উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

মাঘ ১৩৯১

৮৭তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

৮৭তম বর্ষ

(মাঘ, ১৩৯১ হইতে পৌষ, ১৩৯২ ; ইংরেজী : ১৯৮৫)

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'

সম্পাদক

স্বামী নির্জরানন্দ

সংযুক্ত সম্পাদক

স্বামী অজজানন্দ (আশ্বিন, ১৩৯২ পর্যন্ত)

স্বামী প্রমেয়ানন্দ (পৌষ, ১৩৯২ হইতে)

উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

বার্ষিক মূল্য ২২'০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ২'০০ টাকা

উদ্বোধন—বর্ষসূচী

৮৭তম বর্ষ

(মাঘ, ১৩৯১ হইতে পৌষ, ১৩৯২)

৮০/৬ গ্রে-স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী নির্জরানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত এবং ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩ হইতে প্রকাশিত।
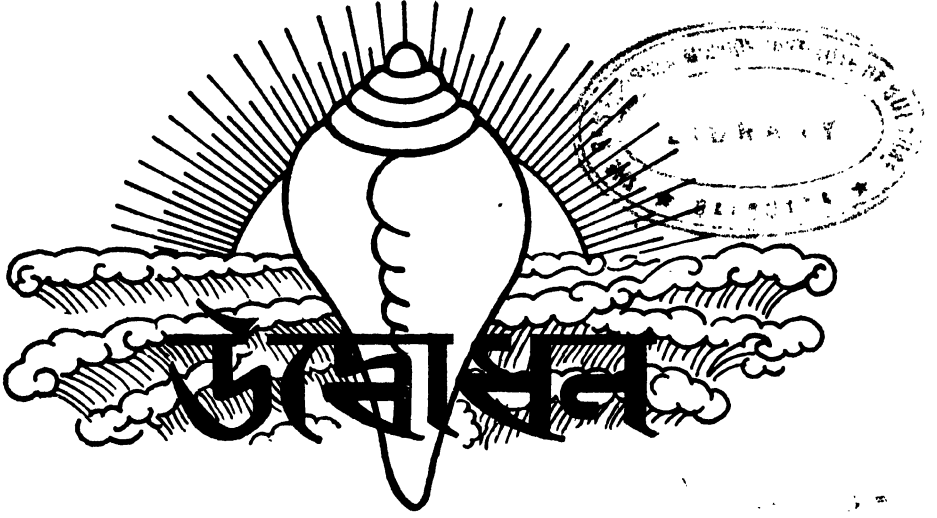
৮৭তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

মাঘ, ১৩৯১

দিব্য বাণী

…ভারতীয় বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়-সাধনই ভবিষ্যৎ ভারত-গঠনের প্রথম কর্মসূচী, যুগযুগান্তধরিয়া অবস্থিত কালজয়ী ঐ মহাচল হইতেই এই প্রথম সোপান প্রস্তুত করিতে হইবে।…নিজেদের কল্যাণের জন্য, জাতির কল্যাণের জন্য, আমাদিগকে পরস্পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া বিবাদ ও পরস্পর ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিবার সময় আসিয়াছে। নিশ্চয় জানিও, এই-সকল বিবাদ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, আমাদের শাস্ত্র ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া থাকে, আমাদের পূর্বপুরুষগণের ইহা সম্পূর্ণ অননুমোদিত, আর যাঁহাদের বংশধর বলিয়া আমরা দাবি করিয়া থাকি, যাঁহাদের রক্ত আমাদের শিরায় শিরায় প্রবহমান, সেই মহাপুরুষগণ তাঁহাদের সন্তানগণের অতি সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া এইরূপ বিবাদকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

এই-সকল দ্বেষ ও দ্বন্দ্ব পরিত্যক্ত হইলে অন্যান্য বিষয়ে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। যদি রক্ত তাজা ও পরিষ্কার হয়, সে দেহে কোন রোগের বীজ বাস করিতে পারে না। ধর্মই আমাদের শোণিতস্বরূপ। যদি সেই রক্তপ্রবাহ চলাচলের কোন বাধা না থাকে, যদি রক্ত বিশুদ্ধ ও সতেজ হয়, তবে সকল বিষয়েই কল্যাণ হইবে। যদি এই 'রক্ত' বিশুদ্ধ হয়, তবে রাজনীতিক, সামাজিক বা অন্য কোনরূপ বাহ্য দোষ, এমন কি আমাদের দেশের ঘোর দারিদ্র্যদোষ—সবই সংশোধিত হইয়া যাইবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

['স্বামীজীর বাণী ও রচনা', পঞ্চম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৮৪]
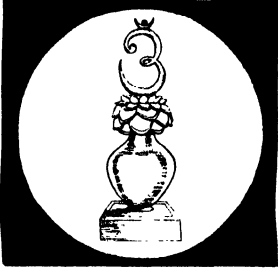
কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের নববর্ষ

বর্তমান সংখ্যায় 'উদ্বোধন' সপ্তাশীতি বর্ষে উপনীত হইতেছে। জীবনের পরিচয় কর্মে। কর্মের দ্বারাই জীবনকালের মূল্যায়ন হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র সীমিত কর্মের বিচারে দীর্ঘ আয়ুষ্কালকেও লঘু দৃষ্টিতে পরিমাপ করা হয়, আবার কর্মের ব্যাপকতায় ও গুরুত্বে অতি স্বল্পকালীন জীবনকেও অমরত্বের গৌরব প্রদান করা হইয়া থাকে। পরন্তু আরও সত্য যে, উচ্চ আদর্শ ও উন্নত কর্মের প্রাণসঞ্জীবনী শক্তি সর্ববিধ জড়ত্বকে চিরদিনই দূরে ঠেলিয়া রাখে—প্রাচীনকেও নবীনের দীপ্তি প্রদান করে। 'উদ্বোধন' পত্রিকার এই সপ্তাশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমকে আমরা কোন্ দৃষ্টিতে বিচার করিব? নিছক কালের হিসাবে ইহাকে দীর্ঘ—পুরাতন ও জীর্ণ বলিয়া ধারণা হইতে পারে। কিন্তু অনন্তের যাত্রাপথে যাহার বিচরণ, কর্মের পরিধিও যাহার অন্তহীন অসীম,—তাহার পক্ষে এই দীর্ঘ জীবনকালও নিতান্তই সূচনাপর্ব মাত্র। সপ্তাশীতি বর্ষের 'উদ্বোধন' তাই যথেষ্ট পুরাতন হইয়াও বিশেষ অর্থে নিত্য নবীন। 'পুরাপি নব এবেতি পুরাণঃ।' পুরাতন অথচ নবীন—কেননা ইহা যে চিরন্তনেরই বার্তাবহ।

'উদ্বোধন' একখানি সাময়িক পত্রিকা মাত্রই নহে। ইহার পত্রে পত্রে সঞ্চরণশীল স্বামী বিবেকানন্দের ভাবপ্রবাহ,—বিকীর্ণ রহিয়াছে প্রাচ্যের ধ্যানধারণার সহিত প্রতীচীর জ্ঞান-বিজ্ঞান। এক কথায়, স্বামীজীর দিব্যদৃষ্টিতে প্রকট শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বম্ভররূপেরই অপর বাঙ্ময় আকার ইহা—একত্র অভিনব বাণী-শরীর। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবের অপরূপ জাহ্নবীধারা এই 'উদ্বোধন'।

'উদ্বোধন' আর কাহারও দ্বারা নহে—ঘনীভূত বিশ্ববিবেক, নরঋষি স্বামীজীর ধ্যানের দ্বারা সৃষ্ট—তাঁহারই কল্যাণ-ভাবনায় লালিত ও বর্ধিত। প্রায় শতাব্দকাল পূর্বে ইহার জন্মক্ষণে স্বামী বিবেকানন্দের 'উদ্বোধনের প্রস্তাবনা'য় যাহা ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহাতেই নির্দিষ্ট রহিয়াছে, এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ও আদর্শ। সংক্ষেপে উহা এইরূপ :

'ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত—এক দেবপ্রতিম জাতির অলৌকিক উদ্যম, বিচিত্র চেষ্টা, অসীম উৎসাহ, অপ্রতিহত শক্তিসংঘাত ও সর্বাপেক্ষা গভীর চিন্তাশীলতায় পরিপূর্ণ। ইতিহাস অর্থাৎ রাজ-রাজড়ার কথা ও তাহাদের কাম-ক্রোধ-ব্যসনাদির দ্বারা কিয়ৎকাল পরিক্ষুব্ধ, তাঁহাদের সুচেষ্টা-কুচেষ্টায় সাময়িক বিচালিত সামাজিক চিত্র হয়তো প্রাচীন ভারতে একেবারেই নাই।··· ভারতের ধর্মগ্রন্থরাশি কাব্যসমুদ্র, দর্শনসমূহ ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক তন্ত্রশ্রেণী, প্রতি ছত্রে তাহার প্রতি পদবিক্ষেপ, রাজাদিপুরুষবিশেষবর্ণনাকারী পুস্তকনিচয়াপেক্ষা লক্ষগুণ স্ফুটীকৃতভাবে দেখাইয়া দিতেছে। প্রকৃতির সহিত যুগযুগান্তরব্যাপী সংগ্রামে তাঁহারা রাশীকৃত জয়পতাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আজ জীর্ণ ও বাত্যাহত হইয়াও সেগুলি প্রাচীন ভারতের জয় ঘোষণা করিতেছে।'

... ...

'ভূমধ্যসাগরের পূর্বকোণে সুঠাম সুন্দর

দ্বীপমালা-পরিবেষ্টিত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-বিভূষিত একটি ক্ষুদ্র দেশে অল্পসংখ্যক অথচ সর্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণাবয়ব···অপূর্ব ক্রিয়াশীল, প্রতিভাশালী এক জাতি ছিলেন। অন্যান্য প্রাচীন জাতিরা ইহাদিগকে যবন বলিত ; ইহাদের নিজ নাম—গ্রীক।

'মনুষ্য-ইতিহাসে এই মুষ্টিমেয় অলৌকিক বীর্যশালী জাতি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। যে দেশে মনুষ্য পার্থিব বিদ্যায়—সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, দেশশাসন, ভাস্কর্যাদি শিল্পে—অগ্রসর হইয়াছেন বা হইতেছেন, সেই স্থানেই প্রাচীন গ্রীসের ছায়া পড়িয়াছে।···

'সমগ্র ইউরোপ আজ সর্ববিষয়ে প্রাচীন গ্রীসের ছাত্র এবং উত্তরাধিকারী, এমন কি, একজন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, "যাহা কিছু প্রকৃতি সৃষ্টি করেন নাই, তাহা গ্রীক মনের সৃষ্টি।"

'সুদূরস্থিত বিভিন্নপর্বত-সমুৎপন্ন এই দুই মহানদীর মধ্যে মধ্যে সঙ্গম উপস্থিত হয় ; এবং যখন ঐ প্রকার ঘটনা ঘটে, তখনই জনসমাজে এক মহা আধ্যাত্মিক তরঙ্গে উত্তোলিত সভ্যতা-রেখা সুদূর সম্প্রসারিত [হয়] এবং মানবমধ্যে ভ্রাতৃ-বন্ধন দৃঢ়তর হয়।'

মানব-সংস্কৃতির উক্ত দুই সু-উন্নত পর্বতশিখর হইতে উৎসারিত দুইটি স্রোতধারা—ইতিবৃত্ত ও ইতিহাসের মিলন ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন স্বামীজী। তিনি দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ঐ সম্মিলনের স্বাভাবিক ফলশ্রুতিরূপে জনসমাজে উত্থিত এক মহা আধ্যাত্মিক তরঙ্গ এবং দূর-দিগন্ত বিস্তৃত অপূর্ব মানব-ভ্রাতৃত্ব! ভারতের ইতিবৃত্ত এবং ইউরোপের ইতিহাস উভয়ের সমুচ্চয় আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন তিনি,—কাহাকেও ইতি করেন নাই কোথাও। 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রতি ছত্রে এই সমুচ্চয় সাধনের অঙ্গীকারই উদ্‌ঘোষিত হইবে—ইহাই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ।

কিন্তু এই কার্য সম্পাদন নিশ্চয়ই অতীব কঠিন। নীতি হিসাবে মানিয়া লওয়া এক জিনিস—আর কার্যে পরিণত করার দায়িত্ব পালন স্বতন্ত্র ব্যাপার—দুস্তর সাধনসাপেক্ষ। 'একের গভীর চিন্তা, অপরের অদম্য কার্যকারিতা ;··· একের সর্বচেষ্টা অন্তর্মুখী, অপরের বহির্মুখী ; একের প্রায় সর্ববিদ্যা অধ্যাত্ম, অপরের অধিভূত ; একজন মুক্তিপ্রিয়, অপর স্বাধীনতাপ্রাণ।'—অতএব এই দুই শক্তির মিলন-প্রচেষ্টা অত্যন্ত দুরূহ সাধন বৈ কি! অনেক কিছুকে হারাইবার, ছাড়িবার ও মানিয়া লইবার গুরুতর প্রশ্নগুলিও এখানে আসিতে বাধ্য। স্বামীজী নিজেও তাহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল শঙ্কার সমাধানও তিনি যাহা নির্দেশ করিয়াছেন, উহাই বর্তমান যুগের প্রাণ-বাণী—উদ্বোধন-মন্ত্র। উল্লিখিত 'প্রস্তাবনা'-তে তিনি উহা এইরূপ লিখিয়াছেন :

'ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে ; যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ।'

'ঘরের সম্পত্তি'—ভারতীয় ধ্যান-ধারণা-সংস্কৃতি,—সত্ত্বগুণ-সঞ্জাত বিদ্যা-জ্ঞান-উপলব্ধি, শিল্প-সাহিত্য-দর্শন, বেদ-বেদান্ত-পুরাণ-ইতিবৃত্ত। আর 'পাশ্চাত্য কিরণ'—বিজ্ঞান-প্রযুক্তি,—রজোগুণ-সৃষ্ট কর্মকুশলতা, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ভূবিদ্যা, ইতিহাস প্রভৃতি। ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ 'ঘরের সম্পত্তি'-কে সশ্রদ্ধ পরিরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের দৃপ্ত কিরণমালাকেও সমাদরে বরণ করিয়া লইয়া ঘরকে আরও আলো-বাতাসযুক্ত করিয়া স্বাস্থ্যপ্রদ করিতেই স্বামীজী নির্দেশ দিয়াছেন। পরিশেষে তিনি ইহাও বলিয়াছেন—'এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা "উদ্বোধনের" জীবনোদ্দেশ্য।'

'উদ্বোধন' তাহার সপ্তাশীতি বর্ষব্যাপী জীবনে উল্লিখিত প্রাণবাণীকেই মন্ত্ররূপে যথাশক্তি সাধিয়া চলিয়াছে। কতখানি সফল হইতেছে, সে-বিচারের অধিকার তাহার নহে। আচার্য-নির্দেশকে শিরোধার্য করিয়া—অগণিত ভারত-ভারতীর সহৃদয় উৎসাহে ও সহযোগিতায় ভরসা রাখিয়া 'উদ্বোধন' তাহার সীমিত শক্তি লইয়া নীরবে ও ধীর পদক্ষেপে নিজ সাধনপথ অতিক্রমণ করিতেছে। একটি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক তাহাকে নিরন্তর সম্মুখের পথ দেখাইতেছে—চলিবার আহ্বান জানাইতেছে। স্বামী সারদানন্দের লেখনী-নিঃসৃত কয়টি কথা, যাহা তিনি একদা লিখিয়াছিলেন অনুরূপ এক মাঘ সংখ্যাতে কিঞ্চিদধিক আট দশককাল পূর্বে, তাহাই ধ্রুবতারার ন্যায় আজও উহার মাথার উপরে :

'হে পাঠক! "উদ্বোধন" পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইল। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবোধিত সত্ত্ব বা ব্রহ্মশক্তি বীরাগ্রণী শ্রীবিবেকানন্দ-হৃদয়নিহিত রজঃ বা ক্ষত্রশক্তির সহিত মিলিত হইয়া পর-কল্যাণের নিমিত্ত ইহাকে জাগরিত করিয়াছে। সেই জন্য আপাততঃ শিশু হইলেও ইহা প্রবীণ, স্বল্পবয়স্ক হইলেও অমিতবলশালী এবং ক্ষুদ্র হইলেও ভারতের কল্যাণ সাধনে বদ্ধপরিকর। আশ্চর্য নহে,—সর্ষপতুল্য বীজেই বিশাল বৃক্ষ, নগণ্য অসহায় মনুষ্য শরীরেই জড় শক্তি নিয়ামিকা চৈতন্যময়ী অদ্ভুত বুদ্ধি শক্তি এবং আকাশাপেক্ষাও তরল ইন্দ্রিয়াতীত মনে সমস্ত বিশ্বসংসার নিহিত রহিয়াছে। নববর্ষে নবোদ্যমে পুরাতন শক্তি আবার জাগরিতা।

'হে পাঠক, ভারতের কুলদেবী দুঃস্বপ্ননাশিনী শিবানীর উপাসনার এবং পূর্ণভাবে আত্মবলি-দানের জ্বলন্ত মহিমা যদি অনুভব করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে এস একবার নিমীলিত নেত্রে ধ্যান-সহায়ে সেই দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলে কুটীর-নিবাসী আত্মহারা প্রেমিক এবং সেই গুরুভক্ত যুবক সন্ন্যাসী, যাঁহার অদ্ভুত ধর্মবলে আজ সুদূর মার্কিনে চিরপদদলিত হিন্দুর ধর্মধ্বজা সগৌরবে উড্ডীন, তাঁহাদের পদপ্রান্তে ক্ষণেকের জন্য দণ্ডায়মান হই। ওঁ শিবা বঃ সন্তু পন্থানঃ।'

'উদ্বোধন' পত্রিকার বর্তমান বর্ষারম্ভে আমরা ইহার সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা এবং শুভানুধ্যায়ীকে সসম্ভ্রম শুভেচ্ছা জানাইতেছি—আন্তরিক কামনা করিতেছি তাঁহাদের প্রত্যেকের অকুণ্ঠ প্রীতি ও সহযোগিতা।

যুববর্ষে বিবেকানন্দ-চেতনা

ইংরেজী ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দকে ইতিহাসে স্মরণীয় করার ব্যবস্থা হইয়াছে—রাষ্ট্রসঙ্ঘ ইহাকে 'আন্তর্জাতিক যুববর্ষ' বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। বিশ্বের যুবশক্তিকে নূতন দৃষ্টিতে মূল্যায়নের ইহা এক অভিনব ও তাৎপর্যমণ্ডিত প্রয়াস। বর্তমান বর্ষের সকল উদ্যোগ ও চিন্তার ক্ষেত্রে তারুণ্যের অগ্রাধিকার সগৌরবে স্বীকৃতিলাভ করিবে—ইহাই স্বাভাবিক প্রত্যাশা। ততোধিক আনন্দের ও গর্বের বিষয় যে, ভারতের জাতীয় সরকার এই যুববর্ষের সূচনা ঘোষণা করিয়াছেন যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের শুভ আবির্ভাব তারিখ (ইংরেজী দিনপঞ্জী অনুযায়ী) ১২ জানুআরি হইতে। সরকারী ঘোষণায় আরও বলা হইয়াছে যে, অতঃপর প্রতিবর্ষেই এই ১২ জানুআরি তারিখটি সারা ভারতের জাতীয় যুবদিবসরূপে সূচিত হইয়া পরবর্তী সাতদিন 'যুব সপ্তাহ' প্রতিপালিত হইবে।

গত ১২ জানুআরি, ভারতের রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং দেশের যুবসমাজকে উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দের পতাকাবাহী হইয়া সমাজের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইতে। জাতীয় যুবদিবসের তাৎপর্য বুঝাইতে গিয়া রাষ্ট্র-পতি আবেগজড়িত কণ্ঠে বলিয়াছেন : 'স্বামীজী

হইতেছেন যৌবনের প্রতীক। তাঁহার ত্যাগ, সেবা, দেশপ্রেম ও দুর্জয় সাহসকে সম্মুখে রাখিয়া আমাদের দেশের তরুণ-তরুণীরা নূতনভাবে সংগঠিত হউক, স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষানুরূপ তাহাদের পেশীসমূহ হইবে লৌহকঠোর এবং স্নায়ু হইবে ইস্পাতের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ।'

প্রধান মন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধীও সেদিন একই প্রসঙ্গে সোচ্চারে ঘোষণা করিয়াছেন: 'দেশ-গঠনের উদ্দেশ্যে স্বামীজী যাহা কিছু বলিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরন্তন সত্য। কালজয়ী এই সত্যকেই আদর্শরূপে বরণ করিয়া লইয়া ভারতের যুবসমাজকে আজ শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ সমাজ-গঠনে এবং জাতীয় সংহতি সংরক্ষণে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।'

ভারতের যুবসমাজের প্রতি রাষ্ট্রনেতাদের এই [illegible]শান্বিত দৃষ্টি,—রাষ্ট্রের ও সমাজের অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে তরুণ-তরুণীদের সাদর স্বীকৃতি,—জাতির সংগঠনে ও উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা লইতে তাঁহাদিগকে আন্তরিক আহ্বান,—সর্বোপরি একটি সুদীপ্ত তেজোময় আদর্শকে যুবসমাজের সম্মুখে স্থাপনা,—আমাদের জাতীয় সরকারের এক বলিষ্ঠ, সুচিন্তিত ও অভিনন্দনযোগ্য পদক্ষেপ। আমাদের দেশ বিদেশী শৃঙ্খলমুক্ত হইবার পরেও দীর্ঘ চারিদশক কাল অতিক্রান্ত হইতে চলিয়াছে। এতদিন বাদে এইরূপ সুসিদ্ধান্ত ভারতের জাতীয় সরকার গ্রহণ করিলেন! অনেক বিলম্বে হইলেও, এমন একটি কল্যাণ-সংকল্পকে সরকার বরণ করিয়াছেন—ইহার জন্য আমরা সাধুবাদ না জানাইয়া পারি না।

কাল বহিয়া গিয়াছে,—অনেক অবাঞ্ছিত ঘটনার স্রোত বহুদূর গড়াইয়াছে। জাতীয় যুবশক্তিকে বিবেকানন্দের তারুণ্য-দৃপ্ত জীবন হইতে অনুপ্রেরণা সঞ্চয়নের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ও তদনুকূল শিক্ষা-পরিবেশ সৃষ্টি করা রাষ্ট্রনায়কগণের কর্তব্য ছিল বহু পূর্বেই। তাহা হইলে ভারতের সর্বত্র সম্প্রতি যে নিদারুণ অবক্ষয় ও পচন-লক্ষণ দেখিয়া সকলেই আতঙ্কগ্রস্ত বোধ করিতেছেন, হয়তো বা উহা অনেকাংশেই এড়ান সম্ভবপর হইত। যাহা হউক, অতীতের জন্য দীর্ঘশ্বাস না ফেলিয়া, বর্তমানের এই শুভ উদ্যোগকে আমরা অকুণ্ঠ স্বাগত জানাইতেছি। ভারতের ছেলে-মেয়েদের মনে স্বামীজীর অগ্নিগর্ভ বাণী হইতে বিচ্ছুরিত স্ফুলিঙ্গ বিদ্যুৎ-ঝলকের ন্যায় চমকিত হউক,—তাহারা বাস্তবিকই বিবেকানন্দ-তড়িৎ-শক্তিতে স্পৃষ্ট হইয়া জাগিয়া উঠুক,—স্বামীজীর ধ্যানদৃষ্ট মহিমান্বিতা ভারত-জননীকে উহারা চোখ মেলিয়া দেখুক,—শাশ্বত ভারতবর্ষকে তাহারা চিনিয়া লইতে সমর্থ হউক, আমাদিগের ইহাই আন্তরিক প্রার্থনা।

একটা দেশ বা জাতির পক্ষে যৌবনাদর্শের প্রকাশ ও প্রয়োগ একান্ত অপরিহার্যই শুধু নয়,—তাহার জীবন-চিহ্নও বটে। প্রশ্ন উঠিতে পারে, বহুতর অভিজ্ঞতাময় প্রবীণতার প্রয়োজন তবে কি মূল্যহীন? উত্তরে স্পষ্টই বলিতে হইতেছে,—না, বহুদর্শী প্রবীণের স্থান সমাজের শীর্ষে—তাহাদের অভিজ্ঞতাই গতিশীল সমাজের প্রকৃত পথের দিশারী।

সবুজ কিশলয়গুলি গাছের প্রাণ-পরিচায়ক বটে,—উহার পুষ্টি ও বৃদ্ধির উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি। কিন্তু তাই বলিয়া বৃক্ষের অজস্র পুরাতন পত্ররাশিও কিছু প্রত্যাখ্যেয় নহে। অগ্রজ ঐ পাতার সমষ্টিই তো আলো-বাতাস-মৃত্তিকা হইতে গাছের বাঁচিবার উপকরণগুলিকে সংগ্রহ করিয়া আসিতেছে,—কচি কিশলয়-উদ্‌গমেও প্রত্যক্ষ সহায়তা করিয়াছে। অতএব পুরাতন পাতা এবং সতেজ কিশলয়—বৃক্ষের জীবনে উভয়েরই গুরুত্ব ও মর্যাদা সমান স্বীকৃত। কিশলয়েরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি

ঘটে পত্রে,—বৃক্ষের জীবনবৃত্ত ইহাই বলে।

পরিণামের সার্থক রূপায়ণ প্রবীণতায়। তথাপি স্মরণ রাখিতে হইবে, কর্মসম্পাদন ও কর্ম-নির্দেশনা কিছু এক নহে—সুষ্ঠু প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বরং ভিন্ন,—কিন্তু পরস্পরের পরিপূরক। যৌবনের উদ্যমই কর্মসম্পাদনের মূলে—প্রবীণের পূর্ব অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত নির্দেশনাই কর্মের গতি, ছন্দ ও লক্ষ্যের নিয়ামক। যে-সমাজে এই উভয়ের ভূমিকাই যথোপযুক্ত পালিত হয়, সেই সমাজই যথার্থ উন্নতি-লক্ষণশীল। যুববর্গের উত্তেজনাকর ভাবোচ্ছ্বাসে তাই কেহ যদি মনে করিতে আরম্ভ করেন যে, সমাজে প্রবীণের প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছে,—তবে উহা হইবে অত্যন্ত অমঙ্গলের সূচক।

উপনিষদের ঋষিমুখেও আমরা ঠিক এই উপদেশই শুনিয়াছি। তারুণ্যের জয়গান শুভ্রশির শ্রুতিও করিয়াছেন। বলিয়াছেন—যুবা শুধু দেহের বয়সে নহে, মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশেও যদি সেই যুবা সাধুচরিত্র, অধ্যয়নশীল, অভিজাত, দৃঢ় ও সবল হয়—তাহার নিকট সমগ্র পৃথিবীই সকল ঐশ্বর্যসহ ধরা দিবে,—আনন্দের পরাকাষ্ঠাও সেখানেই অভিব্যক্ত হইবে। 'যুবা স্যাৎ সাধু যুবা অধ্যায়কঃ আশিষ্ঠঃ দ্রঢ়িষ্ঠঃ বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স একো মানুষঃ আনন্দঃ।' ঐ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ-ই অপর মন্ত্রে তরুণ শিক্ষা-র্থীকে নির্দেশ দিয়াছেন,—যাঁহারা জ্যেষ্ঠ তাঁহাদের সেবা করিবে।...নিজ আচরণীয় কর্ম সম্পর্কে কখনও সংশয় উপস্থিত হইলে, ঐ-কালে ঐ-স্থানে সমুপস্থিত জ্ঞানী, নীতিপরায়ণ, উদারচরিত্র শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যেরূপ যাহা করেন, তুমিও সেইরূপই করিবে। এমন কি তাঁহাদের কর্মধারাতে যদি সংশয়ান্বিত হও, তবে তাঁহাদের মধ্যেও যিনি বিচারক্ষম জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তাঁহাকেই অনুসরণ করিও। 'যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্।...অথ যদি তে কর্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তিবিচিকিৎসা বা স্যাৎ। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আয়ুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তত্র বর্তেরন্। তথা তত্র বর্তেথাঃ। অথ অভ্যাখ্যাতেষু যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ।...তথা তেষু বর্তেথাঃ।'

বুঝিতে কষ্ট হয় না,—যৌবনের প্রকৃত আদর্শ কী। অদম্য উৎসাহ, বুকভরা আশা, দৃঢ় চরিত্রবল, অটল আত্মপ্রত্যয় এবং নীরোগ বলিষ্ঠ ইস্পাত-দৃঢ় শরীরই যৌবনের লক্ষণ। আর সেই যৌবন-তেজের মধ্যে নিহিত থাকিবে গভীর শ্রদ্ধা। একাধারে এই গুণগুলির ঘনীভূত মূর্তি চিন্তা করিতেও ভাল লাগে—ঐ মূর্তির কাছে যেন মাথা আপনিই নত হয়—হৃদয়ে নব বলসঞ্চার অনুভূত হইতে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দই আমাদের সেই ঈপ্সিত মূর্তি—উপনিষদের ঋষির ধ্যান-দৃষ্ট আদর্শ মানব-বিগ্রহ।

তারুণ্য বা যুবাত্ব নিছক শরীরের ধর্ম নহে—উহা একটি উচ্চ মানসিক অবস্থা, দৈবী সম্পদ, যাহা পরিণত বয়সেও ব্যক্ত থাকিতে পারে,—আবার দুরদৃষ্টক্রমে যৌবনেও ম্লান হইয়া যাইতে পারে। এই অবস্থা কিংবা গুণ বা সম্পদ বলেই সর্বপ্রকার শিক্ষা ও সাধনায় মানুষ অগ্রসর হইতে সক্ষম হয়—সকল বাধা-বিপত্তিকে প্রতিহত করিবার সাহস ও ঝুঁকি লইতে পারে। মাত্র ঐহিক ক্ষেত্রেই নহে—আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির সাধনপথেও চিরকাল ইহাই সত্য। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ 'ছোকরা' ভক্তদের বিশেষত্বকে বহু-ভাবে বুঝাইয়াছেন। 'ছোকরাদের জ্ঞানোপদেশ দিলে শীঘ্র চৈতন্য হয়।' 'ছোকরারা খাঁটি দুধ, একটু ফুটিয়ে নিলেই হয়।' 'ছোকরারা যেন নূতন হাঁড়ি, দুধ নিশ্চিন্ত হয়ে রাখা যায়।' এই-রূপ আরও অনেক উক্তি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে

আমরা পাঠ করিয়া থাকি। দেখা যাইতেছে, যুগ যুগ ধরিয়া ঋষি-মুনি-আচার্য লোকশিক্ষকগণ যুবশক্তিকেই সর্বাধিক কার্যকর বলিয়া নির্দেশ করিয়া আসিতেছেন। যতদিন পর্যন্ত সংসারের কুটিল আবর্ত ও কামকাঞ্চনাসক্তি মনকে মলিন করিতে না পারে, ততদিন পর্যন্তই মানসিক তারুণ্য—তেজ ও শক্তি বজায় থাকে—আর ততদিনই বৃহৎ কার্যে মনোনিয়োগ সম্ভবপর হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে মনকে ভিন্নভাবে জড়িত করিবার পরে উহা সম্ভবাতীত হইয়া দাঁড়ায়,—প্রাকৃতিক নিয়মেই তখন যুবাকালে বার্ধক্য-লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতে থাকে। সকল যুগে সর্বত্র যৌবনের জয়গান এই কারণেই,—উন্নতিকামী সমাজে যুব-সমাজের জাগরণও তাই এত বেশি আকাঙ্ক্ষিত।

যাঁহার আবির্ভাব-স্মৃতিকে সম্মুখে রাখিয়া এই আন্তর্জাতিক যুববর্ষের সূচনা হইল—যাঁহার আদর্শকে অনুসরণের আহ্বান শোনা গেল ভারতের রাষ্ট্রপ্রধানদের কণ্ঠে, যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া দেশব্যাপী উদ্‌যাপিত হইল জাতীয় যুবদিবস, সেই স্বামী বিবেকানন্দের বাণী অদ্যাবধি আকাশে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। ভারতের তরুণ-তরুণীদের হৃদয়াকাশে সেই বিবেক-বাণীরই প্রতিধ্বনি উঠুক, —যুববর্ষের প্রারম্ভে ইহাই আমাদের কামনা। যুগনায়ক স্বামীজী কম্বুকণ্ঠে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন :

'হে যুবকবৃন্দ, আমার আশা তোমাদের উপর, তোমরা কি তোমাদের সমগ্র জাতির আহ্বানে সাড়া দিবে না? তোমরা যদি ভরসা করিয়া আমার কথায় বিশ্বাস কর, তবে আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের প্রত্যেকেরই ভবিষ্যৎ বড় গৌরবময়। নিজেদের উপর প্রবল বিশ্বাস রাখো, যেমন বাল্যকালে আমার ছিল।... তোমরা প্রত্যেকে নিজের প্রতি এই বিশ্বাস-সম্পন্ন হও যে, অনন্ত শক্তি তোমাদের সকলের মধ্যে রহিয়াছে। তোমরা সমগ্র ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করিবে।...

'...আমি চাই কয়েকটি যুবক। বেদ বলিতেছেন, 'আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠো মেধাবী' —আশাপূর্ণ বলিষ্ঠ দৃঢ়চেতা ও মেধাবী যুবকগণই ঈশ্বরলাভ করিবে। তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবন-গতি স্থির করিবার এই সময়, যতদিন তোমাদের ভিতর যৌবনের নবীনতা ও সতেজভাব রহিয়াছে, কাজে লাগো—এই তো সময়।'

অবশ্য স্বামীজী ইহাও সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন—'কিন্তু মানুষ চাই, পশু নহে।'

যুবমানসে স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দীপনাকর বাণীপ্রবাহ পুনরায় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠুক, যেমনটি হইয়াছিল প্রাক্‌স্বাধীন ভারতবর্ষের তরুণদের চিত্তে—আসমুদ্র-হিমাচলে যাহা সাড়া জাগাইয়াছিল। বর্তমান বিভ্রান্তি ও নৈরাশ্যের যুগে, জাতির যুবচরিত্র যখন ইতস্ততঃ আদর্শ খুঁজিতে খুঁজিতে হতোদ্যম, ঠিক সেইক্ষণেই স্বামীজীর বিবেক-দৃপ্ত জীবনালেখ্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ভারতের রাষ্ট্রকর্ণধারগণ বাস্তবিকই পরম কল্যাণ-সাধন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ আদর্শ-বিগ্রহকে যে বেদিকায় স্থাপনা করিতে হইবে, ইত্যবসরে তাহারও পরিমার্জন একান্ত অপরিহার্য প্রয়োজন। অন্যথায় পুঞ্জীভূত জঞ্জাল ও আবর্জনার স্তূপের উপর তাঁহার আসন রচনায়—কেবল আদর্শের অমর্যাদা হইবে না, সমগ্র প্রয়াসটিই ব্যর্থ ও হাস্যকর হইবে। শিক্ষা-সাহিত্য-নাটক, চলচ্চিত্র-বেতার-দূরদর্শন এবং পত্র-পত্রিকাদি জনমাধ্যমগুলিও অচিরে সুসংস্কৃত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। নূতন আলোকের সন্ধান মাত্র দিলেই চলিবে না—আলোকের প্রবেশ-পথও অবাধ ও অনুকূল করিয়া তোলা রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব। নতুবা পুরাতন জঞ্জালরাশি হইতে রোগ-বীজাণুর প্রজননও অব্যাহতই থাকিয়া যাইবে। সমাজ-দেহের ব্যাধি নিরাময়ের অন্য বিকল্প কিছু আর আছে কি?

বিবেকানন্দ-চেতনায় ভারতের যুবসমাজ উদ্বুদ্ধ হইবে,—ব্যাধিমুক্ত সুস্থ সমাজগঠনে তাহারাই হইবে সুযোগ্য বিবেকানন্দ-পদাতিক, ইহাই দেখিবার জন্য আমরা অধীর প্রতীক্ষায় রহিলাম। যুববর্ষ জয়যুক্ত হউক।

শ্রীশ্রীমায়ের অপ্রকাশিত পত্র

॥ এক ॥

২৩শে চৈত্র, জয়রামবাটী

কল্যাণবরেষু,

বাবাজীবন তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। সংসারে থাকিতে গেলে মধ্যে মধ্যে মনে অশান্তি আসে বটে। তা তোমাদের ভয় কি? তোমরা তাঁর শরণাগত। ৺ঠাকুর তোমার মঙ্গল করুন এই আশীর্ব্বাদ করি। অত্রস্থ কুশল। আমি ভাল আছি।

ইতি আশীর্ব্বাদিকা
তোমার মাতাঠাকুরাণী

॥ দুই ॥

(শ্রীযুক্ত মানদাশঙ্কর দাসগুপ্তকে লেখা)

জয় মা

জয়রামবাটী
৩০শে চৈত্র

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্রখানা পাইলাম [।] তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে [।] আর সীতানাথ সম্বন্ধে যাহা লেখিয়াছ তাহাও শুনিলাম [।] সীতানাথকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবা আর বলিবা তাহাকে আমি যাহা দিয়াছি তাহা জপ্ করিলেই সমস্ত হইবে [,] তাহাকে আর কিছুই করিতে হবে না কারণ যেই ঠাকুর সেই আমি। আর রাখাল নামক ছেলেটী আমাকে যাহা লেখিয়াছে তাহাও শুনিলাম [।] তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ দিয় [দিও] এবং তাহাকে বলিবে ত্যাগ করিতে হইলে প্রথম ভগবানে [ভগবানের] প্রতি কত ব্যাকুলতা আছে সেটী দেখিতে হয় [।] সে যদি নিজে মনে করে যে তার মন ভগবান্ ব্যতিত [ব্যতীত] আর কিছু চায় না তবে ত্যাগ করা উচিত [,] নতুবা পরে ঐ বৈরাগ্য থাকে না। বিঃ কিঃ আমি ও রাধু ভাল আছি [।] তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ জানিবে [।]

তোমাদের
মা

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

বিগত ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০, কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ-স্মৃতি-মন্দির পরিদর্শনান্তে প্রদত্ত ভাষণের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক : শ্রীসন্দীপ বসু।

দিশারী আত্মা

ভারতীয় চিন্তা-জগতের পূর্বতন ঋষিদের মতোই স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের বলেছিলেন, আমাদের গুণাবলীকে আমাদের ভিতর থেকেই জাগ্রত করাতে হবে। অন্য কেউ পথ দেখাতে পারেন, কিন্তু সেই পথ অবলম্বন করা বা না করা প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব দায়িত্ব।

আজ সকালে এখানকার সমিতি আমাকে অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সম্বলিত একটি পুস্তিকা পাঠিয়েছেন। অবশ্য আমি বইটি আগেই পড়েছি। এর প্রতি পৃষ্ঠায় উৎসারিত মহান বাণী থেকে,—বস্তুতঃ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিটি উক্তি থেকেই নির্গত হয় সাহস, শক্তি, আত্মনির্ভরতা এবং বিশ্বাস। এ সেই বস্তু যার প্রয়োজন একদা ভারতের ছিল ; কিন্তু আজ তার প্রয়োজন আরও বেশি। যথার্থ অর্থেই এক মহৎ সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী আমরা। আমাদের জাতীয় দোষ-দুর্বলতার বিশ্লেষণ স্বামীজী কিভাবে করেছেন ? কেমন-ভাবে তিনি আমাদের জাতিগঠনের পন্থা নির্দেশ করেছেন ? স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর কথা থেকে এইমাত্র একটি ইঙ্গিত পাওয়া গেছে : আমরা আমাদের বিরাট ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকারের উপযুক্ত জীবন যাপন করতে পারছি না। সেই বিরাট ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদিতে মাত্র আবদ্ধ করে আমরা তার গুরুত্বকে কোন না কোন ভাবে লঘু করে ফেলছি। আমরা বিস্মৃত হয়েছি যে, ধর্মীয় আচার এবং অনুষ্ঠান আমাদের লক্ষ্যে অগ্রসর করিয়ে দিতে পারে, কিন্তু সেটাই কিছু লক্ষ্য-বস্তু নয়।

স্বামীজীর ঐতিহাসিক ভূমিকা

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাশক্তি এবং বিবেচনা-শক্তি বিশাল। তাঁর বিরাটত্ব কিন্তু কেবল তাতেই আবদ্ধ নয়। সমগ্র ভারতবর্ষ, সেইসঙ্গে সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণের জন্য তিনি সর্বদাই কিছু একটা করতে জ্বলন্ত বাসনায় অস্থির থাকতেন। বিরাটত্ব সেইখানে। আমার বিবেচনায় তাঁর মহিমা এইখানে : তিনি আমাদের প্রাচীন প্রজ্ঞাকে এমনভাবে উন্মোচিত করতে চেয়ে-ছিলেন, যাতে ব্যক্তি-মানব তার জীবনোদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন হয় ; সামাজিক উন্নতি সাধিত হয় ; সম্ভব হয় সমষ্টির প্রগতি। তাঁর সমৃদ্ধ মনীষার বিশেষত্ব এইখানে—আধুনিক পৃথিবীতে যেসব শক্তি সক্রিয় রয়েছে, তাদের সম্বন্ধে তিনি তীক্ষ্ণভাবে সচেতন ছিলেন। এখানে আসার ঠিক পূর্বে আয়োজিত বিবেকানন্দ প্রদর্শনীটি আমি দেখেছি। অনুভব করেছি এমন কি নিতান্ত আধুনিক কালেও যেসব শক্তিগুলি সক্রিয়, তাদের বিষয়ে পরিপূর্ণ ধারণাসহ তিনি যেভাবে আধুনিক পৃথিবীর সম্মুখীন হয়ে নিজেকে উন্মোচিত করতে পেরেছিলেন, তা সত্যই বিস্ময়কর। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যার কোন্ বিরাট পরিবর্তন ঘটবে, তা মানুষকে কি বিপুল জ্ঞান ও শক্তি অর্পণ করবে, তা তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু সেই জ্ঞান এবং শক্তির সাহায্যে এখন আমরা কি করছি ? স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, এইমাত্র অর্থনৈতিক দারিদ্র্য

দূরীকরণের প্রয়োজনের কথা বলেছেন। আমরা তা করতে দায়বদ্ধ। তার জন্য নানা পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। জানি না আমরা সফল হতে পারব কিনা। কেবল জানি, আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতেই হবে, আমাদের সব শক্তিকে তাতে নিয়োজিত করতে হবে।

অর্থনীতি শেষ কথা নয়

কিন্তু কেবল দারিদ্র্য দূরীকরণ কোন জাতির পক্ষে একমাত্র কাজ হতে পারে না। দুর্গত মানুষের মন থেকে আধ্যাত্মিক দারিদ্র্যও দূর করতে হবে। এক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্য বৃহৎ আধ্যাত্মিক নেতাদের কাছ থেকে অনেক প্রজ্ঞাবাক্য ও নির্দেশবাক্য আমরা পেয়েছি। আধুনিক মানুষ তা জানে,—কিন্তু কর্মপথ নিয়েই যত চিন্তা। আধুনিক মানুষ সহজতম পথে লক্ষ্যে পৌঁছতে আগ্রহী। পথটা তার জন্য সহজ করে দেওয়া হোক, এই একান্ত বাসনা। আর যতই আমরা পথকে সহজতর করি, যত অধিক স্বাচ্ছন্দ্য পাই, ততই আমরা অন্য একদিকে দরিদ্রতর হয়ে পড়ি। কিন্তু আমি মনে করি, এই দুইকে মেলাবার উপযুক্ত রাস্তা আছে এবং ভারতই তা আবিষ্কারে সমর্থ।

সমন্বিত অগ্রগতি চাই

আমরা আজ উপলব্ধি করতে পেরেছি, বস্তুবাদ, তা পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক বস্তুবাদ, অথবা প্রাচ্যের কমিউনিস্ট বস্তুবাদ (বস্তুত তাও পাশ্চাত্যজাত), যাই হোক, মানুষের আত্মজিজ্ঞাসার উত্তরদানে অসমর্থ। তারা কিছু সমস্যার সমাধান করেছে বটে, কিন্তু অনেক নতুন সমস্যার সৃষ্টিও করেছে। এইসব সমস্যার মীমাংসা অবশ্য প্রয়োজন। আমরা পৃথিবীকে ধনী এবং দরিদ্র, এই দুই ভাগে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন রাখতে পারি না, যদিও সে ভাগ বাড়ছেই। আমরা মানব-সমাজের বিরাট অংশকে, যেন তারা মানবজাতির অংশ নয়, এইভাবে অধঃপতিত রাখতে পারি না। এসব সমস্যার কোন কোনটি আবার আমাদের দেশের সমস্যা নয়। দরিদ্র মানুষের বস্তুগত উন্নতি এখনকার প্রচেষ্টার বিষয়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রচেষ্টাটি যা আত্মিক দারিদ্র্য দূর করবে তা কোনমতে কম প্রয়োজনীয় নয়। এই পৃথিবীতে মানুষ শান্তিতে থাকতে পারবে না, যদি না শান্তি থাকে তার নিজের মধ্যে। মানুষ প্রকৃতিকে জয় করেছে, বলের দ্বারা নয়, এই পৃথিবীতে ক্রিয়াশীল শক্তিসমূহকে বুঝবার চেষ্টার দ্বারা। এই কারণে চাতুরী যেখানে ব্যর্থ, বিজ্ঞান সেখানে সফল।

কিছু প্রাকৃতিক শক্তি সম্বন্ধে এই যে-জ্ঞান আমরা অর্জন করেছি এবং তারই বলে আবিষ্কার করেছি—আরও অনেক প্রাকৃতিক শক্তি আছে যা এখনও আমাদের বোধের অতীত। আমরা এমনকি নিতান্ত এক ক্ষুদ্র প্রাণী, যা মহাবিশ্বের এক কণা ছাড়া কিছু নয়, মানুষ নামে যা অভিহিত—তাকেই পরিপূর্ণভাবে বুঝবার চেষ্টা করে উঠতে পারিনি।

আমাদের দর্শন শাস্ত্রাদি সেই উপলব্ধির চেষ্টাই করেছে। কিন্তু আমি আগেই বলেছি, আমাদের অধিকাংশ মানুষই সুবিধামতো মানব-প্রয়াসের ঐ অংশকে বিস্মৃত হয়েছে।

আজকে ভারতে এক ধরনের উত্তেজনা; সারা পৃথিবীতে অন্য ধরনের উত্তেজনা। এই উত্তেজনার কারণ, অনেক যুবক পুরাতন মূল্যবোধের মধ্যে ত্রুটি আবিষ্কার করছে। এর মানে কি এই যে, পুরাতন মূল্যবোধগুলি অসম্পূর্ণ? আমি সেরকম মনে করি না। কিন্তু আমি অবশ্যই মনে করি এর কারণ—অপেক্ষাকৃত পুরাতন প্রজন্মের লোক আমরাই পারিনি পুরাতন মূল্যবোধ অনুযায়ী যথাযথ জীবনগঠন করতে। আর সেইজন্যই ঐ সকল মূল্যবোধকে

গুরুত্বের সঙ্গে বরণ করতে আজকের তরুণরা সন্দিহান এবং তারা নতুন পথ সন্ধানের চেষ্টা করছে। এই ধরনের কোন-কোন পন্থা কোন-কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আমাদের কাছে অর্থহীন মনে হতে পারে। কিন্তু এই ধরনের পরীক্ষামূলক প্রয়াস ও ভুল-ভ্রান্তির মধ্য দিয়েও যদি আমরা শেষ পর্যন্ত সত্যে পৌঁছতে পারি, তাতে এই সব আন্দোলন খানিকটা উদ্দেশ্যসিদ্ধি করবে। আমাদের দেশের এই সমস্যাগুলি সারা পৃথিবীর সমস্যাও বটে। মহাপুরুষরা অনেকে দেখিয়েছেন যে, এই সমস্ত বৈচিত্র্য এক বিরাট সত্যের অংশ এবং আমাদের সেই একত্বের অনুসন্ধানেই সর্বদাই সচেষ্ট হওয়া উচিত। আর বিজ্ঞান বিজ্ঞানই নয়, যদি না তা আমাদের বহু বিচিত্র ও ব্যাপক নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে ঐক্যসূত্রটিকে আবিষ্কারের পথে সন্ধানী না হয়।

স্বামীজীর বাণী : অভীঃ অভীঃ

একটি কথা স্বামীজী তাঁর বক্তৃতায় প্রায়শঃ ব্যবহার করতেন—সেটি হল অভীঃ। তাঁর বলা একটি কাহিনী আমার স্মরণে আসছে। একবার বানরের দল তাঁর পশ্চাদ্‌ধাবন করেছিল। যত জোরেই তিনি দৌড়ান, বানররাও তত জোরে তাড়া করছিল, তাঁকে প্রায় ধরে ফেলে আর কি! তখন কেউ একজন চেঁচিয়ে বলল—"পালিয়ো না, রুখে দাঁড়াও।" তিনি ফিরে রুখে দাঁড়ালেন, তখন বানররাও থমকে দাঁড়াল এবং পালিয়ে গেল। এটা পৃথিবীর অধিকাংশ সমস্যার ক্ষেত্রেই খাটে। যদি কেউ কোন সমস্যাকে অতি বৃহৎ ভেবে তার থেকে পালিয়ে যায়, তাহলে সেটি ক্রমেই বৃহত্তর আকার ধারণ করে তাকে গ্রাস করে ফেলে। কিন্তু সাহসের সঙ্গে তার মুখোমুখি হলে সমাধানের একটা সুযোগ পাবার সম্ভাবনা থাকে। এমন কি সমাধান করতে যদি নাও পারা যায়, তথাপি সংগ্রামের মূল্য আছে, কারণ সেই অভিজ্ঞতা থেকে পরবর্তী কালে সমাধান করা সহজতর হয়ে দাঁড়াবে।

কতিপয়ের জন্য নয়—সকলের জন্য উন্নয়ন চাই

আমরা কেউ কেউ স্বামীজীর মতাদর্শ থেকে ব্যক্তিমুক্তির ধারণা গ্রহণ করেছি, আর তার পরিণতি ঘটেছে—না ব্যক্তি-মুক্তিতে, না সমষ্টি-মুক্তিতে। বিবেকানন্দের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা এবং অধ্যাত্মচেতনার যে সুন্দর সমন্বয় ঘটেছিল তার থেকে আমাদের সমষ্টি-মুক্তি অর্থাৎ সর্বসাধারণের উন্নয়নের ধারণাই গ্রহণ করা উচিত।

স্বামীজী মানব-ভ্রাতৃত্বের বাণী দিয়ে গেছেন। তারই পক্ষে পৃথিবীর সকল দেশে বর্তমানে জোরদার ধ্বনি উঠছে। তার পিছনে আছে প্রচণ্ড শক্তি। কিন্তু এক্ষেত্রেও আবার বলতে হবে, মূল শক্তি যেন মানুষের ভিতর থেকেই উদ্ভূত হয়। মনে হয়, এখন জীবনের সকল কর্ম-ক্ষেত্রেই রাজনীতি ঢুকে পড়েছে। রাজনীতি নিজস্বভাবে মন্দ কিছু নয়। আমরাই তাকে মন্দ করে তুলি। বস্তুতঃপক্ষে আমার মতে জীবনে মূলগতভাবে ভাল বা মন্দ কিছুই নেই। বস্তুর মধ্যে আমরা কি দিচ্ছি, বা তার থেকে কি আদায় করে নিতে চাইছি, তার উপরেই সব কিছু নির্ভর করে। রাজনীতিকে আমরা ব্যক্তিগত কলহ বা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির বিষয় করে তুলছি। অথচ তার মূল চরিত্র হওয়া উচিত ছিল, বা তাই হবে বলে নির্ধারিত ছিল—সমগ্র মানবের অর্থনৈতিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জন্য বিশাল আন্দোলন। রাজনীতির এই হচ্ছে আদর্শ রূপ। রাজনীতি যদি সেই রূপ নেয়, তাহলে তা আমাদের সকলের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করলে মঙ্গল। গান্ধীজী সেই কাজই করে গেছেন। মহান

ধর্মীয় আদর্শকে তিনি সমাজ সেবার কাজে প্রবাহিত করেছিলেন। তাকে বিরাট অসম্ভব আদর্শ বলে সরিয়ে না রেখে জনগণের দৈনন্দিন জীবনে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন—যা লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে বাস্তব পদক্ষেপ। বর্তমানে আমরা আমাদের লক্ষ্যবস্তুকে নির্ধারণ করে ফেলেছি, কেউ কেউ পথের কাঁটা কিংবা পাথরের বাধা দেখে সন্দেহ করছেন—সত্যই আমরা সেপথে অগ্রসর হচ্ছি কিনা বা হতে পারব কিনা। কিন্তু যে যাত্রাই করি না কেন, পথে কাঁটা এবং বাধা থাকবেই; তা ছিল আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়েও; তা ছিল স্বামী বিবেকানন্দ এবং আমাদের ও অন্য দেশের সকল মহান সংস্কারকদের পথেই। কিন্তু এঁরা অগ্রসর হতে পেরেছেন, কারণ এঁরা নিজেদের পায়ের উপর নজর রাখেননি। নজর রেখেছিলেন সম্মুখ-লক্ষ্যে, আলোক-লক্ষ্যে। আমাদেরও মনে জাগিয়ে রাখতে হবে মহান লক্ষ্যবস্তুর রূপচ্ছবি। তা সত্যই মহান; কারণ কেবল আমাদের দেশকে নয়, গোটা মানব-সমাজকে তা আলিঙ্গন করে আছে। ভারতের বিরাট সৌভাগ্য, এই দেশে রাজনীতির ক্ষেত্রে, সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে, ধর্ম-সংস্কারের ক্ষেত্রে এমন নেতৃগণের আবির্ভাব হয়েছে যাঁরা জনগণের আদর্শ-লক্ষ্যকে উন্নততর করেছিলেন, তাদের পথ দেখিয়েছিলেন কেবল অতীতের যথাযথ মূল্যায়নে নয়, একই সঙ্গে ভবিষ্যতের রূপ-কল্পনা করে নিয়ে সেদিকে অগ্রসর হবার জন্যও।

আমাদের পরিবারে স্বামীজীর প্রভাব

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, রচনা, জীবনীর সঙ্গে পরিচিত হবার বিশেষ সৌভাগ্য আমার হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ এবং প্রকাশিত রচনাবলীর সঙ্গেও আমি পরিচিত। আমার একেবারে শৈশবে এই পরিচয়ের সূত্রপাত। আমার পিতা ও মাতা, বিশেষতঃ আমার মাতার সঙ্গে, রামকৃষ্ণ মিশনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। একথা অতি যথার্থ যে, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী আমাদের সমগ্র পরিবারকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তা প্রভাবিত করেছে আমাদের রাজনৈতিক জীবনকে, একই সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবনকেও। আজকে আমি, স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ যে প্রশ্ন করেছিলেন, সেই একই প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই, "ভারতবর্ষ বেঁচে আছে কেন? সে কিসের জন্য সংগ্রাম করছে?" উত্তরে বলব, আমরা এমন বস্তুর জন্য সংগ্রাম করছি যা সত্য, মহান, যা পালনীয় এবং রক্ষণীয়। কিন্তু কর্ম এবং ত্যাগ ভিন্ন আমরা তাকে অর্জন করতে পারব না।

এই তীর্থভূমিতে (কন্যাকুমারিকায়), সমস্ত ভারতবাসীর প্রাণপ্রিয় এই ভূমিতে, স্বামীজীর স্মৃতি-মন্দির নির্মিত হয়েছে। স্মারক মন্দিরের সাহায্যে স্বামীজীকে স্মরণ করাবার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। তবু এমন কেউ থাকতে পারেন যাঁদের জন্য স্মারক বস্তুর প্রয়োজন আছে। সেই বস্তু তাঁরা এখানে পাবেন। সেই সঙ্গে আমি আশা করি, যে-কেউ এখানে আসবেন, তাঁর কাছেই এই স্মৃতি-মন্দির শক্তির উৎস হয়ে উঠবে।

সুভাষচন্দ্রের জীবন ও চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দ

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক এবং সুপ্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দ-গবেষক। সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কৃত 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' (ছয় খণ্ডে), 'নিবেদিতা লোকমাতা' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক।

১

সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭—?) ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্বের (১৮৯৭—১৯৪৭) তিন প্রধান পুরুষের একজন—অপর দুজন হলেন বাল গঙ্গাধর তিলক ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। এই কালে উল্লেখযোগ্য নেতৃপুরুষ আরও আছেন যাঁরা কোন না কোন দিক দিয়ে বিশিষ্ট ভাব-প্রেরণা ও শক্তি দান করেছেন; যথা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জাতীয় ভাবোন্মেষের প্রথম পর্বে ভারতীয়দের মধ্যে স্বাধিকারবোধ সৃষ্টিতে—), বিপিনচন্দ্র পাল (চরমপন্থী উন্মাদনা সৃষ্টিতে ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ তত্ত্বপ্রচারে—), অরবিন্দ ঘোষ (পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঘোষণায় এবং গুপ্ত বৈপ্লবিক আন্দোলন সংগঠনে—), লাজপত রায় (প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠনে ও চরমপন্থী ভাবপ্রচারে—), গোপালকৃষ্ণ গোখলে (স্বাধিকার-আন্দোলনের সঙ্গে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক চিন্তার সংযোজনে—), চিত্তরঞ্জন দাশ (জাতীয় সংগ্রামকে জনমুখী করে তোলায়, সরকারী অস্ত্রে সরকারকে বধ করার বুদ্ধিকৌশলে—)। এইসঙ্গে জওহরলাল নেহরুর নাম করতে হবে, যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে ও তাতে সমাজতান্ত্রিক ভাব প্রবেশ করানোর ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। (নেহরুর মুখ্য ভূমিকা অবশ্য স্বাধীনতা-উত্তরকালেই)। এই সকল বিখ্যাত নেতার ভূমিকামূল্য স্বীকার করেও বলব—এঁরা কেউই তিলক-গান্ধী-সুভাষের তুল্য স্বাধীনতাপূর্ব ভারতীয় রাজনীতিতে মৌলিক বেগ সৃষ্টি করতে পারেননি। তিলক ও গান্ধীর ভূমিকার কথা আমরা আগে যথেষ্টই বলেছি। সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে এখানে অগ্রিম এইটুকু বলে নেওয়া যায়—গোপন ও প্রকাশ্য সকল তথ্যসূত্র অনুযায়ী—ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপর সর্বশেষ সর্বাধিক প্রচণ্ড আঘাত তিনিই করেছেন। আজাদ হিন্দ বাহিনীর আঘাত কার্যকলাপ ও তাঁর সেনাপতিদের বিরুদ্ধে পরবর্তী মামলাসূত্রে ভারতবর্ষে প্রবল জনবিক্ষোভ, ভারতীয় সেনাবাহিনীতে আলোড়ন, নৌবিদ্রোহ ইত্যাদি যে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়েছিল, ভারতের আশু স্বাধীনতা ঘোষণায় ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়েছিল, তা নিকট ইতিহাসের জ্ঞাত তথ্য।

সুভাষচন্দ্রের মোটামুটি পরিচিত জীবনকথা আমরা জেনেছি: কটকে তাঁর জন্ম; পিতা জানকীনাথ বসু আইনজীবী; মাতা প্রভাবতী বসু; ভ্রাতারা কৃতী, (যাঁদের অন্যতম শরৎচন্দ্র বসু কেবল আইনজগতে দিক্‌পাল নন, রাজনীতিতেও উল্লেখ্য চরিত্র, সুভাষচন্দ্রের পোষ্টা তিনি); স্বয়ং কৃতী ছাত্র, প্রবেশিকায় দ্বিতীয়; প্রেসিডেন্সি কলেজে দর্শনে বি-এ অনার্স পড়বার সময়ে ওটেন নামক ইংরেজ অধ্যাপককে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কৃত; পরে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ; ইংলণ্ডে আই-সি-এস পরীক্ষায় চতুর্থ (মাত্র আট মাসের পড়াশোনায়); কিন্তু পদগ্রহণে অসম্মত; কেম্ব্রিজ ট্রাইপস্ লাভ; ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরে দেশবন্ধু

চিত্তরঞ্জনকে রাজনৈতিক গুরুরূপে গ্রহণ, অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান, কারাবরণ ; কলকাতায় প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ আগমন-বয়কট সংগঠনে নেতৃত্ব ; 'ফরোয়ার্ড' ও 'বাংলার কথা' পত্রিকা পরিচালনায় অংশগ্রহণ ; জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ-এর অধ্যক্ষ ; উত্তরবঙ্গের বন্যা-ত্রাণে স্বেচ্ছাসেবায় নেতৃত্ব ; স্বরাজ্যদলের কর্তৃত্বাধীন কলকাতা কর্পোরেশনে চীফ একজিকিউটিভ অফিসার ; মান্দালয়ে বিনাবিচারে নির্বাসন ; আড়াই বৎসর পরে স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণে মুক্তি ; বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতি ; যুব আন্দোলন ও কংগ্রেস সংগঠনে ভূমিকা ; নিখিল ভারত কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক ; সাইমন কমিশন-বিরোধী আন্দোলন সংগঠন ; ১৯২৮ কলকাতা কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক ; ঐ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাবের উত্থাপক ; ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্স লীগ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ; আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ ; ১৯৩১ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে সভাপতিত্ব ; কলকাতার মেয়র ; স্বাস্থ্যভঙ্গ, স্বাস্থ্যোদ্ধারে ইওরোপ গমন, সেখানে নানা রাজনৈতিক প্রয়াস ; 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থ প্রণয়ন ; ১৯৩৮ ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি ; ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং প্রবর্তন ; গান্ধী-মনোনীত প্রার্থীকে হারিয়ে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি ; দক্ষিণপন্থীদের অসহযোগিতার কারণে বাধ্য হয়ে পদত্যাগ ; ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন ; অবিলম্বে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করার জন্য প্রচার, কারারুদ্ধ (পূর্বে একাধিকবার তা হয়েছেন কম-বেশি সময়ের জন্য), অনশন, গৃহবন্দী ; ভারতত্যাগ (জানুআরি ১৯৪১); প্রথমে জার্মানীতে আজাদ হিন্দ সৈন্যদল গঠন ; পরে পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ সৈন্যদলের পুনর্গঠন ; আজাদ হিন্দ সরকার স্থাপন ও তার সর্বাধিনায়ক ; ব্রিটিশ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ; ভারতীয় ভূখণ্ডে আজাদ হিন্দ সৈন্যদলের প্রবেশ, পরাজয় ; জাপানের আত্মসমর্পণ, ও আজাদ হিন্দ সরকারের আত্মসমর্পণ ; অজ্ঞাত লক্ষ্যে প্রস্থান ; বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু সংবাদের প্রচার ; সেই বিশেষ ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে ব্যাপক সংশয়। অর্থাৎ অদ্ভুত ঘটনাবহুল রোমাঞ্চকর এক জীবন, রাজনৈতিক অংশে তার ব্যাপ্তি মোটামুটি ২৫ বৎসর—কিন্তু ঘটনার চমৎকারিত্বে, তৎসহ প্রচণ্ড প্রভাবসৃষ্টির হিসাবে তা অসাধারণ বললেও অল্পই বলা হয়।

এমন যে মহাজীবন, ভারতীয় ইতিহাসে বিরল ব্যক্তিত্ব, তা আদ্যন্ত নির্মিত হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে ও দৃষ্টান্তে। সে সম্বন্ধে স্বয়ং সুভাষচন্দ্রের প্রচুর স্বীকৃতি আছে। তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচিতদের স্বীকৃতির পরিমাণও প্রভূত। বস্তুতপক্ষে, বাংলায় অন্তত অনেকের কাছে 'স্বামীজী' ও 'নেতাজী' এই দুটি শব্দ পরস্পর জড়িত। 'স্বামীজী ও নেতাজী' এই নামে অজস্র লেখা পত্র-পত্রিকায় বেরিয়েছে। আমি এই জাতীয় অনুভূতির প্রকাশক হিসাবে মনীষী-লেখক মোহিতলাল মজুমদারের রচনার অল্প অংশ উদ্ধৃত করছি :

"বিবেকানন্দের মতো সন্ন্যাসী অথচ দেশপ্রেমিক ভারতবর্ষে পূর্বে আর দেখা যায় নাই।... তিনি জ্ঞানমার্গী সন্ন্যাসী হইয়াও এক নূতন কর্মমন্ত্রের সাধক ছিলেন, এবং বহুকাল পরে এই ভারতবর্ষে বুদ্ধের আদর্শে এক সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন।...কিন্তু সেই কর্মজীবনের মূলে অধ্যাত্মপিপাসাকেও পরাভূত করিয়া কোন্ মানব-হৃদয়বেদনা অনুক্ষণ জাগরূক ছিল, তাহা সেকালে কেহ বুঝিতে পারে নাই ; আজ আর একজনকে দেখিয়া আমরা তাহা বুঝিয়াছি—বিবেকানন্দ-জীবনের জীবন্ত ভাষ্যরূপে আজ

আমরা নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে দেখিতেছি।...

"বিবেকানন্দ মানবাত্মার মুক্তিকে যেমন, তাহার বন্ধনকেও তেমনি আত্মগোচর করিয়াছিলেন। এজন্য সেই বন্ধন তাঁহার যেমন অসহ্য হইয়াছিল এমন আর কাহারও হয় নাই।... পৃথিবীর আর সকল দেশে তিনি মানবাত্মার মহিমা ঘোষণা করিতেন, কিন্তু নিজের দেশে আসিয়া তিনি নির্বাক হইয়া যাইতেন, অশ্রুবাষ্পে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাইত।...সেই অশ্রুকেও নিরুদ্ধ করিয়া, সেই বিষকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ এই মৃতকল্প জাতির শিয়রে জাগিয়া রহিলেন, এবং তাহার বক্ষে ও বাহুতে বলাধান করিবার জন্য কর্ণে ক্রমাগত 'শিবোঽহম্ শিবোঽহম্' উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।...

"সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর যে-প্রেম তাহার নাম কি দিব ?...ব্যক্তিগত মুক্তিসাধনাকে তুচ্ছ করিয়া এই যে মানবপ্রেম, বিশেষ করিয়া স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেম—ভারতবর্ষে ইহা নূতন। আবার এই প্রেমও যে অধ্যাত্মপিপাসারই একটা রূপ, তাহা একমাত্র ভারতবর্ষে সম্ভব। সন্ন্যাসী না হইলে, বৈরাগ্যের দ্বারা সুরক্ষিত না হইলে, প্রেম এমন নির্ভীক ও বলীয়ান হইতে পারে না, প্রাণ এমন মুক্ত ও স্বাধীন হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ সেই কারণেই কোন সমাজবন্ধন না থাকায় তিনি দেশের সকল সমাজে মিশিয়া সকল প্রকার জীবনযাত্রা আপন চক্ষে দেখিবার ও আপন মনে বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। দেশকে ভালবাসার মূলে ছিল—দেশের যাতনাক্লিষ্ট সর্ব-অঙ্গের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়। ঐ পরিচয়ের কাহিনী মহাকাব্য অপেক্ষাও রোমাঞ্চকর।...

"শত জাতি, শত সমাজ ও শত সম্প্রদায় সত্ত্বেও ভারতবর্ষের আত্মা এক—সেই আধ্যাত্মিক ঐক্যের উপরেই বিবেকানন্দ এ-যুগে এক নূতন মহাভারতের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ বাণীই তাঁহার বাণী। উহাই জাতীয়তার মন্ত্রবাণী। এই বাণীই নেতাজীকে অনুপ্রাণিত করিয়া তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিকে সম্ভব করিয়াছে। স্বামীজীর সেই অধ্যাত্মদৃষ্টিই নেতাজীর বাস্তব দৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে। তিনিও সর্বজাতি ও সর্বসম্প্রদায়ের ভেদ ঘুচাইয়া, স্বামীজীর সেই নবলব্ধ 'মহাভারত'কে সাকার করিয়া তুলিয়াছেন।...

"স্বামীজীর প্রতিভা প্রেমের দ্বারা রঞ্জিত হইলেও, জ্ঞানই তাহার প্রধান লক্ষণ। নেতাজীর প্রতিভায় বিশুদ্ধ জ্ঞানের লক্ষণ নাই—তাহার শক্তি প্রেমের শক্তি; জ্ঞান—সেই শক্তির আনুষাত্রিক। নেতাজী মুখ্যতঃ কর্মবীর, তাঁহার প্রতিভার চরম নিদর্শন তাঁহার আশ্চর্য কর্মকুশলতা।...স্বামীজীর স্বপ্ন মানুষের আত্মার মতোই বিরাট, তাহার গৌরবও স্বতন্ত্র। নেতাজীর স্বপ্ন মানুষের দেহ-প্রাণের পরিধিতেই সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ করার শক্তিও একটা বড় শক্তি—ইহাই কর্মবীরের প্রতিভা। স্বামীজীর সে প্রয়োজন ছিল না ; তিনি সাক্ষাৎ কর্ম অপেক্ষা কর্মের প্রেরণাটাকেই মহৎ ও বিশুদ্ধ রাখিতে চাহিয়াছিলেন।...

"কিন্তু স্বামীজী ও নেতাজীর মধ্যে যেখানে গভীরতর একাত্মীয়তা আছে সেইখানে দৃষ্টি বদ্ধ করিতে না পারিলে উভয়ের কাহাকেও আমরা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিব না। নেতাজী যে এক অর্থে স্বামীজীর মানসপুত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। একজনের হৃদয়ে যাহা বীজরূপে ছিল, আর একজনের জীবনে তাহাই বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়াছে।...স্বামীজীর...বিশাল হৃদয়ের নিপীড়িত কামনাই নেতাজীর মধ্যে অকুণ্ঠিতরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। স্বামীজী যদি গেরুয়া ত্যাগ করিতেন, তবে সে আর কিছুর জন্য

নয়—ঐ আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতাজী হইবার জন্য।"[১]

গভীর এই রচনা। আমরা লক্ষ্য করি, এই ধরনের বক্তব্য নানা লেখক নানাভাবে প্রকাশ করেছেন, এবং তাঁরা সে-কাজ করবার সময়ে এই তথ্যপুষ্ট ছিলেন—সুভাষচন্দ্রের জীবনের মডেল নিঃসন্দেহে স্বামী বিবেকানন্দই।[২] সে সম্বন্ধে তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্ব থেকে প্রাসঙ্গিক সংবাদ আমরা অল্পবিস্তর সংকলন করব। এখানে উদ্দেশ্য দুটি। এক, সুভাষচন্দ্রের মতো বিরাট জীবন, যা কেবল অন্তর্দেশে বিরাট নয়, বহির্গত জাতীয় জীবনে প্রভাব বিস্তারের শক্তিতেও বিরাট—তা কিভাবে প্রতি পর্যায়ে বিবেকানন্দের প্রভাবে গড়ে উঠেছে তা দেখিয়ে দেওয়া। সে কাহিনী চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ। দুই, সুভাষচন্দ্রের ধারাবর্তী অগণিত দেশব্রতী সংগ্রামী মানুষ ছিলেন যাঁদের জীবন বিবেকানন্দের আদর্শে নির্মিত। তাঁদের জীবনের খসড়া-রূপ সুভাষচন্দ্রের এই কাহিনী থেকে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র এক্ষেত্রে বিবেকানন্দের অজস্র ভাবসন্তানদের প্রতিনিধি-পুরুষ।

২

সুভাষচন্দ্রের বিদ্যালয়-শিক্ষা কটকে র‍্যাভেনশ' কলেজিয়েট স্কুলে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত সময় তাঁর জীবনের স্কুল পর্ব। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বয়স ১৬ বৎসর। সুভাষচন্দ্র বলেছেন, স্কুল ত্যাগের মাত্র এক বৎসর আগে তাঁর জীবনে বিবেকানন্দের প্রবেশ। এই পর্বে বিবেকানন্দের প্রবেশ কোন্ আকারে সে-সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের আত্মজীবনী 'ভারত পথিক'-এ ['অ্যান ইণ্ডিয়ান পিলগ্রিম'] আলোড়িত বিবরণ আছে। তাছাড়া আছে ঐকালে লেখা তাঁর পত্রাবলীতে একই প্রসঙ্গ। তাঁর সহপাঠী

১ মোহিতলাল মজুমদারের 'জয়তু নেতাজী' এবং 'বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

২ বিখ্যাত রাজনৈতিক, পণ্ডিত-লেখক ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন: "১৯১৩ সালে কলকাতায় সুভাষের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়।…ঐ সময়ে সুভাষের মধ্যে চারটি জিনিস আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলাম: রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি তার গভীর আবেগময় ভক্তি, ধর্মভাব, সেবাপরায়ণতা এবং নির্ভীকতা।…সুভাষের অন্তর্জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন যে, শেষোক্ত তিনটি চারিত্রিক গুণের বিকাশের মূলে যে-প্রেরণাটি সক্রিয় ছিল তা হল আমি যার প্রথমেই উল্লেখ করেছি—সুভাষের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ অনুরাগ। ১৯১৩-১৯১৫—এই দু'বছর আমি সুভাষের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলাম এবং এই সময়ে আমরা একসঙ্গে বহুবার বেলুড়মঠে গিয়েছি। বস্তুত তখনকার দিনে স্বাধীনতাকামী এমন বাঙালী কেউ ছিলেন না বললেই চলে যিনি দক্ষিণেশ্বর বেলুড়মঠ যাননি।"

উপরের স্মৃতিকথা শঙ্কর মহারাজের (স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ) সংগ্রহ থেকে পেয়েছি। তাঁর সংগ্রহে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের স্মৃতিকথাও রয়েছে—যাতে সুভাষচন্দ্রের উপর স্বামীজীর গভীর প্রভাবের উল্লেখ পাই। 'দি রোল অব অনার' গ্রন্থের লেখক, সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী বন্ধু শ্রীকালীচরণ ঘোষ অজস্র লেখায় সুভাষের উপর স্বামীজীর প্রভাবের কথা বলেছেন। বিশ্ববাণী পত্রিকায় (আশ্বিন ১৩৫৫) 'স্বামীজী ও নেতাজী'—এই নামে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন। রাম শর্মা সম্পাদিত 'নেতাজী' গ্রন্থে তিনি 'এ সেণ্ট টার্নস্ পেট্রিয়ট' প্রবন্ধে এ-সম্বন্ধে চমৎকার আলোচনা করেছেন। সুভাষচন্দ্রের অতি ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহকর্মী, 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক সত্যরঞ্জন বক্সী

চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ও নির্ভরযোগ্য স্মৃতিকথা দিয়েছেন।[৩]

সুভাষচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন, বাল্যকালে যখন অন্য ছেলেরা খেলাধুলা ইত্যাদি বহির্গত আনন্দে ও আত্মবিকাশে ব্যস্ত থাকে তখন তিনি গুরুতর জীবনজিজ্ঞাসায় উৎকণ্ঠিত ছিলেন। অর্ধ-কৌতুকের সঙ্গে বলেছেন, এটা অকালপক্কতা। বলা বাহুল্য নচিকেতা-জাতীয় বালকগণ এইপ্রকার অকালপক্কতায় আক্রান্ত থাকেনই। মায়ের কাছে লেখা চিঠিতে নিতান্ত বালক সুভাষচন্দ্রের সুগম্ভীর ধর্মচিন্তা ও অধর্মাক্রান্ত দেশের দুর্গতি-চিন্তার অনেক কথাই মেলে। ১৯১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দে মাতা প্রভাবতী বসুকে লেখা সুভাষচন্দ্রের যে ৯টি পত্র পাওয়া গেছে[৪] তার মধ্যে উক্ত ভারাতুর বালকটিকে আমরা সবিশেষ পাই। পত্রগুলিতে তারিখ নেই, সুতরাং বলা শক্ত—পত্ররচনার কালরূপে যে দুই বৎসর সময় সম্পাদক নির্ধারণ করেছেন তার মধ্যে ঠিক কোন্ সময়ে সুভাষের

বিবেকানন্দের প্রভাবের প্রসঙ্গ না তুলে সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন-প্রবন্ধ লিখেছেন কিনা সন্দেহ। বিপ্লবী লেখক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায় বা নলিনীকিশোর গুহর লেখার মধ্যেও একই প্রসঙ্গের পুনঃ পুনঃ উপস্থাপনা দেখা যায়। হরিবিষ্ণু কামাথ প্রভৃতির লেখাতেও। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত নেতাজী স্মারক পত্রিকায় (১৯৭০) সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনে' নামক প্রবন্ধে লিখেছিলেন : "এক বীর্যবান সন্ন্যাসীকে মনে পড়ছে। আমাদের মাতৃভূমি যখন এক শতাব্দীকাল পূর্বে পাশ্চাত্যভূমি থেকে আগত জড়বাদী চিন্তাবন্যার তরঙ্গাঘাতে মুহুর্মুহু প্লাবিত, ক্ষুব্ধ, মুগ্ধ ও বিপর্যস্ত হচ্ছিল, তখন অকুণ্ঠ-জীবন, তরুণ সন্ন্যাসী সেদিনের সেই প্লাবনকে আপনার কণ্ঠোচ্চারিত বাণীতে···সংযত করেছিলেন। জড়বাদের যে অংশ তাঁর ধ্রুববাণীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাকে গ্রহণ করতেও দ্বিধা করেননি।···মনে করতে ভালো লাগে, আমাদের এই মাতৃভূমির আকর্ষণেই সেই তরুণ সন্ন্যাসী আপনার গৈরিক পরিত্যাগ করে পরবর্তী জন্মে যোদ্ধার ভূমিকায় সুভাষচন্দ্র হয়ে জন্মলাভ করেছিলেন।"

একই পত্রিকায় সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের রচনার নাম 'স্বামীজী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র'—যার মধ্যে তিনি তুলনামুখে দেখাতে চেষ্টা করেছেন "শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দে প্রতিফলিত, আর বিবেকানন্দ প্রতিফলিত সুভাষচন্দ্রে।"

৩ চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কটকের র‍্যাভেন শ' স্কুলে এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে সুভাষচন্দ্রের সহপাঠী। নেতাজী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রধান কর্মকর্তা, নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র ডাঃ শিশিরকুমার বসুর মতে, চারুচন্দ্র সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বাল্যবন্ধু, এবং তাঁর বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য। চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় আবার বলেছেন, 'সুভাষচন্দ্রের বাল্যজীবন' গ্রন্থের লেখক সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় র‍্যাভেন শ' স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পড়েছিলেন, এবং সংবাদ যাচাই করে তবে তিনি গ্রন্থভুক্ত করেছেন, তাঁর বিবরণ প্রামাণ্য।

শঙ্কর মহারাজ আমাকে চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে যে-সাক্ষাৎকার বিবরণ দিয়েছেন, তার মধ্যে উপরের তথ্যগুলি আছে। শঙ্কর মহারাজ অত্যন্ত পরিশ্রম করে কেবল প্রকাশিত বিবরণ নয়, নেতাজীর পরিচিত নানা ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, [তাঁদের মধ্যে আছেন ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়] বিস্তৃত তথ্যপূর্ণ উৎকৃষ্ট একটি প্রবন্ধ লিখেছেন 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে (১৯৭৭)—'যুগনায়ক ও দেশনায়ক : বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্র।' ইনি আমাকে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর সংগৃহীত ঐ সকল নথিপত্র দেখার সুযোগ দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'বিশ্ববিবেক' গ্রন্থে (১৯৬৩) আমি স্বামীজী সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের রচনা ও উক্তির যথাসম্ভব সংকলন করে দিয়েছিলাম।

৪ 'সুভাষচন্দ্র বসু : সমগ্র রচনাবলী' ১ম খণ্ড, সম্পাদক শিশিরকুমার বসু, পৃ. ৬৫—৭৭।

জীবনে স্বামীজী প্রবেশ করেছেন। তবে স্বামীজীর রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই যে সুভাষ অবয়সোচিত প্রশ্নে কাতর ছিলেন, তার উল্লেখ আত্মজীবনীতেই করেছেন। বৃহৎ পরিবারের অন্তর্গত কনিষ্ঠ বালক তিনি, সেজন্য 'অন্তর্মুখী' এবং 'বালবৃদ্ধ'—১২ বছর বয়সে তাঁর জীবনের প্রথম আদর্শ পুরুষ হেডমাস্টার মহাশয় বেণীমাধব দাসের সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। বয়ঃসন্ধিকালের নানা মানসিক টানাপোড়েনের মধ্যে এই আচার্য সুভাষচন্দ্রের মনে নৈতিক মূল্যবোধ, সত্যানুভূতি এবং প্রকৃতিপ্রেম জাগিয়ে তোলেন। এমন একজন শিক্ষকের সান্নিধ্য ২ বৎসরের বেশি পাবার সুযোগ সুভাষের হয়নি। সুভাষের ১৪ বৎসর বয়সের সময়ে তিনি বদলী হয়ে কৃষ্ণনগরে চলে যান, ফলে স্কুল-জীবন হয়ে ওঠে "নিরানন্দ, প্রাণহীন, একঘেয়ে, কারণ যে-আলো এতদিন সেখানে জ্বলছিল তা অদৃশ্য।" তা সত্ত্বেও বলতে হবে, বেণীমাধব দাসের কাছে সুভাষ যে-শিক্ষা পেয়েছিলেন তা তাঁর পরবর্তী জীবনপ্রশ্নের মীমাংসার ও মানসিক যন্ত্রণার উপশমে সমর্থ ছিল না। তাঁর মধ্যে এসে গিয়েছিল পার্থিব জীবন ও চিরাচরিত কাজকর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহচেতনা এবং সেইসঙ্গে যৌনচেতনা, যাকে তিনি মানসিক অপরিচ্ছন্নতা বলে মনে করছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের ঐকালীন মানসিক অবস্থা তাঁর নিজের কথাতেই দেখা যাক :

"আমার মনের মধ্যে এক বিষম ওলটপালট শুরু হল। প্রায় বছর ছয়েক সে যে কী অসহ্য মানসিক অশান্তিতে কেটেছিল বলবার নয়।··· এই ধরনের উৎকট অভিজ্ঞতা সাধারণত সকলের হয় বলে মনে হয় না, অন্তত প্রার্থনা করি কারো যেন না হয়। তবে আমাকে আর দশজনের মতো ভাবলে ভুল হবে, কারণ আমার মনের গড়নটা ছিল বেশ একটু অস্বাভাবিক ধরনের আমি যে শুধু আত্মকেন্দ্রিকই ছিলাম তা নয় অনেক দিক থেকে অকালপক্কও ছিলাম।··· এমন একটা আদর্শের তখন প্রয়োজন ছিল যার উপর ভিত্তি করে আমার সমস্ত জীবনটা গড়ে তুলতে পারব—সব রকম প্রলোভন তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যাবে। এমন একটি আদর্শ খুঁজে বের করা সহজ ছিল না। মানসিক অশান্তি আমাকে ভোগ করতে হত না যদি আমি আর দশজনের মতো জীবনের দাবিকে সহজভাবে মেনে নিতাম।···কিন্তু আমি কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করিনি। আমার মনে এমন কিছু ছিল যা তা করতে দিত না। আবার যেহেতু দুর্বল ছিলাম তাই লড়াই হয়েছিল তীব্র, প্রাণান্তকর।"[৫]

সুভাষের কৈশোরের মানসিক কুরুক্ষেত্রে গীতার আবির্ভাব হল এর পরেই। সেই প্রাপ্তির আনন্দবার্তা এই প্রকার :

"একদিন নেহাতই দৈবক্রমে এমন একটা জিনিস পেয়ে গেলাম যা এই সংকটকালে আমার প্রধান সহায় হয়ে দাঁড়াল। আমার এক আত্মীয় [সুহৃৎচন্দ্র মিত্র] পাশের বাড়িতে থাকতেন, তিনি শহরে নতুন এসেছিলেন, এবং আমাকে তাঁর কাছে প্রায়ই যেতে হত। তাঁর বইগুলির উপর চোখ বোলাতে-বোলাতে নজরে পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী। কয়েকটি পৃষ্ঠা উলটিয়ে বুঝলাম, এতে এমন কিছু আছে যা এতদিন আমি খুঁজে মরছি। বইগুলি তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে বাড়িতে এসে গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম। মজ্জাবধি শিহরণ খেলে গেল। প্রধান শিক্ষক মহাশয় আমার মধ্যে সৌন্দর্য ও নীতিবোধ জাগ্রত

৫ 'ভারত পথিক' (সিগনেট সং, ১৯৪৮), অনুবাদ—সুভাষ সেন এবং 'সমগ্র রচনাবলী'-র অন্তর্গত 'ভারত পথিক', অনুবাদ—সুমন চট্টোপাধ্যায়, সুগত বসু।

করেছিলেন, আমার জীবনে নতুন প্রেরণা এনে দিয়েছিলেন, কিন্তু এমন কোন আদর্শ তাঁর কাছ থেকে লাভ করিনি যার জন্য সমগ্র সত্তাকে আমি উৎসর্গ করতে পারি। বিবেকানন্দ তাই এনে দিলেন। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস—তাঁর রচনা তন্ময় হয়ে পড়তে লাগলাম।"

স্বামীজীর রচনাবলী থেকে তিনি কোন্ শিক্ষা পেয়েছিলেন, তার সারাংশ সুভাষচন্দ্র দিয়েছেন। ঐসব শিক্ষা তিনি অবিলম্বে পেয়েছিলেন, না ক্রমে ক্রমে—তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। মনে হয়, স্বামীজীর শিক্ষার ব্যাপক রূপ তিনি ক্রমান্বয়ে উপলব্ধি করেন। তবে তখনকার মতো তাঁর মনে কোন্ আলোড়ন ঘটে গিয়েছিল সে-সম্বন্ধে আত্মজীবনীতে আরও স্বীকারোক্তি অতঃপর আছে :

"আমার জীবনে যখন বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঘটে তখন সবে পনরয় পড়েছি। তারপর আমার মধ্যে শুরু হয়ে গেল এক বিপ্লব। তাঁর শিক্ষার পূর্ণ তাৎপর্য অথবা তাঁর ব্যক্তিত্বের বিরাটত্ব সম্যক্ উপলব্ধি অবশ্যই তখন করতে পারিনি। তবু আমার মনে শুরু থেকেই এমন দাগ পড়েছিল যা মুছবার নয়। যুগপৎ তাঁর চিত্র ও তাঁর শিক্ষা থেকে বিবেকানন্দকে পূর্ণবিকশিত ব্যক্তিত্ব বলেই আমার বোধ হয়েছিল : এমন অনেক প্রশ্ন আমার মনকে নাড়া দিত যার রূপ খুব স্পষ্ট ছিল না, যেগুলি নিয়ে আমি চিন্তা-ভাবনা করতাম—বিবেকানন্দের মধ্যে সেগুলির সন্তোষজনক উত্তর খুঁজে পেতাম। প্রধান শিক্ষকের ব্যক্তিত্বকে আর যথেষ্ট বড় বলে মনে হত না, যাতে তাঁকে আদর্শ বলে গ্রহণ করতে পারি। আগে ভাবতাম, তাঁরই মতো দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করব, এবং তাঁকে অনুসরণ করব। এখন বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথের কথা ভাবতে লাগলাম।"

স্বামী বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্রের জীবন থেকে কেবল বেণীমাধব দাসকে স্থানচ্যুত করেননি—পরবর্তী জীবনে অন্য কেউই তাঁর অন্তর থেকে বিবেকানন্দের আসন বিচলিত করতে পারেননি, যদিও সুভাষচন্দ্র সর্বদাই জীবনগ্রন্থের পৃষ্ঠা উল্টে নব নব শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী ছিলেন। সংক্ষেপে বলা যায়, বিবেকানন্দকে অন্তরে রেখেই সুভাষচন্দ্রের সর্ব সমুদ্র লঙ্ঘন।

মাকে লেখা সুভাষচন্দ্রের ১৯১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দের পত্রগুলি লক্ষ্য করলে দেখব—এই বালকটি নিরতিশয় ধর্মভাবনায় ব্যাকুল। দেবী দুর্গার প্রতি অপরিসীম ভক্তি, তাঁকে কাষ্ঠপুত্তলিকায় নয়—সর্বত্রবিরাজিত দেখার ঐকান্তিক ইচ্ছা, শঙ্করাচার্যের স্তোত্রের প্রতি প্রীতি, সাংসারিক উন্নতিতে অনিচ্ছা, বৈরাগ্যবাসনা, ভোগমুগ্ধ বাবু-সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে ঘৃণা, ঋষি, তপোবন ইত্যাদি সম্বন্ধে স্বপ্নকল্পনা, ক্ষণস্থায়ী মানবজীবনে অকৃতার্থতার অসহ্য গ্লানি (লেখকের বয়স যদিও পনরর বেশি নয়) —সেইসঙ্গে দেশে ধর্মের পতনে ক্ষোভ দুঃখ—এই সকলই পত্রগুলির ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে।

মায়ের কাছে লেখা চিঠিগুলিতে স্পষ্টভাবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কথা নেই। তবে সে বিষয়ে ইঙ্গিত আছেই। সুভাষচন্দ্র আত্মজীবনীতে বলেছেন, বিবেকানন্দ থেকে তিনি রামকৃষ্ণে উপনীত হন। রামকৃষ্ণ নিজ বাণীর জীবন্ত বিগ্রহ ছিলেন, তিনি কামকাঞ্চনত্যাগের আদর্শ দিয়ে গেছেন—কিশোর সুভাষচন্দ্রের চিত্তে তা অনপনেয় ছাপ রেখে যায়। চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, সুভাষ মায়ের কাছে বসে কথামৃত শুনতেন। সুভাষচন্দ্রের মাকে লেখা বেশ কয়েকটি চিঠিতে কথামৃতের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি আছে।

যথা, "দুই-চার কথা শিখিলেই কি জ্ঞানী হয়? প্রকৃত জ্ঞান—ঈশ্বরজ্ঞান; আর সমস্ত জ্ঞান—অজ্ঞান। আমি বিদ্বান বা পণ্ডিতকে শ্রদ্ধা করিতে চাহি না। ভগবানের নাম স্মরণে যাহার চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হয় আমি তাহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করি।" কিংবা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উচ্চ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হবার অব্যবহিত পরে লেখা চিঠিতে: "লেখাপড়া ছাত্রের প্রধান উদ্দেশ্য নহে—বিশ্ববিদ্যালয়ের 'চাপ্রাস্' পাইলে ছাত্ররা আপনাকে কৃতার্থ মনে করে—কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপ্রাস্ পাইলেও যদি কেহ প্রকৃত জ্ঞান না লাভ করিতে পারে—তবে সে শিক্ষাকে আমি ঘৃণা করি।...চরিত্রগঠনই ছাত্রের প্রধান কর্তব্য। ...আমি চাই—চরিত্র, জ্ঞান, কার্য। এই চরিত্রের ভিতরে সব যায়—ভগবদ্ভক্তি, স্বদেশপ্রেম, ভগবানের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা—সবই যায়।"

এই পত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বিবেকানন্দও আছেন।

চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, সুহৃৎচন্দ্র মিত্র নন, কটকের প্যারীমোহন অ্যাকাডেমির শিক্ষক কৃষ্ণচন্দ্র সেন সুভাষচন্দ্রকে বিবেকানন্দের বই পড়তে দেন (সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ও তাই বলেছেন)—যখন সুভাষ সবে নবম শ্রেণীতে উঠেছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন—স্বামীজীর চিকাগো বক্তৃতা, কলম্বো থেকে আলমোড়া বক্তৃতাবলী, পত্রাবলী এবং 'সন্ন্যাসীর গীতি'—সুভাষচন্দ্রের উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বিদ্যালয়জীবনে বিবেকানন্দের প্রভাব সম্বন্ধে কথা এখনও শেষ হয়নি। সুভাষচন্দ্র নিজ চরিত্রবিকাশ সম্বন্ধে আরও কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়েছেন—যার সঙ্গে বিবেকানন্দের প্রভাবের সাক্ষাৎ সম্পর্ক আছে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার সংস্রবে আসার পরে সুভাষচন্দ্র কটকে মাত্র দেড় দুই বৎসর ছিলেন। ঐকালের মধ্যে তাঁর মধ্যে সত্যই 'ওলটপালট' হয়ে গিয়েছিল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 'অখণ্ডসত্তা' হলেও তাঁরা আপেক্ষিকভাবে দুই ভিন্ন ভূমিতে তাঁকে আলোড়িত করেছেন। "এই সময়ে যে-পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমাকে দিন কাটাতে হচ্ছিল [সুভাষচন্দ্র লিখেছেন], তার চাইতে তীব্র আর কোন পরীক্ষা আমার জীবনে এসেছে কিনা সন্দেহ। রামকৃষ্ণের ত্যাগ ও শুদ্ধতার দৃষ্টান্তের ফল হয়েছিল এই যে, আমার সমস্ত কুপ্রবৃত্তির সঙ্গে লড়াই হয়ে উঠেছিল অনিবার্য। আর বিবেকানন্দের আদর্শ প্রচলিত পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে আমার সংঘর্ষ ডেকে এনেছিল।"

রামকৃষ্ণের অনুসরণ থেকে সুভাষচন্দ্রের জীবনে ঘটেছে ব্রহ্মচর্য-সাধনা, কৃচ্ছ্রতা, ধ্যান ও যোগ। এসব সম্বন্ধে ব্যাপক চেষ্টার নানা বিবরণ তিনি দিয়েছেন। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে কেউ কেউ মনে করেছিলেন—এঁর "উন্মাদ হতে দেরী নেই।" এরই অনুসৃতিতে সুভাষের গুরু সন্ধান। রামকৃষ্ণের উপদেশ কিছুদিন পালন করার পরেই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হল না বলে নিরতিশয় অস্থির সুভাষচন্দ্র স্থির করলেন—উপযুক্ত গুরুর অভাবেই তা ঘটছে না। তাই তিনি কটকে এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে আগত সাধুসন্ন্যাসীর সন্ধান পেলেই হাজির হতেন—যদি গুরু পেয়ে যান।

বিবেকানন্দের অনুসরণে কিভাবে পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সংগ্রামে নেমে পড়েছিলেন, তার বিবরণও সুভাষচন্দ্র দিয়েছেন। যথা গুরুসন্ধিৎসু সুভাষ এক নব্বুই বৎসরের অধিক বয়সের সাধুর প্রভাবে কয়েক মাস কাটান, যাঁর নির্দেশের মধ্যে আমিষাহার ত্যাগ, স্তোত্রপাঠ এবং পিতামাতার কাছে বাধ্যতা ছিল। এই সাধুর নির্দেশ কিছুদিন পালন করার পরে যখন তিনি

বিশ্লেষণ করে দেখলেন যে, সন্তোষজনক ফললাভ হয়নি তখন, সুভাষচন্দ্র লিখেছেন : "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে ফিরে গেলাম। নিজেকে আবার বোঝালাম—ত্যাগ ভিন্ন সিদ্ধি নেই।"

উক্ত বৃদ্ধ সাধু পিতামাতার প্রতি বাধ্যতার উপদেশ দিলেও অবাধ্যতাই সুভাষের নিয়তি, কারণ—বিবেকানন্দ। একেই তিনি পারিবারিক জীবনের সঙ্গে বিদ্রোহ বলেছেন। পড়াশোনায় অবহেলা তো হচ্ছিলই, আরও নানা অপরিচিত আচরণ তিনি করছিলেন। "বাবা মা আমাকে যতই সংযত করতে চেষ্টা করছিলেন ততই আমি বিদ্রোহী হয়ে উঠছিলাম। অন্যান্য সকল চেষ্টাই যখন ব্যর্থ হল—আমার মা কান্নার আশ্রয় নিলেন। কিন্তু তাতেও আমার মনে কোন প্রতিক্রিয়া হল না। আমি উদাসীন, হয়ত-বা খামখেয়ালী।... এভাবে পিতামাতাকে অমান্য করা আমার পক্ষে অস্বাভাবিক ও অপ্রীতিকর [পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ, বা জননী জন্মভূমিশ্চ মুখস্থ করে ও মান্য করে তাঁর প্রথম বয়স কেটেছে]—কিন্তু দুর্বার স্রোতে আমি যেন সামনের দিকে এগিয়ে চলছিলাম।" সুভাষচন্দ্র সামাজিক ও পারিবারিক প্রথাগুলি ভাঙছিলেন, মায়ের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে একত্রে ভোজন করেছিলেন। "মায়ের হুকুম···অগ্রাহ্য করতে কেমন অদ্ভুত এক আনন্দবোধ করলাম। যখন ঐকান্তিকভাবে ধর্ম ও যোগসাধনায় ব্যাপৃত ছিলাম, এবং যেখানে খুশি যাওয়ার ও যা ইচ্ছে করার স্বাধীনতা চেয়েছিলাম তখন প্রায়ই আমাকে পিতামাতার বহু আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করতে হয়েছে। এইসব করতে আমি কিছুমাত্র ইতস্তত করিনি কারণ ইতিমধ্যে বিবেকানন্দের প্রেরণায় আমার বিশ্বাস জন্মেছিল যে, আত্মবিকাশের জন্য বিদ্রোহ প্রয়োজন—শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর যখন কেঁদে ওঠে তখন চতুষ্পার্শ্বের বন্ধনের বিরুদ্ধেই সে প্রতিবাদ জানায়।"

এই সময়ে ভূত-প্রেত, হাতুড়ে চিকিৎসা ও অন্যান্য "কুসংস্কারমুক্তিতে বিবেকানন্দ সহায় হয়েছিলেন"—একথাও সুভাষচন্দ্রের রচনা থেকে জেনেছি। "বিবেকানন্দ-প্রচারিত ধর্ম ও যোগ—যুক্তিসঙ্গত দর্শনের উপর, বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ; বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বিজ্ঞানের বিরোধী ছিল না—বরং বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলিকে ভিত্তি করেই তা গড়ে উঠেছিল। তাঁর জীবনের ব্রতগুলির অন্যতম বিজ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয়সাধন।" সুভাষচন্দ্র এই সূত্রে প্রথম যৌবনে বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী দর্শন-পাঠের উল্লেখ করেছেন। "মুক্ত মনের অধিকারী ছিলেন বলেই, রাশি-রাশি কুসংস্কার, এবং ভারতে ধর্মকে যে অলৌকিকতার আতিশয্যে কখনো-কখনো জড়িত দেখা যেত—তার থেকে ধর্মের সারকথা উপলব্ধি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল"—সুভাষচন্দ্র লিখেছেন।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শবদ্ধ ছাত্রগোষ্ঠী সুভাষচন্দ্র অবিলম্বে গঠন করে ফেলেছিলেন, এবং তাদের সাহায্যে লোকসেবার কাজে নেমে পড়েছিলেন। কটকের শহরতলীর গ্রামে গিয়ে প্রাথমিক শিক্ষাদানের কাজ করেছেন। সুভাষচন্দ্র বলেছেন, যদিও গোড়ার দিকে "যোগসাধনা নিয়ে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন", কিন্তু ক্রমে উপলব্ধি করেন—"আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সমাজের সেবা করা আবশ্যক।" তিনি স্বীকার করেছেন : "ধারণাটা বিবেকানন্দের কাছ থেকে এসেছিল, কেন না তিনি মানবসেবার আদর্শ প্রচার করে গেছেন, যার মধ্যে স্বদেশসেবাও আছে।" সুভাষচন্দ্রের মানবপ্রেমের মূলে বিবেকানন্দের সুগভীর প্রভাব সম্বন্ধে তাঁর স্বীকৃতি : "দরিদ্রের সেবা করার জন্য বিবেকানন্দ প্রত্যেককে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, কারণ তাঁর মতে

দরিদ্রের বেশে ঈশ্বর মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হন, আর দরিদ্রের সেবাই নারায়ণ সেবা। মনে আছে, ভিখারী, ফকির ও সাধুদের প্রতি খুব উদার হয়ে উঠেছিলাম, এবং যখনই তাদের কেউ আমাদের বাড়িতে আসত, হাতের কাছে যা পেতাম তাই দিয়েই তাদের সাহায্য করতাম। তাতে পেতাম অদ্ভুত তৃপ্তি।"

অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, স্কুল-জীবনের শেষপর্বে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গোষ্ঠীর ছাত্রদের সঙ্গ ছাড়া আর কোন সঙ্গ তাঁর ভাল লাগত না। এমন কি "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অনুরাগী দুই-একজন ছাড়া সাধারণভাবে আর কোন শিক্ষক প্রেরণাসঞ্চার করতে পারেননি।"

কাছাকাছি সময়ে ইংলণ্ড-প্রবাসী অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুকে এক পত্রে (৮. ১. ১৯১৩) ভারতের তমসাচ্ছন্ন অবস্থার দুঃখার্ত বিবরণের শেষে লিখলেন :

"তবু আমার মনে হয় আশা আছে, এখনো আশা আছে। আশার দূত আমাদের মধ্যে আসিয়াছেন—আমাদের প্রাণের সকল তমঃ নাশ করিয়া হৃদয়ে অনির্বাণ শিখা জ্বালাইতে। তিনি ঋষি বিবেকানন্দ। তিনি তাঁহার দিব্য কান্তি, বিশাল ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টি লইয়া সন্ন্যাসীর বেশে হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত বাণী বিশ্বের নিকট প্রচার করিতে আবির্ভূত হইয়াছেন।" [ক্রমশঃ]

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা

(কয়েকটি প্রস্তাব)

ডক্টর পবিত্র সরকার

বাঙলা বিভাগের রীডার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

১. **দৃষ্টিভঙ্গি** : প্রথমে যে কথাটি আমাদের মনে রাখা দরকার তা এই : এই দুটি পর্যায়ে শিশুদের **লেখার ভাষা** শেখানো শুরু হচ্ছে, মুখের ভাষা নয়। মুখের ভাষা তারা তাদের সাড়ে তিন বছর বয়সে মোটামুটি ভালই আয়ত্ত করে ফেলেছে। কিন্তু এ-কথাটাও আংশিকভাবে সত্য, পুরোপুরি সত্য নয়। আমাদের যেটা মান্য কথ্য ভাষা—**Standard Colloquial Dialect**—সেটা উপভাষাভাষী অঞ্চলের সব শিশু বলে না, কাজেই ঐ সব অঞ্চলে (বা অন্যান্য সামাজিক স্তরে, যেখানে-ও ভাষা বলা হয় না) মান্য কথ্য ভাষার একটা আদর্শ তুলে ধরাও এ দুটি পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

২. **কী শেখানো হবে : বিষয়বস্তু** : বলা বাহুল্য, এতে ছাত্রের নিজের জগতের আকর্ষণীয় অভিজ্ঞতার এলাকাগুলি যেমন স্থান পাবে, তেমনি তার অভিজ্ঞতার এলাকা বাড়ানোর চেষ্টাও করতে হবে। তার নিজের জগতের যে-সমস্ত আকর্ষণীয় এলাকা—খেলাধুলা, গৃহপরিবেশ বা বন্ধুবান্ধব, বেড়ানো, ছোটখাটো ভয় বা বিপদের অভিজ্ঞতা, পশুপাখি, ম্যাজিশিয়ান, মুশকিল আসান ইত্যাদি অদ্ভুত জীবিকা—এগুলো নিয়ে যেমন লিখতে হবে, তেমনি দেশবিদেশের শিশু, রূপকথার জগৎ, পৌরাণিক কাহিনীও সম্ভবক্ষেত্রে আনতে হবে।

এক্ষেত্রেও নজর রাখতে হবে যে, প্রস্তুত পাঠ্যে যেন শহর ও গ্রামের অভিজ্ঞতার অনুপাত অসংগত ও একপেশে না হয়। পশ্চিমবঙ্গ এবং বৃহদ্‌ভাবে পুরো ভারতবর্ষ মূলত গ্রামজীবন-ভিত্তিক, কাজেই গ্রামের অভিজ্ঞতা, কিংবা এমন

অভিজ্ঞতা (পুরাণের গল্পে যেমন) যেগুলি শহর ও গ্রাম-নিরপেক্ষ—সেগুলির বেশি অবতারণা দরকার।

আমার ব্যক্তিগত মতে, এই সব গল্প বা রচনার মধ্যে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী, জীবিকা, সম্প্রদায় ইত্যাদির যে পরস্পরনির্ভরতার সম্পর্ক, তা প্রতিফলিত হওয়া ভাল। আর শ্রেণী, জীবিকা, সামাজিক স্তর বা সম্প্রদায়ের কোনটি উঁচু, কোনটি নিচু—এ-ধরনের অনবধানজনিত ইঙ্গিতও যেন না থাকে। এমন ইঙ্গিতও যেন না থাকে যে, নারী ও পুরুষের সামর্থ্য, বুদ্ধি, জীবিকা ও সাংসারিক ভূমিকার মধ্যে কোন অসমতা/বিরোধ আছে।

গদ্য ও পদ্যের (ছড়া ইত্যাদি) প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

৩. কীভাবে শেখানো হবে : প্রকরণ :

প্রথম শ্রেণীতে যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহৃত হবে না।

প্রথম স্বরচিহ্নহীন শব্দাবলি দিয়ে পাঠ তৈরি করতে হবে—'বই পড়', 'জল ভর', 'ঘর চল', 'কত জল' ইত্যাদি।

বর্ণানুক্রম অনুসরণ না করে, বর্ণমালা প্রথমে মুখস্থ না করিয়ে ছবি ও উচ্চারণের সঙ্গে বর্ণের সম্পর্ক তৈরি করে দিলে ভাল হয়।

পরে স্বরবর্ণ ও তার 'কার' ভেদটিকে পাঠে আনতে হবে। এখানে 'সহজ পাঠ'-এর অনুসরণে একটি পাঠে একটি স্বরবর্ণ ও তার-কার-চিহ্নের পর্যাপ্ত উদাহরণ থাকাই ভাল। তাতে সীমাবদ্ধ-ভাবে অবশ্যই পূর্ব-পরিচিত স্বরবর্ণ ও তাদের 'কার'গুলোর পুনরাবৃত্তি করতে হবে। অর্থাৎ **drilling** হবে মূল উদ্দেশ্য।

যে-সব 'কার' লাইনো ছাড়া অন্য টাইপে 'অস্বচ্ছ' (opaque) অর্থাৎ দেখে বোঝা যায় না, যেমন রু-এর ু-কার, শু-এর ু-কার, হৃ-এর ৃ-কার, রূ-এর ূ-কার—সেগুলোকেও মূল আদলের পাশাপাশি চিনিয়ে দিলে ভাল হয়। তাতে অন্য বই, যা লাইনোতে বা মনোটাইপে ছাপা নয়, পড়ার সুবিধে হবে।

অনেকদিন থেকেই বাঙালি শিশুদের, এবং সম্ভবক্ষেত্রে অন্যভাষী শিক্ষার্থীদের যুক্তব্যঞ্জন শেখানোর বিষয়ে একটি চিন্তা আমার মাথার মধ্যে ঘুরছে। একক ধ্বনির বর্ণরূপ—স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ শেখানোর নানা বই আমাদের আছে। এগুলোই আমাদের 'প্রাইমার'। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা', বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ-পরিচয়' প্রথম ভাগ, যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিখুসি' প্রথম ভাগ, রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ' প্রথম ভাগ, সুখলতা রাওয়ের 'নিজে পড়' ইত্যাদি বই শিশুকে নিজের নিজের উপায়ে বর্ণমালা শেখানোর চেষ্টা করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত সাম্প্রতিক 'কিশলয়' প্রথম ভাগও এ-বিষয়ে একটি অভিনব প্রচেষ্টা। এ-বইগুলোর ব্যাপ্তি সবসময় একরকম নয়। 'সহজ পাঠ' প্রথম ভাগ-এ আলাদা করে আ-কার ই-কার ইত্যাদি শেখানো হয়নি, কিন্তু এর অক্ষর চেনানোর ছড়ানির্ভর পদ্ধতিটি 'প্রি-স্কুল' শিশুদেরও খুব উপযোগী। 'প্রি-স্কুল' পর্বে শিশুদের জন্য কবি সুনির্মল বসুর 'ছড়া-ছবিতে অ আ ক খ' একটি ভাল বই। এই লেখকও এই স্তরের শিশুদের জন্যই এ-ধরনের একটি বই রচনা করেছে, সেটি আপাতত মুদ্রণাগারের দখলে। সাধারণভাবে স্কুলের প্রথম শ্রেণীতেই বর্ণমালা, আ-কার থেকে ঔ-কার এবং ঋ-ফলা শেখানো হয়ে থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে যুক্তব্যঞ্জন শেখানো আরম্ভ হয়। ফলে উপরি-উক্ত অনেক-গুলো বইয়ের দ্বিতীয় ভাগে যুক্তব্যঞ্জন শেখানো শুরু হয়েছে। 'হাসি খুসি' দ্বিতীয় ভাগ-এ ছড়ার সাহায্যেই তা করা হয়েছে, অন্যান্য বইয়ে, যেমন 'সহজ পাঠ' দ্বিতীয় ভাগ-এ গল্পধরনের গদ্যাংশে

সোজাসুজি যুক্তব্যঞ্জন-ওয়ালা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন হল, যুক্তব্যঞ্জন শেখানোর বিষয়ে কোন ক্রম বা order স্থাপন করা উচিত কি না। কোন যুক্তব্যঞ্জন আগে, কোনটা পরে শেখাব কি না। বলা বাহুল্য ক্রম একটা ধরে নিলে শিশুরও সুবিধে হয়, লেখকেরও সুবিধে হয়, অবিন্যস্ত (arbitrary) ক্রমে সাজালে সেই সুবিধে থাকে না। ফলে অধিকাংশ শিশুপাঠ্য গ্রন্থরচয়িতাকেই একটা প্রকট বা প্রচ্ছন্ন ক্রম ধরে নিয়ে যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে শিশুর পরিচয় সাধন করাতে দেখি। এরকম দুটি বড় ক্রম চোখে পড়ে—এক. বর্ণানুক্রমিক (alphabetical), দুই. বারংবারিক (based on frequency)। অনেকেই শুরু করেন ক-এর সঙ্গে অন্য ব্যঞ্জনের যুক্তরূপ দিয়ে, ক্ক, ক্ত, ক্র ইত্যাদি—তারপর কমবেশি বর্ণানুক্রম ধরে এগোন। আবার কেউ-কেউ, যেমন যোগীন্দ্রনাথ সরকার—য-ফলা র-ফলা দিয়েই আগে শুরু করেছেন, সম্ভবত এই কারণে যে তাঁর মনে হয়েছে—এ-সব যুক্তব্যঞ্জনই সবচেয়ে ঘন-ঘন বাঙালি শিশুকে পড়তে হবে, ফলে এগুলোই সে আগে চিনে নিক।

আমাদের জানা নেই, যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহারের বারংবারতা বা frequency নিয়ে বাংলায় এখনও কোন নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান নেওয়া হয়েছে কি না। আমরা এখন এরকম একটি পরিসংখ্যান প্রস্তুত করছি। তার আগেই এই লেখা। ফলে এমন হতে পারে যে, পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে এ-লেখার সিদ্ধান্তগুলি টিকল না। সেই ঝুঁকির কথা আগেই পাঠকদের জানিয়ে রাখছি।

আমাদের বক্তব্য, প্রথম বর্ণমালা শেখানো আর যুক্তব্যঞ্জন শেখানো—এ-দুয়ের মধ্যে কোন আবশ্যিক পদ্ধতিগত যোগ নেই। বর্ণমালায় বর্ণানুক্রমিক ক্রম অনুসরণ করে শিক্ষা দেওয়াই ভাল—এই বিশ্বাস এখনও আমার বদ্ধমূল। বিদেশী শিশুশিক্ষায় বর্ণানুক্রম ত্যাগ করে শব্দ-পদ্ধতি (ওঅর্ড মেথড) বা বাক্যপদ্ধতি (সেন্‌টেন্‌স মেথড) গ্রহণ করা হয়েছে দেখে আমরাও অনেক শিশুপাঠ্যে তাই করেছি। কিন্তু এ-বিষয়ে আমাদের শিশুশিক্ষাবিদ্‌রা ভাল করে স্বাধীন চিন্তা করেছেন বলে মনে হয় না। বিদেশীদের বর্ণনানুক্রম ত্যাগের অনেক যুক্তি আছে। প্রথমত, তাদের বর্ণমালাই খুব এলোমেলোভাবে সাজানো। আমি ইয়োরোপের বর্ণমালাগুলির কথা বলছি। এ-বি-সি-ডি থেকে জেড পর্যন্ত যে ছাব্বিশটি বর্ণ—তাতে অভ্যস্ত ও পরিচিত ক্রম ছাড়া আর কোন ক্রম নেই। না আছে ধ্বনি বা উচ্চারণের ক্রম, না আছে লিখিত রূপ-সাদৃশ্যের ক্রম। কিন্তু যে-সংস্কৃত বর্ণমালা সমস্ত ভারতীয় ভাষার লিপির মূল অবলম্বন তাতে বর্ণগুলি ধ্বনির সুশৃঙ্খল ক্রমে সজ্জিত—স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ আলাদা করা, ব্যঞ্জনে উচ্চারণ-প্রক্রিয়া অনুযায়ী চমৎকার বর্গে বর্গে বিন্যাস। পড়তে পড়তে এর উচ্চারণের লজিকটিও অনেকাংশে শিশুর ধাতস্থ হয়ে যায়, ফলে তার পক্ষে মনে রাখা সহজ হয়। আর আমাদের বর্ণগুলির মধ্যে কম ক্ষেত্রেই দ্ব্যর্থকতা আছে: প্রতিটি বর্ণপিছু একটিমাত্র উচ্চারণ শিখলেই শিশুর চলে যায়। কিন্তু ইংরেজী বা রোমান বর্ণমালার c, g—এই বর্ণ দুটির দুটি করে উচ্চারণ, যথাক্রমে k-s এবং g-j; আবার x ঐ একক ব্যঞ্জনের মধ্যেই একটি যুক্তব্যঞ্জন—তাতে একসঙ্গে পরপর দুটি ধ্বনি—ks। রোমক বর্ণমালার নামকরণেও কোন স্পষ্ট নীতি নেই। বাংলা ব্যঞ্জনের নাম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুক্তদল বা open syllable. তার সংগঠন CV অর্থাৎ Consonant + Vowel যেমন kO*,

* বড় হাতের O দিয়ে 'অ' উচ্চারণ বোঝাতে চাইছি।

gO, mO ইত্যাদি। কিন্তু রোমান লিপির নামের সংগঠন বিশ্লেষণে কোথাও পাই **CV**, যেমন **B, C, D** ইত্যাদির নামে, আবার কোথাও পাই **VC**, যেমন **E, L, M, N** ইত্যাদির নামে, কোথাও পাই **CVC—Z**-এর নামে, কোথাও পাই **VCC—X**-এর নামে। **VC** সংগঠনের নামের **Vowel**-গুলোও আবার সব সময় এক নয়। **M, L** ইত্যাদির নামে তা **e**, **R**-এর নামে তা **a**। আবার **CV** সংগঠনের নামেও দুটি করে স্বরধ্বনি পাই—**B, C, D** ইত্যাদির ক্ষেত্রে **i**, এবং **J, K** ইত্যাদির নামে **e** বা **ei**। অর্থাৎ ইংরেজী বর্ণমালা শুধু এলোমেলোই নয়, সেগুলোর নামের গঠনও জটিল।

সুতরাং বাংলা বর্ণমালা আপেক্ষিকভাবে সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত—তার ক্রম বর্জনের লজিক পশ্চিমী বর্ণমালার ক্রম বর্জনের লজিককে অন্ধভাবে অনুসরণ করবে, এটা কোনমতেই সংগত নয়। দরকার হলে তার জন্য নতুন কোন লজিক গড়ে তুলুন আমাদের শিক্ষাবিদ্‌রা।

আমাদের মূল আলোচনা যুক্তাক্ষর নিয়ে, উপরের আলোচনা তার পটভূমিকা মাত্র। আমাদের মতে, বাংলা বর্ণমালার ক্রমও যুক্তাক্ষর শেখানোর ক্ষেত্রে অনুসরণ করার দরকার নেই। একবার স্বর ও ব্যঞ্জন এবং আ-কার ই-কার শেখানো হয়ে গেলে যখন যুক্তাক্ষর শেখানোর পালা আসে তখন **alphabetical** ক্রম অনুসরণের কোন প্রয়োজন দেখি না। এইজন্য দেখি না যে, অ-আ-ই-ঈ এবং ক-খ-গ-ঘ-এর ক্রম তাকে মুখস্থ করতে হয় এবং সেই মুখস্থের কাজে উচ্চারণগত সুবিন্যাস তাকে যথেষ্ট সাহায্য করে কিন্তু যুক্তাক্ষরের তালিকা তার মুখস্থ করার দরকার নেই, শুধু চিনতে ও পড়তে এবং লিখতে শেখা দরকার। তার জন্য মুখস্থ সহায়ক (mnemonic) কোন পদ্ধতি—আমাদের বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি অংশত তাই—আপাতত প্রয়োজন নেই।

তাহলে যুক্তাক্ষর শেখানোর বারংবারতাসূচক পদ্ধতিই কি ভাল? ভাল হত, যদি যুক্তাক্ষরের বারংবারতার একটা নির্ভরযোগ্য হিসেব আমাদের হাতে থাকত। তার অভাবে নিছক আপ্তধারণার উপর কোন পদ্ধতি তৈরি করার কোন অর্থ হয় না।

আমি একটি দ্বিতীয় ক্রম বা পদ্ধতির কথা ভেবেছি। সেটি হল যুক্তবর্ণের শরীর সংগঠনের স্বচ্ছতার (**transparency**-র) ক্রম। 'স্বচ্ছতা'র বিষয়টি একটু বুঝিয়ে বলি।

কিছু কিছু বাংলা যুক্তাক্ষর আছে যাদের দুটি বর্ণই মোটামুটি তাদের আদি চেহারা রেখে দেয়, ফলে তাদের আলাদা করেই চেনা যায়। বোঝা যায় যে, কোন্ দুটি ব্যঞ্জন মিলে এই যুক্তাক্ষর তৈরি হয়েছে। এগুলিকে আমি বলতে চাই 'স্বচ্ছ' (**transparent**) যুক্তাক্ষর। যেমন ক্ক, চ্চ, চ্ছ, জ্জ, প্ন, ড্ড, দ্দ, ন্ন, ব্ব, ম্ন, ম্ম, শ্চ, স্ট, ষ্ট, ন্দ, শ্ব, স্ব ইত্যাদি। হ্যাণ্ড কম্পোজ, লাইনো, মনো বা ফটো টাইপ-সেটিং-এ এ-সবের রূপের একটু-আধটু হেরফের হতে পারে। এ-ধরনের যুক্তাক্ষরে শিশু দুটি অক্ষরই আলাদা করে চেনে, ফলে এই যুক্তাক্ষরগুলিকেও চিনতে তার প্রাথমিক অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

বাংলা যুক্তাক্ষরগুলির দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম দিতে পারি আধা-স্বচ্ছ (**Semi-transparent**)। এতে হয়তো যুক্তাক্ষরের একটি অক্ষর স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে, কিন্তু আরেকটি (এখনও পর্যন্ত আমরা দু-বর্ণের যুক্তাক্ষরের কথাই ভাবছি, তিন বর্ণের কথায় পরে আসব) অক্ষরের চেহারা বদলে গেছে। সেটি কোন্ অক্ষর, তা শিশুদের আলাদা করে বলে দিতে হবে। 'রেফ' ও 'র-ফলা'-ওয়ালা সমস্ত যুক্তাক্ষরই এই শ্রেণীতে পড়বে। শিশুকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে 'ʼ' ও ' ' ব্যঞ্জনে

অব্যবহিত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী 'র্' ছাড়া আর কিছুই নয়। এও হয়তো তাকে ক্রমে ক্রমে শেখাতে হবে যে কেবল তৎসম শব্দেই 'রেফ' ও 'র-ফলা'র প্রত্যাশা বেশি। কিছু ইংরেজী শব্দের বঙ্গীকৃত রূপেও এর ব্যবহার আছে, যেমন আর্ট, শার্ট, কোর্ট, ট্রাম, ড্রইং, লাইব্রেরি ইত্যাদি। এ-ছাড়া যে-সব যুক্তব্যঞ্জন এই আধা স্বচ্ছ শ্রেণীতে পড়বে সেগুলো হল ক্ত, স্ত, স্থ, গ্ধ, দ্ধ, ন্ধ, ক্য, ব্য ইত্যাদি। এগুলি শিশুর কাছে একটুখানি ব্যাখ্যা করা দরকার, অন্তত একটা অংশ তার কাছে রূপের দিক থেকে (visually) দুর্বোধ্য লাগতে পারে।

তৃতীয় এক দল যুক্তব্যঞ্জনকে নাম দিতে পারি অনচ্ছ (opaque)। কারণ এগুলোর দুটির কোনটিকেই আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। বস্তুতপক্ষে যে-দুটি বর্ণ মিলে opaque বা অনচ্ছ যুক্তাক্ষর তৈরি তাদের পরিচয় জেনে শিশুর একটু বিস্ময়ই জাগে। এই শ্রেণীর যুক্তাক্ষরের মধ্যে পড়ে ঙ্গ, ত্র, ক্র, ভ্র ইত্যাদি। আর ক্ষ ও জ্ঞ যুক্তাক্ষর দুটি যে কোন্ কোন্ অক্ষর মিলে তৈরি হয়েছে তা ধরতে পারাই মুশকিল।

অনেকেই লক্ষ্য করেছেন, বাংলা সংবাদপত্রের মুদ্রণে লাইনো টাইপের প্রবর্তন থেকে ইদানিংকার ফটো টাইপ-সেটিং মুদ্রণে যে বিবর্তন ঘটেছে তাতে P, T, S-এর কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাড়া যুক্তব্যঞ্জনকে ক্রমশ স্বচ্ছতা দানের চেষ্টা প্রকট হয়ে উঠেছে। এটাই ঠিক রাস্তা এবং যুক্তাক্ষরের rationalization এই ভাবেই করা উচিত। যতদিন সমস্ত যুক্তাক্ষর স্বচ্ছ না হয়ে উঠছে (PTS-এ এখন একটু রক্ষণশীলতাই যেন অবলম্বন করা হচ্ছে) ততদিন যুক্তাক্ষর শেখানোর জন্য আমি এই ক্রমটিকে ভেবে দেখতে বলি : স্বচ্ছ—আধা-স্বচ্ছ—অনচ্ছ। এই ক্রমের সুবিধে এই যে, এর প্রতিটি পর্যায়েও দরকারমতো বর্ণানুক্রম বা বারংবারতার ক্রম ঢুকিয়ে নেওয়া চলে।

তিন অক্ষরের যুক্তব্যঞ্জনগুলি সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা? স্ত্র, দ্র্, ত্র্য, ক্ত্র, ন্দ্য ইত্যাদিকে সকলের শেষে, এমন কী অনচ্ছ যুক্তাক্ষরের শেষে চেনানোর জন্য অপেক্ষা করার দরকার আছে বলে মনে করি না। য-ফলা শিখিয়েই ন্দ্য শিখিয়ে দেওয়া যেতে পারে

এ-প্রসঙ্গে ঞ্জ (ঞ্ + জ্) এবং জ্ঞ (জ্ + ঞ্) এবং 'হ্ন' ও 'হ্ণ'—এই জোড়গুলিকে আলাদা করতে শেখানোও প্রয়োজন মনে করি।

য-ফলা, ব-ফলা, ম-ফলা এই তিনটিতে সাধারণভাবে উচ্চারণে আগের ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব (doubling) ঘটছে, অর্থাৎ ব্যঞ্জনটি পাশাপাশি দুটি একই ব্যঞ্জন–এভাবে উচ্চারিত হচ্ছে : বাক্য>বাক্‌কো, বিশ্ব>বিশ্‌শো, আত্মা>আঁত্তা ইত্যাদি। ব-ফলা এবং ম-ফলায় কিছু ব্যতিক্রম অবশ্য আছে—উদ্বেগ (দ্‌ব), উদ্বোধন, বাগ্মী, বাল্মীকি, গুল্ম, কাশ্মীর (কিন্তু রশ্মি>রশ্‌শি) ইত্যাদি। এই যুক্তব্যঞ্জনগুলো পাশাপাশি পাঠে সাজালে ভাল হয়। ব্যতিক্রমগুলোও দেখিয়ে দেওয়া দরকার।

৪. রীতি ও শব্দভাণ্ডার : লেখার ভাষা হবে সহজ শিষ্ট কথ্য ভাষা।

ঐ পর্যায়ের শিশুদের পরিচিত (শিষ্ট) শব্দাবলি যেমন পাঠে থাকবে—তাতে পাঠের আকর্ষণ তাদের কাছে বাড়বে—তেমনি তাদের শব্দভাণ্ডার বাড়ানোর জন্য কিছু নতুন vocabulary-ও পাঠে যোগ করতে হবে। সেগুলি ছোট আকারের তৎসম শব্দ হতে বাধা নেই। যুক্তব্যঞ্জনের পাঠে আমাদের পরিচিত ও ব্যবহৃত শব্দগুলি দিতে হবে, 'স্নেহ' 'শান্ত', 'বিরক্ত', 'সুস্থ' ইত্যাদি। নতুন Vocabulary-র লক্ষ্য হবে যাতে শিশুরা ঐ বয়সের যোগ্য পাঠ্যাতিরিক্ত অন্যান্য বই পড়ার সহায়তা পায়।

বানানের ক্ষেত্রে বাংলা এবং সমস্ত পাঠ্যবইয়ে একরূপতা (uniformity) থাকা বাঞ্ছনীয়। তৎসম শব্দের বানান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতির নির্দেশ অনুযায়ী হবে, আর অন্যান্য শব্দের বানানে—যেখানে বিকল্পের সমস্যা আছে—সেখানে সহজতর বিকল্পটিকে নিতে হবে। 'চলন্তিকা' এ-ব্যাপারে সর্বাংশে নির্ভরযোগ্য নয়। আমার মতে 'খুশি' বিশেষ্য ও বিশেষণ দুইই বোঝাতে পারে, 'চলন্তিকা' বিশেষণে দীর্ঘ ঈ-কার দিয়েছে। অ-তৎসম শব্দে শ-স-ষ-এর সমস্যাটিরও ('পোষাক' না 'পোশাক', 'পুলিস' না 'পুলিশ'?) সমাধান হওয়া দরকার।

চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ ব্যাখ্যাত হিন্দুধর্ম

ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর

ফেলো, নেতাজী ইন্‌স্টিটিউট ফর্‌ এশিয়ান স্টাডিজ।

চিকাগো ধর্মমহাসভা : বিশ্ব-ইতিহাসের একটি বিশেষ ঘটনা

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার চিকাগো সহরে যে বিশ্বমেলার আয়োজন হয় তার ছিল পাঁচটি বিভাগ,—শিল্প, কলা, শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং ধর্ম। শিল্পে ও স্বাধীন চিন্তায় তখন আমেরিকা জগতের শীর্ষে। এই বিশ্বমেলার মুখ্য উদ্দেশ্য—প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে ছিল পাশ্চাত্য জাতির বৈষয়িক উন্নতির পরস্পর তুলনা। বৈষয়িক উন্নতি প্রদর্শনে মার্কিন জাতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠিত হবে—এই বিশ্বাস প্রত্যেক আমেরিকাবাসীরই ছিল। ধর্ম-সম্পর্কেও এইরূপ একটা জিগীষা ছিল—অনুমান করা যায়।

বিশ্বমেলায় ধর্মসম্মেলনের আরম্ভে এর পরিণতি সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের সঠিক ধারণা ছিল কিনা বলা যায় না। বিভিন্ন জাতির ধর্মগুলির মধ্যে সমন্বয়কারী উদার দৃষ্টিভঙ্গি অপেক্ষা নিজ নিজ ধর্মমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করাই ছিল অংশগ্রহণকারীদের প্রচেষ্টা। একেশ্বরবাদী,—নিরাকার ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং নিরীশ্বর-তত্ত্ববাদীদের ধারণা ছিল—বহু ঈশ্বরবাদ এবং সাকার মূর্তিপূজা ধর্মের অঙ্গ হতে পারে না। ভারতবর্ষ থেকেও স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত যে সকল প্রতিনিধি চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান করেছিলেন তাঁরাও বহু দেবদেবী এবং মূর্তিপূজা সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবই পোষণ করতেন। হিন্দুধর্ম বা সনাতন বৈদিক ধর্ম সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত আর কারও সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। বরং অধিকাংশেরই ভ্রান্ত ধারণাই ছিল।

সর্বংসহ, সর্বগ্রাহী, বিজ্ঞান ও যুক্তিভিত্তিক হিন্দুধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ হয়ে ধর্মসম্মেলনের উদ্যোক্তাগণের পক্ষে "বিভিন্ন জাতির ধর্মমতগুলির মধ্যে ভ্রাতৃভাবপূর্ণ মিলনের"—স্বপ্ন দেখা অবাস্তব ছিল। যদি স্বামীজী এই ধর্মমহাসভায় উপস্থিত না থাকতেন এবং যদি সেখানে হিন্দুধর্মের যথার্থ ব্যাখ্যা না করতেন, তাহলে ধর্মসম্মেলনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হত। চিকাগোয় স্বামীজীর পরিচয় ছিল "ভারতের হিন্দু সন্ন্যাসী"। স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা—বিশ্ব-ইতিহাসের চিন্তা-জগতের একটি বিশেষ দিগন্ত উদ্‌ঘাটিত করল।

বিবেকানন্দ ব্যাখ্যাত হিন্দুধর্মই সর্বমানবের একমাত্র মিলন ক্ষেত্র

আমরা বিশ্বাস করি, চিকাগো ধর্মমহাসভার উদ্যোক্তাগণের মনে "বিভিন্ন জাতির ধর্মগুলির মধ্যে ভ্রাতৃত্বভাবপূর্ণ মিলনের" সদিচ্ছা ছিল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে যখন এক এক জন প্রতিনিধি নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা দিলেন, তখন দেখা গেল প্রত্যেকেই নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের কথাই প্রতিপাদন করতে চাইলেন। একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দই হিন্দুধর্মের এমন ব্যাখ্যা করলেন যার দ্বারা তিনি প্রমাণ করলেন যে, হিন্দুধর্ম সর্বাবগাহী। মানুষের পূর্ণতা বা দেবত্ব লাভের জন্য যে কোন প্রচেষ্টাই হিন্দুধর্মের বিধান। সেই অর্থে সব ধর্ম হিন্দুধর্মের অন্তর্গত। ধর্মকে অবলম্বন করে যদি মানুষের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হয়,—এবং বাস্তব পক্ষে ধর্মের ভিত্তিই মানুষের মিলনের একমাত্র ক্ষেত্র,—তাহলে হিন্দুধর্মের উদার দৃষ্টিভঙ্গির উপরই নির্ভরশীল হতে হবে। স্বা

অন্য কোন ধর্মাবলম্বীকে হিন্দু হতে বলেননি। শুধু হিন্দুর মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অপরের ধর্মকে শ্রদ্ধা করতেই বলেছেন। ধর্মান্তরিত না হয়ে বা ধর্মান্তরিত না করে নিজ ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা এবং পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেই ধর্মের উদ্দেশ্য ঠিক ঠিকভাবে সিদ্ধ হবে। চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর হিন্দুধর্মের উদার মনোভাব ব্যাখ্যার পর থেকেই বিশ্বে পরমতসহিষ্ণুতার কথা সহজভাবে আলোচিত হচ্ছে।

বিবেকানন্দের হিন্দুধর্মবোধের উৎস শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামীজী হিন্দুধর্মের মর্মবাণীকে যেভাবে উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা করেছেন—তার মূল উৎস কোথা? স্বামীজীর ধর্মবোধের মূল উৎস শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি শুধু হিন্দুধর্মেরই প্রতীক রূপে দেখেননি। তিনি তাঁকে দেখেছেন—ধর্মের স্থাপক এবং সর্বধর্মের স্বরূপ-রূপে। "স্থাপকায় চ ধর্মস্য—সর্বধর্মস্বরূপিণে।" চিকাগো ধর্মসভায় বিবেকানন্দ "সর্বধর্মস্বরূপ" হিন্দুধর্মকেই ব্যাখ্যা করেন,—যাঁর জীবন্তভাব শ্রীরামকৃষ্ণে প্রকট হয়েছিল। তাঁর বেদপুরাণ-ইতিহাসাদি শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে ভারতীয় জীবনে নিত্য আচরিত হিন্দুধর্মকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানব-জীবনে। বেদ-বেদান্ত-পুরাণাদি শাস্ত্রে বিধৃত, ভারতীয় জন-জীবনে নিত্য আচরিত এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে পরিশীলিত ভারতীয় সনাতন ধর্মকেই স্বামীজী চিকাগো ধর্মসভায় ব্যাখ্যা করেছেন। সাধারণ সংজ্ঞায় যা হিন্দুধর্ম তাই সর্বজনীন ধর্ম।

হিন্দুধর্মের ব্যবহারিক অসঙ্গতি সম্পর্কে সচেতন থেকেও স্বামী বিবেকানন্দের মূল ধর্মনির্যাস প্রদর্শন

স্বামীজী হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব—আত্মতত্ত্ব—দেবত্বের সাধনা,—বৈচিত্র্যে ঐক্যভাবনা,—অন্যের মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে অন্যেকে অনুভব করা প্রভৃতি উদার ও সর্বজনীন মহান্ ভাবগুলিই চিকাগো ধর্মসভায় ব্যক্ত করেন। আপাতবিরোধী ভাবের মধ্যেও যে ভারতীয় কৃষ্টি এবং ধর্মের ঐক্য বর্তমান তা স্বামীজী ভাল-ভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু ভারতের লোকাচারে এবং ধর্মাচরণে যে অসংগতি, বিরোধ এবং বীভৎসতা আছে সেই সম্পর্কেও স্বামীজী সচেতন ছিলেন। ভারতে ফিরে এসে স্বামীজী দেশবাসীকে হিন্দুধর্মের ব্যবহারিক অসংগতি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত থেকে যথার্থ ধর্মনিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ সমাজ-জীবন গঠন করতে উদ্বুদ্ধ করেন। ধর্মের নামে অস্পৃশ্যতা, প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয় চর্চা, পীড়ন—দ্বন্দ্ব প্রভৃতিকে তিনি তীব্র কষাঘাত করেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্যে,—বিশেষতঃ যে সময় বিদেশী ধর্মযাজকগণ ভারতীয় ধর্মকে ধর্ম বলেই মনে করতেন না,—যেখানে খ্রীষ্টান মিশনারীকে স্বামীজী ভারতে ধর্ম প্রচার না করে অন্ন দান করতে বলেন সেই ক্ষেত্রে, সেই পণ্ডিতমূর্খ ধর্মযাজীদের সভায়,—যথার্থ জ্ঞানীগুণীদের কাছে হিন্দুধর্মের মূল বেদ-বেদান্ত-গীতা প্রতিপাদ্য উদার, শুভ ও কল্যাণকর দিকগুলির প্রতিই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সাধারণ ভাষায় চিকাগোতে স্বামীজীর ব্যাখ্যাত ধর্মকে "হিন্দুধর্ম" বললেও তা ছিল ভারতীয় সনাতন ধর্ম—যাঁর ভাবঘন মূর্তি ছিলেন বিবেকানন্দ-গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণকে শুধু হিন্দুধর্মের সাধক বা সিদ্ধপুরুষ বললে তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনাকে ছোট করা হয়। তিনি ছিলেন সনাতন ধর্মের পূর্ণ প্রতীক যা সকল ধর্মের উৎস। শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধিত সেই সনাতন ধর্মই চিকাগোতে স্বামীজী কর্তৃক ব্যাখ্যাত হিন্দুধর্ম।

চিকাগো বক্তৃতার বিষয়বস্তু

চিকাগো ধর্মসভার বিভিন্ন অধিবেশনে স্বামীজী যে সকল বক্তৃতা দেন—তার নামকরণ এবং বিষয়বস্তু মোটামুটি এইরূপ : অভ্যর্থনার উত্তর, ভ্রাতৃভাব, হিন্দুধর্ম, খ্রীষ্টানগণ ভারতের জন্য কি করিতে পারেন, বৌদ্ধধর্মের সহিত হিন্দু-ধর্মের সম্বন্ধ ও বিদায় ভাষণ। স্বামীজীর প্রথম ও শেষ ভাষণ সংক্ষিপ্ত হলেও এই দুই ভাষণের মধ্যেই ভারতীয় সনাতন ধর্মের মহিমা এবং চিকাগো ধর্মমহাসভার মহৎ উদ্দেশ্যকে বর্তমান যুগে প্রয়োগ করে কিভাবে মানবজাতি শান্তি ও মৈত্রীর পথে অগ্রসর হবে তার নির্দেশ আছে।

১৮৯৩ খ্রীঃ ১১ সেপ্টেম্বর : অভ্যর্থনার উত্তর : হিন্দুধর্ম—সর্বধর্মের জননী

স্বামীজী আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব না নিয়ে গেলেও প্রথম বক্তৃতাতেই তিনি সমগ্র ভারতের সনাতন ধর্মের প্রতিনিধি হিসাবেই সগর্বে সভামণ্ডলীকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। এই বক্তৃতারই আরম্ভ "ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ" সম্বোধনে। এই সম্বোধনের মধ্যেই হিন্দুধর্ম-সাধনায় সিদ্ধির পরিচয় আছে, যে সিদ্ধি সমগ্র মানবজাতিকে আন্তরিকভাবেই ভ্রাতা ও ভগিনীরূপে গ্রহণ করতে পারে।

বক্তৃতার প্রারম্ভেই তিনি নিজেকে "সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সন্ন্যাসী সমাজের" প্রতিনিধি হিসাবে সগর্বে পরিচয় দেন এবং হিন্দুধর্মকে তিনি "সর্বধর্মের প্রসূতিরূপে" নির্ভয়ে ঘোষণা করেন। হিন্দুধর্ম যে শুধু পরমতসহিষ্ণুই নয়,—এ সর্ববিধ মতকেই স্বীকার করে,—তাও তিনি বললেন।

হিন্দুগণ কিভাবে নিজ দেশে নিপীড়িত ইহুদী ও পার্শী দেশীয় অন্য ধর্মাবলম্বীকে আশ্রয় দিয়েছে তার দৃষ্টান্তও দেখালেন। প্রত্যেক মানুষকে রুচিভেদে ধর্ম-সাধনার স্বাধীনতা দান এবং গীতার সেই বাণী—"যে যেভাবে আশ্রয় করে ভজনা করে, ভগবান্ তাকে সেইভাবেই গ্রহণ করেন" —হিন্দুধর্মের এই উদার বাণীও স্বামীজী এই ক্ষুদ্র ভাষণেই সূত্রাকারে ঘোষণা করেন। স্বামীজী এই সংক্ষিপ্ত ভাষণের উপসংহারে আশা পোষণ করেন যে, হিন্দুধর্মের পরমতগ্রহণের আদর্শে পৃথিবী থেকে সকল প্রকার ধর্মদ্বন্দ্ব দূর হয়ে যাবে এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

স্বামীজীর এই বক্তৃতা-ই চিকাগো ধর্মমহা-সভাকে একটা মিলনাত্মক ও সহযোগিতামূলক ধর্ম-চর্চায় ও শুভসংকল্পে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দুধর্মকে "সকল ধর্মের প্রসূতি" রূপে গ্রহণ করতে কারও মনে দ্বিধা বা সংশয় জাগেনি। স্বামীজীর প্রথম সংক্ষিপ্ত ভাষণই ভারতের ধর্ম-বিজয়ের প্রথম পদক্ষেপ। সকল ধর্মকেই গীতার আদর্শে ধর্ম-রূপে স্বীকৃতি এবং ধর্মের নামে পীড়িতকে আশ্রয়-দান ভারতীয় সনাতন ধর্মের জলবায়ুতে চিরকালই বর্তমান। অতি আধুনিক কালেও ভারতবর্ষ লক্ষ লক্ষ তিব্বতী ধর্মীয় শরণার্থীকে তাদের গুরু দলাইলামা সহ সাদরে অভ্যর্থনা করে গ্রহণ করেছে। তিব্বতী লামা এবং গৃহী উপাসকগণ স্বাধীনভাবেই তাদের ধর্মাচরণ ও ধর্ম-প্রচার করবার সুযোগ পাচ্ছেন। প্রথম দিনের স্বামীজীর এই মিলনাত্মক ধর্মাদর্শ ধর্মসভার পরবর্তী দিনগুলির বক্তাগণকে উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে নিশ্চয়ই প্রবুদ্ধ করেছিল। তথাপি কোন কোন বক্তা পরমতকে বিরূপ সমালোচনাই করেন।

১৮৯৩ খ্রীঃ ১৫ সেপ্টেম্বর : ভ্রাতৃভাব : কূপমণ্ডূকতা পরিহার

এই দিনের অধিবেশনে কোন কোন বক্তা নিজ ধর্মের প্রাধান্য প্রতিপাদনে অন্যধর্মের প্রতি কটাক্ষপাত করেন। অধিকাংশ প্রতিনিধিই ছিলেন স্বধর্মের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী।

বিতর্ক এবং বাগ্‌দ্বন্দ্ব। হিন্দুধর্মের আদর্শে এবং নিজ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ধর্মের মূর্তরূপ দর্শনে অভিজ্ঞ স্বামী বিবেকানন্দ কূপমণ্ডূকের গল্পটি বলে উপসংহার টানলেন—"হে ভ্রাতৃগণ, এইরূপ সংকীর্ণ ভাবই আমাদের মতভেদের কারণ" এই বক্তৃতায়ও স্বামীজী আশা পোষণ করলেন যে, চিকাগো ধর্মসভায় উদার ধর্মালোচনার পর কারও মনে ক্ষুদ্র কূপমণ্ডূক ভাব থাকবে না।

আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করব যে, স্বামীজী প্রতিটি বক্তৃতাতেই হিন্দুধর্মের উদার, সর্বাবগাহী, পরধর্মসহিষ্ণুতা ও পরধর্মগ্রাহিতার আদর্শকে বিশেষভাবে জোর দিয়ে সমগ্র ধর্মসভার অভিমতকে মিলনাত্মক পরিণতির দিকেই নিয়ে যাবেন। এখানেই স্বামীজীর তথা হিন্দুধর্মের দিগ্বিজয়।

১৯ সেপ্টেম্বরঃ মূল প্রবন্ধ—হিন্দুধর্ম

পূর্ববর্তী দুটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে স্বামীজী হিন্দুধর্মকে সর্বধর্মজনয়িত্রী, সর্বমতসহিষ্ণু এবং সর্বমতগ্রাহীরূপে সূত্রাকারে উল্লেখ করেছেন। ১৯ সেপ্টেম্বরের মূল বক্তৃতায় স্বামীজী হিন্দু-ধর্মের মূলতত্ত্ব, তার দর্শন—এবং তার প্রযুক্ত উদার সাধনার ও সিদ্ধির কথা ব্যাখ্যা করেন। বেদই হিন্দুধর্মের মূল। বিভিন্ন সময়ে ভারতে বিভিন্ন মত ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হলেও এই বৈচিত্র্যময় ভাবরাজিই সমষ্টিগতভাবে "হিন্দুধর্ম"। "সর্বোৎকৃষ্ট বেদান্ত জ্ঞান থেকে নিম্নস্তরের মূর্তি-পূজা ও আনুষঙ্গিক নানাবিধ পৌরাণিক গল্প পর্যন্ত,—এমনকি বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ, জৈনদের নিরীশ্বরবাদ—হিন্দুধর্মে এগুলির প্রত্যেকটিরই স্থান আছে।" মানুষ আত্মাস্বরূপ। আত্মা অমর। অবিনাশী আত্মা কর্মফলানুসারে দেহ-ধারণ করে। কর্মানুসারেই মানুষ সুখ দুঃখ অনুভব করে। আত্মা অব্যয়, অবিকারী। কর্মফলই মানুষকে জন্ম থেকে জন্মান্তরে নিয়ে যায়। নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব আত্মা কেমন করে জড় বন্ধনে বদ্ধ হলেন—তা দুর্জ্ঞেয় এবং ব্যাখ্যাতীত। কিন্তু কর্মফলের দ্বারাই মানুষ আবার শুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব হতে পারে—এ ভারতে পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সত্য। ভারতীয় ঘোষণা—"মানুষ অমৃতের পুত্র"। আবার ঈশ্বরের কৃপায় ও ভক্তিবাদ অবলম্বনকারী মানুষ মুক্ত হতে পারে। কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ব না হলে ঈশ্বরের কৃপার অনুভবও হয় না। শুধু মতবাদে বিশ্বাস করা মাত্র নয়,—আদর্শ জীবনে পরিণত করাই ধর্ম। স্বর্গস্থ পিতার মতো পূর্ণ হওয়াই হিন্দুর ধর্ম। ধর্ম কিছু করা মাত্র নয়,—কিছু হওয়া,—পূর্ণ হওয়া, মুক্ত হওয়া—নিষ্কাম হওয়া। পূর্ণ মানুষ ও ব্রহ্ম এক। পূর্ণ মানুষ পূর্ণানন্দী হয়—ঈশ্বরের আনন্দের অংশভাক্ হয়। পূর্ণতা হল বিশ্বের সঙ্গে একত্ব অনুভব। সৎ, চিৎ, আনন্দ,—তিনে মিলে এক। একত্বের আবিষ্কারই বিজ্ঞান। বৃহত্ত্বে,—একত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ধর্ম। এই একত্বজ্ঞানই মুক্তি বা ব্রহ্মপদ।

ভারতে আপাত দৃষ্টিতে যাকে বহু ঈশ্বরবাদ বা নানা দেবদেবীর আরাধনা বলে মনে হয়,—আসলে তা একেশ্বরবাদ-ই। কারণ ভারতীয় ধর্ম-সাধনায় একই ব্রহ্মকে "রূপে রূপে,—দেবে দেবে" দর্শন করে তাঁরই সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস করা হয় এবং সেইভাবেই তাঁকে বিশেষিত করে প্রার্থনা করা হয়। নিরাকারবাদিগণ মূর্তি-পূজার জন্য হিন্দুকে নিন্দা করেন। কিন্তু স্বামীজী প্রমাণ করেন যে, প্রত্যেক আচারমূলক ধর্মই প্রতীক বা মূর্তি-পূজক!

মূর্তিপূজার প্রয়োজন বা সার্থকতা অবশ্যই আছে। অধিকারীভেদে মানুষ সত্য থেকে বৃহত্তর সত্যে উপনীত হয়। হিন্দুগণ কোন উপাসনাকেই অসত্য বা ভ্রান্ত মনে করেন না।

প্রত্যেক স্তরই আপেক্ষিক সত্য। এই বহুত্বের মধ্যে একত্ব দর্শনই ভারতের সাধনা। উপনিষদ্ এবং গীতা অধিকারীভেদে এই বৈচিত্র্যের সার্থকতাকে স্বীকার করেছে।

হিন্দুধর্মের চরম উপলব্ধিতে কৃষ্ণভক্ত, খ্রীষ্টভক্ত, ব্রাহ্মণ, মুসলমান ভেদ থাকবে না। যথার্থ হিন্দু-ধর্ম সকল ধর্মের সমষ্টি স্বরূপ। এই ধর্ম আপামর মহামানবকে সাদরে আলিঙ্গন করে, এই ধর্মের নীতিতে কারও প্রতি বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের স্থান নেই। এই ধর্ম সকল নর-নারীর দেব-স্বভাবকে স্বীকার করে—এবং তার সকল শক্তি মনুষ্যজাতিকে দেব-স্বভাব উপলব্ধি করতে সহায়তা করার জন্য সতত নিযুক্ত আছে। হিন্দুধর্ম সর্বজনীনধর্ম—তা কোন দেশের বা কালের ধর্ম নয়। সকলের দেবভাব বিকাশ করাই হিন্দু-ধর্মের লক্ষ্য। হিন্দুধর্মের মহান্ আদর্শের তুলনায় অশোক ও আকবরের ধর্মসংগীতি সংকীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত মাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণকে অবলম্বন করেই হিন্দু-ধর্মের নবজাগরণ

স্বামীজী যে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করলেন,—তার মূর্তরূপ তিনি দেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে। শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ধর্মোপলব্ধিই যে বর্তমান জগতের "পরিচালক নক্ষত্র"-স্বরূপ এই কথাও স্বামীজী ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন—"পূর্বাপেক্ষা সহস্রগুণ উজ্জ্বল হয়ে পুনর্বার পূর্বগগনে সাংপোর (ব্রহ্মপুত্রের) সীমান্তে (বঙ্গদেশে) উহা উদিত হচ্ছে।" স্বামীজী এই বক্তৃতার উপসংহারেও আশা পোষণ করেন, চিকাগো ধর্মমহাসভার নীতি ও আদর্শ থেকেই মহামানবের সর্বজনীন উদার ধর্মের বিকাশ হবে।

২০ সেপ্টেম্বর: খ্রীষ্টানগণ ভারতের জন্য কি করতে পারেন?

এই ভাষণে স্বামীজী ভারতে বিদেশীদের ধর্ম প্রচার অপেক্ষা ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি বিষয়ে সাহায্য করাকে-ই অধিকতর প্রয়োজন বলে অভিমত প্রকাশ করেন। ভারত ধর্মের দেশ। এখানে ধর্ম-প্রচার নিষ্প্রয়োজন। বৈষয়িক উন্নতিতে সাহায্য করাই পাশ্চাত্য খ্রীষ্টানগণের ভারতের প্রতি যথার্থ সাহায্য। কিন্তু খ্রীষ্টানগণ পরধর্মাবলম্বীকে সাহায্য করতে অনিচ্ছুক—এ স্বামীজীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। এই ভাষণে স্বামীজী খ্রীষ্ট-প্রচারকগণকে কিছু অপ্রিয় সত্য কথা শোনান।

এই বক্তৃতায় একটা জিনিস লক্ষণীয়। স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল,—ভারতের বৈষয়িক উন্নতির জন্য পাশ্চাত্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা। "আমি দরিদ্র দেশবাসীর জন্য তোমাদের কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিলাম।" —স্বামীজী প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলনের বিনিময়ে—প্রাচ্যের ধর্মদান এবং পাশ্চাত্যের বৈষয়িক জ্ঞান ও বস্তুদানের কথা পরবর্তী কালে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রাচ্যে ধর্ম-প্রচার অপেক্ষা বৈষয়িক সাহায্যই বেশি প্রয়োজন।

২২ সেপ্টেম্বরও স্বামীজী সনাতন হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ভাষণ দেন এবং নানা ধর্মাবলম্বী জিজ্ঞাসুদের বহু প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করেন। এই বক্তৃতার শেষে আগ্রহী শ্রোতৃগণ আরও একদিন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজীর কাছ থেকে শুনতে চান। হিন্দুধর্মের প্রতি বিদ্বজ্জনের আগ্রহ সৃষ্টি স্বামীজীর ভাষণের একটি বিশেষ তাৎপর্য।

২৬ সেপ্টেম্বর: বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের সম্বন্ধ

চিকাগো ধর্মসভায় আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে হিন্দুধর্ম-প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। বর্তমান বিশ্বে বুদ্ধ অনুগামীদের সংখ্যাই

বেশি। বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখাই ধর্মনেতা এবং পণ্ডিতদের অভ্যাস এবং অভিমত। স্বামীজী প্রমাণ করলেন যে, শ্রীবুদ্ধ হিন্দুধর্মেরই পরিপূরক। "শাক্যমুনি নূতন কিছু প্রচার করতে আসেননি। তিনি হিন্দুধর্মকে পূর্ণ করতেই এসেছিলেন।" স্বামীজীর মতে "শ্রীবুদ্ধ ছিলেন হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি ও যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত—ন্যায়সম্মত বিকাশ।" হিন্দুধর্ম বক্তৃতায় শ্রীবুদ্ধের নিরীশ্বরবাদকেও হিন্দুধর্মেরই শাখা বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বৌদ্ধধর্মের নৈতিক প্রভাব—ভারতের সংস্কৃতির উন্নতমানের পরিচায়ক। সাকার ঈশ্বরকে অস্বীকার করায় সাধারণ মানুষের মন থেকে শ্রীবুদ্ধের দার্শনিক প্রভাব লুপ্ত হয়ে গেল। সর্বাবগাহী হিন্দুধর্ম সাকার ঈশ্বরকে এবং শ্রীবুদ্ধের নিরাকার নির্বাণকে সমকালে গ্রহণ করে এখনও জীবন্ত। স্বামীজী এই বক্তৃতায় ব্রাহ্মণ্য ধীশক্তির সঙ্গে শ্রীবুদ্ধের হৃদয়বৃত্তিকে সংযুক্ত করে ভবিষ্যৎ ভারত-গঠনের অনুপ্রেরণা দেন। এই ভাষণও মিলনাত্মক প্রেরণা।

২৭ সেপ্টেম্বর: বিদায় ভাষণ

স্বামীজীর বিদায় ভাষণটি সংক্ষিপ্ত হলেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর এই ভাষণে তিনি সমগ্র ধর্মমহাসভার উদ্দেশ্যকে হিন্দুধর্মাদর্শের মিলনের পটভূমিতেই দাঁড় করিয়ে দিয়ে একটি সার্থক উপসংহার টানলেন। পরবর্তী কালে ধর্মসম্মেলন ও ধর্মালোচনা—কিভাবে সমগ্র মানব-সমাজকে স্বার্থলেশহীন এক মহামিলনের পথে পরিচালনা করবে তাঁরও স্পষ্ট নির্দেশ আছে এই ভাষণে।

এই ধর্মসম্মেলনের বহু ভাষণে বৈষম্য এবং বিরোধমূলক বহু উক্তি ছিল। স্বামীজী সে-সকলের প্রয়োজনের কথা স্বীকার করেও দৃঢ় ভাষায় বলেছেন—আপাতবিরোধ থাকলেও কোন ধর্ম নষ্ট হয়ে অন্য ধর্মে মিলিত হয়ে যাবে—এই আশা বা আশংকা অমূলক। "একটির অভ্যুদয় এবং অপরটির বিনাশ"—কখনও কাম্য নয় এবং সম্ভবও নয়। কোন খ্রীষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হতে হবে না—অথবা হিন্দু ও বৌদ্ধকে খ্রীষ্টান হতে হবে না। প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সার ভাগ গ্রহণ করে পুষ্ট হবে এবং স্বীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই নিজ প্রকৃতি অনুসারে বর্ধিত হবে। হিন্দুধর্মের উদার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে স্বামীজী ভবিষ্যৎ ধর্মের মর্মবাণীকে ঘোষণা করলেন—"বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।"

স্বামীজীর চিকাগো ভাষণের প্রভাব: ভারতের আত্মচেতনা ও বিশ্বের শ্রদ্ধা লাভ।

(১) সনাতন হিন্দুধর্মই সকল ধর্মের প্রসূতি-রূপে প্রমাণিত হল

(২) বহুধা আচরিত এবং আপাতবিরোধী মতবাদের মধ্যেও হিন্দুধর্মের একটা সংজ্ঞা এবং স্বরূপ স্বামীজীর ভাষণে মূর্ত হয়ে উঠল,—"ঈশ্বর বা ব্রহ্ম উপলব্ধির জন্য যে কোন প্রয়াসই হিন্দু-ধর্মের অঙ্গ।"

(৩) স্বামীজীর ব্যাখাত সনাতন ধর্মকেই—বিশ্ববাসী মহামানবের মিলনের পটভূমিরূপে গ্রহণ করল—"সকল মতই পথ"—অধিকারীভেদে।

(৪) পাশ্চাত্যের খ্রীষ্ট প্রচারকগণ প্রাচ্যে ধর্ম-প্রচার বিষয়ে সতর্ক হলেন। প্রত্যেক ধর্ম-প্রতিনিধিই নিজ নিজ মতকে উদার দৃষ্টিতে বিচার করার সাবধানী চেতনা লাভ করলেন। পরমতকে ভ্রান্ত বলা থেকে বিরত হলেন।

(৫) পাশ্চাত্য দার্শনিক ও মনীষিগণ হিন্দু-ধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতিকে নূতনভাবে বিচার করার অনুপ্রেরণা পেলেন

(৬) পরাধীন ভারত হিন্দুধর্মের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হল,—হীনম্মন্যতা থেকে মুক্তি-লাভ করে—দেশে এবং বিদেশে আত্মপ্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হল। ভারতের জাগরণ—সমগ্র প্রাচ্য-দেশকেও নূতন প্রেরণা দিল।

(৭) চিকাগো ধর্মমহাসভার পটভূমিতেই স্বামী বিবেকানন্দ-উচ্চারিত মহামানবের মিলনের মহামন্ত্র—"বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।" এটাই বর্তমান বিশ্বসমস্যা সমাধানের একমাত্র নির্দেশ।

বর্তমান সঙ্কটে যুবসমাজের প্রতি স্বামীজীর আহ্বান

স্বামী চৈতন্যানন্দ

'উদ্বোধন' পত্রিকার সহায়ক ৮

বর্তমানে ভারতবর্ষ তথা সারা বিশ্ব এক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে। যে কোন মুহূর্তে এই সঙ্কট প্রবলাকার ধারণ করে মানবসমাজকে দারুণ বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলতে পারে। এই সঙ্কট উদ্ভবের কারণগুলি একটু তলিয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে, বিশ্বমানবের মধ্যে আজ সাম্য ও মৈত্রীর অভাবই সর্বাধিক। কেন এই অভাব হল তা সংক্ষেপে একটু আলোচনা করলে বর্তমানের এই পরিস্থিতিকে অনুধাবন করতে আমাদের সুবিধা হবে।

সাম্য ও মৈত্রীর প্রথম বাধা হল—বর্তমান জগতে শক্তিমান জাতিসমূহের অতৃপ্ত সাম্রাজ্যলিপ্সা। জড়বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ব্যবহারিক জগতের চাহিদা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে। সে আর অল্পে সন্তুষ্ট নয়। ব্যষ্টির চাহিদা সমষ্ট্যাকারে জাতীয় রূপ নেয়। তাই আজ প্রত্যেক জাতির ভোগ-স্বার্থের চরমোৎকর্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে ধনসম্পদ। এই ধনসম্পদ আহরণের জন্য তারা নানারকম প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে তারা ধনসম্পদ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছে। ফলে বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে গড়ে উঠেছে বড় বড় কলকারখানা। ঐ কলকারখানাগুলিতে কাঁচামাল সরবরাহ ও উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য আবশ্যক হচ্ছে সাম্রাজ্য। তাই বড় বড় ধনতান্ত্রিক দেশগুলি ছোট ছোট দেশগুলিকে কৌশলে নিজের নিজের অধীনে রাখার জন্য সবসময় চেষ্টা করছেন। শক্তিমান দেশগুলির মধ্যে এই নিয়ে বেশ প্রতিযোগিতা ও ঘাত-সংঘাত চলছে। তাঁরাও পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস থাকায় একে অপরের থেকে শক্তিশালী হওয়ার জন্য অত্যাধুনিক পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করছেন। এর যদি কখনও প্রয়োগ হয় সারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এই নিয়ে আজ সারা পৃথিবীর মানুষ সন্ত্রস্ত। বর্তমান জগতে শক্তিমান জাতিসমূহের ভোগবাসনার চরমোৎকর্ষসাধন লক্ষ্যের জন্যই তাঁদের অতৃপ্ত সাম্রাজ্যলিপ্সা দেখা দিয়েছে এবং বিশ্বে আজ এই অশান্তির উদ্ভব হয়েছে।

অতঃপর দ্বিতীয় বাধা হল—ধনতন্ত্রবাদিগণের বিশ্বগ্রাসী বুভুক্ষা। বর্তমান ধনতন্ত্রবাদিগণ বস্তুতপক্ষে অনেক রাষ্ট্রনায়কগণকে পরিচালনা করেন। তাঁদের ধনসম্পদের লিপ্সা রাষ্ট্রনায়কদের মাধ্যমে চরিতার্থ করেন। রাষ্ট্রনায়কগণও ঐ ধনতন্ত্রবাদিগণের হাতের পুতুল হয়ে পড়েন। আর তাঁরা ক্ষমতায় থাকারও জন্য ধনতন্ত্রবাদিগণের সাহায্য নেন।

বর্তমান সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে জড়বিজ্ঞানের উপর। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে আজ পর্যন্ত চৈতন্যের থেকে জড়ের সম্মান বেশি করে দেওয়ায় মানুষের মনের সুকোমল ভাবগুলি ক্রমেই অন্তর্হিত হতে বসেছে। মানুষের মনগুলিও হয়ে পড়েছে যেন যন্ত্র। এই যন্ত্রসভ্যতার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জাগতিক সুখভোগ বৃদ্ধি করা। এই সুযোগ নিয়ে ধনতন্ত্রবাদিগণ পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রনায়কগণকে দিয়ে জনসাধারণের জাগতিক সুখভোগে রাখার প্রতিশ্রুতি দেওয়ান। রাষ্ট্রনায়কগণও রাষ্ট্রক্ষমতা-ভোগের জন্য জনগণকে সুখভোগ বৃদ্ধি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তখন তাঁরা বাধ্য হন সমস্ত নিয়ম-নীতি বিসর্জন দিয়ে ধনতন্ত্রবাদিগণের সর্বগ্রাসী ধনলিপ্সা পূরণ করার জন্য বহির্বিশ্বের দিকে হস্ত প্রসারিত করতে। এইজন্য তাঁরা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে থাকেন। যেমন—ধনতান্ত্রিক দেশগুলি ছোট

ছোট দেশগুলির পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ বাধিয়ে অশান্তি সৃষ্টিতে প্ররোচনা দিয়ে থাকেন। ছোট ছোট দেশগুলিও নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে—একে অপরের থেকে ধনসম্পদে ও আগ্নেয়াস্ত্রে সমৃদ্ধ হতে। এইভাবে ধনতান্ত্রিক দেশগুলি নিজেদের উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য ও যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি করে ধনতন্ত্রবাদিগণের সর্বগ্রাসী বুভুক্ষার তৃষ্ণা মেটাবার চেষ্টা করেন। এই সব নানা কারণে আজ বিশ্বে সাম্য ও মৈত্রী অত্যন্ত বিঘ্নিত হচ্ছে।

সাম্য ও মৈত্রীর তৃতীয় বাধা হল—অনুন্নত ও দুর্বল জাতির উপর শক্তিমান জাতির শতমুখী অত্যাচার। উপরে উল্লিখিত শক্তিমান ধনতান্ত্রিক দেশগুলি নিজেদের ধনসম্পদ বৃদ্ধি এবং ক্ষমতা বিস্তারের জন্য অনুন্নত ও দুর্বল ছোট ছোট জাতিগুলির উপর অত্যাচার করেন। শক্তিমান জাতিগুলি নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র খুব বিক্রি হবে বলে তাঁরা চেষ্টা করেন ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি যেন সবসময় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আর একভাবে তাঁরা অত্যাচার করেন সেটা আরও মারাত্মক। যেমন—একটা রাষ্ট্রের ভিতরে সরকার-বিরোধী জননেতাকে বিভিন্ন 'ইস্যু' নিয়ে আন্দোলনে উশকানি দিয়ে নানারকম গোলমাল বাঁধিয়ে দেওয়া। আর এই গোলমাল মেটানোর জন্য তাঁরা রাষ্ট্রপরিচালককে বাধ্য করেন শক্তিমান রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও পণ্যদ্রব্য ক্রয় করতে। আবার বিরোধী পক্ষও অস্ত্রশস্ত্র পায় ঐ শক্তিমান দেশগুলি থেকে। দুদিক থেকে তাঁরা মুনাফা লোটেন। এইভাবে শক্তিমান দেশগুলি নিজেদের স্বার্থে নানাভাবে চেষ্টা করেন ছোট ছোট দেশগুলির মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে দিয়ে সেই রাষ্ট্রের অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে। তাঁরা ছোট ছোট রাষ্ট্রের উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ান। এইরকম বহুভাবে অনুন্নত ও দুর্বল জাতিগুলির উপর উৎপীড়ন করে ধনতান্ত্রিক দেশগুলি বিশ্বে সাম্য ও মৈত্রীর পথে বিঘ্ন করছেন।

তারপর চতুর্থ বাধা হল—বর্ণবিদ্বেষমূলক অধিকার-বৈষম্য। জড়বিজ্ঞানের দ্রুত প্রসার হয়েছে। দূরের মানুষকে পরস্পরের খুব কাছাকাছি এনে দিয়েছে। এই বিজ্ঞানসহায়ে পৃথিবীটা এখন আর বড় নয়—যেন কত ছোট হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষকে মানুষ থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। মানুষের ভিতরকার সুকোমল বৃত্তিগুলি জড়বিজ্ঞানের প্রভাবে চাপা পড়েছে। ভালবাসা সত্য সংযম এগুলি এখন কথার কথায় পর্যবসিত। তাই বিংশ-একবিংশ শতাব্দীর মানুষ হয়েও আমরা বর্ণবিদ্বেষমূলক ব্যাধি থেকে মুক্ত হতে পারছি না। যেমন—দক্ষিণ আফ্রিকা, আমেরিকা, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশে বর্ণবিদ্বেষমূলক অধিকার-বৈষম্য এক দুরারোগ্য ব্যাধির মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। নানা দেশে সাদা-কালোর ভেদ করা হয়। সাদা-কালোর মাপকাঠিতে অধিকার-বৈষম্য করা হয়। সাম্য ও মৈত্রী রক্ষায় এই বিদ্বেষ-বৈষম্য এক প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাম্য ও মৈত্রীর পঞ্চম বাধা হল—সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ। আজ এশিয়া মহাদেশে বিশেস করে ভারতে এই ব্যাধি প্রচণ্ডভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ভারতে বহু জাতি ও সম্প্রদায়ের বাস। কোন সম্প্রদায় নিজের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে না। পরধর্মসহিষ্ণুতার অভাব তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। তাদের অধিকার যদি সামান্যতম ক্ষুণ্ণ হয় তারা বিচ্ছিন্নতাবাদের জিগির তুলছে। ধর্মের বাহ্যিক আচার-আচরণগুলির সঙ্গে রাজনীতিকে মিশিয়ে ফেলাতে আজ এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। ডঃ রাধাকৃষ্ণণের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় আজ ধর্ম হয়েছে যেন 'a branch of

statecraft—a plaything of Politics'—রাষ্ট্র-শাসনকার্যেরই একটি বিষয়—রাজনীতির খেলনা। ধর্মের আসল দিক যে আধ্যাত্মিকতা সেদিকে আর কারও নজর নেই। ধর্মের শুধু বাহ্যিক দিকগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে ধর্মকে ক্ষমতা আদায়ের একটি যন্ত্র করে ফেলা হচ্ছে। কিন্তু সকল ধর্মের সার হল সাম্য ও মৈত্রী। এই দিকটির দিকে জোর না দিয়ে ধর্মের নামাবলী গায়ে দিয়ে ধর্মধ্বজা উড়িয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টা হচ্ছে। তাই বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত ভারতের অবস্থার দিন দিন অবনতি ঘটছে। জোড়াতালি দিয়ে কোনক্রমে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মুখ বন্ধ করার জন্য তাদের দাবির কিছু কিছু মেনে নিয়ে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। ভারতের বাইরে তো সংখ্যাগরিষ্ঠরা সংখ্যালঘুদের রীতি-মতো ভয় দেখিয়ে দাবি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। দাবি-দাওয়া নিয়ে তাই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা অসন্তোষভাব দিন দিন বেড়ে চলেছে। ফলে ভারত তথা এশিয়া মহাদেশে সাম্য ও মৈত্রীর অভাবে এক সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখা দিয়েছে।

পরিশেষে ষষ্ঠ কারণ হল—অসহনশীলতা। আজ পৃথিবীর মানুষ বিজ্ঞানসহায়ে জাগতিক উন্নতির প্রচুর উৎকর্ষ দেখিয়েছে, কিন্তু মানস-জগতের ক্ষেত্রে সেই অনুপাতে ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে। বহির্জগতে মানুষ আজ খুব কাছাকাছি এসেছে, কিন্তু মনের দিকে মানুষ ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে সরে চলেছে। যন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে চলতে মানুষও আজ যন্ত্র হয়ে পড়ছে। তার সংবেদনশীল মনটি আজ শুষ্ক কঠিন। মানুষের সহনশীলতা এবং সহমর্মিতা বৃদ্ধির জন্য যে আন্তর জগতের শিক্ষার প্রয়োজন, তা আজ অবহেলিত। তার ফলশ্রুতিস্বরূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা বিশ্বে এমনকি বড় বড় ধনতান্ত্রিক দেশগুলি ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েও তাঁরা সর্বদা শঙ্কিত ও ভীত। যেমন জাপান—পৃথিবীর অন্যতম ধনী দেশ হয়েও, সেখানকার ১২।১৩ বছরের ছেলেমেয়েরাও মানসিক ব্যাধির শিকার। পাশ্চাত্যে অনেক ধনী দেশের ছেলেমেয়েদের মানসিক যন্ত্রণা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তারা আত্মহত্যার পথও বেছে নিচ্ছে।

মানুষ আজ বড় বেশি স্বার্থপর হয়ে পড়েছে। নিজের সম্বন্ধে চিন্তা ছাড়া অপরের জন্য চিন্তা করার আজ আর তার সময় নেই। সে ক্রমশঃ সংকীর্ণ হতে সংকীর্ণতর হচ্ছে। ফলে বিবাহ-বিচ্ছেদ, দাম্পত্য কলহ, সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, বর্ণবিদ্বেষ প্রভৃতি নানা সমস্যা আজ সৃষ্টি হয়ে বিশ্বের সমাজব্যবস্থাকে এক অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে। ব্যষ্টির সহনশীলতা ও উদারতার অভাব সমষ্ট্যাকারে জাতীয় রূপ নেয়। তাই ব্যষ্টির মহৎ গুণ ও উদার মনোভাব বৃদ্ধি না হলে কখনই বিশ্বে সাম্য ও মৈত্রী আসতে পারে না। মানুষের মন থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে বিশ্বে সাম্য ও মৈত্রী আনা জড়বিজ্ঞান দ্বারা সম্ভব নয়। এ-যুগের বিখ্যাত যুক্তিবাদী বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন: "কোনও রাসায়নিক ক্রিয়াসংযোগে বিদ্বেষ ভাব হতে বিশ্বসাম্যের উদ্ভব হবে না।"

তাই বর্তমান অবস্থার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে সকলেরই মনে স্বাভাবিক প্রশ্ন: এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের কি উপায়? এই সঙ্কট সৃষ্টি যে হবে স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু তা বহু পূর্বেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বিজ্ঞানের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন করতে বলেছিলেন। জড়বিজ্ঞান মানুষকে দৈহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে, কিন্তু মানসিক শান্তি ও স্থৈর্য দিতে পারে না, তা পারে একমাত্র আধ্যাত্মিকতা। তাই এই দুয়ের মিলন স্বামীজী চেয়েছিলেন। বিশ্বের

শান্তি ও মৈত্রী রক্ষার জন্য স্বামীজী ভারতের আধ্যাত্মিকতার পুনরুত্থান চেয়েছিলেন। তিনি বলছেন:

"ভারত কি মরিয়া যাইবে? তাহা হইলে জগৎ হইতে সমুদয় আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত হইবে; চরিত্রের মহান্ আদর্শসকল বিলুপ্ত হইবে, সমুদয় ধর্মের প্রতি মধুর সহানুভূতির ভাব বিলুপ্ত হইবে, সমুদয় ভাবুকতা বিলুপ্ত হইবে; তাহার স্থলে দেবদেবীরূপ কাম ও বিলাসিতা যুগ্ম রাজত্ব চালাইবে; অর্থ—সে পূজার পুরোহিত; প্রতারণা, পাশব বল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা—তাহার পূজাপদ্ধতি আর মানবাত্মা তাহার বলি। এ অবস্থা কখন হইতে পারে না।…অদৃষ্টচক্র ঘুরিয়া গিয়াছে।…ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে; বিনাশের বিজয়পতাকা লইয়া নয়, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া—সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশ-সহায়ে; অর্থের শক্তিতে নয়, ভিক্ষাপাত্রের শক্তিতে।"

বিশ্বের এই দারুণ সঙ্কটাবস্থা থেকে মুক্তির পথ হিসাবে স্বামীজী ভারতের পুনর্গঠনের জন্য যুবসমাজকে আহ্বান করেছেন: "হে মহাপ্রাণ, ওঠ, জাগো! জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে—তোমার কি নিদ্রা সাজে? এস, আমরা ডাকতে থাকি, যতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত হন, যতক্ষণ না অন্তরের দেবতা বাইরের আহ্বানে সাড়া দেন। জীবনে এর চেয়ে আর বড় কি আছে?" "ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান।"

"…বৎসগণ! সমগ্র জগৎ জ্ঞানালোক চাইছে—উৎসুক নয়নে তার জন্য আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হে বীর হৃদয় যুবকগণ, তোমরা বিশ্বাস কর যে, তোমরা বড় বড় কাজ করবার জন্য জন্মেছ।" "হে বীর, সদর্পে বলো, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই…ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ! আর বলো দিনরাত: হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা আমায় মানুষ কর।"

স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষিত আধ্যাত্মিক ভিত্তিক ভবিষ্যৎ ভারত-পুনর্গঠনের কাজ খুবই দুরূহ। এই কাজের জন্য চাই দৃঢ় চরিত্রবল। তাই স্বামীজী চরিত্রগঠনের উপর প্রথম জোর দিয়েছেন। তিনি বার বার বলেছেন **man-making education**-এর কথা। তিনি বলছেন: "তাদের **life** (জীবন) তয়ের করে নিতে হবে, তবে কাজ হবে।" তাঁর কাজের জন্য স্বামীজী চেয়েছিলেন এইসব যুবকদের "যাদের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত-নির্মিত, আর তার মধ্যে থাকবে এমন একটি মন, যা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য, মনুষ্যত্ব—ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ!" যুবসমাজ নিজের উপর বিশ্বাস রেখে আলস্য বিসর্জন দিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে ভারতের পুনর্গঠনের কাজ করবে। তিনি বলছেন: "আত্মবিশ্বাসী হও, অন্যথা কোন মুক্তি সম্ভব নয়! বিশ্বাসী হও, শক্ত সবল হও—একমাত্র ইহাই আমাদের প্রয়োজন।" "ত্যাগ বিনা কোন মহৎ কাজ হয় না।…আরাম, সুখ, নাম-যশ, পদমর্যাদা—এমনকি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দাও।"

স্বামীজী আর একটি জিনিসের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি সারা দেশবাসীকে উদ্দেশ করে বার বার বলেছেন, অতীতের অর্জিত জাতির আধ্যাত্মিক সম্পদের দিকে সগর্বে তাকাতে এবং বিশ্বাস করতে যে, মাতৃভূমি আবার ঐ শক্তিরই উপরে দাঁড়াবে। তিনি বলছেন: "পৃথিবীতে যত গর্বিত মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন আমি তাঁহাদের অন্যতম; গর্ব আমার নিজের জন্য নয়, আমার পূর্বপুরুষদের জন্য। এই গর্ব আমাকে শক্তি দিয়াছে, পথের ধূলি হইতে আমাকে

তুলিয়া ধরিয়াছে। তোমাদেরও মধ্যে এই গর্ব সঞ্চারিত হোক।”

ভবিষ্যৎ ভারত সম্বন্ধে তিনি বলছেন: “বিধাতৃ-নির্দিষ্ট তাঁহার গৌরবময় ভবিষ্যৎ পরিপূর্ণ করিবার জন্য ঐ আমার মাতৃভূমি রানীর মতো ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছেন; পৃথিবীতে কোন শক্তির সাধ্য নাই, তাঁহার গতি রোধ করে।” “মা আর ঘুমাইবেন না। বাহিরের কোন শক্তি আর তাঁহার অগ্রগতি রুদ্ধ করিতে পারিবেন না, প্রচণ্ড শক্তি লইয়া তিনি স্বীয় পদভরে উঠিয়া দাঁড়াইবেন।”

আমরা লক্ষ্য করেছি, সমগ্র যুবসমাজকে স্বামীজী আহ্বান করেছেন ভারতের পুনর্গঠনের জন্য। ভারত যে পুনরায় আধ্যাত্মিকতার শক্তিতে গঠিত হয়ে বিশ্বের সাম্য ও মৈত্রী বজায় রাখবে সে-বিষয়েও তিনি নিশ্চিত। এখন এই ভারত কি উপায়ে গঠিত হবে—তার পথনির্দেশ তিনি দিয়ে গেছেন তাঁর রচনা, বাণী ও উপদেশের মাধ্যমে। সেগুলি সংকলিত হয়ে ‘স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা’ নামে দশখণ্ডে উদ্বোধন কার্যালয় এবং **‘The Complete Works of Swami Vivekanada’** নামে ইংরেজীতে আটখণ্ডে অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থাবলীর মধ্যে বর্তমান ভারতের সমস্যা-সমাধানের সূত্র নির্দেশিত আছে।

ভারত বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ভারতের কয়েকটি মৌলিক সমস্যা-সমাধানের উপাদান স্বামীজীর গ্রন্থাবলী থেকে সংগ্রহ করেছেন। সেগুলি তিনি উদ্বোধন পত্রিকায় (৬৫তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা) ‘স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ’ প্রবন্ধে উল্লেখ করে লিখেছিলেন। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি কিভাবে স্বামীজীর গ্রন্থাবলী থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন তা উৎসাহী যুবকদের উপাদান সংগ্রহের সহায়ক হবে বলে আমরা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

ডঃ মজুমদার লিখছেন:

স্বামীজীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে বর্তমান নানা সমস্যার সমাধানের কথা বলা আছে। অতএব স্বামীজীর গ্রন্থাবলী যদি আমরা ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে অনুধ্যান করি, তাহলে আমাদের দেশ ও সমাজের নানা সমস্যার পথনির্দেশ করবে—তা যত বড় সমস্যাই হোক না কেন। “নিজের অভিজ্ঞতা হইতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে ব্যক্তিগত জীবনে অথবা দেশে ও সমাজে যে-কোন সঙ্কটের অথবা সমস্যার সম্মুখীন হই না কেন, তাঁহার বাণীর মধ্যেই সেই সঙ্কট হইতে মুক্তির পথ ও সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাইব।…তাঁহার নির্দেশিত পথে চলিলে আমরা সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব।”

স্বামীজীর উপদেশ ও বাণী অসংখ্য হলেও সবগুলিতেই মূল সুর এক—কয়েকটি শাশ্বত সত্য। ভারত-ঋষিদের কণ্ঠেই প্রথম এই সত্যগুলি উদ্গীত হয়েছিল। কালক্রমে যা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল স্বামীজী তা-ই আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীর তথা জগদ্বাসীর কর্ণে শুনিয়েছিলেন। শাশ্বত এই সত্যগুলিকে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

এই সত্যগুলির প্রথমটি হল—আধ্যাত্মিকতা। এর অর্থ ‘আমি’ বলতে এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ নয়, এই দেহের অভ্যন্তরে যে অজর; অমর আত্মা আছেন তাকেই লক্ষ্য করা হয়। দেহের ক্ষয় বিনাশ আছে, কিন্তু আত্মার নেই।

দ্বিতীয় সত্যটি হল—‘আমি’ এই আত্মা, সেই পরমাত্মার অংশ। আমরা অমৃতের পুত্র। সুতরাং সকল জীব ভগবানের অংশ—সকল জীবেই ভগবান আছেন।

তৃতীয় সত্যটি হল—উপরি-উক্ত সত্য শুধু শুনলেই আমাদের হবে না, তা

করতে হবে এবং জীবনের প্রতি মুহূর্তে প্রতি কার্যে ঐ উপলব্ধির দ্বারা যেন আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়।

চতুর্থ সত্যটি হল—এই উপলব্ধির জন্য চাই ত্যাগ। ত্যাগ মানে শুধুমাত্র নেতিবাচক বর্জন নয়। তা হবে ক্ষণস্থায়ী দৈহিক সুখ বর্জন করে উচ্চতর আনন্দলাভের চেষ্টা। এই উচ্চতর আনন্দের সন্ধান পেলে অনিত্য দেহসুখ আর ভাল লাগবে না।

উপরি-উক্ত চারটি সত্যের উপর আমাদের জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠিত। তবে জীবনের নানা ক্ষেত্রে, নানা অবস্থায় এর প্রয়োগের বিভিন্ন পন্থার কথা স্বামীজীর গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ আছে।

পাশ্চাত্যের জড়শক্তি অপেক্ষা যে আধ্যাত্মিক শক্তি অনেক শ্রেষ্ঠ তা স্বামীজী আমাদের বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আর এই আধ্যাত্মিক শক্তির উপরই ভারত আবার দাঁড়াবে। ভারত যদি আধ্যাত্মিকতার উপর দাঁড়াতে পারে তবেই জগতে ধর্মের উন্নতি সম্ভব।

স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই,পদদলিত আপামর ভারতবাসীর উন্নতির জন্য এত তাঁর হৃদয়ের আকুতি। এ-দেশ কোটি কোটি দরিদ্র অবহেলিত ঘৃণিত অপমানিত নিরন্ন অধিবাসীকে নিয়ে ভারত। এদের উন্নতির জন্য আমাদের সবরকম চেষ্টা করা প্রয়োজন। শাশ্বত সত্য অনুযায়ী এরা আমাদের ভাই। তাই স্বামীজী এই দরিদ্রনারায়ণের পূজার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করেছেন। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' বাণীর উপর স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম প্রতিষ্ঠিত।

বিভিন্ন ভাষা ধর্মসম্প্রদায় প্রাদেশিকতার মনোভাবের জন্য আমাদের জাতীয় ঐক্য সম্ভব হচ্ছে না। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের নেতাগণ জাতীয় ঐক্যের জন্য পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। পরধর্মসহিষ্ণুতা এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের উপরই একমাত্র জাতি সুসংগঠিত হতে পারে,নচেৎ নয়। হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান-শিখ প্রভৃতি ধর্মমত বা সম্প্রদায় হিসাবে তাঁরা যাই হন না কেন এই পরধর্মসহিষ্ণুতা ও আধ্যাত্মিকতার উপর দাঁড়িয়ে ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করতে কারও আপত্তি হতে পারে না। তাঁদের সমবায়েই এ জাতি আবার গঠিত হবে—এটাই স্বামীজীর মত। আর এ-ছাড়া কোন পথও নেই।

এই আধ্যাত্মিকতার উপর ভর করে যদি আবার আমাদের জাতি ওঠে, তবেই বিশ্বমানবের সঙ্কটমুক্তির পথনির্দেশ করতে পারবে, অন্যথায় নয়। কারণ যদি আমরা আধ্যাত্মিকতার মহৎ ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারি তবে জগতে ঈর্ষা, দ্বন্দ্বের সংঘাত থামবে, তা না হলে বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্র জগৎ ধ্বংস করবেই। ভারত যদি আধ্যাত্মিকতার উপর জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠা করতে পারে তবেই ভারতের বাণী জগৎ শুনবে, তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হবে।

ডঃ মজুমদারের সত্যানুসন্ধানী ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বর্তমান ভারতের মৌলিক কয়েকটি সমস্যা-সমাধান কিভাবে হতে পারে তা আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করলাম।

বর্তমান বিশ্বের সঙ্কটাবস্থায় সাম্য ও মৈত্রীর পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য স্বামীজী তাই ভারতের পুনর্গঠনে যুবশক্তিকে চেয়েছেন। যুবার প্রাণবন্ত অসীম শক্তি ছাড়া ভারত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই তিনি সংগঠিত যুবশক্তির উপর নির্ভর করেছেন। তাদেরই উপর ভারত গড়ার দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। তিনি বলছেন : "এ-কাজ ভারতের যুবকগণের উপর নির্ভর করিতেছে।" "চরিত্রবান্, বুদ্ধিমান্, পরার্থে সর্বত্যাগী এবং আজ্ঞানুবর্তী যুবকগণের উপরই আমার ভবিষ্যৎ ভরসা—আমার idea (ভাব)গুলি যারা work out (কাজে পরিণত) ক'রে নিজেদের ও দেশের কল্যাণ-সাধনে জীবনপাত করতে পারবে।"

ক্যালসিয়াম ও স্বাস্থ্য

ডক্টর অমিয়কুমার ভট্টাচার্য

কলিকাতা 'স্কুল অব্ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে'র ডেপুটি ডিরেক্টর।

স্বাস্থ্যের জন্য কতকগুলি খনিজ লবণ দরকার। ক্যালসিয়াম সেগুলির মধ্যে একটি। বিজ্ঞাপন-দাতাদের প্রচারের জন্য ক্যালসিয়ামের কথা শোনেননি এমন সাধারণ লোক খুব কমই আছেন। কিন্তু বিজ্ঞাপন হতে যা জানা যায়, তা হয় আংশিক সত্য কিংবা অনেক সময়েই কিছুটা বিভ্রান্তিকর। যেমন ধরুন, শিশুদের হাড় ও দাঁত গঠনে ক্যালসিয়াম খুবই প্রয়োজন, কিন্তু এই ক্যালসিয়াম পাওয়ার জন্য কী ট্যাবলেট কিংবা কোন্ বিশেষ ধরনের পানীয় খেতে হবে অথবা এক সুষম খাদ্যই যথেষ্ট? ওষুধ হিসাবে অনেক দিন ধরে ক্যালসিয়াম ব্যবহার কি নিরাপদ?

ক্যালসিয়াম একটি পুষ্টি-উপাদান। বিজ্ঞান-সম্মত দৃষ্টিতে বিচার করলে আমাদের জানতে হবে শরীরে ক্যালসিয়ামের কাজ কী, কতটুকু ক্যালসিয়াম খাদ্যে থাকা প্রয়োজন, ক্যালসিয়াম শরীরে কিভাবে কাজে লাগে অথবা জমা থাকে এবং বেশি ক্যালসিয়াম খেলে শরীর হতে কিভাবে তা বেরিয়ে যায়। এবং সবশেষে ক্যালসিয়ামের অভাবে কী হয় অথবা বেশি ক্যালসিয়াম শরীরে জমলে কী অসুবিধা হতে পারে।

শরীরে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ: একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরের রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এর ৬২% হল জল। অবশিষ্ট অংশের প্রায় ১৭% প্রোটিন, ১৪% স্নেহ-জাতীয় পদার্থ, মাত্র ১·৫% শর্করা এবং শতকরা ৬ ভাগ হল খনিজ লবণ। এখন খনিজ লবণের সংখ্যা ১৭টি, তার মধ্যে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ অন্যগুলির চেয়ে অনেক বেশি।

শরীরে ক্যালসিয়ামের কাজ: ক্যালসিয়াম হাড় ও দাঁতের গঠনে বিশেষ প্রয়োজন। হাড়ের ওজনের শতকরা ৩৫ ভাগ খনিজ লবণ দিয়ে তৈরি, আর এর প্রায় সবটাই ক্যালসিয়াম ঘটিত লবণ, যাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে ক্যালসিয়াম ফসফেট। ক্যালসিয়াম ফসফেট থাকার দরুন হাড় একাধারে শক্ত অথচ নমনীয় হয়। হাড়ের এই গুণগুলি বিশেষ দরকার পড়ে শরীরের ওজন বইতে, চলাফেরায় এবং দেহযন্ত্রগুলির রক্ষায়। একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে প্রায় ১২০০ গ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে, যার শতকরা ৯৯ ভাগই আছে হাড়ে। অবশিষ্ট অংশ-টুকুও কিন্তু কম প্রয়োজনীয় নয়। সেই অংশ পরিমাণ ক্যালসিয়াম থাকে রক্ত, পেশী এবং আন্তঃকলা (tissue space) স্থানে। এই সমস্ত জায়গায় ক্যালসিয়াম অন্য কতকগুলি বিশেষ কাজে লাগে, যেমন—স্নায়ুতরঙ্গ প্রবাহ এবং পেশীর সঙ্কোচন। ক্যালসিয়ামের তৃতীয় একটি কাজ হল রক্ত জমাট বাঁধায় সাহায্য করা এবং এটি সম্ভব না হলে সামান্য কেটে গেলেও প্রচুর রক্তপাত হবার সম্ভাবনা থাকত। অবশ্য ক্যালসিয়ামের অভাবে রক্তক্ষরণ কদাচ দেখা যায়। সম্প্রতি ক্যাল-সিয়ামের আরেকটি উপকারিতা সম্বন্ধে জানা গেছে, সেটি হল ক্যালসিয়াম হৃৎপিণ্ডের করো-নারী অসুখের (coronary heart disease) সম্ভাবনা কমায়। দেখা গেছে, যে-সব অঞ্চলে পানীয় জলে ক্যালসিয়াম বেশি থাকে (কঠিন জল, hard water), সেখানে লোকের ঐ অসুখ কম হয়। অবশ্য এ-বিষয়ে অন্য মতও আছে। দেখা গেছে, কঠিন জলে ম্যাগনেসিয়ামও বেশি

থাকে এবং বোধহয় এই ম্যাগনেসিয়ামই উপকারী। অন্যভাবে বলা যায়, কঠিন জল হৃৎপিণ্ডের অসুখের প্রতিরোধে উপকারী। তার চেয়ে সত্য হল নরম জল (soft water) হৃৎপিণ্ডের পক্ষে অপকারী।

ক্যালসিয়ামের চাহিদা: ক্যালসিয়ামের চাহিদার তারতম্য হয় বয়স ও স্ত্রী-পুরুষ ভেদে। মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৬ বৎসর এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৮ বৎসর পর্যন্ত হাড় লম্বায় এবং পরিধিতে বাড়ে। পূর্ণবয়স্কের হাড় লম্বায় বাড়ে না, তবে হাড়ের মধ্যে ক্যালসিয়াম জমা হওয়া এবং অপসারণ সমপরিমাণে সারা জীবন ধরেই চলতে থাকে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে অপসারণ জমার চেয়ে বেশি হয়, যেমন বুড়ো বয়সে কিংবা অনেকদিন শয্যাশায়ী থাকলে। এই বেশি ক্যালসিয়াম অপসারণের ফলে হাড় ভঙ্গুর হয়ে যায়। একটি সাধারণ ঘটনা হল অনেক বৃদ্ধার পড়ে গেলে সামান্য আঘাতেই জানুর হাড় (neck of femur) ভেঙে যায়, সন্তানধারণের বয়সে, গর্ভাবস্থায় কিংবা স্তন্যদান সময়ে ক্যাল-সিয়ামের চাহিদা বেশ বেড়ে যায়। গর্ভাবস্থায় ভ্রূণ কিংবা স্তন্যপানরত শিশু মায়ের কাছ থেকেই তার ক্যালসিয়ামের চাহিদা মেটায়। একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বা স্ত্রীর রোজ ৪০০—৫০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন হয়। কিন্তু গর্ভাবস্থায় বিশেষ করে গর্ভাবস্থার দ্বিতীয়ার্ধে এবং স্তন্যদান সময়ে প্রায় ১০০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন পড়ে। ১২ বছর বয়স পর্যন্ত ক্যালসিয়ামের চাহিদা ৫০০ মিলিগ্রাম, কিন্তু কিশোর-কিশোরীদের প্রয়োজন ৭০০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত

ক্যালসিয়ামের উৎস: আমরা খাদ্য হতে ক্যালসিয়াম পাই। পানীয় জল, বিশেষ করে কঠিন জল একটি উল্লেখযোগ্য উৎস। অবশ্যই সব ক্যালসিয়ামের মূল উৎস হল মাটি, যার মধ্যে সমুদ্রের তলদেশও ধরতে হবে। সমস্ত স্বাভাবিক খাদ্যেই তা সে প্রাণীজ বা উদ্ভিজ্জ যাই হোক না কেন ক্যালসিয়াম থাকে। কিন্তু পরিস্রুত (refined) চিনি, তেল, ঘি, মাখন এবং কিছু কিছু কৃত্রিম মিশ্রিত খাবার ও পানীয় প্রভৃতিতে মোটেই থাকে না। গুড়ে কিন্তু ক্যালসিয়াম থাকে। ক্যালসিয়ামের সবচেয়ে ভাল উৎস হল গোরুর দুধ। এই দুধে প্রতি লিটারে ১২০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে, কাজেই রোজ ৪০০ থেকে ৬০০ মিলিলিটার দুধ খেলে গর্ভবতী বা স্তন্যদায়িনী মায়েদের ছাড়া সকলেরই ক্যালসিয়ামের চাহিদা মিটে যায়। ঐ মায়েদের ক্ষেত্রে আরও ২৫০ মিলিলিটার দুধ প্রয়োজন। উল্লেখ করা যেতে পারে, ১০০ গ্রাম মহিষের দুধে, ২১০ মিলিগ্রাম ছাগলের দুধে, ১৭০ মিলি-গ্রাম ঐ স্তন্যদুগ্ধে মাত্র ২৮ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে। প্রতি ১০০ গ্রাম দই-এ ক্যালসিয়ামের পরিমাণ ১৪৯ মিলিগ্রাম, ঘোলে ৩০ মিলিগ্রাম, গোরুর দুধের ছানায় ২০৮ মিলিগ্রাম, মহিষের দুধের ছানায় ৪৮০ মিলিগ্রাম এবং চীজ-এ ৭৯০ মিলিগ্রাম।

ছোটছোট মাছ, যেগুলি কাঁটা সমেত চিবিয়ে খাওয়া যায়, সেগুলিতে বেশি ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। ডালও একটি ভাল উৎস। ছোলা, মুগ, অড়হড়, বরবটী, সয়াবীন প্রভৃতিতে প্রতি ১০০ গ্রামে প্রায় ২৫০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত ক্যালসিয়াম থাকতে পারে। সবুজ শাকে প্রচুর ক্যালসিয়াম আছে, কিন্তু সবটুকু বিশোষিত (absorption) হয় না। তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যের মধ্যে ১০০ গ্রাম গমে থাকে ৪০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম। ঐ পরিমাণ চালে পাওয়া যায় মাত্র ১০ মিলিগ্রাম। অন্যান্য তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যে ১০০ গ্রামে ২০ থেকে ৪০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে, তবে

রাগি (ragee)-তে থাকে খুব বেশি পরিমাণে ৩৪৪ মিলিগ্রাম।

যেহেতু দুধ এবং দুগ্ধজাত খাদ্য আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের অনেক সময় নাগালের বাইরে, সেইহেতু খাদ্যেই ক্যালসিয়ামের সবচেয়ে ভাল উৎস হল ডাল ও শুঁটি জাতীয় জিনিস। সবুজ শাকপাতাও উল্লেখযোগ্য।

রান্নার সময় কিছু পরিমাণে ক্যালসিয়াম বেরিয়ে যেতে পারে, এটা নির্ভর করে কিছুটা খাদ্যের উপরে (সব খাবার থেকে সমানভাবে বেরিয়ে যায় না) এবং কিছুটা রান্নার প্রণালীর উপরে। বিশেষ করে যদি সেদ্ধ করে জল ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে অনেক খাদ্য হতে ক্যালসিয়াম চলে যায়। উদাহরণ হিসাবে, পালং শাক হতে শতকরা ২৫ ভাগ ক্যালসিয়াম নষ্ট হয়—খোলা পাত্রে এবং খুব কম জল দিয়ে রান্না করলে। অল্প জলে রান্না করলে শতকরা ২০ ভাগ নষ্ট হয়, আর একেবারে জল না দিয়ে রান্না করলে শতকরা ১০ ভাগ নষ্ট হয়। প্রেসার কুকারে রান্না করলে শতকরা ১৫ ভাগ নষ্ট হয়।

শরীরে ক্যালসিয়ামের ব্যবহার : ক্যালসিয়াম প্রধানতঃ ক্ষুদ্রান্ত্রের উপরিভাগ হতে বিশোষিত হয়। কিন্তু আমাদের ক্যালসিয়াম বিশোষণ ক্ষমতা খুব ভাল নয়। মোটামুটিভাবে খাদ্যের ক্যালসিয়ামের শতকরা ২০ হতে ৩০ ভাগ বিশোষিত হয়। কতকগুলি কারণের উপর ক্যালসিয়ামের বিশোষণ (absorption) নির্ভর করে। খাদ্যের প্রোটিন, দুধের চিনি ল্যাকটোজ, পিত্ত এবং ফসফরাসের কিছু পরিমাণে (যেমন যে পরিমাণ দুধে থাকে) উপস্থিতি ক্যালসিয়াম বিশোষণে সাহায্য করে। অবশ্য ক্যালসিয়াম বিশোষণে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ভিটামিন 'ডি'-র সাহায্য। ক্যালসিয়াম অন্ত্রের কোষে প্রবেশ করে একটি প্রোটিনের সাহায্যে। এই প্রোটিন প্রস্তুত করতে সাহায্য করে ভিটামিন 'ডি'। অপরপক্ষে ক্যালসিয়াম বিশোষণে বাধার সৃষ্টি করে এমন কতকগুলি কারণও আছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ফাইটিক অ্যাসিড। ফাইটিক অ্যাসিড তণ্ডুল জাতীয় শস্যকণার বাইরের দিকের আবরণে থাকে এবং ক্যালসিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশোষণে বাধার সৃষ্টি করে। এ কারণে আটার ক্যালসিয়াম ময়দার ক্যালসিয়াম অপেক্ষা কম বিশোষিত হয়। যদি আটার সঙ্গে কিছুটা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট মিশিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেটা ফাইটিক অ্যাসিডের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায় এবং অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে ক্যালসিয়াম বিশোষিত হতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় খাদ্যের অপচয় রোধে ব্রিটেনে রুটি তৈরিতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। ফাইটিক অ্যাসিড ক্যালসিয়াম বিশোষণে বাধার সৃষ্টি করে, কিন্তু অনেক তণ্ডুল জাতীয় শস্যে ফাইটেজ বলে একটি এনজাইম থাকে। এই ফাইটেজ ফাইটিক অ্যাসিডকে ভেঙে দেয় এবং তখন সেটা আর ক্যালসিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়, পাউরুটি তৈরির সময় এই এনজাইম কাজ করে। ক্যালসিয়াম বিশোষণে বাধা সৃষ্টির আরেকটি কারণ হল অকজালিক অ্যাসিডের উপস্থিতি। অনেক সবজীতে অল্প পরিমাণে অকজালিক অ্যাসিড থাকে। পালং শাকে থাকে একটু বেশি পরিমাণে।

স্নেহজাতীয় খাদ্য যদি ঠিকমত হজম না হয় তাহলেও ক্যালসিয়াম বিশোষণে বাধার সৃষ্টি করে।

আগেই বলা হয়েছে, খাদ্যের শতকরা ৭০ ভাগ ক্যালসিয়াম মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। অন্য দুটি পথেও ক্যালসিয়াম শরীর হতে বেরিয়ে যেতে পারে। এ দুটি হল মূত্র ও ঘাম। যখন খাদ্যে

ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কম থাকে, তখন দিন-রাত্রে মাত্র ২০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম মূত্রের সঙ্গে বের হয়। খাদ্যে ক্যালসিয়াম বেশি থাকলে মূত্রে ক্যালসিয়ামের পরিমাণও বাড়ে। ঘামের সঙ্গে ক্যালসিয়াম নির্গত হয়, গরম এবং ভ্যাপসা আবহাওয়ায় রোজ ১০০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত। একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষের ক্যালসিয়ামের গ্রহণ ও বর্জন সমপরিমাণে হওয়া দরকার

ক্যালসিয়ামজনিত অপুষ্টি : ক্যালসিয়ামের অভাবে হাড় নরম এবং বিকৃত হয়ে যায়। এই রোগকে বড়দের ক্ষেত্রে অসটিওম্যালেসিয়া (osteomalacia) ও শিশুদের ক্ষেত্রে রিকেটস্ (rickets) বলে। রিকেটস্ রোগে হাড় ঠিক-মত বাড়ে না এবং যেটুকু হাড়ের গঠন হয়, তা হয় অসমান। যেহেতু ক্যালসিয়াম পেশীর সংকোচনে কাজে লাগে, সেজন্য ক্যালসিয়ামের অপুষ্টিতে পেশীতে টান ধরে। গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদান-কালে ক্যালসিয়ামের অভাব হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ভ্রূণ তার চাহিদা মায়ের কাছ হতে নিয়ে নেয়ই, ফলে মায়ের হাড় হতে ক্যালসিয়াম ক্ষয় হয় এবং হাড় নরম হয়ে যায়। একে অসটিও-ম্যালেসিয়া (osteomalacia) রোগ বলে। বিশেষ করে কোমরের হাড় নরম হয় এবং বেঁকে যায়। যার ফলে প্রসব বিঘ্নিত হয়। অসটিও-ম্যালেসিয়া হলে পেশীর দুর্বলতা খুব বেশি হয় এবং শরীরে ও হাড়ে খুব ব্যথা অনুভূত হয়। সূর্যালোক দ্বারা ভিটামিন 'ডি' আমাদের চামড়ায় তৈরি হতে পারে। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে সূর্যালোকের অভাবে বস্তি অথবা ঘিঞ্জি শহরাঞ্চলে ভিটামিন 'ডি'-র অভাব দেখা যায়। খাদ্যে বেশি পরিমাণ ফাইটেট থাকার দরুন এবং কৃমি রোগও সচরাচর দেখা যায় বলে শিশুদের রিকেটস্ রোগ খুব কম একটা হয় না। সমীক্ষায় দেখা গেছে ৫ বছর বয়সের নিচের শিশুদের শতকরা ২ জন যে কোন সময়ে রিকেটস্-এ ভোগে।

ক্যালসিয়ামের আধিক্য : ক্যালসিয়াম বেশি খাওয়া ক্ষতিকর। মনে হতে পারে, শিশুদের বেশি ক্যালসিয়াম দিলে হাড় বেশি শক্ত হবে, কিন্তু এটা ঠিক নয়। ঠিক যেটুকু চাহিদা সেই-টুকুই দেওয়া উচিত। তাছাড়া সাধারণ দৌর্বল্যে কিংবা ঘনঘন সর্দিকাশিতে ভোগা—এ-সবের ওষুধ ক্যালসিয়াম নয়। শিশুদের যদি বেশি পরিমাণে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন 'ডি' (মায়েরা প্রায়ই ভিটামিন ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করেন) দেওয়া হয় তাহলে শরীরের অনেক জায়গায় ক্যালসিয়াম জমে সাংঘাতিক অসুখের সৃষ্টি করে। যাঁরা অম্লরোগে ভোগেন, তাঁরা সাধারণতঃ এর প্রতিকারের জন্য বড়ি (অ্যাণ্টাসিড) খান। কিছু কিছু এই ধরনের বড়ি ক্যালসিয়াম বিশোষণে সাহায্য করে। এই সঙ্গে বেশি পরিমাণে দুধ খেলে অম্ল উপশম হয়, কিন্তু রক্তে ক্যালসিয়াম বেড়ে যায় এবং শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রে ক্যালসিয়াম জমতে থাকে। এই অবস্থাকে মিল্ক-অ্যালকালি সিনড্রোম (milk-alkali syndrome) বলা হয়। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, ক্যালসিয়াম একটি অতি প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ। কিন্তু নির্বিচারে খেলে বা ব্যবহার করলে শরীরের ক্ষতি করতে পারে।

দেশের প্রতি ও বিশ্বের প্রতি ভারতের বাণী

স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রবীণ বিদগ্ধ সন্ন্যাসী—'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী' তথা উদ্বোধন কার্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব্ কালচারের সংস্থাপক ও প্রাক্তন সচিব। লেখকের 'India's message to herself and to the world' পুস্তিকার বঙ্গানুবাদ করেছেন শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার।

ভারতের আধ্যাত্মিক অবদানই 'মানবমুক্তির একমাত্র পথ'

পৃথিবীর বহুশতাব্দব্যাপী ইতিহাসে ভারতের অবদানই মানব-সভ্যতার বিকাশকে সুসমৃদ্ধ করে আসছে। যে-অন্তর্দৃষ্টি ভারতীয় ধ্যান-ধারণার প্রধান বৈশিষ্ট্য,আজকের বিশ্বে তারই প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভূত। আধ্যাত্মিক অন্তর্মুখিতা, মানব-সত্তার অভিন্নত্ব এবং বিভিন্ন ভাবধারার আভ্যন্তর ঐক্য, যা একান্তভাবে ভারতীয় জীবনের মূল সুর,—একমাত্র তা দিয়েই রচিত হতে পারে এমন এক দৃঢ়ভিত্তি, যার ওপর একটি স্থায়ী জাতিসঙ্ঘকে গড়ে তোলা সম্ভব।

আরনল্ড্ টয়েনবি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে, বিশ্বের অস্তিত্বের জন্যই আজ বিশ্বকে ভারতীয় আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রয়োজনীয়তা ও মূল্যকে স্বীকার করে নিতে হবে। স্বামী ঘনানন্দের ইংরেজীতে রচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর অনন্ত বাণী' (১৯৭০)[১] গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় টয়েনবি লিখেছেন—'তিনি [শ্রীরামকৃষ্ণ] এমন এক বিশ্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে, তাঁর জীবৎকালের সীমার মধ্যেই সেই বিশ্ব আক্ষরিক অর্থে নিখিল বিশ্বে রূপান্তরিত হচ্ছিল। আজও আমরা বিশ্ব-ইতিহাসের সেই ক্রান্তি লগ্নের অধ্যায়ে রয়েছি। এখন একথা স্পষ্ট হচ্ছে যে, যে-অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল পাশ্চাত্যের সঙ্গে সংযোগ দিয়ে, তার সমাপন ঘটাতে হবে ভারতীয় জীবন-সাধনার আদর্শে, যদি না ইতিমধ্যে মানব-সভ্যতা আত্মবিধ্বংসী পথ বেছে নেয়। বর্তমান যুগে সমগ্র বিশ্ব পাশ্চাত্য প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে ভৌতিক স্তরে ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু এই প্রতীচীয় বিশেষজ্ঞতা একদিকে যেমন দূরত্বের অবসান ঘটিয়েছে, তেমনি বিশ্বের হাতে তুলে দিয়েছে ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র—এমন এক সময়ে, যখন বিশ্ববাসী মানুষ পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, অথচ এখনও পরস্পরকে জানার ও ভালবাসার সুযোগ পায়নি। মানব-ইতিহাসের এই চরম সঙ্কটময় মুহূর্তে মানবমুক্তির একমাত্র উপায় হল ভারতীয় পন্থা। সম্রাট অশোক ও মহাত্মা গান্ধীর অহিংসার নীতি ও শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়ের জীবন্ত সাক্ষ্য : এর মধ্যেই এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গী ও অধ্যাত্মভাব রয়েছে যা বিশ্বজনকে একটি পরিবারে সঙ্ঘবদ্ধ ও সম্মিলিত করতে পারে—আণবিক যুগে আত্ম-বিনাশের এই একমাত্র বিকল্প।

'বর্তমান আণবিক যুগে, প্রয়োজনের তাগিদেই এই ভারতীয় পন্থা সমগ্র মানবজাতির পক্ষে গ্রহণীয়। অন্য কোন প্রয়োজনের তাগাদা এর চেয়ে জোরদার বা শ্রদ্ধার্হ হতে পারে না। মানবজাতির অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। তবু সবচেয়ে জোরদার এবং সবচেয়ে শ্রদ্ধার্হ প্রয়োজনের তাগাদাও রামকৃষ্ণ, গান্ধী ও অশোকের শিক্ষাকে হৃদয়ে গ্রহণ করা এবং সেইমতো কাজ করার পক্ষে গৌণ কারণমাত্র। মুখ্য কারণ হল এই যে, এই শিক্ষা যথার্থ এবং তা যথার্থ যেহেতু আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সত্য উপলব্ধি থেকে এ উদ্ভূত।'

---

১ **Sri Ramakrishna and His Unique Message (1970)—By Swami Ghanananda**

আধ্যাত্মিক ঐক্যের বোধ ভারতের প্রাণশক্তি এবং তার জীবনধারার মূলসূত্র

বিশ্ববাসীর কাছে ভারতের চিরন্তন অবদান হল আধ্যাত্মিক ঐক্যের বাণী। মানুষের আধ্যাত্মিক স্বরূপ এবং মানবজাতির ও মানব-সভ্যতার আধ্যাত্মিক ঐক্য ও সংহতির বোধ, উপলব্ধি ও জীবনে প্রয়োগের ওপর এই বাণী প্রতিষ্ঠিত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতের এই আধ্যাত্মিক জীবনাদর্শের যে ঐতিহাসিক বিবর্তন চলেছে তার মধ্যেই এই বাণীর যথার্থতা সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়।

প্রত্যেক জাতির একটা বৈশিষ্ট্য আছে যাকে বলা যায় এর প্রাণশক্তি, এর বিশিষ্ট স্বভাব। এই প্রাণশক্তিই হল এর জীবন-মরণের জাদুকাঠি। যতদিন এই জাদুকাঠি অবিকৃত থাকে ততদিন জাতি তার জীবনীশক্তি অব্যাহত রাখতে পারে এবং উত্তরোত্তর শক্তিসঞ্চয় করতে পারে। যে মুহূর্তে এই প্রাণশক্তি নষ্ট হয়, সেই মুহূর্তে জাতিরও বিনাশ ঘটে থাকে।

রোমক-সভ্যতার জাদুকাঠি ছিল তার রাজ-শক্তি; সেইজন্যই রোম-সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে রোমক-সভ্যতারও পতন ঘটল। পৃথিবীর কত রাজ্য গ্রাস করার জন্য কত নরবলি দেওয়া হয়েছে—সেই কাহিনীতেই রোম, মিশর ও আসিরিয়ার ইতিহাস পূর্ণ। ক্ষমতা ও ধনের প্রতি লালসার ফলে সমাজে যে, অসাধুতা ও দুর্দশার উদ্ভব হয় তার ভারে এই সভ্যতাগুলি অবলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তার জীবনধারা চিরকালই আধ্যাত্মিক এবং সেটা দুন্দুভিনিনাদ, রণবাদ্য বা সৈন্যবাহিনীর অভিযানের দ্বারা কখনও সম্পন্ন করা যায় না। ভারতের প্রভাব স্বভাবত বিনম্র। এই প্রভাব পৃথিবীতে সকলের অলক্ষ্যে নিঃশব্দ সুকোমল শিশিরপাতের ন্যায় সঞ্চারিত হয়েছে। এই প্রভাব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে সকলে অবহিত না হলেও এর ফলে পৃথিবীর সুন্দরতম কুসুমগুলি ফুটে উঠেছে। এইভাবে ভারত যুগে যুগে একটি আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা পালন করেছে; মানুষের আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবন এবং জগতের প্রকৃত সভ্যতার অভ্যুদয়ের প্রতি ভারতের প্রচেষ্টা চির উৎসর্গীকৃত।

ভারতীয় জীবনের জাদুকাঠি হল ধর্ম। ধর্ম হচ্ছে আসলে মানুষের স্বরূপের বিকাশ; এই স্বরূপ হল শুদ্ধ চৈতন্য, মানবসত্তার অন্তর্নিহিত বিশ্বচৈতন্য এই বিশ্বচৈতন্যই প্রকৃত মানবাত্মা, মানবের অন্তর্নিহিত সত্তা। কাজে কাজেই বাহ্য প্রকৃতির সকল জীবনই যেমন অন্তর্নিহিত সুপ্ত সত্তার অভিব্যক্তি তেমনি এই বিশ্বচৈতন্য বিভিন্ন মানব ও জাতির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় বহুধা আচার-আচরণ ও জীবনচর্যার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে থাকে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, মানবসমাজে মানবসমাজে, জাতিতে জাতিতে যে বিভেদ দেখা যায় তা স্বরূপগত নয়,—শুধু প্রকাশের বিচিত্রতা মাত্র। সকল মানবের আত্মা এক, অখণ্ড;—সকল প্রকাশবৈচিত্র্যের অধিষ্ঠানসত্তা।

মানবের অন্তর্নিহিত এই বিশ্বচৈতন্য ভারতাত্মার মৌল সত্তা। ভারত যে আজও বেঁচে আছে তার কারণ সে কখনও এই আধ্যাত্মিক ঐক্য-চেতনার ভিত্তিভূমি থেকে বিচ্যুত হয়নি। এইজন্যই পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতা যদিও অবলুপ্ত হয়েছে, তবু ভারত পুনঃপুনঃ বিদেশী শত্রুর আক্রমণ সত্ত্বেও পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। এইজন্যই যখনই ধর্মের মৌল সত্য, যা ভারতের প্রাণশক্তি, খর্ব ও বিকৃত হয়েছে, তখনই জাতীয় জীবনে বিপর্যয় এসেছে এবং এর ফলে জাতি ধ্বংসের মুখে এগিয়ে গেছে। অন্যদিকে, সত্যিকার ধর্মের পুনরুজ্জীবনের

সঙ্গে সঙ্গে ভারত আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এবং সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অন্যান্য জাতির ইতিহাস যে পদ্ধতির সাহায্যে পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে তা থেকে ভারতের ইতিহাস আলোচনার পদ্ধতি স্বতন্ত্র হতে বাধ্য। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে উত্থান-পতনের বন্ধুর পথ দিয়ে জাতীয় জীবনের রথের চক্র চলেছে, রাজনীতিক ইতিহাসের সুপরিচিত কার্যকারণ সম্পর্কের দিক থেকে তা বিচার না করে ধর্মের উত্থান ও পতনের দিক থেকেই তার ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ভারতের ইতিহাসের মূল্যায়ন করতে হলে ধর্মের উত্থান ও পতনের সঙ্গে জাতীয় জীবনের উত্থান ও পতনকে কার্যকারণ সম্পর্কে চিহ্নিত করতে হবে।

কাজে কাজেই, আজ ভারতকে খুব গভীরভাবে তার জাতীয় সমস্যাগুলি বিচার করতে হবে এবং এই কাজ করতে হবে অতীত ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে, ইতিহাসের শিক্ষাকে অন্তরে গ্রহণ করে এবং সেই অনুসারে কাজ করে। আজ ভারতের পক্ষে তার আধ্যাত্মিক ঐক্য, যা জাতির বিশিষ্ট প্রাণশক্তি, তার পুনরুদ্ধার করা খুব জরুরী হয়ে পড়েছে; এই পুনরুদ্ধারের দ্বারাই ভারত তার প্রকৃত আত্মাকে রক্ষা করতে এবং জাতিকে ভাবী ধ্বংসের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, একমাত্র আধ্যাত্মিক ঐক্যের বোধই ভারতবর্ষকে স্বদেশে সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে এবং তার জীবনব্যাপী সাধনার পথে এগিয়ে যেতে—অর্থাৎ মানবজাতির আধ্যাত্মিক উজ্জীবন ঘটাতে সমর্থ করবে।

ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শ সম্পর্কে অচেতনতাই ভারতের জাতীয় ব্যাধির উৎস

স্বদেশের মানুষকে ও সেই সঙ্গে বিশ্ববাসীকে আধ্যাত্মিক সত্যস্বরূপের সন্ধান দেওয়া বর্তমানে ভারতেরই দায়িত্ব। তবু এই বিশেষ দায়িত্ববোধ সম্পর্কে এবং বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে সেই দায়িত্ব পূরণের ভূমিকা পালন বিষয়ে ভারত সম্পূর্ণ উদাসীন ও নির্বিকার। ভারতের এই ভূমিকা পালন বিষয়ে ঔদাসীন্যের কারণ হল তার আধ্যাত্মিক আদর্শ দীর্ঘকাল সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত এবং এই আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রয়োগের অভাবেই তার জাতীয় দেহেও আজ নানা কঠিন ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। তাই এখন ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শের আশু পুনরুজ্জীবন ও পুনর্নিবেশ এবং ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার প্রত্যক্ষ ব্যবহার অনিবার্যভাবে জরুরী হয়ে পড়েছে। এই আধ্যাত্মিক আদর্শই ভারতকে যথার্থ সংহতি দিতে পারে, জাতীয় ব্যাধি থেকে তাকে মুক্ত করতে পারে, খণ্ডছিন্নতা ও ধ্বংসাত্মকতা এবং সকলপ্রকার সমস্যানিরসন ব্যাপারে নানা লক্ষ্যহীন প্রচেষ্টা থেকে উদ্ধার করতে পারে এবং জাতীয় ভিত্তিতে প্রতি ক্ষেত্রে তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করতে পারে। ভারতে নানা ক্ষেত্রে আজ যে বিবিধ সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে, সেগুলির নিরসনে এই মৌল কর্তব্য আজ অত্যন্ত অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

আধ্যাত্মিক ঐক্যের অচেতনতাই সাম্প্রদায়িকতার উৎস

ভারতের আধ্যাত্মিক ঐক্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিস্মৃতি ও অচেতনতার অন্যতম মারাত্মক ফল হল সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িকতা এবং অন্যান্য যে-সব মতবাদ মানুষে মানুষে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, জাতিতে জাতিতে, ধর্মমতে ধর্মমতে এবং ধর্মে ধর্মে বিরোধ-বিচ্ছিন্নতা ঘটায়, তার সূচনা হয় আধ্যাত্মিক ঐক্য ও নিখিল মানবসংহতির অজ্ঞানতা বোধ থেকে। তারই জন্য দেখা দেয়

আদর্শভ্রষ্টতা; এবং ফলে ক্রমাগত বিশৃঙ্খলা, হিংসা, সংঘাত, উদ্বেগ, ঐক্যনাশক আত্মঘাতী প্রবণতাগুলির প্রকাশ ঘটে। এর সঙ্গে ক্রমাগত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের উদ্ভব হয়—যা এখন ভারতের জাতীয় জীবনে মাঝে মাঝেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। ভারতের জাতীয় ব্যাধি-স্বরূপ আদর্শভ্রষ্টতা ও নীতিহীনতার এইসব বাহ্যিক প্রকাশ মূলত ভারতের আধ্যাত্মিক ঐক্য সম্পর্কে ঔদাসীন্যেরই ফল। সাম্প্রদায়িকতার বিষকীট আজ ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক জীবকোষে প্রবেশ করে তার জীবনীশক্তি নিঃশেষ করে দিচ্ছে—এটাই আজ ভারতের সবচেয়ে বড় জাতীয় ব্যাধি। আগেই বলা হয়েছে, আধ্যাত্মিক ঐক্যের মধ্যে যে শাশ্বত সত্য নিহিত সে-বিষয়ে সচেতনতা, তার স্বীকৃতি ও তার আত্মীকরণের মধ্যেই ভারতের যাবতীয় সমস্যা, জটিলতা ও ব্যাধির নিরসন ও নিরাময়ের উপায় নিহিত। সকল বিচ্যুতি ও তার বহিঃপ্রকাশ সেদিনই জাতীয় দেহ থেকে দূরীভূত হবে যেদিন আধ্যাত্মিক ঐক্য, যা ভারতের প্রাণশক্তি, জাগ্রত হবে এবং যেদিন উপযুক্ত শিক্ষার সাহায্যে এবং জাতীয় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতি সমাজ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত প্রতিষ্ঠিত করে ভারতের জাতীয় জীবনের সকল দিকে এই আধ্যাত্মিক প্রাণশক্তিকে সঞ্চারিত করা যাবে। অতএব যা প্রথমেই প্রয়োজন তা হল ভারতের আধ্যাত্মিক ঐক্যের সূচক যে বিশিষ্ট প্রাণশক্তি, তাকে উদ্বুদ্ধ করা; এই আধ্যাত্মিক ঐক্যই ধর্ম নামে অভিহিত।

ধর্ম কি?

প্রকৃত অর্থে, যে-বিদ্যায় মানুষের স্বরূপের জ্ঞান লাভ হয় তাই ধর্ম। ধর্ম হল মানুষের প্রকৃত স্বরূপের বোধ, উপলব্ধি ও প্রকাশ। শুদ্ধ চৈতন্য, শুদ্ধ সত্তা, শুদ্ধ আনন্দই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। এই স্বরূপ তার দিব্য সত্তা, যা সর্বজনীন। অতএব প্রত্যেক জীবের আত্মা সেই একই স্বয়ম্প্রভ সর্বব্যাপী চৈতন্য, অজ্ঞান-মেঘের দ্বারা আবৃত সূর্য। এক জীবের সঙ্গে অন্য জীবের পার্থক্য শুধু অজ্ঞান-মেঘের বিভিন্ন স্তরের ঘনত্বের দরুন। এই পার্থক্য প্রকৃতিগত নয়, পরিমাণগত; বিকাশ ও অগ্রগতির বিভিন্ন স্তরের মধ্যে এই তারতম্যের প্রকাশ। এই চিরন্তন সত্যই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, সকল ধর্মের ভিত্তি-রূপে বিদ্যমান; মানবজাতির ভৌতিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক যে-কোন স্তরের প্রগতির সমগ্র অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা এই চিরন্তন সত্যের মধ্যেই পাওয়া যায়;—একই বিশ্বচৈতন্য বিভিন্ন স্তরে আত্মপ্রকাশ করছে। অতএব ধর্ম হচ্ছে মানব-জাতির ও মানব-সভ্যতার আধ্যাত্মিক ঐক্য ও সংহতির উপলব্ধি।

ধর্ম এক; এর প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন

আগেই বলা হয়েছে, মানুষের প্রকৃত স্বরূপ, যা আসলে দিব্য সত্তা, মানুষের অন্তর্নিহিত বিশ্ব-চৈতন্য, তার বোধ, উপলব্ধি ও প্রকাশই হচ্ছে ধর্ম। এই বিশ্বচৈতন্য অনন্ত দিকে, অনন্ত রূপে, অনন্ত ভাবে, অনন্ত মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে। আসলে তত্ত্বের দিক থেকে ধর্ম এক, অথচ রূপ ও প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে বহু। একই বহুরূপী যেমন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে, কখন লাল, কখন সবুজ, কখন হলদে, কখন নীল, আরও সব কত কি হয়, আবার কখন কোন রঙই নেই, তেমনি এক বিশ্বচৈতন্য এবং তার বহু দিক আসলে একই সত্তা। মানুষের মন এই সত্তাকে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে, বিভিন্ন দৃষ্টি-ভঙ্গী দিয়ে উপলব্ধি করে থাকে। সুতরাং একটি বিশেষরূপ, মাধ্যম বা প্রকারের দ্বারাই কেবল আত্মোপলব্ধি ঘটে, একথা মনে করলে ভুল

হবে। আসলে মানুষের জীবন যতপ্রকার রূপের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, তারা সকলেই সমানভাবে আত্মোপলব্ধির উপযোগী পথ। এই বিভিন্ন দিকগুলি একটি বৃত্তের বিভিন্ন ব্যাসার্ধের মতো। যতগুলি ব্যাসার্ধ ততগুলি পথ। যত মত তত পথ। সব পথ অবলম্বন করেই কেন্দ্রে উপনীত হওয়া যায়; এই কেন্দ্রই পরম সত্তা, মানুষের অন্তর্নিহিত বিশ্বচৈতন্য; এবং এই কেন্দ্রে, যেখানে সকল ব্যাসার্ধ মিলিত হয়, সেখানে সকল প্রকার বিভেদের অবসান ঘটে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এই কেন্দ্রে পৌছানো না যায়, ততক্ষণ পার্থক্য থাকবেই। বিভিন্ন মানুষ তাদের মনোবৃত্তি অনুসারে বিভিন্ন পথ অবলম্বন করে চলে; একজন এক পথে চলে, অন্যজন অন্য পথে চলে। নিজ নিজ পথ অনুসরণ করে সকলেই যদি অগ্রসর হয়, তবে অবশ্যই তারা কেন্দ্রে উপনীত হবে। এই হল ধর্মের সার কথা। মতবাদ, আচার-আচরণ, শাস্ত্রগ্রন্থ, মন্দির ও এই জাতীয় অনুষঙ্গ হচ্ছে অপ্রধান গৌণ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অঙ্গ।

ধর্মকে যখন আমরা বিভিন্ন নামে বহু বলে অভিহিত করি, তখন আমরা ধর্মের প্রকাশে বিভিন্নরূপ ও মাধ্যমকে উপলক্ষ করেই একথা বলে থাকি। এই ভিন্ন ভিন্ন রূপ সার্বিক বা মুখ্য নয়; ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে, দল থেকে দলে, সম্প্রদায় থেকে সম্প্রদায়ে তা বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, শস্যের ভিতরকার দানার রক্ষা, পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য যেমন তুষরূপ আবরণের প্রয়োজন আছে, তেমনি মানুষের বিভিন্ন মনোবৃত্তি অনুযায়ী ধর্মভাবের রক্ষা, পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন মতবাদের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য; কেননা এই বিভিন্ন মতবাদের উৎস হচ্ছে মানুষের প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন মানসিক গঠন। যুগে যুগে ভারত এই চিরন্তন সত্যকে প্রকাশ করে এসেছে যে সংস্কার, অভিরুচি ও মানসিকতার ভিন্নতা থাকার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন মানুষ স্বকীয় দিব্য সত্তার উপলব্ধিরূপ একই লক্ষ্যে পৌঁছবার ভিন্ন ভিন্ন পথ অনুসরণ করে থাকে। আত্মপ্রকাশের দিক থেকে ধর্মমতের বহুত্ব সেইজন্য মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত। পৃথিবীতে যতগুলি মানুষ আছে ততগুলি ধর্মমতের যেদিন উদ্ভব হবে একমাত্র সেদিনই এই সত্য পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করবে। বহু যে একের মধ্যে বিধৃত সেই সার্বিক আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সেদিনই পরিপূর্ণতা লাভ করবে, শুধু ভাবগত দিক থেকে নয়, প্রকাশের দিক থেকেও। অনন্ত প্রকাশ-ভঙ্গীর বৈচিত্র্য যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার সুপ্ত ভাগবত সত্তা স্বকীয় বিশিষ্ট মাধ্যমে প্রকাশ করতে সাহায্য করে, এই সত্যই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। এই সত্যকে অনুসরণ করেই মানবজাতি বিরোধ থেকে নিরঙ্কুশ মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে পারে, যা মানবজাতি ও মানব-সভ্যতার চরম অভীষ্ট।

প্রত্যেক ধর্মই প্রত্যেকের ধর্ম

আগেই বলা হয়েছে যে, অধ্যাত্মবিদ্যার সব চেয়ে বড় আবিষ্কার হল, ধর্ম এক; কিন্তু মত বিভিন্ন। বিভিন্ন ধর্মমত হল এক যে ধর্ম, এবং যার মূল সত্য ঐক্য, তারই বিচিত্র প্রকাশ, বিভিন্ন নামের মতগুলি এক বিশ্বচৈতন্যেরই এক একটা দিকের প্রকাশ। সমমানসিকতাসম্পন্ন এক এক মানবগোষ্ঠী বিশ্বচৈতন্যের এক একটা দিকের প্রতি অনুরক্ত হয়ে তার অনুসরণ করে থাকে। এক বিশ্বচৈতন্য ও তার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মূলত অভিন্ন সত্তা এবং এই সত্তাকে মানুষের মন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকাশের মাধ্যমে বিভিন্ন-ভাবে ধারণা করে থাকে। কাজেই একই বিশ্বচৈতন্যরূপ একত্বের উপলব্ধির জন্য প্রত্যেক

মানুষ তার মনোবৃত্তি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকাশের যে-কোন একটিকে নিজের উপযুক্ত পথরূপে নির্বাচন করে, অনুসরণ করে থাকে।

প্রত্যেক ধর্মমতের মূলে একটা প্রধান ভাব কাজ করছে যা বিশ্বচৈতন্যের একটা বিশেষ দিকের প্রকাশ এবং এই ভাব একটা বিশেষ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এই দিক থেকে বিচার করলে প্রত্যেক ধর্মমতই এক হিসাবে একদেশদর্শী। প্রত্যেক ধর্মমতের উপলব্ধি বিশ্বচৈতন্যের একটা বিশেষ দিকে সীমাবদ্ধ, অথচ বিশ্বচৈতন্যের অনন্ত দিক রয়েছে যা অনন্ত রূপ, অনন্ত ভঙ্গী, অনন্ত মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে। অধ্যাত্মবিদ্যায় বিভিন্ন ধর্মমত তো পরস্পর বিরোধী নয়ই, বরং পরস্পরের পরিপূরক, কারণ প্রত্যেক ধর্মমতই মৌল আধ্যাত্মিক ঐক্যের একটি বিশেষ প্রকাশ। সেইজন্য, প্রত্যেক ধর্মমতেরই নিজ নিজ উপলব্ধির বৈশিষ্ট্যের দ্বারা অপর অপর ধর্মমতকে সহায়তা করা এবং অপর-দিকে এই পারস্পরিক সহায়তার মাধ্যমে নিজেকে সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ করা একান্তভাবে প্রয়োজন। একটা ধর্মমত তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং নিজেকে সার্থক করে যখন সে বিশ্বচৈতন্যের অনন্ত প্রকাশকে সাঙ্গীভূত করতে সক্ষম হয়।

আদান-প্রদানই প্রগতির মূল কথা। এই যৌথ প্রচেষ্টার নীতি অনুসরণ করেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা আজ দ্রুত প্রগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই নীতি অধ্যাত্মবিদ্যার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে নিরন্তর আদান-প্রদানের মাধ্যমেই প্রত্যেক ধর্মমত সমৃদ্ধ হতে পারে; এইভাবে তারা আধ্যাত্মিক ঐক্য লাভের অন্তিম লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে। এই আদান-প্রদানের দ্বারা এক ধর্মমতের সঙ্গে অন্য ধর্মমতের সামঞ্জস্য সাধিত হবে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সত্যিকারের সহমর্মিতা ও সমন্বয়ের দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রত্যেক ধর্মমতের বিকাশের জন্য এবং আধ্যাত্মিক ঐক্যে তার পরিপূর্তি লাভের জন্য প্রত্যেক ধর্মমতের পক্ষে অপর ধর্মমতের প্রয়োজন অপরিহার্য। কোন একটি ধর্মমতের বিশিষ্ট সত্যানুভূতি অপরাপর প্রত্যেক ধর্মমতের পরি-পূর্ণতা ও পর্যাপ্তিলাভের জন্য আবশ্যক। বিভিন্ন ধর্মমত যে-সকল আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধি করে থাকে তাদের সমষ্টিকেই বলা যায় ধর্মজগৎ। ধর্মজগতের এই বহুবিচিত্র আধ্যাত্মিক সত্য মানবজাতির সম্মিলিত উত্তরাধিকার, প্রত্যেক ধর্মমতের সম্মিলিত সম্পদ, সম্মিলিত ভাণ্ডার, যেখান থেকে প্রত্যেক ধর্মমতই রসদ সংগ্রহ করতে পারে। এই বহুবিচিত্র আধ্যাত্মিক সত্যের উপলব্ধির দ্বারা প্রত্যেক ধর্মমতই উপকৃত। অতএব, প্রত্যেক ধর্মমতই এক অর্থে, অন্য ধর্ম-মতের দ্বারা উপকৃত, কারণ, এক ধর্মমত অন্য একটি ধর্মমত থেকে অথবা অন্য সকল ধর্মমত থেকেই রসদ সংগ্রহ করতে পারে। কাজে কাজেই, প্রত্যেক ধর্মই প্রত্যেকের ধর্ম। কোন আধ্যাত্মিক সত্যই কোন ব্যক্তিবিশেষের অথবা গোষ্ঠীবিশেষের একচেটিয়া সম্পত্তি হতে পারে না। জড়জগতের হোক বা অধ্যাত্মজগতের হোক, সকল সত্যই বিশ্বজনীন এবং চিরন্তন। জড়বিজ্ঞানী বা অধ্যাত্মবিজ্ঞানী সেই সত্যকে শুধু আবিষ্কার করে থাকেন।

প্রকৃতিগতভাবে প্রত্যেক ধর্মমতই ঐক্যাভিমুখী। ঐক্যের উপলব্ধির মধ্যেই ধর্মমতের পর্যবসান। এই ঐক্য থেকে বিচ্যুত হলেই ধর্ম স্বভাবভ্রষ্ট হয়। বিভিন্ন ধর্মমতগুলি 'এক' ধর্মের বিচিত্র প্রকাশ। এই অদ্বয় ধর্ম মানবজীবনে পরিপূর্ণতা আনে এবং এই 'এক'-এর উপলব্ধি, যা ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ, তাই হল মানবজীবনের পরম কল্যাণ, চরম লক্ষ্য।

[ক্রমশঃ]

চিরনূতন বিবেকানন্দ

ডক্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক।

গ্রন্থ-সমালোচনা : *Swami Vivekananda in the West: New Discoveries. His Prophetic Mission, Parts I & II. By Marie Louise Burke. Advaita Ashrama, 5 Dehi Entally Road, Calcutta-700 014, Rs. 48 each volume.*

বিবেকানন্দকে জানা আমাদের কোনদিনই ফুরাবে না, তিনি চিরনূতন। তাঁর মহাপ্রাণ জীবনের অসংখ্য দিক্, তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের গণনাতীত বিকাশ; তিনি **'myriad-minded'** মহামানব, বহুবিচিত্র তাঁর লোকোত্তর চরিত্রের বিচ্ছুরণ। তাঁর কথা যখন ভাবি তখন আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। সম্প্রতি বিদেশিনী বিদুষী শ্রীমতী মারী লুই বার্ক পাশ্চাত্য-পরিব্রাজক স্বামীজী-সম্পর্কে বহু নূতন তথ্য তাঁর রচিত গ্রন্থ-গুলিতে সযত্নে সুচারুভাবে সন্নিবিষ্ট করে আমাদের এই বিস্ময় আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। তবে এখানেই আমাদের বিস্ময়ের শেষ নয়। মার্কিন লেখিকা যে-অসামান্য নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় নিয়ে এই বিশেষ পরিশ্রম-সাধ্য গবেষণার কাজ এত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন তাও বিস্ময়কর। ভগিনী নিবেদিতারই একজন সুযোগ্যা উত্তরসাধিকাকে আমরা দেখলাম শ্রীমতী বার্কের মধ্যে—যাঁর অতন্দ্র সাধনা শুধু বিবেক-আনন্দকে উপলব্ধি ও প্রকাশ করা।

১৯৪৫-৫০ খ্রীষ্টাব্দে লেখিকা তাঁর গুরু স্বামী অশোকানন্দের প্রেরণায় প্রথম গবেষণা আরম্ভ করেন। তখন থেকেই তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন বিবেকানন্দের ভক্তদের কাছে প্রকৃত তথ্য পরিবেশন করার জন্য, কারণ তিনি জানেন তাঁরা এই ধরনের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের জন্য অনেক দিন ধরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় রয়েছেন। পাশ্চাত্য-দেশে যে-সব স্থানে বিবেকানন্দ বাস করেছেন ও তাঁর কার্যকলাপ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তার বিশদ বর্ণনা এবং তিনি যাঁদের সংস্পর্শে এসেছেন ও যাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন এবং যাঁদের কাছ থেকে তিনি সহায়তা পেয়েছেন তাঁদের অনুপুঙ্খ বিবরণ শ্রীমতী বার্ক মনোজ্ঞভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। এর অনেক কিছুই আমরা আগে জানতাম না। এ-সবই যথেষ্ট মূল্যবান। তবে এ-সব ছাপিয়ে স্বামীজীর যে-নয়নাভিরাম ভাবমূর্তি ফুটে উঠেছে তা লোকোত্তর সাধক বিবেকানন্দের,—যে-সাধকের একমাত্র লক্ষ্য ছিল সমগ্র মানবজাতির উদার অভ্যুদয়। যে-দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসীর দুর্দশায় তিনি অত বিচলিত হয়েছিলেন এবং যাদের উন্নতির জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন তারাও তো বিরাট মানবজাতির একটা অংশ। ভারত পরাধীন থাকলে কি বিশ্ব স্বাধীন হতে পারে?

বিবেকানন্দের জীবনের একটা সময়ের সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বেশি ছিল না—সে-সময়টা অগস্ট ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৪ অব্দের শেষ পর্যন্ত। এই সময়ের ঘটনাবলীই লেখিকার মূল বিষয় এবং তিনি বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। এর জন্য তিনি তদানীন্তন ছোট-বড় সংবাদপত্রগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখেছেন, সেই সময়ের বিবরণ আছে এমন বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত চিঠিপত্রের

সন্ধান নিয়েছেন, অনেক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন যাঁদের বন্ধু বা আত্মীয়দের সঙ্গে বিবেকানন্দের কোন সংযোগ ঘটেছিল। অনেক অন্তরঙ্গ খুঁটিনাটির তিনি আকর্ষক সমাবেশ ঘটিয়েছেন যা থেকে আমরা মানুষ বিবেকানন্দের —তাঁর আকৃতি, পোশাক, মেজাজ, চলার ও চলার ভঙ্গী ইত্যাদির—ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাই।

লেখিকা তাঁর গ্রন্থকে জীবনচরিত বলেননি। (যে-সময়টা তিনি বেছে নিয়েছেন, তাঁর রচনাকে সেই সময়কার একটি আকর-গ্রন্থ বলা যেতে পারে।) এর দুটি প্রধান কারণ আছে। প্রথমত, তিনি যত তথ্য পেয়েছেন সবই লিপিবদ্ধ করেছেন; যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ বা পুনরুক্তি সেগুলিও বাদ দেননি। চরিতকার সাধারণত নির্বাচিত তথ্য উপস্থাপিত করেন। লেখিকা যে-প্রণালী অবলম্বন করেছেন সেটা বিবেকানন্দের ভক্তদের দ্বারা সর্বান্তঃকরণে অনুমোদিত হবে, কারণ তাঁদের কাছে বিবেকানন্দ সম্পৃক্ত সকলই মধুর। দ্বিতীয়ত, বিবেকানন্দের জীবনের যে-সমস্ত ঘটনা এবং তাঁর সমকালীন যে-সব মূল্যায়ন ইতিপূর্বেই আমাদের গোচরে এসেছে, সেগুলি সাধারণত লেখিকা তাঁর গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেননি। সুতরাং তাঁর কাহিনী চরিতগ্রন্থের মতো পূর্ণাঙ্গ বা সম্পূর্ণ হয়নি। তবে নব-আবিষ্কৃত তথ্যগুলি সাজাবার জন্য লেখিকা বিবেকানন্দের জীবন ও ভাবধারাকে পশ্চাৎপট-রূপে ব্যবহার করে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। শিকাগোর ধর্ম-মহাসভার যে-সব ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলিকেও তিনি কাজে লাগিয়েছেন। এই-সব কারণে তাঁর গ্রন্থকে শুধুমাত্র আকর-গ্রন্থ-রূপে দেখলে আমরা ভুল করব।

আরও দুটি কারণ আছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে শুধু সংবাদপত্রের বিবরণটুকু যদি লেখিকা ছেপে দিতেন তবে সেটুকু পাঠ করে বিবেকানন্দকে আমরা ভুল বুঝতে পারতাম। যুক্তরাষ্ট্রে থাকার সময় বিবেকানন্দ যে-সব তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন সেগুলি এখানে বিশেষ-ভাবে উল্লেখ্য। লেখিকা এই-সব প্রসঙ্গে তাঁর যে-ভাষ্য সংযোজিত করেছেন সেটা আমাদের প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে সহায়ক হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণা করতে গিয়ে লেখিকা দেখেন যে, বিবেকানন্দের মার্কিন 'মিশন'-সম্পর্কিত যে-সব মতবাদ তাঁর পূর্ববর্তী চরিতকার ও ভক্তদের মধ্যে প্রচলিত আছে তার মধ্যে কয়েকটি তথ্যভিত্তিক নয়। নূতন তথ্য আবিষ্কার করার পর এবং বিবেকানন্দের প্রকাশিত চিঠিপত্র ও অন্যান্য রচনা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পাঠ করার পর লেখিকা তাঁর নিজস্ব নূতন ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন। বিবেকানন্দের যুক্তরাষ্ট্র-পরিভ্রমণের প্রকৃত অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য কি ছিল সে-সম্পর্কে লেখিকার নিজের বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ের শেষাংশে ও চতুর্দশ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

দেড় বছর ধরে বিবেকানন্দ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে অক্লান্তভাবে বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছেন। কখন কখন তীব্র শীতে তুষারাচ্ছন্ন পর্বতের মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে। কখন কখন আবার ঘুরতে ঘুরতে রাত্রি ১টা ২টা পর্যন্ত বেজে গেছে। কোন্ আশা নিয়ে কোন্ ভরসায় বিবেকানন্দ দিনের পর দিন অবিরাম পরিশ্রম করে গেছেন? তাঁর প্রচলিত জীবনীগুলিতে তিনটি কথা বলা হয়েছে। বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন পাশ্চাত্যে বেদান্তের প্রচার করতে, মার্কিনীদের চিন্তা থেকে মিথ্যা ও ক্ষতিকর ভাবধারা দূর করতে, এবং ভারতের জন্য আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ করতে। এগুলিই নাকি ছিল

তাঁর প্রধান লক্ষ্য। যুক্তি-বিচারের সাহায্যে লেখিকা দেখিয়েছেন যে, এগুলি আনুষঙ্গিক মাত্র। বিবেকানন্দের মতো যিনি নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকল্প, তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পশ্চিমী প্রভঞ্জনের মতো বয়ে গেছেন শুধু সেখানকার ধনী অধিবাসীদের জ্ঞান-ভাণ্ডার কিংবা ভারতের দরিদ্র অধিবাসীদের অর্থভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে, একথা মনে করার অর্থ সূর্যকে দেশলাইয়ের পর্যায়ে নামিয়ে আনা। বিবেকানন্দ ছিলেন আধ্যাত্মিকতার প্রতিমূর্তি। আধ্যাত্মিকতাই ছিল তাঁর প্রধান ধর্ম ও পরম ঐশ্বর্য এবং তিনি সূর্যের মতো অকৃপণভাবে ও স্থানকালপাত্র-নির্বিশেষে দুঃখক্লিষ্টদের আধ্যাত্মিকতার আলো বিতরণ করেছেন: 'Being what he was—a completely illumined soul whose heart cried over the suffering of all men—he inevitably poured out his blessings as the sun pours out its light.' (প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭৭)

বিবেকানন্দ যা-যা বলেছিলেন ও করেছিলেন সে-সব কিছুর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর গভীর স্থৈর্য ও শান্তি, সমগ্র মানবজাতির জন্য তাঁর সীমাহীন দরদ ও তাদের আর্তিনাশনের জন্য তাঁর সীমাহীন প্রচেষ্টা, এবং অন্যদের মধ্যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি উদ্বুদ্ধ করার তাঁর অনায়াস শক্তি। শ্রীমতী বার্ক যথার্থই মনে করেন যে, বিবেকানন্দের এই-সব গুণই যুক্তরাষ্ট্রের হৃদয়কে জয় করেছিল, তাঁর স্বদেশপ্রীতি বা বুদ্ধিবৃত্তির মহত্ত্ব নয়।

এই কথাগুলি প্রথম খণ্ড, অষ্টম বা অন্তিম অধ্যায়ের ('Return of the Warrior') শেষাংশে রয়েছে। আগের সাতটি অধ্যায়ের নাম, যথাক্রমে: Before the Parliament, The Parliament of Religions, In and around Chicago, The Midwestern Tour, In a Southern City, The Climax at Detroit, এবং The Christian Onslaught.

দ্বিতীয় খণ্ডের ছয়টি অধ্যায় হল: The Eastern Tour—I, Trials and Triumph, Summer 1894, The Eastern Tour—II, The Last Battle, এবং Dawn of the World Mission. শেষ অধ্যায়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম খণ্ডের শেষে লেখিকা যে-প্রশ্নের অবতারণা করেছেন এবং যে-উত্তরের আভাস দিয়েছেন, তা আরও স্পষ্ট ও গভীরভাবে এখানে উচ্চারিত।

যুক্তরাষ্ট্রে বিবেকানন্দের প্রধান ভূমিকা ছিল প্রবুদ্ধ পুরুষের। অবশ্য এ-কথা ভারতবর্ষেও সত্য। তিনি যেখানেই থাকুন না কেন ও যা-ই করুন না কেন, যাঁদের সম্পর্কে এসেছেন তাঁদের সকলের চেতনাকেই স্থায়ীভাবে গভীরতর স্তরে উত্তীর্ণ করেছেন। ভগিনী নিবেদিতা তাই বলেছেন যে, বন্ধন-মোচন করাই বিবেকানন্দের স্বরূপের প্রধান অভিব্যক্তি: 'Vivekananda is nothing if not a breaker of bondage.'

খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের কার্যকলাপ এবং অন্যান্য আরও অনেক জটিল সমস্যা-সম্পর্কে বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গী ও অভিমত এখনও যথেষ্ট, প্রাসঙ্গিক, লেখিকার এ-মন্তব্য যথার্থ। আধুনিক যে-সব হিন্দু মনে করেন, বিবেকানন্দের মতামত আজকের যুগে অচল এবং আজকের সমস্যার সমাধান বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে করা যাবে না, লেখিকা তাঁদের ভ্রান্ত মনে করেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতবর্ষ যদি উন্নত হতে চায় ও জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করার আশা রাখে, তা হলে স্বামীজী-প্রদর্শিত পথ ছাড়া এদেশের অন্য কোন গতি নেই।

শ্রীমতী বার্কের গ্রন্থের আলোচ্য তৃতীয়

সংস্করণটি অধুনা প্রকাশিত হয়েছে (প্রথম খণ্ড ১৯৮৩, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৮৪)। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ যথাক্রমে ১৯৫৭ ও ১৯৬৬-তে প্রকাশিত হয়। নূতন পরিবর্ধিত সংস্করণে গত সাত-আট বছরের নূতন গবেষণায় পাওয়া অনেক খুঁটিনাটি জিনিস যোগ করা হয়েছে। যথাস্থানে সেগুলি সন্নিবিষ্ট। কোন কোন অধ্যায়ের কিছু কিছু অংশ নূতনভাবেও লিখতে হয়েছে। সবচেয়ে যা উল্লেখ্য তা হল, স্বামীজীর লেখা চিঠিপত্রের একটি সংগ্রহ লেখিকা স্বর্গতা বর্ণী সেনের কাছ থেকে পেয়েছেন যা থেকে বিভিন্ন অধ্যায়ের অনেক নূতন উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছেন। এ-চিঠিগুলির বেশির ভাগই লেখা হয়েছে Mrs. George W. Hale-নাম্নী এক মহিলাকে, যাঁকে স্বামীজী 'মা'-র মতো মনে করতেন। এই-সব চিঠিতে যে-বিবেকানন্দের আমরা পরিচয় পাই তিনি সর্বত্যাগী ঝটিকাপ্রকৃতি সন্ন্যাসী নন, তিনি সহজ, সরল, মানুষ বিবেকানন্দ, যিনি মাকে ভালবেসে ও মা-র ভালবাসা পেয়ে সুখী হয়েছেন, যাঁর কাছে শুধু জন্মভূমি নয়, জননীও স্বর্গাদপি গরীয়সী।

সুলেখিকা শ্রীমতী বার্কের দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম—'Swami Vivekananda, His Second Visit to the West: New Discoveries' (ভারতীয় সংস্করণ, ১৯৭৩)। সম্প্রতি তিনি তৃতীয় একটি নূতন গ্রন্থ রচনা করেছেন বিবেকানন্দের জীবনের ১৮৯৫ ও ১৮৯৬ এই দুই বছরের ঘটনাবলী নিয়ে। বর্তমান প্রকাশক এই গ্রন্থ দুটিও প্রকাশের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। এই প্রশংসনীয় উদ্যমের জন্য তাঁদের সাধুবাদ জানাই। আশা করি বর্তমান সটীক ও সচিত্র খণ্ড দুটিতে সম্পাদন, মুদ্রণ ও প্রকাশনের যে-উন্নত মান ও সুরুচির পরিচয় আমরা পেয়েছি, প্রকাশিতব্য খণ্ডগুলিতেও তা বজায় থাকবে।

ফেরা

ডক্টর শান্তিকুমার ঘোষ

যশস্বী কবি ও লেখক। দিল্লী, যাদবপুর ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অর্থনীতি বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

যখন পুষ্পকে আরোহী রামচন্দ্র ঘরে ফিরছেন সীতাকে সঙ্গে নিয়ে
পিছনে সরে যাচ্ছে শ্রীলঙ্কার বনরাজিনীল বেলাভূমি
নীল স্বচ্ছ স্নিগ্ধ মেঘমালা ফুঁড়ে জাগে ভারতখণ্ড
বিমোহিত সীতা তাকিয়ে দ্যাখেন অনেক নিচে
ছুঁড়ে-ফেলা সেই বীজ থেকে বেড়ে উঠেছে অশোক তরু
সারা পথ ধরে
মিলিয়ে গেল গোদাবরী তটে
ভালবাসার পর্ণকুটির
রাঘবের সামনে দোলে অযোধ্যার দীপমালা
তাঁর মুখে ফুটে ওঠে প্রশান্তি।

অষ্টাবক্র-গীতা

স্বামী ধীরেশানন্দ

বেলুড় মঠের প্রবীণ শাস্ত্রজ্ঞ সন্ন্যাসী।

রাজর্ষি জনক ও শ্রীঅষ্টাবক্র মুনির গাথা

বেদান্তবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞানই জন্মমরণ প্রবাহ-সংকুল এই দুস্তর সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ সর্বদুঃখরহিত পরমানন্দস্বরূপ মোক্ষধাম প্রাপ্তির একমাত্র উপায়—ইহাই সর্ব বেদান্ত একবাক্যে ঘোষণা করিয়া থাকেন। আচার্য ভগবান্ শংকরও বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধেন মোক্ষঃ সিধ্যতি নান্যথা" (বিঃ চূঃ, ৫৬)—একমাত্র ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানই মোক্ষের সাধন, যোগ, সাংখ্য, কর্ম বা অন্য কোন উপায়ে উহা লাভ হয় না। শ্রুতিতে এইজন্যই ব্রহ্মবিদ্যা সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা বা 'পরাবিদ্যা'-রূপে বর্ণিত হইয়াছে (মুঃ উপঃ, ১/১/৫)।

মনুষ্যসমাজে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ, এই ত্রিবিধ বিদ্যাধিকারী পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। মলবিক্ষেপাদি-প্রতিবন্ধবাহুল্যবশতঃ সংসারে মধ্যম ও কনিষ্ঠ অধিকারীর সংখ্যাই অধিক। বহুজন্মকৃত নিষ্কাম-কর্ম ও উপাসনাদি সাধনসহায়ে নির্মলচিত্ত হইলে তাহারা ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনের যোগ্যতা লাভ করিয়া থাকেন। পূর্বকৃত সাধনবলে মলবিক্ষেপরহিত ও কেবল আবরণ মাত্রাবশিষ্ট বিরল উত্তম অধিকারী এই জন্মেই গুরুমুখে মহাবাক্যবিচার শ্রবণমাত্র তত্ত্বজ্ঞানলাভে কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

মহারাজ জনক ব্রহ্মজ্ঞানের অতি উচ্চ অধিকারী ছিলেন। জ্ঞানলাভের পরিপূর্ণ যোগ্যতাই তাঁহার ছিল। অশ্বারোহণকালে এক রেকাবে এক চরণ ন্যস্ত করিয়া দ্বিতীয় চরণ অপর রেকাবে ধারণ করিতে যে অত্যল্প সময় প্রয়োজন, তাহার মধ্যেই গুরূপদেশে তিনি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন—এই গাথা বিদ্বৎ-সমাজে প্রসিদ্ধ আছে।

রাজকার্যকুশল, সর্বগুণনিলয় মহারাজ জনকের রাজসভায় তাঁহার ব্রাহ্মণ-কুলগুরু-পুত্র নিত্য শাস্ত্র-ব্যাখ্যান শুনাইতেন। উত্তম অধিকারীর কথা বর্ণনপ্রসঙ্গে একদিন তিনি 'রেকাবে চরণ ও ব্রহ্মোপদেশ'-এর কথা বলিলে মহারাজ জনকের উক্ত বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইল এবং তিনি তৎকালেই অশ্ব আনাইয়া উহাতে আরোহণকরতঃ পূর্বোক্ত প্রবাদের সত্যতা পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলে পাঠক গুরুপুত্র উহা প্রমাণ করিবার স্বীয় অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিলেন। ইহাতে কোপাবিষ্ট হইয়া রাজা পাঠককে কারাগারে বন্ধ করিলেন। কোন ব্রাহ্মণই ইহা প্রমাণ করিতে সমর্থ নহেন দেখিয়া রাজা সকলকেই ঐরূপ কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। দেশের সর্বত্র এক ত্রাসের সঞ্চার হইল। জনকের নগরে আর কোন ব্রাহ্মণই ভয়ে পদার্পণ করিতেন না। দীর্ঘকালানন্তর সৌভাগ্য-বশতঃ সেই নগরে মহর্ষি অষ্টাবক্রের আগমন হইল। মার্গমধ্যেই তিনি মহারাজ জনকের ব্রাহ্মণনিগ্রহের বিষয় শ্রবণ করিয়াছিলেন। মুনি রাজসভায় প্রবেশ করিলে তাঁহার তেজস্বী মুখমণ্ডলদর্শনে জনকের চিত্তে শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল। মুনি রাজকর্তৃক অকারণ ব্রাহ্মণনিগ্রহের কথা উত্থাপন করিলে জনক বলিলেন যে, শাস্ত্রোক্ত বিষয়ের প্রতিপাদনে অসামর্থ্যহেতুই ব্রাহ্মণগণ নিগৃহীত হইয়াছেন। প্রতিপাদনে অসমর্থ কাল্পনিক বিষয় প্রচার লোকসমাজের অকল্যাণকর। প্রত্যুত্তরে দৃঢ়তার সহিত মুনি বলিলেন—"'রেকাবে চরণ ও ব্রহ্মোপদেশ'—এই শাস্ত্রোক্ত বচন মিথ্যা নহে, উহা অক্ষরশঃ সত্য। হে রাজন্! তুমি যদি ইহা পরীক্ষা দ্বারা সুনিশ্চিত-রূপে জানিতে চাও তবে তুমি নিগৃহীত ব্রাহ্মণ-

দিগকে মুক্তি দাও ও অশ্ব সহ আমার সহিত বনে চল। আমি প্রথম তোমার যোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া তদনন্তর ঐ ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করিব। কারণ উপদেশ প্রদানের উহাই শাস্ত্রীয় বিধি।"

মহারাজ জনক তাহাই করিলেন। বনে উপস্থিত হইয়া রাজা অশ্বে আরোহণার্থ এক রেকাবে এক চরণ স্থাপন করিয়া দ্বিতীয় রেকাবে অপর চরণ ন্যস্ত করিতে উদ্যত হইলে মুনি বলিলেন—"হে রাজন্! দ্বিতীয় চরণ উঠাইবার পূর্বে আমার এক প্রশ্নের উত্তর দাও। রাজন্! ব্রহ্মবিদ্যালাভার্থ গুরুকরণের অত্যাবশ্যকতা কি শাস্ত্রমুখে তুমি শ্রবণ কর নাই? যদি তুমি আমাকে গুরু-পদে অভিষিক্ত করিতে চাও তবে যথাশাস্ত্র গুরু-দক্ষিণাও তোমার দেওয়া কর্তব্য।" মহারাজ জনক উত্তর করিলেন—"হ্যাঁ গুরুদেব, আমার 'তন, মন, ধন', সবই আমি আপনার চরণে অর্পণ করিলাম। এখন আপনি কৃপাপূর্বক আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন।" ইহা শুনিয়া মুনি দূরে কোন গুহায় প্রস্থান করিলেন। এদিকে মহারাজ জনক এক চরণ এক রেকাবে স্থাপন করিয়া তদবস্থ হইয়াই সেখানে গতিহীন স্থির দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কিয়ৎকাল ব্যতীত হইলে মুনি আসিয়া জনককে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি ঐরূপ নিস্পন্দ গতিহীন হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন কেন? রাজা উত্তরে বলিলেন—"গুরুদেব! এই হস্ত, পদ, শরীর, মন, ইন্দ্রিয়াদি কিছুই তো আর এখন আমার নহে। এই সবই এবং বিদেহ রাজ্যও আপনাকে অর্পণ করিয়াছি। সত্যপ্রতিজ্ঞ আমি আপনাকে সব কিছু অর্পণ করাতে এখন আর আমার বলিয়া কিছু খুঁজিয়া পাইতেছি না। অতএব আপনার আজ্ঞা ব্যতীত আমি আর কিছুমাত্র করিতে সমর্থ নহি।"

শিষ্যের উত্তরে প্রসন্ন হইয়া গুরু বলিলেন—"হে প্রিয় শিষ্য! মুমুক্ষু জ্ঞানলাভের কিরূপ অধিকারী তাহা পরীক্ষা করা আবশ্যক। তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ। 'রেকাবে চরণ ও ব্রহ্মোপদেশ'—ইহা অতি উত্তম অধিকারী একমাত্র তোমার প্রতিই প্রযুক্ত হইতে পারে।

"হে শিষ্য! ইহা নিশ্চিতরূপে অবধারণ কর যে, তুমিই স্বরূপতঃ সদামুক্ত সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শুদ্ধ নিষ্ক্রিয় নির্বিকার ব্রহ্মস্বরূপ। তোমার আর কোন কর্তব্য বা প্রাপ্তব্য অবশেষ নাই। তুমিই এক অখণ্ড সুখস্বরূপে সদা বিদ্যমান। এই সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ড তোমাতেই কল্পিত একটি সত্তাহীন মিথ্যা প্রতীতিমাত্র, ইহা বস্তুতঃ নাই। একমাত্র চৈতন্যস্বরূপ তুমিই ত্রিকালে বিদ্যমান। এক তুমিই সর্বজগদ্রূপে প্রতিভাত হইতেছ, ইত্যাদি।"

গুরু উপদেশ শুনিয়া মহারাজ জনক জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"কথং জ্ঞানমবাপ্নোতি…" ১/১—এই শ্লোক হইতেই 'অষ্টাবক্র-গীতা'র প্রারম্ভ। শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ মুনিবরের মুখে উপদেশ লাভ করিয়া জনক কৃতকৃত্য হইলেন।

অতঃপর মুনি বলিলেন—"হে রাজন! এখনও যদি তোমার কোন সংশয় থাকে তবে বলিতে পার।" জনক উত্তরে বলিলেন—"হে দয়াময় গুরুদেব! আর আমার চিত্তে শংকার লেশ মাত্রও নাই। শাস্ত্রবচন অতি সত্য, ইহা আপনার প্রসাদেই আজ আমি অনুভব করিয়া ধন্য হইলাম।"

অষ্টাবক্র-গীতা ও স্বামী বিবেকানন্দ

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের বাসগৃহের নির্দিষ্ট স্থানে একখানি 'অষ্টাবক্র সংহিতা' (অষ্টাবক্র-গীতা) গ্রন্থও থাকিত। অদ্বৈত বেদান্তের অতি উচ্চ কোটির এই গ্রন্থখানি উপযুক্ত অধিকারী বিবেচনা করিয়া তিনি একমাত্র প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথকেই (ভাবিকালের স্বামী বিবেকানন্দকেই) পড়িতে দিতেন। ব্রাহ্মসমাজের

ভাবাপন্ন হইয়া নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের দ্বৈতভাবে উপাসনায় অভ্যস্ত ও তাহাতেই বিশ্বাসী নরেন্দ্রনাথের নিকট এইরূপ গ্রন্থ তখন নাস্তিক্যদোষদুষ্ট বলিয়া প্রতিভাত হইত এবং তিনি স্পষ্ট বলিয়াও ফেলিতেন—"ইহাতে আর নাস্তিক্যবাদে কি প্রভেদ ? সৃষ্ট জীব নিজেকে স্রষ্টা পরমেশ্বর বলিয়া ভাবিবে, ইহা মহাপাপ। সবই পরমেশ্বর —প্রতিটি প্রাণী, বৃক্ষ, লতা, সর্ব জগৎ—সবই পরমেশ্বর, ইহা নিতান্তই অশোভন, অযৌক্তিক কথা। যে ঋষিরা এরূপ লিখিয়াছেন, তাঁহাদের নিশ্চয়ই মাথা খারাপ ছিল ইত্যাদি।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু তাঁহার ঐকথায় হাসিয়া বলিতেন—"তা তুই এখন ঐকথা নাই বা নিলি। তা বলে ঋষিদের নিন্দা করবি কেন ? ঈশ্বরের স্বরূপের কি ইতি আছে ?"

বলা বাহুল্য পরবর্তী জীবনে এই নরেন্দ্রনাথই তাঁহার অলৌকিক সাধনপ্রভাবে গুরু-কৃপায় অদ্বৈতের সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব অনুভব করিয়া বিগত-সংশয় হইয়াছিলেন—তখন তিনি সিদ্ধ আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ। অদ্বৈতজ্ঞানের বিমল আলোকে তখন তাঁহার চিত্ত সমুদ্ভাসিত। সংশয়ের লেশমাত্রও আর তখন তাঁহার ছিল না। 'অষ্টাবক্র-গীতা'র তত্ত্বই তিনি তখন নিরন্তর অনুভব করিতেন

অষ্টাবক্র মুনি

এই গ্রন্থে দেখা যায়, গুরু জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ মুনি অষ্টাবক্র বক্তা ও সর্ব দৈবী সম্পদ্‌বিভূষিত সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন শিষ্য রাজর্ষি জনক শ্রোতা।

অষ্টাবক্র মুনির কাহিনী বড়ই চমকপ্রদ ও কৌতুকাবহ। মহাভারত—'বন' পর্বের ১০৮ হইতে ১১০ পর্যন্ত অধ্যায়সমূহে তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত ও জনকের রাজসভায় সভাপণ্ডিত 'বন্দি'সহ তাঁহার বাদানুবাদের একটি পরম কৌতুকাবহ কাহিনী বর্ণিত আছে।

অষ্টাবক্রের পিতা 'কহোড়' বেদবিদ্যায় অতি পারদর্শী ছিলেন। মাতা 'সুজাতা'র গর্ভে বাসকালেই পিতার বৈদিক মন্ত্রের আবৃত্তিসমূহ শ্রবণ করিয়া গর্ভস্থ শিশু অষ্টাবক্র বেদবিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। একদিন পিতার স্খলিত আবৃত্তি শ্রবণ করিয়া মাতৃগর্ভস্থ ঐ শিশু বলিয়া উঠিল—"পিতঃ! আপনার কৃপায় মাতৃগর্ভবাস-কালেই আমি বেদবিদ্যা অধিগত করিয়াছি। কিন্তু আবৃত্তিতে আপনার কোন কোন স্থলে ভুল হইতেছে।" ইহা শুনিয়া পিতা 'কহোড়' অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন ও পুত্রকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। তাহার ফলে জন্মাবধিই পুত্রের শরীরে অষ্টবিধ অঙ্গবিকৃতি ঘটিল এবং তদবধি তিনি 'অষ্টাবক্র' নামেই প্রখ্যাত হইলেন।

দারিদ্র্যনিষ্পিষ্ট কহোড় পুত্র পালনের সহায়তা লাভার্থ জনকের সভায় গমন করিলে সেখানে রাজপণ্ডিত 'বন্দি' তাঁহাকে বিচারে পরাভূত করিয়া স্বপিতা বরুণের সেবায় নিযুক্ত করিলেন। বহু বৎসর কহোড়ের আর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে অষ্টাবক্র দ্বাদশবর্ষীয় বালক হইয়াছেন। বেদবিদ্যায় তিনি সুপণ্ডিত। মাতার নিকট পিতার জনক রাজসভায় গমনের বৃত্তান্ত শুনিয়া তিনি পিতার সংবাদ জানিবার জন্য বিদেহ রাজ্যে গমন করিলেন। বালকদৃষ্টে দ্বারপাল তাঁহাকে রাজসভায় প্রবেশাধিকার দিতে অসম্মত হইল। কিন্তু বালকের বাক্‌পটুতা ও বিদ্বত্তাদর্শনে চমৎকৃত হইয়া সকলে তাঁহাকে রাজসমীপে লইয়া গেল। সেখানে রাজার অনুমতিক্রমে রাজসভা-পণ্ডিত 'বন্দি' সহ বালকের শাস্ত্রীয় বিচার আরম্ভ হইল। বিচারে 'বন্দি' পরাজয় স্বীকার করিলেন। শর্তানুসারে পিতা 'কহোড়' মুক্তি পাইলেন। প্রসন্ন পিতার আশীর্বাদে ও আদেশে পুত্র 'অষ্টাবক্র' 'সমঙ্গ' নদীতে স্নান করিলে তাঁহার অষ্টধা বিকৃত অঙ্গসমূহ সুবিন্যস্ত হইল এবং তাঁহার

আর কোন অঙ্গবিকৃতিই থাকিল না। মহাভারতে 'বন্দি' সহ অষ্টাবক্রের বিচারের কথাই শুধু আছে। রাজর্ষি জনককে অষ্টাবক্রের উপদেশ—যাহা 'অষ্টাবক্র-গীতা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে—তাহা কালান্তরে প্রদত্ত হইয়াছিল।

অষ্টাবক্র-গীতা

'অষ্টাবক্র গীতা'—অদ্বৈতবেদান্ততত্ত্বানুভব-বিষয়ক এক অতি উচ্চ কোটির গ্রন্থ। প্রশ্নোত্তরশৈলীতে অতীন্দ্রিয় অনুভবসমূহ ইহাতে অতি মনোরম ভাষায় বর্ণন করা হইয়াছে। ইহার পাঠ মুমুক্ষুগণের চিত্তে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা সমধিক উদ্রিক্ত করে এবং তাহাকে সেই অপূর্ব দিব্য স্থিতিলাভার্থ উৎসাহিত করে। এইজন্যই জ্ঞান-মার্গী সাধকগণের ইহা অতি প্রিয় গ্রন্থ। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার ন্যায় এই গ্রন্থেও গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরছলেই বেদান্তের সাধন, তত্ত্বজ্ঞান, জ্ঞানীর দিব্য স্থিতি ও তাঁহার আচার-ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় পুনঃ পুনঃ বহুধা বর্ণিত হইয়াছে।

এক হিসাবে এই গ্রন্থ অভিনব। আচার্য শংকরোত্তর যুগের দার্শনিক প্রক্রিয়াসম্বলিত গ্রন্থরাজি হইতে ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরের। ইহার প্রকাশভঙ্গী সরল, সতেজ, অতিস্ফুট এবং চিন্তা-ধারা গভীর ভাবদ্যোতক। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পাঠককে ইহা যেন এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বের সান্নিধ্যেই উপস্থাপিত করিয়া দেয়, কোন দার্শনিক তর্কজালে তাহাকে বিভ্রান্ত করে না।

পণ্ডিতগণ বলেন যে, বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ ও প্রক্রিয়াসমূহ উৎপত্তির পূর্বেই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল এবং ইহা শ্বেতাশ্বতর, মুণ্ডক প্রভৃতি উপনিষদ-আবির্ভাবকালের প্রায় সমসাময়িক। একটি শ্লোকে (২০/১) মাধ্যমিক শূন্যবাদ নিষেধ-প্রসঙ্গও যেন আছে বলিয়া মনে হয়।

বেদান্ত জীবকর্মফলদাতা ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু এই গ্রন্থের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে কোন ঈশ্বরপ্রসঙ্গ বা ঈশ্বরের স্বীকৃতি নাই। এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ ব্রহ্মই মায়াপ্রভাবে জীববৎ প্রতীত হইতেছেন এবং জীব স্বপুরুষকারবলে ঐ মায়া-জাল ছিন্ন করিলেই তাহার স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরমানন্দে অবস্থান করিতে পারে। এই গ্রন্থে সেই নির্দ্বৈত সহজ স্থিতিই অনুপম ভাষায় পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইয়াছে। এই অবস্থানলাভের জন্য গুরূপদেশের আবশ্যকতা আছে বটে, কিন্তু ঈশ্বর-কৃপা, যোগাভ্যাস, উপাসনা, কর্মাদি সাধনের স্বীকৃতি ইহাতে নাই। উহা পরবর্তী আচার্যরা তাঁহাদের গ্রন্থে বলিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, এই গ্রন্থোক্ত বিষয় অদ্বৈত-তত্ত্বের আদর্শের অধিক সমীপবর্তী, কারণ ইহা সাধককে অন্য কোন সাধনে লিপ্ত হইতে না বলিয়া একমাত্র তত্ত্ব-বিচারেই নিযুক্ত হইতে বলেন। এইজন্য অতি উত্তম অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়াই এই গ্রন্থ রচিত, এইরূপ বলাই সঙ্গত।

ইহ বা পূর্বজন্মে অন্য সাধনাদি অনুষ্ঠানসহায়ে যাঁহারা বিষয় ভোগবাসনারহিত হইয়া যথেষ্ট নির্মলচিত্ত হন নাই এবং অন্তর্মুখ নহেন, তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থোক্ত পদ্ধতির অনুসরণ, লোভনীয় প্রতীত হইলেও, বিপজ্জনক। কারণ নিষ্কামকর্ম, উপাসনা, ধ্যান, সমাধি আদি সাধনে বীতশ্রদ্ধ হইয়া এবং আত্মবিচারনিষ্ঠারও সামার্থ্যাভাবে তাঁহাদের উভয়তঃ ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা সমধিক বিদ্যমান। অতএব যথার্থ শুদ্ধচিত্ত অধিকারীর প্রতিই এই গ্রন্থ অমৃততুল্য ফলপ্রসূ হইয়া থাকে।

এই গ্রন্থে একমাত্র নির্ভেজাল অদ্বৈত-তত্ত্বে স্থিত হইয়া মহর্ষি অষ্টাবক্র আর কোন কিছুর সহিতই আপস বা রফা করেন নাই। চিত্তগত কোন কল্পনা বা এতটুকু স্পন্দনও যেন তিনি সহ্য করিতে বিমুখ। স্তিমিত—সর্বোপাধি এক চৈতন্য সাগরেই যেন তিনি নিমগ্ন থাকিতে চান ও

শিষ্যকেও তদনুরূপ স্থিতিলাভ করাইতেই যেন তিনি ব্যগ্র। শ্রীগুরুর অভিলাষ ব্যর্থ হয় নাই। সুযোগ্য শিষ্যের শুদ্ধ হৃদয়ে এই উপদেশ তৎকালেই বাঞ্ছিত ফলপ্রসূ হইয়াছিল এবং শিষ্য জনক ও স্বকীয় অনবদ্য ভাষায় অন্তরে অনুভূত সেই দিব্য স্থিতির কথা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও গ্রন্থমধ্যে দৃষ্ট হয়।

মিথ্যা শরীর, মন বা বুদ্ধি সহায়ে অনুভূত সর্ব বিষয়ই অষ্টাবক্র তাঁহার দিব্য অনুভূতির অগ্নিতে যেন ভস্মীভূত করিয়া দিতেছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে জীব, জগৎ, মায়া বা ঈশ্বর বলিয়া কিছুই নাই। আছে কেবল এক অসীম চিৎ-সমুদ্র—যাহাতে এই বিশ্ব প্রপঞ্চ ক্ষণকালের জন্য উঠিতেছে, ভাসিতেছে ও বিলীন হইতেছে। সেই চিৎ-সমুদ্রে কোন ভেদ নাই। উহা জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয় সর্ব বিভেদ-কল্পনা, সর্ব স্পন্দনবিহীন। ইহাই অতি উত্তম অধিকারীর জন্য বেদান্তের সুপ্রসিদ্ধ—'অজাতবাদ'। —স্বরচিত কারিকায় ইহারই পরিচয় দিতে গিয়া আচার্য গৌড়পাদ বলিয়াছেন—

"ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভবোঽস্য ন বিদ্যতে।
এতত্তদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে॥"

(মাঃ কাঃ ৩/৪৮)

—বাস্তব জীবোৎপত্তির কারণ অবিদ্যমান বলিয়া কর্তা ভোক্তা জীব কেহই বস্তুতঃ উৎপন্ন হয় না। অতি উত্তম অর্থাৎ পারমার্থিক সত্য ইহাই যে, এক নিত্য সৎস্বরূপ ব্রহ্মই আছেন, তাঁহাতে দ্বৈতের লেশমাত্রও নাই।

সুতরাং বন্ধ মোক্ষাদিও বস্তুতঃ কিছু নাই। একথাও আচার্য কারিকায় বলিয়াছেন—

"ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্তো ইত্যেষা পরমার্থতা॥"

(২/৩২)

—উৎপত্তি, বিনাশ, বদ্ধ সংসারী জীব, সাধনসহায়ে বন্ধনমোচনার্থী এবং বন্ধনমুক্ত, কেহই বস্তুতঃ নাই। পরমার্থতঃ এক নিত্যসত্য সচ্চিদ্‌ঘনমূর্তি সুখস্বরূপ ব্রহ্মই স্বমহিমায় সদা সর্বত্র বিরাজিত।

এক চিৎ-ই সর্বভূত, জীব, জগৎ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-রূপে প্রতীত হইতেছেন। ইহারই অপর নাম—'দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ'। 'সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী'-আদি গ্রন্থকার বলেন যে, 'দৃষ্টি' অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই 'সৃষ্টি'-রূপে প্রতিভাত হইতেছেন। স্বরূপজ্ঞান হইতে ভিন্ন কোন সৃষ্টি নাই। 'সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী' বলেন—

"জ ̐ৃ অবিকৃত কৌন্তেয় মে, রাধাপুত্র পরতীতি।
চিদানন্দঘন ব্রহ্মমে ̐ জীবভাব তিহি ̐ রীতি॥"

—"তুমি রাধাপুত্র নহ, কুন্তীর গর্ভে তুমি আমার ঔরসজাত পুত্র"—সূর্যের এই বচন শুনিয়া যেমন কর্ণের হীনজাতিত্ব ভ্রম দূর হইয়া স্বীয় উত্তম জাতিত্ববিষয়ক জ্ঞান হইয়াছিল তদ্রূপ চিদানন্দ ব্রহ্মও অনাদি অবিদ্যা সম্বন্ধবশতঃ জীবত্বভ্রম প্রাপ্ত হন ও স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মভাব বিস্মৃত হইয়া দুঃখানুভব করেন এবং পুনঃ (স্বপ্নকল্পিত আচার্য সদৃশ) নিজ অজ্ঞানকল্পিত আচার্যমুখে মহাবাক্যশ্রবণ-দ্বারা লব্ধ অপরোক্ষজ্ঞানসহায়ে তিনিই নিত্য পরমানন্দ অনুভব করেন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞাননিবৃত্তি রূপ মোক্ষ তাহা হইলে কাহার হয়? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, বস্তুতঃ কাহারও হয় না। কারণ আত্মাতে বন্ধের অত্যন্ত অভাব। নিত্যমুক্ত আত্মার আবার মোক্ষ হইবে কি করিয়া?—ইহাই উত্তম ভূমিকারূঢ় বিদ্বানের নিশ্চয়।

এই নিশ্চয় লাভ করিয়াই ও গুরুপ্রোক্ত চিৎ-সাগরে অবগাহন করিয়াই রাজর্ষি জনক ধন্য, কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে প্রিয় শিষ্য শুকদেবকে তাই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন—

"অনন্তমিযমে বিত্তং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন।
মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে কিঞ্চন দহ্যতে॥"

—আমি অনন্ত ধনের অধিকারী, আবার আমার কোন ধনই নাই। সমগ্র মিথিলা নগরী অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গেলেও আমার কিছুমাত্র দগ্ধ হয় না। [ক্রমশঃ]

এবার তোমায় ধরেছি

স্বামী নিরাময়ানন্দ

'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী' তথা উদ্বোধন কার্যালয়ের প্রয়াত অধ্যক্ষ—চিন্তাশীল লেখক এবং 'বৈভব' ছদ্মনামে সুপরিচিত কবি।

তোমায় পূজা করার নামে
আমি, আমার পূজা করছি।
তাই ত দেখি পূজার শেষে
ভুলের বোঝায় ভরেছি!

শিখাও তুমি শিখাও মোরে
তোমার পূজা নতুন করে—
এবার যেন পূজা শেষে
বলতে পারি ধরেছি!
তোমায় ছলার নামে আমি
আমারেই ত ছলেছি!

হে মোর প্রভু হে মোর প্রিয়
এবার যেন ধরা দিও—
আমার মাঝেই আছ 'তুমি'—
আমি তারেই 'আমি' বলেছি!
এতদিন ত লুকিয়েছিলে
এবার তোমায় ধরেছি!

চলা

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

প্রথিতকীর্তি শিল্পী, সাহিত্যিক ও কবি। অপ্রকাশিত এই কবিতাটি শ্রীমতী অতসী বড়ুয়ার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

তরী চলে তরঙ্গের
তালে তালে ধেয়ে
মোরা চলি জানিনাক
কোন্ পথ বেয়ে
জানি শুধু চলাটারে
পথ জানা নাই
কোথা হতে আসি আর
কোথা ভেসে যাই!

যুগসূর্য বিবেকানন্দ

ডক্টর কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

খ্যাতনামা প্রবীণ কবি এবং সাহিত্যসেবী।

মূর্চ্ছা কিংবা মোহনিদ্রা, কিংবা তীব্র বিষে বিষাইয়া
জীবন্মৃত ছিল দেশ হীনমন্য দাসত্বে মজিয়া
ইংরেজের পদধূলি শিরে তুলি করিত লেপন
প্রসাধন মনে করি পরাধীন রাজভক্তগণ!

হেনকালে এলে বীর জাগৃতির মন্ত্রদাতা গুরু
স্বাধীনতা-সাধনায় করিলে উদ্যোগপর্ব শুরু
পৌরুষে পুরুষসিংহ বিবেকে বিচারনিষ্ঠ সদা
ভারতের সর্বদুঃখে কাতর হৃদয় সর্বদা।

কায়মনোবাক্যে যার পরাধীনতায় আত্মগ্লানি
দিবসে না দিত শান্তি নিশীথে করিত নিদ্রাহানি।
গুরু যার রামকৃষ্ণ, সর্বধর্ম-সমন্বয়-ঋষি,—
বৃক্ষতলে সিংহাসন ব্রহ্মবিদ্যা তাহার মহিষী।

চিকাগোর ধর্মসভা সম্বোধিল সে-ভিক্ষু নবীন
গণ্য হল সে-সভায় বাগ্মিতায় সমকক্ষহীন।
সর্বজীবে শিবজ্ঞান শিব যার জীবগুহাশায়ী
আদর্শ আকাশস্পর্শী হিমাদ্রিরে হয় লজ্জাদায়ী।

দেশভক্তি দীক্ষাদানে সে হইল মুক্তিমন্ত্রদাতা
সেই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভি—নিবেদিতা সাধ্বী
লোকমাতা।
নেতাজীরও নেতা তিনি,—গান্ধী অরবিন্দ
ভক্ত তাঁর,—
দেশের শহীদবৃন্দ সানন্দে বন্দিল পদ তাঁর।

মাটির পুতুলী ছিল নরনারী নিষ্প্রাণ নিঃসাড়
প্রাণাগ্নি আনিয়া নিজে প্রাণশক্তি করিলে সঞ্চার
প্রমিথিউসের মতো,— নিজে চাহে তুষিতে নিরয়,—
ভাগ্যহত নারীনর যদি তাহে কিছু সুখে রয়।

অগ্নিগর্ভ বাণী শুনি জাগে আসমুদ্র-হিমাচল
চক্ষে জ্বলে জ্ঞানালোক,বক্ষে তার জ্বলে হোমানল।
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল মূর্খ পণ্ডিতের গণ্ডীভেদ নাশি
আবালবণিতাবৃদ্ধে বলে,'ওঠো জাগো দেশবাসী'।

আজিও ধ্বনিত হয় সে গম্ভীর মেঘমন্দ্র স্বর
সর্বজীবে এক আত্মা পরমাত্মা প্রত্যক্ষ ঈশ্বর।
প্রভায় ও প্রতিভায় কেহ নাই প্রতিদ্বন্দ্বী তার
পৃথ্বীর প্রতীচ্য প্রাচ্য নীরাজনা করে বারংবার।

অতীতের অহঙ্কারে পণ্ডিতেরা অর্জে উপহাস
প্রাচীনেরা 'আর্য' ছিল অর্বাচীন আজি সবে 'দাস'।
মান্ধাতা-গৌরব স্মরি' ষণ্ডবৎ রোমন্থনে রত!
দোর্দণ্ডপ্রতাপ কোথা? মেরুদণ্ড কোদণ্ডের মতো!

সে-আলেখ্য গেছে মুছে, মিছে তর্কবিতর্ক তিক্ততা
সে গর্জিল জাগো ভাই বিশ্বসহ পাতাও মিত্রতা।
এই দেশ স্বর্গ মোর, স্বর্ণ মোর এ-স্বর্গের ধূলি
বীর্যবলে বাঁধি বুক অগ্রে চল কোটি শির তুলি।

এ-সমাজ শিশুশয্যা যৌবনে সাধের উপবন
বার্ধক্যের বারাণসী অহর্নিশি সাধনার ধন।
গৌরীনাথ জগদম্বে! এ লাঞ্ছিত নিগৃহীতদের
শক্তি দাও, মুক্তি দাও, দূর কর ক্লৈব্য ভারতের।

মানুষে মানুষ কর, নারী হোক আদর্শ-জননী
সিংহের বিক্রম লভি হোক তারা বীরশিরোমণি।
আগামী পঞ্চাশ বর্ষে ভুলে যাও অন্য দেবী-দেবা
মাতৃপাদপীঠ 'পাশ' মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা লবে যেবা।

সে জীবন্ত প্রার্থনায় জীবন্মৃত লভিল জীবন
পঞ্চাশৎ বর্ষে ঠিক কাটিল সে দাসত্ব বন্ধন।
সত্য করি' তাঁর বাক্য আঠারশো সপ্তনবতির
ঠিক পঞ্চাশৎ বর্ষে ইতিহাস স্থাপিল মুক্তির।

জীব-শিব সেবামন্ত্রে উঠিল উত্তুঙ্গ প্রতিষ্ঠান
রামকৃষ্ণ-সারদার সারোদার মহিমার গান।
সন্ন্যাসী সন্তান দল সহৃদয় সদা স্নেহশীল
বৈরাগ্যের রঙে রাঙা অনুরাগে রাঙালো নিখিল।

স্বাধীন ভারতবর্ষে তাঁর দিব্য আবির্ভাব স্মরি'
শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে গর্বে সহর্ষে সহস্র নতি করি।

মন ও তার নিয়ন্ত্রণ

স্বামী বুধানন্দ

অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রকাশিত লেখকের 'Mind and Its Control' পুস্তক থেকে ভাষান্তরিত কিছু অংশ। অনুবাদক : ব্রহ্মচারী অনিরুদ্ধচৈতন্য

মনের নিয়ন্ত্রণ : কঠিন কিন্তু সম্ভব

মন ও তার নিয়ন্ত্রণ এই বিষয়ে আমাদের সকলেরই অত্যন্ত আগ্রহ, কারণ আমরা আমাদের মনের দ্বারা যেভাবে প্রভাবিত হই অন্য কিছুর দ্বারা সেরূপ হই না। এ ব্যাপারে আমাদের সকলেরই কিছু না কিছু জানা আছে এবং আমরা মনকে দমন করতে চেষ্টাও করে থাকি। কিন্তু এই বিষয়ে আমাদের আরও বিশদভাবে জানা দরকার ও ভালভাবে চেষ্টা করাও প্রয়োজন।

কারা আমাদের এই ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন? হ্যাঁ, কেবলমাত্র তাঁরাই, যাঁরা নিজেদের মনকে সম্পূর্ণভাবে জয় করতে সমর্থ হয়েছেন। এই সকল সংযতমনাদের কাছ থেকে যে-সব শিক্ষা আমরা পাই সেগুলিই 'সহজ সাধন প্রণালী' হিসাবে এখানে আমরা উপস্থিত করব।

মনের নিয়ন্ত্রীকরণ এক বড় মজার আভ্যন্তরীণ খেলা। যদি আপনার খেলোয়াড়ী মনোভাব থাকে তবে দৃশ্যত: পরাজিত হলেও আপনি এর আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন। এই খেলা খেলতে প্রয়োজন অত্যন্ত দক্ষতার, আর আবশ্যক সতর্কতা, রসবোধ, সততা, উপস্থিত বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও বীরোচিত বিচক্ষণতার। এই গুণগুলি থাকলে শত পরাজয়ও আমাদের নিরুৎসাহ করতে পারবে না।

কিভাবে যোগের সুউচ্চ অবস্থায় আরোহণ করা যায়, শ্রীকৃষ্ণ গীতা-মুখে তাই বলেছিলেন। তাঁর সেই উপদেশ শুনে অর্জুন হতাশার সুরে ভগবানকে বলেছিলেন—

"হে মধুসূদন, তুমি যে আত্মার সমতারূপ যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলে, মন যেরূপ চঞ্চল, তাহাতে এই সমত্ব ভাব চিরস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই।...

"হে কৃষ্ণ, মন অতি চঞ্চল, প্রবল এবং শরীরও ইন্দ্রিয়াদির বিক্ষেপ উৎপাদক। ইহাকে বিষয়-বাসনা হইতে নিবৃত্ত করা অতিশয় কঠিন। সেই-জন্য উহার নিরোধ আকাশস্থ বায়ুকে পাত্রবিশেষে আবদ্ধ করার ন্যায় দুঃসাধ্য মনে করি।"...[১]

শ্রীকৃষ্ণ মানবপ্রতিনিধির এই অভিযোগ শুনে-ছিলেন এবং তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন তা সকল যুগের সকল মানুষের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ। মনঃসংযমের ক্ষেত্রে ভারতীয় চিন্তা এবং সাধন-প্রণালী বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশের উপর ভিত্তিশীল। তিনি বললেন—"হে মহাবাহো, মন যে দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু হে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা উহা নিগৃহীত হইয়া থাকে।"[২]

এই কথোপকথন থেকে আমরা মনঃসংযমের ব্যাপারে তিনটি মৌল-শিক্ষা পাই—

(১) মনের নিয়ন্ত্রণ সর্বদাই অত্যন্ত কঠিন কাজ এমন কি অর্জুনের মতো বীরপুরুষদের পক্ষেও।

(২) তবুও মনের দমন সম্ভব।

(৩) মনঃসংযমের সুনির্ধারিত পদ্ধতি আছে।

'অভ্যাস এবং বৈরাগ্য' এই দুটি শব্দের দ্বারা মনের নিয়ন্ত্রণের সব রহস্য প্রকাশ করে দিয়েছেন।

সেই সুপ্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ভারতের সকল সাধু-মহাত্মারা একবাক্যে ঘোষণা

১ গীতা, ৬।৩৩-৩৪

২ ঐ, ৬।৩৫

করেছেন যে, 'অভ্যাস এবং বৈরাগ্য' ছাড়া মনের দমনের অন্য কোন পথ নেই। একে অভ্যাস-যোগও বলা হয়।

আমরা এখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও একজন ভক্তের কথোপকথন উদ্ধৃত করব যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কতকগুলি অপরিহার্য বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করছেন, যেগুলি সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—একটু উদ্দীপন হচ্ছে ব'লে চুপ ক'রে থেকো না। এগিয়ে পড়। চন্দন কাঠের পর আরও আছে—রূপার খনি, সোনার খনি!

প্রিয়—আজ্ঞা, পায়ে বন্ধন—এগুতে দেয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—পায়ে বন্ধন থাকলে কি হবে?—মন নিয়ে কথা। মনেই বদ্ধ মুক্ত।...

প্রিয়—মন যে আমার বশ নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সেকি! অভ্যাস যোগ। অভ্যাস কর, দেখবে মনকে যেদিকে নিয়ে যাবে সেই দিকেই যাবে। মন ধোপাঘরের কাপড়। লালে ছোপাও লাল—নীলে ছোপাও নীল। যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যাবে।"[৩]

সন্দেহ নেই যে, 'অভ্যাস এবং বৈরাগ্য' মনঃসংযমের গোপন কথা, কিন্তু প্রশ্ন হল কিভাবে তা আমাদের জীবনে প্রতিফলিত করব। সেইজন্য—

(১) মনকে শাসন করতে হলে আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে সুদৃঢ় করতে হবে।

(২) মনের স্বভাবকে বুঝতে হবে। আর

(৩) কিছু সাধনপ্রণালী শিখে সুচতুরভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে নিয়মিত অভ্যাস করতে হবে।

মনকে বশ মানাতে ইচ্ছাশক্তি কিভাবে দৃঢ় করা যায়?

একথা বলা ঠিক নয় যে, মনকে বশ মানাবার ইচ্ছা আমাদের নেই, বরঞ্চ আমাদের প্রত্যেকের ভিতর সর্বদাই যুদ্ধ চলছে এবং সেটাই প্রমাণ করছে যে, আমাদের ইচ্ছা রয়েছে, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই ইচ্ছা শক্তিশালী নয়।

যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের জীবনের বাসনাগুলির অন্যতম ইন্দ্রিয়সুখের লালসাকে বিচারপূর্বক চিরতরে ত্যাগ করছি, ততক্ষণ পর্যন্ত মনকে দমন করার শক্তি আমাদের দৃঢ় হবে না। দূষিত ক্ষতের মতো ইন্দ্রিয়সুখের লালসা আমাদের শুভ ইচ্ছার জীবনীশক্তিকে গ্রাস করে। ধরা যাক, একজন চাকর আছে যে খুব ভালভাবেই জানে যে, তার বাবু নেশা করে, আর সেই অবৈধ মাদক সংগ্রহ করতে বাবুর ভরসা তারই ওপর। তারপর যদি বাবু আর চাকর দুজনে একসঙ্গে বসে মাদক সেবন করে, তাহলে সেই বাবু কখনই সেই চাকরকে বশে রাখতে পারবে না। মনের ক্ষেত্রেও সেই একই সমস্যা। যে মন দিয়ে আমরা ইন্দ্রিয়সুখের খোঁজ করি এবং সেই সুখ উপভোগ করি, সেই মনকে কখনই আমরা দমন করতে পারব না, যতক্ষণ না ইন্দ্রিয়সুখের লালসা ত্যাগ করছি।

সুখভোগের ইচ্ছা ত্যাগ মানে পরমানন্দ লাভের ইচ্ছা ত্যাগ তা নয়। সুখ কথাটির মানে হল ইন্দ্রিয়সুখ বা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'কাঁচা আমি' থেকে যে সন্তুষ্টি লাভ। এ দুটোই পরমানন্দলাভের পথে বাধা। সুখ-দুঃখের পারে গিয়েই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, পরমানন্দকে লাভ করা যায়। এই পরমানন্দলাভের কামনাকে ত্যাগ করার প্রশ্নই উঠতে পারে না, কারণ আমরা সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ—আর আনন্দই আমাদের অখণ্ড সত্তা।

দুটো বিপরীত জিনিসও কখন কখন সমান দেখায়। দু-রকমের লোক আছে যাদের

৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।২০।৩

কোন মানসিক দ্বন্দ্ব নেই ; একরকম হল তারা, যারা তাদের নিম্নপ্রকৃতির সম্পূর্ণ দাসে পরিণত হয়েছে আর দ্বিতীয় প্রকার হল তারা, যারা তাদের নিম্নপ্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে জয় করতে পেরেছে। অন্য আর সকলেরই মানসিক দ্বন্দ্ব আছে যার পরিণাম হল মনঃসংযম অপর্যাপ্ত অথবা অসফল প্রচেষ্টা। অসফল প্রচেষ্টাগুলি আমাদের দুর্বল ইচ্ছাশক্তি ও মনঃসংযমের ক্ষেত্রে যথার্থ জ্ঞানের অভাবেরই ইঙ্গিত। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল এই, আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে এমন সুদৃঢ় করতে হবে যে, বারবার পরাজয়ের মুখেও আমরা ভেঙে পড়ব না, বরঞ্চ প্রত্যেকটি পরাজয় আমাদের নতুনভাবে উৎসাহিত করবে। মনকে দমন করতে আবার আমরা উদ্যমী হব।

এখন প্রশ্ন হল মনকে বশে আনার ইচ্ছাকে কিভাবে আরও শক্তিশালী করা যায় ? যে-সব বিষয় আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে দুর্বল করে সেগুলিকে দূর করে বদলে অনুকূল কারণগুলির সাহায্যে মনের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করতে হবে।

সন্দেহ নেই যে, আমাদের মধ্যেই এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা মনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু বারবার পরাজিত হয়েছেন। তাই তাঁরা ধরে নিয়েছেন যে, মনের নিগ্রহ তাঁদের দ্বারা সম্ভব নয়। মানসিক এই দুর্বলতার আর একটা কারণ হল আমরা অনেকেই হয়তো ভালভাবে ভেবে দেখিনি, মনকে জয়ের পথে আসল বাধা কোন্‌টা। তা যদি ভাবতাম, তবে বেঁচে থাকার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই আমাদের মনকে জয় করার ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ়তর করতে বাধ্য করত। মনকে দমন করার ব্যাপারে অসাফল্যের জন্য আমাদের অযথা উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ এটা মোটেই একটা সোজা কাজ নয়, এমনকি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের পক্ষেও নয়, যেহেতু চঞ্চলতাই মনের প্রকৃতি। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

"হে কুন্তীপুত্র, বিক্ষেপকারী ইন্দ্রিয়গণ অতি যত্নশীল মেধাবী (শাস্ত্রজ্ঞ) পুরুষের মনকেও বলপূর্বক বিষয় অভিমুখে আকর্ষণ করে।"

"ঘূর্ণায়মান বায়ু যেমন জলস্থিত নৌকাকে উন্মার্গগামী করে, সেইরূপ স্ব স্ব বিষয়ে ধাববান ইন্দ্রিয়গণের যেটিকে মন অনুসরণ করে, সেই ইন্দ্রিয়টিই অসংযত ব্যক্তির আত্মানাত্ম বিবেকবুদ্ধি হরণ করে ও তার মনকে বিষয়াভিমুখী করে।"[৪]

বুদ্ধদেব শেখান—

"যদি কেউ যুদ্ধে সহস্রবার সহস্রব্যক্তিকে জয় করেন—তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা তিনি যিনি নিজেকে জয় করেছেন।"[৫]

এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, মনকে দমন করাই জগতে সব থেকে কঠিন কাজ। সত্যই তা বীরের কাজ। অতএব মনকে দমন করতে চেষ্টা করে যদি আমরা আকস্মিক বা বারংবার পরাজিত হই তবুও আমরা ভেঙে পড়ব না, পরাজয়কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে নেব না। বরঞ্চ পরাজয়ের কাঁটার আঘাতে আমরা আরও বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সহনশীল ও ধী-সম্পন্ন প্রচেষ্টায় উৎসাহিত হব। হতাশ হবার কোন কারণ নেই। মহাপুরুষদের আশ্বাসবাণী রয়েছে আমাদের সঙ্গে—তাঁরা বলেছেন, মনের পরিপূর্ণ সংযম সম্ভব, নিশ্চয়ই সম্ভব। অতএব সমস্ত প্রকার বিপরীত চিন্তাকে আমাদের বিষবৎ পরিত্যাগ করতে হবে।

৪ গীতা, ২।৬০, ৬৭

৫ ধম্মপদ, সহস্‌সবগ্‌গো-৪

মনঃসংযমের পথে বাধা কি ?

মনঃসংযমের পথে বাধা কি তা আমাদের স্পষ্ট করে জানতে হবে। ব্যক্তিজীবনে অসংযত-মনের চরম পরিণাম— মানসিক বিকৃতি। সমষ্টিজীবনে অসংযত-মন জাতির সমগ্র সভ্যতাকে, তা সে যত সমৃদ্ধিশালীই হোক্ না কেন, ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যায়। কম-বেশি নানা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার মূলেও এই অসংযত-মনই দায়ী।

মনের অসংযম ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশে বিশেষভাবে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অসংযমী ব্যক্তির সর্বদাই অস্বাভাবিক মানসিক বিকারের শিকার হবার সম্ভাবনা থাকে, আর মানসিক দ্বন্দ্বের জন্য তার মস্তিষ্ক বিকৃতিও ঘটতে পারে। এমনকি সম্পূর্ণ অনুকূল পরিবেশের মধ্যেও সে তার অব্যক্ত বা বিকশিত গুণগুলি সম্পর্কে নিজে সচেতন হবে না।

যার নিজের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই, সে মানসিক শান্তিলাভ করতে পারে না। যার মানসিক শান্তি নেই সে কেমন করে সুখ লাভ করবে? বাসনা, আবেগ আর উত্তেজনার শিকার হয়ে সে দুঃসাধ্য মানসিক রোগে আক্রান্ত হতে পারে অথবা এক অপরাধীতে পরিণত হবে। আর যদি সে ব্যক্তি কোন এক পরিবারের কর্তা হয় তবে বিশৃঙ্খলা, অব্যবস্থা, দুরাচার, দুঃখজনক পারস্পরিক সম্পর্ক সে সংসারকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে নিয়ে যায়। দুর্ভাগ্যের করাল ছায়া সে পরিবারের বুকে নেমে আসে।

বাংলায় এক প্রবাদ আছে—"গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব তিনের দয়া হলো, একের দয়া বিনে জীব ছারেখারে গেল।" এখানে এক বলতে নিজের মনকে বোঝাচ্ছে। মনের দয়া—মানে মন সংযত হওয়া।

লাভের দৃষ্টিতে দেখলে, মনঃসংযমের দ্বারা সর্বোচ্চ যে ফললাভ হয়, তা হল আধ্যাত্মিক জ্ঞান। এছাড়া সংযত-মন জীবনের বহু ক্ষেত্রেই সুখদায়ক বস্তু লাভ করে। নিয়ন্ত্রিত মনকে সহজেই একাগ্র করা যায়। একাগ্র মনের দ্বারাই জ্ঞান লাভ সম্ভব এবং জ্ঞানই শক্তি।

মনঃসংযমের একটি স্বতঃস্ফূর্ত ফল হল—ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা। সেইরকম লোক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও সফল হয়। সংযত-মন ক্রমে শান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং শান্তভাব থেকে মানসিক শান্তির জন্ম হয়। মানসিক শান্তি সুখ উৎপন্ন করে। একটি সুখী হৃদয় অন্যদেরও সুখী করে। তার কর্মদক্ষতাও বৃদ্ধি পায় এবং স্বাভাবিকভাবেই সে সাধারণতঃ স্থায়ী সৌভাগ্যের অধিকারী হয়। এইরকম লোকদের যে জীবনের অগ্নিপরীক্ষাগুলির সম্মুখীন হতে হয় না, তা নয়,—তবে সেগুলির মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস ও শক্তি কখনও তারা হারায় না। এ ধরনের ব্যক্তিরা যে পরিবারের কর্তা হয়, সেখানে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, আনন্দ, সংস্কৃতি এবং চমৎকার পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। সমাজ সেই ব্যক্তিকে সুখী জীবনের আদর্শ হিসাবে দেখে।

যিনি মনঃসংযমে সক্ষম হয়েছেন, তিনি মানসিক ও শারীরিক ব্যাধি যা মনের চাপ থেকে সৃষ্টি হয়, তার থেকে মুক্ত থাকবেন।

যে ব্যক্তি নিজ মনকে বশে আনতে পেরেছেন, তার মধ্যে তার উচ্চতর স্বভাব প্রকাশ পায় এবং তার সুপ্ত শক্তিগুলি জেগে ওঠে। বন্ধুরা আশ্চর্য হয় এই ভেবে যে, তাদের চোখের সামনেই কিভাবে এ ব্যক্তি এত মহান হয়ে উঠলেন।

একটি বিখ্যাত সংস্কৃত প্রবাদে বলে—"কে হতে পারে বিশ্বজয়ী? শুধু তিনিই, যিনি নিজ মনকে জয় করেন।"

মনঃসংযম বিনা জীবনের কোন ক্ষেত্রেই স্থায়ী

উন্নতি বা সমৃদ্ধি বা শান্তি লাভ করা যাবে না। এমনকি অসংযমী ব্যক্তিরা তাদের প্রাপ্ত সমৃদ্ধিও ধরে রাখতে পারবে না।

এগুলিই হল মন-নিগ্রহের পথে বাধা। মন-জয়ের ইচ্ছাকে দৃঢ়তর করার জন্য আমরা অবশ্যই নিজেদের মনকে শেখাব যে, এছাড়া (মনঃসংযম ছাড়া) আমাদের অন্য কোন পথ নেই। আমরা মনকে দমন করব কি করব না তার উপরই নির্ভর করছে আমাদের সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ জীবন—এ সত্যকে আমাদের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করতে হবে। মানুষের ন্যূনতম শারীরিক চাহিদাগুলি মিটাবার পরও অনেক জিনিসই থাকতে পারে যা প্রয়োজনীয়, কিন্তু মানবজীবনের উচ্চতম লক্ষ্য—আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভ করতে মনঃসংযম ছাড়া আর কোন কিছুই জীবনে অধিক গুরুত্বপূর্ণ নয়। একবার যদি আমরা একথাকে সত্য সত্যই বুঝতে পারি, আর মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে পারি, তবে মনকে বশে আনার ইচ্ছা আমাদের দৃঢ় হবে। ততটাই দৃঢ় হবে যতটা আমাদের প্রয়োজন।

মহাকাব্য

শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায়

খ্যাতনামা কবি—রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব্‌ কালচারের সঙ্গে যুক্ত।

মানুষের ভাববার সময় বড় কম।
সে ভাবতেই চায় না।
বাইরে বৃষ্টি পড়ছে,
শীতের বৃষ্টি—তাই ভেজা গেল না।
বৃষ্টিতে ভিজতে কার না ভাল লাগে!
ঘরে বসে একটা বই নিয়ে পড়তে বসলাম,
বইটা বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা।
এর আগেও এ বই পড়েছি।
কিছু বুঝেছি, কিছু বুঝিনি।
আজ এই বইটা পড়তে পড়তে
হঠাৎ মানুষটার কথা মনে পড়ল।
যে-মানুষটা একটা আদর্শের প্রতীক
যার চোখে অনন্ত সমুদ্রের গভীরতা।
মুক্তি চাই, সর্বাঙ্গীন মুক্তি।
চোখের সামনে যে রূপটা দেখলাম
তা এক গৈরিক সন্ন্যাসীর অপরূপ রূপ।
বলছেন—'কর্ম কর, নিঃস্বার্থভাবে কর্ম কর।
আত্মবিশ্বাস রেখে এগিয়ে যাও।
আমিও তোমাদের মতো অনিশ্চয়তার
দোলায় দুলেছি—
কিন্তু আজ দৃপ্তকণ্ঠে বলতে পারি
মানুষই ভগবান হতে পারে।
চাই সাধনা—ক্ষুদ্র গণ্ডী ভাঙার সাধনা।
বিরাটের সাধনা।
চাই তামসিকতা থেকে মুক্তি।
কাজ করে যাও—জীবনের দিকে ফিরে
তাকিও না।
একদিন দেখবে—তুমিও আনন্দের জগতে
পৌঁছে গেছ।
জগতে যত শোষণ দেখছ—তার মূলে লোভ।
বাসনা পরিত্যাগ কর।
কোনও কিছু বড় পেতে হলে
ছোট ছোট জিনিস ত্যাগ করতে হয়।
ত্যাগ কর—বিরাটের জন্যে ক্ষুদ্রকে ত্যাগ কর
আমার গুরুদেবকে দেখ—
যিনি ত্যাগের সম্রাট।'

বই পড়তে পড়তে কখন থেমে গেছি জানি না।
মনে হোল এসব কথা তিনি আজ
আমাদের সবাইকে বলছেন।
আমাদের জীবনের চলার ছন্দে
বিবেকানন্দের ছন্দ যেদিন মিলবে
আমরা নতুন জীবনের সন্ধান পাব
প্রত্যেকটা জীবন এক-একটা মহাকাব্য হবে।
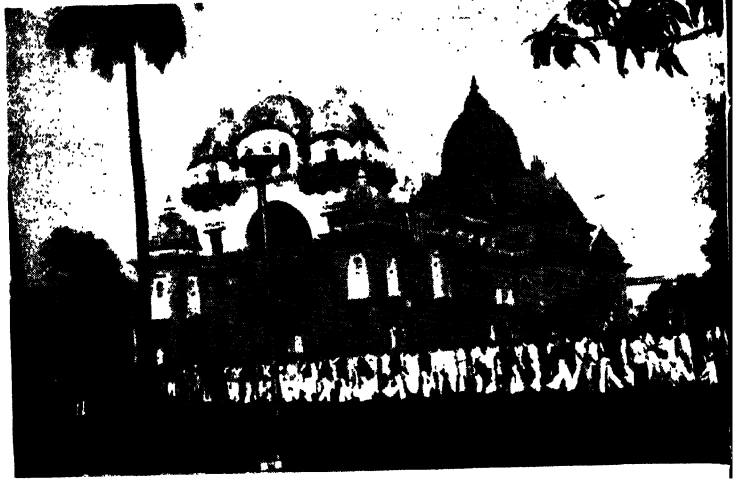
(উপরে ও নীচে)
১২ জানুআরি, ১৯৮৫,
জাতীয় যুবদিবসে বেলুড় মঠে
যুব-সমাবেশ।

(মধ্যে)
যুব-সমাবেশে শ্রীমৎ স্বামী
বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ এবং
শ্রীমৎ স্বামী অভয়ানন্দ মহারাজ
(প্রথম সারিতে যথাক্রমে দ্বিতীয়
ও তৃতীয়)। ছবিতে সর্ববামে
স্বামী বন্দনানন্দজী এবং
সর্বদক্ষিণে স্বামী আত্মস্থানন্দজী।

'স্বামীজীর আশীর্বাদ তোমাদের উপর বর্ষিত হোক'

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

গত ১২ জানুআরি ১৯৮৫, জাতীয় যুবদিবসে, বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে পাঁচ সহস্রাধিক তরুণ-তরুণীর এক সমাবেশে পূজ্যপাদ মঠাধীশ মহারাজের উদ্বোধনী ভাষণ।

যুবক বন্ধুগণ,

আজ তোমরা এখানে একত্রে মিলিত হয়েছ কেন? কারণ, তোমরা স্বামী বিবেকানন্দকে ভালবাস, তিনি যা বলেছেন তা তোমাদের ভাল লাগে, তাছাড়াও তাঁর সম্বন্ধে তোমাদের আরও অনেক কিছু জানার ইচ্ছা; দেশকে কিভাবে উন্নত করতে পারা যায় সে-সম্বন্ধে স্বামীজী যা বলে গিয়েছেন তাও তোমরা জানতে চাও। এ-সকল বিষয়ে তোমরা আরও শুনবে জানবে এই আশায় তোমরা এখানে একত্রিত হয়েছ। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস তোমরা আজ অনেক কিছু শিখে যাবে।

তোমাদের আমার একটা কথা জোর দিয়ে বলবার আছে। তা হচ্ছে, ভারতবর্ষের উন্নতি অন্য কোন পথ দিয়ে হবে না, হবে শুধুমাত্র ধর্মের মাধ্যমে। চিরকাল ঐ রকমই হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। বুঝতে হবে, এই কারণেই দুই মহাপুরুষ—শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ এদেশে জন্মেছেন। এঁদের বর্জন করে আমরা কোন প্রকারেই উন্নতি করতে পারব না। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজীকে যুবমণ্ডলীর নেতা নির্বাচিত করে আজ তাঁর জন্মদিনে জাতীয় যুবদিবস পালন আমাদের পক্ষে একটা খুব আনন্দের বিষয়, গর্বের বিষয়। লোকে বলে, ধর্ম ধর্ম করে ভারতের এই দুরবস্থা। এ-কথা ঠিক নয়। আমরা ধর্ম সঠিকভাবে পালন করতে পারিনি, ধর্মটাকে বুঝে উঠতে পারিনি, প্রকৃত ধর্ম কি তা ভুলে গিয়েছিলাম। সেজন্য আমাদের ভুলভ্রান্তি মনে করিয়ে দেবার জন্য, আমাদের সঠিক পথ দেখিয়ে দেবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন। আর তাঁরই নির্দেশ উপদেশ স্বামীজী সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

এখন ধর্ম দিয়ে কিভাবে দেশের উন্নতি হবে জিজ্ঞাসা করতে পার; প্রশ্ন করতে পার, সমাজ ব্যবস্থায় এখন যা পচন ধরেছে এগুলি পরিষ্কার হবে কি করে? তুমি ঘরে বসে মালা ঠক্ ঠক্ করলে হবে কি? স্বাভাবিকভাবেই এ-সকল কথা উঠতে পারে। এ-সকল সমস্যার সমাধানের জন্য ঠাকুর ও স্বামীজী আমাদের দিয়ে গেছেন একটি নতুন মন্ত্র। সে নতুন মন্ত্রটা কি? নতুন মন্ত্র বলে, জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করতে হবে। মানুষকে শিবজ্ঞানে সেবা করতে পারলে সমস্ত কর্মের সঙ্গেই আমরা ভগবানকে জড়াতে পারব, আর আমরা যা কিছু করব তা ভগবানের জন্যেই করব। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দিনচর্যা করতে পারলে ভগবানকে ভুলে যাবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। যেমন জপ ধ্যানের সময় ভগবানের উপর মনস্থির রেখে একাগ্র হয়ে ভাবনা চিন্তা করি, তেমনি সেই ভগবানকেই যদি আমরা প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে দেখতে শিখি, তাহলে কাজের ভিতরেও ভগবানকে আমরা ভুলে যাব না। এভাবে জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ছিল সে দ্বন্দ্ব দূর করে দিয়ে ঠাকুর ও স্বামীজী এদের মধ্যে সমন্বয় এনে দিয়েছেন। ধর্মের মাধ্যমে কর্ম হতে পারে, আবার

কর্মের মাধ্যমেও মানুষের ধর্মের দিকে উন্নতি হতে পারে, শেখাচ্ছে এই নতুন মন্ত্রটি। এই মন্ত্রই হচ্ছে এ-যুগের সর্বোপযোগী মন্ত্র।

এ-ছাড়াও স্বামীজী আরও অনেক কথা বলে গিয়েছেন আমাদের উন্নতির জন্য, সমাজের উন্নতির জন্য। কিন্তু এটা বোঝা উচিত যে, তিনি এ-সমস্তই বলেছেন একটা বিশেষ দিক্ থেকে। বিশেষ দিক্ মানে কি? তিনি ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। তিনি ছিলেন আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। সেই আত্মজ্ঞানের আলো দিয়ে তিনি সমস্ত কিছুই scan (যাচাই) করে দেখেছেন। তিনি দেখেছেন সমাজকে, দেখেছেন সমাজের ভিতরে কি দোষ-ত্রুটি আছে। আর আত্মার যে-জ্ঞান যে-আলো সেই আলো দিয়ে সমস্ত সমাজকে বিশ্লেষণ করে তিনি সমাজের সার্বিক উন্নতির উপায় বলে গিয়েছেন। সে কারণে আমাদের স্বামীজীকে ভাল করে পড়ে বুঝতে হবে। নাটক-নভেল পড়ার মতো স্বামীজীর বই পড়লে চলবে না। খুব ভাল করে পড়তে হবে। শাস্ত্রেতেও আছে প্রথম শ্রোতব্য—শুনতে হবে। তারপর মন্তব্য—ভাল করে চিন্তা করতে হবে। তারপর নিদিধ্যাসিতব্য—ধ্যান করতে হবে। সেইজন্য বলছি স্বামীজী সম্বন্ধে শুনে প্রথম স্বামীজীর পাঠ গ্রহণ কর, তারপর সেগুলি চিন্তা কর। বাইরের যে-সব ভাবনা রয়েছে তাদের সঙ্গে তুলনা করে দেখ। যেমন কষ্টিপাথরে দেখে কতটা খাঁটি সোনা আছে তেমনি বাইরের আদর্শগুলিকে যাচাই করে দেখ। ভাল করে দেখ, আমাদের আদর্শে কতটা খাঁটি সোনা আছে, তারপর কাজে লাগ। এইভাবে তোমাদের এগুতে হবে। তাছাড়াও স্বামীজী বলে দিয়ে গেছেন দেশের উন্নতি করতে গেলে কি কি করা দরকার। তার কয়েকটা কথা তোমাদের বলে দেই। সর্বপ্রথম বলেছেন 'চরিত্র-গঠন' করতে হবে; চরিত্র গঠিত না হলে কোন কাজ করা যাবে না, চরিত্র গঠন করতে গেলে spirituality (আধ্যাত্মিকতা) চাই। তারও আগে ধর্ম করতে গেলে আমাদের চাই দৃঢ় বলিষ্ঠ শরীর। সেইজন্যই স্বামীজী বলেছেন, তোমরা ফুটবল ভাল করে খেল, তাহলে গীতা ভাল বুঝতে পারবে। এর মানে, শরীরে যথেষ্ট শক্তি না থাকলে এ-সব চিন্তা করা, ধ্যান করা বা বড় বড় কাজ করা, অসম্ভব হয়ে পড়বে। সেইজন্য তিনি বলেছেন, শরীর শক্ত করতে হবে। এ কারণেই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের লেখক, শাস্ত্র লেখবার সময় প্রথমেই ভূমিকা করেছেন, তুমি আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে একখানা মামুলি medical বই লিখতে যাচ্ছ কেন? তোমার আদর্শ তো ধর্ম! সে কারণে বলছেন, "শরীরম্ আদ্যম্ খলুধর্ম সাধনম্"—শরীর ভাল না হলে কোন ধর্মই হয় না। শরীর শক্ত হলে তখন খুব ধ্যান জপ করতে পারা যায়। এইজন্য স্বামীজী বলেছেন, দৃঢ় শরীর দরকার। বলিষ্ঠ লোক দরকার। তাহলেই প্রকৃত উন্নতি হতে পারে। আর চরিত্র-গঠনের কথাও বলেছেন। তারপর নিজের উপর আশা ভরসা না রাখতে পারলে কোন কাজই হয় না। মনে স্থির প্রত্যয় থাকা চাই যে, আমি এ-কাজ করবই করব। আমি ঠিক করতে পারব। এরূপ ভাবনায় নিজের উপরে দৃঢ় বিশ্বাস এনে দেয়। সেরূপ লোক দিয়েই কাজ হয়। আর স্বামীজী যা সবচেয়ে জোর দিয়ে বলে গেছেন তা হচ্ছে ত্যাগ। আমাদের দেশে চিরকাল ত্যাগের সাধনা চলে আসছে। স্বামীজী পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া, ঈর্ষা, দ্বেষ এগুলি

বর্জন করে, ভালবাসা প্রচার ও প্রসার করতে বলেছেন। পরস্পরের মধ্যে চাই ভালবাসা, বিশেষতঃ যারা সমাজে পিছিয়ে পড়েছে, যারা অস্পৃশ্য, যারা অশিক্ষিত যাদের এতদিন আমরা লক্ষ্যই করিনি, তাদের দুঃখ-কষ্ট জানতে হবে। বুঝতে হবে যে, তাদের পরিশ্রমের ফলেই আমরা বড় হয়েছি ; এই বিষয়টি লক্ষ্য করে স্বামীজী বলেছেন, তাদের উন্নতি না হলে তাদের সমাজে যথাযোগ্য মর্যাদা না দিতে পারলে ভারতবর্ষ উন্নত হতে পারে না। এই কথা বলে তিনি তাঁর "বর্তমান ভারত" প্রবন্ধে দিঙনির্দেশ দিয়েছেন—কিভাবে সমস্ত ভারতবর্ষের লোককে নিজের ভাই বলে আপনার করে নিতে হবে। তোমরা সেটা পড়ে দেখবে। সে-সব পড়ে তোমাদের মন তৈরি করতে হবে, তারপরে তোমরা কাজে এগুবে।

শেষকালে আমি তোমাদের একটা কথা বলি। তোমরা হয়তো অনেক লেকচার শুনলে, অনেক বই পড়লে, নানারকম চিন্তাও করলে কিন্তু তাতে কাজ কিছু এগুবে না। ইংরেজীতে একটা কথা আছে—"An ounce of practice is more than a ton of talks." এক টন কথার চাইতে এক আউন্স কাজ গুরুত্বপূর্ণ। সেইজন্য বলছি, তোমরা যদি অল্প কিছুও কাজ করতে পার তাহলেও ভাল। ছেলেমেয়েরা যারা এখানে এসেছ তোমরা তোমাদের আশপাশে যারা অশিক্ষিত রয়েছে তাদেরকে একটু লেখাপড়া শেখাতে পার ; তাদের একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে শেখাতে পার ; তাদেরকে ভাল কথা বলে বা ধর্ম উপদেশ দিয়ে একটু সাহায্য করতে পার। অবশ্য বড় বড় সংস্থা (Organization) করে সংস্থার মাধ্যমে এ-সব কাজ হতে পারে, কিন্তু বড় রকমের সঙ্ঘ-সংস্থা ছাড়া এ-কাজ হতে পারে না, এটা ঠিক নয়। আসলে যেটা সহজসাধ্য, সেটা হচ্ছে তোমরা নিজেরা চার-পাঁচজন একত্রে মিলিত হয়ে কিভাবে গাঁয়েতে উন্নতি হতে পারে সেটা ভাবনা-চিন্তা করে অনায়াসে কাজে এগিয়ে যেতে পার। সেইজন্য তোমাদের বিশেষ করে বলছি, স্বামীজীর রচনা পড়ে চিন্তা করে তাঁর আদেশমতো কাজ করতে না পারলে আর কি লাভ হল ? স্বামীজী তোমাদের কাছে অনেক কিছু আশা করে গিয়েছেন, আরও বলে গিয়েছেন যে, তিনি যা কিছু চিন্তা-ভাবনা করেছেন তা তিনি যুবকবৃন্দের উপর অর্পণ করে দিয়েছেন। উত্তরাধিকারীরূপে তারা স্বামীজীর পরিকল্পিত এ-সব কাজের দায়িত্ব বহন করবে, এ-আশা তিনি পোষণ করতেন। আশা করি, তোমরা স্বামীজীকে নিরাশ করবে না। সেইজন্য আজ তোমরা সঙ্কল্প গ্রহণ কর যে স্বামীজীর কাজে তোমরা লেগে যাবে, আর স্বামীজী যে-পথে ভারতবর্ষকে নিয়ে যেতে বলেছেন সেই পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

তোমাদের কাছে আমার আবেদন, আজ এখান থেকে যাবার আগে তোমরা মনে মনে একটা স্থির সংকল্প গ্রহণ করবে। দেখবে তোমরা যতই স্বামীজীর কাজ করবে ততই তোমাদের ভিতর থেকে শক্তি খুলে যাচ্ছে। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। একটা যুবক ছেলে একাই জঙ্গলে গিয়ে উপজাতিদের মধ্যে কাজ আরম্ভ করছিল। সে-সময়ে তার সঙ্গে কেউই ছিল না। আজকে দেখছি অনেক লোক, সরকারী লোক বে-সরকারী লোক, তার পিছনে দৌড়াচ্ছে। কাজ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। ক্রমেই বিরাট আকার ধারণ করছে। সেইজন্য বলছি, আত্মবিশ্বাস থাকলে তোমরা সব কিছুই করতে পারবে, এ-কথাটা মনে রাখলেই হল। স্বামীজীর আশীর্বাদ তোমাদের উপর বর্ষিত হোক। তাঁর কাছে আমার এই প্রার্থনা।

নানা প্রসঙ্গে

চিরন্তন কাহিনী

'কৃত কর্মফল ভুঞ্জিতে হইবে'

পৌরাণিক যুগে সোমক নামে এক ধার্মিক রাজা ছিলেন। তাঁর একশত রানী—যাঁরা সবাই ছিলেন যেমন ধার্মিক, তেমনি রূপে-গুণে সমান। কোন সন্তান না থাকায় তাঁদের মনে খুব দুঃখ ছিল। অবশেষে বৃদ্ধ বয়েসে রাজার এক রানীর গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। রাজা ও একশত রানী পুত্রের মুখ দর্শন করে মহা খুশি। রাজা পুত্রের নাম রাখেন জন্তু।

একশত মায়ের একটি পুত্র। তাই সেই পুত্রের উপর রানীদের স্নেহধারা শতধারায় বর্ষিত হত। পুত্রের সুখের জন্য রানীরা সবাই মিলে সর্বদা চেষ্টা করতেন। একবার পুত্র জন্তুর কোমরে একটা পিঁপড়া কামড়ায়। সে চিৎকার করে ওঠে। বালক পুত্রের সহসা চিৎকারে তার জননীগণও তার দুঃখে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করতে থাকেন। অন্তঃপুরের মধ্যে মহা কোলাহল।

রাজা সোমক ঋত্বিক ও অমাত্যগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রাজকর্ম পরিচালনা করছিলেন। হঠাৎ অন্তঃপুরের কোলাহল শুনে একজন দৌবারিককে ভিতরে পাঠালেন ব্যাপার কি খবর আনার জন্য। দৌবারিক দ্রুত খবর নিয়ে এসে জানাল যে; রাজকুমারকে পিঁপড়া কামড়ানোর জন্য তার ক্রন্দন ও রানী-মাতাদের এই বিলাপ। রাজা অন্তঃপুরে গিয়ে সকলকে সান্ত্বনা দিয়ে আবার রাজসভায় ফিরে এসে মন্তব্য করেন: সংসারে যার একমাত্র পুত্র তাকে ধিক্! তার থেকে পুত্র না হওয়া ভাল। কারণ একপুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় সর্বদা আকুল হয়ে থাকতে হয়।

তারপর ঋত্বিকদের উদ্দেশে রাজা সোমক বললেন: হে ব্রাহ্মণগণ! আমার শতপত্নী থেকেও একটি মাত্র পুত্র লাভ করেছি। এর ফলে আমাদের যাতনার আর শেষ নেই। এখন আমার ও পত্নীগণের যৌবন গত, ফলে আমাদের সকলের প্রাণ ঐ পুত্রের উপর নিবদ্ধ হয়েছে। এমন কোন যুক্তিযুক্ত কর্ম কি নেই, যার দ্বারা আমি শতপুত্র লাভ করতে পারি?

ঋত্বিকদের মধ্যে একজন বললেন: হে মহারাজ! শতপুত্র লাভের কর্ম আছে; তবে আপনি কি সে-কর্ম করতে সমর্থ হবেন?

রাজা সোমক উল্লসিত হয়ে ঋত্বিককে বললেন: হে ভগবন্! সে কার্য বা অকার্য যাই হোক আপনি সেই কর্মের কথা বলুন, যার দ্বারা আমি শতপুত্র লাভ করতে পারব।

ঋত্বিক রাজার অভয় বাণী শুনে বললেন: হে রাজন্! আমি যে যজ্ঞ করব, তাতে আপনার একমাত্র পুত্র জন্তুকে চর্বি মাখিয়ে আহুতি দিলে যজ্ঞকর্ম পূর্ণ হবে। তখন যজ্ঞভূমি থেকে যে গন্ধ বের হবে তা আপনার পত্নীগণ আঘ্রাণ করলে তাঁরা সকলে একটি করে বীর্যবান পুত্র প্রসব করবেন। আর আপনার এই জন্তু নামে পুত্রটি তার পূর্বের মাতার গর্ভে আবার জন্মগ্রহণ

করবে। তা আপনি বুঝতে পারবেন তার বামপার্শ্বে স্বর্ণবর্ণের চিহ্ন দেখে।

রাজা পুত্র কামনায় পত্নীগণের বাধা সত্ত্বেও ঐ ঋত্বিককে দিয়ে যজ্ঞ করালেন অবশেষে প্রত্যেক রানী গর্ভ ধারণ করলেন। যথাসময়ে রাজার একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করল।

জন্তু নামে পুত্রটিও আবার তার জননীর গর্ভে জন্মাল। আগের মতোই সে পিতা-মাতার প্রিয় হয়ে উঠল। সবার স্নেহ ও আশীর্বাদে সে ক্রমে বড় হতে লাগল।

কিছুকাল পরে রাজা সোমকের সেই ঋত্বিক পরলোকে গমন করলেন এবং তার কিছুকাল পরে রাজারও দেহান্ত হল।

মৃত্যুর পর সোমক তাঁর যাজককে নরকে দুঃখভোগ করতে দেখলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: হে ব্রাহ্মণ! আপনি নরকে দুঃখভোগ করছেন কেন?

উত্তরে নরকাগ্নিতে সন্তপ্ত ব্রাহ্মণ বললেন: হে রাজন্! তোমার সন্তান উৎপাদক-যজ্ঞে পৌরোহিত্য করেছিলাম—তার কর্মফলে এই নরকাগ্নির যন্ত্রণাভোগ করছি।

সন্তপ্ত ব্রাহ্মণের কথা শুনে সোমক মনে মনে দুঃখিত হলেন। তিনি যমরাজকে বললেন: হে ধর্মরাজ! আমার যাজককে মুক্ত করে দিন। আমি তাঁর প্রতিনিধি হয়ে নরকভোগ করব, কারণ আমার জন্যই তিনি নরকাগ্নির যন্ত্রণাভোগ করছেন।

ধর্মরাজ বললেন: হে রাজন্! কর্মকারীর কর্মফল সে ভিন্ন অপরে কেউ কখনও ভোগ করে না। তোমার জন্য এই যে দেখছ এই সব কর্মফল নির্দিষ্ট আছে।

সোমক বললেন: হে ধর্মরাজ! আমার জন্য অনুষ্ঠানকারী যাজককে আমি পরিত্যাগ করে পুণ্যফলভোগ করতে চাই না। আমার পুণ্যকর্মে তাঁরও সমান অধিকার আছে। আমি চাই তাঁর সঙ্গে সমান ভাবে পুণ্যফল ও নরকভোগ করতে।

তখন ধর্মরাজ বললেন: হে রাজন্! বেশ তাই হোক। তবে আগে তুমি ব্রাহ্মণের সঙ্গে নরকভোগ কর, পরে পুণ্যফলভোগ করবে

[মহাভারত, বনপর্ব অবলম্বনে।]

স্মৃতি-সঞ্চয়ন

'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রচার'

শ্রীশ্রীস্বামীজীর অন্যতম শিষ্য পূজ্যপাদ জ্ঞান মহারাজ দেশের তদানীন্তন যুবসমাজের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবাবেগ সঞ্চারণায় একজন চিরস্মরণীয় পথিকৃৎ। 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রচার' নামে তাঁর একটি অলক্ষ্য অনাড়ম্বর কিন্তু বহুবিদিত ভাবপ্রচার যন্ত্র ছিল,—যা তখনকার দিনে কেন, ইদানীং কাল পর্যন্ত মৌলিকতায় অতুলনীয়, কার্যকারিতায় অনন্ত। ছোট-বড় নানা আকারের পত্র-পুস্তিকাদিও তিনি আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে মুদ্রিত করেছিলেন—ঐ একই উদ্দেশ্যে। উদ্দেশ্য—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রচার। এই ভাবপ্রচারের ভূমিকা-স্বরূপ জ্ঞান মহারাজের লেখা একটি 'নিবেদন' এখানে পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে,—প্রচারমুখর বর্তমান কালেও যার তাৎপর্য অপরিসীম। উল্লেখ্য, তিনি নিজেকে 'প্রকাশক' বলেই ব্যক্ত করেছেন,—লেখকরূপে কোথাও স্ব-নাম উল্লেখ করেননি।

ওঁ

॥ নিবেদন ॥

এই প্রচারের নাম—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রচার। ভাবপ্রচারই এর উদ্দেশ্য। যে প্রচার বাহির হয়, প্রভুই তার যোগান দেন। আমি বাহির করি মাত্র। সেই জন্যই প্রকাশক বলে আমার নাম থাকে। প্রকাশকের সকল কার্যও আমাকে করতে হয় না। যারা 'প্রচার'কে ভালবাসে তারাই ইহাতে সাহায্য করে। তারা জানে এ আমার কাজ নয়—ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ। তারা ভালবাসা থেকে এই কাজ করে। কোন ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা থেকে নয়—যাঁর কাজ তাঁর প্রতি ভালবাসা। এই ভালবাসায় স্বার্থ নেই। তারা নাম-যশও চায় না। "যেমন করান তেমনি করি" এই ভাব নিয়ে তারা চলে, অগ্র পশ্চাৎ ভাবে না। সে-জন্য তারা কোন কথাই জিজ্ঞাসা করে না। শুধু কাজ করে যায়।

"কোন প্রশ্নে তোমাদের নাহি অধিকার,
কাজ কর, করে মর,—
এই কর সার।"

ইহাই একমাত্র কথা।

স্বামীজীর নিকট হইতে প্রচার সম্বন্ধে ঠাকুরের যাহা উপদেশ পাইয়াছি—তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল

"প্রকৃত প্রচার কয় রকম জান? লোককে না ভজিয়ে আপনি ভজলে যথেষ্ট প্রচার করা হয়। যে আপনি মুক্ত হতে চেষ্টা করে, সে যথার্থ প্রচার করে। যে আপনি মুক্ত, শত শত লোক কোথা হতে আপনি এসে তার কাছে শিক্ষা লয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঠাকুর বলতেন, ফুল ফুটলে ভ্রমর আপনি এসে জুটে।" অলম্ ইতি—

প্রকাশক

জ্ঞান-বিজ্ঞান

সাপের কামড়

সাপের কামড় একটি জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা বিশেষ করে এশিয়ার গাঁয়ে-গঞ্জে। কারণ এশিয়াতে ধরতে গেলে সবরকমের বিষাক্ত সাপের দেখা মেলে, ডাঙায় বা সাগরে, কেউটে বা গোখরো, শঙ্খচূড়, শাঁখামুটে, কালাচ (শিয়রচাঁদা), চন্দ্রবোড়া, রাজবংশী, পাহাড়ীচিতি, এমনকি এমন ধরনের কেউটে—যা তিন-চার মিটার দূরে ফনা তুলে দাঁড়িয়ে মুখ থেকে বিষ ছিটিয়ে দিতে পারে থুথু ছুঁড়ে দেবার মতো করে—সবার দেখা মেলে এশিয়াতে—এদের সবাই ভারতেও আছে। গ্যাবুন ভাইপার বলে চন্দ্রবোড়া জাতীয় একরকম সাপ পাওয়া যায় এশিয়ার কোথাও কোথাও, যা কামড়ালে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হতে পারে।

এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে বছরে বিষাক্ত সাপের কামড়ে মারা যায় ১০,০০০ লোক। সংখ্যাটা একটা অনুমান মাত্র। ভারতে একটি পুরানো পরিসংখ্যান অনুযায়ী বছরে মৃত্যুসংখ্যা ২৫,০০০। কিছুদিন আগে আরেকটি পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, শুধু ভারতেই বিষাক্ত সাপের কামড়ে বছরে ১০,০০০ লোক মারা যায়। আসল মৃত্যুর সংখ্যা হয়তো আরও বেশি।

বার্মাতে সাপের কামড়ে মৃত্যুর হার পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বেশি—ওখানে বছরে ১০,০০০ লোককে সাপে কামড়ায়, মৃত্যুহার ১০ শতাংশ। ভারতে ২ লাখ লোককে প্রতি বছর সাপে কামড়ায়, বেশির ভাগ কামড় খায় সন্ধ্যা ৬টা থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত—এদের বেশির ভাগই চাষী। যারা সমুদ্রে মাছ ধরে, তাদের কেউ কেউ সমুদ্রসাপের কামড় খায়। এখানে বলা দরকার, প্রায় সব সামুদ্রিক সাপই বিষাক্ত।

ভারতে প্রায় ৩০ ধরনের সামুদ্রিক সাপ আছে। ভারতে প্রায় ৭০ ধরনের বিষাক্ত সাপ দেখতে পাওয়া যায়। মালয়েশিয়ায় সমুদ্রসাপের কামড়ের খবর বেশি পাওয়া যায়, কামড়ায় যারা মাছ ধরে সমুদ্রে, তাদের।

পশ্চিমবঙ্গের একটি পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে। সরকারী পরিসংখ্যান, কিন্তু দশ বছরের। হয়তো আসল ঘটনা কমবেশি, সম্ভবতঃ বেশিই হবে, কিন্তু মোটামুটি একটা চিত্র পাওয়া যায়, যা অন্য কোথাও পাওয়া দুর্লভ। ১৯৬৯—১৯৭৮ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে মোট প্রায় ৭৫,০০০ লোককে সাপে কামড়েছে। এদের মধ্যে মৃত্যুর হার ৩ শতাংশ।

বিষাক্ত সাপে কামড়ালে দেখা গেছে, ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে তারা ঠিকমতো বিষ ঢালতে পারে না। পরিসংখ্যান বলছে ১০ জনকে কেউটে কামড়ালে মরবার সম্ভাবনা থাকে একজনের মাত্র, আধুনিক চিকিৎসায় তা আরও কমানো যায়। কাজেই সাপে কামড়ানোর ফলে মৃত্যু যে খুব বেশি হবে এই ধারণা অমূলক বরং উল্টোটাই সত্য।

প্রাথমিক চিকিৎসা কী হবে? সময় বেশি নেওয়া চলবে না। প্রথমে যাকে সাপে কামড়েছে, তাকে সাহস দিতে হবে, কামড়ানোর জায়গাটা ধুয়ে বা মুছে দিতে হবে, যাতে যদি কোন বিষ লেগে থাকে, চলে যাবে। যে জায়গায় কামড়েছে, সেটা যেন নড়াচড়া না করে, এজন্যে রোগীকে পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হবে। রোগীর সাহস বাড়াবার জন্যে একটা বাঁধন দেওয়া চলতে পারে,—তারপর সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে হবে কাছের কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা হাসপাতালে, যেখানে অ্যান্টিভেনম পাওয়া যায়। যত তাড়াতাড়ি অ্যান্টিভেনম দিয়ে চিকিৎসা করা হবে, তত বাঁচার সম্ভাবনা বাড়ে। কিন্তু দেখা গেছে, পশ্চিমবঙ্গেও—যেখানে মানুষ বেশি শিক্ষিত ও সজাগ, সেখানেও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসার আগে ৮০ শতাংশ রোগী ওঝার ঘর ঘুরে আসে। বলা বাহুল্য, মৃত্যুহার আরও কমবে এই কুসংস্কার যদি কাটে।

দেশ-বিদেশ

অস্ট্রেলিয়ার ফুল ও পশুপাখি

অজস্র ফুলের সমারোহ দেখতে পাওয়া যায় অস্ট্রেলিয়ায়। সেখানে প্রাকৃতিক নিয়মে আপনা থেকেই শত শত রকমের ফুল ফুটে থাকে। সব জাতীয় ফুল অস্ট্রেলিয়ার সব জায়গায় পাওয়া যায় না। বৈচিত্র্যময় এবং উৎকৃষ্ট ধরনের ফুল দেখতে পাওয়া যায় বালীপ্রধান জমিতে, উপত্যকা ভূমিতে ও পাহাড়ের ঢালু জায়গায়। নিউ-সাউথ-ওয়েলসে খুব সুন্দর সুন্দর লাল ফুলের গুচ্ছ দেখতে পাওয়া যায়। ভিক্টোরিয়া গ্রামপিয়ানে যে ২০ রকম জাতির ফুল দেখা যায় তা আর কোথাও পাওয়া যায় না। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় অনেক দুষ্প্রাপ্য ফুল দেখতে পাওয়া যায়। অদ্ভুত অদ্ভুত ২,০০০ জাতির ফুল এখানে ফোটে। অস্ট্রেলিয়ার মানুষ ফুলের ব্যাপারে বড় শৌখীন। প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতে একটা ফুলের বাগান অবশ্যই থাকে। ফুল না হলে যেন তারা বাস করতে পারে না।

ফুল যেমন অস্ট্রেলিয়ার অত্যাশ্চর্য সম্পদ তেমনি সেখানকার পশুপাখিও বড় অদ্ভুত। এখানে এমন অনেক পশুপাখি দেখতে পাওয়া যায় যা পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

এখানকার জন্তুজানোয়ার ঘাস-খেগো। স্তন্যপায়ী মাংসাশী জন্তুজানোয়ার এখানে নেই বললেই চলে। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ সমুদ্র-বেষ্টিত

হওয়ার জন্য অন্য দেশ থেকে মাংসাশী জন্তু জানোয়ার এখানে আসার সুযোগ পায়নি ঘোড়া, হরিণ, বিড়াল প্রভৃতির পরিবর্তে এখানে দেখতে পাওয়া যায় অদ্ভুত থলিযুক্ত প্রাণী। থলি-যুক্ত প্রাণীদের মধ্যে কাঙ্গারু পৃথিবী বিখ্যাত। সাধারণত তাদের উচ্চতা ১'৮ মিটার এবং ওজন ৯০ কিলোমিটারের মতো হয়। ৪০ রকম জাতির কাঙ্গারু এখানে দেখতে পাওয়া যায়। তারা সবাই নিরামিষাশী ও মাটির নিচে বাস করে। এরা ৯ মিটার দূরত্ব এক লাফে যেতে পারে। দৌড়ায় ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটারের মতো।

শান্ত ও নিরীহ কোয়ালা (Koala) নামে এক ধরনের প্রাণী আছে। এদের উচ্চতা অর্ধ মিটারের বেশি হয় না। গায়ের লোম ধূসর-বাদামী রঙের। কান গোলাকার এবং নাক খুব তীক্ষ্ণ। এরা বাস করে গাছে এবং পাতার রস খেয়ে বেঁচে থাকে। এদের সাধারণত দেখতে পাওয়া যায় অস্ট্রেলিয়ার পূর্বাংশে।

পূর্বে স্তন্যপায়ী ও মাংসাশী থলিযুক্ত কিছু কিছু প্রাণী অস্ট্রেলিয়ায় দেখা যেত। তারা ছিল পোকামাকড় খাওয়া ইঁদুর। এই ইঁদুর জাতীয় প্রাণী আদিবাসীদের কাছে বিড়াল এবং তাসমানিয়াদের কাছে বাঘ ও শয়তান নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু আজ আর অস্ট্রেলিয়ার প্রধান ভূমিতে তাদের দেখতে পাওয়া যায় না। তারা 'ডিঙ্গো'দের ভয়ে পালিয়ে গেছে। এশিয়া থেকে আদিবাসীরা যখন অস্ট্রেলিয়ায় যায় তখন তারা সঙ্গে করে নেকড়ে জাতীয় বন্য কুকুরকে নিয়ে যায়। এই কুকুরকে ডিঙ্গো (dingo) বলে। পরে আদিবাসীদের কাছ থেকে তারা জঙ্গলে পালিয়ে যায়। তবে তারা তাসমানিয়াতে যেতে পারেনি।

কাঠঠোকরা, শকুনি ও মরাল ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার নানারকমের পাখি দেশ-বিদেশে যায়। এখানে নানারকম রঙের তোতাপাখি আছে। প্রায় ৬০ রকম জাতির তোতাপাখি এখানে পাওয়া যায়। অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম সমুদ্র-তীরে কালো রঙের রাজহাঁস দেখতে পাওয়া যায়, যা আর কোথাও দেখা যায় না।

পৃথিবী-খ্যাত ল্যায়ার বার্ড (Lyre bird) অস্ট্রেলিয়ায় দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণত এদের দেখতে পাওয়া যায় কুইন্সল্যাণ্ড ও উত্তরে নিউ-সাউথ-ওয়েলসে। এদের লেজ খুব বড় হয়। তবে ছোট লেজও দেখা যায়। স্ত্রী থেকে পুরুষ ল্যায়াররা খুব সুন্দর গান গাইতে পারে। এরা মনের আনন্দে নাচে ও গান করে করে বেড়ায় যখন ওদের বাচ্চা হয়। নাচগানের জন্য এরা পৃথিবী-খ্যাত।

ব্রলগা (Brolga) নামে সারসের মতো এক ধরনের পাখি পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় দেখতে পাওয়া যায়। এরা দল বেঁধে নাচে। দল বেঁধে নাচতে নাচতে এরা বহু দূরে চলে যায়। চারটি বা ততোধিক ব্রলগা একসঙ্গে একই তালে তালে পা ফেলে নাচে। এই রকমভাবে ছোট ছোট দল করে একসঙ্গে বহু দল নাচে। যখন ওরা নাচে তখন ওদের পাখাগুলি প্রসারিত করে—দেখতে ভারী সুন্দর লাগে।

আর এক ধরনের পাখি আছে যারা খুব সুন্দর বাসা বাঁধতে পারে। এই পাখি ১৬ রকম জাতির দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকে আলাদা আলাদা করে বাঁসা বাঁধে। প্রত্যেকের তৈরি বাসার মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে।

অস্ট্রেলিয়ায় রঙ-বেরঙের বহু প্রজাপতি দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে কুইন্সল্যাণ্ডে খুব সুন্দর সুন্দর প্রজাপতি দেখতে পাওয়া যায়। ২,০০০ রকম জাতির মাছ অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্র ও নদীতে দেখতে পাওয়া যায়।
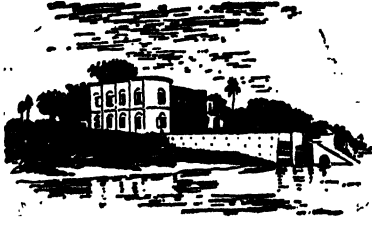
পুস্তক সমালোচনা

ইতিহাস চিন্তায় বিবেকানন্দ—স্বামী সোমেশ্বরানন্দ। প্রকাশক: শ্রদ্ধা প্রকাশন, ২৩৮ মানিকতলা মেন রোড, ফ্ল্যাট নং ৪১, কলিকাতা-৫৪। পৃঃ ৭+২২০ ; মূল্য : পঁচিশ টাকা।

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ লিখিত আলোচ্য পুস্তকটি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ইতিমধ্যে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন, যেগুলির মূল বিষয়বস্তু হল স্বামী বিবেকানন্দের ইতিহাস-চিন্তা। স্বামীজীর লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ, বিশেষত 'বর্তমান ভারত', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'পরিব্রাজক' নামে তাঁর তিনটি মৌলিক রচনা, তাঁর বক্তৃতা ও পত্রাবলী থেকে লেখক বিশেষ নৈপুণ্যের সঙ্গে ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি এবং বিভিন্ন সমাজের বৈশিষ্ট্য ও বিকাশ সম্বন্ধে স্বামীজীর মতামত বিশ্লেষণ করেছেন, এবং তার পাশাপাশি কার্ল মার্কস, ভেবার, বার্কলে, টয়েনবী, ফিশার, উইল ডুর‍্যান্ট প্রমুখ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের বক্তব্য উদ্ধৃত করে এদের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। বিশ্ব-ইতিহাস আলোচনায় স্বামীজীর মৌলিকত্ব পরিস্ফুট করাই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য বলে মনে হয়।

'প্রকাশকের নিবেদন' ও 'ভূমিকা' বাদে আলোচ্য গ্রন্থটি মোট দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। 'ইতিহাস চেতনার ভূমিকা' অধ্যায়ে লেখক মানব-সভ্যতার বিকাশের মূল সূত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন পাশ্চাত্য মনীষীর মন্তব্য উদ্ধৃত করে এ বিষয়ে স্বামীজীর বক্তব্য: 'জড়ের ওপর চেতনার আধিপত্য বিস্তারের ইতিহাসই পৃথিবীর ইতিহাস', আলোচনা করেছেন। 'অগ্রগতির তাৎপর্য' শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক স্বামীজীর বিবেচনায় কোন্ ঐতিহাসিক ঘটনাকে প্রগতিশীল, আর কাকেই বা প্রতিক্রিয়াশীল বলা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। স্বামীজীর বক্তব্যের মূল কথা,—রাষ্ট্র ও সমাজের ক্ষমতা যখন কোন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয় তখন সভ্যতার সংকোচন ঘটে এবং প্রতিক্রিয়ার সূচনা হয়; বিপরীত ভাবে ঐ ক্ষমতা যখন জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তখনই সভ্যতার প্রগতি লক্ষিত হয়। 'প্রাচ্য সমাজ' নামে পরবর্তী অধ্যায়ে লেখক বিশেষ ভাবে ভারত ও চীনের ইতিহাস আলোচনা করেছেন, এবং এই দুই দেশে উৎপাদন ব্যবস্থা, সমাজ-গঠনের বৈশিষ্ট্য, ধর্মের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ে স্বামীজীর বিক্ষিপ্ত মন্তব্যগুলি একত্র করে তাদের বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন। দাস-প্রথা, সামন্ততন্ত্র, আমলাতন্ত্র, ভূমির অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজের মৌলিক পার্থক্যও তিনি এই প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। 'ইতিহাস প্রসঙ্গে মার্কস ও বিবেকানন্দ' শীর্ষক অধ্যায়ে লেখক এই দুই মনীষীর ইতিহাস—চিন্তার মৌলিক পার্থক্য নির্দেশ করে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গিকেই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। 'ইতিহাসে শ্রেণী-শাসনের রূপবৈচিত্র্য' এবং 'একালীন বিশ্বে রাষ্ট্রচরিত্র' এই দুটি অধ্যায়ে লেখক প্রধানত স্বামীজীর 'বর্তমান ভারত' বইটির অনুসরণে তাঁর উল্লিখিত শ্রেণীগুলির (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) বৈশিষ্ট্য এবং প্রতিটি

শ্রেণীর শাসনের ভাল-মন্দ দিকগুলি আলোচনা করেছেন। বর্তমান পৃথিবীর কোথায় কোন্ শ্রেণীর শাসন চলেছে লেখক তাও স্বামীজীর বক্তব্য অনুসরণ করে ব্যাখ্যা করেছেন। 'ভারতীয় ধর্মান্দোলনের ইতিহাস' অধ্যায়ে লেখক বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে যে-সব ধর্মান্দোলন ঘটেছে তাদের কয়েকটিকে বেছে নিয়ে সেগুলির ঐতিহাসিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। যুগ যুগ ধরে ভারতাত্মা কিভাবে ধর্ম থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছে তা-ও এখানে সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে। এর পরবর্তী 'প্রাচীন বিশ্বে সমাজ-বিকাশের ধারা' অধ্যায়টি মূলত একটি ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা। প্রাচীন কালে বিভিন্ন দেশে সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাস এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে, বিনিময়-প্রথা, উ[illegible]ন-ব্যবস্থা, বিবাহ-প্রথা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়কে কেন্দ্র করে। 'গান্ধী, লেনিন, বিবেকানন্দ' অধ্যায়টি একটি তুলনামূলক, মনোজ্ঞ আলোচনা। 'নিবেদিতার দৃষ্টিতে স্বামীজীর বাণী' শীর্ষক শেষ অধ্যায়টি স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা ও তাৎপর্য বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতার কয়েকটি বিতর্কমূলক উক্তির বিশদ ব্যাখ্যা। বইয়ের শেষে লেখক একটি নাতিদীর্ঘ গ্রন্থপঞ্জী সংযোজন করেছেন উৎসাহী পাঠকদের এই বিষয়ে আরও পড়াশোনার ব্যাপারে সাহায্য করতে।

বিশ্ব-ইতিহাস বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের বিচার ও বিশ্লেষণ সম্পর্কে আলোচ্য পুস্তকটি নিঃসন্দেহে একটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ। পথিকৃৎ-এর মর্যাদা দাবী না করলেও লেখক এই বইটিতে যে বলিষ্ঠ চিন্তা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। তাঁর বহু বক্তব্য বিতর্কমূলক বলে মনে হবে মার্কসবাদী ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের কাছে। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো তিনি মার্কসের বক্তব্যের অতি সরলীকরণ করেছেন, বিশেষত 'ইতিহাস প্রসঙ্গে মার্কস ও বিবেকানন্দ' অধ্যায়ে। কিন্তু এই প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে স্বামীজীর ইতিহাস-চিন্তার যে গভীরতা প্রকাশিত হয়েছে, তাকে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই একেবারে অস্বীকার করতে পারবেন না। ইতিহাস, রাজনীতি ও সমাজ-বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে স্বামীজীর প্রজ্ঞার একটি অপেক্ষাকৃত অনালোচিত দিককে তুলে ধরতে এই বইটি বিশেষ সাহায্য করবে। বর্তমান সমালোচকের মতে বইটির আসল সার্থকতা সেখানেই। বইটির একটি ইংরেজী অনুবাদ একান্ত বাঞ্ছনীয়। একমাত্র অভিযোগ—বইটির মুদ্রণকার্য তেমন ভাল হয়নি।

— ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রামকৃষ্ণের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ। অনুবাদক ঃ ঋষি দাস। প্রকাশক ঃ ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭। পঞ্চম সংস্করণ। পৃষ্ঠা ৮+২২৬। মূল্য ঃ কুড়ি টাকা।

ভারতের ঋষি-কণ্ঠে একদা ধ্বনিত হইয়াছিল—একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি। যুগ যুগ ধরিয়া বহু সাধক নিজ নিজ সাধনার ধারা অবলম্বন করিয়া পরিসমাপ্তিতে সেই এক অদ্বিতীয় ভূমা আনন্দসত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। কিন্তু সমন্বয়াদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন নজীরহীন, অনবদ্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: "বহুসাধকের বহুসাধনার ধারা, ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা / তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে, নূতন তীর্থ রূপ নিল এ-জগতে।" 'অসীমের লীলাপথে' এই 'নূতন তীর্থে' ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য পৃথিবীর অপর এক শ্রেষ্ঠ মনীষা রোমাঁ রোলাঁ 'রামকৃষ্ণের জীবন' রচনা করেন। অপূর্ব সাহিত্যিক কুশলতায় যুক্তি ও বিচারভিত্তিক পাশ্চাত্যবাসীর দৃষ্টিতে এই মহাজীবনকে রোলাঁ অবলোকন করিয়াছেন—যাহা পাঠককে এক আনন্দলোকে লইয়া

উপস্থাপন করে। ঐক্যের পূজারী রোলাঁর ভাষায়: "সকল নির্ঝর ও সকল নদীর যেখানে মিলন ঘটিয়াছে, সেই বিধাতারূপী মহানদীর মহাসঙ্গমকে রামকৃষ্ণ যে কেবল নিজের মধ্যে অন্যদের অপেক্ষা পূর্ণতররূপে কল্পনা করিয়াছিলেন তাহাই নহে। তিনি নিজের মধ্যে তাহা সংঘটিতও করিয়াছিলেন।...সেই কারণেই আমি পৃথিবীর মহাতৃষ্ণা দূর করিবার মানসে তাঁহার নিকট এই স্বল্প শুদ্ধবারি আহরণ করিতেছি।...পূত এই উৎস, পূত এই স্রোত-পথ, পূত এই সঙ্গম। এইরূপেই আমরা এই নদীর মধ্যে, ইহার ক্ষুদ্রবৃহৎ উপনদীগুলির মধ্যে, এমন কি সেই মহাসমুদ্রের মধ্যে—আলিঙ্গন করিব জাগ্রত বিধাতার গতিমান সমগ্র বিশ্বকে।" (পৃঃ ২)। প্রাচ্যের পাঠকদের উদ্দেশে উপরোক্ত কথার পর তিনি বলিতেছেন: "আমি ইউরোপের জন্য এক নবীন শরতের ফসল আনিয়াছি, আনিয়াছি আত্মার এক নূতন বাণী, ভারতের মহা-সংগীত। এই মহা-সংগীতের নাম রামকৃষ্ণ।...তাই আজ আমি জ্বরবিকার-গ্রস্ত বিনিদ্র ইউরোপের কর্ণে সেই ধমনীর শোণিত-স্পন্দন ধ্বনিত করিতে চাই। চাই ইউরোপের শুষ্ক ওষ্ঠাধরকে 'অমরতার' শোণিত-ধারায় সজল-সিক্ত করিয়া তুলিতে।" (পৃঃ ৯,১১)

মূল ফরাসী ভাষায় ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত এই 'নবীন শরতের ফসল'-এর ইংরেজী তর্জমা বহু-পূর্বেই হইয়াছিল। প্রখ্যাত জীবনীকার ও অনুবাদক শ্রীঋষি দাস প্রায় একুশ বৎসর পর ইংরেজী তর্জমা হইতে ঐ 'ফসল' বঙ্গভাষাভাষীকে উপহার দেন প্রচুর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া। পাশ্চাত্যের প্রেক্ষাপটে উদাহৃত, আমাদের অপরিচিত বা স্বল্প পরিচিত ভাবগুলিকে বুঝিবার সুবিধার জন্য লেখক রোলাঁ প্রচুর ব্যাখ্যা ফুটনোটে দিয়াছেন—বঙ্গানুবাদে অতিরিক্ত ব্যাখ্যার সংযোজন ঐ ভাবগ্রহণে অধিকতর সহায়তা করিয়াছে। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সাহিত্যিক রোমাঁ রোলাঁর যুক্তি ও ভক্তিমিশ্রিত রচনার এমন রসপুষ্ট, প্রাঞ্জল, সাবলীল ও যথার্থ অনুবাদের জন্য শ্রীদাস সকলের ধন্যবাদার্হ। "পূজ্যপাদ মাধবানন্দজী মহারাজ অনুবাদ দেখিয়া দিয়া"-ছেন, প্রকাশকের এই উক্তি নিঃসন্দেহে এই অনূদিত পুস্তকটির সুউচ্চ মানের কথাই ঘোষণা করে।

বর্তমান সংস্করণে সামান্য মুদ্রণ প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অনুবাদের ভাষা সহজতর এবং আক্ষরিক না হইলেই অধিক আদরণীয় হইত। যেমন: 'বিশ্বকৌশিক', (পৃঃ ৭৪, ২১১), 'ধর্মাত্মক শান্তি' (পৃঃ ৭৭), 'ধানুকী' (পৃঃ ৫), 'মা...ভর করিয়াছেন' (পৃঃ ২৬), 'কাপট্য' (পৃঃ ৪), 'রামকৃষ্ণ গ্রাম্য চাষাড়ে (?) ভাষায়...বলিতেন' (পৃঃ ১৯৪), 'পরম সত্যের পরম জ্ঞান, পরম অসীম' (পৃঃ ১৭৯) ইত্যাদি। একটি স্থানে অর্থের অসঙ্গতিবোধ হইল: 'কিন্তু জাতিবিচারের ব্যাপারে তাঁহার দাদার (?) অত্যন্ত গোঁড়ামি ছিল' (পৃঃ ২০)। উদ্ধৃতির মধ্যের অধিকাংশ কথা কথামৃত বা লীলাপ্রসঙ্গ হইতে দেওয়া হইয়াছে—সর্বত্র অমনটি করিতে পারিলে আরও হৃদয়গ্রাহী হইত।

যাহাই হউক, এই সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ঐ অনুবাদের রসাস্বাদনে কোন বাধাই সৃষ্টি করে না—বরং মনকে টানিয়া লইয়া যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-চেতনায়, যেখানে "তিনি যেন স্নানার্থী, তিনি ডুবিতেছেন, ডুবিবার পরমুহূর্তেই আবার ভাসিয়া উঠিতেছেন, আর সেই সঙ্গে তিনি বহিয়া আনিতেছেন সমুদ্র-শৈবালের সুমিষ্ট গন্ধ, মহা-সমুদ্রের লবণাক্ত আস্বাদ।"...(পৃঃ ১২৬)

ঝকঝকে কাগজে পরিচ্ছন্ন লাইনো টাইপে প্রায় নির্ভুল ছাপা এই আকর্ষণীয় গেট্‌আপের সুন্দর বাঁধানো বইটি পাঠকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিবে। প্রকাশকের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সুরুচিরই পরিচয় ইহা। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাববাহী এই পুস্তকটির বহুল প্রচার আমরা কামনা করি।

—স্বামী সর্বদেবানন্দ
রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ
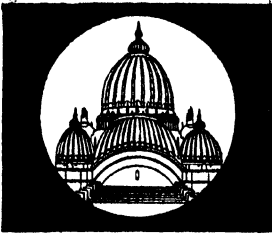
রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব

বেলুড়মঠে স্বামী বিবেকানন্দের ১২৩তম আবির্ভাব-তিথি গত ১৩ জানুআরি ১৯৮৫, এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ, ভজনকীর্তনাদির মধ্য দিয়ে পালিত হয়। মঠভূমি সারাদিন আনন্দ মুখরিত ছিল। দুপুরে প্রায় ১০,০০০ ভক্ত নরনারীকে হাতে-হাতে রন্ধিত প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে মঠপ্রাঙ্গণে স্বামী আত্মস্থানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসভায় স্বামীজীর জীবনী ও বাণী আলোচনা হয়।

জাতীয় যুবদিবস

বেলুড়মঠে প্রথম জাতীয় যুবদিবস গত ১২ জানুআরি, ১৯৮৫ অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ থেকে ৩০ বছরের ৫,০০০ যুবক-যুবতী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে। এরা প্রায় সবাই নিকটবর্তী স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী। তারা স্বামীজীর ভাবাদর্শে জাতীয় ঐতিহ্যের উপর বক্তৃতা, আবৃত্তি, পাঠ ও আলোচনাদি করে। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ। উপস্থিত সমস্ত প্রতিনিধিকে সকালে ও দুপুরে প্রসাদ দেওয়া হয়।

প্রায় প্রত্যেক শাখাকেন্দ্রে অতি উৎসাহের সঙ্গে এক প্রেরণাপ্রদ পরিবেশে স্বামীজীর বাণী ও সঙ্গীত সহ পথপরিক্রমা, আলোচনা, বক্তৃতা, বিতর্ক, আবৃত্তি, ব্যায়াম-প্রদর্শন, স্বামীজীর বাণী সম্বলিত ছোট ছোট পুস্তিকা বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে জাতীয় যুবদিবস পালিত হয়। কিছু কিছু শাখাকেন্দ্রের আয়োজিত যুবদিবসে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। নিচের শাখাকেন্দ্রগুলি থেকে যুবদিবস পালনের সংবাদ আমাদের কাছে এসেছে :

কাঁথি (মেদিনীপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন।

মোরাবাদি (রাঁচি) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম।

গ্রামীণ সংবাদপত্র-পত্রিকার সম্পাদক-সম্মেলন

গত ১ ও ২ ডিসেম্বর ১৯৮৪, **নরেন্দ্রপুর** রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গ্রামীণ সংবাদপত্র-পত্রিকার সম্পাদক-সম্মেলন ও পত্র-পত্রিকা প্রদর্শনী হয়। এই সম্মেলনে যোগদান করেন ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর, নদীয়া, হুগলী, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমদিনাজপুর, হাওড়া, বর্ধমান, দার্জিলিং ও কলকাতাকে ধরে মোট ১০টি জেলার ২৬ জন সম্পাদক-প্রতিনিধি। দুদিনের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'পরিবর্তন' পত্রিকার সম্পাদক ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম লোকশিক্ষা পরিষদের পরিচালক শ্রীশিবশঙ্কর চক্রবর্তী প্রতিনিধি-সম্পাদকদের স্বাগত ভাষণ জানিয়ে বলেন : রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে গ্রামীণ মানুষের উন্নতিকল্পে পত্র-পত্রিকা কিভাবে সাহায্য করতে পারে তার জন্য এই সম্মেলন ডাকা। সার্বিক গ্রামসংগঠনে গ্রামীণ পত্র-পত্রিকা যাতে নিজেদের স্বার্থত্যাগ করে এগিয়ে আসে তার জন্য ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক-প্রতিনিধিদের আহ্বান জানান। গ্রামীণ সম্পাদক-প্রতিনিধিরাও তাঁদের বক্তব্য রাখেন এই

অনুষ্ঠানে। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুগান্তর' পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক দেবব্রত মুখোপাধ্যায় এবং 'উদ্বোধনে'র সংযুক্ত সম্পাদক স্বামী অজজানন্দ। তাঁরা গ্রামীণ পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে গ্রাম ও গ্রামবাসীর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও উন্নতির কিছু পথরেখা নির্দেশ করেন।

ভিত্তিস্থাপন

গত ১৩ জানুআরি ১৯৮৫, **বেলুড় সারদা-পীঠের** 'সমাজ-সেবক শিক্ষণ মন্দির' ভবনের ভিত্তিস্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ। অনুষ্ঠানে বহু সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী ও শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্র-কৃতিত্ব

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের প্রাথমিক বিদ্যালয় শিশু বিদ্যাপীঠের ছাত্র-ছাত্রীরা গত ১৯৮৩-র বৃত্তি-পরীক্ষায় ২৪ পরগনা আলিপুর সদরের মধ্যে ১ম, ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ৯ম স্থান অধিকার করেছে।

উৎসব

মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৫ থেকে ১৮ ডিসেম্বর ১৯৮৪, শ্রীশ্রীমায়ের ১৩২তম আবির্ভাব উৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন

গত ২০ জানুআরি হাবড়া (২৪ পরগনা) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচারের বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেলের উদ্যোগে বাণীপুরে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা স্বামী বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ১৩ শত যুবপ্রতিনিধি সারাদিনব্যাপী এই সম্মেলনে যোগদান করে। সম্মেলনে আলোচ্য বিষয় ছিল 'বিশ্ব যুববর্ষ এবং স্বামী বিবেকানন্দ' ও 'আজকের যুবজীবনে কেন স্বামী বিবেকানন্দকে চাই'। প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে স্বামী অজজানন্দ এবং স্বামী শিবরূপানন্দ। সভা পরিচালনা করেন সাংবাদিক শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী। যুবপ্রতিনিধিরাও আলোচনায় যোগ দেয়। এই উপলক্ষে জেলাব্যাপী এক বক্তৃতা প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়।

দন্তচিকিৎসা শিবির

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে ১৫ ডিসেম্বর ১৯৮৪, **শ্যামলাতাল** (উত্তরপ্রদেশ) রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে দাতব্য দন্তচিকিৎসা শিবির স্থাপিত হয়। তাতে ১৬৮ জন রোগী চিকিৎসিত হন

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

পশ্চিমবঙ্গে বন্যাত্রাণ: কলিকাতার নিম্নাঞ্চল ছাড়াও জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, নদীয়া, মেদিনীপুর, হাওড়া ও ২৪ পরগনা—৭টি জেলায় প্রাথমিক ত্রাণকার্য চলছে।

পশ্চিমবঙ্গে শৈত্যত্রাণ: ২৪ পরগনা জেলার রহড়া বালক আশ্রমের চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত ৫টি গ্রাম এবং ৪টি কলোনির ৫৩৩টি পরিবারবর্গের মধ্যে আশ্রমের তত্ত্বাবধানে ৩,৪৪৭টি পুরানো পোশাক ও ব্যবহৃত সোয়েটার ইত্যাদি বিতরিত হয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশে ঘূর্ণিবাত্যাত্রাণ: রাজমুন্দ্রী রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে ২০০ খানি ধুতি, ৮৪ খানি কম্বল, ১৫২ খানি বিছানার চাদর, ৭১৮টি লণ্ঠন, ৩৯৪টি মাদুর, ১৫ খানি তোয়ালে এবং ৩২৮টি ফতুয়া নেলোর জেলার ঘূর্ণিবাত্যাবিধ্বস্ত ভাকাড়ু, নাইডুপেটা এবং সুলুরপেটা তালুকের ৩৪টি গ্রামের অধিবাসীদের

মধ্যে পুনরায় বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও উক্ত জেলার ১১০টি গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে ৫২,১৬২ খানি ফতুয়া ও আণ্ডারওয়্যার বিতরিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গাসাগর মেলা চিকিৎসা-ত্রাণ: সেবাপ্রতিষ্ঠান, সরিষা ও মনসাদ্বীপ কেন্দ্রের সহযোগিতায় গঙ্গাসাগরে মকরসংক্রান্তি মেলায় বিগত ১০—১৫ জানুআরি, ১৯৮৫-তে আউটডোরে ১,৭৩৬ জন এবং ইনডোরে ১৬ জন রোগী চিকিৎসিত এবং ২০ খানি সুতীর কম্বল বিতরিত হয়েছে।

শ্রীলঙ্কা শরণার্থী ত্রাণ: মাদ্রাজের ত্যাগরাজনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কা থেকে আগত ও মন্দাপম শিবিরে আশ্রিত শরণার্থীদের খাদ্য বিতরণ ও শিশুদের শিক্ষা-প্রকল্পের কার্য যথারীতি চলছে।

পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন: "নিজের বাড়ি নিজে কর" প্রকল্পানুসারে বন্যাবিধ্বস্ত বীরভূম জেলার জাহানাবাদ, লাউদাহ, বেজরা এবং ৪টি অন্যান্য গ্রামের অধিবাসীদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে নির্মীয়মাণ ৫৩টি আবাসগৃহের কাজ যথারীতি চলছে। এছাড়া উক্ত পরিকল্পনাধীন বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১৩টি বাড়ির সংস্কারকার্য পরিসমাপ্ত।

মেঘালয়ে পুনর্বাসন ও অগ্নিত্রাণ: চেরাপুঞ্জী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের মাধ্যমে মেঘালয়ের খাসি পাহাড় অঞ্চলের অন্তর্গত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পাটাঘাট গ্রামের দুর্গত পরিবারবর্গকে "নিজের বাড়ি নিজে কর" প্রকল্পানুসারে নির্মিত ৬টি বাড়ি দান করা হয়। এছাড়া উক্ত গ্রামের দুর্গত পরিবারবর্গকে কম্বল এবং গুঁড়া দুধ দেওয়া হয়।

পূর্ব খাসি পাহাড় জেলাস্থিত শেলাবাজার এলাকা অগ্নিতে মর্মান্তিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় স্থানীয় দুর্গত অধিবাসীদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে ১৭টি বাড়ির "নিজের বাড়ি নিজে কর" প্রকল্প শিলং আশ্রম কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। এবং তাছাড়াও অগ্নিতে ক্ষতিগ্রস্ত অধিবাসীদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে অর্থ সাহায্য প্রদানের কর্মসূচীও হাতে নেওয়া হয়েছে।

আসামে ভূমিকম্প ত্রাণ ও পুনর্বাসন: শিলচর রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম কাছাড় জেলায় মারাত্মক ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহে দ্রুত ত্রাণকার্য শুরু করেছে। ইতি-মধ্যেই ৫০০ খানি কম্বল দুর্গত নরনারীর মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

সৌরাষ্ট্রে বন্যাত্রাণ ও পুনর্বাসন: রাজকোট আশ্রমের মাধ্যমে জুনাগড় জেলাস্থিত আনন্দপুর, পাটাপুর ও কেরালা গ্রামে নবনির্মিত তিনটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ২,৯১২ সেট শিশু-পোশাক বিতরিত হয়েছে।

উদ্বোধন-সংবাদ

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-তিথি উৎসব: স্বামী বিবেকানন্দের ১২৩তম আবির্ভাব-তিথি গত ১৩ জানুআরি ১৯৮৫, রবিবার 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'তে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ ও ভজন-কীর্তনাদির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। দুপুরে বহু ভক্ত নরনারীকে হাতে-হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামীজীর সম্বন্ধে আলোচনা করেন স্বামী চৈতন্যানন্দ।

২৩ জানুআরি স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ এবং ২৫ জানুআরি স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'তে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা হয় এবং সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী অজজানন্দ

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী অজজানন্দ প্রত্যেক রবিবার ও বৃহস্পতিবার যথাক্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ও শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

২৭ জানুআরি, রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত আলোচনা করেন স্বামী চৈতন্যানন্দ।

বিবিধ সংবাদ

অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডলের অষ্টাদশ বার্ষিক যুবশিক্ষণ-শিবির

গত ২৫ থেকে ৩০ ডিসেম্বর ১৯৮৪, বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির ছাত্রাবাসে অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডলের অষ্টাদশ বার্ষিক যুব শিক্ষণ-শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানা বৃত্তি অবলম্বনকারী মোট ৬৪৯ জন যুবক এই শিবিরে যোগদান করেন। ২৫ ডিসেম্বর বিকালে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় স্বামী বন্দনানন্দ কর্তৃক মহামণ্ডলের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। নানা কর্মসূচী ও বিশিষ্ট বক্তাগণের সংক্ষিপ্ত ভাষণের দ্বারা সাতদিনের একটি সুন্দর অনুষ্ঠান হয়। এই শিবিরের মূল লক্ষ্য ছিল যুবকদের স্বামীজীর আদর্শে উদ্দীপিত করে চরিত্রগঠন, জাতীয় সংহতি, ধর্মসমন্বয়, দেশপ্রেম, সমাজসেবা প্রভৃতি ভাবে উদ্বুদ্ধ করা। ১২৮ জন শিবিরবাসী কেন্দ্রীয় ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত দান করেন।

জাতীয় যুবদিবস

গত ১২ জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন থেকে ১৯ তারিখ পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী 'যুবসপ্তাহ' সারা ভারতে পালিত হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছিলেন। ভারতের নানা প্রান্তের স্কুল-কলেজ এবং বিভিন্ন সংস্থার উৎসাহী যুবক-যুবতীরা স্বামীজীর নামে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যুবদিবস পালন করে। নিম্নলিখিত সংস্থাগুলি থেকে স্বামীজীর বাণী লিখিত ব্যানার সহ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বক্তৃতা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা প্রভৃতির মাধ্যমে যুবদিবস পালনের সংবাদ পাওয়া গেছে :

ত্রিপুরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাব-প্রচার পরিষদ্।

আরিট (মেদিনীপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম।

কন্যাকুমারী (দক্ষিণ ভারত) বিবেকানন্দ রক্ মেমোরিয়াল।

স্যাণ্ডেলের বিল (২৪ পরগনা) আঞ্চলিক বিবেকানন্দ পাঠচক্র।

ঘুঁটিয়াবাজার (হুগলী) অশোক পাঠচক্র।

আলিপুর জংশন (জলপাইগুড়ি) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম।

উৎসব

ইম্ফল (মণিপুর) রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ১৫ ডিসেম্বর ১৯৮৪, শ্রীশ্রীমায়ের ১৩২তম আবির্ভাব-তিথি নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। সন্ধ্যায় ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী চন্দ্রানন্দ ও শ্রীকে. রাধাবিনোদ সিংহ।

লামডিং (আসাম) শ্রীসারদা সঙ্ঘের দ্বারা আয়োজিত ১৫ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-তিথি নানা আনন্দোৎসবের মাধ্যমে তিনদিন ধরে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির মন্দিরপ্রাঙ্গণে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, পাঠ, ভজনগান, লীলাগীতি, হাসপাতালে দুঃস্থরোগীদের ফলপ্রসাদ বিতরণ করা প্রভৃতি হয়।

মাকড়দাহ (হাওড়া) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয়প্রাঙ্গণে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে ১৫ থেকে ১৬ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাব-তিথি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। ১৬ ডিসেম্বর মন্দিরের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন স্বামী স্মরণানন্দ। দুদিনের বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন যথাক্রমে স্বামী শিবরূপানন্দ, শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী, স্বামী স্মরণানন্দ ও স্বামী দিব্যানন্দ।

শ্যামপুকুর স্ট্রীট (কলিকাতা) শ্যামপুকুর বাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ১৩ জানুআরি ১৯৮৫, নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামীজীর আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

বসিরহাট (২৪ পরগনা) শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২০ জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে আহূত ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী গহনানন্দ ও স্বামী পরেশানন্দ।

নববারাকপুর (২৪ পরগনা) বিবেকানন্দ সংস্কৃত পরিষদে গত ২৫ ডিসেম্বর ১৯৮৪, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য আবির্ভাব স্মরণোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন স্বামী অজজানন্দ।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **শ্রীমতী সাধনা সেনগুপ্ত** তাঁদের ভদ্রেশ্বর সারদাপল্লীর বাড়িতে গত ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৮৪ মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত পীড়ায় দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে পূজ্যপাদ খোকা মহারাজ (সুবোধানন্দজী) কলমা আশ্রমে (ঢাকা জেলায়) শুভাগমন করেন,—শ্রীশ্রীমায়ের চরণাশ্রিতা শ্রীমতী তরলা সেনগুপ্তের কন্যা সাধনা সেখানেই তাঁর কাছে কৃপালাভে ধন্যা হন। কলমানিবাসী বিশিষ্ট প্রাচীন ভক্ত—শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রিত সন্তান শ্রীবিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত সাধনার মাতুল।

শ্রীমতী সাধনা নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী এবং কিছুকাল ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার কর্মেও নিযুক্ত ছিলেন। আজীবন কুমারী অবস্থায় থেকে শিক্ষিকার কর্মকেই তিনি নিজ জীবনব্রত-রূপে বেছে নিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন বালিকা বিদ্যালয় তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পার্ষদদের অনেকেরই, বিশেষ করে পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অশেষ স্নেহলাভে তিনি কৃতার্থা হয়েছেন। দক্ষিণেশ্বর সারদা মঠের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল।

তাঁর দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করুক,—আমাদের এই প্রার্থনা।

ভ্রমসংশোধন

পৌষ, ১৩৯১ সংখ্যায় ৭৯৩ পৃষ্ঠার উপর থেকে ৫ম পঙ্‌ক্তিতে '৯ জুলাইয়ের' পরিবর্তে '৯ মে', ৮০৮ পৃষ্ঠায় ২য় কলমের নিচের দিক থেকে ১৭শ পঙক্তিতে '১৩২৭'-এর পরিবর্তে '১৩১৭' এবং ৮৩০ পৃষ্ঠার ২য় কলমের উপর থেকে ১১শ পঙ্‌ক্তিতে 'জানুআরি ১৯৮৫' স্থলে 'ডিসেম্বর ১৯৮৪' পড়তে হবে।—সঃ

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ
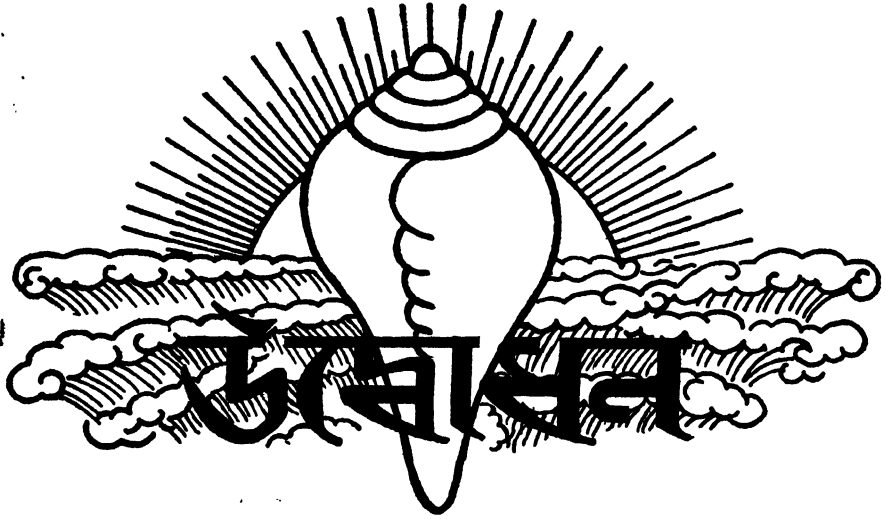
৮৭ তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৩৯১

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মহাসমাধি

বেদনা-বিনম্র হৃদয়ে বর্তমান সংখ্যার সূচনাতেই একটি নিদারুণ বার্তা লিপিবদ্ধ করতে হচ্ছে। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ গত ২৯ ফাল্গুন, ১৩৯১ (বুধবার, ১৩ মার্চ ১৯৮৫), বেলুড় মঠে অপরাহ্ণ ৩-১৭ মিনিটে মহা-সমাধিলাভ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। সম্প্রতি শ্বাসনালী ও ফুসফুস-সংক্রান্ত নানা উপসর্গে তিনি অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন—অবশেষে হৃদ্‌যন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর দেহান্ত হয়। উল্লেখ্য যে, গত দুবছর ধরে তিনি বার্ধক্যজনিত পীড়াদি ছাড়াও স্বরনালীতে ক্যানসার রোগে ভুগছিলেন, কিন্তু সুচিকিৎসার ফলে উক্ত রোগ-কষ্টের সম্পূর্ণ উপশম হয়েছিল।

ফেব্রুআরির মাঝামাঝি থেকেই পূজ্যপাদ মহারাজের শরীর ভাল যাচ্ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথি-পূজার দিন ভোরে মন্দিরে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন ও প্রণামাদি নিবেদন করেন এবং অতঃপর শেষরাত্রে পুনরায় মন্দিরে যান—যথাবিধি ব্রতী ব্রহ্মচারিগণকে সন্ন্যাস-ব্রহ্মচর্যাদিও প্রদান করেন। এ-সব ছাড়াও ঐদিন দুবেলা তিনি চেয়ারে বসে সহস্র সহস্র দর্শনার্থীকে দর্শন দিয়েছিলেন। তাঁর ক্ষীণ স্বাস্থ্যে এই ধকল অত্যন্ত গুরুতর প্রতিক্রিয়া আনে। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব হলে তিনি অসম্মতি জানান। অগত্যা বেলুড় মঠে তাঁর নির্দিষ্ট শয়নকক্ষেই বিশিষ্ট চিকিৎসকদের দ্বারা চিকিৎসার যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি করা হয়। সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী সেবক-মণ্ডলী এবং বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ অহর্নিশ আপ্রাণ তাঁর সেবাকার্যে নিরত থাকেন। কিন্তু ২ মার্চ তাঁর অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। ঐ সংবাদ সন্ধ্যায় রেডিও মারফতে এবং সঙ্ঘের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রে টেলিফোন এবং টেলিগ্রাম মাধ্যমে জানানো হয়। সেদিন রাত্রে বিভিন্ন আশ্রম থেকে সাধু-ব্রহ্মচারিগণ এবং অগণিত ভক্ত নরনারী তাঁকে দেখার জন্য ছুটে আসেন। তারপর অবস্থার যদিও অল্প উন্নতি হয়, কিন্তু দুর্বলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কখন ভাল কখন মন্দ—এইভাবেই অবস্থা চলতে থাকে। মুখে কিছু খেতে পারছিলেন না,—তাঁর জ্বরও অবিরাম চলছিল—কখন খুব উপরে উঠছিল কখন নিচে নামছিল। ১১ তারিখে অবস্থার সাময়িক কিছু উন্নতি দেখা যায়। কিন্তু ১২ তারিখ রাত্রে আবার অবস্থা ভয়াবহ অবনতির দিকে চলে যায়। সেই রাত্রেই বিভিন্ন

আশ্রমে ঐ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা জানিয়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে অনেক সাধু-ব্রহ্মচারী বেলুড় মঠে ছুটে আসেন। মহারাজজীর শরীরে তখন দারুণ অস্থির ভাব। ভোর-রাত্রের দিকে তিনি একটু ঘুমান। ১৩ তারিখ সকালে অবস্থার অল্প উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। মুখ দিয়ে কিছু তরল ও নরম খাদ্যও গ্রহণ করেছিলেন। নিকটবর্তী চিকিৎসক ও সেবকদের সঙ্গে দু-চারটি কথাও বলেন। কিন্তু দুপুর থেকে পুনরায় তাঁর মধ্যে ভয়ানক অস্বস্তির ভাব দেখা যায়—মাঝে মাঝে বুকের বাঁদিকে হাত দিয়ে কষ্ট অনুভবের ইঙ্গিত করছিলেন। ধীরে ধীরে অবস্থার ভীষণ অবনতি ঘটতে থাকে। ক্রমে শ্বাস-কষ্টও পরিলক্ষিত হয়।

দুপুর ২-৩০ মিনিট নাগাদ সেবকদের বলেন, তাঁকে শয্যায় বসিয়ে দিতে। কিছু সময় পরে সমীপবর্তী সেবকের কাছে তিনি গঙ্গাজল চান। তাঁর হাতে গঙ্গাজল দিলে তিনি তা নিজের মাথায় ও মুখে ছিটান এবং একটু জল আঙুলে করে মুখেও স্পর্শ করান। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণামৃত চান। মুখে একটু চরণামৃত দেওয়া হলে, অকস্মাৎ তাঁর মুখ প্রসন্নতায় ভরে যায়। তারপর করজোড়ে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের নাম করে করে প্রত্যেককে প্রণাম করেন।

প্রায় বেলা ৩টা নাগাদ তিনি সম্পূর্ণ অন্তর্মুখ হয়ে পড়েন, তখন থেকে খুব ধীরে ধীরে নিশ্বাস পড়তে থাকে। ৩-১০ মিনিটে চিকিৎসকের নির্দেশে সেবকগণ মহারাজের অনুমতি নিয়ে তাঁকে শয্যায় বসিয়ে দেন। খুব প্রশান্ত ভাব লক্ষণীয় ছিল ঐ সময়ে; অবশেষে অপরাহ্ণ ৩-১৭ মিনিটে তিনি মহাসমাধিতে প্রবেশ করেন। প্রশান্ত বদন। যেন একটি ছোট শিশু মায়ের কোলে নিশ্চিন্তে ঘুমন্ত! সঙ্গে সঙ্গে খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সাধু-ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরনারী তাঁদের পরম প্রিয় ও শ্রদ্ধাস্পদকে শেষ দর্শন, শেষ প্রণাম জানাতে বেলুড় মঠে আসতে থাকেন। ব্রহ্মচারিগণ বৈদিক স্তোত্র ও গীতা পাঠ করতে থাকেন। মুহূর্তের মধ্যে অগণিত নর-নারীর ভীড়ে সমগ্র মঠভূমি ভরে যায়। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মহারাজজীর পূত দেহ চন্দনচর্চিত করে এবং ফুলমালা দিয়ে সুসজ্জিত করে নিয়ে যাওয়া হয় আরোগ্যভবনের সামনে একটি বড় হলঘরে। সেখানেই মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সারিবদ্ধভাবে হাজার হাজার নরনারী অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁকে শেষ প্রণাম ও দর্শন করে যান। ১৪ তারিখ সকাল থেকে লক্ষাধিক মানুষ তাঁকে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে আসেন। বেলা যত বাড়তে থাকে ব্যাকুল জনস্রোতে মঠপ্রাঙ্গণ ভরে যায়। সবার হৃদয় শোকাহত। বেলা ১০টা নাগাদ আদি মঠবাড়ির প্রশস্ত আঙিনায় আম্রবৃক্ষতলে মহারাজজীর শরীর রক্ষিত হয়—আগন্তুক সকলেই তাঁকে শেষ অর্ঘ্য নিবেদন করেন সেখানে। ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী প্রমুখ ব্যক্তিগণও পুষ্পমাল্যাদি সহ শোকবার্তা পাঠিয়ে দেন বেলুড় মঠে।

বেলা ১২-৩০ মিনিট নাগাদ পূত দেহকে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির হয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ও শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরের সম্মুখে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর মায়ের ঘাটে নামিয়ে ঐ দেহকে গঙ্গাস্নান করিয়ে, নতুন গৈরিক বস্ত্র, চন্দনচর্চিত পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা পরিশোভিত করে সন্ন্যাসাশ্রমের কৃত্যাদিসহ পূজা-আরতি করা হয়। পরে স্বামীজীর মন্দিরের সম্মুখে কিছুক্ষণ দেহ রক্ষিত হয়—সর্বশেষে সমাধিপীঠে। সেখানেই চন্দনকাঠে সুসজ্জিত চিতাগ্নিতে পূজ্যপাদ সঙ্ঘাধীশ মহারাজের পার্থিব শরীরকে আহুতি দেওয়া হয়। অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল বেলা ১-১৫ মিনিটে। সাধু-ব্রহ্মচারিগণের মিলিত কণ্ঠের ভজনগীত ও বেদমন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মহারাজজীর নশ্বর দেহ অনন্তে বিলীন হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ নরনারী নীরবে অশ্রুসজল নেত্রে এই মহা অন্ত্যেষ্টি-যজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেন—গঙ্গাবক্ষেও শত শত নৌকারোহী মানুষও উদ্গ্রীব নয়নে এই দৃশ্য দেখেছেন। বেলা ৩-১৫ মিনিটের মধ্যেই সব সমাপ্তি ঘটে।

শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ বিশদ রচনা আগামী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কথাপ্রসঙ্গে

'মানবের প্রেম-আশে মানুষ সাজিয়া আসে'

'সুমধুর কলধ্বনিতে গঙ্গা তাঁহাকে ঘুম পাড়াইয়া দিত। মধ্যাহ্নে আঁকিয়া-বাঁকিয়া দুই কূল ভাসাইয়া নদীতে আসিত জোয়ার। এই-ভাবে জাহ্নবী ধারার অবিরাম অবিচ্ছিন্ন সঙ্গীতের পটভূমিকায় রামকৃষ্ণ এবং তাঁহার শিষ্যদের সুন্দর মিলন-দৃশ্য রচিত হইত, মঙ্গল উষা ও সন্ধ্যা সমাগম ঘোষণা করিয়া যে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিত, যে শঙ্খধ্বনি হইত, বংশী-মৃদঙ্গ-করতাল বাজিত, ভজনগীতি চলিত, তাহারই ঐকতানে ভাগীরথীর কলতানও উদয়াস্ত মিশিয়া যাইত। বায়ুভরে উদ্যান হইতে বহিয়া আসিত ধূপ-গন্ধের মতো পবিত্র হৃদয়ানন্দী কুসুমসৌরভ।···গোল বারান্দার স্তম্ভগুলির ফাঁকে ফুটিয়া উঠিত গঙ্গার স্রোতধারায় প্রবহমান অনন্তের আভাস।

'কিন্তু ঐ মন্দির-পাদপীঠ আরও একটি ভিন্নতর নদীর অবিরাম প্রবাহে অনুক্ষণ আলোড়িত থাকিত। উহা ছিল মানুষের নদী —সেই নদী ছিল তীর্থযাত্রীর, ভক্তের, জ্ঞানী-গুণী সকলের;—সর্বশ্রেণীর ধর্মান্বেষী ও জিজ্ঞাসু সাধারণ মানুষের নদী। ইঁহারা সকলেই আসিয়া-ছিলেন···এই অপূর্ব অনধিগম্য মানুষটিকে··· দেখিতে বা প্রশ্নভারে আকুল করিয়া তুলিতে। ক্লান্তিহীন ধৈর্যের সঙ্গে সুমধুর সরল পল্লীজনের ভাষায় রামকৃষ্ণ সকলের সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন। তাঁহার কথাগুলিতে থাকিত সহজ অন্তরঙ্গতার মাধুর্য। অথচ ছিল কঠিন বাস্তব এবং নিবিড় আত্মীয়তা।···মানুষের সহিত সম্পর্কিত কোন কিছুই তাঁহার দৃষ্টির বাহিরে ছিল না।···তিনি দুঃখের সন্ধান করিতেন, দুঃখকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতেন। কিন্তু উহা তাঁহার মধ্যে গিয়া কোথায় মিলাইয়া যাইত; তাঁহার পক্ষে বিষণ্ণ, বিরস, বিরূপ বলিয়া কিছুর সৃষ্টি সম্ভব ছিল না। তিনি ছিলেন মানুষের মহান ত্রাতা। মানুষের আত্মাকে তিনি ক্লিন্ন আবরণ হইতে মুক্তি দিয়া পরিশুদ্ধ করিয়া লইতেন—নিষ্কলঙ্ক করিতেন।

'তিনি তাঁহার চারিদিকে প্রবাহিত রাখিতেন আনন্দ ও মুক্তির বাতাস। তাপদগ্ধ পরিবেশে মুহ্যমান ক্লিষ্ট মানবাত্মাগুলি আবার তাহাদের অন্তরের পাপড়িগুলিকে প্রস্ফুটিত করিবার সুযোগ পাইত। হতাশ হৃদয়ের কাছে তিনি ছিলেন পরম আশ্বাস। বলিতেন: ভয় কি, ধৈর্য ধর। বর্ষণধারা নামিবেই! আবার তুমি সবুজ হইয়া উঠিবে।'

উদ্ধৃত লেখচিত্রটি ব্যঞ্জনায় অপূর্ব—বাস্তবের ন্যায় স্পষ্ট। বিশ্বমনীষী রোমাঁ রোলাঁর উক্তির ভাবানুবাদ ইহা। দক্ষিণেশ্বর দেবালয়ে শ্রীরাম-কৃষ্ণের অবস্থান, বিচরণ ও লোকাচরণের আশ্চর্য সুন্দর একখানি পটভূমিকা দৃষ্টিগোচর এখানে। সুরনদী এবং মানব-নদী—উভয় নদীর তরঙ্গান্বিত মোহানায় শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাতীর্থ দক্ষিণেশ্বর! সুরধুনী গঙ্গা প্রকাশ্যেই প্রবাহিত, কিন্তু যে মানব-হৃদয়-ফল্গু নিরন্তর ঐ তীর্থমৃত্তিকাকে সরস ও সিক্ত রাখিয়াছে তাহাই চিরকালের রহস্য হইয়া

রহিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলানাট্যের অনিন্দ্য বৈশিষ্ট্য এবং মাধুর্যও এইখানে—এই রহস্যের উপলব্ধিতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ একান্ত লোকাতীত হইয়াও পরম-লৌকিক। তাঁহার জীবনেতিহাসের প্রতি অধ্যায়ে এই সত্যই নানাভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের লোকোত্তর মহিমার অনুচিন্তনে সাধারণ জীব দেবত্বে উন্নীত হয়, আর তাঁহার অত্যাশ্চর্য মানববৎসল চরিত্রের ভাবানুসরণে মানুষ হইয়া উঠে প্রকৃত 'মানুস'। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-চরিত পাঠ করিতে করিতে স্বতই অনুভব হইয়া থাকে—তিনি কোনভাবেই পৃথিবীর অঙ্গীভূত নহেন, যাঁহার সর্বসত্তা নিয়তই তুরীয়-লোকস্পর্শী। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার অন্য একটি আবেগও পাঠক-পাঠিকার হৃদয় জুড়িয়া বাসা বাঁধে: এমন আপন জন সংসারে দ্বিতীয় কেহ নাই।

'হরিপাদপদ্মতরঙ্গিণী' গঙ্গার তটে যাঁহার নিত্য বিহার, সেই তিনিই আবার মানব-নদীর কূলে বসিয়া অহর্নিশ অপেক্ষা করিয়াছেন: 'কে কোথায় আছিস আয়' বলিয়া আকুল স্বরে ডাকিয়া ডাকিয়া। কখন অগোচরে—কখনও-বা সগোচরে অবিরাম তিনি মানুষকেই খুঁজিয়াছেন।

জমাট সমাধির উত্তুঙ্গ হিমালয়কে যেমন দেখা যায় বিচিত্র দ্রবীভূত রূপে সমতলের মৃত্তিকায়, আত্মবিগলিত শ্রীরামকৃষ্ণকেও মর্ত্যজনের তৃষ্ণার ঘাটে ঘাটে সদাই প্রত্যক্ষ করা যায়। একেবারে সাদা চক্ষেই তাঁহার দেখা মিলিয়া থাকে মানুষের কুটিরে-প্রাঙ্গণে, মানুষের হাটে-মাঠে। শ্রীরাম-কৃষ্ণ-রহস্য-সন্ধানীকে তাই সর্বাগ্রে বুঝিতে হইবে, —তাঁহার ভাবপরিমণ্ডল কত ব্যাপক ও বিস্তৃত, সার্থক অর্থেই যাহা 'ভূর্ভুবঃ-স্বঃ'—পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক জুড়িয়া।

সর্বব্যাপীকে তাই শুধুমাত্র ঊর্ধ্বলোকেই নহে, সম্মুখের এই ভূলোকেও অন্বেষণ করা যাইতে পারে,—বরং উহাই হইবে সহজতর সাধন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবৃত্ত হইতে সুস্পষ্টই জানা যায় যে, তিনি কেবল ঊর্ধ্বলোকবিহারীই নহেন,—ভূমণ্ডলচারীও বটে, পৃথিবীর মাটিতেই তাঁহার অনায়াস বিচরণ। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলায় দেবতারাই মাত্র সঙ্গী নহেন,—মানুষও তাঁহার চিরসহচর।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'—যাহা পাঠ করিয়া স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছিলেন—'বাস্তবিকই অপূর্ব।...কতখানি উপভোগ করিয়াছি, তাহা ভাষায় প্রকাশ্য নহে। পাঠ করিবার কালে আমি যেন সত্যই অন্য রাজ্যে চলিয়া যাই। ইহা কি কম আশ্চর্য?' বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র তাঁহার রোগশয্যায় যে-গ্রন্থকে 'জীবন-সর্বস্ব' করিয়া লইয়াছিলেন—যাহার প্রতি ছত্রেই ঈশ্বরীয় ভাবের দ্যোতনা, যাহার প্রতিপদই স্বাদু, প্রতিটি বাক্যই 'শ্রবণমঙ্গল',—সেখানেও একটি বহু উচ্চারিত কথা—এই 'মানুষ'। বিশ্বের ধর্মসাহিত্যের আর কোথাও এমন আছে কিনা আমাদের সঠিক জানা নাই। অহর্নিশ ঈশ্বরীয় আবেশে বিভোর যিনি—ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান, কিংবা হরি-কৃষ্ণ-রাম, অথবা 'মা' 'মা' বুলিই যাঁহার সারাক্ষণের কণ্ঠস্বর —সেই তাঁহাকেই মানুষের ভাবনা ভাবিতে, মানুষের জন্য কাঁদিতে, মানুষের নামে মাতোয়ারা হইতে দেখিলে বিস্ময়ে হতবাক্ হইতে হয় বৈ কি!

'মানুষ' শব্দটিও 'মা'-বিহীন নহে—সেই কারণেই বুঝি মানুষের এত মান। তাঁহার দৃষ্টিতে মানুষ পরমেশ্বরেরই এক রূপ, নর-নারায়ণেরই প্রতিমা। জীব মাত্রই শিব। শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত-কণ্ঠে, মানুষের মহিমাও, ভগবানের গুণ-কীর্তনের মতোই পরিকীর্তিত।

কথামৃতের প্রতিটি অধ্যায়ে অনুরূপ পরিকীর্তনের চিত্র বিরল নহে। যেমন :

'মানুষ আর মানহুঁশ। যার চৈতন্য হয়েছে— সেই মানহুঁশ।'

'মানুষ কি কম গা? ঈশ্বর চিন্তা করতে পারে, অন্য জীবজন্তু পারে না।'

'মানুষে তিনি অবতীর্ণ হন। যেমন ঘুটীর ভিতর মাছ এসে জমে।'

'মানুষের ভিতর ঈশ্বরের প্রকাশ বেশি।'

'এখন মানুষের ভিতর ঈশ্বরের বেশি প্রকাশ দেখিয়ে দিচ্ছে। যেন বলছে—আমি মানুষের ভিতর রয়েছি, তুমি মানুস নিয়ে আনন্দ কর.

'জলাশয়ের কিনারায় ছোট ছোট গর্ত থাকে, সেইখানে মাছ, কাঁকড়া এসে জমে, তেমনি মানুষের ভিতর ঈশ্বরের প্রকাশ বেশি।'

'এমন আছে যে, শালগ্রাম হতেও বড় মানুস। নর নারায়ণ।'

'প্রতিমাতে তাঁর আবির্ভাব হয়, আর মানুষে হবে না?'

'মানুষের ভিতর নারায়ণ। দেহটি আবরণ, যেন লণ্ঠনের ভিতর আলো।'

'মানুষের ভিতর যখন ঈশ্বর দর্শন হবে, তখন পূর্ণ-জ্ঞান হবে।'

'মানুষের স্বধাম হচ্ছে পরব্রহ্ম।'

'তিনি নরলীলা করবার জন্য মানুষের ভিতর অবতীর্ণ হন, যেমন রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্যদেব।'

উৎকলিত কথামৃত-কণাগুলি শ্রীরামকৃষ্ণের নানা সময়ের উক্তি—মানুষ, মানুষের ঠিকানা,— মানুষের স্বরূপ এবং মানুষের মহনীয়তারই বিচিত্র ব্যঞ্জনা! এমন আরও কত কথা সমগ্র কথামৃতে ছড়াইয়া রহিয়াছে, যে-গুলিকে সযত্নে চয়ন করিলে অনুপম একটি মানুষ-বন্দনা রচিত হইতে পারে— যাহা বিশ্বের মানবদরদী যে-কোন দার্শনিক কিংবা কবির পক্ষে বিস্ময়কর নজির হইয়া থাকিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-গ্রথিত মানুষ-বন্দনা মৃত্যুভীত মানুষকে মরণ জয় করিবার নূতন পথের সন্ধান দিয়াছে—মানুষের দৃষ্টিকে টানিয়াছে তাহার নিজ স্বরূপের দিকে—তাহার বিস্মৃত স্ব-স্বরূপকে ফিরিয়া পাইবার আশ্বাস দিয়াছে—দেবত্বের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছে—দুঃখভারাক্রান্ত মানুষের কণ্ঠে আবার আনন্দের সুর তুলিবার কৌশল শিখাইয়াছে।

প্রশ্ন জাগে—ভারতবর্ষ আত্মবিদ্যার মহাতীর্থ —বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের চর্চাকেন্দ্র। এখানে মানবাত্মার গৌরবকাহিনী চিরপুরাতন—মানুষই এখানকার পুরাণ-ইতিহাসের মূল উপজীব্য। এই প্রাচ্য ভূখণ্ডেই কত আত্মবিদ্ ঋষির আবির্ভাব ঘটিয়াছে, যাঁহাদের মধুনিস্যন্দী কণ্ঠে বিশ্ববাসী পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছে, মানুষ অমৃতের সন্তান— 'ব্রহ্মৈব নাপরঃ'। গীতাকার শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব স্বয়ং এই ভারতের মৃত্তিকাতেই বিচরণ করিয়াছেন। মানবের আদিকবি বাল্মীকি, মানবপুরাণকার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস,—মানবমূর্তির পরাকাষ্ঠা প্রকাশ বুদ্ধ-শঙ্কর-চৈতন্য এই ভারত-ভূমিকাতেই যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়াছেন! এখানে আবার মানুষ-গরিমার কথা নূতন ভাষায় বলিবার আবশ্যক হইল কেন? পুরাতনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দিল কিসের জন্য?

উল্লিখিত প্রশ্নের সহজ উত্তর সম্ভবতঃ ইহাই যে, সত্য পুরাতন এবং চিরন্তন হইলেও, অতীতে কদাপি উহাকে তেমনভাবে উচ্চারণের দরকার হয় নাই,—কিন্তু যুগের দাবীতে সেই পুরাতনকেই —সনাতন তত্ত্বকেই, সাধারণ মানবের বোধগম্য ভাষায় উদ্‌ঘোষণের একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অন্ধকার জমিয়া উঠিলে তবেই আলো জ্বালিতে হয়,—আলোর আয়োজন থাকিলেই জ্বালিতে

হইবে এমন কোন কথা নাই। ইহসর্বস্বতার ঘোর অন্ধকারে মানুষ যখন নিজেকেই নিজে চিনিতে পারিতেছিল না,—নিত্য-সত্য মানব-মহিমার উজ্জ্বল দীপালোক হস্তে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন তখনই হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই নবীন গীতাকার —মানুষ-উপাসনার প্রথম প্রবর্তক—আবির্ভূত অবতার।

ঈশ্বর মানুষের বেশে মানুষের প্রয়োজনেই ধরায় অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। প্রয়োজন হইলে, ছদ্মবেশে রাজা যেমন আসেন তাঁহার প্রজাদের মধ্যে। ঈশ্বর নিত্য—অপরিবর্তনীয় অবিতথ সত্য। কিন্তু তাঁহার সৃষ্টি কিছু নিত্য নহে—জগৎ পরিবর্তনশীল—নিরন্তর প্রবহমান স্রোতধারা যেন! তাই যুগে যুগে সত্যকে স্বীকার করিবার রীতিরও ব্যতিক্রম ঘটে, প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বৈষম্য দেখা যায়। ইহাই প্রবাহের স্বাভাবিক নিয়ম। এই কারণেই আমরা সত্যকে জানি, সনাতনকে মানি,—তথাপি যুগ ও যুগপ্রয়োজনকেও স্বীকার না করিয়া পারি না। কালের ধারায় সত্যের রূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রতীত হয়—সনাতনকেও ধারণা হয় যেন কত বৈচিত্র্যপূর্ণ। কিন্তু এই প্রতীতি ও ধারণাই কিছু সত্যকে মিথ্যা করিয়া ফেলে না, বা সনাতনকে ভাঙিয়া দেয় না। এই কারণেই যুগে যুগে একই সত্যকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দেয়—ঈশ্বরকেও বারে বারেই নর শরীর ধারণ করিতে হয়।

বর্তমান যুগ অতিশয় জীবন-সচেতন। পাশ্চাত্য ভূখণ্ড আবার অতিমাত্রায় জীবনপ্রেমী —তাহাদের বস্তুবাদ ও জড়বিজ্ঞান মানুষকে বড় বেশি রকম জীবন-মত্ততা আনিয়া দিয়াছে। পৃথিবীর আয়তন অতীত যুগের ন্যায় আর অনির্দিষ্ট নহে—এক দেশ অন্য দেশের খুব নিকটবর্তী এখন। পশ্চিমের জীবন-জিজ্ঞাসা তাই পূর্বের মানুষকেও উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। বিগত শতকের প্রারম্ভকাল হইতেই সারা বিশ্বের মানব-মনে কয়েকটি দুরূহ প্রশ্ন মাথা চাড়াইয়া উঠিয়াছে, যাহার সন্তোষজনক জবাব কোন দিক হইতে না মিলিলে, মানুষ বুঝি আর 'মানুষ'-রূপে বাঁচিবার কোন প্রয়োজন অনুভব করিবে না। প্রশ্নগুলি নিদারুণ। মানুষও একজাতীয় প্রাণী—দেহধারী জীব। এতদতিরিক্ত কোন পরিচয় মানুষের আছে কি? ব্রহ্ম, আত্মা, ঈশ্বর ইত্যাদির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কোথায়? মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে—উহার কোন বাস্তব মূল্য আছে কি?

কঠিন এই প্রশ্নগুলির সরল উত্তর দরকার। আমরা জানি যুগোচিত পিপাসা নিবারণে সেই যুগের মহাপুরুষগণ কালোপযোগী উপায় নির্দেশ করিয়া থাকেন,—মানুষও যথাসাধ্য উহাই অনুসরণ করে। যুগ যুগ ধরিয়া এই ধারাই পরিলক্ষিত হইতেছে। কিন্তু এবারকার প্রশ্ন কিছু ভিন্ন—খুবই গুরুতর, অতীব দুরূহ। কারণ, সমস্যা কোন বিশেষ দেশের বা জাতির নহে—বিশ্বমানবের সংশয়। অতীতের কোন্ আদিকাল হইতে মানুষ ধর্ম, ভগবান, পরকাল ইত্যাদি কথা শুনিয়া আসিতেছে! মানুষের বহু বিচিত্র জীবন-সমস্যার সমাধান করিতে, তাহাকে যে-সকল উপদেশ এতাবৎকাল দেওয়া হইয়াছে তাহাতে জগৎকে, জগতের মানুষকে তেমন সুস্পষ্ট মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে কিনা, তাহা সাধারণ চক্ষে পরিষ্কার নহে। বরং প্রাচীন মানবগুরুগণ বলিয়াছেন, চিত্তকে সর্বাবস্থায় ভগবন্মুখী রাখিয়া জগৎ তথা সংসার ও মানুষের ব্যাপারে উদাসীন থাকিবার অভ্যাস সাধিতে। যদিও ব্রহ্ম ও জীব —পরমাত্মা ও আত্মা অভিন্ন এবং এক, ইহাই ঋষিগণের ধ্যানলব্ধ তত্ত্ব—পরম সত্য। উচ্চাধিকার-সম্পন্ন মানুষের জন্য মহাপুরুষগণের উক্ত জ্ঞানোপদেশ সাতিশয় ফলপ্রদ হইলেও জনসাধারণ তাঁহাদের শিক্ষার মর্মগ্রহণে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া

মনে হয় না। তাই সাধারণ মানুষ উচ্চতম তত্ত্বকে সমীহ করিলেও তাহাদের প্রাত্যহিক জীবন-ধারায় উহার কোন প্রতিফলন নিজেরাই খুঁজিয়া পাইতেছিল না। ব্রহ্ম সর্ববৃহৎ সর্বোত্তম বস্তু—বরণীয় আদর্শ। কিন্তু মানুষ যেন কত ক্ষুদ্র ও অক্ষম, ঐ উচ্চতম তত্ত্বশিখরে আরোহণ করিতে। মানুষ তাহার নিজস্ব মূল্য বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। জীবনের মূল্যবোধ ক্রমেই সে হারাইয়া ফেলিতেছিল। ইত্যবসরে উন্নত জড়-বিজ্ঞানের প্রভাবে পড়িয়া মানুষ প্রকৃতি বা সৃষ্টির বাহ্যিক মহিমাতেই অন্ধভাবে মুগ্ধ হইতে হইতে অবশেষে স্রষ্টা ঈশ্বরকে—বা আত্মাকে অস্বীকার করিবার উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিতে থাকে। যুগের ব্যাধি এইভাবেই শুরু হয়,—মানব-মনে বিকারের সূচনাও এই। তত্ত্বের সঙ্গে জীবনের গরমিল মানুষকে অতিশয় বিক্ষুব্ধ এবং দিগ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল। উল্লিখিত প্রশ্নগুলির উদ্ভবও হইয়াছে এই সূত্রে।

ঋষিগণের উপদিষ্ট অধ্যাত্ম-শিক্ষাতে কদাপি মানুষ উপেক্ষিত হয় নাই, পরন্তু মানুষের আত্মিক পরিচয়কেই তাহার দৃষ্টিপথে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহাই সনাতন সত্য,—কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, সাংসারিক ভাষায় জন-সাধারণের নিকট এই সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করাইবার বা প্রয়োগ-কৌশল বুঝাইয়া দিবার কথা, পূর্বতন মহাপুরুষগণ তেমন করিয়া ভাবেন নাই বোধ হয়। অথবা, বলা যাইতে পারে, অতীতের সমাজ-পরিস্থিতিতে তেমন প্রয়োজনই দেখা দেয় নাই। ইদানীংকালে বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদ, বা অন্ধ জড়-শক্তির মোহ মানুষকে এমন ভিন্ন পরিস্থিতিতে টানিয়া আনিয়াছে যে, আত্মার প্রতি তাহাকে অবিশ্বাসী করিয়াছে যেমন, ঠিক তেমনই তাহার জীবনের ভারসাম্যও একেবারেই বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। তথাকথিত মানবতাবাদ মানুষের জীবনকে জন্ম ও মৃত্যুর অতি সঙ্কীর্ণ এক গণ্ডীর মধ্যে আঁটিয়া সাঁটিয়া বন্দী করিয়া রাখিয়াছে! নবীন এই বস্তুতন্ত্র, বিমোহিত বন্দী মানবাত্মাকে শান্তি দিতে সহস্র প্রচেষ্টা করিয়া চলিয়াছে—কত ভাবেই বুঝাইতে প্রয়াস চালাইতেছে,—ঐহিক আহার-বিহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং ভোগ-পণ্য বৃদ্ধি করা এবং ঐ সকলকে মনুষ্য-সমাজে সমভাবে বণ্টন-ব্যবস্থা করিয়া প্রতি মানুষের ভোগাধিকারকে সবলে কায়েম রাখার মধ্যেই মানুষের পরম হিত নিহিত—শ্রেষ্ঠ কল্যাণ-সাধন। জীবনের উচ্চতর কোন দিক লইয়া মাথা ঘামাইবার আবশ্যকতা নাই,—তাই উল্লিখিত নীতিমালায় সে-সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য পাওয়া যায় না। মানবাত্মার মহিমা, মনুষ্যজীবনের স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ও উহার মূল্যবোধের কোন সংবাদ উক্ত নয়া নাস্তিক্য দর্শনে আদৌ মিলিবে না। আধুনিক যুগের বস্তুবাদী নব মানবতাবাদ—তাই মানুষকে মহীয়ান না করিয়া উত্তরোত্তর হতাশার অন্ধকারেই ঠেলিয়া দিয়াছে। অতএব, তাহার বিক্ষুব্ধ অন্তরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ঝড় তুলিতেছিল—জীবন-যন্ত্রণায় জর্জর মানুষ খুঁজিয়া ফিরিতেছিল একজন যথার্থ মানব-সুহৃদ্‌কে, যিনি বলিয়া দিবেন মানুষের প্রকৃত স্বরূপ, মানুষের জীবন-লক্ষ্য, জীবন-লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপায়।

উত্থিত যুগ-জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদান করিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ—যাঁহার দৃষ্টিতে 'আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত' একই চৈতন্য প্রত্যক্ষ সত্য। শুদ্ধ ব্রহ্মকে 'মহতো মহীয়ান্' রূপে অপরোক্ষ করিয়াই, প্রতি মানুষের মধ্যেও সেই ব্রহ্মেরই প্রকাশকে তিনি দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া সোচ্চারে ঘোষণা করিয়াছেন: 'যত্র জীব তত্র শিব'। পূর্বগ ধর্মাচার্যগণ কখন তত্ত্বকে বড় করিয়াছেন, কখনও-বা তত্ত্বের প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিয়া

গিয়াছেন,—আবার কোন যুগে নিজেকেই তত্ত্বের জীবন্ত-বিগ্রহ করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু ইদানীং-কালে দক্ষিণেশ্বরের দেব-মানবকে দেখা গেল,—স্বয়ং ঘনীভূত তত্ত্বেরই শরীরী বিগ্রহ হইয়াছেন, অথচ নিয়ত অলৌকিক জোতির্মণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করিয়া নহে,—একেবারে অবিমিশ্র মনুষ্যত্বের সুবিস্তৃত আকাশতলে দাঁড়াইয়া। মানুষ তাঁহাকে বড় কাছে পাইয়াছে। তাঁহাকে সে দেখিয়াছে অবিকল তাঁহাদেরই চেহারায়—হাসিতে ক্রন্দনে—কখনও সেই পরিচিত ছোট ঘরখানিতে—কোন সময়ে মাঠের আলিতে অথবা প্রশস্ত রাজপথে। কিংবা তাঁহাকে সে দেখিয়াছে কুঠীবাড়ির ছাদে দাঁড়াইয়া মানুষকে আহ্বান করিতে—আবার কখনও একেবারে অনাহুতভাবে এখানে-সেখানে মানুষের ঘরে। তাই বুঝি একালের একজন মনস্বী ব্যক্তি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন: 'কথামৃত এখনও বাংলার সবচেয়ে popular বই। তা হয়েছে, কারণ এর মতো human value আর কোথাও নেই। জীবনের যা ভিত্তি তাই এর ভিত্তি।'

উপনিষদের ঋষি যে আত্মাকে জানিয়াছিলেন ধ্যানের গভীরে, সেই তাঁহাকেই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন প্রকাশ্য জনারণ্যে। তিনি জগৎকে শিখাইয়াছেন, ভগবৎপ্রেমকে মনুষ্যপ্রেমে প্রবাহিত করিতে। জীবমাত্রই শিব—শ্রদ্ধা দ্বারা, ভালবাসা দ্বারা, পূজা দ্বারা এই শিবত্বের উদ্বোধন করাই শ্রেষ্ঠ পরমার্থ-সাধন।

জড়োপাসক আধুনিক যুগের মানুষ ভাবিতেছিল—মানুষও একপ্রকার যন্ত্র! তথাকথিত বস্তুবাদের অহঙ্কারে তাহারা মনে করিয়াছিল মানুষগুলিকে সমাজ নামক বৃহত্তর যন্ত্রের অঙ্গীভূত করিয়া তুলিতে পারিলেই সকল সমস্যার সমাধান অনায়াসেই হইতে পারিবে। কিন্তু এই নগ্ন নাস্তিক্যবাদ—মানুষকে ছলে কৌশলে মহৎ হইবার প্রেরণা মোটেই দিতে পারে নাই বরং মানুষকে ক্রমেই শক্তিহীন ক্ষুদ্র করিয়া ফেলিতেছিল। জীবনের মূলে সর্বস্থিতিকর ঈশ্বরকে অস্বীকার করিলে, মানুষ দাঁড়াইবে কেমন করিয়া? সমাজ স্থাপিত হইবে কিসের উপর? ভিত্তি নাই, চূড়া আছে,—এমন একটি প্রাসাদ কল্পনাতেই মাত্র গড়া চলে। সর্বমানবের অন্তরশায়ী সেই পরম একের সন্ধান শ্রীরামকৃষ্ণই জনসমাজে সর্বাগ্রে জানাইয়াছেন। দীন-দরিদ্র রুগ্ন-ক্লিষ্ট সুধী-সজ্জন ধনী-জ্ঞানী মানুষ কেহই অবজ্ঞেয় নহে—সকলেই বন্দনীয়। ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তা। চিরন্তন তত্ত্বকে তিনি নবতম তথ্যে রূপান্তরিত করিয়া মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে স্বয়ং পরমপ্রিয়রূপে বিরাজ করিতেছেন। আমরা সেই শ্রীরামকৃষ্ণকেই আমাদের সকল সুখে-দুঃখে স্মরণ করিয়া থাকি।

সাম্প্রতিককালের এক দিক্পাল পুরুষকেও সেদিন প্রসঙ্গক্রমে বলিতে শুনা গিয়াছিল: 'ঠাকুরের কথা কি বলব—মনে হয়, তিনি আমার চিরপুরাতন বন্ধু—My Eternal Friend, and the most intimate friend।…তিনি আমার সবকিছু দেখছেন, দেখেও ভালবাসছেন, তাঁকে কি লুকাবো? তাঁর কাছে প্রবেশাধিকার পায়নি এমন কেউ নেই।…এই ঠাকুর আমার চব্বিশ ঘণ্টার আপনজন।'—এই অনুভূতি সকলেরই, অতি সাধারণ জনেরও। অজস্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা চলে, যাহাতে স্পষ্টই বোধ হইবে শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গাবারি-বিধৌত দেবালয়বাসী হইয়াও মানুষ-নদীর তটে তটে নিত্যবিচরণশীল। সাধক-কবি ঠিকই লিখিয়াছেন:

'যারে খুঁজ লীলা স্থলে, তীর্থে তীর্থে, পুণ্য জলে
 সে তোমারে খুঁজে সদা অন্তরে বাহিরে,
মানবের প্রেম-আশে মানুষ সাজিয়া আসে
 পরশি চরণে পূত করে ধরণীরে…।'

তিনি মানুষ সাজিয়া মানুষ খুঁজিতেছেন 'মানবের প্রেম-আশে'। মানুষও আর কতকাল পারিবে তাঁহার এই অন্বেষণে ধরা না দিয়া থাকিতে?

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন উপদেশ

স্বামী শুদ্ধানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের অন্তরঙ্গ শিষ্যগণের অন্যতম— রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পঞ্চম অধিনায়ক।

প্রবন্ধটি 'বসুমতী' শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সংখ্যায় (১৩৪২ ফাল্গুন) প্রকাশিত হয়েছিল।

[প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগ হইয়াছে। তখন আমার বয়ঃক্রম কিঞ্চিন্ন্যূন চতুর্দ্দশ বৎসর। তাহার পূর্ব্বেই কলিকাতায় তাঁহার নাম প্রচার হইয়া পড়িয়াছিল—তাঁহার উপদেশও কিছু কিছু পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গের ফলে ব্রাহ্মসমাজে মাতৃভাবে ভগবদারধনার বিশেষভাবে প্রচলনের কথা, ব্রাহ্ম হইয়া যাঁহারা উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও তাঁহার নিকট যাতায়াতের ফলে আবার উপবীত গ্রহণের কথা, তাঁহার শাস্ত্রের গভীর তত্ত্ব সকল অতি সহজ ভাষায় সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইয়া দিবার ক্ষমতা প্রভৃতির কথা তাঁর আমার কানে আসিয়াছিল। কিন্তু তখন অল্পবয়সের দরুণ এবং হৃদয়ে ধর্ম্মসাধনার বিশেষ প্রেরণা না আসায় তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই নাই। এখন প্রায়ই মনে হয়, যদি তাঁহাকে একবারও অন্ততঃ দেখিতাম, তবে জীবন সার্থক হইত। এখনও অনেক বয়স্ক ব্যক্তির সহিত দেখা হয়। যাঁহারা তাঁহার দর্শনলাভের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন, যদিও অনেকে তখন তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারেন নাই। তখন বুঝিতে পারুন বা না পারুন, তাঁহারা যে দেবদুর্লভ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন, ইহা শুনিয়াই তাঁহাদিগকে সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে হয় এবং তাঁহাদের চরণে প্রণত হইয়া পড়িতে ইচ্ছা করে।

যাহা হউক, পরমহংসদেবের অদর্শনের ৪ বৎসর পরে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে মহাত্মা রামচন্দ্রের দর্শনলাভ করি ও তল্লিখিত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনচরিত পড়িয়া তাঁহার জীবন ও উপদেশের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হই। ক্রমে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (কথামৃতকার শ্রীম—), ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি গৃহী ভক্তগণের ও মহেন্দ্র বাবু বা মাষ্টার মহাশয়ের কৃপায় তদানীন্তন বরাহনগর মঠে স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত অন্যান্য সকল সন্ন্যাসী ভক্তগণের সহিত পরিচিত হই। স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য দেশ বিজয়ান্তে কলিকাতায় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে আগমনের পূর্ব্বে তাঁহাকে দর্শনের সৌভাগ্যলাভ হয় নাই।

তাঁহার শিষ্য ও অনুরাগিগণ তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়া এবং নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার জীবনচরিত ও উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং যাঁহারা তাঁহাকে দেখেন নাই, তাঁহাদেরও অনেকে এই সংকল্প করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। এইরূপে তাঁহার জীবনচরিত ও উপদেশসংক্রান্ত বহু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। সুতরাং এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার জীবনচরিত ও উপদেশের বিস্তারিত পুনরাবৃত্তি করা বাহুল্য। পাঠকবর্গকে এই সকল পুস্তক অধ্যয়ন করিতে সাগ্রহে অনুরোধ করি। তাঁহার শিষ্য ভক্তগণের সংস্পর্শে আসিয়া, তাঁহাদের জীবন দেখিয়া ও কথা শুনিয়া এবং এই সকল পুস্তক অধ্যয়নের ফলে আমি তাঁহার জীবন ও উপদেশের যে মূলকথা বুঝিয়াছি—তাহাই অতি সংক্ষেপে এখানে লিপিবদ্ধ করিব।]

এক কথায় যদি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনকথা বলিতে হয়, তবে বলিতে হয়, তিনি ঈশ্বর বৈ আর কিছুই জানিতেন না। বাল্যকাল হইতেই তিনি মাঝে মাঝে ভগবদ্ভাবে তন্ময় হইয়া

বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন। সংসারের পড়াশুনা চালকলা-বাঁধা বিদ্যা জানিয়া পড়াশুনায় একদম মনোযোগী হইলেন না—তারপর দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে পূজারীর পদে ব্রতী হইয়া মার সাক্ষাৎদর্শন অথবা শরীরপাত—এই পণ করিলেন —ফলে জগদম্বার সাক্ষাৎ দর্শন পাইলেন। শেষে এই দর্শন স্থায়ী করিবার জন্য উক্ত মন্দিরে যত সাধু সন্ন্যাসী সিদ্ধ পুরুষ আসিতেন, বিভিন্ন-মতাবলম্বী প্রায় কাহাকেও তিনি গুরু করিতে বাকি রাখিলেন না—এইরূপে তিনি অদ্বৈতবাদী তোতাপুরী, তন্ত্রবিদ্ ভৈরবী ব্রাহ্মণী, রামভক্ত জটাধারী প্রভৃতিকে গুরুপদে বরণ করেন। ইঁহারা যাহা যাহা বলিতেন, তাহার খুঁটিনাটি সাধন কোনটিই তিনি অবহেলা করিতেন না, এক উদ্দেশ্য—শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন—সাক্ষাৎকার। ধর্মকে তিনি কেবল মতবাদ বলিয়া মনে করিতেন না—তাঁহার জীবনে একমাত্র মূলমন্ত্র ছিল সাধন। ঈশ্বরদর্শনের বিঘ্ন কাম-কাঞ্চনাসক্তি ও অহঙ্কার দূরীকরণের জন্য তাঁহার টাকা মাটী—মাটী টাকা সাধনা, কালীবাড়ীর কাঙ্গালীগণের উচ্ছিষ্ট ভোজন, অপরের পাইখানা সাফ করা প্রভৃতি সাধনার কথা প্রসিদ্ধ। এইরূপে তিনি ক্রমে জড়ের রাজ্য অতিক্রম করিয়া ভাব-রাজ্যে এবং পরে সর্ব্বভাববিবর্জ্জিত নির্ব্বিকল্প সমাধি-ভূমিতে পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াছিলেন। জগতের সৌভাগ্য যে, বহুকাল ধরিয়া অহরহঃ বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়াও মায়ের ইচ্ছায় তাঁহার শরীরপাত হয় নাই। তাঁহার নিকট ঈশ্বরসাধনার মতমতান্তরের ইতরবিশেষ ছিল না—তাঁহার ইসলাম ও খ্রীষ্ট সাধনাও প্রসিদ্ধ।

আমার মনে হয়, মতমতান্তরের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সাধনার দ্বারা প্রত্যক্ষ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিব, এইরূপ অহরহঃ দৃঢ় চেষ্টার ফলেই তাঁহার জীবন একদিকে যেমন গভীর, অপর দিকে তেমনই উদার হইয়াছিল। তিনি যদি কিছু ঘৃণা করিতেন, তবে তাহা সংসারাসক্তি বা সাংসারিকতা। তিনি স্বয়ং ঈশ্বরসাক্ষাৎকার না করিয়া ধর্মপ্রচারকার্য্যে অগ্রসর হন নাই—অথবা বলা যাইতে পারে, ধর্মপ্রচার তিনি নিজে কখনও করিতে চান নাই—তাঁহাকে মন্ত্রজপ করিয়া সেই জগদম্বাই তাঁহাকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া সেই জগদম্বাই তাঁহাকে যাহা বলাইয়াছেন, তিনি তাহাই বলিয়াছেন, তাই তাঁহার প্রত্যেক কথার জোর অত। অনেকে সাধনাবস্থায় তাঁহাকে পাগল মনে করিয়া চিকিৎসা করাইতে গিয়াছিল —কিন্তু তাঁহার এই ঈশ্বরপ্রেমরূপ ব্যাধি যে লৌকিক চিকিৎসার অসাধ্য। তাঁহার এই সাধনাবস্থায় অনেক পণ্ডিত, সাধক, সিদ্ধ ব্যক্তি তাঁহার এইরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব সাধনায় মুগ্ধ হইয়া-ছিলেন। শেষে আধুনিক ইংরেজিশিক্ষিত কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অনুবর্ত্তী ভক্ত সাধকগণের সহিত তাঁহার পরিচয়ের ফলে হিন্দু সনাতন সমাজেও একটা বিশেষ সাড়া পড়িয়াছিল এবং পরিশেষে কয়েকজন যুবক তাঁহার একেবারে অনুগত হইয়া সংসারধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছিল।

তাঁহার উক্তিগুলি অতি সরল অথচ অতি গভীর। ঈশ্বরকে যে কোন নামে ডাক না কেন, তাঁহাকে ঈশ্বর, ব্রহ্ম, কালী, শিব, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, আল্লা বা গড যাহাই বল না কেন, ঈশ্বর সেই একই সচ্চিদানন্দ বস্তু—যেমন জলকে বারি, পানি, ওয়াটার, অ্যাকোয়া—যাহাই বল না কেন, উহা দ্বারা পিপাসাশান্তি অবশ্যই হয়।

আমবাগানে গিয়া পাতা গণিয়া লাভ নাই—আম পাড়িয়া খাইতে পারিলেই তৃপ্তি। তদ্রূপ শাস্ত্রের নানাবিধ বাদানুবাদে কিছুই হয় না—শাস্ত্রের সার কথা সচ্চিদানন্দকে সম্ভোগ করা, তাহাতেই সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞানের ফললাভ হয়।

ঈশ্বরের চাপরাস না পাইয়া প্রচারকার্য্য করা বৃথা—কারণ, কেহই তোমার কথা শুনিবে না, অথবা শুনিলেও তাহাতে বিশেষ কাজ হইবে না।

তিনি নিজে ঈশ্বরের জন্য সর্ব্বত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সাংসারিকতাকে ঘৃণা করিতেন—কিন্তু বিশেষ অধিকারী ব্যতীত তিনি কাহাকেও সংসার ত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেন না। কেবল বলিতেন, ঈশ্বরকে জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা কর। যেমন যারা ঢেঁকিতে চিঁড়া কুটে, তাহারা সেই সঙ্গে দশ রকম কায করে। কিন্তু সদা লক্ষ্য রাখে যে, হাতে ঢেঁকি না পড়ে। তদ্রূপ সংসারের সব কায কর, কিন্তু ঈশ্বরের দিকে সদা লক্ষ্য রাখিও।

তাঁহার জীবন ও উপদেশ আলোচনা করিয়া আমাদের কি লাভ হইবে? ইহাতে আমাদের পরম লাভ—যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউন না কেন, তিনি যে মতই বিশ্বাস করুন না কেন, প্রত্যেক সম্প্রদায়েই সাধন-ভজন অনুষ্ঠান আছে। সকলকে তাঁহার দৃষ্টান্তে নিজ নিজ মতানুযায়ী সাধন-ভজন অনুষ্ঠানে বেশী করিয়া সময় দিতে হইবে। তাঁহার জীবনে ও উপদেশে conversion-এর (ধর্মান্তরের) কোন অবকাশ নাই। যদি কোনরূপ conversion থাকে, তবে তাহা হৃদয়ের conversion (পরিবর্ত্তন)—আর অপরের হৃদয় পরিবর্ত্তন করিতে গেলে নিজের হৃদয় পরিবর্ত্তন বিশেষরূপে আগে হওয়া দরকার। সুতরাং সাধন-ভজনের দিকে আমরা প্রত্যেকে বেশি করিয়া ঝোঁক দিলে স্বতঃই উদার ভাব না আসিয়া থাকিতে পারে না। কারণ, তখন আর অপরকে সমালোচনা করিবার সময় বা স্পৃহা থাকে না। হিন্দুকে মুসলমান বা খৃষ্টিয়ান করিবার চেষ্টার প্রয়োজন নাই—শাক্তকে বৈষ্ণব করিবার চেষ্টার প্রয়োজন নাই—দ্বৈতবাদীকে অদ্বৈতবাদী করিবার চেষ্টার প্রয়োজন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনানুসরণ করিয়া আজ হইতে আমরা সকলে বিশেষভাবে সাধনে প্রবৃত্ত হই। যিনি একেবারে ঈশ্বরের জন্য সর্ব্বত্যাগ করিতে পারিতেছেন না, তিনি যতটা পারেন, ততটা ত্যাগ করুন। সম্পূর্ণ কাম-কাঞ্চনত্যাগী হইতে না পারি, যতটা পারি, ততটাই আমাদের কল্যাণ।

যাঁহারা বলিবেন, অপরকে বুঝানই—অপরের সঙ্গে তর্ক-বিবাদ-বিসম্বাদ করাই আমাদের ধর্ম্মের অঙ্গ, যে সকল কর্ম্মকে আমরা কুকর্ম্ম বলিয়া জানি, সেইগুলিই আমাদের ধর্ম্মের অঙ্গ; তাঁহাদিগকে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন বিশেষভাবে আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। তিনি চিরজীবন শিখিয়াই গিয়াছেন—বলিতেন 'সখী' যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি। তাঁহাকে গুরু, কর্ত্তা বা বাবা বলিলে তাঁহার কষ্ট হইত। তিনি তান্ত্রিক সাধনা রীতিমত করিলেও কি কখনও এক ফোঁটা মদ্যপান করিয়াছিলেন, অথবা স্ত্রী-জাতিকে জগজ্জননী ব্যতীত অন্যদৃষ্টিতে কখনও দর্শন করিয়াছিলেন? তিনি কথায় কথায় বলিতেন, সকলেই মনে করে, আমার ঘড়ি ঠিক ঠিক চল্‌ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কারও ঘড়ি ঠিক চল্‌ছে না—তাই সূর্য্যকে দেখিয়া মাঝে মাঝে ঘড়ি ঠিক করিয়া লইয়া তবে চালাইবার মত করিয়া লইতে হয়। অথবা যেমন বৃষ্টির জল বিশুদ্ধ, কিন্তু উহা ছাদে পড়িয়া নানা ময়লার সহিত মিশিয়া বিভিন্ন নলের মধ্য দিয়া পড়ে—তদ্রূপ যাঁহারা ঈশ্বরলাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের দ্বারা তথাকথিত বিভিন্ন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাঁহারা সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ সচ্চিদানন্দ লাভ করিয়া সকলেই এক কথা বলিয়া গিয়াছেন—কেবল দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে যেখানে যেমন প্রয়োজন—কোথাও কর্ম্ম, কোথাও জ্ঞান, কোথাও ভক্তি—কোথাও দ্বৈতবাদ, কোথাও অদ্বৈতবাদের উপর ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে—আবার অজ্ঞ

কামনান্ধ জীব আমরা—আমাদের দুর্ব্বলতা ও অজ্ঞতা অনুযায়ী তাহার মধ্যে নানা আবর্জ্জনা মিশাইয়াছি তাই বলি, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'যত মত তত পথ' খুব সত্য কথা—কিন্তু ধর্ম্মের দোহাই দিয়া আমরা যেন আমাদের দুর্ব্বলতা, অজ্ঞতা ও স্বার্থপরতা-প্রসূত কদাচারকে ধর্ম্মের নামে চালাইবার চেষ্টা কখনও না করি।

আজকাল লোকে বলে, আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ক নানা সমস্যা রহিয়াছে—রামকৃষ্ণচরিত ও উপদেশ আলোচনা করিলে তাহার কিছু মীমাংসা হইবে বলিতে পার? আমরা জোর করিয়া বলি, হাঁ, ভাল করিয়া বুঝিয়া অনুষ্ঠান করিলে সকল সমস্যারই মীমাংসা হইবে। সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতির মূলগত সমস্যা, স্বার্থপরতা ও নিঃস্বার্থপরতার বিরোধ। যত দিন সমাজে স্বার্থপরতা অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিবে, তত দিন রাষ্ট্রগত ও সমাজগত নিয়মের যতই পরিবর্ত্তন হউক না কেন, কিছুতেই মানুষের শান্তি নাই। বিদ্যার কথা বলিতেছ? সকলের শ্রেষ্ঠ বিদ্যা—বিজ্ঞান (science), কিন্তু আমরা কি দেখিতেছি না, বিজ্ঞানবলে আমরা প্রকৃতির উপর যে সকল শক্তিলাভ করিতেছি—তাহার কত অপব্যবহার হইতেছে? তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় এই বলিয়া উপসংহার করিতে চাই—ঈশ্বরকে খোঁটা-রূপে ধরিয়া যত ইচ্ছা বন্ বন্ করিয়া ঘুর—প্রাণ ভরিয়া রাজনৈতিক, সামাজিক বিষয়াদির চর্চ্চা কর—পতনের ভয় নাই। লক্ষ্যহীন হইয়া ঘুরিলেই পতন অবশ্যম্ভাবী। তবে ইহাও বলিব যে, ঈশ্বরপ্রেম ব্যতীত—ধর্ম্মের উন্মাদনা ব্যতীত—কেবল শুষ্ক নীতি-দ্বারা কখনও স্বার্থপরতারূপ ব্যাধির পূর্ণ উপশম হয় না।

ঈশ্বরপ্রেমিক বলেন—নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু। তিনি দল বাঁধিয়া social service (সমাজের সেবা) করিতে যান না—জীবকে নারায়ণের মূর্ত্তি জানিয়া তাহাদের সেবায় আত্মবিসর্জ্জন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও উপদেশ অনুসরণ করিতে পারিলে জগতে অপূর্ব্ব সেবাধর্ম্মের অভ্যুদয় হইবে এবং তাহাতেই সকল সমস্যার সমাধান হইয়া জগতে শান্তি-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। কিন্তু ইহার জন্য আমাদের প্রত্যেকের এই জীবন ও উপদেশের শ্রবণ, মনন ও অনুধ্যান করিতে হইবে।

শুধু শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অবতারবরিষ্ঠ বলিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিয়া শতসহস্র সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার একটি নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিলে চলিবে না। যাঁহারা যথার্থ আন্তরিক-ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও উপদেশ চর্চ্চা করিবেন, তাঁহারা বাহ্যতঃ হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান—দ্বৈতবাদী অদ্বৈতবাদী যাহাই থাকুন না কেন, তাঁহারা নূতন মানুষ হইবেন—তাঁহারা নিজের অহংকে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়া ভগবানের প্রকাশ-জ্ঞানে সকল সম্প্রদায়ের নর-নারী-সেবায় অগ্রসর হইবেন।

বর্ত্তমান যুগে অল্পকাল পূর্ব্বেই আমাদের সমক্ষে এই আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে। আসুন, আমরা সকলে তাঁহার জীবন ও উপদেশ চর্চ্চা করিয়া ও যথাসাধ্য জীবনে পরিণত করিয়া নিজেদের সার্থক করি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি কথাঃ 'ভক্তি-পথ সহজ পথ'

স্বামী ধীরেশানন্দ

বেলুড় মঠের প্রবীণ শাস্ত্রজ্ঞ সন্ন্যাসী।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন—'ভক্তি-পথ দিয়ে তাঁর কাছে সহজে যাওয়া যায়', 'ভক্তিযোগ যুগধর্ম', 'কলিযুগের পক্ষে নারদীয়া ভক্তি'—ইত্যাদি।

অন্যান্য যোগসহায়ে সিদ্ধিলাভ করা এ সময়ে কষ্টসাধ্য, কিন্তু ভক্তি-পথ সেরূপ কষ্টসাধ্য নহে এবং ভক্তি-পথেই সব পাওয়া যায়—একথা শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বারংবার তাঁহার কথামৃতপিপাসু শ্রোতৃবর্গের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন।

ভক্তিপথের বিশেষত্ব কি এবং উহা কেন সকলের পক্ষে সুগম, এ বিষয়ে ভক্তিশাস্ত্র কি বলেন তাহাই আমরা একটু আলোচনা করিব।

অদ্বৈতবেদান্তের মতে ব্রহ্মই একমাত্র ত্রিকালাবাধিত সত্য বস্তু ও জগৎ মিথ্যা। জীব স্বরূপত ব্রহ্ম। অবিদ্যাপ্রভাবেই জীবের জন্ম-মরণরূপ সংসারভ্রান্তি হইয়া থাকে। অবিদ্যা-প্রসূত ত্রিগুণাত্মক অন্তঃকরণরূপ উপাধি সহ মিথ্যা তাদাত্ম্যবশতঃই জীব অশেষ দুঃখ প্রাপ্ত হয়। জবাকুসুম সংযোগে স্ফটিকের লালিমার ন্যায় এই উপাধি সংযোগ থাকিলে দুঃখ হইবেই। এই উপাধি নিবৃত্তি হইলেই দুঃখনিবৃত্তি সম্ভব। অদ্বৈতবেদান্ত বলেন—উপাধিজনিত এই দুঃখ প্রতীতি একটা ভ্রান্তিমাত্র। একমাত্র আত্মজ্ঞান দ্বারাই এই ভ্রান্তি নিবৃত্ত হয়।

ভক্তিসিদ্ধান্ত কিন্তু অন্যরূপ। সে মতে পরমেশ্বর সত্য ও তাঁহার শক্তিও সত্য। পরমেশ্বরের সত্য শক্তি হইতে উৎপন্ন জগদাদি যাবতীয় পদার্থ মিথ্যা হইতে পারে না। সংসার ঈশ্বরের সংকল্প। সত্য সংকল্প ঈশ্বরসৃষ্ট সংসার মিথ্যা নহে, উহা সত্য। যদি সংসার মিথ্যা, একটা ভ্রান্তিমাত্র হইত তবে তাহা আত্মজ্ঞান-নাশ্য হইত। কারণ অন্ধকার নিবর্তক দীপপ্রকাশের ন্যায় একমাত্র জ্ঞানই ভ্রান্তি বা অজ্ঞানান্ধকার নিবর্তক—ইহা সর্বজনস্বীকৃত। সংসার সত্য, অতএব উহার নিবৃত্তি জ্ঞানসাধ্য নহে। জ্ঞান সত্য বস্তুকে নাশ করিতে পারে না। সংসার-নিবৃত্তি একমাত্র ভগবদ্ভক্তি দ্বারাই হইয়া থাকে। ভক্তিদর্শন ভক্তিপূর্বক ভগবানে বুদ্ধির লয় ব্যতীত সংসার-নিবৃত্তি স্বীকার করেন না। সুতরাং এ মতে আত্মজ্ঞান সংসার নিবর্তক নহে। আত্মজ্ঞান অন্তঃকরণগত অশ্রদ্ধা সংশয়াদি মনের নিবৃত্তি করিয়া থাকে মাত্র। তখন প্রমাদ আলস্য অভিমান প্রভৃতি অনাত্মধর্ম রহিত হইয়া, নির্মল হইয়া জীব শ্রীভগবানের প্রপন্ন বা শরণাগত হইয়া থাকে।

ভগবান পরম ঐশ্বর্যশালী। তাঁহার স্বস্বরূপের ন্যায় এই ঐশ্বর্যশক্তিও অবাধিত। এই শক্তি ও শক্তিমান উভয়ে মিলিত হইয়া জগৎ কারণ হইয়া থাকেন। এই উভয়ই সত্য। অদ্বৈতবেদান্তের ন্যায় শক্তিকে এ মতে মিথ্যা মানা হয় না। ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মস্বরূপই মানা হয়।

ঈশ্বর কর্মফলদাতা, এ বিষয়ে উত্তর মীমাংসা বা অদ্বৈতবেদান্ত ও ভক্তি মতের কোন মতানৈক্য নাই। ভক্তি বেদ প্রতিপাদ্য। শাণ্ডিল্য ঋষি বলিয়াছেন—'ভক্তিঃ প্রমেয়া শ্রুতিভ্যঃ, পুরাণেতিহাসাভ্যাম্ চ'—শ্রুতি, পুরাণ ও ইতিহাসাদি সহায়ে ভক্তির স্বরূপ জ্ঞাতব্য। ঋগ্‌বেদে পরমেশ্বরকে মাতাপিতার ন্যায় রক্ষক বর্ণন করা হইয়াছে; ইন্দ্র পিতা ও শ্রেষ্ঠ সখারূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

ভক্তি কি? এ বিষয়ে বলিতে গেলে বলিতে

হয় পরমেশ্বরের প্রতি পরম অনুরাগই ভক্তি। নারদ বলেন—ভক্তি পরমপ্রেমরূপ ও অমৃতস্বরূপ। শাণ্ডিল্য অমৃতকে ভক্তির ফল বলিয়াছেন।

ঋষি অঙ্গিরার মত এই যে, স্নেহ, প্রেম ও শ্রদ্ধার আতিশয্যে ঈশ্বরের প্রতি অলৌকিক অনুরাগের নামই ভক্তি, ইত্যাদি।

ভক্তির স্বরূপ বিষয়ে নানা মতভেদ থাকিলেও ইহা নির্বিবাদে বলা যায় যে, ঈশ্বরে পরম অনুরাগ বা প্রীতিই ভক্তি। কিন্তু এই অনুরাগ বস্তুটি তো স্বসংবেদ্য, অর্থাৎ ইহা একমাত্র নিজেই জানা যায়। যথার্থই ঈশ্বরের প্রতি কাহারও অনুরাগ হইয়াছে কিনা তাহা অপরে জানিবে কি প্রকারে? অপরের পক্ষে ইহা জানা কঠিন, ইহা সত্য বটে, তথাপি ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ভক্তির পরিচয় স্বরূপে বিভিন্ন আচার্যগণের মত উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ব্যাসদেব বলেন যে, ভগবানের পূজা আদিতে অনুরাগ হওয়াই ভক্তির লক্ষণ। যাঁহার প্রতি প্রেম হয় তাঁহার সেবাতেই আন্তরভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

গর্গাচার্য বলেন—যাঁহার প্রতি প্রেম হয় তাঁহার চরিত্র, নাম, গুণাদির সশ্রদ্ধ শ্রবণ, বর্ণন ও তাহার আবৃত্তিই আন্তরভক্তির পরিচায়ক। অর্থাৎ বাহিরে এসব দেখা গেলেই বুঝিতে হইবে যে, সে ব্যক্তির চিত্তে ভক্তির বিকাশ হইয়াছে।

শাণ্ডিল্য বলেন—যে কোন প্রিয় বস্তুতে ঈশ্বরের সত্তা চিন্তন করিয়া তাহাতে তন্ময় হইয়া যাওয়ার নামই ভক্তির লক্ষণ।

ভরদ্বাজ বলেন—পরমানন্দে মগ্ন হইয়া ঈশ্বরের মহিমাখ্যাপন করার নামই ভক্তি। অর্থাৎ যাঁহার প্রতি প্রেম হয় তাঁহার মহিমা খ্যাপন।

কশ্যপ বলেন—আপনার সর্বকর্ম ভগবানে সমর্পণ করার নাম ভক্তি। অর্থাৎ যাহা কিছু আমি করি তাহাই ভগবানের প্রসন্নতা ও সেবার্থ। শৌচ স্নানাদির দ্বারা শুদ্ধ হইয়া ভগবানের সমীপে যাওয়ার নামও ভক্তি বলিয়া কথিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ, শুকদেব, প্রহ্লাদ ও বসিষ্ঠাদি মুনিগণের মত এই যে, সর্বজগৎ শ্রীভগবানেরই একটি রূপ —এই বুদ্ধিতে সকলের সেবা করার নামই ভক্তি।

দেবর্ষি নারদ বলেন—নিজের সর্ব আচরণ ভগবানে অর্পণ করা ও ভগবদ্ বিস্মরণে পরম ব্যাকুলতার উদয়ের নামই ভক্তি।

ব্রজবাসিগণের মতে—স্বীয় মতি, রতি, গতি, জীবন, প্রাণ—সব কিছু ভগবানে লীন করিয়া দেওয়াই ভক্তি।

এই সব লক্ষণই সাধকের চিত্ত অন্তিমে ভগবানে বিলীন হইয়া যায়—ইহাই বুঝাইয়া থাকে।

এখন ভক্তি হয় কি প্রকারে ইহাই বিবেচ্য। ইহা নিঃসন্দেহ যে, ভক্তিসিদ্ধান্তের সার সর্বস্ব হচ্ছেন জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান কারণ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, অশেষ কল্যাণ গুণাকর ঈশ্বর। জীব ও জগৎ ঈশ্বরসহ অভিন্ন। অতএব ঈশ্বরের অথবা ঈশ্বরাভিন্ন ভক্তজনের অনুগ্রহ-বিনা ভক্তির উদয় হয় না। কিন্তু ঐ অনুগ্রহ-লাভ জীবের নিজের আয়ত্তাধীন নহে। এই অনুগ্রহলাভের জন্য সাধকের ব্যাকুল অন্তরে প্রতীক্ষা প্রয়োজন। এজন্যই নারদ বলেন যে, মহৎকৃপা বা ভগবৎকৃপালেশবশতঃই ভক্তির উদয় হয়।

কিন্তু ভক্তির উদয়ের জন্য কয়েকটি উপায়ের কথাও ভক্তিশাস্ত্র বর্ণন করিয়া থাকেন। যথা—ভগবানের নামের আশ্রয়। নামই ভগবান, এই বুদ্ধিতে নামকীর্তন, জপ, শ্রবণ, ধ্যান, স্মরণাদি দ্বারা হৃদয়ে ভগবানকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা।

ভগবানের রূপের আশ্রয় অর্থাৎ ভগবানের

রূপে প্রীতি ও তন্ময়তা। উহা দ্বারা ক্রমে মনরূপ উপাধির বিলয় ও ভগবানের সহিত একতাবোধ হইয়া অন্তঃকরণ পরমেশ্বরে বিলীন হইয়া যায়।

ঈশ্বরের বিভূতিদর্শন অর্থাৎ—অন্তরে ভগবানের ধ্যান ও বাহিরে ব্যবহারকালে প্রত্যেক বস্তুতে পরিপূর্ণ ভগবানের বিশেষ প্রকাশ চিন্তন। এইরূপে মন তন্ময় হইয়া যায় ও ভগবানের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়। সর্ব-পদার্থের শক্তিরূপে ভগবানই বিদ্যমান, এইরূপ চিন্তনেও মন ক্রমে পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া থাকে।

গুণের বর্ণন,—সত্ত্বাদি গুণত্রয় ও তাহার কার্য সবই ঈশ্বরনিয়ন্ত্রিত, এরূপ চিন্তনেও মন ত্রিগুণের অতীত পরমেশ্বরে বিলীন হয়।

পরমাত্মভাবনা,—সর্ববস্তুতে অস্তি, ভাতি, প্রিয়রূপে সচ্চিদানন্দের দর্শন অভ্যাস করিলে অচিরেই মন প্রিয়তম ঈশ্বরসহ অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়।

এইসব সাধন পরিপক্ক হইলে তখন এক প্রভু ও তাঁহার শক্তিই অবশেষ থাকেন। এই প্রকার স্বরূপানুভবে সমাধি ও ব্যবহার এক হইয়া যায়।

ভক্তির পরিপক্ক অবস্থায় বাহ্য ব্যবহার কিরূপ হয় তাহাও ভক্তিশাস্ত্র বিভিন্ন প্রকারে বর্ণন করিয়া থাকেন। যথা—সম্মান প্রদর্শন। অর্জুন যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেই তিনি অতি প্রেমের সহিত দণ্ডায়মান হইতেন। ভক্তও ভগবদ্‌বিগ্রহ বা অন্য ভক্ত দর্শনে তদ্রূপ করিয়া থাকেন। রাজা ঈক্ষাকু কমল, মেঘ প্রভৃতি দর্শনে কমলনয়ন মেঘশ্যাম শ্রীভগবানের স্মরণে মগ্ন হইয়া তাহাদেরও সৎকার বা প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। অর্থাৎ যে যে বস্তু দর্শনে প্রিয়তমের স্মরণ হয় তাহাদিগকে সৎকার বা সম্মান প্রদর্শন করিতেন। শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন—'এদের কিরূপ ভক্তি! গুরু বা গুরুবংশের সকলকে সৎকার তো করেই থাকে, গুরুর দেশের বিড়ালটাকেও পর্যন্ত সৎকার করে।' শ্রীশ্রীচৈতন্য-দেব মেড় গ্রাম অতিক্রম কালে, এই গ্রামের মাটিতে কীর্তনের বাদ্য খোল নির্মিত হয় শুনিয়া ভগবদ্‌ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। যথার্থ ভক্তেরও সামান্য বস্তু দর্শনে ভগবদ্‌ভাবাবেশ হইয়া থাকে। প্রতিকূল অবস্থাতেও ভক্ত বিচলিত হন না, সহস্র বিপদের মধ্যেও তিনি তাঁহার পরমপ্রিয় আরাধ্য দেবতার মঙ্গলময় হস্তের স্পর্শই অনুভব করিয়া থাকেন।

সর্বশাস্ত্রই অধিকারী নির্ণয় করিয়া থাকেন। জ্ঞানকাণ্ডে অর্থাৎ বেদান্তে সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তিই অধিকারী। অর্থাৎ বিবেক, বৈরাগ্য, শমদমাদি ও মুমুক্ষুত্ব না থাকিলে কেহ বেদান্ত সাধনের অধিকারী হয় না। কর্মকাণ্ডেও দেখা যায় ব্রাহ্মণ বৃহস্পতি সব, অগ্নিহোত্রাদি কর্মে অধিকারী, রাজসূয় যজ্ঞে নহে। ক্ষত্রিয় রাজসূয় অশ্বমেধাদি কর্মে অধিকারী, বৃহস্পতি যজ্ঞ আদিতে নহে, ইত্যাদি। শাস্ত্রীয় কর্মে অর্থিত্ব, সামর্থ্য ও শাস্ত্রদ্বারা অনিষিদ্ধত্ব থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ভক্তিতে সকলেরই সমান অধিকার। ইহা ভক্তিমার্গের একটি প্রধান বিশেষত্ব। তবে ভগবানের নাম উচ্চারণে সমর্থ ও ইচ্ছুক ব্যক্তিই অধিকারী। জ্ঞাতে, অজ্ঞাতে যে অবস্থাতেই হউক না কেন, ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলেই তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব-জন্মীয় সংস্কারও ভক্তি উদয়ের কারণ হইতে পারে।

নিজের মাতাপিতার সেবার অধিকার যেমন সকলেরই আছে সেইরূপ ভগবানকে ভক্তি, সেবা করিবার অধিকারও সকলেরই আছে। নীচ-জাতি চণ্ডালাদিও ভক্তির অধিকারী। নাম

শ্রবণ কীর্তনাদি দ্বারাই সর্বযাগযজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। ভক্তগণের মধ্যে জাতি, কুল, রূপ, বিদ্যা, ধনাদি দ্বারা কোন ভেদ হয় না। অন্য সাধনমার্গে বিচিত্র অধিকারী ভেদ বিদ্যমান, কিন্তু ভক্তিমার্গে তাহা নাই। ইহা ভক্তিপথের একটি মহান্ বিশেষত্ব। কর্মকাণ্ডে কর্মানুষ্ঠানের বিশেষ স্থান, কাল ইত্যাদির নিয়ম আছে, যেমন নির্দিষ্ট দিকে বসিবে, নির্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে। ভক্তিসাধনে এসব কিছুরই প্রয়োজন নাই। পূর্ব মীমাংসক ঈশ্বর মানেন না। তাঁহারা কর্মেরই প্রাধান্য স্বীকার করেন। কর্মই ফল-দাতা। কিন্তু ভক্তিমতে ঈশ্বরই সর্বস্ব। ঈশ্বরের অনুগ্রহ, করুণা, প্রসন্নতাই জীবের সর্বস্ব। সুতরাং যখন ইচ্ছা, যেভাবে হউক, যেখানে হউক জীব ঈশ্বর চিন্তা করিতে পারে ও ঈশ্বর কৃপায় তাহার হৃদয় মধুময় হইয়া যায়। ভগবন্নাম, গুণ, লীলাদি চিন্তনে তন্ময়তা যেভাবেই হউক তাহাই উত্তম সাধন।

সংকেত পরিহাসাদি যে কোনভাবে ভগবন্নাম উচ্চারণ করিলেই তদ্দ্বারা জীবের পাপ নাশ হইয়া থাকে। করুণাময় ঈশ্বরই 'নাম'রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যাহাদের নামে বিশ্বাস নাই তাদের জন্যই শাস্ত্রে পাপনাশক বহুবিধ প্রায়শ্চিত্ত কর্মের বিধান। নামের এই অপূর্ব মহিমা অর্থবাদ বা স্তুতিমাত্র নহে। নাম একটি নিমিত্তমাত্র। এই নিমিত্তাবলম্বনে ভক্তের উপর শ্রীভগবানের অজস্র কৃপা বর্ষিত হয়।

ভক্তির অপর একটি বিশেষত্ব এই যে, উহা অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করে, সঙ্গে সঙ্গে আরাধ্যবস্তু-বিষয়ক অজ্ঞানের আবরণও ধীরে ধীরে ক্ষয় করিয়া বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে। অশুদ্ধ বস্তুর চিন্তন দ্বারাই চিত্ত অশুদ্ধ হয়, এবং শুদ্ধবস্তু চিন্তনেই চিত্ত শুদ্ধ হয়। তাই স্বতঃনির্মল শুদ্ধস্বরূপ শ্রীভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ ও চিন্তন অপেক্ষা চিত্তশুদ্ধিকারী আর অন্য কোন সাধনই হইতে পারে না।

এইরূপে ভক্তিসাধনের সুগমতা উল্লেখ করিলেও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ইহাও আমাদের সতর্ক করিতে ভোলেন নাই যে, উহা অতি সুলভ নহে। সাধারণতঃ লোকে মন্দিরে প্রণামাদি করা, চরণামৃত গ্রহণ ও নিবেদিত মিষ্টান্নাদি গ্রহণকেই ভক্তি বলিয়া মনে করে ও তাহাতেই নিজেদের কৃতার্থ বোধ করে। ঠাকুর বলিয়াছেন—'ভক্তি-পথ সহজ পথ, তবে তেমন সহজ নয়।' ভগবানের প্রতি ভালবাসা বা অনুরাগই ভক্তির একমাত্র পরিচয়। আমরা টাকা-পয়সা, স্ত্রী-পুত্র পরিজন, সর্বোপরি নিজের শরীরকে যেরূপ ভালবাসি ভগবানের প্রতি আমাদের সেরূপ ভালবাসা আছে কি? তাঁহার প্রতি যথার্থ ভালবাসা থাকিলে সম্পদে বা বিপদে সর্বাবস্থায় সে ভালবাসা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ (শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের প্রিয় শিষ্য স্বামী শিবানন্দ) বলিয়াছেন—

'খুব প্রেমের সহিত তাঁর ভজন কর—পরম শান্তি পাইবে। সেই প্রেমে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা সব সহ্য করিতে পারিবে। কোন চিন্তা নাই। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা আছেই, তবে তাঁর প্রেমে যে ভক্ত সে সবই আনন্দে সহ্য করিয়া যায়—সেই ঠিক ঠিক ভক্ত। দুঃখ কষ্ট পেয়ে তাঁকে ভুলে যাওয়া—অতি নিম্নস্তরের ভক্ত।'—

'বিপদে ভক্ত তাঁকে আরও প্রাণভরে ডাকে। এজন্যই সংসারে বিপদের সৃষ্টি। তা না হলে কেউ তাঁকে ডাকিত না। সংসারের সম্পদে সকলেই তাঁকে একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাইত।'

শ্রীশ্রীঠাকুর এককথায় ভক্তির সারকথা বলিয়া দিয়াছেন—

'কথাটা হচ্ছে এই যে তাঁকে ভালবাসতে হবে।'

প্যারিস পেরিয়ে

ডক্টর অমিয়কুমার হাটি

[অগ্রহায়ণ, ১৩৯১ সংখ্যার পর]

কানে লাগিয়ে সুইচ টিপেও কিছুই শুনতে পেলাম না। ভাবলাম, বুঝি ঠিকমতো ব্যবহার জানি না। ভাই মোজেস্থিককে বললাম, উনিও টিপে, নেড়েচেড়ে, ধাক্কা দিয়ে দেখলেন। না, কাজই করছে না। অথচ গুঁরটা করছে। তখন আরেকটা নিয়ে এসে লাগালাম। ফরাসী ভাষায় কেউ বলতে শুরু করলে যন্ত্রটা কানে লাগিয়ে ইংরেজী ভাষার সুইচটা টিপলেই ইংরেজী শুনতেই পাচ্ছি, তবে সব সময় মহিলা কণ্ঠে। হয় কি, বক্তৃতা যিনি করছেন, তিনি বলার সঙ্গে সঙ্গেই মহিলা অনুবাদক তর্জমা করছেন, সেটাই ভেসে আসছে হেড-ফোনে। তা এরকম ৫।১০টা ভাষাও শোনা যায়। সেটা বড় কথা নয়। মজাটা হল এই যে, সব হেডফোনগুলো ঠিক ছিল না। বক্তৃতার সময় স্লাইড দেখাতে গিয়েও অনেক সময় আটকে গেছে। আরও দেখেছি, কোন ফরাসী বিজ্ঞানীর সঙ্গে হয়তো আলাপ হল, ঠিক হল বিকাল ৪টায় বিশেষ কোন বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হবে, 'বনলিউ'-এর গেট-এ, অনুসন্ধান অফিসের সামনে। ৪টায় হাজির হলাম। কা কস্য পরিবেদনা! কোথায় বা ফরাসী বিজ্ঞানী! যতটা অখুশি, তার থেকে খুশি এই ভেবে যে, কিছুটা বাঙালী আদলের সঙ্গে মেলে ব্যাপারস্যাপারগুলো।

৫

অ্যানেসির সৌন্দর্য শতগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে একটি বিশাল প্রাকৃতিক হ্রদ—আলপস্ পাহাড়ের কোলে। নীল তার জল। ছোট ছোট মোটর লঞ্চ আছে ঘুরে বেড়াবার হ্রদের ভিতর। পাশে পাশে আছে সুদৃশ্য হোটেল। ভ্রমণ-পিপাসুদের কাছে বড়ই আকর্ষণীয়। বেশি দূর নয় এখান থেকে সুইজারল্যাণ্ড—মাত্র ১০০ কিলোমিটারের মতো। আলপস্ হিমালয়ের মতো বিশাল নয়, কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অ্যানেসি হ্রদের পরিবেশ বড় শান্ত, বড় নির্জন। ইউরোপের মানুষ হয়তো তাই ছুটে আসে এখানে একটু শান্তি খুঁজতে, একটু তৃপ্তি পেতে। সত্যিই চোখ জুড়িয়ে যায়। আমাদের সম্মেলন যেখানে হচ্ছে, তার লাগোয়া। যখনই বিজ্ঞানের কচকচিতে মাথা ভোঁ ভোঁ করত, চলে আসতাম অ্যানেসি লেক-এর পারে, ঘাস এখানেও সবুজ—সে সবুজ মখমল মাড়িয়ে বসতাম কোন বেঞ্চ-এ, চেয়ে থাকতাম আলপস্-এর দিকে, হ্রদের জলের মতো ছলাৎ ছলাৎ করত কেমন যেন মনটা! দুদিনের দেখা, তারপর শুধু স্মৃতি—এই জন্যেই হয়তো!

সম্মেলন চলেছে এখানে অনেক রাত অবধি—সকাল ৮টা থেকে আরম্ভ হয়। অ্যানেসি লেক-এর ধার দিয়েই রাতে ফিরে যেতাম হোটেলে। বিকাল ৭৷৷০টাতেও আলপস্ পাহাড়ের গায়ে রোদ, লেক-এর জলেও বোঝা যাচ্ছে, রোদের ওড়না টেনে নিয়ে হয়তো ভারী একটা চাদর চাপাবে হাল্কা আঁধারের। কবুতর ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাকের ডাক ৮টার সময় লেক-এর ধারে। লেক-এর উপরের পাহাড়ের মাথা দিয়ে চাঁদ উঠেছে এইবার। কাছে দূরে জলের ধারে ধারে নানা ধরনের আলোর সমারোহ শুরু হয়েছে এর মধ্যেই। কিছু দূরেই বাজার। সেখান থেকে কিছু খাবার কিনলাম রাতের। এক মধ্যবয়সী মহিলা দোকানটির পরিচালিকা। দাম তো লেখাই আছে খাবারের উপর, ফ্রাঁ-এর হিসাব রপ্ত হয়নি, দিলাম যা দাম হিসাবে, বোধ হয় বেশিই হল, ফিরছিলাম যখন, ডেকে ফেরত

দিলেন মহিলা। স্নেহঝরা দৃষ্টি। মায়ের মতো। যেন তৃপ্তি পাচ্ছেন খাবার দিয়ে। ভারতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান পরিষদ্ থেকে পরিদর্শক হিসাবে এসেছিলেন ডঃ ডি. পি. শর্মা। তিনিও কিছু কিনতে চাইলেন। কোথায় ভাল দোকান—নিরামিষ খাবার পাওয়া যাবে? গেলাম তাঁকে নিয়ে ঐ দোকানে। সঙ্গে সঙ্গে চিনলেন মহিলা, এগিয়ে এলেন, নিজে খাবার বেছে দিলেন।

দুজনে খাবার নিয়ে ফিরছি—লেক-এর ধারে বসে খাব। তারপর ফিরে যাব হোটেলে। ঘাসে হাঁটছি। বসেছিলেন অনতিদূরে তিনটি যুবতী। একজন এসে ডঃ শর্মার বুকে পরা ব্যাজটায় হাত দিয়ে দেখালেন, জানতে চাইলেন কী ওটা! কেন বুকে লাগানো হয়েছে! কিন্তু ফরাসী ভাষায়। মানে, আমাদের মনে হল, ওঁরা জানতে চাইছেন কীসের জন্যে আমরা ব্যাজটা পরেছি। আমরা তো ফরাসী জানি না—বললাম ইংরেজীতে। কিছুই বুঝলেন না ওঁরা। হেসে চলে গেলেন তরুণীটি।

এঁদের চলনে-বচনে আচারে-ব্যবহারে এতটুকু সংকোচ নেই, নেই দ্বিধা। মাথা উঁচু পুরুষের সমান—অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও করায়ত্ত। খোলা-মেলা মন। এবং সুন্দরী। লালিত্য আছে। আছে দীপ্তি। স্বাস্থ্য। সাধারণভাবে নম্র, মার্জিত। রুচিশীল। অথচ ছটফটে। কর্মচঞ্চল। সম্ভ্রম জাগে। কিন্তু হিসাব মিলাতে পারা যায় না তখনই যখন প্যারিস ও বড় বড় শহরের বুকে অপ-সংস্কৃতিও পাশাপাশি চালু দেখতে পাওয়া যায়—নাইট ক্লাব, ক্যাবারে, উদ্দামতা, পানোচ্ছলতা! শুধু শেষটার কথাই ধরা যাক। এককালে মদ খাওয়ার জন্যে ফরাসীদের মধ্যে লিভারের পচনশীল একটা রোগ—সিরোসিস বেশি হত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মদের রেশন চালু হয়, তখন ঐ সিরোসিস-এ মৃত্যুর হার কমে যায়। কিছুদিন পর রেশন উঠে যায়—এখন ফরাসীদের মধ্যে সিরোসিস-এ ভুগে মৃত্যুর হার আবার ক্রমবর্ধমান।

৬

সারা দুনিয়ার যে ছ'শোর মতো বিজ্ঞানী এখানে জমা হয়েছেন, তাঁরা সবাই আজ শিশুর মতো চঞ্চল ও উচ্ছল হয়ে উঠেছেন হলুদ বিকালে, নীল হ্রদটির তীরে। দুটো বিশাল লঞ্চ লেগে আছে। কে আগে উঠবেন, কত ভাল জায়গায় ধারের দিকে বসবেন, বন্ধুদের জন্যে জায়গা রাখবেন—এসব নিয়ে হুটোপুটি। অ্যানেসি হ্রদের অপর পারে যাব আমরা সবাই মিলে একটি বাগানবাড়িতে—লঞ্চ-বিহার করে, রাতেই নৈশ ভোজের আয়োজন করা হয়েছে, বিজ্ঞানীদের সংবর্ধনার অঙ্গ হিসাবে আমরা যেটায় উঠলাম, সেটার নাম **'La Belle Etoile'**। ধীরে চলেছে লঞ্চটি। নীল হ্রদের জলে দাগ কাটতে কাটতে। হ্রদটির ভিতর কোথাও খাড়া পাথর, কোথাও বা ক্ষুদে দ্বীপ। বড় বড় সাদা রাজহাঁস নিশ্চিন্তে ঘুরছে তীরের দিকে। হ্রদের জলে নৌ-চালনা করছে নীল পোশাক-পরা ছেলেমেয়েরা। ছোট ছোট নৌকা। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। ছেলেটি আগে, তারপর মেয়েটি নৌকা বাইছে। দুটি নৌকার মধ্যে প্রতিযোগিতাও হচ্ছে। হলুদ চরাগুলো মাঝে মাঝে ভাসছে, দুলছে, দূর থেকে ওগুলোকে দেখে পাখি বলে ভুল হয়। খুব ছোট ছোট সাদা হাঁসও দেখলাম কতকগুলো—নাকি সাদা বক ওগুলো? দূরে খাড়া এক পাহাড়—চতুর্ভুজ—সোজা থামের মতো উঠেছে—ঘোলাটে বরফ আছে কি উপরে? পাহাড় বেয়ে সবুজ বন নেমে গেছে, নীলে সবুজে মেশামেশি। পাহাড়ে আছে ফার্ন, হার্ডউড, মেপল গাছ।

আট ঘণ্টার এই লঞ্চ-বিহার এত

তাড়াতাড়ি শেষ হল! বাগানবাড়িটা এসে গেছে। বিরাট সুদৃশ্য সামিয়ানা টাঙানো। লঞ্চ থেকে নামবার সময় ক্যামেরা ক্লিক ক্লিক করে উঠছে। হয়তো নামজাদা বিজ্ঞানীদের ফটো তুলছে কেউ, কেউ বা বন্ধুবান্ধবদের—ভাবলাম তখন এটাই। দেশে ফিরে এসে ভুল ভেঙেছিল। একদিন দেখলাম সম্মেলন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটা ফটো পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে—ফটোটা আমার, নামছি বাগানে। লেখা আছে ফটোর সঙ্গে লাগানো একটুকরো কাগজে—মধুময় এই দিনগুলির একটুখানি স্মৃতি উপহার। অর্থাৎ কিনা সবার ছবিই সেদিন তোলা হয়েছিল। সেটা হয়তো এমন কিছু কঠিন নয়, আমার কাছে যেটা এখন বিস্ময়ের সেটা হল প্রত্যেককে তার সঠিক ফটোটা কী করে পাঠানো গেল! ওখানে ব্যবস্থাপকরা তো ঘুণাক্ষরেও কারুকে কিছু জানাননি—বা কারুর কাছ থেকে কিছু জেনেও নেননি!

পরিবেশটা ছিল মানানসই। টিমটিমে আলো—বিজলীবাতি অবশ্যই—তবে মনে হচ্ছিল না বিজলীবাতি বলে। বাইরে পথের দুপাশে সারি দিয়ে সাজানো বড় বড় ধূপদানির মতো পাত্রে আগুনের শিখা লকলক করছিল। পানভোজনের এলাহি ব্যাপার। মদ বুঝি এদের সব উৎসবেরই একটি অঙ্গ! সেটা থাকবেই। অবশ্য সফট ড্রিঙ্কসও থাকে, কমলালেবুর রস, টম্যাটোর রস, আনারসের রস। তবে, নজরে পড়ল একটা জিনিস। চমৎকৃত হতেই হল। ইউরোপের এক তরুণ বিজ্ঞানী বসেছিলেন আমাদের সামনে। দেখা গেল, ঐ টেবিলে আমরা দুজনেই শুধু সফট ড্রিঙ্কস খাচ্ছি। ডঃ মোজেস্বির বন্ধুরা প্রথমে লাগলেন আমার পিছনে। এখন এসব খুব স্পর্শকাতর ব্যাপার। আমি আমতা আমতা করে বলি, অ্যালকোহলে আমার অ্যালার্জি হয়। ওরা হাসে। ঐ তরুণ বিজ্ঞানী কিন্তু বললেন, স্পষ্ট ভাষায়, তিনি মদ খান না। আসলে বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থা মদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। অথচ এ ধরনের বিজ্ঞানী সম্মেলনে তো অঢেল ফোয়ারা ছোটে! যদিও এসব একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, এবং ছুঁৎমার্গীও নই—তাহলেও বিজ্ঞানীরা যখন পথ দেখান, তখন বিষয়টা আরও গুরুত্ব পায়। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে ধূমপানের কথা। ৬০ হাজার ব্রিটিশ চিকিৎসক যেন গবেষণার স্বার্থে ধূমপান ছেড়ে দিয়েছিলেন। সমীক্ষায় দেখা গেছে, তাঁদের রোগ—অসুখ যথা ফুসফুসের ক্যানসার, ব্রনকাইটিস প্রভৃতি ধূমপায়ীদের তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে কম। বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থার অনুমানে ধূমপান সাধারণতঃ বর্জনই করা হয়। মদ নিয়ে এতটা ব্যাপক প্রচার কিন্তু আরম্ভ হয়নি।

ফেরার সময় আর লঞ্চে নয়—বাস আমাদের যে যার হোটেলে পৌঁছে দিল—অন্য পথ দিয়ে। রাত তখন দশটা, বেশ শীত। চোখে তৃপ্তির ঘুম নেমে এল।

পরের সন্ধ্যায় আর এক জায়গায় নেমন্তন্ন ছিল সবার। এটা অ্যানেসির পুরানো অঞ্চল—টালির ছাদ দেখেই বোঝা যায়—একটা টালির ঘরের ছাদ তো প্লাস্টিকের চাদর দিয়ে ঢাকা। তবে এই একটা-দুটো ভাঙা বা অসংস্কৃত বাড়ি নজরে পড়েছে। যেমন, এদিকে আসতে বাজারের কাছে একটা ফাটা বাড়ি দেখলাম, প্লাস্টার তার কিছুটা ছাড়ানো, নোংরা, পাশের অন্য বাড়িগুলোর মধ্যে রঙ করা নেই। তো এ দু-একটাই। পুরানো অ্যানেসিতে কঞ্চি বা কাঠির বেড়াও দেখেছি—বাড়ি ঘিরে, কিন্তু তাও ছিমছাম। আর, হঠাৎ নজরে পড়ল এক হোমিওপ্যাথি ডাক্তারখানা। অবাকই হলাম কিছুটা। এদিকটা একটু উঁচু—পাহাড় ঠিক

বলা যায় না—টিলার উপর। উঠে অনেকদূর অবধি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অ্যানেসি শহর (না গ্রাম ?)-টিকে দেখা যায়। আছে পুরানো দিনের একটা দুর্গ। আগেকার যুগের বিশাল বড় সিংহদরজা। বিরাট উঁচু পাথরের পুরু প্রাচীর চারদিক ঘিরে। আমরা বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে হেঁটেই আসছিলাম—দূরত্ব বেশি নয়—সম্মেলনের জায়গাটা থেকে বড় জোর এক কিলোমিটার।

কেউ কেউ এইটুকু পথ ট্যাক্সিতেও আসছেন দেখলাম। তা আসতে পারেন, তাতে কার কী? তবে, কানে বাজবেই বহুদিন—"T—a—x—i···my goodness···l—a—z—y" এক মেমসাহেব বলছেন তাঁর সঙ্গীকে, কতকগুলো মেমসাহেবকে ট্যাক্সিতে আসতে দেখে। এতো একেবারে এ দেশীয় স্বভাব! যাকে বলে নির্ভেজাল কতকগুলো প্রকৃতি; মূল বৈশিষ্ট্য, পুরুষের বা নারীর—বোধ হয় সব দেশেই এক! বাঙালী ললনা এ মতো অবস্থায় নিশ্চয়ই বলতেন, "ও-মা—কী কুঁড়ে!" [ক্রমশঃ]

বস্তুগঠন-তত্ত্বের ক্রমবিকাশ

অধ্যাপিকা রেণুকা চট্টোপাধ্যায়

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা রামমোহন কলেজ।

বস্তুজগৎ বা বস্তুর সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তা চিরকালের। কোথা থেকে, কোন্ উপাদানে এবং কি ভাবে বস্তুপুঞ্জ গড়ে উঠেছে এই প্রশ্ন মানুষের মনকে আলোড়িত করেছে বহু প্রাচীনকাল থেকে। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক কণাদ বস্তুকে কণার সমষ্টিরূপে কল্পনা করেছিলেন। প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতদেরও ধারণা ছিল পদার্থ কণার সমষ্টি। কণাগুলি অবিভাজ্য। তাঁরা কণাগুলির নাম দিয়েছিলেন অ্যাটম বা পরমাণু। অণু-পরমাণুর কল্পনা সনাতন যুগের।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী প্রাউট (Prout) বলেছিলেন, প্রতিটি বস্তুই কতকগুলি মৌলিক পদার্থের সমষ্টি এবং এই মৌলিক পদার্থগুলি হাইড্রোজেন পরমাণু দিয়ে তৈরি। এই ধারণার কারণ কি? কারণ বেশির ভাগ মৌলিক পদার্থের আণবিক ভর ছিল হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের গুণিতক। কিন্তু এটাও পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্ত নয়।

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে রসায়নবিদ্ ডালটন (Dalton) মাঞ্চেস্টারে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাঁর জীবন অতিবাহিত করেন, কিন্তু সেই সময়ে তাঁর গবেষণালব্ধ ফল জনসমক্ষে আসেনি। তাঁর মৃত্যুর বহু বছর পর ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে দুজন বৈজ্ঞানিকের সহায়তায় তাঁর আণবিক তত্ত্বের পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয়। সেই সঙ্গে ডালটনের আণবিক-তত্ত্বের মূল এবং ব্যাখ্যাও প্রকাশিত হয়। এই তত্ত্বে নিউটনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। প্রাচীন মতবাদের সঙ্গে পরীক্ষালব্ধ ফল মিশ্রিত হয়ে সর্বপ্রথম পদার্থের গঠনতত্ত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞান-সম্মত তত্ত্ব প্রচারিত হল। ডালটনের পারমাণবিক তত্ত্ব থেকে পাওয়া গেল পদার্থ অসংখ্য, অবিভাজ্য কণাদ্বারা গঠিত এবং এই কণাগুলিই পরমাণু।

ইতিমধ্যে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে রুশ বিজ্ঞানী রসায়নবিদ্ মেণ্ডেলিফ (Mendeleeff) পারমাণবিক সংখ্যা ও ভর (mass) অনুযায়ী ৯২টি পরমাণুকে একটি পর্যায় সারণীতে সাজিয়েছিলেন।

ঊনবিংশ শতকের শেষদিক পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের

ধারণা ছিল পরমাণু পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ এবং অবিভাজ্য, কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষদিকে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে টমসন, লেনাউ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ নিম্নচাপ গ্যাসের ভিতর তড়িৎ-মোক্ষণ পরীক্ষার দ্বারা ইলেকট্রন (Electron) আবিষ্কার করেন। তাঁরা বললেন, ইলেকট্রন পরমাণুর একটি অংশ। এটি একটি মৌলিক কণা, যে কোনও পরমাণুতে বিদ্যমান। একটি ইলেকট্রন ঋণাত্মক (negative) তড়িৎ-যুক্ত এবং এর ভর (mass) হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের ১৮৩৬ ভাগের ১ ভাগ। পরমাণু স্বাভাবিক অবস্থায় তড়িৎ-শূন্য, কিন্তু একটি ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হলে অবশিষ্ট অংশ ধনাত্মক (Positive) তড়িতে আহিত হয়ে পড়ে। তখন প্রতিপন্ন হল পরমাণুকে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাঙা যায়।

পরমাণুর ভিতর ধনাত্মক তড়িতাধান এবং ঋণাত্মক তড়িতাহিত ইলেকট্রনগুলি কিভাবে সাজানো সেটা জানা দরকার। টমসনের মডেল থেকে পাওয়া গেল, পরমাণু একটি ধনাত্মক আধানের গোলক যার মধ্যে ইলেকট্রনগুলি ইতস্ততঃ ছড়ানো। টমসনের পরমাণু মডেল, সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি। বৈজ্ঞানিক রাদারফোর্ডের পরীক্ষার পর টমসনের পরমাণু মডেল পরিত্যক্ত হয়।

আলফা-রশ্মি (α-rays) সোনার পাতলা পাতের ওপর ফেলে রাদারফোর্ড দেখালেন, দ্রুতগতি সম্পন্ন অধিকাংশ আলফা-কণা (α-Particle) পাতটিকে ভেদ করে চলে গেল, গতিপথের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল না। কিন্তু কিছু কিছু α-কণার ক্ষেত্রে গতিপথের বেশ কিছুটা বিচ্যুতি লক্ষ্য করা গেল, কোন কোন কণা ৯০° এবং আরও বেশি বিক্ষিপ্ত হল। আলফা হল একটি ইলেকট্রন বিহীন হিলিয়াম পরমাণু, ইহা ধনাত্মক।

এই বিক্ষেপণের ব্যাখ্যা করে রাদারফোর্ড বললেন, পরমাণুর ধনাত্মক আধান এবং প্রায় সম্পূর্ণ ভর এর কেন্দ্রে একটি ক্ষুদ্র অংশে কেন্দ্রীভূত আছে। এটাই পরমাণুর কেন্দ্রক বা নিউক্লীয়াস (Nucleus)। পরমাণুর আয়তনের তুলনায় নিউক্লীয়াসের আয়তন খুবই কম। ধারণা করা যায় যে, পরমাণুর ভিতর অধিকাংশ স্থানই শূন্য।

আলফা বিক্ষেপ-পরীক্ষার ফলে পরমাণুর কেন্দ্রক সম্বন্ধীয় তথ্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং আরও প্রতিষ্ঠিত হল যে, কেন্দ্রকের মধ্যে ধনাত্মক মৌলিক কণা আছে, যা প্রোটন (Proton) নামে পরিচিত হল। এই কণা সবরকম পরমাণু কেন্দ্রকের একটি সার্বিক উপাদান। এর ভর (mass) ইলেকট্রনের ভরের প্রায় ১৮৩৬ গুণ বেশি। পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রকের চতুর্দিকে কিভাবে বিন্যস্ত, সে সম্বন্ধে রাদারফোর্ড একটি মতবাদ প্রকাশ করেন। ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রকের আকর্ষণ সত্ত্বেও তার ওপর গিয়ে পড়তে পারে না, কারণ তাহলে তাদের অস্তিত্বই থাকত না। তিনি বললেন, পরমাণুর গঠন সৌরজগতের গঠনের অনুরূপ। সৌরজগতে সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলি আবর্তিত হয়। গ্রহগুলি সূর্যের অভিকর্ষ দ্বারা আকৃষ্ট হয়, অথচ সূর্যের ওপর গিয়ে পড়ে না এটা সম্ভব হয়, কারণ তারা সূর্যকে ঘিরে নিজ নিজ নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তন করে, যার ফলে তাদের ওপর একটা অপকেন্দ্রিক বল ক্রিয়া করে। এই অপকেন্দ্রিক বল অভিকর্ষজ আকর্ষণী বলকে প্রতিহত করে। রাদারফোর্ড অনুমান করেন যে, পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনগুলি ঠিক এইভাবে কেন্দ্রককে ঘিরে আবর্তন করে, যার ফলে অপকেন্দ্রিক বল ও বৈদ্যুতিক আকর্ষণী বল পরস্পরকে প্রতিহত করে।

রাদারফোর্ডের মতবাদের মধ্যে একটা গুরুতর ত্রুটি দেখা যায়। তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ত্ব থেকে

জানা যায়, কোন আহিত কণা (charged particle) ত্বরণশীল (Accelerated) গতিতে বিচরণ করলে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ নিঃসৃত হয়; যার ফলে শক্তি ক্ষয় হয়, গতি শ্লথ হয় এবং বৃত্ত ছোট হয়। এইরূপে কালক্রমে ইলেকট্রনটি কেন্দ্রকের ওপর পড়ে বিলীন হয়ে যাবে।

ডেনমার্কের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নীল-বোর, রাদারফোর্ডের আণবিক মডেলের ত্রুটি সংশোধন করে একটি মডেল তৈরি করেন। বোর বলেছিলেন, ইলেকট্রনগুলি যে কোন কক্ষপথে আবর্তিত হবে না। কতকগুলি নির্দিষ্ট (স্থায়ী) কক্ষপথে আবর্তিত হলে ইলেকট্রনে শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে। শক্তির কোনও বিকিরণ হবে না।

নিরপেক্ষ পরমাণুর ক্ষেত্রে বহিঃকক্ষে ইলেকট্রনের সংখ্যা ও কেন্দ্রকে প্রোটনের সংখ্যা সমান হবে। পরমাণু পরিবারে হাইড্রোজেন পরমাণু সবচেয়ে সহজ ও হাল্কা। এর কেন্দ্রে একটি প্রোটন এবং বহিঃকক্ষে একটিমাত্র ইলেকট্রন প্রোটনকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। কেন্দ্রকের (নিউক্লীয়াস) গঠন সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। প্রত্যেক মৌলের (element) পরমাণুর ভিতর কেন্দ্রে একটি ঘনীভূত ভর আছে, একেই কেন্দ্রক বলে। এর ব্যাসার্ধ প্রায় ৫×১০^{-১৩} সে. মি.। নিউক্লীয়াস গঠন সম্পর্কে বলা হল যে, পরমাণুতে যতগুলি ইলেকট্রন থাকবে নিউক্লীয়াসেও ততগুলি প্রোটন থাকবে; তবেই পরমাণু নিস্তড়িৎ হবে। হিলিয়াম বহিঃকক্ষে দুটি ইলেকট্রন আছে, এটা নিস্তড়িৎ পরমাণু। সুতরাং নিউক্লীয়াসে নিশ্চয়ই দুটি প্রোটন আছে, কিন্তু দেখা গেল এর যা ভর পাওয়া গেল, তাতে ৪টি প্রোটন না থাকলে ঐ ভর আসে না। আবার ৪টি প্রোটন থাকলে নিস্তড়িৎ করার জন্য নিউক্লীয়াসের মধ্যে দুটি ইলেকট্রনের অবস্থিতি মেনে নিতে হয়, তাও সম্ভব নয়। অন্যান্য মৌলের ক্ষেত্রেও এইরকম; যেমন কার্বন, ভর অনুযায়ী ১২টি প্রোটন থাকা উচিত, কিন্তু রাসায়নিক ও অন্যান্য পরীক্ষায় দেখা গেছে ৬টি ইলেকট্রন আছে। সুতরাং ৬টি প্রোটনের তড়িতাধান প্রশমিত হচ্ছে এবং ৬টি হচ্ছে না। দেখা গেল, সর্বাপেক্ষা ভারী মৌল ইউরেনিয়ামের ভর অনুযায়ী ২৩৮টি প্রোটন থাকা উচিত, ৯২টি ইলেকট্রন বহিঃকক্ষে ঘুরছে। সুতরাং এ-ক্ষেত্রেও $(২৩৮-৯২)=১৪৬$টি প্রোটন অপ্রশমিত অবস্থায় থেকে গেল। যদি নিউক্লীয়াসের মধ্যে ইলেকট্রন অবস্থান করতে পারে, তাহলে ভরশূন্য ইলেকট্রনকে নিউক্লীয়াসে স্থাপন করে এইসব বাড়তি প্রোটনের ধনাত্মক আধানকে প্রশমিত করা যায়। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে স্যাডুইকের নিউট্রন (Neutron) আবিষ্কারের ফলে উপরি-উক্ত সমস্যার সমাধান হল। নিউট্রন একটি নিস্তড়িৎ কণিকা এবং এর ভর একটি প্রোটনের ভরের প্রায় সমান। নিউক্লীয়াসের ভিতর নিউট্রনের অবস্থানে সমস্যার সমাধান হল। বহিঃকক্ষে ইলেকট্রনের সংখ্যা ও নিউক্লীয়াসে প্রোটনের সংখ্যা সমান থাকবে এবং ভর অনুযায়ী বাদবাকি থাকবে নিউট্রন, তাহলে ভরও ঠিক রইল আবার মৌলটিও নিস্তড়িৎ হল। বিজ্ঞানী সডী (Soddy) তেজস্ক্রিয় পদার্থ সংক্রান্ত গবেষণাকালে আইসোটোপ আবিষ্কার করেন। আইসোটোপের (Isotope) অর্থ, মূল মৌল ও আইসোটোপের ভরের পার্থক্য থাকবে, কিন্তু বহিঃকক্ষে ইলেকট্রনের সংখ্যার পরিবর্তন হবে না। সেজন্য এদের রাসায়নিক ও ভৌত গুণাবলী একই হয়।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে টমসন নীয়ন গ্যাস নিয়ে পরীক্ষার সময় আইসোটোপের সন্ধান পান। এই গ্যাসের ক্ষেত্রে একটি পারমাণবিক ভর হল ২০ এবং আর একটির হল ২২। টমসনের পরীক্ষায় স্থায়ী মৌলের ক্ষেত্রেও আইসোটোপের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছিল এবং টমসনের এই

আবিষ্কার পরবর্তী কালে পরমাণু কেন্দ্রকের গঠন নির্ণয়ে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এক্সরের মতো তেজস্ক্রিয়তা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল। ফরাসী বিজ্ঞানী বেকরেল ইউরেনিয়াম নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ সন্ধান পেলেন ইউরেনিয়াম স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক প্রকার বিকিরণ নিঃসৃত করছে। নানারকম পরীক্ষা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নিঃসৃত বিকিরণের প্রকৃতি এবং তীব্রতা, ইউরেনিয়ামের রাসায়নিক ও ভৌত পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হয় না, অর্থাৎ বহিঃপ্রযুক্ত চাপ, উষ্ণতা বা রাসায়নিক গঠন পরিবর্তন করলেও ইউরেনিয়ামে তেজস্ক্রিয়তা সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকে। তেজস্ক্রিয়তা রাসায়নিক পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত নয় বলে পদার্থের এই ধর্মের সঙ্গে পরমাণুর কক্ষপথে আবর্তনশীল ইলেকট্রনগুলির কোনও সম্পর্ক নেই। তেজস্ক্রিয়তার উৎপত্তির কারণ নিহিত থাকে মৌলের পরমাণু কেন্দ্রকের মধ্যে।

রাদারফোর্ড প্রমাণ করলেন, ইউরেনিয়াম থেকে দু-রকম বিকিরণ নিঃসৃত হয়। একটির নাম আলফা-রশ্মি (α-ray) এবং অপরটির নাম বীটা-রশ্মি (β-ray)। পরে আর একটি বিকিরণের নিদর্শন পাওয়া যায় তার নাম গামা-রশ্মি (γ-rays), ইউরেনিয়াম ছাড়া থোরিয়াম, রেডিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি প্রকৃতিলব্ধ মৌল থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকিরণ নিঃসরণের নিদর্শন পাওয়া গেছে। আলফা কণিকা (α) একটি হিলিয়াম মৌলের কেন্দ্রক। এর মধ্যে দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন থাকে। এটি একটি ধনাত্মক কণিকা। বীটা কণিকাগুলি (β) খুব উচ্চ বেগ-সম্পন্ন ইলেকট্রন। ইলেকট্রন ঋণাত্মক আধান বহন করে। বীটা বিঘটনের ফলে কেন্দ্রকের ধনাত্মক আধান বৃদ্ধি পায়। আধুনিক তত্ত্ব অনুযায়ী কেন্দ্রক মধ্যস্থ একটি নিউট্রন, বীটা বিঘটনের ফলে, প্রোটনে রূপান্তরিত হয়। গামা-রশ্মি (γ-rays) একটি তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ, এদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য অতি ক্ষুদ্র। গামা নিঃসরণের ফলে পরমাণুর প্রকৃতির কোনও মৌলিক পরিবর্তন হয় না, কেবল কেন্দ্রকটি এক শক্তিস্তর থেকে অন্য শক্তিস্তরে সংক্রমিত হয়।

কিছু পদার্থকে উচ্চশক্তিসম্পন্ন আলফা কণিকা, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি দ্বারা আঘাত করলে তারা সাময়িকভাবে তেজস্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এইভাবে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা নিষ্পন্ন হয়। এই ধরনের তেজস্ক্রিয়তার ফলে অনেক সময় এক প্রকার কণিকা বিকীর্ণ হয়, যাদের ভর ও আধানের মান ইলেকট্রনের সমতুল্য কিন্তু যাদের আধান ধনাত্মক। এগুলিকে পজিটিভ ইলেকট্রন অথবা পজিট্রন (positron) বলা হয়।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানী পদার্থবিদ্ য়ুকাওয়া নিউক্লীয় বল ব্যাখ্যা করার সময় এক ধরনের কণিকার কথা বলেন, যা ইলেকট্রনের সমান ধনাত্মক বা ঋণাত্মক আধান বহন করতে পারে এবং যা একটি ইলেকট্রনের দু-শ গুণ ভারী। এই কণার নামই মেসন (Meson)। পরবর্তী কালে পাই-মেশনের (π-meson) সঙ্গে য়ুকাওয়া মেশনের অভিন্নতা প্রমাণিত হয়েছে। নিউক্লিয়াস গঠনে পাই-মেশনের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে।

মহাজাগতিক রশ্মির সঙ্গে বিভিন্ন নিউ-ক্লীয়াসের বিক্রিয়ার ফলে আরও কিছু কণিকা আবিষ্কৃত হয়েছে; এদের হাই-পেরন বলা হয়। বিভিন্ন মৌল কণিকার সঙ্গে নিউক্লীয়াসের বিক্রিয়া চলেছে এবং নিত্য নূতন ব্যাখ্যারও শেষ নেই।

নিউক্লীয়াসের গঠন এবং নিউক্লীয় বিক্রিয়ার আরও তত্ত্ব কালক্রমে আবিষ্কৃত হবে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার শেষ কিছু নেই।

বাউল এলো

(গান—বাউল সুরে গেয়)

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যের বিশ্রুত গবেষক, লেখক ও কবি।

আনন্দ! আনন্দ! ভরা ভুবনে,
বাউল এলো কোথা হতে, কে জা-নে!
নেচে গেল গেয়ে গেল সারা বেলা
রঙে রসে প্রেম-বশে আত্মভোলা।
ছুটে আসে ঊর্দ্ধশ্বাসে দলে দলে পাগল ছেলে
সকল ভুলে কিসের টানে কে জা-নে!
আনন্দ! আনন্দ! ভরা ভুবনে।

তাঁরে ঘিরে টলোমলো মোহন খেলা
রাজার ঐশ্বর্য সেথা হেলাফেলা— শুধু খেলা।

নাচে বাউল বিশ্বভুলে, হৃদয়-দুয়ার গেল খুলে,
রসের সায়র ওঠে দুলে তাঁরি পানে, কে জা-নে
বাউল এলো কোথা হতে কে জা-নে!

ঠাকুর রামকৃষ্ণ আমার, বাউল রামকৃষ্ণ আমার
হৃদয়মাঝে কেবল নাচে তুফান তুলে গানে গানে—
আনন্দ! আনন্দ! ভরা ভুবনে।

দেশের প্রতি ও বিশ্বের প্রতি ভারতের বাণী

স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ধর্মমতের পারস্পরিক বিরোধ ধর্মবিকৃতির নিকৃষ্টতম অভিব্যক্তি

একথা এতক্ষণে বোঝা গেল যে, প্রত্যেক ধর্মই প্রত্যেকের ধর্ম এবং সেইজন্য এক ধর্মমতের সঙ্গে অন্য ধর্মমতের কোন বিরোধ নেই। বিকৃতি থেকেই বিরোধের জন্ম এবং ধর্মের সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিকৃতি হল এই বিরোধ। আজ ধর্মের নামে প্রচলিত বিকৃত আচার-আচরণের গভীরে প্রবেশ করে তার মুখোশ খুলে দেওয়া এবং তার অবলুপ্তি ঘটানোর সময় এসেছে। ধর্ম স্বরূপত এক, কিন্তু আজ আমরা দেখছি যে ধর্মের নামে স্বার্থান্ধ ও সুবিধাভোগী ব্যক্তিরা ধর্মমতে ধর্মমতে বিভেদ সৃষ্টি করে মানুষের মধ্যে সংঘাতকে জিইয়ে রেখেছে। এই সব স্বার্থান্ধ ব্যক্তিরা এক ধর্মমতকে অন্য ধর্মমতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে। এইভাবেই তারা ধর্মের সারসত্যকে বিকৃত ও বিনষ্ট করে, যে সারসত্য হল অভেদতত্ত্ব, যা মানবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ। এক অদ্বয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার অর্থ এক অখণ্ড সত্তা ও অখণ্ড মানবজাতিতে বিশ্বাস স্থাপন করা। আজ মানবাত্মার বেদীমূলে ধর্মকে বলি দেওয়া হয়েছে এবং এখনও এই বলিদান অব্যাহত রয়েছে। বস্তুত ধর্মের নামে আজ নিরন্তর মানবাত্মারই বলিদান হচ্ছে

সংখ্যালঘু ধর্ম বলে কোন ধর্ম নেই

মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান, আধ্যাত্মিক ঐক্যের বিকাশ এবং মানবসভ্যতা ও মানবজাতির সংহতি সাধনই হল ধর্মের উপজীব্য। ধর্মের কোন প্রত্যক্ষ সামাজিক বা রাজনৈতিক ভূমিকা নেই কাজেই 'সংখ্যালঘু' বা 'সংখ্যাগুরু' ধর্ম অর্থহীন। অতএব, ধর্মের দিক থেকে 'সংখ্যাগুরু' বা 'সংখ্যালঘু' বলে কোন সম্প্রদায় স্বীকার করা চলে না। মানুষের প্রকৃতিগত অভিরুচির পার্থক্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং পৃথিবীতে যতগুলি মানুষ আছে ততগুলি ধর্মমত থাকাই স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয়। কাজেই ধর্মের ক্ষেত্রে 'সংখ্যাগুরু' ও 'সংখ্যালঘু' শব্দের প্রয়োগ স্ববিরোধী। এই উক্তিগুলি এবং এই মনোভাব-সঞ্জাত দৃষ্টিভঙ্গী প্রকৃত ধর্ম বলতে যা বুঝায় তার ক্ষেত্রে অতি নিকৃষ্ট অপপ্রয়োগ। প্রত্যেক ধর্মমতই প্রত্যেক মানুষের অন্তর্নিহিত অদ্বয় সত্তা ও তার মৌল ঐক্যের প্রকাশ। ধর্মের মাধ্যমেই মানুষ তার অন্তর্নিহিত ঐক্যকে উপলব্ধি ও প্রকাশ করতে সমর্থ হয়। বিভিন্ন ধর্মমতের প্রকৃত উদ্দেশ্য মানব-ঐক্যের উপলব্ধি; ধর্মের এই মূল উদ্দেশ্যকে বিকৃত করে মানুষে মানুষে বিভেদের সৃষ্টি করা চরম মূঢ়তা।

কোন ধর্মেরই স্বকীয় বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দাবীর অবকাশ নেই

এতক্ষণ যে আলোচনা করা হল তা থেকে এই সিদ্ধান্তে সহজেই আসা যায় যে, কোন ধর্মমতই নিজের জন্য বিশেষ অধিকার বা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দাবী করতে পারে না, কারণ ধর্মের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা স্বীকার করার অর্থই হল বিভেদকে মেনে নেওয়া। কোন একটি ধর্মমতের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দাবী করা স্ববিরোধী কথা এবং ধর্মমতে ধর্মমতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী। অন্যভাবে বলা যায়, কোন একটি ধর্মমতের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দাবী

করার অর্থ বিশ্বচৈতন্যের সর্বতোমুখী প্রকাশকে মাত্র তার এক অংশের মধ্যে সীমিত করে রাখা। কিন্তু এই জাতীয় দাবী যে কোন ধর্মমতের পক্ষেই আত্মঘাতী। ধর্ম হচ্ছে জীবনের অভ্যুদয় ও বিস্তৃতির দ্যোতক। ধর্মই জীবনের বিকাশকে সর্বপ্রকারে সম্ভব করে তোলে। তাই, কোন ধর্মমতকে সংকুচিত করার অর্থ হল প্রকৃত ধর্মের ও মানবজীবনের বিনাশ সাধন করা। ধর্মের প্রকৃতি হল এই যে, সে মানুষকে নানাভাবে ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তের দিকে নিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত এক আধ্যাত্মিক ঐক্যের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করতে শেখায়। আজ অবশ্য চারিদিকে যা দেখা যাচ্ছে তা হচ্ছে এই সত্যের বিপরীত। কোন ধর্মমতের জন্য বিশেষ সুবিধা দাবী করলে তাকে আধ্যাত্মিক স্তর থেকে জাগতিক স্তরে নামিয়ে আনা হয়, তার সার-সত্যকে বাদ দিয়ে কেবল বাহ্যরূপকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ফলে ধর্মের সারসত্যটি বিনষ্ট হয়ে যায়। ধর্মমতের ক্ষেত্রে যদি কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা মানতেই হয়, তবে বলা যায় যে, এই বিশেষ সুযোগ হল প্রত্যেক ধর্মমতেরই এই মৌলিক অধিকার আছে যে, অন্যান্য ধর্মমতের বিশেষ বিশেষ অবদানকে স্বাঙ্গীকরণের মাধ্যমে নিজেকে সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ করে চরম অভীষ্টলাভে সমর্থ হয়।

জ্ঞাতসারেই হোক, আর অজ্ঞাতসারেই হোক, প্রত্যেক ধর্মমতই ঐক্যলাভের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য ঐক্যকে বলা যায় সকল ধর্ম-মতের পরিপূর্ণতার মাপকাঠি। ধর্মমত তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করে যথার্থ ধর্মে পরিণত হয়, যখন সে এক অদ্বয় সার্বভৌম সত্যের বিচিত্র বিভিন্ন প্রকাশকে স্বাঙ্গীকৃত করে চরম ঐক্যকে উপলব্ধি করে। সুতরাং সেই পরিপূর্ণ ধর্মই মানুষের চরম অনুসরণীয় আদর্শ।

এক অদ্বয় ধর্মই সত্যিকার 'ধর্মান্তর' ও অভ্যুদয়ের ভিত্তিভূমি

অধ্যাত্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের ফলে ধর্মের উপর একটা দায়িত্ব এসে পড়েছে। এই দায়িত্ব হল মানবজাতিকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যেতে হবে যেখানে বেদ, বাইবেল, কোরান—কিছুই নেই। অথচ এই যাত্রা সম্ভব হবে বেদ, বাইবেল, কোরানেরই সমন্বয়ের মাধ্যমে। মানুষকে শেখাতে হবে যে, বিভিন্ন ধর্মমত হচ্ছে এক অদ্বয় ধর্মের বিচিত্র প্রকাশ এবং ঐক্য হল সকল ধর্মমতেরই চরম লক্ষ্য। এর ফলে প্রত্যেক মানুষ নিজস্ব রুচি অনুযায়ী তার উপযোগী কোন বিশেষ ধর্ম-মত বেছে নিতে পারবে। সেইজন্য একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, ঐক্যই হচ্ছে প্রকৃত ধর্মান্তরের চরম লক্ষ্য। এইরূপ 'ধর্মান্তর' সর্বজনীন অভ্যুদয়ের পক্ষে অপরিহার্য। কোন মানুষের পক্ষে এক ধর্ম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্মকে গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সকল মানুষকেই নিজ নিজ ধর্মমত থেকে ধীরে ধীরে এক অদ্বয় সনাতন তত্ত্বে বা ধর্মতত্ত্বে উপনীত হতে হবে। এই পথই মানুষের পক্ষে একমাত্র মুক্তির পথ। এই পথ অবলম্বন করেই মানুষ সেই একত্বে উপনীত হতে পারবে, 'যে একত্বের মধ্যে সকল বিশ্ব অনুস্যূত, যা সকল বিশ্বে বিরাজমান, আত্মা যার মধ্যে বিরাজমান, যা আত্মার মধ্যে অনুস্যূত, যা মানুষের আত্মা; তাকে জানলে, প্রকারান্তরে বিশ্বকে জানলে,—নিজের আত্মা-রূপে জানলে,—সকল ভয় ও দুঃখের অবসান হয়, এবং মানুষ অনন্ত মুক্তির অভিমুখে যাত্রা করে। ব্যষ্টির ক্ষেত্রেই হোক বা সমষ্টির ক্ষেত্রেই হোক, যেখানেই প্রেমের বা অভ্যুদয়ের বিস্তার ঘটেছে, তার মূলে রয়েছে এক চিরন্তন সত্য, সমগ্র মানবের একত্ব, এবং এই একত্বের বোধ, অনুভূতি ও প্রয়োগ।' এই একত্বের বোধ,

অনুভূতি ও প্রয়োগ মানবজীবনে যত ব্যাপক হবে ততই জগতে প্রেমের ও অভ্যুদয়ের বিস্তৃতি ঘটবে। এই একত্বই প্রকৃত সর্বোদয়ের একমাত্র উৎস।

আধ্যাত্মিক ঐক্যের উপলব্ধি 'আধ্যাত্মিক' ও 'ব্যবহারিক' সত্তার বিভেদ দূর করে এবং জীবনে ও চিন্তায় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে

আধ্যাত্মিক ঐক্যের উপলব্ধি সকল প্রকার ভেদবুদ্ধি দূর করে দেয় এবং জীবন ও চিন্তার মধ্যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করে। এক বিশ্বচৈতন্য ও তার অনন্ত দিক মূলত অভিন্ন; শুধু মন তাকে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ করে। সুতরাং শুধু বিভিন্ন পূজাপদ্ধতিই নয়, সকল কর্মপদ্ধতি, জীবন-সংগ্রামের সকল পদ্ধতি, সৃজনশীল সকল পদ্ধতি আত্মোপলব্ধির বিভিন্ন উপায়। 'পারমার্থিক' ও 'ব্যবহারিকের' মধ্যে কোন পার্থক্য নেই; মানব-সেবা ও ঈশ্বর-উপাসনার মধ্যেও তাই কোন বিভেদ নেই। শ্রম করা প্রার্থনারই নামান্তর। জয় করা ত্যাগেরই নামান্তর। গ্রহণ, অধিকার ও সংরক্ষণ ত্যাগ ও পরিহারের ন্যায় সমভাবে কঠোর দায়-স্বরূপ। সমগ্র জীবনই ধর্ম। সন্ন্যাসীর গিরিগুহা ও মন্দিরের দ্বার যেমন ঈশ্বরসাক্ষাৎকারের প্রকৃষ্ট স্থান তেমনি ক্ষেতখামার, কারখানা, শিক্ষাগৃহ, চিত্রশালাও সমভাবেই ঈশ্বরানুভূতির উপযোগী স্থান। কলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম এক কেন্দ্রগত সত্যকেই প্রকাশ করার বিভিন্ন পন্থামাত্র।

ধর্ম, যা ভারতের প্রাণশক্তি, তার সাহায্যেই জাতীয় জীবনের রূপান্তর ঘটবে

আধ্যাত্মিক ঐক্য, যা ভারতের বৈশিষ্ট্য ও প্রাণশক্তি, তাকে ভিত্তি করেই ভারত প্রত্যেক ক্ষেত্রে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবে। আধ্যাত্মিক ঐক্যের উপলব্ধি বিভেদবোধ ও বিশেষ সুবিধাভোগের সকল ভাবনাকে দূর করবে এবং সকল চিন্তা ভাবনা ও কর্মপ্রচেষ্টাকে ত্যাগ ও সেবার পথে পরিচালিত করবে। এই সচেতনতা ভারতের মানসিকতার সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটাবে এবং যে সকল ভাবাদর্শ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে প্রভাবিত করছে সেই সব সংকীর্ণ ভাবাদর্শের সীমিত নিগড় থেকে তাদের মুক্ত করবে। যে তামসিকতার উৎস হচ্ছে ভারতের অখণ্ড ঐতিহ্য ও অখণ্ড জীবন সম্বন্ধে অজ্ঞতা, সেই তামসিকতা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র এই আধ্যাত্মিক ঐক্যের উপলব্ধি। এই অনুভূতি ভারতের মানুষকে এক অখণ্ড নাগরিকত্ববোধের দিকে ও এক অখণ্ড সর্বজনীন লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাবে; তাছাড়া এই বোধ সকল মানুষকে যৌথ দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা ও স্বীকৃতির দিকে উন্নীত করবে। এই চেতনা তাদের মনে সম্মিলিত উদ্দেশ্য-বোধক মিলনের সূত্র সৃষ্টি করবে এবং একসূত্রে গাঁথা কর্মজীবনের মেলবন্ধ রচনা করবে। এর ফলে তারা পাবে এক অনন্তপ্রসারী দৃষ্টি এবং সেই দৃষ্টি নিয়ে অনন্তের অভিমুখে নিরন্তর এগিয়ে যাবে। তাদের জীবনে ও কর্মে এই চেতনা অফুরন্ত শক্তি, দুর্বার আস্পৃহা ও অদম্য বিশ্বাস এনে দেবে যার ফলে এমন এক পরিবেশ আবার রচিত হবে যা সম্মিলিত অগ্রগতি ও সর্বোদয়ের সহায়ক। এই বোধ মানুষে মানুষে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, এক মতের সঙ্গে অন্য মতের, এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের ঐক্য, সংহতি ও সমন্বয় সাধন করবে। আধ্যাত্মিক ঐক্যের উপলব্ধির ফলেই উদ্ভব হবে এমন এক দৃঢ় ভিত্তিভূমির, যা দেশের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সত্যিকারের সহমর্মিতা ও সমন্বয় সৃষ্টি করতে পারে এবং তাদের সকলকে

এক অখণ্ড ভারতীয় জাতিরূপে শান্তিতে একসঙ্গে বাস করতে শেখাতে পারে।

ধর্মীয় স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার বিশ্বশান্তি ও বিশ্ব-উন্নয়নের ভিত্তি-স্বরূপ আধ্যাত্মিক ঐক্য ও সর্বধর্ম-সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ

ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষিত ধর্মাচরণের স্বাধীনতা হল ভারতবাসীর অন্যতম মৌলিক অধিকার, যেখানে বলা হয়েছে, 'প্রত্যেক নাগরিক স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ও বিবেকের দ্বারা চালিত হয়ে নিজ নিজ প্রকৃতিগত ধর্ম গ্রহণ, আচরণ ও প্রচার করতে পারবে।' এই মৌলিক অধিকার বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক ঐক্য ও সর্বধর্মসমন্বয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ। একথা আগেই বলা হয়েছে যে, ধর্ম একটিমাত্র, কেবল মত ও প্রকাশ-পদ্ধতির দিক থেকেই তার বিভিন্নতা। তাই জনগণও সেই একই পারমার্থিক লক্ষ্যপূর্তির উদ্দেশ্যে আপন আপন প্রকৃতি ও রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন মত পথ ও প্রকাশ-পদ্ধতির অনুবর্তী হয়ে থাকে। এই শাশ্বত সত্য যুগ যুগ ধরে ভারত ঘোষণা করে এসেছে। আর্নল্ড্ টয়েনবি তাই লিখেছেন, 'নিখিল মানবজাতিকে একটি বৃহৎ পরিবারে পরিণত করার মনোভাব ও চেতনা এই ভাবাদর্শেই আমরা দেখতে পাই।' ধর্মাচরণের স্বাধীনতার যে মৌলিক অধিকার প্রতিটি নাগরিকের জন্য স্বীকৃত, তার দ্বারা প্রতিটি নাগরিক চিন্তার সেই স্বাধীনতা ভোগ করে যার সাহায্যে সে আপন সুনির্দিষ্ট প্রকৃতি ও রুচি অনুযায়ী ঈশ্বরানুভূতির অনুকূল আপন সুনির্দিষ্ট ধর্মপন্থাটি বেছে নিতে পারে। মানুষের প্রকৃত দিব্য আত্মস্বরূপের বিকাশ সকল ধর্মের সচেতন বা অচেতন ভিত্তি এবং কী ভৌতিক, কী বৌদ্ধিক, কী আধ্যাত্মিক, সব ক্ষেত্রে তাই হল মানবজাতির সমগ্র ইতিহাসের একমাত্র ব্যাখ্যা; কারণ এই সর্বজনীন চৈতন্যই মানবজীবনের বিভিন্ন স্তরে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। সকল ধর্মের এই বিশ্বজনীন ভিত্তি হচ্ছে ধর্মীয় স্বাধীনতার মৌল অধিকারের হেতুভূত মূলসূত্র; কাজে কাজেই এর পূর্বশর্ত এবং এটাই ধর্মীয় স্বাধীনতাকে একটা বিশেষ চরিত্র ও অনন্যতা এনে দিয়েছে। ধর্মীয় স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার এইভাবেই বিশ্ব-জনীন তাৎপর্য লাভ করে সর্বমানব-স্বীকৃতির অধিকার পেয়েছে। এই ধর্মীয় স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার ধর্মসমন্বয় ও আধ্যাত্মিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করছে, যা সর্বজনীন সৌভ্রাত্র এবং বিশ্ব-শান্তি ও বিশ্বপ্রগতির প্রকৃত ভিত্তিভূমি।

ধর্মশিক্ষার উপর সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা স্ববিরোধী

ধর্মীয় স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত বলে ধর্ম সমন্বয় স্থাপনের জন্য এই সাংবিধানিক ধর্মসমন্বয়ের জাতীয় আদর্শ সার্থক করার সহায়ক বা অনুকূল শিক্ষা প্রদানের দায়িত্বও অনিবার্যভাবে ভারতের উপর এসে পড়েছে। অথচ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষার উপর সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা থাকায় ভারতের বিশিষ্ট প্রাণশক্তি যে তার আধ্যাত্মিক ঐক্য, সে বিষয়ে চেতনা জাগানোর গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়েছে। এই সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা সর্বধর্মের সর্ববাদিসম্মত বিশ্বজনীন ভিত্তির বিরোধী। এই নিষেধ বস্তুত ধর্মের যথার্থ স্বরূপের উদ্দেশে প্রযুক্ত হতে পারে না। এর প্রয়োগ কেবল ধর্মের খোসা বা বাইরের আবরণের প্রতি প্রযোজ্য; তার শাঁস বা অন্তঃসম্পদের প্রতি নয়। এ শুধু বাইরের রূপ সম্পর্কেই প্রযোজ্য, আত্মস্বরূপ সম্পর্কে নয়। আধ্যাত্মিক ঐক্যই প্রকৃত ধর্ম। যথার্থ ধর্ম আসলে আধ্যাত্মিক ঐক্য। এই ঐক্য জাতীয় আধ্যাত্মিক ঐক্য ও সংহতির অভিমুখে নিয়ে যায়। ধর্মশিক্ষার উপর নিষেধাজ্ঞা কেবল ধর্মের গৌণ বাহ্যিক

প্রকৃতি সম্পর্কে প্রযোজ্য, যার মুখোশটাকেই প্রকৃত ধর্মের মুখশ্রী বলে ভুল করা হয়। তারই ফলে সমাজে বহু সংঘাত ও সংকটের সৃষ্টি হয়, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিপন্ন হয়। ধর্মসংহতি ও ধর্মসমন্বয়ের সার্বভৌম সত্যকে কখনই শিক্ষা-নিরপেক্ষ করা যায় না, বরং সেটা করলেই জাতীয় জীবনে দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে ; ভারতের ইতিহাসে বার বারই তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে এবং এখনও পাওয়া যাচ্ছে।

সমগ্র মানবজাতিকে অধ্যাত্মনিষ্ঠ করাই ভারতের চিরন্তন ব্রত

একথা এখন সুস্পষ্ট এবং অবশ্যগ্রাহ্য স্বীকার্য যে, যদি ভারত স্বকীয় অস্তিত্ব রক্ষা করতে চায় এবং প্রকৃত অগ্রগতির দিকে অগ্রসর হতে চায় তবে শিক্ষা, যা প্রকৃত উন্নতির পূর্বশর্ত, তাকে সর্বস্তরে ভারতীয় আধ্যাত্মিক আদর্শের উপর স্থাপন করতে হবে। এর ফলেই ভারত স্বদেশে সর্বস্তরে ঐক্য, সমতা ও সংগতি রক্ষা করতে ও উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করতে সক্ষম হবে। মাত্র তখনই বিশ্বের উন্নয়ন ও সভ্যতাকে ভারত তার স্বকীয় আধ্যাত্মিক অবদানে সমৃদ্ধ করতে পারবে, যে অবদান সে যুগ যুগ ধরে করে এসেছে। এই অবদানকেই আর্নল্ড্ টয়েনবি 'মানব-মুক্তির একমাত্র পথ' বলেছেন। এই হল ভারতের চিরন্তন ব্রত। স্বদেশে এই আদর্শের রূপায়ণ এবং বিশ্বকে তা দানই ভারতের আবহমান অস্তিত্বের হেতুভূত প্রমাণ। তাই স্বামীজী উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন : 'সমগ্র মানবজাতিকে অধ্যাত্মনিষ্ঠ করাই হল ভারতের জীবন-ব্রত, তার চিরন্তন জীবনসংগীতের মূল স্বর, তার অস্তিত্বের মেরুদণ্ড, তার সত্তার একমাত্র ভিত্তি, তার অস্তিত্বের একমাত্র তাৎপর্য। তার জীবনধারা কখনও এর থেকে বিচ্যুত হয়নি—তা তাতারই শাসন করুক বা তুর্কীই শাসন করুক, মোগলই শাসন করুক বা ইংরেজই শাসন করুক।'

ভারতের বর্তমান দায়িত্ব 'বিশ্বসভ্যতা-কেন্দ্র' স্থাপন এবং এটাই তার জীবনোদ্দেশ্য সফল করতে অনুকূল্য করবে

বিশ্বসভ্যতা-কেন্দ্র স্থাপনে এখন ভারতের অগ্রণী হওয়া উচিত। এই কেন্দ্র বিষয়ে ইংরেজীতে লেখা 'মানব ঐক্য ও বিশ্বসভ্যতার জন্য শিক্ষা' [**Human unity and education for world civilization** (1978)] এবং 'বিশ্ব-সভ্যতা কেন্দ্র' [**The world civilization centre** (1983)] এই দুটি প্রকাশনে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

বিশ্বসভ্যতা কেন্দ্রের ভারতীয় বিভাগের ভূমিকা হবে মুখ্যত দ্বিবিধ—আন্তর্জাতিক ও স্বদেশীয়। আন্তর্জাতিক ভূমিকা হবে কেন্দ্রের সংহত আন্তর্জাতিক, শিক্ষামূলক কার্যপদ্ধতি। স্বদেশীয় ভূমিকা হবে তদতিরিক্ত ব্যাপক, অখণ্ড ভারতীয় শিক্ষামূলক কার্যপদ্ধতি। এই ভূমিকা ভারতের স্বকীয় বিশিষ্ট জাতীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংস্কৃতি, সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের বিকাশসাধনে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত হবে।

ভারতের মাটিতে বিশ্বসভ্যতা-কেন্দ্র স্থাপন ভারতেরই জাতীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব। ভারত এর জন্য নিজের কাছে ও সারা বিশ্বের কাছে দায়বদ্ধ। বিশ্বের কাছে ভারতের নিজস্ব বিশিষ্ট সম্পদ প্রদানের এটি একটি অনন্য সুযোগ এনে দেবে এবং এই অবদানের মাধ্যমে ভারত আপন জীবনোদ্দেশ্য চরিতার্থ করবে।' এইভাবে অন্যান্য দেশও ভারতের অবদানের মুখ্য তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন হবে। এই সচেতনতা থেকে ভারত ও অন্যান্য দেশের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বোধ জন্মাবে, পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতামূলক আত্মীয়তার ভারসাম্য গড়ে উঠবে এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও আদান-প্রদানের মাধ্যমে সমৃদ্ধি, শান্তি ও প্রগতির ভিত্তি রচিত হবে সারা জগতে।

শিবমহিম্নঃ

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য

সুপণ্ডিত লেখক।

মহিম্নঃস্তোত্রের উৎপত্তি: জনৈক গন্ধর্বরাজ কোন নৃপতির প্রমোদকেলিবনস্থিত সুগন্ধি পুষ্পনিচয় শিবপূজনের নিমিত্ত হরণ করিতেন। ইহা জানিয়া সেই নৃপতি শিবনির্মাল্য লঙ্ঘন করিলে পুষ্পাপহরণকারীর পলায়ন করিবার শক্তি লোপ পাইবে এই মনে করিয়া তাঁহার আগমনপথে শিবনির্মাল্য ছড়াইয়া রাখিলেন। ইহাতে গন্ধর্বরাজের পলায়নক্ষমতা বিলুপ্ত হইল। শিবনির্মাল্য লঙ্ঘনে তাঁহার ঐরূপ অচলাবস্থা হইয়াছে জানিয়া গন্ধর্বরাজ পরম কারুণিক সর্বকামদ শ্রীবিশ্বনাথের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তশক্তিবিশিষ্ট বিশ্বপতির গুণানুধ্যান করা সাধারণ মানবের পক্ষে অসম্ভব; তাই হাস্যাস্পদ হইবার ভয়ে সবিনয়ে এই স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। স্তবে সন্তুষ্ট সদাশিব হইতে বর লাভ করিয়া গন্ধর্বরাজ ৺কাশীধামে, পুষ্পদন্তেশ্বর নামক শিব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শিবের নিকট হইতে বর লাভ করিয়াছিলেন,—এই পুষ্পদন্তেশ্বরের পূজা করিলে শিবনির্মাল্যলঙ্ঘন-জনিত অপরাধ-স্খালন হইবে।

মহিম্নঃস্তবের মধ্যে গন্ধর্বরাজ পুষ্পদন্ত সগর্বে বলিয়াছেন,—অসুর, সুরসমূহ ও শ্রেষ্ঠ মুনিগণদ্বারা অর্চিত শশাংকশেখর গুণাতীত মহাশিবের গুণ-বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া গুণিগণশ্রেষ্ঠ পুষ্পদন্ত নামক এক ভক্ত, গুরুগম্ভীর ছন্দাবলম্বনে এই সুন্দর স্তোত্ররচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

বৈশিষ্ট্য: মহিম্নঃস্তবের বৈশিষ্ট্য কোথায়?

এই স্তবের মধ্যে গন্ধর্বরাজ পুষ্পদন্তের বৈষ্ণব-সুলভ বিনয় ও স্বীয় শক্তির উপর অচল ও অটল বিশ্বাসের পরিচয় পরিস্ফুট। ব্রহ্মাদি দেবগণ শিবের স্তব করিতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার অসীম-ভাব প্রকাশনে অসমর্থ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। কিন্তু পুষ্পদন্তের এই স্তবকরণ আরম্ভমাত্র। সুতরাং পূর্ব হইতেই সমালোচনা করা বা দোষযুক্ত মনে করা সমীচীন হইবে না। অবাঙ্‌মনসগোচর শিবের অসীম ও অনন্ত মহিমার সম্যগ্‌রূপে অনুধ্যান করা তাঁহার ন্যায় পরম মূর্খের আকাশকুসুম কল্পনার ন্যায় হইলেও শিব-নাম স্মরণে ও শিবগুণকথা কথনে তাঁহার পুণ্যার্জন করা হইবে এইজন্যই তাঁহার এই প্রচেষ্টা। স্তবের প্রারম্ভেই তাঁহার বৈষ্ণবোচিত বিনয় ও আত্মশক্তির উপর দৃঢ় আস্থা দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত না হইয়া পারি না।

মহিম্নঃস্তবের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য স্তবকারের বৌদ্ধমতের তীব্রভাবে সমালোচনান্তে বুদ্ধির সাহায্যে বৌদ্ধমতবাদ খণ্ডনের মধ্যে। শৈবগণের দৃঢ় বিশ্বাস, শিবের ঐশী শক্তি দ্বারাই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় কার্য সংঘটিত হয়। বেদ উপনিষদ্‌ প্রভৃতি শাস্ত্র সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণ-ত্রয়ের মাধ্যমে শিবমহিমা বর্ণনে সর্বদাই সচেষ্ট। তথাপি অশ্রদ্ধেয় নাস্তিকগণের (বৌদ্ধগণের) মধ্যে দুর্বুদ্ধিপরায়ণ কোন কোন ব্যক্তি শিবের নয়নাভিরাম সৌন্দর্যকে অস্বীকার করিয়া অতীব কুৎসিত ও কদর্যভাবে তাঁহার তীব্র সমালোচনা করিতে কার্পণ্য করে নাই।

নাস্তিকগণ পরিহাসচ্ছলে বলেন,—জগৎস্রষ্টা শিবের দেহগঠন ও প্রচেষ্টাদি কিরূপ? তিনি কী উপায়ে এই ত্রিভুবন সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তাহার উপাদান কী ছিল? ইহার প্রত্যুত্তর

গন্ধর্বরাজ পুষ্পদন্ত শিবসমীপে প্রার্থনা করিয়া যেভাবে দিয়াছেন তাহা তর্কশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী অলঙ্ঘনীয়। তিনি নাস্তিকগণকে বলিতে চাহিতেছেন যে, এই সুন্দর জগতের সর্বত্রই মঙ্গলময়ের বিবিধ ঐশ্বর্য তর্কাতীতভাবে দেদীপ্যমান। তথাপি দুষ্টপ্রকৃতিসম্পন্ন দুর্বুদ্ধিপরায়ণ বৌদ্ধগণ তাহাদের নাস্তিক্যবুদ্ধিরূপ কুতর্কদ্বারা বাচালের ন্যায় মোহগ্রস্ত হইয়া জগতের মধ্যে নাস্তিকভাব প্রচারে কিভাবে সোচ্চার হইয়া থাকে তাহা ভাবিলে বিরক্তির ভাব মনে আসে ও তাহাদিগকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়।

এই সব নাস্তিকগণ অবয়বযুক্ত। তাহাদিগকে বলিতে হইবে কি তাহারা জন্মগ্রহণ করে নাই? জগৎস্রষ্টাকে অস্বীকার করিয়া কি জগৎ চলিতেছে? জগদীশ্বর ব্যতীত এই সুন্দর জগৎ-সৃজনে কে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন অর্থাৎ প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন? মন্দবুদ্ধিযুক্ত, নাস্তিকবুদ্ধিসম্পন্ন মানবগণ জগৎস্রষ্টাকেই অস্বীকার করিয়া তাহাদের মতবাদ প্রচারে সমুদ্যত হইয়া শিবের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিগ্ধচিত্ত!

মহিম্নঃস্তবের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বিরাজিত স্তবকারের উদার ও দার্শনিকতায় পরিপূর্ণ, যুক্তিপূর্ণ বিচারের মধ্যে। বেদ, সাংখ্যদর্শন, যোগদর্শন (পতঞ্জলি), আগমশাস্ত্র অর্থাৎ তন্ত্র, বৈষ্ণবদর্শনসমূহ বিভিন্ন মতের আশ্রয়ে কেহ বলিয়াছেন, --"এই মতই ঠিক অথবা ঐ মতই যথার্থ মঙ্গলদায়ক।" বিভিন্ন মতের বিভিন্ন সাধকগণ কেহ সরল পথে সাধনার পথ বাছিয়া লইয়াছেন, কেহ বা কুটিলপথে সাধনায় অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু বিভিন্ন নদীর গতিপথ যেমন সমুদ্রগমনাভিলাষী, সেইরূপ সমস্ত সাধকের মতবাদ ও চিন্তাধারা—হে শিব! তোমাতেই পর্যবসিত হইয়া সমস্ত ধর্মীয় বিবাদ, মতভেদ ও বিরোধের অবসান সূচনা করিয়াছে। কি উদার দৃষ্টিভঙ্গী! এইরূপ উদারভাব ও সমালোচনা যদি সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আশ্রয় হইত তাহা হইলে বহু অনর্থের আক্রমণ হইতে আমরা নিষ্কৃতি লাভ করিতে সক্ষম হইতাম।

স্তবকার সৎ চিৎ ও আনন্দ বিগ্রহধারী মহাশিবের বিশাল, বিরাট ও সর্বব্যাপকাবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রাণ খুলিয়া ভোলানাথের উদার গুণমহিমা কীর্তন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে,—হে জগন্ময় প্রভো! তুমিই সূর্য, তুমিই চন্দ্র, তুমিই অগ্নি, তুমিই পবন, তুমিই জল, তুমিই আকাশ, তুমিই পৃথিবী এবং তুমিই পরমাত্মাস্বরূপ। সাধকের অসীম ধারণাসমূহ সসীমে পরিমিত হইয়া তোমাতেই নির্ণীত। পুষ্পদন্ত এমন কোন তত্ত্বের বা তথ্যের বিষয় অবগত নহে যাহার মধ্যে তুমি নাই। এই উদার ভাবের জন্যই "শিবমহিম্নঃস্তোত্র" সর্বদেশের, সর্বকালের ও সর্বভাবের সাধকগণের হৃদয়াসনে শাশ্বতভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া তাঁহাদের অন্তঃকরণে চিরশান্তিদানে সক্ষম হইয়াছে ও হইবে।

ত্রিগুণাতীত বিষয়তৃষ্ণারহিত পরম শিবের বিষয়তৃষ্ণারহিতাবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে "মহিম্নঃস্তবের" চতুর্থ বৈশিষ্ট্য প্রকটিত হইয়াছে। মহিম্নঃস্তব রচয়িতা অতুলনীয় ভাষায় অভূতপূর্বভাবে শিবভক্তগণকে বুঝাইতে সচেষ্ট হইয়াছেন যে,—খণ্ড, ত্রিশূল, কুঠার, মৃগচর্ম, শ্মশানভস্ম, সর্প, নরকপাল এই সাতটি বস্তু দ্বারা শিবের সংসার রচিত, কিন্তু আত্মভোলা ভোলানাথের ভ্রূক্ষেপণে ইন্দ্র বরুণ, কুবের প্রভৃতি দেবতাগণ অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়া ধন্য হইলেও বিষয়মৃগতৃষ্ণা তাঁহার বিভ্রম জন্মাইতে সক্ষম হয় নাই। দেব, দানব, গন্ধর্ব, কিন্নর ও মানবগণ সকলেই শিবের বিভূতি সঞ্জাত শক্তিলাভে অলোকসামান্য সম্পদে সম্পদবান হইয়া কতই না ঐশ্বর্যের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু দিগম্বর, শ্মশানবাসী অহিভূষণ জগৎস্রষ্টার চিত্ত

ধ্যানে সতত নিমগ্ন, তাই বিষয় তাঁহার ত্রিসীমার মধ্যেও প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইয়াছে। তিনি শিব, তিনি মঙ্গলময়। অশিব ও অমঙ্গলভাব তাঁহার সমীপে অবস্থান করিবে কি করিয়া? তাঁহার সবই আছে, কিন্তু তিনি অকিঞ্চন। তিনি মদনভস্মকারী, তিনি শ্মশানচারী, পিশাচ সকল তাঁহার সহচর, চিতাভস্ম তাঁহার বিভূতির প্রলেপ, তাঁহার গলদেশ শোভিত নরমুণ্ডমালায়। ভাবিলে মনে হয়, তিনি এই সব কুৎসিত বস্তুধারণকারী—তাঁহার চারিদিকেই অমঙ্গলভাব পরিপূর্ণ। কিন্তু হায়! শিবনাম স্মরণ করিলেই শিবভক্তের সমস্ত অমঙ্গল কোথায় যেন পলায়ন করে অর্থাৎ দূরীভূত হইয়া থাকে—ইহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়! হে শিব! প্রকৃত ভক্ত ভাল করিয়াই বুঝিতে পারে যে, তুমি শিবময় ও মঙ্গলদায়ক।

চন্দ্রচূড় শশিশেখরের প্রলয়কালীন নৃত্যের বর্ণনা মাধ্যমে মহিম্নঃস্তবকার তাঁহার স্তোত্রের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুটিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা আজ প্রলয়নৃত্যে মগ্ন। তাঁহার প্রলয়নৃত্যের প্রতি পদক্ষেপে পৃথিবী ধ্বংসোন্মুখ হইয়া সংশয়াপন্ন। আকাশে ভ্রমণশীল গ্রহনক্ষত্র-সমূহ, লৌহ-মুদ্গর সদৃশ মহাকালের বাহুদ্বয়ের আঘাতে হীনবল হইয়া পুনঃ পুনঃ জটার তাড়নে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। জগদ্বিনাশের আশঙ্কায় তাহারা মুমূর্ষু। কিন্তু জগৎরক্ষার নিমিত্ত তাঁহার ধ্বংসশীল নৃত্য ত্রিভুবনবাসিগণের মঙ্গলের জন্যই সাধিত হইয়াছে। এইখানেই কালজয়ী মহাকালের অসাধারণ প্রভুত্ব। হে চন্দ্রনাথ! প্রলয়কালীন নৃত্যের সময় তোমার মস্তকস্থিত জটার মধ্যে বিশাল জলপ্রবাহ জলবিন্দুবৎ দৃষ্ট হইতেছিল এবং নক্ষত্রগণ ঊর্মিমালার ন্যায় শোভাবর্ধন করিয়া বিরাজ করিতেছিল। সেই সামান্য জলকণাই দ্বীপাকার জলধিরূপে বেষ্টন করায় তোমার বিশাল ও অসীম বপু সুন্দর মহিমায় মহিমান্বিত হইয়াছিল। ইহাদ্বারা মহেশ্বরের বিরাট দেহের মহত্ত্ব ও বিশালত্ব সহজেই শিবভক্তগণের নিকট অনুমিত ও প্রতিভাত হয়। পরম শৈব পুষ্পদন্ত তাঁহার অলোকসামান্য সাধনা ও প্রতিভাবলে সসীম জগতের মধ্যে বাস করিয়াও অসীম জগদীশ্বরের এই বিশাল বিরাট রূপের কল্পনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—হে জগৎপ্রভো! তুমি "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।" মহিম্নঃ-স্তবের রচয়িতা গন্ধর্বরাজ পুষ্পদন্ত ও উপনিষদের অনুসরণে উদাত্তকণ্ঠে ভক্তের আন্তরিক আকৃতি দর্শাইয়া তাঁহার স্তবের ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে শিবানুধ্যানে বলিতে চাহিতেছেন,—হে শিব! হে প্রিয় দেব তুমি ভক্তসমীপে সাধনার স্তরভেদে অতীব দূরে উভয় অবস্থাতেই বিদ্যমান।

তুমি অতীব ক্ষুদ্র, আবার বিশাল হইতেও বিশালতম। তুমি চিরবৃদ্ধ অর্থাৎ প্রাচীনতম। আবার তুমি চিরনবীন, চিরযুবা। তুমি সর্বরূপে সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে বিদ্যমান। সকলের অতীত স্বরূপ তুমি। তুমি সর্বাতীত সাক্ষী।

তুমি রজোগুণে বিশ্বের উৎপত্তি বিধানে রত থাক, তমোরূপ ধারণ করিয়া তোমার সৃষ্ট বিশ্বকে তুমি সংহার কর, আবার সত্ত্বগুণাশ্রিত হইয়া তুমিই বিশ্বের প্রাণিনিচয়কে সুখসাগরে নিমগ্ন কর। গুণযুক্ত তুমি গুণাতীত হইয়া সর্বাবস্থায় বিরাজ কর। হে বিশ্বনাথ! সর্বজনপূজিত তোমার চরণে আভূমি প্রণতি জানাই। হে বিশ্বেশ্বর! বিশ্বময় তুমি, তোমার স্তব আমার ন্যায় ক্ষুদ্র এক গন্ধর্ব কি করিয়া করিবে?

"মহাসমুদ্রের জল যদি মসী অর্থাৎ কৃষ্ণপর্বত প্রমাণ কজ্জল হয়, যদি সমুদ্ররূপ পাত্রে গুলিয়া কালী প্রস্তুত করা হয়, কল্পবৃক্ষের শাখা লেখনী হয়, পৃথিবী যদি পত্র অর্থাৎ কাগজ হয়, সারদা অর্থাৎ সরস্বতী যদি সুযোগ্যা লেখিকা হইয়া

অনন্তকাল লিখিতে থাকেন তাহা হইলেও হে শিব! তিনি তোমার মহিমাকীর্তনে সক্ষম হইবেন না।"

এত উদার মতাবলম্বনে বিশ্বেশ্বরের বিশালতম স্তব করিতে যাইয়া পুষ্পদন্তের হয়তো জগদীশ্বরের জগদ্ব্যাপকতার কথাই মনের মণিকোঠায় উঁকি মারিতেছিল, তাই তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীশম্ভুর শিবময়ত্ব ও সর্বব্যাপকত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্বীয় মানসে আপ্রাণ ত্রিভুবনপতির স্তবমাধ্যমে আরাধনা করিয়া নিজে ধন্য হইয়া জগৎকে ধন্য করিয়াছিলেন।

আত্মসচেতন না হইলে ঐহিক অভ্যুদয় অসম্ভব। পরন্তু নিজ সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চধারণা থাকিলে অহংভাব আসিয়া অভ্যুদয়ের পথে অন্তরায় হইয়া ওঠে। ইহাও খুবই সত্যকথা। মহিম্নঃস্তবকার ছিলেন পরম বিনয়ী।" সেজন্য বৈষ্ণবসুলভ বিনয় স্তবমধ্যে বহুস্থানে বিদ্যমান থাকিলেও স্বীয় শক্তি প্রকাশের নিমিত্ত তিনি জগৎস্রষ্টার শ্রীচরণে শক্তি ভিক্ষা করিয়া অনন্ত-শক্তিসম্পন্ন তুরীয়াবস্থা যাহাতে তাঁহার করতলগত হয়, সেজন্য তিনি শ্রীভগবান বিশ্বেশ্বরের নিকট কতই না আকূতি করিয়া তাঁহার অসীম ও অনন্ত শক্তিলাভে সচেষ্ট হইয়াছেন।

কিঞ্চিৎ ক্লেশের কারণ উপস্থিত হইলেই আমাদের অন্তঃকরণ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর ভাব অবলম্বন করে। সুতরাং সেই ক্ষীণাবয়ব ও ক্ষীণান্তঃকরণবিশিষ্ট আমাদের পার্থিব দেহ ও চিত্ত কোথায়, আর সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়ের গুণাতীতাবস্থায় অবস্থিত হে শিব! তোমার শাশ্বতকালীন ঐশ্বর্যই বা কোথায়? তাই মন্দ-বুদ্ধিবিশিষ্ট বিস্মিত আমাকে উন্নীত করিয়া তোমার প্রতি ভক্তিই আমাকে তোমার চরণ-কমলে বাক্য পুষ্পোপহার সমর্পণে আগ্রহান্বিত করিল।

ভক্তি না থাকিলে জ্ঞানলাভ অসম্ভব ব্যাপার। ভক্তিদ্বারা শিবজ্ঞানে যদি সদাশিবকে আত্মস্থ করা যায় তবেই তাঁহার স্তব করা সার্থক হয় এবং বাক্য পুষ্পোপহার জগৎপতির শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া সাধক কৃতার্থ হন।

সমদরশন মহাশিবের শ্রীচরণে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়া স্তব-রচয়িতা গন্ধর্বরাজ পুষ্পদন্ত স্তবপাঠের ফলশ্রুতি বর্ণনাপ্রসঙ্গে স্বীয় মনোভিলাষ প্রকাশ করিয়া আত্মসমাহিত সদাশিবকে স্মরণান্তর তাঁহার অনুধ্যানে মগ্নাবস্থায় জগতের মঙ্গলের জন্য জগদ্বাসিগণের সর্ববিধ কল্যাণ কামনায় প্রার্থনা করিতেছেন,—"হে বিশ্ববাসি-গণ! সর্বদেশের সর্বকালের জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকলকে উদ্দেশ করিয়া আমি উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি—'মহেশ্বর হইতে পূজ্যতর আর কোন দেবতা নাই'।"

[ক্রমশঃ]

ভারতের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ও দায়িত্ব

স্বামী ভূতেশানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ। বর্তমান নিবন্ধটি ২৮ জানুআরি ১৯৭৯, বাঁকুড়া রামকৃষ্ণ মঠে প্রদত্ত ভাষণের টেপ রেকর্ড থেকে গৃহীত।

ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ বলেই পরিচিত। ভারতের লোক ধর্মপ্রাণ। যুগ যুগ ধরে তারা ধর্মকে আঁকড়ে রয়েছে। প্রকৃতির নানা বিপর্যয়ে, মানুষের এবং প্রকৃতির উভয় দিক দিয়ে, ভারতবর্ষ বহু বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু সমস্ত বিপদের ভিতর দিয়েও সে নিজের অস্তিত্বকে বজায় রেখেছে। চিন্তাশীল মানুষেরা—এর কারণ বলেন যে, ভারত ধর্মকে ধরে রয়েছে। ধর্ম শব্দের অর্থ হল এই—যা আমাদের ধরে রাখে—ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করে বলেছেন যে, বড় বড় সভ্যতা জগতে বিভিন্ন জায়গায় উঠেছে, গেছে। মহাশক্তিশালী সম্রাটেরা পৃথিবীর বহু জায়গায় একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। মহাশক্তিশালী দেশ গড়ে উঠেছে, কিন্তু কাল-প্রভাবে তা আবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সে জায়গায় ভারত হাজার হাজার বছর ধরে এখনও তার অস্তিত্বকে বজায় রেখেছে। ঐতিহাসিকরা বলেন, এটি পৃথিবীর একটি অতি আশ্চর্য ঘটনা। এমনভাবে একটি জাতি, যার অস্তিত্বকে এতদিন ধরে বজায় রেখেছে, সমস্ত বিশ্বে এর আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নেই। ভারতের সমসাময়িক যে-সব সভ্যতা তা বহুদিন আগে পৃথিবী থেকে নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়েছে, কিন্তু ভারত এখনও তার অস্তিত্বকে বজায় রেখেছে।

জওহরলাল নেহরু একবার বলেছিলেন,—ভারতের উপরে এক এক সময়ে এমন সব দুর্দৈব এসেছে যে, মনে হয়েছে বুঝি জাতি এইবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কিন্তু কোন না কোন অচিন্ত্য প্রভাবেতে, অভাবনীয় ঘটনায় ভারতের শক্তি আবার জেগে উঠেছে এবং জাতিকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে। শুধু তাই নয়, যেন প্রগাঢ় আকারে তার সেই ঐতিহ্যকে, সেই কৃষ্টিকে সে অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে আজও পর্যন্ত। এটি জগতের একটি অনন্যসাধারণ ঘটনা। এর সঙ্গে অন্য কোন জাতির এ বিষয়ে তুলনা হয় না। এর কারণ অন্বেষণ করতে গিয়ে স্বামীজী তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়ে বলেছেন যে, এই ভারতের ধর্মই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমাদের রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ কোন কোন সময়ে সে-কথা হয়তো বুঝতে পারেননি। তাঁরা কেউ কেউ তখন মনে করেছেন পাশ্চাত্য জগতের দৃষ্টিতে দেখে,—তাদেরই সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলেছেন, ভারতের আধ্যাত্মিকতা তাকে অন্যান্য জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পশ্চাৎপদ করে রেখেছে। এঁদের ধারণায়—পিছিয়ে রয়েছে ভারত। পাশ্চাত্য জগৎ বলে—ভারত অত্যন্ত other-worldly অর্থাৎ পরকাল সম্বন্ধে তারা বড় ব্যাকুল, চিন্তাশীল। বর্তমান জগতের সঙ্গে ভারতের খাপখাওয়ানোর যোগ্যতা যেন নেই। কথাটা আপাতদৃষ্টিতে মনোজ্ঞ মনে হয় এইজন্য যে, পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে ঐহিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরা পিছিয়ে রয়েছি বলে। পাশ্চাত্যজাতি তাদের সভ্যতাকে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে নতুন নতুন শক্তি অর্জন করেছে। সে-জায়গায় ভারত এখনও পর্যন্ত সত্যিই অনেক পিছিয়ে। স্বামীজী কিন্তু ভারতের ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, আধ্যাত্মিকতাই এই

পিছিয়ে পড়ার কারণ নয়। ভারত পিছিয়ে পড়েছে এইজন্য যে, ধর্মকে জীবনের যে-কেন্দ্র-বিন্দুতে রাখা ছিল এতকাল, সেখান থেকে সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। ধর্মহীনতাই তার বর্তমান অবনতির কারণ, ধর্ম অবনতির কারণ নয়। কথাটি আপাতদৃষ্টিতে স্ব-বিরোধী মনে হতে পারে। একদিক দিয়ে ভারতকে ধর্মপ্রাণ বলা হয়, আর একদিক দিয়ে বলা হচ্ছে, ধর্মহীন হওয়াতেই তার এই অধোগতি। দুটি আপাত-বিরোধী কথা এবং স্বামীজীর ভাষণের ভিতরে আমরা যেন এই দুটি কথাই পাশাপাশি পাই। আবার স্বামীজীর বর্ণনার তথ্য দিয়ে এর সমাধানও পাই আমরা।

ভারতের ভিতরে যে আধ্যাত্মিক সম্পদ ঋষিদের সাধনার ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে, সেইটি হল ভারতের সর্বাধিক মূল্যবান সম্পত্তি। সেই সম্পত্তিকে ভারত এখনও আগলে রয়েছে, তাকে হারায়নি। কিন্তু তার দোষ হচ্ছে এই যে, সেই সম্পত্তিকে সে তার দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগায়নি। কৃপণ যেমন তার ধনকে আগলে রাখে, কিন্তু তার নিজের ভোগে সে-ধন লাগে না। সেইরকম ভারতের ধর্মকে সে আগলে রয়েছে বটে, কিন্তু তার দৈনন্দিন জীবনে তা কাজে লাগছে না। ভুলে গেছে কাজে লাগাতে, তার প্রয়োগ এখানে নেই। জগতে এরকম অপূর্ব আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আবিষ্কার আর কোথাও হয়নি যা ভারতে হয়েছে। ভারতের যে-আত্ম-বিজ্ঞান—ভারতীয় ঋষিদের যে-উপলব্ধি, জগৎ-সংসার ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত—এরকম আর অন্য কোথাও কেউ করতে পারেনি। অন্য সব জায়গাতে সাধনার ক্ষেত্র হল ভোগ অর্জন, সাধনার লক্ষ্য হল ভোগ সঞ্চয় করা এবং কৃষ্টি সভ্যতা এগুলি সব এই ভোগকে কি করে সাধারণ মানুষ আরও বেশি করে সংগ্রহ করতে পারে তার চেষ্টা, এতেই পরিসমাপ্ত হয়েছে। ভারত সেদিকে হয়তো অনেকটা উদাসীন ছিল। কারণ তাদের ঋষিদের দৃষ্টি বাহ্য জগতের দিকে তত ছিল না,—তাঁদের দৃষ্টি ছিল অধ্যাত্মশাস্ত্রের দিকে,—অন্তর জগতের সন্ধানে তাঁরা বেশি ব্যাপৃত ছিলেন। তা বলে যে ভারতের বাহ্য উন্নতি কখনও হয়নি, এরকম ভাবা ঠিক হবে না। বরং ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, যখন যখনই ধর্ম প্রবল হয়েছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ঐহিক উন্নতিও প্রভূত হয়েছে—উভয় ভাবই তালে তালে চলেছে। সুতরাং ধর্ম ধর্ম করে সে ঐহিক দিকে পিছিয়ে পড়েছে,—আধুনিক জগতের সঙ্গে সংগ্রামে সে পশ্চাৎপদ হচ্ছে, তা মোটেই নয়। আসল কথা হচ্ছে, আগেও যেমন বলা হয়েছে,—ধর্মকে সে জীবনের সবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেনি বোধ হয়।

নানা কারণে এমনটা ঘটেছে। প্রধান কারণ হল, মানুষের মন কখন একটানা এক দিকে প্রবাহিত হয় না, তার উত্থান-পতন আছে। ভারতের সমষ্টি মনেরও সেইরকম বিভিন্ন দিক দিয়ে উত্থান-পতন হয়েছে। যখন যখন ধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়েছে, ধর্ম বেড়েছে। ধর্ম যখন প্রবল হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ঐহিক উন্নতিও খুব হয়েছে। এইটি ভারতের পক্ষে বিশেষভাবে সত্য। স্বামী বিবেকানন্দ এইজন্যই বলেছেন যে, ঐহিক উন্নতি করার জন্য যে ভারতকে ধর্ম পরিহার করে চলতে হবে, পাশ্চাত্যদেশের মতো ভোগসর্বস্ব হতে হবে, জড়বাদী হতে হবে, এমন কোন কথা নয়। তার ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে ঐহিক উন্নতিকে সে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং এইটিই হল ভারতের বৈশিষ্ট্য।

আমাদের দেশে জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা করে ঋষিরা এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, চারটি প্রয়োজন মানুষের থাকে—ধর্ম, অর্থ,

কাম ও মোক্ষ। এই চারটির কোনটিকেই উপেক্ষা করলে চলবে না,—ঋষিরাও করেননি। কাম অর্থাৎ ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ করতে হবে। জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় যে-সব বস্তু, সেগুলিকে সংগ্রহ না করলে মানুষ বাঁচবে কেমন করে? ভারতের এই দোষ হচ্ছে,—বস্তু সংগ্রহ করেছে, কিন্তু সব সময়ে সমভাবে তার বণ্টন হয়নি। তাছাড়া ঐহিক সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্পদও বেড়েছে, কিন্তু ঐহিক সম্পদের যেমন সমভাবে বণ্টন হয়নি, তেমনি আধ্যাত্মিক সম্পদের ক্ষেত্রেও তা হয়নি' সমাজের অধিকাংশ পড়ে আছে পিছিয়ে। কারণ তার এই শাস্ত্রজ্ঞান—শাস্ত্রের তত্ত্ব সব জায়গায় সমান প্রসার,—আপনার সাধারণের ভিতরে প্রচার সে করতে পারেনি। ভারতের সমাজব্যবস্থা এইজন্যই কিছু ত্রুটিপূর্ণ রয়েছে—যার ফলে তার অবনতিও যথেষ্ট হয়েছে। স্বামীজী বলেছেন, ভারতে যখনই এইভাবে ধর্ম হীনপ্রভ হয়েছে, তার সামাজিক অবনতিও সঙ্গে সঙ্গে দেখা গিয়েছে। আর সেই অবনতি যখন খুব নিচু স্তরে ভারতকে নিয়ে গেছে, তখনই কোন মহাপুরুষ বা যুগদেবতা আবির্ভূত হয়ে ভারতকে সর্বতোভাবে আবার ঊর্ধ্বে উন্নীত করেছেন—এইটি হল ভারতের বৈশিষ্ট্য।

আমরা এইরকম আবির্ভূত যুগপুরুষকে বহুবার ভারতে দেখছি এবং ভবিষ্যতেও আরও দেখব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যেমন বলেছেন যে, ধর্মে যখন গ্লানি দেখা যায়, তখনই তিনি অবতার হয়ে আসেন। নিজেকে তিনি মানুষ-রূপে প্রকট করেন,—"তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।" সমস্ত মানুষকে আবার ধর্মের পথ দেখাবার জন্য—আবার তাদের ধর্মপ্রেরণা জাগাবার জন্য। ভারতে এইরকম বহুবার ঘটেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে।

আমরা আগেই বলেছি ভারত ধর্মপ্রাণ। ধর্ম বিষয়ে তার একটা ঐতিহ্য আছে, যে ঐতিহ্যকে সে যখনই ভুলে গেছে, তখনই তার ঐহিক উন্নতিও ব্যাহত হয়েছে। আর যখনই আবার সে জাগ্রত হয়েছে, তখনই তার ধর্মের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ঐহিক উন্নতিও খুব হয়েছে। যুগ যুগ ধরে এই-রকম ঘটে আসছে।

আমরা বহুদূরের দিকে না চেয়ে বর্তমান-কালের কথা ভাবি। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বের কথা ভাবি—সে সময় পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভাবাদর্শের সংঘর্ষ হওয়ার ফলে ভারতের একটা চরম দুর্দশার দিন চলছিল। আশংকা হয়েছিল যে, ভারত বুঝি পাশ্চাত্য-দেশের কাছে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে যেমন পরাস্ত হয়েছে, যেমন ঐহিক ভোগ সঞ্চয়ে পরাস্ত হয়েছে, তেমনি ধর্মজীবনেও হয়তো পরাস্ত হবে চিরদিনের জন্য। তার ফলে বুঝি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েই যাবে সে। অথবা তাকে যদি বাঁচতে হয় তাহলে তাকে পাশ্চাত্যের ভাবধারাকে অনুসরণ করে, তাদের প্রণালীতে নতুন করে নিজেদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে হবে। ভারতের নিজের আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে পাশ্চাত্যের আদর্শকে গ্রহণ করে সেই পথে নিজেদের চলতে হবে। একটি পরাজিত দেশের পরাজিত মনোভাব এর দ্বারা পরিস্ফুট।

স্বামীজী কিন্তু বলেছেন, ভারতকে আবার তার আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপরেই নিজের দেশকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই পথেই তাকে চলতে হবে। সেই করেই তার ঐহিক এবং পারত্রিক উভয়তঃ কল্যাণ হবে। স্বামীজী আরও বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে কেন, সমস্ত জগতে সত্যযুগ আরম্ভ হয়েছে। এই সত্যযুগের শীর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি এই যুগাবতার রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। সমস্ত

জগতের চিন্তাধারাকে একটা নতুন স্রোতে প্রবাহিত করার জন্য তিনি এসেছেন। শুধু পারমার্থিক বা দিব্যদৃষ্টি দিয়েই নয়,—একজন খুব প্রবীণ ইতিহাসবেত্তা হিসাবেই তিনি এই কথা বলেছেন। ভারতকে সেইদিক দিয়ে তিনি উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন, পাশ্চাত্যের পথ ভারতের পথ নয়। পাশ্চাত্য নিজেকে বড় করতে চায় অপরকে খর্ব করে। ভারতের তা পথ নয়। ভারত কখন অন্য দেশকে খর্ব করে নিজে বড় হতে চায়নি। ভারত বড় হবে তার নিজের অধ্যাত্মবাদে প্রতিষ্ঠিত থেকে, যেখানে তার শীর্ষে থাকবে ধর্ম

মানবজীবনের চারটি প্রয়োজন—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। তার ভিতরে ধর্ম তার শীর্ষে থাকবে প্রধান লক্ষ্য হবে ধর্ম। যে ধর্ম তার ব্যক্তিসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখবে অর্থ, কাম এগুলিতেও তার প্রয়োজন আছে। ঠাকুরের কথার পুনরাবৃত্তি করে স্বামীজীও বলেছেন, "খালি পেটে ধর্ম হয় না।" পেট যখন ভরা থাকে,—জৈব যা কিছু প্রয়োজন, যখন পরিপূর্ণ হয় তখনই মানুষ ধর্ম ভাবকে পোষণ করতে পারে। তখনই মানুষ ধর্মজীবনের দিকে অগ্রসর হতে পারে। অসাধারণের কথা আলাদা, কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। যেখানে অন্নাভাব, যেখানে বস্ত্রাভাব, যেখানে মাথা গুঁজবার স্থান নেই, যেখানে নিজেদের স্বতন্ত্রতা নেই, যেখানের সমাজব্যবস্থা বিশৃঙ্খল, সেখানে ধর্ম কি করে দাঁড়াবে? ধর্মের ভিত্তিই সেখানে টলে যাবে। ধর্মকে শীর্ষে রেখে চলতে হবে, মানে ঐহিক ভোগের দিকে উপেক্ষার দৃষ্টি রাখতে হবে, তা নয়। এগুলিও প্রয়োজন। এগুলি আমাদের জীবনে অর্জন করতে হবে, ঋষিরাও তা বলেছেন। "অন্নং ব্রহ্ম" বলে বলেছেন, অন্নকে ব্রহ্ম বলে বলেছেন এবং আরও বলেছেন, "অন্নং বহুকুর্বীত"। অন্নকে বাড়াতে হবে। অন্নের উৎপাদন প্রচুর করতে হবে। তা নইলে জীব সবল হবে না। সবল না হলে জীব ধর্মকে অনুসরণ করে চলতে পারবে না। এই কথাই স্বামীজী বিশেষ করে জোর দিয়ে বলেছেন যে, আমাদের বর্তমান প্রয়োজন দারিদ্র্য-নিরসন, —সবচেয়ে বড় কথা এইটি যে, আমাদের অন্নের উৎপাদন বাড়াতে হবে। নতুন নতুন অন্ন-উৎপাদনের পথ আবিষ্কার করতে হবে। স্বামীজী তাঁর সময়েতে এটি তাঁর সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত বলেছেন। ধর্মের জন্য, ধর্মকে রক্ষা করার জন্য এটি প্রয়োজন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জানতে হবে, এই ভোগ তার নিজের জন্য নয়। কিন্তু ভোগ আমাদের জীবনকে বলিষ্ঠ করবে বলে—যাতে আমাদের লক্ষ্য যে ধর্ম, তার দিকে আমরা এগোতে পারি। স্বামীজী একথা আরও বলেছেন যে, মোক্ষ যদিও আমাদের মূল লক্ষ্য এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য, তাহলেও সমস্ত সাধারণ মানুষের পক্ষে একমাত্র মোক্ষকেই লক্ষ্য করে সংসারে চলা সহজ নয়। তাদের জন্য কিছু ঐহিক ভোগও চাই। আবার সঙ্গে সঙ্গে সেই ঐহিক ভোগ স্পৃহাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ধর্ম অবশ্যই চাই। ভোগ অর্জনের জন্য অর্থ চাই। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মোক্ষ হল তার চরম লক্ষ্য। সেই চরম লক্ষ্যের দিকে যাবার জন্য সমাজকে প্রস্তুত হতে হলে এই চতুর্বর্গ—এই চারটির দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

ভারতের ঋষিরা এই চারটি বর্গের কোনটিকেই উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেননি। তাঁরা দেখেছেন, এই চারটিকে সমাজে এমনভাবে রাখতে হবে, যেন একটি প্রবল হয়ে অন্যগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে না দেয়। ভারতে বৌদ্ধযুগে যখন মানুষের এই "মুমুক্ষানাং মুক্তাকাঙ্ক্ষা" প্রবল হয়েছে বলে আপাততঃ মনে হয়েছে, তখন দলে দলে লোক

মুক্তিকামী হয়ে ভিক্ষু সেজেছে। তার ফলে দারুণ প্রতিক্রিয়াও হয়েছে সমাজে। যারা এই মুক্তির পথে চলবার অযোগ্য, তারাও দেখাদেখি মুক্তির পথে চলতে গিয়ে সমাজকে দুর্বল করেছে।

সমাজের দুর্বলতাকে দূর করতে হলে মানুষকে বুঝাতে হবে, হ্যাঁ, ভোগও প্রয়োজন। কিন্তু সেই ভোগে সংযম রাখতে হবে। যেন আমরা অসুরের মতো যথেচ্ছ ভোগ না করি। অসুর ভোগকেই সর্বস্ব করেছিল। আমরা ভোগকে উদ্দেশ্য করব না। কিন্তু উপায়গুলি গ্রহণ করব। সেই উপায়গুলি গ্রহণ করে ভোগ অর্জন করাতে দোষ হবে না। কারণ ভোগ নিয়ন্ত্রিত হবে ধর্মের দ্বারা এবং সেই ধর্মই আমাদের নিয়ে যাবে মোক্ষের পথে।

ভারতের মতো সমাজে বিভিন্ন মত ও আদর্শের একটা সমাহার যেমনভাবে ঘটেছে, পাশ্চাত্যে আর কোথাও তেমন সম্ভব হয়নি। পাশ্চাত্যদেশের অনেকেই খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবে এসে খ্রীষ্টধর্মকে গ্রহণ করেছে, কিন্তু তার সমাজ খ্রীষ্টের আদর্শ অনুসারে পরিচালিত হতে পারেনি। তাদের সমাজে ভোগের প্রবণতা—যা গ্রীক এবং রোম সাম্রাজ্যের ভিতর থেকে পেয়েছিল, তার দিকেই ঝুঁকেছে। তার ফলে জড়বাদের উন্নতি হয়েছে। ঐহিক ভোগ সমৃদ্ধি অর্জন করেছে তারা, কিন্তু আধ্যাত্মিকতাকে হারিয়ে। এখন ভারতের এই আত্মবাদ বা আধ্যাত্মিকতা যা যুগ যুগ ধরে ভারত সংগ্রহ করে রেখেছিল তা জগৎকে দেবার সময় এসেছে। স্বামীজী এই কথাই আমাদের বার বার বলে গেছেন।

পাশ্চাত্য জগতের মনীষিরা এখন এই চিন্তা করছেন যে, আমরা যে-পথে সমাজকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি, তাতে সমাজ কখন স্থায়ী হতে পারে না। ওই পথে চলতে গেলে ধ্বংস অনিবার্য হবে। স্বামীজী পাশ্চাত্যদেশে তাঁর ভাষণে অতি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, তোমরা এই পাশ্চাত্যদেশ, জড়বাদের উপর ভিত্তি করে যে-সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলেছ, যদি তোমরা তার পরিবর্তন না কর তাহলে জেনে রেখো যে, তোমাদের এই সমস্ত ব্যবস্থা বারুদের স্তূপের উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যদি তাতে লাগে সমস্ত ধ্বংস হয়ে যাবে। কাজেই তোমাদের এখন থেকে ভোগ-সর্বস্ব যে-দৃষ্টি তাকে পরিবর্তিত না করলে তোমাদের কল্যাণ নেই।

আর ভারতকে কি বলেছেন? ভারতকে বলেছেন, তোমাদের ঋষিরা সত্যই যে অপূর্ব জ্ঞানের ভাণ্ডার তোমাদের জন্য রেখে গেছেন, সেই সম্পদকে তোমরা ভুলে গেছ। ভুলে যেয়ে ধর্মকে ভুলে তোমরা কতকগুলি অনুষ্ঠান মাত্রকে ধর্ম বলে মনে করছ, এবং তার ফলে পরস্পর ঈর্ষা, দ্বেষ সমস্ত সমাজব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করেছ। এখনও যে তোমরা বেঁচে আছ, তার কারণ হচ্ছে, যে-সম্পদ ঋষিরা তোমাদের কাছে ন্যাস হিসাবে গচ্ছিত রেখে গেছেন, সেই সম্পদের জগতে প্রয়োজন আছে। তাই তোমরা বেঁচে আছ। জগতে দেবার যদি কিছু না থাকে কোন দেশের বা কোন জাতির তাহলে সেই জাতি আর বাঁচে না—সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। প্রকৃতির নিয়মই এই—যার কোন প্রয়োজন নেই, যার কিছু দেবার নেই, তার এই জগতে থাকবারও অধিকার নেই। তবে ভারত যে এখনও পর্যন্ত বেঁচে আছে, তার এই একটি মাত্র কারণ যে, ভারতের এই অধ্যাত্মবিদ্যা যা ঋষিরা ভারতে প্রাচীনকালে সঞ্চিত করে রেখে গেছেন আমাদের কাছে, সেই বিদ্যার জগতে প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজন আছে বলেই ভারত এখন জাতিস্মরের মতো সেই বিদ্যাকে রেখে দিয়েছে, নিজে বিস্মৃত হয়ে। যেমন, কৃপণ তার সম্পত্তি মাটির নিচে পুঁতে রেখে দেয়।

ফলে সেই সম্পত্তি না তার নিজের কাজে লাগে, না জগতের আর কোন কাজে লাগে। ভারতের অধ্যাত্মবিদ্যাও সেইরকম একেবারে অব্যবহৃত হয়ে, অব্যবহার্য হয়ে পড়ে আছে।

এখন স্বামীজী বলছেন, আমাদের প্রয়োজন কি? আবার আমাদের সেই বিদ্যা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া, সেই বিদ্যার সঙ্গে পরিচিত হওয়া, তাকে অর্জন করা। এবং তা শুধু বিশেষ কয়েকটি লোকের জন্য নয়। সমস্ত সমাজে সেই বিদ্যাকে পরিব্যাপ্ত করা, ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। যার ফলেতে সমস্ত দেশ একটা নতুন শক্তিতে শক্তিমান হয়ে উঠবে। সেই আত্মবিদ্যা যা তাকে মহাবলশালী জাতিতে পরিণত করবে এবং সেই বলশালী জাতি তখন সমস্ত জগতের কাছে তার অমূল্যরত্ন ভাণ্ডার উন্মোচিত করে সকলকে দেবে। এই জগৎ তার জন্য প্রতীক্ষা করে আছে।

আমরা পাশ্চাত্য মনীষিদের লেখায় আজকাল পড়ি,—তাঁরা বলেছেন, আমরা এই জড়বাদের ফলে এমন একটা জায়গায় এসে পৌছেছি যে, অচিরে এর আমূল পরিবর্তন সাধন দরকার, না হলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। তা এদেশে আমরাও বেশ বুঝতে পারছি—কিরকম করে দ্রুতগতিতে আমরা ছুটে চলেছি ধ্বংসের দিকে, পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করে। আমাদের আবার আধ্যাত্মিকতাকে জাগাতে হবে। যে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান বলে, এক পরমেশ্বর সর্বভূতে রয়েছেন। বলেছেন যেমন, "অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপ বভূব। / একস্তদা সর্বভূতান্ত-রাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপা বহিশ্চ॥" যেমন অগ্নি এই সমস্ত জগতের ভিতরে পরিব্যাপ্ত হয়ে, বিভিন্ন আধারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে এবং জগতের সর্বত্র থেকে তার বাইরেও সে বিদ্যমান থাকে, ঠিক সেইরকম আত্মাও সর্বজীবের ভিতরে বিভিন্নরূপে পরিব্যাপ্ত রয়েছেন এবং তার বাইরেও আছেন। এই সর্বভূতকে আত্মাতে, এবং আত্মাকে সর্বভূতে প্রতিষ্ঠিত দেখা—এইটি হল ভারতের আত্মবিদ্যা। এই বিদ্যার প্রয়োজন অপরিহার্য। আমরা জগতে সাম্য মৈত্রী প্রভৃতির কথা বড় বড় আলোচনা করি। নানা দৃষ্টিতে সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা করি। নানা সভা-সমিতি করে এই তত্ত্ব আমরা আলোচনা করি। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি আছে ভোগের বণ্টন, ভোগ সাম্যতা এইটুকু মাত্র। কিন্তু এইটুকু করলেই হবে না।

ভোগের সাম্য কেন দরকার? কেন আমরা সকলকে আমাদের সম্পত্তি ভাগ করে দেব বা সকলের সঙ্গে ভাগ করে খাব? এই প্রশ্নের সমাধান কি? কেন আমরা এইরকম করতে যাচ্ছি? স্বামীজী বলছেন, তার কারণ আমরা সকলের ভিতরে রয়েছি। যিনি সব জায়গায় তাঁকে দেখেন এবং সবার মধ্যে সেই ভগবানকে উপলব্ধি করেন, সেই তিনিই আত্মবিদ্। 'আত্মজ্ঞানে বলীয়ান ব্যক্তি নতুন দৃষ্টিতে জগৎকে দেখতে শেখেন। সেই দৃষ্টিতেই বোঝা যায়, কেন আমরা অপরের উপকার করতে যাচ্ছি। একজন শক্তিশালী যদি বলে, আমি অপরের উপরে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে আমি ভোগ করব—তাকে যদি সে পীড়ন করে, তাতে দোষ কি? বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। তার উত্তর হচ্ছে যদি আমরা অপরকে নিপীড়ন করে নিজেরা ভোগ করতে যাই, তাহলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ভুল করছি এই, যাদের নিপীড়ন করছি, তাদের নিপীড়নের দ্বারা আমরা নিজেদেরই

করছি। শাস্ত্র বলছেন, যে সর্বত্র সুখ এবং দুঃখকে সমভাবে দেখে তার নিজের মতো করে, যেখানে দেখে যে অপরের দুঃখ সে আমার দুঃখ, অপরের সুখ সে আমার সুখ। এইভাবে নিজেকে সে সর্বত্র প্রসারিত করে দেখে। তখনই ঠিক

ঠিক তার ভিতরে সাম্যবাদ আসে। এই সাম্যবাদ যে কতকগুলি কথার কথা মাত্র বা কতকগুলি নৈতিক সিদ্ধান্ত মাত্র, তা নয়। এই সাম্যবাদ হল বাঁচবার পথ এবং এই সাম্যবাদের অর্থও হচ্ছে যে,—মাত্র ভোগের বণ্টনের সাম্য নয়, সর্বত্র সেই এক পরমেশ্বরকে দেখা। সর্বত্র সমদৃষ্টি আনতে চেষ্টা করা।

ভারতের এই অধ্যাত্ম সাম্যবাদ নিজস্ব সম্পদ ছিল, কিন্তু জীবনে তার প্রয়োগ করতে সে ভুলে গেছে। আমরা একথা ভুলে গিয়েছিলাম যে, ঋষিরা বলেছেন, সেই এক ব্রহ্ম সর্বত্র—"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" এই বিশ্বচরাচর সবই ব্রহ্ম। আমরা নিছক একটা নীতি বা একটা সিদ্ধান্ত বাক্যমাত্র বলেই এই কথাকে মনে করেছিলাম। ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে ভুলে গিয়েছিলাম। ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে স্বামীজী শিখিয়ে গেছেন। ধর্মকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। ভারত ধর্মের সিদ্ধান্তে একেবারে শীর্ষে, কিন্তু প্রয়োগ-কুশলতা তার ছিল না,—তারই জন্য এত অবনতি। এখন জগতে এই সিদ্ধান্ত দিতে হবে এবং এই সিদ্ধান্তকেই সর্বত্র প্রয়োগ করে প্রতিক্ষেত্রে দেখতে হবে। খুব লৌকিক ভাষায় যদি আমরা বিচার করে বলি, তাহলে ধর্ম মানে আমি আমার নিজের সুখটি হলেই সব হয়ে গেল, তা নয়। ধর্ম মানে সকলের সঙ্গে সমভাবে সুখদুঃখের ভাগী হওয়া। তবেই ধর্মকে বলব ঠিক ঠিক ভাবে প্রয়োগ হচ্ছে, প্রযুক্ত হচ্ছে। ধর্ম মানে এই নয় যে, আমি ঠাকুরঘরে বসে চোখবুজে একেবারে সেই ব্রহ্মেতে লীন হচ্ছি ; আর দুনিয়াটা উড়ে পুড়ে যাক্ আমার কি বয়ে গেল। দুনিয়া মিথ্যা! এটা ধর্ম নয়। ধর্ম মানে সর্বত্র সেই আত্মা যাকে আমরা সত্য বলছি, যাকে ঈশ্বর বলছি, সর্বত্র তিনি ছড়িয়ে রয়েছেন, পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। আমরা যদি একজায়গাতেও কাউকে নিপীড়ন করি তবে সেই পরমেশ্বরকেই বিরুদ্ধাচারণ করা হচ্ছে আমাদের। এই কথাটুকু আমাদের ভাবতে হবে। এই কথাটুকু জীবনে মনে রাখতে হবে এবং কাজে, ব্যবহারে তার প্রয়োগ করতে হবে। তা যদি না করি তবে আমাদের ধর্ম কেবল-মাত্র কতকগুলি ছেঁদো কথা মাত্র। কতকগুলি নীতিকথা মাত্র। কিন্তু জীবনে তা কার্যকর হবে না। বলছেন, সর্বভুতেতে সেই ভগবানকে দেখতে হবে এবং আত্মাতে সর্বভুতকে। শাস্ত্র বারবার এই উপদেশই দিয়ে আসছেন। এইটি আমরা ভুলে যাচ্ছিলাম। আমরা পারমার্থিক দৃষ্টিতে সবই আত্মা এই কথা বলছি, কিন্তু ব্যবহারের সময় অত্যন্ত পার্থক্য করছি। স্বামীজী তাই বলেছেন, এমন উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব জগতে আর কোথাও আবিষ্কৃত হয়নি এবং এই তত্ত্বকে উপেক্ষা করাও এমনভাবে, নিদারুণভাবে আর কোথাও হয়নি।

অন্য সব দেশে বরং ভোগের দিকে দৃষ্টি থাকলেও তারা সমাজকে গড়ে তুলেছে স্বাধীন-ভাবে, সুন্দরভাবে। আর আমরা সেই আধ্যাত্মিকতার কথা বলি বুলি হিসাবে। কিন্তু সর্বজীবের প্রতি করুণা, মৈত্রী এগুলি ভুলে গেছি। আমাদের শাস্ত্র বলছেন, ধর্মেতে মানুষ যেমন যেমন উন্নত হয় তা ক্রমশঃ এই তিনটি পর্যায়ের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। প্রথমতঃ সে ভগবানের একটি মূর্তি করে সেখানে তাঁর সেবাপূজা করে। সেখানেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। ভগবান যে অন্যত্র আছেন সে-কথা সে জানে না, বিচার করে না। সে যদি শ্রদ্ধাশীল হয়, তাহলে তার পক্ষে ঐটুকুও ভাল—সেও ভক্ত। কিন্তু সে প্রবর্তক মাত্র। তবে এখন পর্যন্ত ধর্মেতে তার তেমন অগ্রগতি হয়নি। মধ্যম পর্যায়ে যখন সে উঠবে তখন তার প্রেম, মৈত্রী, করুণা, উপেক্ষা—এইভাবে তার ব্যবহার হবে। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, ঈশ্বর

ভক্তের সঙ্গে মৈত্রী, ঈশ্বর সম্বন্ধে অজ্ঞ যারা তাদের প্রতি করুণা, ঈশ্বরবিদ্বেষী যারা তাদের দ্বেষ-ভাবের প্রতি উপেক্ষা। এইভাবে সকলের সঙ্গে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষার কথা বলা হয়েছে। এইভাবে সমস্ত জগতের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। ব্যবহার যদি এইগুলির না করে, আদর্শকে প্রয়োগ জীবনে যদি না করে, তাহলে সেই আদর্শ তার কোন কাজেই লাগবে না। ধর্মজীবনেও তার কোন উন্নতি হবে না। ঐহিক জীবনেও এই যে দৃষ্টি তা কখনও কল্যাণকর হবে না। সুতরাং এইভাবে মধ্যমপর্যায়ভুক্ত হলে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এগুলি অর্জন করতে হবে। এই ভাবের ব্যবহার করতে হবে। এবং যখন শ্রেষ্ঠ ভক্ত হবে, সে তখন সর্বভূতে ভগবানকে দেখবে। তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত যিনি সর্বভূতে সেই ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেন এবং সর্বভূতকে সেই ভগবানেতে প্রত্যক্ষ করেন। সর্বভূতে তিনি, তাঁতে সর্বভূত। সর্বভূতে তাঁর আত্মা, তাঁর আত্মাতে সর্বভূত। এইভাবে যখন তিনি দেখেন তখন তাঁকে শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলা হয়।

এই শ্রেষ্ঠ ভক্তি যখন আসে তখন তার জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়। তার ব্যবহার তখন একেবারে বদলে যায়। "লোহার তলোয়ার যদি পরশমণির স্পর্শ পায় সে সোনা হয়ে যায়, তা দিয়ে আর হিংসা চলে না" ঠাকুর বলেছেন। ঠিক সেইরকম ভগবানের সান্নিধ্য যদি কেউ লাভ করে, তাঁর সম্পদে যদি কেউ সম্পন্ন হয়, তাহলে তার ব্যবহার এইরকম বদলে যাবে। তার দ্বারা জগতে কেবল কল্যাণ হবে। কোথাও কোন ব্যক্তির, কোন সমাজের তার দ্বারা অকল্যাণ হবে না। এইরকম ব্যক্তিরাই ধর্মকে ধরে থাকে এবং এই আদর্শকে যখন আমরা সমাজের চারিদিকে পরিব্যাপ্ত করে দিতে পারব, যখন সমষ্টি জীবনেতে এই ধর্ম গ্রহণ করবে, তখনই সত্যি সত্যি আমাদের দেশ সেই ধর্মের ভিত্তিতে আবার দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হবে এবং তখনই সমস্ত জগতের যে ধর্ম সম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, যে ক্ষুধা রয়েছে, যে অভাব রয়েছে, সেই অভাব দূর করতে ভারত সমর্থ হবে। সমস্ত জগৎ ভারতের দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে চেয়ে রয়েছে। বিশেষ করে পণ্ডিতেরা যাঁরা ভারতের এই তত্ত্বের খানিকটা আলোক পেয়েছেন, আভাস দেখেছেন, তাঁরা বিশেষভাবে ভারতের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে রয়েছেন। বলছেন, ভারতবাসী আমাদের বাঁচাও।

কিন্তু সেই ভারতবাসী কোন্ ভারতবাসী? যে ভারতবাসীকে আমরা চারিদিকে দেখছি সে নয়। আমরাই তো নিজেরা যেন মুমূর্ষুর মতো-বোধ করছি। আমরা অপরকে বাঁচাব কি করে? প্রথম কথা হচ্ছে এই, সেই আত্মজ্ঞানে আমাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আমাদের সমাজকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তারপর সেই আত্মবলে বলীয়ান হয়ে, আমরা তখন জগতের এই অভাব দূর করতে সমর্থ হব। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের এই দায়িত্ব দিয়েছেন এবং এইজন্য তাঁর জগতে আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর আদর্শকে আমরা ততদিন বুঝতে পারব না, যতদিন পর্যন্ত না এই গুহ্য তত্ত্বটি আমরা অভ্যাস করতে পারছি। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা এইটি যে মানুষ ভগবানকে পূজা করে কাঠে, পাথরে, মাটিতে, কিন্তু মানুষের ভিতরে তাঁর পূজা হয় না?—শ্রীরামকৃষ্ণের এই প্রশ্ন। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে বড় দার্শনিক হিসাবে হয়তো দেখি না। আমরা মনে করি, তিনি একটি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ভক্ত মানুষ। কিন্তু এই দৃষ্টিতে ভক্ত যদি দেখে যে, ভগবানকে আমরা যেমন সাধারণ-ভাবে তাঁর বিগ্রহ করে পূজা করি, তার চেয়ে অনেক ভালভাবে জীবন্ত মানুষের ভিতরে তাঁর পূজা করা যায়। যদি আমরা এটি জানতে

পারি, বুঝতে পারি, তাহলে এই জগতে আমাদের ব্যবহার একেবারে বদলে যাবে।

সেইজন্যে তাঁর পার্ষদদের স্বামী বিবেকানন্দকে বলেছেন, মানুষের সেবায় জীবন অর্পণ করতে। আবার কি দৃষ্টি দিয়ে? সাক্ষাৎ ভগবানকে সেবা করছি এই বুদ্ধি দিয়ে।

সেই ঘটনাটি সকলের হয়তো জানা আছে। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে জীবে দয়া কথাটি বলেছিলেন কেউ। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবস্থ অবস্থায় বলেছিলেন,—'দয়া কিরে? দয়া নয়, সেবা। তুই দয়া করবার কে? শিবজ্ঞানে জীবসেবা।' স্বামী বিবেকানন্দ একা নয়, আরও অনেকে সেইদিন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এই নতুন কথাটি শুনেছিলেন। কিন্তু স্বামীজী বলেছিলেন,—আজ একটি অপূর্ব কথা শুনলাম। যদি ভগবান কখনও দিন দেন তাহলে এই কথা প্রচার করব। সেই প্রচারই তিনি পরে করেছেন—নরনারায়ণের সেবা, দরিদ্রের সেবা, আর্তের সেবা, দুঃস্থের সেবা শিববুদ্ধিতে। সর্বত্র সেই এক ভগবান, তাঁকে আমরা বিভিন্নভাবে সেবা করছি

স্বামীজী বলেছিলেন,—উপনিষদে আছে মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবোভব, আচার্যদেবো ভব। মাকে দেবতা বলে মনে করবে, পিতাকে দেবতা বলে মনে করবে, আচার্যকে দেবতা বলে মনে করবে। বলছেন, এখানেই সেই বাণী শেষ হয়ে গেল না। স্বামীজী আরও জুড়ে দিলেন,—দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব, চণ্ডালদেবো ভব। যেখানে দরিদ্র দেখছ তাকে দেবতা বুদ্ধিতে সেবা কর। তার দারিদ্র্য দূর করতে চেষ্টা কর। যেখানে মূর্খ দেখছ, তার মধ্যে ভগবানকেই দেখতে চেষ্টা কর। তার অজ্ঞতা দূর করতে চেষ্টা কর। যেখানে চণ্ডালকে দেখছ তার মাঝে ভগবানকে দেখতে চেষ্টা কর। সমাজের দুর্দশা দূর করতে চেষ্টা কর। এইভাবে নতুন দৃষ্টিতে তিনি সমাজ সেবার কথা বলেছেন এবং তিনি এই দৃষ্টি পেয়েছেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে।

এখন এই যুগ এসেছে, যে-যুগে নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, আমাদের নিজেদের ঘরকে আবার নতুন করে সাজাতে হবে। আমাদের নতুন পথে চলে জীবনকে সার্থক করতে হবে। স্বামীজী বার বার করে আমাদের বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে এই সত্যটিকে বিশেষ করে বুঝতে হবে যে, আমরা মানুষকে উপেক্ষা করে কেউ কখন ধার্মিক হতে পারব না।

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলেছিলেন যে, আমি চোখ বুজে ধ্যান করছিলাম। তারপর মনে ভাল লাগল না। মনে হল চোখ বুজলে তিনি আছেন, আর চোখ চাইলে তিনি নেই? —চোখ চেয়ে সর্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি! তিনিই সব জায়গায় ওতপ্রোতভাবে রয়েছেন, প্রত্যেকের ভিতরেই সেই ব্রহ্ম রয়েছেন এবং সেই জ্ঞানেতে প্রতিষ্ঠিত থেকে, সকলকেই তাঁর মূর্তি জ্ঞানে সেবা করা। এইটি যতক্ষণ না আমরা গ্রহণ করব জীবনের ব্রতরূপে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভারতবাসী বলে নিজেদের পরিচয় দেবার যোগ্য নই। আমাদের মনে রাখতে হবে, এই সম্পদ আমরা পেয়েছি উত্তরাধিকারসূত্রে। এই সম্পত্তিকে নিজেরা জেনে, বুঝে, নিজস্ব করে নিয়ে সমগ্র জগতে সকলের কাছে তা বিলিয়ে দিতে হবে। কারণ এর দ্বারাই জগতের কল্যাণ। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের এই যুগে তাঁর চরণে প্রার্থনা করি, যেন তাঁর কৃপায় এই মন্ত্রে আমরা উদ্বুদ্ধ হই এবং এর দ্বারা নিজের জীবনকে সার্থক করে জগতে কল্যাণের যে-পথ তিনি আবিষ্কার করে গেছেন, তা সকলের কাছে উন্মুক্ত করতে সমর্থ হই।
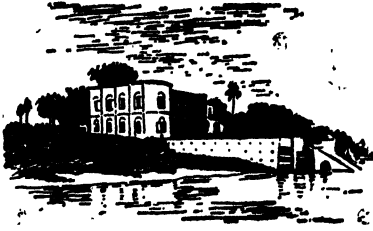
পুস্তক সমালোচনা

ঐতরেয়োপনিষদ্ : অনুবাদক—ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার। প্রকাশক : সন্ত আশ্রম, কল্যাণী, নদীয়া। পকেট সাইজ, পৃষ্ঠা ২৩+৬০ ; মূল্য : তিন টাকা।

মানুষ অতি প্রাচীনকাল থেকে জন্ম-মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা চালিয়ে আসছে। প্রতীচ্যের মানুষ এ-চেষ্টায় কোন কূলকিনারা না পেয়ে উদ্যোগ ত্যাগ করেছে। প্রাচ্যবাসী আমাদের পূর্বপুরুষগণও একই চেষ্টায় ব্রতী হয়ে কোন সমাধান পাননি। তাঁরা বুঝেছিলেন বাক্য-মনের দ্বারা এ-তত্ত্বের মর্মভেদ সম্ভব নয়। তাই তাঁরা বলিষ্ঠ ও দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'। তাঁরা বুঝেছিলেন জন্ম-মৃত্যু রহস্য অতীন্দ্রিয় রাজ্যের ব্যাপার। যিনি অতীন্দ্রিয় সত্য দর্শন বা উপলব্ধি করেন, তিনি ঋষি নামে অভিহিত হন। আর এই অতীন্দ্রিয় সত্যই বেদ বা জ্ঞান-ভাণ্ডার। অনাদি অনন্ত এই জ্ঞানরাশি নিত্য এবং অলৌকিক। তার সাহায্যে সৃষ্টিকর্তা জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কার্য করেন। বেদকে শ্রুতিও বলা হয়। গুরুশিষ্য পরম্পরা ক্রমে শুনে শুনে এই জ্ঞানধারা সমাজে প্রচলিত হত।

অলৌকিক জ্ঞানরাশি বেদ দুই ভাগে বিভক্ত—সংহিতা বা মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্রসমূহ একত্রে সন্নিবেশিত বলে সংহিতা বলা হয়। আর যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াদির বিধিনিষেধ, অর্থবাদ, উপাসনা, ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণ ভাগে নিবদ্ধ। ব্রাহ্মণের অবান্তর ভাগ বা অংশবিশেষকে আরণ্যক বলে। এতে অরণ্যচারীদের উপাসনাদির বর্ণনা আছে। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ উভয় অংশেই উপনিষদ্ রয়েছে। আরণ্যক ও উপনিষদ্ ছাড়া সংহিতা ও ব্রাহ্মণসমূহ প্রধানতঃ কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। আর উপনিষদ্‌সমূহ বেদের শেষাংশে রয়েছে বলে বেদান্ত বলা হয়।

ব্রহ্মবিদ্যার আকর উপনিষদ্। তার সংস্পর্শে এলে মানুষের ভবরোগ নিরাময় হয়। চারভাগে বিভক্ত বেদে চারটি মহাবাক্য আছে। 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তৎ ত্বমসি', 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম', 'অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম' যথাক্রমে যজুর্বেদ, সামবেদ, ঋগ্‌বেদ ও অথর্ববেদের অন্তর্গত। মহাবাক্যের সর্বোচ্চ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করাই শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়াও মানবজীবনের সাধ্য। সর্বোচ্চ অদ্বৈতজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে মানুষ 'অভীঃ' হয়, সকল সুখদুঃখের পারে পরমা শান্তি লাভ করে।

ঋগ্‌বেদের প্রাচীনতম ব্রাহ্মণ ভাগে ঐতরেয় উপনিষদ্‌খানি সন্নিবিষ্ট। ইতরার পুত্র ঐতরেয়। ইতরা মানে সাধারণ রমণী অর্থাৎ শূদ্রাণী। শূদ্রাণীর পুত্র পৃথিবীরূপা মাটির মায়ের কাছে দীক্ষা নিয়ে তপস্যা বলে জ্ঞানলাভ করেন। তাই নাম হয় মহীদাস। সুতরাং ইতরার পুত্র মহীদাস এই উপনিষদের দ্রষ্টা ঋষি। তিনি শূদ্রাণী অর্থাৎ ইতরার পুত্র—এটা ভাল করে বুঝিয়ে দেবার জন্য নিজেকে ইতরাপুত্র 'ঐতরেয়' নামে খ্যাত করলেন। উপনিষদ্‌খানিতে তিনটি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টির ক্রম বর্ণিত। 'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্রে আসীৎ' সৃষ্টির পূর্বে জগৎ প্রপঞ্চ এক আত্মারূপে ছিলেন। অদ্বৈতকে সৃষ্টির পূর্ব বর্ণনাচ্ছলে স্বীকার করা হয়েছে।

পরমাত্মার ইচ্ছাশক্তিতে অম্ভ, মরীচী, মর ও অপলোকসমূহ সৃষ্টি হল। তারপর তিনি লোক-সমূহের পালক এবং ক্রমে দেবতা ও মানব সৃষ্টি করলেন। আত্মা আপনা থেকেই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করলেন। নিজেতে অধ্যারোপ করে তাঁর বিশ্বজগৎ সৃষ্টি। মুমুক্ষু মানব ধ্যান-তপস্থার দ্বারা সংস্কৃতচিত্ত হয়ে অপবাদসহায় সর্বব্যাপী সর্বানুস্যূত ব্রহ্মকে দর্শন করেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মানবের জন্ম-মৃত্যুর বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। জন্ম-মৃত্যুর রহস্য অবগত হলে মানব 'সর্বান্ কামানাপ্ত্বা' পূর্ণকাম হয়ে 'অমৃতঃ সমভবৎ' অমৃতত্ব লাভ করেন। তৃতীয় অধ্যায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নিয়ে শুরু। এখানে আত্মস্বরূপ বিচারিত। সকল বস্তুর মধ্যে সেই এক ব্রহ্ম বিদ্যমান, কোন বস্তুই ব্রহ্মবিহীন বা অচিৎ নয়। চিৎস্বরূপই আত্মা, চিৎস্বরূপই ব্রহ্ম। মুমুক্ষু সাধক বিচারসহায় ঋগ্‌বেদীয় মহাবাক্য 'প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম' সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

যদিও আচার্য শঙ্কর ঐতরেয় উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেছেন, কিন্তু উপনিষদ্‌খানির বহুল চর্চা দেখা যায় না। শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মচারী শিশির-কুমার মহারাজ বাংলা হরফে গ্রন্থখানির মূলসহ স্বচ্ছ সাবলীল অনুবাদ করেছেন। প্রত্যেক মন্ত্রের অন্বয় এবং ব্রহ্মচারিজী লিখিত অনুধ্যান উপনিষদের অর্থ বুঝতে পাঠককে সাহায্য করবে।

বইটির প্রারম্ভে 'উপনিষদ্ কি' মুখবন্ধ এবং মর্মবাণী যথাক্রমে পাঠককে উপনিষদ্ সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা দেবে এবং আলোচ্য উপনিষদের বিষয়বস্তুর পরিচয় দেবে। প্রবীণ বৈষ্ণব মহাজন ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার মহারাজ একজন সাধক। তিনি সারা জীবন শাস্ত্রের সেবা করে এসেছেন। অন্যেও যাতে শাস্ত্রসেবা করতে পারে সেজন্য ভক্তিশাস্ত্র, উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ বিনামূল্যে বা সুলভে পকেট সংস্করণ প্রকাশ করে আসছেন। আলোচ্য উপনিষদ্‌খানি ঐরকম এক শুভ ইচ্ছার ফলশ্রুতি। তাঁর এই প্রয়াসকে আমরা শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে অভিনন্দন জানাই। আর পুস্তকটি প্রকাশ করে তিনি শাস্ত্রানুরাগীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। পুস্তকটির বহুল প্রচার আমরা কামনা করি।

—স্বামী ধ্যানেশানন্দ
রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ

ষষ্ঠ বার্ষিক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন

আগামী ৫ ও ৬ এপ্রিল ১৯৮৫, শুক্রবার ও শনিবার উদ্বোধন কার্যালয়ের 'সারদানন্দ হলে' (বাগবাজার, নয়ানকৃষ্ণ সাহা লেন, কলিকাতা-৩) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। দুদিনের সম্মেলনে তিনটি অধিবেশন এবং একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হবে। বিশিষ্ট গবেষক, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, কবি, সঙ্গীতশিল্পী ও সাংবাদিক এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করছেন। সীমিত সংখ্যক আসন।
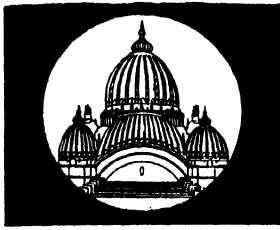
উৎসব

বেলুড়মঠ। ২১ ফেব্রুআরি ১৯৮৫, বৃহস্পতিবার। ভোর সাড়ে চারটা। সুরধুনী কলকল রবে বয়ে চলেছে উত্তর হতে দক্ষিণে। পবিত্র সুশীতল মলয় বাতাস মৃদু মৃদু বইছে। অরুণোদয়ের প্রায় দেড় ঘণ্টা এখনও বাকী। এমনি একটি অপূর্ব ব্রাহ্মমুহূর্তে বেজে উঠল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ১৫০তম আবির্ভাব-তিথির মঙ্গলারতির ঘণ্টার ধ্বনি। মঙ্গলারতি শেষ হতে না হতে আরম্ভ হল সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীর মিলিত সুললিত কণ্ঠে বৈদিক স্তব, শ্রীরামকৃষ্ণ স্তব, সঙ্গীত প্রভৃতি। এমনিভাবে একের পর এক বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মঠপ্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে। দুপুরে হাতে-হাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের রন্ধিত প্রসাদ প্রায় ৩৫,০০০ নর-নারীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। স্বামী ভাস্যানন্দের সভাপতিত্বে বিকালের ধর্মসভায় বর্তমান বিশ্বসঙ্কট পরিস্থিতি হতে ব্যক্তিগত দৈনন্দিন জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়োজনীয়তার অনবদ্য একটি আলোচনা হয়। এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী স্মরণানন্দ ও অধ্যাপক সীতানাথ গোস্বামী।

সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ২৪ ফেব্রুআরি, রবিবার। ঐদিনও ভোর হতে সারাদিন নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক ভাব সঞ্চারিত হয়। এইদিন দুপুরে ৩০,০০০ নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিকালে রহড়া বালকাশ্রমের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ সুদামা নাটকটি একটি অদ্ভুত ভক্তিভাবের পরিবেশ তৈরি করে। হাজার হাজার মানুষ সাশ্রুনয়নে ভক্তিরসাশ্রিত নাটকটি অবলোকন করেন। সন্ধ্যারতির পর আতসবাজির মাধ্যমে সারাদিনের আনন্দোৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

নিম্নের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র হতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-উৎসবের সংবাদ এসেছে :

মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম।

তমলুক (মেদিনীপুর) রামকৃষ্ণ মঠ।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

পশ্চিমবঙ্গে বন্যাত্রাণ : (ক) জলপাইগুড়ি জেলার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের মাধ্যমে এই জেলায় ৭টি গ্রামের ৩০৮জন বন্যাদুর্গত পরিবারের মধ্যে ৫২২টি পশমী কম্বল, ৭৭৬টি চাদর, ১৬টি শাড়ী এবং ৩টি ধুতি বিতরিত হয়েছে।

(খ) মুর্শিদাবাদ জেলার সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের মাধ্যমে এই জেলার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারবর্গের মধ্যে দ্রুত বিতরণের উদ্দেশ্যে ৭৫টি পশমী কম্বল, ৭০টি সূতি চাদর, ২০০টি লুঙ্গী, ২৬০টি পশমী সোয়েটার, প্রভৃতি পাঠানো হয়েছে।

(গ) বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার ৫টি গ্রামের বন্যাবিধ্বস্ত গ্রামবাসীদের মধ্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে ৬৭৫টি পশমী কম্বল, ৯০৯ খানি ধুতি, ৯১৫টি শাড়ী, এবং ২,৪০৮টি শিশু-পোশাক ৭৯৩টি পরিবারবর্গের মধ্যে বিতরিত হয়েছে। এ অঞ্চলে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ অব্যাহত রাখার কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে।

(ঘ) নদীয়া জেলার দেবগ্রাম ব্লকের গোবরা অঞ্চলের চরগোবিন্দপুর গ্রামের ৫২টি বন্যাদুর্গত

পরিবারবর্গের মধ্যে ৫০টি পশমী কম্বল, ৭৪টি ধুতি, ৬৬টি শাড়ী এবং ২০৪টি শিশু-পোশাক বিতরিত হয়।

(ঙ) মেদিনীপুর জেলার বন্যাবিধ্বস্ত ময়না মহাবিদ্যালয়ের দরিদ্র প্রতিভাবান স্নাতক শ্রেণীর ৯৯ জন শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২৫২ খানি পাঠ্যপুস্তক বিতরিত হয়েছে। বিতরণের কাজ এখনও চলছে।

(চ) হাওড়া জেলার ডোমজুর থানাধীন সদর মহকুমার রাজপুর, দক্ষিণবাড়ি, চাখড়ি ও আরও তিনটি গ্রামের ১০২০ পরিবারবর্গের মধ্যে ৭১২ খানি ধুতি, ৩০৮ খানি শাড়ী এবং ৪,৬৪৬টি শিশু-পোশাক বিতরিত হয়েছে।

(ছ) মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের তত্ত্বাবধানে ২৪ পরগনা জেলার সাগরদ্বীপের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের মধ্যে ২,৫০৯টি সুতীর চাদর, ২০০ খানি পুরনো কাপড়, ৫০০টি পশমী সোয়েটার এবং শুকনো খাদ্যবস্তু বিতরণ করা হয়।

(জ) বেলঘরিয়ার নিম্নাঞ্চলে বসবাসকারী বন্যাদুর্গত নরনারীর মধ্যে বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেণ্টস্ হোমের তত্ত্বাবধানে ব্যবহৃত পুরনো পোশাকাদি, শিশু-পোশাক এবং পশমী সোয়েটার বিতরিত হয়।

উদ্বোধন-সংবাদ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-তিথি উৎসব: ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ১৫০তম আবির্ভাব-তিথি গত ২১ ফেব্রুআরি ১৯৮৫, বৃহস্পতিবার 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'তে শান্ত উদ্দীপনাময় পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়েছে। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও ভজন-সঙ্গীত হয়। সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী অজজানন্দ।

৫ ফেব্রুআরি স্বামী অদ্ভুতানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'তে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা হয় এবং সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী চৈতন্যানন্দ তাঁর জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। ১৭ ফেব্রুআরি শ্রীশিবচতুর্দশী সারারাত্রিব্যাপী বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী অজজানন্দ প্রত্যেক রবিবার ও বৃহস্পতিবার যথাক্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

হিন্দমোটর কোন্নগর (হুগলী) শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রমে গত ৩ ফেব্রুআরি, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আবির্ভাব এবং আশ্রমের বার্ষিক উৎসব নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়।

রাজারহাট বিষ্ণুপুর (২৪ পরগনা) শ্রীরামকৃষ্ণ-নিরঞ্জনানন্দ আশ্রমে গত ১০ফেব্রুআরি ১৯৮৫, শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের ১২২তম জন্মজয়ন্তী উৎসব, তীর্থ-পরিক্রমা, পূজা, হোম, কীর্তন, ভাগবৎপ্রসঙ্গ, নারায়ণসেবা, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **মধুসূদন মণ্ডল** গত ১১ ডিসেম্বর মঙ্গলবার রাত্রি ১১টা ৩৫ মিনিটে তাঁর কৃষ্ণনগরস্থ বাস-ভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বৎসর। কর্মজীবনে তিনি নানা জায়গায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা প্রচারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি ইষ্টনাম স্মরণ করে গেছেন।

পাটনার বিশিষ্ট সমাজসেবী **জিতেন্দ্রনাথ ফৌজদার** মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে গত ১৫ ফেব্রুআরি, ১৯৮৫ পরলোকে গমন করেছেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের কাছে শৈশবেই মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেছিলেন। ধর্মপ্রাণ শ্রীফৌজদার কর্মজীবনে পদস্থ পুলিশ কর্মচারী ছিলেন,—দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদকে সম্মানিতও হয়েছিলেন। নানাবিধ সমাজসেবামূলক কর্মে তিনি ছিলেন অনলস কর্মী এবং সকলেরই প্রিয় সহায়ক বন্ধু।

—বিশেষ দ্রষ্টব্য—

* অতঃপর বর্তমান পৃষ্ঠাসংখ্যা নিচে।

* পুনর্মুদ্রিত অংশের পৃষ্ঠাসংখ্যা উপরে।

পুনর্মুদ্রণ

২য় বর্ষ, ১৩—১৪শ সংখ্যা ● ভাদ্র ১৩০৭ (পৃষ্ঠা ৩৯৫—৪২১)

সূচী: হিন্দু-সভা (পূর্বানুবৃত্তি)—(পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ লিখিত)

রামকৃষ্ণ মিশন

পরলোকবাদ (স্বামী সারদানন্দ লিখিত)

আজিকার কথা বলিব না,—জগতের অন্যান্য সভ্যদেশবাসী যে সময় সহজ অজ্ঞানান্ধকারে পতিত হইয়া, ব্যাঘ্র ভল্লুকের ন্যায় বনে বনে বিচরণ করিত, সেই প্রাচীনতম কালে, এই ভারতের বিজ্ঞানসম্পন্ন মণীষিগণ, এই হিন্দুধর্ম্মের প্রতি কি প্রকারভাবে দৃষ্টিপাত করিতেন, এবং ইহার উপর কি প্রকার অভিমত প্রকাশ করিতেন, তাহা জানিতে কাহার উৎসুকতা না হয়?

বৈশেষিকদর্শনসূত্রপ্রণেতা মহামুনি কণাদ হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে—

"যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিঃ সধর্ম্মঃ।"

পরমাণুবাদের ন্যায় দুরবগাহ গম্ভীর দার্শনিক সিদ্ধান্তের অতুলনীয় ব্যবস্থাপয়িতা প্রাচীনতম মুনিকণাদের মুখে হিন্দুধর্ম্মের যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, সে কালের মনীষিবৃন্দের নিকট, এই হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় সর্ব্বসিদ্ধিকর উপায় হিন্দুর পক্ষে অপর আর কিছুই হইতে পারে না। এই কণাদসূত্রের ভাবার্থ এই হইতেছে যে,—অধিকারানুসারে অনুষ্ঠিত হইলে, যে উপায়ের দ্বারা আমরা সংসারে সকল প্রকার অভ্যুদয় এবং নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারি, তাহাই ধর্ম্ম। এই অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির একমাত্র সাধন হিন্দুর ধর্ম্ম জানিবার জন্য, কোন্ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাই বুঝাইবার জন্য মহর্ষি জৈমিনি মীমাংসাদর্শন প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রথমেই প্রকাশ করিয়াছেন যে—

"চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ।"

অর্থাৎ এই চতুর্ব্বর্গসাধন ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব জানিতে হইলে, বেদরূপ প্রমাণের উপর একান্ত নির্ভর করিতে হইবে। নব্যশিক্ষিতাভিমানী, পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের তীব্র আলোকচ্ছটায় উদ্‌ভ্রান্ত-প্রকৃতি যুবকের নেত্রে, পশ্চিমদেশীয় সুচতুর ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ, নবনির্ম্মিত বিচিত্র ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে ঋগ্‌বেদ-সংহিতার শব্দগুলির নূতন ছাঁচের অর্থ করিয়া, বৈদিক মন্ত্রগুলিকে প্রাচীন হিন্দু-কৃষকগণের হৃদয়ের অকপট সারল্যব্যঞ্জক হলচালনার গীতি বলিয়া ঘোষণা করত, ধর্ম্মবিশ্বাসের আবরণকে যত পারেন নিবিড়তর করুন না; কিন্তু, হিন্দুর বেদ যাঁহারা জানিতেন, বেদের মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য যাবজ্জীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যই যাঁহাদের আদরণীয় ব্রত ছিল, তাঁহারা এই সনাতন ধর্ম্মের মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া, সেই অনাদি অনন্ত সর্ব্বজ্ঞানের আধার বেদকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান প্রদর্শন করিতেন; এবং বেদের তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য সকলপ্রকার বিষয় বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া, নির্জ্জন অরণ্যে বসিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভের প্রত্যাশায় জীবন অতিবাহিত করিতেন; এই ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করিবার শক্তি যে কাহারও নাই, এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারি।

পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তে, যাহা আর্য্যকৃষকের গান ছাড়া আর কিছুই নহে, সেই বেদের পরিচয় আমরা বৈদিক ঋষিগণের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহা এ ক্ষেত্রে না শুনাইয়া আমি থাকিতে পারিতেছি না। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায় যে—

কার্ত্তিক, ১৩৯১ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সঃ

(ফাল্গুন, ১৩৯১, পৃঃ ১২১)

[পুনর্ম্মুদ্রণ]

"স ঐক্ষত প্রজাপতিঃ ত্রয্যাংবাব বিদ্যায়াং সর্ব্বাণি ভূতানি হন্ত ত্রয়ী মেব বিদ্যাং আত্মানমভিসংস্করবা ইতি।"

ইহার তাৎপর্য্য এই হইতেছে যে, সেই প্রজাপতি দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, ঋক্ যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়বিদ্যার উপর সকল জীবগণের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিতেছে ; ইহা বুঝিয়া তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, আমি আত্মার সংস্কারসাধনের জন্য এই ত্রয়ীবিদ্যাকেই অবলম্বন করিব। এই ত্রয়ীবিদ্যা কোথা হইতে এ জগতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার উত্তর বেদই আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে যে—

"অস্য বৈ মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিত মেতৎ ঋগ্‌বেদঃ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদশ্চেতি।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সেই এই আদি পুরুষ বিরাটের নিশ্বাসের সহিত, এই সনাতন বেদচতুষ্টয় এই পৃথিবীতে প্রকাশিত হইয়াছে। একমাত্র বেদরূপ মহামূলের অবলম্বনেই যে, এই বিরাটবৎ বিশ্বতোমুখ সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বিরাজমান আছে, তাহা আমরা ধর্ম্মসংহিতার ঋষিগণের নিকটেও সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারি। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন যে—

"বেদোঽখিলোধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলেচ তদ্বিদাম্।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেবচ ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সমগ্র বেদই ধর্ম্মে প্রমাণ। অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবার একমাত্র প্রধান বর্ত্ম—বেদ। বেদ—আদি ও অন্ত রহিত, অসংখ্য শাখায় প্রবিভক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত প্রভৃতি দুরবগাহ গভীর বিষয় পরিপূর্ণ অঙ্গনিচয় পরিপুষ্ট ; মানবজাতির মধ্যে প্রচলিত যাবতীয় ধর্ম্ম পুস্তকের প্রপিতামহস্থানীয়, প্রজাপতির বহুবর্ষব্যাপি-তপস্যার বলে জগতে প্রকাশিত বেদই, এই সর্ব্বপ্রকারে অলৌকিক সর্ব্বাশ্চর্য্যময় ও সর্ব্বসুখনিদান হিন্দুর ধর্ম্মের একমাত্র মূল। সেই বেদ, রীতিমত আচার্য্যের নিকট অধ্যয়ন করিয়া দীর্ঘকাল আদরনিরন্তরসৎকারপূর্ব্বক অনুশীলন করিয়া, যাঁহারা বেদের মর্ম্মার্থ অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই সকল মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণের প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র, এবং তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে অভ্যন্তরীণ স্বভাবও অনেক স্থলে হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণরূপ পরিগৃহীত হয়। রাগ্‌দ্বেষবর্জ্জিত বেদার্থানুষ্ঠায়ী সাধুগণের আচারও কোন কোন স্থলে ধর্ম্মের প্রমাণ হইতে পারে। গৌতম বলিয়াছেন যে—

"বেদোধর্ম্মমূলং তদ্বিদাঞ্চ স্মৃতিশীলে।"

কালবশে বেদের বহুতর শাখা লুপ্ত হওয়া নিবন্ধন, অনেক প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে সাক্ষাৎ প্রমাণস্বরূপ বেদ যে স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় না, এই রূপ স্থলে মন্বাদিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির সাহায্য অবলম্বন করিয়া, ধর্ম্মের তত্ত্ব নিশ্চয় করিতে হইবে। অধুনা এই ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্ম নানা সম্প্রদায় ভেদে নানা আকারে পরিদৃশ্যমান হইলেও, বাস্তব পক্ষে সকলপ্রকার সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের মূলে বেদের প্রামাণ্য সর্ব্বপ্রকারে অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজমান আছে। এবং সেই বেদেরই তাৎপর্য্য প্রকাশের জন্য বিরচিত মন্বাদিধর্ম্মশাস্ত্র এবং ব্যাসাদিপ্রণীত পুরাণাদি শাস্ত্রও যে, সকল সম্প্রদায়ের উপজীব্য, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই।

(৮৭তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১৩০)

যদিচ হিন্দুর যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানই বেদমূলক, তাহা হইলেও ঐ সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে পরস্পর আপেক্ষিক বৈলক্ষণ্য থাকা নিবন্ধন, উহাদের মধ্যে অবান্তর বিভাগ আসিয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মকে চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যেমন, শ্রৌতধর্ম্ম, স্মার্ত্তধর্ম্ম, পৌরাণিকধর্ম্ম এবং তান্ত্রিকধর্ম্ম। এখন প্রচলিত কোন বেদাংশে যে সকল অনুষ্ঠানগুলির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই শ্রৌতধর্ম্ম কহা যায়। অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি যাগ ও উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কারকে শ্রৌতধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। তর্পণ, শ্রাদ্ধ, অতিথিসৎকার, বলিবৈশ্বদেব প্রভৃতি ক্রিয়ানিচয়কে স্মার্ত্তধর্ম্ম কহা যায়। দুর্গোৎসব, তীর্থযাত্রা, গয়াশ্রাদ্ধ, মঠাদি-প্রতিষ্ঠা, দেবতা স্থাপন প্রভৃতি অনুষ্ঠানকে পৌরাণিকধর্ম্ম বলা যায়। পুরশ্চরণ, অভিষেক, দীক্ষা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, প্রভৃতিকে তান্ত্রিকধর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এ প্রকারে চতুর্দ্ধা প্রবিভক্ত হিন্দুধর্ম্মের সংরক্ষণের একমাত্র প্রধান উপায়—বর্ণাশ্রমাচার-সংরক্ষণ। বর্ণ ও আশ্রম বিহিত সদাচারের সম্যক্ অনুশীলন ব্যতিরেকে, হিন্দুধর্ম্ম ঈপ্সিত ফলদানে অসমর্থ হইয়া পড়ে। মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন যে—

"আচারঃ পরমোধর্ম্মঃ সর্ব্বেষামিতিনিশ্চয়ঃ।
হীনাচারপরীতাত্মা প্রেত্য চেহ বিনশ্যতি॥
নৈনং তপাংসি ন ব্রহ্ম নাগ্নিহোত্রং ন দক্ষিণা।
হীনাচারাশ্রিতং ভ্রষ্টং তারয়ন্তি কথঞ্চন॥"

এই সকল প্রাচীন দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষিবৃন্দের অভিপ্রায়ের প্রতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, হিন্দুধর্ম্মের সংরক্ষণ একমাত্র সদাচারের অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করিতেছে। বর্ত্তমান ভারতের হিন্দুসন্তানের এই পুনরুজ্জীবনোন্মুখ ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসদাচারসমূহের উপদেশ প্রতিপালন ও সংবর্দ্ধন বিষয়ে, এই হিন্দুধর্ম্ম সভার আন্তরিক চেষ্টা কোন সময় যাহাতে শৈথিল্য না পায়, সেই জন্য আমাদিগকে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিতে হইবে।

এই "হিন্দু-সভার" পরিচালনাবিষয়ে নিয়মপ্রণালী বিশেষরূপে এখনও প্রকাশিত না হইলেও, ইহার সামান্যভাবে লক্ষ্যনির্দ্দেশ যে প্রকার করা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া সাধারণ হিন্দুমাত্রেই সন্তোষ অনুভব করিবেন—ইহা আমার দৃঢ় ধারণা। একেবারে এই সকল গুরুতর কার্য্যের অনুষ্ঠান আপাততঃ এই সভাদ্বারা সম্পাদিত হইবে, এই প্রকার আশা আমাদের হৃদয়ে এইক্ষণে উদিত না হইলেও, কালে এই সভা নিজ গন্তব্য পথে অনায়াসে অগ্রসর হইয়া, শ্রৌত, স্মার্ত্ত, পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক এই চতুর্ব্বিধ হিন্দুধর্ম্মের সংরক্ষণের অনুকূল বল সঞ্চয় করিয়া হিন্দুহৃদয়ের অনেক বিলুপ্তপ্রায় আশানিচয়কে যে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিবে, এ প্রকার আশা যে নিতান্ত অসমীচীন, ইহা আমার বোধ হয় না। আমার বিবেচনায় হিন্দুধর্ম্মের সংরক্ষণের উদ্দেশে অদ্যাবধি যত সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সর্ব্বাপেক্ষা এই হিন্দুসভার সৌভাগ্য অধিকতর, তাহা নিঃসন্দেহ। আমাদের দেশের সুযোগ্য নেতা, ব্রাহ্মণকুলচূড়ামণি, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, এবং সম্পদে কুবের সদৃশ, পরম উৎসাহী মহারাজ মিথিলেশকে, উৎসাহসহকারে এই সভার সভাপতিপদ গ্রহণ করিতে দেখিয়া, বল দেখি কোন্ হিন্দুসন্তানের হৃদয় আজ গৌরবের উল্লাসে পরিপূরিত না হয়? ভারতবর্ষের রাজধানীতে

(ফাল্গুন, ১৩১১, পৃঃ ১০১)

গণ্যমান্য শিক্ষিত ধনী হিন্দুসন্তানগণের জাতীয় ধর্ম্মের সংরক্ষণের জন্য, মহারাজ মিথিলেশকে অগ্রসর করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণের এই প্রথম দিন স্মরণ করিয়া, কে বলিতে পারে, যে ভবিষ্যৎ হিন্দুসন্তানগণ ইতিহাসের পবিত্র পৃষ্ঠে এই দিনটীকে জাতীয় অভ্যুদয়ের প্রথম উদ্বোধনের দিন বলিয়া আন্তরিক সম্মান করিবে না?

আসামের কথা।

[বাবু প্রবোধচন্দ্র দে লিখিত। পৃষ্ঠা ৪০০ থেকে ৪০৭ পর্যন্ত।—বর্তমান সম্পাদক।]

রামকৃষ্ণ মিশন।

রামকৃষ্ণ মিশন-ভুক্ত কিষণগড়-অনাথাশ্রমের মার্চ্চ মাস অবধি আয়-ব্যয়-তালিকা পূর্ব্বে সাধারণসমক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে, উক্ত আশ্রমের ও খাণ্ডোয়া আশ্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং এপ্রিল ও মে মাসের মোট আয়-ব্যয় জানাইতেছি।—

বিগত মে মাস হইতে, মধ্য-প্রদেশান্তর্গত খাণ্ডোয়া নামক স্থানে আর একটি দুর্ভিক্ষমোচন-আশ্রম খোলা হইয়াছে। তাহারও মোট আয়-ব্যয় এই সঙ্গে প্রদত্ত হইল।

উক্ত দুই স্থানে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কিছুমাত্র না কমিয়া, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কিষণগড়ের অনাথ বালক-বালিকার সংখ্যা এখন ১২৫। খাণ্ডোয়াতে ১৮৫ জন সাহায্য পাইতেছে। দুই স্থানেই অতিশয় জলকষ্ট এবং বৃষ্টির নাম গন্ধ পর্য্যন্ত এখনও নাই।

কিষণগড়ের অনাথাশ্রম ও খাণ্ডোয়া দুর্ভিক্ষমোচনাশ্রমের কার্য্যের নিমিত্ত যাঁহারা দয়াপরবশ হইয়া গত এপ্রিল ও মে মাসে আমাদিগকে সাহায্য করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ধাম ও প্রেরিত সাহায্য ইতিপূর্ব্বেই ইণ্ডিয়ান্ মিরার পত্রিকায় স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব তাহার আর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কেবল হালিসহরস্থ জনৈক বন্ধু "এক দীন-ব্যক্তি প্রেরিত" বলিয়া ৫৲ টাকা প্রেরণ করেন। উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতে ভুল হইয়াছিল। তজ্জন্য এই সূত্রে উহা ধন্যবাদের সহিত স্বীকার করিতেছি। জুন মাসের সাহায্যকারীদের নাম ধাম পরে প্রকাশিত হইবে। জয়পুরের রেসিডেণ্ট মিঃ জি, আর, আরউইন মহোদয় কিষণগড় আশ্রমের সাহায্যার্থ এককালে ১০০০৲ টাকা প্রেরণ করিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দেখিয়া অনুমান হয়—আগামী নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত উক্তস্থানে আশ্রম রাখিতেই হইবে, এবং উক্ত সাহায্য না পাইলে বোধ হয় এত দিন আশ্রম রাখা অর্থাভাবে দুষ্কর হইয়া উঠিত।

কিষণগড় অনাথাশ্রম

গত এপ্রিল ও মে মাসের মোট আয়—	৮১৫।০
" " " " " " ব্যয়—	৭৩৭॥৵০
হস্তে বাকি—	৭৭॥৶০

(৮৭তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ১০২

খাণ্ডোয়া-দুর্ভিক্ষ মোচনাশ্রম

গত মে মাসের মোট আয়—　　৬৪৩৷৷০

" " " " ব্যয়—　　১৭২/১০

হস্তে বাকি　　৪৭১৷৶১০

আয়-ব্যয়ের সবিশেষ বিবরণ বসুমতী, প্রতিবাসী, ইণ্ডিয়ান মিরার প্রভৃতি সংবাদ-পত্রাদিতে এবং পৃথক প্যাম্‌ফ্লেট আকারে, ছাপা হইয়া থাকে।

স্থানীয় কমিশনার সাহেবের পরামর্শে শীঘ্রই ৩০০৲ টাকার কাপড় গরিবদিগকে প্রদত্ত হইবে।

মঠ,
বেলুড়, হাওড়া
২. ৬. ০০.　　　　(স্বাক্ষর) সারদানন্দ।

সমালোচনা।

[ঋষি। মাসিক পত্র। আয়ুর্ব্বেদ ও ধর্ম্মবিষয়ক। ১ম বর্ষ, ৯ম ও ১১শ সংখ্যা।—বর্তমান সম্পাদক।]

ভগবদ্‌গীতা-শঙ্করভাষ্যানুবাদ।

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত)

[গীতার ৩য় অধ্যায়ের ৩৩—৪০ সংখ্যক শ্লোকের মূল, অন্বয়, মূলের অনুবাদ, ভাষ্য ও ভাষ্যের অনুবাদ এবং ৪১ সংখ্যক শ্লোকের মূল, অন্বয়, মূলের অনুবাদ ও ভাষ্যের অনুবাদের প্রথমাংশ।—বর্তমান সম্পাদক।]

উদ্বোধন

২য় বর্ষ।]　　১৫ই ভাদ্র।　　(১৩০৭ সাল)　　[১৪শ সংখ্যা

পরলোকবাদ।

(স্বামী সারদানন্দ লিখিত।)

অনন্তকাল জগৎ সংসার সৃষ্ট হইয়াছে। অনন্তকাল ইহা ক্রমবিকাশ ও অন্তর্লীনতার তরঙ্গ-ভঙ্গে স্পন্দিত হইয়া সিন্ধুবিচারী ফেনরাশির ন্যায় কখন প্রসারিত, কখন বা আকুঞ্চিত হইতেছে। কিরূপে, কোথায়, কি উদ্দেশ্যে ধাবিত?—কে বলিতে পারে! আস্তিক্য, নাস্তিক্য উভয় বুদ্ধিই স্তম্ভিত। বিজ্ঞানের উন্নত শীর্ষ দেশকালের স্তরে স্তরে অনন্ত বিচিত্রতা দেখিয়া মুগ্ধ ও অবনত। কিন্তু অন্তর্নিহিত, মানবের অদম্য, অজ্ঞাত শক্তি ও কার্য্যকারণের সূত্র ধরিয়া জল্পনা করিতে ক্ষান্ত হয় না—প্রত্যক্ষ ও অনুমান সহায়ে ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে, উর্দ্ধমূল সংসারাশ্বত্থের অন্তস্তল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

মনুষ্যভিন্ন দেবসমাজে এ চিরজল্পনা প্রসিদ্ধ কি? 'জানিবার অধিকার নাই—তবে পৃথিবীগত

(ফাল্গুন, ১৩১১, পৃঃ ১০০)

কার্য্যকলাপ ও জীবশ্রেণী এক নিয়মে, এক প্রথায় নিবদ্ধ দেখিয়া কল্পনাসহায়ে এই প্রথার প্রকারান্তর সেখানেও অনুমান করিতে পার—ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। অথবা যদি যোগসহায়ে তোমার দৃষ্টি নিবিড় ইন্দ্রিয়বন্ধন অতিক্রম করিয়া সৃষ্টির উচ্চ স্তরে উঠিতে সমর্থ হইয়া থাকে, তবে নিজেই কিঞ্চিৎ জানিতে ও বুঝিতে পারিবে—কিন্তু সেই জ্ঞানালোক কামকাঞ্চনময়ী পৃথিবীনিবদ্ধদৃষ্টির পক্ষে অত্যধিক হওয়ায় সাধারণ মানবের নিকট দুর্ভেদ্য নিশার ন্যায় প্রতীয়মান হইবে।

বেদ পুরাণ ও ইতিহাস সহায়ে কালের নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া মানব-সৃষ্টির যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি করি, ততদূর কতই না এ বিষয়ে যুক্তিজল্পনা ধ্যান দেখিতে পাই! দর্শনালোকের আদি পিতা সাংখ্য বলিলেন—ভ্রমমুগ্ধ চেতন পুরুষের মুক্তস্বভাব অনুভব করাইবার নিমিত্তই জড়া প্রকৃতির এ বিচিত্র উদ্যম। যতদিন না চেতন, জড় ও জড়ধর্ম্ম হইতে আপনাকে নিত্যভিন্ন বলিয়া জানিতে পারিবে, ততদিন এ সংসার তরঙ্গের আক্রমণ হইতে শান্তিলাভ অসম্ভব। যোগাচার্য্য মহামুনি পতঞ্জলিও প্রায় একথায় সম্পূর্ণ সায় দিয়া, সমাধিলাভে কি প্রকারে মানব এই জন্মজরাগ্রস্ত সংসারের পরপারে উপনীত হইতে পারে, তাহার উপায় প্রচারে নিযুক্ত হইলেন। আচার্য্য-পাদ ব্যাস এবং শঙ্কর প্রভৃতি আবার জগতের অন্তস্তলে ইচ্ছাময় মহান্ পুরুষের লীলাবিলাস দেখিয়া 'তাঁহাতেই সব এবং তিনিই সব' এই মতে বেদান্ত প্রচার করিলেন। বলিবার, লিখিবার সময় বিশেষ বিশেষ পুরুষেরই নামোল্লেখ হয়। তাঁহাদেরই চিন্তাসকল কালের প্রবল আঘাতে বহুকাল অবিকম্পিত থাকিয়া ভূমধ্যস্থ স্তরসমূহের ন্যায় তৎকালীন মানবমনের গঠনেতিহাস সপ্রমাণ করে। নতুবা অবতার, সিদ্ধপুরুষ, আচার্য্য প্রভৃতির মত ভিন্ন এ বিষয়ে আরও কত মতামত বুদ্বুদ-রাশির ন্যায় কিছুকাল ক্রীড়া করিয়া, অনন্ত মনে লীন হইয়াছে, তাহার নির্ণয় কে করিতে পারে?

সর্ব্বোপনিষৎ মন্থন করিয়া পুরাণকার গাহিলেন, 'জন্মিলে মৃত্যু অনিবার্য্য এবং মরিলে আবার জন্ম সুনিশ্চয়।' অর্দ্ধেকটা মানুষ নিঃসন্দেহে বুঝে—'অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।' কিন্তু অপরার্দ্ধটা বোঝাই গেল। মানুষ মরিলে কি আবার কিছু থাকে? পরলোক কি বাস্তবিক কল্পনারাজ্যের ছায়াময় কুসুম নহে? চিরকাল ব্যাপিয়া মানুষের এই সন্দেহস্রোত প্রবাহিত। বেদেও পড়িয়া দেখি, "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা—অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে"—এই যে মৃত্যুর পর সন্দেহ উপস্থিত হয় কেহ বলে মানুষ থাকে, কেহ বলে আদৌ থাকে না।—দর্শনসমূহ তো এই পরকালাস্তিত্বই সপ্রমাণে বদ্ধপরিকর। পুরাণ, ইতিহাস এবং বর্ত্তমান বিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যাসকলও মুখ্য বা গৌণভাবে এই বিষয় মীমাংসায় প্রযত্নশীল। বাস্তবিক ঈশ্বরবিশ্বাস যেমন মানবমনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিবার এক প্রধান উপায়, তেমনি পরলোকবিশ্বাসও নিঃসন্দেহে অপর এক উপায়।

কোথা হইতে এ বিশ্বাসের বীজ মানবমনে প্রবিষ্ট হইল? কোথা হইতে সে এই সন্তঃ-অনুভূত আপাতসুখজগতের রূপরসাদির মোহস্পর্শ হইতে ধীরে ধীরে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, পরকালের সুখের জন্য সংযম, স্বার্থত্যাগ, তপস্যাদি ক্লেশকর উপায় সকল উদ্ভাবন করিল? কে শিখাইল? কে বলিতে পারে! কোন বিষয়ের শেষ কারণ স্পর্শ করিতে মানবমন এ পর্য্যন্ত পারে নাই এবং মনের গঠন এবং প্রচারাদি অনুধ্যান করিলে, কখন পারিবে কিনা, এ বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। আকাশাদি সূক্ষ্ম জড় হইতেও সূক্ষ্মতর জড় পদার্থে মন বা অন্তরেন্দ্রিয়ের গঠন;

প্রত্যেক জড়সমষ্টির ন্যায় ইহারও প্রচার দেশকালসীমাবদ্ধ। অতএব দেশকালের অতীত বস্তুকে ইহা কখনও সম্পূর্ণায়ত্ত করিতে পারিবে না। ব্রহ্ম, ঈশ্বর, আদিকারণ, এক হইয়াও অদ্ভুতবিচিত্রতা-প্রসবিণী মায়া এ সকল দেশকালের সীমা অতিক্রম করিয়া বহুদূরে অবস্থিত। অতএব মনের জ্ঞেয় নহে। মনের এই প্রকার সসীম গঠন না জানাতেই, লোকের শাস্ত্র বুঝিবার বড় গোলযোগ হয়। ভাসা ভাসা শাস্ত্রজ্ঞান লইয়া, অনেকে বলেন শুনিতে পাই—"বেদবেদান্তেও গলদ্ রহিয়াছে। ব্রহ্মকে নির্গুণ স্থির করা হইয়াছে, আবার বলা হইয়াছে 'স ঐক্ষত একোঽহং বহুস্যাম্ প্রজায়েয়'—তিনি জগৎ-সৃষ্টির জন্য অনুধ্যান করিলেন—এক আমি বহুরূপে বিভক্ত হইব। ইহা কি বিরুদ্ধ কল্পনা নহে? এক পদার্থ দুই স্বভাব বিশিষ্ট হয় কি করিয়া? তাহার পর মায়া তাঁর শক্তি, অথচ উহা সৎও নয়, অসৎও নয়, তাঁহা হইতে ভিন্নও নয়, অভিন্নও নয়—এ আবার কি কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার?" না—উহা বিরুদ্ধ কল্পনা নহে। এই যে চিৎ এবং জড়ের বিচিত্র বন্ধন, যাহা সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, উচ্চ নীচ, প্রভৃতি বিচিত্র সৃষ্টি প্রসব করিতেছে, তাহার কারণ দেশকালের পারে বর্ত্তমান, অতএব বাক্যমনের অগোচর এবং অনন্ত। মন তাহাকে কখনই ধরিতে পারিবে না, কারণ সসীম। কিন্তু এই কারণধারার মূলও সেখানে, ইহা সুনিশ্চিত। এই জন্যই শাস্ত্র জগৎ-কারণকে নেতি নেতি, যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, চিন্তা করিতেছি, তাহা নয়, তাহারও পারে—বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াও, আবার 'তিনিই জগৎ-কারণ' এই তত্ত্বটি বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, "তিনি সৃষ্টির অনুধ্যান করিলেন।" এইরূপ মায়ার সম্বন্ধেও 'শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ', বলিয়া, আবার শক্তিমান্ হইতে উহাকে কিছু পৃথক্‌ভাবে বুঝিতে বলিলেন। নতুবা অনন্তে সান্তত্ব, পূর্ণস্বরূপে অপূর্ণতা পক্ষপাতিতা এবং নিষ্ঠুরতাদি দোষস্বীকার অনিবার্য্য হয়। সকল দেশেই মনীষী লোকেরা দেখিয়াছেন যে, জগৎ-কারণে এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম আরোপ করা হইয়াই পড়ে। ইহা জগৎ-কারণের দোষ বা স্বরূপ নহে, কিন্তু যে যন্ত্রসহায়ে তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি, সেই মনেরই গঠন ও প্রচারপ্রণালী অনুসারে আসিয়া পড়ে। মোট কথা, সংসারের কারণ-অনুসন্ধায়ীকে মন দেশকালের পারের দিকে নিয়ত অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে—কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত,—সে কারণের স্বরূপ কি, তাহা কখন বলিতে পারে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদোক্ত মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে এবং ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সারের রচিত "দর্শনের প্রথমতত্ত্ব" (**First Principles**) নামক পুস্তকের 'অজ্ঞেয় ভাগে' (**unknowable**) এ বিষয়টীর বড় সুন্দর মীমাংসা ও যুক্তি প্রদর্শিত আছে।

আধুনিক পণ্ডিতগণ যুক্তিগবেষণা সহায়ে এ চিরপ্রবাহী বিশ্বাস-নদীর উৎপত্তিস্থান বলিয়া তিনটী শৃঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ বলেন:—জন্মাবধি মানব কার্য্যকারণশৃঙ্খলেই জগৎ নিবদ্ধ প্রত্যক্ষ করিতেছে। এই বর্ণমালাতেই সে অদ্ভুতছন্দোবন্ধনিবদ্ধ আদিকবির প্রকৃতিপুস্তক পাঠের একমাত্র ধ্রুব উপায় দেখিতে পাইয়াছে। থাকিতে পারে আর কোন উপায়—উহা তাহার আয়ত্তাধীন নহে। মানব মানবিক ভাবেই জগৎ দেখিবে, শুনিবে, অনুভব করিবে। আপন মনঃ-প্রচারের সহিতই তাহার চিরনৈকট্যসম্বন্ধ এবং ভিতরে সে যাহা অনুভব করে, তাহাই বাহিরে আরোপ করিয়া থাকে। বাহিরের অজ্ঞেয় জগৎ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাহার মনে আঘাত করিয়া যে

(ফাল্গুন, ১৩১১, পৃঃ ১০৬)

ভিন্ন ভিন্ন মানসিক স্পন্দন বা তরঙ্গ উত্থাপিত করে, তাহাই সে প্রত্যক্ষ অনুভব করে এবং তাহা হইতেই, সে দেশ, কাল, নিয়ম (Law), নাম, রূপ প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া থাকে। এককালীন উত্থিত ভিন্ন ভিন্ন ভাব সকল পরস্পর যে সম্বন্ধে অবস্থিত, তাহাই দেশ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতীত ও আগামী ভাব সকল স্মৃতি ও প্রত্যক্ষে যে ভাবে গৃহীত ও সম্বন্ধযুক্ত হয়, তাহাই কাল বলিয়া অনুভূত এবং ভিন্ন ভিন্ন ঘটনাসমূহ মন যে ভাবে শ্রেণী ও প্রণালীবদ্ধ করে, তাহাই নিয়ম বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। এইরূপে ভিতরের অন্যান্য ভাব সকলও বাহিরে আরোপিত হইয়া নামরূপাদির প্রত্যক্ষ করায়। পদার্থসমূহ সূর্য্যরশ্মির অন্যান্য সকলকে গ্রাস করিয়া কোন এক বিশেষ রশ্মির প্রতিভাস দ্বারা যে মানসিক তরঙ্গের উত্থান করে, তাহাই বহির্জগতে পদার্থের রূপবিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়, ইহা বিজ্ঞান প্রসিদ্ধ। এইরূপে আবার ভিতরের চেতনত্ব, ব্যক্তিত্ব এবং ইচ্ছাশক্তির অনুভবও ব্যক্তিগতজ্ঞানের তারতম্য অনুসারে অল্প বা অধিক পরিমাণে জাগতিক জড় শক্তির বিকাশসমূহে আমরা আরোপিত করিয়া থাকি। মনুষ্যভিন্ন গো অশ্বাদি প্রাণিসমূহে এবং মনুষ্যগত বালক এবং অজ্ঞেতেই ইহা বিশেষ লক্ষিত হয়। পথিমধ্যে কোন অদৃষ্ট বা অল্পদৃষ্ট জড়পদার্থের স্থিতি বা গতি দেখিয়া ঘোড়া ভড়কাইয়া থাকে। নবাবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক-শকটের (Motor car) গতি দেখিয়া, অনেক ঘোড়া গাড়ি ভাঙ্গিয়া ছুটাছুটি করে। দ্রুতপদসঞ্চারী বাষ্পীয় শকটের নবাবির্ভাবে ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে অজ্ঞ গ্রামবাসিগণের দেবতাবিশেষ জ্ঞানে পুষ্প চন্দন সিন্দূর নৈবেদ্যাদির দ্বারা ষোড়শোপচারে পূজাও প্রসিদ্ধ আছে। এইরূপে তুঙ্গশৃঙ্গ হিমালয়ে গিরিরাজ ও তৎপত্নী মেনকার, পর্ব্বতবিদারী বজ্রের পশ্চাতে গজারূঢ় ক্রোধকম্পিত বজ্রধরের, অজ্ঞাততল সমুদ্রমধ্যে অনন্তরত্নাকর বরুণদেবতার এবং পাপপ্রচারী মোহনকারী কামাদি মনঃশক্তির পশ্চাতে মায়াবী মার এবং সর্পাকৃতি শয়তানের কল্পনারোপ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে প্রসিদ্ধ।

স্ব স্ব ধর্ম্মে এইরূপ কল্পনাপ্রসূত দেবদেবীর উপাসনা ও পূজা-প্রচার দেখিয়া কাহারও লজ্জিত হইবার প্রয়োজন নাই। ধর্ম্মেতিহাস পর্য্যালোচনায় এইরূপ কল্পনা সকল ধর্ম্মভুক্তই দেখিতে পাওয়া যাইবে এবং এই সকল অপূর্ণমতের সাহায্যেই মানবমন ধর্ম্মের উচ্চতর স্তরসমূহে উত্থিত হইয়াছে দেখিয়া, উহাদিগকে মিথ্যা ভ্রমপ্রমাদ ইত্যাদি ঘৃণাসূচক শব্দে অভিহিত না করিয়া, বরং সত্যসোপানের নিম্নপদাবলী বলিয়া শ্রদ্ধাসহকারে তদনুশীলনে ধর্ম্মের আদি বিকাশ জানিতে প্রবৃত্তি হওয়াই উচিত। সত্যানুভবসম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সূত্রস্বরূপ বাক্যসকল অদ্ভুত আলোক ও উদারতা আনিয়া দেয়। সর্ব্বধর্ম্মের সাধনপ্রণালী যিনি গভীর শ্রদ্ধার সহিত নিজ জীবনে আলোচনা এবং অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই অমিততেজা আচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণের অতিবিরুদ্ধ ধর্ম্মমত সকলের সমন্বয়করী একটী কথাই ছিল—"তাও বটে—তাও বটে।" দেশকালের রাজত্বে মানুষ যত কিছু সত্য অনুভব করিয়াছে এবং করিবে, তাহার সমস্তগুলিই আংশিক সত্য বা অবস্থাবিশেষে অনুভূত সত্য। এবং সর্ব্বাবস্থায় সমভাবে অনুভূত যে সত্য, তাহা দেশকালাতীত। সেই ভূমা সত্য যাঁহারা একবার অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদের ভিতর আর বিরুদ্ধ মত থাকে না। এই কথাটীই তাঁহার সেই সুন্দর গ্রাম্য ভাষায় বলিতেন—'সেখানে সব শিয়ালের এক রা।'

(৮৭তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ১০৬)

৮৭তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　চৈত্র, ১৩৯১

শ্রীশ্রীমায়ের অপ্রকাশিত পত্র

(শ্রীযুক্ত মানদাশঙ্কর দাশগুপ্তকে লেখা)

৫ই চৈত্র, ১৩২৩

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্রখানা পাইয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইলাম। তোমার পত্রের দ্বারা আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। তোমার অসুখের কথা শুনিয়া আমি বড়ই ভাবিত আছি। তুমি ইচ্ছা করিলে দুর্গাপ্রসাদ সেনের নিকট হইতে ঐ রোগের জন্য ঔষধ নিয়া যাইতে পার কারণ তাহার ওষধের দ্বারা শ্রীমতী রাধু ভাল হইয়াছে। সদা সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে। কিছু দিন ধ্যান ধারণা একটু কম করিবে। তবে জপ সম্বন্ধে তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহা শুধু কমের পক্ষে ১০৮ বার [,] আর অতিরিক্ত যত করিতে পার ততই ভাল। যদি আমার ধ্যান করিতে তোমার বেশী ইচ্ছা হয় তবে তাহাই করিবে [,] কারণ আমি ও ঠাকুরে কোন পার্থক্য নাই [,] শুধু রূপের পার্থক্য। যিনি ঠাকুর তিনিই এই দেহে আছেন।…তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অটল ভক্তি বিশ্বাস লাভ কর।

ইতি আশীর্ব্বাদিকা

তোমার মা

পুনশ্চ :—ছেলেরা সকলে ঠাকুরের মঠ করিতেছে শুনিয়া সুখী হইলাম [।] তাহাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবে ও তোমরা সকলে লক্ষ্য রাখিবে তাঁহার অকলঙ্ক নামে কোন দুষ্ট লোক ঢুকিয়া কলঙ্ক না রটায়। ইতি—

কথাপ্রসঙ্গে

একটি জীবন : একটি প্রশস্তি

'আমরা শাস্ত্রে পড়ি, অতীন্দ্রিয় সমাধিভূমি হইতে যখন সাধক স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসেন তখন দ্বৈত জগতের জ্ঞান হইলেও উহার প্রতি তাঁহার আর কোন আসক্তি থাকে না, কেননা বিশ্বপ্রপঞ্চ যে মায়িক—এই বোধ তাঁহার পাকা হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যে কিয়ৎক্ষণ কাটাইলে উপরোক্ত অনুভূতিরই যেন একটা আভাস পাওয়া যাইত। নম্রতা, করুণা ও প্রেমের যিনি ছিলেন প্রতিকৃতি, দুঃখার্তকে দেখিয়া যাঁহার চোখে ফুটিয়া উঠিত অব্যক্ত মর্মযাতনা, যাঁহার ভালবাসা সাধু ও পতিতের পার্থক্য করিতে জানিত না ও যাঁহার অপরিমেয় প্রশান্ত পবিত্রতার প্রভাব ছিল দুরতিক্রম্য এমন একজনের কাছে বসিয়া থাকিতে পারিলে কী আনন্দ ও শান্তি! এই লোকোত্তর আধ্যাত্মিক শক্তির নিকট যাঁহারা স্থিরভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছেন যে, তাঁহাদের কঠিন জটিল ব্যাধি—বিষয়-ভোগ তৃষ্ণা—বহুল পরিমাণে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। ইন্দ্রিয়সুখ যেন বিস্বাদ মনে হইয়াছে—জীবন অতঃপর এক নিরুদ্দেশ যাত্রা না হইয়া একটি গভীর উদ্দেশ্য ও মূল্য বহন করিয়া আনিয়াছে। যে আত্মা নিদ্রায় অচেতন ছিল উহা যেন জাগিয়া উঠিয়া অনন্তের সুদূর অথচ সপ্রেম আহ্বান শুনিতে পাইয়াছে, শুনিয়া উহার নিকট পৌঁছিতে ব্যাকুল হইয়াছে। কী অদ্ভুত রূপান্তর!'

উৎকলিত কথাগুলি শ্রীশ্রীমায়ের উদ্দেশে লিখিত তাঁহারই এক প্রিয় সন্তানের প্রশস্তি, যাহা অন্তরের গভীরে চাপা একটি প্রস্রবণ হইতে স্বতঃ উৎসারিত। 'যে আত্মা নিদ্রায় অচেতন ছিল উহা যেন জাগিয়া উঠিয়া অনন্তের সুদূর অথচ সপ্রেম আহ্বান শুনিতে পাইয়াছে, শুনিয়া উহার নিকট পৌঁছিতে ব্যাকুল হইয়াছে'—ব্যক্ত হৃদয়-নির্ঝরের ইহাই সঠিক বর্ণনা—উৎস ও উদ্দেশ্যের অপূর্ব ব্যঞ্জনা—জগন্মাতা সারদার প্রকৃষ্টতম বন্দনা। না, কেবল তাহাই নহে! 'কী অদ্ভুত রূপান্তর', এই তিনটি মাত্র শব্দে এক আশ্চর্য আত্মচরিত কথাও অভিব্যক্ত হইয়াছে ঐ প্রশস্তিতে। প্রশস্তিকারের স্বীয় জীবনানুভূতিই উল্লিখিত কথাগুলিতে প্রস্ফুটিত হইয়া অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ইহাকে একটি সার্থক আত্মজীবনীর রূপ দিয়াছে। প্রশস্তি-প্রসঙ্গে যাহা বলিবার চেষ্টা হইয়াছে —তাহা বাস্তবিকই এক অনবদ্য 'অদ্ভুত রূপান্তর' কাহিনী। সেই 'রূপান্তর'-এর সাক্ষ্য প্রশস্তিকার স্বয়ং। শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতম বিশিষ্ট সন্তান স্বামী বীরেশ্বরানন্দ শ্রীশ্রীমাতৃ-প্রসঙ্গ করিতে গিয়া তাই একদা যাহা লিখিয়াছিলেন, উহা অত্যাশ্চর্য মাতৃ-বন্দনা হইলেও, লেখকের সংক্ষিপ্ত আত্মচরিত কথনও হইয়া পড়িয়াছে। আমরা দেখিয়াছি তাঁহার জীবনবৃত্ত—উক্ত মাতৃ-মহিমারই উজ্জ্বল প্রমাণ—কথিত অদ্ভুত রূপান্তরের একটি নীরব নজির। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘাধীশ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর প্রকৃষ্ট অথচ সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী আমরা তাঁহার উল্লিখিত মাতৃ-প্রশস্তির মাধ্যমেই জানিয়াছি।

রূপান্তর ঘটে পর্যায়ক্রমে—যেমন পাপড়ি একটির পর একটি মেলিতে মেলিতেই ফুলটি ফুটিয়া উঠে। অবশ্য প্রারম্ভিক কারণরূপে আলোক, শিশির ইত্যাদির আনুকূল্যও অবশ্যই থাকে। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ অক্টোবর কর্ণাটকের গুব্বুপুর শহরে মধ্যবিত্ত এক ব্রাহ্মণ-গৃহে যে শিশুটির জন্ম হইয়াছিল—সেই পাণ্ডুরঙ্গ প্রভুর জীবন-কুসুমের দলগুলিও বিকশিত হইয়াছিল ক্রমে ক্রমে—বিচিত্র কারণ পরম্পরায়, যাহা তাঁহাকে অবশেষে রূপান্তরিত করিয়াছে—বর্তমান বিশ্বের অন্যতম ধর্মগুরুরূপে—অসংখ্য জিজ্ঞাসুজনের পথের দিশারীরূপে—সংসার-তাপিত মানুষের সান্ত্বনাদাতা হিসাবে—অধ্যাত্ম-জীবনের উজ্জ্বল আদর্শ-মূর্তিতে। সদ্য-লোকান্তরিত স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর দীর্ঘ ত্রিনবতি বর্ষের জীবনধারা এক অত্যাশ্চর্য ভগবৎ-প্রশস্তিরই শারীররূপ। একটি কুসুম-কলিকে ফুটাইয়া তুলিতে অলক্ষ্য শিশিরকণাগুলি যেরূপ,—পাণ্ডুরঙ্গ প্রভুকে স্বামী বীরেশ্বরানন্দে পরিণত করিতেও সকলের অগোচরে বিচিত্র করুণার শিশিরবিন্দুগুলিও সেইরূপ ক্রিয়াশীল ছিল। শিশু পাণ্ডুরঙ্গের উপর স্বয়ং যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিপাতই সম্ভবতঃ প্রথম শিশিরবিন্দু যাহা তাঁহার জীবনের পাপড়িগুলিকে অভিসিঞ্চিত করিয়া ভাবী উন্মীলনে আনুকূল্য দিয়াছে। উত্তরকালে তাঁহাকে ঐ ঘটনা স্মরণ করাইলে, তিনি সহাস্যে উত্তর দিতেন: 'আমি স্বামীজীকে দেখেছি বলে আমার কোন ধারণা নেই। তবে স্বামীজী আমাকে দেখেছিলেন।' আধ্যাত্মিক তাৎপর্য-মণ্ডিত, অথচ প্রায়-অজ্ঞাত সেই ঘটনাটিকে স্মরণ না করিলে ইতিহাসের অমর্যাদা হইবে। উহা এইরূপ:

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরিতে স্বামীজী যখন মাদ্রাজের ক্যাসল্-কার্ণানে অবস্থান করিতেছেন, তখন পঞ্চম বর্ষীয় বালক পাণ্ডুরঙ্গ, তাঁহার চরণ-স্পর্শলাভে ধন্য হইয়াছিল। পিতার সহিত স্বামীজীর চরণ-কমলে উপনীত হইবার সেই গৌরব-স্মৃতি তিনি বড় হইয়া পিতৃমুখেই শুনিয়াছেন। আরও শুনিয়াছিলেন যে, স্বামীজী আদর করিয়া তাঁহার দুই কচি হাতে 'লজেন্স্' উপহারও দিয়াছিলেন। জগদ্‌গুরু বিবেকানন্দ বুঝি এইভাবেই তাঁহার অমোঘ সুমিষ্ট আশীর্বাদকে শিশু পাণ্ডুরঙ্গ প্রভুর কোমল করদ্বয়ে গচ্ছিত রাখিয়া দিয়াছিলেন,—যাহার সুস্পষ্ট ফলশ্রুতি ভাবীকালের প্রভু মহারাজের জীবনে জগৎ দেখিয়াছে—গুরুশক্তির আশ্চর্য প্রকাশের মধ্যে এবং ভক্তি-যোগ-জ্ঞান ও কর্মের সুষম বিকাশে।

সাংসারিক মাতা-পিতার স্নেহ পাণ্ডুরঙ্গ স্বল্পকালই লাভ করিয়াছেন—মাকে হারাইয়াছেন মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সেই, পিতৃবিয়োগ হইয়াছে—দশ বৎসর অতিক্রম করিবার পূর্বেই। মাতুল-গৃহে লালিত বালক নিজ মেধা ও শক্তিবলেই বর্ধিত হইতে থাকেন। ছাত্র হিসাবে মেধাবী বলিয়া পরিচিত পাণ্ডুরঙ্গ, কেবলমাত্র বিদ্যালয় বা কলেজের পাঠ্যবিষয়ের চতুঃসীমার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নাই—খেলাধূলা এবং পাঠ্য-বহির্ভূত পুস্তকাদি অধ্যয়নেও তাঁহার অসাধারণ উৎসাহ ও আগ্রহ তাঁহাকে তদানীন্তন ছাত্রসমাজে যথেষ্ট খ্যাতিমান করিয়া তুলিয়াছিল। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের ক্রিকেট দলে তিনি বিশিষ্ট প্রতিনিধি ছিলেন। কলেজের স্নাতক পর্যায় সমাপনান্তে যখন আইন পড়িতেছিলেন, বস্তুতঃ সেই কালেই তাঁহার জীবন-নাট্যের পটগুলি দ্রুত পরিবর্তিত হইতে থাকে। ইতঃপূর্বে উল্লিখিত 'রূপান্তর'-এর সূচনাপর্ব যেন জীবনের ঐ স্নাতকোত্তর পর্যায়টি। এই প্রসঙ্গে তাঁহার স্ব-মুখের স্মৃতিচারণ এইরূপ:

'বি. এ. পরীক্ষার পর ব্যাঙ্গালোরে এসেছি। তিন বন্ধু মিলে আমরা সন্ধ্যায় কানাড়া হাইস্কুলে টেনিস্ খেলতে যেতাম। একদিন টেনিস্ খেলে ফিরছি, বন্ধুদের মধ্যে একজন, পথে

তার কাকার বাড়িতে গেল কাকার লাইব্রেরী থেকে একটা বই আনতে। বইটা আমিই চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার সৌভাগ্যবশতঃ বইটা তখন লাইব্রেরীতে পাওয়া না যাওয়ায় বন্ধুটি অন্য একটি বই আমার জন্য নিয়ে আসে। বইটি হল স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজী রচনাবলীর প্রথম খণ্ড। ঐ বইটি আমি প্রথম দেখলাম এবং আমার ওটি পড়ার কোন আগ্রহও ছিল না। কিন্তু বন্ধুটি প্রায় জোর করেই বইটি আমাকে পড়াবার জন্য বার বার অনুরোধ করল। অগত্যা বইটি নিলাম। কিন্তু না পড়েই বাড়িতে রেখে দিলাম। এদিকে বন্ধুটিও নাছোড়বান্দা। রোজই আমাকে সে জিজ্ঞাসা করত বইটি পড়েছি কিনা। শেষে একদিন ওকে খুশী করার জন্যই বইটি খুললাম এবং পড়তে এত ভাল লাগল যে সবটাই পড়ে ফেললাম। বইটি পড়ে আগ্রহ এত বেড়ে গেল যে, আমি সোজাসুজি চিঠি লিখে বসলাম মায়াবতীতে। সেখান থেকে উত্তরও পেলাম। উত্তর দিলেন স্বামী প্রজ্ঞানন্দজী। তিনি তখন অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ। তিনি আমাকে মাদ্রাজ মঠের ঠিকানা দিয়ে সেখানকার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পরামর্শ দেন। কলেজে পড়ার সময় মাদ্রাজ মঠের কাছাকাছি থাকলেও মঠ সম্পর্কে কিছুই আমি তখন পর্যন্ত জানতাম না।'

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা ইহা। মাদ্রাজ মঠই হইয়াছিল তাঁহার পক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ-রাজ্যে প্রবেশের প্রথম তোরণদ্বার। মাদ্রাজ মঠের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী শর্বানন্দের সস্নেহ তত্ত্বাবধানে নবীন জিজ্ঞাসুর অন্তরে নব দিগন্তের আলোকরেখা ফুটিয়া উঠিতে থাকে। আইন অধ্যয়ন অসমাপ্ত রাখিয়াই যুবক পাণ্ডুরঙ্গ চিরতরে সংসার ত্যাগ করিয়া মাদ্রাজ মঠে আসিয়া যোগদান করেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম চব্বিশ বৎসর—খ্রীষ্টাব্দ ১৯১৬। অতঃপর শর্বানন্দজী তাঁহাকে বেলুড় মঠে প্রেরণ করেন। বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের মধ্যে সর্বাগ্রে সাক্ষাৎ হইয়াছিল মহাপুরুষ—স্বামী শিবানন্দজীর সঙ্গে। এতদিনে স্ব-স্থানে স্বকীয় পরিবেশে মুক্ত জীবনের আনন্দ-প্রবাহে আসিয়া পড়ায় নূতন প্রাণস্পন্দন অনুভব করিতে থাকিলেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণপরিকর-গণের অধিকাংশেরই স্নেহদৃষ্টি তাঁহার জীবনকে অসাধারণরূপে গড়িয়া তুলিতে প্রভূত সহায়তা করিয়াছিল,—বস্তুতঃ সেই প্রভাব-বিকিরণের সূচনা ঐ সময় হইতেই। শ্রীশ্রীমাতৃ-চরণ-সকাশে উপস্থিতির পুণ্য-সংযোগও এই কালেই। প্রেমানন্দজী মহারাজই তাঁহাকে জয়রামবাটিতে মাতৃ-সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে পরবর্তী কালে বলিতেন: 'যতদূর মনে পড়ে সেটা ছিল জুন মাস ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ। এক ভদ্রলোক জয়রামবাটী যাচ্ছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দজী আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। শ্রীশ্রীমাকে একখানা চিঠিও লিখে দিলেন তিনি। আমরা জয়রামবাটীর পথে বেরিয়ে পড়লাম।' তাঁহার স্মৃতিচারণা হইতে জানা যায় যে, ঐ-কালের দুর্গম যাত্রায় কলিকাতা হইতে জয়রামবাটী পৌঁছিতে অন্ততঃ তিনদিন লাগিত। আরামবাগ পর্যন্ত আসিয়া দ্বারকেশ্বর নদ—পারাপারের খেয়া না পাইয়া তাঁহাদিগকে ঐ নদের বালুকাময় তটে উন্মুক্ত আকাশের তলায় রাত্রিযাপন করিতে হইয়াছিল। রাত্রি ভোর হইলে দ্বারকেশ্বর পার হইয়া পদব্রজে প্রথমে কামারপুকুরে এবং সেখান হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শিবুদার সাহচর্যে জয়রামবাটীর পথে রওনা হইয়াছিলেন। অপরাহ্ণ চারটা নাগাদ তাঁহারা শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার এই কালের স্মৃতিপ্রসঙ্গ:

'মা তখন তাঁর "পুরানো বাড়িতে"।...মা বারান্দায় বসে রাত্রের রান্নার জন্য তরকারি কাটছেন।...আমরা মাকে প্রণাম করলাম। আমার সঙ্গী ভদ্রলোক মাকে স্বামী প্রেমানন্দজীর

চিঠির কথা বললেন। মা একজন ব্রহ্মচারীকে ডেকে বললেন চিঠিটা পড়ে শোনাতে। চিঠি পড়া হলে মা বললেন, "বেশ, কালই ওদের দীক্ষা হবে।" আমরা "নতুন বাড়ি"-র বৈঠকখানায় ফিরে এলাম।...পরদিন সকালবেলায় ঠাকুরের পূজা শেষ করে মা আমাদের এক-এক করে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। আমাদের দীক্ষা হয়ে গেল।'

এইভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ-কুলে তাঁহার দিব্য জন্মলাভ হইয়াছিল—জাতকের জীবনচক্রও নবীনতর গতিবেগ সহ আবর্তিত হইতে শুরু করিয়াছিল তখন হইতেই। জয়রামবাটীতে ঘনিষ্ঠ মাতৃ-সন্নিধি—শ্রীশ্রীমায়ের চরণ-ছায়ায় যে অনির্বচনীয় অনুভূতির স্বাদ, তাহাকে তিনি সারা জীবনের পাথেয় করিয়া লইয়াছিলেন। বুঝি-বা তাঁহার রচিত মাতৃ-প্রশস্তিতে সেই দিন-কয়টির স্মৃতিই প্রতিফলিত হইয়া থাকিবে। '...যাঁহার অপরিমেয় প্রশান্ত পবিত্রতার প্রভাব ছিল দুরতিক্রম্য এমন একজনের কাছে বসিয়া থাকিতে পারিলে কী আনন্দ ও শান্তি!' এই 'আনন্দ ও শান্তি' লইয়া তিনি ফিরিয়া আসিয়াছিলেন বেলুড় মঠে। অবশ্য অল্প কিছুদিন পরে তিনি পুনরায় মাদ্রাজ-মঠেই প্রেরিত হইয়াছিলেন—যেখানে নিজের স্বাধ্যায়-সাধন ইত্যাদি ছাড়াও ঠাকুর-সেবা হইতে আরম্ভ করিয়া মঠের যাবতীয় কর্মের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করিবার অপূর্ব সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন। তাঁহার নিজের ভাষায় 'জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবরকম কাজই করতে হত।' পাচকের অনুপস্থিতিতে রন্ধনশালার কর্মভারও যেমন লইতে হইয়াছে,—প্রকাশন বিভাগে 'প্যাকিং', হিসাব সংরক্ষণ,—গোশালায় গো-সেবা—সবজীক্ষেতের বা ফুল-বাগানের সর্ববিধ কার্যও তাঁহাকে একান্ত নিষ্ঠা লইয়া করিতে দেখা যাইত।

এই মাদ্রাজ-মঠেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের ঘনিষ্ঠ সেবার সৌভাগ্যও তাঁহার হইয়াছিল। রাজা মহারাজ তাঁহার প্রিয় সেবক প্রভুকে একদিন পরম আদরে কাছে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন— 'ওহে প্রভু! আমি তোমাকে সত্যি সত্যিই প্রভু করে গড়ে তুলব।' শ্রীশ্রীমহারাজ তাঁহার এই আশীর্বাদকে সত্যসত্যই কার্যকর করিয়াছিলেন,—শ্রীরামকৃষ্ণ-মহাসঙ্ঘের অধিনায়ক 'প্রভু মহা-রাজ'-কে দেখিয়া ভাবীকালের মানুষ তাহা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য – স্বামী মাধবানন্দ যখন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান সচিব এবং প্রভু মহারাজ তাঁহার অন্যতম সহকারী, সেইকালে মাধবানন্দজীকে অনেক সময়েই রহস্যচ্ছলে বলিতে শুনা যাইত: 'আমার দুই প্রভু। এক প্রভু মন্দিরে—আর একজন এই কাছে কাছেই।'

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাব-তিথিতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তরুণ পাণ্ডুরঙ্গকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন—নাম দিয়াছিলেন ব্রহ্মচারী সিদ্ধচৈতন্য। পরে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীবীরেশ্বর-বিবেকানন্দ-স্বামীজীর আবির্ভাব-তিথির পুণ্য ব্রাহ্মক্ষণে, ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে রাজা মহারাজই সিদ্ধচৈতন্যকে স্বামী বীরেশ্বরানন্দে রূপান্তরিত করেন,—তাঁহাকে সন্ন্যাস প্রদান করিয়াছিলেন। অতঃপর স্বামী বীরেশ্বরানন্দকে দেখা গিয়াছে সঙ্ঘের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে অথবা ব্যাপকতর সাধন-পরিমণ্ডলে। কিন্তু যেখানে যে-ভাবেই তিনি থাকিয়াছেন—সর্বাবস্থায় তাঁহার জীবনচর্যা ছিল একাধারে অতন্দ্র কর্মযোগীর, পরম নিষ্ঠাবান ভক্তের এবং বিচারপ্রবণ তত্ত্বান্বেষীর। ভুবনেশ্বরের পরে তাঁহাকে বেশ কিছুকাল থাকিতে হইয়াছিল বারাণসীতে—সেখানকার সেবাশ্রমে ও শ্রীরামকৃষ্ণ-অদ্বৈত আশ্রমে। বারাণসীর দিনগুলি তাঁহার কাছে আজীবনের পুণ্যস্মৃতি হইয়াছিল —কারণ সেখানেই তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দজীকে খুব নিকট সন্নিধিতে পাইয়াছিলেন। স্বামী

তুরীয়ানন্দের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে বীরেশ্বরানন্দকে উত্তর-জীবনেও আবেগে উদ্দীপিত হইতে দেখা যাইত।

শ্রীশ্রীমায়ের অন্তিম অসুস্থতার সংবাদ বীরেশ্বরানন্দকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছিল—কাশীধাম হইতে তিনি কলিকাতায় না আসিয়া পারেন নাই। শ্রীশ্রীমায়ের মহাসমাধি-কালের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা ছিলেন তিনি। বেলুড় মঠে জগন্মাতার পার্থিব শরীর অগ্নিতে আহুত হইবার কালের অলৌকিক ঘটনাবলী তিনি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন—সেই সব স্মৃতি বড় যত্নে সুরক্ষিত ছিল তাঁহার অন্তরের মণিকোঠায়। পরবর্তী কালে ঐ-সকল প্রসঙ্গের কোন কথা উঠিলে তিনি বলিতেন—'শুনতে অস্বাভাবিক ও অলৌকিক মনে হলেও বাস্তব এ ঘটনা।…সে-ঘটনার আমি প্রত্যক্ষদর্শী।' মাতৃ-ভক্ত বীরেশ্বরানন্দ চিরদিনই মায়ের কথায় ও প্রসঙ্গে অভিভূত হইয়া পড়িতেন—তাঁহাকে যাঁহারা ঐ-রূপ কোন পরিবেশে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ইহা জানেন। পরিণত বয়সেও বেলুড় মঠে, উদ্বোধনে, জয়রামবাটীতে—যে-কোন মাতৃতীর্থে, মায়ের মন্দিরদ্বারে কিংবা চিত্রপট বা মূর্তির সম্মুখে তাঁহার সেই দর্শন-ব্যাকুল সন্তানরূপটি বাস্তবিকই অবিস্মরণীয়—ভক্ত-চিত্তে প্রেরণাসঞ্চারক। শ্রীশ্রীমায়ের স্থূল দেহের দর্শন-স্মৃতিতেও তিনি কতখানি বিহ্বল হইয়া পড়িতেন—তাহা ঐরূপ কোন প্রাসঙ্গিক কথাবার্তায় কেহ উপস্থিত থাকিলে, তিনি অবশ্যই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি আবেগাকুল কণ্ঠে বলিতেন যে, শ্রীশ্রীমায়ের স্থূল শরীর-খানি অপ্রকট হইবার ঠিক প্রাক্-ক্ষণে মহাপুরুষ মহারাজ সমীপবর্তী সকলকে ডাকিয়া জানাইয়া দিয়াছিলেন: 'মাকে সবাই এখন ভাল করে শেষবারের মত দর্শন করে নাও। এরপর ধ্যানের ভিতর কখনও দু-এক মুহূর্তের জন্য হয়তো তাঁর দর্শন পাবে।'

বারাণসীতে বীরেশ্বরানন্দ ছিলেন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধ পর্যন্ত। ঐ-কালের মধ্যে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ কাশীধামে আগমন করায়, তাঁহার সঙ্গ ও সেবার সুযোগ পুনর্বার তিনি লাভ করেন। স্বামী শুদ্ধানন্দজীও তখন কাশীধামে—তাই বীরেশ্বরানন্দের সৌভাগ্য হইয়াছিল স্বামীজীর অতিপ্রিয় এক সন্তানের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে থাকিয়া স্বামীজীর চিন্তা ও ভাবরাশির সহিত চাক্ষুষ পরিচিত হইতে। শুদ্ধানন্দ মহারাজেরও স্নেহ-দৃষ্টি বীরেশ্বরানন্দের উপর সেদিন যেরূপ ছিল—উত্তরকালে উহা ক্রমেই নিবিড়তর হইয়াছে। স্বামী শুদ্ধানন্দের বিশেষ আস্থাভাজন ও পদানুগামী রূপে বীরেশ্বরানন্দের উত্তরকালীন পরিচিতি তাই সঙ্ঘের সর্বত্রই সুবিদিত ছিল। তাঁহার মুখে বহুবারই শুনা গিয়াছে: 'আমরা যখন মঠে এসেছিলাম, তখন একটা মস্ত সুযোগ আমাদের ছিল,—যা তোমরা এখন ভাবতেও পার না। স্বামীজীর বই পড়তাম, স্বামীজীর ভাব বুঝবার চেষ্টা করতাম,—কোথাও কোন অসুবিধা ঠেকলে স্বামীজীর ভাবের জীবন্ত ব্যাখ্যা যাঁরা, তাঁদেরই কাছে চলে যেতাম,—তাঁরাই আমাদের সাহায্য করতেন। সুধীর মহারাজ (স্বামী শুদ্ধানন্দ) প্রভৃতি সর্বদাই উন্মুখ থাকতেন আমাদের সাহায্য করার জন্য, স্বামীজীর কথা বুঝাবার জন্য। ওঁরা ত চোখের সামনেই ছিলেন—ঘোরাফেরা করতেন। চেষ্টা করে, খুঁজে পেতে দেখা করার দরকার হত না,—ওঁরাই বরং আমাদের খুঁজে বেড়াতেন।' স্বামী শুদ্ধানন্দের সঙ্গ-প্রভাবে বীরেশ্বরানন্দের জীবন কতখানি আলোকিত ছিল, তাহা উপলব্ধি করা যাইত জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়াও যখন তাঁহাকে শুদ্ধানন্দজীর রচনা বা চরিতকথা-সংবলিত একখানি প্রামাণিক গ্রন্থের জন্য সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখা যাইত। কাশীধামের সেই অতীত-দিনের

স্মৃতিচারণা করিতে করিতে তিনি একাধিকবার বলিয়াছিলেন, একবার স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের আজ্ঞানুসারে তাঁহারই প্রদত্ত পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা শুদ্ধানন্দজীকে সুন্দর সজ্জিত করিয়া খোল-করতালাদি বাদ্য-সহ তাঁহাকে ঘিরিয়া কীর্তন-ভজন ও নৃত্যাদি করিয়াছিলেন কাশীর উভয় আশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারীরা। রাজা মহারাজ স্বয়ং সেই দৃশ্যে উপস্থিত ছিলেন এবং হাসিতে আনন্দে বিভোর হইয়াছিলেন।

বারাণসীর আনন্দ-কানন হইতে বীরেশ্বরানন্দকে চলিয়া যাইতে হয় হিমালয়স্থ মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে। তাঁহার জীবনের এই মায়াবতী-অধ্যায় অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যময়—অনেক কারণেই স্মরণীয়। অদ্বৈত আশ্রমের ইতিহাসেও ঐ অধ্যায়টি বিশেষ গৌরবের দাবী রাখে। দীর্ঘ ষোল বৎসর কালব্যাপী এই অধ্যায়টি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য তথা ভাবধারা প্রচারের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'প্রবুদ্ধ ভারত' ইংরেজী মাসিকপত্র তথা অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত তদানীংকালের গ্রন্থরাজিই ইহার প্রকৃত সাক্ষ্য বহন করে। অদ্বৈত আশ্রমে বীরেশ্বরানন্দকে বিভিন্ন কর্মভার লইতে হইয়াছে—সাধারণ সেবক হইতে শুরু করিয়া অধ্যক্ষের মর্যাদা অবধি তাঁহাকে সমান দক্ষ ও কর্মকুশল দেখা গিয়াছে। ১৯২৭ হইতে পরবর্তী দশবৎসরকাল পর্যন্ত তিনি অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেলুড় মঠের অন্যতম 'ট্রাস্টি' এবং রামকৃষ্ণ মিশনের গভর্নিং বডির সদস্য নির্বাচিত হন।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দের মানসিক গঠন ছিল—কর্ম-ভক্তি-জ্ঞান-ধ্যানের সমুচ্চয় সাধন-প্রয়াসী। তাই তাঁহার কর্মময় জীবন নিরন্তর অবসর খুঁজিত, একান্তভাবে মনন-নিদিধ্যাসনাদির জন্য। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সেই বাঞ্ছিত অবসর অবশেষে মিলিয়াছিল,—অতঃপর বৎসরাধিককাল তাঁহাকে নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান-ভজন এবং স্বাধ্যায়-চিন্তনাদিতে নিমগ্ন দেখা গিয়াছে হৃষীকেশের মায়াকুণ্ডে—গঙ্গাতটে এক নিভৃত কুটীরে। মাধুকরী বা ছত্রের ভিক্ষায় কোনমতে শরীরযাত্রা নির্বাহ করিয়া, একান্ত নিবিষ্ট চিত্তে এইকালে তিনি তপস্যা ও শাস্ত্রচর্চায় নিমগ্ন ছিলেন। শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতার উপর শ্রীধর স্বামীর টীকার ইংরেজী অনুবাদ-কার্যও তাঁহার ঐ-কালের নিয়মিত স্বাধ্যায়ের অঙ্গীভূত ছিল। হৃষীকেশের মায়াকুণ্ড তাঁহার তপস্যার স্মৃতিকে কতখানি নিবিড় আত্মীয়তায় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বুঝা যায় তিনি চলিয়া আসিবার পরে পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলেও তাঁহার পরিত্যক্ত সেই জীর্ণ পর্ণ-কুটিরটি উত্তরকালীন সাধুগণের দ্বারা সসম্ভ্রমে রক্ষিত ছিল—এবং 'প্রভু মহারাজের কুঠিয়া' নামে নির্দিষ্ট হইত।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে বীরেশ্বরানন্দ—বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়া মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সচিবের দায়িত্ব স্বীকার করেন। তাঁহার এইকালের জীবনেতিহাস যেমন বৈচিত্র্যময়—তেমনই দৃষ্টান্তস্বরূপ। তাঁহার ত্যাগ-তপস্যা ও নিয়মিত শাস্ত্রানুশীলনদীপ্ত জীবনে কী অপূর্ব কর্মকুশলতা ও সংগঠনশক্তির সুষম বিকাশ হইয়াছিল তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে চিরদিনই স্মরণার্হ হইয়া থাকিবে। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় এই পর্যায়ে সমধিক দেখা গিয়াছে—আশ্রম-গুলির সংগঠন, ত্রাণকার্য পরিচালনা, মঠ ও মিশনের বহুবিধ সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান প্রভৃতি কার্যে তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য তাঁহাকে অলক্ষ্যে ভাবী সঙ্ঘ-নেতার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিল। স্বামী মাধবানন্দজী স্বাস্থ্যের কারণে সাময়িক বিশ্রাম গ্রহণ করিলে ১৯৪৯-এর এপ্রিল হইতে ১৯৫১-র মার্চ পর্যন্ত স্বামী বীরেশ্বরানন্দই তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া সঙ্ঘে সাধারণ

সচিবের দায়িত্ব বহন করেন। স্বামী মাধবানন্দ পুনরায় স্বীয় পদে ফিরিয়া আসিলে বীরেশ্বরানন্দও তাঁহার পূর্ব-দায়িত্বকেই প্রসন্নচিত্তে বরণ করেন। ১৯৬১-র এপ্রিলে স্বামী মাধবানন্দ চিকিৎসার্থ বিদেশে যান—স্বাভাবিক কারণেই তাঁহার পক্ষে আর সাধারণ-সচিবের দায়িত্ব বহন সম্ভবপর হয় নাই। স্বামী বীরেশ্বরানন্দই তখন ঐ কার্যভার গ্রহণ করেন এবং ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্ঘাধ্যক্ষের আসনে বৃত হইবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি সাধারণ-সচিবরূপেই মঠ ও মিশনের সেবায় নিরত ছিলেন।

বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ সহ-সচিব, সাধারণ-সচিব বা মঠাধীশ যে-পদেই যখন আসীন থাকিয়াছেন,—তিনি সমগ্র রামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলে সর্বকালেই সর্বজন-মানিত প্রভু মহারাজরূপে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্বরূপ ছিলেন। সাধারণ-সচিবের কর্মভার লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চির অভ্যস্ত কৃচ্ছ্রতাকে কিছু কিছু শিথিল করিতে বাধ্য হইয়াছেন ঠিকই, তথাপি তাঁহার জীবন-চর্যার রীতিনীতি ছিল খুবই অনাড়ম্বর ও সাধারণ। সাধারণ-সচিবের কক্ষে স্থায়ী আসনে বসিবার প্রাক্‌কাল অবধি তাঁহার আবাস-কক্ষ ছিল গিরিশ স্মৃতি-ভবনের তিনতলার ক্ষুদ্র চিলা-কোঠায়—যাহার আয়তন তাঁহাকে সেই হৃষীকেশের কুঠিয়াটিকেই বোধ হয় স্মরণ করাইত। মাত্র একজন লোক কোনমতে শয়ন করিতে পারে—ইহাই ছিল ঐ কুঠরির আয়তন। শয্যা বলিতে ছিল মেঝেতে একখানি মাদুর—আসবাব ছিল পুস্তকরাশি। চা-পান করিবার পেয়ালা ছিল কলাই-করা একটি বাটি,—আর থাকিত একখানি হাতপাখা—একটি কমণ্ডলু! দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন হইলে প্রকোষ্ঠের বাহিরে আসিয়া খোলা ছাদে মাদুর বিছাইয়া বসিতে হইত। ঐ চিলাকোঠার মধ্যে থাকিয়াই মঠ ও মিশনের সহ-সচিব তাঁহার কর্মযোগ, ধ্যান-ভজন এবং শাস্ত্রানুশীলন ইত্যাদি লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে সাধিয়াছেন। তৎ-কৃত শাস্ত্র-গ্রন্থের অনুবাদগুলির অনেকাংশই ঐ চিলাকোঠায় বসিয়া লিখিত ও সম্পাদিত। প্রসঙ্গতঃ স্মর্তব্য—'**Brahma-Sutras**', '**Srimad Bhagavad-Gita with Gloss of Sridhara Swami**' এবং স্বামী আদিদেবানন্দের সহযোগিতায় ব্রহ্মসূত্রের রামানুজ-ভাষ্যের ইংরেজী অনুবাদ, তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানের ও বৈদগ্ধ্যের পরিচায়ক। ঐ-কালে কোন সেবক বা ভৃত্যের সহায়তা তাঁহার ব্যক্তিগত কার্যে তিনি গ্রহণ করিতেন না।

বীরেশ্বরানন্দজীর সহ-সচিবত্ব কালে সঙ্ঘে তথা সমগ্র দেশে অত্যন্ত গুরুতর কিছু পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল,—ঐতিহাসিক বিবর্তনও অনেক ঘটিয়াছে। যেমন—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশ-বিভাগ, স্বাধীনতা লাভ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রভৃতি—আবার শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাব শতবার্ষিকী প্রভৃতি। শুভাশুভ সকল পরিস্থিতিতেই রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে স্বামী বীরেশ্বরানন্দের উপর ন্যস্ত সকল কর্মোদ্যগই অসাধারণ মহিমান্বিত হইয়া সকলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং প্রাণান্তক সেই দুর্ভিক্ষের দিনে তিনি মিশনের তরফ হইতে যে সেবা ও ত্রাণকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ বিশাল কর্মকাণ্ডের প্রতিটি স্তরে তাঁহার অনন্যসাধারণ সংগঠন-কুশলতা, মানবপ্রীতি, নেতৃত্ব-প্রতিভা, সাহস, সংযম ও ধৈর্য প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। ঐ-কালে তাঁহার কায়িক পরিশ্রমও যে-কোন যুগের শক্তিশালী কর্মীর পক্ষে এক বিস্ময়কর নজির! শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব শতাব্দীতে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের অভীপ্সিত নারী মঠ স্থাপনার যে-প্রেরণা রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে অনুভূত হইয়াছিল এবং যাহাকে কার্যকর রূপ দিতে সঙ্ঘ-কর্তৃপক্ষ ব্রতী হইয়াছিলেন,—তাহার দায় অনেকখানিই পরিন্যস্ত হইয়াছিল স্বামী বীরেশ্বরানন্দের উপর।

তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত সেই পবিত্র কিন্তু কঠিন দায়কে ফলপ্রসূ করিয়াছিলেন। 'সারদা মঠ' প্রতিষ্ঠায় তাঁহার ভূমিকা এক ঐতিহাসিক অবদান স্বরূপ।

১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে জীবনের শেষ উনবিংশতি বৎসর তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ—গুরু ও কর্ণধার। এত উচ্চ গরিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও তিনি ছিলেন সাধু-গৃহী আপামর সাধারণের দরদী সুহৃদ্—সর্বসময়ের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আপনজন। সহস্র সহস্র মানবের অধ্যাত্মপথের পরম দিশারী—আবার একই কালে অগণিত উপেক্ষিত জনের নিকট বান্ধব। আদিবাসী ও পার্বত্য অঞ্চলের অনুন্নত অধিবাসীদের জীবনযাত্রার উন্নয়ন চিন্তা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিত। তাঁহার অধ্যক্ষতা-কাল কেবল রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের নহে, সারা বিশ্বের পক্ষেই নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। সকল পরিস্থিতিতেই তাঁহার সুযোগ্য নেতৃত্ব মঠ ও মিশনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মপরিধি বহুল বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে তাঁহারই প্রত্যক্ষ অনুমোদনে ও নির্দেশনায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবে উদ্বুদ্ধ দেশব্যাপী বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে একই সূত্রে গ্রথিত করিয়া মঠ ও মিশনের অনুবর্তী করিয়া তুলিতে এবং ঐ ভাব-সম্মেলনের মাধ্যমে সমগ্র সমাজের মধ্যে সত্য, সংহতি ও সেবার মনোভাব বিস্তারে বীরেশ্বরানন্দজীর আগ্রহের অন্ত ছিল না। ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বিতীয় মহাসম্মেলন—যাহাকে বিশ্ব-সম্মেলনও বলা যাইতে পারে, উহার মূল প্রেরণা ও শক্তি ছিলেন স্বয়ং স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। ঐ সম্মেলনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি সমাগত পঞ্চদশ সহস্রাধিক প্রতিনিধিকে বলিয়াছিলেন: 'রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ শুধু সাধু-ব্রহ্মচারীদের লইয়া নহে, কেবলমাত্র দীক্ষিত ভক্তদের জন্যও নহে, যাহারাই শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর ভাবাদর্শে বিশ্বাসী ও অনুরাগসম্পন্ন তাহাদের সকলকে লইয়াই এই সঙ্ঘ এবং সেই বিরাট সমষ্টিই প্রকৃত সঙ্ঘশরীর।' শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ নায়কের কণ্ঠে এই উদার উদাত্ত আহ্বান যে-দিন উচ্চারিত হইয়াছিল, সেই দিন হইতেই রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের গতিতে নূতন বেগ সঞ্চারিত হইয়াছিল, ইহা বলা বাহুল্য। সারা দেশে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচার সমিতি'-র উদ্ভব—ঐ আহ্বানেরই ফলশ্রুতি।

গত ১৯৭৮-এর বিধ্বংসী বন্যার পরে হৃতশ্রী পল্লী-অঞ্চলের দুর্দশা তাঁহাকে অত্যন্ত বিচলিত করে। পল্লীবাসীর অর্থনৈতিক স্ব-নির্ভরতাই মাত্র নহে—তাহাদের ধর্ম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ এবং সাংস্কৃতিক পুনর্বাসনের চিন্তাও তাঁহাকে উন্নিদ্র করিয়া তুলিয়াছিল। বর্তমানে যে 'পল্লীমঙ্গল' কর্মসূচী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে উহা সর্বাংশেই স্বামী বীরেশ্বরানন্দের সঙ্কল্প-জাত। অন্ধ্রপ্রদেশের 'গ্রামশ্রী' পরিকল্পনাও তাঁহারই চিন্তাপ্রসূত। দরিদ্র, অজ্ঞ, নিপীড়িত মানবাত্মার প্রতি তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ও মমতা সর্বকালের জনসেবকদের জন্যই অনুপ্রেরণার উৎস হইয়া থাকিবে।

সমগ্র বিশ্ব শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে—স্বামীজীর আদর্শে জাগরিত হইবে, ইহাই ছিল বীরেশ্বরানন্দজীর আজীবনের ধ্যান-জ্ঞান। তিনি অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ছিলেন—ভারতের, শুধু ভারতের কেন, সারা পৃথিবীর চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই উদ্দেশ্যে সম্মিলিত প্রয়াস করুন—নবযুগের ভাবাদর্শের সঙ্গে তাঁহারা নিজেরা পরিচিত হউন এবং জগদ্বাসীকে পরিচিত হইতে সাহায্য করুন। বস্তুতঃ, সঙ্ঘনায়ক বীরেশ্বরানন্দজীর এই ঐকান্তিক ইচ্ছাকে রূপ প্রদানের উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট হয় 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবান্দোলন সমীক্ষা-পর্ষদ্' নামে একটি আন্তর্জাতিক প্রকল্প। দেশের

শিক্ষাব্যবস্থা, তথা তরুণ-তরুণীদের জন্যও তাঁহার উদ্বেগের অবধি ছিল না—যাহা তাঁহার জীবনের শেষ কয়েকটি বৎসরকে গভীরভাবে ব্যাপৃত রাখিয়াছে। ১২ জানুয়ারি, ১৯৮৫ স্বামীজীর আবির্ভাব-তারিখ (ইংরেজী পঞ্জী অনুযায়ী) হইতে ভারতবর্ষে 'যুব বর্ষ' সূচিত হইয়াছে—রাষ্ট্রসঙ্ঘ বর্তমান বর্ষকেই 'আন্তর্জাতিক যুববর্ষ' বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। ত্রিনবতি বর্ষের বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর অসুস্থ দেহেও ইহাতে যে তারুণ্যের প্রভা পরিলক্ষিত হইয়াছিল, সম্ভবতঃ তাহা কোন তরুণের বা তরুণীর মধ্যেও দেখা যায় নাই। তাঁহারই নির্দেশে ভারতের প্রতি নগরে-গ্রামে, প্রত্যেক যুব-সমাবেশে স্বামীজীর উদ্দীপনাকর বাণী-সঙ্কলন বিনামূল্যে প্রদত্ত হইয়াছিল, লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতীর হস্তে। উক্ত ১২ জানুআরি, বেলুড় মঠ-প্রাঙ্গণে এক বিপুল ছাত্র-ছাত্রী সমাবেশে তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছিলেন,—ক্ষীণ কিন্তু দৃপ্ত কণ্ঠে তিনি তাহাদের উদ্দেশে বলিয়াছিলেন: 'আশা করি তোমরা স্বামীজীকে নিরাশ করবে না।…তোমরা আজ সঙ্কল্প গ্রহণ কর যে, স্বামীজীর কাজে তোমরা লেগে যাবে, আর স্বামীজী যে-পথে ভারতবর্ষকে নিয়ে যেতে বলেছেন, সেই পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।…স্বামীজীর আশীর্বাদ তোমাদের উপর বর্ষিত হোক! তাঁর কাছে আমার এই প্রার্থনা।'—ইহাই ছিল স্বামী বীরেশ্বরানন্দের সর্বশেষ প্রার্থনা—প্রকাশ্য সভায় শেষ বাণী। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাকে বলিতে শুনা যাইত: 'স্বামীজীর আগুন দিকে দিকে ছড়িয়ে দাও।'

শ্রীশ্রীমায়ের সন্তান বীরেশ্বরানন্দের মধ্যে একটি শোকহরণ ক্ষমাপ্রবণ মাতৃসত্তা অন্তর্নিহিত ছিল—যাহা তাহার জ্ঞান ও কর্মোজ্জ্বল চরিত্র-তেজকে কদাপি প্রখর না করিয়া স্নিগ্ধ ও মধুর করিয়াছিল। ঐ ক্ষীণকায় কৃশ শরীরখানির স্নেহাকর্ষণ, তাঁহার সস্মিত মুখের দুই একটি কথাও সমীপাগত মানুষকে—স্ত্রী-পুরুষ কিংবা শিশু-বৃদ্ধ—সাধু বা গৃহী সকলকেই আকাঙ্ক্ষিত শান্তি ও সান্ত্বনায় ভরিয়া দিত। ভগবৎ-অন্বেষী জনকে যেমন তিনি গুরুমূর্তিতে সাধন-পথের নির্দেশ দিয়াছেন,—সংসার-জ্বালায় জর্জর বা শোকতাপে বিহ্বল আর্ত ব্যক্তিকেও ঠিক তেমনই জননীর স্নেহ-দৃষ্টি লইয়া মনের কষ্ট লাঘব করিবার সঠিক উপায় বলিয়া দিয়াছেন। লোকগুরুর সকল বৈশিষ্ট্যই তাঁহার চরিত্রে পূর্ণ-প্রকাশিত ছিল। ভাবিতে বিস্ময় লাগে, একদা মাতৃ-প্রশস্তিতে স্বয়ং যাহা লিখিয়াছিলেন মাতৃ-মহিমা খ্যাপনের উদ্দেশ্যে, উত্তরজীবনে তাহাই যেন তাঁহার স্ব-চরিত্রেও স্বতই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এককথায়, তাঁহার স্বীয় জীবনটিই ব্যক্ত হইয়াছিল শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদের সার্থক প্রতিমূর্তি রূপে—যেন মাতৃ-প্রশস্তিরই সার্থক এক প্রতিমা। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন: 'যাঁহার ভালবাসা সাধু ও পতিতের পার্থক্য করিতে জানিত না ও যাঁহার অপরিমেয় প্রশান্ত পবিত্রতার প্রভাব ছিল দুরতিক্রম্য এমন একজনের কাছে বসিয়া থাকিতে পারিলে কী আনন্দ ও শান্তি!' ঠিক এই মাতৃ-সত্তাতেই তিনি নিজের জীবনকে পরিপূর্ণ রাখিয়াছিলেন—অথবা স্বয়ং জগজ্জননীই তাঁহার সন্তান-হৃদয়ে যেন অনুক্ষণের জন্য অভিনিবিষ্ট থাকিতেন। ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ,—নিকটবর্তী সকল হৃদয়ে অনুভূত। অজস্র ঘটনার মালা রচিত হইতে পারে ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ।

বহুভাষা ,বিচিত্র সংস্কৃতি, বিভিন্ন খাদ্য-পরিচ্ছদ এবং নানা মত ও আচার-আচরণের দেশ এই ভারতবর্ষ। ভারতের একজন আদর্শ লোকগুরুকে তাই হইতে হইবে অত্যন্ত সহজ সমন্বয়-কারী—যিনি সকল ভাষা, খাদ্য, পরিচ্ছদ ও কৃষ্টিতে হইবেন সমান শ্রদ্ধাসম্পন্ন। বীরেশ্বরানন্দজীর

চরিত্রে ও ব্যবহারে ছিল এই অসাধারণ গুণের স্বাভাবিক দ্যোতনা। তাঁহার নিজ মাতৃভাষা কোঙ্কনী,—কিন্তু বাংলাও যে তাঁহার মাতৃভাষা নহে ইহা সহজে মানিয়া লওয়া কাহারও পক্ষে কঠিন হইত। তাঁহার সর্বক্ষণের কথোপকথনের বাংলাতে একজন প্রাচীন বঙ্গভাষীর সরল উচ্চারণ-রীতিই প্রকাশ পাইত।—ইহা ছাড়াও সংস্কৃত, হিন্দী, তামিল, কানাড়া এবং ইংরেজী ভাষায় তাঁহার সহজাত ব্যুৎপত্তি ও অধিকার সুবিদিত। আহারাদির ব্যাপারেও তাঁহার রুচি ও অভ্যাস ছিল অতি সাধারণ—যাহাতে বিশেষ কোন আঞ্চলিকতার আভাস মোটেই পাওয়া যাইত না। দীর্ঘকাল তাঁহার সঙ্গে ওঠা-বসা করিয়াও অনেকেই জানিতে পারে নাই—তাঁহার শরীর কোন্ প্রদেশের।—কেহ-বা জানিলেও সে-বিষয়ে সুনিশ্চিত ছিলেন না। বিচ্ছিন্নতাপ্রবণ বর্তমান সমাজে ইহাও এক অনন্যসাধারণ আদর্শ। ভগ্ন-দেহেও তিনি অবিরাম সারা ভারত পরিভ্রমণ করিয়াছেন—বাহিরেও গিয়াছেন জিজ্ঞাসু মানুষদের আহ্বানে, আর্তের ডাকে। বার্ধক্য, জরা, ব্যাধি ও দৃষ্টিহীনতা প্রকৃতির নিয়মে তাঁহার স্থূল শরীরকে স্পর্শ করিয়াছে—কিন্তু তাঁহার সূক্ষ্ম মানসিক স্বাস্থ্য ছিল চিরতরুণ, সদা হাস্যময়, নিত্য সতেজ। এমনকি মহাসমাধির দিনটিতে পর্যন্ত তাঁহার অলৌকিক অন্তঃপ্রকৃতিতে কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। চির অভ্যস্ত রঙ্গ-পরিহাস ও রসজ্ঞতা তাঁহার এক চারিত্রিক সৌন্দর্য ছিল। মৃত্যুর সম্মুখে শায়িত থাকিয়াও মৃত্যু লইয়া রসিকতা—অতি বড় জ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব। বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের জীবন তাই যোগ, জ্ঞান ও অনাসক্তির বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত।

১৯৮৩ হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি পরিলক্ষিত হইতে থাকে। দুরারোগ্য কর্কট রোগে তাঁহার শরীর ক্রমশঃ জীর্ণ হইতে থাকে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আনুকূল্যে ঐ দুর্ধর্ষ ব্যাধির উপশম হইয়াছিল বটে—কিন্তু তাঁহার আয়ুকে উত্তরোত্তর পরিসমাপ্তির পথেই লইয়া যাইতেছিল। অবশেষে গত ১৩ মার্চ বুধবার অপরাহ্ণ ৩-১৭ মিনিটে শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠাধীশ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী তাঁহার চির-ঈপ্সিত মাতৃ-ক্রোড়ে অনন্তকালের জন্য বিশ্রাম লইলেন। বেলুড় মঠে তাঁহার বাস-কক্ষ তখন অগণিত মানুষের অশ্রুধারায় সিক্ত ও সিঞ্চিত—সমবেত সাধু-ব্রহ্মচারিগণের কণ্ঠোদ্গীত বেদমন্ত্র-ধ্বনিতে সমগ্র মঠভূমি অনুরণিত স্পন্দিত। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ-ইতিহাসের বিপুল ঘটনাসমন্বিত আরও একটি দীর্ঘ অধ্যায়ের শেষ পৃষ্ঠাটিতে এই-ভাবেই ইতি রেখা টানা হইল! সমগ্র জীবনটি যাঁহার ছিল উপাসনাস্বরূপ—প্রশস্তিময়, যাত্রার বিরতি-কালেও তাহাতে একক্ষণের জন্যও ছন্দপতন ঘটে নাই, সুর কাটিয়া যায় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ, মা, স্বামীজী এবং ব্রহ্মানন্দ মহারাজের উদ্দেশে প্রণতি নিবেদনপূর্বকই অপূর্ব সেই নিবেদিত জীবনের শিখাটি নির্বাপিত হইল,—ভাবীকালের জন্য থাকিয়া গিয়াছে উহার সমুজ্জ্বল আলোক-স্মৃতি, যাহা প্রেরণা সঞ্চার করিবে আগামী দিনের সর্বস্তরের মানুষকে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব-জগতেও যুগ আছে—যুগের প্রবাহ চলিতেছে। ব্যক্তির যেমন বৈশিষ্ট্য থাকে, এক-একটি যুগেরও তেমনই বিশিষ্টতা অনস্বীকার্য। আর সেই যুগ-বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত হয় ঐ যুগের বিশেষ কোন জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই। নির্দিষ্ট সেই জীবনের চরিতকথাকে লইয়াই রচিত হয় যুগ-জীবনী। শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দের জীবনচরিতও বাস্তবিক পক্ষে এই ভাব-জগতেরই যুগপোযোগী স্বরূপ-ব্যাখ্যা—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবলোকের আধুনিকতম জীবনচিত্র। লোকান্তরিত এই মহাজীবনের উদ্দেশে জানাই আমাদের সভক্তি প্রণাম।

বীরেশ্বরানন্দজীর মহাপ্রয়াণে

স্বামী গম্ভীরানন্দ

গত ২৫ মার্চ, ১৯৮৫, বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের স্মরণ-সভায় পঠিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের তদানীন্তন সহাধ্যক্ষের বাণী।

একটি আধুনিক গানের গোড়াতে আছে—"তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা, কে বলে তুমি নাই, তুমি আছ—মন বলে তাই।" পূজ্যপাদ বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মরদেহ পূত চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়েছে এবং সে-স্থান এখন পুষ্পরাজিতে সুসজ্জিত হয়েছে এবং সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তাঁর শরীর আর নাই। কিন্তু তা হলেও তাঁর দেহের আকৃতি এখনও আমাদের স্মৃতিতে সজীব। এখন তিনি ভক্তদের ধ্যানের বস্তু। তাঁর দেহ, তাঁর জীবন, তাঁর চরিত্র, তাঁর ভাবরাশি—তা সবই আমাদের কাছে পূত, পবিত্র এবং প্রেরণাদায়ক। আর এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। দেবতাকে সম্মুখে না পেলেও আমরা তাঁর প্রতিমাতে পূজা করে থাকি। আর মনে করি, প্রতিমা সত্য সত্যই দেবতা। সে-প্রতিমার আকৃতি, অঙ্গভূষণ, নির্মাল্য, পাদোদক সবই আমাদের কাছে পবিত্র, সবই ধ্যানের বস্তু।

কিন্তু এটাই সব নয়। পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর ভিতর দিয়ে একটি গুরুশক্তি প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেই শক্তিবলে তিনি অবিরাম ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ করে সহস্র সহস্র নরনারীকে ধর্মপথে পরিচালিত করেছেন। এই গুরুশক্তি আমাদের কাছে বিশেষ আদরণীয়। বলেছেন—গুরুতে মানুষবুদ্ধি করতে নেই। সুতরাং প্রভু মহারাজের দেহই সব নয়। তাঁর ভিতরে যে গুরুশক্তি প্রকাশিত হয়েছিল তারই প্রতি আমাদের দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক,—শুধু মানুষ হিসাবে নয়। এই গুরুশক্তির দৃষ্টিতেই শক্তি এবং শক্তিমান ভগবান অভিন্ন। এজন্যই শাস্ত্রে বলেছে—"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। / গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥" এই দৃষ্টি অবলম্বনেই তিনি কাউকেই নিজের জন্মতিথি বলতেন না। আর বলতেন, ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর আবির্ভাব-তিথি পালন করতে এবং তাঁদেরই উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে। গুরুপূর্ণিমাও তিনি মানতেন, কিন্তু তাঁর ভয় ছিল পাছে ভক্তগণ বিভিন্ন গুরুকে অবলম্বন করে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে পরিণত হয়।

তিনি যেমন গুরু ছিলেন, তেমনই ছিলেন সঙ্ঘাধ্যক্ষ। এ কাজটা কত দায়িত্বপূর্ণ, তা এ ভার যাঁরা বহন করেছেন তাঁরাই জানেন। সঙ্ঘকে—ভক্ত, সন্ন্যাসী সকলকে একসূত্রে গ্রথিত করে একভাবে পরিচালিত করা বড় সহজ কথা নয়। সম্প্রতি তিনি ভক্তদের মধ্যে ভাবপ্রচারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বাইরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে অনেক আশ্রম গড়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে যাতে ভাব-ধারা বিনিময় হয়—একটা বন্ধুত্বের ভাব গড়ে ওঠে, সেজন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন। মঠের নবাগত ব্রহ্মচারীরা যাতে সুশিক্ষিত হয়, তার জন্যও তিনি অর্থাদির ব্যবস্থা করে গেছেন। আর তাদের সঙ্গে তিনি নিত্যই মিলিত হতেন। তাঁর আর একটা ইচ্ছা ছিল, যাতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য সস্তামূল্যে বা বিনামূল্যে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। উপজাতির উন্নতির প্রতিও তাঁর দৃষ্টি ছিল। অরুণাচলের প্রথম কেন্দ্র আলং নগরের আবাসিক বিদ্যালয় প্রধানতঃ তাঁরই উৎসাহে আরম্ভ হয়। তাঁর সম্প্রতি 'পল্লীমঙ্গল' কার্যের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং এই বিভাগে অনেকটা কার্য

অগ্রসর হয়েছে। স্বামীজীর আদর্শানুযায়ী গঙ্গার অপর তীরে স্ত্রী-মঠ স্থাপনে তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। প্রথম বয়সে তিনি বক্তা ছিলেন না। কিন্তু সঙ্ঘাধ্যক্ষ হওয়ার পর বহু জায়গায় বহু বক্তৃতা তাঁকে দিতে হয়েছিল। আর সব ভাষণগুলিই ছিল সুন্দর ও সুচিন্তিত। ওই সব গুণের উপর তাঁর সর্বাধিক আকর্ষক গুণ ছিল শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা, স্বামীজী ও মহারাজের প্রতি অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা। বৃদ্ধ বয়সেও জরাজীর্ণ ক্ষীণ ও রোগগ্রস্ত শরীর নিয়ে প্রতিদিন বেলুড় মঠের প্রত্যেক মন্দিরে প্রণাম করতে যেতেন এবং সর্বশেষ বিদায় নিয়েছেন তিনি তাঁদের চারজনকে প্রণাম জানিয়ে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় কোনরূপ ত্রুটি তিনি সহ্য করতে পারতেন না। একবার কোন এক শাখাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ সম্বন্ধে তাঁকে যখন বলা হল—ইনি সুদক্ষ কার্যপরিচালক, তখন তিনি মন্তব্য করলেন—তিনি পরিচালক হতে পারেন, কিন্তু সেবায়েত নন।

আরব্ধ, অর্ধসম্পূর্ণ ও অনারব্ধ নানাবিধ কার্যের দায়িত্ব তিনি আমাদের উপর ন্যস্ত করে গেছেন। তাঁর প্রদর্শিত প্রণালীতে আমাদের সকলকে—সঙ্ঘের প্রতি অঙ্গকে—ভক্ত, সাধু, ব্রহ্মচারী সকলকে সমবেতভাবে উপাসনা করতে হবে। হরি ওঁ তৎ সৎ।

স্মৃতির অর্ঘ্য

স্বামী চৈতন্যানন্দ

'উদ্বোধন' পত্রিকার সহায়ক।

১২ জানুআরি, ১৯৭৪। আজ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব্ কালচারে রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ আসবেন। কালচারের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী এবং কর্মিবৃন্দ সবাই সকাল থেকে ব্যস্ত। যার যার উপর যে যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছে তারা সবাই সযত্নে করছে। তবু সবার একটু ভয় কি জানি কি হয়। পূজ্যপাদ মহারাজের সেবার কোন যাতে ত্রুটি না হয় সেদিকে সবার সতর্ক দৃষ্টি। জনৈক ব্রহ্মচারীর উপর পূজ্যপাদ মহারাজের জন্য রান্নার ভার পড়েছে। তার খুব ভয়। সে রান্না-বান্না কিছুই জানে না। যদিও ব্রাহ্মণ পাচকই সব রান্না করবে—তবু তার মনের ইচ্ছা সে নিজ হাতেও কিছু রান্না করে মহারাজকে খাওয়াবে। কাজেই সে সকাল থেকে খুব সন্ত্রস্ত আছে।

মহারাজ সকাল ১০টা নাগাদ বেলুড় মঠ থেকে কালচারে এসে পৌঁছালেন। তাঁর পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে যেন উৎসব আরম্ভ হয়ে গেল। সবার খুব আনন্দ। তিনি সবার সঙ্গে এমনভাবে ব্যবহার করছেন যে, গুরুগম্ভীর থমথমে পরিবেশ হালকা হয়ে আনন্দের ফোয়ারা ছুটে গেল। সবাইকে সহজ স্বচ্ছন্দ করার জন্য তিনি হাসতে হাসতে সবার ঘরে ঘরে গিয়ে দেখতে লাগলেন কে কোথায় কিভাবে থাকে। পথে রান্নায় ব্যস্ত ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হল। অন্য একজন ব্রহ্মচারী পূজ্যপাদ মহারাজের সঙ্গে উক্ত ব্রহ্মচারীর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল: 'মহারাজ, ও আপনার জন্য রান্নার ব্যবস্থা করছে।' মহারাজ হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন: 'তোমার কি মেনু (menu) হচ্ছে?' তিনি কথাগুলি এমন সহৃদয়তার সঙ্গে বললেন যে, ব্রহ্মচারীর মন থেকে ভয় ও জড়তা এক মুহূর্তের মধ্যে কেটে গেল। সে তাঁকে খুব আপনার বোধ করল। সেও হেসে বলল: 'মহারাজ, মেনু এখন বলব না। সারপ্রাইজ

(Surprise) দেব আপনাকে।' শুনে মহারাজও হাসলেন। উপস্থিত সকলেই হেসে উঠল।

তিনি ছিলেন সদা আনন্দময়। তাই থমথমে গুরুগম্ভীর পরিবেশকে আনন্দমুখর করে তুলতে পারতেন। ভয়-সম্ভ্রমের একটা গম্ভীর ভাব কেটে গিয়ে সেখানে বিরাজ করত শ্রদ্ধাযুক্ত অনাবিল আনন্দ-পরিবেশ। পূজ্যপাদ মহারাজ সারাদিন সেখানে ছিলেন। সারাটা দিনই আনন্দের রেশ চলেছিল

বেলুড় মঠ। ১৯৭৭-এর কোন এক সময় জনৈক ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারি-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আছে সে খুব বেদান্তচর্চা করে। কিছু দিন করার পরে তার নিজের ধারণা হল—সে অদ্বৈত-সাধনের উপযুক্ত। সেই অনুযায়ী সে ভাবনা-চিন্তা করতে আরম্ভ করে দিল। এইভাবে কয়েক মাস অতিবাহিত হল। একদিন তার মনে হল—এইভাবে অদ্বৈত-সাধন করা তার পক্ষে ঠিক হচ্ছে কিনা পূজ্যপাদ মহারাজকে একবার জিজ্ঞাসা করা ভাল। এই ভেবে সে মহারাজের সঙ্গে কথা বলার একটা সময় ঠিক করে নিল।

সন্ধ্যাবেলা আরতির পর মহারাজের কাছে গিয়ে প্রণাম করে ব্রহ্মচারী বলল: মহারাজ, আমার অদ্বৈতভাবে সাধনা করতে ভাল লাগে। সেইভাবে কি আমি সাধনা করব?

মহারাজ: শরীর-বোধ থাকতে অদ্বৈতভাবে সাধনা করা যায় না। তোমার গালে যদি কেউ চড় মারে তুমি কি তা সহ্য করতে পারবে? তোমার মনে কি তার প্রতি কোন প্রতিক্রিয়া হবে না?

ব্রহ্মচারী বোকার মতো বলে বসল: মহারাজ, আপনার আশীর্বাদে আমি চড় মারা সহ্য করতে পারব।

মহারাজ: একটা কথা সহ্য করতে পার না, তা আবার চড় মারা সহ্য করবে! অদ্বৈত-সাধনা করা খুব কঠিন। তোমার ও পথ নয়।

নাছোড়বান্দা ব্রহ্মচারী আবার বলে বসল: মহারাজ, আমার খুব ভাল লাগে অদ্বৈতভাবে চিন্তা করতে।

মহারাজ বিরক্ত হয়ে বললেন: খাল ডিঙ্তে পারে না, তা আবার নদী ডিঙ্তে চায়!

ব্রহ্মচারী: তবে কি অদ্বৈত-বেদান্তের বই পড়া ছেড়ে দেব? ঐ বিষয়ক বই পড়লে আমার মনে ঐ ভাবের খুব দাগ কাটে।

মহারাজ: না, বই পড়া ছাড়বে না। বেদান্ত পড়বে বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য।

ব্রহ্মচারীর সকল সংশয় নিরসন হয়ে গেল। সে পূজ্যপাদ মহারাজকে প্রণাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দের আর একটি ঘটনা। বেলুড় মঠ, ব্রহ্মচারি-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। সকল ব্রহ্মচারী আরতির পর পূজ্যপাদ মহারাজকে প্রণাম করতে যায়। একদিন দুজন ব্রহ্মচারী সকলের সঙ্গে প্রণাম করতে যেতে পারেনি—একটা কাজে তারা আটকে পড়েছিল। সকলে প্রণাম করে ফিরে এলে তারা দুজন মহারাজকে প্রণাম করতে গেল। সেই সময় তাঁর ঘর থেকে দুজন ভক্ত বেরিয়ে এলেন। তাঁদের চেহারায় ও পোশাকে ধনী ও শিক্ষিত বলে মনে হল দুজন ব্রহ্মচারীর। তাঁরা বেরিয়ে যেতে ব্রহ্মচারী দুজন প্রণাম করতে ঢুকল। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেলে মহারাজ তাদের বারণ করেন। তারা ভয় পেয়ে গেল। ভাবল: মহারাজ তাদের প্রণাম করতে বারণ করলেন কেন? তারা এমন কি অন্যায় করেছে যে আজ তাদের প্রণাম করার অধিকার নেই? এই রকম যখন তারা ভাবছে তখন মঠের ক্ষৌরকার মুরতরাম প্রতিদিনের মতো সেদিনও মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে গেল।

মহারাজ তাকেও নিষেধ করলেন। সে সঙ্গে সঙ্গে করজোড়ে মহারাজকে জিজ্ঞাসা করল : মহারাজ, আমি কি অন্যায় করেছি যে আমাকে প্রণাম করতে নিষেধ করছেন? তখন মহারাজ বললেন : যারা একটু আগে প্রণাম করে গেল, তারা ভাল নয়। তুমি —কে বল একটু গঙ্গাজল নিয়ে আসতে। মূরতরাম সেবককে ডাকতে গেল। ব্রহ্মচারী দুজন পিছনে নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে স্পষ্টই লক্ষ্য করছিল মহারাজজীর পা যেন যন্ত্রণায় আড়ষ্ট রয়েছে তখনও। সেবক গঙ্গাজল দিয়ে তাঁর পা ধুইয়ে দিলেন। তারপর মহারাজ ভক্ত মূরতরামকে প্রণাম করতে দিলেন। পরে দুজন ব্রহ্মচারীও প্রণাম করে বেরিয়ে এল। তারা ভাবল : মহারাজ নিজে অপরের পাপ গ্রহণ করছেন, কিন্তু অন্য কাউকে যাতে সেই পাপ স্পর্শ করতে না পারে তার জন্য কত সতর্কতা!

*

জনৈক নবীন সন্ন্যাসীর কেদার-বদরী-গঙ্গোত্রী প্রভৃতি তীর্থ-দর্শন এবং কিছুকাল উত্তরাখণ্ডে তপস্যা করার ইচ্ছা। তীর্থযাত্রার তিনমাস আগে থাকতে হরিদ্বারের একটি টিকিট কেটেছেন তিনি। কারণ পূজার সময় ট্রেনের টিকিট পাওয়া খুব মুশকিল। আনন্দে উৎসাহে নবীন সন্ন্যাসী প্রস্তুত হচ্ছেন—শীতের কাপড়-জামা, টুকিটাকি সব জিনিসপত্রও সংগ্রহ করে ফেলেছেন।

২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪। যাত্রার দুদিন আগে তিনি পূজ্যপাদ মহারাজের আশীর্বাদ নিতে মঠে গেলেন। তিনি প্রণাম করে নিবেদন করলেন : মহারাজ, ২৪ তারিখ রাত্রে দুন এক্সপ্রেসে কেদার-বদরী-গঙ্গোত্রী তীর্থ-দর্শনে যাত্রা করছি।

পূজ্যপাদ মহারাজ বললেন : বিহারের সহরসা জেলায় বন্যায় হাজার হাজার মানুষ মরছে। তাদের সেবা করতে যাবে, না আগে কেদার-বদরী দর্শনে যাবে? এই দুটোর মধ্যে কোন্‌টা তোমার ভাল বলে মনে হয়? স্বামীজী দুঃখক্লিষ্ট মানুষের সেবার কথা বলেছেন। তাদের সেবা না করে তুমি তীর্থে যাবে?

নবীন সন্ন্যাসী কিছু সময় চুপ করে রইলেন। পূজ্যপাদ মহারাজ আবার বললেন : কী তাদের সেবা করবে, না তীর্থে যাবে?—দুটোর মধ্যে কোন্‌টি তোমার ভাল বলে মনে হয়?

নবীন সন্ন্যাসী : মহারাজ, আপনি যা আদেশ করবেন আমি তাই করব।

মহারাজ : তুমি কাল ভেবে বল। তীর্থে পরে গেলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু এদের সেবার এক্ষুণি প্রয়োজন। আজ যাও, কাল এসে আমাকে বলবে তোমার কি ইচ্ছা।

নবীন সন্ন্যাসী পরের দিন সকালে মঠে গিয়ে পূজ্যপাদ মহারাজকে জানালেন : মহারাজ, আমি রিলিফেই যাব। —শুনে মহারাজ খুব খুশি হয়ে তাঁর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তীর্থে যাওয়ার তিনমাসের প্রস্তুতি সব ভেস্তে গেল। নবীন সন্ন্যাসী ২৩ সেপ্টেম্বর অন্যান্য সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীর সঙ্গে পাটনায় রওনা হলেন।

২৪ তারিখ দুপুরে তাঁরা পাটনা আশ্রমে পৌঁছে গেলেন। বিহার সরকার বন্যার কাজের জন্য সবরকম সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু নানা কারণে সাহায্য করতে সরকার পক্ষের দেরী হচ্ছিল। দেরী করে ত্রাণ-কার্য যখন আরম্ভ হল তখন দেখা গেল সেখানকার মানুষের সেবার প্রয়োজন অনেক কমে গেছে—এত লোকের সেখানে দরকার নেই। ফলে অনেকে বেলুড় মঠে চলে এলেন। এবং উক্ত নবীন সন্ন্যাসীকেও জানানো হল—পূজ্যপাদ মহারাজ তাঁকে এইবার তীর্থ-দর্শনের অনুমতি দিয়েছেন। নবীন সন্ন্যাসী তো আনন্দে আটখানা। তিনি ভাবতেই পারছিলেন না যে পূজ্যপাদ মহারাজ তাঁকে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন : পূজ্যপাদ মহারাজের দুঃখপীড়িত মানুষের জন্য একদিকে কী অপার করুণা, আর একদিকে নবীন সাধুর তীর্থ-দর্শন ও তপস্যার প্রয়োজনটিকেও উপেক্ষা না করা। মানুষের সেবা এবং ধ্যান-তপস্যা-পূজা তাঁর কাছে উভয়ই সমান। 'Work and worship' এবং 'Work is worship'—স্বামীজী এই দুই শিক্ষাই পূজ্যপাদ বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের জীবনে রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

মহীরুহ

শ্রীসুনীল সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন অধিকর্তা।

শৈশবে এক বিশাল বটবৃক্ষকে ভালবাসতাম।
অন্তরের যত প্রশ্ন, যত ক্ষণিকের বেদনা,
তার ছায়াতলে বসে অনুচ্চারিত কণ্ঠে
উজাড় করে দিতাম।
কবে একদিন সেই বটবৃক্ষ হারিয়ে গেল।
তারপর জীবনের প্রশ্ন সঞ্চিত হতে হতে
উত্তপ্ত হয়ে ফুঁসতে লাগল
উত্তর না পেয়ে।
তাপদগ্ধ আমি সেই হারিয়ে যাওয়া—
বটবৃক্ষের সন্ধানে আবার বেরিয়ে পড়লাম।
অবশেষে সেই বটবৃক্ষ নতুন আকারে
একদিন দেখা দিল।
পরম করুণায় তার বিশাল ছায়াময় প্রাঙ্গণে
টেনে নিল।
অনুচ্চারিত কণ্ঠে বলা প্রশ্নের জবাব মিলল।
অন্তরে সিঞ্চিত হল শান্তিবারি।
মাঝে মাঝে মনে হত এই শীর্ণকায় বৃদ্ধ
সন্ন্যাসী-দেহ
এমন বিশাল মহীরুহ ?
ছত্রছায়ায় যাঁর অগণিত তাপদগ্ধজন
ছুটে আসে
জুড়াইতে ক্লান্তদগ্ধ হিয়া ?
সারিবদ্ধ মানুষের মাঝে বেদনাক্লিষ্ট
পরিচিত মুখ
ধীরপদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন,
ফিরে এলেন হাসিমুখে।
প্রশ্ন করি—বোঝা নামল ?
পেলেন কি আনন্দের বাণী ?
পাব না মানে ? এযে বীরেশ্বর-আনন্দের
খনি,
সর্বনিরানন্দ—অপহারক বলে এঁরে গণি।
এই বিষণ্ণ সন্ধ্যায় বার্তা নেমে এল
নেই সে মহীরুহ নেই।
মহাজীবনের যাত্রা সাঙ্গ করি—
মহাসমাধিতে লীন।
নদী যথা নামরূপ ছাড়ি—
মহাসমুদ্রে বিলীন।
নিস্তব্ধ রজনী, মৌন গঙ্গাতীর।
অগণিত জনস্রোত মাঝে চলেছি—
শূন্য হৃদয়,
প্রতিপদক্ষেপ ক্লান্ত ধীর।
অবশেষে সেই দেবতনু হেরি
আনত মস্তকে পাদপদ্ম স্পর্শ করি
রেখে দিলাম আমার শেষ প্রণতি।
কান্নাভেজা অবরুদ্ধ কণ্ঠে অস্ফুট প্রশ্নের
জবাব মিলল,—
না, ঘুমায়ে পড়েনি মহীরুহ।
রামকৃষ্ণ-মহামহীরুহে মিশে গিয়ে
ঘটে নব সংযোজন।
এ যাত্রার সাঙ্গ নেই,
বহু সাধকের গাঁথা চিরন্তন প্রবাহিত
এ মহাজীবন।

সুভাষচন্দ্রের জীবন ও চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দ

অধ্যাপক প্রসাদ বসু

[মাঘ, ১৩৯১ সংখ্যার পর]

৩

এর পরে সুভাষচন্দ্রের জীবনের কলেজ-পর্ব, মানে প্রেসিডেন্সি কলেজ-পর্ব। অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ এই কাল। তীব্র ধর্মানুরক্তি, আবার কিছু-কিছু ধর্মীয় ধারণার বিয়োগ—এইকালেই ঘটেছে। রাজনৈতিক চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে, যদিও তা গভীর হয়নি। কিন্তু তাঁর কাজ রাজনৈতিক তরঙ্গের কারণ হয়েছে—সুবিখ্যাত ওটেন-প্রহার ঘটনার সূত্রে।

এই পর্ব সম্বন্ধে অন্তরঙ্গ সংবাদ সুভাষচন্দ্রের আত্মজীবনীতে রয়েছে—সেই সঙ্গে আছে তাঁর পত্রাবলীতে। উল্লেখযোগ্য স্মৃতিকথা মিলেছে ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ, ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, হেমন্তকুমার সরকার এবং দিলীপকুমার রায়ের রচনায়।

প্রাপ্ত সংবাদগুলি দুই অংশে বিভাজ্য—এক, ধর্মজীবন সংক্রান্ত, দুই, সামাজিক ধারণা সংক্রান্ত।

কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়ে সুভাষচন্দ্র একটি বিশেষ দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, যার অন্তর্ভুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যুগলকিশোর আঢ্য, প্রফুল্ল ঘোষ, হেমন্তকুমার সরকার, হরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। এই দলটি, সুভাষচন্দ্র বলেছেন, "নিজেদের রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিকতার উত্তরাধিকারী বলে মনে করত।" "আমাদের নব্য বিবেকানন্দগোষ্ঠী বলা যেতে পারত।"

সুভাষচন্দ্রের উপর দলটির বিশেষ প্রভাব গোড়ার দিকে অবশ্যই ছিল। এই দলের সঙ্গে তিনি ধর্মসাধনা করতে নানা ধর্মীয় স্থানে ঘুরেছেন, নিয়মিত বেলুড় ও দক্ষিণেশ্বরে গেছেন, শান্তিপুরে গিয়ে গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী সেজেছেন, উদাত্ত কণ্ঠে স্তোত্রগান করেছেন ও বিবেকানন্দের রচনা পড়েছেন—এসকলই সংশ্লিষ্ট স্মৃতিকথাগুলি থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু এও দেখা যায়, সুভাষচন্দ্র খুব বেশিদিন দলটির মধ্যে নিজেকে আটকে রাখতে পারেননি। এমনই ছিল তাঁর ব্যক্তিগত নীতি ও আদর্শের উপর নির্ভরতা এবং তাকে বাস্তবায়িত করার মতো শক্তি যে, গোষ্ঠিনির্দেশের সবটুকু মানা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। সুভাষচন্দ্রের মতো মানুষ নিজের খাত নিজেই কেটে চলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজ-কালেই দেখা যাবে—সুভাষচন্দ্রের জীবনে ধর্মসাধনা ও লোকসেবা—এই উভয়কে গ্রহণের ব্যাপারে মাত্রাভেদ ঘটে গেছে এবং এক্ষেত্রেও সুভাষ বিবেকানন্দকেই দিশারিরূপে পেয়েছেন। আগেই বলেছি—কটকে বিদ্যালয়-জীবনেই ধর্মসাধনার সঙ্গে লোকসেবার আকাঙ্ক্ষা জড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রাধান্য ছিল ধর্মসাধনার। প্রেসিডেন্সি কলেজ-পর্বে গোড়ার দিকে ধর্মসাধনার তীব্রতা অধিকতর হলেও শেষের দিকে লোকসেবার আপেক্ষিক প্রাধান্য ঘটে যায়। এই মাত্রা-পার্থক্যের ক্ষেত্রে তাঁর কোন চিত্তসংকট ঘটেনি, কারণ বিবেকানন্দের নির্দেশ ছিল আশু লোকসেবার জন্য এবং তিনি সেবাকে ধর্ম বলে নির্দেশ করেছেন। এরই সঙ্গে তৃতীয় মাত্রা যুক্ত হবে—রাজনীতি।

প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশের কালে ধর্মানুরক্তি সুভাষচন্দ্রকে কী দিয়েছিল সে সম্বন্ধে কিছু গভীর বিশ্লেষণাত্মক উক্তি তিনি করেছেন। প্রথমত বলেন, শহর কলকাতার প্রলোভনের গহ্বরে তিনি স্খলিত হয়ে পড়েননি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্মীয় আদর্শকে ব্যবহারিক জীবনে

পূর্বেই গ্রহণ করেছিলেন বলে। জীবন সম্পর্কে তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন : আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও লোকসেবাই হবে লক্ষ্য, অর্থোপার্জনের চেষ্টা করবেন না, এবং জীবনসমস্যার গভীর রূপ বুঝতে ও তার সমাধান করতে দর্শন-চর্চা করে যাবেন। এই সিদ্ধান্তের মূলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, যাঁদের তিনি "বাস্তব জীবনে যথাসম্ভব অনুসরণ করে" যাবেন। তারপর সুভাষচন্দ্র বলেছেন, ঈশ্বর, আত্মা, বা ধর্মের চরম মূল্য সম্বন্ধে যে-প্রশ্নই উত্থাপন করা হোক—ধর্ম তাঁকে "জীবনের গুরুত্ব" বুঝতে শিখিয়েছিল। ধর্মাশ্রয়ে শরীর ও মনের নিয়মিত অনুশীলন করে তিনি শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। বহু প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি বর্তমান আস্তিকতা ও নাস্তিকতার দার্শনিক দ্বন্দ্বের উল্লেখের পরে তিনি লিখেছেন, "যাই হোক, আমার নিজের ক্ষেত্রে ধর্মীয় সাধনা ছিল একটি বাস্তব প্রয়োজন। যে-জ্ঞানগত সংশয় আমাকে পীড়া দিত তা নিরসনের প্রয়োজন হয়েছিল এবং আমার মানসিক অবস্থা তখন যেরূপ দাঁড়িয়েছিল তাতে যুক্তিসঙ্গত কোন দর্শন ব্যতীত ঐ নিরসন সম্ভব হত না। বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণের মধ্যে যে-দর্শন আমি খুঁজে পেয়েছিলাম তা আমার বাস্তব প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল, তাকে ভিত্তি করে আমার নৈতিক ও বাস্তব জীবন নতুন করে গড়ে তুলতে পেরেছিলাম—তার সাহায্যে কয়েকটি মূল নীতি শিখেছিলাম যাদের দ্বারা সমস্যা বা সংকট দেখা দিলেই আচরণ বা কার্যদ্বারা নিরসন করা সম্ভব হত।"

একটি ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণের আদর্শ তাঁর কঠিনতম অন্তর্যাতনার কারণ। রামকৃষ্ণ কামপ্রবৃত্তিকে মোড় ঘুরিয়ে ঊর্ধ্বায়িত করতে বলেছেন। যৌনপ্রবৃত্তির সঙ্গে তীব্রতম সংগ্রামে নিযুক্ত যুবক সুভাষচন্দ্র অনুভব করেছেন—কামপ্রবৃত্তি হয়তো দমন করা যায়, কিন্তু তাকে ঊর্ধ্বায়িত করা কার্যত অসম্ভব—ও-কাজ রামকৃষ্ণের পক্ষেই করা সম্ভব। পরবর্তিকালে আত্মজীবনী লেখার সময়ে সুভাষচন্দ্র সংশায়িত প্রশ্ন তুলেছেন—যৌবনকালে প্রবৃত্তির সঙ্গে এই ধরনের আপসহীন সংগ্রামের ঔচিত্য সত্যই আছে কিনা বিশেষত যাঁরা সন্ন্যাসজীবন নয় জনসেবার জীবনকে বরণ করবেন? সুভাষচন্দ্র যখন আত্মজীবনী লিখছেন তখনই তিনি শ্রীমতী এমিল শেঙ্কলের সঙ্গে প্রীতি-বদ্ধ, সম্ভবত তাঁকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত করেছেন—সেক্ষেত্রে ঐ প্রশ্ন তিনি করবেনই। কিন্তু একথাও তিনি স্বীকার করেছেন—প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম তাঁর ক্ষেত্রে শুভদায়ী হয়েছিল। "যৌন-সংযমকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে যদি কোন ভুল করে থাকি, সে ভুলে সম্ভবত আমার ভালই হয়েছে, কেননা তার দ্বারা ঘটনাচক্রে আমি উপকৃত হয়েছিলাম। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি, এর ফলে নিজেকে এমন একটা জীবনের জন্য তৈরি করে তুলেছিলাম যা চিরাচরিত পথ ধরে চলবে না, এবং যাতে স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ ও নিজের বৈষয়িক উন্নতির কোন স্থান নেই।"

কামপ্রবৃত্তির সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রামের ঔচিত্যের বিষয়ে প্রশ্ন তোলার পরে, ঐ সংগ্রামের যে-সকল শুভফলের কথা তিনি বলেছেন (যা সুভাষচন্দ্রকে সুভাষচন্দ্র করে তুলেছিল)—তার দ্বারা ঔচিত্য বিষয়ে তাঁর উত্থাপিত সংশয় নিরতিশয় লঘু হয়ে পড়েছে।

সুভাষচন্দ্রের ধর্মোৎসাহের এক বিশেষ প্রকাশ—সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে গুরু সন্ধানের চেষ্টা এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মের ছুটিতে (বয়স তখন ১৭) ব্যাকুলচিত্তে গৃহত্যাগ ও উত্তর ভারতের তীর্থস্থানগুলি দর্শন। গুরু মেলেনি—অধিকন্তু সাধু-সন্ন্যাসী সম্বন্ধে কিছু মোহভঙ্গ ঘটেছিল—কারণ তিনি ওঁদের কথায় ও কাজে

পার্থক্য দেখেছিলেন, মুখে অদ্বৈতবাদ কিন্তু কার্যকালে ছুঁৎমার্গ ইত্যাদি। (অর্থাৎ বিবেকানন্দের উক্তিকে প্রত্যক্ষ করলেন তিনি !)। ভাল সাধুও দেখেছেন। বৃন্দাবনে বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধু রামদাস বাবাজির সঙ্গে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ নিয়েও আলোচনা করেছেন। রামদাস বাবাজি তাঁকে দ্বৈতবাদী বৈষ্ণবদর্শনের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র যদিও শঙ্করাচার্যের মায়াবাদকে "জীবনে মানিয়ে নিতে" পারছিলেন না, তাঁর কাছে "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শিক্ষা অধিকতর বাস্তব" বলে প্রতীয়মান হয়েছিল—তবু শঙ্করাচার্যের মতকে তিনি হিন্দুধর্মের সার বলে তখনও মনে করেছেন, তাই রামদাস বাবাজির কথাকে পরিপাক করা সম্ভব হয়নি।

কাশীতে তাঁর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দের সাক্ষাৎ হয়। সেই সাক্ষাতের উল্লেখ সুভাষচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে করেছেন, যদিও ব্রহ্মানন্দই যে তাঁকে কর্মজীবনে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তা বলেননি সেখানে। সেকথা কিন্তু তিনি বারবার বলেছেন বন্ধুবান্ধবদের কাছে, আর তাঁরা তা লিখেও গেছেন। যথা, দিলীপকুমার রায় যখন নিজের বিষয়ে বলেছেন, কৈশোরে তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে গিয়েছিলেন, সেই মহাযোগীর দর্শনে পেয়েছিলেন অপরূপ শান্তি—তাঁর মুখে সেকথা শুনে যুবক সুভাষচন্দ্রের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল, দিলীপের দু-হাত চেপে ধরে তিনি বলেছিলেন, "যে কৃপা পায় তার জীবন বদলে যায়ই।··· আমিও পেয়েছি এ-কৃপার আভাস। তাইতো চাই দেশের কাজে জীবন ঢেলে সার্থক হতে। এও তোমাকে বলেছি, ঐ রাখাল মহারাজই [স্বামী ব্রহ্মানন্দ] আমাকে কাশী থেকে ফিরিয়ে পাঠান, বলেন, 'তোমাকে দেশের কাজ করতে হবে'।" ['স্মৃতিচারণ', পৃঃ ৩২৭]।

পরে ইংলণ্ডে পাঠকালেও সুভাষচন্দ্র দিলীপকুমারকে একই কথা বলেছেন। [ঐ, পৃঃ ৩৩৫]। এইসঙ্গে সুভাষচন্দ্র আরও বলেছেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপদেশের পরে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের লেখার দিকে ঝোঁকেন এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। এক্ষেত্রে দিলীপকুমারের স্মৃতি হয়তো প্রতারণা করেছে, কারণ স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথা শোনার কয়েক বৎসর আগে থেকে সুভাষচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আকৃষ্ট—যে-কথা দিলীপকুমারের স্মৃতিকথার অন্যত্র পাওয়া যায়। ঐ কথার একমাত্র সঙ্গত অর্থ হতে পারে—স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথা শোনার পরে তিনি বিশেষভাবে বিবেকানন্দের দেশপ্রেমাত্মক উক্তির বিষয়ে আকৃষ্ট হন—আর তা সত্য হতেই পারে, যা আমরা অন্য সূত্র থেকেও অনুমান করতে পারি।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র কি স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপদেশ তৎক্ষণাৎ পূর্ণপ্রাণে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন? মনে হয় না। তিনি মনে করেছিলেন (আমার তাই অনুমান), ব্রহ্মানন্দ যে গভীর অধ্যাত্মলোকে স্বয়ং অধিষ্ঠিত, তার অধিকার না দিয়ে উপেক্ষাভরে ফিরিয়ে দিয়েছেন। সুভাষের পক্ষে তখনি বোঝা সম্ভব হয়নি—ব্রহ্মানন্দ কী পরিমাণে লোকচরিত্র অনুধাবনে সমর্থ। বৌদ্ধিক অথবা আধ্যাত্মিক, যে-শক্তিতেই হোক, স্বামী ব্রহ্মানন্দ মানবচরিত্রের গভীরে সহজে প্রবেশ করতে পারতেন, তেমন ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত তাঁর জীবন-কাহিনীতে মেলে। সুভাষচন্দ্রকে দেখেই তিনি বুঝেছিলেন, তাঁর আসল কর্মক্ষেত্র কী। তদনুযায়ী তাঁকে ঘরে ফিরতে বলেন। ঘরে ফেরার বৎসরাধিক পরে এক চিঠিতে (৩.১০. ১৯১৫) সুভাষ লেখেন: "একদিকে···ব্রহ্মানন্দের কথা মনে পড়ে—অপরদিকে পাশ্চাত্ত্য আদর্শ—Life is activity. একদিকে Silent and peaceful life of an introspective Yogi who has

realised the futility of the world—অপরদিকে পাশ্চাত্ত্যদের প্রকাণ্ড **laboratory**, তাহাদের বিজ্ঞান দর্শন, তাহাদের আবিষ্কৃত ও উদ্‌ভাবিত অদ্ভুত জ্ঞানরাশি।" পরিষ্কার বোঝা যায়, সুভাষচন্দ্র এখনও চিন্তায় ও কর্মোদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ সুস্থির হননি, নচেৎ তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠত—ঐ দুই জীবন-সত্যের সমন্বয়ের কথাই স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেছেন, এবং ব্রহ্মানন্দ স্বয়ং আত্মলীন পুরুষ হয়েও ঐ সমন্বিত জীবনের সন্ধানে সুভাষচন্দ্রকে প্রণোদিত করেছেন।

প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরে লেখা চিঠিতে (১৯.৬.১৯১৪) সন্ন্যাসের আবেগ উত্তাপ যথেষ্টই আছে দেখা যায়। হাওড়ার এক গণৎকার গণনা করে তাঁর পরিবারের লোকজনদের বলেন, বিরোধীশক্তির বাধায় সুভাষ সন্ন্যাসী হতে পারবেন না, সংসারী হবেন—তাতে সুভাষচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া : "তাঁর মাথায় লাঠি, তিনি কচুপোড়া জানেন।" বাবার সঙ্গে জীবনোদ্দেশ্য নিয়ে একান্ত আলোচনা কালে তিনি সন্ন্যাসের পক্ষেই বলেছিলেন। মা ও বাবার স্নেহাবেগ সম্বন্ধে অত্যন্ত মানসিক নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছেন। তাঁকে ফিরে পেয়ে মা আর্তনাদ করে বলেছিলেন, "আমার মৃত্যুর জন্য তোমার জন্ম।" সংযত গম্ভীর পিতা পর্যন্ত সুভাষকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলেন। সুভাষ লিখেছেন, "তাঁরা কাঁদিলেন, আমি হাসিলাম।" পিতা যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র সেন বা শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শের কথা তুলেছিলেন—তখন সুভাষ বলেন, "বিবেকানন্দের **ideal** হচ্ছে আমার **ideal**."

কিন্তু বিবেকানন্দের কোন্ আইডিয়াল? অথবা, বিবেকানন্দের আইডিয়ালকে সুভাষচন্দ্র কিভাবে বুঝেছিলেন?

প্রসঙ্গটি পরিষ্কার হবে সুভাষচন্দ্রের গুরু-সন্ধানের অন্য একদিকে দৃষ্টি দিলে।

সুভাষচন্দ্র পণ্ডিচেরীতে যোগরত শ্রীঅরবিন্দকে সাক্ষাৎ গুরুরূপে পেতে চেয়েছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীতে দেখি, প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর ছাত্রাবস্থায় শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে নানা ধরনের কথা ও কল্পনায় চারিদিক পূর্ণ ছিল, যথা, যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করে তিনি অলৌকিক শক্তিসহ অবতীর্ণ হয়ে ভারতকে স্বাধীন করে দেবেন। এহেন কল্পনার মাদকতায় আচ্ছন্ন হয়েও সুভাষচন্দ্রের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, "মানুষের মন যখন কোন অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক বাধার সম্মুখীন হয় তখন তা আধ্যাত্মিক উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করে।" সুভাষচন্দ্রকে কলেজ-জীবনে আকৃষ্ট করেছিল অরবিন্দের রচনা ও পত্র, যার মধ্যে ছিল "আধ্যাত্মিকতা-মিশ্রিত রাজনীতি।" আর সুভাষচন্দ্রকে সত্যকার মুগ্ধ করেছিল অরবিন্দর "গভীরতর দর্শন"—যা যোগ-সমন্বয়-তত্ত্বের মধ্যে প্রকাশিত। অরবিন্দ-দর্শন তাঁকে একটি অন্তঃক্ষয়কারী দার্শনিক দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত করে। সুভাষচন্দ্র যখন সন্ন্যাসী হতে চেয়েছেন তখন সন্ন্যাসীদের প্রধান আচার্য শঙ্করাচার্যের মায়াবাদকে তিনি প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতে সচেষ্ট। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের রক্তে ছিল এই বাস্তব জীবনের প্রতি ভালবাসা—সেখানে শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের প্রচলিত ব্যাখ্যা তাঁর কাছে প্রদাহী অগ্নি। গুরু-সন্ধানে বেরিয়ে রামদাস বাবাজির কাছে তিনি শঙ্কর-বিরোধী কথা শুনে খুশি হতে পারেননি অথচ তখনই তাঁর মধ্যে শঙ্করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জেগে উঠেছে। প্রত্যাবর্তনের পরে পিতার সঙ্গে আলোচনাকালে শঙ্করাচার্যের দর্শনের প্রতি প্রীতি দেখিয়ে "ব্রহ্ম-সত্য জগন্মিথ্যা" তত্ত্বকে পারমার্থিক সত্য বলে স্বীকার করার কালেই তিনি বলেছেন, বিবেকানন্দ আমার আদর্শ—যে-বিবেকানন্দ, তাঁর মতে, শঙ্করাচার্যকে সংশোধিত আকারে উপস্থিত

করেছেন। আত্মজীবনীতে অরবিন্দ-দর্শনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেছেন—তা শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ কাটিয়ে উঠতে তাঁকে সাহায্য করেছিল। তিনি একথা স্বীকার করেছেন, "এক ও বহু, এবং ঈশ্বর ও সৃষ্টির মধ্যে সমন্বয়" তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে লাভ করেন, তা তাঁর মনে রেখাপাতও করেছিল, কিন্তু "তখনও পর্যন্ত তা মায়ার বন্ধন থেকে" তাঁকে মুক্তি দিতে পারেনি—যা করেছিল অরবিন্দর "আত্মা ও জড়, ঈশ্বর ও সৃষ্টির মধ্যে সমন্বয়" এবং "যোগসমন্বয়"। তিনি বলেছেন, "চরিত্রকে সব দিক দিয়ে গড়ে তোলার জন্য জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের প্রয়োজনের কথা অবশ্য বিবেকানন্দ স্বীকার করেছেন, কিন্তু যোগের সমন্বয় সম্বন্ধে অরবিন্দের ধারণার মধ্যে মৌলিক ও অতুলনীয় কিছু ছিল।" তিনি শেষ করেছেন এই বলে, "অরবিন্দকে মানবসমাজের আদর্শ গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে যা আবশ্যিক ছিল তা হল সক্রিয় জীবনে তাঁর প্রত্যাবর্তন।"

এই রচনা থেকে সুভাষচন্দ্রের কৈশোর ও যৌবনের আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক সংকটের রূপ অনেকটা বুঝতে পারি। প্রথমত, তাঁর মধ্যে সন্ন্যাসের একটা প্রবল প্রেরণা ছিল; দ্বিতীয়ত, সন্ন্যাস-বিরোধী টানও অনুরূপ প্রবল। এই দুই প্রান্তকে মেলাবার চেষ্টায় নিয়োজিত তিনি, এবং যথাসম্ভব তাতে সফল। কিন্তু ঐ দ্বন্দ্ব চলাকালে তিনি জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে অপরের প্রতি অবিচার করেছেন।

কথাটা ব্যাখ্যা করলে এই দাঁড়ায়। সন্ন্যাসের প্রতি আকর্ষণে তিনি মায়াবাদী, শঙ্করের অনুগামী। বিপরীত আকর্ষণে শঙ্কর-বিরোধী। শঙ্করাচার্যের প্রভাব কাটাতে সহায়ক বলে অরবিন্দ-দর্শনের প্রতি অনুরক্ত, এবং সেজন্য এমনকি নিজ আরাধ্য বিবেকানন্দ অপেক্ষা দর্শন-ক্ষেত্রে অরবিন্দকে গভীরতর বলতে ইচ্ছুক। এই কথা বলার সময়ে বিস্মৃত—বিবেকানন্দ প্রচলিত অর্থে দার্শনিক নন, তিনি পথ প্রদর্শক, এবং দার্শনিকরা তাঁর থেকে প্রাপ্ত ইঙ্গিতের অনুসরণে পূর্ণায়ত দর্শন রচনাকারী, যা শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ করেছেন। আরও লক্ষণীয়, সুভাষচন্দ্রের বিবেকানন্দ-বিষয়ক প্রচুর বক্তব্যের মধ্যে বিবেকানন্দ-দর্শনের গভীর অংশের কোন উপস্থাপনা নেই।

অপরদিকে আবার তিনি দার্শনিকভাবে শ্রীঅরবিন্দকে গ্রাহ্য মনে করেও, কেন শ্রীঅরবিন্দ সক্রিয় জীবনে প্রত্যাবর্তন করছেন না, তাই নিয়ে অবুঝ অভিমানে, এমনকি অভিযোগে মুখর। তা করবার সময়ে বিস্মৃত হয়েছেন যে, দার্শনিকরা বা অধ্যাত্ম-দার্শনিকরা সুসংহত চিন্তার দ্বারা যে তত্ত্ব উপস্থিত করেন, তাকে লোকজীবনে বাস্তবায়িত করার দায় তাঁরা বহন নাও করতে পারেন।

এক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছে বিবেকানন্দের কাছেই—যাঁর মধ্যে তিনি নিজ জীবনের বৃহতীকৃত প্রতিরূপ দেখেছিলেন, যদিও স্বীকার্য, এই দুইজন স্বরূপত দুই প্রান্তবর্তী—বিবেকানন্দ স্বরূপে সন্ন্যাসী, আর সুভাষচন্দ্র স্বরূপে সংসারী। কিন্তু বিবেকানন্দের ছিল মানুষের জন্য অনন্ত ভালবাসা, তাই তাঁর সন্ন্যাসের উত্তরীয় তিনি মানুষের আশ্রয়ের জন্য বিস্তৃত করে দিয়েছিলেন; আর সুভাষচন্দ্রের ছিল সন্ন্যাসের প্রতি উৎকণ্ঠিত প্রীতি—সন্ন্যাসের ত্যাগকে চরিত্রে জ্বালিয়ে রেখে তিনি লৌকিক মানুষের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন।

শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের আকর্ষণ-বিকর্ষণ-কথা দিলীপকুমার নানা প্রসঙ্গে বলেছেন। মান্দালয় থেকে দিলীপকুমারকে লিখেছিলেন, "আমি তোমার সঙ্গে একমত যে মানুষের পক্ষে নির্জন ধ্যানের প্রয়োজন আছে, কোন-কোন সময়ে এই ধ্যানের কাল বেশি হওয়াও অবাঞ্ছনীয়

নয়। কিন্তু এতে একটা বিপদ আছে—বেশিদিন সমাজের জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলে কর্ম-যোগের দিকটা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।" ['আমার বন্ধু সুভাষ', পৃঃ ৯২]। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেস চলাকালে যুবসম্মেলনে সুভাষচন্দ্র পণ্ডিচেরীর দর্শন, যা নির্জন ধ্যানে উৎসাহদানকারী, তাকে প্রকাশ্যে আক্রমণ করে-ছিলেন। তারপর ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে জেল থেকে মুক্ত হবার পরে, তাঁকে আধ্যাত্মিক শান্তি দেবার জন্য উৎকণ্ঠিত দিলীপকুমার যখন পণ্ডিচেরীর আশ্রমে তাঁকে প্রবেশ করাতে ব্যস্ততা দেখিয়েছেন, তখন উত্ত্যক্ত সুভাষচন্দ্র কঠোরভাবে পত্র লিখে দিলীপকুমারকে নিরস্ত করেন। দেশের সেরা সন্তানেরা অন্ধ বিশ্বাসের পিছনে ছুটবে, মানুষকে ভগবানের আসনে বসাবে, সেই সকল অবতারেরা নির্বিবাদে ভক্তদের ঘাড়ে চড়ে বসবেন—এই মনের দৈন্যে তাঁর ক্ষোভের সীমা ছিল না। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, "'যোগ জীবনকে বাদ দিয়ে নয়' —শ্রীঅরবিন্দের এই বাণীর সঙ্গে তোমাদের নির্জন জীবনযাত্রার মিল কোথায়?" [ঐ, পৃঃ ৯৮—৯৯]। দিলীপকুমার একই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "[সুভাষ] মনে করত যে, অন্তত ভারতের দুর্দিনে দিশারি এক বিবেকানন্দই হতে পারেন, আর কেউ নয়। শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে সে ছিল দোমনা। কখন-কখন তাঁর নানা গভীর বাণীতে অভিভূত হত বটে, কিন্তু তাঁর দেশের কাজ ছেড়ে একান্তভাবে অজ্ঞাতবাস বরণ করে নেওয়াতে কিছুতে তার মনপ্রাণ সায় দিত না। বলতো প্রায়ই, 'তাঁর আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য ও শক্তি নিয়ে তিনি যদি আমাদের তামসিকতার রূপান্তর ঘটাতে না পারেন তবে তিনি কিসের যোগী'?" সুভাষচন্দ্র এর সঙ্গে যোগ করতেন, "বেশিদিন সর্ববিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার ফলে মানুষের কর্মশক্তি নিস্তেজ হয়ে যায় বলেই আমার ভয় হয় যে, শ্রীঅরবিন্দকে আমরা হারিয়েছি বা। সামাজিকতা ও নিঃসঙ্গতা, দুয়ের হার্মনিতেই একজন মস্ত মানুষ গড়ে ওঠে, যেমন বিবেকানন্দ, তিলক, রবীন্দ্রনাথ। শ্রীঅরবিন্দ মহাপ্রতিভাবান সন্দেহ নেই, কিন্তু—।" [স্মৃতিচারণ, পৃঃ ৩০৫]। দিলীপ যখন তর্কচ্ছলে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বাত্মক ঈশ্বরমুখিতার কথা তুলতেন তখন সুভাষচন্দ্র তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন—মোক্ষলোভী বিবেকানন্দের প্রতি রামকৃষ্ণের উক্তি—"আমি ভেবেছিলুম, তুই বিরাট বটবৃক্ষ, বহুজনের আশ্রয় হবি," ইত্যাদি। [ঐ, পৃঃ ৩৩৬—৩৭]। মূঢ় গুরুভক্তিকে আক্রমণ করলেও পাছে এ সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে ভুল বোঝা হয় তাই তিনি দিলীপকুমারকে স্মরণ করিয়ে দেন, "তুমি তো জানো, গুরুবাদকে আমি অশ্রদ্ধা করি না—নিজেও তো আমি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্ত। কিন্তু অন্ধ গুরুবাদের যে বিপদ আছে সে সম্বন্ধে সাবধান থাকা দরকার। ...আমাদের ক্লৈব্যের মূল কারণ এই [ধরনের] গুরুবাদ। গুরুবাদ আমাদের কর্মপ্রেরণাকে নষ্ট করে দিয়েছে।" ['আমার বন্ধু সুভাষ', পৃঃ ১০৫]।

বিপরীত চিন্তায় আন্দোলিত সুভাষচন্দ্রের অসহিষ্ণুতা রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে ঐকালীন অযৌক্তিক সমালোচনাতেও দেখা যায়। প্রেসিডেন্সি কলেজে সুভাষচন্দ্র যে-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন সেই 'নব্য বিবেকানন্দগোষ্ঠী' মনে করতেন, রামকৃষ্ণ মিশন কেবল হাসপাতাল ইত্যাদির সাহায্যে সেবাকাজ করে স্বামীজীর শিক্ষাকে অবহেলা করছেন। আর এই গোষ্ঠী সমাজসেবা বলতে বুঝতেন "জাতীয় পুনর্গঠন, প্রধানত শিক্ষাক্ষেত্রে।" এই কাজ রামকৃষ্ণ মিশন অবহেলা করেছে ধরে নিয়ে এঁরা তাকে কার্যকর করতে চেয়েছিলেন। "আমাদের নব্য বিবেকানন্দগোষ্ঠীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—শুধু মতবাদের ক্ষেত্রেই নয়, বাস্তব জীবনেও ধর্ম ও

জাতীয়তাবাদের মধ্যে একটা সমন্বয়সাধন করা।" বলাবাহুল্য এখানেও সুভাষচন্দ্র যৌবনের ভাবাবেগে ভাবতে ভুলে গিয়েছিলেন, রামকৃষ্ণ মিশন সন্ন্যাসী সংঘ, তার অন্তর্ভুক্ত মানুষেরা সন্ন্যাসের সাধনা হিসাবেই লোকসেবার ব্রত নিয়েছেন—জাতীয় পুনর্গঠনের মূল ভার নেবার দায় বৃহত্তর জনসাধারণের—মুষ্টিমেয় কিছু সন্ন্যাসীর নয়। পরবর্তিকালে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মকাণ্ডের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, এবং তাতে যথাসম্ভব সাহায্য করে, সুভাষচন্দ্র তাঁর প্রথম যৌবনের একদেশী মনোভাবের সংশোধন করেছিলেন।

পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরলে দেখব, গুরু-অন্বেষণে ব্যর্থ সুভাষচন্দ্র ক্রমেই সন্ন্যাস-সাধনা থেকে সমাজসেবার দিকে ঝুঁকেছেন। তাঁর ঐ সময়ের সেবামূলক কাজ, শিক্ষামূলক কাজ, এমন কি যুবসংগঠনমূলক কাজের উল্লেখ তিনি আত্মজীবনীতে করেছেন। চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন, ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র তাঁর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে মানিকতলা ও অন্য একটি জায়গার বস্তীতে নৈশ বিদ্যালয় খুলে জনগণের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবধারা সঞ্চারের চেষ্টা করেছিলেন—সে প্রেরণার উৎস বিবেকানন্দই। ওটেন-ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত সুভাষচন্দ্র কটকে ফিরে গিয়ে কিভাবে স্বামীজীর মূল আদর্শ অনুযায়ী "বহু তরুণ একত্র করে তাদের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য বিভিন্ন বিভাগ-সহ সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন"—তার কথা সুভাষচন্দ্র আত্মজীবনীতে বলেছেন।

সমকালীন চিঠিপত্রে দেখা যায়, সুভাষচন্দ্র তখন আত্মপ্রস্তুতির জন্য 'intellectual preparation' চাইছেন—এবং 'intellectual ideal.' [১২. ৪. ১৫ পত্র]। ভারতীয় যুবকদের জন্য বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষিত আদর্শকে তিনি নিজের আদর্শ বলে ঘোষণা করেছেন: "যাক, আমি এখন বুঝিতেছি যে, মানুষ হইতে গেলে তিনটি জিনিস চাই: (1) Embodiment of the past, (2) Product of the present, (3) Prophet of the future." [৩১. ৮. ১৫ পত্র]। দর্শন-চর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা জোরের সঙ্গে বোঝাতেন, কারণ তা আবেগকে সংযত করবে, চিন্তায় আনবে প্রণালীবদ্ধ শৃঙ্খলা। জীবনের মৌল আদর্শকে কী প্রকার সংঘাতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে উপলব্ধি করতে হবে তা বোঝাতে বিবেকানন্দের উক্তির সাহায্য নিলেন: "নিজের বর্তমান জীবনকর্ম—সমস্ত harmonise করিবার জন্য একটা philosophy যে-রকম করে হউক গঠন কর। তারপর ঐ অনুসারে জীবন চালাও—এদিকে মনের ভিতরে সেটাকে প্রত্যেক মুহূর্তে ভাঙো এবং গড়ো—destroy and construct. Life progresses through continual construction and destruction···Something cannot come out of nothing. Man proceeds from Truth to higher Truth. We must pass through inconsistencies. They fulfil life." [১৬. ৯. ১৫ পত্র]। বিবেকানন্দের ভাবনা ঘুরে-ফিরে আসতে লাগল তাঁর পত্রে: "পাহাড়ে বেড়াতে-বেড়াতে এই কথা খুব মনে হয়—চাই শিরায়-শিরায় রজোগুণ। চাই লম্ফের দ্বারা পর্বত উল্লঙ্ঘন। যখন আর্যগণ এইরূপ করিত তখনই তাহাদের কণ্ঠ হইতে বেদগান ধ্বনিত হইয়াছিল।···We must begin from the land of our birth—the sacred Himalayas. ভারতে যদি কিছু অমূল্য—যদি কিছু ভাল থাকে—যদি কিছু গৌরব করিবার থাকে—সে সবের স্মৃতি হিমাচলের সহিত জড়িত।" [১৯. ১০. ১৫ পত্র]।

জীবনের এই পর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ অপেক্ষা বিবেকানন্দই সুভাষচন্দ্রের মৌল প্রেরণা-কারণ —তাই বলে তিনি রামকৃষ্ণকে বিস্মৃত হননি। একটি পত্রে বলেছেন, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা বাঙালীর দুর্বলতার মুখ্য কারণ [কথাটি বিবেকানন্দ বিশেষভাবে বলেছিলেন]; তাই তাকে "counteract করিবার জন্য একদল কঠোর puritanic principles-বিশিষ্ট যুবকবৃন্দ চাই। দেশের লোকের চোখ খুলে দেওয়া চাই। বাস্তবিক রামকৃষ্ণ জাতীয় চরিত্রের মূল ধরেছিলেন।" [৮. ১২. ১৫ পত্র]।

এর মাস দশেক আগে একটি চিঠিতে [৩. ১০. ১৪] তিনি যেভাবে রামকৃষ্ণ-চিত্র এঁকেছিলেন, তাতে বিহ্বল ভক্তি আর ভালবাসা ছাড়া কিছু ছিল না :

"মনে পড়ে একটি চিত্র—কালীমন্দির দক্ষিণেশ্বরে। সম্মুখে খড়্গহস্তা মা কালী—আনন্দময়ী—শিবের আসনের উপর অধিষ্ঠিতা—শতদলবাসিনী—তার সম্মুখে একটি বালক—বালক হইতেও বালপ্রকৃতি—আধ-আধ স্বরে কাঁদিতেছে, এবং কাকে যেন ডেকে-ডেকে বলিতেছে—'মা, এই নাও তোমার ভাল—এই নাই তোমার মন্দ। এই নাও তোমার পাপ—এই নাও তোমার পুণ্য।' করালমুখী ভীষণদংষ্ট্রা মা অল্পেতে সন্তুষ্ট নয়—সব গ্রাস করিতে চায়—তাই ভালও চাই, মন্দও চাই—পুণ্যও চাই, পাপও চাই। বালককে সবই দিতে হইবে—না দিলে শান্তি নাই—মাও ছাড়িবে না।

"বড় কষ্ট। মাকে সব দিতে হইবে। মা কিছুতেই সন্তুষ্ট না—তাই কাঁদিতেছে এবং বলিতেছে—'এই নাও, এই নাও।' দেখিতে-দেখিতে অশ্রুধারা বন্ধ হইল—গণ্ডস্থল ও বক্ষ শুকাইল—হৃদয় জুড়াইল—হৃদয়ে আর কিছু নাই —যেখানে ভীষণ কণ্টক যন্ত্রণা দিতেছিল, তার চিহ্নও নাই—সবই শান্তিময়। হৃদয় মধুতে ভরিয়া গেল। বালক উঠিল। আপনার বলিয়া তার আর কিছু নাই—সব দিয়ে ফেলেছে।

"বালকটি রামকৃষ্ণ।" [ক্রমশঃ]

আহ্বান

শ্রীকৃশানু লাহিড়ী

কিশোর কবি। শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজী কবিতার ছায়া অনুসরণে স্তবক রচনার প্রয়াস।

জগৎ-মাঝারে কর সন্ধান তাঁহার
আপন স্বরূপ তাঁরে জেনো, নৃপবর!
আত্মারে ঘেরিছে, হের, অজ্ঞান-তমসা
নিজ অভিলাষে। হিয়ে লয়ে সত্যতৃষা
অবিদ্যার অন্ধযাম করো করো জয়!
পূর্ণ নিরস্তকুহক শান্ত জ্যোতির্ময়॥

সাধ্য-সাধন তত্ত্ব ও শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব

স্বামী পরাশরানন্দ

অধ্যাপক, ব্রহ্মচারি-শিক্ষণকেন্দ্র, বেলুড় মঠ।

দক্ষিণ-ভারতের তীর্থ পরিক্রমা করতে করতে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী বিদ্যানগরের গোদাবরী নদীর তীরে এসে উপস্থিত,—সেখানেই সন্ধান মিলল রায় রামানন্দের। প্রথম সাক্ষাতেই উভয়ে আলিঙ্গনে বদ্ধ হলেন। পুণ্যতোয়া গোদাবরীর তীরে শ্রীচৈতন্য-অবতারের একটি মধুরতম অধ্যায় শুরু হল—প্রসঙ্গ ছিল সাধ্য-সাধন তত্ত্ব। জীবের সাধ্য বস্তু কি, আর তা পাবার উপায়ই বা কি—এই হল বিষয়; বক্তা রায় রামানন্দ, আর শ্রোতা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,—আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা,—বহির্মুখ জীব সংসারী জীবনে থেকে কিভাবে শ্রীভগবানে ভক্তি নিবেদন করে চিত্তশুদ্ধি করবে এই দিয়ে শুরু হল আলোচনা। রায় রামানন্দ পুরাণ, ভাগবত ও গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন,—সেই প্রাকৃত জীব কিভাবে শ্রীভগবানে ভক্তি লাভ করে ধীরে ধীরে ভক্তে পরিণত হয়। তারপর ভক্তি আরও উচ্চ অবস্থায় ভক্তের হৃদয়ে প্রেমসঞ্চার করে এবং সে প্রেমাভক্তি লাভ করে, তাও রায় ব্যাখ্যা করলেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের তৃপ্তি যেন হচ্ছে না,—তিনি আরও এগিয়ে যেতে বলছেন। ভগবানের সঙ্গে প্রেমিক ভক্তের দিব্য সম্বন্ধ এবার রায় শুরু করলেন,—দাস্যভাব, সখ্যভাব, বাৎসল্যভাবও ব্যাখ্যা করলেন,—ভগবানের ঐশ্বর্য নেই, চোখ ধাঁধানো দীপ্তি নেই। তিনি আপনার থেকে আপনার জন হয়েছেন; তারপর কান্তাভাবের অমৃতধারা বর্ষিত হল,—সেই ব্রজগোপীদের লীলামৃত যাঁরা গৃহ-স্বামী, আত্মীয়-স্বজন, কুল-মান সব কিছু পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন, কোনও বাধাই তাদের কাছে বাধা হয়ে ওঠেনি চৈতন্যদেবের আনন্দ আর ধরে না,—তিনি মহানন্দে বলে উঠলেন, 'তুমি আমায় খুবই আনন্দ দিলে,—সাধ্যের শেষ সীমা এই পর্যন্ত ঠিকই, কিন্তু তোমার হৃদয়-ভাণ্ডারে কি আর কিছুই অবশিষ্ট নাই?' রায় রামানন্দ হলেন নির্বাক, বিস্মিত, অধোমুখ; ভাবলেন যে, এর পরও কি আর কিছু জিজ্ঞাসা থাকতে পারে? তারপর মহাপ্রভুকে তৃপ্তিদানের উদ্দেশ্যে তাঁর হৃদয়-ভাণ্ডারের সর্বশেষ অমৃতধারা একটি দোঁহার মাধ্যমে প্রকাশ করলেন,—

> পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল
> অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।
> ন সো রমণ, হাম ন রমণী,
> দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি

—গান শুনে শ্রীচৈতন্য রামানন্দের মুখ সপ্রেমে চেপে ধরলেন,—যেন বলতে চাইলেন এই গোপনীয় প্রেমের তত্ত্ব সাধারণের জন্য নয়। প্রেমবিলাস বিবর্তবাদের চরম যে পরিণতি, প্রেমাস্পদের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া—এ সাধারণের জন্য নয়; তত্ত্ব হিসাবে, সিদ্ধান্ত হিসাবে ঠিক; ঠিক জগতে অতি সামান্য কয়েকজন উত্তম অধিকারীর জন্য,—কিন্তু সেই বৃত্তের বাইরের জন্য নয়,—তাদের জন্য আগের অবস্থা পর্যন্ত। সাধ্য-সাধন তত্ত্বের চরম পরিণতি যা 'ন সো রমণ, হাম ন রমণী'—এই দোঁহাচ্ছলে রায় বললেন,—এই ভাবটি কিরূপ?

সাধনার উচ্চ অবস্থায় সাধক সমস্ত মন-প্রাণ-চিত্ত দিয়ে শ্রীভগবানের উপাসনা শুরু করে ক্রমে তাঁর সকল ঐশ্বর্য ভুলে তাঁকে আপনার জন, প্রেমাস্পদ বলে ভাবতে শুরু করে; এই আপনার জ্ঞানে তাঁর প্রতি আবদার-অনুরোধ-অভিমান-

তিরস্কার ইত্যাদি যে-সব ভাবের সঙ্গে সে পরিচিত সেই ব্যবহার চলতে থাকে। অবশেষে ভাব-রাজ্যের চরমে সাধক প্রেমাস্পদের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে তন্ময় হয়ে যায় এবং প্রেমেরই প্রবল টানে তাঁর সঙ্গে মিলিত ও এক হয়ে অদ্বৈতভাব উপলব্ধি করে থাকে। এই হচ্ছে 'ন সো রমণ, হাম ন রমণী' ভাবের ভিতরের কথা।

ভাবরাজ্যের চরমে সর্বভাবের অতীত অদ্বয়-বস্তুর উপলব্ধির কথা প্রথমে স্ব-বিরোধী মনে হয় এবং আমাদের অভ্যস্ত মন মানতেও চায় না। আর তাছাড়া ভক্তিপথের আচার্যগণ এবং উন্নত সাধকগণও ও-কথা না বলায় আমরা যেন গ্রহণ করতে চাই না। আমরা তাঁদের নির্দেশ মতো চরমে চিন্ময় দেহে বৈকুণ্ঠে বা গোলকে শ্রীভগবানের নিত্য সেবকরূপকেই সাধ্য-বস্তুর চরম বলে ভেবে নিয়েছি; কিন্তু ভক্তিপথের আচার্যগণ বাইরে প্রচার না করলেও তাঁরা নিজেরা সেই অবস্থা লাভ করেছিলেন যাঁর সম্বন্ধে শ্রীভগবান গীতায় বলছেন, 'যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম'। পরমকারুণিক শ্রীভগবান করুণাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণলীলায় গোপগণকে এই 'স্বং লোকং তমসঃ পরম্'—গোলকধাম বা বৈকুণ্ঠদর্শন করালেন যার সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতকার বলছেন,—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্।
যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।২৮।১৫)

—শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে যে মায়াতীত ধাম দেখালেন তা সৎস্বরূপ (নির্বিকার), চিৎস্বরূপ, অপরিচ্ছিন্ন, স্বপ্রকাশ, আদ্যন্তরহিত এবং সর্বব্যাপী। সমাধিনিষ্ঠ মুনিগণ ত্রিগুণাতীত অবস্থায় এই ধামের দর্শনলাভ করে থাকেন। এটি ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা এবং ব্রহ্মজ্ঞরা এই অবস্থাই প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণের ঠিক ঠিক ভক্ত অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের একনিষ্ঠ ধ্যানিগণ জ্ঞান-লাভান্তে মায়ার তিনগুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃকে অতিক্রম করে অস্তিত্ব, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের সঙ্গে একীভাব প্রাপ্ত হন।

গীতার পরমধাম বা ভাগবতের গোলক হচ্ছে সেই অবস্থা যেখানে সাধক ইষ্টের সঙ্গে এক হয়ে অদ্বৈতভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন অর্থাৎ ব্রহ্মকে ঠিক ঠিক জেনে ব্রহ্মই হয়ে যাচ্ছেন, নুনের পুতুল সমুদ্রের সঙ্গে মিশে তদাকারাকারিত হয়ে যাচ্ছে,—নিজের সবরকম স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে।

শ্রীচৈতন্যদেবের মতে, পুরুষ হচ্ছেন একমাত্র সচ্চিদানন্দ-ঘন পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এবং জগতের যাবতীয় পদার্থ হচ্ছে তাঁর মহাভাবময়ী প্রকৃতির অংশসম্ভূত, সুতরাং তাঁর স্ত্রী। অতএব ভক্তিকামী জীব শুদ্ধ, পবিত্র জীবন যাপন করে নিজেকে সেই পরমপুরুষের স্ত্রী জ্ঞান করে তাঁর উপাসনা করে যাবেন, তাঁকে কিভাবে আনন্দে রাখা যায় এই চেষ্টা করে যাবেন। কৃষ্ণের সুখে সুখী, কৃষ্ণের দুঃখে দুঃখী এই ভাব নিয়ে সাধন করতে সেই পরমপুরুষের কৃপায় তাঁর পরমাগতি ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দপ্রাপ্তি হয়। হাজার হাজার ভক্তিপথের সাধকদের মধ্যে বিরল কেউ সেই 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' নির্বিশেষ চরম অদ্বৈতবস্তু উপলব্ধি করেন। আচার্যপুরুষ, যাঁরা লোকশিক্ষা দিতে এসেছেন, সর্বসাধারণের জন্য এই চরম অনুভূতির কথা প্রচার করেননি,—কারণ তাঁরা হয়তো ভেবেছিলেন, সকল কল্যাণগুণের আকর ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ শ্রীভগবানের সঙ্গে মলিন বুদ্ধিযুক্ত সাধারণ জীবের স্বরূপদৃষ্টিতে একত্বপ্রচারে ভক্তিপথের সাধকের ভক্তির হানির সম্ভাবনাই বেশি; এতে সাধকের উপকার থেকে অপকারই বেশি হতে পারে। তাই আচার্যেরা সেই একত্ব-রস আস্বাদ করলেও সাধারণের জন্য সেই ভাবকে নিন্দাই করে

গেছেন। উচ্চ-অধিকারী ভক্ত কিন্তু ভক্তির শেষ সীমায় এসে উপলব্ধি করেন,—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥
(গীতা, ১৮।৫৫)

—সেই ভক্তি (জ্ঞানমিশ্রা) দ্বারা তিনি আমার সর্বব্যাপী স্বরূপ যথার্থভাবে অবগত হন এবং আমার স্বরূপজ্ঞান হওয়ার অব্যবহিত পরে আমার যথার্থ স্বরূপে প্রবেশ করেন। জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়কারীরূপে বিখ্যাত মধুসূদন সরস্বতী এই শ্লোকের ভাষ্যে লিখছেন, 'মামদ্বিতীয়মাত্মানমভিজানাতি সাক্ষাৎ করোতি। যাবান্ বিভুর্নিত্যশ্চ যশ্চ পরিপূর্ণসত্যজ্ঞানানন্দঘনঃ সদা বিধ্বস্তসর্বোপাধিঃ অখণ্ডৈকরস একস্তাবন্তঞ্চাভিজানাতি। ততো মামেবং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা অহমস্ম্যখণ্ডানন্দাদ্বিতীয়াং ব্রহ্মেতি সাক্ষাৎকৃত্য বিশতে অজ্ঞানতৎকার্যনিবৃত্তৌ সর্বোপাধিশূন্যতয়া মদ্রূপ এব ভবতি।' —'আমাকে অর্থাৎ অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করে। আমি যে পরিমাণ অর্থাৎ আমার স্বরূপ যে বিভু ও নিত্য এবং আমি যাহা অর্থাৎ পরিপূর্ণ সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ সর্বদা সর্বপ্রকার উপাধিরহিত, অখণ্ড একরস এবং এক—সেইরূপে আমার সাক্ষাৎকার করে। তাহার পর, এই প্রকারে আমার তত্ত্বতঃ জানিয়া অর্থাৎ আমি অখণ্ড আনন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ হইতেছি, এইরূপে সাক্ষাৎকার করিয়া অজ্ঞান ও তাহার কার্যের নিবৃত্ত হইয়া সকল প্রকার উপাধিশূন্য হইয়া সৎস্বরূপ হইয়া যায়।'

যে সচ্চিদানন্দঘনমূর্তি শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় ও তাঁর ধ্যানে সাধক এতদিন তন্ময় হয়েছিলেন, শ্রীভগবানের অপার করুণায় ভক্ত তাঁর আসল যে রূপ, সেই অস্তিত্ব-জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ভাব উপলব্ধি করেন। ভগবানের চিন্তা রূপ থেকে অরূপে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত নিজেকেও আর কোনরূপ রূপধারী বা উপাধিবিশিষ্ট ভাবতে পারেন না। ক্ষুদ্র সীমার ভাব থেকে তিনি ভূমা বা অসীমের ভাব প্রাপ্ত হন,—সীমাবদ্ধ ভাবের সঙ্গে একাত্মভাব থেকে তিনি অসীম নিরাকার ভাবের সঙ্গে একাত্মবোধ করতে থাকেন এবং চরমে নির্গুণ নিরুপাধি নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যান।

সাধ্য-সাধন তত্ত্বপ্রসঙ্গে মহাপ্রভু গোপীদের যে প্রেমাভক্তির কথা শুনে অতিশয় আনন্দলাভ করেন, নিজেও যে প্রেমাভক্তি আস্বাদ করতেন সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের অলৌকিক প্রেম, আকর্ষণ, তন্ময়তা, ব্যাকুলতা—এগুলির সঙ্গে আমরা পরিচিত। কিন্তু এটিই সব নয়। দীর্ঘ বিরহের পর কুরুক্ষেত্র-তীর্থে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ করলে শ্রীকৃষ্ণ বললেন,—

. হি সর্বভূতানামাদিরন্তোঽন্তরং বহিঃ।
ভৌতিকানাং যথা খং বার্ভূর্বায়ুর্জ্যোতিরঙ্গনাঃ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৮২।৪৬)

—'হে অঙ্গনাগণ! আমি সর্বব্যাপী জগদীশ্বর! ভূতমাত্রেরই আদি কারণরূপে এবং অবসানের স্থলরূপে আমিই বিদ্যমান রহিয়াছি। ভৌতিক পদার্থমাত্রেরই সার এবং সর্বস্বরূপে যেমন আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত প্রতীত হইতেছে, আমিও সেইরূপ দেহীর দেহরূপে বাহিরে এবং অন্তর্যামিরূপে নিরন্তর বিরাজ করিতেছি।'

এবং হ্যেতানি ভূতানি ভূতেষ্বাত্মাত্মনা ততঃ।
উভয়ং ময্যথ পরে পশ্যতাভাতমক্ষরে॥
(ঐ, ১০।৮২।৪৭)

—'এই সমগ্র ভূতনিচয় পঞ্চমহাভূতে বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু আত্মা জীব ভোক্তৃরূপে তাহাতে ব্যাপ্ত হইয়া জীবত্বের সাধন করিতেছে। এই উভয় জড় ও চেতন ভাব এক আমা হইতেই উৎপন্ন এবং আমাতেই বিরাজ করিতেছে; কিন্তু

আমি অক্ষয় এবং অব্যয়রূপে নিত্য সর্বত্র অবস্থান করিয়া থাকি।'

শ্রীকৃষ্ণের এই তত্ত্বোপদেশে গোপীদের হৃদয়-মালিন্য চিরকালের জন্য বিদায় নিল; তাঁদের অজ্ঞান পুরোপুরি চলে গিয়ে তাঁরা জীবন্মুক্ত হলেন। এ-প্রসঙ্গে শুকদেব বলছেন,—

অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপ্য এবং কৃষ্ণেন শিক্ষিতাঃ।
তদনুস্মরণধ্বস্তজীবকোশাস্তমধ্যগন্ ॥

(ঐ, ১০।৮২।৪৮)

—'এই প্রকার অধ্যাত্মতত্ত্বের উপদেশে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া ভগবৎ তত্ত্বের স্বরূপ অবধারণে জীবত্বের কোশস্বরূপ স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ ভেদে উপাধিত্রয়ের উল্লঙ্ঘনে তদীয় পরম গতি লাভ করিলেন।'

এই অবস্থা ও জ্ঞানীর জীবন্মুক্ত অবস্থা একই শ্রীচৈতন্য ও রায় রামানন্দ আলোচিত সাধ্য-সাধন তত্ত্বের পর্যবসান হচ্ছে এইখানে; 'ন সো রমণ, হাম ন রমণী' দোঁহার নিগূঢ় তাৎপর্য হচ্ছে এই।

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, লোকশিক্ষার জন্য অবতীর্ণ ভক্তির অবতার শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব বাইরে ভক্তির ভাব প্রচার করলেও তিনি নিজ অন্তরে জ্ঞানের চরম লক্ষ্য অদ্বৈতবস্তুর আস্বাদনেই নিমগ্ন থাকতেন। এই চরম উপলব্ধিতে পৌঁছানোর জন্য, এই শেষধাপে যাওয়ার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় তিনিও যথাবিধি সন্ন্যাস অবলম্বন করেছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করেন শ্রীশঙ্করাচার্য প্রবর্তিত দশনামী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের আচার্য শ্রীমৎ কেশব ভারতীর কাছ থেকে। গুরুর কাছ থেকে সন্ন্যাসের মহাবাক্য শোনার পর মনন নিদিধ্যাসনের অল্প আয়াসমাত্রেই তাঁর মন নির্বিশেষ নির্গুণ তত্ত্বে স্থির হয়ে নির্বিকল্প সমাধির আনন্দে বিলীন হয়ে গেল; মন একটু বাইরের দিকে এলে সেই পরমতত্ত্বকেই সর্বত্র দেখে 'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র, সর্বং চ ময়ি পশ্যতি'—সেই শ্রীকৃষ্ণকে জীব-জগৎ প্রকৃতির সকল বস্তুতে দেখে ভাবাবস্থায় সাত্ত্বিক বিকারাদির শুরু হল—মন আরও বাইরের দিকে এলে শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে তাঁর বিরহে আর্তি-বিলাপ-ক্রন্দন করতে লাগলেন। মহাপ্রভুর এই তিন অবস্থা—অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশা ও বাহ্যদশা নামে জগতে বিখ্যাত। সন্ন্যাসগুরু কেশব ভারতী শিষ্যের এই তিন অবস্থা ক্রমান্বয়ে হতে দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন মর্ত্যজীবনের ঠিক মধ্যরেখায় চব্বিশ বছর বয়সে; তারপরে তাঁর চব্বিশ বছরের লীলা কিন্তু সন্ন্যাসের সু-উচ্চ আদর্শে সমুজ্জ্বল ও মহীয়ান। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় আহার-বিহারে তিনি নিজে এবং তাঁর অন্তরঙ্গদের এই আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান রাখতে তাঁর যে আন্তরিক চেষ্টা তা সকলেরই সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শাস্ত্র বলছেন, সন্ন্যাসী কামিনী-কাঞ্চনের সঙ্গে সংস্রব রাখবেন না। চৈতন্যদেব অর্থের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ তো রাখতেনই না এমন কি খুব প্রিয়জনের জন্য অর্থভিক্ষাও তিনি করতে চাইতেন না। একবার তাঁর অন্তরঙ্গ রায় রামানন্দের সহোদর গোপীনাথের দুই লক্ষ কাহন কর পাওনা হয়,—রাজা প্রতাপরুদ্র তা জানতেন না; কিন্তু রাজপুত্রগণ এই কর আদায় করতে গিয়ে গোপীনাথের ব্যবহারে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করায় তার মৃত্যুদণ্ড দেন। ভক্তগণ চৈতন্যদেবকে এই ঘটনা জানালে কিন্তু তিনি একেবারেই বিচলিত হলেন না। ভক্তগণের আশা ছিল রাজা প্রতাপরুদ্রও মহাপ্রভুর একজন ভক্ত,—তিনি রাজাকে কর মকুব করতে বললে গোপীনাথের প্রাণরক্ষা হয়। কিন্তু,

শুনি মহাপ্রভু কহেন সক্রোধ বচনে।
"মোরে আজ্ঞা দেহ সবে যাইব রাজ-স্থানে ॥

তোমা-সবার এই মত রাজঠাঞি যাঞা।
কৌড়ি মাগি লই আমি আঁচল পাতিয়া॥
পাঁচ গণ্ডার পাত্র হয় সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ।
মাগিলে বা দিবে কেন দুই লক্ষ কাহন॥"

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৯ম পরি.)

যাই হোক রাজা প্রতাপরুদ্রের কানে এ-সংবাদ যাওয়ামাত্র তিনি সমুদয় কর মার্জনা করলেন ও গোপীনাথের প্রাণরক্ষা হল।

জীবনের শেষপাদে যখন বাহ্য জগতের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে গেছে, একদিন বেড়াতে বেড়াতে মধুর গীতগোবিন্দের গান শুনে তিনি ভাবোন্মত্ত হয়ে উঠলেন। সুললিত ভক্তিগীতি শোনামাত্র তিনি গায়কের দর্শনের জন্য এবং তাকে প্রেমালিঙ্গন করার জন্য দ্রুতপদে অগ্রসর হলেন। সেবক গোবিন্দ তাঁর সঙ্গেই ছিল। একটু এগোনর পর সেবক বলে দিল এই গলা বামাকণ্ঠের, কোনও দেবদাসী হয়তো গাইছে। সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত পরিবর্তন,—মহাপ্রভুর পা হয়ে গেল স্থির,—গোবিন্দ সাবধান করে দেওয়াতে তিনি অতিশয় খুশি হলেন।

প্রভু কহে গোবিন্দ আজ রাখিলে জীবন।
স্ত্রীপরশ হইলে হইত আমার মরণ॥
এ ঋণ শোধিতে আমি নারিব তোমার।
গোবিন্দ কহেন জগন্নাথ রাখেন মুই কোন ছার॥
প্রভু কহে গোবিন্দ মোর সঙ্গে রহিবা।
যাঁহা তাঁহা মোর রক্ষায় সাবধান হইবা॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

সন্ন্যাসগ্রহণের পর সাধারণতঃ তিনি নারী সম্ভাষণ করতেন না। নিত্যানন্দ সাহচর্যে একবার যখন শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে এসেছিলেন, তখন সেখানে প্রাচীন রমণীগণও তাঁকে দূর থেকে দেখেই ক্ষান্ত হতেন।

পূর্ববৎ কৈল প্রভু সবার মিলন।
স্ত্রী সব দূর হৈতে কৈল প্রভু দরশন॥

একবার মহাপ্রভুর সেবার জন্য ভক্ত ছোট হরিদাস শ্রীপ্রভুরই অন্তরঙ্গ 'সাড়ে তিনজন পাত্রী'র অন্যতমা প্রৌঢ়া সাধিকা মাধবী দাসীর কাছ থেকে সুগন্ধি শালি-অন্ন ভিক্ষা নিয়ে আসেন। মহাপ্রভু অন্নগ্রহণ করে সব জেনে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে যান।

প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনিজনের মন॥
…　　…
আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা।
ছোট হরিদাসে ইহ আসিতে না দিবা॥

(চৈ. চ. অন্ত্যলীলা, ২য় পরি.)

ছোট হরিদাস মর্মাহত হয়ে প্রাণের বেদনায় তিনদিন উপবাসে রইলেন। তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ চৈতন্যদেবকে ভক্ত হরিদাসকে ক্ষমা করার জন্য বারবার আবেদন করলে তিনি বজ্রের ন্যায় কঠোর হয়ে বললেন,—

নিজ কার্যে যাও সবে ছাড় বৃথা কথা।
পুনঃ কহ যদি আমা না দেখিবে হেথা॥

এক বছর ছোট হরিদাস তাঁর এই কাজের জন্য অনুতাপ অনুশোচনা করে শেষে ত্রিবেণী-সঙ্গমে দেহ বিসর্জন করলে মহাপ্রভুর ভাবগম্ভীর উত্তর এল,—

প্রকৃতি-দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত।

ভবিষ্যতে তাঁর নাম করে তাঁর অনুগামিগণ আদর্শভ্রষ্ট যেন না হন, তাই তাঁর এই কঠোর বিধান। কীর্তনানন্দে সংজ্ঞাহীন ভক্তিরসে আপ্লুত চৈতন্যদেবের আবার সন্ন্যাসের আদর্শের প্রতি এরূপ নিষ্ঠার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে চৈতন্য-চরিতামৃতকার লিখছেন,—

মধুর চৈতন্য লীলা সমুদ্র গম্ভীর।
লোকে নাহি বুঝে, বুঝে যেই ভক্ত ধীর॥

শাস্ত্র বলছেন, 'জিতং সর্বং জিতে রসে',—জিহ্বা-ইন্দ্রিয় সংযত থাকলে অন্য সব ইন্দ্রিয়ই সংযত থাকবে। সন্ন্যাসীর জিহ্বা-লাম্পট্য থাকবে না,—তার আহার শরীর-মন-বুদ্ধিকে সুস্থ-সবল রেখে শ্রীভগবানের স্মরণ-মনন করার জন্য ; পরন্তু উদরপূর্তি বা রসাস্বাদ করার জন্য নয়। অদ্বৈত আচার্যের গৃহে মহাপ্রভু এসেছেন,—প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের ভোগের উপকরণ বিবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি দেখে খুব আনন্দিত হয়ে বললেন,—

ঐছে অন্ন যে কৃষ্ণকে করায় ভোজন।
জন্মে জন্মে শিরে ধরোঁ তাঁহার চরণ॥

(চৈ. চ. মধ্যলীলা, ৩য় পরি)

কিন্তু সেই সব প্রসাদ যখন তাঁকে দেওয়া হল, নানারকম অন্ন-ব্যঞ্জন-মিষ্টান্ন দেখে তিনি বলে উঠলেন,—

প্রভু কহে—"সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ।
ইহা খাইলে কৈছে হবে ইন্দ্রিয়-বারণ।"

সন্ন্যাসী হবেন নিরভিমানী ও নিরহঙ্কারী,—তাঁর অভিমান ও অহঙ্কার দূর করার জন্য তিনি গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করবেন, পবিত্র মাধুকরী অন্নে তিনি জীবনধারণ করবেন। সন্ন্যাসি-অগ্রণী চৈতন্যদেবও নিজে প্রায়ই সঙ্গীদের অপেক্ষা না রেখে ভিক্ষায় বার হতেন। নীলাচলে যাওয়ার পথে উড্রদেশে গঙ্গাঘাটে নেমে স্নান করলেন। এরপর—

এক দেবস্থানে প্রভু থুইয়া সভারে।
আপনে চলিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে॥
... ...
আঁচল পাতেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
সভেই তণ্ডুল আনি দেয়েন সত্বর॥
... ...
হেন প্রভু আপনে সকল ঘরে ঘরে।
ন্যাসিরূপে ভিক্ষা-ছলে জীব ধন্য করে॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড)

সঞ্চয়ের ইচ্ছা সন্ন্যাসীর কাম্য নয়,—তিনি হবেন পুরোপুরি ঈশ্বরনির্ভর, তাঁর দেহধারণের জন্য যা প্রয়োজন তা শ্রীভগবান দেখবেন। ভগবানে একশরণ যতির বা ভক্তের 'যোগ' ও 'ক্ষেম' তিনিই বহন করেন। দণ্ড-কমণ্ডলু-বহির্বাস ইত্যাদি ছাড়া পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর আর কিছুই থাকবে না। ইহ-পরলোক তাঁর ভোগেচ্ছা বা ভোগের উপকরণ কিছুই থাকবে না। সন্ন্যাসী চৈতন্যদেব সঙ্গীদের বলে দিলেন,—

কৌপীন-বহির্বাস আর জলপাত্র,
আর কিছু সঙ্গে নাহি যাবে, এই মাত্র।

কিন্তু নিজে কিছু না নিলেও সঙ্গীসাথীরা কে কি নিলেন? পুরীর পথে মহাপ্রভু চলতে চলতে অনেক দূর এগিয়ে এসেছেন। তারপর,—

পথে প্রভু পরীক্ষা করেন সবা প্রতি।
কি সম্বল আছে বল কাহার সংহতি॥
কেবা কি দিয়াছে কারে পথের সম্বল।
নিষ্কপটে মোর স্থানে কহত সকল॥
সবে বলে প্রভু বিনা তোমার আজ্ঞায়।
কার দ্রব্য লইতে বা শক্তি আছে কার॥
শুনিয়া ঠাকুর বড় সন্তোষ হইলা।
শেষে সেই লক্ষ্যে তত্ত্ব কহিতে লাগিলা॥
প্রভু বলে কাহার যে কিছু না লইলা।
ইহাতে আমারে বড় সন্তোষ করিলা॥

(ঐ, অন্ত্যখণ্ড)

অন্তরঙ্গ ভক্তদের জীবনও যেন ত্যাগ ও বৈরাগ্যের দৃঢ় বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এদিকে তাঁর সদা সতর্কদৃষ্টি ছিল। তখন তিনি কাশীতে সপার্ষদ অবস্থান করছেন ; সনাতন গোস্বামীকে এক ব্রাহ্মণ তার বাড়িতে রোজ ভিক্ষা গ্রহণ করতে বলায় গোস্বামীজী উত্তর দেন তিনি মাধুকরী করবেন, এক বাড়িতে রোজ ভিক্ষা করবেন না। এই বৈরাগ্যের কথা শুনে চৈতন্যের খুব আনন্দ, তিনি অপরের কাছেও এই বৈরাগ্যের

প্রশংসা করছেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি বারেবারেই গিয়ে পড়ছে সনাতনের গায়ের ভোট কম্বলটির দিকে; মহাপ্রভুর মনের কথা জানতে পেরে গোস্বামীজী সেটি একজনকে দিয়ে দেন। সব ঘটনা জেনে চৈতন্যদেব আনন্দে বললেন,—

প্রভু কহে ইহা আমি করিয়াছি বিচার।
বিষয়-রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার॥
সে কেন রাখিবে তোমার শেষ বিষয়ভোগ।
রোগ খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষরোগ॥

(চৈ. চ. মধ্যলীলা, ২০ পরি.)

প্রায়ই তাঁর ভাব হওয়ায় বায়ু চড়ে থাকত,— সেজন্য ভক্তেরা নবদ্বীপ থেকে সুগন্ধি চন্দন তেল নিয়ে নীলাচলে এসেছেন—তাঁর শ্রীঅঙ্গে লেপন করলে পিত্ত-বায়ুর প্রকোপ অনেক শান্ত হবে, এই তাদের ইচ্ছা। কিন্তু তাঁর কাছে এ-খবর পৌঁছানো মাত্র তিনি রেগে বলে উঠলেন,—

সন্ন্যাসীর নাহি তৈল অধিকার।
তাতে সুগন্ধি তৈল পরম ধিক্কার॥
জগন্নাথে দেহ তৈল দীপে যেন জ্বলে।
তাঁর পরিশ্রম হবে পরম সকলে॥

(চৈ. চ. অন্ত্যলীলা, ১২ পরি.)

আহারে বিহারে কঠোর ব্রতী সন্ন্যাসী মহাপ্রভু মাটিতে শুকনো কলাগাছের খোলার উপর শুতেন; এতে তাঁর কোমল ভাগবতী তনুতে ব্যথা হয় দেখে জগদানন্দ একটি গেরুয়া কাপড়ে তুলা ভরে পাতলা তোষক করে সেবক গোবিন্দের হাতে দিলেন। মহাপ্রভু এই শয্যা-পরিবর্তন দেখলেন, কিন্তু তুলার তোষকে না শুয়ে পুনরায় কলার শরলার উপরই শুলেন। পাশেই ছিলেন স্বরূপ দামোদর,—

স্বরূপ কহে "তোমার ইচ্ছা, কি কহিতে পারি।
শয্যা উপেক্ষিলে পণ্ডিত দুঃখ পাবে ভারি॥"
প্রভু কহেন "খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে॥
সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন।
আমারে খাট তূলী বালিস। মস্তক মুণ্ডন॥"

যিনি বিদ্বৎসন্ন্যাসী, আত্মজ্ঞানী তাঁর অবস্থা কিরূপ? 'স একঃ'—তিনি একা, তাঁর সঙ্গী নেই। নাম-রূপের প্রহেলিকা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। ত্রিগুণময় প্রকৃতির সব খেলা তিনি সাক্ষীরূপে দেখে যাচ্ছেন, তিনি আত্মক্রীড়, তিনি সকলের হৃদয়েই সেই ভগবানকে দেখে রাগ-দ্বেষ-রহিত হয়ে আত্মপর ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করেন—এই হচ্ছে অভেদদৃষ্টিসম্পন্ন যতির অবস্থা। দুরাচার দানীর অর্থদাবী করার সময় মহাপ্রভু উত্তর দিচ্ছেন,—

প্রভু কহে জগতে আমার কেহ নয়।
আমিও কাহার নহি কহিল নিশ্চয়॥
এক আমি তুই নহি সকল আমার।
কহিতে নয়নে বহে অবিরত ধার॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড)

উপরের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা থেকে আমরা কিছুটা উপলব্ধি করতে পারি, সন্ন্যাসের আদর্শের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা কি উচ্চস্তরের ছিল। কারণ তিনি জানতেন, তিনি তিলমাত্র এই আদর্শ থেকে সরে এলে পরে তাঁর অনুগামীরা অনেক সরে যাবেন এবং আদর্শভ্রষ্ট হয়ে যাবেন।

আমাদের চোখের সামনে অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী, মুণ্ডিতমস্তক, গৈরিকধারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-ভারতীর চিত্রই যেন সমুজ্জ্বল রাখি, যিনি একদিকে ভাবাবেশে নৃত্য করতে করতে ভাবসমাধি প্রাপ্ত হয়ে ভূলুণ্ঠিত হচ্ছেন, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের বিরহে যাঁর অশ্রুধারা মাটি ভিজিয়ে দিচ্ছে, আবার পরক্ষণেই যিনি অন্তরের অন্তরে জ্ঞানের চরম লক্ষ্য অদ্বৈততত্ত্ব আস্বাদন করছেন। সন্ন্যাসী জগদ্গুরু হিসাবে তিনি কামিনী-কাঞ্চন ও যাবতীয় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে চরম বৈরাগ্য দেখিয়ে এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। জ্ঞান ও ভক্তির চরম সমন্বয়কারী দেবমানব শ্রীশ্রীচৈতন্য-দেবের পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি তবেই আমরা বুঝতে পারব ও অন্যান্য অবতারলীলা বোঝাও আমাদের পক্ষে অনেক সহজ ও সর্বাঙ্গসুন্দর হবে।

শুধু বাণী নয়—জীবনী

ডক্টর জলধিকুমার সরকার

খ্যাতনামা চিকিৎসা-বিজ্ঞানী এবং লেখক। ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, কলিকাতা স্কুল অব্ ট্রপিক্যাল মেডিসিন।

যে সব নৃপতি, বীর যোদ্ধা, রাষ্ট্রীয় নেতা, কিংবা চিন্তানায়ক মানবসমাজকে পরিচালিত করে আসছেন, বা যাদের ভাবধারা আদিযুগ হতে আজ পর্যন্ত সমাজকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিচালিত করেছে, তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন আচার্য এবং অবতার-পুরুষগণ। এই পর্যায়ে পড়েন যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধদেব, মহম্মদ প্রভৃতি। এঁদের বাণী নানা ধর্মীয় গ্রন্থের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষকে পথনির্দেশ করছে। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, এই সব অবতারপুরুষের কার্যাবলী তাঁদের আশপাশের কয়েকজন শিষ্যকে এমনভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল এবং তাঁদের জীবনকে এমন-ভাবে পরিবর্তিত করে দিয়েছিল যে, সেই সকল শিষ্যই তাঁদের গুরুর ভাবধারার বাহক ও প্রচারক হন। এবং তাঁদের দেখে আরও হাজার হাজার লোক অবতারগণের বাণীগুলি গ্রহণ করতে থাকেন। প্রশ্ন হচ্ছে—এই বাণীগুলি কি শাশ্বত সত্যবোধক বলেই মানুষের মনে এরূপ উচ্চস্থান লাভ করতে পেরেছে, না এদের পশ্চাতে এই সব মহাপুরুষদের ব্যক্তিগত জীবনচর্যাই বাণীগুলিকে অমন শক্তিশালী করেছে! এই আলোচনায় আসতে গেলে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের মহাপুরুষ বা অবতারগণই আলোচ্যবিষয় হওয়া বিধেয়, কারণ এঁদের জীবনী নানা ভক্তের বা সংস্কারকগণের কল্পনার দ্বারা তেমন অতিরঞ্জিত হবার সুযোগ পায়নি। অথবা অলৌকিক ঘটনাবলীর দ্বারা আচ্ছাদিত হতে পারেনি। এই পরিপ্রেক্ষিতে যে দুজন অবতারপুরুষের কথা মনে জাগে তাঁরা হলেন শ্রীচৈতন্য (আবির্ভাব ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দ) এবং শ্রীরামকৃষ্ণ (আবির্ভাব ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ)। এঁদের জীবন-ইতিহাস শুধু যে জাতির স্মৃতিতে স্পষ্ট হয়ে আছে তা নয়, সেই জীবন-আলেখ্যের কিছু কিছু সমকালীন পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠাতে অথবা প্রত্যক্ষদর্শীর চিঠিপত্রে অঙ্কিত হয়ে ঘটনাবলীর সাক্ষ্যের নিদর্শন হয়ে রয়েছে। এর ফলে এঁদের বাণী ও জীবনী অনুপুঙ্খভাবে আলোচিত হতে পারবে। এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, দুজন মহাপুরুষের উপদেশের সমতা বা ভিন্নতা দেখানো, কিংবা আপেক্ষিক মূল্য নির্ণয় করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এঁদের জীবনে বাণীগুলি মূর্ত হওয়া প্রত্যক্ষদর্শীকে কিরূপ প্রভাবান্বিত ও আকৃষ্ট করেছিল সেটাই বর্তমান আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রথমে শ্রীচৈতন্যের কথায় আসা যাক। তখন তাঁর পূর্ণ যৌবনকাল, আকর্ষণীয় রূপ, পাণ্ডিত্যের জয়জয়কার, তাঁর পরিচালিত দৈনিক কীর্তনে যোগ দিচ্ছেন প্রায় সমগ্র নবদ্বীপবাসী, ঘরে সুন্দরী যুবতী স্ত্রী, বাড়ি জিনিসপত্রে ভরপুর—ঠিক সেই সময়েই তিনি দেখলেন যে, লোকের কীর্তনে অশ্রু ঝরছে, প্রেমে গড়াগড়ি দিচ্ছে, ভাব হচ্ছে সত্য, কিন্তু বিষয়তৃষ্ণা, কামকাঞ্চনের আকর্ষণ একটুও হ্রাস পাচ্ছে না। "মানুষ কাহাকে দেখিয়া শিখিবে?"—এই প্রশ্ন তাঁর মনে জাগল। ভেবেচিন্তে স্থির করলেন যে, এই সংসারাশ্রম, কামকাঞ্চনের সংস্পর্শ ত্যাগ করবেন, সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন। উদ্দেশ্য যে, তাঁর পাণ্ডিত্যে, মূল্যবান বাণীতে, কীর্তনে যা হয়নি, চোখের সামনে তাঁর ত্যাগ দেখে লোকের

বিষয়তৃষ্ণা থেকে ভগবানপ্রাপ্তির দিকে ঝোঁক আসবে। তিনি সমস্ত বাধা-বিপত্তি, প্রলোভন, উপদেশ ব্যর্থ করে সন্ন্যাস নিলেন। পুরীতে এলে সার্বভৌম যখন শ্রীচৈতন্যের ন্যায় গুণবান লোকের কেশব ভারতী অপেক্ষা কোন নামী গুরু দ্বারা দ্বিতীয়বার সন্ন্যাসগ্রহণের ব্যবস্থা করতে চাইলেন (যাতে সন্ন্যাস সম্প্রদায়ে নূতন সন্ন্যাসীর প্রতিষ্ঠা ভাল হয়) শ্রীচৈতন্য সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্র বিনীত ভক্তের ভাবে আসতে চাইলেও তিনি সন্ন্যাসী হয়ে 'রাজদর্শন' প্রত্যাখ্যান করলেন। পরবর্তী কালে শ্রীচৈতন্যের অতিপ্রিয়ভক্ত রামানন্দ রায়ের ভ্রাতার কারাগার থেকে মুক্তির জন্য সকলের অনুরোধ সত্ত্বেও 'রাজদ্বারে' যেতে চাননি। নিজের অহমিকা বিসর্জনের জন্য পুরীতে গুণ্ডিচাবাড়ি স্বহস্তে সম্মার্জনী দ্বারা পরিষ্কার করেছেন। দীনহীন বেশে বৃন্দাবন যাবার জন্য সমস্ত সাঙ্গপাঙ্গদের, যাঁরা পথে নানাভাবে তাঁর সেবা করতে আগ্রহী ছিলেন, তাঁদের পরিত্যাগ করে একা পথ চলেছিলেন। পথে তাঁর মুখশুদ্ধির জন্য অর্ধখণ্ড হরিতকী 'সঞ্চয়' করার অপরাধে সেবককে ত্যাগ করে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করার আদেশ দিলেন। ভক্ত হরিদাসকে পরম ভক্তিমতী মাধবী দাসীর কাছ থেকে চাউল সংগ্রহ করায় 'প্রকৃতি সম্ভাষী' হওয়ার অপরাধে পরিত্যাগ করলেন, সকলের অনুরোধ উপরোধ ব্যর্থ হল। সন্ন্যাস অবস্থায় জন্মভূমি দর্শনে এসে স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রথমে চিনতে পারেননি, কারণ সন্ন্যাসজীবনে তাঁর মন থেকে স্ত্রীচিন্তার সম্পূর্ণ বিনাশ হয়েছিল; বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিজ পাদুকা দান করে স্বামী-চিন্তা না করে কৃষ্ণ-চিন্তা করার উপদেশ দিলেন। ছোটবেলায় যে 'মুকুন্দের মা' তাঁকে কত সুস্বাদু ভোজ্যবস্তু খাইয়েছেন, পুরীতে সেই বৃদ্ধা সঙ্গে নানাবিধ খাদ্য এনে দেখা করতে চাইলে তাঁকে স্ত্রীলোক বলে কাছে আসতে দিলেন না। সন্ন্যাসগ্রহণের পর থেকে জীবনভর শ্রীচৈতন্য ভিক্ষান্ন ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করেননি, তাও অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণে, যদিও তাঁকে নানাবিধ ভোজ্যবস্তুদ্বারা পরিতৃপ্ত করতে ভক্ত ও শিষ্যের অভাব ছিল না। শেষজীবনে, অসুস্থ অবস্থাতেও খাটে শোওয়া প্রত্যাখ্যান করে মেঝেতে কলার 'শরলা' পেতেই শুতেন।

শ্রীচৈতন্যের এরূপ কঠোর সন্ন্যাসজীবনের কারণ জানতে হলে মনে রাখা দরকার যে, অবতারপুরুষ বা জগদ্‌গুরুর জীবনে শুধু অন্তরের বিশুদ্ধতা ও ত্যাগই যথেষ্ট নয়, লোকশিক্ষার জন্য বাইরের ত্যাগও সমভাবে প্রয়োজনীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের সারা জীবনে শুধু মন-মুখই এক ছিল না, মুখ ও কর্মের মধ্যে অসাধারণ সামঞ্জস্য ছিল। তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁরা সকলেই মুগ্ধ হয়েছেন তাঁদের বিবিধ প্রশ্নের সহজ সমাধান পেয়ে, স্তম্ভিত হয়েছেন তাঁর কার্যকলাপে, বাণীর সঙ্গে আচরণবিধির সামঞ্জস্য দেখে। সেকালের এক ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত নারায়ণশাস্ত্রী ঘটনাচক্রে এসে দেখতে পেলেন যে, যে-সকল কথা তিনি শাস্ত্রে পড়েছেন, তা যেন রূপ নিয়েছে—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে। তাঁর ত্যাগ ও সত্যনিষ্ঠা শুধু কথার কথা নয়, বর্তমান যুগের এক মহাবিস্ময়। 'টাকা মাটি' বলে টাকাকে শুধু গঙ্গার জলে ফেলেননি, টাকার স্পর্শে বা অর্থসম্বন্ধে আলোচনাতেও তাঁর গায়ে যেন কাঁটা বিঁধত। এরূপ ক্ষেত্রে মথুরানাথের বিষয়সম্পত্তি দেবার ইচ্ছা ও লক্ষ্মী-নারায়ণ মাড়োয়ারীর প্রভৃত অর্থদানের অভিপ্রায় যে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যাখ্যান করবেন এটা কিছু বিচিত্র নয়। কামার-কন্যা ধনীকে উপনয়নের পরে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি তৎকালীন

সমাজ-প্রথার বিরুদ্ধ হওয়ায় নানা জনের বারণ সত্ত্বেও পালন করেছিলেন; শম্ভু মল্লিকের কাছ থেকে আফিম নেবার কথা থাকায় ভ্রমবশতঃ তাঁর কর্মচারীর কাছ থেকে আফিম লওয়ার পরে ফিরবার পথ খুঁজে পাননি। সুন্দরী বার-নারীকে জগন্মাতারূপে দেখা এবং আপন স্ত্রীকে মন্দিরস্থিত ভবতারিণীরূপে দেখা শুধু কথার কথা নয়, এই মনোভাবের পূর্ণ প্রকাশ পাওয়া যায় শ্রীশ্রীমাকে ষোড়শী মূর্তিরূপে পূজার পরে সমস্ত সাধনার ফল তাঁর পাদপদ্মে বিসর্জন করায়। পার্থিব মরদেহকে 'হাড়মাসের খাঁচা' বলতেন, সেকথা, তাঁর ক্যান্সারে শীর্ণকায় দেহে কীর্তন সমাধি যিনি দেখেছেন, তাঁর পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হবে না। আর বিষয়ী মথুরানাথের 'বাবা মানুষ নন' এবং 'শিব বল, কৃষ্ণ বল, সবই ত উনি নিজে'—এই সব ধারণা, শ্রীরামকৃষ্ণের আচার-বহির্ভূত পূজা পদ্ধতিতে আপত্তি না করা

।-সব তাঁর বাণী শুনে হয়নি, তাঁর দৈনন্দিন জীবনের ত্যাগ, দিব্যোন্মাদনা প্রভৃাত পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণের ফলেই হয়েছিল। এ সম্বন্ধে দুজনের উক্তি প্রণিধানযোগ্য: শুদ্ধমনা নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দিনের আলাপেই দেখলেন, "তাঁহার সদালাপ ও ভাবসমাধি দেখিয়া মনে হইল, সত্যসত্যই উনি সর্বত্যাগী, এবং যাহা বলিতেছেন, তাহা স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়াছেন।" অন্যদিকে যুক্তিবাদী মহেন্দ্রনাথ সরকারের স্পষ্টোক্তি, "তুমি যেটা সত্য বলিয়া বুঝ, তার একচুল এদিক ওদিক করিয়া চলিতে পার না; অন্যস্থানে দেখি তারা বলে এক, করে এক।··· সাধে কি তোমার এখানে এতটা সময় কাটিয়ে যাই?"

অবতারগণের বাণীর মূল্য হ্রাস করা বর্তমা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, কারণ সেই সব বাণীর উৎস হচ্ছে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি যা সমাধিস্তরে তাঁরা লাভ করেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সাদা কথায় যাকে বলতেন—"মা রাশ ঠেলে দেন।" তবে একথা মনে রাখা দরকার যে, সেই অনুভূতি আসে ব্রহ্মচর্য পবিত্র জীবনযাত্রা, সত্যনিষ্ঠা ও সাধনার ফলে এইভাবে জীবনযাত্রায় যে ওজঃশক্তি জন্মায় ত বাণীগুলিকে মন্ত্রশক্তি দান করে। কোন বাণীর সদর্থ মাত্র তার শাশ্বত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয় রাজনীতিবিদ্ ও দার্শনিকদের কাছ থেকে অনেক সময় আপাতসত্য চমকপ্রদ বাণী আসে, কিন্তু তাঁদের জীবনী ও বাণীর মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকায় সেগুলি ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করতে পারে না। ঠিক বিপরীত ব্যাপার দেখা যায় আচার্য ও অবতারদের বাণীর ব্যাপারে। তাঁদের বাণীগুলির মধ্যে আপাতবিরুদ্ধতা দেখা গেলেও জ্ঞানিগুণীরা, বাণীর উৎস যে পবিত্র জীবন তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে সেই বাণীগুলির সত্যতা সম্বন্ধে সামঞ্জস্যের সন্ধান ঠিক পেয়ে যান। যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন—"আমাদের পিতা স্বর্গে আছেন", আবার অন্যত্র বলেছেন—"স্বর্গরাজ্য তোমারই মধ্যে"। স্বামী বিবেকানন্দ এ সম্বন্ধে মতপ্রকাশ করেছেন যে, পূর্বোক্ত মতটি বলা হয়েছে আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে অশিক্ষিতদের কাছে তাদের বুঝবার ভাষায়; শেষোক্তটি ধর্মসম্বন্ধে যাঁরা অগ্রসর, তাঁদের উদ্দেশ্যে। বাণীর পিছনে যদি বলিষ্ঠ ও পবিত্র জীবন উৎস না থাকত তবে স্বামী বিবেকানন্দেরও অধিকারিভেদে উক্ত কয়েকটি বাণীর প্রকৃত অর্থ নিরূপণে সেরূপ প্রচেষ্টা হত না।

স্বামী শুদ্ধানন্দের স্মৃতি

শ্রীপ্রভাতকুমার শেঠ

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ সন্তানগণের কৃপাধন্য বর্ষীয়ান ভক্ত—বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

পিতৃদেবের সঙ্গে পূজ্যপাদ সুধীর মহারাজের (স্বামী শুদ্ধানন্দ) বেশ হৃদ্যতা ছিল দেখেছি ও শুনেছি। শোনা কথা থেকেই আরম্ভ করি। সুধীর মহারাজের অনুগ্রহ ও অনুরোধে বাবা একদিন স্বামীজীর কাছে গিয়ে তাঁকে ধরে বসলেন, "আজ গান হবে না?" স্বামীজী স্বাভাবিকভাবে সজোরে বলে উঠলেন, "ওঃ, সুধীর পাঠিয়েছে বুঝি? আচ্ছা যা, শরৎকে ডেকে আন্।" গান হল। শরৎ মহারাজ গাইলেন। স্বামীজী সংগত করলেন। যতদূর মনে পড়ে এরকম বোধ হয় একাধিক বার হয়েছিল।

উদ্বোধনের গোড়ার দিকে পূজ্যপাদ স্বামী ত্রিগুণাতীতজীর সহায়করূপে কাজ করতেন সুধীর মহারাজ। তখন উদ্বোধনের অফিস আমাদের তখনকার বাড়ির (৩নং বাঁশতলা স্ট্রীট; বর্তমানে ৩নং স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কা স্ট্রীট) কাছে বসাক স্ট্রীটে ছিল। ত্রিগুণাতীত-স্বামী আমেরিকা চলে যাওয়ার আগে ও পরে সুধীর মহারাজ কখন কখন আমাদের বাড়িতে আসতেন। একদিন বহির্বাটীর দোতলার বৈঠকখানায় সুধীর মহারাজ বসে আছেন, এমন সময় খুব জোরে ভূমিকম্প হল। ভূমিকম্প খুব জোরেই হয়েছিল। তখনও আমি জন্মাইনি। দাদা তখন শিশুমাত্র। ঘুরে ঘুরে খেলা করছিল, বৈঠকখানার দক্ষিণদিকে যে লোহার সিঁড়ি ছিল তার কাছে। ভূমিকম্পে সিঁড়িটা বেশ দুলছিল বাড়ির সঙ্গে। এমন অবস্থায় সুধীর মহারাজ বৈঠকখানা থেকে উঠে গিয়ে দাদাকে কোলে নিয়ে সিঁড়ির কাছ থেকে ছাদে সরে গেলেন। এ ঘটনা বাবার কাছে শোনা।

একবার প্রসঙ্গক্রমে বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম চাতুর্মাস্য ব্রত খুব কঠোর কিনা, শরীরের পক্ষে হানিকর কিনা? উত্তরে তিনি বললেন, "মনে হয় না, সুধীর মহারাজকে তো চাতুর্মাস্য করতে দেখেছি। ব্রতের শেষে তাঁকে সামান্য একটু শীর্ণ দেখাত।" সুধীর মহারাজ খুব কর্ম করতেন। আর কর্মকে তপস্যার মতনই দেখতেন। একবার প্রায় সারারাত লেখাপড়ার কাজ করবার পর তিনি বলেছিলেন, "মনে হচ্ছে রাতভর কালীপূজা করে উঠলুম।"

শ্রীশ্রীশরৎ মহারাজের মহাসমাধির পর বেলুড়-মঠে মাঙ্গলিক ভাণ্ডারা উপলক্ষে প্রসাদ ধারণের পর সুধীর মহারাজ শরৎ মহারাজের সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ও প্রাণস্পর্শী একটি ভাষণ দেন। মঠের সাধুদের কল্যাণের জন্য স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষ শরৎ মহারাজের খুব আগ্রহ ছিল যে, সকলে খুব মন দিয়ে নিষ্কাম কর্মের সঙ্গে সঙ্গে জপধ্যানের অনুশীলন করেন। সুধীর মহারাজ বলেন, এক-সময় তিনি ও শরৎ মহারাজ উভয়ে পালাক্রমে সর্বক্ষণ জপধ্যান করে ঠাকুরঘর জাগিয়ে রাখতেন।

সুধীর মহারাজ মঠে সাধু ব্রহ্মচারীদের নিয়ে রাত্রে আহারের পর ঠাকুর ও স্বামীজীর জীবন ও আদর্শ সম্বন্ধে কথায় এবং শাস্ত্রীয় আলোচনায় অনেক সময় কাটাতেন। শ্রীযুক্ত অনঙ্গ মহারাজের কাছে শুনেছি, একদিন জপধ্যানে উৎসাহ দিতে দিতে সুধীর মহারাজ বলেন যে, "সারারাত্রি জপধ্যানে কাটালে তার ফল অব্যর্থ।" এই কথা শুনে অনঙ্গ মহারাজ সেই রাতেই স্বামীজীর মন্দিরে বসে গেলেন, মশার কামড় সত্ত্বেও ভোর

হওয়া পর্যন্ত। পরে সকালবেলায় সুধীর মহারাজের সঙ্গে দেখা করে বললেন, "রাতভর তো বসলাম, কিন্তু কই কিছুই তো হল না।" উত্তরে সুধীর মহারাজ সরস উত্তর দেন, "হয়েছে, তুমি 'জান্‌তি' পার নাই।"

ঠাকুর-স্বামীজীর ভাব, কাজ ও সঙ্ঘের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সর্বদাই সুধীর মহারাজের হৃদয় অধিকার করে থাকত। আর এই উদ্দেশ্যের জন্য তিনি কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলারও পক্ষপাতী ছিলেন। সময় সময় একটু বাড়াবাড়িও হয়ে যেত। পূজনীয় শুকুল মহারাজ (স্বামী আত্মানন্দ) ধ্যানভজনে সমধিক উৎসাহী হওয়ার ফলে কখন কখন কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশনে অনুপস্থিত হয়ে পড়তেন। এতে সুধীর মহারাজ একবার অসন্তোষ প্রকাশ করে তাঁকে বলেন, "আপনি যদি **regular meeting attend** না করেন, আপনার **resignation** দেওয়া উচিত।" তাতে আত্মানন্দ-স্বামী বলেন, "ভাই পদত্যাগ পত্রটি আপনিই লিখে দিন, আমি সই করে দেব।" ব্যাপার কিন্তু আর বেশিদূর গড়ায়নি। কারণ উভয় গুরুভ্রাতাই পরস্পরকে বুঝে নিলেন। ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবের দিক দিয়ে বস্তুত কারুরই কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। নিষ্কাম কর্ম ও প্রত্যক্‌-প্রবণতা - এই উভয়ই ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবের পরিপোষক। দুজনেই ছিলেন স্বামীজীর প্রিয় সন্তান।

এই রকম একবার পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের ভক্তসেবায় অত্যধিক উদারভাব দেখে, তাঁর কাছেও সুধীর মহারাজ সে-সম্পর্কে অনুযোগ করেছিলেন। বাবুরাম মহারাজের সস্নেহ ভর্ৎসনায় সেদিন তিনি বুঝে-ছিলেন, শক্তিমান প্রেমিক মহাপুরুষকে নিয়মের গণ্ডীতে বেঁধে রাখা যায় না। শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজের ভক্তসেবা প্রসঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে শুনেছি যে, ভক্তরা অসময়ে এসে হাজির হলেও বাবুরাম মহারাজ তাদের জন্য রন্ধনাদি করতেন ও ঠাকুরকে জাগিয়ে ভোগ দিতেন যাতে ভক্তরা প্রসাদ পেয়ে ধন্য হতে পারে। এই কথা বলে কিন্তু মহাপুরুষ মহারাজ আরও বলেছিলেন, "ও বাবুরাম মহারাজের পক্ষেই সম্ভব ছিল, আমাদের সে শক্তি নাই।"

স্বামীজীর শক্তিতে শক্তিমান হয়ে পূজনীয় সুধীর মহারাজ কোনও কুসংস্কারকেই আমল দিতে চাইতেন না। অশ্লেষা, মঘার প্রতি তাঁর খুব উদাসীনতা ছিল। পুরীতে একবার মঘা তিথিতে বেড়াতে বেরিয়ে তিনি এক গর্তের মধ্যে পড়ে যান। পরে বাবার কাছে গল্প করেছিলেন, "মঘায় বেড়াতে বেরিয়ে গর্তে পড়ে গিছলাম।" বাবাও তখন পুরীতে ছিলেন। আত্মশ্লেষরূপ রসিকতা দেখে আরও মনে পড়ে, তিনি তিথি অশুভ হওয়ায়, ঠাকুরের যাত্রা বদলানোর কথা স্মরণ করেছিলেন।

শুনতে পাওয়া যায়, স্বামীজী নিজেই নিজের মহাপ্রয়াণের দিনক্ষণ দেখে ঠিক করবার জন্য সুধীর মহারাজকে দিয়েই পঞ্জিকা আনিয়েছিলেন।

সুধীর মহারাজের হৃদয়ে এত বেশি স্নেহ ছিল যে, তাঁর মুখের দু-চারটি কথায় বা কিছুক্ষণের সান্নিধ্যে ভক্তজনের দুঃখকষ্ট ও অশান্তি নিবারিত হত। একবার বাবা মানসিক অশান্তির জন্য কলিকাতা ত্যাগ করে মধুপুরের বাড়িতে চলে যান। অশান্তি কিন্তু কিছুতেই যায় না। এক-দিন সে অশান্তি এত বেশি হল যেন আর সহ্য করতে পারছেন না! এমন সময়ে হঠাৎ বিকেলের দিকে তাঁর কাছে সুধীর মহারাজ এসে উপস্থিত। সুধীর মহারাজ তখন মধুপুরে গিয়েছিলেন বোধ হয় শ্রদ্ধেয় কিরণ দত্তের বাড়িতে। দুজনেই পরস্পরকে দেখে খুবই খুশি হলেন। অনেক রকম পুরানো কথা আলোচনা হল, অনেকক্ষণ ধরে—

এক ঘণ্টারও বেশি। বাবা পরে বলেছিলেন, তাঁর তীব্র অশান্তির ভাব সুধীর মহারাজের সঙ্গে কথা কয়ে কেটে গেল।

আমিও একদিন অনুভব করেছিলাম কাশীধামে সেবাশ্রমে তাঁর ভালবাসার প্রভাব। তখন তিনি বোধ হয় মঠ মিশনের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট। একদিন তাঁর কাছে গিয়ে বসে আছি—বিশেষ কোন বাক্যালাপ হয়নি। ঘরে আর কেউ ছিলও না। মনে হচ্ছিল, তাঁর অন্তরের শান্তি ও ঈশ্বর-অনুরাগ যেন আমার ভিতর সংক্রামিত হচ্ছে। এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে শ্রীশ্রীহরি মহারাজের কথা। চারিদিকে তিনি ভক্তসাধু পরিবেষ্টিত। সহসা সকলকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন, "বল দেখি কেমন করে সাধু চিনবে?" কারো মুখে কোন কথা নেই। খানিক পরে তিনি নিজেই বললেন, "আগুনের কাছে এলে, আগুনকে জানতে হলে, heat vibration-এই টের পাওয়া যায়, বলে দিতে হয় না। ঠিক সেই রকম ভাল সাধুর কাছে এলে আপনার ভিতর থেকে ঈশ্বর-চিন্তার স্ফুরণ হয়, তাতেই বুঝতে হবে লোকটি যথার্থ সাধু।"

মনে হয়, ১৯৩৩-এর কোন সময়ে বাবার কঠিন অসুখ ধরা পড়ে। তখন আমরা বড়বাজারের বসত-বাড়ি ছেড়ে বালীগঞ্জের এক ভাড়া বাড়িতে থাকি। সুধীর মহারাজ অসুখের কথা শুনেই শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন মহারাজের সঙ্গে একদিন তাঁকে দেখবার জন্য সন্ধ্যার প্রাক্কালে এসে উপস্থিত হলেন। বাবার সঙ্গে নানা কথাবার্তা কইলেন। আর অসুখের কথা জানা সত্ত্বেও নিঃসঙ্কোচে বাবার গড়গড়াটি টেনে নিয়ে ধূমপান করলেন। পরে অনেক ভরসা দিয়ে এবং আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন। অতঃপর বাবাকে ডাক্তারদের পরামর্শ অনুসারে কালিংপং নিয়ে যাওয়া হল। সেইখানে অবস্থান-কালে খবর পাওয়া গিয়েছিল, শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের দেহাবসান হয়। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা। সংবাদ পেয়ে আমরা কলকাতায় ফিরে আসি। অতঃপর দু-তিনমাস বাদে বাবাকে মুসৌরী নিয়ে যাওয়া হল বায়ু পরিবর্তনের জন্য ডাক্তারদের নির্দেশে। সুধীর মহারাজ সেই সময়ে দীর্ঘকাল মঠ মিশনের সেক্রেটারী থাকবার পরে ঐ দায়িত্বভার পূজনীয় বিরজানন্দ-স্বামীর সুযোগ্য হস্তে অর্পিত হয়েছে। ঐ কালেই একদিন পূজনীয় সুধীর মহারাজ বাবার সঙ্গে দেখা করবার জন্য মুসৌরীতে 'Camel's Back'-এ উপস্থিত হলেন কোন খবর না দিয়েই। যতদূর মনে হয়, কিষণপুর আশ্রম থেকে এসেছিলেন সকালবেলায়। সারাদিন বাবার সঙ্গে কাটিয়ে বিকেলের দিকে তিনি প্রস্থান করলেন। তাঁদের ভালবাসা যে কত-দূর আন্তরিক ছিল তা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়।

ঠাকুরের প্রাণস্পর্শী উপদেশগুলি সংক্ষেপে চয়ন করে লোককল্যাণের জন্য একটি পুস্তিকা প্রকাশ করার খুব আগ্রহ ছিল সুধীর মহারাজের মনে। একদিন বাবা গেছেন মঠে সুধীর মহারাজকে দর্শন ও প্রণাম করতে। সুধীর মহারাজ বললেন, "পূর্ণ বাবু! আপনি তো মশাই, দেখছি আমাদের প্রায় ভুলেই গেলেন। মনে করেছি যে, ঠাকুরের অমৃতোপম উপদেশের কিয়দংশ ছাপিয়ে তাঁর ভক্ত ও অনুগামীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করব। তাই কথামৃতের একটি সংক্ষিপ্ত সারাংশ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, এবং এর খরচটা আপনাকেই দিতে হবে।" বাবা বললেন, "বেশ তো, আমি দিয়ে যাব আপনাকে। তার আর ভাবনা কি? এ তো মস্ত কাজ।" এর দু-একদিন পরে বাবা যখন মঠে টাকাটা তাঁকে দিলেন, তখন তিনি খুব খুশি। পরে ঐ বই ছাপা হলে পুস্তকের কতকগুলি তিনি আমাদের উপহার দিলেন।

এর পরে মঠ মিশনের প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিষ্ঠিত হবার পরে তাঁর মতো স্নেহশীল, উদারচেতা মহাপুরুষেরও দীক্ষাপ্রদান সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধি খুব লক্ষণীয় ছিল। পূর্ব পরিচিত লোককে দীক্ষা দিতে আপত্তি না থাকলেও নিজেই তাকে নানাপ্রকার জেরা করতেন, যেমন,—জীবনের উদ্দেশ্য কী? কেন দীক্ষা নিতে চায়? দীক্ষা নিয়ে কী হবে? সুখ-দুঃখে আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য বিষয়ে, শ্রীশ্রীঠাকুরকে অবতার বলে বিশ্বাস করে কিনা। অনেক সময় শিক্ষিত—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিজেই কথামৃত পড়তে দিতেন। কথামৃত পড়ে দীক্ষা-প্রার্থীদের তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হত। তখন আবার তাকে নানারূপ প্রশ্ন করতেন। যোগ্য বলে বোধ হলে দীক্ষা দিতেন। এই সময়ে একদিন আমি তাঁকে দর্শন ও প্রণাম করতে গেছি, তিনি আমাকে বললেন, "ছাখো প্রভাত, তুমি আমাকে একসেট কথামৃত প্রেজেণ্ট্ করবে। দীক্ষার্থীদের কথামৃত পড়তে দিই, আর একসেট বেশি থাকলে দেবার সুবিধে হয়।" অবিলম্বে আমি তাঁকে একসেট কথামৃত দিয়ে এসেছিলাম।

আমার এক পরিচিত সজ্জন মঠে অনেকবার আমার সঙ্গে এবং একলা একলাও গিয়েছিল। সুধীর মহারাজ তাকে চিনতেন। সে একদিন তাঁর কাছে গিয়ে (আমি সেদিন ইচ্ছা করেই তার সঙ্গে ছিলাম না) সস্ত্রীক দীক্ষা প্রাপ্তির জন্ম আর্তি জানাল। তখন তিনি অনুমোদন করে কোন একটি বিশেষ দিনে তাদের উভয়কে আসতে বললেন। তারা উপস্থিত হলে তিনি ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি কোথাও দীক্ষা নিয়েছ?" উত্তরে তিনি বললেন, "আমি শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর নিকটে দীক্ষা নিয়েছি। কিন্তু মোটেই শান্তি পাচ্ছি না, তাই এখন আপনার নিকট মন্ত্র পেলে কৃতার্থ হব।" উত্তরে শুদ্ধানন্দ মহারাজ বললেন, "তবে তো তোমার দীক্ষা হয়ে গেছে। তোমাকে আর দীক্ষা দেবার প্রয়োজন হবে না। ব্রহ্মচারী মহাশয় তোমাকে ভগবানের নাম দিয়েছেন, আমিও তোমাকে ভগবানের নামই দেব। সুতরাং যা পেয়েছ তাতেই তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।" তিনি হতাশ ও বিমর্ষ হওয়ায় মহারাজ তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "তুমি কিছু ভেব না, ওতেই তোমার কল্যাণ হবে। আমি তোমার স্ত্রীকেই কেবল দীক্ষা দেব।" তাই হল।

গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও নানাবিধ অভিজ্ঞতার ফলে তিনি খুব সাবধানে দীক্ষা দিতেন। এখানে শাস্ত্রের (গীতা, ১৮।৬৭) কথা মনে হয়—

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥

শ্রীশ্রীঠাকুরও প্রচলিত আপ্ত উক্তিটির উল্লেখ করতেন, "গুরু মেলে লাখ লাখ, চেলা না মেলে এক।"

শাস্ত্র এবং মহাপুরুষদের নিকট শুনতে পাওয়া যায়, গুরুর ওপর ঠিক ঠিক বিশ্বাস থাকলে সিদ্ধিলাভের ব্যতিক্রম হয় না। কারণ সৎশিষ্যের কাছে গুরু হলেন যথার্থ তত্ত্বের জ্বলন্ত জীবন্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু এই বিশ্বাস অনেক সাধ্য-সাধনায় আসে। এইজন্যই দেখে শুনে শিষ্য করতে হয়। তাই ঠাকুর বলতেন, অন্তর ও প্রকৃতি পরিষ্কাররূপে না দেখে শিষ্য করলে সে শিষ্য টেকে না। তিনি গিরিশবাবুকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "যাকে তাকে নিয়ে আস কেন? সময় না হলে হয় না।" আবার এও শুনি যথার্থ ভক্ত সাধু নিজে যে-আনন্দ অনুভব করেছেন তা অপরকে অনুভব করাতে না পারলে বড় কষ্ট পান। স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের শেষকালে নাকি থাকে মাত্র দয়াবৃত্তিটি। তখন মহাপুরুষ

সকলেরই কল্যাণ কামনা করে যথার্থ সুখ পান। যারা মন থেকে সংসারের মায়া ত্যাগ করে ভগবানের দিকে অগ্রসর হয়, তাদের উন্নতি দেখে উক্ত মহাপুরুষের যে সুখ হয়, তার ইয়ত্তা করা যায় না।

মনে পড়ে,—তিনি যখন ডাক্তার ৺অজিতনাথ চৌধুরীর চিকিৎসাধীন ছিলেন তখন ডাক্তারবাবু একদিন কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে বলেছিলেন, "মহাপুরুষ মহারাজ তো বহুসংখ্যক প্রার্থীকে প্রাণখুলে দীক্ষা দিয়ে গেছেন। আপনি দীক্ষা দিতে এত কেন সংকুচিত হন?" শুদ্ধানন্দ মহারাজ উত্তর দিয়েছিলেন, "তাঁর শক্তি ছিল, আমার কি সে শক্তি আছে?"

তবে দীক্ষা দেবার জন্য যে আগ্রহ বা অনুকম্পা থাকা উচিত তা তাঁর যথেষ্ট ছিল এবং মনে হয় বেশিদিন তাঁর শরীর থাকলে তিনিও খুব সম্ভব জীবের দুঃখে কাতর হয়ে আরও অনেককে কৃপা করতেন। এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে, আমার কন্যা অষ্টম বর্ষীয়া বালিকার হয়ে তাঁর কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করি। মেয়েটি সঙ্গেই ছিল। তিনি তাকে দেখলেন, তাঁর সঙ্গে একটু আধটু কথাবার্তাও বললেন। আমাকেও কিছু কিছু জিজ্ঞাসা করলেন তার সম্বন্ধে। অতঃপর পরবর্তী রথের দিন তার দীক্ষার দিন ধার্য করে দিলেন। দীক্ষা হয়ে যাবার পরে স্বামী মাধবানন্দজী তাঁকে বললেন, "সন্ধ্যার বেলা দীক্ষা কেমন করে হল?" উত্তরে তিনি বললেন, "ও কাদের ঘরের মেয়ে?"

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের প্রারম্ভে বাবার দেহান্ত ঘটে মধুপুরের 'শেঠভিলা' নামক বাগান-বাড়িতে। মৃত্যুর দু-তিনদিন পূর্বে বাবা আমাকে বললেন, "এখন একবার কাশীতে আমাকে নিয়ে ফেলতে পার না?" উত্তরে আমি তাঁকে বললাম, "এই ঘরই (অর্থাৎ যে-ঘরে তিনি ছিলেন) তোমার কাশী! মনে পড়ছে না এই ঘরেই মহাপুরুষ মহারাজ কতদিন থেকে গেছেন?" এই কথা শোনা মাত্র তিনি শান্ত হয়ে আমার কথার অনুমোদন করলেন। তাঁর দেহান্তের পর তাঁর ইচ্ছা স্মরণ করে আমরা তাঁর শরীর কাশীর মণিকর্ণিকার মহাশ্মশানেই নিয়ে যাই। এবং সেখানেই শেষকৃত্য সমাপন করি। অতঃপর আমরা কাশীবাস করলাম বহুদিন ধরে। প্রয়োজন মতো মধ্যে মধ্যে কয়েকদিনের জন্য কার্যব্যপদেশে কলকাতা আসতে হত। একবার এরকম একলাই এসেছি কলকাতায়। মঠে পূজ্যপাদ শুদ্ধানন্দ-স্বামীকে দর্শন ও প্রণাম করলাম। তিনি আমার মা ও মেয়ের কুশল প্রশ্নাদি করলেন। আমি তাঁর কথার উত্তর দিয়ে, শেষকালে চলে আসার সময় বললাম, "চিঠিতে আপনার আশীর্বাদ তাঁদের পাঠিয়ে দেব।" নিয়ত সতর্ক মহাপুরুষ তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, "শুভেচ্ছা বল, আশীর্বাদ বলছ কেন?" এবং তাঁর কথার উদাহরণ স্বরূপ তিনি তখনই কথামৃত বের করে কেশববাবুর ছেলেদের আশীর্বাদ করার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে অনুরোধ এবং প্রত্যুত্তরে তাঁর জোর দিয়ে বলা যে, আশীর্বাদ করতে একমাত্র ভগবানই পারেন। অবশ্য আমিও ছাড়িনি, তাঁর মতো তখনই কথামৃত থেকে দেখিয়ে দিতে না পারলেও আমার বক্তব্য বিষয়ে অন্যস্থানের উল্লেখ করলাম, যেখানে ঠাকুর বাবুরাম মহারাজকে ও আর একজন ভাগ্যবানকে বললেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও কেদারবাবুকে দেখিয়ে যে, "এঁদের প্রণাম কর।" এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও কেদার-বাবুকে বললেন, "এদের আশীর্বাদ কর যেন এদের ভগবানে ভক্তিলাভ হয়।"

দীক্ষা সম্বন্ধে পূজনীয় সুধীর মহারাজের এইরূপ সতর্কতা সত্ত্বেও তাঁর সকলের প্রতি দরদ ও লোককল্যাণচিকীর্ষা, তাঁর নিকটস্থ সকলেই বারবার লক্ষ্য করেছেন।

ঈশ্বর-দর্শন

শেখ সদরউদ্দীন

প্রধান শিক্ষক, পানিহাটি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যাপীঠ,—সুপরিচিত কবি ও গীতিকার।

ঈশ্বরকে পাবার তরে কোথায় বৃথা ছোটো ভাই ?
যেথায় ছোটো দিবা-নিশি সেথায় দেখো, তিনি নাই !
মন্দিরে কেউ ঘণ্টা নাড়ে, মসজিদে কেউ ছুটে যায়—
যাকে পাবার জন্যে ছোটে, বলো তাকে ক'জন পায় ?

দেবী-দেবের ধ্যানে তুমি বসে আছো অর্ঘ্য লয়ে—
যাকে তুমি পূজা করো, কোথায় তিনি দেবালয়ে ?
গুরুদ্বার আর গির্জা গিয়ে, মসজিদে হায় মাথা কুটে
দরশন তার পেলে নাক ডাকলে এতো ভূমে লুটে।

বহু তীর্থে ঘুরলে হে ভাই, অর্থব্যয়ে হজে গিয়ে
বলো, আজি হৃদয় ভ'রে কত পুণ্য এলে নিয়ে ?
অনেক ঘোরাঘুরি ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়লে শেষে—
শ্রান্ত দেহের ঘর্ম মুছে দেখো ফিরে ঘরে এসে।

খুঁজছ যাকে সেই দেবতা পড়ে আছে পথের ধারে—
অনাহারে মরছে ধুঁকে, বুকে টেনে নাও হে তারে।
অন্ন যে নেই, বস্ত্রও নেই, জীর্ণ-শীর্ণ রুগ্ন দেহ—
নারায়ণই, জানবে তারা, নয়ক তারা অন্য কেহ।

একটু প্রীতি, একটু দরদ, একটু পেতে ভালোবাসা,
এই পৃথিবীর বুকে প্রভু নিত্য করেন যাওয়া-আসা।
দেবের আলয় নিত্য গড়ে তোমার আমার হৃদয়-মন—
জানবে এই বক্ষটাই কাবা-কাশী-বৃন্দাবন !

ছায়ার মায়া

অধ্যাপক শ্রীশিবশম্ভু সরকার

চারুচন্দ্র কলেজের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান।

বাস করি আমি আমারি ছায়ায়
ছেয়ে আছে আচরণ—
ঘিরে রাখি আমি মনের মায়ার
নিভৃত গুঞ্জরণ।

কায়া যদি যায় বনে
সীমা চলে তারি সনে
চালায় সে খনে খনে
হাসে কাঁদে এ' ভুবনে—
ভাসিলে গহন টানে
তট এসে পড়ে মনে।

স্তিমিত অসাড় করে বার বার
'আমি'-র আবেশে রচে কারাগার
মান-সম্ভ্রম-ছলার বাহার
ঘিরে ফেলে চারিপাশ—
নিজেরে এড়াবো—যত ভেবে মরি—
পিছে টানে কে যে রাশ।

কোথায় সে পূজা—কোথা নিবেদন
হৃদয় ছিঁড়িয়া কোথা তর্পণ
আসলে-নকলে একি বিরচণ
আমি-ছাড়া আমি কই?
আমার বিহনে কুহরিবে প্রাণ
"তুহু', তুহু"—গান ওই।

দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীমা সারদা

ব্রহ্মচারিণী অজিতা

শিক্ষাব্রতধারিণী লেখিকা।

যখনই ধর্মের গ্লানি দেখা দেয়, অভ্যুত্থান হয় অধর্মের,—যুগপ্রয়োজনে ধর্মসংস্থাপনার্থে আবির্ভাব হয় অবতারপুরুষের। আর্তমানবের আকুল প্রার্থনার আলোড়ন জাগায় অখণ্ড 'চিৎ'-সমুদ্রে,—করুণার 'মৃদুল-বায়ে' তরঙ্গায়িত হয় 'অরূপসায়র'—নির্বিশেষ নিরুপাধিক ব্রহ্ম নামরূপ পরিগ্রহ করে অবতীর্ণ হন ধরাতলে। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। 'নির্গুণ' মায়াধীশ ব্রহ্ম যখন নররূপে অবতরণ করেন, তখন মহামায়াস্বরূপিণী ঈশ্বর-শক্তিও নারীদেহাবলম্বনে আবির্ভূতা হন তাঁরই লীলাসঙ্গিনীরূপে। যুগে যুগে সেই এক আদ্যাশক্তির প্রকাশ আমরা দেখি নানা নামে, নানা রূপে—কখনও তিনি 'রামময়জীবিতা' জনকনন্দিনী 'সীতা', কখনও কৃষ্ণগতপ্রাণা 'শ্রীরাধিকা', শ্রীবুদ্ধের সঙ্গে অবতীর্ণা তিনি 'গোপা-যশোধরা' নামে, 'দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া' পরিচয়ে তিনিই সহগামিনী শ্রীচৈতন্যদেবের, শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারে সেই 'মহাশক্তি'রই পুনঃপ্রকাশ 'শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী' রূপে।

যুগপ্রয়োজনে অবতীর্ণ অবতারপুরুষের কথা যুগ যুগ ধরে মানব স্মরণ করে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞ চিত্তে। তাঁদের মহিমময় জীবনগাথা নিয়ে রচিত হয় কাব্য-নাটক-সঙ্গীতাদি, তাঁদের জয়গানে ভুবন মুখরিত। কিন্তু যে 'শক্তি' ব্যতীত অবতার-পুরুষের দিব্য ক্রিয়াকলাপাদি সম্ভবপর হত না,—সেই 'মহাশক্তি'র কথা আমরা প্রায়শঃই স্মরণে রাখি না। ভুলে যাই, গুণাতীত সচ্চিদানন্দ নন,—'সশক্তিক ভগবানই যুগপ্রয়োজনসাধনে সক্ষম।'

যেমন অশ্রুত পদসঞ্চারে স্নিগ্ধ শিশিরবিন্দু বিকশিত করে তোলে সৌরভময় কুসুমকলিকে,—শশধর সুধাধারায় প্লাবিত করেন জগৎ,—এই 'মহাশক্তি'র অবতরণ ঘটে তেমনই নিঃশব্দে, অলক্ষ্যে। আপনাকে সবার অগোচরে রেখে নীরবে আপন মহৎ কর্ম সুসম্পন্ন করে পুনরায় দিব্যলোকে তাঁরা প্রয়াণ করেন। এমনই এক দিব্য জীবন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের কথা, নবদ্বীপ তখন অখণ্ড বঙ্গের বিদ্যাচর্চা এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থান। সেই যুগে নবদ্বীপের বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন সনাতন মিশ্র। সম্পদশালীও ছিলেন তিনি। ধনদৌলত বলতে আমরা সাধারণভাবে যা বুঝি শুধু সেই বাহ্যসম্পদেই নয়—অন্তরের ঐশ্বর্যেও ধনী ছিলেন মিশ্রদম্পতি। অতিথিবৎসল, সদাচারসম্পন্ন, শুদ্ধসত্ত্ব এই ব্রাহ্মণের আলয়ে শুভলগ্নে জন্মগ্রহণ করলেন এক সুলক্ষণা কন্যা, সম্ভবতঃ সেদিনটি ছিল মাঘী শুক্লা পঞ্চমী তিথি। পিতৃগৃহে পরম আদরে শশিকলার মতো ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠলেন সকলের নয়নের মণি—'বিষ্ণুপ্রিয়া'। যেমন রূপ তেমনই গুণ। ধীর, স্থির, শান্ত, সেবাপরায়ণা, দেবদ্বিজে ভক্তিমতী এই বালিকাকে যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়। আবাল্য গঙ্গাপ্রীতিও ছিল তাঁর অসাধারণ। পূত জাহ্নবীসলিলে নিত্য অবগাহন তাঁর আশৈশবের অভ্যাস। গঙ্গার ঘাটেই নিত্য-গঙ্গাস্নায়িনী শচীদেবীর সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। সে পরিচয় পরে আরও নিবিড়তর, ঘনিষ্ঠতর হয়,—একাদশবর্ষীয়া বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়াকে সাদরে স্বীয় পুত্রবধূরূপে বরণ করেন শচীমাতা।

সু-কান্ত সুধীজনশ্রেষ্ঠ, সর্বজনপ্রিয়, সদানন্দময় 'শ্রীগৌরাঙ্গ'কে পতিরূপে লাভ করলেন সৌভাগ্য-শালিনী বিষ্ণুপ্রিয়া। পিতৃগৃহে তনয়ারূপে,

ভগিনীরূপে, সমবয়সী বান্ধবীদের সঙ্গে সখীরূপে, যাঁর আচরণ ছিল আদর্শস্থানীয়, বিবাহের পর বৃদ্ধা শ্বশ্রূমাতার সেবায়, গৃহকর্মনৈপুণ্যে, অতিথি-সৎকারে, শান্ত নম্র প্রীতিপূর্ণ আচরণে আদর্শ-বধূরূপে পতিগৃহেও তিনি সকলের প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠলেন। পরম আনন্দে অতিবাহিত হল কিছুদিন। কিন্তু এ আনন্দ স্থায়ী হল না। বধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার সৌভাগ্য-রবি রাহুগ্রস্ত হল অচিরেই।

কোন কার্যোপলক্ষে মাত্র কয়েকদিনের জন্য পিত্রালয়ে গমন করেছিলেন দেবী আর সেখানেই তাঁর শ্রবণগোচর হল মর্মন্তুদ একটি সংবাদ—নবদ্বীপবাসীর নয়নানন্দ, শচীর আদরের দুলাল, বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণাধিক প্রিয় আরাধ্য দেবতা,—'শ্রীগৌরাঙ্গ' সন্ন্যাসগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প—সে সঙ্কল্পসাধনে জননীর অনুমতিও লাভ করেছেন মাতৃগতপ্রাণ 'নিমাই'। গয়া-প্রত্যাগত নিমাইয়ের ভক্তি-প্রেমের উন্মাদনার কথা তাঁর অজানা নয়। অহর্নিশ কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা, বহির্জগৎ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, গৃহে থেকেও গৃহী নন 'গৌরসুন্দর'—এ কথা সত্য। তবু চিরতরে সংসারত্যাগ !!! এ যে অকল্পনীয়। বিনামেঘে বজ্রপাতের চেয়েও বুঝি নিদারুণ এ সংবাদ।

মহামহীরুহ—সেও সইতে পারে না বজ্রাঘাতের বেদনা, বজ্রাহত বৃক্ষ সমূলে বিনষ্ট হয় তৎক্ষণাৎ। অথচ সুকোমলা লতা অপেক্ষাও কোমল-স্বভাবা, আশৈশব আদরযত্নে লালিতা-পালিতা, চতুর্দশী এক কিশোরীর কি অসাধারণ মনোবল! কি অপরিসীম ধৈর্য, তিতিক্ষা, সহনশীলতা! সর্বোপরি কর্তব্যাকর্তব্যনির্ধারণে কি দৃঢ়নিশ্চয়া বুদ্ধি! সত্য-মিথ্যা যাই হোক, এই মর্মচ্ছেদী সংবাদ শ্রবণের পর দূরে থাকা সঙ্গত নয়, সম্ভবও নয়,—তাই অবিলম্বে পিত্রালয় থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন তিনি। কিন্তু দুঃসহ শেলসম এ সংবাদ তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ করলেও তাঁর ধীর, স্থির, কর্মময় অথচ শান্ত জীবনপ্রবাহের গতি রোধ করতে পারল না। ভাবের উচ্ছ্বাস উদ্বেলিত হয়ে অতিক্রম করল না ধৈর্যের বেলা-ভূমি। সংসারের নিত্য নিয়মিত কর্তব্যকর্ম-সমাপনান্তে নিশীথে নিভৃতে পতিসকাশে মৃদু কণ্ঠে অশ্রুপূর্ণ লোচনে বালিকাবধূ শুধু জানতে চাইলেন—এ সংবাদ সত্য কিনা। তাঁর আরও জিজ্ঞাসা—"কেন গৃহত্যাগ করবেন শ্রীগৌরাঙ্গ? শচীদেবীর কথা কি তিনি চিন্তা করেছেন? গৃহে থেকে কি ঈশ্বর-আরাধনা হয় না?" যদি পত্নী-সংস্পর্শ ত্যাগই নিমাইয়ের অভিপ্রেত হয়, তবে তাঁর গৃহত্যাগের প্রয়োজন নেই, বরং বিষ্ণুপ্রিয়াই পিতৃগৃহবাসিনী হবেন অথবা স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জন করবেন গঙ্গাবক্ষে—স্বীয় অভিমত সুস্পষ্ট কণ্ঠে জানালেন তিনি। ভাবাবেগের উদ্বেল উচ্ছ্বাস নয়, দুঃখ বেদনার উদ্দাম প্রকাশ নয়, এমন কি কোন অভিমান-অনুযোগও নয়,—তার পরিবর্তে দৃঢ় মৃদু কণ্ঠের এই প্রশ্ন। বালিকাবধূর যুক্তিযুক্ত বাক্য বুঝি স্তব্ধ, বিচলিত করল নবদ্বীপের তার্কিককুলচূড়ামণিকেও। ক্ষণকাল মৌন রইলেন তিনি। তারপর ধীর শান্ত কণ্ঠে জানালেন এ সংবাদ সত্য। জীবকল্যাণহেতু সংসারত্যাগ তাঁকে করতেই হবে—বৃহতের জন্য, মহতের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থসুখকে বলি দিতেই হয় চিরকাল।

ভারতবর্ষে পত্নীকে বলা হয় সহধর্মিণী, ধর্মাচরণে সর্বতোভাবে পতির সহায়তা করাই স্ত্রীর কর্তব্য—ভারতীয় নারীর এই আদর্শে গঠিত বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবন। তাই সন্ন্যাসগ্রহণই পতির অন্তরের আকুল আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ঙ্গম করে সাধ্বী পত্নী সহায় হলেন ধর্মপথের—সম্মতি দিলেন সন্ন্যাসগ্রহণের। শুধু একবার মৌখিক সম্মতি প্রদান মাত্র নয়—পরবর্তী কালেও কখনও

শ্রীচৈতন্যের গৃহত্যাগে কোন অনুযোগ, কোন আক্ষেপ-ধ্বনি ধ্বনিত হয়নি তাঁর শ্রীমুখে। বরং দেখি সংসারত্যাগী স্বামীর সন্ন্যাসধর্মরক্ষার্থে পতি-সন্দর্শন-সৌভাগ্য থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিতা করেছেন নিজেকে। সন্ন্যাসগ্রহণের পর নিত্যানন্দাদি ভক্তবৃন্দ সুকৌশলে শ্রীচৈতন্যকে শান্তিপুরে নিয়ে এসেছেন। প্রাণপ্রিয় 'গৌরাঙ্গসুন্দরের' দিব্য সান্নিধ্যে তৃপ্ত ভক্তজন। হারানিধিকে কাছে পেয়ে আনন্দিতা শচীমাতা। অদ্বৈত-আলয়ে আনন্দের প্লাবন। যে আনন্দ-যজ্ঞে সবার নিমন্ত্রণ, সেই মহামহোৎসবে যোগ দেননি শুধু একজন—দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া,—যাঁর অসাধারণ আত্মসংযমের নীরব আত্মোৎসর্গের মূল্যে জগৎ পেয়েছে 'প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে।'

প্রায় পাঁচশো বছর পরে দেখি অনুরূপ ঘটনারই পুনরভিনয় শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবনে। যেন যুগে যুগে একই নাটকের অভিনয়—পরিবর্তন শুধুমাত্র স্থান-কালের, নাম-রূপের। শ্রীশ্রীমা-ও আবির্ভূতা হয়েছিলেন সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণকুলে। কন্যারূপে, ভগিনীরূপে, সখীরূপে—তিনিও আবাল্য সকলের প্রিয়। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার মতো আশৈশব তাঁরও ছিল অসাধারণ গঙ্গা-ভক্তি। অবশ্য জয়রামবাটি নবদ্বীপের মতো গঙ্গা-তটবর্তী নয়,—তাই শীর্ণকায়া 'আমোদর' নদই ছিল বালিকা সারদার গঙ্গা। (পরবর্তী জীবনে কলকাতা বাসকালে নিত্যগঙ্গাস্নানে ব্যতিক্রম ঘটত না তাঁর।) শ্রীরামকৃষ্ণের রূপে তিনিও বৃতা হন বাল্যেই। অতি শৈশবে বিবাহ হওয়ায় সে স্মৃতি যদিও তাঁর চিত্তপটে উজ্জ্বল ছিল না, কৈশোরে অনিন্দ্যকান্তি, সদা-রঙ্গময়, মধুরভাষী, স্নেহশীল, সরল, উদারচরিত পতির পূতসান্নিধ্যে তিনিও বিষ্ণুপ্রিয়ার মতোই পরমানন্দ লাভে ধন্য হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে মা পরে স্বয়ং বলেছেন—"হৃদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে, ঐকাল হইতে সর্বদা ঐরূপ অনুভব করিতাম। সেই ধীর, স্থির, দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূর কিরূপ পূর্ণ থাকিত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে।" কিন্তু তাঁর জীবনেও এ সুখ-সৌভাগ্য অধিক কাল স্থায়ী হল না।

দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তনান্তে সাধনায় মগ্ন হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরপ্রেমে আত্মহারা সাধকের 'ভাবতন্ময়তা' সঙ্কীর্ণবুদ্ধি সাধারণ সংসারী মানবের দৃষ্টিতে 'উন্মত্ততারই' নামান্তর মাত্র। 'শ্রীরামকৃষ্ণ উন্মাদ'—অচিরেই মর্মন্তুদ এ জনশ্রুতি বিদীর্ণ করল সরলা পল্লীবালার হৃদয়। তখন কতই বা বয়স তাঁর! অথচ কি অপরিসীম ধৈর্য, সহনশীলতা! কি অপূর্ব কর্তব্যনিষ্ঠা! কি প্রগাঢ় প্রেম! 'উন্মাদের স্ত্রী' ভেবে মনস্তাপ নয়, বিলাপ নয়, ক্রন্দনের উচ্চরোলে অপরের সহানুভূতি আকর্ষণের বৃথা প্রয়াস নয়—তার পরিবর্তে চক্ষুকর্ণের বিবাদ-ভঞ্জনের জন্য সুকৌশলে গঙ্গাস্নানচ্ছলে স্বয়ংই উপস্থিত হলেন দক্ষিণেশ্বরে। শুধুমাত্র সত্যাসত্য নির্ধারণই নয়,—যদি পতি বাস্তবিকই উন্মাদ হয়ে গিয়ে থাকেন, তবে সেবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে থাকাই তাঁর কর্তব্য—এই ছিল 'তথাকথিত শিক্ষার' আলোকবঞ্চিতা, লজ্জানম্র, শান্ত অথচ দৃঢ়সঙ্কল্প পল্লীবালিকাটির অন্তরের অভিপ্রায়।

'ত্যাগ-বিগ্রহ' শ্রীরামকৃষ্ণ বাহ্যতঃ সংসারত্যাগ করে দূরে সরে যাননি, তাই আক্ষরিক অর্থে 'পতির সন্ন্যাসগ্রহণে সম্মতি দানের' প্রয়োজন সারদাদেবীর হয়নি একথা সত্য। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই সুকঠিন কর্তব্য তাঁকে পালন করতে হয়েছে আরও কঠোরভাবে। ত্যাগীশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবনে শ্রীশ্রীমায়ের অবদান অতুলনীয়। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়েও একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ এ প্রসঙ্গে আমরা করতে পারি। কিশোরী সারদা তখন

দক্ষিণেশ্বরে। "তুমি কি আমায় সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ?"—গভীর নিশীথে একান্তে তরুণী ভার্যাকে জিজ্ঞাসা করছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ নয়, দ্বিধা-সঙ্কোচ নয়, সপ্রতিভ স্থির নিঃসংশয় উত্তর—"না, আমি তোমাকে সংসারপথে কেন টানতে যাব? তোমার ইষ্ট-পথেই সাহায্য করতে এসেছি।"—এই দিব্য কথোপকথন কি পঞ্চশত বৎসর পূর্বের এক পবিত্র রজনীর কথাই স্মৃতিপথে উদিত করে না? শ্রীচৈতন্যদেব বাহ্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন,—তাঁর সন্ন্যাসজীবনের অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত হয়েছে নীলাচলে এবং তীর্থাদি পর্যটনে। সুতরাং পতির পুণ্যদর্শন লাভ বিষ্ণুপ্রিয়ার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না কখনই। সে প্রয়াসও তিনি করেননি। তাঁর আত্মত্যাগ বাস্তবিকই তুলনাবিহীন, আর এই আত্মত্যাগের চরম বিকাশ,—আত্মসুখ বিসর্জনের পরাকাষ্ঠা আমরা দেখি শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে। স্বামী গৃহত্যাগ করে পরিব্রজ্যায় গমন করেননি, পতিসান্নিধ্য থেকে দূরে, বহুদূরে নয়,—'দক্ষিণেশ্বরে' নহবতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তখন বাস করছেন তিনি, অথচ সেই 'দক্ষিণেশ্বরেই' শ্রীশ্রীঠাকুরের কক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য সান্নিধ্যে ভগবৎপ্রসঙ্গের, ভজন-কীর্তনের অমৃতাস্বাদে যখন ভক্তবৃন্দ মাতোয়ারা,—তখনও এই আনন্দের মহামহোৎসবে যোগদান দূরে থাক,—দিনান্তে একটিবারও শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভের সৌভাগ্য পর্যন্ত ঘটত না সারদা-দেবীর। মা পরে নিজেই বলছেন—"কখনও কখনও দুমাসে হয়তো একদিনও ঠাকুরের দেখা পেতুম না।" অথচ আশ্চর্য এই যে, তার জন্য কোন আক্ষেপোক্তি,—কোন অনুযোগ-অভিযোগ নয়, বড় জোর শুধু নিজেকে বোঝানো—"মন, তুই কি এমন ভাগ্য করেছিস যে, রোজ রোজ ওঁর দর্শন পাবি?"

দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীশ্রীমা সারদা—উভয়ের আবির্ভাব অবতারের লীলার সহায়িকারূপে,—উভয়ের সৌসাদৃশ্য দেখা যায় জীবনের সর্ব-ক্ষেত্রেই। শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন মাতৃগতপ্রাণ। মাতৃভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবও, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে গর্ভধারিণী জননীর সেবা-শুশ্রূষার, তাঁর তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করা সাধ্যাতীত ছিল দুজনেরই—সে গুরু-দায়িত্বভার স্বেচ্ছায় সানন্দে অক্ষুব্ধচিত্তে আজীবন বহন করেছেন—'বিষ্ণুপ্রিয়া', 'সারদা'। পতি-পত্নীর লৌকিক সম্পর্ক না থাকলেও 'পতিগতপ্রাণা' ছিলেন উভয়েই—পতির নিকট শিক্ষা-দীক্ষা লাভের সৌভাগ্য ঘটেছিল উভয়ের—অধ্যাত্মসম্পদের অধিকারিণীও হয়েছিলেন উভয়ে।

তপস্যাময় জীবন দুজনেরই। নহবতে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করে ভক্ত মহিলাবৃন্দ বলতেন—"আহা! যেন বনবাস।" 'বিন্দুবাসিনী' সারদাদেবীর জীবন অনুধ্যান করলে মনে হয়, বনবাসও বুঝি স্বর্গ—এর তুলনায়। মুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিতা-পালিতা পল্লীবালার পক্ষে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বন্দিজীবন যাপন! এমনকি শৌচাদির প্রয়োজনেও বাইরে বেরনোর উপায় ছিল না। স্বামী সন্দর্শনলাভ—তাও সব সময় ঘটত না। অথচ তারই মধ্যে তপোনিমগ্না, সদাপ্রসন্না তিনি। অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নানান্তে ধ্যানজপাদিতে নিরতা হতেন, সারাটি দিন ব্যাপৃত থাকতেন ভক্তসেবায়,—শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায়, সমগ্র দিবসব্যাপী অসংখ্য কর্মসমাপনান্তে রাত্রির অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হত ধ্যানজপে—নিশীথে নহবতশীর্ষে সমাধিমগ্ন সেই মাতৃমূর্তি সন্দর্শনে ধন্য হয়েছেন কোন কোন ভাগ্যবান সন্তান। শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূল শরীরের অদর্শনের পর সারদাদেবীকে আরও কঠোর তপশ্চর্যায় নিরত দেখতে পাই,—কখনও বৃন্দাবনাদি তীর্থে

তপোমগ্না, কখনও সুকঠিন 'পঞ্চতপা' ব্রত-পালনে উদ্যোগী, কখনও চরম কৃচ্ছ্রসাধনপূর্বক একান্তে বাস কামারপুকুরে।

দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াও আজীবন একান্তে সাধন-ভজনে মগ্ন থেকে কঠোর সন্ন্যাসিনীর ন্যায় জীবন-যাপন করতেন। শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের পর সে তপোকাঠিন্য বর্ধিত হয় শতগুণে। বাহ্য জগতের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে সাধন-ভজনে নিঃশেষে আত্মনিবেদন করেন তিনি। প্রাতে স্নানাদির পর ভজনমন্দিরে প্রবেশ করতেন ভজনান্তে বেলা তৃতীয় প্রহরে গ্রহণ করতেন যৎসামান্য প্রসাদান্ন।

"অন্তঃপুরে ঠাকুরাণী প্রাতঃস্নান করি।
শালগ্রামে সমর্পিয়া তুলসী মঞ্জরী॥
পিড়াতে বসিয়া করে হরেকৃষ্ণ নাম।
আতপতণ্ডুল কিছু রাখে নিজস্থান॥
ষোল নাম পূর্ণ হৈলে একটি তণ্ডুল।
রাখে সরাতে অতি হইয়া ব্যাকুল॥
এইরূপে তৃতীয় প্রহর নাম লয়।
তাহাতে তণ্ডুল সব সরাতে দেখয়॥
তাহা পাক করি শালগ্রামে সমর্পিয়া।
ভোজন করেন কত নির্বেদ করিয়া॥

—অনুরাগবল্লী

"চৈতন্যদেব বাস করিতেন 'গম্ভীরা'তে—দেবীর বাসগৃহ গম্ভীরতর, গম্ভীরতম হইল"—মনস্বী মরমী সাধক-ভক্তের লেখনীমুখে অঙ্কিত এই একটি রেখাচিত্রেই যেন আমরা পাই তপস্বিনী বিষ্ণুপ্রিয়াজীর একখানি পরিপূর্ণ আলেখ্য।

স্বয়ং শক্তিস্বরূপিণী হয়েও উভয়েই ছিলেন 'লজ্জাপটাবৃতা', 'অবগুণ্ঠিতা'। শ্রীরামকৃষ্ণের বা শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পূর্বে কদাচিৎ কেউ তাঁদের পুণ্যদর্শনলাভে ধন্য হয়েছেন। পরবর্তী কালেও দেখি ভক্তগণ প্রণাম নিবেদন করতে এলে শ্রীশ্রীমা অবগুণ্ঠিতা হয়েই উপবেশন করতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দাদি প্রিয় সন্তানদের সঙ্গে বাক্যালাপ-কালে পর্যন্ত মধ্যবর্তিনীর সহায়তা গ্রহণ করতেন। ভক্ত সন্তানদের দর্শনদানকালে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াও পর্দার অন্তরালে দণ্ডায়মান থাকতেন। পরি-চারিকা বা সেবিকাগণ পর্দা উত্তোলন করলে, ভক্তেরা শ্রীচরণযুগল দর্শনে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করতেন।

অবতারপুরুষের সঙ্গে আসেন লীলাসহচর-গণ, মহাশক্তির দিব্যাবতরণকালে শক্তির অংশ-স্বরূপা লীলাসহচরীবৃন্দ ভূতলে আগমন করেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেখি মহাশক্তির সঙ্গে ব্রাহ্মী, কৌমারী ইত্যাদি নানা নামে অসংখ্য দেবশক্তির সমাবেশ। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরঙ্গ সেবিকা, সহচরী ছিলেন 'কাঞ্চনা' এবং 'অমিতা'। বিশেষতঃ কাঞ্চনা ছিলেন ছায়ার ন্যায় দেবীর অনুগামিনী এবং সদা তাঁর প্রিয়কার্যসাধিকা। নবদ্বীপ থেকে নীলাচল—এই দীর্ঘ দুর্গম পথ পদব্রজে অতিক্রম করা যে-যুগে পুরুষের পক্ষেও সুসাধ্য ছিল না, সেই সময়ও পদব্রজে এই পথে নীলাচল গমনাগমন করে শ্রীচৈতন্যের সংবাদ এনে দেবীকে প্রীত করেছেন,—তাঁর বিশেষ অনুগ্রহভাজনা 'কাঞ্চনা'। মনে পড়ে শ্রীশ্রীমায়েরও এমনই অন্তরঙ্গ সহচরী, একান্ত অনুগামিনী ছিলেন 'গোলাপসুন্দরী দেবী' এবং 'যোগীন্দ্রমোহিনী দাসী'—পরবর্তী কালে যাঁরা পরিচিত 'গোলাপ-মা' ও 'যোগীন-মা' নামে। শ্রীশ্রীমা নিজমুখে বলতেন—"গোলাপ, যোগীন এরা আমার অন্তরঙ্গ।"

পুরুষ ভক্তদের মধ্যে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার বিশেষ সেবাধিকার লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল দেবীর পদাশ্রিত সেবক 'বংশীবদন' এবং 'দামোদর পণ্ডিতের'। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনেও দেখা যায় তাঁর একান্ত স্নেহভাজন সেবকবৃন্দের মধ্যে প্রধান ছিলেন দুজন—স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ। বিষ্ণুপ্রিয়াজীর দেহত্যাগের পূর্বেই

বংশীবদন শরীর ত্যাগ করেন, স্বামী যোগানন্দও মহাপ্রয়াণ করেন শ্রীশ্রীমা স্থূল শরীরে থাকাকালেই। 'দামোদর পণ্ডিত' এবং 'স্বামী সারদানন্দ'—উভয়েই ছিলেন আশিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, উৎসাহী, কর্মপটু, স্থিরবুদ্ধি, দূরদর্শী, বিচক্ষণ, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, মহাসাধক এবং সর্বোপরি দুজনেই ছিলেন একান্তভাবে 'মাতৃগতপ্রাণ'। দামোদর পণ্ডিতকে স্বয়ং চৈতন্যদেব নিয়োজিত করেছিলেন শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার তত্ত্বাবধানে, আর শ্রীশ্রীঠাকুর ক্রীড়াচ্ছলে শরতের (স্বামী সারদানন্দের) ক্রোড়ে উপবেশন করে বলেছিলেন,—"দেখলাম ও কতটা ভার সইতে পারবে"। শ্রীশ্রীমা-ও বলতেন—"শরৎ আমার ভারী"।

শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পর তৎপ্রচারিত ভক্তিমার্গের পুষ্টিসাধন এবং ভক্তহৃদয়ে প্রেরণা সঞ্চারের নিমিত্ত আরও কিছুকাল মর্ত্যে অবস্থান করেন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া। গদাধরদাসাদি ভাগ্যবান ভক্তগণ মাতৃচরণোপান্তে আশ্রয়লাভে কৃতকৃতার্থ হন। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোধানের পর সুদীর্ঘকাল ধরাধামে অবস্থানপূর্বক তাঁর আরব্ধ কার্য সর্বতোভাবে সুসম্পন্ন করেন। যোগানন্দাদি ত্যাগী-সন্তান, অগণিত ভক্ত এবং শত শত আর্ত-তাপিত জন তাঁর শ্রীপদে আশ্রয়লাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচারে, সংরক্ষণে, শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের বিকাশ ও পুষ্টিসাধনে শ্রীশ্রীমায়ের অবদান অপরিসীম। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার মাতৃরূপ এবং সংঘজননী রূপের চরমতম বিকাশ আমরা দেখি শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবনে।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পঞ্চশত বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশ্বব্যাপী মহোৎসবের পুণ্যলগ্নে আমরা স্মরণ করি, প্রণাম করি যুগে যুগে নানা নামে নানা রূপে প্রকাশিত সেই মহাশক্তিকে,—চৈতন্যাবতারে যাঁর আবির্ভাব 'দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া' নামে—শ্রীরামকৃষ্ণাবতারে যিনি পূজিতা 'মা-সারদা'রূপে।

ভ্রমসংশোধন

পৌষ, ১৩৯১ সংখ্যায় ৮২০ পৃষ্ঠার উপর থেকে ২য় পঙ্‌ক্তিতে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টারে'-র পরিবর্তে 'বেদান্ত সোসাইটিতে' পড়তে হবে।—সঃ

অষ্টাবক্র-গীতা

অনুবাদক : স্বামী ধীরেশানন্দ

[মাঘ, ১৩৯১ সংখ্যার পর]

আত্মানুভবোপদেশঃ

(আত্মানুভবোপদেশ বর্ণনং নাম প্রথমং প্রকরণম্)

জনক উবাচ—

কথং জ্ঞানমবাপ্নোতি কথং মুক্তির্ভবিষ্যতি।
বৈরাগ্যং চ কথং প্রাপ্তমেতদ্ ব্রূহি মম প্রভো ॥১॥

অন্বয় : প্রভো! জ্ঞানং কথম্ অবাপ্নোতি, মুক্তিঃ কথং ভবিষ্যতি, কথং চ বৈরাগ্যং প্রাপ্তম্, এতৎ মম ব্রূহি ॥ ১ ॥

অনুবাদ : রাজর্ষি জনক গুরু অষ্টাবক্র ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—হে প্রভো! পুরুষ কি উপায়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে, মুক্তি কি প্রকারে হইবে এবং বৈরাগ্যই বা কি করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়—এই সমস্তই আপনি আমার কল্যাণার্থ বিশদরূপে বর্ণন করুন ॥ ১ ॥

মুক্তিকামী সমাগত শ্রদ্ধালু শিষ্যকে পরম কারুণিক জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন অষ্টাবক্র মুনি শমদমাদি জ্ঞানসাধনের উল্লেখপূর্বক মোক্ষহেতু তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিতেছেন—

অষ্টাবক্র উবাচ—

মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ।
ক্ষমার্জবদয়াতোষসত্যং পীযূষবদ্ ভজ ॥২॥

অন্বয় : তাত! চেৎ মুক্তিম্ ইচ্ছসি বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ, ক্ষমা-আর্জব-দয়া-তোষ-সত্যং পীযূষবৎ ভজ ॥ ২ ॥

অনুবাদ : অষ্টাবক্র মুনি উত্তরে বলিতেছেন—হে তাত! (হে প্রিয় শিষ্য!) যদি তুমি সর্বানর্থনিবৃত্তি ও পরমানন্দ-প্রাপ্তিরূপ মুক্তির ইচ্ছা করিয়া থাক তবে অনর্থহেতু বলিয়া লোকে যেমন বিষকে ত্যাগ করিয়া থাকে তদ্রূপ তুমিও সর্বানর্থভূত দেহাদি বিষয় ত্যাগ কর অর্থাৎ দেহাদিতে আমি আমার এইরূপ আসক্তি বা অভিমান করিও না।[১] এবং ক্ষমা,[২] আর্জব[৩], দয়া[৪], সন্তোষ[৫] ও সত্য[৬] আদি গুণনিচয় সর্বদা অমৃততুল্য জানিয়া সেবন কর ॥ ২ ॥

১ এইরূপে বাহ্যপদার্থে আসক্তি ত্যাগোপদেশ দ্বারা বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহরূপ জ্ঞানসাধন 'দম' উপদিষ্ট হইল।
২ সর্বসহন অর্থাৎ সর্বাধিষ্ঠানত্ব। ইহা আত্মধর্ম।
৩ অবিদ্যাকুহকরাহিত্য—ইহাও আত্মধর্ম।
৪ নিরুপাধিকরূপে সর্বহিতকারী—ঐ।
৫ আত্মসুখ—ইহা আত্মার স্বরূপ।
৬ ত্রিকালাবাধিত স্বরূপ—ইহা আত্মার স্বরূপ।

(এইরূপ শমদমাদি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন অধিকারীর প্রতি ভগবান্ অষ্টাবক্র মুনি উপদেশ দিতেছেন—)

শংকা : এই পাঞ্চভৌতিক দেহই তো আত্মা। সুতরাং এই পঞ্চভূত ও তাহাদের ধর্মসমূহ কি করিয়া ত্যাগ করা যাইতে পারে ? পৃথিবী আদির স্বভাবভূত গন্ধ আদি ধর্ম তিন কালে কখনও পরিত্যক্ত হইতে পারে না।

এই সম্ভাব্য শংকার উত্তরে আচার্য বলিতেছেন যে, তুমি পৃথিবী আদি স্বরূপ নও, ইত্যাদি—

ন পৃথ্বী ন জলং নাগ্নির্ন বায়ুর্দ্যৌর্ন বা ভবান্।
এষাং সাক্ষিণমাত্মানং চিদ্রূপং বিদ্ধি মুক্তয়ে ॥৩॥

অন্বয় : ভবান্ পৃথ্বী ন, বা জলং ন, অগ্নিঃ ন, বায়ুঃ ন, দ্যৌঃ ন, এষাং সাক্ষিণম্ আত্মানং মুক্তয়ে চিদ্রূপং বিদ্ধি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ : হে শিষ্য! তুমি পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ—ইহার কোনটি রূপই নও।[১] এই সকলের সাক্ষী[২] আত্মাকে (অর্থাৎ "আমি"-কে) তুমি মুক্তি[৩] লাভার্থ চৈতন্য[৪]-রূপে অবগত হও ॥ ৩ ॥

১ অতএব তুমি অনাত্মা বিষয়সমূহ ত্যাগ কর।
২ দেহাদির সাক্ষী আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন, যেমন ঘটদ্রষ্টা ঘট হইতে ভিন্ন।
৩ ইহাই আত্মজ্ঞানের ফল।
৪ নৈয়ায়িকাভিমত আত্মার অচিদ্রূপতা অস্বীকৃত হইল।

নৈয়ায়িকগণ বলেন, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি; প্রাভাকর মতে দুঃখপ্রাগভাবে স্থিতিই মুক্তি; আত্মনাশই মুক্তি, ইহা (শূন্যবাদী) বৌদ্ধগণের মত।—এই সকল মত নিরাকরণ-পূর্বক আত্মজ্ঞানলভ্য জীবন্মুক্তিদশার বর্ণন করিতেছেন—

যদি দেহং পৃথক্কৃত্য চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি।
অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধমুক্তো ভবিষ্যসি ॥৪॥

অন্বয় : যদি দেহং পৃথক্ কৃত্য চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি, (তদা) অধুনা এব সুখী শান্তঃ বন্ধমুক্তঃ ভবিষ্যসি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ : হে শিষ্য! যদি তুমি দেহাদি পৃথক্ করিয়া তৎসমূহ হইতে বিলক্ষণ চৈতন্যে একাগ্রচিত্ত হইয়া অবস্থান করিতে পার তাহা হইলে তুমি এখনই অর্থাৎ এই মুহূর্তেই পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া সুপ্রসন্নচিত্ত ও কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অনর্থরূপ বন্ধনমুক্ত হইতে পার ॥ ৪ ॥

বর্ণাশ্রমবিহিত কর্তব্য কর্ম বিদ্যমান থাকিতে চৈতন্যে বিশ্রান্তিরূপ মুক্তি কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে, এই শংকার উত্তর—

ন ত্বং বিপ্রাদিকো বর্ণো নাশ্রমী নাক্ষগোচরঃ।
অসঙ্গোঽসি নিরাকারো বিশ্বসাক্ষী সুখী ভব ॥৫॥

অন্বয় : ত্বং বিপ্রাদিকঃ বর্ণঃ ন, আশ্রমী ন, অক্ষগোচরঃ ন, (ত্বম্) অসঙ্গঃ নিরাকারঃ বিশ্বসাক্ষী অসি, সুখী ভব ॥ ৪ ॥

অনুবাদ : তুমি ব্রাহ্মণাদি কোন বর্ণ নও, কোন ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রমভুক্তও তুমি নও অর্থাৎ তুমি বস্তুতঃ বর্ণাশ্রমাদিবিহীন। কোন ইন্দ্রিয়জ্ঞান[১]ও তোমাকে বিষয় করিতে পারে না; তুমি সর্বোপাধিসঙ্গরহিত, আকারবিহীন ও সকলের সাক্ষী। অতএব স্বরূপচৈতন্যে বিশ্রান্তিলাভপূর্বক তুমি পরমানন্দ প্রাপ্ত হও ॥ ৫ ॥

১ আমি ব্রাহ্মণ ইত্যাদি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ দেহ বিষয়ক, আত্মবিষয়ক নহে।

২ যেহেতু তুমি অসঙ্গ ও বর্ণাশ্রমাদিরহিত, অতএব কর্মাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যে একাগ্রচিত্ত হও।

চৈতন্যমাত্রনিষ্ঠ হইলে বৈদিককর্ম পরিত্যাগজনিত প্রত্যবায় হইবে, এই শংকার উত্তরে বলিতেছেন—

ধর্মাধর্মৌ সুখং দুঃখং মানসানি ন তে বিভো।
ন কর্তাসি ন ভোক্তাসি মুক্ত এবাসি সর্বদা ॥৬॥

অন্বয় : বিভো! ধর্মাধর্মৌ সুখং দুঃখং মানসানি, তে ন। (ত্বং) কর্তা ন অসি, ভোক্তা ন অসি; (ত্বং) সর্বদা মুক্ত এব অসি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ : হে পরিপূর্ণস্বরূপ! ধর্ম, অধর্ম, সুখ, দুঃখ—এই সকলই মানসিক অর্থাৎ মনের ধর্ম।[১] তুমি কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব[২]বিহীন ও সদা মুক্ত[৩] ॥ ৬ ॥

১ অতএব ইহাদের সহিত ত্রিকালেও তোমার কোন সম্বন্ধ নাই।

২ বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্মকর্তারই পুণ্য পাপদ্বারা সুখদুঃখভোক্তৃত্ব হইয়া থাকে। উহা তোমাতে নাই, কারণ তুমি শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ।

৩ সুখদুঃখ, পাপপুণ্য—এই সবই অজ্ঞানকল্পিত। চৈতন্যে বিশ্রান্তিদ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে ঐ সকল কল্পনা স্বতই বিলীন হইয়া যায় এবং শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ, নিত্যমুক্ততাই প্রতিভাত হইতে থাকে।

নিত্যমুক্ত আত্মার বন্ধন একটি মিথ্যা প্রতীতি মাত্র। সেই মিথ্যা বন্ধনের হেতু বলিতেছেন—

একো দ্রষ্টাসি সর্বস্য মুক্তপ্রায়োঽসি সর্বদা।
অয়মেব হি তে বন্ধো দ্রষ্টারং পশ্যসীতরম্ ॥৭॥

অন্বয় : (ত্বং) সর্বস্য একঃ দ্রষ্টা অসি। সর্বদা মুক্তপ্রায়ঃ অসি। অয়ম্ এব হি তে বন্ধঃ (যৎ) ইতরং দ্রষ্টারং পশ্যসি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ : হে শিষ্য! তুমি সর্বশরীরের একমাত্র ব্যাপক দ্রষ্টা, দেহাধ্যাসবশতঃ বদ্ধ প্রতীয়মান হইলেও তুমি বস্তুতঃ মুক্ত। তথাপি আত্মাকে দেহাদিপরিচ্ছিন্নরূপেই তুমি জানিয়া থাক, ইহাই তোমার বন্ধন ॥ ৭ ॥

পূর্বশ্লোকে বন্ধনের হেতু বলা হইয়াছে, এক্ষণে অনর্থের হেতু, তাহার নিবৃত্তি এবং পরমানন্দপ্রাপ্তির উপায় বলা হইতেছে—

অহং কর্তেত্যহংমানো মহাকৃষ্ণাহিদংশিতঃ।
নাহং কর্তেতি বিশ্বাসামৃতং পীত্বা সুখী ভব ॥৮॥

অন্বয় : (ত্বং) অহং কর্তা ইতি অহংমানঃ মহাকৃষ্ণ-অহি-দংশিতঃ। (অতঃ) অহং কর্তা ন ইতি বিশ্বাস-অমৃতং পীত্বা সুখী ভব ॥ ৮ ॥

অনুবাদ : হে শিষ্য! 'আমি কর্তা' এই অহংকাররূপ (আত্মাতে কর্তৃত্বাভিমানরূপ) মহান্ কৃষ্ণ-সর্পকর্তৃক তুমি দষ্ট (কবলীকৃত) হইয়াছ। অতএব 'আমি কর্তা নহি'—এই প্রকার নিশ্চয়জ্ঞানরূপ অমৃত পান করিয়া অর্থাৎ অনুভব করিয়া পরমানন্দ লাভ কর ॥ ৮ ॥

জ্ঞানাগ্নি গহন অজ্ঞানকানন নিঃশেষে দগ্ধ করিয়াই পরমানন্দলাভের সাধন হইয়া থাকে—

একো বিশুদ্ধবোধোঽহমিতি নিশ্চয়বহ্নিনা।
প্রজ্বাল্যাজ্ঞানগহনং বীতশোকঃ সুখী ভব ॥৯॥

অন্বয় : একঃ বিশুদ্ধ-বোধঃ অহম্ ইতি নিশ্চয়-বহ্নিনা অজ্ঞান-গহনং প্রজ্বাল্য বীতশোকঃ সুখী ভব ॥ ৯ ॥

অনুবাদ : আমি স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরহিত এক অদ্বিতীয় স্বপ্রকাশ চিদাত্মা—এই প্রকার দৃঢ়নিশ্চয়রূপ অগ্নিসহায়ে গভীর অজ্ঞানারণ্য নিঃশেষে ভস্মীভূত করিয়া শোক-মোহ-রাগ-দ্বেষাদি রহিত হও ও পরমানন্দ লাভ কর ॥ ৯ ॥

আত্মজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞাননিবৃত্তি হইলেও, সত্যভূত এই প্রপঞ্চের তো আর জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি হয় না? সুতরাং সুখদুঃখপ্রদ এই সংসার বিদ্যমান থাকিতে পুরুষ কি করিয়া বীতশোক হইতে পারে? এই শংকার উত্তরে আচার্য বলিতেছেন যে, এই সংসার রজ্জুসর্পতুল্য মিথ্যা প্রতীতিমাত্র বলিয়া তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে উহা বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং দুঃখহেতু এই সংসার আর (পূর্বরূপে) না থাকাতে সাধকের বীতশোকত্বও সিদ্ধ হয়—

যত্র বিশ্বমিদং ভাতি কল্পিতং রজ্জুসর্পবৎ।
আনন্দপরমানন্দঃ স বোধস্ত্বং সুখং চর ॥১০॥

অন্বয় : যত্র ইদং বিশ্বং রজ্জু-সর্প-বৎ কল্পিতং ভাতি সঃ আনন্দপরমানন্দঃ বোধঃ ত্বং সুখং চর ॥ ১০ ॥

অনুবাদ : অধিষ্ঠানের অজ্ঞানবশতঃ রজ্জুসর্পের ন্যায় কল্পিত এই বিশ্ব যে বোধস্বরূপে প্রতিভাত হয়, সেই স্বতঃ নিত্য অনন্ত[১] আনন্দস্বরূপ চিদাত্মা তুমিই; ইহা জানিয়া সুখে[২] বিচরণ কর ॥ ১০ ॥

১ দুঃখহেতু প্রপঞ্চের বিলয় হইলে দুঃখাভাবমাত্র হইবে, সুখ কি করিয়া হইবে? এই শংকার উত্তরে বলিতেছেন, 'তুমি অনন্ত সুখস্বরূপ।' মনুষ্যদেবলোকাদির আনন্দ হইতে সর্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মানন্দ। উহাই পরমানন্দ। শ্রুতি বলিয়াছেন, 'এই ব্রহ্মানন্দেরই কণিকামাত্র জীবগণ উপভোগ করিয়া থাকে।'

২ স্বপ্নানুভূত অজ্ঞানকল্পিত ব্যাঘ্রাদি ভয় জাগ্রতে নিবৃত্ত হইলে পুরুষ যে প্রকার নির্ভয়ে বিচরণ করে, তদ্রূপ।

[ক্রমশঃ]

পুস্তক সমালোচনা

ভাবসমাহিত শ্রীরামকৃষ্ণ—রমেন্দ্রনাথ মল্লিক সম্পাদিত। প্রকাশক: সাহিত্যতীর্থ; ৬৭ পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পৃ: ১৯+৪৮০; মূল্য: ৩৫·০০।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে যদুলাল মল্লিকের বয়সের ব্যবধান ছিল নয় বছরের (যদুলালের জন্ম বৈশাখ ১২৫১) কিন্তু উভয়ের মধ্যে গভীর প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির বাগানের পাশেই ছিল যদুলালের বাগান, যেখানে দীর্ঘ কয়েক মাস ভাগবত পাঠের আসরে শ্রীরামকৃষ্ণ নিয়মিত উপস্থিত হতেন। এই সৌহার্দ্য থেকেই ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত পরিচয় যদুলালের কাছে উন্মোচিত হয়েছে—দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের 'ছোট ভট্‌চায'-কে তিনি স্থাপন করেছেন শ্রদ্ধার আসনে। শ্রীরামকৃষ্ণ যদুলালের পাথুরিয়াঘাটার বাড়িতে কয়েকবার এসেছেন এবং একবার এই মল্লিক বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত গৃহদেবী সিংহবাহিনীর মূর্তির সম্মুখে ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন।—প্রচলিত কাহিনীসূত্র থেকে জানা যায়, এই দেবীমূর্তি হর্ষবর্ধনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজ্যবর্ধনের গৃহ-বিগ্রহ, চন্দ্রনাথ পাহাড়ে অবস্থিত মন্দিরে মানসিংহের রাজবাড়ির পূজারী ব্রাহ্মণ কর্তৃক পূজিত হতেন। যদুলাল মল্লিকের পূর্বপুরুষ বৈদ্যনাথ স্বপ্নাদেশ লাভ করে সেই দেবীমূর্তিকে প্রতিষ্ঠা করেন নিজগৃহে। দেবীর সন্ধ্যারতির সময় শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবসমাহিত হন ২১ জুলাই ১৮৮৩। সেই ঘটনার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে যদুলালের পৌত্র, সুখ্যাত সাহিত্যিক রমেন্দ্রনাথ মল্লিকের সম্পাদনায় 'ভাবসমাহিত শ্রীরামকৃষ্ণে'র প্রকাশনা। সম্পাদকীয় ভূমিকায় সঙ্কলনের তিনটি বক্তব্য নির্দিষ্ট হয়েছে: (১) সিংহবাহিনীদেবী (২) শ্রীরামকৃষ্ণ ও (৩) যদুলাল মল্লিক। স্বাভাবিক কারণেই সঙ্কলিত রচনাগুলিতে দ্বিতীয় লক্ষ্যটিই অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে।

সঙ্কলনে প্রথমেই স্থান পেয়েছে 'কথামৃতে' উল্লেখিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-যদুলাল' সংলাপ ও প্রসঙ্গ। রামকৃষ্ণের সঙ্গে যদুলালের সম্পর্ক নির্ণয়ে এইটিই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও প্রামাণ্য দলিল। দ্বিতীয়াংশে রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে গঠিত বিভিন্ন সংঘের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীগণের রচনা—মূলত রামকৃষ্ণ-জীবন ও লীলার পরিচয় ও ব্যাখ্যা। এই অংশে বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণ সাধনার মূল্যায়ন এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘ, মহাউদ্ধারণ মঠ প্রভৃতি হিন্দু সংগঠনের বিচারে রামকৃষ্ণ-আদর্শের পরিচয় প্রকাশিত। তৃতীয়াংশে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল থেকে আরম্ভ করে অতি-আধুনিক কাল পর্যন্ত খ্যাত-অখ্যাত কবিদের 'কবিতাঞ্জলি'। পূর্ববর্তী দুটি অংশের পাশে এই অংশটির সঙ্কলন অপেক্ষাকৃত দুর্বল। কারণ অখ্যাত কবিদের অনেকের রচনাই এই ধরনের গ্রন্থের পক্ষে অপরিহার্য ছিল না। 'সাহিত্যিকী' অংশে বাংলার বিশিষ্ট প্রবন্ধকার, গবেষক ও কথাসাহিত্যিকের রামকৃষ্ণ প্রশস্তি ও বিচার এবং সবশেষে কিছু রামকৃষ্ণ সংগীত যার মধ্যে অনেকগুলিরই সঙ্কলনে অন্তর্ভুক্তির যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে।

এই রামকৃষ্ণ-বৈচিত্র্য অবশ্যই বিশিষ্টতার

দাবী করতে পারে। গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে রামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীর কাছে সমাদর লাভ করবে। যদুলাল মল্লিকের সঙ্গে রামকৃষ্ণের হৃদ্যতার উপর আলোকপাত করে রচিত দীর্ঘ ভূমিকাটি বিশেষ মূল্যবান। সমগ্র সঙ্কলনটিতে সম্পাদকের পরিশ্রম ও নিষ্ঠার পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে। দুয়েকটি অসঙ্গতির দিকে সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি :

(১) কৌতূহলী পাঠকের কথা স্মরণ রেখে পূর্বে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির প্রথম প্রকাশকাল ও আকরগ্রন্থের উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। (২) কোন কোন লেখকের পরিচয়ে অসম্পূর্ণতা ও ভুল চোখে পড়ে। স্বামী আদিনাথানন্দ সুদীর্ঘকাল জামশেদপুর আশ্রমের অধ্যক্ষ, বিদেশী কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কখনও ছিলেন কিনা জানি না। স্বামী দেবেন্দ্রানন্দের পরিচয়ে, নরেন্দ্রপুর বিদ্যালয়ের 'দায়িত্বশীল সন্ন্যাসিজনের অন্যতম' বলে উল্লেখ করা হয়েছে—"দায়িত্বশীল" এর বদলে "দায়িত্ববদ্ধ" বা "ভারপ্রাপ্ত" কথাটিই বোধ হয় সুপ্রযুক্ত হত। (৩) 'পরিচিত গবেষকে'র গান বা 'সুবিখ্যাত বক্তা'র কবিতা তাঁদের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেনি।

এইসব ছোটখাট ত্রুটি বাদ দিলে সঙ্কলনটি অবশ্যই মূল্যবান এবং সম্পাদক এই ধরনের একখানি গ্রন্থ পাঠককে উপহার দেওয়ার জন্য অকুণ্ঠ সাধুবাদ লাভ করবেন।

—অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
বাঙলা বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ

শিক্ষাবিদের স্মৃতিচারণ—অধ্যাপক শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রকাশক : শ্রীসুশান্তকুমার পাল, সম্পাদক, কলিকাতা সাহিত্যিকা, ২৬-এ নগেন্দ্রনাথ রোড, কলিকাতা-৭০০ ০২৮, পৃঃ ৪১+৯০, মূল্য : আট টাকা।

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্। শিক্ষার উন্নতিবিষয়ে তাঁর সজাগ মনের দ্বিতীয় প্রতিফলন এই পুস্তকটি। লেখকের দীর্ঘ শিক্ষকজীবনের বহু স্মরণীয় ঘটনায় গ্রন্থটির ছয়টি প্রবন্ধ সমৃদ্ধ। অধ্যাপকের পূর্ব-প্রকাশিত পুস্তক 'অনুধ্যান ও নানা চিন্তা'র এবং আলোচ্য পুস্তকের চিন্তাধারার সামঞ্জস্য হতে এটা স্পষ্ট হয় যে, শিক্ষা বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বহুদিনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ভূমিকা লিখেছেন ডঃ ভবতোষ দত্ত।

—ডক্টর জলধিকুমার সরকার
ভূতপূর্ব ডিরেক্টর, কলিকাতা "স্কুল অব্ ট্রপিক্যাল মেডিসিন"
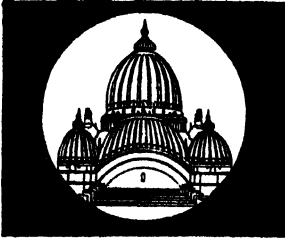
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচার সম্মেলন

ব্যাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে গত ৯ থেকে ১১ জানুআরি ১৯৮৫, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৯ তারিখে ইংরেজী এবং ১০ ও ১১ তারিখে কানাড়া ভাষায় অধিবেশন হয়। ইংরেজী ও কানাড়া অধিবেশনের উদ্বোধন করেন যথাক্রমে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচার সমীক্ষার পরিচালক সমিতির উপাধ্যক্ষ ডঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও এবং ব্যাঙ্গালোর জয়াচামরাজেন্দ্র কলেজের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক বিদ্বান রঙ্গনাথ শর্মা। এই সম্মেলনে কর্ণাটকের বেশ কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট পণ্ডিত ও অধ্যাপক যোগদান করেন।

*

মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ কলেজের পরিচালনায় গত ১৯ ও ২০ জানুআরি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান এবং এই উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল শ্রীএস. এল. খুরনা। দুদিনের অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক টি. এস. সদাশিবম্ এবং মাদুরাই মাদুরাই-কামরাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক জে. রামচন্দ্রন। এই সম্মেলনে প্রায় ৪০০ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত এবং কলেজের ছাত্রছাত্রী যোগদান করেন।

জাতীয় সংহতিতে ধর্মের ভূমিকা

গত ১৩ ফেব্রুআরি ১৯৮৫, রামকৃষ্ণ মিশন অব্ কালচার এবং কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মিলিত উদ্যোগে ইন্‌স্টিট্যুট অব্ কালচারের 'বিবেকানন্দ হলে' 'জাতীয় সংহতিতে ধর্মের ভূমিকা' বিষয় নিয়ে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন বিদগ্ধ ব্যক্তি। এই আলোচনাচক্র উদ্বোধন করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীউমাশঙ্কর দীক্ষিত।

নতুন শাখাকেন্দ্র

সম্প্রতি বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমকে 'রামকৃষ্ণ মঠ, বারাসত'-নামে মঠের একটি শাখাকেন্দ্ররূপে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। স্বামী পুরুষানন্দকে উক্ত কেন্দ্রের দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছে।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

শ্রীলঙ্কা শরণার্থীত্রাণ: মাদ্রাজ ত্যাগরাজনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম রামেশ্বরের নিকট মন্দাপম্ শিবির থেকে শ্রীলঙ্কা হতে আগত বিপুল সংখ্যক শরণার্থীকে প্রাথমিক সেবাদি করছেন। ১২,২১৯ জন শরণার্থীর জন্য রন্ধিত খাবার ছাড়াও তাদের মধ্যে ৫২৬ খানা শাড়ি, ৫৯১ খানা ধুতি, ৪,৪৩৫টি ফতুয়া, ২৪৫ সেট বাসনপত্র, ২,৫৫৪ খানা পুরানো বস্ত্রাদি বিতরণ করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে বন্যাত্রাণ : তমলুক ও গড়বেতা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের যুগ্ম-প্রচেষ্টায় মেদিনীপুর জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ময়না কলেজের দরিদ্র মেধাবী ৯১ জন স্নাতক ও উচ্চমাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৪০৮ খানি পাঠ্য-পুস্তক বিতরণ করা হয়। গত ৭ ফেব্রুআরি এখানকার ত্রাণকার্য সমাপ্ত হয়েছে।

বর্ধমান জেলায় কাটোয়া সদরের চর্কি গ্রামের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ৬০টি পরিবারের পুনর্বাসনকল্পে 'নিজের বাড়ি নিজে কর' পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

বিহারে বন্যাত্রাণ : কাটিহার জেলায় আজমনগর, পরাণপুর ও মণিহার এলাকায় বন্যাপীড়িত ৪,৩৮৫ জনের মধ্যে ১৩২ খানা শাড়ি, ২৯ খানা ধুতি, ২৬ খানা লুঙ্গি, ২৫০ খানা চাদর, ১৬৮ খানা কম্বল এবং ৪,৮৫২ খানা পুরানো কাপড় ও তুলার জামা বিতরণ করা হয়।

মেঘালয়ে পুনর্বাসন : পূর্ব খাসি পাহাড় জেলায় শেলা বাজারে অগ্নিতে মর্মান্তিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ১৭টি গৃহের পুনর্নির্মাণ এবং পুনর্বাসন-কল্পেও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে শিলং রামকৃষ্ণ আশ্রমের মাধ্যমে।

সার্বিক গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প

পুরী (উড়িষ্যা) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম নরেন্দ্রপুর (২৪ পরগনা) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সহযোগিতায় পুরী জেলার বেলেশ্বর-পাটনা, আলতুঙ্গা ও নালিহানা তিনটি গ্রামে সার্বিক গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করেছেন। বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র খোলা, চাষের জন্য নলকূপ, পাম্প, যন্ত্রপাতি এবং উন্নয়ন প্রথায় চাষ সম্বন্ধে শিক্ষা, ছোট ব্যবসা করার জন্য অর্থ সাহায্য ইত্যাদি এই গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। গত ২৭ ফেব্রুআরি থেকে এই প্রকল্পটি আরম্ভ হয়েছে। পুরীর অতিরিক্ত জেলা-শাসক শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র পট্টনায়ক, 'প্রজাতন্ত্র'-সম্পাদক মহতাব এবং স্বামী ভাগবতানন্দ প্রমুখ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন ঐ প্রকল্পারম্ভ অনুষ্ঠানে।

উৎসব

পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২১—২৭ ফেব্রুআরি রামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব পালিত হয়। ২৩ তারিখে বিদ্যার্থী দিবসে বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক প্রতিযোগিতার—আবৃত্তি, বক্তৃতা ও প্রবন্ধ রচনা—পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ, স্বামী নিখিলাত্মানন্দ, স্বামী সত্যরূপানন্দ, শ্রীহীরানন্দ

উদ্বোধন-সংবাদ

১০ মার্চ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'তে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা হয় এবং সন্ধ্যারতির পর স্বামী নির্জরানন্দ তাঁর জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা : সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী অজজানন্দ প্রত্যেক রবিবার ও বৃহস্পতিবার যথাক্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।
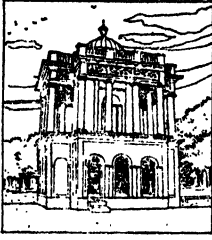
বিবিধ সংবাদ

উৎসব

রানীগঞ্জ স্বামী বিবেকানন্দ জন্মোৎসব কমিটি কর্তৃক গত ৩ ফেব্রুআরি, ১৯৮৫ যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের ১২৩তম জন্মজয়ন্তী পালিত হয় স্থানীয় বার্নস্ হল ও তৎসংলগ্ন প্রাঙ্গণে। এই উপলক্ষে প্রাতে স্বামীজীর সুসজ্জিত প্রতিকৃতি ও বাণীসহ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এবং বিশেষভাবে যুব-ছাত্রদের জন্য একটি সভানুষ্ঠান হয়। স্বামী মিত্রানন্দ, স্বামী রমানন্দ, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা এবং শ্রীতাপস বসু প্রভৃতি বিকালের জনসভায় ভাষণ দেন—বিষয় ছিল 'বর্তমান ভারত এবং স্বামী বিবেকানন্দের মত ও পথ'।

ভাঙড় (২৪ পরগনা) শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-সঙ্ঘে তাঁদের অষ্টম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস ও আন্তর্জাতিক যুববর্ষ উৎসব গত ৭ ফেব্রুআরি মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, ধর্মসভা প্রভৃতি হয়। ধর্মসভায় উপস্থিত ছিলেন স্বামী সর্বাত্মানন্দ, স্বামী ভাগবতানন্দ প্রমুখ।

গত ৯ ফেব্রুআরি, কলিকাতা **বিবেকানন্দ-সোসাইটিতে** স্বামী বিবেকানন্দের ১২৩তম জন্মজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। তাঁর ভাষণে তিনি স্বামীজীর আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রত্যেকের জীবনে গ্রহণ করার উপরই জোর দেন। ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ তাঁর ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভারতের নবজাগরণের পূর্বতন ধারা কি রূপ নিয়েছিল তা বিশ্লেষণ করেন। স্বামী অমরানন্দ স্বামীজীর জীবনালোকে 'ত্যাগ ও সেবার যুগোপযোগিতা আলোচনা করেন। সোসাইটির সভাপতি স্বামী নির্জরানন্দ সামাজিক অবক্ষয় রোধে স্বামীজীর শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শ দেশের প্রশাসনিক কাঠামোতে গ্রহণ করার কথা বলেন। সোসাইটির অন্যতম সহ-সভাপতি স্বামী অমলানন্দ সকলকে স্বামীজীর ন্যায় আর্তের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে বলেন। শ্রীশঙ্কর বসুমল্লিক স্বামীজীর 'সখার প্রতি' কবিতাটি আবৃত্তি করেন। শ্রীসুকান্ত ভট্টাচার্য সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সোসাইটির সম্পাদক ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাগত ভাষণ ও সহ-সম্পাদক ডঃ কমল নন্দী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শ্যামপুকুর স্ট্রীট (কলিকাতা) শ্যামপুকুর বাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ-সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২১ ফেব্রুআরি, শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।
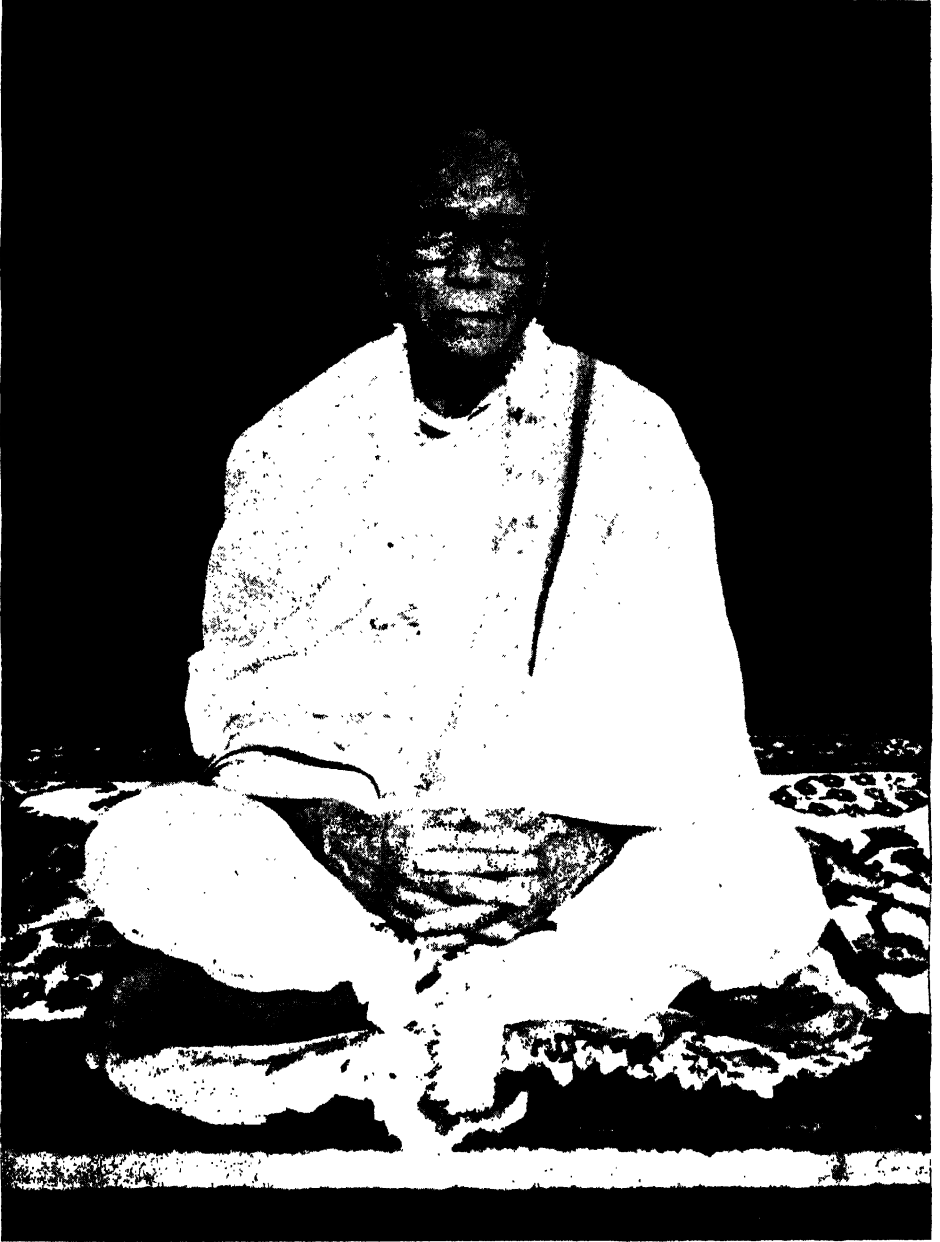
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ

৮৭তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩৯২

দিব্য বাণী

…তোমরা সর্বপ্রকার আরাম-স্বাচ্ছন্দ্য, নাম-যশ অথবা পদ—এমন কি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়া মানবদেহের শৃঙ্খল দ্বারা এমন একটি সেতু নির্মাণ কর, যাহার উপর দিয়া লক্ষ লক্ষ লোক এই জীবনসমুদ্র পার হইয়া যাইতে পারে।

যাবতীয় কল্যাণ-শক্তিকে মিলিত কর। তুমি কোন্ পতাকার নিম্নে থাকিয়া যাত্রা করিতেছ, সেদিকে লক্ষ্য করিও না। তোমার পতাকা নীল সবুজ বা লোহিত, তাহা গ্রাহ্য করিও না; সমুদয় রঙ্ মিশাইয়া প্রেমের শুভ্রবর্ণের তীব্র জ্যোতি প্রকাশ কর। আমাদের প্রয়োজন—কার্য করিয়া যাওয়া; ফল যাহা তাহা আপনি হইবে। যদি কোন সামাজিক নিয়ম তোমার ব্রহ্মলাভের প্রতিকূল হয়, আত্মার শক্তির সম্মুখে তাহা টিকিতে পারিবে না। ভবিষ্যৎ কি হইবে, তাহা দেখিতে পাইতেছি না, দেখিবার জন্য আমার আগ্রহও নাই। কিন্তু আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, আমাদের সেই প্রাচীনা জননী আবার জাগিয়া উঠিয়া পুনর্বার নবযৌবনশালিনী ও পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে মহিমান্বিতা হইয়া তাঁহার সিংহাসনে বসিয়াছেন। শান্তি ও আশীর্বাণীর সহিত তাঁহার নাম সমগ্র জগতে ঘোষণা কর।

কর্ম ও প্রেমে চিরকাল তোমাদেরই

বিবেকানন্দ

['স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা', পঞ্চম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪৬৬]

শ্রীশ্রীমায়ের অপ্রকাশিত পত্র

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীকে লিখিত

[মূল ইংরেজী থেকে ভাষান্তরিত]

জয়রামবাটী

আম্মুর, হুগলী

৪ঠা জুন, ১৯১৭

কল্যাণবরেষু,

বাবা জীবন প্রভু, তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমাকে আমার খুব মনে আছে, বাবা। তুমি সাধু হইয়াছ এবং আমার প্রিয় সন্তান রাখালের [স্বামী ব্রহ্মানন্দের] কাছে ব্রহ্মচর্য পাইয়াছ জানিয়া খুবই আনন্দিত হইয়াছি। তোমার এখন আমার কাছে আসিবার প্রয়োজন নাই। রাখালের আদেশ পালন করিয়া চল। আমি বিশ্বাস করি তাঁহার [শ্রীশ্রীঠাকুরের] কৃপায় তুমি এই-সমস্ত অসুবিধা কাটাইয়া উঠিবে। তাঁহার কাছে প্রার্থনা কর, তিনি তোমাকে কৃপা করিবেন। প্রত্যহ নিয়মিত ধ্যান করিবে। তাহা হইলে [অধ্যাত্ম-জীবনে] ক্রমশই আগাইয়া যাইবে। কখনও হতোদ্যম হইও না, বাবা। নূতন মঠের উদ্বোধন হইয়াছে জানিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। আশাকরি, কিছুদিনের মধ্যেই মঠের [অবশিষ্ট] কার্যাদি ভালভাবে সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে।

আমি ভাল আছি। তোমাকে স্নেহাশীর্বাদ করিতেছি। তোমার যখন ইচ্ছা হইবে আমাকে পত্র লিখিবে। বাংলা জান না বলিয়া দুঃখ করিও না।

তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে এবং মঠস্থ আমার সকল ছেলেদের আশীর্বাদ জানাইবে। ইতি

আশীর্বাদিকা

তোমাদের

মাতাঠাকুরানী

পুনশ্চ :—তুমি ইংরেজীতেই পত্র লিখিও—তবে লেখা যেন পরিষ্কার হয়।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ
শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের মহাপ্রয়াণের পরে গত ৯ এপ্রিল ১৯৮৫, শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের অধ্যক্ষরূপে বৃত হইয়াছেন।

স্বামী গম্ভীরানন্দজী ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অধুনা বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার সাধুহাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ—শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী তাঁহার মন্ত্র-গুরু এবং তিনিই তাঁহাকে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সন্ন্যাস প্রদান করেন।

সৌম্যচৈতন্য নামে তিনি ব্রহ্মচারি-জীবনেই দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের প্রধানরূপে নিযুক্ত হন ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে, এবং সাময়িক কিছু-কালের বিরতিসহ ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বিদ্যাপীঠের কর্মভার বহন করেন। ১৯২৯ হইতে ১৯৩১ পর্যন্ত তাঁহাকে উদ্বোধনে এবং বারাণসী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে নানাবিধ সারস্বত কর্মে ও স্বাধ্যায়াদিতে নিরত থাকিতে হইয়াছে। ইংরেজী 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব তিনি অতি কুশলতার সঙ্গে তিন বৎসর নির্বাহ করেন এবং ক্রমে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকেন প্রায় দশ বৎসর (১৯৫৩—১৯৬৩)। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রামকৃষ্ণ মঠের অন্যতম ট্রাস্টি এবং রামকৃষ্ণ মিশনের গভর্নিং বডির একজন সদস্য নির্বাচিত হন। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সচিবরূপেও তিনি দীর্ঘকাল সঙ্ঘ-সেবা করিয়াছেন—১৯৪৭-এর এপ্রিল হইতে ১৯৫৩ এবং পুনরায় ১৯৬৩ হইতে ১৯৬৬ পর্যন্ত। অতঃপর স্বামী গম্ভীরানন্দজী (১৯৬৬ খ্রীঃ) সঙ্ঘের প্রধান সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯৭৯-এর এপ্রিলে অন্যতম সহাধ্যক্ষের আসন অলঙ্কৃত করেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধিনায়করূপে অভিষিক্ত হইবার প্রাক্‌কাল অবধি তিনি ঐ সহাধ্যক্ষের পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি সর্বজনবিদিত। বিশেষতঃ তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও বৈদগ্ধ্য সমগ্র রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের এক পরম গৌরব। তাঁহার 'শ্রীমা সারদা দেবী', 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' (তিন খণ্ড), 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা' (দুই খণ্ড) বাংলা জীবনী-সাহিত্যের ইতিহাসে অসামান্য আকর-গ্রন্থ। 'উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী' (তিন খণ্ডে, দশখানি উপনিষদ্), 'স্তবকুসুমাঞ্জলি', 'সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহঃ' প্রভৃতি গ্রন্থরাজি বাংলা শাস্ত্রানুবাদ-সাহিত্যে তাঁহার অমর অবদান। ইংরেজীতে শাস্ত্রানুবাদেও তিনি অনন্যসাধারণ—শাঙ্করভাষ্যসহ নয়খানি উপনিষদ্ ছাড়াও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি ইংরেজী গ্রন্থগুলি বেদান্ত-সাহিত্য-জগতে চিরস্মরণীয় সংযোজন। তাঁহার বাংলা গ্রন্থ 'শ্রীমা সারদা দেবী' এবং 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-মালিকা'-র ইংরেজী সংস্করণ যথেষ্ট সমাদৃত। 'History of Ramakrishna Math & Ramakrishna Mission'—তাঁহার রচিত তথ্যসমৃদ্ধ একখানি প্রামাণিক সঙ্ঘ-ইতিহাস। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-পরিমণ্ডলের বিদগ্ধ পরিধিতে স্বামী গম্ভীরানন্দজী এক বহুমানিত ব্যক্তিত্ব,—সর্বশ্রেণীর নর-নারীর কাছে অশেষ ভক্তিভাজন একজন আদর্শ সন্ন্যাসী। তাঁহাকে মঠাধীশরূপে লাভ করিয়া সঙ্ঘের সকল অঙ্গই গৌরবান্বিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রতিনিধিরূপে তিনি সুদীর্ঘকাল আমাদিগের মধ্যে প্রেরণার উৎস হইয়া বিরাজিত থাকুন—এই প্রার্থনা।

প্রসঙ্গতঃ স্মর্তব্য, বিগত ১৩ মার্চ, ১৯৮৫ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের তিরোধানের পরে, বেলুড় মঠের প্রাচীনতম ট্রাস্টি শ্রীমৎ স্বামী অভয়ানন্দজী মহারাজ এই অন্তর্বর্তিকালে সঙ্ঘাধ্যক্ষের কার্য পরিচালনা করিয়াছেন।

কথাপ্রসঙ্গে

একত্বের অন্বেষণে

বীণার তারে কত বিচিত্র সুর ঝঙ্কৃত হয়! প্রতিটি সুরের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অবশ্যই আছে, সঙ্গীত-বিজ্ঞানীরা তাহা জানেন। কিন্তু শ্রোতার সাধ্য নাই, বীণায় ধ্বনিত এক-একটি সুরকে স্বতন্ত্রভাবে শুনিবার বা বিচার করিবার। বীণা-বাদন শুনিতে শুনিতে যদি বা কেহ ঐরূপ প্রয়াস করেন যে, তিনি বিশেষ বিশেষ সুরকে উহাদের স্ব স্ব মহিমাতেই মাত্র উপভোগ করিবেন—তাঁহার সে-প্রয়াস নিশ্চয়ই বৃথা হইবে। কারণ বীণা-বাদনকে যিনি সমগ্রভাবে সানন্দে অনুভবের ক্ষমতা রাখেন, একমাত্র তিনিই পারেন সকল সুর-বৈচিত্র্যের রসাস্বাদন করিতে,—ধ্বনিতরঙ্গমালাকে বিশ্লেষ করিয়া কোন বিশেষ সুরকে শ্রবণীয় করিতে পারে না কেহই। বৃহদারণ্যক শ্রুতির মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে চমৎকার একটি মন্ত্র আছে, যাহাতে পটভূমিকা কিঞ্চিৎ ভিন্ন হইলেও উপরোক্ত ভাবটিই অনুরণিত,—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য অত্যন্ত কবিত্বমণ্ডিত একটি উপমার অবতারণা করিয়াছেন সেখানে: 'যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায়, বীণায়ৈ তু গ্রহণেন বীণাবাদস্য বা শব্দো গৃহীতঃ।'

উপনিষদের বক্তব্য—আত্মাকে জানিলেই সমস্ত জানা হইয়া থাকে, কেননা তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র অপর কিছুই নাই—আত্মাতেই সকল কিছু অন্তর্নিবিষ্ট। বীণার দৃষ্টান্ত তুলিয়া শ্রুতির ঋষি তাই বুঝাইয়াছেন, ঝঙ্কৃত প্রতিটি সুরকে পৃথক-ভাবে গ্রহণ করিতে পারা যায় না, কিন্তু সমগ্র বীণাঝঙ্কারে বাস্তবিকই মুগ্ধ হইলে তদন্তর্গত সকল সুরকেই বরণ করা হয়। যথার্থ সুর-রসজ্ঞতা ইহাই। বিচ্ছিন্নভাবে অখণ্ড সত্যকে গ্রহণ করা চলে না—বিশেষ সুরের প্রতি আসক্তি সঙ্গীতের রসোপলব্ধিতে বরং বাধাই সৃষ্টি করিয়া থাকে।

ভারতের প্রাণবীণায় সমুত্থিত ঝঙ্কারকেও সামান্যতঃ উপলব্ধি করিতে পারিলে উহার বিশেষ বিশেষ সুরগুলিকেও স্বাভাবিকভাবেই বরণ করা হইবে—অন্যথায় বিশেষকে বুঝিবার চেষ্টা কোন-কালেই সার্থক হইবে না। ভারতের প্রাণবীণায় যে সঙ্গীতের মূর্ছনা নিরন্তর বাজিয়া চলিতেছে উহারই সঙ্গে পরিচয়-সাধন তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন—নচেৎ উহার বিশেষ সুরগুলি সম্পর্কেও আমাদের আদৌ কোন ধারণা জন্মিবে না। ভারতের প্রাণবীণায় উদ্গীত যে অনাহত নাদ—অক্ষোভিত ঝঙ্কার, উহারই নাম 'তত্ত্বমসি'। সেই একটি ঝঙ্কারের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে অনন্ত বিচিত্র সুর-মল্লার—রাগ-রাগিণীর বিবিধ ব্যঞ্জনা। যুগে যুগে মহাপুরুষ বা আচার্যগণ আসিয়া ঐ সুরসমষ্টি—'তত্ত্বমসি'-ঝঙ্কারকেই কালোপযোগী মূর্ছনায় বিস্তার করিয়া থাকেন দুর্বার আকর্ষণে মানুষ নড়িয়া চড়িয়া জাগিয়া উঠে—ধাবিত হয় সেই মূল ধ্বনি—সুরসামান্য 'তত্ত্বমসি'-র প্রতি। ভারতের আত্মা সেখানেই।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার বিখ্যাত মাদ্রাজ বক্তৃতায় 'ভারতীয় মহাপুরুষগণ' সম্বন্ধে বলিতে গিয়া উক্তি করিয়াছিলেন: 'তোমরা কখনই সকল জ্ঞানের চরম লক্ষ্য পূর্ণ একত্বের বেশি অগ্রসর

হইতে পারে না। বেদ অনেকদিন পূর্বেই এই পূর্ণ একত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহার চেয়ে বেশি অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। যখনই "তত্ত্বমসি" আবিষ্কৃত হইল তখনই আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পূর্ণ হইল, এই "তত্ত্বমসি" বেদে রহিয়াছে।···বাকী রহিল কেবল বিভিন্ন দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে সময়ে সময়ে লোকশিক্ষা। এই প্রাচীন সনাতন পথে জনগণকে পরিচালনা করা—ইহাই বাকী রহিল; সেইজন্য সময়ে সময়ে বিভিন্ন মহাপুরুষ ও আচার্যগণের অভ্যুদয় হইয়া থাকে।'

যুগে যুগে পৃথিবীতে—বিশেষ করিয়া এই পুণ্যভূমি ভারতে অবতারপুরুষগণের আগমন হইয়াছে। এই আগমন নিরর্থক নহে,—স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন ইতিহাসও নহে। বীণার ঝঙ্কার-তরঙ্গে ভাসিয়া আসা সুরের মতোই এই আবির্ভাবগুলিও একটি মূল শাশ্বত আধ্যাত্মিক সত্যের অঙ্গীভূত,—সেখানেই সকল সুর সম্মিলিত।

একখানি সাহিত্যে কিংবা কাব্যে কত বিচিত্র কথার সমাবেশ থাকে। কথাগুলি অর্থ-হীন নহে,—কিন্তু শুধুমাত্র পদের অর্থ বহনই উহাদের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। যদি মাত্র শব্দার্থই মুখ্য হইত, তাহা হইলে সাহিত্য-রস নিশ্চয়ই শুষ্ক হইয়া পড়িত, কাব্য হইয়া উঠিত নীরস। প্রতিটি পদের বা কথার সার্থকতা তখনই, যখন সকল খণ্ডতাকে ছাপাইয়া তাহাতে সঞ্চারিত হয় সমগ্র সাহিত্যের সুধা, পরিপূর্ণ কাব্যের সৌন্দর্য। মানবসমাজে আবির্ভূত এক-এক মহাজীবনও যেন ঐরূপ এক-একটি বাক্য বা পদ, যাহা মানুষের সুবিশাল অধ্যাত্ম জীবন-কাব্যেরই বিভিন্ন অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—স্বতন্ত্র হইয়াও সমগ্রের ভাবে ও রসে ভরপুর।

দ্রষ্টা ঋষি-মুনি ও আচার্যগণের আবির্ভাব ভারতে কিছু বিরল ঘটনা নহে। উপনিষদ্-পুরাণাদিতে তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে। পরবর্তী যুগেও শ্রীরামচন্দ্র-শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকে উপজীব্য করিয়া চিরন্তন মহাকাব্যের রচনা হইয়াছে। উত্তর-কালে ইতিহাসের যুগেও আমাদের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হইয়াছে শ্রীবুদ্ধ-শঙ্কর-রামানুজ-চৈতন্যের। সাম্প্রতিক আবির্ভাবটিও উজ্জ্বলতায় ও গরিমায় অবিস্মরণীয়—বর্তমান শতকে সুরধুনীর উভয় তটেই উহার সাক্ষ্য পরিদৃশ্যমান। লোকশিক্ষার প্রয়োজনে দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে এইরূপই ধারা চলিয়াছে যুগ যুগ ধরিয়া। কিন্তু লক্ষণীয় যে, সকল মহাপুরুষই তাঁহাদের জীবন ও কর্ম-দ্বারা সেই চিরন্তন এক সত্যকেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদের সম্মিলিত কণ্ঠের বাণীই ভারতের স্বকীয় জীবন-কাব্য—জাতির প্রাণ-সাহিত্য।

শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ পূর্বগ ধর্মপ্রবর্তকগণের ক্রমিক পর্যায়ে এই ভারত-ভূমিতে আবির্ভূত হইয়াছেন তথাগত বুদ্ধ, আচার্য শঙ্কর, মহানুভব রামানুজ, মহাপ্রভু চৈতন্য, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি দেব-মানব। মহর্ষি বাল্মীকি ও শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস যথাক্রমে রামচরিতকথা এবং কৃষ্ণলীলাগাথা হৃদয় উজাড় করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। স্বয়ং স্বামীজী 'মহাকবি যে ভাষায় রামচরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা শুদ্ধতর, মধুরতর, অথচ সরলতর ভাষা আর হইতে পারে না।' শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গেও তিনি আবেগ-উদ্দীপ্ত কণ্ঠে মন্তব্য করিয়াছেন: 'যিনি নানাভাবে পূজিত হইয়া থাকেন, যিনি আবালবৃদ্ধবণিতা ভারতবাসী সকলেরই পরম প্রিয় ইষ্টদেবতা; আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই এ-কথা বলিতেছি,—ভাগবতকার যাঁহাকে অবতার বলিয়াই তৃপ্ত হন নাই, বলিয়াছেন, "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"।'

মাদ্রাজে প্রদত্ত 'ভারতীয় মহাপুরুষগণ'

অভিভাষণে স্বামীজী যাহা বলিয়াছেন, আমরা মাত্র তাহারই প্রতিধ্বনিকে অনুসরণ করিতে প্রয়াসী এখানে। ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবকে বুঝাইতে গিয়া যুগাচার্য বিবেকানন্দ—যে আশ্চর্য পশ্চাৎপটখানি আমাদের দৃষ্টিপথে মেলিয়া ধরিয়াছেন, আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক উভয় ভাবমূল্যেই উহা অতুলনীয় অনুপম। জানি না পৃথিবীর অপর কোন বুদ্ধ-জীবনীকার এইভাবে বুদ্ধকে দেখিতে ও দেখাইতে পারিয়াছেন কিনা। বুদ্ধকে এক স্বতন্ত্র বুদ্ধরূপেই সকলে দেখিয়াছেন —কিন্তু রাম ও কৃষ্ণের অভিন্ন বিগ্রহ ঈশ্বরাবতারকে, অদ্বিতীয় বিবাদভঞ্জনকে কি আর কেহ অবলোকন করিয়াছেন? ভারতের চিরন্তন অধ্যাত্মভাবতরঙ্গের 'সর্বোচ্চ চূড়ায় আমরা আর এক মহামহিমময় মূর্তি দেখিতে পাই। তিনি আর কেহ নহেন—আমাদেরই গৌতম শাক্য মুনি'। স্বামীজীর সেই অবলোকনের ইহাই ভাষা-রূপ। তিনি বুদ্ধকে দর্শন করিয়াছিলেন দ্বিতীয় রামের রূপে,—গীতা-উপদেষ্টা কৃষ্ণেরই অপর মূর্তিতে। তিনি বলিয়াছেন: 'গীতার বাক্যসমূহ —শ্রীকৃষ্ণের ব্রজগম্ভীর মহতী বাণী সকলের বন্ধন, সকলের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া দেয়, সকলেরই সেই পরম পদলাভের অধিকার ঘোষণা করে।

'ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

—যাঁহাদের মন সাম্যে অবস্থিত, তাঁহারা এখানেই সংসার জয় করিয়াছেন। ব্রহ্ম সমভাবাপন্ন ও নির্দোষ, সুতরাং তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থিত।

'সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥

—পরমেশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া তিনি নিজে আর নিজেকে হিংসা করেন না, আত্মহিংসাশূন্য হইয়া পরমগতি লাভ করেন।

'গীতার এই উপদেশের জীবন্ত উদাহরণ-স্বরূপে—উহার একবিন্দুও যাহাতে কার্যে পরিণত হয় এইজন্য সেই গীতা-উপদেষ্টাই অন্যরূপে আবার মর্ত্যধামে আসিলেন। ইনিই শাক্যমুনি। ইনি দুঃখী দরিদ্রদের উপদেশ দিতে লাগিলেন, সর্বসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারেন, সেজন্য ইনি দেব-ভাষা পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ লোকের ভাষায় উপদেশ দিতে লাগিলেন, রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া ইনি দুঃখী দরিদ্র পতিত ভিক্ষুকদের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন, দ্বিতীয় রামের মতো ইনি চণ্ডালকে বক্ষে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন।'

ভারতের প্রাণবীণার ঝঙ্কার সেদিন অতি উচ্চগ্রামে চড়িয়াছিল ঠিকই। কিন্তু সুরের আরোহ এবং অবরোহ সঙ্গীতের স্বাভাবিক ধর্ম। বুদ্ধের অভ্যুদয়ের পরেও তাই নৈসর্গিক নিয়মেই ঐ ভাবস্রোতের নিদারুণ নিম্নগতি সূচিত হইয়াছিল কয়েক শতাব্দী যাইতে না যাইতেই। সেই অবনত বৌদ্ধধর্ম আর এক নবীন আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল, যাহার উল্লেখ করিতে গিয়া স্বামীজী বলিয়াছেন: 'কিন্তু ভারতের জীবনীশক্তি তখনও নষ্ট হয় নাই, তাই আবার ভগবানের আবির্ভাব হইল।...এবার তাঁহার আবির্ভাব হইল দাক্ষিণাত্যে। সেই ব্রাহ্মণযুবক, যাঁহার সম্বন্ধে কথিত আছে যে, ষোড়শ বর্ষে তিনি তাঁহার সকল গ্রন্থ রচনা শেষ করিয়াছিলেন, সেই অদ্ভুত প্রতিভাশালী শঙ্করাচার্যের অভ্যুদয় হইল। এই ষোড়শ বর্ষীয় বালকের রচনা আধুনিক সভ্য জগতে এক বিস্ময়! আর তিনিও ছিলেন বিস্ময়জনক! তিনি চাহিয়াছিলেন সমগ্র ভারতকে তাহার প্রাচীন পবিত্রভাবে লইয়া যাইতে।...মহান্ দার্শনিক শঙ্কর আসিয়া দেখাইলেন, বৌদ্ধধর্ম ও বেদান্তের সারাংশে বিশেষ প্রভেদ নাই।'

শঙ্করোত্তর কালে ভারতের হৃদয়তন্ত্রীতে বাজিয়া য়াছিল যে-ধ্বনি,—উহার বিস্তার ছিল কোমল রাগে, কিন্তু দ্যোতনা সেই একই। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়: 'মহানুভব রামানুজের অভ্যুদয় হইল।···পতিতের দুঃখে তাঁহার হৃদয় কাঁদিল, তিনি তাহাদের দুঃখ মর্মে মর্মে অনুভব করিতে লাগিলেন।···তিনি ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্যন্ত সকলের নিকট উচ্চতম আধ্যাত্মিক উপাসনার পথ উন্মুক্ত রাখিলেন।'

কালচক্রের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ব্যক্তি-চেতনা ও সমাজ-বোধ যত বিকশিত হইতে থাকে—তাহার ধর্মাচরণ-পন্থারও গতি-প্রকৃতি বহুলাংশে সহজ ও ব্যাপকতর করার প্রয়োজন দেখা দেয়। বাস্তবিকপক্ষে আচার্য রামানুজের আবির্ভাব ভারতীয় আধ্যাত্মিক ইতিহাসের ধারায় একটি বিশেষ পরিবর্তন-স্রোত প্রবাহিত করে। ভগবান শঙ্কর তথা তাঁহার পূর্ববর্তী আচার্যগণেরও যাহা ছিল মূলমন্ত্রস্বরূপ—রামানুজ হইতে তাহাই হইয়া দাঁড়াইল অবশ্য-অনুষ্ঠেয় সাধন। সর্বসাধারণের জন্য ধর্মের দ্বার উন্মুক্ত হইল তখনই। নগরের রাজপথে, পল্লীর মাঠে-ঘাটে, আপামর জনসাধারণের মুখে মুখে ধ্বনিত হইতে থাকিল নব-সঙ্গীত, যাহা এতকাল মাত্র মন্ত্ররূপেই একান্তে উচ্চারিত হইয়া আসিতেছিল। ভারতাকাশে চৈতন্যচন্দ্রের উদয় হইল!

উল্লিখিত 'ভারতীয় মহাপুরুষগণ' পর্যায়ের অভিভাষণে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন: 'পৃথিবীতে যত বড় বড় ভক্তির আচার্য হইয়াছেন, প্রেমোন্মত্ত শ্রীচৈতন্য তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার ভক্তির তরঙ্গ···সকলের প্রাণে শান্তি দিল। তাঁহার প্রেমের সীমা ছিল না। পুণ্যবান্-পাপী, হিন্দু-মুসলমান, পবিত্র-অপবিত্র, বেশ্যা-পতিত—সকলেই তাঁহার ভালবাসায় ভাগ পাইত, সকলকেই তিনি কৃপা করিতেন,—তাঁহার সম্প্রদায় দরিদ্র দুর্বল জাতিচ্যুত পতিত—সমাজে পরিত্যক্ত সকল ব্যক্তিরই আশ্রয়স্থল।'

প্রবাহের শেষ এখানেই নহে। প্রয়োজন হইয়াছিল আরও ভাস্বর একটি প্রকাশের—নবতম আবির্ভাবের। স্বামীজী তাঁহার বক্তব্যের উপসংহারে বলিয়াছেন:

'এখন এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাবের সময় হইয়াছিল,···যিনি একাধারে শঙ্করের উজ্জ্বল মেধা ও চৈতন্যের বিশাল অনন্ত হৃদয়ের অধিকারী হইবেন, যিনি দেখিবেন সকল সম্প্রদায় এক মহৎ ভাবে, ঈশ্বরের শক্তিতে অনুপ্রাণিত, দেখিবেন প্রত্যেক প্রাণীতে সেই ঈশ্বর বিদ্যমান, যাঁহার হৃদয় ভারতে বা ভারতের বাহিরে দরিদ্র দুর্বল পতিত—সকলের জন্য কাঁদিবে, অথচ যাঁহার বিশাল বুদ্ধি এমন মহৎ তত্ত্বসকল উদ্ভাবন করিবে, যেগুলি ভারতে বা ভারতের বাহিরে বিরোধী সম্প্রদায়-সমূহের সমন্বয়-সাধন করিবে···।

'আমাকে ভারতীয় সকল মহাপুরুষের পূর্ণ-প্রকাশস্বরূপ যুগাচার্য মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের নাম উল্লেখ করিয়াই আজ ক্ষান্ত হইতে হইবে—এই মহাপুরুষের উপদেশ আধুনিক যুগে আমাদের নিকট বিশেষ কল্যাণপ্রদ।'

স্বামীজী তাঁহার অসাধারণ দিয়া ভারতীয় মহাপুরুষগণের জীবনাদর্শকে স্বয়ং দেখিয়াছেন—আমাদিগকেও দেখাইতে চাহিয়াছেন। যুগপ্রবর্তক শ্রেষ্ঠ আচার্য কয়েকজনের মাত্র নামোল্লেখসহ তিনি আলোচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি প্রারম্ভে ইহাও স্পষ্ট জানাইয়া রাখিয়াছেন যে, সহস্র সহস্র বর্ষ যাবৎ অসংখ্য মহাপুরুষের আবির্ভাবে এই ভারতভূমি ধন্য। মাদ্রাজেই অপর এক বক্তৃতায় তাঁহার আবেগ-জড়িত কণ্ঠে রামানুজ, শঙ্কর, নানক, চৈতন্য, কবীর, দাদু প্রমুখের নাম উচ্চারণপূর্বক জন-মণ্ডলীর উদ্দেশে বলিতে শুনা গিয়াছিল: 'এই

যে বড় বড় ধর্মাচার্যগণ ভারতগগনে অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো একে একে উদিত হইয়া আবার অস্ত গিয়াছেন, ইঁহারা কি ছিলেন?...তাঁহারা আধুনিক সংস্কারকগণের মতো চীৎকার ও বাহ্যাড়ম্বর করিতেন না। আধুনিক সংস্কারকগণের মতো তাঁহাদের মুখ হইতে কখন অভিশাপ উচ্চারিত হইত না, তাঁহাদের মুখ হইতে কেবল আশীর্বাদ বর্ষিত হইত। তাঁহারা কখনও সমাজের উপর দোষারোপ করেন নাই।'

ধর্ম ও ধর্মাচার্যগণকে ঘিরিয়া ইদানীং কত-না দল, গোষ্ঠী, মত, সম্প্রদায় ও বিচ্ছিন্নতা মাথা চাড়াইয়া উঠিতেছে! ভাবিতে বিস্ময় লাগে, যাঁহাদের নাম লইয়া এত কলরব, তাঁহারা কি ছিলেন—আর তাঁহাদের নামকে কিরূপে ব্যবহৃত হইতেছে! ভারতের মহান্ আচার্যগণের জীবন স্ব স্ব মহিমায় উজ্জ্বল—তাঁহাদের বাণী অপূর্ব ব্যঞ্জনাময়, কিন্তু তাঁহারা কি সকলে একই সত্যের প্রকাশক নহেন? একই সঙ্গীতের অনুরণন কি তাঁহাদের জীবনের তারগুলিতে বাজিয়া উঠে নাই?

বর্তমান বর্ষ 'যুব বর্ষ' বলিয়া ঘোষিত—স্বামীজীরই আবির্ভাব-দিবস হইতে যাহার সূচনা হইয়াছে। বিচ্ছিন্নতার বিষবাষ্পে ভারতের বাতাস যখন দূষিত হইতেছে—ঠিক তখন বিবেকানন্দ নামাঙ্কিত বর্ষের পবিত্রতার কথাও আমাদের মনে একটিবারও কি জাগিবে না? সমাজের সর্বস্তরে —তাঁহার দিব্য দৃষ্টিপাত আমাদেরও নয়নের ঘোরকে কাটাইয়া নূতন দৃষ্টিশক্তি প্রদান করিবে না কি? স্মরণ হইতেছে, পাঞ্জাবের মাটিতে পদার্পণ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া উঠিয়াছিলেন: 'এই সেই ভূমি—যাহা পবিত্র আর্যাবর্তের মধ্যে পবিত্রতম বলিয়া পরিগণিত; এই সেই ব্রহ্মাবর্ত—যাহার বিষয় আমাদের মহু মহারাজ উল্লেখ করিয়াছেন। এই সেই ভূমি—যেখান হইতে আত্মতত্ত্বজ্ঞানের সেই প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও অনুরাগ প্রসূত হইয়াছে, যাহা ভবিষ্যতে সমগ্র জগৎকে তাহার প্রবল বন্যায় ভাসাইয়াছে,—ইতিহাস এ বিষয়ের সাক্ষী।... এখানেই অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে দয়াল নানক তাঁহার অপূর্ব বিশ্বপ্রেম প্রচার করেন। এখানেই সেই মহাত্মা তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া এবং বাহু প্রসারিত করিয়া সমগ্র জগৎকে—শুধু হিন্দুকে নয়, মুসলমানগণকে পর্যন্ত আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছিলেন।...দেশের পূর্বাঞ্চল হইতে আমি পশ্চিমাঞ্চলের ভ্রাতৃগণের সহিত সম্ভাষণ বিনিময় করিতে এবং পরস্পরের ভাব মিলাইবার জন্য আসিয়াছি। আমি এখানে আসিয়াছি আমাদের মধ্যে কি বিভিন্নতা আছে তাহা বাহির করিবার জন্য নহে, আসিয়াছি আমাদের মিলনভূমি কোথায় তাহাই অন্বেষণ করিতে; কোন্ ভিত্তি অবলম্বন করিয়া আমরা চিরকাল সৌভ্রাত্রসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে পারি, কোন্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে যে-বাণী অনন্তকাল ধরিয়া আমাদিগকে আশার কথা শুনাইয়া আসিতেছে, তাহা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে পারে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে আমি এখানে আসিয়াছি।'

স্বামীজীর আগমন ও আহ্বান কি ব্যর্থ হইবে? সকল বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার ঊর্ধ্বে মুখ তুলিয়া তাকাইলে—আমরাও কি শুনিতে পাইব না সেই অনন্তকালের আশার বাণী? দৃষ্টি পড়িবে না কি সেই সকল মহাপুরুষদের চরণ-চিহ্নের প্রতি যাঁহাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হইত সেই নিত্যকালের অনাহত 'তত্ত্বমসি'?

মহাযানবৌদ্ধ চিন্তায় শক্তি-সাধনা

ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর

নেতাজী ইন্‌স্টিট্যুট ফর্‌ এশিয়ান স্টাডিজ-এর ফেলো।

গৌতম বুদ্ধ—বেদান্তেরই মূর্তরূপ

মানুষ নিজ কর্মফলেই বদ্ধ,—আবার নিজ কর্মদ্বারাই তাকে তার 'স্ব-ভাবে' ফিরে যেতে হবে। মানুষ স্বভাবতই শুদ্ধ-মুক্ত-বুদ্ধ। শুদ্ধত্ব-বুদ্ধত্বই মানুষের স্ব-ভাব। কর্মের আসব বা মালিন্যই তাকে তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে দেয় না। সে নিজেকে ক্ষুদ্র, হীন, বদ্ধ,—সুখ-দুঃখের অধীন মনে করে দুঃখ পায়। আর এই দুঃখ শুধু এক জন্মেই শেষ হয় না। প্রজ্ঞা লাভ না হওয়া পর্যন্ত জন্ম-জন্মান্তর এই দুঃখ মানুষের সঙ্গী হয়। নির্বাণে,—অর্থাৎ কর্মফলের অবসানে এই দুঃখেরও অবসান। তৃষ্ণার অবসান-ই শান্তি, মোক্ষ, নির্বাণ বা চিত্তবিমুক্তি। শ্রীবুদ্ধ তাঁর জীবনে যে সাধনা করে দেখালেন এবং তাঁর ধর্মচক্র প্রবর্তনে যে প্রতীত্যসমুৎপাদের কথা বললেন—তা উপনিষদের বাণী বলেই মনে হয়। মানুষের চিরন্তন সত্তার বিশুদ্ধির ঘোষণা,—তৃষ্ণা বা কামনাজনিত মালিন্যে দুঃখানুভব এবং কামনারাহিত্যে পুনরায় স্বরূপে প্রতিষ্ঠার কথা—উপনিষদ্‌ এবং শ্রীবুদ্ধ একই ভাষায় বলে গেছেন। তাই মূল বৌদ্ধধর্মের নির্বাণ সিদ্ধির মধ্যে আমরা উপনিষদেরই প্রতিধ্বনি শুনি। শ্রীবুদ্ধের একটি বিশেষ ঘোষণা,—"মানুষ নিজেই নিজের বন্ধনের এবং মুক্তির কারণ। নিজের দুঃখাবসান বা মুক্তির জন্য ভগবান বা দেবদেবীর উপর নির্ভর নিষ্প্রয়োজন।"

আত্মনির্ভরতার রূপান্তর বুদ্ধ-নির্ভরতায়—বুদ্ধে দেবত্ব আরোপ

উপনিষদ্‌ বা শ্রীবুদ্ধ আত্মনির্ভর হয়ে, নিজের উত্তম এবং তপস্যা দ্বারা চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে নির্বাণ বা মোক্ষলাভের উপদেশ দিলেও মানুষ স্বাভাবিক দুর্বলতার জন্যই মোক্ষ-সাধনায় নিজের শক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হতে পারল না। কালক্রমে শ্রীবুদ্ধের অনুগামী নির্বাণ-সাধক নির্বাণ সিদ্ধির জন্য "বুদ্ধেরই শরণ" নিল। সাধারণ মানুষের শক্তির পরিমাপ জেনেই হয়তো শ্রীবুদ্ধ তাঁর জীবদ্দশায়ই—তাঁর অনুগামীদের—বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিরত্নের 'শরণ' নিতে উপদেশ দিয়েছিলেন। "আত্মদীপ", "আত্মশরণ", "অনন্যশরণ" হয়ে চলার নির্দেশ তাঁর শেষ উপদেশের অন্যতম হলেও সাধারণ অধিকারীর জন্য বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ অপরিহার্য ছিল।

বুদ্ধের জীবদ্দশায় এবং তাঁর দেহাবসানের কিছুদিন পরেই শ্রীবুদ্ধকে বা তাঁর কোন দেহ-ধাতুকে পূজা করে চিত্তশুদ্ধি বা নির্বাণ-সাধনার পথে অগ্রসর হবার প্রচেষ্টা প্রকটভাবেই দেখা দেয়। শ্রীবুদ্ধের নরদেহের প্রতীক কেশ, দন্ত, অস্থি, পদচিহ্ন প্রভৃতিকে স্তূপে বা সঙ্ঘারামের মন্দির বিশেষে প্রতিষ্ঠা করে তার নিত্য পূজা ও পরিক্রমাদি নির্বাণ-সাধনার অঙ্গ বলে বিবেচিত হত। ভিক্ষু এবং বিশেষতঃ গৃহী উপাসকের নির্বাণ-সাধনায় শ্রীবুদ্ধ অন্যতম দেবতার আসনই পেলেন।

মহাযানের ধ্যানী পঞ্চবুদ্ধ—শক্তিদেবতার উৎস

গৌতম বুদ্ধ "বুদ্ধ"কেই শরণ নিতে বলেছিলেন। এই শরণ্য বুদ্ধ যে স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ তা তিনি স্পষ্ট করে বলেননি। তবে তিনি কোন কোন সূত্র প্রবচনে "তথাগত" বা "বুদ্ধ" বলে নিজেরই বা "তাদৃশ" কোন প্রজ্ঞা-সম্পন্ন সম্যক্

সম্বন্ধের কথা বা দৃষ্টান্তই দেখাতে চেয়েছেন। শাক্যমুনিও উল্লেখ করেছেন—তাঁর পূর্বেও বহু বুদ্ধ ছিলেন। এবং তাঁর পরে আর কোন বুদ্ধ হবেন না—এরূপ কথা তিনি কখনও বলেননি। ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার ইতিহাসে "শেষ" বলে কোন কথা নেই। বরং বিপরীত কথাই আছে—"সম্ভবামি যুগে যুগে"

মহাযানী বৌদ্ধ উপাসকগণ নিজের রুচি ও কল্পনা অনুসারে পরবর্তী কালে—বহু বুদ্ধের এবং বুদ্ধ স্বভাব বোধিসত্ত্বের কল্পনা করে সাধনা করেছেন। গৌতম শাক্যমুনি বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্মে বহু বুদ্ধের আবির্ভাব এক ঐতিহাসিক বিস্ময়। বর্তমানে গৌতম বুদ্ধ রূপান্তরিত হয়েই বেঁচে আছেন, বহু বুদ্ধের মধ্যে।

শ্রীবুদ্ধের বহু বুদ্ধে রূপান্তরের একটি বিশিষ্ট ধাপ হল ধ্যানী পঞ্চবুদ্ধের কল্পনা। গুহ্য-সমাজতন্ত্রে এই ধ্যানী পঞ্চবুদ্ধের কল্পনা দৃষ্ট হয়। নির্বাণ বা শূন্যতার অনুভবই বিশ্বসত্তার চরম উপলব্ধি। শূন্য থেকেই মহাবিশ্বের আবির্ভাব। এই বিশ্বের উৎপত্তির মূল উপাদান কি ? শ্রীবুদ্ধের মতে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান—এই পাঁচটি উপাদানেই বিশ্বের উৎপত্তি। এই পঞ্চস্কন্ধই গুহ্যসমাজে পাঁচজন ধ্যানী বুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছেন পাঁচটি উপাদানই বিশ্বের মূল।

পঞ্চবুদ্ধে পঞ্চস্কন্ধের আরোপ

মহাবিশ্বের উপাদান—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান যেমন চিরন্তন এবং অবিনাশী সেইরূপ পঞ্চধ্যানী বুদ্ধও চিরস্থায়ী। এই পঞ্চ-স্কন্ধের প্রতিরূপ হলেন যথাক্রমে বৈরোচন, রত্ন-সম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি এবং অক্ষোভ্য। গুহ্যসমাজের মতে এই পঞ্চবুদ্ধ নিত্যসিদ্ধ এবং ধ্যানমগ্ন। তাঁদের অন্যান্য বুদ্ধের মতো সাধনা করে পূর্ণত্বলাভ করতে হয় না। তাঁরা নিত্যই নির্বাণে নিযুক্ত এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বকল্যাণে ধ্যানস্থ। পঞ্চস্কন্ধ যেন অবিনাশী—এঁরাও সেইরূপ চিরন্তন। পঞ্চধ্যানী বুদ্ধই এই বিশ্বকে ধারণ করে আছেন। এই পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ এক আদি ও অবিনশ্বর সত্তারই প্রকাশ। শূন্য বা বজ্রই এই অবিনশ্বর সত্তা। এঁরাই জীবের কায়, বাক্ এবং চিত্তের প্রতিভূ। যখনই আমরা জগৎ-প্রপঞ্চের কথা চিন্তা করি তখনই এই পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের রূপক কল্পনা করতে হবে। ধ্যানাবস্থা—একটা অচঞ্চলভাব। বিশ্বের পঞ্চস্কন্ধের পরিবর্তনের,—রূপান্তরের পশ্চাতেও একটা অবিচলিত ভাব আছে। পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ তারই প্রতীক।

পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের পঞ্চনারীশক্তি কল্পনা

গুহ্যসমাজতন্ত্রে পঞ্চবুদ্ধের প্রত্যেকের সঙ্গে এক-একজন নারীশক্তির কল্পনা করা হয়েছে। বৌদ্ধ-সাধনায় এই শক্তির কল্পনা বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়। গুহ্যসমাজতন্ত্র বৌদ্ধমঠে এবং বিহারে কোন কোন ভিক্ষুকর্তৃক পঠিত এবং আচরিত হলেও তা সকলের অনুমোদিত ছিল না। বুদ্ধের শক্তি হিসাবে বিশেষ নারীদেবতার সংযোগ সকলের মনঃপূত ছিল না। স্বয়ং বুদ্ধকে নারী-দেবতার সহচর হিসাবে কল্পনা করার কোন প্রতীকী মূল্য এবং প্রয়োজন থাকলেও সাধারণ মানুষের কাছে এটা দুর্বোধ্য এবং দুর্জ্ঞেয়। অবশ্য তান্ত্রিক সাধক বলবেন, তন্ত্রের তত্ত্ব এবং রহস্য না বুঝতে পারার জন্যই বুদ্ধসঙ্গিনী শক্তিদেবতার প্রতি আমাদের বিরূপ মনোভাব। ক্রমে বুদ্ধ-সঙ্গিনী শক্তি স্বীকৃত হলেন। পাঁচজন ধ্যানী বুদ্ধের শক্তি বা সংশ্লিষ্ট সহচরী হলেন—বৈরোচনের বজ্রধাত্বীশ্বরী, অক্ষোভ্যের লোচনা, রত্নসম্ভবের মামকী, অমিতাভের পাণ্ডরা এবং অমোঘসিদ্ধির আর্যতারা। এই "আর্যতারা" দেবী বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়। হিন্দুতন্ত্রের তারার সঙ্গে এই

তারা-নাম্নী বৌদ্ধশক্তির মিশ্রণ পরবর্তী কালে হয়েছে। বিচিত্ররূপিণী শক্তি দেবী তারা বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে বহুরূপে পূজিতা।

এই পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের এবং তাঁদের পঞ্চশক্তির পরেও আর একজন ধ্যানী বুদ্ধ এবং তাঁর শক্তির কল্পনা করা হয়েছে। তিনি হলেন বজ্রসত্ত্ব ধ্যানী বুদ্ধ এবং তাঁর শক্তি হলেন বজ্রসত্ত্বাত্মিকা। বজ্রসত্ত্ব বুদ্ধকে নেপালে পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের পূজকরূপে কল্পনা করা হয়। তাঁর হাতে থাকে বজ্র ও ঘণ্টা।

ধ্যানী বুদ্ধ ও শক্তি থেকে বোধিসত্ত্ব

ধ্যানী বুদ্ধ এবং তাঁদের শক্তির সংযোগে পাঁচজন প্রধান বোধিসত্ত্বেরও উৎপত্তি হয়েছে বলে কল্পনা করা হয়। ব্যাপক অর্থে বোধিসত্ত্ব হলেন বুদ্ধত্বলাভপ্রয়াসী যে-কোন সাধক। কিন্তু বিশেষ অর্থে বোধিসত্ত্ব হলেন বিশিষ্ট কতকগুলি বুদ্ধগুণের অধিকারী সিদ্ধপুরুষ। সেই অর্থে নাগার্জুন, অশ্বঘোষ, মৈত্রেয়নাথ, আর্যদেব প্রমুখ বৌদ্ধাচার্যগণও বোধিসত্ত্ব। বোধিসত্ত্বগণ বিশ্বকল্যাণে সদা ব্যাপৃত। নিজেদের নির্বাণের জন্য তাঁদের চিন্তা করতে হয় না। পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ ও শক্তি থেকে যথাক্রমে এই পাঁচজন প্রখ্যাত বোধিসত্ত্ব উদ্ভূত হয়েছেন—সমন্তভদ্র, বজ্রপাণি, রত্নপাণি, পদ্মপাণি এবং বিশ্বপাণি। ষষ্ঠধ্যানী বুদ্ধ বজ্রসত্ত্ব ও শক্তিজাত বোধিসত্ত্ব হলেন—ঘণ্টাপাণি।

ধ্যানী বুদ্ধ এবং তাঁদের শক্তি থেকে পরবর্তী কালে আরও বহু বুদ্ধ এবং শক্তিদেবতার উদ্ভব হয়েছে।

পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ থেকে উদ্ভূত বহু শক্তিদেবতা

পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ এবং তাঁদের শক্তিকে আশ্রয় করে অসংখ্য দেব এবং দেবীর উৎপত্তি কল্পনা করে বৌদ্ধ সাধকগণ সাধনা করেছেন। বিচিত্র এই দেব-দেবী বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে পরবর্তী কালে মিলেমিশে এক হয়ে গেছেন। ধ্যানী বুদ্ধ থেকে একাধিক শক্তিদেবতার উৎপত্তির একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া যেতে পারে।

অমিতাভ ধ্যানী বুদ্ধ থেকে উদ্ভূত হয়েছেন দেবী কুরুকুল্লা, ভৃকুটী এবং মহাসিতবতী। সাধনমালা গ্রন্থে কুরুকুল্লার ৪টি রূপের কথা আছে—শুক্লকুরুকুল্লা, তারোদ্ভব কুরুকুল্লা, ওড্ডিয়ান কুরুকুল্লা এবং অষ্টভুজ কুরুকুল্লা। তিব্বতে কুরুকুল্লার আরও বহু নামের উল্লেখ আছে। কুরুকুল্লা মুখ্যত বশীকরণের দেবী। প্রত্যেক দেবীর বাহন, আসন, হস্ত-মুখাদির সংখ্যা—বর্ণ ইত্যাদিও সাধনমালায় বর্ণিত আছে।

অক্ষোভ্য ধ্যানী বুদ্ধ থেকে উৎপন্ন হয়েছেন এই সকল শক্তিদেবতা: মহাচীনতারা, জাঙ্গুলী, এক জটা, পর্ণশবরী, প্রজ্ঞাপারমিতা, বজ্রচর্চিকা, মহামন্ত্রানুসারিণী, মহাপ্রত্যঙ্গিরা, ধ্বজাগ্রকেয়ূরা, বসুধারা এবং নৈরাত্মা। এই দেবীগণের মধ্যে মহাচীন তারা, প্রজ্ঞাপারমিতা এবং নৈরাত্মা বিশেষ আলোচনার বিষয়। চীনতারা বা মহাচীনতারা—চীন দেশ থেকে এদেশে এসেছেন বলে অনেকের ধারণা। সম্মোহতন্ত্রের বর্ণনা মতে তন্ত্রসাধনার ধারা সারা এশিয়ার দেশেই ব্যাপ্ত ছিল। এখনও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু দেশে তন্ত্রসাধনার ধারা অব্যাহত আছে।

প্রজ্ঞাপারমিতা এবং নৈরাত্মা দেবী বৌদ্ধ দার্শনিক তত্ত্বে এক বিশিষ্ট স্থান পেয়েছেন। শূন্যতা,—প্রজ্ঞা, বোধিচিত্ত প্রভৃতি অবস্থার বর্ণনায় —এই দুই দেবী অনেক সময় মূর্ত হয়ে উঠেন। ধ্যানী বুদ্ধের প্রজ্ঞা এবং নির্বিকার স্থিতির মূর্তরূপ এই দুই শক্তিদেবতা। জাঙ্গুলী সর্পদেবী। পর্ণশবরী—মহামারী নিরোধক দেবী। বসুধারা—ধনদাত্রী দেবী।

বৈরোচন ধ্যানী বুদ্ধ থেকে উৎপন্ন হয়েছেন এই সকল শক্তিদেবতা: মারীচী উষ্ণীষবিজয়া,

সিতাতপত্রা-অপরাজিতা, মহাসহস্র-প্রমর্দনী এবং বজ্রবরাহী।

বৈরোচন বুদ্ধ থেকে শুধু দেবীশক্তিরই উদ্ভব হয়েছে বলে সাধনমালায় বর্ণিত আছে। এঁদের মধ্যে মারীচী এবং বজ্রবরাহী বিশেষ পরিচিত। এঁদের বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন সাধনায় স্থান পেয়েছে। তিব্বতে মারীচীকে উষাদেবীর রূপে বন্দনা করা হয়। মারীচী দেবীরও সূর্যের ন্যায় রথ আছে। সেই রথের বাহন সাতটি শূকর। মারীচীর ছয়টি বিশিষ্ট রূপ আছে—কোথাও তিনি বহুভুজা। বজ্রবরাহীকে হেরুক দেবের সঙ্গে মিলিত অবস্থায়ই দেখা যায়। বৌদ্ধ শক্তিদেবতাকে ধ্যানী বুদ্ধের বা অন্য পুরুষ দেবতার সঙ্গে সম্মিলিত অবস্থায় কল্পনা তান্ত্রিক মহাযানী বৌদ্ধদের এক দুঃসাহসিক ও দুর্জ্ঞেয় সাধনার প্রকাশ।

ধ্যানী বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধি থেকেও দেবীশক্তিরই উদ্ভব হয়েছে। বৈরোচন বুদ্ধের ন্যায় অমোঘসিদ্ধিরও কোন পুরুষ অবতার নেই। খদিরবনী তারা, বশ্যতারা, ষড়ভুজসিত তারা, ধনদতারা, পর্ণশবরী, মহামায়ূরী ও বজ্রশৃঙ্খলা—এই সাতজন দেবী ধ্যানী বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধির শক্তি। এর মধ্যে পর্ণশবরী হলেন—"পিশাচী"—"সর্বমারী প্রশমনী"। পূর্ববঙ্গে এই দেবী অনেকাংশে শীতলা দেবীরূপেই পূজিতা।

ধ্যানী বুদ্ধ রত্নসম্ভব থেকে উৎপন্ন হয়েছেন দুজন দেবীশক্তি। তাঁরা হলেন মহাপ্রতিসরা ও বসুধারা। মহাপ্রতিসরা হিন্দুদেরও দেবী। দুর্গাপূজার সময় মহাপ্রতিসরারও পূজা হয়। মহাপ্রতিসরার দুটি রূপ আছে। এক রূপ—তিন মুখ দশ হাত যুক্ত,—অপর রূপ চার মুখ আট হাত। মহাপ্রতিসরার দশ বা আট হাতে দুর্গার ন্যায় বিভিন্ন অস্ত্র আছে। এইজন্যই হয়তো বঙ্গদেশে দুর্গাপূজার সঙ্গে এই দেবীশক্তির পূজার বিধান আছে। বসুধারার হাতে যব শীর্ষ এবং তিনি বরদমুদ্রাযুক্তা। তাঁকে কৃষির ও ধনের দেবী বলে গ্রহণ করা হয়।

বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে একই শক্তির সাধনা

শ্রীবুদ্ধের ধ্যান ও ধারণা থেকে পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের কল্পনা। পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের কল্পনার সঙ্গে উদ্ভূত হয়েছেন অসংখ্য শক্তিদেবতা। এই শক্তিদেবতা বিদেশ থেকেও ভারতে প্রবেশ করেছেন—যেমন চীনতারা, মহাচীনতারা, লামিকা, ডাকিনী-হাকিনী—লামেশ্বরী। বৌদ্ধসাধক এবং ব্রাহ্মণ্যসাধকের মধ্যে এরই নামীয় শক্তিদেবতার পূজা দৃষ্ট হয়। অসংখ্য অবৈদিক, অপৌরাণিক দেবদেবী কল্পনার জন্য বৌদ্ধরা দায়ী—না ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীরা দায়ী বলা মুশকিল। বর্তমানেও বৌদ্ধ এবং হিন্দু উপাসকরা—সেই সেই দেবীকে নিজেদেরই কুলাগত বলেই ধরে নিয়েছেন।

শক্তিদেবতা তারার প্রাধান্য

দেবী তারা মূলতঃ বৌদ্ধদের দেবী—না ব্রাহ্মণদের দেবী নির্ণয় করা সহজ নয়। শক্তিদেবতা তারার মধ্যে ভীষণ ও মধুর,—উগ্র ও কোমল,—সৃষ্টি ও সংহারের ভাবটি আছে। তারার প্রসন্নবরদা মূর্তিও কল্পিত, ভীষণা মূর্তিও পূজিত এবং কোমল-কঠোর মিশ্রভাবের মূর্তিও আরাধিত হয়ে আসছে। এই দেবীশক্তি ভারতীয় এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেশে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন।

সাধনমালা গ্রন্থে বহু দেবীকেই তারা বলা হয়েছে। এঁদের মধ্যে অনেকেরই দক্ষিণ হস্তে বরদমুদ্রা এবং বামহস্তে পদ্ম। এই সৌম্য বরাভয়দায়িনী তারার উদ্ভব ধ্যানী বুদ্ধের মৈত্রী ও করুণার ভাবনা থেকেই হয়েছে—অনুমান করা যেতে পারে। তারা নাম্নী এই দেবীর ধ্যানে বিচিত্র বর্ণ, বিচিত্র মুদ্রা এবং বিচিত্র আসন-বাহন ও অস্ত্রের কল্পনাও কালে কালে সংযোজিত হয়েছে। নিম্নে

দেবী তারার বিচিত্র রূপের কয়েকটি নাম দেওয়া গেল : খদিরবর্ণী, বশ্যতারা, আর্যতারা, মহত্তরী-তারা, বরদতারা, অষ্টমহাভয়তারা, মৃত্যুবঞ্চন-তারা, দুর্গোত্তারিণীতারা, ধনদতারা, চতুর্ভুজ সিততারা, ষড়্‌ভুজ সিততারা, বজ্রতারা, প্রসন্ন-তারা, মহাচীনতারা ইত্যাদি। এই তারাদের নাম থেকেই তাঁদের বৈশিষ্ট্য অনেকটা উপলব্ধি করা যায়। সাধনমালার বহু দেবীর মন্ত্রেই এই গুহ্য মন্ত্রটি পাওয়া যায়—"ওম্ তারে তুত্তারে তুরে স্বাহা"—সুতরাং সাধনমালার সব দেবীকেই তারা পর্যায়ে ধরা যায়!

বৌদ্ধতন্ত্রের অপর কয়জন শক্তিদেবতা

পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ থেকে উদ্ভূত নন—এমন কয়জন দেবীর উল্লেখও সাধনমালায় আছে। তাঁরা হলেন—সরস্বতী, অপরাজিতা, বজ্রগান্ধারী, বজ্রযোগিনী, গৃহমাতৃকা, গণপতি হৃদয়া এবং বজ্র-বিদারণী। সরস্বতী দেবী আমাদের বিশেষ পরিচিতা। এই সরস্বতীরও আবার বহু রূপ-কল্পনা বৌদ্ধতন্ত্রে আছে।

উপসংহার

গৌতম বুদ্ধ দেবতা বা দেবীশক্তির উপর নির্ভর না করে আত্মনির্ভর হতেই বলেছিলেন। কিন্তু দুর্বল মানুষ স্বাভাবিক কারণেই—দেবতা, বিশেষতঃ দেবীরূপিণী, মাতৃরূপিণী শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করেই নির্বাণ শান্তি প্রার্থনা করেছে। তন্ত্রসাধনা, মাতৃরূপিণী দেবী সাধনা, মৃন্ময়ী মূর্তিতে চিন্ময়ী শক্তিকে দর্শন করে পূর্ণতার সাধনা—মিথ্যা নয়। তার আধুনিক প্রমাণ শ্রীরামপ্রসাদ, —শ্রীরামকৃষ্ণ। বর্তমান যুগের আধ্যাত্মিক চেতনা আবার মাতৃশক্তিকে অবলম্বন করেই সম্ভব হয়েছে। আত্মদীপ—আত্মশরণ হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু মাতৃনির্ভর হওয়া সকলের পক্ষেই সহজ

র　　ত-প্রসঙ্গ

অরবিন্দ বিশ্বাস

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের প্রধান।

যদি রবীন্দ্রনাথের গান না থাকত, যদি তিনি সঙ্গীত রচনা না করতেন তবে কেমন হত? আমাদের কী দশা হত? আমাদের মনের শত সহস্র অস্ফুট ভাব, সুকুমার কল্পনা, স্বপ্ন, আনন্দ, ব্যথা-বেদনা এ কেমন করে রূপ পেত? বস্তুত রবীন্দ্রনাথের গান যেন আমাদের মর্মের কথা, আমাদেরই নিজস্ব ধন। শুনতে শুনতে মনে হয় এ যে আমারি হৃদয়ের গোপন আকুতি। কিন্তু আমার ব্যাকুলতা, আমার গভীর গোপন বিজন মর্মবাণী কি করে এত মধুর, এত অপরূপ হয়ে প্রকাশিত হল? যে-কথা আমি শুধু অব্যক্ত-রূপে অনুভব করেছি কিছু বুঝতে পারিনি, বুঝাতে শিখিনি; তাই প্রকাশের আবেগে কেবল চঞ্চল হয়েছি।

আমারই বিধুর হৃদয়ের সেই বেদনা, আকাশের পটে—নক্ষত্রের আলোতে। যুগযুগান্ত, কল্পকল্পান্ত হতে প্রকাশিত হয়েছে—রবীন্দ্রনাথের গানে ও সুরে। সত্যিই আমাদের জীবনের আনন্দ, বেদনা, দুঃখ, উল্লাস এমন কোন মনের ভাব নেই যা নাকি রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের সুরে প্রকাশ করে যাননি। যেখানে প্রেম-অনুরাগ, ভক্তি-ভালবাসা, মিলন-আনন্দ—সেখানেও তিনি। আবার যেখানে বিরহের অশ্রু-পারাবার সেখানেও তিনি। যেখানে নিভৃত স্বপ্ন, কুসুম-সুকুমার হৃদয় গুঞ্জন সেখানেও তাঁর সঙ্গীতের ধ্বনি। যেখানে মরণের স্নিগ্ধছায়া ঘনিয়ে এল সেখানেও তাঁর গান। তত্ত্বান্বেষী-ভগবদ্ভক্ত রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ আত্মপ্রকাশ তাঁর গানে।

তিনি গেয়েছেন—

"আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালবাসায় ভোলাব। / আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব নাগো, গান দিয়ে দ্বার খোলাব॥"

সঙ্গীতের এই লোকাতীত, জগদতীত, শক্তি-সম্বন্ধে রোমাঁ রোলাঁ তাঁর 'জাঁ ক্রিস্ত্ফ'-গ্রন্থে যা লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথেরও সেই একই আদর্শ। রোমাঁ রোলাঁ তাঁর উল্লিখিত মহাকাব্যোপম উপন্যাসে যা বলতে চেয়েছেন, তার মর্মার্থ হচ্ছে : জীবন-ধারা নিরন্তর বয়ে চলেছে। শরীর ও মনের চিরায়ত প্রবাহ ঠিক যেন নদীর স্রোত—তাতে স্থূল দৃশ্যজগৎ লয় পেতে পেতে, আবার নব-নব রূপে উৎসারিত হতে থাকে। আত্মা অবিনশ্বর অক্ষয়—অনন্ত গহন গম্ভীর। যথার্থ সঙ্গীত হচ্ছে সেই অতল অপার আত্মা-সমুদ্রে উত্থিত তরঙ্গমালা। ভাল সঙ্গীত তাই আত্মারই উদ্ভাসিত রূপ।

গায়ক-গীতিকার রবীন্দ্রনাথও নিজের সম্বন্ধে বার বার বলেছেন : "আমার আত্মপ্রকাশ আমার গানে।" "আমি যখন গান বাঁধি তখনই সব চেয়ে আনন্দ পাই।"

তিনি গেয়েছেনও তাই :

"যবে কাজ করি
প্রভু দেয় মোরে মান।
যবে গান করি
ভালবাসে ভগবান।"

*

"গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি।"

ইত্যাদি।

রবীন্দ্রসঙ্গীত সুরের মায়ায় সর্বলোকের আনন্দকে, সর্বলোকের বেদনাকে নিজেরই মাঝে মিলিয়ে নিতে পেরেছে। আবার নিজের আনন্দকে সবার আনন্দে, নিজের বেদনাকে সকলের বেদনায় রূপান্তরিত করাই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি-মানসের বিভূতি। আর সুরের জাদুতেই এই পরমাবিভূতি ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত রবীন্দ্রসঙ্গীত আরও এক কারণে আমাদের মনকে মুহূর্তের মধ্যে সবলে আকর্ষণ করে নেয়। সেটি হচ্ছে সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে অতি সহজভাবে আমাদের চিরকালের যা শ্রেয়ঃ, যা অন্তর হতে অন্তরতম, শ্রেষ্ঠ—তাকেই প্রত্যক্ষ করিয়ে দেয়।

গান, কথা, সুর ও ছন্দ—এই চারের মিলনে সার্থক রবীন্দ্রসঙ্গীত। তাই আমি একে বলব চতুরঙ্গ। ইন্দিরাদেবী বলতেন : "রবীন্দ্রনাথের গান, একাল ও সেকাল, দেশী ও বিদেশী, জটিল ও সরলের সমন্বয়। এই কথাগুলিও ভেবে দেখা দরকার। তাঁর গানে রাগরাগিণীর ব্যবহার ও মিশ্রণ অপূর্ব। অপূর্ব তাঁর প্রয়োগনৈপুণ্য, একই গানে একাধিক রাগের মিশ্রণ। রবীন্দ্রগীতি তাই অখণ্ড রূপ নিয়েছে—কোথাও মনে হয়নি বেখাপ্পা।"

যুগ যুগ ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারা প্রবাহিত থাকবে। কত গান এল, নিত্যনূতন সুর হল কিন্তু কেউ টিকে রইল না। রবীন্দ্রসঙ্গীত কিন্তু আজও অব্যাহত। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের রচিত গান আজও আমরা গাইছি। কই সে-গান তো পুরানো বোধ হয় না। ভারতীয় সঙ্গীতের মূল বৈশিষ্ট্য, পরিবেশ সৃষ্টিতে। যে-সঙ্গীত পরিবেশ সৃষ্টিতে অক্ষম তা ক্ষণস্থায়ী। যে-সঙ্গীত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে সেই সঙ্গীত হয় সর্বকালের সকল মানুষের গান। রবীন্দ্রনাথের গানও তাই।

যে-সব গুণাবলীর জন্য রবীন্দ্রনাথের গানে আজও আকাশ-বাতাস মুখরিত, এবার সেগুলি সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের গানের বিশেষ গুণ এই : ১। অসাধারণ কাব্যসম্পদ; ২। সুরবৈচিত্র্য; ৩। ছন্দবৈচিত্র্য; ৪। রাগভিত্তিক—স্বপ্ন-সুরের সাধনা; ৫। কথা ও সুরের মিলন; ৬। বিষয়বৈচিত্র্য; ৭। দর্শন বা তত্ত্ব এবং ৮। **Universal appeal**—সার্বজনীনতা।

ক্ষীরভবানীর মাতৃ-সান্নিধ্যে

স্বামী জিতাত্মানন্দ

হায়দ্রাবাদ রামকৃষ্ণ মঠে সহকারী।

ভোরের আলোতে শান্ত ডাললেকের পাশে পাশে জীপ ছুটে চলেছে পপলারের সারির মধ্য দিয়ে। মাঝে মাঝে পথের দুধারে ম্যাগ্‌নিফিসেণ্ট চেনার, তার চির-সবুজ বড় বড় পাতার ছায়া ফেলেছে। গাছ তো নয়, যেন পুরো একটা সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। ফাঁকে ফাঁকে পথের দুধারে উইলো গাছ। আর এই বৃক্ষসারির পেছনেই চোখে পড়েছিল ঠিক বাংলার ধানক্ষেত। দুধারেই অবিকল সেই বর্ধমান অথবা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিশাল দিগন্তবিস্তৃত চাষের জমি। কেবল উন্মুক্ত দিগন্তের পরিবর্তে রয়েছে তুষার-মৌলি কাশ্মীরের পর্বতশ্রেণী। সানুদেশে দীর্ঘাঙ্গ সান্ত্রীদের মতো অজস্র পাইন। যেন আর মানুষের জগতের মধ্যে দাঁড়ানো চেক্‌পোস্ট। কাশ্মীরবাসীরা এখনও অন্তরে অন্তরে স্বীকার করেন তাঁদের জন্মভূমি ঋষিভূমি। এখনও তাঁরা জানেন, মাত্র দু-তিনশ বছর আগে একটা গোটা ব্রাহ্মণ পূজারীদের দেশটাই মুসলমান আক্রমণে আর হিন্দুদের উপেক্ষায় নতুন ধর্ম নিয়েছিল। এখন তাঁরা কাশ্মীরী ভাষায় কথা বলেন, যার ভিত্তিই হচ্ছে সংস্কৃত। শ্রীনগরের বুকে দাঁড়ানো সেরা হোটেল—পম্পোস্‌ অর্থাৎ পদ্মপুষ্প, যা কাশ্মীরী মানুষের নিত্য ব্যবহার্য সবজী। ওঁরা শাক ভালবাসেন। শাককে বলেন হাক্‌। সাধারণ মানুষের প্রবাদবাক্য (Proverb)—'কিসমৎ কা ভাত মেহনৎ কা হাক্‌'। শ্রীনগরের বুকে দাঁড়িয়ে জাগ্রত দেবীপীঠ হারি পর্বত! দেবীর নাম সারিকাদেবী। কাশ্মীরী উচ্চারণে হয়েছে হারিকাদেবী। আর যে পর্বতে দেবীর অধিষ্ঠান তার নাম হারি পর্বত। শ্রীনগর থেকে মাত্র পঁয়ষট্টি কিলোমিটার দূরে আর একটি জাগ্রত দেবীপীঠ। যদিও খুব বেশি পরিচিত নয়, নাম জ্বালামুখী। একসময় আওরঙ্গজেব সৈন্য পাঠিয়ে পর্বতশীর্ষে আমিনী মাতৃমন্দির ধ্বংস করেছিল। আজ সুন্দর মন্দির হয়েছে। আর চারিদিকে কেবল ভূস্বর্গ কাশ্মীরের অবর্ণনীয় সৌন্দর্য।

সমস্ত কাশ্মীরটাই প্রায় দেবীপীঠ। শক্তি আরাধনার জগৎ। জীপে বসে বসে বন্ধু মিঃ কল (Kaul)-এর সঙ্গে এই প্রসঙ্গই হচ্ছিল। মাতৃভক্ত কলসাহেব আজ কাশ্মীরের বিদ্যুৎপর্ষদের চীফ্‌ ইঞ্জিনিয়ার। সারা পথে কেবল বলে চলেছিলেন মাতৃপীঠ কাশ্মীরের গভীর আধ্যাত্মিক আকর্ষণের কথা, যার জন্য শত প্রলোভনেও কলসাহেব কাশ্মীর ছেড়ে যেতে রাজী নন। একসময় যাদবপুরের ছাত্র ছিলেন। তাই বাংলা গান, স্বামীজীর গাওয়া আর শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়া মায়ের গান ওঁর খুব প্রিয়। বিশেষ করে স্বামীজীর জীবনের শেষদিনের মাতৃসঙ্গীত—"শ্যামা মা কি আমার কালো রে।" সকালে উঠেই এক সাজি-ভর্তি কাশ্মীরী গোলাপ, এক বোতল দুধ আর ধূপকাঠি সঙ্গে নিয়েছিলেন। কারণ ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই শ্রীনগর থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরের এই মহাজাগ্রত মাতৃপীঠে আমরা পৌঁছে যাব। ক্ষীরভবানী—The mother of the coloured springs—যেখানে ৮৫ বছর আগে নিঃসঙ্গ বিবেকানন্দ একদিন এসেছিলেন ডাললেকের ধার দিয়ে কাশ্মীরী মুসলমানের নৌকোতে। মাত্র কয়েকদিন আগেই গভীর ভাবাবেগে পূজা করেছিলেন মুসলমান মাঝির চার বৎসরের কন্যাকে সাক্ষাৎ জগন্মাতার মূর্ত প্রতীকের রূপে। নৌকা যেদিন ক্ষীরভবানীর মন্দিরপ্রান্তে এসেছিল—মাঝিভাই

বলেছিল হিন্দু বিবেকানন্দকে—"নৌকাতেই জুতো রেখে যেও। এ অতি পবিত্র ভূমি।"

জীপ থামতেই মনে হল—একটা নিঃশব্দ দেবভূমিতে এসেছি। পেছনেই ক্ষীণস্রোতা নদী আর নির্জন পাহাড়। সামনেশে বিশাল গহন ছায়াসুনিবিড় দশ বারটা চেনারের নিচে বেশ বড় একটা আঙিনা, কালো পাথরে বাঁধানো। চারধারে সামান্য লোহার রেলিঙ-এ ঘেরা। মাঝখানে শ্বেতপাথরে বাঁধানো কুণ্ড। আর কুণ্ডের মাঝখানে খুব ছোট মন্দির। ঠিক মন্দির নয়। চারটি ছোট শ্বেত-স্তম্ভের উপর দাঁড়ানো শ্বেতপাথরের একটি আচ্ছাদন। যার নিচে রয়েছেন ছোট শিলাখণ্ডে খোদিত দেবীমূর্তি আর শিবলিঙ্গ।

কাশ্মীরে শিব আর শক্তির অবস্থান। আর তার সঙ্গে রয়েছেন মানুষ, পুরুষ, প্রকৃতি আর নর—কাশ্মীর শৈবসিদ্ধান্তের এই Trinity। অমরনাথের পথে স্বামীজী দেখিয়েছিলেন নিবেদিতাকে—ঐ দেখ, চিরতুষারাবৃত শিবের পাদদেহে চির-সবুজ উমার অবস্থান। চিরন্তন ধ্যানমগ্ন পুরুষের পদপ্রান্তে চিরন্তনী কর্মময়ী, প্রাণময়ী জীবনদায়িনী প্রকৃতির স্থান। নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়। আগে মাতৃপূজা তারপর শিবের আরাধনা। আগে রাধা তারপর কৃষ্ণ। বৃন্দাবনবিলাসিনী রাই আমাদের। আগে জানকী, তারপর জানকীবল্লভ রাম। আগে তপস্যাদানসেবাদি কর্ম, অন্তে আত্মার ধ্যান।

অমরনাথ দর্শনের পর স্বামীজী ক্রমশঃ মাতৃধ্যানে ডুবে গিয়েছিলেন। আর সেই মাতৃ-ধ্যানের চূড়ান্ত মুহূর্তে একদিন কাশ্মীরের হাউসবোটেই স্বামীজীর গভীরতম অনুভূতি হয়েছিল—মাতৃস্বরূপ কি। হঠাৎ অনুভব করেছিলেন মাতৃশক্তি কেবল স্নেহ-স্তন্যদায়িনী নয়। মহামারী, দুঃখ, প্রলয় ঝঞ্ঝা, মৃত্যু—এ সমস্ত সেই একই মায়ের দান। বলেছিলেন বিবেকানন্দ—"সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখ বনমালী তোমার মায়ার ছায়া।" এই মৃত্যুরূপা মাতার ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ স্নেহস্পর্শ অনুভব করেছিলেন ঐ সায়াহ্নে। ভাবের গভীরতায় আর অনুভূতির আতিশয্যে সারা শরীরে বারবার কেঁপে উঠেছিলেন বিবেকানন্দ। আর ঐ অনুভূতির ঢেউয়ের উপর দাঁড়িয়েই কোনমতে কাগজে ধরে রেখেছিলেন কয়েকটি শব্দ। চেতনার গভীরতম স্তর থেকেই সেই সন্ধ্যায় উৎসারিত হয়ে ঐ শব্দের ঝড় রূপ নিয়েছিল বিবেকানন্দের অবিস্মরণীয় লিরিক-এ—**Kali The Mother**। শেষ কয়টি লাইন প্রায় স্বগতোক্তির মতোই বারবার আবৃত্তি করে চলেছিলেন বিবেকানন্দ তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্যাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে।

> সাহসে যে দুঃখ-দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে
> বাহু পাশে,
> কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি
> কাছে আসে।

অনুভূতির তীব্রতা কমে গেলে স্বামীজী কয়েকদিন প্রায় নীরব ও নিঃসঙ্গ হয়ে ছিলেন। বোধ হয় মাতৃস্বরূপের ধ্যানে ভাষা নিঃস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ একদিন সবাইকে জানালেন—আমি অজ্ঞাতবাসে চলেছি, আমাকে কেউ অনুসরণ কর না।

ঝিলমের বুকে একটি নৌকা সেদিন একাই চলেছিল এ-যুগের মহাসাধককে নিয়ে। নৌকা থেমেছিল ঐ পবিত্র দেবভূমিতে—ক্ষীরভবানী।

ক্ষীরভবানীর ঐ অজ্ঞাতবাসে বিবেকানন্দ ব্রত উপবাস করেছিলেন নিয়মিত, নিত্য পূজা করেছিলেন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের শিশুকন্যাকে দেবীকুমারীর রূপে, আর শেষে একমণ দুধ দিয়ে পূজো করেছিলেন মাকে ঐ ক্ষীরকুণ্ডে, আর রাত্রির নিঃস্তব্ধতায় ঐ মন্দির প্রদক্ষিণ করেছিলেন

মায়ের ভাবে বিভোর হয়ে।

মিঃ কল বলে চলেছিলেন—আজও আমি যেন দেখতে পাই স্বামীজী শিশুর মতো ক্ষীরভবানীর মন্দির প্রদক্ষিণ করে চলেছেন রাত্রির অন্ধকারে। তাই আমি নিজেও কয়েকবার সারারাত জেগে এই মন্দির প্রদক্ষিণ করেছি। ক্ষীরভবানীর মন্দিরের ঐ প্রাচীন ট্রাডিশন আজও সমানে শ্রদ্ধা পায়। একনিষ্ঠ ভক্তরা ঐ পবিত্রভূমিতে রাত্রিযাপন করেন মাতৃনামে বিভোর হয়ে জীবন্ত মাতৃ-সান্নিধ্যে। আজও ক্ষীরভবানীর প্রবেশ-পথে দাঁড়ালে অন্তরের মধ্যে শোনা যায় মায়ের কণ্ঠস্বর—"এসো, আমি এখানে রয়েছি অনন্তকাল ধরে। চিরন্তন জগজ্জননীকে ভুলে যেও না। মা-ই সত্য, জগৎটা তারই খেলা।"

ক্ষীরভবানীর দিনগুলোর গভীরতম মুহূর্তে একদিন মহামায়ার কণ্ঠস্বর শুনেছিলেন বিবেকানন্দ, প্রত্যক্ষ দৈববাণী। সেদিনের ক্ষীরভবানীর ভগ্ন মন্দিরে ছিল মুসলমান আক্রমণের চিহ্ন। ঐ ধ্বংসাবশেষের পাশে দাঁড়িয়ে মাতৃভক্ত বিবেকানন্দের অন্তরে জ্বলে ওঠে দেশপ্রেমের আগুন। পাশ্চাত্যবিজয়ী বিবেকানন্দের রক্তে তখন ছিল প্রাচীন বেদান্ত সভ্যতার জন্য গভীরতম গৌরববোধ আর সেই গৌরববোধের পুনরুদ্ধারের স্বপ্নই পরিব্রাজক বিবেকানন্দ কপর্দকহীন অজ্ঞাতনামা সন্ন্যাসী হয়েও আমেরিকায় "সাইক্লোনিক হিন্দু" আর "ওয়্যারিয়র প্রফেটে"র নাম কিনেছিলেন। ক্ষীর-ভবানীর ধ্বংসস্তূপের পাশে দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দের মনে বিধ্বস্ত আর্যজ্ঞান আর আর্যসভ্যতার জন্য গভীর বেদনা জেগে উঠেছিল। আর সেই ক্ষোভ, সেই বেদনার, সেই হৃতগৌরববোধের তীব্রতায় বিবেকানন্দের হৃদয়ে সেই মুহূর্তে আবির্ভূত হয়েছিল মাতৃগত প্রাণ, এক দুর্জয় সংগ্রামী যোদ্ধার। বিবেকানন্দ চিন্তা করেছিলেন —"মা, আমি যদি বেঁচে থাকতাম সেই সময়, তবে জীবন দিয়েও তোমার মন্দির কলুষিত করতে দিতাম না বিধর্মীদের।"

হঠাৎ শুনলেন প্রত্যক্ষবাণী, জগজ্জননীর কণ্ঠস্বর—"আমার মন্দির যদি বিধর্মীরা কলুষিত করেই থাকে তাতে তোমার কি করবার আছে? তুমি আমাকে রক্ষা করে চলেছ, না আমিই তোমাকে রক্ষা করে চলেছি?" পুত্রের উদ্ধত মাতৃ-গর্ব আর আত্মশক্তির বহু ঊর্ধ্বে উত্তুঙ্গ মহিমায় সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়েছিলেন জগজ্জননী, —যেন বলেছিলেন নিজ সন্তানকে—"আমিই আদিশক্তি, সৃষ্টিস্থিতি পালনকারিণী, ত্রিভুবন আমিই সৃষ্টি করি, আবার আমিই গ্রাস করি। জগতের গাছে একটি পাতাও নড়ে না যদি না আমি ইচ্ছা করি।" কয়েকদিন ধরেই বিবেকানন্দ বার বার শুনেছিলেন মায়ের একই কণ্ঠস্বর, সেই সর্বজয়ী ইচ্ছাময়ী লীলাময়ী জগজ্জননীর বিশ্বসৃষ্টি ধ্বংসের, জগৎ-ভাঙাগড়ার খেলার বাণী—"বাছা, আমি যদি ইচ্ছা করি তবে এই মুহূর্তেই অগণিত মঠ-মন্দির তৈরি করে নিতে পারি, এই মুহূর্তেই গড়ে তুলতে পারি সপ্ততল স্বর্ণমন্দির এই খানেই।" এই মাতৃকণ্ঠই পাঁচ হাজার বছর আগে শুনেছিলেন ঋগ্বেদের ঋষি।

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্ত বা উ।

জগতের অজ্ঞানবিনাশের জন্য শিব যখন তাঁর ধনুর্বাণে শর যুক্ত করেন, তাঁর পিছনে রয়েছে আমারই শক্তি। মাত্র পনেরো বছর আগে দুঃখদারিদ্র্য অনাহারের এক রাত্রিতে কালী অবিশ্বাসী নরেনকে নিয়ে খেলেছিলেন মাতৃস্বরূপ রামকৃষ্ণ এক নিষ্ঠুর খেলা। মাকে মানে না এমন এক দুর্জয় শিবস্বরূপকে এই যুগের ঈশ্বর ফেলে দিয়েছিলেন মায়েরই পদতলে। বহুবছর আগে এক সেই রাতের ব্রাহ্মমুহূর্তে দক্ষিণেশ্বর

কালী-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দের আতিশয্যে জনে জনে বলে বেড়িয়েছিলেন—নরেন্দ্র কালী মেনেছে, সারারাত ধরে গেয়েছে "মা ত্বং হি তারা, তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা···"

ক্ষীরভবানীর নিস্তব্ধ গভীরতায় আর একবার সর্বজয়ী মাতৃশক্তির পুনরভ্যুত্থান হল বিবেকানন্দের জীবনে। বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ আর একবার পরিণত হলেন শরণাগত বিবেকানন্দে—এবার চিরদিনের জন্য মা তাঁর কাজ শেষ করিয়ে ঘরের ছেলেকে ঘরে এনেছেন। ফিরিয়ে এনেছেন ক্ষীরভবানীর নির্জন মাতৃপীঠে এই চরম সত্যটি বুঝিয়ে দেবার জন্যই—আমিই সব করেছি, তুমি নিমিত্ত মাত্র। মহামায়ার শক্তিতেই তোমার মাধ্যমে জগৎ আলোড়িত হয়েছে। এবার সেই সত্য অনুভব কর আর চিরদিনের মতো শরণাগত হও আমারই কাছে।

বেদান্তকেশরী বিবেকানন্দ পরিণত হয়েছিলেন মাতৃক্রোড়াশ্রয়ী সম্পূর্ণ অহং ও ইচ্ছা বর্জিত একান্ত মাতৃনির্ভর শিশু বিবেকানন্দে—ওই জাগ্রত মাতৃভূমি ক্ষীরভবানীতে। ছেলের সব ভার মা তুলে নিয়েছিলেন ঐ দৈববাণীর মুহূর্ত থেকে। সাতদিন পরে যখন ফিরেছিলেন, নিবেদিতা দেখেছিলেন এক রূপান্তরিত বিবেকানন্দকে। গভীর শান্তি আর অন্তর্মুখীতার রাজ্যে ঢুকে পড়েছিলেন বিবেকানন্দ। প্রথমেই শান্তকণ্ঠে বলেছিলেন—এখন মা-ই সব। মায়ের ইচ্ছাতেই যা হবার তাই হবে। যে হাউসবোটে সারা দুনিয়ার ইতিহাস, ভারতের অতীত ভবিষ্যৎ দেখেছিলেন বিবেকানন্দ, যে ঝিলমের তীরে বিবেকানন্দ মাত্র কয়দিন আগেই বেদ-বিদ্যালয় আর নারীমঠের স্বপ্ন দেখেছিলেন, আজ সেই হাউসবোটেই বিবেকানন্দ মাতৃধ্যানে নীরব হয়ে গিয়েছিলেন। সব স্বপ্নের পরিসমাপ্তি, সম্পূর্ণ শরণাগতি, মা-ই সব জানেন। মা, মা, মা,—বিবেকানন্দের কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছিল স্বপ্নোত্থিত শিশুর মতো। কয়েকদিনের মধ্যেই হঠাৎ বিবেকানন্দ জানালেন তাঁর কাশ্মীর বাস শেষ। সকলকে ছেড়ে রওনা হলেন গঙ্গাতীরের বেলুড়-মঠে। মাতৃশক্তির এই শক্তিময় পুনরুত্থান বিবেকানন্দের জীবনে এনেছিল গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি, যে প্রিয়তম গুরুকে একদিন সম্বোধন করেছিলেন—"my hero, my god in life" তাকেই আবার নতুন রূপে ডাকলেন—"সশক্তিকে নমি তব পদে"; সম্বোধন করলেন, "শিবশক্তির সমষ্টিরূপে—"ওঁ হ্রীং ঋতং"। নিবেদিতাকে বলেছিলেন ভবিষ্যতে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ কালীর অবতার হিসেবেই পূজিত হবেন। জীবনের শেষদিন মাতৃসন্তান বিবেকানন্দ তাই গেয়েছিলেন—Swan-song—"শ্যামা মা কি আমার কালোরে···"।

পূজা শেষ করে যখন মাতৃপীঠ ছেড়ে বেরিয়ে আসছিলাম কলসাহেব বার বার ফিরে তাকাচ্ছিলেন পিছনে, আমিও। কবে আর মার সঙ্গে দেখা হবে কে জানে! হৃদয় ভরে গিয়েছিল। অভয়ের বাণী যেন বার বার শোনাচ্ছিলেন মা। বিশাল চেনারের ছায়ায় যেন ঐ ছোট মুসলমান বালিকাটির মতো মা খেলে বেড়াচ্ছিলেন—তারকা রবি-শশী খেলনা তব। আদিশক্তির বিরাট সত্তার এত শান্ত, এত গভীর শক্তিময়ী নীরব উপস্থিতি! এখনও মনে হয় ক্ষীরভবানীর গভীর শান্ত নীরবতায় বসে রয়েছেন শিশু বিবেকানন্দের মা, তাঁর অনাগত অগণিত সন্তানদের অপেক্ষায়।

১৩৯২
বৈশাখ

মানুষ বিবেকানন্দ

শ্রীমতী অভয়া দাশগুপ্ত

সহ-গ্রন্থাগারিক, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব্ কালচার, কলিকাতা।

"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"—চতুর্দশ শতাব্দীতে বাঙালী কবির কণ্ঠে শোনা গিয়েছিল এই গান। আর কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে বাংলার এক তরুণ সন্ন্যাসীর মুখে শুনতে পাওয়া গেল—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"—

একথাকে আরও পরিষ্কার ও স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করলেন, "জগতের সমুদয় ধনরাশির চেয়ে মানুষ হচ্ছে বেশী মূল্যবান।" উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠে জানালেন, "বিশ্বজগতে এই মানব-দেহই শ্রেষ্ঠ দেহ এবং মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষ সর্বপ্রকার জীবজন্তু হইতে, এমনকি দেবাদি হইতেও উচ্চতর। মানুষ অপেক্ষা উচ্চতর আর কেহ নাই।"—কিন্তু কে এই তরুণ সন্ন্যাসী? কি তাঁর পরিচয়?—তিনি স্বামী বিবেকানন্দ যাঁর যথার্থ পরিচয়—মানবতার মূর্ত প্রতীক—যে-মানবসত্তা কোন দেশ ও কালের অঙ্গীভূত নয়, যা সর্বপ্রকার ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে পরিব্যাপ্ত হয়েছে বিশ্বমানবের অন্তরলোকে। বিংশ শতাব্দীর মানবসভ্যতার মূল উৎস স্বামী বিবেকানন্দ। ভারতের নব ভগীরথ স্বামী বিবেকানন্দ—এই ভাগীরথীর কূলে কূলে গড়ে উঠছে বিশ্বের নব নব তীর্থ, যা সার্বভৌম ও শাশ্বত।

একদা অর্জুন শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন, অধুনা বিবেকানন্দও তাই প্রত্যক্ষ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণে। বিবেকানন্দও সব্যসাচীরূপে দেশের, সমাজের, জগতের সকল গ্লানিসমূহকে দূর করে এক মহান সমন্বয়সাধনে ব্রতী হলেন। মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে, দেশে-দেশে সমন্বয়; সনাতনে-নবীনে সমন্বয়; ধর্মে-কর্মে সমন্বয়—এই নব সমন্বয়-দর্শনের অপর নাম স্বামী বিবেকানন্দ। বহুতে এক দর্শন এবং বৈচিত্র্যের মাঝেও একত্ব দৃষ্টি—এই হচ্ছে বিবেকানন্দের নবধর্ম, নববেদান্ত—নবীনতর বিশ্বরূপদর্শন। এই নব বেদান্তের যুগকে বলা যায় বিবেকানন্দের যুগ। এই যুগে বিবেকানন্দ মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছেন আত্মমর্যাদাবোধ। আবার এই আত্মমর্যাদাবোধই হচ্ছে নতুন মানবসভ্যতার ভিত্তি। আদর্শ লোকশিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে বিবেকানন্দ শুনেছেন—"মানুষ আর মান-হুঁশ। যার চৈতন্য হয়েছে, সেই মান-হুঁশ। চৈতন্য না হলে বৃথা মানুষ জন্ম।" উপযুক্ত আধারে এই শিক্ষা সার্থক রূপ নেয়। তাই মনের, দেহের, সমাজের ও দেশের সকল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর অক্লান্ত অভিযান, নিদারুণ কশাঘাত। অপরদিকে মানবমনের সর্বত্রগামী প্রেমের কথা, অন্তরের অতুলনীয় আধ্যাত্মিকতার কথা নিজ অন্তর দিয়ে অনুভব করে আবেগের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। একাধারে বিবেকানন্দ বিপ্লবী ও রক্ষণশীল। মাত্র এক শতাব্দীতে বিবেকানন্দের পূর্ণ পরিচয় জগৎবাসী পেতে পারে না, এর জন্যে কয়েকটি শতাব্দী ধরে অপেক্ষা করতে হবে।

বিবেকানন্দের অসামান্য প্রতিভায় বিশ্ববাসী আজ মুগ্ধ ও বিস্মিত। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার আলো দেশে-দেশান্তরে জ্ঞানিগুণিজনকে প্রভাবিত করছে। কিন্তু তাঁর সকলের চেয়ে বড় পরিচয়,

তিনি যথার্থ মানবপ্রেমিক—যে-কথা প্রবন্ধের সূচনাতেই বলা হয়েছে। সাধারণ মানুষ আমরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকি পরস্পরের সঙ্গে যোগসূত্রে। সে-পরিচয় বিশেষ শ্রেণীর, বিশেষ জাতির, বিশেষ সমাজের। কিন্তু পূর্ণ মনুষ্যত্বের পরিচয় সেখানেই, যেখানে—যে-হৃদয়ে সকল কালের সকল দেশের সকল স্তরের মানুষ স্থান পেয়েছে। যাঁর চেতনা খণ্ডিত হয়নি, সঙ্কুচিত হয়নি দেশকালের কোন সীমানায়। আবার পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রকাশ একমাত্র তাঁরই মধ্যে, মানুষকে যিনি প্রকৃত মানুষের মর্যাদা দিয়েছেন। এরও ওপরের কথা, মানুষের প্রকাশ সত্যে। নবযুগের মানবশ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ, বিভ্রান্ত দিশাহারা মানুষের কাছে মানবের সত্যকে কালোপযোগী করে ব্যাখ্যা করেন। মানবজীবনের সারসত্যকে সর্বমানবের গ্রহণযোগ্য করে সকলের কাছে উপস্থিত করেন। তিনি জানালেন—মানুষ দুর্বল নয়, মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই; মানুষের মধ্যেই দেবত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব, আর পূর্ণতার সাধনায় সব পথ সমান। এভাবে তিনি আপামর সাধারণের মিলনক্ষেত্র রচনা করে বিশ্বের মানুষকে আহ্বান জানালেন। এই আহ্বানের মধ্য দিয়েই আন্তর্জাতিক মানবতার যুগ নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। আর সেই মিলন-মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি স্বামী বিবেকানন্দ। খণ্ডিত বুদ্ধি ও জাতীয়তার গণ্ডী কাটিয়ে সকল প্রকার সংস্কার-মুক্ত মানবসভ্যতাকে বাস্তব রূপায়ণের কাজে বিবেকানন্দ এক কুশলী শিল্পী। তাঁর স্বদেশ-মন্ত্রও এই মানবমন্ত্রেরই একটি অঙ্গ বিশেষ। তাই তো অনুভব করছেন, "ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়।" আবার প্রার্থনা মন্ত্র বলে দিচ্ছেন, "আর বল দিনরাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

মানুষের মধ্যে দেবতার প্রকাশ, সংসারের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা, আমাদের প্রতিমুহূর্তের সুখ-দুঃখের মধ্যে দেবত্বের সঞ্চার—এটিই বিবেকানন্দ-দর্শনের মর্মকথা। বিবেকানন্দ রাম-কৃষ্ণের কাছে জেনেছেন, "দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীব সেবা"—এই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম। ভারতের সনাতন ঋষির ভাষায় বলা যায়, "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"—মানুষকে অমৃতের পুত্র বলে অভিহিত করা ভারতের সনাতন ধর্ম। শুধু মুখের কথায় নয়, গান গেয়ে নয়, নিজ জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিলেন কেমন করে এই শিক্ষাকে কাজে পরিণত করা যায়। সমাজে-সংসারে, অন্তরে-বাইরে মানুষ যখন দিগ্‌ভ্রান্ত তখন তার নিজেকে জানা দরকার। নিজের প্রতি শ্রদ্ধাবান হলেই নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উপলব্ধিতে আনা সম্ভব। বিবেকানন্দের ব্যাখ্যা: "যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সেই নাস্তিক। প্রাচীন ধর্ম বলিত: যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক। নূতন ধর্ম বলিতেছে: যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সেই নাস্তিক।" নিজের প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া মানে নিজের ওপরে বিশ্বাস স্থাপন। সকলের চেয়ে বড় দান যে শ্রদ্ধাদান, তা থেকে তিনি কোন মানুষকে বঞ্চিত করেননি। বিবেকানন্দের স্বল্প-পরিসর জীবনে এর প্রচুর উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। একবার আমেরিকার এক হোটেলে প্রবেশ করতে দেখে হোটেলের লোক বিবেকানন্দকে জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনি কি নিগ্রো?" তখন সে-কথার কোন উত্তর না দিয়েই তিনি সোজা হোটেল থেকে বের হয়ে আসেন। এই ঘটনার কথা শুনে সেখানকার শ্বেতকায় বন্ধুরা যখন বলেছিলেন, "আপনি নিগ্রো নন্, এইটুকু বললেই তো হোটেলে ঢুকতে পারতেন।" তখন গভীর হৃদয়াবেগ ও অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে

বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "অন্তকে ছোট করে বড় হবার জন্যে বিবেকানন্দ জন্মায়নি।"—এই মানব-প্রেম, এই দরদীমন, এই সর্বজীবে একাত্মানুভূতি দেখে মনে হয় শঙ্করের অদ্বৈতবাদ আর বুদ্ধের মৈত্রীভাবনার ঘনীভূত মূর্তি স্বামী বিবেকানন্দ।

মানব-সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে মানব-প্রেমিক বলছেন,—ভালবাসায় শান্তি, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রীতিতে শান্তি। তিনি তাঁর সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন দীনতম, মূর্খতম মানুষের জন্যে। তাঁর দৃষ্টিতে কেউ ছিল না ম্লেচ্ছ, কেউ ছিল না অনার্য। কারণ তিনি ছিলেন সকল দেশের সকল কালের সকল মানুষের অতি আপনার জন। তাই তো অন্তর থেকে বের হচ্ছে এমন অভিনব কথা, "পড়েছ, মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আমি বলি, দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব। দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক। ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম জানিবে।" ধর্মের এমন নবতর ভাষ্য এর আগে বিশ্ববাসী শোনেনি। নবযুগের মানবশ্রেষ্ঠ আরও নতুন কথা শোনালেন, "দুঃখী দরিদ্রকে সাহায্য করা, পরের সেবায় জন্য নরকে যাইতে প্রস্তুত হওয়া—আমি খুব বড় কাজ বলিয়া বিশ্বাস করি। তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নহে? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? প্রেমের সর্বশক্তিসত্তায় বিশ্বাস কর।"—এই দরদীমনটি শুধু ভাবাবেগে পরিচালিত হয়নি। এই বীর বিপ্লবী সন্ন্যাসী ছিলেন অত্যন্ত বাস্তববাদী এবং দীনদরিদ্রের অকৃত্রিম বন্ধু। সাধারণ মানুষের দেহের প্রয়োজন সম্বন্ধেও তাঁর ছিল বাস্তববোধ। তাই বলেছেন, "আগে অন্ন, তারপর ধর্ম।" তিনি নিজ অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন যে, "খালি পেটে ধর্ম হয় না।" তাঁর মহান্ ঈশ্বরপ্রেমই তাঁকে মহান্ মানবপ্রেমিকে রূপান্তরিত করে-ছিল। সেই কারণেই সন্ন্যাসী হয়েও বুঝেছিলেন, ক্ষুধিত মানুষকে ধর্মোপদেশ দিতে যাওয়া মূঢ়তা মাত্র। প্রয়োজন শিক্ষা বিস্তারের, প্রয়োজন অশন-বসনের সংস্থান। ক্ষুধিত, নিপীড়িত, অশিক্ষিত মানবরূপী ঈশ্বরকে ত্যাগ করে অন্য ঈশ্বরের পূজা করা বাতুলতা। লক্ষ লক্ষ দীন-দরিদ্রের প্রতিনিধি হয়ে রাজা-মহারাজাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন, সর্বত্র এই সর্বহারাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। তাদের জন্য কেঁদে আকুল হয়েছেন। বিবেকানন্দের স্পর্শকাতর মন দীন-দুঃখীর ব্যথায় স্থির থাকতে পারেনি। "আমার ভাই, আমার রক্ত" বলে স্বামীজী তাদের আলিঙ্গন জানালেন। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ঘুরে ঘুরে এদের সঙ্গে মিশেছেন, এদের দুঃখ অনুধাবন করেছেন। এখানেই বেদান্তবাদী, ব্রহ্মজ্ঞানী মুক্তপুরুষ সন্ন্যাসী ব্যবহারিক ভূমিতে নেমে মানুষ বিবেকানন্দ রূপে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন। জয় হল মানুষের।

শিবজ্ঞানে জীবের সেবা—শ্রীরামকৃষ্ণের এই দর্শনকে ব্যবহারিক জীবনে রূপ দিতে গেলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজের প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন-বোধে গড়ে উঠল বর্তমান যুগের নবীন ধর্মযজ্ঞ—যার নাম রামকৃষ্ণ মিশন। রুগ্ণ, আতুর, দরিদ্রের সেবাকেই মুক্তির একমাত্র পথ বলে ঘোষণা করলেন। জীবসেবাকে দেবসেবায় উন্নীত করলেন। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—নবীন ধর্ম-সঙ্ঘের লক্ষ্য। এক হাতে পূজা, অপর হাতে সেবার অপূর্ব সমন্বয়—এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য হিসাবে রূপ নেয়। একদিকে স্বার্থপর বাসনার ক্ষয়, অপর দিকে নিঃস্বার্থ প্রেমের বিস্তার—এই আদর্শ যাতে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘকে ধরে রাখতে পারে, মানুষ বিবেকানন্দের সেদিকে সদা সতর্ক দৃষ্টি। এইজন্য প্রয়োজন নিঃস্বার্থ প্রেমিক মানব-দরদী

যুবকের দল। উদাত্ত স্বরে সেই আহ্বানও জানাচ্ছেন, "মানুষ চাই, মানুষ চাই; আর সব হইয়া যাইবে। বীর্যবান্ সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবক আবশ্যক। এইরূপ একশত যুবক হইলে সমগ্র জগতের ভাবস্রোত ফিরাইয়া দেওয়া যায়।" আবার বলছেন, "আমাদের এখন এমন ধর্ম চাই, যাহা আমাদিগকে মানুষ করিতে পারে। আমাদের এমন সব মতবাদ আবশ্যক, যেগুলি আমাদিগকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলে। যাহাতে মানুষ গঠিত হয়, এমন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ শিক্ষার প্রয়োজন।"—বিবেকানন্দের এই আকুল আহ্বানের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি মনে পড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "আধুনিক কালের ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোন আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন, তোমাদের সকলের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি,—দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটা যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্রভাবে বিচিত্র ত্যাগে ফলছে। তাঁর বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েছে তখনি শক্তি দিয়েছে। সেই শক্তির পথ কেবল এক ঝোঁকা নয়, তা কোন দৈহিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত নয়, তা মানুষের প্রাণমনকে বিচিত্রভাবে প্রাণবান করেছে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যেসব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী, যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আঙুলকে নয়।"

রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে আমরা বুঝতে পারি বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের তরুণ সন্ন্যাসীদল কিভাবে মানুষের মনকে স্পর্শ করেছে। কারণ আর্ত-পীড়িতজনের সেবায় রামকৃষ্ণ মিশন আজ মানুষের কাছে আদর্শ স্থাপন করেছে। যেখানেই ঝড়-ঝঞ্ঝা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক অথবা আকস্মিক বিপর্যয় দেখা যায়, সেখানেই রামকৃষ্ণ মিশন সেবার হাত নিয়ে মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়। পীড়িতজনের সঙ্গে সমব্যথী, সমদুঃখী হয়ে তাদেরই সেবায় আত্মনিয়োগ করে। আবার অশিক্ষা, কুসংস্কার, দারিদ্র্য দূর করতেও রামকৃষ্ণ মিশনের উদার হস্ত সদা ব্যস্ত। কারণ এ যে মানুষ গড়ার ব্রত। এ যে নররূপী-নারায়ণ সেবার ব্রত। এই সেবার অপর নাম পূজা। এ-হেন সঙ্ঘের মূল কেন্দ্র বেলুড় মঠের পত্তন করেন স্বামী বিবেকানন্দ নিজহাতে। এজন্যে তাঁকে যে কিরূপ কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, সেকথা আজ আর কারও অজানা নেই। এরপরে কলকাতায় একবার প্লেগ রোগ মহামারী-রূপে দেখা দিলে, তখন এই নব-জাতক রামকৃষ্ণ মিশন প্লেগ রোগাক্রান্ত রোগীদের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। শিশু-সঙ্ঘে অর্থ কিছু নেই। কাজেই অর্থাভাবে কাজের গতি বাধা পায়। তখন যন্ত্রণাকাতর রোগীদের ব্যথায় পীড়িত বিবেকানন্দ এরূপ সিদ্ধান্তে আসতেও দ্বিধাবোধ করেননি যে, অর্থের প্রয়োজনে মঠের জন্য কেনা নতুন জমি বিক্রী করে দেবেন। কারণ, "সহস্র সহস্র ব্যক্তি আমাদের চোখের সামনে যন্ত্রণা ভোগ করবে, আর আমরা মঠ করব! আমরা সন্ন্যাসী, না হয় পূর্বের মতো আবার তরুতলে বাস করব, ভিক্ষান্নে উদর পূরণ করব; কিন্তু জনসেবা করে যাব।"—পরে অবশ্য জমি বিক্রী করতে হয়নি। কিন্তু জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে অসহায় রোগীদের সেবা বিবেকানন্দের পরিচালনায় হতে থাকল।

এইসব ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান, আদর-অভ্যর্থনা বিবেকানন্দের মনকে সেভাবে স্পর্শ করতে পারেনি যেমনভাবে উদ্বেল করেছে এই সাধারণ মানুষের ব্যথা-বেদনা-

অভাব। বিবেকানন্দের এই অপরিসীম হৃদয়ের প্রতি আলোকপাত করতে গিয়ে নিবেদিতা বলেছেন, "স্বর্গের দেবদূতের যিনি সেরা, সেই মাইকেল আর এক নিকৃষ্ট পাপী—এ দুজন যদি বিবেকানন্দের কাছে এসে হাজির হয়, তবে এটা নিঃসন্দেহ যে, তাঁর দৃষ্টি মাইকেলের ওপর না পড়ে সেই জঘন্য পাপী, সকলে যাকে ঘৃণা করে তার ওপরেই পড়বে।"—নিবেদিতার এই কথায় বিবেকানন্দের দরদীমনের সুন্দর ছবি ফুটে ওঠে। এই প্রেমিক মানুষটি মুঠো মুঠো করে প্রেম বিলিয়ে গেছেন সকলের জন্যে। সেই প্রেমপ্রবাহে প্লাবিত হয়েছে রাজপ্রাসাদ থেকে দরিদ্রের কুটির পর্যন্ত।

শিবজ্ঞানে জীবের সেবা—শ্রীরামকৃষ্ণের এই তত্ত্বের অনুরণন শুনতে পাওয়া যায় বেদান্তের সিদ্ধান্ত—"জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" যাঁরা ঈশ্বরকে ভালবাসেন তাঁরা মানুষকেও ভালবাসেন। কারণ জীব ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নয়, আবার জীব শিব ছাড়া কেউ নয়। যদিও এই অদ্বৈতবাদের ভিত্তির ওপরেই নর-নারায়ণ-সেবার ধর্ম প্রতিষ্ঠিত, তথাপি বিবেকানন্দের বিশাল হৃদয়ে, বটগাছের মতো মহীরুহের ছায়ায় তাপিত, পীড়িত মানুষ প্রকৃত মানুষের মর্যাদাই পেয়েছে। বেলুড় মঠে জমির কাজ করতে কিছু সাঁওতাল নরনারী আসত। এদের সঙ্গে বিবেকানন্দের সুখ-দুঃখের কথাবার্তা হত। বিবেকানন্দ তাদের কাজের সাথে আনন্দ দেওয়ার জন্য রঙ্গরসও করতেন। তাই সাঁওতাল মজুররা তাঁকে অতি কাছের মানুষ বলেই মনে করতেন। তাদেব মধ্যে একজনের নাম কেষ্ট—বিবেকানন্দ তাঁকে ডাকতেন, কেষ্টা। সেই কেষ্টা বিবেকানন্দকে বলত, "ওরে স্বামী বাপ, তুই আমাদের কাজের বেলা এখানে আসিস না, তোর সঙ্গে কথা বললে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যায়, পরে বুড়ো বাবা (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) এসে বকে।" কথা শুনে স্বামীজীর চোখ ছলছল করে উঠত আর বলতেন, "না, না, বুড়ো বাবা বকবে না; তুই তোদের দেশের দুটো কথা বল্।"—এই সাঁওতালদের স্বামীজী একদিন খাওয়াতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু সাঁওতালরা এই সন্ন্যাসীদের ছোঁয়া জিনিস খেতে ভয় পায় সমাজের শাসনের ভয়ে। অবশেষে ঠিক হয় যে, নুন বাদ দিয়ে রান্না-করা জিনিস খেলে দোষ হবে না তাদের সমাজের চোখে। স্বামীজী তাই লুচি, মেঠাই খাওয়ালেন পরিতোষ সহকারে। সাঁওতালরা পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে খুব খুশি। তখন স্বামীজী বলছেন, "তোরা যে নারায়ণ, আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হলো।"—স্বামীজী দরিদ্র-নারায়ণ-সেবার আদর্শ শুধু মুখে বলেননি, নিজে এভাবে মজুরদের সেবা করে সেটি বাস্তবে দেখিয়ে দিলেন। তাদের প্রকৃত বন্ধু, এমন সুহৃদ্ আর কে আছে? এই সব সরল মানুষদের জন্যেই স্বামীজীর প্রাণ কেঁদেছে সমস্ত জীবন ধরে। তাঁর এই দরদীমনের পরিচয় ছোট ছোট কথার মধ্যেও প্রকাশ পায়, "মানুষের মহত্বের কথা কখনও ভুলে যেও না।" সর্বশেষে আমাদের জন্যে মানুষ বিবেকানন্দ তাঁর উদাত্ত আহ্বান রেখে গেলেন—

"দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।
অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
দাও, দাও—যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান।"

'যেন ক্লাসিক ভাস্কর্যের রূপময় দেবতা'

॥অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী

প্রাবন্ধিক ও কবি। গবেষক—সায়েন্টিফিক্ অফিসার।

আমেরিকার ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের ইতিহাসখ্যাত কীর্তির পর বাংলাদেশের 'বঙ্গ-নিবাসী' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল: "···সেই নবীন নধর মূর্তি, সেই শিষ্ট বলিষ্ঠ গঠন, সেই স্বভাবসরল ভাষা; বিবেকানন্দের মূর্তি দর্শনে আমেরিকাবাসী মুগ্ধ।" যদিও একথা স্বীকার্য যে, "তাঁর দৈহিক সৌন্দর্যের তুলনায় বাণীর সৌন্দর্য অল্প ছিল না; বরং বেশী", তবু স্বামী বিবেকানন্দের অপরূপ শারীর সৌষ্ঠবও যে তাঁর প্রবাদতুল্য বিজয়সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি, সে-কথা বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না। বিবেকানন্দ যে-কথা বলেছিলেন এবং যে-রূপে শ্রোতৃদর্শকের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন—দুয়েরই সুনিশ্চিত অবদান ছিল তাঁর মন্ত্রমুগ্ধকর প্রভাববিস্তারের পিছনে। 'হিতবাদী' পত্রিকাটি লিখেছিল, "সেখানে তাঁহার বেশভূষা ও কথাবার্তায় আমেরিকার স্ত্রী-পুরুষ মহলে মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে।"

শিকাগোর সেই স্মরণীয় বক্তৃতামঞ্চে বিবেকানন্দের জয় ঘোষণার পরে তাঁকে নিয়ে দেশেবিদেশে যত বন্দনা উচ্চারিত হয়েছে তার এক উল্লেখযোগ্য অংশ তাঁর আবয়বিক সুষমার মুগ্ধ প্রশস্তিতে ভরপুর। এ-কথা তো অস্বীকার করা যাবে না যে, ওরকম দৈহিক সৌন্দর্যের অধিকারী মানুষের দিকে যে-কোন লোকই চোখ তুলে তাকাতে বাধ্য এবং তিনি যদি পাদপ্রদীপের আলোয় দাঁড়ান তাহলে তো সেই দৈহিক রূপকে অবহেলা করা আরও অসম্ভব। শুধু সাগরপারেই নয়, এদেশেও যাঁরা স্বামী বিবেকানন্দকে, কিংবা বলা ভাল—নরেন্দ্রনাথ দত্তকে আমেরিকা যাত্রার আগে পরে কখনও দেখেছেন, তাঁর পক্ষে ঐ মানুষটির চেহারা সম্পর্কে নীরব থাকা সম্ভব হয়নি।

তাঁর মুখমণ্ডলের বর্ণনায় কতরকম রূপকল্পই না কত লোক ব্যবহার করেছেন—তাঁর মুখাকৃতি, গাত্রবর্ণ, দাঁত, চুল, পোশাক সবই বারবার ভাষ্যকারদের বর্ণনার বিষয় হয়েছে। বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে তাঁর চোখের সৌন্দর্যের কথা, যা কারও ভাষায় 'ঘূর্ণায়মান', 'অতলস্পর্শী', 'জ্বলন্ত'; কারও ভাষায় 'গভীর রাত্রির নীলাকাশের মতো'। তাঁর কণ্ঠস্বরের সঙ্গীতময়তাও ধীর, শান্ত কোমলতা অনেকেরই উল্লেখনীয় মনে হয়েছে, কেউ তার মধ্যে দেখেছেন বজ্র ও অগ্নি। সামগ্রিক ভাবে তাঁর চেহারায় কেউ দেখেছেন বুদ্ধের ধ্রুপদী মহিমা, কেউ দেখেছেন 'চিরায়ত দেবমূর্তির রূপ', কেউ বা দেখেছেন 'ব্রোঞ্জমূর্তি'র সমাহিত সৌন্দর্য! তাঁর সুপুরুষ চেহারার আকর্ষণ ও মনোহারিত্ব নিয়ে বরঞ্চ কোন ভাষ্যকারেরই দ্বিমত নেই, তাঁর বক্তব্য বা কর্ম সম্পর্কে যদিও বা থেকে থাকে!

বিদেশের জনমঞ্চে উপস্থিত হবার আগে আমাদের দেশের যে-সব মানুষ বিবেকানন্দকে দেখেছিলেন, তাঁদের অনেকেই পরবর্তী যুগে তাঁদের স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করেছেন। সেখানে বিবেকানন্দের দেহসৌন্দর্যের বর্ণনার রূপটি দেখা যেতে পারে। স্বামীজীর কলেজ-জীবনের সহপাঠী, সতীশ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিবরণ থেকে ছাত্র নরেন্দ্রনাথ দত্তের যে শারীরিক বর্ণনা পাওয়া যায়, সেখানেও তাঁর চোখের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে

উল্লিখিত : "গলায় গম্ভীর ভারী আওয়াজ। সে-সময়ে দেখতে একহারা। চোখ দুটো চমৎকার। মুখ যেন মনস্বিতা দিয়ে মাজা। আরও বৈশিষ্ট্য, তাঁর মুখে হাসি দেখলে সবাই আমোদ-আহ্লাদ করবার অধিকার পেতেন, কিন্তু মুখে গাম্ভীর্য-মেঘ দেখলে কার বাবার সাধ্য কাছে এগোয়!" [স্বামীজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন—স্বামী নির্লেপানন্দ]

পরবর্তী কালের কথাসাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ('দাদামশাই') তরুণ বয়স থেকেই বিবেকানন্দকে চিনতেন। তিনিও উল্লেখ করেছেন : "তিনি যেমন সুপুরুষ, তেমনি সুবক্তা। তাঁকে দেখলে ও তাঁর কথা শুনলে মুগ্ধ না হয়ে কেউ পারতো না।"

ছাত্রজীবন শেষ করে নরেন্দ্রনাথ যখন মেট্রোপলিটান ইনস্টিট্যুশনের শিক্ষক, তখন থেকেই তাঁকে চিনতেন পরবর্তী যুগের সাহিত্যিক এবং নামকরা সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বামীজীর ধর্মপ্রচার অভিযানের পর সে ব্যাপারে উচ্ছ্বসিত না হয়েও পাঁচকড়ি অতীতের বিবেকানন্দ সম্পর্কে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার কথা লিখতে গিয়ে সে-সময়ে তাঁর সম্মোহনকারী চেহারা ও সর্বজয়ী কণ্ঠস্বরের কথা উল্লেখ করেন। [১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরির 'লাইট অব দি ইস্ট' পত্রিকার ইংরেজী অনুবাদ থেকে]

একই রকম মনোভাব দেখা যায় বিখ্যাত দেশহিতব্রতী 'ডন সোসাইটি'-খ্যাত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লেখায়। তাঁর 'লাইট অব দি ইস্ট' পত্রিকার জানুআরি, ১৮৯৪ সংখ্যায় তিনি বিবেকানন্দ সম্পর্কে পূর্বপরিচয়সূত্রে তাঁর ভালবাসার কথা উল্লেখ করে যা লেখেন, সেখানেও স্বামীজীর চোখের বর্ণনা মুখ্যস্থান অধিকার করেছে : "চমৎকার দীর্ঘ প্রশস্ত পুরুষ ; অপূর্ব সুন্দর মুখ যা মনস্বিতায় পূর্ণ, বৃহৎ উজ্জ্বল চক্ষু—প্রসন্ন স্থির প্রেমে ও স্নেহে তোমার প্রতি আনত ; বুদ্ধির প্রভায় ঝলমলে অবয়ব···তোমার প্রতি নিবদ্ধ তাঁর প্রদীপ্ত নয়নের দিকে যদি তাকাও, দেখবে তার মধ্যে আছে সংকল্পশক্তির আগ্নেয়গিরি, যা ঠিক পথ নিলে মাতৃভূমিতে অলৌকিক কাণ্ড ঘটাবে।···"

সন্ন্যাস গ্রহণ করে স্বামীজী যখন নানা নাম নিয়ে সারা ভারতে পরিব্রাজক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সে-সময়কার বর্ণনা পাওয়া যায়, পরবর্তী কালে বাল্যবিবাহরোধী 'সর্দা-আইন'-সূত্রে বিখ্যাত হরবিলাস সর্দার লেখায়। 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার ফেব্রুআরি ১৯৪৬ সংখ্যায় হরবিলাস সর্দার লেখা থেকে যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয় তাতেও স্বামীজীর "জ্যোতির্ময় বিশাল নয়নের" উল্লেখ ছিল।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে বেলগাঁওয়ে স্বামীজীকে দেখেন ফরেস্ট অফিসার হরিপদ মিত্র। 'স্বামীজীর সহিত দুই চারিদিন' রচনায় তাঁর সে-সময়কার চেহারার বর্ণনা হরিপদ মিত্র দিয়েছেন তাঁর চোখের বিশেষ উল্লেখ সহ : "···এক স্থূলকায় প্রসন্নবদন যুবা সন্ন্যাসী আমার পরিচিত জনৈক দেশীয় উকিলের সহিত আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ···দেখিলাম, প্রশান্ত মূর্তি, দুই চক্ষু হইতে যেন বিদ্যুতের আলো বাহির হইতেছে। গোঁপ দাড়ি কামানো, অঙ্গে গেরুয়া আলখাল্লা, পায়ে মহারাষ্ট্রীয় দেশের বাহানা চটিজুতা, মাথায় গেরুয়া কাপড়েরই পাগড়ি—সন্ন্যাসীর সে অপরূপ মূর্তি স্মরণ হইলে এখনো যেন তাঁহাকে চোখের সামনে দেখি।" ['স্বামীজীর কথা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত]

মাদ্রাজের 'থিয়সফিস্ট' পত্রিকার মার্চ (১৮৯৩) সংখ্যায় 'সচ্চিদানন্দ' নামে পরিচিত পরিব্রাজক বিবেকানন্দের যে-সংবাদ বের হয়,

সেখানে তাঁর "উন্নত সুঠাম অবয়ব এবং মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বে"-র উল্লেখ আছে। আর একটি স্থানীয় কাগজ 'ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মারে' এ-সময়কার স্বামীজীর বর্ণনা রয়েছে পরবর্তী কালে লিখিত এক সাংবাদিকের বিবরণে [২ ফেব্রুআরি ১৯৪৬]: "আমার পুরাতন অধ্যাপক সুন্দররাম তাঁকে ত্রিবান্দ্রমের পথে ক্লান্তপদে হাঁটতে দেখে ছিলেন। কাষায়বস্ত্র ভারতের সর্বত্র শ্রদ্ধা জাগায়, আতিথ্যদানের আগ্রহ উজ্জীবিত করে। তরুণ সন্ন্যাসীর চালচলন ও চেহারা দেখে অধ্যাপক চমৎকৃত। ··"

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে বিবেকানন্দের চেহারার আর এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়েছিলেন জি. জি. নরসিমাচার্য ৫-৯-১৮৯৪ তারিখের 'ইনডিয়ান মিরার' কাগজে। এখানেও বিশেষ ভাবে রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ চক্ষু-সৌন্দর্যের বর্ণনা: "স্বামীজীর দৈহিক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ভারতীয় ও আমেরিকান পত্র-পত্রিকায় অনেক কিছু লেখা হয়েছে। সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। কিন্তু একটা জিনিস যোগ করে দিতে পারি। তাঁর শান্ত স্নিগ্ধ মুখের দিকে তাকালে প্রথমেই যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল তাঁর দু'টি চোখ—বিশাল এবং চমকপ্রদ, যখনই তিনি কোন বিষয়ে উদ্দীপিত হয়ে ওঠেন, তখনই যেন চোখ দু'টো অপূর্ব জ্যোতিবিচ্ছুরণ করে ঘুরতে থাকে।" তাঁর চোখের সমকালীন একই রকম বর্ণনা 'জনৈক শিষ্য' লিখিত এক বিবরণে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম-বাদিন্ পত্রিকার নভেম্বর আর ডিসেম্বর (১৯০৬) এই দু-সংখ্যায় প্রকাশিত এই বিবরণে বিবেকানন্দের "উজ্জ্বল সহাস্য আনন" ও "অপরূপ জ্যোতি-বিচ্ছুরিত সঞ্চরণশীল নয়নের" উল্লেখ রয়েছে।

এযাবৎ সঙ্কলিত সমস্ত বর্ণনাই ধর্মমহাসভা-পূর্ব বিবেকানন্দের; দেখা যায়, ভারতে ইতিপূর্বেই নানাজন তাঁর অপূর্ব দৈহিক রূপ ও ব্যক্তিত্বে আকর্ষিত হয়েছিলেন, বিদেশের ঘটনা যার পুনরাবৃত্তি মাত্র। এক্ষেত্রে বিদেশীরা নূতন করে কিছু আবিষ্কার করেননি। শিকাগোর ধর্ম-মহাসভামঞ্চে দাঁড়াবার আগেই যে-সব আমেরিকান স্বামীজীকে দেখেছিলেন তাঁদের অগ্রগণ্যা শ্রীমতী হেলের বর্ণনা: "অপরূপ—জমকালো দৃশ্য তিনি। মাথা খাড়া রাখার অপূর্ব-ভঙ্গী, প্রাচ্যরীতিতে অসাধারণ সুদর্শন—বয়সে ত্রিশ, সভ্যতায় সুপ্রাচীন।" শ্রীমতী হেলের চোখে "দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত আনন, তাঁর বাণীতে যজ্ঞাগ্নি, তাঁর অবস্থিতিতে সৌষম্য ও পবিত্রতার পরিবেশ।" এর পরের ইতিহাস জনসভার ও সমাবেশের, আলোকিত মঞ্চের—যেখানে বিবেকানন্দ-মূর্তি দেখে অনায়াসে বলা যেত—"বালকবীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়!"

শিকাগোর ঐতিহাসিক ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের উপস্থিতির যে-সব বিবরণ পাওয়া গেছে তার মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত বোধ হয় অ্যানি বেশান্তের রচনা—যিনি বিদেশী হয়েও ভারতের সঙ্গে পূর্ব থেকেই ছিলেন বিশেষ সম্পর্কের নিগড়ে বাঁধা। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে শিকাগোর সেই মহাসভায় দর্শকরূপে তিনি শুধু বিবেকানন্দকে দেখেননি, অপরূপ ভাষায় তাঁর বর্ণনাও দিয়েছেন। 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার মার্চ-এপ্রিল, ১৯১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর লেখায় স্বামীজীর দেহ-সৌন্দর্যের বর্ণনা: "···শিকাগোর ভারী আবহাওয়ার মধ্যে জ্বলন্ত ভারতীয় সূর্য, সিংহতুল্য গ্রীবা ও মস্তক, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, স্পন্দিত ওষ্ঠ, চকিত দ্রুতগতি, কমলা ও হলুদ রঙের পোশাকে পরমাশ্চর্য ব্যক্তিত্ব। ···সন্ন্যাসী—তাঁর পরিচয়? নিশ্চয়ই। কিন্তু সৈনিক সন্ন্যাসী। প্রথম দর্শনে বরং সন্ন্যাসীর চেয়ে সৈনিকই বেশি

মনে হয়—মঞ্চ থেকে এখন নেমে এসেছেন—দেশ ও জাতির গর্ব ফুটে আছে দেহের রেখায় রেখায়। …প্রাণবন্ত শক্তিধর, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে স্থির স্বামী বিবেকানন্দ পুরুষের মধ্যে পুরুষ—নিজেকে উত্তোলিত করবার সামর্থ্যসম্পন্ন পুরুষ।…"

অ্যানি বেশান্তের এই কাব্যিক বর্ণনার পাশে রাখা যায় আমেরিকার আরও দুজন কবি-সাহিত্যিকের বিবরণ, যাঁরা বেশান্তের মতোই ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দের অভ্যুদয়ের চাক্ষুষ সাক্ষী ছিলেন এবং মেরী লুই বার্কের 'স্বামী বিবেকানন্দ ইন আমেরিকা : নিউ ডিসকভারিজ' গ্রন্থে যা সংকলিত হয়েছে। কবি হ্যারিয়েট মনরোর মুগ্ধতার প্রকাশ এরকম : "কমলা রঙের পোশাক-পরা নিখুঁত ইংরেজীতে কথা বলা সুদর্শন সন্ন্যাসীই আমাদের সর্বোত্তম আকর্ষণ ছিলেন। তাঁর প্রচণ্ড ও বৈদ্যুতিক ব্যক্তিত্ব, ব্রোঞ্জের ঘণ্টাধ্বনির মতো ঐশ্বর্যময় কণ্ঠস্বর, তাঁর সংযত আবেগের অন্তর্লীন প্রবলতা…সব কিছু মিলে চরম অনুভূতির এক নিখুঁত বিরল মুহূর্ত আমাদের এনে দিল।" আর লেখিকা লুসি মনরোর ভাষায় : "হলদে ও কমলা রঙের চিত্রবৎ পোশাকের পটভূমিতে সংস্থাপিত তাঁর সুদৃঢ় বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, সেই মুখ থেকে উচ্চারিত ঐশ্বর্যপূর্ণ ও সঙ্গীতময় বাণীর চেয়ে কম আকর্ষণীয় ছিল না।"

ধর্মমহাসভায় উপস্থিত ইংরেজ ধর্মযাজক এইচ. আর. হাউইস 'বর্ণময়-পোশাক পরিহিত' "জনপ্রিয় হিন্দু সন্ন্যাসী" বিবেকানন্দের মুখাবয়বের সঙ্গে "বুদ্ধের ক্লাসিক মুখের অদ্ভুত সাদৃশ্য" দেখেছিলেন এবং তাঁর এই বর্ণনা ভারতীয় সংবাদপত্রেও পুনরুল্লিখিত হয়েছে। [সম্পাদকীয় 'হিন্দু' ২৩-১২-১৮৯৭]

বস্টনের 'ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট' পত্রিকার সংবাদদাতা ধর্মমহাসভার যে বিবরণ দেন সেটি 'টাইমস অব্ ইনডিয়া' (৪ নভেম্বর ১৮৯৩), 'স্টেটসম্যান' (৯ নভেম্বর), 'ইনডিয়ান মিরার' (১১ নভেম্বর), 'হিন্দু' (১৭ নভেম্বর) প্রভৃতি পত্রিকায় পুনঃ প্রকাশিত হয়। সেখানে ধর্মমহাসভার সভাপতির অফিস-ঘরে উপস্থিত বিবেকানন্দের বর্ণনা এবম্প্রকার : "…এই অন্দর-কক্ষের সবচেয়ে চমক লাগানো চেহারা ব্রাহ্মণ সাধু বিবেকানন্দের। তাঁর বৃহৎ সুগঠিত আকার, অসাধারণ সুন্দর দেহভঙ্গী, চৌকস ধরনের পরিষ্কার কামানো মুখের সুঠাম সৌন্দর্য, শুভ্র দন্তপংক্তি, সুবিন্যস্ত অধরোষ্ঠ—কথা বলার সময় প্রায়ই যা সদয় হাসিতে বিস্ফারিত হয়, স্কন্ধোস্থিত মনোহারী মস্তক কমলা বা রক্তবর্ণ পাগড়িতে মণ্ডিত, নিম্নজানু পর্যন্ত লম্বিত উজ্জ্বল কমলা বা রক্তবর্ণের আলখাল্লা কোমরবন্ধনীতে বাঁধা।…"

ধর্মমহাসভার ঘটনাবলীর বিবরণ যে-সব পত্রপত্রিকা সরবরাহ করেছিল তাদের প্রায় কেউই স্বামী বিবেকানন্দের আকর্ষক চেহারাকে উপেক্ষা করতে পারেননি। এ-সব পত্রপত্রিকার মন্তব্য 'ইণ্ডিয়ান মিরার', 'হিন্দু', 'ইনডিয়ান নেশান' প্রভৃতি ভারতীয় কাগজে আবার উদ্ধৃত হয়েছিল। মার্কিন পত্রিকা 'প্রেস' "অধ্যাপক বিবেকানন্দের মনোহারী চেহারা" ও তাঁর "পীতাভ মুখে মনস্বিতার দীপ্তি"-র কথা উল্লেখ করেছে। 'ন্যুয়র্ক ক্রিটিক' লিখেছিল তাঁর "সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত মুখ" আর "গম্ভীর সঙ্গীতময় কণ্ঠস্বরের" কথা আর 'বে-সিটি ট্রিবিউন' স্বামীজীর দেহ-সৌন্দর্যের সংখ্যাতত্ত্বও উপস্থিত করেছিল : "বিবেকানন্দের চমকপ্রদ চেহারা, প্রায় ৬ ফুট লম্বা, ওজন নিশ্চয় ১৮০ পাউণ্ড, অনবদ্য দেহ-সৌষ্ঠব। গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল অলিভ, সুন্দর কৃষ্ণ কেশ, পরিষ্কার কামানো মুখ, তাঁর কণ্ঠস্বর

কোমল এবং সুনিয়মিত।…"

ব্রুকলিন স্ট্যানডার্ডের বিবেকানন্দ বর্ণনায় কিছু অংশ: "গতরাত্রে যখন তিনি মঞ্চে দাঁড়িয়েছিলেন, পরনে উজ্জ্বল লোহিত চিত্রবৎ সুন্দর আলখাল্লা, বহু ভাঁজ-করা কমলা রঙের পাগড়ির তলায় দু-একটি ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ, শ্যামল মুখে দ্যুতিময় চিন্তার অভিব্যক্তি, বিশাল বাঙ্ময় চক্ষু প্রফেটের উন্মাদনায় জ্যোতির্ময়, স্পন্দিত মুখ থেকে উৎসারিত গভীর সঙ্গীতময় স্বরে, প্রায় নিখুঁত ইংরেজীতে শোনালেন প্রেম সহানুভূতি আর সহিষ্ণুতার বাণী।"

স্বামীজীর পোশাক 'হার্ট ফোর্ডস ডেইলি টাইম্‌সে'রও বিশেষ উল্লেখের বিষয়: "তাঁর লাল রঙের দীর্ঘ আলখাল্লা, হলুদ রঙের পাগড়ি, প্রাচ্যদেশীয় রূপময় মুখমণ্ডল এক অপূর্ব চিত্রের মতো শ্রোতাদের নয়নকে…মোহিত করে রেখেছিল স্বামীজীর মুখমণ্ডলে, সবিশেষ তাঁর চোখে প্রাচ্যের সৌন্দর্যসৌষ্ঠব দেখেছিল 'রাদারফোর্ড আমেরিকান' নামক পত্রিকাটিও: "অপূর্ব চিত্রবৎ আকৃতি নিয়ে তিনি বক্তৃতা করতে উঠেছিলেন।…তাঁর সুঠাম অঙ্গ, স্ফুরিত ওষ্ঠ, মুখনিঃসৃত বাণীতে সংস্কৃতির প্রবাহ। চক্ষু বৃহৎ এবং ঘনকৃষ্ণ, যখন অব্যস্ত, তখন সে চক্ষে প্রাচ্যের মন্থর মেদুরতা, কিন্তু যখনই উচ্চভাবনার সংক্রমণ ঘটে তৎক্ষণাৎ ঐকান্তিক মনঃশক্তির সঞ্চরমান আলোকে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। কণ্ঠস্বর মৃদুকোমল, তাতে আশ্চর্যজনক সঙ্গীতময় তরঙ্গতরলতা।…"

'ফ্রেনোলজিকাল জার্নালে' এডগার সি বীল নামে একজন এম. ডি.-র রচনায় অনেক টেকনিক্যাল শব্দসহ "দেহে মনে সুসমন্বিত" স্বামী বিবেকানন্দের শরীরের নানা অংশের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছিল কিভাবে তিনি "আর্যজাতির উৎকৃষ্ট প্রতিনিধি"। এই প্রবন্ধ ভারতের পত্রপত্রিকায় বহুলভাবে উল্লিখিত হয়েছিল এই সংবাদ শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু আমাদের জানিয়েছেন।

'ন্যুয়র্ক হেরাল্ড' নামে একটি পত্রিকায় স্বামীজীর চেহারার বর্ণনা: "স্বামীজীর ছবি থেকে তাঁর ব্যক্তিত্বের অনেকটা আন্দাজ পাওয়া যায়। বর্ণ কৃষ্ণ, উচ্চতা সাধারণের চেয়ে বেশি, ভারি গড়ন। ভাবভঙ্গী নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক; এবং প্রচুর তাঁর ব্যক্তিত্বের চৌম্বকশক্তি।"

শিকাগোর ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর ঐতিহাসিক ভাষণের প্রথম দিনটির পরও আমেরিকার নানা শহরে তিনি যে-সব বক্তৃতা করেন তার বিবরণীতেও ছড়িয়ে আছে তাঁর দেহসৌন্দর্যের প্রশস্তি। 'মেমফিস কমার্শিয়াল' লেখে: "বিবেকানন্দের চমকপ্রদ ব্যক্তিত্ব। বর্ণ কৃষ্ণ তথাপি তাঁর মনীষাদীপ্ত ললাট, বৃহৎ সুন্দর চক্ষু, কৃষ্ণ কেশ, স্বচ্ছন্দ কমনীয় আচরণ এবং সুগঠিত অবয়ব ও উন্নত ভঙ্গীর জন্য তিনি যথার্থ সুপুরুষ।" অন্যত্রও কাগজটি "মানুষটির পরম সুন্দর শারীরিক ব্যক্তিত্ব, অতি সুগঠিত, ভারসাম্যযুক্ত ব্রোঞ্জ-মূর্তির আকারের" বর্ণনা দিয়েছে। 'অ্যাপীল অ্যাভালাঞ্চ' নামক পত্রিকার মতে "মনোহর, বুদ্ধির আলোকদীপ্ত, প্রাণস্পন্দিত তাঁর মুখ হলদে রঙের পটভূমিকায় স্থাপিত তাঁর গভীর সঙ্গীতময় কণ্ঠস্বর অবিলম্বে অপরকে আকর্ষণ করে পক্ষপাতী করে তোলে।"

স্বামীজীর চেহারার মধ্যে তাঁর চোখের বৈশিষ্ট্য 'ডেট্রইট ফ্রি প্রেস'-ও লক্ষ্য করেছে: "…মধ্যম আকারের মানুষ তিনি, স্বজাতিসুলভ কৃষ্ণবর্ণ, ব্যবহারে অতি ভদ্র। পদক্ষেপে সুনির্দিষ্ট এবং কথাবার্তা ও হাবভাবে অতিশালীন। তাঁর চেহারার মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় তাঁর চোখ—অপূর্ব।…কণ্ঠস্বর আনন্দদায়কভাবে স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন এবং সুনিয়ন্ত্রিত।"

বিবেকানন্দকে দেখা ও তাঁর কথা শোনা একটা পরম সুযোগ ও সৌভাগ্য সে-কথা জানিয়ে 'নর্দাম্পটন ডেইলি হেরাল্ড' ১৬ এপ্রিল (১৮৯৪) লিখেছিল স্বামীজীর গলার স্বর সম্পর্কে: "ধীর কোমল শান্ত অনুত্তেজিত সঙ্গীতময় কণ্ঠস্বর, যার মধ্যে ধৃত হয়ে আছে প্রচণ্ডতম নির্ঘোষের শক্তি ও অগ্নি, সে-কণ্ঠ সরাসরি প্রবেশ করে যায় লক্ষ্যবস্তুতে।…" আবার 'বাল্টিমোর আমেরিকানে'র পাতায় (১২ অক্টোবর) স্বামীজীর শারীর সৌষ্ঠব সম্পর্কে সংখ্যাতাত্ত্বিক অনুমান: "চিত্রপটে অঙ্কিত আকারের মতো বিবেকানন্দের চেহারা। সাড়ে পাঁচফুটের মতো দৈর্ঘ্য, ভারি গড়ন, ওজন হবে ২১০ পাউণ্ড। গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ, কিন্তু তার একটা নিজস্ব আভা আছে, যা এশীয়দের বর্ণের বৈশিষ্ট্য। মুখ গোল, মাংসল এবং মাথায় রাশিরাশি ঘন কালো চুলের ঐশ্বর্য। ঐ ঢেউ খেলানো চুল কপালে লুটিয়ে পড়ে, এমনকি চোখের পাতা পর্যন্ত এসে যায়। চোখ, চুলের মতোই কৃষ্ণ, উজ্জ্বল, জ্বলন্ত। যখন হাসেন তখন নিখুঁত দাঁতের সারি দেখা যায়। চেহারা যেমন সুদর্শন তেমনই চমকপ্রদ।…"

'সানডে হেরাল্ড' কাগজটি ১৪ অক্টোবর সংখ্যায় "উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ সাধু" (এ ভুল অনেক মার্কিন পত্রিকাই করেছিল) বিবেকানন্দের পোশাক ও চেহারার নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছিল: "গতকাল বিকেলে হোটেল রেনার্টের প্রধান লবিতে গেরুয়া রঙের ড্রেসিং গাউন পরে…এক ভদ্রলোক বসে ছিলেন। তাঁর কৃষ্ণবর্ণ মুখ, তাতে রহস্যময় মর্যাদা। মুখের প্রান্তরেখায় একাধারে মনন ও আবেগের মিশ্রণ। ঘন অলিভ রঙের ত্বক, বিশাল চোখ কালো এবং দীপ্তিময়, মাথার চুল রাতের আকাশের মতো এবং ললাট মুখ-বিজ্ঞানীদের চর্চার যোগ্য। সব মিলিয়ে তাঁর মস্তক ও মুখমণ্ডল, যারা ফ্রেনোলজির চর্চা করে, তাদের সানন্দ গবেষণার বিষয়বস্তু হবে।"

এ-সব মার্কিন পত্রপত্রিকার মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া ভারতের সমকালীন সংবাদপত্রেও দেখা যায়। 'ইনডিয়ান মিরার' (৬-১২-১৮৯৩) স্বামীজীর চোখের বিশেষ উল্লেখ সহ তাঁর আমেরিকাবিজয়ের বর্ণনা দিয়েছেন: "সকল দর্শকের চক্ষু একটি মূর্তিতে আটকে ছিল, ভারতের একমাত্র যথার্থ প্রতিনিধির মূর্তিতে, যেখানে তিনি গেছেন, সেখানেই জয় করেছেন, সেই স্বামী বিবেকানন্দ, সন্ন্যাসীর বেশে আবির্ভূত, সুন্দর সুঠাম আকৃতি …আর চক্ষু—বৃহৎ অত্যুজ্জ্বল হীরকখণ্ডের মতো। মহিলারা পর্যন্ত এই বহিরঙ্গ আকারের আকর্ষণী-শক্তিকে স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি যখন কথা বলেন, খোলস থেকে বেরিয়ে আসে ভিতরের মানুষটি, দেখা যায় শক্তি এখানে বহু গুণিত…।"

'বঙ্গনিবাসী' কাগজটির এ-বিষয়ে প্রতিক্রিয়ার কিছুটা আমরা শুরুতেই উদ্ধার করেছি। আরও কিছু: "…আমেরিকার পত্রিকাসকল তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'আজ সমবেত সভ্যমণ্ডলীর মধ্যে মহাপুরুষ বিবেকানন্দের মূর্তিই চিত্তাকর্ষক। তাঁহার পরিণত দেহ দিব্য বলব্যঞ্জক। তাঁহার কৃষ্ণ চক্ষুতে যেন সরলতা মাখা আছে।'…"

আমেরিকার নানা জায়গায় বক্তৃতারত স্বামী বিবেকানন্দের ছবি ধরা আছে সংবাদপত্রের বিবরণ ছাড়াও নানা মানুষের স্মৃতিতে। মেরি ফাঙ্কির নাট্যরসাত্মক বর্ণনা: "তিনি মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছেন! রাজকীয় মহিমান্বিত আকৃতি, তেজ-পূর্ণ, প্রভাবশালী, শক্তিশালী! অপূর্ব কণ্ঠের প্রথম শব্দ ধ্বনিত হল। আ-হা, অপূর্ব কণ্ঠ, সঙ্গীত, শুধু সঙ্গীত বুঝি এখন ইয়োলিয়ান বীণার মৃদু বিষণ্ণ সুর, তারপরই স্পন্দিত ধ্বনিতরঙ্গ—আ-হা! চুপ, চারিদিকে গহন নীরবতা, সে এমন নিথরতা যাকে হয়তো স্পর্শ করা যায়—বিশাল

জনমণ্ডলীর বুক উঠছে পড়ছে কেবল একটি শ্বাসে।”

মেরি ফান্কির এই বর্ণনার সাথে তুলনীয় সিস্টার দেবমাতার স্মৃতিচিত্রণ,—এখানেও স্বামীজীর কণ্ঠস্বরের উদাত্ত অলৌকিকতার মুগ্ধ বন্দনা: “সহসা শ্‌-শ্‌-শ্‌—চুপ! শান্ত পদক্ষেপে বিবেকানন্দ এগিয়ে এসেছেন, মর্যাদায় উন্নত আকার নিয়ে মধ্যবর্তী সিঁড়ির উপর দিয়ে উঠে মঞ্চে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। এইবার আরম্ভ করলেন—আর বিগলিত হয়ে গেল স্মৃতি, স্থান, কাল পাত্র সমস্তই। কিছু নেই, শুধু শূন্যের মধ্যে ধ্বনিত কণ্ঠস্বর! মনে হল যেন আমার সামনে দ্বার খুলে গেছে, আমি তার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছি কোন্ অসীম লক্ষ্যে।... ঐ তিনি দাঁড়িয়ে আছেন—অনন্তের দিব্য দিশারী।”

১৮৯৩ থেকে ১৮৯৫ পর্যন্ত মার্কিন দেশে স্বামীজীর রূপবর্ণনার বিভিন্ন অংশ শ্রীমতী বার্কের গ্রন্থে চয়িত হয়েছে, তা থেকে আরও দুজন মানুষের বর্ণনা এখানে হাজির করা যায়। খ্যাতকীর্তি ভাস্কর মালভিনা হফম্যানের শিল্প-দৃষ্টিতে বিবেকানন্দের দেহভাস্কর্যের বর্ণনা: “...ডাইনিং রুমে তিনি প্রবেশ করা মাত্র হঠাৎ স্তব্ধতা। বিরাট পাগড়ি ও পোশাকের হালকা রঙের পটভূমিকায় তাঁর সঘন ব্রোঞ্জবর্ণ মুখ এবং হাত।...তাঁর কৃষ্ণ নয়ন আশেপাশে যেন দৃকপাতও করলো না। কিন্তু ঐ চোখে এমন একটা অন্তর্লীন শান্তি ও শক্তি ছিল যে, গাঢ় দাগ টেনে গেল মনে। যথার্থ ব্রহ্মবাদী আচার্যের সব রহস্যময়তা ও সুদূরতাই তাঁর দেহাধারে অভিব্যক্ত।...”

আর কন্‌স্ট্যান্স টনির কাছে বিবেকানন্দ প্রতিভাত হয়েছেন জীবন্ত ভাস্কর্যরূপে: “তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল, যেন ক্লাসিক ভাস্কর্যের রূপময় দেবতা! গায়ের রঙ অবশ্যই কৃষ্ণ, আর চোখ! যেন মনে হয় মধ্যরাত্রির নীলাকাশ!”

এই সব প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনার শেষে আমরা উপস্থিত করছি এমন একজন বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিকের রচনাংশ, যিনি স্বামী বিবেকানন্দকে কখনও চর্মচক্ষে দেখেননি। তাঁর ছবি নিশ্চয়ই দেখেছিলেন এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণও হয়তো পড়েছিলেন। রোমাঁ রোলাঁ স্বামীজীর অপূর্ব চোখের এরকম বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর অপরূপ ভাষায়: “...তাঁর চোখ দেখলে প্রাচীন সাহিত্যের সেই পদ্মপলাশের উপমা মনে পড়তো। বুদ্ধিতে, ব্যঞ্জনায় প্রখর ছিল সে চোখ, ভাবাবেগে ছিল তন্ময়, চেতনার গভীরে তা অবলীলায় অবগাহন করত—রোষে হয়ে উঠত অগ্নিবর্ষী; সে-দৃষ্টির ইন্দ্রজাল থেকে কারও অব্যাহতি ছিল না।”

আকর সূত্র:

রোমাঁ রোলাঁর বিবেকানন্দ জীবনী [ঋষি দাশ অনূদিত ১৯৬৩]; শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', প্রথম খণ্ড [প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৫]

প্যারিস পেরিয়ে

ডক্টর অমিয়কুমার হাটি

[ফাল্গুন, ১৩৯১ সংখ্যার পর]

আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে বিশাল দুর্গের বিকট দরজা খুলে গেল একসময় ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করতে করতে। ভিতরে বেশ বড় একটা উঠান। দুর্গের ভিতরের একটা দেওয়ালের সারা গা বেয়ে উঠেছে লতানে গাছ—জালের মতো জুড়ে রয়েছে সারাটা দেওয়াল—লাল আর সবুজ পাতা ঝুলছে কয়েকটা—মনে হয়েছিল প্লাস্টিকের, কিন্তু আসল। উঠানে সার দিয়ে ৮টা বিশাল মশাল জ্বলছে হা হা করে।

ভিতরে একটা ছোট গোছের মিউজিয়াম আছে। ছেঁড়া কাগজপত্র, ঐতিহাসিক কিছু দলিল দস্তাবেজ, নকশা-করা কাঁথা, দিল্লী ও চীন সহ নানা জায়গার কিছু শিল্পকলা, ছবি, ফটো, পাথর, পুরানো পুথি এসব আছে।

আজকের খানাপিনাও রাজসিক—কয়েকটা হলঘর জুড়ে। এদিক দিয়ে, বলতেই হয়, আতিথেয়তার কোন তুলনা নেই। এটাও একেবারে বাঙালী কায়দা। চর্ব-চুষ্য-লেহ্য-পেয়। এখানে একরকম সরু মিহিদানার মতো চাল—তারই পোলাও মতো একটি পদ হয়েছিল। বলল তো সবাই তাই—চেখে ঠিক বুঝলাম না—এমনকি সত্যিই চাল কিনা কে জানে! মাছও খেলাম, তবে চিংড়ি ছাড়া কি মাছ—বোঝা গেল না। একটা বড়ার মতো জিনিস—ভিতরে বোধ হয় মাছের পুর ছিল—ভাল লাগল। নানারকমের কেক এবং সবশেষে চীজ—এটা বোধ হয় ফরাসী বিশেষত্ব। আতিথেয়তায় জলুস যেমন আছে, তেমনি প্রাণও আছে। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দুবেলা খাবারদাবারের এতো বিরাট আয়োজন এখন আর তেমন থাকে না, কেমন যেন ব্যবসাভিত্তিক হয়ে উঠছে বলে মনে হয়। এদিক দিয়ে অ্যানেসি নিশ্চয়ই একটি অনবদ্য ব্যতিক্রম যা অন্তরে গেঁথে রাখার মতো। খাওয়া-দাওয়া শেষ। দুর্গের উঠানে এখন ছোট ছোট জটলা। রাত বাড়ছে। হিমঝরা রাত। বন্ধুত্বের পরিধিও বাড়ছে। আলাপ হচ্ছে এর ওর সঙ্গে, কেউ কেউ খুবই নামজাদা, কেউ-বা উঠতি, কেউ বা তরুণ বৈজ্ঞানিক। রাত হিমঝরা হলেও আন্তরিকতায় উষ্ণ। অথচ কেমন যেন বিষাদ করুণ। ধরতে গেলে আজকের রাতই শেষ মিলন রাত। কাল দুপুর থেকে মেলা ভাঙার খেলা। বিদায়ের বিষণ্ণ সুর যেন গুমরে গুমরে উঠছে ব্যাণ্ডের বাজনায়, ককিয়ে ককিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে দুর্গ ছাড়িয়ে কাছে—দূরে অ্যানেসির পাহাড়—হ্রদে বিউগল-এর মূর্ছনায়। লেলিহান জ্বলছে একই রকমভাবে শুধু মশালগুলো, এও যেন কান্নার বহ্ন্যুৎসব—দুর্গ থেকে বেরিয়ে গেলেই নিভে যাবে। নিঝুম, নিথর হয়ে যাবে, ফিরে যাবে আবার যেন অতীতে। মশালের আলো ছাড়া আর কোন আলো নেই, কাজেই আলো-আঁধারী। তাতে কখন কখন মশালের মতো আমাদের ছায়াও কাঁপছে দুলছে। এদেশের ব্যাণ্ড-বাজনার নাম জগৎ-জোড়া। বিউগল বাজাচ্ছিলেন যাঁরা, সুদৃশ্য পোশাক পরে, তাঁরা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। দেখাই যায় না কারুকে কারুকে, কোন্ কোথায়, কোন্ পাথরের থামের ফাঁকে, কোন্ ঝোপে লুকিয়ে। আর তাঁদের দৃপ্ত পদচারণা নেই, সরব সদম্ভ ঘোষণা নেই,—বিউগলের বাঁশিতে কেমন ক্লান্তি, একদিক থেকে আরেকদিকে যখন বিউগল বাজাতে বাজাতে যাচ্ছেন, তখন যেন শ্রান্ত পা টেনে টেনে চলছেন। যেখানে যত ব্যাণ্ড-বাজনা

শুনেছি, আজ রাতের সঙ্গে তার কোন তুলনাই চলতে পারে না। হৃদয়-নিংড়ানো সেই সুর মনে পড়েই মাঝে মাঝে, কেমন উতলা করে তোলে, সেই পরিবেশ তৎক্ষণাৎ জীবন্ত হয়ে ওঠে, সেই রাত তার ব্যগ্র বাহু মেলে যেন ফিরে পেতে চায় আমাদেরও। বিদায় জানানোর ফরাসী কায়দার মধ্যেও কোথাও যেন বাঙালী আদল লুকিয়ে রয়েছে—মনে রাখি, মনে রেখো, এই যেন তার বাণী!

সব দেশের লোকেরই অতীতের উপর দুর্বলতা বুঝি মজ্জাগত। ফরাসীদের কি কিছু বেশি? বাঙালীদের মতো? হ্রদের ধারে এক বিশাল নির্জন বাগানবাড়িতে গত রাতের ভোজ এবং পাথুরে দুর্গের অন্তঃপুরে আজ রাতের আয়োজন একথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অতীতের ফ্রান্সকে দেখার এ-যেন এক কাব্যিক আয়োজন। আমার তো কেমন শিরশিরানি অনুভূতি জাগছিল। রচিত হয়েছিল একটা স্বপ্নময় আবেশ।

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ দুর্গের ফটক থেকে বাস ছাড়ল। মিনিট ১৫।২০-র মধ্যে পৌঁছে গেলাম হোটেল নোভেল।

হোটেলে একা-একটা ঘরে ভাল লাগছিল না। ডাঃ মোজেস্বির ঘরে তাই চলে এসেছি। গল্প গুজব করা যাবে, একঘেয়েমি কাটবে। তবে আজ চোখ ভেঙে নেমে এল ঘুম। রাতে বোধ হয় ডাঃ মোজেস্বির শরীর খারাপ হয়েছিল। বমিটমি। কিন্তু অতি সন্তর্পণে বাথরুমে গেলেন। উঠতে যাচ্ছিলাম। নিষেধ করলেন। রাত তখন কত কে জানে!

৭

সম্মেলনের শেষ দিন আজ। ভাঙাহাট। ইচ্ছে ছিল সকালের কোন ট্রেনে উঠে পড়ব, তাড়াতাড়ি পৌঁছাব প্যারিস। সাতসকালে তাই প্রাতরাশ সারলাম, হোটেলের পালা চুকোলাম, বিদায় নিলাম সম্মেলনের সম্পাদকের কাছ থেকে। অ্যানেসি স্টেশনে এসে সকালের সেরকম কোন ট্রেন দেখলাম না। ট্রেন বদল করে যাওয়া যায়, তবে ওগুলো অত দ্রুতগামী ট্রেন নয়। পৌঁছুবে একই সময়ে, পরের দ্রুতগামী টি জি ভি ট্রেনের সঙ্গেই প্রায়। কাজেই কী হবে বেশি ওঠানামা করে? টিকিট কাউন্টারে এসেও জানতে চাইলাম। হালকা ধরনের কিছু একটা সুর বাজছিল স্টেশনে। রেলের তরুণ কর্মীটিও উপদেশ দিলেন বসে থাকতে, খারাপ লাগলে বাজনা শুনতে মনোযোগ দিয়ে।

কিন্তু মনঃসংযোগ করতে পারছিলাম কই? আজকের রাতে কোথায় আশ্রয় নেব, সেই চিন্তাই বারবার এসে উঁকি মারছিল মনের মধ্যে। আমার পরম সৌভাগ্য, শ্রদ্ধেয় স্বামী অজজা-নন্দজী নিজে আমার হয়ে বলেছিলেন শ্রদ্ধেয় স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর কাছে, এবং স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী একটি চিঠি দিয়েছিলেন প্যারিসের উপকণ্ঠে গ্রেট্‌জ-এ রামকৃষ্ণ মিশনের যে বিশাল কেন্দ্র আছে, তার অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় ঋতজানন্দ মহারাজজীকে। কিন্তু প্যারিস পৌঁছুতে তো প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যাবে। প্যারিস থেকে কতদূরে গ্রেট্‌জ, কিভাবে যেতে হবে, কতক্ষণ লাগবে, স্টেশন বা বাসস্টপ থেকেই বা কতটা দূর, এসব কোন ধারণাই ছিল না। তাই অ্যানেসি স্টেশনে বসে দারুণ অস্বস্তিতে ভুগেই সময়টা কাটিয়েছি।

দোতলা স্টেশনটা কয়েক চক্কর দিলাম। এই ছোট স্টেশনেও ওঠানামার জন্য এসকালেটর রয়েছে তবে সব সময় চলে না। একবার দেখলাম ফুটফুটে বাচ্চা ছেলে একটি, বছর দুয়েকের, কেন জানি না, কাছে আসতে চাচ্ছে, তারপর হঠাৎই মুখের দিকে চেয়ে হেসে চলে গেল। দেখলাম একটা শিশুকে ফিতে দিয়ে

বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছেন তার মা, বুকের সামনে রেখে। এরকম পিঠে-ঝোলানো দেখেছি হিমালয়ে।

স্টেশন মোটামুটি ছিমছাম। তবে কটুকষায় সোঁদা একটা গন্ধ যেমন সব স্টেশনেই থাকে, তেমনি এখানেও রয়েছে। বিদেশে এলে স্বভাব বোধ হয় বদলাতে হয়। কিংবা বদলে যায়। দেশে দূরে গাড়ি আসছে দেখলেও লাইনের উপর দিয়েই হুড়মুড় করে এক প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হামেশাই আরেক প্ল্যাটফর্মে যাই আমরা সবাই। কিন্তু গাড়ি আসার কোন নামগন্ধও ছিল না তখন কোন দিক দিয়ে অ্যানেসি স্টেশনে। লোকও গোনাগুনতি। অথচ অন্য প্ল্যাটফর্মে যেতে হবে, ওখানে একজন বিজ্ঞানী আছেন, ওঁর স্ত্রী ও মেয়ে নিয়ে, উনিও টি জি ভি ট্রেনে উঠবেন, উনি ডাকছেন। ভারতীয় বিজ্ঞানী, অল্পবয়স, এখন কাজ করছেন আমেরিকায়। তো, লাইন টপকে যাওয়া? নৈব নৈব চ। বেশ সময় খরচ করে ঘুরে এসকালেটর দিয়ে নেমে সাবওয়ে দিয়ে হেঁটে আবার উঠে গেলাম ঐ প্ল্যাটফর্মে। ছোট মেয়ে, নাম তার নীরু—আসল নাম নীহারিকা। মায়ের নাম গীতা। ওরা তাহলে কজন? মা-বাবা-মেয়ে তিনজন, এবং না, আরও একজন, পুতুল কিনেছে একটা, **Ruky the pup**, তাকে নিয়ে চারজন। ছোটদের এ হিসাব বড় মজার, এবং বুঝি যথার্থ! যতই বড় হই, ততই যেন সহজ হিসাবে গোল পাকাতে থাকি আমরা।

সে যাই হোক, ফ্রান্সের টি জি ভি ট্রেন, সারা ইউরোপে এবং পৃথিবীতে এর ইজ্জতই আলাদা। এখন পর্যন্ত যত ট্রেন যেখানে আছে, তাদের মধ্যে এ ট্রেন দ্রুতগামী, গতি ঘণ্টায় ১৬২ মাইল। এবং সুন্দর, আরামপ্রদ। আসন সংরক্ষণ না করলে এ ট্রেনে ওঠা যায় না। সংরক্ষণের জন্য পয়সাও এমন কিছু কিন্তু বেশি লাগে না। মাত্র ১০।১২ টাকা প্যারিস থেকে অ্যানেসি পর্যন্ত।

ট্রেন ঠিক সময়ে ছাড়ল ১টা ১৭ মিনিট-এ। কাছে দূরে পাহাড় বন আলপস পাইনগাছ লেক টানেল ভুট্টা ক্ষেত। পাহাড় এখন সবুজ। ঋতু ঘুরলে সব সাদা হয়ে যাবে। নিঃশব্দে চলছে ট্রেন, চোখে ভেসে উঠছে ছবি। গদি আঁটা আসনের সামনে টেবিল। উড়োজাহাজের মতো যেন। ভিড় নেই। "চা গরম" নেই। চমৎকার পরিষ্কার। ট্রেনে যে রেস্টুরেন্ট, তার মেয়ে হকার অবশ্য টফি লেমনেড প্রভৃতির পসরা সাজিয়ে গেছেন পাশ দিয়ে ২।১ বার। একজন লেমনজুস কিনে ভাগ করে খেল তার সঙ্গীনীর সঙ্গে। অ্যানেসি থেকে প্যারিস অবধি কেনা-কাটা ঐ একটাই নজরে পড়েছে। এবং চেকার ওঠেই। সাধারণতঃ মেয়ে চেকার। নীল পোশাক। অনেকটা আমাদের ট্রামের ইন্‌সপেক্টারদের মতো। লোকেরা যারা চলেছে ট্রেনে, অচেনা বলেই বোধ হয় আত্মমগ্ন। চুপ-চাপ। এমনকি ট্রেন চলছে, তার শব্দও শ্রুতি-গোচর নয়। সামনেই বসে সম্মেলন-ফেরতা তরুণ-তরুণী দুই বৈজ্ঞানিক, তাঁদের শুধালাম একবার গ্রেট্‌জ্‌-এর কথা। যদিও প্যারিসের কোন একটা জায়গায় থাকেন ওঁরা, সঠিক বলতে পারলেন না। আন্দাজে ৩০ কিলোমিটার বললেন। এরকম আন্দাজের উপর কথাবার্তা বলাও বাঙালীদের মতো ফরাসীদের কেতা বোধ হয়। অন্য দেশের সাহেবরা ঠিক না জানলে বলে, "জানা নেই"। কাজেই ট্রেনেও গ্রেট্‌জ্‌-এর রাস্তা খুঁজে বের করা গেল না।

ট্রেনে আর একটা ব্যাপার দেখলাম। এক তরুণী উঠলেন, প্রত্যেকের হাতে ১টা করে ছাপানো কাগজ ধরিয়ে দিলেন, তাতে শূন্যস্থান

পূরণ করতে হবে, এই আর কী? আমরা তো ফ্রেঞ্চ বুঝি না, তাই প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারলাম না। তবে ফরাসী যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ উত্তর লিখলেন, কেউ কেউ লিখলেন না। কিছু পরে এসে মেয়েটি নিয়ে গেলেন কাগজগুলো। দেখলাম, ২।১টা ২।১ জনের কাছ থেকে নিতে ভুলেও গেলেন। ট্রেনের সুযোগসুবিধা নিয়ে বোধ হয় কোন একটা সমীক্ষা।

প্যারিস তো এল। যেন না এলেই ভাল হত। যেন বিশ্বের সব থেকে দ্রুতগামী টি জি ডি ট্রেন প্যারিসের দিকে অনন্তকাল চললেই ভাল হত। বুক দুরু দুরু। কেন? গ্রেট্‌জ্‌ যাবার ভাবনা ভেবে। যেতে হবে গ্রেট্‌জ্‌। যাবই গ্রেট্‌জ্‌। কিন্তু কী ভাবে? কাঁধে ঝোলানো একটা মোট। হাতে হালকা ন্যাকড়ার একটা বাক্স। 'পারলে আংলে' (ইংরেজী জানেন?) সম্বল করে অনুসন্ধান অফিসে শুধাই কারুকে কারুকে, ঠিক সুবিধা করতে পারি না। এদিকে সময় যত যাচ্ছে, ততই অস্থিরতা বাড়ছে। তত যেন গোঁ চাপছে, ঠিকানা খুঁজে বের করতেই হবে।

দেখি কি, কয়েকজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক জটলা করছেন, অনুসন্ধান অফিসের একটা কাউণ্টারে। পিছনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কিছু পরে পালা এল আমার। কিন্তু তার আগেই লক্ষ্য করলাম, কাকতালীয় একটি অদ্ভুত যোগাযোগ, যিনি এই কাউণ্টারে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন, সেই তরুণটি দক্ষিণভারতীয়, এখন ফ্রান্স প্রবাসী, ফ্রান্সের রেলের কর্মী। অতি সহৃদয়। সহিষ্ণু। তাঁকে আমার সমস্যার কথা বললাম। রামকৃষ্ণ মিশন কোথায়, কতদূরে গ্রেট্‌জ্‌ থেকে, বলতে পারলেন না, তবে গ্রেট্‌জ্‌-এর ঠিকানা মিলল, বলে দিলেন তিনি, প্যারিস-এর গ্যারে ডিলা ঈস্ট স্টেশন থেকে ৪০ মিনিট লাগবে সেখানে যেতে। ধরতে হবে সেখান থেকে টুর্নাম-এর ট্রেন, তার আগের স্টেশনটির নামই গ্রেট্‌জ্‌।

প্যারিসে অনেকগুলি স্টেশন। ভূগর্ভরেল দিয়ে যোগাযোগ। মাকুর মতো ২।১ বার ঘোরাঘুরি করতে হল। তাতেও সময় গেল। সুবিধা এই, একবার টিকিট কাটলে ভূগর্ভরেল থেকে বেরিয়ে না এলে আর টিকিট কাটতে হয় না প্যারিসে।

যাই হোক, ৬টা নাগাদ পৌছে গেলাম গ্যারে ডিলা ঈস্ট স্টেশনে। সময় খুব বেশি নেই টুর্নাম-এর ট্রেনটা ছাড়ার। অ্যানেসি স্টেশনে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ল। আবার কি পুনরাবৃত্তি হবে তার?

পিছনে কার গলা—"বাঙালী বুঝি?"

ফিরলাম। অপরিচিত গোলগাল বেঁটে খাটো এক ভদ্রলোক।

"হ্যাঁ", স্বীকার করতেই হয়। যেন মরুভূমিতে মরুদ্যান। লোকে লোকারণ্য অথচ একান্ত অপরিচিত অতি ব্যস্ত স্টেশনটাতে যেন হাতে এল আমার আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ।

"আপনি কোথা থেকে?" শুধাই।

"হোসেন আমার নাম। বাড়ি ঢাকায়।" বিশুদ্ধ পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণ।

চমৎকৃত হই।

পোশাক-আশাকের ব্যবসা করেন। লেখা-পড়া তেমন কিছু করেননি। বয়সও বেশি নয়, তিনের কোঠায়। প্রথমে কিছুদিন ছিলেন পূর্ব জার্মানিতে। তারপর চলে এসেছেন প্যারিসে। ভাগ্য অন্বেষণে।

"আমার কাছে চলেন, আজ থাকবেন রাতে।" হঠাৎই অযাচিতভাবে বললেন হোসেন, যেন আমি তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, "কোন অসুবিধা হবে না, একা থাকি, একটা ঘর প্যারিসেই।"

টুর্নামের ট্রেন ছাড়তে আর মিনিট দশেক মাত্র বাকী। প্যারিসে আজ হোসেন-এর নিরাপদ আশ্রয়ে আরামে থাকলে গ্রেট্‌জ্‌ আর যাওয়া হবে না, কারণ আগামীকালই ফ্রান্স ছেড়ে যাবার কথা।

"কি ভাবছেন?"

"হোসেন, তোমাকে অনেক ধন্তবাদ। আমাকে গ্রেট্‌জ্‌ যেতেই হবে আজ।"

"তবে তাড়া করেন।"

টিকিট কেটে আনলাম। বিদায় জানালাম হোসেনকে। ট্রেনে উঠলাম। আমাদের লোকাল ট্রেনগুলোর মতো। তবে, দোতলা। এরকম দোতলা বগি দু-একখানা দেখেছি কলকাতাতেও, ব্ল্যাক ডায়ামণ্ড-এ। কর্মক্লান্ত মেয়ে-পুরুষ ঘরে ফিরছে—ঘর যাদের প্যারিস থেকে দূরে। ছোটাছুটি আছে, ব্যস্ততা আছে, তবে কোলাহল নেই। হুড়োহুড়ি নেই। বিশৃঙ্খলা নেই। ভিড়ও ততটা নয়। ২।৪টা স্টেশন পেরুনোর পর বসবার ভাল জায়গা পেলাম। একতলায়। দেখতে দেখতে চললাম। শিল্প এলাকা। সমৃদ্ধ। আধুনিক। কিছু পরে এল গ্রামীণ পরিবেশ। ঘন গাছপালা কোন কোন স্টেশনের ধারে। দূরে বিলীয়মান সর্পিল কালো পথরেখা। গেছে গ্রামের দিকেই, তবে মেঠোপথ বলাতো চলবে না। আসলে গ্রাম আর শহরের কোন তফাত তেমন নেই, দেশের যে কোন জায়গাতেই শহরের সব সুবিধাই মেলে নাগালের মধ্যে।

[ক্রমশঃ]

দিশারী

শ্রীমতী মিনতি দত্তরায়

সাহিত্যসেবিকা।

লক্ষ জন্ম পার হয়ে এসেছি—
আরও কত জন্ম যাবে,
আঁকা-বাঁকা পথে নদী
মিলবে মোহনায়
সে কত দূর!
আঁধার রাতের তুমি ধ্রুবতারা
তোমার হাতছানি
মনে আশা জাগায়
তোমার আকুল-করা বাঁশী
ক্ষণে ক্ষণে উন্মনা করে আমায়!
জীবনের আবর্তে—
বার বার ডুবে যাই আকণ্ঠ
জাল পেতে রয়েছে জেলে
বুনে চলি আশা-নিরাশার স্বপ্ন;
স্বপ্ন টুটে যায়—
বঙ্কিম পথের বাঁকে জাগে ভাঙন
নানা চেষ্টায় ডানা ব্যথা করা
ফিরে চাই উন্মুখ তোমার আশায়;
তুমি আছ জেনেছি এই সত্য
নূতন বেগে পথ চলি।
ঋজু করে দাও তোমার পথ
প্রসারিত কর তোমার অভয় হস্তখানি,
বুকে বাজে তোমার অমোঘ বাণী;
ওগো দিশারী রামকৃষ্ণ,
ভীড়িবে তোমার তীরে কবে—
এ ভাঙা ক্লান্ত তরীখানি?

শিবমহিম্নঃ

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য

[ফাল্গুন, ১৩৯১ সংখ্যার পর]

১। মহিম্নঃ পারং তে পরমবিদুষো যদ্যসদৃশী
স্তুতির্ব্রহ্মাদীনামপি তদবসন্নাস্ত্বয়ি গিরঃ।
অথাবাচ্যঃ সর্বঃ স্বমতিপরিণামাবধি গৃণন্
মমাপ্যেষ স্তোত্রে হর নিরপবাদঃ পরিকরঃ॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : হে শিব! পরমবিদুষো (মূর্খতমস্য) স্তুতিঃ তে মহিম্নঃ (মহত্বস্য) পারম্ (অবধিং) গন্তুম্ অসদৃশী (অনস্বরূপা ভবিতুমর্হতি) কথং? (যতঃ) ব্রহ্মাদীনামপি গিরঃ (স্তবাঃ) ত্বয়ি (তব গুণানুধ্যানে) অবসন্নাঃ (অযোগ্যাঃ)। স্বমতি পরিণামাবধিগৃণন্ (নিজবুদ্ধ্যনুসারেণ স্তবকরণে) সর্বঃ (সর্বজনঃ) অবাচ্যঃ (অনিন্দনীয়ঃ, অনুপালম্ভনীয়ঃ) অথ (অস্মাৎ কারণাৎ) মম অপি স্তোত্রে হে হর! এষঃ পরিকরঃ (আরম্ভঃ) নিরপবাদঃ (নিন্দা-করণাভাবঃ)।

ভাবানুবাদ : হে শিব! তোমার মহিমার সম্পূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্য না জানিয়া স্তব করা যদি অনুচিত হয় তাহা হইলে কোন ক্ষতি নাই, কারণ ব্রহ্মাদিদেবতাগণও তোমার সম্পূর্ণ তত্ত্ব বর্ণনা করিতে পারেন নাই। তবে যদি বলা যায় নিজ নিজ জ্ঞানানুসারে স্তব করিলে দোষ হইতে পারে না তাহা হইলে হে হর! আমার পক্ষেও ক্ষুদ্র-জ্ঞানানুসারে স্তবারম্ভ অপবাদযুক্ত নাও হইতে পারে।

আমার ন্যায় পরমমূর্খের এই স্তব তোমার মহিমার সীমা বর্ণনা করিতে বিফল হইতে পারে, কারণ ব্রহ্মাদিদেবতাগণের তোমার উদ্দেশ্যে রচিত স্তব যথাস্থানে স্তুত হইয়াও সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। সাধকের ধ্যান-সীমান্তের প্রথম সোপানে তোমার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত এইরূপ বলা হইয়া থাকে অর্থাৎ সাধক যথাশক্তি তোমার স্তব দ্বারা তোমাকে সন্তুষ্ট করিতে চায়। এইজন্য তোমার মহিমার বর্ণনা আমার পক্ষে কেবল আরম্ভ মাত্র। সুতরাং আমার স্তব আরম্ভ করিবার প্রয়াস পূর্ব হইতেই নিন্দনীয় বলিয়া সমালোচনা করা উচিত হইবে না।

২। অতীতঃ পন্থানং তব চ মহিমা বাঙ্মনসয়ো-
রতদ্ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি।
স কস্য স্তোতব্যঃ কতিবিধগুণঃ কস্য বিষয়ঃ
পদে ত্বর্বাচীনে পততি ন মনঃ কস্য ন বচঃ॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : তব চ মহিমা বাঙ্মনসয়োঃ পন্থানম্ অতীতঃ (ত্বম্ অবাঙ্মনসগোচরঃ ইত্যর্থঃ); অতদ্ব্যাবৃত্ত্যা (ন তদ্ব্যাবৃত্তিরতদ্ব্যা-বৃত্তিঃ তয়া অভেদেন ইতি যাবৎ, সমগ্রগ্রহণেন বা) শ্রুতিরপি যং চকিতম্ (সভীতম্) অভিধত্তে (তাৎপর্যেণ প্রতিপাদয়তি, স্বীকরোতি বা)। সঃ (এবম্ভূত মহান্ জগদীশ্বরঃ) কস্য স্তোতব্যঃ? (কেন স্তবনীয়ঃ?); কতিবিধ-গুণঃ (অনেক প্রকারাঃ গুণাঃ, সত্ত্বরজগুণাঃ যত্র সঃ); কস্য বিষয়ঃ (ন কস্যাপি বিষয়ঃ, নির্ধর্মকত্বাৎ অতএব অবিষয়ত্বাৎ ন স্তুত্যর্হঃ ইত্যর্থঃ) (তৎ কথং স্তৌসি? তৎ প্রতিপাদয়তি) অর্বাচীনে পদে (বিষয়ে) (তু অর্থাৎ নবীন বিষয়ে) কস্য ন বচঃ মনঃ বা ন পততি (আবিশতি)।

ভাবানুবাদ : জাগতিক বিষয়াচ্ছন্ন আমাদের বাক্য ও মন তোমার মহিমা বর্ণনে অক্ষম; কারণ বেদ উপনিষদ্ প্রভৃতি শ্রুতি তোমার বিরাট ও বিশাল মহিমার বিষয় বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও

সত্তীত চিত্তে নিরস্ত হইয়াছে তাঁহারা বাস্তবিক শিব কিরূপ তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম হইয়াই নিরস্ত হইয়াছেন।

হে শিব! তোমার ন্যায় বিরাট পুরুষের মহিমা বর্ণনা করিতে কে সক্ষম হইয়াছে? তুমি নির্গুণ ও গুণাতীত হইয়াও সগুণরূপে উপাস্য। তোমার বিষয় বিস্তৃতভাবে মুখে প্রকাশ করা অসম্ভব, তবে নবীন বিষয়ে অপক্কবুদ্ধি-বিশিষ্ট মানবের মন স্বভাবতই আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক, —তাই এই প্রচেষ্টা।

৩। মধুস্ফীতা বাচঃ পরমমমৃতং নির্মিতবত-
স্তব ব্রহ্মন্ কিং বাগপি সুরগুরোর্বিস্ময়পদম্।
মম ত্বেতাং বাণীং গুণকথনপুণ্যেন ভবতঃ
পুনামীত্যর্থেঽস্মিন্ পুরমথন বুদ্ধির্ব্যবসিতা॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : হে ব্রহ্মন্! তব মধুস্ফীতাঃ (মাধুর্যাদি শব্দগুণালঙ্কারবিশিষ্টত্বেন মধুময়াঃ) বাচঃ পরমম্ অমৃতম্ ভবতি। (এতাঃ) নির্মিতবতঃ কিং সুরগুরোঃ বাক্ অপি বিস্ময়পদম্? (কথং স্তবকরণে প্রবৃত্তিঃ সঞ্জাতা তস্য কারণমাহ) হে পুরমথন! ভবতঃ গুণকথন পুণ্যেন মম তু এতাং বাণীং রচয়ামি। পুনামি ইতি অর্থে অস্মিন্ (কার্যে) বুদ্ধিঃ (কর্তা) ব্যবসিতা (স্তবকরণে উদ্যতা)।

ভাবানুবাদ : হে শিব! পরম অমৃত স্বরূপ মধুময় তোমার কথার প্রতি অক্ষরই মধুসদৃশ বলিয়া সাধকের নিকট প্রতিফলিত ও প্রতীয়মান হইয়া প্রত্যক্ষীভূত। প্রতি পদে অতীব সুস্বাদু তোমার স্বরূপ প্রকাশ করিতে মানবের দূরের কথা, মনে হয়, দেবগুরু বৃহস্পতিও উহা ভাষায় প্রকাশ করিতে বিস্মিত হইয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন। তথাপি হে ত্রিপুর হর! তোমার পবিত্র গুণ-মহিমা প্রকাশ করিলে আমার বাক্য পবিত্র হইবে এইজন্যই আমার, তোমার এই স্তবকরণে প্রচেষ্টা।

৪। তবৈশ্বর্যং যত্তজ্জগদুদয়-রক্ষা-প্রলয়কৃৎ
ত্রয়ীবস্তু ব্যস্তং তিসৃষু গুণভিন্নাসু তনুষু।
অভব্যানামস্মিন্ বরদ রমণীয়ামরমণীং
বিহন্তুং ব্যাক্রোশীং বিদধত ইহৈকে জড়ধিয়ঃ॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : জগদুদয়-রক্ষা-প্রলয়কৃৎ (জগতঃ আকাশাদি মায়োদ্ভবস্য বস্তুনঃ) উদয়ং (সৃষ্টিং) রক্ষাং (স্থিতিং) প্রলয়ং (সংহারং করোতীতি) যৎ তব ঐশ্বর্যং তৎ ত্রয়ী বস্তু (ত্রয়াণাং বেদানাং তাৎপর্যেণ প্রতিপাদ্যং বস্তু) গুণভিন্নাসু (সত্ত্বরজ-তমোভিঃ ভিন্নাসু) (নতু বস্তুগত্যাভেদ ইত্যর্থঃ) তিসৃষু তনুষু (ব্রহ্ম বিষ্ণুমহেশ্বরাখ্যাসু মূর্তিষু) ব্যস্তং (বিবিচ্য ন্যস্তং প্রকটিতমিতি যাবৎ) হে বরদ! অভব্যানাম্ (অস্মিন্ ত্রৈলোক্যে নাস্তি ভব্যঃ কল্যাণং যেষাং তেষাম্; নাস্তিকানাম্ ইত্যর্থঃ) একে জড়ধিয়ঃ (বুদ্ধিভ্রান্তিজাতাঃ মূর্খাঃ) অস্মিন্ (অস্মিন্ সুচিন্তিত বিষয়ে) রমণীয়াম্ (মনোহারিণীম্ অবস্থাং) বিহন্তুং (নিরাকর্তুম্) অরমণীং ব্যাক্রোশীম্ (অহমহমিকয়া আক্ষে-পোক্তিম্) বিদধতে (কুর্বতে) ("কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে" ইতি সূত্রেণ বিদধাতেরাত্মনে-পদম্)।

ভাবানুবাদ : হে বরদ শিব! তোমার ঐশী শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়াই জগতের উৎপত্তি, রক্ষা ও প্রলয় সংঘটিত হয়। বেদ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়ের মাধ্যমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের চরিত্রানুধ্যানে তোমার মহিমা বর্ণনে সর্বদাই সচেষ্ট। তথাপি অশ্রদ্ধেয় নাস্তিকগণের (বৌদ্ধগণের) মধ্যে দুর্বুদ্ধিপরায়ণ কোন কোন অসদ্ব্যক্তিগণ তোমার নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের মাধুর্যকে অস্বীকার করিয়া অতীব কুৎসিত ও কদর্যভাবে তাহার তীব্র সমালোচনা করিতে কার্পণ্য করে নাই।

৫। কিমীহঃ কিংকায়ঃ স খলু কিমুপায়স্ত্রিভুবনং
কিমাধারো ধাতা সৃজতি কিমুপাদান ইতি চ

অতর্কৈশ্বর্যে ত্বয্যনবসরদুঃস্থো হতধিয়ঃ
কুতর্কোঽয়ং কাংশ্চিন্ মুখরয়তি মোহায় জগতঃ॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : স খলু ধাতা (বিধাতা) কিং ত্রিভুবনং সৃজতি? স খলু কিমীহঃ (কা ঈহা [চেষ্টা ; ইচ্ছা] যস্য)? কিমুপায়ঃ (কঃ উপায়ঃ সহকারি কারণমস্যেতি)? কিং কায়ঃ (কঃ কায়ঃ শরীরং যস্যেতি)? কিমাধারঃ (কঃ আধারোঽধিকরণমস্যেতি)? কিমুপাদানঃ (কিমুপাদানং সমবায়িকারণং ভুবনাকারেণ নিষ্পাদ্যমস্যেতি)? অতর্কৈশ্বর্যে ত্বয়ি (সর্বতর্কাগোচরে ত্বয়ি, "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ" ইতি) অনবসর দুঃস্থঃ (নাস্তি অবসরঃ অবকাশঃ অস্য ইতি অনবসরঃ অর্থাৎ চঞ্চলঃ) অতএব দুঃস্থঃ (দুষ্টত্বেন স্থিতঃ) অয়ং কুতর্কঃ কাংশ্চিৎ হতধিয়ঃ (দুষ্টবুদ্ধীন্) জগতঃ মোহায় মুখরয়তি (বাচালান্ করোতি)

ভাবানুবাদ : নাস্তিকগণ বলেন, জগৎস্রষ্টা শিবের প্রচেষ্টাদি ও দেহগঠন কিরূপ? তিনি কি উপায়ে এই ত্রিভুবন সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তাহার উপাদান কি ছিল? তাহার কার্যাদির আধার কি ছিল? তিনি কোথায় রাখিয়া কার্যাদি করিয়াছিলেন?

হে শিব! এই সুন্দর জগতের সর্বত্র তোমার বিবিধ ঐশ্বর্য তর্কাতীতভাবে দেদীপ্যমান, তথাপি দুষ্টপ্রকৃতিসম্পন্ন দুর্বুদ্ধিবিশিষ্ট হতভাগ্য ব্যক্তিগণ সর্বদা এই সমস্ত কুতর্কদ্বারা বাচালের ন্যায় মোহপ্রাপ্ত হইয়া জগতের মধ্যে নাস্তিকতা প্রচারে সোচ্চার!

৬। অজন্মানো লোকাঃ কিমবয়ববন্তোঽপি জগতা-
মধিষ্ঠাতারং কিং ভববিধিরনাদৃত্য ভবতি।
অনীশো বা কুর্যাদ্ভুবনজননে কঃ পরিকরো
যতো মন্দাস্ত্বাং প্রত্যমরবর সংশেরতে ইমে॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : অপি (প্রশ্নার্থে) অবয়ববন্তঃ লোকাঃ (ক্ষিত্যাদয়ঃ) কিং অজন্মানঃ (জন্মহীনাঃ) (কথং তৎ প্রতিপাদয়তি) জগতামধিষ্ঠাতারম্ অনাদৃত্য (অনপেক্ষ্য) কিং ভববিধিঃ (উৎপত্তিক্রিয়া) ভবতি? (কিং কর্তারং বিনা তব জগতঃ উৎপত্তিঃ সম্ভবতি ইত্যর্থঃ)। অনীশো বা (ঈশ্বরাদন্যঃ বা) কঃ ভুবনজননে পরিকরম্ (আরম্ভম্) কুর্যাৎ? যতঃ (ত্বং সর্বপ্রমাণসিদ্ধঃ তথাপি ত্বাং বিস্মৃত্য) ইমে মন্দাঃ (নাস্তিকাঃ বৌদ্ধাঃ) ত্বাং প্রতি সংশেরতে (সন্দেহবন্তঃ) ইতি আশ্চর্যম্!

ভাবানুবাদ : এই সব নাস্তিক অবয়বযুক্ত। তাহাদিগকে বলিতে হইবে কি তাহারা জন্মগ্রহণ করে নাই? জগতের স্রষ্টাকে অস্বীকার করিয়া কি জগৎ চলিতেছে? জগদীশ্বর ব্যতীত এই জগৎসৃজনে কে বদ্ধপরিকর হইয়াছে অর্থাৎ প্রচেষ্টা চালাইয়াছে? মন্দবুদ্ধিযুক্ত নাস্তিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানবগণ জগৎস্রষ্টাকেই অস্বীকার করিয়া তাহাদের মতবাদ প্রচারে সমুদ্যত।

৭। ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথযুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : ত্রয়ী (অত্র বেদত্রয়মুপলক্ষিতা, অষ্টাদশ বিদ্যা অপি অত্র বিবক্ষিতাঃ) সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি চ প্রভিন্নে প্রস্থানে (শাস্ত্রে) ইদং পরং পথ্যম্ (হিতকরং, সুগম্যং বা) অদঃ পরং পথ্যম্ ইতি (বদন্তি)। রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ ঋজুকুটিলনানাপথযুষাং (ঋজবশ্চ কুটিলাশ্চ ঋজুকুটিলাঃ, ঋজুকুটিলাশ্চ নানাপথাশ্চ ইতি ঋজুকুটিল নানা পথা, তান্ জুষন্তে ভজন্তীতি তেষাম্) নৃণাম্ ত্বমসি একো গম্যঃ (একঃ এব উপাসনীয়ঃ) পয়সামর্ণব ইব (নদীনাং যথা সমুদ্রঃ এব সম্মিলিতস্থানম্)।

ভাবানুবাদ : বেদ, সাংখ্যদর্শন, পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র, আগম অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্র এবং বৈষ্ণব

সাধক সকল, বিভিন্ন মতের আশ্রয়ে কেহ বলিয়াছেন, "এই মতই ঠিক অথবা ঐ মতই যথার্থ মঙ্গলদায়ক।" এইভাবে বিভিন্ন মতের বিভিন্ন সাধকগণ কেহ সরলপথে সাধনার পথ বাছিয়া লইয়াছেন, কেহ বা কুটিল পথে সাধনায় অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু বিভিন্ন নদীর গতিপথ যেমন সমুদ্রগমনাভিলাষী সেইরূপ সব সাধকের মতবাদ ও চিন্তাধারা হে শিব! তোমাতেই পরিণতিলাভ করিয়া পর্যবসিত হইয়াছে।

মহোক্ষঃ খট্বাঙ্গং পরশুরজিনং ভস্ম ফণিনঃ
কপালং চেতীয়ত্তব বরদ তন্ত্রোপকরণম্।
সুরাস্তাং তামৃদ্ধিং দধতি তু ভবদ্ভ্রূপ্রণিহিতাং
নহি স্বাত্মারামং বিষয়মৃগতৃষ্ণা ভ্রময়তি॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : হে বরদ! মহোক্ষঃ (মহান্ উক্ষঃ), খট্বাঙ্গং (ত্রিশূলম্ অস্ত্রবিশেষঃ বা), পরশুঃ (কুঠারঃ), অজিনং (মৃগচর্ম), ভস্ম, ফণিনঃ, কপালং (মনুষ্যশিরোঽস্থি) চ ইতি ইয়ৎ তব তন্ত্রোপকরণম্ (কুটুম্বপালনস্য উপকরণম্)। সুরাঃ ভবদ্ভ্রূপ্রনিহিতাং (ভ্রূবিক্ষেপমাত্রেণ সমর্পিতাং) তাং তাম্ (অসাধারণীম্) ঋদ্ধিং (সম্পত্তিম্) দধতি (ধারয়ন্তি)। (ত্বম্ অতি দরিদ্রঃ তব ভৃত্যাস্তু সর্বে সুরাস্তৎপ্রসাদাৎ সমৃদ্ধাঃ। যো অন্যান্ ধনবতঃ করোতি স তদেবক্ষয়া অধিক ধনবান্ ভবতীতি প্রসিদ্ধম্ কিন্তু তব পক্ষে বিপরীতাম্ এতাম্ অবস্থাম্ ইত্যর্থঃ।) ন হি স্বাত্মারামং ([সে আত্মনি স্বরূপে অর্থাৎ চিদানন্দ ঘনে] আরমতি [ক্রীড়তি] ইতি তথা তম্) বিষয়মৃগতৃষ্ণা (বিষয়া এব মৃগতৃষ্ণা, জলবুদ্ধ্যা গৃহ্যমানা মরীচিকা) ত্বাং ন ভ্রময়তি (মোহয়তি)।

ভাবানুবাদ : হে বরদ! হে শিব! বিশাল ষণ্ড, ত্রিশূল, কুঠার, মৃগচর্ম, ভস্ম, সর্প এবং মানুষের মাথার খুলি লইয়া তোমার সংসার অর্থাৎ এই সকল তোমার সাধনার উপকরণ। দেবতাসকল তোমার ভ্রূভঙ্গীতে কত শত ঐশ্বর্য দ্বারা ঐশ্বর্যশালী হইয়া থাকেন, কিন্তু তুমি নিজেই আত্মারাম অর্থাৎ আত্মজ্ঞানলাভে চিরতৃপ্ত। তাই বিষয় মৃগতৃষ্ণা তোমার বিভ্রম জন্মাইতে পারে নাই।

[ক্রমশঃ]

দুরিতদলনদক্ষং দক্ষজাদত্তদোষং
কলিতকলিকলঙ্কং কম্রকহ্লারকান্তম্।
পরহিতকরণায় প্রাণপ্রচ্ছেদপ্রীতং
নতনয়ননিবদ্ধং নীলকণ্ঠং নমামঃ॥

যিনি পাপনাশ করিতে সমর্থ, দক্ষকন্যা সতী—যাঁহাকে করকমল দান করিয়াছেন, যিনি কলির দোষসমূহ নাশ করেন, যিনি সুন্দর কহ্লারপুষ্পের মতো মনোহর, পরের কল্যাণের জন্য প্রাণত্যাগ করিতে যাঁহার সদাই প্রীতি, প্রণত ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্য সর্বদা যাঁহার দৃষ্টি রহিয়াছে—সেই নীলকণ্ঠ মহাদেবকে আমরা প্রণাম করি।

- স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর প্রয়াণে উত্তরকাশী সাধু-সমাজের শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিগত ১৩ মার্চ, ১৯৮৫, শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মহাসমাধিলাভের সংবাদে উত্তরাখণ্ডের সমগ্র সাধু-সমাজ অভিভূত হন। ১৭ মার্চ, অপরাহ্ণ ৪টায় উত্তরকাশীস্থ 'বিবেকানন্দ-ভজনালয়ে' সাধু-সমাজের সভাপতি স্বামী অখণ্ডানন্দ পুরীজির তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মহাত্মাগণের উপস্থিতিতে এক মহতী স্মরণ-সভার আয়োজন হয়েছিল। প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী ঐ সভায় বহু বিদগ্ধ সাধু তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ব্রহ্মলীন স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর উদ্দেশে। উক্ত সভায় মুখ্য অতিথির আসনে বৃত হয়েছিলেন দণ্ডী স্বামী শ্রীমৎ শুদ্ধদেব তীর্থজী মহারাজ।

উত্তরকাশী সাধু-সমাজের অর্পিত শ্রদ্ধাঞ্জলির সারমর্ম এখানে প্রকাশিত হচ্ছে :

ব্রহ্মলীন শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ, যাঁকে গত প্রায় ১৯ বৎসর যাবৎ পরমাদর ও সম্মানের সঙ্গে "প্রেসিডেন্ট মহারাজ" বলা হত, সমগ্র ভারতবর্ষে ও বিশ্বের সুধী জগতে এক অনন্য ধর্মবেত্তা, মহান স্থিতপ্রজ্ঞ বিদ্বানরূপে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর অসীম ধৈর্য, অটুট কর্মশক্তির ফলে দেশের অগণিত ধর্মপিপাসু নরনারী তাদের জীবনে দিশা পেয়ে কৃতার্থ হয়েছে।

তিনি যুবাবস্থার প্রারম্ভেই শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং জগন্মাতা শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর কাছে দীক্ষিত হয়ে ধন্য হয়েছিলেন। অবতারবরিষ্ঠ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের এবং যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজী মহারাজের উদ্ঘোষিত মহা সমন্বয়মূলক যুগধর্মের সবল একনিষ্ঠ সেবক রূপে তাঁদের উজ্জ্বল গরিমাযুক্ত পতাকাবাহক হয়ে এক মহান ধর্মযোদ্ধা রূপে জীবনের শেষক্ষণ পর্যন্ত যেভাবে তিনি আদর্শ স্থাপন করেছেন তা অতুলনীয় এবং এই মহান জ্ঞানযজ্ঞ কেবলমাত্র পরমযোগী পুরুষের মাধ্যমেই সাধিত হওয়া সম্ভব।

শাশ্বত বেদান্ত-বাণীর প্রচার ও প্রসার তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজী মহারাজের যুগপোযোগী ভাষ্যের মাধ্যমে আজীবন অক্লান্তভাবেই করেছেন তাঁর রচিত বহু গ্রন্থের মাধ্যমে। জীবন্মুক্ত, অসঙ্গ, স্থিতপ্রজ্ঞ দশাপ্রাপ্ত হয়েও তিনি যেরূপ দীর্ঘ নিরলস জীবনাদর্শ দেখিয়ে গেছেন তা সর্বদেশের সর্বকালের মুমুক্ষু-সমাজে এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকারূপে চির বিদ্যমান থাকবে। গত ১২ জানুআরি ১৯৮৫, বেলুড় মঠপ্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত যুবসম্মেলনে তিনি তাঁর অন্তিম ভাষণে দেশের যুবকদের উদ্দেশে, নিজের মর্মবাণীরূপে যে-উপদেশ-গাথা দিয়েছেন, তার জন্য সমগ্র দেশবাসী চির কৃতজ্ঞ থাকবে। বর্তমান সময়ে যখন এক বিভ্রান্ত—দিশাহারা পরিস্থিতির মধ্যে দেশের যুবসম্প্রদায় চালিত, সেই চরম মুহূর্তে তিনি তাঁদের সামনে এক অধ্যাত্ম আদর্শ ও মার্গের সন্ধান দিয়ে গেছেন।

তাঁর পাঞ্চভৌতিক শরীর যখন দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে অতিশয় জীর্ণশীর্ণ দশাপ্রাপ্ত, তখনও ৯৩ বৎসর বয়সে তাঁর এই অক্লান্ত জনসেবা, ধর্মপ্রচারে একনিষ্ঠতা, "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—এই মহান আদর্শের মূর্ত প্রকাশরূপে তাঁর জীবন বর্তমান ও আগামীকালে দেশবাসী তথা সত্যপ্রেমী সাধু-সমাজের চির পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে। অসীম প্রেম, জ্ঞান-দীপ্তি এবং সুমধুর আচরণে তিনি সকলের

হৃদয়-জয়ী পুরুষ ছিলেন। তাঁর মহাপ্রয়াণে সমগ্র দেশের এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

পরমেশ্বরের নিকট আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা,—ব্রহ্মলীন শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের সমুজ্জ্বল জীবনাদর্শ যেন দেশের সত্যান্বেষী যুবকদের জীবনে উজ্জ্বল প্রেরণাস্রোত-রূপে চির-বিদ্যমান থাকে। তাঁর মহান পবিত্র আত্মা সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে চির-শান্তিতে বিরাজমান থাকুক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্বাঃ স্বামী অখণ্ডানন্দ

সভাপতি, উত্তরকাশী সাধু-সমাজ

১৭. ৩. ৮৫

বেলুড় মঠে সমাধিস্থল দর্শনে

(স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর মহাপ্রয়াণের পরে)

শ্রীকালীসাধন ঘোষ

প্রবীণ ভক্ত, কর্মী ও সাহিত্যসেবী।

সুপবিত্র ভূমিখণ্ডে সন্ন্যাসীর অন্তিম শয়ান,
স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা। বুকে তার শ্মশানের ফুল।
তোমার করুণাছায়ে প্রচ্ছায়িত এ মহাপ্রয়াণ
ভক্তের বিষাদে স্তব্ধ হল আজ মৌন উপকূল।

যদি এই হৃদয়ের স্মৃতিটুকু নিয়ে কোন দিন
আষাঢ়ে কি শ্রাবণের সজল সঙ্গীত
আমাকে উতলা করে, মেঘাচ্ছন্ন হয় নিশিদিন
আশীর্বাণীর মন্ত্রে স্বপ্নে দিয়ো অম্লান ইঙ্গিত
জীবনযাত্রার পথে, অতিক্রান্ত নহেক নির্বাধ
সূর্যের আহ্নিকগতি তীব্র বেগে করে চক্রমন
পাথেয় সম্বল জানি একমাত্র তব আশীর্বাদ
শুভঙ্কর দৈববাণী নিরন্তর স্মরণ-মনন!

আমি রব পথপার্শ্বে
অর্ঘপত্র লয়ে রিক্ত হাতে
হে আচার্যদেব মোর দীনভক্তি
যাবে তব সাথে।

নানা প্রসঙ্গে

চিরন্তন কাহিনী

দেবগণের শক্তিপরীক্ষা

অবশেষে দেবগণ জয়ী হলেন। অসুরদের হারিয়ে ওঁরা ফিরে এসেছেন।

জয় হয়েছে। অতএব আনন্দ, আনন্দ এবং আনন্দ। স্বর্গে শুধু আনন্দ। যুদ্ধের শ্রান্তি অন্ত অপগত। দেবগণ পরিতৃপ্ত।

অবশেষে হর্ষের স্রোত এক সময় স্তিমিত হয়ে এল। মন গেল ভিন্নতর বিষয়ে। দেবগণ জিতেছেন। কিন্তু কার প্রাপ্য কতখানি কৃতিত্ব? বিবাদ শুরু হল। দেবে দেবে বিবাদ।

ইন্দ্র বললেন: আমি জিতেছি।

অগ্নি বললেন: রাখ রাখ, জিতেছি আসলে আমি

বায়ু বললেন: প্রকৃত জয়ী আমি

এই রকম সবাই লিপ্ত হলেন সম্মান পাবার দ্বন্দ্বে। সবাই আত্মপ্রসাদে মগ্ন এবং অন্ধ।

ব্যাপারটি মহেশ্বরের কানে গেল। তিনি কিঞ্চিৎ মজা পেলেন। যক্ষের বেশে স্বয়ং মহাদেব এলেন ঘটনাস্থলে।

উনি বললেন: বিবাদে প্রয়োজন নেই। তোমাদের কার বীর্যবত্তা কতখানি তা এখুনি প্রমাণিত হবে।

একগুচ্ছ তৃণ রাখলেন মাটির উপর। বললেন: নাড়াও, পোড়াও—যিনি পারবেন তাঁকেই জয়ী বলে ধরা হবে।

ইন্দ্র রেগে অস্থির হলেন। কোথাকার কে এক যক্ষ! ইন্দ্রের সঙ্গে এসেছে পরিহাস করতে!

ইন্দ্র উপহাস করে খুব একচোট শুনিয়েও দিলেন। তারপর অগ্রসর হলেন। কিন্তু মুহূর্তে ইন্দ্রের মনোভাব বদলে গেল। যা ভেবেছিলেন আসলে ব্যাপারটি তা নয়। ইন্দ্র বহু চেষ্টা করলেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন। তৃণটিকে হাতে তোলা দূরের কথা মনে মনেও তুলতে পারলেন না তিনি।

অপমানে দেবরাজ লাল হলেন। বজ্র তুললেন। বজ্র পড়ল তৃণের উপর। ইন্দ্র ও দেবগণ হতভম্ব হলেন। বজ্র নিতান্তই যেন লজ্জা পেয়ে নিস্তেজ হয়ে একপাশে পড়ে রইল। তৃণটির কিছুই হল না।

ইন্দ্রের মুখ চুন হল। ম্লান ইন্দ্র অবনত-মস্তকে কালো মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুহূর্তে মুহূর্তে তাঁর মাথার মধ্যে বিদ্যুতের চমকের মতো বিস্ময় খেলে যাচ্ছিল।

অগ্নি এলেন এগিয়ে। প্রচণ্ড আগুন জ্বলে উঠল। লেলিহান শিখায় যেন সমগ্র চরাচর দগ্ধ হবে। কিন্তু অগ্নির অহংকারও চূর্ণ হল। সামান্য একগাছি তৃণকে তিনি কিছুই করতে পারলেন না।

বায়ু ধেয়ে এলেন। ঝঞ্ঝার প্রমত্ততা বিস্তার করে বায়ু এলেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন তিনিও। তৃণটিকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতেও তিনি পারলেন না।

সমস্ত দেবতা এলেন এগিয়ে। দেবশক্তির অপমানে সবাই আত্মহারা। সামান্য একগুচ্ছ

তৃণ, অথচ তার মুখে ব্যর্থ হল দেবতাদের তাবৎ শক্তি! ওঁরা শত সহস্র অস্ত্রে চতুর্দিক অন্ধকার করে তুললেন। যেন প্রলয় উপস্থিত হয়েছে। সাগর উতলা হল, বায়ু পাগল হল, আগুন জ্বলল। কাতর কপোতের মতো চরাচর কাঁপতে থাকল।

ইন্দ্র ক্রোধে অপমানে উত্তেজিত হয়ে সেই যক্ষকে জিজ্ঞাসা করলেন : কে তুমি?

চোখের পলক ফেলার সময়টুকুও পেরুল না। যক্ষ অন্তর্হিত হলেন।

দেবতারা বিমূঢ়। স্তব্ধ বিস্ময়ে ওঁরা তাকিয়ে রইলেন। মুহূর্তের মধ্যেই দেখলেন আকাশের প্রান্তে এক রমণী। দিব্য সাজে অলংকারে অনন্ত শোভা বিকীর্ণ করতে করতে সেই রমণী দেবমণ্ডলীর দৃষ্টিপথে পতিত হলেন। ক্রমে উদ্ভাসিত হতে থাকলেন।

দেবগণ বুঝলেন, উনি উমা, পরমেশ্বরী। ওঁরা এগিয়ে গেলেন। ওঁদের মনে তখনও বিস্ময়ের ঘনীভূত সেই মেঘখণ্ড। ওঁরা শুধালেন : ঐ যক্ষ কে?

দেবীর মুখে মিষ্টি হাসির একটি রেশ খেলে গেল। বললেন : উনিই সব কিছুর মূলে। তোমাদেরও অগোচর উনি। অন্তরালে থেকে ঐ মহান পুরুষই সংসারের চাকাকে ঘোরাচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছাতেই সমস্ত কিছু উঠছে, পড়ছে, গড়ছে, ভাঙছে।

দেবীও অন্তর্হিত হলেন। দেবগণ যেন তলিয়ে গিয়েছিলেন কোথায়। অবশেষে ভেসে উঠলেন। দেখলেন : আলোর সমুদ্রে ওঁরা স্নান করছেন।

[শিবপুরাণের বায়বীয় সংহিতা অবলম্বনে উপাখ্যানটি প্রকাশিত হল। কেনোপনিষদের তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে বর্ণিত আখ্যান তুলনীয়—সেখানে কিঞ্চিৎ ভিন্ন রূপ লক্ষণীয়।]

স্মৃতি-সঞ্চয়ন

ত্যাগের আদর্শ এবং শ্রীশ্রীমা

'শ্রীশ্রীমা ত্যাগের ভাবকে খুব সমাদর করতেন। ত্যাগে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিদের তিনি উৎসাহ দিতেন। তিনি একবার বলেছিলেন, সবাই বলে ঠাকুর ধর্ম-সমন্বয়ের জন্য জগতে এসেছিলেন; কিন্তু নানা ধর্মমতে তিনি যে সাধন করেছিলেন, সে কোনও মতলব করে নয়। অন্যান্য ধর্মের সাধকরা ভগবানকে কেমন করে ডাকেন এটি জানবার বিশেষ আগ্রহ হয়েছিল তাঁর—তারই জন্য তিনি নানা ধর্মমতে সাধন করেন। সব ধর্ম একই লক্ষ্যের অভিমুখী, এটি প্রমাণ করবার উদ্দেশ্য মাত্র নিয়েই তিনি এ-কাজ করেননি। সাধন করে অবশ্য তিনি ঐ সিদ্ধান্তেই উপনীত হন,—সে-ফল তিনি পেয়েছেন কাজটি করতে গিয়ে। কেমন করে বিভিন্ন ধর্মে ভগবানকে ডাকা হয়, সেটি জানবার জন্যই তিনি নানা ধর্ম সাধন করেন—আর সাধন করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সব ধর্মই সাধককে একই চরম লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। কিন্তু শ্রীশ্রীমা বলেন, এটিই শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রধান শিক্ষা নয়। শ্রীশ্রীমায়ের মতে তাঁর প্রধান শিক্ষা হল ত্যাগ—যা তিনি নিজের জীবনে মূর্ত করে গিয়েছেন। এ-যুগের জগৎকে তিনি তাঁর ঐ শ্রেষ্ঠ আদর্শটি দিয়েছেন। শ্রীশ্রীমা বলতেন, পূর্ব পূর্ব অবতারে এই রকম ত্যাগ কদাচিৎ প্রকাশ পেয়েছে। এমনটি দেখা গিয়েছে কেবল শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যেই।

'স্বামীজী বলতেন, ত্যাগ আর সেবা জাতির আদর্শ; এই দুই আদর্শ যদি অক্ষুণ্ণ থাকে তাহলে সব কিছু ঠিক থাকবে। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনও ছিল ত্যাগের মূর্ত প্রকাশ। আজ স্বার্থপরতা এবং যত রকম দুর্নীতিমূলক প্রবৃত্তি সারা

পৃথিবীকে গ্রাস করতে বসেছে, স্বভাবতই এখন আমাদের সামনে এই রকম উচ্চ ত্যাগের আদর্শেরই বিশেষ প্রয়োজন।

'যে-কথা আগেই বলেছি, শ্রীশ্রীমা ত্যাগের ভাবটিকে জীবনে ফুটিয়ে তুলতে বিশেষ উৎসাহ দিতেন। একবার পূর্ববঙ্গের, অর্থাৎ এখনকার বাংলাদেশের কোনও একটি অঞ্চল থেকে একটি যুবক মায়ের বাড়িতে এসেছিলেন। সংসার ত্যাগ করে হৃষীকেশ বা ঐ-সব দিকে কোথাও গিয়ে তপস্যাদি করতে তিনি খুব আগ্রহী। এদিকে জানা গেল যে, যুবকটি বিবাহিত—তাঁর একটি সন্তানও আছে। অতএব এই নিয়ে স্থানীয় লোকদের মধ্যে বেশ কথা শুরু হয়ে গেল। সবাই প্রশ্ন তুলল—এমন গৃহস্থ লোক কেমন করে সব ত্যাগ করবেন? তাঁর পক্ষে সাধু হওয়া সম্ভবপর কিনা—ইত্যাদি। শ্রীশ্রীমা কিন্তু নীরব ছিলেন—তাঁর মধ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। কিছুদিন বাদে ওখানকার ঐ-সব উত্তেজনা একটু কমলে মা নিজেই সব বিতর্কের অবসান ঘটালেন। যুবকটিকে শ্রীশ্রীমা নিজ হাতে গেরুয়া প্রদান করে হৃষীকেশে চলে যেতেই নির্দেশ দিলেন। উত্তরকালে সেদিনের সেই ত্যাগী যুবকটিকে দেখা গিয়েছে, রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের একজন বিশিষ্ট ও শ্রদ্ধেয় সাধু রূপে।

'জয়রামবাটীর আর একটি যুবকের কথা বলছি। খুব ভাল ছেলে, চমৎকার গান করত, সবাই ভালবাসত তাকে। হঠাৎ একদিন সে নিরুদ্দেশ; কেউ জানতে পারল না, কোথায় সে চলে গেল! বছর কয়েক পরে সে আবার গ্রামে ফিরে এসেছে। তখন তো তাকে নিয়ে খুব হৈ চৈ পড়ে গেল। বহু লোক তাকে ঘিরে ধরেছে—যেন ঘেরাও করেছে—আর প্রশ্নবাণে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। চারিদিকের কলরবে শ্রীশ্রীমায়েরও কৌতূহল হল। সাধারণত তিনি অন্যের বাড়িতে যেতেন না—কিন্তু সেদিন তিনি ঐ প্রতিবেশীর বাড়ির উঠোনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মা দেখলেন—সবাই মিলে ছেলেটিকে জেরা করছে, কেন সে বাড়ি ত্যাগ করে চলে গেল, এত বছর কোথায় ছিল, কি করেছে ইত্যাদি। শ্রীশ্রীমা প্রথমে কিছুই কথা বলেননি—একেবারে চুপ হয়ে ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি ছেলেটিকে সস্নেহে বললেন—"বাবা সাধু হয়ে খুব ভাল করেছ।" একই কথা তিনি তিনবার উচ্চারণ করেছিলেন। মায়ের বাড়িতে প্রসাদ পাবার জন্য তাকে বিকেলে যেতে বললেন।

'ভক্তেরা যখন তাঁদের মেয়েদের বিবাহের জন্য সুপাত্র পাওয়া যাচ্ছে না, এইসব দুঃখের কথা মাকে জানাতেন, তিনি তখন বলতেন: "কেন এরা এমন বলে? নিবেদিতার স্কুলে কেন পাঠিয়ে দেয় না?"—এই ছিল তাঁর মনোভাব।'

[শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর মুখে শ্রুত মাতৃ-প্রসঙ্গ থেকে সংগৃহীত]

জ্ঞান-বিজ্ঞান

লৌহমিশ্রিত লবণ

লৌহের অভাবজনিত রক্তাল্পতা রোগ (Anaemia) পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই দেখা যায়। ভারতবর্ষে শিশুদের মধ্যে শতকরা ৪০ থেকে ৬০ জন, যুবতী মেয়েদের মধ্যে শতকরা ২৫ থেকে ৩০ জন এবং অন্তঃসত্ত্বা নারীদের মধ্যে (গর্ভকালের শেষ তিনমাসে) শতকরা ৫০ জন এই রোগে ভুগে থাকে। গ্রামাঞ্চলে রক্তাল্পতা রোগের প্রাদুর্ভাব আরও বেশি। ভারতের মতো দেশে মানুষের শরীরে লৌহের অভাব মেটাবার সবচেয়ে সহজ উপায়

হচ্ছে কোন সাধারণ খাদ্যের মাধ্যমে এটি গ্রহণ করানো এবং এ-ব্যাপারে সবচেয়ে প্রকৃষ্ট খাদ্য-মাধ্যম হচ্ছে লবণ। হায়দরাবাদের ন্যাশনাল ইন্স্টিটিউট অব নিউট্রিসন (National Institute of Nutrition) কিভাবে এই জাতীয় প্রকল্পটিকে কার্যকরী করা যায় তা নিয়ে সম্প্রতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁরা কয়েকটি এলাকার মানুষের খাবার লবণে আগে থেকেই লৌহ মিশিয়ে দিয়ে—সেই সেই জায়গার বাসিন্দাদের মধ্যে—রক্তাল্পতা রোগের স্বল্পতা লক্ষ্য করেছেন। এঁরা নির্দেশ দিচ্ছেন, লবণের মাধ্যমে একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের শরীরে প্রতিদিন ১২—১৫ মিলিগ্রাম অতিরিক্ত লৌহ যাতে প্রবেশ করে সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে।

রক্তের হিমোগ্লোবিন (Haemoglobin), যার মধ্যে লৌহ আছে, কমে গেলে রক্তাল্পতা হয়। রক্তাল্পতা হলে মানুষের কর্মশক্তি কমে যায়,—গর্ভিণী নারীর নানা রোগ—এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে, গর্ভজাত সন্তান কম ওজনের হয় ও সেই শিশু নানারকম অসুখে কষ্ট পায়। শৈশবকালে রক্ত কম থাকলে শিশুদের মানসিক গঠন ও শিখিবার ক্ষমতা কমে যায়। তাছাড়া রক্তাল্পতা হলে শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা (Immune functions) হ্রাস পায়।

অবশ্য ইন্জেকসন দিয়েও শরীরে লৌহ ঢুকান যায়। কিন্তু এইভাবে শরীরে লৌহ ঢুকিয়ে দেওয়া হলে রক্তে লৌহাংশের পরিমাণ আকস্মিক বেশি হওয়ার আশঙ্কা থাকে—যার কুফল অত্যন্ত মারাত্মক। পক্ষান্তরে লবণের মাধ্যমে শরীরে লৌহ গেলে কোন খারাপ ফলের সম্ভাবনা থাকে না। তাই লৌহমিশ্রিত লবণই সমধিক বিজ্ঞানসম্মত।

[Nutrition News, National Institute of Nutrition, May 1982—অবলম্বনে।]

দেশ-বিদেশ

আজকের অস্ট্রেলিয়া

ভাঙা-গড়ার প্রাচীন কোন ইতিহাস নেই। প্রাকৃতিক শান্ত ও সুন্দর পরিবেশকে নষ্ট করে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে কোন নতুন সভ্যতারও জন্ম হয়নি এখানে। কোন বিদেশী শত্রুর দ্বারা এখানকার মানুষ আক্রান্ত বা শাসিতও হয়নি। নানা দেশ থেকে বিদেশীরা অস্ট্রেলিয়ায় বসতি স্থাপন করতে এসেছে। ক্রমে তারাই আদিবাসীদের জায়গা-জমি দখল করে নিয়ে তাদের গভীর বনে-জঙ্গলে সরে যেতে বাধ্য করেছে। এইভাবেই বিদেশীরা অস্ট্রেলিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে আসছিল।

বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া সরকার আদিবাসীদের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট সাহায্য করছে। আদিবাসীদের বংশ যাতে একেবারে লোপ পেয়ে না যায়, তার জন্য সরকার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের জায়গা-জমি, অর্থ, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি দিয়ে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাওয়ার নানারকম চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

অস্ট্রেলিয়া মাত্র দুই শতাব্দীর একটি নবীন দেশ। কোন ধনী সম্প্রদায় বা সম্ভ্রান্ত বংশ বিশেষের দ্বারা বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া শাসিত হয় না। এই দেশ গণতন্ত্রের নিয়মে চলে। কিছু কিছু ব্যক্তি এখানে বংশ পরম্পরায় ধনী, কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে তারা বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অধিকারী নয়।, সবার সমান অধিকার। কোন হোটেলে খেতে গেলে কমনওয়েলথের মন্ত্রীরা যে-সুযোগ-সুবিধা পায় সাধারণ নাগরিকও তাই পায়।

একজন সাধারণ নাগরিককে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ,

অর্থ-ঋণ, শ্রমের মজুরী প্রভৃতি এমন দেওয়া হয় যাতে সে স্বাভাবিক উপায়ে অচিরেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে,—দীর্ঘকাল তাকে পর-মুখাপেক্ষী হয়ে না থাকতে হয়। জনসাধারণকে নানারকম সাহায্য দিয়ে সরকার বিভিন্ন রকম জন-সেবামূলক কাজেও তাদের উৎসাহ প্রদান করে।

অস্ট্রেলিয়ায় পুরুষদের মতো মেয়েরা জনসেবা করার সুযোগ পায় না। তাদের ধারণা যে-সব মেয়েরা মাতৃত্ব লাভ করেছে, তারা যদি বাইরে কাজ করে তাহলে সংসার অবহেলিত হবে। ছেলে-মেয়েদের লালন-পালন করার অসুবিধা হবে। তাই দেখা যায়, অন্ততঃ ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সেখানকার সরকার মেয়েদের জনসেবামূলক কর্মে নিরুৎসাহী ছিল। যদিও নীতিগতভাবে বলা হয় যে, ছেলে-মেয়ে উভয়ই চাকরির ক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকারী, কিন্তু কার্যত মেয়েদের জন্য উজ্জ্বল কোন সম্ভাবনা নেই—এমনকি শিক্ষা ক্ষেত্রেও। সেখানে মেয়েদের ওকালতি করায় বাধা, কিন্তু তারা বিধানসভার সদস্য হতে পারে। গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের কোন সুযোগই নেই। সেখানে তাদের বিধিনিষেধ আরও বেশি। মেয়েরা ঘর-সংসারের তত্ত্বাবধান ও পারিবারিক খেত-খামারে কাজ করে।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রেলিয়ার সর্বত্র—প্রতি জেলায় বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল। তাতে ৬ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে দেশের অধিকাংশ ছেলে-মেয়ে সরকারী স্কুলে পড়তে উৎসাহী হয়। ১০০ বছর পরে, অর্থাৎ ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ৭,৩০০টি সরকারী প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে ২২ লক্ষ ছেলে-মেয়ে পড়ে। ঐ স্কুলগুলিতে শিক্ষকসংখ্যা ১ লক্ষ ৫ হাজার। এছাড়া বেশ কয়েক হাজার স্কুল চালায় মিশনারীরা। সেখানেও লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী পড়ে এবং শিক্ষকসংখ্যাও বহু। এখন সেখানে কমপক্ষে ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৪৩ হাজার। এদের মধ্যে কিছু আংশিক সময়ের জন্য পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীও আছে। ৩০০টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে বহু ছাত্রছাত্রী জীবনযাত্রায় স্বাবলম্বী হওয়ার উপযোগী বিভিন্ন কারিগরি ও প্রযুক্তি বিদ্যাও শেখে। উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলিতেও বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা শেখানো হয় যাতে স্কুলজীবন শেষ করেই ছাত্রছাত্রীরা জীবিকার পথ বেছে নিতে পারে।

অস্ট্রেলিয়া একটি সমৃদ্ধশালী দেশ। তা সত্ত্বেও এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ বেকার। ১৯৭৪-৭৫-এর গণনায় বেকারের সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার দেখা গিয়েছিল।

অস্ট্রেলিয়ায় কৃষি উৎপাদন খুব ভাল। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এখানে চাষ করা হয়। এখানে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয়। বিদেশেও রপ্তানি হয়। খাদ্যবস্তুও বিদেশে রপ্তানি হয়। এখানে কলা ও আনারস পর্যাপ্ত পরিমাণে হয়।

অস্ট্রেলিয়ায় চাষের জমি প্রচুর হলেও জলাভাবে সব জমিতে চাষ করা যায় না। পরিত্যক্ত জমিতে গরু, ভেড়া প্রভৃতি চরানো হয়।

অস্ট্রেলিয়ার খনিজ সম্পদ হচ্ছে—সোনা, কয়লা, লোহা, ইউরানিয়াম, নিকেল প্রভৃতি।

অস্ট্রেলিয়া সরকার বেকার-ভাতা দেয়, বিকলাঙ্গ, কঠিন রোগগ্রস্ত সহায়সম্বলহীন রোগীদের এবং মৃত ব্যক্তির সৎকারের জন্য অর্থসাহায্য করে।

এখানকার মানুষ খেলাধুলাকে খুব ভালবাসে। ক্রিকেট, টেনিস, ফুটবল, ঘোড়-দৌড়, নৌ-চালনা প্রভৃতি এখানকার মানুষের অতি প্রিয় খেলা। ফুটবল খেলা দর্শকদের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে। ক্লাবস্তরে ক্রিকেট খুব জনপ্রিয়। তবে টেস্ট খেলা প্রায় সবস্তরের মানুষকে আকর্ষণ করে।

অস্ট্রেলিয়ার মানুষ ধর্মে বিশ্বাসী। শতকরা ৯৮'৮ খ্রীষ্টধর্মে এবং বাদ-বাকী ইহুদী, মুসলমান ও বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী।

পুস্তক সমালোচনা

Sri Sarada Devi : The Great Wonder—A Compilation of Revelations, Reminiscences and Studies by Apostles, Monks, Savants, Scholars, Devotees. **Published** by Swami Hiranmayananda, Secretary, Ramakrishna Mission, New Delhi-110-055. pp. xvi+508. Price : Rs. 25·00 (ordinary) ; Rs. 35·00 (Deluxe).

বাংলায় অনুবাদ করলে গ্রন্থখানির নাম সম্ভবত বলা যায় : শ্রীসারদা দেবী—পরমাশ্চর্য একটি সত্তা। পরমা প্রকৃতি—যিনি জনতাপ-হরণের জন্য কৃপাবশে মানবীর বেশে অবতীর্ণ হয়েছেন ; ভক্তি-জ্ঞান-অভয়দাত্রী—মানুষকে যিনি 'মানহুঁশ' হবার পথ দেখিয়েছেন ; প্রজ্ঞার প্রতিমূর্তি—সংসারের জ্বালাযন্ত্রণার মধ্যে সকল কর্তব্যে স্থিত থেকেও যিনি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত থেকেছেন ; সমদর্শিনী ও দয়াস্বরূপা—যাঁর ভালবাসা পাত্রাপাত্রনির্বিশেষে সকলের প্রতি বর্ষিত সেই জননী শ্রীসারদা দেবীকে কি বিশেষ একটি আখ্যায় সম্যক্ চিহ্নিত করা যায়? যায় না বলেই বুঝি 'পরমাশ্চর্য' শব্দটির প্রয়োগ। যা অনির্বচনীয় তাকেই আমরা বলি পরমাশ্চর্য। অনির্বচনীয় বলতেই আমাদের মনে হয় ব্রহ্ম। ব্রহ্ম কী, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, তা মুখে বলা যায় না। প্রাচীন সত্যদ্রষ্টা শাস্ত্রকাররাও জানতেন, আদি-অন্তহীন, নামরূপের অতীত সেই এক এবং অদ্বিতীয় সত্তাকে কোনও বাক্যের বন্ধনে ধরা যায় না, বর্ণনা করা যায় না বিশেষণের মাধ্যমে। যিনি একমাত্র শুদ্ধ চৈতন্যের গোচর, যাঁকে অতীন্দ্রিয় বোধে বোধ করতে হয়, সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে তবে নির্দেশিত করা হবে কেমন করে? শাস্ত্রকাররা তার জন্য আশ্রয় নিয়েছেন ক্ষুদ্র, নিরাভরণ একটি শব্দের : তৎ। ঠিক তেমনই বুঝি শ্রীসারদা দেবীর অনির্বচনীয় ব্যক্তিত্ব বা সত্তাকে আমরা আপন করে নিতে পারি একাক্ষর একটি আহ্বানের মাধ্যমে : মা।

শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেবী-জ্ঞানে পূজা করেছিলেন, পূজান্তে মায়ের চরণে নিবেদন করেছিলেন তাঁর তপস্যার ফল। তবুও দীর্ঘকাল পর্যন্ত অনেকেই শ্রীশ্রীমাকে চিনে নিতে পারেননি, পারেননি তাঁর স্বরূপ, তাঁর মহিমা সম্যক্ উপলব্ধি করতে। (উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম এক্ষেত্রে অবশ্যই স্বামী বিবেকানন্দ-সহ শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েকজন লীলাসহচর।) তিনি তাঁর মুখমণ্ডল যেমন অবগুণ্ঠনের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখতেন, তেমনই ঢেকে রাখতেন তাঁর আধ্যাত্মিক স্বরূপ মায়ার আবরণে। মহামায়া—তিনি নিজে ধরা না দিলে কি তাঁকে ধরা যায়? ক্রমে—শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনের পর—কৃপা করে তিনি কখন কখন নিজেকে প্রকাশ করেছেন ভাগ্যবান কোন কোন ভক্তের কাছে। একদা-অন্তরালবর্তিনী সারদা দেবী তখন ক্রমবর্ধমান ভক্তমণ্ডলের এবং শরণাগতের

আশ্রয়, রামকৃষ্ণ-সংঘ-জননী। শ্রীশ্রীমায়ের লীলা-সংবরণের পর তাঁর জীবনচরিত ও স্মৃতিকথাধর্মী লেখা একে একে প্রকাশ পেতে থাকে। বিশেষ করে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসবের সময় (১৯৫৩) থেকে তাঁর বিষয়ে একদিকে যেমন সভায় সভায় ভাবগম্ভীর আলোচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা গিয়েছে, অন্যদিকে তেমনই তৎপরতা দেখা গিয়েছে রচনাদি ও গ্রন্থপ্রকাশের ক্ষেত্রেও। অনির্বচনীয়া শ্রীশ্রীমাকে দীর্ঘকাল ধরে দেশে-বিদেশে সাধু-ভক্ত-সুধী নানাজনে নানাভাবে বুঝতে চেষ্টা করেছেন তাঁদের লেখার মাধ্যমে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থে সন্নিবেশিত অনুরূপ প্রায় একশত রচনার সংকলন আলোচ্য এই গ্রন্থখানি।

সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই বিরাট গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে শ্রীশ্রীমা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্রয়োদশ পার্ষদের (স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ প্রমুখ) রচনা অথবা উক্তি স্থান পেয়েছে। কী দৃষ্টিতে তাঁরা শ্রীশ্রীমাকে দেখেছেন তার একটি পরিচয় পাওয়া যায় এই স্বল্প পরিসর কিন্তু অত্যন্ত মূল্যবান লেখাগুলির মাধ্যমে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সন্নিবেশিত শ্রীশ্রীমায়ের সম্পর্কে কয়েকটি অসামান্য স্মৃতিকথা। স্মৃতিচারণ করেছেন যাঁরা, তাঁরা সকলেই শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত; একজন (শ্রীমতী সরযূবালা) ছাড়া সকলেই রামকৃষ্ণ-সংঘের সন্ন্যাসী (স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী মাধবানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ, স্বামী অরূপানন্দ, স্বামী অপূর্বানন্দ প্রভৃতি)। এঁদের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে জ্ঞানদাত্রী শ্রীশ্রীমায়ের রূপটি, সেই সঙ্গে তাঁর অন্তহীন ভালবাসার একটি অপার্থিব, হৃদয়স্পর্শী চিত্র। তৃতীয় অধ্যায়ে আছে রামকৃষ্ণ-সংঘের সন্ন্যাসীদের লেখা পনেরটি জ্ঞানগর্ভ, মনোগ্রাহী প্রবন্ধ। অধিকাংশ প্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে 'প্রবুদ্ধ ভারত' অথবা 'বেদান্ত কেশরী' পত্রিকায় প্রকাশিত। লেখকদের মধ্যে আছেন স্বামী শঙ্করানন্দ, স্বামী নিখিলানন্দ, স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, স্বামী যতীশ্বরানন্দ, স্বামী প্রেমেশানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী প্রভবানন্দ, স্বামী তপস্যানন্দ ও স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ। (এই প্রসঙ্গে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের আর একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে, যেটি গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রদত্ত।) সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, টি. এম. পি. মহাদেবন, অনির্বাণ, দিলীপকুমার রায়, কালিদাস নাগ, ভগিনী নিবেদিতা ও রোমাঁ রোলাঁ-সহ দেশ-বিদেশের নানা মনীষী ও ভক্তের রচনা নিয়ে গঠিত গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ের প্রবন্ধগুলি শ্রীশ্রীমায়ের দেবী-মানবী চরিত্রের উপর বিশেষ আলোকপাত করেছে।

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে 'বেদান্ত কেশরী' পত্রিকায় শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তর হিসাবে পাশ্চাত্য মহিলাভক্তদের বক্তব্য প্রকাশিত হয়। প্রশ্নটি ছিল: 'শ্রীশ্রীমাকে পাশ্চাত্য মহিলা হিসাবে আপনার কী মনে হয়?' আটজন মহিলাভক্ত এই আলোচনায় যোগ দেন। পরে অনুরূপ একটি আলোচনার আয়োজন করা হয় 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার পক্ষ থেকে। বিষয় ছিল: 'শ্রীশ্রীমায়ের জীবন থেকে সর্বাধিক প্রেরণাদায়ক যা আমি পেয়েছি।' ১৯৬৮ থেকে ১৯৭০—এই দুই বছর ধরে উক্ত বিষয়ে বিভিন্ন জনের বক্তব্য পত্রিকাটিতে প্রকাশ করা হয়। আলোচনায় যোগ দেন দেশ-বিদেশের জ্ঞানিগুণী উনিশ ব্যক্তি: স্ত্রী, পুরুষ; সাধু, গৃহী। উক্ত দুই প্রসঙ্গে রচিত আলোচনামূলক নিবন্ধগুলি স্থান পেয়েছে যথাক্রমে পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে। প্রত্যেকটি রচনার একটি নিজস্ব আবেদন আছে।

যা পাঠকের অন্তর স্পর্শ করে। লেখক/লেখিকার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীও এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। সপ্তম ও শেষ অধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের অনুধ্যানমূলক ছয়টি নিবন্ধ নিয়ে গঠিত ; লেখক স্বামী বুধানন্দ— যিনি এই গ্রন্থের পরিকল্পনা করেন এবং আরম্ভ করেন সেই পরিকল্পনার রূপায়ণের কাজ। তাঁর আরব্ধ কর্ম সম্পন্ন করেছেন স্বামী হর্ষানন্দ।

গ্রন্থটির পরিশিষ্টের তৃতীয় পর্যায়ে ভগিনী নিবেদিতার কয়েকটি পত্রের কিছু অংশ সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে ; এইসব পত্রাংশে আছে শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে তাঁর সশ্রদ্ধ, সানুরাগ উল্লেখ। শ্রীশ্রীমা তাঁর চোখে একটি পরম আদর্শ ও পবিত্রতার প্রতিমূর্তি। পরিশিষ্টের দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে আমেরিকা থেকে শ্রীশ্রীমাকে লেখা তাঁর সেই অসাধারণ পত্রটি, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের পাঠকদের কাছে যেটি সুপরিচিত।

গ্রন্থটির সম্পাদনায় যত্নের ছাপ স্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে পরিশিষ্টের শেষাংশে লেখক-পরিচিতি ও বিশেষ নাম ও শব্দের ব্যাখ্যা উল্লেখযোগ্য। তবে দুঃখের বিষয়, গ্রন্থের অধিকাংশ রচনার ক্ষেত্রে উৎসের নির্দেশ-সহ সম্পূর্ণ উল্লেখসূচী দেওয়া হয়নি। জিজ্ঞাসু পাঠকরা এই অভাব বিশেষ করেই বোধ করতে পারেন। বইটির মুদ্রণ পরিচ্ছন্ন, ছাপার ভুল খুবই কম। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত প্রচ্ছদটি সুন্দর।

কিঞ্চিদধিক পাঁচশত পৃষ্ঠার এই রচনা-সংকলনে নানা প্রসঙ্গের পুনরুল্লেখ পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করবেন। এই ধরনের গ্রন্থে পুনরুক্তি অবশ্যম্ভাবী। তাছাড়া উচ্চভাবের পরিস্ফুটনে পুনরুক্তি কার্যকরও। প্রসঙ্গত বলা যায়, স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ-সহ অনেকেই শ্রীশ্রীমায়ের অবিস্মরণীয় শেষ উপদেশের উল্লেখ করেছেন: 'যদি শান্তি চাও,…কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়,…জগৎ তোমার।' স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ জানিয়েছেন, ফ্রান্সের বেদান্ত-কেন্দ্রে প্রতিদিন আহারের পূর্বে 'ব্রহ্মার্পণম্…' মন্ত্রটির পর শ্রীশ্রীমায়ের ওই উপদেশটিও ফরাসী ভাষায় মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করা হয়। বস্তুত, শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি উপদেশ, প্রতি বাণী মন্ত্রের মতো। মন্ত্র বার বার শুনতে শুনতেই তো মনের মালিন্য দূর হয়!

—শ্রীজ্যোতির্ময় বসু রায়

প্রবীণ লেখক ও সাহিত্য-সমালোচক

লোকায়ত রামকৃষ্ণ—পবিত্রকুমার ঘোষ। প্রকাশক: সৃজনী, ৪ ভূপেন বোস এভিন্যু, কলিকাতা-৭০০০০৪। পৃঃ ১০৬ ; মূল্য: ১৪'০০ টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে" আছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত-বেদান্তমতে সাধন শেষে একাদিক্রমে ছ-মাসকাল নির্বিকল্প সমাধিভূমিতে অবস্থানের পর যখন চেতনার সাধারণ স্তরে ফিরে এলেন, তখন তিনি সর্বক্ষণ সহজভাবেই সর্বজীবের সঙ্গে এমন একাত্মতা অনুভব করতেন যে, একদিন যখন তাঁর সামনে দুজন মাঝি বিবাদ করতে করতে একজন অপরকে আঘাত করল, তিনি যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠলেন ; প্রহৃত মাঝির সমস্ত যন্ত্রণা তিনি নিজ অঙ্গে অনুভব করেছিলেন। এটি তাঁর অদ্বৈত অনুভূতির জীবন্ত প্রমাণ, প্রমাণ যে সর্বজীবে একই চৈতন্য সত্তা বিদ্যমান, যার ভিত্তিতে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "জীবই শিব"। ঘটনাটি রোমাঁ রোলাঁর মতে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এ-প্রসঙ্গে এক আলোচনায় ("Jiva Is Shiva") রোলাঁ বলেন যে, "একদিন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম মানুষের সঙ্গে বিযুক্ত হয়ে অত্যাচার ও শোষণের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল, রামকৃষ্ণের 'জীবই শিব' বাণী মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্বার যুক্ত করে তার অবসান

ঘটাল।" রামকৃষ্ণের অনুভূতির আলোকে বেদান্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বললেন, "প্রতি জীবে একই সুপ্ত শক্তি নিহিত আছে, সুতরাং কোন বিশেষ অধিকারের দাবীর কোন ভিত্তি নেই, বেদান্ত সকলেরই একই অধিকারের কথা বলে।" অর্থাৎ বেদান্ত প্রয়োগের বাস্তব ফলশ্রুতি হল এক সাম্যসমাজ। তিনি তাঁর পাশ্চাত্য দেশে সমাজ-বিপ্লবীদের সান্নিধ্যে এসে লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আরও বললেন, "সমস্ত শোষিত মানুষ ও সমাজ-বিপ্লবীগণ তাদের অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য বেদান্তের বাণীই চাইছেন।" পরে Prof Ernest Horrwitz রামকৃষ্ণ সম্পর্কে এক আলোচনায় সুস্পষ্টভাষায় বলেন যে, "রামকৃষ্ণের অনুরাগিগণ সাংস্কৃতিক উপায়ে সাম্যসমাজ আনতে দায়বদ্ধ।"

সুতরাং সন্দেহ নেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী এক অগ্নিগর্ভ বিপ্লবের বাণী। কিন্তু তা অদ্বৈতবেদান্তের বাস্তব অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, সমাজ-বিপ্লবের জন্য আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন আছে এবং তার জন্য বস্তুবাদ অপরিহার্য নয়।

আলোচ্য গ্রন্থে রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর এই আধ্যাত্মিক ভিত্তিকেই উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত গ্রন্থে 'বেদান্ত' কথাটিই অনুচ্চারিত। গ্রন্থ-পরিচিতি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "সভ্যতার নতুন দিক্‌নির্দেশের প্রশ্নে রামকৃষ্ণের প্রাসঙ্গিকতা সম্পূর্ণ বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচিত।" প্রাজ্ঞ লেখক প্রারম্ভে সুস্পষ্ট বলেছেন, "এই গ্রন্থে আমি পরমহংস, ব্রহ্মজ্ঞানী, অবতার রামকৃষ্ণের কথা বলছি না, আমি একান্তভাবে লৌকিক ও লোকায়ত রামকৃষ্ণের কথা বলছি।" গ্রন্থটি পাঠ করলেই বোঝা যায় যে, 'লোকায়ত' কথাটি 'বস্তুবাদী' কথাটির সমার্থক বলে ধরা হয়েছে।

এ বস্তুবাদী ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য দেখানো হয়েছে যে, রামকৃষ্ণ 'লোকায়ত' মত অর্থাৎ বস্তুবাদের ধারক ও বাহক। সেজন্যই প্রারম্ভে বলা হয়েছে যে, রামকৃষ্ণ যে 'অশিক্ষিত' ছিলেন এবং অশিক্ষিতা বৃন্দা ঝি ইংরেজী শিক্ষিত মহেন্দ্রনাথকে যে রামকৃষ্ণের ঘরে আহ্বান করছে (কথামৃত—১ম ভাগ)—তা ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। লেখকের মতে রামকৃষ্ণ পাঁচহাজার বছরের মানবসভ্যতাকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছেন—তার প্রমাণ তিনি 'লিপি' ধাতু ও Cash nexus যার উপর ভিত্তি করে সুমেরীয় হতে কম্যুনিস্ট সভ্যতা পর্যন্ত আন্দোলিত, তাকে বর্জন করেছেন। তিনি নাকি শুধুমাত্র বাংলার আদিম নিষাদ জাতির সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এবং তিনি একদিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতাকে, অপরদিকে বৈদিক সংস্কৃতিকেও। লেখকের সিদ্ধান্ত রামকৃষ্ণ শোষণ-ভিত্তিক, শ্রেণীবিভেদভিত্তিক, শ্রেণীসংগ্রামে পূর্ণ সভ্যতাকে প্রত্যাখ্যান করে 'মানবতা'ভিত্তিক সাম্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন এবং এভাবে সভ্যতার পালাবদলের সূচনা করেছেন। এর প্রমাণ তিনি "টাকা মাটি, মাটি টাকা" বলে টাকাকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে পুঁজিবাদকে আক্রমণ করেছেন! রামকৃষ্ণ যে ধাতু স্পর্শ করতে পারতেন না তা থেকেই নাকি বোঝা যায় যে, সুমেরীয় সভ্যতার কাল হতে এ পর্যন্ত মানবেতিহাসে ও সমাজে শ্রেণীবিভেদ, শ্রেণী-সংগ্রাম ও অসাম্যের মূল কারণ নাকি তিনি জানতেন। এবং তিনি নাকি এও জানতেন যে, "শ্রেণীসংগ্রাম ও রাষ্ট্রবিপ্লবের মাধ্যমেও সভ্যতার উত্তরণ সম্ভব নয়।" সেজন্যই নাকি তিনি "দল গড়েননি, রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে তথাকথিত সভ্যতার ধারকবাহকদের সঙ্গে কথা বলতেই সম্মত হননি।" একথা বলার

উদ্দেশ্য যে, রামকৃষ্ণ মূলত রাজনীতি বা অর্থনীতি সম্বন্ধে অ-সচেতন ব্যক্তি নন, কেবল তথাকথিত সভ্যতার ধারকবাহকদের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে আপত্তি ছিল।

রামকৃষ্ণ শুধু রাজনীতি সচেতনই নন, তিনি বিদ্রোহীও। লেখকের মতে তিনি যে জ্ঞান-অজ্ঞান, শুচি-অশুচি, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি প্রচলিত সব মূল্যবোধকে প্রত্যাখ্যান করেছেন "এটি তাঁর বিদ্রোহী মানসতার বড় পরিচয়।" এবং "শুধু সামাজিক, রাষ্ট্রিক কর্তৃত্ব নয়, মানুষের কল্পিত ঈশ্বরতন্ত্র থেকে তিনি মানুষকে মুক্ত করে তাঁর বিদ্রোহকে সমগ্রতা দান করেন।"

লেখকের মতে রামকৃষ্ণের ইতিহাস-সচেতনতাও ছিল এবং তিনি "সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী না হয়েও (?)" তিনি যে 'চট্টোপাধ্যায়' উপাধি ত্যাগ করেন তা তাঁর গূঢ় ইতিহাস-চেতনারই স্বাক্ষর। "কারণ তা করে তিনি তাঁর ঐতিহাসিক পরিচয় অর্থাৎ তাঁর খাঁটি নিষাদজাতিত্ব পুনরুদ্ধার করেছেন!" লেখকের মতে বাঙালী রামকৃষ্ণই বিশ্বের, তাঁর ভারতীয়ত্ব অনুচ্চারিত।

রামকৃষ্ণের খ্রীষ্টসাধনার কারণ নাকি তিনি হুগলী জেলার লোক—যেখানে শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টীয় মিশন সক্রিয় ছিল। দেখা যাচ্ছে, তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতাকে প্রত্যাখান করলেও খ্রীষ্টীয় মিশনারী প্রভাবকে স্বীকার করেছেন। প্রশ্ন করা যেতে পারে, তিনি ইসলাম ধর্মমতে সাধনা করেন কোন প্রভাবে? স্ববিরোধিতা এরকম মনগড়া ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। ধর্মের ইতিহাস আলোচনায় তিনি 'যজ্ঞধূমকলঙ্কিত' বৈদিক যুগকে কোন আমল দেননি আর উপনিষদের অস্তিত্বকে স্বীকারই করেননি, স্বীকৃতি দিয়েছেন একমাত্র বুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্যকে, শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতির নাম সম্পূর্ণ অনুচ্চারিত। তথ্যকে উড়িয়ে দেওয়া, ইতিহাসকে অস্বীকার করা—এরই নাম হল বস্তুবাদী ব্যাখ্যা!

লেখক দৃঢ়তার সঙ্গে দাবী করেছেন যে, রামকৃষ্ণের ঐতিহাসিক ভূমিকার পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ হল এই ঘটনা যে, তিনি কালীমন্দিরে "সামরিক কুচের ভঙ্গীতে দণ্ডায়মানা সশস্ত্র এক দেবীর পূজা" করেছেন, এবং "নিজেও তিনি সশস্ত্র, হাতে খড়্গ"। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে সিপাহীদের অভ্যুত্থান ঘটল এবং "সিপাই, কৃষক, শ্রমিকেরা ও অপরাপর ভারতীয়রা অস্ত্র হাতে নিয়ে উঠে" দাঁড়াল। দুটি ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক নাকি অস্বীকার করা যায় না। বস্তুবাদী কল্পনা কত বল্গাহীন—এ তারই একটি প্রমাণ!

রামকৃষ্ণ তাঁর দেহত্যাগের পূর্বে বলেছিলেন, "তিনিই ঈশ্বর"। উক্তিটির উপর লেখকের সিদ্ধান্ত—"দারিদ্র্য, ব্যাধি ও মৃত্যুর অধীন রামকৃষ্ণ যদি ঈশ্বর হন তবে সব মানুষই ঈশ্বরত্বের অভিজ্ঞান নিয়ে এসেছে।" সুতরাং লেখকের মত রামকৃষ্ণ বলেছেন, "মানুষই ঈশ্বর"। এবং লেখকের দৃঢ় মত, "মানুষই ঈশ্বর"—এই বাণীর মধ্যে রামকৃষ্ণের metaphysical বিদ্রোহের অন্তিম পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ তিনি রুশো, বদলেয়ের, মার্ক্ ইস্ ডি সেড্, ডস্টভয়েস্কি, নীৎসে প্রভৃতি অপর metaphysical বিদ্রোহীদের সমগোত্র। এই সকল পূর্বসূরীরা যা বলেছেন তার সার কথা—"ভগবান লজিকবিহীন, অন্যায়কৃৎ, নিষ্ঠুর"; "মৃত্যু ও হিংসা" তাঁর অস্ত্র।

লেখকের বিশ্বাস, ভগবদ্বিশ্বাসীরা চেয়েছিলেন, পৃথিবীতে ভগবানের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে, আর আধুনিক বিপ্লবীরা চেয়েছেন মানুষের রাজ্য। রামকৃষ্ণ মানুষের এই কামনা নাকি জানতেন এবং মানুষের ঈশ্বর-বিদ্রোহের মূল কারণও জানতেন। তিনি নাকি "সেই বিদ্রোহের অন্তিম পর্যন্ত গিয়েছিলেন।" তাঁর "মানুষই ঈশ্বর"—এই বাণীর "আঘাতে কল্পিত দেবদেবীতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র, বর্ণ ও শ্রেণী, প্রভু ও দাসতন্ত্র, দমন-পীড়নকারী রাষ্ট্রতন্ত্র সবই ধূলোয় লুটোয়।" লেখক সেজন্য সমালোচনা করেছেন, "রামকৃষ্ণের বাণীর প্রচার ও অনুশীলনের দায়িত্ব নিয়ে যাঁরা মঠমন্দির গড়েছেন···সে মহতী বাণীর গতিশীল আগ্নেয়রূপ তাঁরা এখনো অনুভব করেননি।" "তাঁরা রামকৃষ্ণকে এস্টাব্লিশমেন্টের খাঁচায় বন্দী করার ব্যবস্থা" করেছেন এবং "সে বন্দীশালা থেকে কপট ভক্তির দুর্গ থেকে আপামর জনসাধারণের সংগ্রামের সাথী রামকৃষ্ণ দলিত মানবভাগ্যের বিরুদ্ধে তাঁর আপোষহীন বিদ্রোহের বাণী নিয়ে পথে ও জনপদে ধাবমান হবার জন্য প্রতীক্ষমান।" এর অর্থ পাঠকেরা বুঝে নিন।

রামকৃষ্ণের ধর্মচেতনা প্রসঙ্গে লেখক প্রশ্ন তুলেছেন (প্রশ্নটি তাঁর রামকৃষ্ণের বিরুদ্ধেই বলে মনে হয়)। রামকৃষ্ণ বলেছেন, "মানুষই ঈশ্বর" "তা মানুষকেই যখন এত বিশ্বাস তাহলে জগৎ ও জীবনকে লক্ষ্যবস্তু বলতে কি বাধা ছিল? কেন ঈশ্বরের ঘেরাটোপ দিয়ে জগৎকে দেখব?" প্রশ্ন তুলেই লেখক বোঝাতে চেয়েছেন, রামকৃষ্ণের ঈশ্বরের ধারণা কি ছিল। তাঁর মতে, "রামকৃষ্ণ ঈশ্বর বলতে বুঝেছেন চেতনা বা চৈতন্যকে" এবং "একদিন এ চৈতন্যের চিহ্নমাত্র ছিল না", "মহাশূন্যে গ্যাস ও ধূলিকণার মধ্যে সুদূর সম্ভাবনারূপে নিহিত ছিল এই সৌরমণ্ডল ও পৃথিবী" এবং "অসম্ভবের সীমা পেরিয়ে এই চৈতন্যের উন্মীলন"। কোন্ যুক্তি ও তর্কের উপর ভিত্তি করে লেখক রামকৃষ্ণের ঈশ্বরের ধারণা সম্পর্কে এই অভিনব তত্ত্ব উদ্ভাবনা করলেন তা উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন মনে করেননি। সত্য কথা হল এই যে, উদ্ভাবনের পশ্চাতে কোন যুক্তি-তর্ক, তথ্য-প্রমাণ নেই। আছে একমাত্র বস্তুবাদী অন্ধবিশ্বাস ও বল্গাহীন অলীক কল্পনা যা সত্য থেকে বহু দূরে নিয়ে যায়।

লেখকের অপর বিশ্বাস কালী মর্ত্যের দেবতা, যেহেতু কালী প্রাক্-নগরসভ্যতার দেবী। রামকৃষ্ণ নাকি কালীকে স্বীকার করে বিশ্বকে জানিয়েছেন তিনি মর্ত্যকেই ও মানুষকে আপনার বলে মনে করেন।

যুক্তি-বিচার ও তথ্য-প্রমাণকে যথেচ্ছ উপেক্ষা করায় এ বস্তুবাদী ব্যাখ্যা কোথাও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি, যদিও গ্রহ-নক্ষত্রের উদ্ভব, মানবসভ্যতার উন্মীলন ও বিকাশ, বাঙালী জাতির আদি ইতিহাস, সুমেরীয় ও সিন্ধুসভ্যতার আলোচনা, লিপির উদ্ভব, ফরাসী-রুশ-চীন বিপ্লব, রুশ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ, "মাও জে দঙের" সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মহিমা, মার্কসবাদ একটি একেশ্বরবাদী ধর্ম, ইসলামে আল্লার ধারণা, ধর্মের বিকাশের ইতিহাস প্রভৃতি হরেকরকম বিষয়ে অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় গ্রন্থখানি ঠেসে দেওয়া হয়েছে সম্ভ্রম ও বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যই।

তথাকথিত বস্তুবাদী 'যুক্তি-বিচার' সত্য থেকে কত দূরে নিয়ে যায়—এ বইখানি তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। কোন্ যুক্তিতে ধরা হবে রামকৃষ্ণ শুধু কালী উপাসক যেখানে তিনি বৈষ্ণবমতে, তন্ত্রমতে, বেদান্তমতেও সাধনা করেছেন? তোতাপুরীর নিকট থেকে রামকৃষ্ণ সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, তবু কেন বলা হল—"তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী নন?" ভারতে সন্ন্যাসীদের চিরাচরিত প্রথা—তাঁরা কুলবাচক পদবী বর্জন করেন, রামকৃষ্ণ তাই করেছিলেন, তবুও কোন্ যুক্তিবলে বলা হল, তিনি তাঁর আদি নিষাদজাতিত্বের পরিচয় উদ্ধার করবার জন্য তা করেছেন? যিনি বৈদিকমতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, তিনি বৈদিক সংস্কৃতি প্রত্যাখ্যান করেছেন বলা যায় কি করে? এ সকলের কোনও সন্তোষজনক উত্তর এ গ্রন্থে পাওয়া যাবে না। সুতরাং কোন সমালোচক যদি বলেন যে, যুক্তি-বিচার ও তথ্য-প্রমাণের কোন পরোয়া না করে লেখক যা উপস্থিত করেছেন তা নিছক গল্পমাত্র, তাহলে তাঁকে দোষ দেওয়া যাবে না।

প্রশ্ন জাগে, কেন এই কল্পিত বস্তুবাদী রামকৃষ্ণকে সৃষ্টির অপপ্রয়াস? এর উত্তর মিলবে গ্রন্থপরিচিতি প্রসঙ্গে এই উক্তিটির মধ্যে—"অদ্যাবধি প্রবাহিত সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে রামকৃষ্ণের প্রতিপক্ষ বুদ্ধ, যীশু বা মহম্মদ নয়, প্রতিপক্ষ নূতন কালের নবধর্মগুরু, কার্ল মার্কস।" এতদিন বস্তুবাদী ইতিহাস প্রণেতারা রামকৃষ্ণকে আখ্যা দিয়েছিলেন "মধ্যযুগীয় ভাবধারার প্রতিনিধি" বলে। আজ তাঁরা strategy পাল্টেছেন, তাঁরা আজ বলছেন, রামকৃষ্ণ বস্তুবাদী, তিনি বিদ্রোহী, তিনি বিপ্লবের ধ্বজাপতাকাবাহী। তাহলে রামকৃষ্ণের কি রইল, তিনি বিলীন হয়ে গেলেন বস্তুবাদী বিপ্লবীদের মধ্যে। এই বিপ্লবী বস্তুবাদী মতবাদের প্রবর্তকরা যা বলেছেন তিনিও তাই বলেছেন—এই হল রামকৃষ্ণের কৃতিত্ব। এভাবে তাঁকে বিলীন করে দেবার চেষ্টা অভিনব বটে! এ প্রচেষ্টা চলতে থাকুক, ততদিনে রামকৃষ্ণের প্রভাবও আরও বাড়তে থাকবে, কারণ রামকৃষ্ণ মিটিয়েছেন মানুষের অধ্যাত্ম-তৃষ্ণা, দিয়েছেন তার প্রকৃত পরিচয়, আর দিয়েছেন সাম্য, শান্তি ও মুক্তির মন্ত্র। মানবতার উৎসমূলে তাঁর প্রেরণা।

এ গ্রন্থের একমাত্র প্রশংসার দিক—অতি উচ্চমানের ছাপা ও বাঁধাই।

—শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত
বেথুন কলেজের অর্থনীতি বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপিকা। স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা বিষয়ক বিশিষ্ট গবেষিকা।
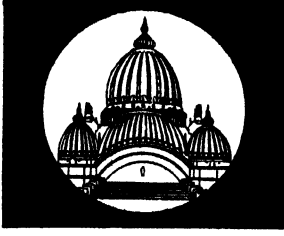
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

বেলুড়মঠে স্মৃতি-পূজা

লোকান্তরিত মঠাধীশ পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মহাসমাধির ত্রয়োদশ দিবসে গত ২৫ মার্চ শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ ও ভজন-কীর্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিনব্যাপী নানাবিধ অনুষ্ঠান-সূচীর মাধ্যমে দিনটি অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। মঠ ও মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র থেকে বহু সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী এই উপলক্ষে বেলুড়মঠে উপস্থিত হন। সকাল থেকে প্রায় দুই লক্ষাধিক ভক্ত নরনারী ঐ দিন বেলুড়মঠে আসেন। গঙ্গাতটস্থ সমাধিপীঠ চন্দ্রাতপ এবং পত্র-পুষ্পাদি মণ্ডিত করে সুচারুরূপে সজ্জিত করা হয়। পূজ্যপাদ মহারাজের শয়নকক্ষে ও সমাধিপীঠে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সুদীর্ঘ সারিতে দাঁড়িয়ে সহস্র সহস্র নরনারীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শান্ত সুশৃঙ্খলভাবে অপেক্ষারত দেখা যায়। মধ্যাহ্নে প্রায় ৬০ হাজার নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

অপরাহ্ণে মঠপ্রাঙ্গণে সুনির্মিত বিশাল মণ্ডপ-তলে এক মহতী স্মরণ-সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ অসুস্থতাবশতঃ স্বয়ং উপস্থিত হতে না পারলেও তাঁর লিখিত একটি বাণী সভায় পঠিত হয়েছিল। পাঠ করেছিলেন স্বামী গহনানন্দ। (দ্রষ্টব্য : 'উদ্বোধন' চৈত্র, ১৩৯১ সংখ্যা)। এই সভায় শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন স্বামী বন্দনানন্দ, স্বামী আত্মস্থানন্দ ও স্বামী গহনানন্দ তাঁদের স্মৃতিচারণের মাধ্যমে। সভায় উপস্থিত কয়েক সহস্র নরনারী ভক্তি-আপ্লুত-চিত্তে স্মৃতিকথাগুলি শ্রবণ করেন।

সভাশেষে শ্রীমন্দিরে আরাত্রিকান্তে ঐদিনের স্মৃতি-উৎসব পরিসমাপ্ত হয়। 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ' শিরোনামে একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী-পুস্তিকাও এই উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছিল।

ছাত্রকৃতিত্ব

মেঘালয় বোর্ড অব্ স্কুল এগজামিনেশনস্-এর ১৯৮৫-র এইচ. এল. সি. পরীক্ষায় **চেরাপুঞ্জী** রামকৃষ্ণ মিশনের দুটি ছাত্র ২য় ও ৫ম স্থান অধিকার করেছে এবং উপজাতির তালিকায় ঐ বিদ্যালয় থেকে তিনটি ছাত্র ১ম, ২য় এবং ১০ম স্থান লাভ করেছে।

উৎসব

টাকী (২৪ পরগনা) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৬ ও ১৭ মার্চ দুদিনব্যাপী শ্রীশ্রীঠাকুরের ১৫০তম আবির্ভাব-তিথি নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। দুদিনের ধর্মসভায় বক্তা ছিলেন স্বামী যতীন্দ্রানন্দ, স্বামী আত্মপ্রভানন্দ, স্বামী অমরানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসিবৃন্দ।

আবির্ভাব-তিথি ও পূজাদির সূচী

বাংলা ১৩৯২ সাল, ইংরেজী ১৯৮৫-৮৬ খ্রীঃ

তিথি-কৃত্য

১।	শ্রীশঙ্করাচার্য	বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী	১২ বৈশাখ	বৃহস্পতিবার	২৫ এপ্রিল	১৯৮৫
২।	শ্রীবুদ্ধদেব	বৈশাখ পূর্ণিমা	২১ বৈশাখ	শনিবার	৪ মে	”
৩।	স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী	৩০ আষাঢ়	সোমবার	১৫ জুলাই	
৪।	স্বামী নিরঞ্জনানন্দ	শ্রাবণ পূর্ণিমা	১৪ ভাদ্র	শুক্রবার		
		শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী	২২ ভাদ্র	শনিবার	৭ সেপ্টেম্বর	”
৬।	স্বামী অদ্বৈতানন্দ	শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী	২৮ ভাদ্র	শুক্রবার	১৩ সেপ্টেম্বর	”
৭।	স্বামী অভেদানন্দ	ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী	২২ আশ্বিন	মঙ্গলবার	৮ অক্টোবর	”
৮।	স্বামী অখণ্ডানন্দ	ভাদ্র অমাবস্যা	২৮ আশ্বিন	সোমবার	১৪ অক্টোবর	”
৯।	স্বামী সুবোধানন্দ	কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী	৮ অগ্রহায়ণ	রবিবার	২৪ নভেম্বর	”
১০।	স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	কার্তিক শুক্লা চতুর্দশী	১০ অগ্রহায়ণ	মঙ্গলবার	২৬ নভেম্বর	”
১১।	স্বামী প্রেমানন্দ	অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী	৫ পৌষ	শুক্রবার	২০ ডিসেম্বর	”
১২।		—	৯ পৌষ	মঙ্গলবার	২৪ ডিসেম্বর	”
১৩।	**শ্রীশ্রীমা**	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী	১৯ পৌষ	শুক্রবার	৩ জানুআরি	১৯৮৬
১৪।	স্বামী শিবানন্দ	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী	২২ পৌষ	সোমবার	৬ জানুআরি	”
১৫।	স্বামী সারদানন্দ	পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী	২ মাঘ	বৃহস্পতিবার	১৬ জানুআরি	”
১৬।	স্বামী তুরীয়ানন্দ	পৌষ শুক্লা চতুর্দশী	১০ মাঘ	শুক্রবার	২৪ জানুআরি	”
১৭।	**শ্রীশ্রীস্বামীজী**	পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী	১৮ মাঘ	শনিবার	১ ফেব্রুআরি	”
১৮।	স্বামী ব্রহ্মানন্দ	মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া	২৭ মাঘ	সোমবার	১০ ফেব্রুআরি	”
১৯	স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ	মাঘ শুক্লা চতুর্থী	২৯ মাঘ	বুধবার	১২ ফেব্রুআরি	”
২০	স্বামী অদ্ভুতানন্দ	মাঘী পূর্ণিমা	১২ ফাল্গুন	সোমবার	২৪ ফেব্রুআরি	”
২১	র	ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া	২৮ ফাল্গুন	বুধবার	১২ মার্চ	”
	(শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব)		২ চৈত্র	রবিবার	১৬ মার্চ	”
২২।	শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু	দোল পূর্ণিমা	১২ চৈত্র	বুধবার	২৬ মার্চ	”
২৩।	স্বামী যোগানন্দ	ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী	১৫ চৈত্র	শনিবার	২৯ মার্চ	”

পূজা-কৃত্য

১।	শ্রী্রী কালীপূজা	বৈশাখ অমাবস্যা	৫ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	১৯ মে	১৯৮৫
২।	স্নানযাত্রা	জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা	২০ জ্যৈষ্ঠ	সোমবার	৩ জুন	”
৩।		আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী	৩ কার্তিক	রবিবার	২০ অক্টোবর	”
৪।	শ্রীশ্রীকালীপূজা	দীপান্বিতা অমাবস্যা	২৫ কার্তিক	সোমবার	১১ নভেম্বর	”
৫।	শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা	মাঘ শুক্লা পঞ্চমী	১ ফাল্গুন	বৃহস্পতিবার	১৩ ফেব্রুআরি	১৯৮৬
৬।	শ্রীশ্রীশিবরাত্রি	মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী	২৪ ফাল্গুন	শনিবার	৮ মার্চ	”

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

শ্রীলঙ্কা শরণার্থী ত্রাণ: মাদ্রাজ ত্যাগরাজনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম শ্রীলঙ্কা থেকে মন্দাপম্ শিবিরে আগত বিপুলসংখ্যক শরণার্থীকে প্রাথমিক সেবাদি করে চলেছেন। ১৩,৯৪৭ জন শরণার্থীর জন্য রন্ধিত খাবার ছাড়াও তাদের মধ্যে ৬৫ কিলোগ্রাম চাল, ২০০টি বান্, ১৬ কিলোগ্রাম বিস্কুট, ১,৯২৮ খানা ছোট জামা, ৪৯৫ খানা ধুতি, ৩৫ খানা তোয়ালে, ৮৮৫টি প্লেট ও মগ এবং ৯২৫ খানা মাদুর ও ৫১৭ খানা সাবান বিতরণ করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে বন্যাত্রাণ: হুগলী জেলার খানাকুল ২ নম্বর ব্লকে মারোখানা ও জগৎপুর অঞ্চল। এই অঞ্চলের ১০টি গ্রামে বন্যায় খুব ক্ষয়ক্ষতি হয়। বন্যাপীড়িতদের মধ্যে ৮৫১ খানা শাড়ি, ৩৬২ খানা ধুতি, ৬,৮৫০ খানা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জামা, ১,১২৫ খানা লুঙ্গি ও ৮৪টি লণ্ঠন বিতরণ করা হয়।

বিহারে অগ্নিত্রাণ: জামশেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির মাধ্যমে বিহারের পাটামদা থানার অন্তর্ভুক্ত দুটি গ্রামে অগ্নিতে ক্ষতিগ্রস্ত ৬৭টি পরিবারের মধ্যে চাল, ডাল, আলু, চিঁড়া, দুধ, কাপড়-চোপড় প্রভৃতি দ্রুত বিতরণ করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে এবং **মেঘালয়ে** পুনর্বাসন কার্য যথারীতি চলছে।

উদ্বোধন-সংবাদ

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী অজজানন্দ প্রত্যেক রবিবার ও বৃহস্পতিবার যথাক্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

৭ এপ্রিল, রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত আলোচনা করেন স্বামী চৈতন্যানন্দ।

সংবাদ

ধর্ম সম্পর্কে মার্কসীয় মত চীনে অগ্রাহ্য

সম্প্রতি রয়টার সূত্রে জানা গেছে যে, চীনের সংবাদ মাধ্যম থেকে বলা হয়েছে—চীনের আকাদেমী অব্ সোশ্যাল সায়েন্সেস্ সংস্থার ডেপুটি সেক্রেটারি শ্রীঝ্যু ফুসান্ (Zhou Fusan) একটি সম্মেলনে সোচ্চারে ব্যক্ত করেছেন যে, 'ধর্ম হচ্ছে জনগণের আফিম' এই মার্কসীয় মতবাদ আদৌ বৈজ্ঞানিক যুক্তিসিদ্ধ নয়—সম্পূর্ণ তো নয়ই।

অপর একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্ শ্রীঝাও (Zhao) উক্ত মতকে খণ্ডন করে আরও স্পষ্টভাবে বলেছেন—'ধর্ম হচ্ছে মনুষ্য সমাজে আত্মশক্তির অঙ্গ। জনগণের সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য, এমনকি দর্শন, নীতিজ্ঞান, স্বভাব ও জীবনচর্যা কোন না কোনভাবে ধর্মের দ্বারাই প্রভাবিত হয়ে থাকে।'

তারাপদ বসু পুরস্কার—১৯৮৫

হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমের ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দের তারাপদ বসু পুরস্কার প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক অধ্যাপক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে অর্পণ করেন আশ্রম-সম্পাদক শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এই উপলক্ষে ৩১ মার্চ আয়োজিত সভায় স্বামী রুদ্রাত্মানন্দের সভাপতিত্বে তারাপদ বসু বক্তৃতা দেন ঐতিহাসিক শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। অন্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ডঃ নিমাইসাধন বসু, অধ্যাপক

শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু, ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রফুল্ল রায়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীঅসীম দত্ত ও শ্রীঅমিত ঘোষ। সুদৃশ্য স্মারক-ফলক নির্মাণ করেন শিল্পী নিত্যানন্দ ভকত।

উৎসব

পাণ্ডু (আসাম) বিবেকানন্দ পাঠচক্র প্রাঙ্গণে গত ২৮ ফেব্রুআরি—৪ মার্চ ১৯৮৫ পর্যন্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচার পরিষদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫০তম জন্মোৎসব নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়।

খগৌল (পাটনা) রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে গত ২৪ মার্চ, ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫০তম আবির্ভাব-তিথি নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। স্থানীয় প্রায় এক হাজার ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অধ্যাপক ডঃ বীরেশ্বর গাঙ্গুলীর সভাপতিত্বে সন্ধ্যায় একটি ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী বেদান্তানন্দ।

পিরোজপুর (বাংলাদেশ) রামকৃষ্ণ আশ্রমে ১ হতে ৩ এপ্রিল বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৫০তম জন্মোৎসব পালিত হয়। "রামকৃষ্ণ জীবনদর্শন" সম্বন্ধে আলোচনা করেন পিরোজপুরের জেলাজজ জনাব আব্দুলকাদের খান, শ্রীনীরদবিহারী নাগ ও স্বামী পরদেবানন্দ। "মানব কল্যাণে স্বামী বিবেকানন্দ" ও "আধ্যাত্মিকতায় সারদা দেবী" সম্বন্ধে বলেন জনাব আলীহায়দার, শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল ও শ্রীপ্রফুল্লকুমার ভাবুক।

নিম্নলিখিত স্থান হতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-তিথি উদ্‌যাপনের সংবাদ পাওয়া গিয়েছে:

ইম্ফল (মণিপুর) রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ। **বাগআঁচড়া** (শান্তিপুর : নদীয়া) রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম। **পাথানজোর** (দণ্ডকারণ্য) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম। **মালেপুর** (বাঁকুড়া) শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ। **পশ্চিম রাজাপুর** (কলিকাতা) শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ। **গোলাঘাট** (আসাম) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি।

দ্বারোদ্‌ঘাটন

পশ্চিম গারো পাহাড়ের অন্তর্গত জিকাবাড়া বেরুপাড়া গ্রামে গত ২৪ ফেব্রুআরি শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতির প্রতিষ্ঠাকল্পে নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন স্বামী দেবদেবানন্দ।
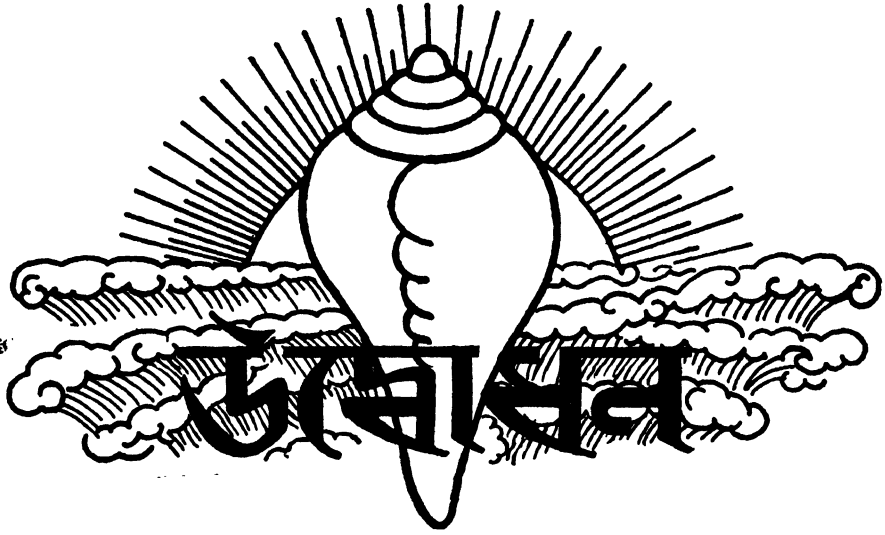
৮৭তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯২

দিব্য বাণী

…যুবকগণ, তোমাদের দ্বারাই ভারতের উদ্ধার সাধিত হইবে। তোমরা বিশ্বাস কর বা না কর, উহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও। মনে করিও না—আজ বা কালই উহা হইয়া যাইবে। আমি যেমন আমার দেহ ও আমার আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী, সেইরূপ দৃঢ়ভাবে ইহাও বিশ্বাস করিয়া থাকি। সেইজন্য হে…যুবকগণ, তোমাদের প্রতি আমার হৃদয় আকৃষ্ট। তোমাদের টাকা কড়ি নাই ; তোমাদেরই উপর ইহা নির্ভর করিতেছে ; যেহেতু তোমরা দরিদ্র, সেইজন্যই তোমরা কাজ করিবে। যেহেতু তোমাদের কিছুই নাই, সেহেতু তোমরা অকপট হইবে। অকপট বলিয়াই তোমরা সর্বত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইবে। এ-কথাই আমি তোমাদিগকে এইমাত্র বলিতেছিলাম। আবার তোমাদিগের নিকট উল্লেখ করিতেছি—ইহাই তোমাদের জীবনব্রত, ইহাই আমার জীবনব্রত। তোমরা যে-দার্শনিক মতই অবলম্বন কর না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমি শুধু এখানে প্রমাণ করিতে চাই যে, সমগ্র ভারতে 'মানবজাতির পূর্ণতায় অনন্ত বিশ্বাস-রূপ প্রেমসূত্র' ওতপ্রোতভাবে বর্তমান, আর আমি স্বয়ং ইহা বিশ্বাস করিয়া থাকি ; ঐ বিশ্বাস সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হউক।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৫৪—৫৫]
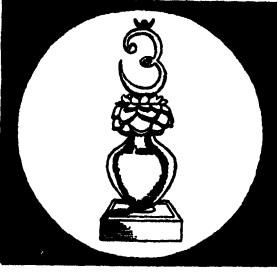
কথাপ্রসঙ্গে

উৎসব-সমীক্ষা

তখন মধ্যাহ্নসূর্য ঠিক মাথার উপরে। চলিতেছিলাম এক সুবিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের আলপথ ধরিয়া। মাঝে মাঝে পানের বরজ ঐ অঞ্চলের মানুষের জীবিকা ও অর্থনীতিকে স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। দূরে দূরে সবুজ বৃক্ষলতাদি সমাকীর্ণ ঘরবাড়ি যেন সমুদ্রের মধ্যবর্তী দ্বীপ বলিয়া মনে হইতেছিল, আবার কখনও-বা গ্রাম্য কাঁচা পথ সর্পিল গতিতে মাঠ ভাঙিয়া ছুটিয়া আসিয়া বড় দরদ লইয়া আমাদিগকে আহ্বান করিতেছিল। সরল মমতাভরা সেই পথের টানকে এড়াইয়া চলিবার সাধ্য ছিল না আমাদের—তাই আল ছাড়িয়া মাঝে মাঝে পথেও উঠিতে হইতেছিল।

কিন্তু আর কত দূর? সহযাত্রী বন্ধু ভরসা দিলেন—সম্মুখের ঐ বাঁকটি ঘুরিলেই আমাদের গন্তব্য গ্রামখানিকে দেখা যাইবে—শোভাযাত্রারও কিছু অংশ দৃষ্টিগোচর হইবে। আশ্বস্ত হইয়া চলিতেই থাকিলাম,—অথবা পথই যেন আমাদিগকে একান্ত আপনবোধে টানিয়া লইয়া চলিল।

'এ নব যুগের নবীন তন্ত্রে, দীক্ষিত কর মিলন মন্ত্রে
সার্থক কর জীবন মোদের চরণে শরণ দাও॥'

—সহসা এক দমকা বাতাসে শতকণ্ঠে সমুত্থিত এই গীতধ্বনি ভাসিয়া আসিল। আমাদিগের দৃষ্টিতেও চমক লাগিল। চক্ষে ভাসিয়া উঠিল—বর্ণাঢ্য সুদীর্ঘ এক মিছিল—গৈরিক পতাকাবাহী পদাতিকের দল মিলিত কণ্ঠে গান গাহিয়া চলিয়াছে। অনুমানে বুঝিতে কষ্ট হইল না—আমরা যাহাদের উদ্দেশে পথে চলিয়াছি, এতক্ষণে তাহাদের অনেক নিকটবর্তী হইতে পারিয়াছি। দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া সেই দীর্ঘ এক কিলোমিটারব্যাপী পদযাত্রায় আমরাও অংশ লইতে পারিয়াছিলাম। শোভাযাত্রীদের সংখ্যা সহস্র না হইলেও সহস্রপ্রায় ছিল, তাহা অল্পক্ষণেই ধারণায় আসিয়াছিল। যাত্রীরা সকলেই স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী—যাহাদের বয়ঃক্রম সাত-আট হইতে শুরু করিয়া পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত—তবে কিশোর-কিশোরীর সংখ্যাই বেশি। অনধিক জন কুড়ি শিক্ষক-শিক্ষিকাও ছিলেন ঐ শোভাযাত্রাটির পরিচালনায়।

এমন বৈচিত্র্যমণ্ডিত অথচ সুশৃঙ্খল ও সজীব মিছিল দেখিবার সুযোগ সচরাচর হয় না,—বিশেষতঃ এই বিপুল সংখ্যক বালক-বালিকা ও তরুণ-তরুণীর গতিশীলতার সঙ্গে সমান তালে প্রবহমান একটি ছন্দ-গাম্ভীর্য আমাদিগের নিকট অত্যন্ত বিস্ময়কর বোধ হইয়াছিল। যেন প্রাণোচ্ছল জাহ্নবী-স্রোত—যাহার গৈরিক ধারায় নিরন্তর বাহিত হয় পবিত্রতা ও প্রশান্তি—যাহার কলকল নাদে কোলাহল নাই, আছে গম্ভীর 'হর হর' ধ্বনি! বিবেকানন্দ-ভাবগঙ্গারই একটি পুণ্য ধারা!!

'জয় শ্রীস্বামীজী মহারাজজীকি জয়'! প্রান্তর ও তৎসংলগ্ন পল্লীর আকাশ-বাতাস এই সোচ্চার জয়ধ্বনিতে সচকিত হইয়া উঠিতেছিল। মিছিলটির

সামগ্রিক প্রকৃতি ছিল বৈচিত্র্যময়। শুদ্ধ উচ্চারণে গীতা পাঠ চলিতেছিল—আবার কোরাণ,—এক অংশে বাইবেল পাঠও শুনা যাইতেছিল। স্বামীজীর রচনা হইতে নির্বাচিত অংশসমূহ ছেলেরা ও মেয়েরা পালাক্রমে পাঠ ও আবৃত্তি করিতে করিতে যাইতেছিল। মহানগরবাসী আমাদের স্লোগ্যান্-বিধ্বস্ত কর্ণগুলির বধিরত্ব উহাতে অনেকখানি ঘুচিয়াছিল—হৃত শ্রবণ-শক্তি যেন ফিরিয়া পাইয়াছিলাম ইহাও এক অনমুভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা!

বলিতেছিলাম, পল্লীঅঞ্চলে অনুষ্ঠিত একটি বিবেকানন্দ-যুব-উৎসবের কথা কলিকাতা হইতে দুই শতাধিক কিলোমিটার দূরবর্তী সেই তথা-কথিত অনগ্রসর গ্রামখানিতে স্বামীজীর নামে যে শ্রদ্ধা, উদ্দীপনা ও জাগরণ-লক্ষণ—সর্বোপরি যে আন্তরিকতা ও শৃঙ্খলাপ্রিয়তা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, তাহা বাস্তবিকই অবিস্মরণীয়। পাকা রাস্তা—কাঁচা রাস্তা—অবশেষে সমান জমিও যেখানে শেষ হইল, আমাদের গাড়িখানিকে বাধ্য হইয়া সেখানেই রাখিতে হইয়াছিল। তারপর মাঠ ভাঙিয়া—কখনও বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের আলপথ ধরিয়া—চার-পাঁচ কিলোমিটার দূরত্ব এইভাবে পায়ে চলিতে হইয়াছিল, ঐ উৎসব-ক্ষেত্রে পঁহুছিবার জন্য। অবশ্য কিছু দূর চলিবার পরেই আমরা উৎসবের অঙ্গস্বরূপ উল্লিখিত শোভাযাত্রাকে ধরিতে পারিয়াছিলাম।

পথে চলিতে চলিতে, যাহা সর্বাগ্রে আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছিল—অথবা বলা চলে, পরম বিস্ময় লইয়া যাহা আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল,—তাহা ছিল সত্য সত্যই অনবদ্য,—ঐ অঞ্চলের প্রতিটি মানুষের অন্তরের সার্থক প্রতিচ্ছবি—নারী-পুরুষ যুবা-বৃদ্ধ সকলেরই অসাধারণ পবিত্রচিত্ততা ও সারল্যের পরিচায়ক। দেখিয়াছিলাম, সুমার্জিত পথের দুই ধারে মাঙ্গলিক আলিম্পনের অনুকরণে চুনের রেখাঙ্কন। উল্লেখ্য যে, আলিম্পনযুক্ত ঐ পথের দৈর্ঘ্য তিন-চারি কিলোমিটারের কম ছিল না—পথের প্রকৃতিও সর্বত্র সমান ছিল না—ঋজু-কুটিল-বন্ধুর বিচিত্র ধরনের। কৌতূহলভরে জনৈক তরুণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—'কেন তোমরা এমন-ভাবে সারা গ্রাম জুড়িয়া চুনের আলপনা রচনা করিয়াছ?' যুবক বন্ধুটির সপ্রতিভ জবাব আমাদিগকে শ্রদ্ধায় অভিভূত করিয়াছিল। বলিয়াছিল: 'বিশ্ববন্দিত স্বামীজী আমাদের এই মাটির উপর দিয়া চলিবেন—তাঁহাকে লইয়া শোভাযাত্রা যাইবে এই পথে। এই গ্রাম তো আজ স্বর্গ। আমাদের তো উচিত ছিল সমস্ত গ্রামখানাকেই ফুলের পাপড়ি দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া, মঙ্গলঘট-আম্রপল্লব ইত্যাদি দিয়া মনের সাধে সাজাইয়া রাখা। কিন্তু তাহা আর পারিলাম কোথায়? তাই কিছু একটা বিকল্পের দ্বারা মনের তৃপ্তিবোধ—এই যাহা কিছু দেখিতেছেন। আমাদের মা-বোন সকলে মিলিয়া ছেলেদের সঙ্গে এক-যোগে সারা রাত্রি জাগিয়া, সূর্যোদয়ের আগেই এই চুনের আলপনা আঁকিয়াছে। গরীব আমরা,—এত চাউলগুঁড়ার সংস্থান করিবার সামর্থ্য নাই, সঙ্গতিও নাই। বুঝিতেই তো পারিতেছেন। আলপনা যে চাউলগুঁড়া জলে-গুলিয়া দিতে হয়—তাহা তো সকলেই জানি আমরা। আমাদের মায়েদের ইচ্ছাও তাহাই ছিল,—কিন্তু সব ইচ্ছাই কি আর কাহারও মেটে? শেষ পর্যন্ত, চুনকে জলে ভিজাইয়া মায়েদের সান্ত্বনা দিতে হয়।'

মাত্র শোভাযাত্রাই একটি উৎসবের সম্পূর্ণ অঙ্গ হইতে পারে না। অপরিহার্য আরও অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে, যাহাতে রচিত হয় একটি সর্বাঙ্গ-সমগ্র উৎসব-সূচী। ঐ-সকল সূচী এবং

উহাদের রূপায়ণের পদ্ধতি-মাধ্যমেই ব্যক্ত হয়,—যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া উৎসব তাঁহার আসনখানি কোথায়—যাহাদের উৎসব তাহাদের প্রাণের গভীরতা—যাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া এত আয়োজন, অনুষ্ঠাতাদের হৃদয়ে তাঁহার ভাবমূর্তিখানি কীরূপ উজ্জ্বল। আলোচ্য বিবেকানন্দ-উৎসবের খুঁটিনাটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি তাই আমাদের বিচার-দৃষ্টিকে আকর্ষণ না করিয়া পারে নাই।

জানিয়াছিলাম, কোন একখানি গ্রাম নহে, একটি বিশেষ সংস্থা নহে,—চৌদ্দটি গ্রামে স্বামীজীর আদর্শে সংগঠিত বিভিন্ন সমিতির সম্মিলিত উদ্যোগে ঐ যুব-উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। উদ্যোক্তাগণ নানা পল্লী-প্রতিষ্ঠানভুক্ত হইলেও, তাঁহাদের প্রতি জনের মনঃপ্রাণগুলি একত্রীকৃত হইয়া যেন একটি বহুবর্ণের স্তবক বা গুচ্ছে পরিণত হইয়াছে। ইহারা তাই বুঝি সগৌরবে নিজেদের পরিচয় দিতেছিল, গুচ্ছ-সমিতিরূপ বৃহৎ পরিবার হইতে আসিয়াছে বলিয়া। বহু বর্ণ ও গন্ধের বৈচিত্র্যমণ্ডিত একটি সুরচিত পুষ্পগুচ্ছ, স্বামীজীর উদ্দেশে সমর্পিত! আমাদিগের নিকট এই ভাবনাটিও অত্যন্ত অভিনব এবং অভিনন্দনীয় বোধ হইয়াছিল।

প্রশ্ন করিয়াছিলাম—সমগ্র কার্যক্রমের মধ্যে এমন নিয়মানুবর্তিতা ও নীতিপরায়ণতার মূলে কাহার নেতৃত্ব রহিয়াছে,—অথবা কে এই সুশৃঙ্খল অনুষ্ঠানকে এমন সুষ্ঠুভাবে সঞ্চালনা করিতেছেন—কিংবা এই উৎসবের প্রধান কর্মকর্তা কে বা কাহারা। জনে জনে জিজ্ঞাসা করিয়াও তাৎক্ষণিক একই উত্তর পাইয়াছি: 'আমাদের প্রত্যেকেরই আন্তরিক চেষ্টা ও ইচ্ছা এইসবের মূলে।' এমনকি কার্যতঃ যাহাকে নেতারূপে প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম—কিংবা যাহার নেতৃত্বকে নির্ভুলভাবেই চিনিয়া লইয়াছিলাম—এমন একজনের মুখেও সেই একই জবাব পাওয়া গিয়াছিল—কিন্তু আরও বিনম্র সলজ্জভাবে। অধিকন্তু ঐ যুবক নেতা বলিয়াছিল: 'স্বামীজীই আমাদের সকলের প্রেরণা। তাঁহার শক্তি ছাড়া আমাদের মতো ছেলেদের পক্ষে এমন দরিদ্র শিক্ষাদীক্ষাহীন পল্লীগ্রামে এইরকম একটা ব্যাপার ঘটানো—যাহাতে সকলে সবরকম দুঃখ-অভাব-ভেদাভেদ ভুলিয়া উৎসবের আনন্দে মাতিয়া উঠিবে—ইহা কি ভাবা যায়? জানেন, আমাদের এই অঞ্চলে সকলে মিলিয়া একখানা সার্বজনীন দুর্গাপূজা কি কালীপূজাও ইতঃপূর্বে হয় নাই। কোন দল, পার্টি, মোড়ল, অঞ্চল কেহই এ-যাবৎ পারে নাই এখানে সবাইকে এক-কাটা করিতে। আর আজ দেখুন—কেবল হিন্দু নহে,—হিন্দু-মুসলমান ছোট-বড় সকলেই স্বামীজীর উৎসবে যোগ দিয়াছে। যোগ দিয়াছে বলা ঠিক নহে—সকলে মিলিয়া উৎসব করিতেছে।

'ছোটরা অনেকেই আট-দশ কিলোমিটার দূরের গ্রাম হইতেও পায়ে হাঁটিয়া আসিয়াছে। সকালের শোভাযাত্রায় তাহাদিগকে তো দেখিলেন। ওরা ঘর হইতে বাহির হইয়াছে শেষ রাত্রিতে—আবার উৎসবশেষে বাড়ি ফিরিবে যখন, তখনও গভীর রাত্রি। অন্ধকারে পথে চলিতেছে—কিসের আশায়? একটু আলোর আশায়। স্বামীজীই আমাদের জীবনের আলো,—ঐ শিশুরাও তাহা জানিয়া গিয়াছে, নিশ্চয়ই মানিবেন। নচেৎ উহারাই-বা আসিয়াছে কেন, আর উহাদের বাপ-মায়েরাও-বা পাঠাইয়াছে কেন! কোন একজনের চেষ্টায় এই জাতীয় কাজ অসম্ভব—আমাদের গুচ্ছসমিতিভুক্ত প্রতিটি ছেলে-মেয়ের প্রাণঢালা উদ্যোগেই—আবার গ্রামের বয়স্কদেরও বিবেকানন্দ-ভক্তির জোরে এমন সাড়া দেখিতেছেন এখানে। চলুন, অন্ততঃ দুই-তিনখানা গ্রাম ঘুরিয়া দেখুন—প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ির চেহারা-গুলি দেখিয়া যান—ঐ-সব বাড়ির মেয়ে-পুরুষ সকলের মুখের পানে একটু মুখ তুলিয়া দেখুন।'

আমরা সত্যই দেখিয়াছিলাম। দেখিয়া বিস্ময় মানিয়াছিলাম। বিশ্বাসই হইতেছিল না যে, আমরা এই হাল আমলের রাজনীতি-সচেতন রাজ্যের এক বিশালায়তন জেলার অভ্যন্তরে ঘুরিতেছি—বাদ-বিবাদ-গোষ্ঠী-দ্বন্দ্বমুখর সমাজেরই একাংশের মধ্যে বিচরণ করিতেছি—দরিদ্র অসংস্কৃত পল্লীজীবনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। লক্ষ্য করিয়াছিলাম, গ্রামের সব কয়টি কাঁচা রাস্তা এমনভাবে সুপরিচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে যে, বোধ হইতেছিল যেন সম্মার্জনী হস্তে একটি সাফাই-বাহিনী নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছে ঐ পথ-পরিষ্করণের কার্যে। একাধিক ব্যক্তির মুখে প্রসঙ্গতঃ একটি উদ্দীপনাকর উক্তি শুনিয়াছিলাম। প্রথমে অবশ্য একজন প্রাচীন লোকই মন্তব্য করিয়াছিলেন : 'বাবা, এই গ্রামের মাটিতে আজ বিবেকানন্দ স্বামীজীই তো চলিবেন। ইহা অপেক্ষাও শুভ সংযোগ আমাদের ভাগ্যে আর কবে কী ঘটিবে বল। তাই বাড়ির বৌ-ঝি সকলে মিলিয়া অন্ধকার রাত্রি থাকিতে উঠিয়া পড়িয়া ঘর-দ্বার-উঠান নিকাইয়াছে, নিজ নিজ বাড়ির সম্মুখের রাস্তাকেও ঝাড়ু দিয়া সাফ্ করিয়া রাখিয়াছে,—যাহারা পারিয়াছে, তাহারা নিজেদের গাছের ফুল তুলিয়া পথে বিছাইয়া রাখিয়াছে। স্বামীজীরই তো চরণ পড়িবে সেখানে!'

মনোমুগ্ধকর আরও কিছু বৈশিষ্ট্য, যাহা সেখানে দেখিয়াছিলাম, তাহা এইরূপ :

(এক) গ্রামের প্রত্যেক গৃহদ্বারে মাঙ্গলিক সজ্জা। মাল্যভূষিত স্বামীজীর চিত্রপট বিলম্বিত দেখিয়াছি প্রায় প্রতি বাড়ির সম্মুখে প্রকাশ্য কোন স্থানে।

(দুই) কোন গৃহের সন্নিকটে উল্লিখিত শোভাযাত্রাটি আসিলেই, বাড়ির শিশু-বৃদ্ধ-যুবা কন্যা-জায়া-মাতা সকলেই বাহিরে আসিয়াছে—লাজ-পুষ্পবর্ষণ সহ শঙ্খধ্বনি করিয়া অভ্যর্থনা জানাইয়াছে, সমবেত কণ্ঠে স্বামীজীর জয়ধ্বনি দিয়াছে।

(তিন) অনেকবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিয়াছি—প্রবীণা মহিলা কেহ কেহ পথের উপরে বিন্যস্ত লাজ ও পুষ্পরাশিকে সযত্নে সম্মার্জনী সহায়ে সরাইয়া পথকে পুনরায় পরিষ্কৃত রাখিতেছেন।

(চার) শোভাযাত্রা অন্তে যে-বিপুল যুব-সমাবেশ পল্লীর প্রান্তভাগে আয়োজিত ছিল—তাহার কার্যক্রম অনেক কারণেই বিশিষ্টতার দাবী রাখে। বক্তৃতা, আবৃত্তি, সঙ্গীত, বিবেকানন্দ-বাণী ও রচনা হইতে পাঠ ইত্যাদিতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করিয়াছিল কেবলমাত্র কিশোর-কিশোরীর দল—স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা, যাহাদের সংখ্যা পনেরো জনেরও বেশি। ছেলে-মেয়েদের নিজস্ব চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য, স্বামীজীর বাণী-উৎকলন প্রভৃতির এক অপরূপ প্রদর্শনী সমগ্র সভা-মণ্ডপ-খানিকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছিল। সভায় উপস্থিতির সংখ্যা ছিল দুই সহস্রাধিক, যাহার মধ্যে নব্বই শতাংশেরও বেশি তরুণ-তরুণী—অর্থাৎ বয়ঃক্রম ত্রিশের নিচে।

(পাঁচ) ব্রতচারী ও অন্যান্য ক্রীড়ানুষ্ঠানগুলি সঞ্চালিত হইতেছিল কোন সোচ্চার 'কমাণ্ড্' বা নির্দেশের দ্বারা নহে,—এমনকি বয়স্ক কোন ব্যক্তির ইশারাতেও নহে। অলক্ষ্য কোন আদেশ এবং নীরব ইঙ্গিতেই সকল ক্রীড়া-কৌশল এবং অনুষ্ঠানের প্রতিটি অঙ্গ সুশৃঙ্খলভাবে প্রদর্শিত হইয়াছিল। আরও আশ্চর্যকর এই জন্য যে, স্থানীয় গ্রামগুলি হইতে আগত এইরূপ ক্রীড়া-সূচীতে সক্রিয় অংশ নিয়াছিল, বিভিন্ন উচ্চতা ও বয়সের বালক-বালিকা প্রায় দুই শত। ইহারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন স্কুলেরও বটে। এখানে উৎসবের কর্মধারায় মিশিয়া গিয়া, ইহাদের

ভিন্নতা কোথায় লীন হইয়া গিয়াছে এবং দেহে-মনে এমন সমান ছন্দের উদ্ভব হইল কিরূপে—লক্ষণীয় তাহাই।

(ছয়) জলখাবার ও ভোজনের সারিতে তুলনাহীন শৃঙ্খলা ও শান্ত পরিবেশ। সর্বোপরি শিষ্টাচার, সময়ানুবর্তিতা, পরিচ্ছন্নতা-বোধ এবং তরুণ স্বেচ্ছাসেবী ও পরিবেশকগণের দরদ ও আন্তরিকতা অনুকরণযোগ্য আদর্শ।

(সাত) ভোজনের পরিপাটি আয়োজনে ও ব্যবস্থায় গ্রামের প্রতি গৃহস্থের সক্রিয় অবদান একটি তুলনাহীন নজীর। মামুলি চাঁদা প্রদানের দ্বারা নহে—প্রত্যেক বাড়ি হইতে চাউল, তরি-তরকারি, শাক-সবজি, তৈল-মশলা, লঙ্কা-লেবু, দুগ্ধ-ঘৃত, এমন কি জ্বালানি প্রভৃতি স্বেচ্ছাদানের মাধ্যমেই এই বৃহৎ যজ্ঞ সম্পাদন হয়। আর সেই সঙ্গে যুক্ত ছিল, গ্রামের কর্মঠ পুরুষ ও মহিলা-গণের স্বতঃপ্রণোদিত সহায়তা এবং যুবকদের অনলস কায়িক শ্রম।

(আট) পল্লীর মাতা ও ভগিনীদের স্বাভাবিক সস্নেহ তত্ত্বাবধান ও শিশু-পরিচর্যা, উৎসবে আগত শত শত বালক-বালিকার অংশগ্রহণকে সানন্দ, সুষ্ঠু ও সম্ভবপর করিয়াছিল। মাতৃত্ব ও স্নেহ-বাৎসল্যের এমন সামাজিক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত অভূতপূর্ব,—একটি অভিনব শিক্ষণীয় উদাহরণ এই গ্রাম্য নারীগণ স্থাপনা করিয়াছেন!

(নয়) প্রতি গৃহের বহির্বাটিস্থ অলিন্দ বা কক্ষ, অথবা বৃক্ষতলকে উপযুক্তভাবে প্রস্তুত রাখা হইয়াছিল—শ্রান্ত বালক-বালিকাদের ও অতিথিদের বিশ্রামের জন্য। ব্যবস্থাপক—বাড়ির লোকেরাই—উৎসবের কর্মকর্তাগণ নহে।

(দশ) পল্লীর জনস্বাস্থ্যের দিকেও প্রখর মনোযোগ এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। পানীয় জলের জন্য যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল—তাহা যে প্রচুর অভিজ্ঞতাপ্রসূত, বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করিয়া যথেষ্ট সংখ্যক অস্থায়ী শৌচাগার ও জলাধার ইত্যাদির নির্মাণ ব্যবস্থা ছিল বাস্তবিকই আদর্শ স্বাস্থ্যবিধিসম্মত,—যাহা কোন বৃহৎ জনস্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠান বা সরকার-চালিত অনুষ্ঠানেও বিরল ঘটনা।

(এগার) গ্রামস্থ বট-অশ্বত্থ আম-কাঁঠাল জাতীয় প্রত্যেক বড় গাছের তলায় এমন সুপরি-চ্ছন্ন ব্যবস্থা রাখা ছিল, যাহাতে কর্মক্লান্ত যে-কোন ব্যক্তি কিছুক্ষণ বসিয়া বিশ্রাম লইতে স্বাভাবিক-ভাবেই আমন্ত্রিত হইবে।

(বারো) নির্দিষ্ট স্থানে নির্মিত একটি মণ্ডপকে নহে,—সমগ্র পল্লীভূমিকে এক বিশাল উৎসব-ক্ষেত্রে পরিণত করা হইয়াছিল আক্ষরিক অর্থেই। স্বামী বিবেকানন্দের তেজোদৃপ্ত বাণী—বাংলায় ও ইংরেজীতে বোর্ডের উপরে লিখিত হইয়া প্রত্যেক গৃহের দেওয়ালে, প্রাচীরগাত্রে, বৃক্ষকাণ্ডে বা স্তম্ভে শোভমান রাখা হইয়াছিল। ততোধিক আশ্চর্য—মাধ্যাহ্নিক আহারান্তে বিভিন্ন বয়সের ছেলে ও মেয়েদের ছোট ছোট দলগুলি যখন কোন বাড়ির বারান্দায় বা গাছের ছায়ায় বিশ্রামরত ছিল—তখনও কাহাকেও আমরা শুইতে গড়াইতে দেখি নাই—কেহ হালকা হাসি-তামাসা-গল্পেও মত্ত হয় নাই। স্তম্ভিত ও শ্রদ্ধান্বিত বিস্ময়ে দেখিয়াছিলাম,—উহারা বৈকালিক যুব-অনুষ্ঠানের জন্য মহড়া দিতেছে একক বা মিলিতভাবে। দুই-চারিজনকে লক্ষ্য করা গিয়াছিল—অতি নিবিষ্ট চিত্তে স্বামী বিবেকানন্দের কোন পুস্তক পড়িতেছে—কেহ-বা আপন মনে দূরে মাঠের পানে দৃষ্টি রাখিয়া স্বামীজীর কোন বাণীকে আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছে—যেন দিগন্তে দণ্ডায়মান স্বামীজীকেই শুনাইতেছিল সবটুকু মনঃপ্রাণ ঢালিয়া।

একটা অখণ্ড ভাবস্রোতে সারাটা দিন কাটিয়াছিল—ঐ অপূর্ব সুন্দর গ্রামাঞ্চলের

বিবেকানন্দ-যুব-উৎসবের মধ্য দিয়া। বাস্তবিকই বোধ হইয়াছিল, তীর্থযাত্রার আনন্দ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হইল। সংসারের আনাচে-কানাচে এইরূপ শান্ত স্নিগ্ধ আলোকিত, অথচ অজানা স্বর্গস্থল এখনও রহিয়াছে!

অস্ত-সূর্যের রক্তিমাভা শুধু বহিঃপ্রকৃতিতে নহে, বিবেকানন্দ-ভাবক যুব-মানসের অন্তরাকাশকেও উদ্‌ভাসিত করিয়াছিল নিঃসন্দেহে। সমবেত তরুণ-তরুণীদের মুখশ্রীতে ইহাই সুব্যক্ত দেখিয়াছিলাম তখন।

উৎসব পরিসমাপ্ত। স্বামীজীর নামে জয়ধ্বনি দিয়া সারিবদ্ধভাবে সকলেই নিজ নিজ ঘরের দিকে যাত্রা করিল। ছোটদের কিছু পূর্বেই যাত্রা করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল—এক-একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকার উপর এক-একদল শিশুর ভার দিয়া। আমাদেরও ফিরিবার পালা এখন। করজোড়ে সকলকে নমস্কার জানাইয়া বিদায় লইতে হইল। আমাদের গাড়ি অপেক্ষা করিতেছে চারি কিলোমিটারের পরে সেই দোকানঘরের সম্মুখে। তাই পুনরায় যাত্রা মাঠের পথে—সেই কাঁচা রাস্তা—আলপথ ধরিয়া। তারপর গাড়ি মিলিবে।

আকাশে ততক্ষণে শুক্লপক্ষের চন্দ্রিমার আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে—তারার প্রদীপগুলিও মিটিমিটি জ্বলিতে শুরু করিয়াছে। নিঝুম প্রান্তরের মধ্য দিয়া আমরা চার-পাঁচ জন চলিয়াছি—কলিকাতায় ফিরিতে হইবে ঐ রাত্রিতেই—পৌছিতে হয়তো-বা মধ্যরাত্রি হইয়া যাইবে। মাঝে মাঝে পানের বরজের পাশ ঘেঁষিয়া চলিবার কালে পবিত্র ধূপের গন্ধে মনে যেন এক দিব্য আবেশ অনুভূত হইতেছিল। সঙ্গী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম—গ্রামবাসীরা প্রতি সন্ধ্যায় তাহাদের পানের বরজে এইভাবে ধূপ-দীপ জ্বালাইয়া শ্রীভগবানকেই স্মরণ করিয়া থাকে—ঐ বরজ মাধ্যমেই তাহাদের সংসারে লক্ষ্মীর আশীর্বাদ বর্ষিত হয়, এই সরল বিশ্বাসেই উহারা এইরূপ করিয়া থাকে।

প্রখর সূর্যতাপ মাথায় লইয়া পল্লীভূমিতে আসিলেও উৎসবান্তে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলাম স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় অভিস্নাত হইয়া। ঐ জ্যোৎস্নায় ছিল শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভরসা ও আশার অপরূপ মাধুর্য,—চতুর্দিকব্যাপ্ত হতাশার ঘোর অন্ধকারে যাহার স্মরণেও মনোবল ফিরিয়া আসে, দৃষ্টির আচ্ছন্নতা কাটিয়া যায়।

বিবেকানন্দ-যুববর্ষ চলিতেছে। বিভিন্ন স্থানে যুবসম্মেলন হইতেছে—স্বামীজীর নাম লইয়া। উহাদের ধরনগুলিও বিচিত্র। সর্বত্রই নানারকম ব্যঞ্জনের আয়োজন করা হয়,—বিবেকানন্দ-ফোড়ন সহযোগে উহাদের স্বাদবৃদ্ধির প্রচেষ্টাও উৎসবের একটি উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু ঐ বিশেষ ফোড়ন যে সকল উপকরণে চলে না,—উহাতে কিছু একটা স্বাদ হয় বটে, কিন্তু তাহা যে সুস্বাদ মোটেই নহে, এই সাধারণ বিচার-বুদ্ধিতে প্রায়শঃই দৈন্য পরিলক্ষিত হয়। শহরে বা শহরের উপকণ্ঠে কোন কোন বিবেকানন্দ-যুব-উৎসবের কার্যক্রমের মধ্যে রাজনৈতিক নেতাগণের স্তুতিগাথাও শুনিতে পাওয়া যায়—স্বামী বিবেকানন্দকেও তাহাদের অনুরূপ কোন রঙে রঞ্জিত করিবার একটা প্রচ্ছন্ন চেষ্টা থাকে। আবার কোথাও-বা স্বামীজীর বাণী আলোচনা চলাকালেই শঙ্খ-ঘণ্টা-উলুধ্বনির প্রবল বর্ষণে সমগ্র সভাস্থলকেই একটি বারোইয়ারি-তলায় রূপান্তরের ঘটা দেখা যায়। কোন কোন যুব-উৎসবকে বিরাট বিচিত্রানুষ্ঠান, কিংবা জলসা, অথবা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, কি বিতর্কের মজলিস, বা যাত্রার আসর রূপেও সংগঠন করা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই বিবেকানন্দ আড়ালে থাকিয়া যান,—আড়ম্বরের ঘনঘটাই সকলের দৃষ্টিকে ঝলসাইয়া দেয়। কোথাও-বা তাঁহাকে লইয়া নূতন দল গড়িবার প্রয়াস মুখ্য হইয়া দাঁড়ায়। স্বয়ং যিনি 'সহস্রদল,' তাঁহাকে

লইয়া বিশেষ দল বাঁধিবার চেষ্টা তাই সর্বক্ষেত্রেই হাস্যকর ব্যাপার হইয়া থাকে শেষ পর্যন্ত।

উৎসব হওয়া উচিত একটা বিশেষ আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া। আদর্শানুরাগই উৎসবের মূল। মতবাদ লইয়া দল গড়া যাইতে পারে, উৎসব হইতে পারে না। অনুষ্ঠান দিয়া লোক জমানো চলিবে, উৎসব জমিবে না। লোকের সংখ্যায় বিজ্ঞাপন স্ফীত হইতে থাকে—কিন্তু উৎসব হইয়া থাকে প্রাণের সমারোহে। উৎসব করিতে হয় কোন সঙ্কল্পকে দৃঢ় করিতে,—কথার বাজার বসাইতে নহে। উৎসবে যাঁহারা আসেন, তাঁহারা আসেন হৃদয়ের ভক্তি-প্রদীপকে জ্বালাইয়া লইয়া,—তাঁহারা কোলাহল জমাইতে আসেন না, আসেন ধীর শান্ত চিত্তে। উৎসবে বাক্-সজ্জা অপ্রয়োজনীয় এবং অবান্তর। উৎসবে থাকে শ্রদ্ধার আলোকমালা, নিষ্ঠার সুদৃঢ় মঞ্চসজ্জা।

মহানগরীর উপান্তে আয়োজিত কোন এক তথাকথিত বিশাল বিবেকানন্দ-যুব-উৎসবের অভিজ্ঞতা এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য। উক্ত যুব-উৎসবে উপস্থিত কয়েক শত নরনারীর মধ্যে প্রকৃত যুবকের সংখ্যা দশের অধিক পাওয়া যায় নাই। আর জন পনেরো ছিল শিশু ও বালক-বালিকা,—যাহাদের ভূমিকা ছিল নৃত্য-গীত-বাদ্যাদিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ এবং অতঃপর অভিভাবকদের সাহচর্যে নিরাপদে—শান্তভাবে সভাস্থল-ত্যাগ। কার্যসূচীর প্রারম্ভেই উদ্যোক্তা-গণের একজন দাঁড়াইয়া অতি বিনম্র সুমিষ্ট ভাষণে নিবেদন করেন: 'নমস্কার। আমাদের বিবেকা-নন্দ-উৎসব এখনই আরম্ভ হইতেছে। উৎসবের কর্মসূচী রচনা ও পরিচালনার ভার আমার উপরেই ন্যস্ত—কিন্তু আমার আসিতে কিছু বিলম্ব হওয়ায় সম্মেলনের কার্য শুরু করিতে সামান্য একটু দেরী হইল। আমি এজন্য বিশেষ দুঃখিত। যদিও জানি বিবেকানন্দ এইরূপ পছন্দ করিতেন না মোটেই। তথাপি আমার বিশ্বাস আছে যে, তিনি আমাদের অসুবিধাগুলিকে উপলব্ধি করিতে সক্ষম—কারণ তিনি আমাদের মতো মানুষেরই পরম দরদী নেতা ছিলেন। আপনারা ধৈর্য ধরিয়া আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন—এই অনুরোধ। আমাদের শিশু-শিল্পীরা এখনও পর্যন্ত সকলে আসিয়া পহুঁছিতে পারে নাই—যাঁহারা বক্তব্য রাখিবেন সেই সব মাননীয় ব্যক্তিরাও কেহ কেহ অনুপস্থিত দেখিতেছি। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহারা সকলে আসিয়া পড়িবেন আশা করিতেছি।'

ঘড়িতে তখন সন্ধ্যা সাতটা। অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবার কথা ছিল বৈকাল পাঁচটায়। 'সামান্য একটু দেরী' এবং অতঃপর আরও 'কিছুক্ষণ অপেক্ষা' করিবার সনির্বন্ধ নিবেদন্ এই-ভাবে মাইক্-সহযোগে সুষ্ঠুভাবে ঘোষণা করিয়া ঐ ভারপ্রাপ্ত উদ্যোক্তা তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন! প্রগতি ও সংস্কৃতিসম্পন্ন নাগরিক পরিবেশে অনুষ্ঠানসর্বস্ব এবং 'বক্তব্য রাখিতে' সদাতৎপর একটি তথাকথিত উৎসবের ইহাই তো সাধারণ নমুনা। পূর্বে উল্লিখিত সেই দূর গ্রামাঞ্চলের উৎসব-চিত্রখানি হইতে ইহা কত স্বতন্ত্র!

বর্তমান যুববর্ষের বিবেকানন্দ-উৎসবগুলি কি আমাদিগকে এই কথাই স্মরণ করাইয়া দিবে না যে, বিবেকানন্দ-বহ্নি হইতে বিচ্ছুরিত স্ফুলিঙ্গ দ্বারা আমাদের তরুণ-তরুণীদের অন্তরের দীপগুলিকে জ্বালাইয়া লইবার উদ্যোগের নামই বিবেকানন্দ-উৎসব। ইহা কোন বিচিত্রানুষ্ঠানের অঙ্গ নহে—কোন মতবাদ প্রচারের সমারোহ নহে—কোন নূতন 'ফ্যাশন্' বা হুজুকও নহে। বিবেকানন্দ-উৎসবের সরল অর্থ বিবেকানন্দ-চর্চা, বিবেকানন্দ-অনুশীলন—বিবেক-বরণ। বিশেষ চিহ্নিত বর্ষে অনুষ্ঠেয় একটি সামাজিক 'প্রোগ্রাম' বা পর্ব-কৃত্য নহে ইহা। বিবেকানন্দ-উৎসব সারাজীবনব্যাপী সাধনীয় ব্রত—লোকলোকান্তরের উৎসব। নিতান্তই সামাজিক দস্তুর রক্ষা অথবা বর্ষ-পঞ্জিকায় নির্দিষ্ট একটা পর্বপালন মাত্রই যদি ইহার তাৎপর্য হয়—তবে বলিতে হইবে, এই উৎসব যত ধুমধামের অনুষ্ঠানই হউক, বিবেকানন্দ-উৎসব অবশ্যই নহে। এই উৎসবের মূলে থাকিবে নিরহঙ্কার সংগঠনশীলতা—গভীর আত্ম-বিশ্বাস, অকুণ্ঠ মানবপ্রীতি এবং প্রকৃত 'মানুষ' হইয়া উঠিবার অদম্য ইচ্ছা। এইরূপ আদর্শ এখনও খুঁজিলে চোখে পড়িবে—যেমন আমরা দেখিয়াছিলাম সেই দূর গ্রামাঞ্চলের তরুণ-তরুণীদের উৎসবের প্রতিটি অঙ্গে। উহাদের কণ্ঠের বিবেকানন্দ-জয়ধ্বনি তাই ভুলিবার নহে।

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে পুরাণ

ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক—বিশিষ্ট গবেষক, লেখক ও সঙ্গীতজ্ঞ।

বর্তমান প্রবন্ধটি উদ্বোধন কার্যালয়ের 'সারদানন্দ হলে' অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে (২৬ জানুআরি, ১৯৮৪) লেখক কর্তৃক পঠিত।

ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনার জীবন্তবিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁহার 'বাণী ও রচনা'র মধ্যে সেই অধ্যাত্মসাধনার মর্মবাণী বিধৃত ও ঝঙ্কৃত। আমরা সকলেই জানি পৃথিবীতে নানা ধর্মমত প্রচলিত আছে এবং প্রত্যেক ধর্মের পিছনে একজন প্রবর্তক পুরুষ আছেন। যেমন ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ, খ্রীষ্টান ধর্মের যীশুখ্রীষ্ট, বৌদ্ধ ধর্মের গৌতমবুদ্ধ প্রভৃতি। তাঁহারা সাক্ষাৎ সেই ধর্মের বা সম্প্রদায়ের স্রষ্টা না হইলেও তাঁহাদের বাণী বা উপদেশ অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের শিষ্য বা ভক্তরা এক-একটি ধর্ম-সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছেন। সেই হিসাবে এই সমস্ত ধর্মই পুরুষ-প্রবর্তিত বা পৌরুষেয়। একমাত্র ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনার ভিত্তি রচিত হইয়াছে কোন পুরুষের দ্বারা নহে, বেদবাণীর দ্বারা। স্বামী বিবেকানন্দ তাই যথার্থই বলিয়াছেন: "এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন, খ্রীষ্টধর্ম খ্রীষ্ট ব্যতীত, মুসলমানধর্ম মহম্মদ এবং বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধ ব্যতীত টিঁকিতে পারে না, কিন্তু হিন্দুধর্ম কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর একেবারে নির্ভর করে না।"[১]

ভারতবর্ষে সেইজন্য নাস্তিকের সংজ্ঞা হইল: "নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ!" যাঁহারা বেদকে মানেন না বা স্বীকার করেন না তাঁহারাই নাস্তিক, ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসীকে নাস্তিক বলে না। ঈশ্বরের অস্তিত্বও বেদের উপর নির্ভরশীল, কারণ ঈশ্বর প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রমাণের বিষয় নহে, একমাত্র শ্রুতিগম্য বা বেদপ্রতিপাদ্য বিষয়। অপৌরুষেয় এই বেদবাণী ঋষিদের দ্বারা দৃষ্ট, সৃষ্ট নহে—"ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ, ন তু মন্ত্রকর্তারঃ"।

বেদভিত্তিক এই অধ্যাত্মসাধনার মহত্ত্ব এইখানেই যে, ইহা কখনও কোন সঙ্কীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেয় নাই। জ্ঞানের উদার অঙ্গনে সকলকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্থান দিয়াছে। কোন ব্যক্তিকে পূজা করিতে হইবে বা মান্য করিতে হইবে নতুবা তাহাকে সেই ধর্মমতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা চলিবে না, এমন কোন গোঁড়ামি আমাদের ধর্মকে কোনদিন কলঙ্কিত করে নাই। স্বামী বিবেকানন্দ এই উদার আর্যধর্মেরই বলিষ্ঠ প্রবক্তা, আধুনিক উদ্গাতা। সেই কারণেই—তিনি বেদকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন, বলিয়াছেন: "আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, চিরকালের জন্য বেদই আমাদের চরম লক্ষ্য ও চরম প্রমাণ।"[২]

কিন্তু এই বেদবোধিত ধর্ম মানুষের কালাতীত সত্তা বা স্বরূপের পরিচয় দিয়া থাকে, ব্যক্তিকে সে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করিতে চায়, তাহার ক্ষুদ্র গণ্ডি ভাঙিয়া ভূমার দিকে লইয়া যাইতে চায়। বেদের ধর্ম তাই প্রকৃতি-অভিমুখী—"পশ্য দেবস্য-কাব্যম্"—এই তার আহ্বান। দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত আকাশের উদার অঙ্গন যেন কোন এক মহাশিল্পীর বিশ্বচিত্র অঙ্কনের সুবিস্তৃত পট এবং সেখানে নানা উজ্জ্বল গ্রহচন্দ্র

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, খণ্ড ৯; পৃঃ ৪৫৮

২ ঐ, খণ্ড ৫; পৃঃ ৬৩

তারকার দীপ্তি। এই ব্যাপ্তি ও দীপ্তি যেন বেদের ঋষিদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। 'দেব'-শব্দের মৌলিক অর্থ সেইজন্য দীপ্তিমান্ বা দ্যুতিমান্। কিন্তু শুধু প্রকৃতির নানা দীপ্ত প্রকাশ মানুষকে তত আকর্ষণ করে না, সে প্রকৃতির মধ্যে পুরুষের আবির্ভাবের জন্য সতৃষ্ণ হইয়া থাকে। মানুষের চিরন্তন মৌল আকর্ষণ মানুষের প্রতি, ব্যক্তির প্রতি। মানুষ নিজেকেই মহৎ করিয়া, বৃহৎ করিয়া পাইতে চায়, প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিতে চায় না। প্রকৃতির সাধনা অব্যক্তের সাধনা, পুরুষের সাধনা ব্যক্তের সাধনা। "অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে"—ইহা চিরন্তন সত্য। দেহধারী আমরা, দেহধারী কাহারও মধ্যেই আমাদের পূর্ণতা দেখিতে চাই, কালাতীত অপেক্ষা দেশকালের মধ্যে তাহার প্রকাশকে আমরা অভিনন্দন করি। বেদে—যেখানে প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি, পুরাণে সেখানে পুরুষের দিকে দৃষ্টি। অবতার, মহাপুরুষ, ভক্তের জীবনগাথাই তাহার উপজীব্য, পুরাণই আমাদের ইতিহাস, দিব্য মানুষের কাহিনী, পঞ্চম বেদ, যাহা বেদের মূল সাধনাকে সর্বসাধারণের কাছে সুলভ ও সুগম করিয়া প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। সেইজন্যই বলা হয়— "ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।"

স্বামীজী বেদ ও পুরাণের এই পরস্পর সম্পর্কের বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। তাই তিনি বলিয়াছেন: "আমাদের শাস্ত্রে দুই প্রকার সত্য উপদিষ্ট হইয়াছে। এক প্রকার সত্য মানুষের নিত্যস্বরূপ-বিষয়ক—ঈশ্বর, জীবাত্মা ও প্রকৃতির পরস্পর সম্বন্ধ-বিষয়ক; আর এক প্রকার সত্য কোন বিশেষ দেশ-কাল-অবস্থার উপর নির্ভর করে। প্রথম প্রকার সত্য প্রধানতঃ আমাদের শাস্ত্র বেদে রহিয়াছে; দ্বিতীয় প্রকার সত্য স্মৃতি-পুরাণ প্রভৃতিতে রহিয়াছে।"[৩] তিনি আরও বলিয়াছেন: "পুরাণ পঞ্চলক্ষণান্বিত। উহাতে ইতিহাস, সৃষ্টিতত্ত্ব নানাবিধ রূপকের দ্বারা দার্শনিক-তত্ত্বসকলের বিবৃতি প্রভৃতি বহু বিষয় আছে। বৈদিক ধর্ম সর্বসাধারণে প্রচার করিবার জন্য পুরাণ লিখিত হয়।...ঐগুলি পণ্ডিতদিগের জন্য নহে, সাধারণ লোকের জন্য।"[৪]

ইহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন জাগে, বেদ ও পুরাণের মধ্যে কাহার প্রামাণ্য? স্বামীজী এ-বিষয়েও অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করিয়াছেন যে, বেদই সর্বপ্রমাণশিরোমণি। তাঁহার ভাষায়: "আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, চিরকালের জন্য বেদই আমাদের চরম লক্ষ্য ও চরম প্রমাণ।"[৫] তিনি আরও বলিয়াছেন: "স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র—এগুলির ততটুকুই গ্রাহ্য, যতটুকু বেদের সহিত মিলে; না মিলিলে অগ্রাহ্য। কিন্তু এখন আমরা পুরাণকে বেদের অপেক্ষা উচ্চতর আসন দিয়াছি। বেদের চর্চা তো বাংলাদেশ হইতে লোপই পাইয়াছে। আমি শীঘ্র সেইদিন দেখিতে চাই, যেদিন প্রত্যেক বাটীতে শালগ্রামশিলার সহিত বেদও পূজিত হইবে, আবালবৃদ্ধবনিতা বেদের পূজা করিবে।"[৬] বেদের প্রতি স্বামীজীর এই অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যেরই অনুসারী। শাস্ত্রেও বলা হইয়াছে: "শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী।" ইহারই যেন প্রতিধ্বনি করিয়া স্বামীজী বলিয়াছেন: "যদি কোন পুরাণ বেদের বিরোধী হয়, তবে পুরাণের সেই অংশ নির্মমভাবে ত্যাগ করিতে হইবে।"[৭]

---

৩ ঐ, খণ্ড ৫; পৃঃ ৬২
৪ ঐ, খণ্ড ৫; পৃঃ ১৮—১৯
৭ ঐ, খণ্ড ৫; পৃঃ ৬৩
৫ ঐ, খণ্ড ৫; পৃঃ ৬৩
৬ ঐ, খণ্ড ৫; পৃঃ ৩৬৪

তিনি বিষয়টি বিশদ করিয়া আরও বলিয়াছেন: "পুরাণে অনেক কথা দেখিতে পাই, যেগুলি বেদের সহিত মিলে না। যথা, পুরাণে লিখিত আছে—কেহ দশ সহস্র, কেহ বা বিশ সহস্র বৎসর জীবিত রহিয়াছেন, কিন্তু বেদে দেখিতে পাই, 'শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ',—এখানে বেদের কথাই গ্রাহ্য।"[৮] প্রামাণ্য বিষয়ে স্বামীজী সেইজন্য বেদ বা উপনিষদ্‌কে সর্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন এবং কোনক্ষেত্রেই যে ইহার ব্যতিক্রম করা উচিত নহে, এ-বিষয়েও তিনি সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন: "পুরাণ, তন্ত্র ও অন্যান্য সমুদয় গ্রন্থ, এমন কি ব্যাসসূত্র পর্যন্ত প্রামাণ্যবিষয়ে গৌণ-মাত্র, আমাদের মুখ্য প্রমাণ উপনিষদ্। মন্বাদি-স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণ প্রভৃতির যতটুকু উপনিষদের সহিত মেলে, ততটুকুই গ্রহণীয়; যেখানে উভয়ের বিরোধ হইবে, সেখানে স্মৃতি প্রভৃতির প্রমাণ নির্দয়ভাবে পরিত্যাজ্য। আমাদিগকে এই বিষয়টি সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। কিন্তু ভারতের দুরদৃষ্টক্রমে আমরা বর্তমানে ইহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি।"[৯]

প্রামাণ্য বিষয়ে বেদ উপনিষদ্ অপেক্ষা পুরাণ হেয় হইলেও স্বামীজী তাহার অন্য মূল্য সম্বন্ধে কিন্তু সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। তিনি ঐ সঙ্গেই বলিয়াছেন: "তাহা হইলেও পুরাণে যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্মের অনেক সুন্দর সুন্দর কথা আছে, সেগুলি অবশ্য লইতে হইবে।"[১০] এছাড়াও পুরাণের অসংখ্য কাহিনীরাজি যে আমাদের একটি পরম সম্পদ সে সম্বন্ধেও স্বামীজীর স্বাভাবিক গর্ববোধ ছিল। তিনি বলিয়াছেন: "আমাদের প্রত্যেক পুরাণে এত গল্প আছে যে-গুলি পৃথিবীর গ্রন্থাগারসমূহের তিন-চতুর্থাংশ পূর্ণ করিতে পারে—এ-সকলই আমাদের আছে।"[১১]

আমাদের মনে সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন জাগে, পুরাণের এই সব কাহিনী সবই কি নিছক কল্পনামূলক অলস ভাববিলাস? স্বামীজী বলিতেছেন: "কিছু-না-কিছু ঐতিহাসিক সত্য সকল পুরাণেরই মূল ভিত্তি। পুরাণের উদ্দেশ্য—নানাভাবে পরম সত্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া।"[১২] ভারতবর্ষে ইতিহাস তাই পুরাণের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ এবং ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত। ভারতবর্ষে ইতিহাসের সংজ্ঞা কি ছিল তাহা আমরা নিম্নলিখিত একটি উদ্ধৃতি হইতে উপলব্ধি করিতে পারি:

"মূঢ় যারা, গণে অবিস্মরণীয় শুধু
শুষ্ক ছিন্ন ঘটনার পঞ্জিকা শ্রীহীন
কোন্ মন্বন্তরে ছিল মনু কোন্ জন,
সূর্যবংশ-চন্দ্রবংশ রাজতরঙ্গিণী,
ছিল প্রতিপক্ষ কার কোন্ ধনুর্ধারী
কোন্ মুনি কারে দিল কবে অভিশাপ!
—নহে নহে। সত্য ইতিহাস বলি তারে
যবে চিত্রণীয় তার হয় সুচরিত
সাধু-সজ্জনের, মহাপুরুষের,—যবে
কোন্ অবতার আনি কোন্ নবভাব
জাগালো সে কোন্ আলো কোন্ নব সুরে
—হেন কাহিনীর গাঁথে সার্থক মালিকা!"[১৩]

আমরা প্রারম্ভেই লক্ষ্য করিয়াছি পুরাণ পুরুষনিষ্ঠ অর্থাৎ বিশিষ্ট পুরুষের বা মহাপুরুষের চরিত্র-চিত্রণই তাহার লক্ষ্য। এইসব পুরুষেরা যথার্থই ঐতিহাসিক চরিত্র কিনা, শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামচন্দ্র নামে সত্যই কোন ব্যক্তি ছিলেন কিনা এ-বিষয়ে অনেক সময়েই আমাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইয়া থাকে। আমাদের দেশ বিশেষ

৮ ঐ, খণ্ড ৫; পৃঃ ৩৬৪
৯ ঐ, খণ্ড ৫; পৃঃ ২২৯—২৩০
১০ ঐ, খণ্ড ৫; পৃঃ ৩৬৪
১১ ঐ, খণ্ড ৫; পৃঃ ১৩০
১২ ঐ, খণ্ড ৯; পৃঃ ৪৫৮
১৩ কৃষ্ণকথা'কাহিনী: দিলীপকুমার রায়, পৃঃ ৬৯

ইতিহাস-সচেতন নহে, এ অভিযোগও সর্বত্র শোনা যায়। ইতিহাস ও পুরাণের সম্পর্ক বিষয়ে স্বামীজী যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি বলিতেছেন: "আর যদিও সেগুলিতে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য না থাকে, তথাপি উহারা যে উচ্চতম সত্যের উপদেশ দিয়া থাকে, সেই হিসাবে আমাদের নিকট খুব উচ্চ প্রামাণ্য গ্রন্থ। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ রামায়ণের কথা ধরুন—অলঙ্ঘনীয় প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে উহাকে মানিতে হইলেই যে, রামের ন্যায় কেহ কখনও যথার্থ ছিলেন, স্বীকার করিতে হইবে, তাহা নহে, রামায়ণ বা মহাভারতের মধ্যে যে-ধর্মের মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে, তাহা রাম বা কৃষ্ণের অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না; সুতরাং ইঁহাদের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হইয়াও রামায়ণ-মহাভারতকে মানবজাতির নিকট উপদিষ্ট মহান্ ভাবসমূহ সম্বন্ধে উচ্চ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায়।"[১৪]

স্বামীজী এইভাবে পুরাণের প্রামাণ্য অকাট্য-ভাবে স্থাপন করিয়াছেন এবং যাঁহারা পুরাণের কোনও যথার্থ ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই বলিয়া কটাক্ষ করেন অথবা তাহার প্রামাণ্যে সংশয় প্রকাশ করেন তাঁহাদের সমুচিত উত্তর প্রদান করিয়াছেন নিম্নলিখিত দৃপ্ত উক্তির মাধ্যমে: "কোনও পুরাণে বর্ণিত দার্শনিক সত্য কতদূর প্রামাণ্য, তাহার বিচার করিতে হইলে ঐ পুরাণে বর্ণিত ব্যক্তিগণ বাস্তবিকই ছিলেন, অথবা তাঁহারা কাল্পনিক চরিত্রমাত্র, এ বিচারের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। পুরাণের উদ্দেশ্য ছিল মানব-জাতির শিক্ষা—আর যে-সকল ঋষি ঐ পুরাণ-সমূহ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা কতকগুলি ঐতিহাসিক চরিত্র লইয়া ইচ্ছামত যত কিছু ভাল বা মন্দ গুণ উহাদের উপর আরোপ করিতেন—এইরূপে তাঁহারা মানবজাতির পরিচালনার জন্য ধর্মের বিধান দিয়াছেন। রামায়ণে বর্ণিত দশমুখ রাবণের অস্তিত্ব—একটা দশমাথাযুক্ত রাক্ষস অবশ্যই ছিল—মানিতেই হইবে, এমন কি কথা আছে? দশানন নামে কোন ব্যক্তি বাস্তবিকই থাকুন, বা উহা কবিকল্পনাই হউক, ঐ চরিত্রসহায়ে এমন কিছু শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, যাহা আমাদের বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য।"[১৫] স্বামীজী সেইজন্য পুরাণের প্রামাণ্য নির্ণয়ে বেদের অনুবর্তিতাকেই একমাত্র নিয়ামকরূপে নির্দেশ করিয়াছেন: "দেখুন, কৃষ্ণ জগতের সমক্ষে নূতন বা মৌলিক কিছুই শিক্ষা দেন নাই, আর রামায়ণকারও এমন কথা বলেন না যে, বেদাদি-শাস্ত্রে যাহা আদৌ উপদিষ্ট হয় নাই, এমন কিছু তত্ত্ব তিনি শিখাইতে চান।"[১৬] বেদানুবর্তিতাই তাই পুরাণের প্রাণ বা উপজীব্য।

পুরাণের আর একটি বিশিষ্ট অবদানের দিকে স্বামীজী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। পুরাণের মধ্যেই ভক্তির মন্দাকিনীস্রোত প্রবাহিত হইয়া অগণিত জনমানসকে স্নিগ্ধশ্যামল করিয়া রাখিয়াছে, যাহা আর অন্য কোন শাস্ত্রে, দর্শনে বা সাহিত্যে পাওয়া যায় না। এই হিসাবে পুরাণের এক অনন্যবৈশিষ্ট্য আছে। স্বামীজী তাই বড় সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন: "পুরাণেই ভক্তির চরম আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তি-বীজ পূর্বাবধি বর্তমান; সংহিতাতেও উহার পরিচয়, উপনিষদে কিঞ্চিৎ অধিক বিকাশ, কিন্তু পুরাণে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়।

---

১৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, খণ্ড ৯, পৃঃ ৪৫৮
১৫ ঐ, ঐ, ঐ
১৬ ঐ, ঐ, ঐ

সুতরাং ভক্তি কী বুঝিতে হইলে আমাদের এই পুরাণগুলি বুঝা আবশ্যক…একটি জিনিস আমরা নিশ্চিতরূপে দেখিতে পাই ; প্রায় সকল পুরাণেই আগা হইতে গোড়া পর্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিলে সর্বত্র এই ভক্তিবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধু-মহাত্মা ও রাজর্ষিগণের চরিত-বর্ণনমুখে উহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ ও আলোচনা করা হইয়াছে এবং দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। সৌন্দর্যের মহান্ আদর্শের—ভক্তির আদর্শের দৃষ্টান্তসমূহ বিবৃত করাই যেন পুরাণগুলির প্রধান কাজ মনে হয়।"[১৭] যে কোন পুরাণ পাঠ করিলেই স্বামীজীর এই উক্তির যাথার্থ সকলেই উপলব্ধি করিবেন।

শুধু ভক্তিই নহে, পুরাণে শক্তির এক আদর্শ ছবিও যত্র তত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই কারণেই আমরা পুরাণের মধ্যে নানা তুমুল যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনাও দেখিতে পাই। যেমন শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবী আগাগোড়াই নিদারুণ সংগ্রামে নিরত। শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করাই যেন এইসব কাহিনীর লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। পুরাণের এই দিকটিও স্বামীজীর দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। তিনি বলিতেছেন : "বস্তুতঃ শক্তির প্রকাশনাই সকল পুরাণ-সাহিত্যের মূলভাব। নিম্নস্তরের পুরাণগুলিতে—আদিমযুগের রচনায় এই শক্তির অভিব্যক্তি দেখা যায় দেহের পেশীতে। পুরাণগুলিতে বর্ণিত নায়কগণ আকৃতিতে যেমন বিশাল, বিক্রমেও তেমনি বিপুল। একজন বীরই যেন সমগ্র বিশ্বজয়ে সমর্থ। মানুষের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার শক্তি দেহ অপেক্ষা ব্যাপকতর ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে মহাপুরুষগণ উচ্চতর নীতিজ্ঞানের নিদর্শনরূপে পুরাণাদিতে চিত্রিত হইয়াছেন। পবিত্রতা উচ্চনীতিবোধের মধ্য দিয়াই তাঁহাদের শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে।"[১৮] স্বামীজীর এই নিপুণ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়াই আমরা প্রাচীনকালে পুরাণগুলির সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদের সূত্রটিও যেন আবিষ্কার করি। স্থূল দৈহিক শক্তি হইতে ক্রমশঃ বিশুদ্ধ আত্মিক শক্তিতে উন্নীত করাই যেন তিন শ্রেণীর পুরাণের লক্ষ্য।

পুরাণ সম্বন্ধে স্বামীজীর এই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্য দিয়া ইহাই পরিস্ফুট হইয়া ওঠে যে, স্বামীজী সবকিছুই স্বচ্ছ, মুক্ত ও বৈজ্ঞানিক মন দিয়াই পর্যালোচনা করিতেন। অনেকে মনে করেন যে, তাঁহার মতো প্রখর বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ কখনও পুরাণের কল্পলোকে বিচরণ করিতে আগ্রহবোধ করিতে পারেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্কে আসিয়া এবং কিছুটা তাঁহার দ্বারা সম্মোহিত হইয়াই তিনি পুরাণাদি লইয়া কিছু আলোচনা করিতে যেন বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই যে, স্বামীজী বিনা বিচারে কোন কিছুই কখনও গ্রহণ করেন নাই এবং শ্রীরামকৃষ্ণও কখনও কিছু না বাজাইয়া অর্থাৎ নিজে যাচাই না করিয়া গ্রহণ করিতে তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছেন। আমাদের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা হইতে ইহা বারংবারই প্রমাণিত হইয়াছে যে, স্বামীজী পুরাণের যে অংশ গ্রাহ্য নহে তাহাকে যেমন নির্মমভাবে পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তেমনই যে অংশ গ্রাহ্য বা উপাদেয় তাহাকে তেমনই সমান সমাদরের সঙ্গে বরণ করিয়া লইতেও আদেশ করিয়াছেন। ইহাই যথার্থ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, যাহা কোন প্রকার সংস্কারের দ্বারা আবদ্ধ নহে। প্রাচীন বলিয়াই অন্ধভাবে তাহাকে মাথায় তুলিয়া নাচে না অথবা তাহা বৃথা আবর্জনা মনে করিয়া ফেলিয়াও দেয় না।

১৭ ঐ, খণ্ড ৫ ; পৃঃ ২৮৯

১৮ ঐ, খণ্ড ৩ ; পৃঃ ২৭৪

পুরাণ যে ভারতবর্ষের সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং তাহাতে প্রতিফলিত আদর্শ যে আজও সকল ভারতবাসীর অনুসরণীয় বা অনুকরণীয়, একথাও স্বামীজীর সেই উদাত্ত ও উদ্দীপ্ত ঘোষণায় স্বদেশমন্ত্রে ঝঙ্কৃত হইয়াছে: "হে ভারত, ভুলিও না..."[১৯]।—এই দিব্যবাণীর মধ্য দিয়া ভারতবাসীকে যে আদর্শ বিস্মৃত না হইবার জন্য তিনি আহ্বান জানাইয়াছেন তাহার মূলগুলি প্রধানতঃ পুরাণেই নিহিত। সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী পুরাণেরই আদর্শ নারী, সর্বত্যাগী শঙ্কর বা গৌরীনাথ ও জগদম্বা পুরাণেরই দেবতা।

আধুনিকতার মোহে আমরা যদি পুরাণের অনুশীলন করিতে বিস্মৃত হই তাহা হইলে আমরা আমাদের জীবনে পুরাণের প্রভাবকেই অস্বীকার করিয়া আত্মঘাতী হইব। তাই স্বামীজীর নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি দিয়াই আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতে চাই: "আধুনিক কালে পুরাণগুলির প্রভাব শুধু স্বীকার করিলেই চলিবে না, পুরাণের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, কারণ পরবর্তী যুগের অবনত বৌদ্ধধর্ম আমাদিগকে যে-ধর্মের অভিমুখে লইয়া যাইতেছিল, পুরাণগুলি আমাদিগকে তদপেক্ষা প্রশস্ততর ও উন্নততর এবং সর্বসাধারণের উপযোগী ধর্ম শিক্ষা দিয়াছে।...যতদিন ব্যক্তিগত ও বিষয়গত প্রীতি বলিয়া কিছু থাকিবে, ততদিন কেহ পুরাণের উপদেশাবলী অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিবে না। যতদিন সাহায্যের জন্য কোন ব্যক্তির উপর নির্ভর করা-রূপ মানবীয় দুর্বলতা বর্তমান থাকিবে, ততদিন এই-সকল পুরাণ কোন না কোন আকারে থাকিবেই থাকিবে।...পুরাণ ছাড়িবার জো নাই, ...মানুষের প্রকৃতিই ইহা চাহিয়া থাকে।"[২০]

স্বামীজীর নির্দিষ্ট পথে দেশে পুরাণের পঠন-পাঠন ও পুনর্মূল্যায়ন প্রবর্তিত হউক, ইহাই প্রার্থনা। তাহাতেই দেশের ও দশের মঙ্গল।

১৯ ঐ, খণ্ড ৬; পৃঃ ২৪৯

২০ ঐ, খণ্ড ৫; পৃঃ ২৯০—২৯১

প্রতীক্ষায় থাকা

শ্রীমতী অরুন্ধতী রায়

সাহিত্যসেবিকা।

কি আসে যায়
বসন্তের নিটোল পদক্ষেপে
জীবনে
কিংবা নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ব্যাপ্তিতে
অথবা
হা-হা দীর্ঘশ্বাস দেবদারুর পাতায়।
অন্তহীন মহাকাশের শূন্যগর্ভে
বিলীন তো হবেই কোনদিন

যতই আবৃত হোক আঁখিপল্লব
হাসির ঔজ্জ্বল্যে—
অবচেতন স্তর পেরিয়ে
মন তো পাবেই তার সন্ধান
কোনদিন—
আত্মমগ্ন নিঃসীম চেতনায়
এখন শুধু প্রতীক্ষায় থাকা।

বুদ্ধপূর্ণিমা

শ্রীহেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী

বৌদ্ধধর্ম ও ভারত-সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা 'জগজ্জ্যোতি'র সম্পাদক।

বৈশাখী পূর্ণিমা যা সর্বসাধারণে বুদ্ধপূর্ণিমা নামে পরিচিত। এ এক চিরস্মরণীয় তিথি। তিনভাবে জয়যুক্ত এই তিথি। এই তিথিতেই মহামানব বুদ্ধের জন্ম, এই তিথিতেই তাঁর বুদ্ধত্ব-লাভ, আবার এই তিথিতেই তাঁর পরিনির্বাণ-প্রাপ্তি। মানবসভ্যতার যুগ যুগান্তরের ইতিহাসে এমন একটা মহিমান্বিত দিন বিরল।

অপূর্ব এই মহামানব বুদ্ধের জীবনকাব্য। শান্তিপূর্ণ রাজ্য, স্নেহময় পিতা, রূপেগুণে অতুলনীয়া যুবতী স্ত্রী, শিশুপুত্র, রাজপ্রাসাদে বিলাসের অজস্র আয়োজন—এরই মধ্যে যুবক সিদ্ধার্থ সন্ধান পেলেন মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের মূল সমস্যার। জীবনের স্তরে স্তরে রোগ শোক, জরা মৃত্যুর যে দুঃখ, সেই দুঃখের সত্যরূপ তিনি দেখলেন। প্রশ্ন জাগল রাজপুত্র সিদ্ধার্থের মনে—সত্যিই কি এর থেকে পরিত্রাণ নেই? দুঃখ আছে, দুঃখের নিরোধও আছে—কোন্ পথে? সেই মুক্তিপথের সন্ধানে রাজা ও রাজ-সিংহাসন, প্রিয়তমা পত্নী, নবজাত পুত্র সব পিছনে রেখে তিনি নৈশ অন্ধকারে হলেন অভিনিষ্ক্রান্ত। তারপর এক বৈশাখী পূর্ণিমায় শাক্যকুমার গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করে নব রূপান্তরে মানুষের মুক্তিদাতারূপে আবির্ভূত হলেন। পৃথিবীর মানুষকে দিলেন নূতন ধর্ম, নীতি, নূতন সমাজ-বিন্যাস কৌশল। প্রচলিত বিশ্বাস, আচরণের ধর্ম, গতানুগতিক লোকব্যবহার—এ সবকে উপেক্ষা করে ধর্ম ও সঙ্ঘের নামে তিনি আহ্বান জানালেন সকলকেই। বললেন—আমি ঈশ্বর নই বা ঈশ্বরপ্রেরিত নই। আমি মানব সন্তান, সাধনা-বলে জেনেছি জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য। জেনেছি দুঃখ কি, জেনেছি দুঃখের কারণ, সেই কারণ দূর করবার উপায়ও জেনেছি। তিনি সকলকে আহ্বান জানালেন জীবনের পথে, জীবনের প্রসারের পথে, নির্মল বিচারবুদ্ধির পথে। তাই তিনি লোকগুরু। তাঁরই কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হল সত্যের জাগরণ মন্ত্র। আজ তাই আবার এসেছে সেই বৈশাখী পূর্ণিমা বুদ্ধ-আত্মার অভ্যুদয় চিহ্নিত সেই আলোকতিথি।

বুদ্ধ-আত্মার আবির্ভাব মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক বিরাট দিক পরিবর্তন। বিবর্তনের একটা আলোকময় জাগরণ। হৃদয় ও মস্তিষ্কের অপূর্ব সমন্বয়। আত্মবিশ্বাস আর আত্মপ্রচেষ্টা—পৃথিবীর মানুষকে তিনি দিলেন এই মহামন্ত্র। বললেন—এই পথেই আছে আত্মবিকাশ ও আত্মোপলব্ধি।

মৈত্রীভাবনার মহাভাবুক সেই তথাগতের প্রয়োজন আজ নূতন করে দেখা দিয়েছে হিংসা-দ্বেষ-কলুষিত এই পৃথিবীতে। দেখা দিয়েছে এই সঙ্কটময় মুহূর্তে যখন 'মানুষকে অশ্রদ্ধা করেই মানুষ মানুষের অশ্রদ্ধা-ভাজন হল। আজ মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে, মানুষ আজ সত্যভ্রষ্ট, তার মনুষ্যত্ব প্রচ্ছন্ন। তাই আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে মানুষের প্রতি মানুষের এতো সন্দেহ, এতো আক্রোশ, এতো আতঙ্ক। তাই আজ এই মহামানবকে এই বলে ডাকবার দিন এসেছে, তুমি আপনার প্রকাশের দ্বারা মানুষকে প্রকাশিত করো'—পূর্ণ কর তাকে।

প্রেম, মৈত্রী আর করুণার মূর্ত-প্রতীক বুদ্ধ। বুদ্ধকে কেউ বলেন অবতার, কেউ বলেন মানব-শিক্ষক, লোকগুরু। আবার কেউ বলেন নির্বাণের

মন্ত্রদাতা। তিনি এ সবই। কিন্তু সবার আগে তিনি ইতিহাসের উত্তম পুরুষ। তিনি মানব-প্রেমিক। তিনি এমন এক ধর্মের প্রচারক—যে ধর্মে ঈশ্বর অনুচ্চারিত, আছে শুধু আত্মত্যাগ। এই আত্মত্যাগের মধ্যেই বুদ্ধ আবিষ্কার করেছেন দুঃখনিবৃত্তির রাজপথ। বিশ্বমানবের ইতিহাসে বুদ্ধ তাই চিরোজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। ইতিহাসের এক নিগূঢ় ও মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেই তিনি সিদ্ধার্থ। সভ্যতার ইতিহাসে বুদ্ধই জনজাগরণের অগ্রদূত। মানবসমাজে এই মহামানবই গতিশীল করে তুলেছিলেন সর্বোচ্চ নৈতিক ভাবরাশি, যা পৃথিবীর কোথাও হয়নি, অথচ যার প্রয়োজন ছিল পৃথিবীতে। এই মহামানবের জ্ঞানসূর্য থেকেই বিকীর্ণ হল নীতিরশ্মি পৃথিবীর সব দেশে। জগতে তিনিই প্রথম গুরু, যিনি আরম্ভ করলেন ধর্মপ্রচার, গড়লেন সঙ্ঘ। বললেন—প্রজ্ঞার আলোকে চিনে নাও মুক্তির পথ। বললেন—পৃথিবী জয়ের চেয়েও আত্মজয় বড়। বললেন—সর্বজীবের প্রতি ভালবাসা, এর চেয়ে বড় ধর্ম আর কিছু নেই। বিশ্বমানবের মুক্তির সঙ্গে তিনি এক করে দিতে পেরেছিলেন নিজের মুক্তি। তাই তাঁর কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হল সাম্য-মৈত্রীর অমৃতময় বাণী।

পৃথিবী আজ উন্মত্ত হয়ে উঠেছে অপ্রমেয় আচরণ আর হিংসায়। বুদ্ধদেব বলেছেন—প্রেমের দ্বারা বিশ্বকে রক্ষা কর, ক্ষমার দ্বারা বিশ্বকে ধারণ কর, প্রীতির দ্বারা সবার সাথে সংযুক্ত হও। কিন্তু লোভাতুর মানুষ নির্লোভ হতে পারছে না। লোভাতুর পতঙ্গের মতো মানুষ নিজেও মরছে, বিশ্বকেও ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। নীতি নিয়ে ধর্ম নিয়ে বাঁধছে লড়াই। পৃথিবীর এক-একটা বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে এর স্বাক্ষর পাওয়া যায়। জীবনের মধ্যে মৃত্যুকে জাগ্রত করে অমৃতের পুত্রেরা বিষে বিষে নীল হয়ে উঠছে। আজকের পৃথিবীর চরম সঙ্কটময় সময়ে যেখানে হানাহানির গ্লানি সব মানুষকে বইতে হচ্ছে, যেখানে লোভের সীমাহীন প্রতাপ মানুষের রক্ত-ধারায় মাটিকে কর্দমাক্ত করছে সেখানে আবার নূতন করে ভাববার সময় এসেছে—প্রাণ কোথায়, ত্রাণ কোথায়, জীবনের প্রস্ফুটিত সমারোহ কোন্‌খানে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমায় আহ্বান জানাই—'বর্ণে বর্ণে জাতিতে জাতিতে অপবিত্র ভেদবুদ্ধির নিষ্ঠুরতা, মূঢ়তা ধর্মের নামে আজ পঙ্কিল করে তুলেছে ধরাতল। পরস্পর হিংসার চেয়ে সাংঘাতিক পরস্পর ঘৃণায় মানুষ এখানে পদে পদে অপমানিত। সর্বভাবে মৈত্রীকে যিনি মুক্তির পথ বলে ঘোষণা করেছিলেন, সেই তাঁর বাণীকে আজ উৎকণ্ঠিত হয়ে কামনা করি—এই ভ্রাতৃবিদ্বেষ কলুষিত দেশে। পূজাবেদীতে আবির্ভূত হল মানবের শ্রেষ্ঠ তথাগত বুদ্ধ, মানব-শ্রেষ্ঠতাকে উদ্ধার করবার জন্য।'*

---

* ১৩৪২ বঃ বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ ; বুদ্ধদেব, পৃঃ ৮

'কৃপা কঠোর'

স্বামী পুরাণানন্দ

কাশীপুর উদ্যানস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ।

ভক্তিশাস্ত্রে ও ভক্তজনমহলে শ্রীভগবান কৃপাময়, দয়াময় বলিয়া কীর্তিত হন। সাংসারিক আর্তিনাশ অথবা সংসারাতীত মোক্ষসিদ্ধি—উভয়ই সংকটমোচন পরমেশ্বরের কৃপাসাপেক্ষ ভক্তেরা এই কথায় বিশ্বাসী। বেদান্তনিষ্ঠ তরুণ সাধক, শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্য শ্রীহরিনাথ চট্টোপাধ্যায় (উত্তরকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট এই শিক্ষাই পাইয়াছিলেন। হরিনাথ পূর্বে ভাবিতেন, বেদান্তাদি শাস্ত্রানুশীলন সহায়ে কেবল পুরুষকার নির্ভর থাকিয়াই 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্' ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ সম্ভবপর। এইরূপ ধারণা পোষণকালে, একদিন ভক্তবর বলরাম বসু মহাশয়ের গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন বার্তা পাইয়া হরিনাথ তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে যাইয়া "দুই-একটি কথার ভাবেই বন্ধু (হরিনাথ) বুঝিতে পারিলেন, ঠাকুর উপস্থিত সকলকে বুঝাইতেছেন—জ্ঞান বল, ভক্তি বল, দর্শন বল, কিছুই ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন হইবার নহে।···(হরিনাথ) শুনিলেন ঠাকুর বলিতেছেন—'কি জান, কাম-কাঞ্চনকে ঠিক ঠিক মিথ্যা ব'লে বোধ হওয়া, জগৎটা তিন কালেই অসৎ ব'লে ঠিক ঠিক মনে জ্ঞানে ধারণা হওয়া কি কম কথা! তাঁর দয়া না হ'লে কি হয়? তিনি কৃপা ক'রে ঐরূপ ধারণা যদি করিয়ে দেন তো হয়। নইলে মানুষ নিজে সাধন ক'রে সেটা কি ধারণা করতে পারে?'··· এইরূপে ঈশ্বরের দয়ার কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের সমাধি হইল। কিছুক্ষণ পর অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া···ভাবাবস্থায় গান ধরিলেন—

> 'ওরে কুশীলব, করিস কি গৌরব,
> ধরা না দিলে কি পারিস্ ধরিতে।'

গাহিতে গাহিতে ঠাকুরের দুই চক্ষে এত জলধারা বহিতে লাগিল যে, বিছানার চাদরের খানিকটা ভিজিয়া গেল! বন্ধুও (হরিনাথ) সে অপূর্ব শিক্ষায় দ্রবীভূত হইয়া কাঁদিয়া আকুল। ···বন্ধু বলেন, 'সে শিক্ষা চিরকাল আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। সেদিন হইতেই বুঝিলাম, ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন কিছুই হইবার নহে।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, গুরুভাব পূর্বার্ধ, পৃঃ ১১-১২)

কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা উদ্দিষ্ট ভক্তের পক্ষে সর্বদা অনুকূল মনে হয় কিনা—ভক্তসাধক ভগবানের দয়াকে সর্বাবস্থায় প্রসন্নচিত্তে 'দয়া' বলিয়া স্বীকৃতি দিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে পারেন কিনা তাহা বিচার্য। দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণকথিত 'কাঁচা আমি'-র প্রভাবমুক্ত হইতে না পারা পর্যন্ত—অবিদ্যাপ্রসূত অহংকারের সেবায় তৎপর থাকিয়া, এমন দয়াময়ের দয়াকেও ভক্তসাধক কখন কখন স্বীয় স্বার্থ-প্রতিকূল মনে করেন! তবে তাহা সত্ত্বেও, ভক্তহিতনিষ্ঠ ভগবান ভক্তের অপ্রসন্নতা ও স্বীয় 'বিপত্তির' ঝুঁকি লইয়াও আশ্রিত ভক্তের হিতসাধনে তৎপর থাকেন।

এই বিষয়ে তুলসীদাসের 'রামচরিতমানসে' একটি মধুর ও কৌতুকজনক উপাখ্যান আছে, যাহা আমরা এই প্রবন্ধে উদ্ধৃতি ও অনুবাদ সহ আলোচনা করিতে অভিলাষী।

পার্বতী একবার মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করেন—

রাম ব্রহ্ম চিন্ময় অবিনাসী।*
সর্ব রহিত সব উর পুর বাসী ॥
নাথ ধরেউ নরতন কেহি হেতু।
মোহি সমুঝাই কহহু বৃষকেতু ॥
[বালকাণ্ড, ১৪৪]

—শ্রীরামচন্দ্র তো চিন্ময়, অবিনশ্বর, সর্বদোষ-বর্জিত এবং অন্তর্যামী ব্রহ্মস্বরূপ; তিনি কেন নরতনু ধারণ করিয়াছিলেন, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বুঝাইয়া বলুন। উত্তরে মহাদেব গীতোক্ত ধর্মগ্লানি ও অধর্মের প্রাদুর্ভাব, শ্রীভগবানের নরাদি শরীর স্বীকারের হেতু বলিয়া নির্দেশ করিয়া বলেন, কখন কখন স্বীয় সেবক-কৃত অপরাধের পরিণতিতেও (যথা—জয় ও বিজয়) ভগবানকে শরীর ধারণ করিতে হয়। মহাদেব আরও বলেন—

নারদ সাপ দীন্‌হ একবারা।
কল্প এক তেহি লগি অবতারা ॥
গিরিজা চকিত ভঈ সুনি বানী।
নারদ বিষ্ণুভগত পুনি জ্ঞানী ॥ [ঐ, ১৫২]

—দেবর্ষি নারদ একবার ভগবানকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, যাহার জন্য ভগবানকে এক কল্পে (রামরূপে) অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। ইহা শুনিয়া পার্বতী অতি বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন—নারদ তো বিষ্ণুভক্ত, তদুপরি জ্ঞানী ঋষি,—

কারন কবন সাপ মুনি দীন্‌হা।
কা অপরাধ রমাপতি কীন্‌হা ॥
য়হ প্রসঙ্গ মোহি কহহু পুরারী।
মুনিমন মোহ আচরজ ভারী ॥ [ঐ]

-তিনি কেন তাঁহার সদা আরাধ্য জীবন-দেবতাকে অভিশাপ দিলেন? রমানাথ কি অপরাধ করিয়াছিলেন? অনুগ্রহ করিয়া এই বিষয়ে আমাকে বিস্তারিত বলুন, কেননা দেবর্ষি নারদের মতো মুনিও মোহগ্রস্ত হন—ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়।

পার্বতীর এই বিস্মিত জিজ্ঞাসার উত্তরে, নারদ কেন ভগবানকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন প্রসঙ্গে মহাদেব নিম্নোক্ত উপাখ্যান বলেন—

হিমগিরি গুহা এক অতি পাবনি।
বহ সমীপ সুরসরী সুহাবনি ॥
আশ্রম পরম পুনীত সুহাবা।
দেখি দেবরিষি মন অতি ভাবা ॥ [ঐ, ১৫৩]

—হিমালয়ে সুরধুনী তটে এক অতি মনোরম গুহায় একটি পবিত্র আশ্রম দেখিয়া একবার দেবর্ষি নারদ অত্যন্ত প্রীত হন।

নিরখি সৈল সরি বিপিন বিভাগা।
ভয়উ রমাপতি পদ অনুরাগা ॥
সুমিরত হরিহি সাপগতি বাধী।
সহজ বিমল মন লাগি সমাধী ॥ [ঐ]

—বিশাল পর্বতশ্রেণী, বেগবতী নদী এবং মনোরম বনরাজির স্নিগ্ধ পরিবেশে ভক্ত নারদের নির্মল চিত্ত রমানাথের মহিমা সপ্রেমে স্মরণ করিতে করিতে ক্রমে সমাধিমগ্ন হইল এবং তাঁহার উপর দক্ষ প্রজাপতির অবিরাম ভ্রমণের যে অভিশাপ ছিল, তাহা বাধিত হইল।

মুনিগতি দেখি সুরেস ডরানা।
কামহি বোলি কীন্‌হ সনমানা ॥
সহিত সহায় জাহু মম হেতু।
চলেউ হরষি হিয় জল চর কেতু ॥ [ঐ]

—নারদের ধ্যানতন্ময়তা দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র

---

* উদ্ধৃতিগুলি ৺সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত কর্তৃক সঙ্কলিত এবং খাদি প্রতিষ্ঠান, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'রামচরিত মানসে'র ২য় সংস্করণ হইতে গৃহীত।
'য', 'শ', 'ণ'-স্থলে তুলসীদাস প্রায়ই 'জ', 'স' এবং 'ন'-এর ব্যবহার করিয়াছেন।

ভীত হইলেন ও কামদেবকে ডাকিয়া আপ্যায়িত করিলেন ও বলিলেন—আমার স্বার্থে, নারদের তপস্যা ভঙ্গ করিতে স্বীয় সঙ্গীগণ সহ দেবর্ষি সমীপে যাও। কামদেব প্রসন্নচিত্তে চলিলেন।

সুনাসীরমন মহঁ অসি ত্রাসা।
চহত দেবরিষি মম পুর বাসা॥
জে কামী লোলুপ জগ মাহীঁ।
কুটিল কাক ইব সবহিঁ ডেরাহীঁ॥ [ঐ]

—(সুনাসীর=ইন্দ্র) দেবরাজের মনে এই ভয় যে, বুঝিবা স্বর্গরাজ্যের অধিকার লাভের আশায় দেবর্ষি তপস্যামগ্ন হইয়াছেন। (তুলসীদাসের মন্তব্য—) সংসারে কামনাপরায়ণ, বিষয়লোলুপ মানুষ স্বীয় স্বার্থহানির ভয়ে সর্বদা কুটিল কাকের মতো অপর সকল হইতে সন্ত্রস্ত থাকে!

সূখ হাড় লেই ভাগ সঠ স্বান নিরখি মৃগরাজ।
ছীনি লেই জনি জানি জড় তিমি সুরপতিহি
ন লাজ॥ [ঐ]

—মৃগরাজ সিংহকে দেখিয়া ক্ষুদ্র কুকুর, শুষ্ক ও তুচ্ছ অস্থিখণ্ড লইয়া পলাইয়া যায়—মনে এই ভয়, পাছে মৃগরাজ তাহা কাড়িয়া লয়! সুরপতি ইন্দ্রও তেমনি কুকুরের মতোই নির্লজ্জ। (কেননা তাঁহার এই বোধ নাই যে, নারদের কাছে সুরপুরীর আধিপত্য লাভ কাকবিষ্ঠাতুল্য হেয়। মৃগরাজের কাছে যেমন শুষ্ক অস্থিখণ্ড। তুলসীদাসের তুলনার তীক্ষ্ণতা লক্ষণীয়।)

তেহি আশ্রমহি মদন জব গয়উ।
নিজ মায়া বসন্ত নিরময়উ॥
কুসুমিত বিবিধ বিটপ বহুরঙ্গা।
কূজহিঁ কোকিল গুঞ্জহিঁ ভৃঙ্গা॥ [ঐ,১৫৪]

—কামদেব দেবর্ষি নারদের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া স্বীয় মায়াবলে বসন্ত ঋতু নির্মাণ করিলেন—বৃক্ষে বৃক্ষে নানাবর্ণের মনোরম পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল এবং কোকিলের মধুর নিনাদ ও ভৃঙ্গকুলের শ্রুতিসুখকর মৃদুগুঞ্জনধ্বনি হইতে লাগিল।

চলী সুহাবনি ত্রিবিধ বয়ারী।
কামকৃষানু বঢ়াবনিহারী॥
রম্ভাদিক সুর নারি নবীনা।
সকল অসমসর কলা প্রবীনা॥ [ঐ]

—কামাগ্নি উদ্দীপিত করে, এমন শীতল, মৃদু এবং সুগন্ধি বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, কামকলায় নিপুণ রম্ভাদি নবীনা স্ত্রীবৃন্দ—

করহিঁ গান বহু তান তরঙ্গা।
বহু বিধি ক্রীড়হিঁ পানি পতঙ্গা॥
দেখি সহাই মদন হরষানা।
কীন্হেসি পুনি প্রপঞ্চ বিধি নানা॥ [ঐ]

—নানাপ্রকারে হস্তসঞ্চালনাদি সহকারে গান করিতে লাগিল; কামদেব স্বীয় সহায়িকাগণের নৈপুণ্য দর্শনে প্রীত হইলেন এবং স্বয়ং আরও মিথ্যা মায়া সৃষ্টি করিলেন।

কামকলা কছু মুনিহি ন ব্যাপী।
নিজ ভয় ডরেউ মনোভব পাপী॥
সীম কি চাঁপি সকই কোই তাসু।
বড় রখবার রমাপতি জাসু॥ [ঐ]

—কিন্তু এই সকল জঘন্য উদ্যম নারদের চিত্তে কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে পারিল না দেখিয়া পাপী কামদেব স্বীয় ব্যর্থ চেষ্টার সম্ভাব্য পরিণাম চিন্তা করিয়া ভীত হইলেন। (তুলসীদাসের মন্তব্য—) ভক্তপালক পরমেশ্বর যাহাকে রক্ষা করেন, অপর কে তাঁহার মর্যাদা লঙ্ঘন করিতে পারে?

সহিত সহাই সভীত অতি মানি হারি মন মৈন।
গহেসি জাই মুনিচরন তব কহি সুঠি আরত
বৈন॥ [ঐ]

—অত্যন্ত ভীত কামদেব তখন পরাজয় স্বীকার করিয়া রম্ভাদির সহিত দেবর্ষি সমীপে যাইয়া তাঁহার চরণ ধারণপূর্বক আর্তস্বরে ক্ষমাভিক্ষা করিলেন।

ভয়উ ন নারদ মন কছু রোষা।
কহি প্রিয় বচন কাম পরিতোষা॥

নাই চরন সিরু আয়সু পাই।
গয়উ মদন তব সহিত সহাঈ ॥ ঐ, ১৫৫]

—এদিকে নারদ কিন্তু কামদেবের উপর বিন্দুমাত্রও কুপিত হইলেন না, বরং প্রিয়বাক্যে তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া অভয় দিলেন। অনন্তর কামদেব দেবর্ষি চরণে ভূমিষ্ঠ প্রণামান্তে সহায়িকাবৃন্দ সহ সেখান হইতে বিদায় লইলেন।

মুনি সুসীলতা আপনি করনী
সুর পতি সভা জাই সব বরনী ॥
সুনি সব কে মন অচরজু আবা।
মুনিহি প্রসংসি হরিহি সিরু নাবা ॥ [ঐ]

—বিদায় গ্রহণান্তে, কামদেব স্বর্গে দেবরাজের সভায় যাইয়া, স্বীয় উদ্যম ও নারদের দুঃসাধ্য সংযমের কথা নিবেদন করিলে সকলেই বিস্মিত হইলেন এবং দেবর্ষির প্রশংসা করিয়া, আশ্রিত-পালক শ্রীহরির মহিমা স্মরণে নতমস্তক হইলেন।

তব নারদ গবনে সিব পাহীঁ।
জিতা কাম অহমিতি মন মাহীঁ ॥
মারচরিত শকঁরহি সুনায়ে।
অতি প্রিয় জানি মহেস সিখায়ে ॥ [ঐ]

এদিকে "আমি কাম জয় করিয়াছি"—এই অহংকারে স্ফীত নারদ অতঃপর মহাদেবের নিকট যাইয়া কামদেবের অপচেষ্টা এবং নিজের সংযম-শক্তির কথা আত্মশ্লাঘা সহকারে নিবেদন করিলেন। মহাদেব তখন অতিপ্রিয় নারদকে পরামর্শ দিলেন,—

বার বার বিনবউ মুনি তোহীঁ।
জিমি য়হ কথা সুনায়হু মোহী ॥
তিমি জনি হরিহি সুনায়হু কবহূঁ।
চলেহু প্রসঙ্গ দুরায়হু তবহূঁ ॥ [ঐ]

—দেখ নারদ, তোমার কাছে বারংবার আমি এই মিনতি করিতেছি যে, আমাকে তুমি তোমার কামবিজয়ের কথা যাহা বলিলে, তাহা যেন প্রসঙ্গ উঠিলেও শ্রীহরির কাছে বলিও না।

সম্ভু দীন্হ উপদেস হিত নহিঁ নারদহি সুহান।
ভরদ্বাজ কৌতুক সুনহু হরিইচ্ছা বলবান ॥ [ঐ]

—নারদের হিতার্থে মহাদেব যে উপদেশ দিলেন, তাহা নারদের মনঃপূত হইল না; ইহার পর যে কৌতুক হইল, হে ভরদ্বাজ, তাহা বলিতেছি, শোন; শ্রীহরির ইচ্ছাই বলবতী। ('রামচরিত-মানসে' মুখ্য বক্তা ও শ্রোতা যথাক্রমে শিব ও পার্বতী, তবে এই কথাই পরে যাজ্ঞবল্ক্য প্রয়াগ-তীর্থে ভরদ্বাজের নিকট কীর্তন করিয়াছেন।)

একবার করতল বরবীনা।
গাবত হরিগুন পানপ্রবীনা ॥
ছীরসিন্ধু গবনে মুনিনাথা।
জহঁ বস শ্রীনিবাসা শ্রুতিমাথা ॥ [ঐ, ১৫৬]

—অনন্তর সঙ্গীতপটু নারদ একদিন বীণাহস্তে শ্রীহরিগুণ কীর্তন করিতে করিতে ক্ষীরসমুদ্রে লক্ষ্মী-পতি, শ্রুতিশীর্ষ নারায়ণের নিকট গমন করিলেন।

হরষি মিলেউ উঠি কৃপানিকেতা।
বৈঠে আসন রিসিহি সমেতা ॥
বোলে বিহঁসি চরাচররায়া।
বহুতে দিননহ কীন্হি মুনি দায়া ॥ [ঐ]

—চরাচর জগন্নাথ, কৃপানিধি শ্রীভগবান, নারদকে দেখিয়া সানন্দে ও সাগ্রহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং একাসনে উপবেশন করিয়া মৃদুমধুর হাস্যসহকারে বলিলেন—মুনিবর, দীর্ঘকাল পর দয়া করিয়া আমাকে দর্শন দিলে!

কামচরিত নারদ সব ভাখে।
জদ্যপি প্রথম বরজি সিব রাখে ॥
অতি প্রচণ্ড রঘুপতি কৈ মায়া।
জেহি ন মোহ অস কো জগ জায়া ॥ [ঐ]

—মহাদেবের নিষেধ সত্ত্বেও নারদ কথায় কথায় কামদেবের বৃত্তান্ত নারায়ণকে সব বলিলেন। (তুলসীদাসের মন্তব্য) শ্রীরঘুপতির মায়া দুর্নিবার—জগতে এমন কে জন্মিয়াছে যে, এই 'দৈবী' মায়ায় মুগ্ধ না হইয়াছে?

রুখ বদন করি বচন মৃদু বোলে শ্রীভগবান।
তুমহরে সুমিরন তেঁ মিটহিঁ মোহ মার মদ মান॥ [ঐ]

—ভগবান তখন অপ্রসন্ন বদনে, মৃদুবাক্যে নারদকে বলিলেন—তোমার স্মরণে অপরের মোহ, কাম, অহংকার এবং অভিমান দূর হইয়া যায় (সুতরাং তোমার উপর আবার কামের কি প্রভাব হইবে ?)।

সুনু মুনি মোহ হোই মন তাকে।
জ্ঞান বিরাগ হৃদয় নহিঁ জাকে॥
ব্রহ্মচরজ ব্রত রত মতিধীরা।
তুমহহিঁ কি করই মনোভব পীরা॥ [ঐ, ১৫৭]

—শোন নারদ, জ্ঞানবৈরাগ্যহীন মানুষই মোহগ্রস্ত হয়, কিন্তু ব্রহ্মচর্য ব্রতাভ্যাসী তোমার মতো বিবেকীর প্রতি কাম কি পীড়া উৎপন্ন করিবে ?

নারদ কহেউ সহিত অভিমানা।
কৃপা তুম্হারি সকল ভগবানা॥
করুনানিধি মন দীখ বিচারী।
উর অঙ্কুরেউ গর্বতরু ভারী॥ [ঐ]

—নারদ অভিমানের সহিত বলিলেন—সকলি তোমার কৃপা। এদিকে করুণাময়, সর্বদর্শী ভগবান দেখিলেন (ভক্ত হইলেও) নারদের হৃদয়ভূমিতে অনর্থমূল গর্বতরু অঙ্কুরিত হইয়াছে!

বেগি সো মৈঁ চারিহউঁ উখারী।
পন হমার সেবক হিতকারী॥
মুনি কর হিত মম কৌতুক হোঈ।
অবসি উপায় করব মৈঁ সোঈ॥ [ঐ]

—(নারদের অবস্থাদৃষ্টে ভগবানের সিদ্ধান্ত—) শীঘ্রই আমি এই গর্বতরুর মূলোৎপাটন করিব ; কেননা, ভক্তের হিতসাধনই আমার ব্রত। সুতরাং এমন কিছু উপায় আমি অবলম্বন করিব যাহাতে নারদের মঙ্গল এবং আমার কিছু কৌতুক হয়।

তব নারদ হরিপদ সির নাঈ।
চলে হৃদয় অহমিতি অধিকাঈ॥
শ্রীপতি নিজ মায়া তব প্রেরী।
সুনহু কঠিন করনী তেহী কেরী॥ [ঐ]

—অতঃপর নারদ শ্রীহরিকে প্রণামান্তে বিদায় লইয়া চলিলেন—তাঁহার হৃদয় তখন অহংকারে পূর্ণ। এমন সময় ভগবান নিজ মায়া বিস্তার করিলেন এবং তাহার যে কঠিন পরিণাম হইল, তাহা শোন।

বিরচেউ মগু মহুঁ নগর তেহি সতজোজন বিস্তার।
শ্রীনিবাস পুর তেঁ অধিক রচনা বিবিধ প্রকার॥ [ঐ]

—হরিমায়া, নারদের চলার পথে শতযোজনব্যাপী এক মহানগর সৃষ্টি করিল, যাহার শোভা বৈকুণ্ঠপুরী হইতেও অধিকতর সুন্দর।

বসহিঁ নগর সুন্দর নর নারী।
জনু বহু মনসিজ রতি তনুধারী॥
তেহি পুর বসই সীলনিধি রাজা।
অগণিত হয় গয় সেন সমাজা॥ [ঐ, ১৫৮]

—সেই নগরে সুন্দর সুন্দর নরনারী বাস করেন —যেন বহু কামদেব ও রতি তনুধারণ করিয়া রহিয়াছেন। অগণিত ঘোড়া, হাতী ও বিশাল সেনাবাহিনীর অধিপতি শীলনিধি সেখানকার রাজা।

সত সুরেস সম বিভব বিলাসা।
রূপ তেজ বল নীতি নিবাসা॥
বিস্বমোহনী তাসু কুমারী।
শ্রী বিমোহ জেহি রূপু নিহারী॥ [ঐ]

—রাজা শীলনিধির বৈভব শত দেবরাজতুল্য— স্বয়ং তিনি রূপবান, তেজস্বী, বলবান, অথচ সুনীতিনিষ্ঠ। বিশ্বমোহিনী নাম্নী তাঁহার কন্যার রূপমাধুর্যে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও যেন মুগ্ধ হন।

সোই হরি মায়া সব গুন খানী।
সোভা তাসু কি জাই বখানী॥
করই স্বয়ম্বর সো নৃপবালা।
আয়ে তহঁ অগনিত মহিপালা॥ [ঐ]

—সকল গুণের অধিকারিণী রাজকন্যা বিশ্বমোহিনী, বস্তুতঃ ভগবানের মায়ারই সাকার রূপ। পরমাসুন্দরী এই রাজকন্যার জন্য আহূত স্বয়ংবর সভায় তখন অসংখ্য রাজা সেখানে আগমন করিয়াছেন।

মুনি কৌতুকী নগর তেহি গয়উ।
পুরবাসিন্হ সব পূছত ভয়উ॥
সুনি সব চরিত ভূপগৃহ আয়ে।
করি পূজা নৃপ মুনি বৈঠায়ে॥ [ঐ]

—কৌতূহলী হইয়া নারদ সেই নগরে প্রবেশ করিলেন এবং নগরবাসিগণের নিকট সমস্ত শ্রবণান্তে রাজপ্রাসাদে গমন করিলে, রাজা শীলনিধি তাঁহাকে সসম্মানে উপবেশন করাইলেন।

আনি দেখাঈ নারদহি ভূপতি রাজকুমারি।
কহহু নাথ গুন দোষ সব এহি কে হৃদয় বিচারি॥ [ঐ]

—অনন্তর স্বীয় কন্যা বিশ্বমোহিনীকে দেবর্ষি সমীপে আনাইয়া, রাজা নারদকে বলিলেন—অনুগ্রহ করিয়া লক্ষণ বিচারান্তে আমার কন্যার গুণদোষের কথা বলুন।

আলোচ্যমান উপাখ্যানের এই অংশে কিছু মন্তব্য প্রয়োজন। সাধক স্বীয় শক্তিতে সাধননিষ্ঠ থাকিয়া অন্তে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন, এমন নহে; নিষ্কপট শরণাগতি ও অহংকাররাহিত্য দেখিয়া মায়াপতি, যে সাধকের নিকট স্বীয় স্বরূপ উৎঘাটিত করেন, তিনিই সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হন। নারদের মনে এই অহংকার হইয়াছিল যে, তিনি স্বীয় শক্তিতে কামজয় করিয়াছেন—ভক্তবৎসল ভগবান তাই তাঁহার এই মহাভ্রম দূর করিতে সচেষ্ট হইলেন।

দেখি রূপ মুনি বিরতি বিসারী।
বড়ী বার লগি রহে নিহারী॥
লচ্ছন তাসু বিলোকি ভুলানে।
হৃদয় হরষ নহিঁ প্রগট বখানে॥ [ঐ, ১৫৭]

—রাজকন্যাকে দেখিয়া দেবর্ষি তাঁহার বৈরাগ্যব্রত ভুলিলেন!—অনিমেষ নয়নে শুধু বিশ্বমোহিনীকে দেখিতে লাগিলেন। লক্ষণাবলী দেখিয়াও তিনি প্রসন্ন হইলেন, তবে প্রকাশ্যে কিছু বলিলেন না।

লচ্ছন সব বিচারি উর রাখে।
কছুক বনাই ভূপসন ভাখে॥
সুতা সুলচ্ছন কহি নৃপ পাহীঁ।
নারদ চলে সোচ মন মাহীঁ॥ [ঐ]

—রাজকন্যার লক্ষণ বিচার করিয়া যাহা বুঝিলেন গুপ্ত রাখিয়া নারদ রাজাকে শুধু বলিলেন—আপনার কন্যা সুলক্ষণা এবং পরে চিন্তাকুল হৃদয়ে দেবর্ষি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। (এইবার নারদের চিন্তার কারণ বলিতেছেন—)

করউঁ জাই সোই জতন বিচারী।
জেহি প্রকার মোহি বরই কুমারী॥
জপ তপ কছু ন হোই তেহি কালা।
হে বিধি মিলই কবন বিধি বালা॥ [ঐ]

—(ক্ষুব্ধ হৃদয়ে নারদ ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন—) ভাবিয়া চিন্তিয়া এখন এমন উপায় আমি অবলম্বন করিব, যাহাতে রাজকন্যা আমাকেই বরণ করে। (তুলসীদাসের মন্তব্য—) সেই সময় দেবর্ষি জপতপাদি কিছুতেই মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না—কেবল এক চিন্তা—হে বিধাতা, কি করিয়া রাজকন্যাকে লাভ করি?

এহি অবসর চাহিয় পরম শোভা রূপ বিসাল।
জো বিলোকি রীঝই কুঅঁরি তব মেলই জয়মাল॥ [ঐ]

—(নারদ ভাবিতেছেন—) এই সময় চাই পরম সুন্দর রূপ, যাহাতে রাজকন্যা আকৃষ্ট হইয়া আমাকেই বরণ করে।

হরিসন মাগউঁ সুন্দরতাঈ।
হোইহি জাত গহরু অতি ভাঈ॥
মোরে হিত হরি সম নহিঁ কোউ।
এহি অবসর সহায় সোই হোউ॥ [ঐ, ১৬০]

—শ্রীহরির নিকট যাইয়া রূপলাবণ্য ভিক্ষা করিতে পারি। কিন্তু তাহাতে সময় অনেক লাগিবে; শ্রীহরির মতো আমার হিতৈষী কেহ নাই—তিনিই এই সঙ্কটে আমার সহায় হউন।

বহু বিধি বিনয় কীন্হি তেহি কালা।
প্রগটেউ প্রভু কৌতুকী কৃপালা॥
প্রভু বিলোকি মুনি নয়ন জুড়ানে।
হোইহি কাজু হিয়ে হরষানে॥

—পথোপরি নারদ তখন কাতর প্রার্থনা করিলে, রঙ্গপ্রিয় দয়াল হরি সেখানে প্রকট হইলেন দেখিয়া দেবর্ষি অত্যন্ত প্রীত হইলেন ও ভাবিলেন—আমার মনস্কামনা এইবার পূর্ণ হইবে

অতি আরতি কহি কথা সুনাঈ।
করহু কৃপা করি হোহু সহাঈ॥
আপন রূপ দেহু প্রভু মোহী।
আন ভাতি নহিঁ পাবউ ওহী॥ [ঐ]

—অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে নারদ তখন শ্রীহরিকে সমস্ত বলিলেন ও প্রার্থনা করিলেন—হে নাথ, কৃপা করিয়া আমার সহায় হউন—আপনার অতুলনীয় রূপ আমাকে দিন, কেননা রাজকন্যাকে লাভ করিবার অন্য উপায় নাই।

জেহি বিধি নাথ হোই হিত মোরা।
করহু সো বেগি দাস মৈঁ তোরা॥
নিজ মায়াবল দেখি বিসালা।
হিয় হঁসি বোলে দীনদয়ালা॥ [ঐ]

—(নারদ আরও বলিলেন—) হে নাথ, আমি আপনার দাস, যাহাতে আমার মঙ্গল হয় অবিলম্বে তাহাই করুন। (নারদের প্রার্থনা শ্রবণান্তে—) মায়াপতি, দীনবন্ধু হরি স্বীয় মায়ার দুর্নিবার প্রভাব লক্ষ্য করিয়া মনে মনে হাসিলেন ও বলিলেন—

জেহি বিধি হোইহি পরমহিত নারদ সুনহু তুমহার।
সোই হম করব ন আন কছু বচন ন মৃষা হমার॥ [ঐ]

—হে নারদ, শোন, যাহাতে তোমার পরম কল্যাণ হয়, তাহাই আমি করিব, আমার বাক্য মিথ্যা হয় না।

কুপথ মাগ রুজব্যাকুল রোগী।
বৈদ ন দেই সুনহু মুনি জোগী॥
এহি বিধি হিত তুম্হার মৈঁ ঠয়উ।
কহি অস অন্তরহিত প্রভু ভয়উ॥ [ঐ, ১৬১]

—(ভগবান আরও বলিলেন—) দেখ নারদ, রোগকাতর ব্যক্তি কুপথ্য চাহিলেও হিতৈষী বৈদ্য তাহা দেন না। অনুরূপভাবেই তোমার কল্যাণ করিব স্থির করিয়াছি—এই কথা বলিয়া ভগবান অন্তর্হিত হইলেন।

মায়াবিবস ভয়ে মুনি মূঢ়া।
সমুঝী নহিঁ হরিগিরা নিগূঢ়া॥
পবনে তুরত তহঁা রিষিরাঈ।
জহঁা স্বয়ম্বরভুমি বনাঈ॥ [ঐ]

—হরিমায়ায় আচ্ছন্নবুদ্ধি নারদ ভগবদুক্তির অর্থ বুঝিলেন না এবং শীঘ্রই রাজকন্যার জন্য আয়োজিত স্বয়ম্বর সভায় গমন করিলেন।

নিজ নিজ আসন বৈঠে রাজা।
বহু বনাব করি সহিত সমাহা॥
মুনিমন হরষ রূপ অতি মোরে।
মোহি তজি আনহি বরিহি ন ভোরে॥ [ঐ]

—সেখানে ভিন্ন ভিন্ন দেশাগত নৃপতিগণ, নিজ নিজ পারিষদবৃন্দ সহ, যথোচিত সাজে সজ্জিত হইয়া আসনে উপবিষ্ট আছেন। "ভগবান আমাকে নিশ্চয়ই অত্যন্ত সুরূপ দিয়াছেন"—এই বিশ্বাসে প্রসন্নহৃদয় দেবর্ষি ভাবিলেন, বিশ্বমোহিনী আমাকে ত্যাগ করিয়া ভুলিয়াও অপরকে বরণ করিবে না।

মুনিহিত কারন কৃপানিধানা।
দীন্হ কুরূপ ন জাই বখানা॥
সো চরিত্র লখি কাহু ন পাবা।
নারদ জানি সবহি সির নাবা॥ [ঐ]

—এদিকে দয়াল হরি কিন্তু নারদের হিতার্থে তাঁহাকে অবর্ণনীয় কদর্য রূপ দিয়াছেন—যদিও এই রূপ হরিমায়ায় কাহারও নিকট প্রকট হইল না এবং সকলেই দেবর্ষি বলিয়া চিনিয়া তাঁহার প্রতি নতমস্তক হইলেন।

কাহু ন লখা সো চরিত বিসেখা।
সো সরূপ নৃপকন্যা দেখা॥
মর্কটবদন ভয়ঙ্কর দেহী।
দেখত হৃদয় ক্রোধ ভা তেহী॥ [ঐ, ১৬২]

—নারদের কদর্যরূপ সকলের নিকট অপ্রকট থাকিলেও, রাজকন্যা সেই রূপই দেখিল। তাহা কেমন? না—বানরের মুখ ও ভয়ঙ্কর দেহ। অভাবনীয় এই রূপ দেখিয়া রাজকন্যা ক্রুদ্ধ হইল।

সখী সঙ্গ লেই কুঅঁরি তব চলি জনু রাজ-
মরাল।
দেখত ফিরই মহীপ সব করসরোজ জয়মাল॥
[ঐ]

—অনন্তর রাজকন্যা বরমাল্য হস্তে, সখীসঙ্গে, রাজহংসীর মন্থর গতিতে চলিয়া উপস্থিত রাজাদের নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

জেহি দিসি বৈঠে নারদ ফূলী।
সো দিসি তেহি ন বিলোকি ভূলী॥
পুনি পুনি মুনি উকসহিঁ অকুলাহীঁ.
দেখি দসা হরগন মুসুকাহীঁ॥ [ঐ, ১৬৩]

—"আমি এখন ভগবৎকৃপায় অতুলনীয় রূপের অধিকারী"—এই গর্বে গর্বিত নারদ স্বয়ম্বর সভায় যেদিকে উপবিষ্ট ছিলেন, রাজকন্যা সেদিকে ভুলিয়াও দেখিল না। এদিকে রাজকন্যার আকর্ষণে ব্যর্থ নারদের ব্যাকুল-চাঞ্চল্য দর্শনে মহাদেবের দুই অনুচর (যাঁহারা ছদ্মবেশে সেখানে রঙ্গ দেখিতেছিলেন) মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিলেন। (এমন সময় এই রঙ্গ ষোলকলায় পূর্ণ করিতে—)

ধরি নৃপতনু তহঁ গয়উ কৃপালা।
কুঅঁরি হরষি মেলেউ জয়মালা॥
দুলহিনি লেই গে লচ্ছিনিবাসা।
নৃপসমাজ সব ভয়উ নিরাসা॥ [ঐ]

—দয়াল শ্রীহরি রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী হইয়া, রাজবেশে স্বয়ম্বর সভায় প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহাকে দেখিবামাত্র রাজকন্যা প্রসন্নচিত্তে ভগবানের গলায় বরমাল্য অর্পণ করিল। অনন্তর লক্ষ্মীপতি রাজকন্যাকে লইয়া প্রস্থান করিলে অন্যান্য নৃপতিবৃন্দ নিরাশ হইলেন

মুনি অতি বিকল মোহমতি নাঁঠী।
মনি গিরি গঈ ছুটি জনু গাঁঠী॥
তব হরগন বোলে মুসুকাঈ।
নিজ মুখ মুকুর বিলোকহু জাঈ॥ [ঐ]

—রাজকন্যাকে রাজবেশী ভগবানের সহিত প্রস্থান করিতে দেখিয়া নারদ তীব্র হতাশায় পীড়িত হইয়া বিহ্বল হইলেন—যেন তাঁহার অধিকৃত মহামূল্য মণি খোয়া গিয়াছে! এমন সময় শিবের অনুচরদ্বয় মুচকি হাসিয়া নারদকে বলিলেন—"বলি ঠাকুর, স্বীয় রূপটি দর্পনে একবার দেখুন না?"

অস কহি দোউ ভাগে ভয় ভারী।
বদন দীখ মুনি বারি নিহারী॥
বেষু বিলোকি ক্রোধ অতি বাঢ়া।
তিন্হহিঁ সরাপ দীন্হ অতি গাঢ়া॥ [ঐ]

—এই কথা বলিয়া অনুচরদ্বয় ভীতভাবে প্রস্থান করিলে, নারদ জলে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহাদিগকে কঠিন অভিশাপ দিলেন

পুনি জল দীখ রূপ নিজ পাবা।
তদপি হৃদয় সন্তোষ ন আবা॥
ফরকত অধর কোপ মন মাহীঁ।
সপদি চলে কমলাপতি পাহীঁ॥ [ঐ, ১৬৪]

—শীঘ্রই জলে পুনরায় স্বীয় রূপ দেখিতে যাইয়া নারদ নিজের স্বাভাবিক রূপ দেখিলেন; কিন্তু তবু তাঁহার হৃদয়ে তখন তীব্র অসন্তোষ—ক্রোধে

ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল এবং তিনি শীঘ্র ভগবানের কাছে চলিলেন।

দেইহউ সাপ কি মরিহউ জাঈ।
জগত মোরি উপহাস করাঈ॥
বীচহি পন্থ মিলে দনুজারী।
সঙ্গ রমা সোই রাজকুমারী॥

—(যাইতে যাইতে ক্রোধাকুল নারদ ভাবিতেছেন—) এখন কি করি?—ভগবানকে অভিশাপ দিব, না আত্মহত্যা করিব? সর্বজনসমক্ষে তিনি আমায় নিতান্ত অপদস্থ করিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরেই, পথে নারদের সহিত দানবারি ভগবানের সাক্ষাৎ হইল—সঙ্গে রহিয়াছেন স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী ও রাজকন্যা বিশ্বমোহিনী।

বোলে মধুর বচন সুরসাঈঁ।
মুনি কহঁ চলে বিকল কী নাঈঁ॥
সুনত বচন উপজা অতি ক্রোধা।
মায়াবস ন রহা মন বোধা॥ [ঐ]

—(যেন কিছুই হয় নাই বা জানেন না, এমনভাবে—) ভগবান মধুরবাক্যে নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে মুনিবর, এত বিহ্বল হইয়া কোথায় চলিয়াছ?" এই প্রশ্নে নারদের ক্রোধবহ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি পড়িল এবং হরিমায়ায় তিনি উচিতানুচিত বোধশূন্য হইলেন।

পরসম্পদা সকহু নহিঁ দেখী।
তুম্হরে ইরিষা কপট বিসেখী॥
মথত সিন্ধু রুদ্রহি বৌরায়হু।
সুরন্হ প্রেরি বিষপান করায়হু॥ [ঐ]

—(তীব্র তিরস্কার সহকারে নারদ ভগবানকে বলিতে লাগিলেন—) পরের মঙ্গল তুমি দেখিতে পার না, তুমি ঈর্ষাপরায়ণ ও অত্যন্ত কপট। সমুদ্রমন্থনকালে তুমিই শিবের প্রতি চরম অবিচার করিয়াছিলে। কেননা, দেবতাদের পাঠাইয়া তুমিই তাঁহাকে বিষপান করাইয়াছিলে।

অসুর সুরা বিষ শঙ্করহি আপু রমা মনি চারু।
স্বার্থসাধক কুটিল তুম্হ সদা কপটব্যবহারু॥
[ঐ]

—(তোমার কীর্তির কথা কে না জানে?—) অসুরদিগকে দিলে সুরা, মহাদেবকে বিষ, আর লক্ষ্মীদেবী ও কৌস্তুভ মণি স্বয়ং গ্রহণ করিলে! তুমি স্বার্থপর, কুটিল—তোমার আচরণ সর্বদাই কপটতাপূর্ণ।

পরমস্বতন্ত্র ন সির পর কোঈ।
ভাবই মনহিঁ করহু তুম্হ সোঈ॥
ভলেহি মন্দ মন্দেহি ভল করহূ।
বিসময় হরষ ন হিয় কছু ধরহূ॥ [ঐ, ১৬৫]

—পরম স্বতন্ত্র তুমি, তোমার মাথার উপর কেহ নাই—যাহা মনে কর, তাহাই কর। ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল কর—হর্ষবিষাদ বলিয়া তোমার কিছুই নাই।

ডহঁকি ডহঁকি পরিচেহু সব কাহূ।
অতি অসঙ্ক মন সদা উছাহূ॥
করম সুভাসুভ তুম্হহিঁ ন বাধা।
অব লগি তুম্হহিঁ ন কাহূ সাধা॥ [ঐ]

—বঞ্চিত করিয়া তুমি সকলের পরীক্ষা লও, তুমি সর্বদা অভয়, তাই পরকে বঞ্চিত করিতে তোমার উৎসাহের শেষ নাই; তদুপরি শুভাশুভ কর্ম তোমাকে বদ্ধ করিতে পারে না। আসলে, আক্কেল হয়—এমন শিক্ষা আজ পর্যন্ত কেহ তোমায় দেয় নাই!

ভলে ভবন অব বায়ন দীন্হা।
পাবহুগে ফল আপন কীন্হা॥
বঞ্চেহু মোহি জবনি ধরি দেহা।
সো তনু ধরহু সাপ মম এহা॥ [ঐ]

—কিন্তু এইবার তুমি আমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছ—শীঘ্রই ইহার ফল পাইবে। যে মনুষ্যতনু ধারণ করিয়া আমাকে বঞ্চিত করিয়াছ—সেই শরীরই তোমাকে ধারণ করিতে হইবে—ইহাই আমার অভিশাপ।

কপিআকৃতি তুম্হ কীন্হি হমারী।
করিহহিঁ কীস সহায় তুম্হারী॥
মম অপকার কীন্হ তুম্হ ভারী।
নারিবিরহ তুম্হ হোব দুখারী॥ [ঐ]

—আরও শোন, আমাকে তুমি বানরাকৃতি করিয়াছিলে—বানরই তোমার সংকটে সহায় হইবে। যেহেতু তুমি আমার নিদারুণ অনিষ্ট-সাধন করিয়াছ, সুতরাং তুমিও আমার মতো পত্নীবিরহে দুঃখী হইবে।

সাপ সীস ধরি হরষি হিয় প্রভু বহু বিনতী কীন্হী।
নিজ মায়া কৈ প্রবলতা করষি কৃপানিধি লীনহি॥

—ভক্তের দেওয়া অভিশাপ শ্রীহরি প্রসন্ন হৃদয়ে স্বীকার করিলেন এবং যথার্থ সুহৃদোচিত মধুর-বাক্যে নারদকে শান্ত করিতে সচেষ্ট হইয়া, স্বীয় মায়ার দুর্নিবার প্রভাব সংবরণ করিলেন। তখন—

জব হরিমায়া দূর নিবারী।
নহিঁ তহঁ রমা ন রাজকুমারী॥
তব মুনি অতি সভীত হরিচরনা।
গহে পাহি প্রনতারতিহরনা॥ [ঐ, ১৬৬]

—হরিমায়া নিবারিত হইলে সেখানে না রহিলেন লক্ষ্মী, না রাজকন্যা বিশ্বমোহিনী। মায়ার প্রভাবমুক্ত নারদ তখন অত্যন্ত ভীত ও সঙ্কুচিত হৃদয়ে হরিচরণে পতিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন—হে প্রণতার্তিহরণ, রক্ষা কর, রক্ষা কর।

মৃষা হোউ মম সাপ কৃপালা।
মম ইচ্ছা কহ দীনদয়ালা॥
মৈঁ দুর্বচন কহে বহুতেরে।
কহ মুনি পাপ মিটিহি কিমি মোরে॥ [ঐ]

—(অনুতপ্ত নারদ বলিতেছেন—) হে দয়াল, হে নাথ, আমার অভিশাপ মিথ্যা হউক প্রভু। শ্রীহরি বলিলেন—যাহা হইয়াছে, আমার ইচ্ছাতেই হইয়াছে, জানিবে। ইহাতে নারদ বলিলেন—আমি যে আপনাকে অকথ্য অনেক দুর্বাক্য বলিয়াছি, আমার এই পাপ কি করিয়া মিটিবে?

জপহু জাই শঙ্কর সত নামা
হোইহি হৃদয় তুরত বিশ্রামা॥
কোউ নহিঁ সিব সমান প্রিয় মোরে।
অসি পরতীতি তজহু জনি ভোরে॥

—ভগবান বলিলেন—যাও, মহাদেবের শতনাম জপ কর। তাহাতেই তুমি শীঘ্র হৃদয়ের প্রসন্নতা লাভ করিবে। জানিও, শিবের মতো প্রিয় আমার আর কেহ নাই—ভুলিয়াও এই বিশ্বাস হারাইও না। (বিষ্ণু ও শিবের অল্পজ্ঞ ও অনুদার ভক্তদের মধ্যে তৎকালেও বিদ্যমান বৈরীভাব ও অসহিষ্ণুতার অবসানকল্পে, তুলসীদাস ভগবানের দ্বারা এইরূপ বলাইলেন, বুঝিতে পারা যায়।)

অতঃপর মহাদেব পার্বতীকে বলিলেন—

এক কল্প এহি হেতু প্রভু লীন্হ মনুজঅবতার।
সুররঞ্জন সজ্জনসুখদ হরি ভঞ্জন ভুবি ভার॥
[ঐ, ১৬৭]

—দেবতাদের প্রীতিসম্পাদনকারী, সজ্জনের সুখবিধায়ক এবং পৃথিবীর ভারহারী ভগবান এইভাবে নারদের শাপে এক কল্পে (রামরূপে) মনুষ্যতনু ধারণ করিয়াছিলেন।

এই উপাখ্যানে আমরা দেখিলাম যে, ভক্ত-সাধক ভগবৎকৃপায় সাধনপথে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করিবার পরও, অবিদ্যাপ্রসূত অহংকারের কুহকে মজিতে পারেন—বিবেক, বৈরাগ্য, সংযম প্রভৃতি সাধক-জীবনের বাঞ্ছিত ঐশ্বর্য ভগবৎকৃপায় লাভ করিয়া, স্ফীত অহংকার-জনিত এই মহাভ্রমে পড়িতে পারেন যে, এই সকলের কৃতিত্ব তাঁহারই প্রাপ্য! আরও দেখিলাম, ভক্ত-সুহৃৎ শ্রীভগবান কৃপা প্রকাশে, প্রয়োজন হইলে কঠোর হইতেও দ্বিধা করেন না। এই প্রসঙ্গে 'গীতাঞ্জলি'র দ্বিতীয় সংগীতের প্রথম কয়েকটি পঙ্‌ক্তি স্মরণ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারি—

"আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই,
বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর
জীবন ভ'রে।"

সুভাষচন্দ্রের জীবন ও চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দ

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

[চৈত্র, ১৩৯১ সংখ্যার পর]

৪

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্বাসনের আদেশ উঠে যাবার পরে সুভাষচন্দ্র স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে দর্শনে অনার্স নিয়ে বি-এ পাস করেন ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি যথেষ্ট মানসিক পরিণতি লাভ করেছেন—ওটেন-ঘটনার ঝড় তাঁর উপর দিয়ে বয়ে গেছে; তাঁর আদর্শের পরীক্ষা হয়েছে; নেতৃত্বের স্বাদ পেয়েছেন; জেনেছেন কাকে বলে মূল্যদান। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন আই-সি-এস পরীক্ষায় বসবার জন্য, সেইসঙ্গে কেম্ব্রিজের ট্রাইপস অর্জন করতে। পরবর্তী প্রায় দুই বৎসর নিয়ে সুভাষচন্দ্রের জীবনের আর এক পর্ব।

সে পর্বের কথায় আসার আগে একটি প্রসঙ্গ সেরে নেওয়া যায়। সুভাষচন্দ্রের রচনায় এবং তাঁর বিষয়ে স্মৃতিকথায় দেখা যায়—তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন উক্তি প্রয়োজনমতো উদ্ধৃত করেছেন। তাদের কিছু অংশ কর্মনীতি-নির্দেশক। কিন্তু এমন-কিছু উদ্ধৃতি আছে যা সুভাষচন্দ্রের গভীর জীবনচেতনার সঙ্গে সংযুক্ত। সেগুলিকে বিশ্লেষণ করলে তাঁর জীবনবোধের রেখারূপ লাভ করা যায়।

সুভাষচন্দ্রের মরমী কবিবন্ধু দিলীপকুমার সুভাষের গুরুলাভ হল না বলে বারবার আক্ষেপ করেছেন। আমরা বলব, ভারতবর্ষের পরম সৌভাগ্য, সুভাষচন্দ্র কোন সাক্ষাৎ গুরুর কবলিত হননি। তাঁর গুরু বিদেহী বিবেকানন্দ এবং তাঁর বাণী। এর ফলে সুভাষচন্দ্র একদিকে যেমন আদর্শ লাভ করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি পেয়েছিলেন স্বাধীনতা—আত্মনির্মাণ ও আত্মবিস্তারের। কিছু পরে সুভাষচন্দ্র দেহধারী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মধ্যে কয়েক বৎসরের জন্য 'রাজনৈতিক গুরুলাভ' করবেন। কথাটা নিষ্ঠুর ঠেকলেও বলব, দেশবন্ধুর মৃত্যু সুভাষ-চন্দ্রের বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, প্রথম যৌবনে তিনি জীবন সম্বন্ধে যে-সিদ্ধান্ত করেছিলেন তা "কোনো এক রাত্রির চিন্তার ফলে গজিয়ে ওঠেনি, অথবা তাতে কোনো ব্যক্তি-বিশেষের নির্দেশ ছিল না। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, গভীর সন্ধানের ফলেই আমি এইসব সিদ্ধান্তে পৌছেছিলাম।" অর্থাৎ সুভাষ-চন্দ্র বিবেকানন্দ আদর্শ মূর্তির সামনে পরমাশ্চর্য একলব্য-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

সুভাষচন্দ্র কর্তৃক উদ্ধৃত বিবেকানন্দের জীবনসত্যদ্যোতক উক্তির সংখ্যা অধিক নয় (অন্তত আমরা তা পাই না)—হওয়াও সম্ভব নয়, কারণ সেগুলি ছিল মন্ত্রজাতীয় এবং মন্ত্র অল্পাক্ষরই হয়। আমরা দেখব, স্বামীজীর একই উক্তি, একাধিকবার উদ্ধৃত হয়েছে—কারণও একই।

উক্তিগুলি থেকে সুভাষচন্দ্রের ত্রিমুখ মানস-প্রবণতা দেখতে পাই। এ-বিষয়ে একটা সাদা-মাটা উল্লেখ সুভাষচন্দ্রের একটি চিঠিতে মেলে। দিলীপকুমারকে তিনি লেখেন (৫. ৩. ৩৩): "সত্যি কথা বলতে, শিব, কালী আর কৃষ্ণ—সবাইকে আমি সমান চোখে দেখি।…আমি দেখেছি, আমার মনের ভাব সব সময় একরকম থাকে না—মনের ভাব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার দেবতার রূপ বদলায়। এই তিনটি রূপের মধ্যে আবার দ্বন্দ্ব লাগে শিব আর শক্তির

মধ্যে। পরমযোগী শিবের রূপ আমাকে মুগ্ধ করে, আবার কালীর মাতৃমূর্তিও আমার ভালো লাগে।…কখনও আমি শৈব, কখনও শাক্ত, আবার কখনও বা বৈষ্ণব।"

শিব, কালী ও কৃষ্ণ—বলা বাহুল্য স্থূল কোন মূর্তি নয়—তিনটি ভাবের প্রতিমা—যাদের একত্রে অন্তরে ধারণ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র এবং ঐ তিন ভাবের মন্ত্রোচ্চারণ করে গেছেন বিবেকানন্দের কাছ থেকে সে মন্ত্র সংগ্রহ করে।

প্রথমত শিব। শিব সন্ন্যাসের দেবতা—বৈরাগ্যের, নিঃশেষ ত্যাগের, এবং দানের। আমরা জেনেছি, বিবেকানন্দের 'সন্ন্যাসীর গীতি' ছিল সুভাষের সর্বপ্রিয় কবিতা। চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন: "স্বামীজীর 'সন্ন্যাসীর গীতি' ওর গীতা। পুরো কবিতাটি ওর কণ্ঠস্থ ছিল, প্রায়ই ওর মুখে শোনা যেত কবিতাটি। যখন ভাবগম্ভীর ভঙ্গিতে, উদাত্ত সুরে ও আবৃত্তি করত ওটি—তখন ওকে অন্য মানুষ মনে হত।" দিলীপকুমার বলেছেন: "স্বামীজীর *Song of the Sannyasin* থেকে ও প্রায়ই উদ্ধৃত করত একটি চরণ: 'Have thou no home, what home can hold thee, friend'?" আত্মজীবনীতে সুভাষচন্দ্র স্বয়ং এক অনিকেত পাঞ্জাবী সাধুর সানুরাগ বর্ণনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন একই কবিতা থেকে:

"The sky thy roof, the grass thy bed,
and food what chance may bring."

শিব—যিনি নিঃস্ব, তিনিই আবার সর্বস্ব দান করেন। সেই সর্বস্ব দানের বিবেকানন্দ-মন্ত্র সুভাষচন্দ্র উচ্চারণে অক্লান্ত ছিলেন:

"দাও আর ফিরে নাহি চাও
থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।"

দ্বিতীয়ত কালী। কালী মহাশক্তি। কালী মহামৃত্যু। কালী মহামায়া। কালী মহামাতা। কালী তাই মৃত্যুপ্রেমিক বিপ্লবীর দেবী। বিবেকানন্দ মৃত্যুদর্শন আমরা আগেই উপস্থিত করেছি। সুভাষচন্দ্র যে নির্দিষ্টভাবে তন্ত্রসাধনা করেছেন, একথা কেবল অন্যের স্মৃতিকথা থেকে পাই না—তিনি স্বয়ং দিলীপকুমারকে পত্রযোগে (৫. ৩. ৩৩) সেকথা জানিয়েছেন।

আমরা জেনেছি, সুভাষচন্দ্র কৈশোরে গঙ্গা-জলে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করেছেন:

"Who dares misery, loves
And hugs the form of Death,
Dances in destructions dance,
To him the Mother comes. ?"

[স্মৃতিচারণ, পৃঃ ৩৬৭]

স্বামীজীর 'কালী দি মাদার' কবিতার অন্তর্গত উপরের উদ্ধৃতি। এই ইংরেজী কবিতার অনুরূপ স্বামীজীর অসাধারণ একটি বাংলা কবিতা আছে—'নাচুক তাহাতে শ্যামা'। সেই কবিতার একটি চরণ সুভাষচন্দ্রের মর্মসঙ্গীত:

"পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার
সদা পরাজয়—তাহা না ডরাক তোমা।"

['নূতনের সন্ধান']

তৃতীয়ত কৃষ্ণ। প্রেমের দেবতা কৃষ্ণ। সকল প্রেমের উৎস তিনি। সকল প্রেমে বিরাজিত তিনি। সুভাষচন্দ্রের শক্তিসাধনার, সংগ্রামের, মূলে কী আছে?—প্রেম। তাঁর সেবার মূলে কী আছে?—প্রেম। বিবেকানন্দ সেই প্রেমের মন্ত্র দিয়ে গেছেন—যাকে নিশিদিন উচ্চারণ করেছেন সুভাষচন্দ্র—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

[স্মৃতিচারণ, পৃঃ ৩২২]

সুভাষচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীর শেষাংশে

'আমার দার্শনিক প্রতীতি' অধ্যায়ের শেষে বলেছেন :

"আমার দৃষ্টিতে বাস্তবতার মূল ভিত্তি হচ্ছে প্রেম। কি বিশ্বজগতের কি মানবজীবনের— উভয়ের মূলে প্রেম।...আমার চারিদিকে দেখতে পাই প্রেমের লীলা। নিজের ভিতরও দেখি তারই প্রকাশ। নিজের পূর্ণতার জন্য প্রেমের প্রয়োজন বোধ করি, জীবনকে গড়ে তোলার একমাত্র ভিত্তি পাই প্রেমে।"

ব্যক্তিজীবন ও মানবজীবনের মূলে আছে প্রেম—এই সিদ্ধান্তে কিভাবে পৌছালেন তা বোঝাবার চেষ্টা সুভাষচন্দ্র এই রচনায় করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত :

"সুতরাং চেতনাই বাস্তব, আর চেতনার মূল হচ্ছে প্রেম—যার বিকাশ নিয়তই চলেছে সংঘাত ও সমাধানের মধ্য দিয়ে।"

[সিগনেট সং, পৃঃ ১৫৫—৫৭]।

নিখিলব্যাপ্ত প্রেম সম্বন্ধে স্বামীজীর অজস্র উক্তি আছে, বিশেষত সুভাষচন্দ্রের গীতাস্বরূপ বিবেকানন্দের পত্রাবলীতে। আমি সামান্য অংশ তুলছি :

"জীবনের অর্থ বিস্তার, বিস্তার ও প্রেম একই কথা। সুতরাং প্রেমই জীবন। প্রেমই জীবনের একমাত্র গতি-নিয়ামক।"

"প্রেমের কাছে সব ধূল-সমান। প্রেমেই অনিমাদি সিদ্ধি, প্রেমেই ভক্তি, প্রেমেই জ্ঞান, প্রেমেই মুক্তি।"

৫

সুভাষচন্দ্রের জীবনে পরবর্তী ইংলণ্ড-পর্বের ব্যাপ্তি দীর্ঘ নয়—সে সময়ে আবার তিনি ঘাড় গুঁজে পড়াশোনায় ডুবে ছিলেন। এই পর্বে দিলীপকুমারও ইংলণ্ড-প্রবাসী; উভয়ের মধ্যে বিশেষ অন্তরঙ্গতা ঘটেছিল—সুভাষচন্দ্র বিরূপ পরিবেশের মধ্যে হৃদয় উন্মোচন করবার সুযোগ পেতেন এঁর কাছেই। দিলীপকুমারের সাক্ষ্য অনুযায়ী—এই কালেও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বিষয়ে একান্ত আলোচনা সুভাষচন্দ্র করেছেন। দিলীপকুমার সুস্পষ্টভাবে বলেছেন—সুভাষচন্দ্র যে দৃঢ়ভাবে নানা প্রলোভন এড়িয়ে চলতে পেরেছেন তা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শের শক্তিতেই।

মাত্র আটমাসের মধ্যে সুভাষচন্দ্র কঠিন আই-সি-এস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিলেন (ইংরেজীতে প্রথম)—এই ঘটনার আশ্চর্যজনকতা একেবারে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল অধিকতর চাঞ্চল্যকর ঘটনায়—তিনি সেকালের বিবেচনায় উক্ত স্বর্গস্খলিত চাকুরিকে ত্যাগ করেছিলেন। এই চাকুরি ত্যাগের মূলে অরবিন্দের পূর্ব-দৃষ্টান্ত (অরবিন্দ অবশ্য আই-সি-এস পাস করেননি—সম্ভবত অশ্বারোহণে ইচ্ছাকৃত অসামর্থ্যের দ্বারা)—এবং বিবেকানন্দের প্রেরণা। (৬. ৪. ১৯২১ পত্র)। সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের গ্রন্থে পাই, সুভাষচন্দ্র স্বামীজীর কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন : "স্বামীজী, তুমি আমাকে পথ দেখিয়েছ—তুমিই এখনো ঠিক পথে চালিত করো।" [চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে শঙ্কর মহারাজের কথালাপে উল্লিখিত]। আই-সি-এস ত্যাগের পরে তিনি এমনও ভেবেছিলেন—রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেবেন। (২২. ৪. ১৯২১ পত্র)।

৬

ভারতে ফিরে, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে রাজনীতিতে প্রবেশ, কারাবরণ, স্বরাজ্য দল গঠনে সাহায্য, শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা, কর্পোরেশনে চীফ এগজিকিউটিভ অফিসারের চাকুরি, এবং ১৯২৪ অক্টোবরের শেষে গ্রেপ্তারের পরে বিনাবিচারে মান্দালয়ে নির্বাসন, নির্বাসনকালে দেশবন্ধুর মৃত্যু এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তি—সুভাষ-জীবনে এই আর এক পর্ব।

এই পর্বের প্রথম অংশে তিনি অত্যন্ত কর্ম-ব্যস্ত, এবং দেশবন্ধুর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলেন বলে নিজ নামে যথেষ্টসংখ্যক রচনা প্রকাশিত হয়নি, অথবা তার সন্ধান আমরা পাইনি। 'ফরোয়ার্ড' ও 'বাংলার কথা'-য় তাঁর অনেক বেনামা লেখা বেরিয়েছে, কিন্তু সেগুলি এখনও অনির্ধারিত। তবে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'আর্যসমাজ হলে' নিখিল বঙ্গ যুবসম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে তিনি যে-ভাষণ দেন তার মধ্যে "মথিত নরনারায়ণের উদ্বোধনের" আহ্বান ছিল; "এক হইতে বহুতে এবং বহু হইতে একের মধ্যে সহজ সরল স্বাভাবিক সংযোগের সৃষ্টি" করে সাধনাকে সর্বজনগ্রাহ্য করার আকাঙ্ক্ষা ছিল; জনশিক্ষার বহুল প্রচারের দ্বারা দেশের আত্ম-মর্যাদাবুদ্ধির জাগরণ, "ছুঁৎমার্গ পরিহার করে অস্পৃশ্যতা-ভূতকে ঝেড়ে ফেলে সবাইকে আপনার বলে আলিঙ্গন করার" জন্য আবেদন করা হয়েছিল। বলাবাহুল্য, এ-সকলই বিবেকানন্দের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি। নিম্নের অংশও:

"নরনারায়ণের এই আহ্বান উপেক্ষা করার নয়। রোগে যারা অবসন্ন, দারিদ্র্যে নির্যাতনে যারা কাতর, তাদের মধ্যে আমি সে আহ্বান, সে আদেশ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।...আজ আমাদের নিদ্রিত নারায়ণ জেগে উঠেছেন—ভোগবিলাস ও আরামের মাঝখানে নয়—যেখানে দারিদ্র্য, যেখানে দুর্ভিক্ষ, যেখানে নির্যাতন, যেখানে অপমান —সেখানে গিয়ে তাঁকে পূজা করতে হবে।" ['সুভাষ-রচনাবলী', ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯—১১]।

দেশবন্ধুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল কলকাতা কর্পোরেশন অধিকার করেছিল; বহু জনসেবা-মূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল; দেশবন্ধু সেই কাজকে পরিষ্কার 'দরিদ্রনারায়ণ'-সেবা বলে অভিহিত করেছিলেন—তাতে সুভাষচন্দ্রের সানন্দ সমর্থন ছিল, তা না বললেও চলবে। তবে দেশবন্ধুকে নিকট থেকে দেখাই এই পর্বে সুভাষচন্দ্রের সর্বোত্তম শিক্ষা। তিনি দেখে-ছিলেন—বিবেকানন্দ-কথিত মানবপ্রেমের আদর্শ কিভাবে মর্মে গৃহীত এবং কর্মে প্রকাশিত হতে পারে। এ-প্রসঙ্গের উল্লেখ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করেছি।

মান্দালয়ে দুই বৎসরের উপর কারাবাসকালে আত্মসমীক্ষার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন, জীবনের অনেক জটিল প্রশ্নের স্পষ্টতর সমাধান করতে পেরেছিলেন, লাভবান হয়েছিলেন আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে—একথা দিলীপকুমারকে চিঠিতে লিখেছেন। (মে, ১৯২৫)। মান্দালয় জেল থেকে হরিচরণ বাগচীকে লেখা চিঠিতে কিভাবে শরীর ও মনের উন্নতি করা সম্ভব তার সম্বন্ধে ধর্মনীতিসম্মত উপদেশ দিয়েছেন (এক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের নীতির প্রভাব ছিল) এবং মানসিক শক্তিবৃদ্ধির ও চরিত্রগঠনের জন্য যেসব বই পড়তে বলেছিলেন তার শুরুতেই বিবেকানন্দের গ্রন্থতালিকা—'পত্রাবলী', 'ভারতে বিবেকানন্দ'। সতর্ক করে বলেছেন—ঐসব বই পড়ার আগে 'জ্ঞানযোগ' ইত্যাদি দর্শনাত্মক বই পড়তে যাওয়া ঠিক হবে না। এইসঙ্গে কথামৃত পড়তেও বলেছেন। একই জনকে লেখা অন্য একটি চিঠিতে পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলির অতিরিক্ত স্বামীজীর 'চিকাগো বক্তৃতা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য', 'ভাববার কথা' পড়বার উপদেশ দিয়েছেন। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা এক চিঠিতে বাংলায় কর্মীদের মধ্যে ব্যবসাদারী ও পাটোয়ারী বুদ্ধির বৃদ্ধিতে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন: "আমি জিজ্ঞাসা করি—নরনারায়ণের সেবা ব্যবসাদারিতে কণ্ট্রাক্ট-এ কবে পরিণত হইল? আমি তো জানিতাম সেবার আদর্শ এই—'দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল'।" দুঃখের সঙ্গে বলেছেন: "যে বাঙালী এত শীঘ্র দেশবন্ধুর

ত্যাগের কথা ভুলিয়াছে—সে যে কতদিনের আগেকার স্বামী বিবেকানন্দের 'বীরবাণী' ভুলিবে —ইহা আর বিচিত্র কি?"

মান্দালয় থেকে লেখা অনেক চিঠিতেই সেবাধর্মের প্রসঙ্গ আছে। সেবা মানে যে ভিক্ষা দিয়ে ভিখারীর সংখ্যা বাড়ানো নয়, পরন্তু সাহায্যের দ্বারা তাদের মধ্যে কর্মপ্রবণতা বাড়িয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠিত করে তোলা, একথা বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেছেন। কিভাবে কারিগরি শিক্ষা দিয়ে, কুটীরশিল্পের সাহায্য নিয়ে, অর্থ-নৈতিক স্বয়ম্ভরতা বাড়ানো যায়—সে সম্বন্ধে নানা পরিকল্পনা এই পর্বের চিঠিতে দেখা যায়। এইসব চিন্তা ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তিনি স্পষ্টতই স্বামীজীর চিন্তার দ্বারা চালিত। এখানে স্বামী অখণ্ডানন্দকে লেখা বিবেকানন্দের চিঠির কথা স্বতই মনে পড়বে যাতে তিনি সাহায্যদানের সঙ্গে শিক্ষাদান ও সংগঠন শুরু করার তাগিদ দিয়েছিলেন। একই প্রসঙ্গে স্বামীজী স্বামী শুদ্ধানন্দকে লিখেছেন: "জনসাধারণকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শেখানো না যায় তবে জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য ভারতের একটি ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত হবে না।" সে যাই হোক, সেবা সুভাষচন্দ্রের রক্তমাংসের সঙ্গে এমনই মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল যে, এই চরম কথাটা লিখতে পেরেছিলেন: "আমি কংগ্রেসের কাজ ছাড়িতে পারি—তবুও সেবাশ্রমের কাজ ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব। দরিদ্রনারায়ণের সেবার এমন প্রকৃষ্ট সুযোগ আমি কোথায় পাইব?" নব্য

অন্যতম গঠনকর্তা, সমাজসেবী 'উৎকল-মণি' গোপবন্ধু দাসের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের অন্তরঙ্গতা ছিল। গোপবন্ধু যখন কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর মৃত্যুতে মর্মাহত হয়ে জনকল্যাণমূলক কাজ থেকে অবসর নেবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন তখন তাঁকে এক পত্রে (২৪. ১২. ২৫/পত্রটি বাংলায় লেখা) স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ স্মরণ করিয়ে উদ্দীপিত করতে চেয়েছিলেন: "জনকল্যাণমূলক কাজে প্রবেশের প্রথম দিন থেকেই আপনার নিজস্ব ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আপনি পরিত্যাগ করেছেন। জনসেবা হল সন্ন্যাসধর্মের মতন—একজন যখন একাজে প্রবেশ করে তখন তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অস্বীকার ক'রে তাকে সকল দম্ভের অবসান ঘটাতে হয়। একবার একাজে প্রবেশ করলে ফিরে যাওয়ার রাস্তাও নেই। সাময়িক-ভাবে যদিও আপনি বিহ্বল হয়ে পড়েছেন, এবং আপনার দুঃখ যদিও সীমাহীন, তবুও আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, আপনি ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করতে পারবেন। কেন হয় তা জানি না—তবে জীবনের ধর্মই হল, হৃদয় যার যত প্রসারিত, দুঃখ তার তত গভীর। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন: 'যত উচ্চ তোমার হৃদয় তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়'।" আর একটি চিঠিতে (৫. ৪. ১৯২৭) সুভাষচন্দ্র বিবেকানন্দের অনুসরণে লিখেছেন: "ত্যাগ ও উপলব্ধি—**renunciation and realisation** একই বস্তুর এপিঠ ওপিঠ।" একই প্রেরণায় অন্য এক চিঠিতে (৬. ৫. ১৯২৭) বলেছেন: "আমি জীবনকে এতটা প্রিয় মনে করি না যে, তা রক্ষার জন্য চালাকির আশ্রয় নেব।...শারীরিক বা বৈষয়িক সুখের নিরিখে জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ণয় করা যায় বলে আমি মনে করি না। আমাদের সংগ্রাম দৈহিক শক্তির নয়। বৈষয়িক লাভও আমাদের সংগ্রামের উদ্দেশ্য নয়।"

নির্বাসন থেকে লেখা সুভাষচন্দ্রের যে-দু-একটি গল্পরচনা পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং উৎকৃষ্ট দেশবন্ধু বিষয়ে প্রবন্ধ—যার মধ্যে দেশবন্ধুর দরিদ্রনারায়ণ-প্রীতির উপস্থাপনা আছে—পূর্ব অধ্যায়ে তার আলোচনা করেছি। 'তরুণের স্বপ্ন' নামক

রচনায় তিনি মানবজীবনকে অখণ্ড সত্যরূপে নির্দেশ করে সর্ববিধ স্বাধীনতার দাবি জানিয়েছেন। এবং সেকথা বলার সময়ে তাঁর প্রিয় স্বামী বিবেকানন্দের একটি উক্তির প্রতিধ্বনি করেছেন: "অনাদিকাল হইতে আমরা মুক্তির সঙ্গীত গাহিয়া আসিতেছি। শিশুকাল হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আমাদের শিরায়-শিরায় প্রবাহিত। জন্মিবামাত্র আমরা যে কাতর কণ্ঠে ক্রন্দন করিয়া উঠি—সে ক্রন্দন পার্থিব বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাইবার জন্য।" 'দেশের ডাক' রচনায় তিনি আহ্বান জানিয়েছেন দেশ-সেবায় নবীন সন্ন্যাসীদের—আত্মবলি দেবার জন্য।

[ক্রমশঃ]

স্বামী বিবেকানন্দ ও 'কর্মে পরিণত বেদান্ত'

শ্রীমতী রুবি দাশগুপ্ত

কৃষ্ণনগর গভর্ণমেণ্ট কলেজে দর্শনের অধ্যাপিকা।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের আগের অবস্থাটা যদি দেখি, তবে দেখব, চারিদিকে এক ভয়ানক অস্থিরতা, ধর্ম নিয়ে শুধু তর্ক-বিতর্ক, পাশ্চাত্য আদব কায়দার অনুকরণের অপর নাম সামাজিকতা, উচ্ছৃঙ্খলতাই নব্য নৈতিকতা, আর যুক্তি-বিরোধী সঙ্কীর্ণতার নাম আধুনিক মানসিকতা। একদিকে বৈষ্ণবধর্ম অন্যদিকে শাক্ত ও শৈব-ধর্মের মধ্যে চলছে প্রচণ্ড বিরোধ। তাঁরা যে একই হিন্দুধর্মের দুই প্রধান অংশীদার এ-হেন সত্যটি যেন তখন অপসৃত। অপরদিকে খ্রীষ্টান মিশনারীদের বেপরোয়া অপপ্রচার, যার ফলে মা-কালীকে হতে হয়েছিল **'dark and uncivilized'**। নমুনা আরো আছে,—কিন্তু আসল কথা হল এই দুর্মদ প্রভাব, কিন্তু কোন নতুন ধর্মমত ও সমাজব্যবস্থা নির্দেশ করতে পারেনি। শুধু হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সমাজকে ধ্বংসের পথটি চিনিয়ে দিয়েছিল মাত্র। এরমধ্যে অবশ্য প্রথম আশার আলো, নবজাগরণের ইঙ্গিত এনেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। বেদ-বেদান্তের সারবস্তু স্মরণ রেখে তিনি নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা প্রচার করেছিলেন। তিনিই প্রথম বুঝেছিলেন, ধর্ম কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়,—এটি সমাজ জীবনে রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সব কিছুর সঙ্গে ওতপ্রোত। কিন্তু রামমোহনের অনুবর্তীরা তাঁর মতাদর্শের অনুগত থাকতে পারেনি, ইতিহাসে সে প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতীয় জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ ধর্মীয় ভাবের এই পরিবর্তন-পরম্পরা পুরো জাতীয় জীবনে এনে দিয়েছিল এক গ্লানি ও নৈরাজ্য। এইরকম অস্থিরতার মধ্যে আবির্ভাব হয়েছিল যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের। গীতার সেই আশ্বাসবাণী বাস্তবায়িত করেছিলেন বলেই তিনি যুগাবতার, এসেছিলেন যুগের প্রয়োজন ও হিতসাধনে। 'ধর্ম' যার অন্য নাম সত্য-প্রেম, তাকেই প্রতিষ্ঠা করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন। তিনি ছিলেন ধর্মসংস্থাপক। ধর্মের অলিগলি থেকে রাজপথ সমস্ত পথেই স্বচ্ছন্দ বিচরণ করে সত্যকে পরিপূর্ণরূপে ফুটিয়ে তুলেছিলেন নিজের জীবনে। হাঁচি টিক্‌টিকি থেকে অদ্বৈত বেদান্ত, সবের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছিলেন—সত্য এক, দুই নয়। সব রাস্তাই এক লক্ষ্যে গিয়ে পৌছায়। আচার নিয়ম প্রভৃতি ধর্মের বাইরের কথা। ধর্মমত গৌণ, ধর্মই

মুখ্য। কোন মতই তুচ্ছ নয়। সব মানুষ এক নয়, তাই বহুপথের প্রয়োজন। সব মতেই এমন কিছু আছে যা নিত্য ও সার্বজনীন। তিনি সেটি লাভ করেছিলেন এবং প্রচার করতে চেয়েছিলেন। আর সেই জন্যই এক যোগ্য উত্তরাধিকারীর কাছে রেখে গিয়েছিলেন একটি বীজমন্ত্র —জীবপ্রেমই শিবপ্রেম।

সেই উত্তরাধিকারীই হলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত বা আজকের এবং ভবিষ্যতের স্বামী বিবেকানন্দ— সুদর্শন, তেজস্বী, অসাধারণ প্রতিভাবান, যুক্তিবাদী, পাশ্চাত্য যুক্তিবাদে শিক্ষিত কিন্তু সত্যানুসন্ধিৎসু, ধ্যানানুরাগী, সর্বোপরি জিতেন্দ্রিয়। উত্তর-কলকাতার এই উঠতি ছেলেটি চেয়েছিল ঈশ্বরকে দেখতে, পরিবর্তে শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁকে শিখিয়েছিলেন নিজেকেই ঈশ্বর রূপে উপলব্ধির আশ্চর্য কৌশলটি এবং ন্যস্ত করেছিলেন অন্যকেও সেই উপলব্ধির পথে প্রেরণাদানের সুকঠিন দায়। কিছু নতুন কথা নয়; বেদ-উপনিষদ-বেদান্ত তো মানুষকে একথাই শুনিয়ে আসছে বারবার— 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। তাই যদি হবে তবে নিজের মধ্যে সেই ঈশ্বরকে প্রকাশ করতে বাধাটা কোথায়? প্রয়োজন সাধনার। দিতে হবে মনোবল, ধৈর্য, নিষ্ঠা, পরিশ্রম; ফলস্বরূপ আসবে সাফল্য, গৌরব, সম্মান। ঈশ্বর তো সত্য শিব ও সুন্দর—জীবনের মহত্তম আদর্শ। যাকে প্রতিফলন করতে হয় নিজের প্রতিটি জীবনচর্যায়। সচেতন ও অচেতন ভাবে এই কাজই করছে সবাই। যে যতটা করেছে সে ততটাই এগিয়েছে ঈশ্বরলাভের পথে। ঈশ্বরলাভের অর্থ সেই আদর্শের সম্পূর্ণ প্রতিফলন অর্থাৎ ঈশ্বরে রূপান্তরিত হওয়া। শাস্ত্র তাই বলেছে, 'ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি'। অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্ত, 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'—তা প্রতি মুহূর্তে সকল অস্তিত্বের মধ্যে, দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে হবে। বেদান্ত পেল এক নতুন 'dimension'— স্বামীজী নাম দিলেন Practical Vedanta। বেদান্ত শুধু জ্ঞানীর চর্চার বিষয় নয়; সবার ব্যবহারের বিষয়। যা ছিল বনে তা আসবে ঘরের কোণে কোণে। যা ছিল মুখে, তা প্রবেশ করুক মনের গভীরে। প্রকাশ পাক চিন্তায় ও আচরণে। শাস্ত্র অধিকারী-ভেদ বর্ণনা করে ঠিকই, কিন্তু তার আগে সংযোজন করতে হবে এই অধিকার প্রতিটি মানুষের,—যে কোন জীবেরই জন্মগত অধিকার। আর এর ব্যবহারে ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত উভয় দিক থেকেই লাভ হবে অসাধারণ।

স্বামী বিবেকানন্দ-কৃত তত্ত্বের প্রায়োগিক রূপটি যদি বিশেষভাবে অনুধাবন করি তবে দেখব তিনি ছিলেন একজন অদ্বৈতবাদী, কিন্তু জীবনকে তিনি অস্বীকার করেননি। তিনি সব কিছুর মধ্যে ব্রহ্মের প্রকাশ দেখেছেন। সব কিছুই তাঁর কাছে মহৎ, পবিত্র, সুন্দর। প্রকৃত বেদান্তবাদী বলেই তিনি জগতের পশ্চাতে এক পারমার্থিক সত্যকে জানতেন, ঠিক তেমনি জগতের ব্যবহারিক দিককেও তিনি মেনেছেন। তিনি স্পষ্টই জেনেছিলেন, এই জীবনের ভেতর দিয়েই জীবনের উর্ধ্বে যেতে হয়; মৃত্যুকে জয় করতে হয়। তাই জীবনের এমন কোন সমস্যা নেই, এমন কোন দিক নেই, যা নিয়ে স্বামীজী চিন্তা করেননি। তিনি 'Totality' বা সমগ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী ছিলেন। এই অখণ্ড ও উচ্চ দৃষ্টি অদ্বৈতের। তিনি চেয়েছিলেন, অদ্বৈতের নিয়মই ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের নিয়ামক হোক। কারণ এই নিয়মই পারে সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে এক পরিবারভুক্ত করতে। যে-কোন অবস্থায় যে-কোন ভেদকে দূর করতে পারে। এই অভেদই অদ্বৈতের লক্ষ্য। এই দৃষ্টিতে যে-কোন কর্মই উপাসনায় রূপান্তরিত হয়। তাই স্বামীজী

বললেন, যে-কোন কর্মই যদি নিষ্কামভাবে করা যায় তাতে চিত্তশুদ্ধি হয়।

'নিষ্কাম কর্ম' কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে ঈশ্বরের প্রীতির জন্য কর্ম। সব কিছুই বৃহত্তমের উদ্দেশ্যে কৃত হবে। সর্বপ্রকার শুভের, সর্বপ্রকার নৈতিক মঙ্গলের মূলমন্ত্র 'আমি' নয়,—'তুমি'। তাই স্বামীজী বলছেন—"আপনাকে ভুলিয়া যাও; আস্তিকই হও, নাস্তিকই হও, অজ্ঞেয়বাদী হও বা বৈদান্তিক হও, খ্রীষ্টান হও বা মুসলমান হও—ইহাই প্রথম শিক্ষার বিষয়। এই শিক্ষা, এই উপদেশ সকলেই বুঝতে পারে। নাহং নাহং তুহুঁ তুহুঁ—" এই অহং নাশের মধ্য দিয়েই চিত্ত শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ চিত্তে প্রকৃত 'আমি'র বিকাশ ঘটে, অর্থাৎ জ্ঞানোদয় হয়।

আর একটি 'নতুন কথা' স্বামীজী শিখিয়েছেন—দুঃখী, আর্ত, পীড়িত মানুষের সেবাই ঈশ্বর সেবা—ঈশ্বরের পূজা। এই পূজার জন্য কোন 'অকেজো দেবতার' অন্বেষণের প্রয়োজন নেই। "…তোমার সম্মুখে, তোমার চতুর্দিকে যে দেবতাকে দেখিতেছ সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না?…প্রথম পূজা—বিরাটের পূজা… পূজা করিতে হইবে—সেবা নহে…" এখানেই স্বামীজীর স্বকীয়তা, এতে নিজের মুক্তি ও অন্যের উন্নতি নিহিত। 'শিবজ্ঞানে জীব সেবা' বেদান্তের এই নবীনতম সূত্রটি প্রকৃতপক্ষে চারিটি যোগের যুক্ত প্রয়াস। মানুষ ঈশ্বরেরই প্রতিবিম্ব, এটি জ্ঞানীর উপলব্ধ সত্য। মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ সংযোগ লাভ সম্ভব, এটি ভক্তিশাস্ত্রের প্রধান আকাঙ্ক্ষা। এ-সবের জন্য প্রয়োজন এক বিশেষ ধরনের মানসিক ভারসাম্য। মানসিক সংযমের মধ্যে আসবে স্থৈর্য ও শান্তি। তীব্র কর্মশীলতার মধ্যে চাই অনন্ত শান্তভাব। এটি যোগের কাছে প্রাপ্য। সুতরাং দেখা গেল, স্বামীজীর প্রদর্শিত 'নতুন' পথটি হল জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগের সম্মিলিত পথ—সত্যলাভের প্রতি নিশ্চিত পদক্ষেপ।

এইভাবে জীবনের সর্বস্তরে যদি একই সত্য অনুভূত হয় তবে সমাজের সমগ্র চেহারাটি পালটে যায়, বিশেষ সুবিধাবাদ, শোষণ প্রভৃতির অবসান ঘটে। আধুনিক মনের যা কিছু চাহিদা, যেমন—স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, আত্মসম্মান ইত্যাদি সবই একমাত্র এই আধ্যাত্মিক আদর্শের শক্ত ভিতের উপর নিশ্চিত প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। স্বামীজী একটি কথা বলতেন, যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছে সেদিন থেকে শুরু হয়েছে সত্য-যুগের। কথাটি বোধ হয় নেহাত মুখের কথা নয়, সত্যযুগ হল সাম্যের যুগ। তিনি জানতেন শূদ্রযুগ আসছে। উচ্চ-নিচ, ধনী-নির্ধন, হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল এবার সবাই এক হয়ে যাবে। তবে ব্রাহ্মণকে নামিয়ে দিয়ে নয়, শূদ্রকে ব্রাহ্মণের পদবীতে উন্নীত করে। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণত্বের অর্থ হল সংস্কৃতিবান্ হওয়া, মন, বুদ্ধি, হৃদয়ের ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান হওয়া। শূদ্রশক্তি ব্রাহ্মণ-কৃষ্টিতে সংস্কৃত ও মার্জিত হয়ে সমাজ-দেহের প্রতিটি অঙ্গে বিচ্ছুরিত হবে বলে তিনি আশা করতেন।

স্বামীজীর বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জন স্টুয়ার্ট মিলের উপযোগিতাবাদের সমান্তরাল নয়। এটি পুরো-পুরিভাবে অদ্বৈতের আধ্যাত্মিক ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এর পিছনে যে শিক্ষা কাজ করছে তা হল—

'…রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥'
(কঠোপনিষদ্, ২।২।১০)

বহুরূপের অন্তরালে একই অন্তরাত্মা বিরাজ-মান। এক মানব গোষ্ঠী, এক মানব ঐক্য

শুধু মানুষ নয়, পশু, পক্ষী, তৃণ-লতা এমন কি ক্ষুদ্র জীবাণু পর্যন্ত সেই অখণ্ড সত্তার অংশস্বরূপ। প্রভেদ কেবল পরিমাণগত, প্রকারগত নয়। তবে মনে রাখতে হবে বৈচিত্র্য প্রকৃতির নিয়ম, পরিবর্তন জীবনের ধর্ম। কিন্তু এই অনৈক্যের পশ্চাতে এক মহান ঐক্য বিদ্যমান। এই ঐক্যকে স্মরণ রেখেই তিনি বলেছেন—"Not tolerance but acceptance"—সহ্য করা নয়, বরণ করা।

স্বামীজী মনে করতেন ডারউইনের Survival of the fittest নীতিটির যোগ্য ব্যবহার মানবসমাজে সম্ভব নয়। সর্বদা আশা, উৎসাহ, সাহস জোগাতে হবে সমাজের নিচুতলার মানুষদের। ভারতবর্ষের দরিদ্র, অনগ্রসর, নিপীড়িত মানুষের রূপটি তাঁকে বড় ব্যথিত করত। বৈদান্তিক মানুষকে ভালবাসে। তাঁর চোখে পাপ বলে কিছু নেই। মানুষের ভুল, অন্যায় সাময়িক। সুযোগ-সুবিধা, উৎসাহ ও শিক্ষা পেলে, তাঁর সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হলে সে তাঁর নিজের শক্তিতে বড় হবে। মানুষকে পাপী না বলে বেদান্তী বরং ঠিক বিপরীত পথ ধরেন এবং বলেন—তুমি পূর্ণ ও শুদ্ধস্বরূপ, যাকে তুমি পাপ বল তা তোমার মধ্যে নেই। তা হল তোমার নিম্নতম প্রকাশ; যদি পার তবে উচ্চতর ভাবে নিজেকে প্রকাশ কর, কারণ পাপ ও পুণ্যের পার্থক্য পরিমাণগত। মানুষকে তাঁর দুর্বলতার বিষয়ে ভাবতে বলা তাঁর দুর্বলতার প্রতিকার করা নয়, তাঁর শক্তি স্মরণ করিয়ে দেওয়াই দুর্বলতার প্রতিকার। তাই তিনি বললেন—"Each soul is potentially divine." জগৎকে মায়ারূপে অগ্রাহ্য করেও তিনি নিঃশঙ্ক চিত্তে বলতে পারেন—"It is love and love alone that I preach…"

আর এই তো হল উপনিষদের শিক্ষা—

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥
(ঈশোপনিষদ্, ৬)

সর্বত্র একই সত্তার উপস্থিতি দেখার পর হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি থাকে না। একত্ববাদ আত্ম-প্রীতিকে সর্বভূতের প্রীতিতে পরিণত করে। শুধু-মাত্র আমিই শুদ্ধস্বভাব নই,—সকলেই তাই। সেই জন্য সকলের প্রতি বিশ্বাস চাই। আত্মবিশ্বাস রূপ আদর্শই মানবজাতির সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করতে পারে।

স্বামীজীর সমস্ত চিন্তা, যাবতীয় কর্ম যথার্থ অদ্বৈতভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই কোন মতের, কোন ভাবের বিরোধিতা তাঁর মধ্যে নেই। লণ্ডনের এক বক্তৃতায় অধ্যাত্মবাদী হয়ে তিনি যা বলেছিলেন, তা একমাত্র তিনিই বলতে পারেন—"The materialist is right—there is but one, only he calls that one matter and I call it God" তিনি নিজেই জানিয়েছেন—"I base my teaching on the great Vedantic truth of the sameness and omnipresence of the soul of the universe." তিনি চাইতেন প্রত্যেক মানুষের অন্তরস্থ সত্যই তাঁর উপাস্য হোক। তিনি সব সময় মনে করতেন, বেদান্তের তত্ত্বই হোক আর ধর্মের আদর্শ হোক, যতক্ষণ না তা প্রাত্যহিক জীবনে, নাগরিক জীবনে, প্রত্যেক জাতির জীবনে কার্যে পরিণত করা যাচ্ছে, ততক্ষণ তাঁর কোন মূল্য নেই। তা কেবল মুষ্টিমেয়র মতবাদে পর্যবসিত হবে মাত্র।

অষ্টাবক্র-গীতা

অনুবাদক : স্বামী ধীরেশানন্দ

[চৈত্র, ১৩৯১ সংখ্যার পর]

আত্মানুভবোপদেশঃ

যদি সর্ব প্রপঞ্চই রজ্জুসর্পের ন্যায় কল্পিত এবং আত্মা স্বভাবতই আনন্দস্বরূপ তাহা হইলে আত্মার বন্ধন ও মোক্ষ কি করিয়া হয়?—এই শংকার উত্তরে বলিতেছেন—

মুক্তাভিমানী মুক্তো হি বদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি।
কিম্বদন্তীহ সত্যেয়ং যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ ॥ ১১ ॥

অন্বয় : মুক্ত-অভিমানী হি মুক্তঃ, বদ্ধ-অভিমানী অপি বদ্ধঃ (ভবতি), যা মতিঃ সা গতিঃ ভবেৎ ইহ ইয়ং কিম্বদন্তী সত্যা ॥ ১১ ॥

অনুবাদ : 'আমি মুক্ত' এইরূপ অভিমানী মুক্তই হইয়া থাকেন ও 'আমি বদ্ধ' এইরূপ অভিমানকারী বদ্ধই হন। 'যাহার যেরূপ বুদ্ধি, তাহার গতিও[১] তদ্রূপ হইয়া থাকে'—এই লোকপ্রসিদ্ধি অতীব সত্য।

১ 'তং বিদ্যাকর্মণী সমন্বারভেতে, পূর্বপ্রজ্ঞা চ'—বৃঃ
'যং যং বাপি স্মরন্ ভাবম্'—গীঃ

বন্ধ ও মোক্ষ উভয়ই অভিমানপ্রসূত, কোনটিই বাস্তব নহে। দুর্বোধ্য আত্মতত্ত্ব শিষ্যবোধের নিমিত্তই পুনঃ পুনঃ বর্ণন করা হইতেছে।

জীবাত্মার বন্ধন ও মোক্ষ উভয়ই পারমার্থিক, নৈয়ায়িকগণের এই মত নিরাকরণ করিতেছেন—

আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণ একো মুক্তশ্চিদক্রিয়ঃ।
অসঙ্গো নিঃস্পৃহঃ শান্তো ভ্রমাৎ সংসারবানিব ॥ ১২ ॥

অন্বয় : আত্মা ভ্রমাৎ সংসারবান্ ইব (ভাতি। যতঃ আত্মা) সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণঃ একঃ মুক্তঃ চিৎ অক্রিয়ঃ অসঙ্গঃ নিঃস্পৃহঃ শান্তঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ : ভ্রমবশতই আত্মা সংসারী জীবের ন্যায় প্রতিভাত হন। কিন্তু বস্তুতঃ আত্মা সংসারী নহেন, কারণ আত্মা স্বভাবতই সাক্ষী[১], বিভু[২], পূর্ণ, এক[৩], মুক্ত[৪], চিদ্রূপ[৫], অক্রিয়, অসঙ্গ[৬], নিঃস্পৃহ[৭] ও শান্তস্বরূপ[৮] ॥ ১২ ॥

১ কর্তারূপে প্রসিদ্ধ অহংকারাদিরও সাক্ষী আত্মা স্বয়ং কর্তা নহেন।
২ যাঁহা হইতে বিবিধ বস্তু উৎপন্ন হয় তিনিই বিভু অর্থাৎ সর্বাধিষ্ঠান।
৩ স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরহিত অদ্বিতীয়।
৪ স্বভাবতই মায়া ও তৎকার্যের অতীত।
৫ স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ।
৬ সর্বসম্বন্ধশূন্য।
৭ বিষয়াভিলাষরহিত।
৮ দেহাদি অন্তঃকরণের ধর্ম প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যাদিরহিত।
(সুতরাং আত্মা বস্তুতঃ সংসারী নহেন)।

পরিচ্ছিন্ন দেহাত্মত্ববুদ্ধি ও আত্মাতে সুখিত্বদুঃখিত্বাভিমানরূপ ভ্রম অনাদিপরম্পরাগত; উহা একবার মাত্র আত্মভাবনাদ্বারা দূরীভূত হওয়া দুরূহ। সুতরাং আচার্য পুনঃ পুনঃ বিজাতীয় ভাবনা নিবৃত্তিপূর্বক অদ্বৈতাত্মভাবনার উপদেশ দিতেছেন—

কূটস্থং বোধমদ্বৈতমাত্মানং পরিভাবয়।
আভাসোঽহং ভ্রমং মুক্ত্বা ভাবং বাহ্যমথান্তরম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ অহম্ আভাসঃ (ইতি) ভ্রমং, (তথা) বাহ্যম্ অথ আন্তরং ভাবং মুক্ত্বা কূটস্থং বোধম্ অদ্বৈতম্ আত্মানং পরিভাবয় ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ: হে শিষ্য! আমি অহংকাররূপ এই ভ্রম, দেহাদি আমার, এই বাহ্যভাবনা এবং আমি সুখী দুঃখী মূঢ় ইত্যাদি আন্তরভাবনাসমূহ পরিত্যাগ করিয়া অকর্তা অসঙ্গবোধস্বরূপ ব্যাপক অদ্বিতীয় আত্মাকে চিন্তা কর ॥ ১৩ ॥

অনাদিকালীন দুশ্ছেদ্য দেহাত্মত্ববুদ্ধি পুনঃ পুনঃ জ্ঞানখড়্গ দ্বারা ছিন্ন করিয়া সুখী হও—

দেহাভিমানপাশেন চিরং বদ্ধোঽসি পুত্রক।
বোধোঽহং জ্ঞানখড়্গেন তন্নিঃকৃত্য সুখী ভব ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ হে পুত্রক! দেহ-অভিমান-পাশেন চিরং বদ্ধঃ অসি। অহং বোধঃ (ইতি) জ্ঞান-খড়্গেন তৎ নিঃকৃত্য সুখী ভব ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ: হে পুত্রোপম শিষ্য! সুদীর্ঘকাল যাবৎ তুমি দেহাত্মত্বাভিমানে বদ্ধ হইয়া আছ, সুতরাং 'আমি শুদ্ধচৈতন্যস্বভাব' এই ভাবনারূপ জ্ঞানখড়্গ দ্বারা উক্ত অভিমান নিঃশেষে ছিন্ন করিয়া সুখী হও ॥ ১৪ ॥

চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ সমাধিই একমাত্র ভববন্ধনিবৃত্তির হেতু, এই পাতঞ্জল যোগমত নিরাকরণ করিতেছেন—

নিঃসঙ্গো নিষ্ক্রিয়োঽসি ত্বং স্বপ্রকাশো নিরঞ্জনঃ।
অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি ॥ ১৫ ॥

অন্বয়: ত্বং নিঃসঙ্গঃ নিষ্ক্রিয়ঃ স্বপ্রকাশঃ নিরঞ্জনঃ অসি। সমাধিম্ অনুতিষ্ঠসি অয়ম্ এব হি তে বন্ধঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ: হে শিষ্য! তুমি সর্বসম্বন্ধশূন্য, সর্বক্রিয়ারহিত, স্বয়ং প্রকাশ ও সর্ব অজ্ঞান এবং তৎকার্য-রূপ কালিমাবিহীন হইয়াও যে বৃত্তিনিরোধাত্মক সমাধির অনুষ্ঠান করিতেছ, ইহাই তোমার[১] বন্ধন ॥ ১৫ ॥

১ জ্ঞানাতিরিক্ত অন্য উপায়ানুষ্ঠান, বন্ধন ব্যতীত আর কিছুই নহে—ইহাই ভাবার্থ।

আত্মজ্ঞানাতিরিক্ত সমাধি আদি সর্ব সাধন পূর্বে নিরাকরণ করা হইয়াছে। যাবতীয় বিপরীত কল্পনা পরিত্যাগপূর্বক শুদ্ধচৈতন্যনিষ্ঠ হইয়া থাকাই সাধকের কর্তব্য ইহাই অগ্রিম দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—

ত্বয়া ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং ত্বয়ি প্রোতং যথার্থতঃ।
শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপস্ত্বং মা গমঃ ক্ষুদ্রচিত্ততাম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয় : ইদং বিশ্বং ত্বয়া ব্যাপ্তং, ত্বয়ি প্রোতং, ত্বং যথার্থতঃ শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বরূপঃ, ক্ষুদ্রচিত্ততাং মা গমঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ : হে শিষ্য ! কটক-কুণ্ডলাদি মধ্যগত কনকের ন্যায় তুমি এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত, (ঘটশরাবাদিতে মৃত্তিকার ন্যায় অথবা পটে [কাপড়ে] সূত্রের ন্যায়) তুমিই সর্বত্র ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছ। তুমি স্বরূপতঃ অবিদ্যাতৎকার্যরহিত স্বপ্রকাশ চিদ্রূপ[১]। পরিপূর্ণ শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ তুমি আর দীনচিত্ত হইও না, অর্থাৎ বিপরীত কল্পনার বশীভূত হইও না ॥ ১৬ ॥

১ অধ্যারোপ ও অপবাদ প্রক্রিয়া অবলম্বনে নিষ্প্রপঞ্চ আত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইল।

ষড়ূর্মি ও ষড়্ভাববিকার রহিত আত্মস্বরূপ উপদিষ্ট হইতেছে—

নিরপেক্ষো নির্বিকারো নির্ভরঃ শীতলাশয়ঃ।
অগাধবুদ্ধি অক্ষুব্ধো ভব চিন্মাত্রবাসনঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয় : নিরপেক্ষঃ নির্বিকারঃ নির্ভরঃ শীতল-আশয়ঃ অগাধ-বুদ্ধিঃ অক্ষুব্ধঃ (ত্বং) চিৎ-মাত্র-বাসনঃ ভব ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ : হে শিষ্য ! তুমি বস্তুতঃ নিরপেক্ষ অর্থাৎ ষড়ূর্মিরহিত,[১] ষড়্ভাববিকারাতীত,[২] চিদ্ঘন-স্বরূপ, শীতলচিত্ত অথবা সদাসুখস্বরূপ, অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্যমূর্তি, অবিদ্যাকৃত সর্বক্ষোভ-শূন্য। অতএব তুমি সর্বকর্ম পরিত্যাগ করিয়া এক স্বরূপচৈতন্যমাত্রনিষ্ঠ হও ॥ ১৭ ॥

১ ষড়ূর্মি : অশনাপিপাসা, শোকমোহ ও জরামৃত্যু।
২ ষড়্ভাববিকার : মহর্ষি যাস্কোক্ত— 'জায়তে, অস্তি, বর্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তেও নশ্যতি'। জন্ম, সত্তা, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও মৃত্যু ॥

প্রথম শ্লোকে বলা হইয়াছে—বিষয় বিষের ন্যায় ও আত্মা অমৃতের ন্যায়। অতএব বিষয় ত্যাগ কর, আত্মাকে ভজ। এখন পর পর তিনটি শ্লোকে বলা হইতেছে—মোক্ষের হেতু চিদাত্মা অধিষ্ঠানরূপে এই চরাচর বিশ্ব (বিষয়) ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। দর্পণে প্রতিবিম্বিত দেহাদি যেমন দর্পণ ব্যতীত আর কিছুই নয় সেইরূপ আত্মাতে অধ্যস্ত এই বিশ্ব আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নয়—এইরূপ চিন্তা দ্বারা বিশ্বরূপ যাবতীয় বিষয়ে আত্মদৃষ্টিই পরমপুরুষার্থ।

সাকারমনৃতং বিদ্ধি নিরাকারং তু নিশ্চলম্।
এতত্তত্ত্বোপদেশেন ন পুনর্ভবসম্ভবঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয় : সাকারম্ অনৃতং বিদ্ধি। নিরাকারং তু নিশ্চলং (বিদ্ধি)। এতৎ তত্ত্ব-উপদেশেন ন পুনঃ-ভব-সম্ভবঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ : হে শিষ্য ! তুমি দেহাদি সর্বসাকার বস্তু মিথ্যা বলিয়া জান (সুতরাং সর্বপদার্থ মিথ্যা বোধে ত্যাগ কর) এবং নিরাকার আত্মবস্তুকে ত্রিকালাবস্থায়ী ও নিত্যরূপে অবধারণ কর। এই চিন্মাত্রবস্তুবিষয়ক উপদেশপ্রাপ্তির অনন্তর সেই বস্তুতে বিশ্রান্তি লাভ করিলেই ন-পুনর্ভব অর্থাৎ অপুনর্ভব বা মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

বর্ণাশ্রমধর্মবিশিষ্ট স্থূল শরীর এবং পুণ্যাপুণ্য ধর্মবিশিষ্ট সূক্ষ্ম শরীর হইতে পৃথক্ পরিপূর্ণ আত্মচৈতন্য দৃষ্টান্ত সহ নিরূপণ করিতেছেন—

যথৈবাদর্শমধ্যস্থে রূপেঽন্তঃ পরিতস্তু সঃ।
তথৈবাস্মিন্ শরীরেঽন্তঃ পরিতঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয় : যথা এব আদর্শ-মধ্যস্থে রূপে অন্তঃ পরিতঃ সঃ তু, তথা এব অস্মিন্ শরীরে অন্তঃ পরিতঃ পরম-ঈশ্বরঃ (বর্ততে) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ : দর্পণে প্রতিবিম্বিত দেহাদির অন্তরে ও বাহিরে যেরূপ এক দর্পণই পরিব্যাপ্ত হইয়া বিদ্যমান, আত্মাতে অধ্যস্ত এই স্থূল দেহাদির অন্তরে ও বাহিরেও তদ্রূপ এক চিদাত্মাই পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন[১]।

১ সর্ব প্রকরণের অর্থই এখানে সংক্ষেপে সূচিত হইল।

আত্মার বাহ্যাভ্যন্তর ব্যাপকতা ঘটাকাশদৃষ্টান্ত দ্বারা আরও স্পষ্ট করা হইতেছে—

একং সর্বগতং ব্যোম বহিরন্তর্যথা ঘটে।
নিত্যং নিরন্তরং ব্রহ্ম সর্বভূতগণে তথা ॥ ২০ ॥

অন্বয় : যথা সর্বগতং একং ব্যোম ঘটে বহিঃ অন্তঃ (বিদ্যতে) তথা নিত্যং ব্রহ্ম সর্ব-ভূত-গণে নিরন্তরং (বর্ততে) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ : প্রলয় পর্যন্ত স্থায়ী রূপে নিত্য এক মহাকাশ যেরূপ ঘটের অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান, অবিনাশী ব্রহ্মও তদ্রূপ সর্বভূতগণের অন্তরে ও বাহিরে সদা বর্তমান রহিয়াছেন[১]।

১ অতএব 'আমি শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ আত্মা' এইরূপ জ্ঞানখড়্গ দ্বারা দেহাভিমান নিঃশেষে ছিন্ন করিয়া সুখী হও (১।১৪ দ্রঃ) ॥

ইতি আত্মানুভবোপদেশ নামকং প্রথমং প্রকরণম্ সমাপ্তম্। [ক্রমশঃ]

শ্রীরামকৃষ্ণের শাঁখ

ডক্টর কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত
লব্ধকীর্তি প্রবীণ কবি।

বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের দূর-ভাষণের শাঁখ
যাঁহার কণ্ঠে পরম পুরুষ ভারতে দিলেন হাঁক।
সাড়া দিল সবে স্বামীজীর ডাকে জাগো ভাই জাগো সবে,—
একযোগে জেগে ওঠো নারীনর বৈরীর পরাভবে।
মানুষ হইয়া মিলিয়া দাঁড়াও তুলিয়া উচ্চশির
অরুণ কিরণ সিন্দুর দিল শিখরে হিমাদ্রির।
ভারত মাতার তেত্রিশ কোটি সন্তান পরিবার
জাতীয় গর্বে মাতি সবে হও এক জাতি একাকার।
চির বঞ্চিত লাঞ্ছিত যারা—যাহাদের কেহ নাই
হাতে ধ'রে বুকে তুলে নে তাদেরে তারা যে তোদেরি ভাই।
গুণ্ঠিতা নারী কুণ্ঠা ত্যজিল, মাথা তোলে হরিজন
বহু শতাব্দী পরাধীনতার পরে হ'ল সচেতন।
জননী 'ভারতবর্ষ' আজিকে আসীন সিংহাসনে
'স্বামীজীর জয়' সিংহনিনাদে বল সবাকার সনে।

কাছে তবু দূরে

শ্রীআনন্দ বাগচী

খ্যাতনামা কবি, প্রাবন্ধিক ও সংবাদ-সাহিত্যিক—খাঁকুড়া ক্রীশ্চান কলেজের বাঙলা ভাষার ভূতপূর্ব অধ্যাপক। 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকায় নিবদ্ধ।

এও তো তোমারই মায়া বিশ্বরূপ এভাবে দেখাও,
তোমাকে দেখবো বলে যতবার সামনে তাকাই
সে চাওয়া ফিরিয়ে দাও সুকৌশলে। বারংবার ফিরে আসে চোখ
কেবলই নিজের দিকে, নিকটের গূঢ় সম্মোহনে
বুঝি না আমারই আমি বহুরূপে সম্মুখে দাঁড়িয়ে
প্রিয় হতে প্রিয়তর হয়ে ওঠে, ব্যর্থতায় ঝরে যায় দিন
প্রতিমা পুতুল হয়, মুঠোর ভেতরে নষ্ট, ভাঙে।
তোমারই ছলনা সব, যাব বলে পা বাড়িয়ে দেখি
আজন্ম পুরনো সেই গল্পের ভেতরে এসে গেছি
বিশাল আয়নার মধ্যে ঘর গৃহস্থলি সুদ্ধ যেন
বিঁধে আছি, বিঁধে থাকব আমরণ সুখে শোকে দুঃখে সহবাসে,
চারপাশে গিল্টিকরা কারুকার্যখচা রুদ্ধ ফ্রেম।
এও তো তোমারই মায়া এই আয়না
তুমি আছ কাচের ওপিঠে
পারদপ্রলেপ হয়ে ধরার ছোঁয়ার বাইরে কাছে।

আলোর তরণী

শ্রীপ্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক ও কবি।

নিবিড় আঁধার আবরে ধরণী, বসে আছি একা কূলে,
উছলি উঠিছে কালের তটিনী জলভারে ফুলে ফুলে।
আশা শুধু মনে আলোর তরণী উজান বাহিয়া এলে,
পাইয়া তব মা আশাময় বাণী হৃদয় উঠিবে দুলে।
মোহমায়াভরা আঁধার রজনী কালো আবরণ ফেলে,
করুণাময়ী মা ভবের ঘরনী দিবে নাকো কি তা তুলে?
পিছনে চাহি না কান পেতে শুনি, চাহি সব যেতে ভুলে,
বাঁধন যা কিছু আপনি জননী স্নেহভরে দাও খুলে।
বিপদঝঞ্ঝা কিছুই না মানি আশাদীপ যদি জ্বেলে
দেখি আলোময় সুমুখে সরণী, দয়া তব সব-মূলে।
সকল আঁধার ঘুচায়ে তারিণী টেনে লও নিজ কোলে,
দুলে ওঠে যেন আলোর তরণী খেয়া পারে দিতে তুলে।

পুস্তক সমালোচনা
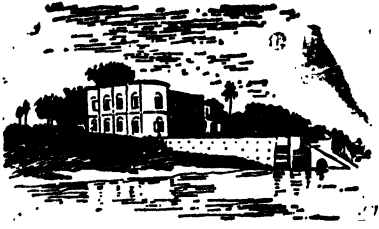
ভারতের সমাজভাবনা (দ্বিতীয় খণ্ড) : **সম্পাদনা—সজল বসু। প্রাচী প্রকাশনী, ৩ ও ৪ হেয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১। পৃঃ ৬+২৫০ ; মূল্য : কুড়ি টাকা।**

প্রকাশকের নিবেদন অনুসারে এই গ্রন্থ (প্রথম সংস্করণের মতোই) 'বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্, সমাজতত্ত্ববিদ্, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সমাজসেবীর রচনা সংকলন।' সম্পাদক সজল বসুর 'সমাজভাবনায় সমাজবিজ্ঞান' নামে একটি প্রবন্ধের আকারে মুখবন্ধ ও আরো বারোটি রচনা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। সম্পাদকের নিবন্ধ আর রামকৃষ্ণ মুখার্জীর 'ভারতীয় সমাজতত্ত্বের বিকাশের ধারা'—দুটিতেই তাত্ত্বিক (লেখকদের ভাষায় 'কেতাবী') সমাজতত্ত্বের পরিচয় দিয়ে তার পরিপ্রেক্ষিতে বা বিষমপ্রেক্ষায় বাস্তবনিষ্ঠ সমাজদৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। প্রবন্ধ দুটিতে বিভিন্ন উপাদান সন্নিবিষ্ট হলেও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তের অভাব অনুভূত হয়। এন. এন. শ্রীনিবাসের 'দেশ, সমাজ ও সমাজবিজ্ঞানী' প্রবন্ধটি সুপাঠ্য ও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি আলোচিত হওয়ায় সুসম্পূর্ণ। সমাজবিজ্ঞানীদের দায়িত্ব সম্পর্কে লেখকের অভিমত মূল্যবান্। 'বিষয়সূচী'তে এই প্রবন্ধটির নাম অনবধানতাবশতঃ বাদ গেছে।

রাজকৃষ্ণের 'দারিদ্র্য মোচনের কর্মসূচী', এম. এল. দাঁতওয়ালার 'গ্রামীণ বেকার সমস্যা'—ভারতের অর্থনৈতিক পটভূমিকায় লেখা দুটি প্রবন্ধই তথ্যনির্ভর ; দুটিতেই বিশ্লেষণভঙ্গিতে স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।—রাজনৈতিক পটভূমিকায় লেখা তিনটি প্রবন্ধ এই সংকলনে স্থান পেয়েছে—বসিরুদ্দিন আমেদের 'রাজনৈতিক বিন্যাসের রূপান্তর', নিখিল চক্রবর্তীর 'কম্যুনিস্ট আন্দোলন', রজনী কোঠারীর 'শাসনতন্ত্রের অবক্ষয় ও যুক্তফ্রন্টের কৌশল'। তিনটি নিবন্ধেই প্রায় সমকাল পর্যন্ত আলোচনার জের টানা হয়েছে। বসিরুদ্দিন আমেদ গত তিরিশ বছরের রাজনৈতিক ভাবনার ধারা আলোচনা করেছেন ; লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা উল্লেখযোগ্য। অপর দুটি প্রবন্ধ, বিষয়বস্তুর যথাযোগ্য উপস্থাপনা বা সম্যক্ পরিচয় দেওয়ার জন্য যেখানে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন ছিল সেক্ষেত্রে অতি সংক্ষেপে বিবৃতির আকারে কিছু তথ্য বা মন্তব্য পরিবেশিত হওয়ায়, অসংহত বলে মনে হয়।

আঁদ্রে বেতের 'আধুনিক ভারতে অনুন্নত সমাজ' বিস্তারিত আলোচনা ; লেখকের বিশ্লেষণভঙ্গি আকর্ষণীয়। অন্নদাশঙ্কর রায় 'লোকসংস্কৃতি ও আধুনিক জীবন' প্রবন্ধে স্বল্প পরিসরে লোকসংস্কৃতির বর্তমান স্বরূপ, সংকট আর ভাবী পরিণাম সম্পর্কে মৌলিক চিন্তা তথা গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। অশোক রুদ্রের 'বাঙালী মধ্যবিত্ত চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও উৎস' প্রবন্ধটি বিস্তারিত এবং সুলিখিত আলোচনা। তা সত্ত্বেও বিনয় ঘোষের অনুরূপ বিষয়ে নিবন্ধাদির কথা স্মরণ করলে মনে হয় যে, আরও কয়েকটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের অবকাশ ছিল। ভি. এম. দাণ্ডেকারের 'মেধার পরবাস' সম্প্রতি বহু আলোচিত একটি বিশিষ্ট সমস্যা নিয়ে লেখা উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। স্বামী সোমেশ্বরানন্দের

'ধর্ম ও সমাজবিবর্তন' তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ; এটিতে লেখকের স্বকীয় চিন্তা, বিশ্লেষণে নিপুণতা ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সংকলনের অন্য প্রবন্ধগুলিতে ধর্ম সম্পর্কে চেতনার নামগন্ধ নেই (অন্নদাশঙ্করের নিবন্ধে ধর্মসংস্কৃতির উল্লেখমাত্র আছে); সেদিক দিয়ে এই প্রবন্ধটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং সংকলনটির একটি বড় অভাব মিটিয়েছে। "ভারতীয় সমাজে সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ হল রাজনীতি-করা"—লেখকের এই ঋজু উক্তি চিন্তার যথাযথ প্রকাশে সুসাহসের পরিচায়ক।

এ-জাতীয় সংকলনগ্রন্থের সব প্রবন্ধের মান সমোৎকর্ষসম্পন্ন হয় না। তা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে বিচার করলে প্রবন্ধগুলি চিন্তাদ্যোতক এবং সংকলনগ্রন্থটি যে মূল্যবান এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই ধরনের গ্রন্থের বহুল প্রকাশ ও প্রচার বাঞ্ছনীয়।

মুদ্রণাদি প্রশংসনীয়।

—ডক্টর তারকনাথ ঘোষ
প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য-সমালোচক

সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ (১ম খণ্ড)—মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ। প্রকাশক: এইচ. চৌধুরী, প্রাচী পাবলিকেশনস্, ৩।৪ হেয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১। পৃঃ ৬+১৭৪; মূল্য: ১২ টাকা।

সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ (৫ম খণ্ড)—মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ। প্রকাশক: এম. চক্রবর্তী, প্রাচী পাবলিকেশনস্, কলিকাতা-৭০০০০১। পৃঃ ৪+১৬১; মূল্য: ১৪ টাকা।

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজের 'সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ' গ্রন্থ পাঁচখণ্ডে সম্পূর্ণ। গ্রন্থটির প্রথম ও পঞ্চম খণ্ড আমাদের আলোচ্য। বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত এই লেখক একাধারে ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ, মনীষী এবং সাধক। অধীত বিদ্যা এবং সাধনালব্ধ জ্ঞানের এক সুষম সমাবেশ দেখা যায় তাঁর অধ্যাত্মবিষয়ক রচনাবলীতে। উক্ত গ্রন্থের আলোচ্য দুটি খণ্ড সম্পর্কে এ-কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে লেখকের হৃদয়ে সাধুসঙ্গের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। ভগবৎতত্ত্ব সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অনুভব লাভ যাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য 'এই প্রকার মহাজনের দর্শনের' সুযোগ পেলে নিজেকে তিনি ধন্য মনে করতেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে কাশীতে যখন তিনি বিদ্যার্থী সেই সময়ে তাঁর সাধুদর্শন শুরু হয়, ওই অভ্যাস অব্যাহত থাকে তাঁর জীবনের অন্তিম পর্ব পর্যন্ত। একটি উদার এবং সশ্রদ্ধ, অকপট মনোভাব নিয়ে তিনি সাধুমহাত্মাদের নিকট উপস্থিত হতেন এবং তাঁদের অনুভবের কথা ও উপদেশ নিয়মিত লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। এই অনুলেখন, তাঁর ভাষায়, 'অস্পষ্ট স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া হয় নাই। যেদিন যে-বিষয়ে আলোচনা হইত সেইদিনই রাত্রিবেলা তাহার সারাংশ সংকলন করিয়া রাখিতাম।' সাধু-মহাত্মাদের মুখনিঃসৃত সেইসব কথাই এই গ্রন্থের খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। লেখক তাঁদের দিব্য অনুভূতি ও আত্মিক উপলব্ধি বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের উপদেশ উপস্থিত করা হয়েছে প্রধানত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে।

প্রথম খণ্ডে মহাত্মা জ্যোতিজী, তৎসঙ্গী মহাত্মা, সোহহং সিদ্ধবাবা, রামঠাকুর এবং অলৌকিক জীবনের অধিকারী কেদার নামে এক অদ্ভুত বালকের কথা আছে। পঞ্চম খণ্ডে আনন্দময়ী মা, শোভা মা ও প্রেমানন্দ তীর্থস্বামী সম্পর্কে রচনা তিনটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

বইটির দুই খণ্ডে উক্ত সাধক-সাধিকাদের অনুভবমূলক উপদেশ ও তত্ত্বব্যাখ্যার পাশাপাশি

তাঁদের অলৌকিক জীবনের কিছু আভাস পাওয়া যায়—যদিও লেখক ওইসব জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এখানে দেননি। আমরা লক্ষ্য করি তাঁদের অনুভূতির বিচিত্রতাও। কোন কোন শক্তিমান পুরুষের—যেমন কেদার নামক অদ্ভুত বালকটির অলৌকিক অভিজ্ঞতার কাহিনী অনুধাবন করা কঠিন। তাঁদের তাত্ত্বিক আলোচনা এবং তার তাৎপর্যও সর্বাংশে সকলের পক্ষে বোধগম্য নয়। তার একটি কারণ, তাঁদের ব্যবহৃত পরিভাষার সঙ্গে সকলে সমভাবে পরিচিত নন। সে যাই হোক, উক্ত মহাত্মাদের কিছু কিছু উপদেশ তুলনামূলকভাবে সহজবোধ্য এবং সাধকমাত্রেরই মননের বস্তু। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি উপদেশের উল্লেখ করা যেতে পারে: 'যখন জগতে প্রত্যেক জিনিসকে নিজের মত ভাবিতে পারা যায় তখন বুঝিতে হইবে ভগবৎ প্রেমের উদয় হইয়াছে।' 'মনই সাধনার প্রধান যন্ত্র।···স্থায়ী ও আন্তরিক ব্যাকুলতার সঙ্গে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের যোগ হইলে মন তাঁহার দিকে আকৃষ্ট না হইয়া পারে না।' 'মহাকৃপা ব্যতীত পূর্ণত্বে প্রবেশের অধিকার কাহারও হইতে পারে না।' [জ্যোতিজী—১।৪৩, ১।৪৬, ১।৪৯] 'আমরা জীবনে প্রত্যেকে তিনটি জিনিসকে আপনার ভাবিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছি। প্রথমটি পূর্বসংস্কার বা মোহ, দ্বিতীয়টি কর্তৃত্ববোধ বা অহংকার এবং তৃতীয়টি ফলাকাঙ্ক্ষা। এই তিনটিকে ত্যাগ করিতে হইবে।···এই সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যে-কার্য কৃত হয় তাহাই ধর্ম।' [তৎসঙ্গী মহাত্মা—১।৯২—৯৩] 'কিছুই চাইতে নাই, গুরুর দান অযাচিত।···গুরু যে-বীজ দেন সেই বীজের সঙ্গে বাস করিতে হয়। উহার সঙ্গে ঘরকন্না করিতে হয়, উহাকে ভালবাসিতে হয়। বীজের সঙ্গে বস্তুতঃ গুরুই জন্মগ্রহণ করেন। তাই ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই।' 'সহ্য করিয়া যাইতে হয়—প্রবৃত্তি, কাম, লোভ প্রভৃতির বেগ সহিয়া থাকিতে হয়। তাহাকে প্রশ্রয়ও দিতে নাই, বাধাও দিতে নাই। একটা স্থির জিনিস ধরিয়া সহ্য করিয়া যাইতে হয়। তাহা হইলে ঐগুলি আপনিই নষ্ট হইয়া যায়, কারণ উহাদের সীমা আছে। সীমা থাকিলেই ক্ষয় হওয়া স্বাভাবিক। ইহাকেই প্রারব্ধের ভোগ বলে।' [রামঠাকুর—১।১৪৮, ১।১৪০] 'যতক্ষণ আমি ও ইষ্ট বলিয়া পৃথক বোধ আছে, ততক্ষণ ইষ্টই বড়। আর যখন পৃথক বোধ থাকিবে না, দুই-ই এক হইয়া যাইবে—তখন একজনই থাকিবে—একমাত্র সে-ই থাকিবে, সে-ই আমি।···যতক্ষণ গুরু-শিষ্য বোধ আছে ততক্ষণ গুরুই বড়। যখন দুই-ই এক হইয়া যাইবে—তখন তো আর কোন বোধ থাকিবে না।' (আনন্দময়ী মা—৫।১২) 'পূজার পর প্রণাম হয় এবং প্রণামের পর হয় প্রসাদ।···পূজা তখনই সমাপ্ত হয় যখন তাহার ফলে মমত্ব এবং অহংতা পূর্ণভাবে চলিয়া যায়।···পূজার পর এবং যাবতীয় সেবার পর প্রণামই অহংভাব নিবৃত্তির চরম স্থিতি।···ইহার পরের অবস্থাই প্রসাদ।···ভক্ত পূজা করিতে গিয়া আত্মসমর্পণের ফলে বুঝিতে পারেন তিনি কিছুই নন। ভগবান প্রসাদ দিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দেন তুমিই সবকিছু, তুমিই তো ভগবান।' [প্রেমানন্দ তীর্থস্বামী—৫।৬৮—৬৯]

এইসব সাধু মহাত্মার সঙ্গ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন: 'ব্যক্তিগত ভাবে আমি···বহুভাবে নিজেকে তাঁহাদের নিকট ঋণী মনে করি।' পাঠকরাও কৃতজ্ঞতা বোধ করবেন তাঁদের প্রতি এবং যিনি তাঁদের কথা প্রকাশ করেছেন, বিশেষ করে, সেই লেখকের প্রতি। এই গ্রন্থ প্রকাশনার দায়িত্ব সুচারুরূপে যাঁরা পালন করেছেন পাঠক সমাজের অকুণ্ঠ সাধুবাদ সেই সংস্থারও প্রাপ্য।

—শ্রীজ্যোতির্ময় বসু রায়
প্রবীণ লেখক ও সাহিত্য-সমালোচক

Sri Ramakrishna : A Mythological View. *By* **'Ananda.**

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও সাধনা নানা দিক দিয়েই বিচার করা যায় এবং সে প্রচেষ্টা আমরা স্বতই দেখতে পাই। লেখক আলোচ্য পুস্তিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রকে সংক্ষেপে বিচার করেছেন পৌরাণিক বৈশিষ্ট্যের পটভূমিকায়। আলোচনার ক্ষেত্রে লেখক কোন অভিনবত্ব দাবী করেননি —তবু রচনাটিতে নতুনত্ব আছে—চিন্তার গভীরতা ও বিশ্লেষণের নিপুণতায় লেখকের শক্তিমত্তা ফুটে উঠেছে। আধুনিক চিন্তাজগতের কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত-মনীষীর বিভিন্ন মন্তব্যের আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণকে নতুনভাবে উপলব্ধি করবার এই প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য। আয়তনে যতই ক্ষুদ্র হোক বিষয়বস্তু বিচারে রচনাটি অবশ্যই মূল্যবান।

বর্তমান গণতন্ত্র স্বরূপতঃ মানুষের লোভ, বাসনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার সমানাধিকার মাত্র। সেই অধিকার প্রয়োগের আস্ফালনে মানুষের আত্মিক অসুস্থতা ক্রমশঃ প্রকট হয়ে উঠছে। তাই রাজনীতিবিদ্‌দের বিচারে, আধুনিক সভ্যতার তুলাদণ্ডে ত্যাগ ও তিতিক্ষার এবং জীবনের মহত্তর উপলব্ধির ওজন সামান্যই। লেখক দাউদ হায়দারের মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছেন, রামকৃষ্ণের জীবন ও সাধনায় যে মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা পলায়নী মনোবৃত্তি সঞ্জাত নয়—রামকৃষ্ণ-জীবনের মূল সমস্যাগুলিকে দেখেছেন সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এবং সেগুলির সমাধানে এক অভিনব সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, যা শুধু বর্তমান পৃথিবীর জন্যই মূল্যবান নয়—চিরন্তন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই সমাধান অনাগত কালের জন্যও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

সি. জি. জাঙ্গ ও সি. কারেনেয়ি বলেছেন, দার্শনিক তাঁর বস্তুজগতের পরিধির মধ্যেই বাস্তবতার সঠিক রূপটিকে নির্ণয় করার চেষ্টা করেন—পুরাণের দৃষ্টি অতীতের চিরন্তন ভিত্তি-ভূমির দিকে, যার উপর গড়ে উঠেছে মানব-সভ্যতার সৌধ। সাহিত্য, শিল্পকলা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহের বিবরণের মধ্য দিয়ে ইতিহাস যেমন বিশেষ কালের সংবাদ কালান্তরে পৌঁছে দেয়—ধর্ম ও পুরাণও তেমনি জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যের সন্ধান কাল থেকে কালান্তরে বহন করে চলেছে। শক্তিমান মানুষ ইতিহাসের সামগ্রী নন—ইতিহাসের স্রষ্টা, অবতার পুরুষও জীবন-সত্যের সন্ধানে পুরাণের নিয়ন্তা। পুরাণে দেবতাদের জন্ম, বাল্য, যৌবনের লীলাবর্ণনার অন্তরালে দেবত্বের প্রকৃতি ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলি লেখক যুক্তির সাহায্যে সুনিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সত্যোপলব্ধি কেবল দু-হাজার বছরের ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বিত রূপমাত্র নয়—বর্তমান ও আগামী কালের আলোকবর্তিকা। সংক্ষিপ্ত হলেও লেখকের যুক্তিধর্মী বিশ্লেষণের গুণে রচনাটি বিশেষ মর্যাদা ও মূল্যের অধিকারী।

—অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
বাঙলা বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ
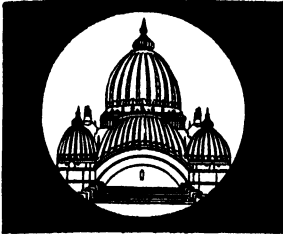
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

নতুন শাখাকেন্দ্র

সম্প্রতি বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ আগরতলার গাঙ্গাইল রোডস্থ রামকৃষ্ণ আশ্রমকে 'রামকৃষ্ণ মিশন, আগরতলা' নামে একটি শাখা-কেন্দ্ররূপে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। স্বামী শান্তিদানন্দকে উক্ত কেন্দ্রের দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছে। অতঃপর মিশনের এই কেন্দ্রটির ঠিকানা হবে: রামকৃষ্ণ মিশন, গাঙ্গাইল রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম), পিন-৭৯৯ ০০১; (টেলিফোন: আগরতলা-৪৩৩৪)।

নতুন শাখাকেন্দ্রের উদ্বোধন

গত ২৩ এপ্রিল ১৯৮৫, বেলুড় মঠের নতুন শাখাকেন্দ্র বারাসত 'রামকৃষ্ণ মঠে'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন-কার্য সম্পন্ন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ। এই উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বহু সন্ন্যাসী ও ভক্ত।

দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন

গত ২২ মার্চ, ১৯৮৫, ২৪ পরগনা, মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য নবনির্মিত গৃহটির দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

শ্রীলঙ্কা শরণার্থী ত্রাণ: মাদ্রাজ ত্যাগ-রাজনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের মাধ্যমে রামেশ্বরের নিকট মন্দাপম্ শিবিরে আগত শ্রীলঙ্কার বিপুলসংখ্যক শরণার্থীদের মধ্যে যথারীতি প্রাথমিক সেবাদির কার্য চলছে।

মেঘালয়ে পুনর্বাসন: পূর্বখাসি পার্বত্য জেলায় শেলা বাজারে অগ্নিতে মর্মান্তিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য 'নিজের বাড়ি নিজে কর'-প্রকল্প এবং আর্থিক সাহায্য প্রদানের কাজ চলছে শিলং রামকৃষ্ণ আশ্রমের মাধ্যমে।

পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন: বর্ধমান জেলায় কাটোয়া সদরের চর্কি গ্রামে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসনকল্পে 'নিজের বাড়ি নিজে কর'-প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৫টি গৃহের নির্মাণকার্য এবং ৮টি গৃহের মেরামতির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই নবনির্মিত কলোনিতে দুটি নলযুক্ত নলকূপও বসানো হয়েছে। এছাড়া বন্যাপীড়িত চর্কি ও বারন্দা গ্রামের ৩৫২টি পরিবারের মধ্যে ৫৫টি লণ্ঠন, ২৬০৮টি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জামা এবং ১০টি লুঙ্গি বিতরণ করা হয়। বিগত ২৬ জুন ১৯৮৪-তে এই পুনর্বাসন কার্য আরম্ভ হয়েছিল এবং শেষ হয়েছে ১২ এপ্রিল ১৯৮৫-তে।

উৎসব

পুরী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২১ ও ২৬—২৮ ফেব্রুআরি এবং ১—৩ মার্চ ১৯৮৫, ৮ দিন ধরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ১৫০তম আবির্ভাব-তিথি উৎসব মহাসমারোহে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। বিভিন্ন দিনের বক্তাগণ ছিলেন জেলাজজ শ্রীঅনন্তপ্রসাদ গুরু। শ্রীজগন্নাথ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের সহাধ্যক্ষ মেজর বি. কে. মহান্তি, স্বামী ভক্ত্যানন্দ, স্বামী দীনেশানন্দ, স্বামী ভাগবতানন্দ প্রমুখ।

উদ্বোধন-সংবাদ

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা; সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী অজজানন্দ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।
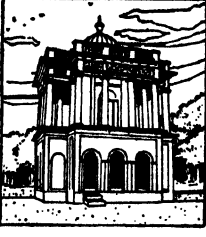
বিবিধ সংবাদ

উৎসব

বেড়ী (২৪ পরগনা) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৩১ মার্চ ১৯৮৫, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভ ১৫০তম আবির্ভাব-উৎসব মঙ্গলারতি শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, বিশেষ পূজা প্রভৃতির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন স্বামী দিব্যানন্দ। এই উপলক্ষে প্রায় ছয় হাজার ভক্ত নরনারী প্রসাদ ধারণ করেন এবং ৬০ খানা কাপড় দরিদ্রনারায়ণের মধ্যে বিতরিত হয়।

স্যাণ্ডেলবিল (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে গত ১৩ ও ১৪ এপ্রিল স্থানীয় সাহেবখালি নিত্যানন্দ উচ্চবিদ্যালয়, গোবিন্দকাটী শিক্ষানিকেতন ও হেমনগর হরিবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বামীজীর ১২৩তম জন্মোৎসব নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়।

নববারাকপুর (২৪ পরগনা) বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদে গত ২৮ ও ২৯ এপ্রিল স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-উৎসব নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিন বিকেলে স্বামী নির্জরানন্দের পৌরোহিত্যে এক ভক্ত-সমাবেশে ভাষণ দান করেন ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা এবং দ্বিতীয় দিনে প্রব্রাজিকা শুদ্ধাপ্রাণার সভাপতিত্বে উক্ত সভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা বিজ্ঞানপ্রাণা।

যুবশিবির

স্যাণ্ডেলবিল (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে গত ২৭ ও ২৮ এপ্রিল হিংগলগঞ্জ থানা এলাকায় কনকনগর সৃষ্টিধর ইনস্টিট্যুশন প্রাঙ্গণে ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী একটি বিশেষ যুবশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরের মুখ্য অনুশীলনের বিষয় ছিল স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত পন্থায় ব্যক্তিচরিত্র গঠন। শিবির পরিচালনা করেন অখিল ভারত যুবমহামণ্ডল। ১৭৫ জনের মতো স্থানীয় ছাত্র, শিক্ষক ও তরুণ এই শিবিরে যোগদান করেন।

—বিশেষ দ্রষ্টব্য—

* অতঃপর বর্তমান পৃষ্ঠাসংখ্যা নিচে।
* পুনর্মুদ্রিত অংশের পৃষ্ঠাসংখ্যা উপরে।

পুনর্মুদ্রণ

২য় বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা ● ভাদ্র ১৩০৭ (পৃষ্ঠা ৪২১—৪৪১)

সূচী :

UDBODHAN PUBLICATIONS (In English)

WORKS OF SWAMI VIVEKANANDA

MY MASTER
Price : Rs. 1,60

THE SCIENCE AND PHILOSOPHY OF RELIGION
Price : Rs. 3,80

RELIGION OF LOVE (12th Ed.)
Price : Rs. 5.00

CHRIST THE MESSANGER (9th Ed.)
Price : Rs. 1.25

A STUDY OF RELIGION
Price : Rs. 4,25

REALISATION AND ITS METHODS
Price : Rs. 3,00

SIX LESSONS ON RAJA YOGA
Price : Rs. 1.80

VEDANTA PHILOSOPHY (9th Ed.)
Page 63, Price : Rs. 3.00

WORKS OF SISTER NIVEDITA

THE MASTER AS I SAW HIM
(13th Ed.)
Price : Rs. 15.00

CIVIC AND NATIONAL IDEALS
(Sixth Edition)
Price : Rs. 7.00

SIVA AND BUDDHA
(Sixth Edition)
Price : Rs. 1.50

HINTS ON NATIONAL EDUCATION IN INDIA (Sixth Edition)
Price : Rs. 6.00

AGGRESSIVE HINDUISM
(Fifth Edition)
Price : Rs. 1.10

NOTES OF SOME WANDERINGS WITH THE SWAMI VIVEKANANDA
(Sixth Edition)
Price : Rs. 7.50

BOOKS ON SRI RAMAKRISHNA

WORDS OF THE MASTER COMPILED
BY SWAMI BRAHMANANDA

Price : Rs. 3,50 (Cloth)
Rs. 2,50 (Ordinary)

RAMAKRISHNA FOR CHILDREN
(Pictorial) (Fourth Edition)

BY SWAMI VISHWASHRAYANANDA

Price : Rs. 6.50

BOOK ON VEDANTA

VEDANTA, ITS THEORY AND PRACTICE
BY SWAMI SARADANANDA

Price : Re. 1.00

UDBODHAN OFFICE, 1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003

তরঙ্গরূপী মানসিক ভাবসমূহের এইরূপ নিয়ত বাহ্যারোপ যুক্তিযুক্ত স্থির হইলে, পরলোক-বিশ্বাসের উৎপত্তি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইন্দ্রাদি বিশেষ শক্তিশালী জীবসমূহের বিদ্যমানতা একবার মনুষ্যমনে স্থান পাইলে, তাহারা অতীতকালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মানবগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল এবং ভবিষ্যৎ মানবের উপরও তদ্রূপ করিবে, ইহা ঘটনাপ্রকারের অনুধ্যানে যুক্তিসহায়ে স্থিরীকৃত হইতে বিলম্ব হয় না। আবার চরিত্রবলে যে সকল মানব সেই সকল দেবতার বিশেষ অনুগৃহীত বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা যে দেহান্তে একেবারে থাকিবেন না, ইহা মানুষ বিশ্বাসে অসমর্থ, কারণ সেই সেই দেবতাবিশেষের শক্তিতে অবিশ্বাসী হইতে হয়। অতএব পরলোকবিশ্বাসও অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। (ক্রমশঃ)

কোন্ পথে যাই ?

ভিক্ষু দেবী দাস লিখিত।] [২২৯ পৃষ্ঠার পর।

দিন কতক এই ভাবে যায়, কুম্ভমেলা শেষ হইল। একদিন কথা প্রসঙ্গে উভয় বন্ধু বলিলেন, চল, উভয়ে একবার পাগ্‌লা বাবাকে দর্শন করিয়া আসি। আমাদের এই নূতন ভাইও তাঁহাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইবেন। আমি জিজ্ঞাসিলাম, তিনি কোথায় থাকেন ? তাঁহারা কহিলেন, হৃষীকেশের পথে যাইতে একটী জঙ্গলে সামান্য এক কুটীরে থাকেন। তাঁহাকে দেখিলেই তাঁহার মাহাত্ম্য অবগত হইবে। আমি উৎসাহিত হইয়া বলিলাম, চলুন, শীঘ্র চলুন। তিনজনে এক শুভক্ষণে যাত্রা করা গেল। পথে হিমালয় শৃঙ্গের পর শৃঙ্গে অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছে দেখিলাম। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিৎ প্রবাহিত, তাহাতে বর্ষাকালে খুব জল থাকে, অন্য সময়ে সামান্য। যাহা হউক, হরিদ্বার হইতে ৫।৬ মাইল অন্তরেই পাগ্‌লা বাবার আশ্রম পাইলাম। আশ্রমটীতে যত্নের কোন চিহ্ন নাই, অথচ তাহা অতি সুন্দর ও যেন এক মহৎ-প্রভাবসম্পন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। গিয়া দেখিলাম, কুটীরাভ্যন্তরে পাগ্‌লা বাবা বসিয়া—বয়স অনুমান ৪০।৪৫ ; পরিধানে একটী ক্ষুদ্র শ্বেত বসন—তাহাও ভাল করিয়া পরা নাই—যেন সে দিকে ভ্রুক্ষেপই নাই। কোনরূপ মালা অথবা অন্য কোনরূপ ভেক্ নাই। বদন মহৎ-প্রভাব ও জ্যোতিঃসম্পন্ন। চক্ষু দুটী যেন বহির্জ্জগৎ দেখিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই—ঈষৎ নিমীলিত, ঢুলু ঢুলু—যেন কোন নেশায় বিভোর, অথচ তথায় কোন নেশার আয়োজন নাই। আমরা যাইতেই, যেন জোর ক'রে একটু বাহিরের দিকে চেয়ে আমাদের ভগবান্ ভগবান্ বলিয়া প্রণাম করিলেন। আমি ত একেবারে মুগ্ধ। তারপর তিনি আবার ধ্যানমগ্ন হইলেন। কিন্তু সেই মুখ কোন বাক্য নিঃসরণ না করিলেও, যেন কোন অমানবী ভাষায় কথা কহিতে লাগিল। ক্ষণিক পরে প্রেমাশ্রু ঝরিল। আমার সমস্ত শরীর লোমাঞ্চ হইল, যেন ঈশ্বর সাক্ষাৎকার অনুভব করিলাম। একি কোন দেবতা, না শাপভ্রষ্ট পুরুষ, না স্বয়ং ভগবান্ ? খানিক পরে, একটু বাহ্যজ্ঞান হইলে আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, এসেছিস ?—আয়,—বলিয়া বুকে টানিয়া লইলেন। তখন আমি তাঁহার শক্তিতেই হউক, অথবা আনন্দেই হউক, মূর্চ্ছিত হইলাম। সেরূপ মূর্চ্ছা নহে, বিলক্ষণ জ্ঞান রহিয়াছে, অথচ এত আনন্দ

ফাল্গুন, ১৩১১ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সঃ

(জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২, পৃঃ ২১৭)

যে জীবনে আর কখন অনুভব করি নাই। বোধ হইল, যেন সমুদয় জগৎ একটী বীণাযন্ত্র, আর ঐ যন্ত্র যেন সচেতন, আর উহার ভিতর হইতে যেন এক মহা সুন্দর নিনাদ উত্থিত হইতেছে—শুনিলাম স্পষ্টতঃ ওঙ্কারধ্বনি। তাহার পর এক মহান্ স্নিগ্ধ জ্যোতিঃসমুদ্রে যেন ভাসিতে লাগিলাম। অবশেষে একরূপ আতঙ্ক আসিল—চেতনা পাইলাম। দেখি—তখনও মহাপুরুষের কোলে—তখন ভয় ভক্তি শ্রদ্ধা আসিল। গুরুদেব গুরুদেব বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলাম।

মহাপুরুষ মধ্যে মধ্যে দু একটী কথা কহিতেন। সেই এক একটী কথা ৫০ হাজার বেদের চেয়ে বেশী দামী। তিনি একদিন বলিলেন, 'শুদ্ধ জ্ঞান শুদ্ধ ভক্তি এক।' ভাল কথা, একটী কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি ;—আমার মূর্চ্ছাভঙ্গের পর তিনি আমাদের তিনজনকে নানাবিধ খাদ্য খাইতে দিলেন। আমরা তাঁহাকে প্রসাদ করিয়া দিতে অনুরোধ করিলে, তিনি সামান্য একটু আধটু খাইলেন। প্রত্যহ তাঁহার কাছে অনেক লোক আসিত—খাবার রাশীকৃত করিত। আমরাই খাইতাম—তিনি খাইতেন নাম মাত্র। রাত্রে তাঁহার নিদ্রা বড় দেখি নাই, জোর যদি ঘুমাইতেন দুই এক ঘণ্টা। তারপর অধিকাংশ সময়ে সমাধিতে থাকিতেন। এ জোর করিয়া বসিয়া সমাধি নয়—একটু ভগবানের নাম কেহ করিলে বা নিজে ভগবানের নাম করিতে করিতে একেবারে বাহ্যচৈতন্য হারাইতেন। আর যখন একটু চেতন থাকিতেন, মধুর গান গাইতেন বা স্তব পাঠ করিতেন, অথবা দুই চারিটী কথা কহিতেন। এই দুই চারিটী কথায় সব মীমাংসা হইয়া যাইত। কথাগুলি বড় নূতন নহে, বোধ হয় অনেকেই জানেন, এবং অনেক শাস্ত্রেই আছে। কিন্তু তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইবার সময়, উহাদের ভিতরে কি একটী শক্তি মাখান থাকিত। তিনি বলিতেন,—মত পথ। যেমন ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া একই জায়গায় যাওয়া যায়, তদ্রূপ বিভিন্ন মতে সাধনা করিলেও লক্ষ্য একই। যতক্ষণ ময়দা ঘিয়ে ভাজা হইতেছে, ততক্ষণ শব্দ হয়। যখন ঠিক ভাজা হইয়া যায়, তখন আর শব্দ থাকে না, তদ্রূপ ঠিক ঠিক অনুভূতি না হইলে লোকে তর্ক বিতর্ক করে, অনুভব হ'লে কি জ্ঞানী, কি ভক্ত সবাই চুপ করে যায় ; আর ঝগড়া থাকে না। তিনি বলিতেন, বরফ না খেয়েই অনেকে বরফের কথা শুনে বরফের গুণাগুণ নিয়ে ঝগড়া করে, তাই গোলমাল হয়। খেয়ে যারা বলে, তাদের আর মতবিরোধ হয় না। তারা এক রকম কথাই বলে। অথবা সমুদ্রের কাছে যে দাঁড়াইয়া থাকে, সেই সমুদ্রের নানা ভাব প্রত্যক্ষ করিতে পারে, সমুদ্রে কত কি আছে, বুঝিতে পারে। আর একবার সমুদ্র দেখিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিলে, সমুদ্র সম্বন্ধে আর কি সিদ্ধান্ত হইবে ? অথবা বহুরূপী সম্বন্ধে যেমন দুইজনের লাল কি সবুজ বলিয়া ঝগড়া হইয়াছিল। তারপর তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি বহুরূপী সম্বন্ধে বিশেষ বুঝাইয়া দেন। অথবা অন্ধের হাতী দেখা যেমন।

এইরূপ ও এতদ্বিধ অনেক উদাহরণের দ্বারা তিনি আমার প্রাণে প্রাণে এই ভাব সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন যে, দ্বৈতবাদ ঠিক, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ঠিক, অদ্বৈতবাদও ঠিক। মনের প্রকৃতি অধিকার ইত্যাদির তারতম্যে লোকের বিভিন্ন ভাব হয়।

ভাই সকল, তোমাদের পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, তোমরা বিবাদ দ্বেষবুদ্ধি ছাড়িয়া, জ্ঞান বড় কি ভক্তি বড় এ বিবাদ ছাড়িয়া, যে যে পথে আছ, সে সেই পথের কিছু করিবার চেষ্টা কর। করিলে সেয়ান হইবে, আর জানিবে, 'সব সেয়ানাকি এক বাত।' জ্ঞান ভক্তির তখন মর্ম্ম বুঝিবে। জয় গুরু মহারাজকি জয়। ইতি।

(সমাপ্ত)

(৮৭তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃঃ ২৯৮)

স্ত্রী-শিক্ষা।

১০ই জুন রবিবার তালতলা মহাকালী পাঠশালার পারিতোষিক
বিতরণ উপলক্ষে পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ
মহাশয় কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধ।

[প্রাপ্ত]

তালতলা মহাকালী পাঠশালা শাখা বালিকাবিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী ও পারিতোষিক বিতরণোপলক্ষে সম্মিলিত ছাত্রীগণের বিনয়নম্র ব্যবহারের সহিত বিশুদ্ধ সংস্কৃত স্তব পাঠ শ্রবণ করিয়া অদ্য যে বিমল আনন্দের অনুভব হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত।

প্রাচীন হিন্দু সমাজে স্ত্রী-শিক্ষা যে বিশেষ আদৃত ছিল এবং বহুলভাবে তাহার প্রচারও ছিল, তাহা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-পাঠকগণের নিকট অবিদিত নহে। আমাদের উপনিষদ্, ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণের অনেক স্থলেই স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বহুতর উপদেশ ও অনেক সদুদাহরণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, পুরাকালে আমাদের অন্তঃপুর, বর্ত্তমান কালের ন্যায় অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃত কলহ অভিমান ও অশান্তির নিকেতন ছিল না। উচ্চশিক্ষিত পুরুষগণের মধ্যে যাহা দুর্লভ, সেই সকল স্বর্গীয় সুবিমল সদ্গুণরত্নরাজিতে বিমণ্ডিত মহিলাকুলের পবিত্র সন্নিধানে আমাদের অন্তঃপুর সকল প্রকার গার্হস্থ্য সুখের একমাত্র নিবাসনিকেতন ছিল। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি সতীকুলশিরোমণি দিব্য রমণীকুল, যে জাতির অন্তঃপুরে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় বিরাজমানা থাকিতেন, তাহাদের ন্যায় নির্ম্মল গার্হস্থ্য সুখ, এই পৃথিবীতে অন্য কোন জাতি কোন সময় অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছে, এ বিশ্বাস আমাদের হৃদয়ে এখনও উদিত হইতে পারে নাই।

আমাদের বালিকাগণের, ধর্ম্ম ও সমাজানুমোদিত শিক্ষালাভের জন্য আমাদের দেশে যে মহাকার্যের আরম্ভ হইয়াছে এবং ধীরে ধীরে দৃঢ়তার সহিত দেশহিতৈষিগণের পবিত্র চেষ্টা যে-ভাবে সফলতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, কে বলিতে পারে যে এই বালিকাবিদ্যালয় সকলের অভীপ্সিত ফলের সহিত, এই বিশৃঙ্খল বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের চিরাভিলষিত গার্হস্থ্যসুখ অদূরভবিষ্যতে এক সূত্রে গ্রথিত নাই?

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে আমাদের বালিকাগণের প্রয়োজনীয় শিক্ষার জন্য স্থাপিত বালিকাবিদ্যালয় সকলের প্রভূত বিস্তার যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এক্ষণে অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিও স্বীকার করিয়া থাকেন। স্বীকার করিবার কারণও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কেন, তাহা বলি :—

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তুনপূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥"

আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসংহিতাকার ভগবান্ মনুর এই বচনটীর প্রতি অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, অতি প্রাচীনকালে যখন হিন্দুসমাজ, শিক্ষা, সভ্যতা ও অভ্যুদয়ের সমুন্নত শিখরে আরোহণ করিয়া পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতির শিক্ষাগুরুর

পবিত্র আসনে উপবেশন করিয়াছিল, সেই সময় সেই পবিত্রশিক্ষালোকসমুদ্ভাসিত হিন্দুসমাজে গার্হস্থ্যধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ নারীজাতির প্রতি বিশেষ সম্মান পূর্ব্বক সদ্ব্যবহার করা হিন্দুসমাজের একটী অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল।

বাহিরের দুরন্ত জীবনসংগ্রামের অতিকঠোর পরিশ্রমে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া অন্তরাত্মা যখন শান্তির পিপাসায় শুষ্কপ্রাণ হইয়া উঠে, ব্যবহার জগতে অপরিহরণীয় দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষা, মদ, মান, মাৎসর্য্য, লোভ ও শঠতার সুতীক্ষ্ণ বৃশ্চিকদংশনের বিষময় জ্বালা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, সংসারী জীব, যখন আশা, উৎকণ্ঠা ও প্রতিক্ষায় চারিদিকে চাহিতে থাকে, সেই সময় পবিত্র অন্তঃপুরের শান্তিময় কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া আমরা যদি দয়াময়ী জননীর বাৎসল্যময় অমৃতসাগরে অবগাহন করিতে না পাই, সহোদরার অকপট স্নেহময় নির্ম্মল নির্ঝরের শীতল জলে বাহ্য ব্যবহার জগতের তীব্র সন্তাপকে প্রশমিত করিতে সমর্থ না হই, পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীর ভক্তিময় অপার্থিব প্রীতির অমৃতময়ী জীবনী শক্তির উত্তেজনায় আবার নূতন বল ও নবীন উৎসাহ লাভ করিতে অসমর্থ হই, তাহা হইলে সেই শোক-তাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্যময় বাহ্য ব্যবহারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া আমরা আবার কি প্রকারে সেই দুরন্ত জীবনসংগ্রামে নিজ নিজ স্বার্থ সাধন করিতে সমর্থ হইব?

মানব চিরদিন দেবতারই পূজা করিয়া থাকে। পবিত্রস্নেহ অকপট প্রীতি ও অপার্থিব বাৎসল্যরূপ দেবসুলভ গুণরত্নরাজির যাহারা এক মাত্র অধিকারী, সেই নারীরূপধারী দেবতাগণ, যে গৃহে পূজিত না হন, তাহা যে প্রকৃত পক্ষে দানবের গৃহ, অশান্তি, কলহ, কাপট্য, কার্পণ্য ও পাপ সে গৃহকে কখন পরিত্যাগ করে না এবং সেই গৃহে যে, সকল ক্রিয়াই পণ্ড হইয়া থাকে, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

প্রাচীনরীতির অনুসারে দেবভাবসম্পাদিকা আবশ্যকীয় স্ত্রী-শিক্ষার ঐকান্তিক অভাবই যে, আমাদের সমাজের বর্ত্তমান গার্হস্থ্যধর্ম্মের বিশৃঙ্খলতার একটী প্রধান কারণ, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়া থাকি। প্রায়ই অধিকাংশ স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের গৃহে এক্ষণে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দয়াময়ীমূর্ত্তি জননীর পরিবর্ত্তে নিষ্ঠুরহৃদয়া, উগ্রচণ্ডামূর্ত্তির অধিষ্ঠান; পতিপ্রাণা সততসংসারকর্ম্মপরা বিনয়নম্রমূর্ত্তি সহধর্ম্মিণীর পবিত্র আসনে এক্ষণে অনেক ভাগ্যবানের ভবনে অভিমানিনী বিলাসিনী মুখরা ভার্য্যার একাধিপত্য প্রতিক্ষণ বিকট কল কল ধ্বনিতে ঘোষিত হইতেছে! যে হিন্দুর গৃহ লজ্জা, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি ও আস্তিকতার বিশ্রামনিকেতন ছিল, আজ অধিকাংশ সেই হিন্দুর গৃহ নির্লজ্জতা, নাস্তিকতা, কপটস্নেহ ও কৃত্রিমব্যবহারের কলুষময় আবর্ত্তে পতিত হইয়া, বিষাদ ও পশ্চাত্তাপের ঐকান্তিক আশ্রয়নিবাস হইয়া উঠিতেছে! পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার তীব্র অনুচিকীর্ষার সাগরে নিমগ্ন হইয়া আমরা কেবল যে, বাহিরের জগতে সভ্যজাতির নিকট ঘৃণা ও উপহাসের পাত্র হইতে চলিয়াছি তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অনন্ত তপস্যার প্রভাবে সঞ্চিত আমাদের গার্হস্থ্যজীবনের সুখ ও শান্তিরও সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছি, আমাদের হতভাগ্যের দোষে ইহা দেখিয়াও আমরা অদ্য দেখিতে চাহিতেছি না!—আমাদের চরিত্র কি বিষম! আমরা আমাদের কন্যা ভগিনী প্রসূতিকে অদ্য বিলাতী অনুকরণের বালিকাবিদ্যালয়ে পাঠাইয়া বা গৃহে ইউরোপীয় মহিলাকে শিক্ষাদায়িনীর উচ্চপদে স্থাপিত করিয়া শিক্ষার স্থলে যে তীব্র বিষপান করাইতেছি, তাহার পরিণামের ভয়ঙ্কর

সর্ব্বনাশের অনেক ভীষণ দৃষ্টান্ত নিত্য আমাদের নেত্রে পতিত হইলেও, আমরা এখনও বিহিতরূপে এই পাপের প্রতিবিধান করিতে ও অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইতেছি না। উদরান্নের সংস্থান করিবার জন্য যাহাদিগকে মাথার ঘাম পায় ফেলিতে হয়, আবশ্যক দাসদাসীর সাহায্যে স্ত্রী কন্যা বা ভগিনীর সাংসারিক দুরন্ত শ্রমের লাঘব করিবার উপযোগী অর্থ সংগ্রহ করা যাহাদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনের আছে কিনা সন্দেহ, তাহাদের গৃহের বালিকাগুলিকে কেবলমাত্র পিয়ানো বাজান, উল বুনান প্রভৃতি কার্য্যের শিক্ষা দিয়া এবং কতকগুলি পাশ্চাত্য মহিলার অনুপযোগী আদর্শ হৃদয়ে অঙ্কিত করিবার জন্য নভেল নাটক বা ইতিহাস পড়াইয়া বিবাহের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত আবদ্ধ রাখার ন্যায় মূঢ়তার কার্য্য আর কি হইতে পারে? বিবাহের অল্পদিন পরেই সকল প্রকার গৃহকর্ম্মে যাহাকে শ্বশ্রূর সাহায্যকারিণী হইতে হইবে, জীবিকার্জ্জনের জন্য দিবসব্যাপী পরিশ্রমে ক্লান্ত পতির ক্লেশাপনয়ন ও চিত্তবিনোদনের জন্য সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে, অপরিচিত শ্বশুরগৃহে প্রবেশের পর হইতেই দেবর, ননদ, দেবরজায়া প্রভৃতির সামাজিক রীতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার চিত্তবৃত্তির অনুসরণ দ্বারা সাংসারিক ভবিষ্যৎ শান্তির পথকে প্রশস্ততর করিতে হইবে, সেই হিন্দু বালিকার পক্ষে পাশ্চাত্যরীতির অনুকরণে স্থাপিত বালিকাবিদ্যালয়ের অনুপযোগী শিক্ষা যে, কি ভীষণ বিষময় ফল প্রসব করিতে পারে, তাহা বর্ত্তমান সময়ে অনেক হিন্দুপরিবার যে, অশ্রুসিক্তনেত্রে বিষাদময় দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বিলক্ষণরূপ অনুভব করিতেছেন, তাহা কে প্রত্যাখ্যান করিবে? বিলাসশিক্ষার সুখময় নিকেতনস্বরূপ ঐ সকল পাশ্চাত্য প্রণালীর বালিকাবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভপূর্ব্বক, যে সকল বালিকা আজ দরিদ্র হিন্দুর অন্তঃপুরে গৃহলক্ষ্মীর পদে আরূঢ় হইতেছেন, তাঁহাদের আদর সম্মান বা পূজা, আমাদের সমাজে যে যথেষ্ট পরিমাণে না হইতেছে তাহা নহে, কিন্তু, তাঁহাদের প্রতি সম্মান ও পূজার ফল স্বরূপ, যে যে দেবতাপ্রসাদের বিষয় মনুবচনে উক্ত হইয়াছে, আমাদের অনেকের ভাগ্যে যে তাহা একেবারেই ঘটিতেছে না, বরং বিপরীতই হইয়া দাঁড়াইতেছে, সে বিষয়ে বোধ করি কাহারও অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

কেন যে এমন হইতেছে, বোধ হয় এতদিনে তাহা আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। আবশ্যকশিক্ষার অভাবে এবং কুশিক্ষার বিপ্লবকর পরিণামে, আমাদের মহিলাগণ আর্য্যমহিলোচিত দেবভাব ভুলিয়া যাইতেছেন; নিষ্কাম কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিবর্ত্তে তীব্র বিলাসবাসনা, এক্ষণে পাশ্চাত্যরীতিতে শিক্ষিত মহিলানিচয়ের সংসারের সকল কার্য্যের একমাত্র পরিচালনা করিতেছে। নারীদেবতার পূজা না করিয়া, আমরা এক্ষণে বিলাসিনীর পূজা করিতেছি—এরূপ অবস্থায় আমাদের গৃহে দেবতাপ্রীতির সম্ভাবনা কোথায়? বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রীজাতির পক্ষে গার্হস্থ্য-জীবনের উপযোগী শিক্ষালাভ করা যে একান্ত আবশ্যক, আমাদের শাস্ত্রকারগণ তাহা বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥"

অতি যত্নের সহিত কন্যার শিক্ষাদান করিতে হইবে বলিয়া, কি প্রকার শিক্ষা প্রধানতঃ দিতে হইবে তদ্বিষয়েও মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে সুন্দর উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়—

(জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২, পৃঃ ৩০১)

"অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদাং অজ্ঞাতপতিসেবনাং।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্॥"

এই বচনটীতে স্পষ্টই নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে যে, কি প্রকার শিক্ষাদান হিন্দুবালিকাগণের একান্ত প্রয়োজনীয়। যে শিক্ষাময় অমৃতের আস্বাদে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্ত্রীলোক দেবতার প্রকৃতি লাভ করে ও সেই দেবতার প্রতি সম্মান ও সদ্ব্যবহার করিলে, গৃহে নিরন্তর দেবতার প্রসাদময়ী শুভদৃষ্টি পতিত হইয়া থাকে,—সেই শিক্ষার প্রসঙ্গে রামায়ণেও লিখিত আছে—

"নাতোবিশিষ্টং পশ্যামি বান্ধবং বৈকুলস্ত্রিয়াঃ।
পতির্বন্ধুর্গতির্ভর্ত্তা দৈবতং গুরুরেব চ॥"

শাতাতপ বলিয়াছেন—"পতিরোকাগুরুঃ স্ত্রীণাম্"। পতিগৃহে প্রবেশের পর হিন্দু-মহিলার কিভাবে দিন যাপন করা প্রাচীনকালের উন্নত হিন্দুসমাজের মধ্যে ঐকান্তিক স্পৃহার বিষয় ছিল, মহাকবি কালিদাস তাঁহার জগদ্বিখ্যাত শকুন্তলা নাটকে তদ্বিষয়ে যে সুন্দর উপদেশ দিয়াছেন, আমাদের বালিকাবিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের কর্তব্য এই যে, তাঁহারা যেন সেই উপদেশানুসারে বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত করিতে সর্ব্বদা প্রযত্নপর হন। নিজের অতিস্নেহের পালিত-কন্যা শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠাইবার পূর্ব্বে, মহর্ষি কণ্বের উপদেশ-বাক্যটী শকুন্তলাতে এইভাবে সন্নিবেশিত আছে—

"শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাঽপি রোষণতয়া মা স্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতায়া বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥"

পতিগৃহে প্রবেশের পর শ্বশ্রূ শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের শুশ্রূষা, ননদ, দেবর-পত্নী প্রভৃতির সহিত ঔদার্য্যপূর্ণ সখ্য, পরিজনবর্গের প্রতি দয়া ও স্নেহ, শ্বশুরকুলের চিরন্তন রীতি অনুসারে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, দৃঢ়তর দেবতা-বিশ্বাস, নিজের সুখভোগের প্রতি সর্ব্বদা ঔদাসীন্য, অব্যাকুলশান্তভাবে সন্তানসন্ততির লালনপালন, সর্ব্বদা গৃহ কর্ম্মে তৎপরতা, এবং সর্ব্বপ্রকারে অকপট হৃদয়ে ঐকান্তিক অনুরাগের সহিত পতির সেবা, এই সকল সদ্গুণরাশির সময়োপযোগী সঞ্চার, যে শিক্ষার প্রভাবে আমাদের বালিকাগণের হৃদয়ে হইতে পারে, কালে সেই শিক্ষা প্রদানকার্য্যে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়া এই মহাকালী পাঠশালা যাহাতে ভারতের আদর্শ হিন্দুবালিকা-শিক্ষামন্দির বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, এই আশায় সস্পৃহহৃদয়ে উৎকণ্ঠার নেত্রে অনেক বঙ্গীয় হিন্দুসন্তান এক্ষণে চাহিয়া আছেন। এক কথায় বলিতে গেলে, হিন্দুর জাতীয় উন্নতির মুখ্যতম উপায়—সর্ব্বাগ্রে হিন্দুরমণীগণের চরিত্রোৎকর্ষ দ্বারা, হিন্দুসমাজের আন্তরিক বলের উৎকর্ষ সাধন। এই মহা-কার্য্যের সাধনার জন্য মহাকালী পাঠশালা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ। এই মহাকার্য্যসাধন এক বা দশ জন ব্যক্তির অধ্যবসায় বা পরিশ্রমে কিম্বা অর্থব্যয়ে হইবার সম্ভাবনা নাই। সমগ্র বঙ্গদেশের ধর্ম্মানুরাগী ও দেশহিতৈষী হিন্দুসন্তান মাত্রেরই অবস্থানুসারে এই গুরুতর ও অবশ্যকর্ত্তব্য মহা-কার্য্যের পবিত্র সাধনায় যোগ দিতে হইবে। কি উপায়ে, কিভাবে কার্য্য করিলে, এই মহাকার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, সে বিষয়ে কিছু বলা এক্ষেত্রে সম্ভবপর নহে। মহাকালী পাঠশালার উপযুক্ত

নেতৃগণের উপর দেশের বিশ্বাস এখনও স্থির আছে। অবস্থানুসারে সুদূর ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া কার্য্য করিবার শক্তিও তাঁহাদের বিলক্ষণ আছে। প্রগাঢ় ধৈর্য্য, অকৃত্রিম দেশহিতৈষণা ও হিন্দুসমাজের প্রকৃত অবস্থাজ্ঞান ও পরিণাম চিন্তা,—এই সকল মহাকার্য্য সাধনোপযোগী গুণের আশ্রয় বলিয়া যাঁহারা আমাদের দেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাদেরই হস্তে যখন মহাকালী পাঠশালার পরিচালনা ও শুভচিন্তার গুরুভাব ন্যস্ত আছে, তখন মহাকালী পাঠশালার কর্ত্তব্য বিষয়ে বিশেষ বলিবার আবশ্যকতা আপাততঃ দেখিতে পাওয়া যায় না।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি-শালিনী শ্রীমতী মাতাজী, উদারহৃদয় ধার্ম্মিকশিরোমণি মহাপ্রভাব অগাধসত্ত্ব মহারাজ দ্বারভাঙ্গা, মাননীয় স্বদেশহিতৈষী কার্য্যবীর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, ব্যবহারনিপুণ উদারহৃদয় পরমশ্রদ্ধাস্পদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত নীলমণি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশের বহুতর গণ্যমান্য ও শক্তিশালী ব্যক্তিগণের সাহায্য ও পরামর্শে ও বিলক্ষণ কার্য্যকুশলতায় যে, মহাকালী পাঠশালা পরিচালিত হইয়া ধীরে ধীরে দৃঢ়তার সহিত অভ্যুদয়ের দিকেই অগ্রসর হইবে এবং হিন্দুসমাজের বিশেষ উপকারসাধনে সমর্থ হইবে, বঙ্গের অনেক হিন্দুসন্তান এই প্রকার আশাকে হৃদয়ে যত্নের সহিত পোষণ করিয়া আসিতেছেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, অদ্য তালতলা লাইব্রেরী ও তালতলা মহাকালী পাঠশালার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আহুত এই কলিকাতার গণ্য মান্য শিক্ষিত সভ্য মহাশয়গণ এই প্রকারে অনুগ্রহপূর্ব্বক নিবিষ্টচিত্তে এই সভার কার্য্যবিবরণ শ্রবণ ও দর্শন করিয়া, এই লাইব্রেরী ও মহকালী পাঠশালার হিতৈষীগণের হৃদয়ে উৎসাহের অমৃতধারা নিষেক করিয়াছেন; সেই জন্য তাঁহাদের পক্ষ হইতে আমি উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীকে তাঁহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আসামের কথা।

[বাবু প্রবোধচন্দ্র দে লিখিত। পৃষ্ঠা ৪৩১ থেকে ৪৩৯ পর্যন্ত।—বর্তমান সম্পাদক।]

দুর্ভিক্ষ-ফণ্ডে প্রাপ্তি স্বীকার।

রামকৃষ্ণ-মিশন ভুক্ত দুর্ভিক্ষ-মোচনাশ্রমে "কলিকাতা শ্যামবাজার ডিবেটিং সোসাইটী" গত ১৭ই জুন তারিখে ১৫৲ টাকা, এবং গত ৮ই জুলাই তারিখে ৩৩৲ টাকা দান করিয়া আমাদিগকে বাধিত করিয়াছেন।

শ্মশান কালী।

(বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিত।)

একি! পথে, সম্মুখে, পশ্চাতে, অন্ধকার গভীর গহন।
অমানিশা, ঘোর বিভীষিকা, দিগ্ দেশ আঁধারে মগন॥ ১॥
থেকে থেকে বিদ্যুৎ ঝলকে, বজ্রনাদে দিগন্ত কম্পিত।
দিগ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে জীব-পান্থ, অসহায়, ভয়ে সন্ত্রাসিত॥ ২॥

(জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২, পৃঃ ৩০৩)

ঝটিকায় ঘোর হুহুঙ্কার, মিশি তাহে কর্ণে দেয় তালি।
লোল জিহি, হাসে হিহি হিহি, নাচে তাহে মৃত্যুরূপা কালী ॥ ৩ ॥
বিগলিত শব অগণিত, চারিদিকে বিকট দর্শন।
রক্তমাংসঅস্থিমেদপঙ্কে দুর্নিরীক্ষ্য শ্মশান ভীষণ ॥ ৪ ॥
ভীমজ্বাল, প্রলয়করাল, অগ্নিশিখা ব্যাপিছে আকাশ।
চিতাধূম আবরিছে ব্যোম—দেবতা-দানব মহাত্রাস ॥ ৫ ॥
কত কাচে থেই থেই নাচে, ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনী।
মাঝে তার, ঘোর দুর্নিবার, নাচে হরহৃদিবিলাসিনী ॥ ৬ ॥
বিকরাল দৈত্যমুণ্ডমাল কণ্ঠভূষা—মুখে লোহ ঝরে।
দিগম্বরী করকাঞ্চী পরি, ভাসে খর রুধির সাগরে ॥ ৭ ॥
চন্দ্র সূর্য্য অনল নয়নে, শ্বাসে বহে প্রলয় পবন।
কেন্দ্রচ্যুত হুঙ্কারে চূর্ণিত, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ অগণন ॥ ৮ ॥
বিক্ষোভিত ভূলোক দ্যুলোক, তলাতল মুহুঃ কম্পমান্।
ভীম রোল, বারিধি কল্লোল, তুঙ্গগিরি চূর্ণ খান খান ॥ ৯ ॥
মূর্ত্তিমান্ জরা, মৃত্যু, ব্যাধি, শোক, তাপ, নিরাশ, হুতাশ।
চারিধারে ভ্রূকুটি বিস্তারে, বিশ্বত্রাসী অট্ট অট্ট হাস ॥ ১০ ॥
বিকরাল ভীমকরবাল, চণ্ডমুণ্ড—মুণ্ড বাম করে।
বরাভয়, ভকতে নির্ভয়, সৌম্য রৌদ্র শোভা একাধারে ॥ ১১ ॥
বীর বিনে, এ তিন ভুবনে, কে সাহসে সে মূর্ত্তি-দর্শন।
কে কখন মৃত্যু-আলিঙ্গন চাহে, দেহ করিয়ে ধারণ ? ॥ ১২ ॥
মৃত্যুভয় করেছে যে জয়, শ্যামা তার নাচে হৃদি মাঝে।
সেই বীর, হৃদয়ে তাহার সুখ শান্তি সতত বিরাজে ॥ ১৩ ॥

ভগবদ্গীতা-শঙ্করভাষ্যানুবাদ।

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত)

[গীতার ৩য় অধ্যায়ের ৪১ সংখ্যক ভাষ্যের শেষাংশের অনুবাদ এবং ৪২—৪৩ সংখ্যক শ্লোকের মূল, অন্বয়, মূলের অনুবাদ, ভাষ্য ও ভাষ্যের অনুবাদ এবং ৪র্থ অধ্যায়ের ১—৭ সংখ্যক শ্লোকের মূল, অন্বয়, মূলের অনুবাদ, ভাষ্য ও ভাষ্যের অনুবাদ এবং ৮ সংখ্যক শ্লোকের মূল, অন্বয়, মূলের অনুবাদ ও ভাষ্যের প্রথমাংশ—বর্তমান সম্পাদক।]

৮৭তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা আষাঢ়, ১৩৯২

দিব্য বাণী

··শাস্ত্রে যে-সব জ্ঞান মতবাদরূপে রয়েছে, তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) তার । ঋষি ও অবতারেরা যা বাস্তবিক শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, তিনি নিজের জীবন দ্বারা তা দেখিয়ে গেছেন। শাস্ত্রগুলি মতবাদ মাত্র—তিনি ছিলেন তার প্রত্যক্ষ অনুভূতি। এই ব্যক্তি তাঁর একান্ন বর্ষব্যাপী একটা জীবনে পাঁচ হাজার বছরের জাতীয় আধ্যাত্মিক জীবন যাপন ক'রে গেছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষাপ্রদ আদর্শরূপে আপনাকে গড়ে তুলেছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন মত এক একটা অবস্থা বা ক্রম মাত্র, পরধর্ম বা পরমতের প্রতি শুধু দ্বেষভাবশূন্য হলেই চলবে না, আমাদিগকে ঐ ধর্ম বা মতকে আলিঙ্গনও করতে হবে; সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি—তাঁর এই মতবাদ দ্বারা বেদের ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রসমূহের সমন্বয় হ'তে পারে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৪]
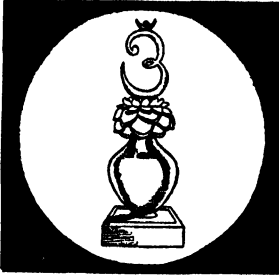
কথাপ্রসঙ্গে

প্রসঙ্গ ও প্রাসঙ্গিকতা

'নির্ভয় গতসংশয় দৃঢ়নিশ্চয়মানসবান্।'

ইহাই হইতেছে স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যান-দৃষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ-মূর্তির সঠিক বর্ণনা। স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ-বন্দনায় কোথাও রূপের আভাস নাই, নামের প্রকাশ নাই,—যাহা আছে তাহা সর্বাংশেই ভাবের দ্যোতনা। শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি ভাবঘন মূর্তিকেই তিনি বিশ্বমানবের পূজা-বেদীতে স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন।

অনুপম সেই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহ! সংসার-দগ্ধ ভীত মানব তাহার সংশয়-শঙ্কিত অস্থির দৃষ্টিকে ক্ষণেকের জন্যও যদি ঐ বিগ্রহখানির প্রতি ফিরাইতে পারে, তবে সে সুনিশ্চয় দেখিবে সেখানে নাই কোনপ্রকার ভয়ের লেশ, সংশয়ের মলিনতা,—কিন্তু ভাস্বর হইয়া রহিয়াছে অভয় ও আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি। আবার সে-প্রতিশ্রুতিও নির্বিচারে, না-চাহিতে, জাতি-কুল-মান নির্বিশেষে অনুগত সকলের জন্যই ব্যক্ত।

'নিষ্কারণ-ভকত-শরণ ত্যজি জাতি-কুল-মান।'

ভয়ান্বিত মানুষের সম্মুখে এমনই এক অভয়-আশ্রয়ের যত প্রয়োজন, অন্য কিছুরই তত নহে। ভয় হইতেই যাবতীয় সংশয়—আবার সংশয় সৃষ্টি করে দ্বন্দ্ব, যাহার অবধারিত ফল অশান্তি। এই-ভাবেই সমাজে সাধারণ মানুষ অশান্তির দহনে জ্বলিয়া জ্বলিয়া অঙ্গার-সদৃশ হইয়া পড়িতেছে।

বিদ্বান পরাক্রান্ত রাজা ভর্তৃহরি জাগতিক সুখ-সম্পদ্ ও ভোগ-বিলাসে আকণ্ঠ ডুবিয়া থাকিয়াও শান্তিলাভে বঞ্চিত ছিলেন। দেহের ছায়ার ন্যায় জীবনের সমস্ত কিছুর সহিত তিনি অন্বিত দেখিয়াছিলেন ভয়কে। সুযোগ্য ভ্রাতা বিক্রমাদিত্যকে উজ্জয়িনীর রাজ-সিংহাসনে বসাইয়া অভয়ের সন্ধানে তাঁহাকে প্রাসাদের বাহিরে দূরে চলিয়া যাইতে হইয়াছিল। সুপ্রিয়া সুন্দরী ভার্যা, অঢেল বৈভব, প্রবল শৌর্য, অপ্রতিদ্বন্দ্বী যশঃখ্যাতি, অগণিত অনুগত জনের সেবা-সহায়তা, নীরোগ অটুট দেহ-সৌষ্ঠব, অগাধ পাণ্ডিত্য—এমন কি বিপুল দান-ধ্যান-পুণ্যকর্ম ইত্যাদি মানবজীবনের পরম বাঞ্ছিত 'সুখ', বহু আকাঙ্ক্ষিত 'প্রেয়' বিধাতা তাঁহাকে অকৃপণ হস্তে মঞ্জুর করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি হৃদয়ের দুর্দম ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন: 'ন সংসারোৎ-পন্নং চরিতমনুপশ্যামি কুশলং, বিপাকঃ পুণ্যানাং জনয়তি ভয়ং মে বিমৃশতঃ।' বিচার-তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সংসারকে দেখিয়া তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া-ছিলেন—সংসারোৎপন্ন কিছুতেই আমি কোন-প্রকার কুশল দেখিতে পাই নাই—এখানকার পুণ্যকর্মগুলিও আখেরে চিত্তে ভয়-সঞ্চারই করিয়া থাকে।

বাস্তবিকই মানুষের সমগ্র জীবনটিই যেন ভয়ের সমষ্টি। ভয় হইতে ত্রাণ পাইতেই তাহার সকল সাধনা—শিক্ষাদীক্ষা, সমাজ-সভ্যতা, দর্শন-বিজ্ঞান, সাহিত্য-কাব্য ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়াস।

ভয়ের দ্বারা তাড়িত হইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলারই আর এক নাম জীবন। জীবনের সকল স্তরে প্রতিটি উদ্যোগের পশ্চাতেই নানা আকারে ও পরিচয়ে সেই দুরত্যয় ভয়। ইহাই তো আশ্চর্য মায়া—দুরতিক্রমণীয় মায়া। এই ভয় লইয়াই জীবনের প্রগতি—ভয়কে পাশ কাটাইয়া চলিবার কৌশল-উদ্ভাবনই সংস্কৃতি। ভোগের পশ্চাতে রোগ, কুল-মর্যাদার পিছনে সমাজ-চ্যুতির আশঙ্কা, অর্থাগমের সঙ্গে রাজ-দৃষ্টি—আয় থাকিলেই আয়করের ভাবনা। যেখানে মান সেখানে অপমান-আশঙ্কা, ক্ষমতাপন্নের শত্রু-চিন্তা, রূপের আড়ালে জরাক্লেশ, পাণ্ডিত্য-খ্যাতি হইলেই প্রতিপক্ষের বিরোধিতা, গুণ থাকিলেই খলের অপবাদ-রটনা—দেহের সঙ্গে মৃত্যুর অবিচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠতা। ভয়েরই তো নামান্তর এইগুলি। অতএব মানুষ অভয় হইবে কবে? তাহার অভীষ্ট অভী তবে কি আকাশ ধরিবারই অন্য নাম? সৃষ্টির প্রথম দিন হইতেই মানুষ এই সুবিশাল সংসার-প্রান্তরে অবোধ বালকের উৎসাহ লইয়া নেহাতই খেলিয়া মরিতেছে। আকাশকে ধরিবার জন্য বিরামহীন উন্মত্ত খেলা! ভয় তাহাকে ছাড়িতেছে না—সংশয়-দোলা তাহাকে অনুদিন পীড়া দিতেছে, অনিশ্চয়তার ঘোর তাহাকে অস্থির রাখিয়াছে!

ভীত সংশয়ান্বিত অস্থির মানব না-জানিয়া না-বুঝিয়া কেবলই ঘুরিয়া মরিতেছে—ভয়কে ভুলিয়া থাকিতে, সংশয়-রাক্ষসের শিকার না হইতে। কিন্তু হায় অজ্ঞ মানুষ! সে কত অসহায়, কত দুর্বল তাহাও নিজে জানে না!! কেবল আজিকার দিনে নহে, চিরদিনই সে যূপবদ্ধ পশুর ন্যায় কখন সরবে, কখন নীরবে আর্তনাদ করিয়া চলিয়াছে। মানুষের এই নিষ্ফল কাতরতা—তাহার অজস্র দুর্বলতা ও বিমূঢ়তা—অভাব ও ব্যাধি, তৃষ্ণা ও কামনা, অভিমান ও দম্ভ, রিপুপারবশ্য ও ভোগেচ্ছা এবং জরা ও মৃত্যুর নিয়ত-নির্যাতনের কোন প্রত্যক্ষ প্রতিকার কি তবে সত্যই অসম্ভব? এককথায়, মানুষের এই সংসার-ভয় কি প্রকৃত-পক্ষে অনিবার্য? ভয়-তাড়িত মানুষ জন্ম জন্ম ধরিয়াই নূতন নূতন মরীচিকার উদ্দেশ্যে ছুটিতেছে। মরীচিকা তাহাকে কেবল দিকভ্রান্তই করিয়া থাকে, পিপাসার বারি একবিন্দুও মেলে না ঐ ব্যর্থ ছুটাছুটিতে। নীতিবাদী, হিতাকাঙ্ক্ষী, সমাজপতি উপদেষ্টাগণ বলিতেছেন—'থামিও না, চোখ বুজিয়া পথ চলো। ভয়ের দিকে চোখ মেলিয়া দেখিও না,—না দেখিলেই তুমি আর ভয় পাইবে না। অন্ধকার? থাকুক অন্ধকার। কবিতায় পড় নাই? অন্ধকারের পরেই আলোকের ঝরনা নামিয়া আসে—ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। হতাশ হইবে কেন? সুধা না জুটিলেই-বা আফসোসের কি আছে? বিকল্প সুরা তো রহিয়াছে। অগত্যা নেশার আশ্রয় লইও,—তরল মধুর—কামের কি কাঞ্চনের—কিংবা চিন্তার কি বক্তৃতার—অথবা রাজনীতির কি সমাজ-উদ্ধারের! "Be drunk always drunk and with anything,—money, wine, woman, poetry"—ইহাই জীবনের সারকথা, বাঁচিয়া থাকিবার শ্রেষ্ঠ উপায়।'

অজ্ঞান-অন্ধকারেই বহুবিচিত্র সংশয় ও ভয়ের জন্ম। মানুষ যেহেতু অজ্ঞান, তাই ভয় ও শঙ্কা বুঝি তাহার কপালের লিখন—কোন মতেই খণ্ডাইবার নহে! অবধারিত কপাল-দোষ তাহাকে তবে নানাবিধ দুষ্কর্মেও প্ররোচনা দিয়া চলিবে,—পাপের বিচিত্র পিচ্ছিল আবর্তেও ঠেলিতেই থাকিবে। যুগে যুগে পৃথিবীর সাহিত্যে, কাব্যে, দর্শনে সাধারণ মানুষের প্রতি যে-সকল সহানুভূতি এযাবৎ ব্যক্ত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে তো মাত্র এই সুরেরই ব্যঞ্জনা

দেখা যায়—বিচিত্র ভাষায় ও ভাবে। আধুনিক লোকদরদী সমাজবিদ্গণও মানুষের দুঃখে ব্যথিত—ভীত পাপক্লিষ্ট মানুষের প্রতি ইঁহাদেরও গভীর প্রেম এই একই প্রেরণায়। লোক-প্রচলিত মানবপ্রেমের নিহিত তাৎপর্য মনে হয় এই পর্যন্তই। একজন বিশিষ্ট ইংরেজ সাহিত্য-সমালোচকের ভাষায়, এই জাতীয় মানবপ্রেমকে বলা হইয়া থাকে—'loyalty to humanity', অর্থাৎ মনুষ্যত্বের প্রতি বিশ্বস্ততা—মানুষের প্রতি মানুষের নৈতিক শ্রদ্ধা। এই নীতিগত শ্রদ্ধা বা বিশ্বস্ততা দ্বারা বাস্তবকে আন্তরিক স্বীকৃতি দেওয়া হয় ঠিকই, কিন্তু ঐ নিষ্ঠুর বাস্তবের কবল হইতে মানুষকে ত্রাণ করা সম্ভবপর হয় না।

একনিষ্ঠ মানবতাবাদ হয়তো আরও কিছু অধিক শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া থাকে—মানুষের দুর্বলতা-দুষ্কৃতি এবং সংশয়-বিক্ষোভকে দূর করার উপায় নির্দেশ অপেক্ষা, ঐ-সকলের প্রতি সকরুণ হার্দিক সমর্থনও জ্ঞাপন করে। সুতরাং মানুষ যে-তিমিরে, সেই তিমিরেই বসবাস করিতেছে যুগ যুগ ধরিয়া! মানবপ্রেমী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের অনুকম্পায় ও সহৃদয়তায় তিমিরকে সহনীয় করিয়া তুলিতেছে, দূষিত পরিবেশকেই গৃহ-পরিবেশ বলিয়া বোধ হইতেছে—তাপিতজনকে আপন করিয়া লওয়া যাইতেছে,—কল্যাণ-সীমা এই অবধিই। অজ্ঞান এবং অজ্ঞান-সৃষ্ট যাবতীয় দুঃখ-শোক-ভয় তাই মানুষের গা-সহা হইয়া যাইতেছে,—যেমন পথহারা পথিককে প্রচণ্ড ভীতি ও বিপদাশঙ্কা বুকে লইয়াই গভীর অরণ্য-মধ্যে রাত্রিযাপন করিতে হয়—অপরিচ্ছন্ন অন্ধকার বৃক্ষতলে পরম নিশ্চিন্তে নিদ্রামগ্ন থাকিতেও দেখা যায় তাহাকে। অথবা, কয়েদির কাছে যেমন দীর্ঘ কারাবাসও নিরুদ্বেগ গৃহাবাস-তুল্য হইয়া দাঁড়ায়!

*

আধুনিককালের প্রচণ্ড মানবতা-ব্যঞ্জক সাহিত্য হইতেও কিছু দৃষ্টান্ত এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে। বিশ্ববিশ্রুত রুশ সাহিত্যিক ফেডর ডস্টয়এফ্‌স্কি (Fedor Dostoieffsky), যাঁহার অনন্যসাধারণ মনুষ্যপ্রীতি অধুনা মানবতাবাদে তথা চিন্তাজগতে বিপুল আলোড়ন জাগাইয়াছে—তাঁহারই কথা ধরা যাউক। তিনি মানুষকে,—অশেষ দোষযুক্ত লম্পট মানুষকেও অন্তরের সমস্ত উপচার ঢালিয়া দিয়া পূজা করিয়াছেন;—নিকৃষ্ট পাপীকেও এমন পাদ্যার্ঘ্য দিয়া অর্চনা আর কোন সাহিত্য-সাধক কোন যুগে করেন নাই। তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন নাই—কিন্তু তিনিও আন্তরিক বিশ্বাস করিয়াছেন মানুষের লালসা-লোভ, কাম-ক্রোধ যতই থাকুক, সে বড় দুঃখী ও ভীত। বাস্তবতাবাদী এই মনীষী মনেপ্রাণে মানুষকে উহার সর্ববিধ পাপাচার ও দুষ্প্রবৃত্তি সহ বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। আবার সেই সঙ্গে মানুষের কুকর্ম ও ব্যাভিচারের জ্বালাকেই তিনি বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন—মানুষের পাপ অপেক্ষা পাপের যাতনাই তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়াছিল বেশি। তিনি জানিয়াছিলেন—উদগ্র কামনার মৃৎপাত্র হাতে লইয়া যথেচ্ছ পানরত থাকিয়াও কোন ভোগী সুখী নহে, কোন পাপাচারী তৃপ্ত নহে;—পাপ-ভোগীর দুঃখ ভাষায় অপ্রকাশ্য—সে নিজেও বুঝিতে অক্ষম। যত বড় ভোগী, তত বেশি তাহার ভীতি। যত কুখ্যাত পাপী, প্রাণের জ্বালাও তাহার তত অধিক!

ডস্টয়এফ্‌স্কি বিশ্বাস করিতেন, মানুষের যদি শক্তি থাকিত তবে নিশ্চয়ই সে নিজেকে পাপ হইতে সরাইয়া আনিতে সক্ষম হইত। সেই শক্তি প্রভাবেই সে সকল ভয় ও শঙ্কাকে অতিক্রমণ করিতে পারিত। মানবদরদী মনস্বী লেখক, মানুষের ব্যথার মর্মস্থল পর্যন্ত গিয়াছেন,

—কিন্তু হায় ইহার অতিরিক্ত কিছুর সঙ্কেত করিতে বা সন্ধান দিতে পারেন নাই। পারিবার কথাও নহে—যেহেতু তিনিও তো রক্তে-মাংসে গড়া মানুষই বটে! স্বয়ং শক্তিহীন বলিয়াই তাঁহার কারুণ্যে ও সহানুভূতিতে মানুষের দুঃখ ঘুচাইবার সঠিক পথ-নির্দেশ নাই—ভয় হইতে উত্তরণের উপায়ও স্পষ্ট হয় নাই। মানব-কারুণ্যের সহিত যদি সেই অপার্থিব শক্তি সংযুক্ত থাকিত—তবে ঐ কারুণ্যই হইয়া উঠিত উদ্ধার মন্ত্র, প্রেম ব্যক্ত হইতে পরিত্রাণের নির্দেশিকারূপে।

কেবলমাত্র ভাষণে ও লেখনীতে উৎসারিত মানবপ্রেমের নির্ঝর হইতে সান্ত্বনার স্নিগ্ধ পানীয় সংগৃহীত হইতে পারে, কিন্তু উহা পারে না ভয়ার্ত জনের জীবন হইতে সর্বপ্রকার ভয় দূর করিতে—সংশয়পীড়িতকে গতসংশয় করিতে। তাই কেবল মানবতাবাদের নীতি নহে, মানবপ্রেমের তত্ত্ব নহে—মানুষের একান্ত প্রয়োজন এমন একটি শক্তির যাহা ঐ নীতি, বাদ ও তত্ত্বকে জীবনে প্রত্যক্ষ করাইবে। তাপিত ও ভীত জনের প্রতি মানবিক প্রেম ও সহানুভূতি বোধ যাঁহার আছে—তিনি অবশ্যই ধন্য—তিনি যথার্থই মহনীয়—তিনি মনীষী। কিন্তু ঐ মহৎ গুণ ও মনীষা অপরকে অভয় করে না, শান্তিও দেয় না—যদিও অনুপ্রেরণা দিতে পারে প্রচুর। ইহাই গভীর মননের বিষয়।

কারুণ্যের বা প্রেমের সেই শক্তি মানব-সংসারে কোথায়? অথবা, শক্তির সেই দাক্ষিণ্য কাহার কাছে কীভাবে মিলিবে?

সেই শক্তির সংবাদ সবিস্তার পাওয়া যায় উপনিষদে। মাত্র শক্তিকে নহে, সমূহ শক্তির উৎসের সন্ধানকেই বুঝিয়া লওয়া চলে শুভ্রশির ঋষিদের নিকট হইতে। এই শক্তি সম্পর্কেই স্বামীজী একদা তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী যোগানন্দকে স্বানুভূতির ভাষায় বুঝাইতেছিলেন :

'দেখলুম কি জানিস্?—সমস্ত পৃথিবীতে এক মহাশক্তিই খেলা করছে। আমাদের বাপ-দাদারা সেইটিকে religion-এর দিকে manifest করেছিলেন, আর আধুনিক পাশ্চাত্য-দেশীয়েরা সেইটিকেই মহারজোগুণের ক্রিয়ারূপে manifest করছে। বাস্তবিক সমগ্র জগতে সেই এক মহাশক্তিরই বিভিন্ন খেলা হচ্ছে মাত্র।'

উল্লিখিত মহাশক্তি সমস্ত সৃষ্টিতে ব্যাপ্ত,—সারা জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড জীব-প্রকৃতি ঐ মহাশক্তিতেই অনুস্যূত, সতত সম্বদ্ধ। সর্বপ্রকাশক পরম জ্যোতিঃ সেই অসীম অনন্তেরই প্রসন্নরূপ—তিনিই সর্বজীবের আত্মা—তিনি অমৃত ও অভয়। তাঁহাকেই বলা হয় বৃহত্তম বস্তু—ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মেরই অপর নাম সত্য। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে আচার্য সনৎকুমারও এই কথাই শুনাইয়াছিলেন সংসার-শোকতপ্ত নারদকে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের সেই মন্ত্রটি এইরূপ : 'অথ য এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি হ উবাচ এতদ্ অমৃতম্ অভয়ম্ এতদ্ ব্রহ্মেতি তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি ॥'

সংক্ষেপে শ্রুতি-সিদ্ধান্তটি হইতেছে : মানুষের চিরঈপ্সিত সেই শক্তিই আত্মা বা সত্য—তাহাকে লাভ করিলেই মানুষ দুর্জয় জরা-মরণ-দুঃখ-শোককে অতিক্রম করিতে পারে—কেননা সেই সত্যই অমৃত ও অভয়।

মানুষের বাসনা-কামনাগুলির স্বাভাবিক গতি *ঐ সত্যের দিকেই*। প্রকৃতিগতভাবে মানুষ সত্যসন্ধ। প্রশ্ন উঠিতে পারে—তবে অসত্য কেন এবং কোথা হইতেই বা আসে? উত্তরে বলা চলে—আলোক ও অন্ধকার যেমন পরস্পরের

অস্তিত্ব ও প্রয়োজন প্রতিপন্ন করিয়া থাকে, সংসারে অসত্য—কামনা-বাসনাদিজাত সুখ-দুঃখ পুণ্য-পাপাদিও তেমনই পরস্পরের বোধক ও সহায়ক। সৃষ্টিলীলার জন্য আলোক ও অন্ধকার, সুখ ও দুঃখ, পুণ্য ও পাপ এবং সম্পদ্ ও বিপদের সমান আবশ্যকতা রহিয়াছে। রাত্রির ধারণা না হইলে দিবসের মহিমা উপলব্ধি সম্ভব কি? মেঘের খেলা না দেখিলে অনন্ত নির্মল আকাশের ভাস্বরতা বোধ হয় না। কাম-ক্রোধ-লোভাদি না থাকিলে সৃষ্টির নাটক জমিত না,—দুঃখ-বিপদ-পাপ-তাপ না থাকিলে সুখ-সম্পদ্-পুণ্য-আনন্দের কোন অর্থবোধই হইত না। সৃষ্টিতে আলোকের সঙ্গেই অন্ধকার, পুণ্যের পার্শ্বেই পাপ, কায়ার সন্নিধিতে ছায়া, জন্মের আড়ালেই মরণ—যেন পরস্পর-অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী। অনেকের ধারণা, অসত্য-অন্যায়-পাপাদি—বোধ হয় এই আধুনিক বস্তুবাদী যুগের শিক্ষাদীক্ষার ফলশ্রুতি—নব্য সমাজনীতির অভিশাপ। ঠিক তাহা নহে। সত্যের সঙ্গেই অসত্যের সহাবস্থান চলিয়া আসিতেছে,—সেই সৃষ্টির আদিকাল হইতেই জীবনের সহিত মৃত্যুর সম্বন্ধ যেমন। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। আবার আশ্চর্য ভগবদ্-বিধানও এইরূপ যে, মানুষ ইচ্ছা করিলে নিজ বিবেক সহায়ে, এই সত্যাসত্য বা পুণ্যপাপকে বিচার করিতে সক্ষম হইয়া থাকে—তখন আপাতসুখকর প্রেয়কে পরিহার করিয়া কঠিন কিন্তু পরমানন্দকর শ্রেয়ঃ-সাধনে সে আত্মনিয়োগ করে।

অবশ্য সংসার-যাত্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনই ঘটিয়া থাকে যে, বিবেক-প্রদীপকে জ্বালাইয়া রাখা সম্ভবপর হইয়া উঠে না—কিংবা অনেক চেষ্টায় জ্বালাইতে পারিলেও প্রতিকূল ঝঞ্ঝাবাতে উহা বারে বারেই নিভিয়া যায়। ফলে আন্তরিক প্রযত্নপরায়ণ যাত্রীকেও ক্ষণে ক্ষণে আছাড় খাইতে হয়,—উঠিয়া চলিতে চলিতে পুনরায় পড়িয়া যাইতে হয়। এমনভাবে আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইতে হইতে, সত্যনিষ্ঠ সাধক-সাধিকা কোন সময়ে ঊর্ধ্বপানে চাহিয়া ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠেন:

'হে ঈশ্বর, অসত্যের অন্ধকার "অপাবৃণু"—ঝড় শান্ত কর, আমার দৃষ্টিকে স্বচ্ছ হইতে দাও। সত্যান্বেষী আমি,—সত্যকেই দেখিতে চাই। তোমার প্রসন্নবদনের অম্লান জ্যোতিঃ আমাকে শ্রেয়ের লক্ষ্যে চলিতে সহায়তা করুক। "যৎ তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্"।'

এমন আকুল প্রার্থনা যখন সমাজে বহুজনের হৃৎস্পন্দনে অনুরণন তুলিয়া সমুত্থিত হয়—তখন বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর, তত্ত্বতঃ যিনি সমষ্টি আত্মা, তাঁহার পক্ষে নিরুত্তর থাকা সম্ভবপর হয় না। সম্মিলিত মানবাত্মার হৃদয়-তারে যখন ঝঙ্কার উঠিয়া থাকে: 'আবিরাবির্ম এধি'—হে স্বপ্রকাশ তুমি আমাদের নয়নগোচর হও—দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হও';—স্তিমিত-গম্ভীর সেই শান্ত শক্তিপুঞ্জে তখনই নৈসর্গিক নিয়মে আলোড়ন জাগে—তিনি সত্য সত্যই 'দেহবান ইব' প্রকট হইয়া থাকেন—আবির্ভূত হন। উদ্ভাসিত সেই মহাশক্তিবিগ্রহের নামই অভয়, অমৃত, সত্য—তিনিই আবার রাম-কৃষ্ণ-বুদ্ধ-খ্রীষ্ট-চৈতন্য-রামকৃষ্ণাদি নানা নামে ও রূপে মানবসমাজে যুগযুগ ধরিয়া বন্দিত হইয়া থাকেন। শক্তি-সমুদ্র-সমুত্থিত সেই তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি আমাদিগকে ঐ পূর্বোক্ত মন্ত্রে জানাইয়াছেন—'এতদ্ অমৃতম্ অভয়ম্' ইত্যাদি।

আমরা বলিতেছিলাম শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। তাঁহারই 'দক্ষিণং মুখম্'-কে স্মরণ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ গাহিয়াছিলেন:

'শক্তিসমুদ্রসমুত্থতরঙ্গং, দর্শিতপ্রেমবিজৃম্ভিতরঙ্গং,
সংশয়রাক্ষসনাশমহাস্ত্রং, যামি গুরুং শরণং
ভববৈদ্যম্... ॥'

শ্রীরামকৃষ্ণে প্রকট সর্বাবগাহী জীবপ্রেম অখণ্ড মহাশক্তিরই তরঙ্গায়িত রূপ,—তাই সেই প্রেম নিছক কারুণ্যমাত্রই নহে, উহা সংশয়-রাক্ষসের নিঃশেষে বিনাশ-সাধন করিয়া মানুষকে নিয়তই অভয় প্রদান করে। কলিহত জীবের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ হইতেছেন বিগ্রহবান্ অভয়,—সন্দেহাতীত আত্মপ্রত্যয়ের প্রোজ্জ্বল প্রতিমা। এই কারণেই তাঁহার শরণ লওয়ার প্রয়োজন পৃথিবীতে কোনদিনই ফুরাইবে না। তিনি সর্বযুগের সর্বজীবের 'ভববৈদ্য'—তিনি চিরপ্রাসঙ্গিক। নির্গুণ ব্রহ্ম যখন জীবের প্রয়োজনে 'দেহবান ইব' —অবিকল দেহধারীর ন্যায় মনুষ্যলোকে প্রকট হন তখনও তাঁহার স্ব-ভাব ও স্ব-মহিমাকে কিছু ছাড়িয়া আসেন না। এই কারণেই তাঁহার 'অভয়' স্বভাবটিকেও মানুষ প্রত্যক্ষ উপলব্ধির সুযোগ পাইয়া আসিতেছে—সেই সৃষ্টির সূচনাকাল হইতেই,—এবং চিরদিন পাইতেও থাকিবে যদি সে আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা করে।

সংসার চলিতেছে উহার নিজ ভাবে ও ছন্দে। জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-শোক-অবসাদ-বিপর্যয় এখানকার চিরাচরিত নিয়ম। আবার অভয়-অমৃতের সাক্ষাৎকারও এই সংসারেই ঘটিয়া থাকে, ইহাও শাশ্বত বিধান। 'যাথাতথ্যতো অর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ'

নির্বিশেষ ব্রহ্মকে যখন আমরা সবিশেষ—সগুণভাবে দেখিবার সুযোগ পাই, 'অভয়', 'অমৃত' ও 'সত্য' যখন বাস্তবিকই শরীরী হইয়া মানুষের মাঝে প্রকট হন—তখন তাঁহার যে-মানবপ্রেম উহাতে স্বভাবতই নিজ শক্তিও সম্পুটিত থাকে,—উহা নিছক নীতি বা উপদেশ হিসাবেই ব্যক্ত হইয়া কর্তব্য সম্পাদন করে না, অথবা সাহিত্য মাত্রেই উহার পর্যবসান নহে। শক্তি-সমন্বিত সেই প্রেম ও করুণার স্ফুরণ কেবলমাত্র তাঁহার বাক্যে নহে, তাঁহার সর্বসত্তায় বিচ্ছুরিত থাকে। স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের অন্যতম স্বামী শুদ্ধানন্দের স্মৃতিচারণার কিছু অংশ এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন :

'হে পাঠকবর্গ, সেই মহাপুরুষের (স্বামী বিবেকানন্দের) যে ছবি এখনও চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি. আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসে তাহা তোমাদেরও মনশ্চক্ষে উদ্ভাসিত হউক। তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া আজ আমার মনশ্চক্ষের সমক্ষে সেই মহাপণ্ডিত, মহা তেজস্বী, মহাপ্রেমিকের ছবি জাগিতেছে। তোমরাও একবার আমার সহিত দেশকালের ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়া আমাদের স্বামীজীকে দেখিবার চেষ্টা কর···। স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, "যখন অপরকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে দেখতে হবে—তখন মহাপাপীকেও ঘৃণা করলে চলবে না।" "মহাপাপীকে ঘৃণা কোর না"—এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর মুখের যে ভাবান্তর হইল, সেই ছবি আমার হৃদয়ে এখনও মুদ্রিত হইয়া আছে—যেন তাঁহার মুখ হইতে প্রেম শতধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মুখখানা যেন ভালবাসায় ডগমগ করিতেছে,—তাহাতে কঠোরতার লেশমাত্র নাই।'

শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বিতীয় মূর্তি স্বামী বিবেকানন্দের একখানি নিখুঁত অনবদ্য চিত্র—ভাবদ্যোতক ধ্যানালেখ্য। ইহাই সত্যকার মানবপ্রেমের ঘনীভূত বিগ্রহ, যাহা কোন দেশকালের প্রাচীরে আবদ্ধ নহে। শ্রীরামকৃষ্ণের 'জীবদুঃখাসহিষ্ণু' মূর্তিও সংসার-তাপক্লিষ্ট মানবের কাছে পরম ভরসা ও আশ্রয়,—মাত্র কোন এক বিশেষ শতাব্দীর জন্য নহে, চিরকালের মানবগোষ্ঠীর জন্য। লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দের লেখনী হইতে জানিতে পারা যায়—ঠাকুর ভাবরাজ্যের সর্বত্র সমান অনুকম্পা লইয়া বিচরণ করিয়াছেন —বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকলের মনোভাব—ছোট

বড় সবরকম ভাব বুঝিতে পারিয়া বিষয়ী, সাধু, জ্ঞানী, ভক্ত, স্ত্রী, পুরুষ সকলের হৃদ্গত ভাব ধরিয়া লইয়া—প্রত্যেকের অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিয়াছেন।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে: '…ঠাকুর যেন মানবমনে যতপ্রকার ভাব উঠিয়াছে, **উঠিতে পারে বা উঠিবে,** সে সকল ভাবই নিজ জীবনে অনুভব করিয়া বসিয়া আছেন…! আর তজ্জন্যই **ইতর-সাধারণ মানব** যে যখন আসিয়া যে ভাবের কথা বলিতেছে,…তখনি তাহা ধরিতেছেন, বুঝিতেছেন ও তদুপযোগী বিধান করিতেছেন। …**মায়া-মোহ, সংসার-তাড়না,** ত্যাগ-বৈরাগ্যের অনুষ্ঠান প্রভৃতি সকল বিষয়েই কেহ কোন অবস্থায় পড়িয়া উহা হইতে **উদ্ধার হইবার পথ খুঁজিয়া না পাইয়া** কাতর জিজ্ঞাসু হইয়া আসিলে, ঠাকুর **পথের সন্ধান** ত দিয়া দিতেনই, আবার অনেক সময়েই সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঐ অবস্থায় পড়িয়া যেরূপ অনুভূতি হইয়াছিল তাহাও বলিতেন।…এইরূপ করায় জিজ্ঞাসুর মনে কত **ভরসার** উদয় হইত এবং ঠাকুর তাহার জন্য যে পথ নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন, কতদূর বিশ্বাস ও উৎসাহে সে সেই পথে অগ্রসর হইত।…জিজ্ঞাসুর মনে হইত, ঠাকুর তাহাকে কত **ভালবাসেন**!'

উৎকলিত লীলাভাষ্যকারের কথাগুলিতে ইহা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার যে, মানবমনের অতীত, বর্তমান ও অনাগত কালের সর্ববিধ ভাব-তরঙ্গের সামঞ্জস্য বিধায়ক এবং সর্বপ্রকার ভয়-ভাবনা হইতে ত্রাণকারী চির সুহৃদ্ হইতেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁহার প্রয়োজন সর্বকালেই,—সংসারে মানুষ যতদিন থাকিবে, তাহার অজ্ঞান-জনিত সংশয়-শঙ্কা-ভয়াদিও সঙ্গে থাকিতে বাধ্য। আলো-জল-বাতাস বাঁচিবার জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন। ভূ-পৃষ্ঠে এমন কোন অবস্থা আসিবে নাকি, যখন প্রাণধারণের জন্য উহাদের অপরি-হার্যতা আর থাকিবে না? আলো-বাতাস-জলের কোনরূপ প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্নও তাই অবান্তর নহে কি? ঐ-রূপ চিন্তা নেহাতই অলস মনের বিচার-বিলাস,—অপ্রাসঙ্গিক তো মূলেই। পৃথিবীর মনুষ্যকুলের পক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শ চিরন্তন চৈতন্যালোক, প্রাণসঞ্চারী পবন এবং জীবনদায়ী পানীয়। যতকাল সংসারে ভয়ের রাজত্ব চলিবে—ততদিন অভয়ের প্রসঙ্গও নিরন্তর অনিবার রাখিতেই হইবে—মানুষের বাঁচিবার জন্যই অব্যাহত থাকিবে। ইহা লইয়া কোনপ্রকার প্রাসঙ্গিকতা-বিচারের অবকাশই নাই।

ইদানীং কোন কোন পণ্ডিতসমাজে বা সভা-সমাবেশে বর্তমান কালে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাসঙ্গিকতা লইয়া বেশ গুরুগম্ভীর আলোচনা এবং নানাবিধ সুবিজ্ঞ প্রশ্নের অবতারণা শুনা যাইতেছে। পাণ্ডিত্যের অথৈ সমুদ্রকে উল্লঙ্ঘন দূরের কথা, স্পর্শের স্পর্ধাও আমরা রাখি না! তাই উক্ত প্রাসঙ্গিকতার দুরূহ প্রশ্নের গহনে প্রবেশ না করিয়া, মাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গই কিছু করা হইল এখানে—যাহা আমাদের বিবেচনায় নিত্য আলোক, অনন্তকালের বাতাস ও শাশ্বত জলের মতোই অপ্রত্যাখ্যেয়—সনাতন-প্রসঙ্গ। আমাদের চিন্তনীয় বিষয় প্রাসঙ্গিকতা নহে—প্রসঙ্গ।

বিদায়

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

'উদ্বোধন' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক, বর্তমানে আমেরিকার সাক্রামেন্টো বেদান্তকেন্দ্রের অধ্যক্ষ।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত পূর্বে অপ্রকাশিত 'বিদায় বাঁশী' নামক ক্ষুদ্র নাটিকার প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য। এই নাটিকার উপাদান মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত থেকে গৃহীত।

স্থান—হস্তিনাপুর প্রাসাদ

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন

শ্রীকৃষ্ণ : মনে পড়ে ?

অর্জুন : কি সখা ?

শ্রীকৃষ্ণ : জীবনের দূর সেই মঙ্গল প্রভাত ?
ধরণীর কোলে—
উষার অরুণ দীপ্তি সবে উদ্ভাসিত
মন্দ মন্দ শীতল পবনে—
বিকশিত কুসুমের মধুস্নিগ্ধ বাস,
হৃদয়ে হৃদয়ে আনিতেছে বহি
অশ্রুত অজ্ঞাত—
কি এক মিলন গীতি
উদগ্র আবেগ ক্ষুব্ধ পাঞ্চাল সভায় ?

অর্জুন : পড়ে।

শ্রীকৃষ্ণ : গুপ্ত দ্বিজসাজ সহসা পড়িল খসি ;
রুদ্র ইন্দ্রতেজে—
দৃপ্ত কত বাহু সহসা হইল নত।
উঠিল আনন্দ রোল
যুক্ত হলে পাণ্ডব পাঞ্চালী—
তারি সাথে মোরে নিলে টানি ;
মনে পড়ে ?

অর্জুন : পড়ে।

শ্রীকৃষ্ণ : সব্যসাচি—
দিবস দিবস ধরি—
শূন্য প্রাণে অপূর্ণতা ব্যথা
কী করুণ সুরে ধ্বনিয়া উঠিতেছিল !
দ্বারে দ্বারে ভিখারীর মতো
ঘুরিলেম ভালবাসা চাহি
ভালবাসা বড় ভালবাসি ;

নাহি মিলে কিন্তু ধরা মাঝে—
স্বার্থবদ্ধ কাম সর্বদিকে
নির্মম আঘাত বহি আনে।
ধনঞ্জয়—
কলুষিত ভুবনের
কোন্ এক নিভৃত কন্দরে
লুকায়ে রাখিয়াছিলে হৃদয়-অমৃত
নিষ্কাম বিমল এই সখ্য প্রেম ?
দিলে ঢালি অন্তরে আমার।

অর্জুন : এ কি বাক্যছটা জনার্দন ?
জানি—
চিরদিন তুমি ভালবাস খেলা
কিন্তু এ কি নিষ্ঠুর ক্রীড়ন
বাগ্‌বাণে বিদ্ধ করি মোরে ?
যদুপতি—
আসমুদ্র হিমাচল বিশাল ভারতে
প্রখ্যাত মহিমা তব।
জ্ঞানে, কর্মে, বীর্যে ধৈর্যে
অতুল একক তুমি—
তোমা সনে সৌখ্য বাসুদেব
দুর্লভ সৌভাগ্য মোর—
তোমারে তা পূর্ণ কি করিবে হৃষীকেশ ?
মাতা, ভ্রাতা, জায়া অপত্যবান্ধব
পাণ্ডবের যত পরিজন
তুমি সবাকার
নয়নের মণি, প্রিয়তম ধন।
প্রেম তব সবারে করেছে পূর্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ : তুমি বিনয়ের খনি
(মৃদু হাস্যে) ভাল—ভাল
বিনয় বীরের ভূষণ।

অর্জুন : তুমি চতুরের চূড়ামণি—
চাতুরীতে শুধু প্রীতি,
তাই তব এত অভিনয়।

শ্রীকৃষ্ণ : কিন্তু এবার যে বিদায় দিতে হবে সখা। অশ্বমেধ সমাপ্ত হল। এইবার আমার দ্বারকায় ফিরবার পালা।

অর্জুন : এ বড় কঠিন প্রস্তাব, মাধব, না, না, আমি চাই তোমার চির সান্নিধ্য। কোনও বিচ্ছেদ কখন আসবে না, কোনও ব্যবধান কখন থাকবে না।

শ্রীকৃষ্ণ : আমিও তো তাই চাই সখা। চাই কেন, অহরহ তাই-ই তো পাই। পশ্চিম সমুদ্রের নীল তরঙ্গমালা ফেনিল উচ্ছ্বাসে দ্বারকার বিস্তীর্ণ সৈকতে যখন এসে আঘাত করে তখন তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে সহসা মানসপটে ভেসে ওঠে ; কার আয়ত-লোচন ওজঃপূর্ণ গৌর মুখখানি ? বাতাস যেন বয়ে আনে মুহূর্তে মুহূর্তে কার মধুমাখা কণ্ঠস্বর —'সখা' 'বাসুদেব' ; চমকিত হয়ে উঠি। অর্জুন, যে অবিচ্ছিন্ন মিলনে নিশিদিন আমায় যুক্ত করেছ—

অর্জুন : তার বুঝি এইবার অবসান। (বিহ্বলভাবে) জনার্দন, জনার্দন—

শ্রীকৃষ্ণ : কেন সখা ?

অর্জুন : জনার্দন, আমার যেন কেবলি মনে হচ্ছে এ জীবনে আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।

শ্রীকৃষ্ণ : ছি সব্যসাচি, নারীসুলভ কোমলতায় আচ্ছন্ন হয়ো না। আমাকে প্রফুল্ল মনে বিদায় দাও। দীর্ঘকাল দ্বারকা থেকে এসেছি। সেখানে বৃদ্ধ রাজা উগ্রসেন একা। পিতা-মাতাও জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত। তাঁরা এবং দ্বারকাবাসী সকলেই আমার প্রত্যাবর্তনের বিলম্বে নিশ্চিত খুব অধীর হয়েছেন। সেখানে আমার উপস্থিতির এখন বড় প্রয়োজন।

[যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ]

যুধিষ্ঠির : কিসের এত প্রয়োজন বাসুদেব ? আমি তো জানতেম তুমি সকল প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের বাইরে।

শ্রীকৃষ্ণ : কিন্তু তবু প্রয়োজন ছাড়ে কই মহারাজ ? (মৃদু হাস্যে) দ্বারকায় প্রত্যাগমন তো অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

যুধিষ্ঠির : তবে কি আবার কোন শাল্বাসুরের আবির্ভাবে দ্বারকায় পৌরজনের শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা উপস্থিত হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণ : (মৃদুহাস্যে) অসম্ভব কি ধর্মপুত্র ?

যুধিষ্ঠির : হাঃ হাঃ বাসুদেবের রক্ষিত দ্বারকায় অশান্তির আশঙ্কা !

শ্রীকৃষ্ণ : পরিবর্তনশীল জগতে কোন কিছুর অপরিবর্তনীয়তা আশা করা বাতুলতা, মহারাজ। সমুদ্রের ঢেউ একবার ওঠে, আবার একবার নামে। শান্তি অশান্তি দুটো নিয়েই মানুষের জীবন-গতি।

[ভীমের প্রবেশ]

ভীম : বাসুদেব—ও—এইখানে ?

শ্রীকৃষ্ণ : এস মধ্যম পাণ্ডব।

ভীম : তোমায় অন্বেষণ করছিলেম, বাসুদেব।

শ্রীকৃষ্ণ : বল কি ব্যাপার।

ভীম : যজ্ঞে অভ্যাগত মদ্রদেশীয় ব্রাহ্মণগণ এইবার স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করবেন। তাঁরা একবার সাগ্রজ বাসুদেবের দর্শন প্রয়াসী।

শ্রীকৃষ্ণ : উত্তম, আমি তাঁদের এই কৃপায় ধন্য হলেম।

যুধিষ্ঠির : বাসুদেবও যে এবার দ্বারকায় ফিরে যাওয়া মনস্থ করেছেন, ভীম।

ভীম : সে কি? অসম্ভব। এত শীঘ্র তোমার সেখানে যাবার কথা ভাবতেই পারি না।

অর্জুন : সখা, দ্বারকায় কি কোনও উৎপাতের আশঙ্কা করছো?

ভীম : উৎপাতের আশঙ্কা! সে কি? তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে এখানে অবস্থান কর, মাধব। আমি অবিলম্বে দ্বারকায় গিয়ে অত্যাচারীদের শাসন করে আসব। আমার বাহুবলে কি তুমি সংশয় কর, বাসুদেব?

শ্রীকৃষ্ণ : না ভাই, তোমার বীর্যে ও সামর্থ্যে অবিশ্বাস কোরব এত বড় অন্ধ আমি নই। তবে কথা এই যে, আমার নিজেরই দ্বারকায় উপস্থিত হওয়া আবশ্যক।

[দ্রৌপদীর প্রবেশ]

দ্রৌপদী : সখা—সখা—

শ্রীকৃষ্ণ : যাজ্ঞসেনী! কি সখি?

দ্রৌপদী : সখা, এ কি দুঃস্বপ্ন! তুমি এর অর্থ বলে দাও।

শ্রীকৃষ্ণ : কি দুঃস্বপ্ন, সখি?

দ্রৌপদী : কাল রাত্রে ঘুমের ঘোরে দেখছি তুমি ও আমি যেন এক গভীর বনের মধ্য দিয়ে চলেছি। হঠাৎ তুমুল ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাতে সব দিক আচ্ছন্ন হয়ে এল। পথ যেন আর দেখতে পাচ্ছি না। পাশে চেয়ে দেখি তুমি নেই। ভীত হয়ে ডাকছি 'সখা', 'সখা'। কিন্তু তোমার কোনও সাড়া পাচ্ছি না। ব্যাকুল হয়ে কাঁদছি। এমন সময় আকাশে একটা বিদ্যুৎ চমকাল। দেখি, তারি মাঝে তোমার মুখখানি। হাসছ। কিন্তু সে যেন এক কঠোর গম্ভীর হাসি। তারপর একটা কালো মেঘ এসে সেই বিদ্যুৎ ঢেকে ফেলল, আমারও ঘুম ভেঙে গেল। সেই থেকে কেবলি মাঝে মাঝে শিউরে উঠছি। সখা, সখা, এ-কি দুঃস্বপ্ন!

শ্রীকৃষ্ণ : পাগলিনী সখি আমার।

দ্রৌপদী : না, না, এবার আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়বো না।

শ্রীকৃষ্ণ : তাই তো। আমার অবুঝ সখীকে কি করে বুঝাব?

দ্রৌপদী : অবুঝ নই যদুনাথ; তবে স্নেহমমতার বন্ধন তোমার মতো এত সহজে কাটাতে পারি না। তুমি পৃথিবীতে বাস কর, কিন্তু পৃথিবীর কোনও টান তোমায় বাঁধতে পারে না। পিতা, মাতা, অপত্য, বন্ধু, কত পরিজনকে আপনার বিশাল হৃদয়ে স্থান দাও, আবার মুহূর্তে সব ভুলে যেতে তোমার একটুও কষ্ট হয় না। পদ্মপত্রে জলের মতো নির্লেপ তোমার মন। কিন্তু আমি যে সখা, পৃথিবীর মানুষ।

শ্রীকৃষ্ণ : আমিও তো সখি তাই। এইজন্যই তো পৃথিবীর মানুষকে কাছে টেনেছি। অমন উতলা হয়ো না, দ্রৌপদী। হৃদয়কে শান্ত কর।

দ্রৌপদী : শান্ত কোরব ? কি দিয়ে যদুনাথ ? হৃদয় যে আমার অবিরত জলছে। কোন দিন কি আর শীতল হবে ?

[হঠাৎ উচ্ছ্বসিত আবেগে]

যদুনাথ, যদুনাথ
কোথা আজি স্নেহময় পিতা ?
কোথা তাঁর প্রাণের দুলাল
ধৃষ্টদ্যুম্ন ভ্রাতা মোর ?
চন্দ্রকুলজ্যোতিঃ কোথা ভীষ্ম পিতামহ
দূর এই পতিগৃহে
পিতামাতা মম একাধারে ?
শ্বেতবাস শুভ্র শুদ্ধ তনু
কোথা গুরু দ্রোণাচার্য ?
প্রাণপ্রিয় অভিমন্যু কোথা ?
কোথা পঞ্চ পাণ্ডবেয়
অভাগীর জীবন সম্বল
কোথায় কোথায় লুকালে ?
উঃ কী ভীষণ অগ্নিশিখা
কুরুক্ষেত্রে জ্বালিলে মুরারি—
কৃষ্ণ তার ধূমে
বিরচিলে ঘোর ঘনমেঘ !
তারি মাঝে বুঝি লুকায়েছ
আমার দুলাল পঞ্চ জনে ?

শ্রীকৃষ্ণ : ধৈর্য ধর পাগলিনী সখী মোর
উদ্বেলিত শোকবেগ আজি
রুদ্ধ হোক্ সত্য দৃষ্টিবলে।
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ-যজ্ঞ ধূমে
ভাসে শুধু কালো মৃত্যুরেখা
অন্ধ তব মূঢ় আঁখিপটে ?
মরণের পিছে দেখিলে না
মৃত্যুশূন্য শাশ্বত অমৃত ?
ওরে উন্মাদিনি—
দেখ দেখ চেয়ে দেখ
গাঢ় সেই তমঃ ভেদ করি
বিকশিছে কী বিমল জ্যোতিঃ
ভারত-কল্যাণ-ইন্দু !

সে সুধাংশু প্রভা
ম্লান কি গো করিবে না
নারী হৃদয়ের ব্যর্থ মোহ মায়া
অকিঞ্চন মর্ত্য ভালবাসা ?

দ্রৌপদী : ক্ষমা কর।

শ্রীকৃষ্ণ : যাজ্ঞসেনি—যাজ্ঞসেনি
পঞ্চ তনয়ের ক্ষীণ 'মা' 'মা' বুলি
ডুবে কি গো যায় নাই
বিশ্বব্যাপী ব্যথার ক্রন্দনে ?
ক্ষত্রিয়ের তাণ্ডব মত্ততা
দিনে দিনে পৃথিবীর বুকে
কী সন্ত্রাস বিস্তারিল !
মাতা বসুন্ধরা কী করুণ সুরে
নিশিদিন 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' রবে
ভরিলেন আকাশে বাতাসে
বিষাদ বিলাপ-গীতি।
পশে নাই কি গো
আত্মসুখ-রুদ্ধ মর্মে তব ?

দ্রৌপদী : ক্ষমা কর, প্রভু।

শ্রীকৃষ্ণ : ক্ষমা কি কোরব সখি, অপরাধ তো কিছু করনি।

[দ্রৌপদী নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন]

যাদের তুমি ভালবাসতে তাদের জন্য যদি বেদনা অনুভব না করতে তা হলে তো তোমায় পাষাণী বলতেম। ব্যথা থাকবে, কিন্তু থাকবে না মোহ, ব্যথায় আত্মহারা হয়ে কর্তব্য বিস্মৃতি। সেইজন্যই তোমায় একটু মৃদু তিরস্কার করলেম, সখি। তুমিই আমাকে ক্ষমা কর, পাঞ্চালী।

দ্রৌপদী : আবার কবে দেখা হবে সখা ? পুনরায় দর্শন পাব তো ?

শ্রীকৃষ্ণ : ধন্য তারা সখি, যারা ভারতবর্ষে এই বহু আকাঙ্ক্ষিত শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে নিজেদের জীবন বলি দিয়েছে। বাঞ্ছিত স্বর্গ তাদের, অমর কীর্তি তাদের। আর আরও ধন্য সেই মহীয়সী ক্ষত্রিয় নারীগণ যাঁরা অম্লান বদনে স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা ও অন্যান্য বান্ধবদের সেই আত্মত্যাগ ব্রতে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিয়েছেন। অতি গরীয়সী তুমি দ্রৌপদী। বীরকান্তা—বীরমাতা তুমি।
(যুধিষ্ঠিরের প্রতি) ধর্মপুত্র, চলুন তবে এইবার মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, দেবী গান্ধারী, কুন্তী এবং অপরাপর সকলের নিকট বিদায় গ্রহণের উদ্‌যোগ করি।

[সকলের প্রস্থান]

স্বাগত বিবেকানন্দ-যুববর্ষ

ডক্টর শোভারানী মজুমদার

ধানবাদ মহিলা কলেজের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপিকা।

১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ যৌবনের দাপট নিয়ে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের গৈরিক পতাকা হাতে আবির্ভূত হবে, একথা আমি কেন অনেকেই আগে ভাবতে পারেননি। মন খারাপ করেই তো ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ বিদায় নিল। মৃত্যু, কত অপমৃত্যু, কত হিংসা কত হানাহানি, কত রক্তপাত, কত চোখের জলের মধ্য দিয়ে ভেসে গেল ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দটি। একটা শোক সামলাতে না সামলাতে এক রাগ দুঃখ ও হতাশাজনক ব্যাপার আমাদের চিত্তকে উদ্বেলিত করে দিয়ে গেল। যাক্, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা বলে থাকেন, অতীতকে নিয়ে বৃথা অনুশোচনা করে কোন লাভ নেই। বর্তমানে আমাদের কি করা উচিত, সেটা করাই হল মনুষ্যত্ব। বছরের শুরুতে আমরা চমকে উঠলাম—এই নবাগত বর্ষকে যাঁর নামাঙ্কিত করা হল তাঁকে আমরা তারুণ্য ও যৌবনের ঘনীভূত বিগ্রহ বলে জানি। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। বড় খুশির কথা। দেশ জুড়ে এবার নাকি কাজের মতন কাজ হবে।

রেডিও খুললেই প্রায় এই গানটা বা এই গানের সুরটা আমাদের হৃদয়কে বেশ নাড়া দিয়ে যাচ্ছে—'ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল নিম্নে উতলা ধরণী তল/চলরে চলরে চল।' আমি মাঝ বয়সের থাকের মানুষ। কাজেই আন্তর্জাতিক যুব বৎসরে যে-সব আনন্দযজ্ঞের আয়োজন হবে সেখানে আমার আমন্ত্রণ থাকবে না। তাতে অবশ্য দুঃখ বা হা-হুতাশ করার কিছু নেই। কেন না যৌবন কালটা বিধাতার বিশেষ প্রসাদরূপে আমার উপরও একদিন বর্ষিত হয়েছিল। তবে সেদিন আমি একা ছিলাম। কোন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শক্তিকে সংহত করার সুযোগ আমার আসেনি। 'বন্ধন দুর্বার সহ্য না হয় আর' মুখে এই বুলি নিয়ে সারা দেশের, সারা বিশ্বের তরুণ-তরুণীরা, যুবক-যুবতীরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে, কিন্তু কোথায় তাদের মিলন হবে, কি তাদের কর্মপদ্ধতি হবে, কোন্ সঙ্কল্পে তারা ব্রতী হবে, কোন্ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য রেখে তারা পথে অগ্রসর হবে, তার পরিকল্পনা কি আগের থেকে তৈরি হয়ে গেছে?

জলে না নামলে সাঁতার শেখা হয় না তা আমি মানি, পথে বেশ কিছুবার হোঁচট না খেলে চলা শেখা হয় না সেটাও সত্য, কিন্তু এ যে দুর্বার যুব-শক্তি, সৃজনশীল নির্দিষ্ট পথেই একটা হদিশ না পেলে, এই অফুরন্ত শক্তির কি ভয়ানক পরিণাম হবে, সেকথা আমাদের একবার ভেবে দেখার দরকার। 'আমরা চঞ্চল আমরা অদ্ভুত, আমরা নূতন যৌবনেরই দূত'—যৌবনের এই দর্প ও অহঙ্কার নিয়ে বীরত্বের আতিশয্য দেখিয়ে তালে তালে পা ফেলে চললেই তরুণদের চলবে না। তাদের সামনে অনেক কাজ।

কোন্ বছরকে কার নামে উৎসর্গ করা হবে, বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হবে, সেই পরিকল্পনা করে ও কত দিনের ব্যবধান বজায় রেখে তা করা হয়ে থাকে আমাদের জানা নেই। হঠাৎ যুদ্ধ বাঁধলে, যদি সাত তাড়াতাড়ি সৈন্যদের আদেশ দেওয়া হয় অবিলম্বে সেই যুদ্ধের মোকাবিলা করতে—সে কজনে করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। তেমনই বেশ কিছুদিন সময় হাতে রেখে যদি ঠিক করা হয়ে থাকে, অমুক বছরটা অমুকের নামে চিহ্নিত করা হবে—তাহলে ভবিষ্যতের কর্মসূচীর একটা নিখুঁত মানচিত্র চোখের সামনে ভেসে উঠবে—সুপরিকল্পিত, সুগঠিত, সুচিন্তিত,

পরিকল্পনাকে কাজে রূপায়ণ করতে কারুর অসুবিধা হবে না। শক্তি অপচয়ের কোন সম্ভাবনা থাকবে না। তা না হলে বলগাবিহীন উদ্যম, অফুরন্ত প্রাণ-প্রাচুর্য ও দুর্দান্ত শক্তির জোয়ারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যদি ভাবতে হয় কোন্ কোন্ কাজে তার প্রয়োগ করা হবে, কিভাবে 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' এর গতিপথে এই শক্তিকে চালিত করা সম্ভব,—সেই চিন্তা-ভাবনার অবকাশে, তবে সমুদ্রের অশান্ত-তরঙ্গের মতন এ শুধু তীরে আছড়িয়ে পড়বে মাত্র।

পারমাণবিক শক্তির চেয়ে এই যুবশক্তি আরও প্রচণ্ড, আরও ভয়ঙ্কর। যদি আমরা সংহতি ও সংগঠনের কাজে এই শক্তিকে প্রয়োগ করতে না পারি, তাহলে আমাদের দুর্দশার অন্ত থাকবে না।

এই পৃথিবীতে যা কিছু নূতন আবিষ্কার ও সৃষ্টি হয়েছে, হতে চলেছে ও ভবিষ্যতে হবে—তার মূলে আছে নবীনের তৃষ্ণা, যে-তৃষ্ণা জন্ম দিচ্ছে কত জিজ্ঞাসার। সেই জিজ্ঞাসায় তাদের অস্থির করে তুলছে, তাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হয় নানা অভিযানে। আমাদের কাছে ওরা অনেক কিছু বিস্ময়কর সৃষ্টি তুলে ধরবে এই বাজি রেখেছে ওরা আমাদের কাছে। যাক, সারা দুনিয়ার মানুষ বড় আশা নিয়ে বসে আছে ওদের মৃত্যুঞ্জয়ী হিসাবে দেখবে বলে। দেশকে নিজেদের করে পাওয়ার জন্য যে-সব দামাল সর্বস্বত্যাগী ছেলেদের আমরা একদিন পেয়েছিলাম, তাদের যদি আবার আমরা এই মিলনযজ্ঞে খুঁজে পাই, তাহলে আমাদের আর আনন্দের পরিসীমা থাকবে না। কোন যুবসম্মেলনে যদি স্বামী বিবেকানন্দের ঐশ্বরিক শক্তির ধারে কাছে আসা কোন তরুণকে আমাদের চোখে পড়ে যায়, যদি দেখি কারুর মধ্যে নেতাজী, ক্ষুদিরাম, লালা লাজপত রায়, বাঘা যতীন, বিনয়-বাদলের মুখের আদলটুকু আসছে, যদি কোন তরুণ বিজ্ঞানীর মধ্যে নূতন করে জগদীশচন্দ্র বসুকে খুঁজে পাই, তাহলে আশ্বাস ও ভরসা জাগবে—আবার আমরা বাঁচার মতন করে বাঁচব।

যাদের কিছু হবে না বলে আমরা দূরে সরিয়ে দিয়েছিলাম, অতীতকে স্মরণ করে যখন ওদের কথায় কথায় ধিক্কার দিয়েছি, ও তাদের নৈরাশ্যের জগতে আরও ঠেলে দিতে সাহায্য করেছি, যাদের বেকার বলে ঘোষণা করে ওদের আরও ব্যর্থ করে দিয়েছি, সেই অপরাধের মাত্রা আর বাড়ালে চলবে না। ওদের অত্যন্ত কাছে টেনে নিয়ে, ওদের আন্তরিক ভালবেসে আমাদের বলতে হবে—তোমরাই আমাদের বল, তোমরাই ভরসা, তোমরাই ভবিষ্যৎ। এই চরম আশ্বাসের কথাতে ওদের বুকে চরম আস্থা জেগে উঠবে, ওরা নিজেদের ভালবাসতে শিখবে, নিজেদের শ্রদ্ধা করবে, নিজেদের আর নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন করে তোলার জন্য জীবন-মরণ পণ করে বসবে না। ওরা নিজেদের চিনতে শিখুক, ওরা ভালবাসুক নিজেদের, ওরা কাজ করুক বাঁচার মতন বাঁচার প্রত্যাশা নিয়ে, তাহলে আন্তর্জাতিক যুব বছরের সুদীপ্ত সার্থকরূপ আমরা দেখতে পাব। শক্তি, সাহস ও অভয়ের প্রতিমূর্তি স্বামী বিবেকানন্দের নামে এই যুববর্ষকে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্য তখনই সার্থক হবে। আমরা একান্তভাবেই স্বামীজীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি—যাতে তাঁর পুণ্য নামাঙ্কিত এই বর্ষ সর্বতোভাবে জয়যুক্ত হয়। স্বাগত জানাই বিবেকানন্দ-যুববর্ষকে।

বাঁকুড়া জেলার লোকসংস্কৃতিতে লৌকিক দেবদেবী-প্রসঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণেন্দু চৌধুরী

তথ্যান্বেষী প্রাবন্ধিক।

ধর্মপূজা

বাঁকুড়ার যে সমস্ত লৌকিক দেবদেবীর সর্বাধিক প্রাধান্য আছে তার মধ্যে 'বাঁকুড়া-রায়' বেশ সুপ্রসিদ্ধ। তিনিই ধর্মঠাকুর বলে মধ্য রাঢ়ে প্রচারিত হয়ে আসছেন সুদীর্ঘ দিন ধরে। অনেকের মতে 'বাঁকুড়ারায়ে'র নামানুসারেই জেলার নাম হয়েছে বাঁকুড়া। কোন কোন পণ্ডিত বলেছেন, মল্লরাজ বীর হাম্বিরের পুত্র বীর বাঁকুড়ার নামানুসারে জেলার নাম হয়েছে বাঁকুড়া। ধর্মঠাকুরকে অনেকেই 'ধর্মরাজ' বলেন। ধর্মরাজের সুনির্দিষ্ট কোন মূর্তি নেই; বিভিন্ন আকৃতির ছোট-বড় পাথরের নুড়ি (যেমন কূর্মাকৃতি) ও শিলাখণ্ডই ধর্মঠাকুর-রূপে বাঁকুড়ার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে পূজিত হয়ে আসছেন। গ্রামের শেষপ্রান্তে অথবা গ্রামে ঢুকবার মুখে সাধারণত বেলগাছের তলায় তাঁর পূজা করেন কর্মকারেরাই। ফাঁকা জায়গাতেও বেদীর মতন করে ধর্মঠাকুরের পূজা হতে দেখা যায়। এই বেদীগুলিকে স্থানীয় লোকেরা 'থান' অথবা 'মাড়' বলেন। পূজার পর কোন কোন জায়গায় মোরগ, কোন কোন জায়গায় পায়রা, আবার কোন কোন জায়গায় সাদা ছাগল বলি দেওয়া হয়। আষাঢ় মাসের শেষ পূর্ণিমায় বেলিয়াতোড় (কেউ কেউ বেলেতোড় বলেন) গ্রামে আষাঢ়ের শেষ পূর্ণিমায় ধর্মরাজের এক বিরাট উৎসব হয়। ধর্মরাজের কাছে বিভিন্ন আকৃতির ছোট-বড় হাতি, ঘোড়া দেখতে পাওয়া যায়। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' থেকে আমরা জানতে পারি যে, হুগলী জেলার কামারপুকুর অঞ্চলেও অর্থাৎ শ্রীপুর, কামারপুকুর ও মুকুন্দ-পুকুর গ্রাম তিনটিতেও "৺ধর্মঠাকুরের পূজায়ও এখানে এককালে বিশেষ আড়ম্বর ছিল। কিন্তু এখন আর সেই কাল নাই; বৌদ্ধ ত্রিরত্নের অন্যতম শ্রীধর্ম এখন কূর্মমূর্তিতে পরিণত হইয়া এখানে এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম সকলে সামান্য পূজা মাত্রই পাইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণকেও সময়ে ঐ মূর্তির পূজা করিতে দেখা গিয়া থাকে। উক্ত ধর্মঠাকুরের ভিন্ন ভিন্ন নাম বিভিন্ন গ্রামে শুনিতে পাওয়া যায়। যথা, কামারপুকুরের ধর্মঠাকুরের নাম—'রাজাধিরাজ ধর্ম', শ্রীপুরে প্রতিষ্ঠিত উক্ত ঠাকুরের নাম 'যাত্রাসিদ্ধিরায় ধর্ম', এবং মুকুন্দ-পুকুরের 'সন্ন্যাসীরায় ধর্ম'। কামারপুকুরে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের রথযাত্রাও এককালে মহা-সমারোহে সম্পন্ন হইত। নবচূড়াসমন্বিত সুদীর্ঘ রথখানি তখন তাঁহার মন্দিরপার্শ্বে নিত্য নয়ন-গোচর হইত। ভগ্ন হইবার পরে ঐ রথ আর নির্মিত হয় নাই। ধর্মমন্দিরটিও সংস্কারাভাবে ভূমিসাৎ হইতে বসিয়াছে দেখিয়া ধর্মপণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর তাঁহার নিজ বাটীতে ঠাকুরকে এখন স্থানান্তরিত করিয়াছেন।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, ১ম খণ্ড; পৃঃ ২৯)। বাঁকুড়াতে সাধারণত ডোম, চণ্ডাল, বাগদি, লোহার প্রভৃতি জাতিরাই এই পূজা করেন। বৃন্দাবনপুর গ্রামের ধর্মঠাকুরের নাম শ্যামরায়, ইন্দাসের বাঁকুড়ারায়, পুখন্নায় ধর্মঠাকুর, মুইদাড়ায় যাত্রাসিদ্ধিরায় ধর্ম। কোতুলপুরের কলাধর ধর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন নামে তিনি পরিচিত।

মনসাপূজা

মা-মনসাদেবীর প্রাধান্য বাঁকুড়া জেলায় সব থেকে বেশি। শহরাঞ্চলের মানুষদের অনেকেই মনসাগাছের ডাল তুলসীতলায় পুঁতে কাঁচা দুধ, নৈবেদ্য ও কলা দিয়ে পূজা করেন। প্রায় সব বর্ণের

মানুষেরাই মনসার পূজা ঘটা করে, করে থাকেন। 'মা-মনসার পালন' কিন্তু সমাজের উঁচু এবং নিচু শ্রেণীর সকলেই পালন করেন এবং পূজাও দেন। অবশ্য সমাজের উঁচু বর্ণের মানুষেরা নিজেদের বাড়িতে মনসাপূজা করেন না। শ্রাবণ মাসের 'দশহরা' উৎসবের দিন থেকে আশ্বিনের শেষ সংক্রান্তি পর্যন্ত বাঁকুড়ার কোন না কোন গ্রামে মনসাপূজা হয়ই। দশহরার দিনে অনেকেই 'কেলেকোঁড়া' ফল খায়। লোকবিশ্বাস এইরূপ যে, এই ফল খেলে সাপে কামড়ালেও নাকি কিছু হয় না। 'পান্তাভাত' ও নয় রকম তরকারি খাওয়ার প্রচলন আছে মনসাপূজার পরের দিনে।

বিষ্ণুপুর থেকে সোনামুখী বাসে যাবার পথে জয়কৃষ্ণপুর স্টপেজ। সেখান থেকে মাইল দুই/তিন হেঁটে গেলেই চোখে আসে অযোধ্যা—বেশ বড় গ্রাম। লোকশ্রুতি এইরূপ যে, 'এই গ্রামের নাম মল্লরাজাদের দেওয়া।' অযোধ্যা গ্রামের মাঝো পাড়ায় দশহরা উৎসব ও মনসা-পূজা দেখবার মতন। দশহরা উৎসব শুরু হওয়ার চৌদ্দ দিন আগে কেবলমাত্র সধবা স্ত্রীলোকেরা নির্জন দ্বারকেশ্বর নদ পার হয়ে ওপারে আমতলায় (স্থানীয় গ্রামবাসীরা বলেন 'চটাই') গিয়ে একসঙ্গে নানারকম আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। একে বলা হয় 'গিন্নী-পালন' উৎসব। এই উৎসব করতে যাওয়ার আগে গ্রামবাসী স্ত্রীলোকেরা অর্থাৎ উপরপাড়া, নামোপাড়া, মাঝোপাড়া, কামারপাড়া, কান-কেঁদোপাড়ার গিন্নীরা মনসা-মন্দিরে এসে মায়ের পায়ে, মাথায় ফুল চড়ান। তার মধ্যে একটি ফুল মায়ের মাথা থেকে আলগা হয়ে পড়ে যায়! মায়ের মাথা থেকে ফুল না পড়লে গিন্নীরা 'গিন্নী-পালন' উৎসব করতে যেতে পারবেন না। স্থানীয় গ্রামবাসীদের মুখের কথা হল এটাই। একটি ফুল খসে পড়লেই তাঁরা বলেন, 'মা অনুমতি দিয়েছেন।' মায়ের অনুমতি নেওয়ার পর ঐ ফুল নিয়ে গিয়ে 'রাজার গিন্নীর' হাতে দেওয়া হয়। তিনি অনুমতি দিলে তবেই গিন্নীরা প্রণাম করে (ভক্তিভরে) নদীতীরে যাত্রা শুরু করেন। কেন এই উৎসব? মানত পূরণের উদ্দেশ্যে। 'চটাই'য়ে পৌঁছানোর পর স্নান, খাওয়া-দাওয়া, গান, হাসি, হৈ-হুল্লোড়, কথাকলি, কথকতা, রঙ্গ-রস, রাধাকৃষ্ণ সেজে অভিনয়, রাম-লক্ষ্মণ-সীতার অভিনয়ও করেন গিন্নীরা। স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাস—'এই দিন প্রত্যেক গিন্নীই হয়ে যান মা-মনসাদেবী।' দশহরার দিনে বালতিতে করে গোবর গুলে অনেকেই গৃহের চারদিকে বৃত্তরেখা টানেন। একে বাঁকুড়াবাসীরা 'দশের বেড়ি' নামে অভিহিত করে থাকেন। আকুড়িয়া গ্রামের ডোমদের দিয়ে অযোধ্যা-বাসীরা মনসাপূজা সম্পন্ন করান। চিরকাল ধরে তাই করে আসছেন। ভক্তরা মনসার ঘট মাথায় চাপিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা নৃত্য করছে, এটাও এক দেখবার জিনিস। এছাড়া আছে 'অগ্নিবারা মন্ত্র'। 'অগ্নিবারা মন্ত্র' আর কিছুই নয়, 'মা-মা' বলে চীৎকার করতে করতে পা দিয়ে জ্বলন্ত আগুন নেভানো হয় বলেই এর নাম 'অগ্নিবারা মন্ত্র'। দশ ফুট লম্বা দু ফুট চওড়া নালার আকৃতি বিশিষ্ট জায়গায় (মাটির উপরে) কাঠকয়লার লাল টকটকে আগুন রাখা হয়। সেই আগুনের উত্তাপ অর্থাৎ আঁচে পঞ্চাশ হাত দূরে দাঁড়ালেও মুখ ঝলসে যায়। অথচ ভক্তরা অনায়াসে পা দিয়ে সেই আগুন নিভিয়ে দেন। দশ ফুট লম্বা জায়গাটির এ-প্রান্তে একটি পদ্মপাতা এবং ও-প্রান্তে একটি পদ্মপাতা রাখা হয়। পদ্ম-পাতার উপর সামান্য দুধ ছিটিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ভক্ত পদ্মপাতার উপর পা দিয়ে 'মা-মা' বলে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে, আবার ও-প্রান্ত থেকে এ-প্রান্তে চলাফেরা করতে থাকেন খালি

পায়েই! দশহরার দিনে এই উৎসবটি হয়। বর্তমানে এ জিনিস খুবই কম পরিলক্ষিত হয়। শুনেছি, আগে নাকি ৪০।৫০টা ঐরকম অগ্নিকুণ্ড থাকত। মা-মনসার পূজা যে সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা বেশি করে থাকেন তাঁদের মধ্যে বাউরি, হাড়ি, ডোম, বাগ্দী, খয়রা, করঙ্গা, কেওট, লোহার, নাপিত, জেলে, শাঁখারি, হাজরা, শুঁড়ি, মুচি, মাল, মাহাতো, মেটে, তিলি, ভূমিজ, কুমোর, ছুতোর প্রভৃতিরাও আছেন।

মনসাপূজা উপলক্ষে বাঁকুড়াতে মনসাযাত্রা অর্থাৎ মনসামঙ্গল, মনসাগান প্রভৃতি হয়ে থাকে। এখানকার লোকেদের কাছে মনসা-যাত্রা খুবই জনপ্রিয়। প্রতি বছর একই পাড়াতে একই যাত্রা; দল হয়তো ভিন্ন, কিন্তু কাহিনী একই, কোন বৈচিত্র্য নেই, কিন্তু তবুও বেশ ভিড় হয়! বাঁকুড়া শহরের অন্তর্গত রামপুর তাঁতি-পাড়াতে গোটা শ্রাবণ মাস ধরে রাত্রিবেলায় মনসামঙ্গল গান গাওয়া হয়। এখানে যে মনসার চালিটি দেখতে পাওয়া যায় সেটিও খুব সুন্দর। তাঁতিপাড়ার বাসিন্দারা বলেন, 'পাঁচমুড়ার শিল্পীকে দিয়ে তৈরি করানো হয়েছে।' প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা চালিটির তিনটি খাঁজ অর্থাৎ তিনটি থাক্; কতকটা গোলাকৃতি ঘোরানো সিঁড়ির ন্যায়। কিন্তু থাক্‌গুলো খুব একটা চওড়া নয়; সেই কারণে সিঁড়ির সঙ্গে তুলনাও ঠিক চলে না। চালিটির একেবারে শীর্ষদেশে কার্তিক-ঠাকুর ময়ূরের পিঠে চড়ে হাতে ধনুক বাণ নিয়ে বসে আছেন। মাঝের থাকে ত্রিভঙ্গমুরারী বঙ্কিমঠামে রাধাকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন; তার নিচের খাঁজে বা থাকে কালো রঙের মনসামূর্তি। চোখ জলজ্বল করছে—সোনার তৈরি। নাকের নাকছাবিটিও সোনার। মনসা-চালির দুপাশে মা-মনসার দুজন সখী দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের চোখগুলিও সোনার। পাঁচমুড়া গ্রামেও ঠিক এই ধরনের মনসার চালি দেখা যায়

বাঁকুড়া শহর থেকে একুশ কিমি দূরে পাঁচ-মুড়া গ্রাম। (কেউ কেউ বলেন পাঁচমোড়া।) এখানকার শিল্পীদের পরিচয় আজ আর কারোরই অজানা নয়। 'মনসার চালি', 'মনসার বারি'; টেরাকোটার হাতি, ঘোড়ার সঙ্গে যাঁদের সামান্যতমও পরিচয় আছে, তাঁরাই এক নজরে বলে দিতে পারেন, এটা কোথাকার ঘোড়া। সৌন্দর্যের ষোলকলা যেন পূর্ণ হয়েছে এই সমস্ত শিল্পনিদর্শনের মধ্য দিয়ে। পাঁচমুড়া ও রাজ-গ্রামের ঘোড়ার থেকেও আরও বেশি সুন্দর ও শৌখীন ঘোড়া দেখা যায় স্যান্দরা গ্রামে। মনসার চালি নির্মাণে কিন্তু পাঁচমুড়ার শিল্পীরা আজও শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন বহন করে চলেছেন। সে যাই হোক, বাঁকুড়ার শিল্প একটা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

মনসাপূজা উপলক্ষে বিষ্ণুপুরে 'ঝাঁপান' উৎসব (সাপখেলা) দেখানো হয়। মল্লরাজ-বাড়ির সামনের রাস্তায় বিভিন্ন দল নানারকমের সাপ নিয়ে খেলা দেখিয়ে, দর্শকদের মন আকৃষ্ট করে 'ঝাঁপান' সম্পন্ন করে। যে সমস্ত সাপ এনে এখানে খেলা দেখানো হয় তার মধ্যে ময়াল, চিতি, অজগর, সাদা খরিস অর্থাৎ দুধে খরিস, কাল খরিস, বড়া, গোখরো প্রভৃতি। বাঁকুড়ায় দশহরার দিনে ছেলেরা ঘুড়ি ওড়ায় এবং মেয়েরা সই পাতা-পাতি করে, অর্থাৎ বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হয়। বিষ্ণুপুরেও এর খুব প্রচলন। এখানে মা-মনসা আবার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামেও পূজিত হন;যেমন—পদ্মা, বিষহরি, বেহুলা, কালনাগিনী; অযোধ্যাগ্রামে মা-মনসাদেবীকে 'কালীবুড়ি' বলা হয়; বিষড়াগ্রামে তিনি 'বিষহরি', লাপুড় গ্রামে তিনি 'লাপুড়সিনি', রাউৎখণ্ডে তিনি 'জগৎ-গৌরী' (জয়পুর থানা) নামে পরিচিত। 'জগৎ-গৌরী' সর্পবিভূষিত জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্তি হলেও

ইনি সর্পদেবতারূপে পূজা পেয়ে আসছেন। মা-মনসারই আর একরূপ হল 'জগৎ-গৌরী' এই লোকবিশ্বাস আজও গ্রামবাসীদের হৃদয়ে বর্তমান। তাই তাঁরা বিনা প্রতিবাদে সর্পদেবতার পূজা করেন ভক্তিভরে। লাপুড় গ্রামের 'লাপুড়-সিনি'ও বর্তমানে মনসারূপেই পূজিতা। এ-ছাড়াও শ্যামনগরে তিনি 'জগৎ-গৌরী', রাহা গ্রামে তিনি 'মনসা', ফুলকুসমা গ্রামেও তিনি 'মনসা' নামেই পূজিতা। ফুলকুসমা গ্রামের মনসা-পূজা দেখবার মতন। মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হওয়ার আগে—খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলায় তুর্কী আগমনের বহু পূর্ব থেকেই বাঁকুড়া জেলায় মনসা, চণ্ডী, ধর্ম, শিব প্রভৃতি পূজা পেয়ে আসছেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে (পৃঃ ২৭৯) বলেছেন, 'খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্বেই মনসা-পূজা এই দেশের সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।'

সিনিপূজা

সিনিদেবীর সাধারণত কোন প্রতীক নেই। অনুন্নত সম্প্রদায় এবং আদিবাসী সমাজের মধ্যেই এই পূজার বেশি প্রচলন। ওন্দা, ছাতনা, পাঁচাল প্রভৃতি গ্রামে সিনি দেবতার পূজা হয়। সিনির পূর্বে অন্য কোন না কোন শব্দ যুক্ত থাকবেই: যেমন—লোধো-সিনি, মদনা সিনি, পঞ্চ-সিনি, পদ্ম-সিনি, মোড়ো-সিনি, কয়া-সিনি, শালবাঁই-সিনি, কুমান-সিনি, ভোদো-সিনি প্রভৃতি। বাঁকুড়া গঙ্গাজল-ঘাটি থানার মাজমুড়া গ্রামে (রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সন্নিকটবর্তী) 'মা-দীঘল-সিনি'র পূজা বেশ ঘটা করে হয়। গ্রামের উত্তরদিকে মাঠের মাঝখানে একটি কালো রঙের পাথর (১′ ৬″) শুয়ে আছেন; তিনিই হলেন 'মা-দীঘল-সিনি'। তাঁর সামনে ছোট-বড় হাতি-ঘোড়াও রয়েছে। শস্যরক্ষাকারিণী দেবী হিসাবে এখানে তিনি উচ্চ ও নিম্ন সকল বর্ণের মানুষের কাছ থেকেই নির্বিবাদে পূজা পেয়ে আসছেন। সমস্ত ফসল বাড়িতে তোলা হয়ে যাওয়ার পর শেষদিনে (বৎসরে মাত্র একদিন) এঁর পূজা হয়। স্থানীয় লোকেরা বলেন, 'ডেনি আনার দিনে'। এছাড়াও বাঁকুড়ার সোনাতপল গ্রামের পশ্চিমে পলাশ-গাছের তলায় 'সোনা-সিনি' থানে ৬।৭ ইঞ্চি পাথরের মুখ দেখতে পাওয়া যায়। বুদ্ধের মুখের আদলে গঠিত, কিন্তু ঠিক বুদ্ধমূর্তি নয়—মুখ নয়। তিনিই 'সোনা-সিনি' নামে পূজিতা।

সিনি মূলতঃ বৌদ্ধদের দেবতা সেকথা পণ্ডিতেরাই প্রমাণ করেছেন। তাঁরা ছান্দারের গ্রামদেবী 'জঙ্গাল-সিনি'কে বৌদ্ধদের ধনৈশ্বর্যের দেবতা 'জম্বলদেব' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁরা রাউৎখণ্ডের জগৎ-গৌরী এবং পাঁচাল গ্রামের 'চুণ্ডা-সিনি'কেও বৌদ্ধতন্ত্রের দেবদেবী বলে অভিহিত করেছেন। একসময় ভগবান গৌতম বুদ্ধদেব ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে বেরিয়ে-ছিলেন সেকথা আমাদের দেশের ইতিহাসে এবং বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকেও উল্লিখিত আছে। ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, রাঢ় অঞ্চলে একসময় বৌদ্ধরা অবস্থান করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বলেন, শুশুনিয়া নামটি বৌদ্ধদের দেওয়া,—বৌদ্ধ শব্দ 'সংসুমারো' থেকে শুশুনিয়া নামটি এসেছে। ছাতনা থানার উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত শুশুনিয়া পাহাড়ের (উচ্চতা ৪৪০ মিটার) অদূরে একখানা ছোট গ্রাম কটরা,—কটরা গ্রামের 'সেনাপতি' পদবীধারীরা আজও ভগবান বুদ্ধের পূজা করেন অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। এই সমস্ত সূত্রেই পণ্ডিতদের উপরি-উক্ত ধারণাগুলিকে কিছুতেই অমূলক বলা যেতে পারে না। বৈতাল

গ্রামের 'ঝগড়াই-সিনি'ও বৌদ্ধ দেবাংশী অর্থাৎ দেয়াসী। এছাড়াও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-বিষ্ণুপুর শাখা অফিসে ডিহর গ্রামে পাওয়া যায় নানা বুদ্ধমূর্তি এবং বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রাপ্ত অসংখ্য জৈনমূর্তিও সংরক্ষিত আছে। সোনামুখী থানার সুবর্ণমুখী মন্দিরটির (বহু পুরাতন) ভিতরে আজও বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এই সব দেখেশুনে স্বভাবতই মনে হয়, মধ্য রাঢ় অঞ্চলে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সংস্কৃতির সংমিশ্রণ তো ঘটেইছে, এমন কি অনার্য সংস্কৃতির সঙ্গে আর্য সংস্কৃতিরও সংমিশ্রণ ঘটে গেছে। আর তা না হলে উল্লিখিত ব্যাপারগুলিও কখনই ঘটত না বা সম্ভব হত না। তৎকালীন যুগে বাঙালী মানসিকতা এইভাবেই গড়ে উঠেছিল, সেই কারণেই এসব সম্ভব হয়েছিল এবং আজও সেই সূত্রধারা ক্ষীণ পরিমাণে বাঙালীর মধ্যে বর্তমান রয়েছে, তা ঐ সমস্ত গ্রামের মানুষদের কাছে গেলেই জানতে পারা যায়।

ঘাঁটুপূজা

লোকবিশ্বাস এইরূপ যে, ইনি নাকি চর্মরোগের দেবতা। ফাল্গুন সংক্রান্তির ভোরবেলায় অনেক গৃহস্থ বাড়িতেই এই পূজা হয়ে থাকে। বাড়ির চৌহদ্দি সীমানার বাইরে অথবা জলাশয়ের ধারে পূর্বদিকে অথবা উত্তরদিকে মুখ করে পূজা করা হয় ঘাঁটুদেবীর। কাঠের আগুনে যে মাটির হাঁড়িটিতে করে দীর্ঘদিন গৃহস্থের ভাত রান্না হচ্ছে সেই হাঁড়িটির মুখের অংশকে ভেঙে ফেলা হয়। সেই ভাঙা হাঁড়িটির উপর গোবর দিয়ে ঘাঁটুমূর্তি তৈরি করা হয়। মাটির হাতি, ঘোড়া কিন্তু এঁর কাছে থাকেন না। থাকেন না বললাম এই কারণেই যে, এখানকার লোকে পোড়ামাটির ছোট-বড় হাতি-ঘোড়াগুলিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে থাকেন। ঘাঁটুমূর্তির উপরের অংশে সিঁদুরের টিপ দেওয়া হয়। ঘাঁটুমূর্তির সামনে হলুদে ছোপানো (রুমালাকৃতি) বস্ত্রখণ্ড রাখা হয়। পূজার শেষে গৃহের সকলকে ব্রতিনীরা ঐ বস্ত্রখণ্ড দেহে ছুঁইয়ে দেন। বেলপাতা, দুর্বা; বুনো ফুল (ভাট, ঘাঁটু, আঁকড়) ভিন্ন অন্য কোন ফুলে সচরাচর পূজা হয় না। পূজার শেষে ছুতো হাঁড়ির মতন পোড়া কালো হাঁড়িটিকে বাচ্চা ছেলেকে লাঠি দিয়ে ভাঙতে বলা হয়। হাঁড়ি ভেঙে দিলেই পূজা শেষ। মাটির প্রদীপটি কিন্তু সারাদিনই জ্বলে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ সহ বাঁকুড়ার প্রায় সমস্ত বর্ণের মানুষই এই পূজা করে থাকে। ঐদিন বিকেলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বাড়ি বাড়ি প্রদক্ষিণ করে চাল সংগ্রহ করে রাত্রে ভোজের মতন করে। ভোজ খেতে যাবার আগে বাড়ির মায়েরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চোখে কাজল পরিয়ে দেন ঐ হাঁড়িতে (ভাঙা অংশ) তৈরি কাজল থেকে, নিজেরাও পরেন। লোকবিশ্বাস এই ভাঙা হাঁড়িতে কাজল পেতে পরলে চোখের রোগ হয় না কখনও। আর ঐ ছোট ছোট ছেলেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল, ডাল চাইবার আগে সুর করে বলে—

'আলুর মালুর চাল দাও গো
না দেবে তো খোস লাও গো।'

অর্থাৎ এ থেকেও সহজেই বোঝা যায় যে, ইনি চর্মরোগের দেবতা ছাড়া আর কিছু হতে পারেন না। কিন্তু সব থেকে আশ্চর্য কোন সশব্দ মন্ত্রোচ্চারণ করা হয় না। এত আয়োজন সত্বেও!

ঘেটুপূজা

ঘাঁটু ও ঘেটু মূলতঃ একই দেবদেবী। কিন্তু ঘেটুপূজা যাঁরা করেন (সাধারণত বাউরি, হাড়ি, ডোম, মুচি, মেথর, রজক) তাঁরা ঘাঁটুকে আলাদা দেবী বলে সূচিত করতে চেয়েছেন। শহর বাঁকুড়ার কমরার মাঠ অঞ্চলের বাউরিদের বক্তব্যও তাই। এখানের একদল লোক ফাল্গুন

সংক্রান্তিতে ঘেটুপূজা করেন, আর একদল লোক চৈত্র সংক্রান্তির দিনে করেন, কিন্তু এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। সাধারণত পাঁচ থেকে সাত ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট গোবরের ডেলাকে গোলাকৃতি করে পাকিয়ে দুটো ঘিঁচি কড়িকে ঢুকিয়ে দিয়ে চোখ করে নেন; তাঁরাও মন্ত্র পাঠ করেন না, কিন্তু তবুও বলেন ঘাঁটু ও ঘেটু ভিন্ন দেবতা। সোনামুখী থানার অন্তর্গত মাঝির ভাঙ গ্রামের অনেকেরই বক্তব্য: 'চতুর্মুখ ব্রহ্মা আর পঞ্চানন শিব কি কখনও এক হতে পারেন? ঘাঁটু গৃহের শান্তি আনেন, আর ঘেটু দেহের শান্তি আনেন। আরও শুনবে তুমু আর ইতু আনেন আত্মার শান্তি।' বাঁকুড়া শহরের মহাকাল ভৈরব-সাধক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখেও এই কথাই শোনা গিয়েছিল। সে যাই হোক, শহর বাঁকুড়ার বিভিন্ন বাউরি পাড়া অঞ্চলে পাড়াপরিক্রমা করে চাল, পয়সা তুলবার সময় ছেলের দল যে গানটি গায় সেটি এখানে তুলে ধরা হচ্ছে—

> 'চোত মাসে চতুর্দশী/ঘেটুর কপালে চন্দন ঘষি॥/আয়রে ঘেটু লড়ে/ঘোড়ার উপরে চড়ে॥/ঘেটু গুড় গুড় বাদ্য বাজে/তার সইতে পোলুই নাচে॥/পোলুই এর আগে ভরা/তার সইতে হরিয়া চড়া॥/হরিয়া চরা লখিন্দর/হালের, উপর হাল ধর॥/সে হাল কুথাকে যায়/রউমুঁন ঘাটাকে যায়॥/রউমুঁন ঘাটায় কি কি বিকা/রউমুঁন মামারভাণ্ডার বিকা॥/মামার ভাণ্ডার লুব/আমার ভাণ্ডার তুব॥/শাঁখ শাঁখ শাঁখের জোড়/পায়রা কিনব বত্রিশ জোড়॥/আয় পায়রা ডাক দিয়ে/ধোবা ঘাটে জল খেয়ে॥/মোষ পড়ল দড়াম দিয়ে॥'

এই ছড়াটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খড়ের মোটা বিচাল-দড়িটিকে গায়ের জোরে মাটিতে চাবুক মারে। কেন দড়িটি দিয়ে চাবুক মারা হয়? সে প্রশ্নের কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া যাবে না—তারা শুধু বলে, 'হয়; এরকম করতে হয়; পূর্বপুরুষদের নিয়ম।' গৃহস্থ বাড়িতে ছেলের দল মাচুলিতে (ছোট টুলের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট কাঠের জিনিস; পিঁড়ে নয় কিন্তু) ঘেটুকে বসিয়ে ঢুকবার সময় বলে—

> 'আশে পাশে লিয়াল দড়ি
> ঘাটু যাচ্ছে গিরস্থ বাড়ি।'

গৃহস্থ বাড়িতে ঢুকে চাল দাও, পয়সা দাও প্রভৃতি না বলে আবার আর একটি ছড়ার ন্যায় পদ্য বলে—

> 'সিঁন্দুর থাকতে দেয় না সিঁন্দুর/তার বৌ হয় চালের ইঁদুর,/বোল্ হরি বোল্ রাম।/তেল থাকতে দেয় না তেল/তার বৌ করে ভেল ভেল; / বোল্ হরি বোল্ রাম/চাল থাকতে দেয় না চাল/তার বৌ করে উত্থাল পাথাল ;/বোল্ হরি বোল্ রাম।'

'বোল হরি বোল্ রাম' কথাটি প্রত্যেকেই বলে সুর করে; কিন্তু অন্য বাক্যগুলি কেবলমাত্র একজন সুর করে বলে।

বিষ্ণুপূজা

'পোখরনা'র রাজা চন্দ্রবর্মা বিষ্ণুর উপাসনা করতেন তা আমরা শুশুনিয়ায় আবিষ্কৃত শিলালিপিটি থেকেই জানতে পারি। বাঁকুড়ার জনমানসে জৈন বৌদ্ধ প্রভাব লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় বিষ্ণু বাসুদেব পূজার প্রচলন ঘটেছে (আনুমানিক তৃতীয়-চতুর্থ শতকে) তা বেশ বোঝা যায়। একেশ্বর শিবমন্দিরের অঙ্গনে সপ্ত-নাগছত্র ও দ্বাদশভুজ 'খাঁদারানী'মূর্তিটি আসলে বিষ্ণুমূর্তি। সত্যনারায়ণপূজার সাথে বিষ্ণুর পূজা এখনও অনেকেই করে থাকেন। উচ্চবর্ণের মানুষেরাই সাধারণত এঁর পূজা করে থাকেন। [ক্রমশঃ]

শিবমহিম্নঃ

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য

[বৈশাখ, ১৩৯২ সংখ্যার পর]

৯। ধ্রুবং কশ্চিৎ সর্বং সকলমপরস্ত্বধ্রুবমিদং
পরো ধ্রৌব্যাধ্রৌব্যে জগতি গদতি ব্যস্ত-
বিষয়ে।
সমস্তেঽপ্যেতস্মিন্ পুরমথন তৈর্বিস্মিত ইব
স্তুবন্ জিহ্রেমি ত্বাং ন খলু নন্বু ধৃষ্টা মুখরতা॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা: কশ্চিৎ (সাংখ্যপতঞ্জলি মতানুসারী) সর্বং (সমগ্রং) জগৎ ধ্রুবং (জন্ম-নিধনাদিরহিতং) (সর্বদা সৎ এব) গদতি (ব্যক্তং বদতীত্যর্থঃ) তথা অপরঃ (অন্যঃ সুগতানুবর্তী) সকলমিদম্ অধ্রুবম্ (ক্ষণিকমিতি) গদতি। পরঃ (তার্কিকঃ) সমস্তেঽস্মিন্ জগতি ধ্রৌব্যাধ্রৌব্যে (নিত্যানিত্যত্বে) ব্যস্তবিষয়ে (ভিন্নধর্মবর্তিনী) গদতি (নৈয়ায়িকানাং মতানুসারেণ আকাশ-কালাদি চতুষ্কপৃথিব্যাদি চতুষ্কপরমাণবশ্চ নিত্যাঃ কিন্তু তেষাং কার্যদ্রব্যানি চানিত্যানি)। [হে পুরমথন! তৈঃ (প্রকারৈঃ, কারণৈর্বা) অহং বিস্মিতঃ ইব]। অতঃ ত্বাং স্তুবন্ ন জিহ্রেমি। খলু নন্বু (নিশ্চিতং) মুখরতা (বাচালতা) ধৃষ্টা (নির্লজ্জা) (মুখরতা এব লজ্জামপহরতি ইত্যর্থঃ)।

ভাবানুবাদ: সাংখ্য ও পতঞ্জলির মতানুসারী বৈদান্তিকগণের ভাবধারানুযায়ী জগৎ নিত্য ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের মতে জগৎ অনিত্য; আবার নৈয়ায়িকগণের মতে জগৎ নিত্য ও অনিত্য দুইই (স্থূলরূপে অনিত্য আবার পরমাণুরূপে নিত্য)। হে ত্রিপুরারি! এই জগতে সকলেই তোমার গুণমহিমাকীর্তনে বিস্মিত ও স্তম্ভিত। তাই তোমার স্তবকরণে আমি লজ্জিত নই। বাচালের লজ্জা থাকে না।

১০। তবৈশ্বর্যং যত্নাদ্ যদুপরি বিরিঞ্চির্হরিরধঃ
পরিচ্ছেত্তুং যাতাবনলমনলস্কন্দবপুষঃ।
ততো ভক্তিশ্রদ্ধাভরগুরুগৃণদ্ভ্যাং গিরিশ যৎ
স্বয়ং তস্থে তাভ্যাং তব কিমনুবৃত্তির্ন ফলতি॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা: হে গিরিশ! উপরি বিরিঞ্চিঃ হরিঃ অধঃ যত্নাৎ অনলস্কন্দবপুষঃ তব ঐশ্বর্যং পরিচ্ছেত্তুং যাতৌ অনলং (ন অলং) (ন পরিচ্ছেত্তুং সমর্থঃ ইত্যর্থঃ)। ততঃ ভক্তিশ্রদ্ধা-ভরগুরুগৃণদ্ভ্যাং (ভক্তিশ্চ শ্রদ্ধা চ তয়োঃ ভরঃ অতিশয়ঃ) তেন গুরু (শ্রেষ্ঠং; নিরতিশয়ং) যথা তথা গৃণদ্ভ্যাং (স্তুবদ্ভ্যাং) তাভ্যাং সহ স্বয়ং তস্থে (প্রকাশয়তি স্ম)। তব অনুবৃত্তিঃ কিং ন ফলতি? (অপি তু ফলত্যেবেত্যর্থঃ)।

ভাবানুবাদ: অগ্নিপিণ্ড বপুবিশিষ্ট তোমার দেহের পরিমাপ করিতে সচেষ্ট হইয়াও ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু তোমার মহিমার ইয়ত্তা করিতে সক্ষম হন নাই। অনন্তর তাহাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার গুরুত্বের প্রাধান্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে তুমি তাঁহাদের সহিত একত্র অবস্থান করিয়াছিলে। তোমার অনুগমন করিলে কি ফল লাভ না হয়?

১১। অযত্নাদাপাদ্য ত্রিভুবনমবৈরব্যতিকরং
দশাস্যো যদ্বাহূনভৃত রণকণ্ডূপরবশান্।
শিরঃপদ্মশ্রেণীরচিত চরণাম্ভোরুহবলেঃ
স্থিরায়াস্ত্বদ্ভক্তেস্ত্রিপুরহর বিস্ফূর্জিতমিদম্॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা: হে ত্রিপুরহর! দশাস্যঃ অযত্নাৎ (অনায়াসেন) অবৈরব্যতিকরং [ন বিদ্যতে বৈরস্য (বিরোধস্য) ব্যতিকরঃ (কারণং) যত্র তৎ তথা] ত্রিভুবনম্ আপাদ্য (প্রাপ্য) যৎ রণকণ্ডূপরবশান্ [রণায় (যুদ্ধায়) কণ্ডূঃ (খর্জুরতি স্পৃহা) ইতি যাবৎ তয়া পরবশান্ (তদধীনান্)] বাহূন্ অভৃত (ধৃতবান্)।

শিরঃপদ্মশ্রেণীমরচিত-চরণাম্ভোরুহবলেঃ [শিরাংস্যেব পদ্মানি তেষাং শ্রেণী (পংক্তিঃ) তয়া রচিতঃ (কল্পিতঃ) চরণাম্ভোরুহয়োঃ (পাদপদ্ময়োঃ) বলিঃ (উপহারঃ) যস্যাং সা তথা] (রাবণেন হি নবভিঃ শিরোভিঃ স্বহস্তকৃত্তৈঃ শম্ভোরুপহারঃ কৃতঃ ইতি পুরাণপ্রসিদ্ধম্) তব স্থিরায়াঃ (নিশ্চলায়াঃ) ভক্তেঃ ইদং বিস্ফূর্জিতম্ (প্রভাবোঽয়মিতি ভাবঃ)।

ভাবানুবাদ : ত্রিভুবন অনায়াসে শত্রুবিহীন করিয়াও দশানন রাবণের বাহুতে সমরকণ্ডূয়ন স্পৃহা বিদ্যমান ছিল। দশানন তাহার দশমস্তক-রূপ-পদ্মশ্রেণী তোমার চরণে পূজোপহাররূপে অর্পণ করায় তোমার প্রতি তাহার ভক্তির পরাকাষ্ঠাই দেখানো হইয়াছিল, অর্থাৎ রাবণ নিজমস্তকশ্রেণীরূপ পদ্ম তোমার চরণকমলে উপহার দিয়া যে-ভক্তি প্রকাশ করিয়াছিল সেই নিশ্চলা ভক্তিপ্রভাবেই ত্রিভুবনকে শত্রুহীন রূপে জয় করিয়াও তাহার বাহুসকল যুদ্ধসামর্থ্যহীন হয় নাই।

১২। অমুষ্য ত্বৎসেবাসমধিগতসারং ভুজবনং
বলাৎ কৈলাসেঽপি ত্বদধিবসতৌ বিক্রময়তঃ।
অলভ্যা পাতালেঽপ্যলসচালিতাঙ্গুষ্ঠশিরসি
প্রতিষ্ঠা ত্বয্যাসীদ্ ধ্রুবমুপচিতো মুহ্যতি খলঃ॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : ত্বৎসেবাসমাধিগত সারং ভুজবনং (ত্বৎসেবাপ্রাপ্তাধিক বাহুবলং) ত্বদধিবসতৌ কৈলাসেঽপি বলাৎ বিক্রময়তঃ (বিক্রমং প্রকাশয়তঃ) ত্বয়ি অলসচালিতাঙ্গুষ্ঠ-শিরসি (সতি) (ত্বয়ি অলসভাবেন স্বীয় অঙ্গুষ্ঠাগ্রভাগঃ চালিতকৃতে সতি) পাতালেঽপি অমুষ্য অলভ্যা প্রতিষ্ঠা (অসম্ভবাবস্থানম্) আসীৎ। খলঃ উপচিতঃ (সমৃদ্ধিলাভযুক্তঃ) ধ্রুবং মুহ্যতি (পূর্বকথাবিস্মৃতো ভবতি)।

(ভগবৎপ্রসাদাসাদিতবলেন রাবণেন স্ববল-পরীক্ষার্থং ভগবন্নিবাসস্যাপি কৈলাসস্য উৎপাটনম্ আরব্ধম্। ততশ্চ পার্বত্যা ভীতয়া প্রার্থিতো ভগবান্ কৈলাসস্য অধোগমনার্থম্ অঙ্গুষ্ঠমাত্রং শনৈর্ব্যাপারয়ামাস। তাবন্মাত্রেণৈব ক্ষীণবলো রাবণঃ পাতালং প্রবিবেশ, পুনশ্চ ভগবতা করুণয়া সমুদ্ধৃত ইতি পৌরাণিকী বার্তা।)

ভাবানুবাদ : শিবসেবাপরায়ণ অধিক বলে বলীয়ান্ রাবণ তোমার স্বীয় বাসভূমি কৈলাসে গমন করিয়া তোমার কৈলাসকেই বিক্রমদ্বারা স্বদেশে আনয়ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলে তুমি স্বীয় অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা তাহাকে পাতালে প্রেরণ করিয়া সেই স্থানে যে প্রতিষ্ঠা তাহার পাওয়া উচিত নয় সেই প্রতিষ্ঠা তাহাকে প্রদান করিয়াছিলে। খলকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করিলে সে চিরতরে মুগ্ধ হইয়া কৃতোপকার বিস্মৃত হয়।

১৩। যদৃদ্ধিং সুত্রাম্ণো বরদ পরমোচ্চৈরপি সতী-
মধশ্চক্রে বাণং পরিজনবিধেয় ত্রিভুবনঃ।
ন তচ্চিত্রং তস্মিন্ বরিবসিতরি ত্বচ্চরণয়ো-
র্ন কস্যাপ্যুন্নত্যৈ ভবতি শিরসস্ত্বয্যবনতিঃ॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : পরিজনবিধেয়ত্রিভুবনঃ (দাসবৎ মন্যমানঃ ত্রিভুবনজনঃ) বাণঃ, সুত্রাম্ণঃ (ইন্দ্রস্য) পরমোচ্চৈরপি সতীম্ ঋদ্ধিং (সম্পত্তিম্) যৎ অধশ্চক্রে (অবনতিং চক্রে) (ন্যক্কৃতবান) তৎ ত্বচ্চরণয়োঃ বরিবসিতরি (নমস্কর্তরি) তস্মিন্ ন চিত্রম্। ত্বয়ি শিরসঃ অবনতিঃ কস্য অপি উন্নত্যৈ ন ভবতি ?

ভাবানুবাদ : তোমার পদসেবার ফলে ত্রিভুবন-বিজয়ী বাণ যে ইন্দ্রের ঐশ্বর্যকেও হীন করিয়াছিল ইহা তাহার পক্ষে মোটেই আশ্চর্য-জনক হয় নাই; কারণ, তোমাতে অবনতশির মানবের যে কোন প্রকার উন্নতি করা সম্ভবপর নহে কি ?

১৪। অকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-ক্ষয়চকিত-দেবাসুরকৃপা-
বিধেয়স্যাসীদ্ যস্ত্রিনয়ন বিষং সংহৃতবতঃ।

স কল্মাষঃ কণ্ঠে তব ন কুরুতে ন শ্রিয়মহো
বিকারোঽপি শ্লাঘ্যো ভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনঃ॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : হে ত্রিনয়ন ! অকাণ্ডে (অসময়ে) ব্রহ্মাণ্ড-ক্ষয়চকিত-দেবাসুরকৃপাবিধেয়স্য (মহা-প্রলয়ভীত দেবাসুর দয়া বশ্যস্য) [অসময়ে মহা-প্রলয়ো বিষোর্মিবেগাৎ সম্ভাবিতঃ তস্মাৎ চকিতা ভীতা দেবাসুরা ইন্দ্রবলি প্রভৃতয়স্তেষু কৃপা (দয়া) তয়া বিধেয়স্য (বশ্যস্য)। অন্যস্য এতৎপানে সামর্থ্যং নাস্তীতি বিশ্বত্রাণায় বিষং স্বয়মেব পীত-বানিত্যর্থঃ] বিষং সংহৃতবতঃ (নীতবতঃ) তব কণ্ঠে যঃ কল্মাষ আসীৎ স তব শ্রিয়ং ন কুরুতে ন। অহো ! ভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনঃ [ভুবনস্য (লোকস্য) ভয়ঃ (ত্রাসঃ) তস্য ভঙ্গঃ (বিনাশঃ) স এব ব্যসনম্ অস্য অস্তীতি তস্য] বিকারোঽপি শ্লাঘ্যঃ (ভূষণম্) জগদুপকৃতিকৃতং দূষণমপি ভূষণমিতি ভাবঃ) (সর্বমন্যদ্বিহায় ক্রিয়মাণত্বাৎ ব্যসনম্)।

ভাবানুবাদ : সমুদ্রমন্থন সময়ে বিষ উত্থিত হইলে সকল দেবতা ও অসুরগণ জগতের ধ্বংসা-শঙ্কা করিয়াছিলেন। হে ত্রিনয়ন ! তুমি তাঁহাদিগকে সেই বিষ পান করিয়া আশ্বস্ত করিয়াছিলে। সেই বিষভক্ষণ চিহ্ন, তোমার কণ্ঠ-সৌন্দর্য বর্ধন করে নাই এমন নহে। ত্রিভুবন ধ্বংস হইবার ভয়ে তুমি বিষভক্ষণ করিয়া বিকারগ্রস্ত হইলেও ইহা তোমার পক্ষে শ্লাঘার বিষয়ই বলিতে হইবে।

১৫। অসিদ্ধার্থা নৈব ক্বচিদপি সদেবাসুরনরে
নিবর্তন্তে নিত্যং জগতি জয়িনো যস্য বিশিখাঃ।
স পশ্যন্নীশ ত্বামিতরসুরসাধারণমভূৎ
স্মরঃ স্মর্তব্যাত্মা ন হি বশিষু পথ্যঃ পরিভবঃ॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : সদেবাসুরনরে জগতি নিত্যং জয়িনো যস্য বিশিখাঃ (বাণাঃ) ক্বচিদপি নৈব অসিদ্ধার্থা নিবর্তন্তে স স্মরঃ ইতরসুর সাধারণং ত্বাং পশ্যন (স্মরঃ অমন্যত যৎ অন্যে দেবা মম জয্যাস্তথায়মপি ইতি ইতরদেবতুল্যং ত্বাং পশ্যন্) স্মর্তব্যাত্মা (স্মর্তব্যঃ স্মরণীয়ঃ আত্মা শরীরং যস্য স তথা নষ্টঃ ইত্যর্থঃ) (অনঙ্গঃ) অভূৎ বশিষু (জিতেন্দ্রিয়েষু) পরিভবঃ (তিরস্কারঃ) পথ্যঃ নহি (হিতো নভবতি, স্বনানাশায়ৈব সম্পদ্যতে ইতি যাবৎ)

ভাবানুবাদ : যে জয়শীল কামদেবের বাণ সকল নিত্যদেবতা অসুর ও মানবগণের মধ্যে কখনও অকৃতকার্য হইয়া নিবর্তিত হয় নাই সেই কাম, হে ঈশ ! আপনাকে অন্য সাধারণ দেবতার ন্যায় মনে করিয়া দর্শন করায় অনঙ্গ হইয়াছে। জিতেন্দ্রিয়গণের নিকট এইরূপ পরিভব হিতকর হয় না।　[ক্রমশঃ]

হেরিয়া বামন রূপ

ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর
নেতাজী ইন্‌স্টিট্যুট অব্ এশিয়ান স্টাডিজ-এর ফেলো, প্রাবন্ধিক ও কবি।

অণু হতে অণু তুমি, তুমি মহত্তম,
স্থূল-সূক্ষ্ম, হ্রস্ব-দীর্ঘ, উত্তম-অধম,—
সবার মাঝারে তুমি অভিনব সাজে।
তোমারি বিচিত্র রূপ ভুবনে বিরাজে॥
বিপুল বারিধি মাঝে, বিশাল আকাশে,
তোমার বিশাল বপু বিশেষে প্রকাশে—
নীলাচলে ত্রিবিক্রম ! ত্রিমূর্ত-বামন !
জগন্নাথরূপে বিশ্ব করিছ শাসন।
উদ্বাহু বামন আমি, ধরিবারে চাই
তোমার বিশালরূপে ;—সেই সাধ্য নাই।
(তাই), ধরিয়া বামনদেহ দারুব্রহ্ম ! রথে
আরোহণ করি' এসো নয়নের পথে।
হেরিয়া বামনরূপ জগন্নাথ স্বামি !
জিত-জন্ম-জরা-মৃত্যু পরিপূর্ণ আমি॥

বর্তমান নারীসমাজ ও শ্রীশ্রীমা

শ্রীমতী ব্রততী চন্দ
উদ্ভিদ্‌ বিজ্ঞানের শিক্ষিকা এবং সংবাদ-সাহিত্যসেবিকা।

জাতীয় সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য চিরদিনই নারী-সমাজের উপর নির্ভর করে আসছে। সমাজের রক্ষাকবচ যেন নারী। সুস্থ, সুন্দর সমাজগঠনে নারীর ভূমিকা অপরিসীম। পৃথিবীর ইতিহাসে যুদ্ধ কিংবা শান্তির জন্য নারীকেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে দায়ী করা যায়। সকল শক্তির মূল উৎস নারী।

আজকের এই বুলেট আর বারুদের গন্ধে ভরা পৃথিবীর বয়স যেন অত্যন্ত দ্রুত লয়ে বেড়ে চলেছে। ইওরোপের অনুকরণে আজ পৃথিবীতে সর্বত্র নারীসাম্য, নারীপ্রগতি, নারী-অধিকারের ব্যাপারে একটা আলোড়ন উঠেছে। এক্ষেত্রে পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবর্ষের নারীর মহনীয় আদর্শ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতের মেয়েরা আজ খানিকটা আলোর স্পর্শ পেলেও চিরকালই ছিলেন অবহেলিতা, অবাঞ্ছিতা। তাঁদের কাছ থেকে কখনই, কোন অবস্থাতেই কোন দাবী আসেনি। কেবলমাত্র এক অনাসক্ত অনুরাগই যেন ভারতীয় রমণীর অলংকার ছিল। এই কারণেই বোধ হয় তাঁরা যুগে যুগে দেশ, জাতি, পতি, পুত্র সব কিছুই পেয়ে এসেছেন। অন্যান্য দেশের নারীরা সাধারণত এতটা পাননি। দেবী সারদামণি ভারতীয় নারীত্বের এক অনুপম বিকাশ।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন অত্যন্ত বাস্তব ও লৌকিক হয়েও অপার্থিব অলৌকিক। নিতান্তই এক পল্লীগ্রামের সরল সাদাসিধা বাঙালী ব্রাহ্মণকন্যা। কিন্তু তাঁর ব্যবহারিক জীবনের একটু গভীরে গেলেই দেখা যায় মহত্ত্ব আর প্রেমের এক অসাধারণ মূর্তিকে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর একজন সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাকে লিখেছিলেন, "মাঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি; এখনও কেহই পারে নাই, ক্রমে পারবে। শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না।...মাঠাকরুন ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন। তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী ভারতে জন্মাবে।"

আজকাল নারীপ্রগতি, স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা, সমাজে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার ইত্যাদি নানা ধরনের সাম্যের ধ্বনিতে আমরা সোচ্চার। স্বাধীনতার আলো ভারতের সমগ্র নারীজাতির অন্তঃপুরে আজও আলোকপাত করতে পারেনি। আজ থেকে কুড়ি-তিরিশ বছর আগে মেয়েদের জীবন ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। গৃহের অন্তঃপুরই ছিল তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার একমাত্র জগৎ। আমাদের এই পুরুষশাসিত সমাজে স্ত্রীজাতির কোন স্বাধীনতা ছিল না। নানা ধরনের অত্যাচার, অবহেলার মধ্য দিয়ে আজকের নারীসমাজকে এগিয়ে আসতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও আত্মত্যাগ, নম্রতা, লজ্জা-শীলতার এক আশ্চর্য প্রতিমূর্তি হচ্ছে ভারতীয় নারীসমাজ। আমাদের দেশের অনেক উজ্জ্বল প্রতিভার পিছনে রয়েছে নারীর নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা, স্বার্থলেশহীন স্নেহ, ভালবাসা, সহিষ্ণুতা। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "এখনও পর্যন্ত ভারতের এই পবিত্র ভূমিতে—সীতা-সাবিত্রীর এই দেশে, নারীদের মধ্যে এমন চরিত্র, এমন সেবাপরায়ণতা, এমন স্নেহমমতা, এমন করুণা সন্তোষ ও ভক্তিভাব দেখা যায়, যাহা জগতের অন্য কোথাও দেখিতে পাই নাই।" যুগের পরিবর্তন এসেছে। আজ পুরুষের তুলনায় নারীর স্থান কোন জায়গাতেই পিছিয়ে নেই।

জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে পুরুষের পাশে নারীর অধিষ্ঠান আজ সর্বত্র। পুরুষজাতির স্ত্রীজাতির উপর প্রভুত্ব করা বা কেবলমাত্র ভোগবিলাসের যন্ত্র মনে করার কোন অধিকার নেই। কারণ নর ও নারী প্রত্যেকের ভিতরই শারীরিক, মানসিক তথা আধ্যাত্মিক উন্নতি করার ক্ষমতা আছে। এজন্য উভয়েরই স্বাভাবিক উন্নতির পথ অবাধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। পুরুষের যেমন উচিত স্ত্রীজাতিকে যোগ্য মর্যাদা দেওয়া, স্ত্রীরও আমাদের ভারতীয় সনাতন ধর্মের কথা মনে রেখে পুরুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত। নারীর মূল লক্ষ্য হল পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার লাভ। পূজা করে ঊর্ধ্বে রাখা বা হেলা করে নিয়ে ফেলা কোনটাই নারীর কাম্য নয়। সমান অধিকার লাভ করা মানেই সর্বাংশে সমরূপতা নয়। প্রকৃতির নিয়মে পুরুষ ও নারীর দৈহিক তথা মানসিক গঠনগত পার্থক্যকে অস্বীকার করা যায় না। নারী যদি প্রকৃতির এই নিয়মের বিরুদ্ধাচারণ করে তবে সমাজশৃঙ্খলার কাঠামো ভেঙে পড়বেই। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "পাশ্চাত্ত্যে নারীদিগকে প্রায়ই নারী বলিয়া মনে হইত না, মনে হইত তাহারা যেন পুরুষের নকল মাত্র।"

বর্তমান কালে আমাদের সমাজের অভ্যন্তরে এক অদ্ভুত অস্থিরতা এসেছে। নারীরা পুরুষের আচরণ অনুকরণ এবং সমাজজীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতার দ্বারা প্রমাণ করতে চায় পুরুষ নারী সমান পর্যায়ভুক্ত। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য, আজকের যুগে কেবলমাত্র মেয়ে বলে কোন জায়গাতেই তেমন বাড়তি সুযোগ আমরা পাই না। কিন্তু তবুও বর্তমানে এক শ্রেণীর শিক্ষিতা নারীর মধ্যে অদ্ভুত আচরণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বিদেশ থেকে ধার-করা কিছু নয়। সাম্যবাদের বাণী তাঁরা ভারতের নারীদের মধ্যে প্রচারের চেষ্টা করছেন। ভারতের নারীসমাজের এক অংশে খানিকটা বিপরীত সুর বাজতে আরম্ভ করেছে। পুরুষের সমপর্যায় হতে গিয়ে ভারতীয় নারীর চিরকালীন আবরণ উন্মুক্ত হতে চলেছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আধুনিক শিক্ষিতা, সংস্কৃতিসম্পন্না, প্রগতিশালিনী মহিলারাও পণ, যৌতুক না দেবার জন্য অপর মহিলাকে নির্যাতন করতে অথবা তাতে সমর্থন জানাতে দ্বিধা বোধ করছেন না। তাই আজ সংবাদপত্র খুললেই বিজ্ঞানের কোন অভিনব আবিষ্কার, কোন নারীর কুমেরু পথে যাত্রার পাশেই নৃশংসভাবে গৃহবধূহত্যার খবরও যেন আমাদের চোখ সওয়া হয়ে গেছে। আরও লজ্জার কথা এই যে, প্রতিটি গৃহবধূ হত্যার পিছনেই রয়েছে অপর কোন বধূর শক্ত জোরালো হাত। অথচ এই ভারতের মাটিতেই বরং বলা চলে সংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকার মাটিতে, স্বাধীনতা, সাম্য আর মৈত্রীর প্রতীক ছিলেন শ্রীশ্রীমা সারদা। তাঁর অপরিসীম ভালবাসার কাছে জাতি, ধর্ম বা বর্ণ কোন বাধাই ছিল না। তাঁর আবির্ভাব কালে ভারত ছিল সামাজিক সঙ্কীর্ণ গোঁড়ামির আখড়া বিশেষ। তাঁর জীবনে আড়ম্বর ছিল না কিন্তু ছিল তপস্যার ঐশ্বর্য। সে জীবনে স্কুল-কলেজের ছাপ ছিল না কিন্তু ছিল বিদ্যা। কোন ভোগসুখ ছিল না, ছিল কেবল গভীর প্রেম।

আজকের নারীসমাজের এক অংশ বিদেশী ধারার অনুকরণে সজ্জিত, পরিমার্জিত কিন্তু তাদের অন্তরে প্রাচীন কুসংস্কারের হাওয়া এখনও বইছে। ভারতীয় রমণীর শ্রেষ্ঠ অলংকার লজ্জা, মাতৃস্নেহ, আত্মত্যাগ সব যেন কেমন ম্লান হয়ে আসছে। বর্তমান সমাজব্যবস্থা আমাদের করে তুলছে পুরুষের প্রতিযোগিনী। নিজের বৃত্তে ঘুরপাক খেতে খেতে দূরদৃষ্টি বোধ হয় কমে আসছে আমাদের। আজকের মায়ের দায়িত্ব

কেবলমাত্র তার সন্তান-সন্ততিকে গর্ভধারণ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। আর আজ থেকে কত বছর আগে জনৈকা সন্তান শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি কি রকম মা?" মা বলেছিলেন, "আমি সত্যি মা। গুরুপত্নী নয়, পাতান মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্যি জননী।"

কেবলমাত্র পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণেই সংস্কার-মুক্ত হওয়া যায় না। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা ও আদর্শের সঙ্গে আমাদের ভারতীয় সনাতন আদর্শের মিলনই হল প্রকৃত আধুনিকতা। শ্রীশ্রীমা ছিলেন প্রাচ্য আর পাশ্চাত্ত্যের সেতুবন্ধক। তার জলন্ত প্রমাণ যেন ভগিনী নিবেদিতা। সাত-সমুদ্র-তেরনদী পারের এই আইরিশ কন্যাকে মা যেমন করে আদরের সঙ্গে বুকে টেনে নিয়েছিলেন, তেমনটি আর হয় না। নিবেদিতার লেখা থেকে সেকথা জানা যায়। একবার মা নিবেদিতাকে খ্রীষ্টীয় বিয়ের প্রণালী বর্ণনা করতে বলছিলেন। নিবেদিতা কখন পাদরী, কখন বরবধূর ভূমিকায় অভিনয় করে দেখাচ্ছিলেন। তারপর যখন বললেন, "ভালয়-মন্দে, সুখে-দুঃখে রোগে-স্বাস্থ্যে আমরা উভয়েই মিলিত থাকব, যতদিন না মৃত্যু এসে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়।" একথায় সকলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন কিন্তু মা বললেন, "আহা কি ধর্মভাবে ভরা কথা—কত সুন্দর কত সত্য।" শান্ত, ধীর মূর্তি ভারতীয় নারীর অতুলনীয় রূপ। শ্রীশ্রীমা ছিলেন ভালবাসায় পরিপূর্ণ মা, ভগিনী নিবেদিতা তাঁর আদরিণী মাকে লিখেছিলেন, "...মাগো, তুমি ভালবাসায় পরিপূর্ণ। আর তাতে নেই আমাদের বা জগতের ভালবাসার মতো উত্তেজনা ও উগ্রতা। তোমার ভালবাসা হচ্ছে একটি সুস্নিগ্ধ শান্তি যা প্রত্যেককে দেয় কল্যাণস্পর্শ; ও যেন বিলাস-বিচিত্র একটি স্বর্ণদীপ্তি।..."

জীবনের আধ্যাত্মিক আদর্শ ভবিষ্যৎ কালের নারীমনে সঞ্চারিত হলে তবেই ভারতবর্ষের নারীমুক্তি আন্দোলন সার্থক হবে। বর্তমানের ক্লান্ত, অবসাদময় নারীদের সামনে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনাদর্শই এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বহু বছর আগে থেকেই যিনি নারীপ্রগতি তথা সাম্যবাদের প্রদীপ হাতে দাঁড়িয়ে আছেন—তিনি আমাদের যুগ-যুগান্তের মা।

আজকের নারীসমাজের এই সাময়িক অস্থিরতা অবশ্যই থাকবে না। পরস্পরের মধ্যে ভেদাভেদ, দ্বন্দ্ব সরে গিয়ে সামঞ্জস্য, মৈত্রী নিশ্চয়ই আসবে। যে-দেশের মাটি শ্রীশ্রীমার ভাব-ভালবাসা আর স্নেহে সিক্ত, সে-দেশের নারীজাতির অভাব কোথায়? স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "পুনর্বার দ্বার খুলিয়া গিয়াছে। সকলে জ্যোতির রাজ্যে প্রবেশ কর।" এই বাণীকে স্মরণে রেখে শ্রীশ্রীমার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আজকের নারীসমাজকে এগিয়ে চলতে হবে অনেক কষ্টে পাওয়া স্বাধীনতার পিছনে রয়েছে বহু নারীর আত্মত্যাগ। আজ আমরা আলোর কাছাকাছি। আমাদের সনাতন আদর্শকে ধুয়ে মুছে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারাকে অনুকরণ করলে সমাজ-শৃঙ্খলার বাঁধন আলগা হয়ে যাবে। শ্রীশ্রীমায়ের প্রশান্ত ব্যক্তিত্ব, মহাসমুদ্রের মতো স্থির অন্তর আমাদের বর্তমান নারীসমাজের একমাত্র আদর্শ হোক তবেই নারী আন্দোলন সার্থক হবে। ভারতীয় রমণীর কথাবার্তা ও আচরণে নম্রতা, লজ্জা, মৃদুতা ও সংযম যাতে প্রকাশ পায় শ্রীশ্রীমা তাই চাইতেন। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনাদর্শই হোক আমাদের চলার পথের আলোকবর্তিকা।

প্যারিস পেরিয়ে

ডক্টর অমিয়কুমার হাটি

[বৈশাখ, ১৩৯২ সংখ্যার পর]

দিনের আলো তখন ধরতে গেলে একেবারেই কমে এসেছে। গ্রেট্‌জ-এ ট্রেনটা থামল। নামল গুটি চারেক লোক। আমার পাশের কামরা থেকে নামল এক তরুণ। আলাপ করতে করতে এগুলাম। পিটার তার নাম। পোলস্ক। প্যারিসে একটা বই-এর দোকানে কাজ করে। ডেলি প্যাসেঞ্জার। ভাঙা ভাঙা ইংরেজী বলে। বাঁচোয়া। শুধুলাম, "রোমাঁ রোলাঁ রোড কোথায়?" "জানি না।"

গ্রেট্‌জ-এ রোমাঁ রোলাঁ রোড-এতেই রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। এখন ঐ রাস্তাটা না খুঁজে পেলে কীভাবে পৌঁছই? এতদূরে আসাই কি তবে বৃথা হবে? একটা ছোট সরু ওভারব্রিজ দিয়ে স্টেশনের চৌহদ্দি পেরিয়ে এলাম। পিটার ছাড়া লোকজন কোথাও কিছু নেই। মানে, রাস্তাটা কোথায় জানতে গেলে বাড়ি থেকে লোক ডেকে জানতে হবে।

বুঝতে পেরেছে পিটারও। কিন্তু কী করা? পিটারকে মরিয়া হয়েই শুধাই, "রামকৃষ্ণ মিশন (আসলে কেন্দ্রটির নাম সেণ্টার বেদান্তিক রামকৃষ্ণ —Centre Vedantique Ramakrishna) চেন কি?"—"হ্যাঁ হ্যাঁ চিনি বইকি, আমাদের বাড়ির কাছেই তো! তুমি ওখানেই যেতে চাইছ বুঝি?"—"তা নয়তো কি!" এবার আনন্দ আমার চোখে-মুখে। মনে।

সন্ধ্যানামা নির্জন পথ ধরে ও আমাকে নিয়ে চলল। একবার আমার হাত থেকে বাক্সটা নিতে চাইল। ভারী। অসুবিধাই হচ্ছে একটু হাঁটতে। স্টেশন থেকে ২।৩ কিলোমিটার দূর হবে বোধ হয়। ওকে ধন্যবাদ জানালাম, কিন্তু বইলাম নিজেই। নিজের বোঝা আর কার কাঁধে দেব? বিশাল এলাকা নিয়ে বেদান্তকেন্দ্রটি। ফটক দেখিয়ে দিল পিটার। বিদায় নিল তারপর। মা ভাববে তার। ফিরতে হবে সময়ে। পোলস্করা কি মাতৃভক্ত হয়? হয়তো ছেলেটি ছাড়া মার আর কিছু নেই! ছেলেটিরও মা ছাড়া নেই কেউ। সন্ধ্যায় ঘরে ফিরছে ছেলেটি নির্জন গ্রামের পথ দিয়ে, পায়ে হেঁটে, তার কাজ শেষ করে এসে, এবং ব্যগ্র বাড়ি যাবার জন্য—এটাকে কেমন যেন একটা কাব্যিক মুহূর্ত বলে মনে হয়েছিল। ইউরোপের উচ্ছল তরুণরা তো এত সকাল সকাল ঘরে ফেরার তাগিদটা অনুভব করে না এখন আর, বিশেষ করে রাতের মোহময়ী প্যারিস নগরী দূরে নয় যেখান থেকে পোলস্ক বলেই কি তার জীবনধারা একটু আলাদা? না ইউরোপের তরুণ সমাজ আবার নতুন করে ভাবছে—নতুন করে মূল্যায়ন করতে চাচ্ছে তাদের জীবনযাপন পদ্ধতির, যে-জীবনে একটু শান্তি থাকবে, শ্রী থাকবে, থাকবে পারিবারিক স্পর্শের জাদু? যে-জীবন জীবনমুখী!

গেট দিয়ে ঢুকলাম। ঘন আঁধার। বড় বড় গাছ উঠেছে আকাশ ফুঁড়ে। কিছু দূরে ভিতরে বড় প্রাসাদোপম অট্টালিকা। সুন্দর, ছিমছাম, সাজানো। একদিকে যেন গোরুও বাঁধা আছে, বা গোরু নিয়ে কেউ যাচ্ছে দেখলাম। আলো জ্বলছে এখানে ওখানে, কিন্তু অত দীপ্তি নেই। গাঁয়ের মতো, যেন কোন জমিদারের বাগানবাড়ি বা খামারবাড়ি। তবে, ঝিঁঝির ডাক শুনিনি।

রাত হয়ে যাবার জন্য কেমন একটু সঙ্কোচও জাগছিল। ৮টা বাজছে প্রায়। ভিতরে ঢুকলাম। কয়েকজন সাহেব আছেন। গেরুয়াবসন পরা এক বৃদ্ধ বাঙালী সন্ন্যাসীকে দেখলাম। তিনি

আমাকে শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানালেন, বিশেষ করে প্যারিস থেকে পথ চিনে এখানে আসতে পেরেছি যখন, তখন বললেন, কিছু আর আটকাবে না। স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজের চিঠিটি বের করলাম। উনি একজনের সঙ্গে পাশের ঘরে এই আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ঋতজানন্দজীর কাছে আমাকে পাঠালেন।

প্রশান্ত স্বভাবের মানুষ। একটি কমনীয়তা এবং কেমন যেন মধুর মোহ মাখা সারাটা মুখে, ফর্সা রং, উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত কোমল স্নেহ উপচে পড়া আয়ত দুটি চোখ, উন্নতনাসা, ঋজু, সতেজ চেহারা, ট্রাউজার এবং আস্তিন গোটানো সাদা শার্ট পরা। কথা বলেন ধীরে। ইংরেজী উচ্চারণ স্পষ্ট, সুরেলা, আলাপ মন ছোঁয়া, নিমেষে আপন করে নেওয়া। তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল করে তোলা। কথা বলার ভঙ্গীটি অনন্ত। প্রত্যয়-গাঢ় অথচ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ।

—"তোমার তো তেষ্টা পেয়েছে। জল খাবে?" কী করে বুঝলেন উনি? আশ্চর্য! সেই সকালে অ্যানেসিতে হোটেল থেকে বেরুবার পর জল খাইনি, কিছুই খাইনি। আর জল খাওয়া নিয়ে ভাবেও না কোন ইউরোপবাসী। অথচ আমাদের মতো গরম দেশে ঘরে কেউ এলে আগেই এক গ্লাস জল এনে দেওয়া হয়।

—"হ্যাঁ জল খাব।"

কিন্তু বলেই ভীষণ বিপদে পড়লাম। আশে-পাশে কেউ তখন আর ছিলেন না। উনি একা। নিজেই একটা কাচের গেলাস নিলেন, কল থেকে জল এনে দিলেন আমার হাতে তুলে।

এটি জল? তাঁর হাতের ছোঁওয়া অমৃত। চোখে জল এসে গেল প্রায়। অভিভূত এবং বিব্রত আমি একই সঙ্গে। এ কী করলাম? নিজে জলটুকুও নিয়ে খেতে পারলাম না!

আমার হাবভাব দেখে কৌতুক ঝলমল তাঁর চোখ। বললেন, "খিদেও তো পেয়েছে?"

একদম স্বাভাবিক হয়ে উঠেছি। একটুও অসুবিধে হল না বলতে, "হ্যাঁ। সেই সকালে হোটেল থেকে খেয়ে বেরিয়েছি। প্যারিসে গ্রেট্‌জ আসবার ট্রেন খুঁজতে গিয়ে খাবার কথা মনেই ছিল না।"

—"চল খাবে, চল।"

পায়ে পায়ে তাঁর পিছে পিছে এগিয়ে চলি, পাশের ঘরে ডাইনিং টেবিল-এ এসে বসি।

হয়তো যাঁদের খাবার কথা ছিল, সবার খাওয়া হয়ে গেছে। এদেশে রাতের খাবার সকাল সকালই খেয়ে নেয় বেশির ভাগ লোক, সন্ধ্যা না পেরুতে, এবং রাতের খাবারটাই ভাল করে খায় সময় নিয়ে। একা একা খাব, সঙ্কোচ হচ্ছিল। বললেন, "শুরু কর, এখন আর কেউ তোমার সঙ্গী হবে না। পছন্দ কর কি চিজ? ইয়েগাটো?

ইয়েগাটো—দই। ইউরোপ আমেরিকায় খুব চালু। তুলনায় সস্তাও। দুধ আর দই খেয়েই থাকা যায়। থাকেও অনেকে কয়েকদিন অন্ততঃ এদেশ থেকে প্রথম যারা যায়, ওদেশের খাওয়া যাদের পছন্দ হয় না, বা হতে সময় লাগে।

খাবার অনেক কিছুই সাজানো আছে। তবে নিরামিষ। রুটি, মাখন, দই নিলাম, আর একটা জিনিস খেতে বললেন, বিশেষ করে, সেটা হল স্কোয়াশ। বেশ বড়, সেদ্ধ, মনে হচ্ছিল শুয়িকুমড়ো সেদ্ধ করা। সব শেষে অবশ্যই চিজ। সেটা শিখে গেছি, এটাকে ফরাসীরা ডেলিকেসী ভাবে। তো, যস্মিন্ দেশে যদাচার।

খাওয়া শেষ হলে এবার কিন্তু বাসনকোসন-গুলো নিয়ে গিয়ে নিজে ধুয়ে দিলাম। জলের কলটাও জানা হয়ে গেছিল, জল খেলাম।

কিন্তু তারপরও ছাড়লেন না। শুধালেন, "ক্লান্ত তো?"

—"না-না"—বেশ জোরেই প্রতিবাদ করি।

—"সেকি", বললেন মহারাজ, "অত দূর থেকে এসেছ, হেঁটে তায় আবার। তা তোমার ছকটা কি? "কি পরিকল্পনা?"

খুলেই বললাম। ফরাসী দেশে থাকার আয়ু এবারের মতো আগামী কাল পর্যন্তই। কাল প্যারিস-এর ভিগল বিমানবন্দর থেকে লণ্ডন হয়ে নিউইয়র্কের পথে পাড়ি দেব।

—"আরে, তুমি শুধু একটা রাত কাটাতে এলে নাকি? কী আশ্চর্য!"

অনভিজ্ঞতা আর কাকে বলে! ওর ফোঁটা কপালে চড়চড় করবেই। শেষ মুহূর্তে আসা হয়েছে। সব কিছু যে সঠিক পরিকল্পনা অনুযায়ী হবে, তার সময় কোথায় ছিল? কারুর কাছে সব কিছু বিস্তারিত জেনে নেবারও অবকাশ পাওয়া যায়নি। তাই প্রায় অদেখার মতোই রাতের গ্রেট্জ-এর আশ্রম দেখেই চলে যেতে হবে! ধরতে হবে ভোরবেলার লোকাল ট্রেন —প্যারিস যাবার।

—"ভোরে যখন বেরুবে, থাকবে আঁধার। চিনতে পারবে পথ স্টেশনে যাবার?" শুধালেন স্বামী ঋতজানন্দজী।

ভাবিনি অতটা। তাইতো? আমতা আমতা করি। আসলে পথ আমার গুলিয়ে যায়। বারবার একটা রাস্তায় চলা-হাঁটা না করলে সড়গড় হয় না। সন্ধ্যায় আজ কিছু না ভেবেই, দিকচিহ্ন না রেখেই শুধু পিটারের পিছে পিছে এসেছি। নির্ঘাত একা একা ভোরে স্টেশন পেঁৗছুতে পারব না। অন্ততঃ ঠিক সময়ে।

—"ভেব না। ঘুমোও ভাল করে। ৬টায় বেরুলেই চলবে। আমি তোমাকে পৌঁছে দেব।" অভয় দিলেন যেন, আমার অসহায় অবস্থা বুঝে।

আবার মরমে মরে গেলাম। অত ভোরে উনি কেন এ কষ্ট করবেন? বললাম, "অন্য কেউ একজন যদি যান আমার সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত, তাহলেই তো হবে।"

—"না-না, ও নিয়ে তুমি চিন্তা করো না। আর হ্যাঁ, পাশের ঘরে এখনই স্লাইড দেখানো হবে—এক দঙ্গল আমরা গিয়েছিলাম গুয়াতেমালা"—

—"দেখব, ভাল লাগবে আমার।"

আধঘণ্টা ধরে প্রকৃতির অপরূপ লীলাভূমি পাহাড়-হ্রদ-নদী-শহর-জনপদ—স্থানীয় অধিবাসী সহ গুয়াতেমালার স্লাইড দেখলাম। ভালই লাগল। মহারাজ মাঝে মাঝে বর্ণনা দিচ্ছিলেন, বা স্মৃতিতে রোমন্থন করছিলেন ২।১টা কথায় ঐ ভ্রমণের। ছবি দেখানো শেষ হলে একজনকে ডাকলেন।

ফরাসী সাহেব। তরুণ। ব্রহ্মচারী। মুখে দাড়ি।

—"ডঃ হাটিকে ওনার ঘরে নিয়ে যাও।"

স্বল্পভাষী। বিনম্র স্বভাব। ইংরেজী ভাল বলেন। যেন ফরাসী নয়, কোন ভারতীয় যুবকের সঙ্গে কথা বলছি। মাঠে আলো আঁধারি। আঁধারটাই বেশি। গ্যারেজ দেখালেন। একটা সুদৃশ্য মোটর গাড়ি আছে। এই গাড়িতেই কাল ভোরে স্টেশন যাব। গ্যারেজটা পেরিয়েই ছোট, কুঠিয়া যেন। ভিতরটা খুব আরামপ্রদ। ঘরটা ছোট হলেও আধুনিক সব ব্যবস্থা। যাকে বলে একটা খাটে দুগ্ধ ফেননিভ শয্যা। দরকার হলে ঘর গরম করার সরঞ্জাম। আয়না। লাগোয়া বাথরুম। সুরুচির ছাপ সর্বত্র। যেন ক্লাসিক কোন ফরাসী শিল্পীর আঁকা।

আসলে মনের আশ মেটানো যাকে বলে, সেটা বোধ হয় কখনই, কারুরই, কোন ব্যাপারেই হয় না, অন্ততঃ জাগতিক দিক দিয়ে, এবং আমরা তো জাগতিক জীবই!

কথাটা তুললাম এইজন্যই যে বড় একটা ধাক্কা খেলাম এই রাতে, ফরাসী সেই ব্রহ্মচারী যুবকের কাছ থেকে, ভারতীয় হিসাবে যার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না বলা যায়, উনি ব্রহ্মচারী জেনেও।

একদম ভাল করে খুঁটিয়ে সব কিছু কি আর দেখা হয়? বিশেষ করে ঘোড়ায় যখন জিন লাগানোই রয়েছে? আমার সাধ ছিল আইফেল টাওয়ারটা আরেকবার ভাল করে দেখার। তবে, ওনার কাছে যা শুনলাম এবং বুঝলাম, তাতে এবার অন্ততঃ সে সাধ পূরণের কোন আশা নেই, কারণ, তাহলে কাল বিমান ফেল করতে হবে। তাই আপসোস আর হা-হুতাশ করেছি হয়তো ২।১ কথায় ওনার কাছে। ফরাসী সেবক তাই শুনে আমাকে প্রবোধ দেবার শেষে বললেন, "God is more than monuments".

কথাটি আমার মর্মমূলে আঘাত করল। এবং এটার ব্যঞ্জনা হয়তো আরও সুদূরপ্রসারী। অন্ততঃ আমার তখন তাই মনে হয়েছিল। স্মৃতি-স্তম্ভ, স্তূপ, স্থাপত্য এসব নিশ্চয়ই গৌরবময়, এসব দিয়ে হয়তো ভৌগোলিক সীমারেখা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে, কিন্তু তার থেকেও বড় মানুষ এবং মানুষের অন্তরের ভগবান। এই উপলব্ধি জাগছিল বিশেষ করে সেই দেশে দাঁড়িয়ে, যেখানে বিশ্ববিপ্লবের বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের সেই দিনগুলি হঠাৎ ঝলমলিয়ে উঠল। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার জয়ধ্বনি শুনতে পেলাম সারা বিশ্ব জুড়ে।

কথাটা পরেও অনেক—অনেকবার ভেবেছি। অনেকরকমভাবে প্রতিভাত হয়েছে। একজন ইউরোপবাসীর কাছ থেকে বিশেষ করে আধুনিক এক ফরাসী যুবকের মুখ হতে এ-ধরনের উক্তি শোনা অভ্যস্ত নিয়মের ব্যতিক্রম। ভোগের চরম সীমা ইউরোপ কি পেরিয়ে যাচ্ছে? নানা-ভাবে তার প্রকাশ—উচ্ছৃঙ্খলতা, নেশার ওষুধ, হিপিসভ্যতা ইত্যাদি ইত্যাদি। এরই পাশাপাশি ফুটে উঠছে পিটারের মাতৃভক্ত মুখখানি সময়ে ঘরে ফেরার জন্য যে ব্যস্ত, ভাসছে ফরাসী সেবকের শান্ত মুখচ্ছবি। এরি পাশে দেখি ইউরোপের সেই তরুণ বিজ্ঞানী যে মদ স্পর্শ করে না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই কটা ছবি কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে?

ভাবনার রেশ জাগিয়ে সেবক বিনম্র নমস্কারে বিদায় নিলেন। আমি কিন্তু হাত আধখানা এগিয়ে দিয়েছিলাম করমর্দনের জন্য!

দেশে ফিরে এসে কথাটা আরও মাঝে মাঝে মনে পড়ে এইজন্য যে, মাঝে শুনেছিলাম, নীলামে চড়ানো হবে আইফেল টাওয়ারকে, তার টনটন লোহালক্কর সব বিক্রি হয়ে যাবে এইভাবে।

সৌধ বিলীন হয়ে যেতেই পারে কোন না কোন দিন, কালের করাল প্রভাবে। মানুষ? মানুষ চিরযুবা। চিরজীবী।

৮

ভোর ৬টার অনেক আগেই ঘুম ভেঙে গেছিল। তৈরি হয়ে নিয়েছিলাম পুরোপুরি। বেরুবার জন্য প্রস্তুত একেবারে। তখনও আঁধার। আমাদের দেশের ভোরের সঙ্গে বোধ হয় কিছু তফাত আছে। অতশত পাখির কূজন কোথায় এখানে? আঁধারটা বেশ পুরুই। চাঁদ আছে আকাশে। এই পরিবেশেই ৬টা বাজার আগে একবার ঘুরে এলাম এপাশ ওপাশ। বিরাট অবয়ব নিয়ে আবছায়াতে বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে বিশাল একটা বাগান—মনে হল। আচ্ছা, স্বপ্ন দেখছি না তো? স্বপ্নই হোক, বা বাস্তবই হোক, অতৃপ্তি থেকে গেল ঠিকমত না দেখার জন্য।

ঘরে ফিরে এলাম। অপেক্ষা করলাম একটু। ৬টা যে বাজছে! ঠিক ৬টা। ভেবেছিলাম,

কেউ হয়তো ডাকতে আসবে! ওকি! ওদিকে গ্যারেজের বাইরে গাড়িতে আলো জ্বলছে। এখন ৬টা ৫ মিনিট!

আমারই বোঝার ভুল হয়েছিল। তাড়াতাড়ি মোটঘাট নিয়ে গ্যারেজের কাছে ছুটে এলাম। পিছন দিকের ক্যারিয়ারের ডালা খুলে দিলেন মহারাজ, একটা মোট নিজে উঠাতে চাইলেন।

লজ্জার উপরে লজ্জা! বলি, "মাপ করবেন মহারাজ, ৫ মিনিট দেরি করে ফেলেছি

—"না-না তুমি তো অনেক আগেই উঠেছ। উঠে এস গাড়িতে।"

সামনের আসনে, ওনার পাশে বসলাম। মোটর গাড়িতে, এখানে উঠলে নিয়ম, চালক একটা বেল্ট দিয়ে নিজেকে আটকাবেন, গাড়ি চালাবার আগে। কানাডায় দেখেছি, সামনের আসনে যে দুজন বসবে, দুজনকেই বেল্ট পরতে হবে। এখানে মহারাজ বেল্ট পরলেন, আমি পরলাম না। [ক্রমশঃ]

প্রার্থনায়

অধ্যাপিকা শ্রীমতী অপর্ণা রায়

ভূগোল বিভাগ, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ। সুপরিচিতা কবি।

প্রার্থনার পাখিরা কি
মেলে দেবে ডানা,
তোমার চরণ-তীর্থ
হবে না কি নির্ভয় নিশানা।
কোন পাখি চলবে কি
নিরাশার বিক্ষত ডানায়
চির প্রত্যাশায়,
বিলম্বিত যাত্রা তার
শ্রান্ত দিন, জাগ্রত নিশায়।
ভেসে যাবে বুঝি কেউ
রঙীন ডানায়
বিধুনন-আনন্দ-বিধুর,
আবেগ স্পর্শন হৃদে তার
বাজাবে উচ্ছল দ্রুত সুর।
সন্ধ্যার বন্দনা গানে
যাত্রা শুরু কার
প্রদোষ আঁধারে
ভীরু কোন পথহারা
ফিরবে কি হায়
আমার এ আকুল দুয়ারে

ক্রুর-কংস বার্তাবহ ভকত অক্রুর

শ্রীমতী মানসী বরাট
সাহিত্যসেবিকা।

অদূরে রাখিয়া রথে,
মধু-বৃন্দাবন পথে,
হরি-পাদপাদ্ম-রজে,
ভূষিতাঙ্গ, পদব্রজে
চলেছেন ভক্ত এক
কৃষ্ণগত প্রাণ।
তখন গোধূলি-বেলা
বেলা অবসান।
কৃষ্ণ-চরণ-চিহ্ন
পথ-অলঙ্কার,
অনুসারী চলে ভক্ত—
ম্লান সূর্যালোকে।
চলে না চরণ আর;
নামে দুটি চোখে
ভাব অশ্রুবান॥
তখন গোধূলি-বেলা
বেলা অবসান।
দূর কতদূর?
বিলম্ব না সহে আর,
আগ্রহ সে দুর্নিবার,
জপিছেন কৃষ্ণনাম
ক্রুর-কংস বার্তাবহ
ভকত অক্রুর॥
কোথা কৃষ্ণ শ্যামতনু,
পথ কতদূর?
নীলকান্ত-মণি জ্বলে
স্নিগ্ধ দ্যুতিময়।
অক্রুর দেখেন চাহি
পরম বিস্ময়,
সমুখে বিরাজমান
সুন্দর সুঠাম
অরূপরতন সেই
মনবিমোহন
নবঘনশ্যাম
কণ্ঠে বিলম্বিত
বনফুল মালা
অধরে মধুর হাসি
নন্দদুলাল।
শরৎ-শশাঙ্ক সম
নয়নে তাহার
করুণা-জ্যোৎস্না ঝরে
বিগলিতধার।
সাথে বলরাম
কনক-কান্তিময়
নয়নাভিরাম,
হেরি চিরভকতবৎসলে,
অবিরল আঁখিজলে
চরণ পরশি ভক্ত
লুটান ভূতলে।
আজানুলম্বিত দুটি করে
তুলি, নিজ বক্ষপরে
ভক্তেরে ধরেন শ্যাম,
কৃষ্ণকিশোর
শিহরিত তনু-প্রাণ
মুখে বলে কৃষ্ণনাম,
কাঙ্ক্ষিতে লভিয়া ভক্ত
আনন্দ বিভোর।

হিন্দুমূর্তির উদ্ভব ও বিকাশ

ডক্টর বিমলকুমার দত্ত

প্রাক্তন প্রধান গ্রন্থাগারিক ও অধ্যাপক, বিশ্বভারতী ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন—"ঈশ্বর নিরাকার আবার সাকার। 'ভক্তের জন্য তিনি সাকার। যারা জ্ঞানী—অর্থাৎ জগৎকে যাদের স্বপ্নবৎ মনে হয়েছে, তাদের পক্ষে তিনি নিরাকার।

"ভক্তের পক্ষে সগুণ ব্রহ্ম। অর্থাৎ তিনি সগুণ—একজন ব্যক্তি হয়ে, রূপ হয়ে দেখা দেন।"

ভক্তের ঈশ্বর-চিন্তায় ও সাধনায় ঈশ্বরের সাকার রূপ বা মূর্তির পরিকল্পনা একান্ত সহায়ক। ভারতে অতি প্রাচীনকাল থেকে দেবদেবীর মূর্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের নানান রূপ পরিকল্পনার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান প্রবন্ধে হিন্দুমূর্তিতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনার চেষ্টা হবে।

ভারতবাসীর চিন্তা, সংস্কার ও ভাবনার প্রবহমান ধারার গতি, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায়, অসংখ্য দেবদেবীর অমূর্ত ও মূর্ত প্রকাশে। ভারতের জনগোষ্ঠী—অনার্য, আর্য, ইরানীয়, গ্রীক, শক, হূন, মঙ্গোলিয় প্রভৃতি মানবধারার একত্র সন্নিবেশ। বৈদিক সাহিত্য থেকেই দেখা যায় যে, এই সকল জনগোষ্ঠী প্রথমে বিরোধ ও পরে সমন্বয়ের মাধ্যমে এক জাতিতে পরিণত হয়ে ভারত সংস্কৃতিকে পূর্ণ ও সার্থক করেছেন। এই সকল জনগোষ্ঠীর ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারার অবদান ও অভিব্যক্তি মূর্তিশিল্পের মাধ্যমে লক্ষণীয়।

মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি স্থানে আবিষ্কৃত পুরাতত্ত্ব নিদর্শনসমূহ ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতম অভিজ্ঞান। এই সভ্যতাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০। এই সকল স্থানে আবিষ্কৃত পশুপতিনাথের শিবলিঙ্গ, যোনি (শক্তির অমূর্ত প্রতীক), মাতৃকা মূর্তি প্রভৃতির বিভিন্ন নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সকল নিদর্শন ও ঋগ্বেদে উল্লিখিত "শিশ্নদেব" "মূরদেব" প্রভৃতি শব্দ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, প্রাগ্‌-আর্যযুগে ভারতীয়গণ মূর্তিপূজায় অভ্যস্ত ছিলেন। আর্যগণ বৈদিক সাহিত্যে নানান দেবদেবীর কল্পনা ও বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত এই সকল বর্ণনার ধারা অনুযায়ী কোন মূর্ত বা অমূর্ত প্রতীক বা মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায়নি। বরং বলা যায়, তাঁরা মূর্তিপূজা বা মূর্তিপূজকদের তেমন মর্যাদার চোখে দেখতেন না।

মূর্তিপূজার সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাগ্‌-ঐতিহাসিক ধারাটি খ্রীষ্টপূর্বকালের প্রারম্ভ হতে আর্যগণের মধ্যে সংক্রামিত হতে শুরু করে। তদানীন্তন সাহিত্য ও শিল্পকর্ম ইহার জীবন্ত সাক্ষ্য। এই সকল সাক্ষ্য প্রমাণের মধ্যে খ্রীষ্টপূর্বাব্দের অসংখ্য মুদ্রায় অঙ্কিত অমূর্ত প্রতীক চিহ্নাদি ও স্তম্ভগাত্রে অঙ্কিত গজলক্ষ্মীর মূর্তি, খোসুণ্ডি (চিতোর) শিলালেখ (২য় খ্রীঃ পূঃ), গুড্ডিমল্লমের (অন্ধ্র-প্রদেশ) শিবলিঙ্গ (১ম খ্রীঃ পূঃ), বেশনগরের গরুড় শীর্ষযুক্ত স্তম্ভ (২য় খ্রীঃ পূঃ), কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (৪র্থ খ্রীঃ পূঃ), পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী (৫ম খ্রীঃ পূঃ) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপরি-উক্ত ঐতিহাসিক উপকরণ থেকে বলা যায় যে, অনার্য সংস্কৃতির মূর্তিপূজার ধারাটি আর্য প্রভাবের কাল হতে কিছুদিন ক্ষীণধারায় সুপ্ত থাকার পর খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আরম্ভ থেকে আবার পূর্ণ প্রাণে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। এই সময় আর্যগণও মূর্তিপূজার ক্রমশঃ আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং অনার্য সংস্কৃতির চিন্তাধারার সঙ্গে নিজেদের ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলতে বাধ্য হন।

প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ "নির্দেশ" থেকে জানা যায় যে, ভারতীয়গণের ধর্মবিশ্বাসে হস্তী, অশ্ব, ধেনু, সারমেয়, বায়স, বাসুদেব, বলদেব, পূর্ণভদ্র, অগ্নি, নাগ, সুপর্ণ, যক্ষ, অসুর, গন্ধর্ব, চন্দ্র, সূর্য, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, দেব, দিসা প্রভৃতি দেবতাদের বিশেষ স্থান ছিল। এখানে বাসুদেব, বলদেবের সহিত ইন্দ্র, ব্রহ্মা, অগ্নির নাম করা হয়েছে। এছাড়া ঐ একই গোত্রে হস্তী, অশ্ব, ধেনু, নাগ, অসুর, গন্ধর্ব প্রভৃতি অনার্য দেবতাদেরও নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আর্যসংস্কৃতি প্রসারের ফলে অনার্য দেবতারা ক্রমশঃ হীনবল হয়ে পড়েন, কিন্তু পরবর্তী কালে ঐ সকল অনার্য দেবতাদের অনেকগুলিই আর্য-অনার্যসংস্কৃতির সমন্বয়ের ফলে আর্য দেবতাদের বাহনরূপে (যথা—সূর্যের বাহন অশ্ব, ইন্দ্রের বাহন হস্তী, বিষ্ণুর বাহন সুপর্ণ বা গরুড় ইত্যাদি) আত্মপ্রকাশ করে।

মূলতঃ ভক্তিবাদের প্রাবল্যে ভারতে মূর্তি-পূজার ব্যাপক প্রচলন হয়। যদিও বেদের কোন কোন সূক্তে মধুরভাবের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তথাপি সুচিন্তিতভাবে উপনিষদের কাল হতে ভক্তিবাদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের (৬।১৮) "শরণমহং প্রপদ্যে" প্রভৃতি শ্লোক থেকে আত্মসমর্পণের ভাবটি পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। এইভাবে এক-এক দেবতাকে অবলম্বন করে, মূর্তিপূজার প্রকাশ ব্যপকতর হতে থাকে। মূর্তিপূজা প্রথম স্তরে অমূর্ত প্রতীক ও পরে মূর্ত প্রতীককে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। যদিও খ্রীষ্টাব্দের অনতিকাল পূর্ব হতে মূর্তিপূজার ধারাটির গতিবেগ শুরু হয়, তথাপি এই গতিবেগের চাঞ্চল্য ও উচ্ছ্বাস গুপ্তযুগ হতে (৩২০ খ্রীঃ) বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

কালের ধারার সঙ্গে মানুষের যেমন ভাবধারার পরিবর্তন হয় সেরূপ বিভিন্ন যুগে দেবদেবীর মূর্তির ভাব, লাবণ্য ও বহিঃপ্রকাশধারাও রূপান্তরিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে লৌকিক দেবতা—যেমন, শিব ও গণেশ অভিজাত শ্রেণীর দেবতার আসনলাভ করেছেন, আবার ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি অভিজাত শ্রেণীর দেবতা কালস্রোতে জাতিচ্যুত হয়েছেন। এর ফলে সরস্বতী ও লক্ষ্মী ব্রহ্মা ও ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করে বিষ্ণুকে পতিত্বে বরণ করেছেন। সূর্যদেব কালের যাত্রার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাঁর রথের চারটি অশ্বের বদলে সাতটি অশ্ব যুক্ত করেছেন এবং দেবী দুর্গা দ্বিভুজা হতে অষ্টভুজা ও পরে দশভুজা হয়েছেন। ভারতীয় হিন্দুমূর্তিতে এ-ধরনের নিদর্শনাদি প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতান্তর দূর করার জন্য বিষ্ণু—নরসিংহ, হরিহর, গরুড়বাহী এবং শিব—অর্ধনারীশ্বর রূপ গ্রহণ করেছেন। কোন কোন স্থলে অনার্যগোষ্ঠীর সঙ্গে অধিকতর মিলন ইচ্ছায় দেবদেবী তাঁদের বাহন বদল করেছেন। যেমন, রাজসাহীর দেবী সরস্বতী হাঁসের বদলে মেষ, হেরম্ব গণপতি ইঁদুরের বদলে সিংহকে বাহনরূপে গ্রহণ করেছেন।

বর্তমানের প্রচলিত হিন্দুধর্মধারাকে পৌরাণিক ধারা বলা যায়। এই সময় পাঁচটি সম্প্রদায় বিশেষ প্রাধান্য পান। তাঁরা হচ্ছেন বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য। জনপ্রিয়তা ও প্রাধান্য হিসাবে বিষ্ণু ও শিবকে প্রথম, শক্তিকে দ্বিতীয় এবং সূর্য ও গণপতিকে তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত করা হয়।

এই পঞ্চদেবতার অমূর্ত প্রতীকের সন্ধান পাওয়া গেছে। যেমন, বিষ্ণুর অমূর্ত প্রতীক হচ্ছে শালগ্রামশিলা, শিবের—বানলিঙ্গ, দেবীর—ধাতুখণ্ড বা স্বর্ণরেখা, সূর্যের—স্ফটিক বা সূর্যকান্ত প্রস্তর এবং গণপতির—স্বর্ণভদ্র প্রস্তর। এই পঞ্চদেবতার উপাসকবৃন্দ তাঁদের স্ব স্ব নির্দিষ্ট দেবদেবীর পূজার্চনা করতেন। আবার কখনও

তাঁরা এই পঞ্চদেবতার পূজা একসঙ্গে করতেন। যাঁরা এরূপ পূজা করতেন তাঁদের "স্মার্ত পঞ্চোপাসক" বলা হয়।

হিন্দু মাত্রেই ধর্মকার্য শুরু করার আরম্ভে "গণেশাদি পঞ্চদেবতাভ্যোঃ নমঃ" এই মন্ত্র পাঠ করে থাকেন। কিন্তু এই পঞ্চদেবতার মধ্যে সূর্য ও গণপতির প্রভাব খুবই নিষ্প্রভ।

বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ও সংস্কৃতিধারার মিলনের ফলে হিন্দুদেবদেবীর মূর্তির রূপ ও তাঁদের পূজা-পদ্ধতি যুগে যুগে রূপান্তরিত হয়ে ভারতের হিন্দুদের ভাব-মানসের ও ধর্মীয় চিন্তাধারার এক সম্পূর্ণ ইতিহাস প্রকাশ করেছে।

মুক্তির মন্ত্রঃ তুমি বিবেকানন্দ

শ্রীধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজে বাঙলার অধ্যাপক—কবি ও প্রাবন্ধিক।

উজ্জ্বল ছুরির নিচে—
আর কতকাল অপেক্ষা করবো বলো ?
মৃত্যু—ক্ষুধা, হত্যা—হিংসা, লেলিহ জিহ্বা,
পৃথিবীর সবুজ পাতায় বারুদের ঘ্রাণ
নিস্তব্ধ নীলিমা ছিঁড়ে পেঁচার চীৎকার।
আর কতকাল আমাদের অপেক্ষা বলো ?
ভারত—গোলার্ধ থেকে এখন কোথায়
তোমার উষ্ণীষ তোলে বিপ্লব-চেতনা আদিগন্ত ?
ঝলসিত মন্ত্র কোথা
উচ্চারিত কোন্ দেশে—কোন্ জনতার মাঝখানে ?
বাসের পাদানিতে আর ট্রামের হাতলে,
অন্ধকারে ডুবে যাওয়া কলকাতার রাজপথে
দেখি না তোমার মূর্তি কতকাল।
শতাব্দীর এই শেষ প্রহরে দাঁড়িয়ে
স্মৃতিভ্রষ্ট ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে
বিবেক-আনন্দ স্মৃতি তুলে নিয়ে
নতুন পৃথিবীর মহাদ্বারে দাঁড়াই যখন,
তখন হে বিবেকানন্দ! জেগে ওঠো ?
অতলান্ত গভীরতার প্লাবন নয়নে নিয়ে—
মুক্তির মন্ত্রে জাগো, কুরুক্ষেত্র বোবা-অন্ধকারে।

পথ ও পথিক

শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আনন্দ-পুরস্কারে সম্মানিত খ্যাতনামা গল্পকার, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক
আনন্দবাজার পত্রিকার সহ-সম্পাদক।

প্রতিধ্বনি

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দুরকমের বাতাসের কথা বারে বারে, নানা কথার ছলে ভক্তদের বলতেন কু-বাতাস আর সু-বাতাস প্রায়ই গাইতেন—'কু-বাতাসে দিয়ে পাড়ি হাবুডুবু খেয়ে মরি।'

পৃথিবীর এই হল নিয়ম, এই হল ধরন জীবনের ওপর দুটো প্রভাবই থাকবে। আদর্শ পৃথিবী মানুষের চিন্তায়, মানুষের কল্পনায়, মানুষের স্বপ্নে। বাস্তব অন্য জিনিস। এক জটিল জল-স্রোত। ভোগের পৃথিবী, লোভের পৃথিবী, বঞ্চনার পৃথিবী, খুনীর পৃথিবী জীবনকে গ্রাস করে বসে আছে। মেটিরিয়ালিজম ধর্ম ভোলাতে চাইছে, অনবরতই কানের কাছে পশুশক্তির জয়গান গাইছে। মানুষকে বলছে—তুমি বুদ্ধিমান জন্তু। আত্মশক্তি, সেলফ রিয়েলাইজেসানের কথা ভেব না। ওসব আদ্দিকালের অচল লোক-ঠকানো কথা। ধর্ম, ঈশ্বর এসব হল ধনীর বিলাসিতা। গরিবের ইনটক্সিকেসান। মানুষকে ভুলিয়ে রাখার ছলাকলা। নয়া মতবাদ—**Produce or Perish.**

যন্ত্রে যন্ত্রের মতো জুড়ে যাও। চাকা ঘোরাও। রাষ্ট্রের ভাণ্ডার পূর্ণ করে দাও সম্পদে। ধনী হও, ভোগী হও। মানুষ হলে কিনা সে প্রশ্ন পরে। ঈশ্বর নয় ওয়েলথ, গড নয় ডেমন, ভজ গৌরাঙ্গ নয়, জপ কাঞ্চন। **Get rich quick.** বাড়ি, গাড়ি, পঞ্চমকার আধুনিক মানুষের ভগবান।

Macbeth has murdered sleep. পশ্চিমের ধনী দেশের মানুষ জলে পুড়ে খাক হয়ে গেল। সব পেয়েও শূন্য, নিঃসঙ্গ জীবন। দেশ আছে। দেশাত্মবোধ আছে। জাতীয় অহংকার আছে। বিশাল সম্পদ আছে। বাহুবল, অস্ত্রবল আছে। এক তুড়িতে অন্য দেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষমতা আছে। নেই পরিবার। কে কার? পিল ছাড়া ঘুম আসে না। মন ভেঙে টুকরো টুকরো শত বিভক্ত ব্যক্তিত্ব মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধিতে সব জেরবার।

স্বামীজী যখন বলেছিলেন, 'খালি পেটে ধর্ম হয় না', তখন ভারত ছিল পরাধীন। অতি দরিদ্র, শোষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ভেদাভেদে শতচ্ছিন্ন, ধর্মব্যবসায়ীদের দ্বারা অপহৃত। সেই ভারতে ওই উক্তির প্রয়োজন ছিল। ধার্মিকের আলস্য পরিহার করে ফকির থেকে উজির হবার প্রয়োজন ছিল। স্বামীজী বলেছিলেন, 'ভিখারির আবার ত্যাগ কি?' আগে সব পাও, তারপর মায়ামুক্ত বৈদান্তিকের উদাসীনতায় সব লাথি মেরে ফেলে দাও।

দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা স্বামীজীকে ঠিক ঠিক বুঝিনি। আজও আমাদের আত্মবিমুগ্ধতা, অধার্মিকতা, কদাচারিতাকে ওই একটি উক্তি দিয়ে সমর্থন করে চলেছি। স্বামীজীর অজস্র উক্তি থেকে একটিকে বিচ্ছিন্ন করে এনেছি

নিজেদের অপকর্মের আচ্ছাদনী হিসেবে। শয়তানের এই তো ধর্ম। অথচ স্বামীজী যা চেয়েছিলেন তা হল :

"আমি দুনিয়া ঘুরে দেখলুম—এ দেশের মতো এত অধিক তামস প্রকৃতির লোক পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বাহিরে সাত্ত্বিকতার ভান, ভিতরে একেবারে ইট-পাটকেলের মতো জড়ত্ব—এদের দ্বারা জগতের কি কাজ হবে? এমন অকর্ম, অলস, শিশ্নোদরপরায়ণ জাত দুনিয়ায় কতদিন আর বেঁচে থাকতে পারবে? ওদেশ (পাশ্চাত্ত্য) বেড়িয়ে আগে দেখে আয়, পরে আমার ঐ কথার প্রতিবাদ করিস। তাদের জীবনে কত উদ্যম, কত কর্মতৎপরতা, কত উৎসাহ, কত রজোগুণের বিকাশ! তোদের দেশের লোকগুলোর রক্ত যেন হৃদয়ে রুদ্ধ হয়ে রয়েছে—ধমনীতে যেন আর রক্ত ছুটতে পারছে না—সর্বাঙ্গে প্যারালিসিস হয়ে যেন এলিয়ে পড়েছে! আমি তাই এদের ভিতর রজোগুণ বাড়িয়ে কর্মতৎপরতা দ্বারা এদেশের লোক-গুলোকে আগে ঐহিক জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে চাই। শরীরে বল নেই—হৃদয়ে উৎসাহ নেই, মস্তিষ্কে প্রতিভা নেই! কি হবে রে, এই জড়-পিণ্ডগুলো দ্বারা? আমি নেড়েচেড়ে ওদের ভিতর সাড়া আনতে চাই—এজন্য আমার প্রাণান্ত পণ। বেদান্তের অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাব। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—এই অভয়বাণী শোনাতেই আমার জন্ম। তোরা ঐ কার্যে আমার সহায় হ। যা গাঁয়ে গাঁয়ে, দেশে দেশে এই অভয়বাণী আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে শুনাগে। সকলকে ধরে ধরে বলগে যা—তোমরা অমিতবীর্য, অমৃতের অধিকারী। এইরূপে আগে রজঃশক্তির উদ্দীপনা কর—জীবন সংগ্রামে সকলকে উপযুক্ত কর, তারপর পরজীবনে মুক্তিলাভের কথা তাদের বল। আগে ভেতরের শক্তি জাগ্রত করে দেশের লোককে নিজের পায়ের ওপর দাঁড় করা, উত্তম অশন-বসন—উত্তম ভোগ আগে করতে শিখুক, তারপর সর্বপ্রকার ভোগের বন্ধন থেকে কি করে মুক্ত হতে পারবে, তা বলে দে।"

গাঁয়ের চেহারা, জেলা শহরের চেহারা পাল্টে গেছে। এক শ্রেণীর মানুষের হাতে প্রচুর অর্থ এসেছে। জীবনের চটক অবশ্যই খুলেছে। অর্থনীতির দুটো দিক খুলে গেছে, কালো আর সাদা। রজোগুণের বদলে বেড়েছে তমোগুণ। মানুষ আর কিছু বুঝুক না বুঝুক রাজনীতিটা বেশ ভালই বুঝেছে। আর সেই আগুনে বাতাস করছে নানা মতবাদ। আর সেই বাতাসটাই হল কু-বাতাস। এ-যুগের একটিই মাত্র মন্ত্রদীক্ষা—ভায়োলেন্স। একটিই মাত্র মন্ত্রদীক্ষা—কর্‌াপসান। জনে জনে শুধু বলা হচ্ছে—পশু হও। মারো, মরো, হিংসা বুঝে নাও।

They have sacrified you to a symbol, and you carry them to power over yourself. [Wilhelm Reich] মতবাদের হাড়িকাঠে মাথা, কথার জাদু হল খড়্গ। সম্মোহিত হয়ে সাধারণ মানুষ যাঁদের মাথায় বসিয়েছে, তাঁরা কিন্তু পাকে প্রকারে একটি কথাই বলেন—তুমি এবং তোমার জীবনের বাস্তবিকই কোনও দাম নেই। তোমার পরিবার, পরিজন, পুত্রকন্যা কিছুই না। তুমি এক মহামুর্খ, দাস-মাত্র। তোমাকে দিয়ে যা খুশি করানো যায়, যেমনভাবে খুশি ব্যবহার করা যায়। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভাঁওতা মাত্র, জাতীয় স্বাধীনতা হয় তো আছে।

This is why I am afraid of you, Little Man, deadly afraid. For on you depends the fate of humanity. [Reich] ক্ষুদ্র মানুষ, সাধারণ মানুষ, বড় ভয় হয় তোমাদের জন্যে। তোমরাই যে তোমাদের

ভাগ্যের নিয়ন্তা। তোমাদের জন্তে ভয় হয়। তোমরা কোনও কিছু থেকে পালাও না পালাও, নিজেদের কাছ থেকে আগে পালাচ্ছ। তোমরা অসুস্থ, ভীষণ অসুস্থ। তোমাদের দোষ নেই অবশ্য। কিন্তু সুস্থ হয়ে ওঠার দায়িত্ব তোমার নিজের। যারা তোমাকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছে, তাদের তোমরা যে কোনও মুহূর্তে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারো। পারো না কেন, একটিই মাত্র কারণ, তোমরা দলিত হতে ভালবাস। দলনকারীকে তোমরা সমর্থন কর। No police force in the world would be powerful enough to suppress you. সামান্ততম আত্মসম্মানবোধ থাকলে কেউ তোমাদের দাবিয়ে রাখতে পারে না। সেই গভীর উপলব্ধি যদি থাকত!—সাধারণ মানুষ ছাড়া, পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে যেতে এক ঘণ্টারও বেশি সময় লাগবে না! Did your 'liberator' tell you that? No. He called you the 'Proletarian' of the world, but he did not tell you that you, and only you are responsible for your life. [Reich] একটি কথা, আজকের সার কথা, দূরকাল থেকে ভেসে আসা স্বামীজীর সেই নির্দেশ—শিক্ষাহীন, ধর্মহীন বর্তমান অবনতিটার কথা তাদের বুঝিয়ে দিয়ে বলগে—'ভাই সব, ওঠ, জাগ। কতদিন আর ঘুমুবে?' এই কণ্ঠস্বরকে সপ্তগ্রামে তুলতে হবে, ছাপিয়ে যেতে হবে তাদের, যারা বলে—বন্ধুগণ, পশু হও, অধার্মিক ইতর হও।

আমি বলিতেছি, আমাদের এখন চাই বল, চাই বীর্য। মানুষকে সর্বদা তাহার দুর্বলতার বিষয় ভাবিতে বলা তাহার দুর্বলতার প্রতিকার নয়—তাহার শক্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়াই প্রতিকারের উপায়। আমাদের দেশের পক্ষে এখন প্রয়োজন—লৌহবৎ দৃঢ় মাংসপেশী ও ইস্পাতের মতো স্নায়ু; এমন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি চাই, কেহই যেন উহাকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ না হয়, উহা যেন ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় রহস্যভেদে সমর্থ হয়—যদি বা এই কার্যসাধনে সমুদ্রের অতল তলে যাইতে হয়, যদি বা সর্বদা সর্বপ্রকার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত থাকিতে হয়। ইহাই এখন আমাদের আবশ্যক। এই বীর্যলাভের প্রথম উপায়—উপনিষদে বিশ্বাসী হওয়া এবং বিশ্বাস করা যে 'আমি আত্মা'। উহার দ্বারা সমগ্র জগৎকে পুনরুজ্জীবিত, শক্তিমান্ ও বীর্যশালী করিতে পারা যায়। শত শত শতাব্দী যাবৎ মানুষকে তাহার হীনত্বজ্ঞাপক মতবাদসমূহ শেখানো হইয়েছে,...তাহারা এখন আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করুক—তাহারা জানুক যে, তাহাদের মধ্যে নিম্নতম ব্যক্তির হৃদয়েও আত্মা রহিয়াছেন; সেই আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই।

—স্বামী বিবেকানন্দ

নানা প্রসঙ্গে

চিরন্তন কাহিনী

স্বধর্মানুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ

পুরাকালে কৌশিক নামে এক বেদাধ্যায়ী ও ধর্মশীল ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি একদিন একটি গাছের তলায় বসে বেদপাঠ করছিলেন। ওই গাছের ডালে এক বক বসে ছিল। সে বেদাধ্যায়নরত ব্রাহ্মণের গায়ে মলত্যাগ করে। ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে গাছের ডালে বসে-থাকা বকের দিকে তাকিয়ে তার অনিষ্ট চিন্তা করেন। বকটি সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে মারা যায়। কৌশিকের তাতে একটু গর্ববোধ হল—কিছু শক্তি অর্জন হয়েছে বলে। কিন্তু বকটির নিষ্প্রাণ মৃত শরীরটি দেখে কিছু অনুশোচনাও হল। তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন: আমার সামান্য ক্রোধের ফলে একটা প্রাণী হত্যা হল! এটি আমার অকার্যই হয়েছে।

ইতিমধ্যে ভিক্ষার সময় হয়ে গেছে। তিনি তাঁর দুষ্কর্ম চিন্তা করতে করতে এক গ্রামে ভিক্ষা করতে গেলেন। এক বাড়িতে গিয়ে তিনি ভিক্ষা চাইলেন। বাড়ির ভিতর থেকে একজন স্ত্রীলোক তাঁকে একটু অপেক্ষা করতে বললেন।

স্ত্রীলোকটি তখন উচ্ছিষ্ট বাসন মাজছিলেন। এমন সময় তাঁর স্বামী ক্ষুধার্ত হয়ে বাড়িতে এলেন। তিনি সব কাজ বাদ দিয়ে স্বামিসেবা করতে লাগলেন। স্বামিসেবা করতে করতে সাধ্বী স্ত্রী বাইরে ভিক্ষার জন্য অপেক্ষারত ব্রাহ্মণের কথা ভুলে গেলেন। পতিকে যখন ভোজন পরিবেশন করছিলেন তখন সহসা দূরে দাঁড়ানো ব্রাহ্মণের দিকে চোখ পড়ে। লজ্জিতা হয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা দিতে এগিয়ে গেলেন।

এদিকে ব্রাহ্মণ ভিক্ষা পেতে দেরি হওয়াতে মনে মনে ক্রুদ্ধ ছিলেন। সাধ্বী স্ত্রীলোকটিকে দর্শনমাত্রই তিনি বলে উঠলেন: তোমার একি ব্যবহার? তোমার যদি এতই দেরি হবে, আমাকে তুমি চলে যেতে বললে না কেন?

সাধ্বী স্ত্রী: হে ব্রাহ্মণ! আমাকে ক্ষমা করুন। ক্ষুধার্ত পতিকে আমি সেবা করছিলাম। তাই দেরি হয়ে গেছে ভিক্ষা দিতে।

ব্রাহ্মণ: ব্রাহ্মণের থেকে কি পতি তোমার বেশি সমাদরের পাত্র হল? গৃহস্থ হয়ে তুমি ব্রাহ্মণকে অবমাননা করছ? তুমি কি জান না স্বয়ং ইন্দ্রও ব্রাহ্মণকে প্রণাম করেন। তুমি কিছুই জান না। তোমার উচিত কোন বৃদ্ধের কাছে উপদেশ লাভ করা। ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হলে সমস্ত পৃথিবী দগ্ধ করতে পারেন।

সাধ্বী স্ত্রী: হে তপোধন! আমি বক নই যে, আপনি আমাকে মেরে ফেলবেন। আপনার ক্রোধ আমাকে কিছুই করতে পারবে না। আপনি ক্রোধ ত্যাগ করুন। ক্রোধ ব্রাহ্মণের শোভা পায় না। বিদ্বান ব্রাহ্মণগণকে আমি দেবতুল্য শ্রদ্ধা করি, কখনও অসম্মান করি না।

হে ব্রাহ্মণ! আমি ব্রাহ্মণের তেজের কথা জানি। পতিসেবা আমার কাছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। সকল দেবতার মধ্যে আমি পতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করি। পতি, শ্বশুর-শাশুড়ি প্রভৃতি পরিবারের সকলকে নিষ্ঠাসহকারে সেবা করে আমি আপনার ক্রোধবশে বককে মেরে ফেলার কথা জানতে পেরেছি। ক্রোধ মানুষের শত্রু। যিনি ক্রোধ ও মোহকে ত্যাগ করতে পারেন তাঁকেই দেবগণ ব্রাহ্মণ বলেন। যিনি সত্যকথা বলেন, কাউকে হিংসা করেন না এবং গুরুকে সন্তুষ্ট রাখেন তাঁকে দেবগণ ব্রাহ্মণ বলেন।

হে তপোধন! আপনার এখনও ধর্ম সম্বন্ধে সূক্ষ্ম দৃষ্টিলাভ হয়নি। আপনি যদি পরম ধর্ম কি জানতে চান, মিথিলাপুরীতে ধর্মব্যাধ নামে এক মহা ধার্মিক ব্যক্তি আছেন, তাঁর কাছে যান। তিনি মাতা-পিতাকে সেবা, স্বধর্ম অনুষ্ঠান করে ও সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় হয়ে পরম ধর্মলাভ করেছেন।

সাধ্বী স্ত্রীর পরামর্শানুসারে ব্রাহ্মণ কৌশিক মিথিলাপুরীতে ধর্মব্যাধের কাছে গেলেন। গিয়ে তিনি দেখেন যে, মহাত্মা ধর্মব্যাধ কসাইখানায় হরিণ ও মহিষের মাংস বিক্রি করছে। কসাই-খানায় এত ভিড় যে কৌশিক তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলেন না, দোকানের একপাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ব্রাহ্মণের উপস্থিতি বুঝতে পেরে ধর্মব্যাধ সঙ্গে সঙ্গে কসাইখানা থেকে তাঁর কাছে গেলেন। তিনি হাতজোড় করে অতি বিনয়ের সঙ্গে বললেন: হে ভগবন্! আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনাকে যে উদ্দেশ্যে সেই পতিব্রতা নারী আমার কাছে পাঠিয়েছেন, তা আমি অবগত আছি।

ধর্মব্যাধের কথা শুনে কৌশিক বিস্মিত হলেন—কী করে ইনি আমার পূর্বের সব কথা জানলেন!

ধর্মব্যাধ বললেন: হে ব্রাহ্মণ! এই স্থান আপনার অবস্থানের যোগ্য নয়। আপনি অনুমতি করলে, আপনাকে আমার বাড়ি নিয়ে যেতে পারি—সেখানে আমাদের কথা হবে।

কৌশিক খুশি হয়ে ধর্মব্যাধের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে গেলেন। ধর্মব্যাধ তাঁকে পাদ্য-অর্ঘ্য দ্বারা পূজা করে আসনে বসতে দিলেন। তখন কৌশিক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: আচ্ছা, তোমার মতো পুণ্যাত্মা ধার্মিক কসাইয়ের কাজ করছে কেন? তোমাকে এই কাজ করতে দেখে আমি পীড়িত হয়েছি।

উত্তরে ধর্মব্যাধ বললেন: হে দ্বিজ! এই কর্ম আমার পিতা-পিতামহ সবাই করেছেন, আমিও করছি। এটি আমাদের কুলধর্ম। সেই কুলধর্মই আমি পালন করছি। অতএব এতে আপনার পীড়িত হওয়ার কোন কারণ নেই।

হে ব্রাহ্মণ! আমি অতি নিষ্ঠাসহকারে এই কুলধর্ম পালন করে দেবপূজার ন্যায় পিতা-মাতার সেবা করি। আমি সত্য কথা বলি। কাউকে হিংসা ও বিদ্বেষ করি না। কারোর কুৎসা রটনা বা আমার চেয়ে বলবান্ পুরুষের নিন্দাও করি না।

স্ব স্ব জাতিধর্ম অনুসারে প্রত্যেকের কর্ম করা উচিত। ব্রাহ্মণের ধর্ম ব্রহ্মচর্য, তপস্যা, মন্ত্রজপ ও সত্যকথন। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ধর্মানুসারে রাজ্য-শাসন করা। বৈশ্যের—কৃষি ও বাণিজ্য এবং শূদ্রের ধর্ম-সেবা।

হে ব্রাহ্মণ! আমি জীবহত্যা করি না অন্যের দ্বারা নিহত মহিষ-হরিণের মাংস আমি বিক্রি করি। আমি নিজে মাংস খাই না। সত্য কথা বলি। সংযত জীবনযাপন করি। সৎপাত্রে দান করি। যথাযোগ্য স্থানে সম্মান প্রদর্শন

করি। সকলের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করি স্বধর্ম অনুষ্ঠান করে এবং পিতা-মাতার সেবা করে আমি পরম ধর্মলাভ করেছি।

এইরূপে ধর্মব্যাধ চতুর্বর্ণের ধর্ম সম্বন্ধে সবিস্তারে ব্রাহ্মণ কৌশিককে উপদেশ প্রদান করে ধর্মের সূক্ষ্ম নীতি বর্ণনা করেন।

ব্রাহ্মণ কৌশিক পরম ধর্মের উপদেশলাভ করে ধর্মব্যাধকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সত্যিকারের ধর্মাচরণের জন্য তিনি নিজ গ্রামে ফিরে গিয়ে পিতা-মাতার সেবা-সহ সংযত জীবনযাপন করতে লাগলেন।

[মহাভারত, বনপর্ব দ্রষ্টব্য।]

স্মৃতি-সঞ্চয়ন

ভগবদ্দৃষ্টি

স্বামী মাধবানন্দজী (নির্মল মহারাজ) তখন সমগ্র রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রধান সচিব। বেলুড় মঠে মন্দিরের সম্মুখস্থ আফিস-বাড়ির দোতালায় বাঁ দিকের ঘরখানিতে তিনি থাকতেন—বাড়িটি তখন আয়তনে অনেক ছোট। খুবই সুপরিচিত একটি চিত্র: হয়তো তিনি সেই ইজি-চেয়ারখানিতে বসে চিঠিপত্র লিখছেন কিংবা কোন কাগজপত্র বা প্রুফ্ দেখছেন, পাণ্ডুলিপি সংশোধন করছেন, অথবা কোন সাধুর সঙ্গে কোন বিষয়ে কথা বলছেন বা আলোচনায় রত রয়েছেন—কিন্তু এত সব ব্যস্ততা ও কাজকর্মের মধ্যেও, দেখা যেত মাঝে মাঝেই তিনি উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছেন—ঘরের জানালার বাইরে দূরে একটা কিছু যেন তিনি নিবিষ্টচিত্তে দেখছেন!

কৌতূহলী কোন নবীন সাধু খুব সাহস করে একদিন জিজ্ঞাসা করে বসল,—তিনি কী দেখেন অমন অপলক নেত্রে একদৃষ্টিতে বাইরের দিকে। খানিক্ষণ চুপ করে থেকে মাধবানন্দজী একটু মৃদু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—"ঐ নারকেল গাছটিকে ছাখ।" জিজ্ঞাসু সেদিকে চোখ ফেরালে, নারকেল গাছের পাতাগুলি দেখিয়ে তিনি বলেছিলেন—"যেমন মৃদুমন্দ বাতাস বইছে,—তালে তালে পাতাগুলোও কখনো দুলছে ডাইনে—কখনো বাঁয়ে—আবার সামনে-পিছনে—কখনও-বা স্থির হয়েও থাকে—যেন অচঞ্চল দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর এই কারণেই ঝড়-ঝাপটাতে ওদের কিছু করতে পারে না—ওরা ভেঙে পড়ে না—অক্ষতই থাকে। আমরাও যদি অমনিভাবে সব সময়ে ঠাকুরের ইচ্ছার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারতাম!"

আর একদিনের কথা। তরুণ এক সাধু সেদিন সকালে স্বামী মাধবানন্দজীর মাথা মুণ্ডন করে দিচ্ছিল। বয়সে নবীন—তাই আত্মপ্রশংসায় উৎসাহী হয়ে মহারাজকে বলছিল—"মহারাজ, আমি কিন্তু খুব ভাল কামাতে পারি,—দক্ষ নাপিতের মতো।"

স্মিতহাস্যে মাধবানন্দ মহারাজ উত্তর দিয়েছিলেন—"মানুষকে বা অন্য কোন প্রাণীকে অনুকরণ করো না। সব ব্যাপারে একমাত্র ঠাকুরকেই অনুসরণের চেষ্টা করবে। 'আমার চিন্তা-ভাবনা, চলা-ফেরা, কাজকর্ম দেবতার মতো! আমি শিবের মতো বসেছি, শিবের মতো ধ্যান করি'—এই রকম কথাই সর্বদা ভাবতে ও বলতে চেষ্টা করবে।"

কথা এখানেই শেষ করেননি সেদিন। একটা মজার গল্পও শুনিয়েছিলেন। বলেছিলেন— "শূয়োরের ঘোঁৎ-ঘোঁৎ আওয়াজ নিজের গলায় অনুকরণ করে, পাড়ার লোককে তাই শুনিয়ে শুনিয়ে একটা লোক বেশ কিছু টাকা রোজগার করে জমিয়েছিল। হায়, এত কষ্টের রোজগার! একদিন ঘরে ডাকাত ঢুকে লোকটির ঐ জমানো টাকাকড়ি সব লুটপাট করে নিয়ে গেল।"

অন্ত্রের পরজীবী সংক্রমণ ও তার প্রতিকার

৫০-এরও বেশি বিভিন্ন ধরনের পরজীবী আছে যারা মানুষের পেটের ভিতর—অন্ত্রের মধ্যে বাসা বাঁধতে পারে। এদের মধ্যে ৬টা শ্রেণী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলি হল :

(১) গোলাকার কৃমি (অ্যাসকারিস) বড় আকারের। সারা পৃথিবীতে এই সংক্রমণে ভুগছে ১০০ কোটি লোক। গোলাকার কৃমি সংক্রমণের ফলে লোক মারা যেতেও পারে। বছরে সারা পৃথিবীতে মারা যায় ২০ হাজার লোক।

(২) হুইপওয়ার্ম (ট্রাইকিউরিস) চাবুকের মতো দেখতে বলে এই কৃমির এই নাম। এটাও গোলাকার একধরনের ছোট কৃমি। এই কৃমির সংক্রমণে ভোগে ৫০ কোটি লোক।

(৩) হুকওয়ার্ম (অ্যানকাইলোস্টোমা/নিকেটর) ছোট গোলাকার কৃমি, হুকের মতো দেখতে। পৃথিবীতে ৯০ কোটি লোক এতে ভোগে। এই কৃমি অন্ত্র থেকে রক্ত চুষে খায়। বছরে হুকওয়ার্মের সংক্রমণে মারা যায় ৬০ হাজার লোক।

(৪) আমাশয় (এনটামিবা হিসটোলিটিকা) এককোষী পরজীবী সংক্রমণের ফলে এ-রোগ হয়। সারা দুনিয়াতে বছরে ৪০ কোটি লোক আমাশয়ে ভোগে। মারা যায় ৩০ হাজার লোক।

(৫) জিয়ার্ডিয়া (জিয়ার্ডিয়া) এও এক-ধরনের এককোষী পরজীবী। লোক মারা না গেলেও পেটের নানা গোলমাল ও অপুষ্টির জন্য দায়ী। জিয়ার্ডিয়াতে পৃথিবীজুড়ে বছরে ভোগে ২০ কোটি লোক।

(৬) ফিতে কৃমি (টিনিয়া) অনেক ধরনের হয়। ফিতের মতো দেখতে। ৫ কোটি লোক বছরে এই রোগে ভোগে। বছরে মৃত্যুর সংখ্যা ৫০ হাজার।

সংক্রমণ হয় মাটি থেকে, জল থেকে, খাবার বা মাংস থেকে। কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়?

—খেতে হবে বিশুদ্ধ জল।

—মানুষের মলমূত্র ঠিকভাবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অপসারণ করতে হবে।

—হাত বারে বারে ধুতে হবে, এবং আরও—

—ফলমূল ও শাকসবজী ভালভাবে ধুতে হবে।

—মাছি, আরশোলা, ইঁদুর প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

—মাংস খেতে হলে সুসিদ্ধ মাংস খেতে হবে।

দেশ-বিদেশ

নোকতে

অরুণাচলপ্রদেশের একটি জেলা তিরাপ। এই জেলার পূর্ব ও দক্ষিণে বার্মা দেশ এবং উত্তরে মিশমী পর্বতশ্রেণী। নানা উচ্চতার পাহাড় দিয়ে ঘেরা তিরাপ জেলা। সবচেয়ে বড় পাহাড়ের উচ্চতা ১,৮২৯ মিটার এবং সর্বনিম্ন পাহাড়ের উচ্চতা ১৫২ মিটার। এইসব পাহাড়ের গা বেয়ে অজস্র ঝরনা বেরিয়ে এসে তিরাপ নদীতে পড়ছে। এই নদী আবার গিয়ে মিশছে ব্রহ্মপুত্রে।

পাহাড়ের গায়ে সবুজ বনানীর সমারোহ। কী অদ্ভুত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য! প্রকৃতি দেবী যেন অকৃপণ হস্তে উজাড় করে তাঁর রূপের ডালি সাজিয়ে বসে আছেন। গভীর জঙ্গলে নানা-শ্রেণীর জীবজন্তু। ইতস্তত বন্য হাতিকে সদলবলে জঙ্গলে বিহার করতে দেখা যায়। আজ জঙ্গলের বড় বড় গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। হাতিকে পোষ মানিয়ে তাকে দিয়ে জঙ্গলের বাইরে ওই কাঠ আনা হচ্ছে।

এই বিভিন্ন উচ্চতার পাহাড়ে নানা আদিবাসীর বাস। অরুণাচলপ্রদেশের অন্যান্য আদিবাসীদের তুলনায় তিরাপের আদিবাসীদের সাহিত্য খুবই কম। তাই তাদের সম্বন্ধে খুব কমই জানা যায়। নোকতে, ওয়ানচো, তাংসা প্রভৃতি আদিবাসীদের সম্বন্ধে অল্পবিস্তর কিছু কিছু জানা যায়।

নোকতে আদিবাসীরা পরিচিত অহম রাজাদের সময় থেকে। সেই সময় থেকে সমতল-ভূমির সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল। এই যোগাযোগ তারা শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য করত না, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের জন্যও করত। এই যোগাযোগের একটি পৌরাণিক কাহিনী আছে:

নোকতে ও অহমিয়ারা একই পিতা-মাতার সন্তান; তবে কালক্রমে তারা তা ভুলে যায়।

পাহাড়ের মধ্যে একটি লবণহ্রদ ছিল। একদিন তিনজন নোকতে আদিবাসী নিকটবর্তী একটি নদীতে নৌকায় লবণ ভরছিল। তাদের নৌকায়
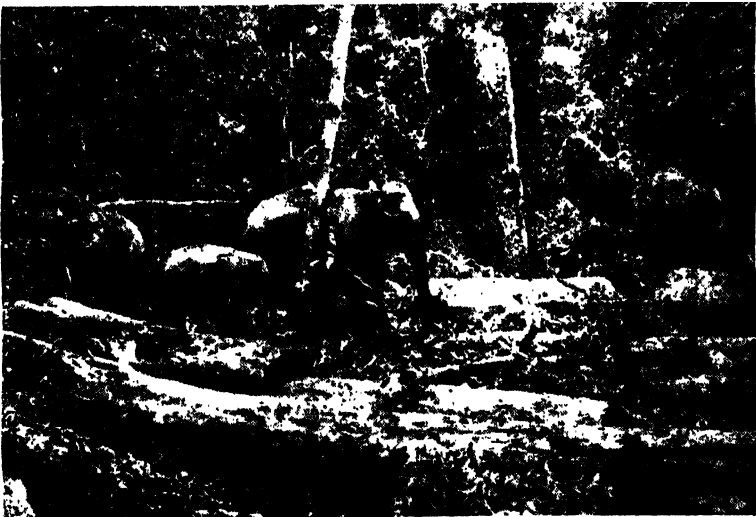
হাতিকে পোষ মানিয়ে তাকে দিয়ে জঙ্গলের বাইরে কাঠ আনা হচ্ছে।

কোন হাল ছিল না। যখন লবণে নৌকা ভর্তি হয়ে গেল তখন নৌকা নদীর স্রোতে তাদের নিয়ে সমতলভূমির দিকে ছুটে চলল। সমতলভূমির লোকেরা তাদের নৌকাটি ধরে তীরে টেনে নিয়ে গেল। নোকতেরা নৌকা থেকে তাদের লবণ দিল। তারা খুব খুশি হল। পরিবর্তে তারা লাল, নীল ও হলুদ রঙের কাপড় দিয়ে নোকতেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করল। সমতলভূমির লোকেরা—অহমিয়ারা নোকতেদের সাদর আমন্ত্রণ জানাল—যখনই তাদের প্রয়োজন হবে কোন জিনিসের নিয়ে যাওয়ার জন্য।

নোকতে আদিবাসীরা তিরাপ জেলার মধ্যবর্তী অংশ থেকে ওয়ানচোর উত্তর-পূর্ব পর্যন্ত, 'বোর দুরিয়া' ও 'নংসাং' নামে দুটি গ্রামে প্রধানত বসবাস করে।

নোকতেসমাজ গ্রামপ্রধানের দ্বারা পরিচালিত হয়। তাদের প্রভাব খুব বেশি। তারা অন্যদের চেয়ে বেশি সম্মান, পদমর্যাদা লাভ করে। একজন গ্রামপ্রধানের অধীনে কয়েকটি গ্রাম থাকে।

গ্রামপ্রধানের বংশধরেরা 'লোয়াংজাত' এবং সাধারণ আদিবাসী 'সনাজাত' নামে পরিচিত। এই দুটি গোষ্ঠীতে নোকতেসমাজ বিভক্ত। 'লাজু' অঞ্চলে 'পান্সাজাত' নামে সাধারণ আদিবাসীরা পরিচিত। গ্রামপ্রধানেরা ইচ্ছা করলে ছোট-খাট কাজের জন্য সাধারণ আদিবাসীদের মধ্য থেকে বিচার-সমিতির সভ্য নির্বাচন করতে পারে। উচ্চশ্রেণী 'লোয়াংজাত' গ্রামের সাধারণ মানুষদের থেকে বেশি সুযোগ-সুবিধা পায়।

সাধারণত বাইরে থেকে পোশাকে-আশাকে দেখে উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর লোক বলে নির্দিষ্ট করে বোঝা যায় না, তবে তাদের পার্থক্য বোঝা যায় সামাজিক অনুষ্ঠানের সময়। 'লাজু'গোষ্ঠীর গ্রামপ্রধানদের 'কেপি' ও সাধারণ আদিবাসীদের 'টাংমো' বলে। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ। তবে শুধু গ্রামপ্রধানরা ইচ্ছা করলে 'টাংমো'গোষ্ঠীর মেয়েদের বিয়ে করতে পারে। ওই স্ত্রীকে গ্রামপ্রধানরা প্রথমা স্ত্রীর মর্যাদা দেয় না। প্রথমা স্ত্রীর জন্য গ্রামপ্রধানকে অতি অবশ্যই 'কেপি'গোষ্ঠীর মেয়েকে বিবাহ করতে হবে। কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে নিম্ন ও উচ্চ-শ্রেণীরা কখনও এক পঙ্ক্তিতে বসে আহার করে না। ভোজনের জন্য মহিষ মারা হলে মাংসের সিংহভাগটি চলে যায় উচ্চশ্রেণী 'কেপি'র দিকে, অবশিষ্ট অংশটি যায় নিম্নশ্রেণী 'টাংমো'র দিকে।

এই 'কেপি' এবং 'টাংমো'গোষ্ঠী আবার বহু ছোট ছোট উপদলে বিভক্ত।

নোকতেরা বাড়ি তৈরি করে মাটি থেকে বেশ কিছু উঁচুতে। বড় বড় গাছের খুঁটির উপর ঘর বাঁধে তারা। খুঁটিগুলি কখন কখন সুন্দর কারুকার্য করা। 'টোকো' গাছের পাতা দিয়ে ঘরের চাল ছাওয়ায়। ঘরের চাল এমনভাবে ছাওয়া হয় যে, ঘরের দেওয়াল কদাচিৎ দেখা যায়। চাল ছাড়া অংশ পাটাতন বারান্দার কাজ করে। বাড়ির সামনের দিকে বেশ বড় আয়তনের ঘর থাকে যা বৈঠকখানারূপে ব্যবহৃত হয়। মেয়েদের জন্যও ওইরকম একটি বড় ঘর থাকে—যেখানে তারা সবাই একত্র মিলিত হয়ে গল্পগুজব করে। গ্রামপ্রধানদের ঘরবাড়ি বেশ বড় বড় হয়। মনে হয়, অরুণাচলপ্রদেশের অন্যান্য আদিবাসীদের চেয়েও বড়। নোকতে আদিবাসীদের মধ্যে কোন ক্রীতদাস নেই।

আদি নোকতে পুরুষেরা অসংখ্য বেতের বেণ্ট কোমরে জড়াত, এক ফালি কাপড় লেঙ্গুটির মতো করে পরত এবং বাঁশ গোল চাকা চাকা করে কেটে হাতে ও পায়ে পরত। মাথার চুল চারপাশ থেকে কামিয়ে ফেলত। মাথার

মাঝখানে দক্ষিণভারতীয় ব্রাহ্মণদের মতো মোটা শিখা রেখে দিত। ওই মোটা লম্বা শিখা একত্র জড়িয়ে ঘাড়ের কাছে বেঁধে রাখত। বর্তমানে সহর ঘেঁষা পুরুষেরা প্যাণ্ট-শার্ট পরে। মাথার চুল হাল ফ্যাশানের মতো কাটে।

নোকতে মেয়েরা একটুকরো সাদা বা কালো রঙের কাপড়—হাঁটু পর্যন্ত লম্বা—কোমরে জড়িয়ে রাখে। বিধবা মেয়েরা যারা দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে না চায় তারা মাথার চুল একেবারে কেটে ফেলে। আজকাল মেয়েরা শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গের জন্য ছোট ব্লাউজ পরে। রঙ-বেরঙের পুতির মালা এই অঞ্চলের প্রায় সব আদিবাসী মেয়েদের পছন্দ।

অতীতে নোকতেরা মানুষের মাথা-শিকার, এবং বিশেষ নকশার উলকি ব্যবহার করত। তারা প্রথম কবে থেকে মানুষের মাথা-শিকার আরম্ভ করেছে—তার ব্যাখ্যা অনেকে অনেক-রকম দিয়ে থাকেন। সে-সব কাহিনীর একটি এইরকম :

প্রথমে মানুষ এবং জীবজন্তু একত্রে বসবাস করত। অনেক বছর পরে মানুষের সংখ্যা জীব-জন্তুদের তুলনায় প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেল। আবার মেয়েদের থেকে পুরুষদের সংখ্যা খুব বেড়ে গেল। সুতরাং পুরুষদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেঁধে গেল মেয়েদের নিজ নিজ অধীনে রাখা নিয়ে।

একদিন 'পাতেই' নামে একজন লোক খুন হল ওই মেয়েছেলে-সংক্রান্ত বিবাদে। তার ভাই তখন খুব ছোট। তারপর বেশ কয়েক বছর পরে সেই ভাই বড় হল। একদিন সে জঙ্গলে বেড়াতে গেল। তাকে 'নিয়ালাং' (মৌমাছি)-এ কামড়াল মৌমাছির কামড়ে তীব্র যন্ত্রণায় সে কাতরাতে লাগল। তখন তার মনে পড়ল বড় ভাই-এর কথা—সে নিশ্চয়ই আমার মতো যন্ত্রণা ভোগ করেছে মৃত্যুর সময়ে। সে তখন ভীষণ ক্রোধান্বিত হল এবং যে তার দাদাকে মেরেছে, তাকে মেরে ফেলল। তারপর দুটি পরিবারের মধ্যে বিবাদ শুরু হল। এবং তাদের পরস্পরের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেও প্রতিহিংসা গ্রহণের চেষ্টা আরম্ভ হয়ে গেল। এইভাবে মাথা-শিকার শুরু হল।

মাথা-শিকারের সাধারণ পদ্ধতি হল : হঠাৎ একটি গ্রামের আদিবাসী অন্য একটি গ্রামকে আক্রমণ করে। নোকতেরা একে অপরের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানিয়েও যুদ্ধ করে। চ্যালেঞ্জ জানাবার পদ্ধতি হল : একজন দূতকে পাঠানো হয় একটি বাঁশের লাঠি দিয়ে। লাঠির একধারে সূচালো এবং অপর দিকটি থাকে ভোঁতা। এই ভোঁতা দিকটির তাৎপর্য হল—যাকে চ্যালেঞ্জ জানানো হচ্ছে তার মাথা নেওয়া হবে ওই ভোঁতা অংশ দিয়ে মেরে। বিরোধীপক্ষও ভোঁতাওয়ালা লাঠি ওই দূত মারফতে প্রেরণ করে জানিয়ে দেয়, তারাও মাথা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত। আর যদি বিরোধীপক্ষ শান্তি চায়, লাঠির ভোঁতা অংশটি কেটে সরু অংশটি পাঠিয়ে দেয়।

যুদ্ধে জয়লাভ করলে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার, নাচ, বন্দুকের আওয়াজ এবং বড় বড় ঢোল জোরে জোরে বাজাতে বাজাতে গ্রামে ফিরে আসে। এই শব্দই গ্রামবাসীকে জানিয়ে দেয় যে, যুদ্ধে জয়লাভ করে ফিরছে। যদি পরাজিত হয়, খুব নীরবে গ্রামে এসে নিজে নিজের বাড়িতে চলে যায়। তাদের নীরবতাই প্রমাণ করে যে, তারা পরাজিত হয়েছে।

বিজয়ীরা বাদ্যযন্ত্রসহ নৃত্য করতে করতে শত্রুর মাথাগুলি মাটিতে হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে টেনে নিয়ে আসে। তারপর গ্রামের মধ্যে একটি জায়গায় এসে মাথাগুলি একত্র সংগ্রহ করে, চালের গুঁড়া ও ডিম একসঙ্গে মিশিয়ে সেগুলিতে মাখিয়ে দেয়। শেষে ওইগুলিকে একটি বড়গাছে ঝুলিয়ে রাখে।

ফসল কাটার সময় নোকতেদের একটি বড় উৎসব হয়। এই উৎসবকে তারা 'খোটাং' বলে। বাংলাদেশে যেমন নবান্ন উৎসব হয় তেমনি তাদের 'খোটাং' হয়। এই উৎসবে গ্রামবাসীরা সবাই অংশগ্রহণ করে এবং প্রত্যেক পরিবারকে একটা করে শূকর দিতে হয়—যাতে উৎসবের কার্য সুষ্ঠু-ভাবে সম্পন্ন হয়। গাছে ঝুলানো মাথাগুলি নামিয়ে সিদ্ধ করে বেশ ভালভাবে পরিষ্কার করে উৎসবপ্রাঙ্গণের একটি জায়গায় একত্রে রাখা হয়। মাথা-শিকারকারীরা তার চারপাশে নৃত্য করে। উৎসবান্তে মাথাগুলিকে একটি জায়গায় রাখা হয় যেখানে তারা শান্তিতে থাকবে। তারপর প্রত্যেক বছর ফসল-কাটার উৎসবের সময় ওই মাথাগুলিকে গ্রামের পুরোহিতরা খাবার দিয়ে আসে। এটা তাদের একটি কর্তব্য।

বর্তমানে আর এই ধরনের মাথা-শিকারের ঘটনা দেখা যায় না। গ্রামপ্রধানরা এখন বিচার-সমিতির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করে থাকে।

এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের সাধারণ ঝগড়া-বিবাদ বাধে জমিজায়গা, মাছ ধরা প্রভৃতি নিয়ে। তবে কোন গ্রাম থেকে কোন মেয়েকে জোর করে ধরে নিয়ে গেলে ভীষণভাবে ঝগড়া বেধে যায়। বিচার-সমিতির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ-ভাবে ঝগড়া মিটানোর চেষ্টা করা হয়। যখন কোন মীমাংসা হয় না, তখন মাথা-শিকার করতে গ্রাম আক্রমণ করে।

এই সমিতির বিচার গ্রামবাসীকে মাথা পেতে নিতে হয়। এই সমিতি কঠিন শাস্তি দেয় তাদের, যারা গ্রামপ্রধানের স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধভাবে মেলামেশা করে। এই কঠিন শাস্তি হল—অপরাধীকে টু-টুকরো করে কেটে ফেলা। প্রয়োজনবোধ করলে অপরাধীর গ্রামকেও আগুন দিয়ে পুড়িয়ে গ্রামের সব লোককে মেরে ফেলা হয়। অন্যান্য অপরাধের জন্য দোষীকে জরিমানা দিতে হয়। দোষ অনুযায়ী নানারকমের জরিমানা হয়। মানুষ খুন করলে প্রচুর অর্থ জরিমানা স্বরূপ দিলে দোষী বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। পুরুষ ও মেয়েদের জরিমানা সমান নয়।

নোকতেরা 'জোবান্' নামে দেবতাকে বিশ্বাস করে। এই দেবতা 'জোংবান্' বা 'তেসং' নামেও পরিচিত। কল্যাণ ও অশুভ উভয়ের দেবতা ইনি। তাই নোকতে আদিবাসীরা তাঁকে খুশি করার জন্য সর্বদা চেষ্টা করে। এই দেবতার শুভ দিককে 'কাট জোবান্' এবং অশুভ দিককে 'ওয়াং জোবান্' বলে।

কোন কোন গ্রামে এই দেবতা একজন নন—দুজন। একজন আকাশে থাকেন—তাঁর নাম 'রাং জোবান্', আর একজন ভূমিতে থাকেন—তাঁর নাম 'হা জোবান্'। যিনি আকাশে থাকেন তিনি অশুভের দেবতা, আর যিনি ভূমিতে থাকেন তিনি কল্যাণের দেবতা। এছাড়া নোকতেরা বহু ভূতপ্রেতে বিশ্বাসী। অসুখ-বিসুখের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তারা বিশেষ বিশেষ ভূতপ্রেতকে নিয়মিত ভেট দেয়। এইসব ভূত-প্রেতদের মধ্যে আবার কেউ কেউ তাদের ঘরবাড়ি পাহারা দেয়—সবরকম অশুভ থেকে তাদের রক্ষা করে।

নোকতেরা বিশ্বাস করে, মৃত্যুর পর আত্মা আকাশে যায়। আত্মাকে তারা 'মাং' বা 'জা থাং' বলে। তাদের বিশ্বাস, মৃত্যুর পর—আত্মা আকাশে গিয়ে ঘুড়ির আকার ধারণ করে। তাই যখন মৃতদেহকে সৎকার করা হয় তখন যদি আকাশে কোন ঘুড়ি উড়তে দেখা যায়, তাহলে তার আত্মীয়-স্বজন মাটিতে সঙ্গে সঙ্গে জল ঢেলে দেয় যাত্রী-আত্মার উদ্দেশ্যে। অপঘাতে মৃত্যু হলে তারা মনে করে, ভূতপ্রেতরা ওই আত্মাকে নিয়ে গেছে দূর আকাশে।
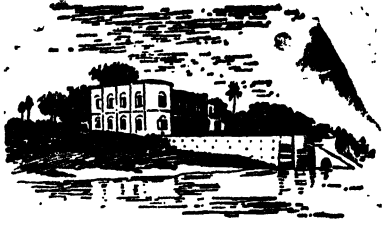
পুস্তক সমালোচনা

Statics and Dynamics of Progress —(Vivekananda Concept): by Ananda pp. 179, Price : not mentioned.

গ্রন্থটির বাঙলা অর্থ দাঁড়ায় 'অগ্রগতি বা উন্নতির স্থিতিবিজ্ঞান ও গতিবিজ্ঞান'। এতে মানসিক উন্নতি, আধ্যাত্মিক উন্নতি, জাতীয় উন্নতি এবং সমগ্র মানবজাতির ধারাবাহিক উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। উন্নতি বা অগ্রগতি সম্বন্ধে ধারণা সকলের এক নয় এবং সেই ধারণা আগে ঠিক না করলে তার মাপকাঠি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এর ভুল অর্থ করলে জাতিকে অবনতির গভীরতম প্রদেশে নিয়ে যেতে পারে।

বইটি 'অগ্রগতি' সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের ধারণাকে কেন্দ্র করে বহু মনীষীর মতামত সমৃদ্ধ। স্বামীজী তাঁর লেখায়, বক্তৃতায় বা চিঠিতে বিভিন্ন স্থানে অগ্রগতি সম্বন্ধে যা কিছু বলেছেন, সেগুলিকে একত্র করে লেখক তাদের বিশ্লেষণ করেছেন। আপাতঃ দৃষ্টিতে স্বামীজীর উক্তির কোথাও বিরোধ দেখা দিলে লেখক গভীর চিন্তাপূর্ণ যুক্তির সাহায্যে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করেছেন। এই সব আলোচনার অঙ্গীভূত হয়েছে ইতিহাস, বিজ্ঞান, জীববিদ্যা, স্বর্গ, দেবতা, ধর্ম ও সমাজের ক্রমবিকাশ, মার্কস্, ডারউইন প্রভৃতি। স্বামীজীর রচনাবলীর সঙ্গে যাঁরা সুপরিচিত নন, তাঁদের কাছে স্বামীজীর অনেক যুক্তিই নূতন ও কৌতূহল উদ্দীপক মনে হবে। তিনি বলেছেন, উন্নতির উত্থান ও পতন দুই দিকই অগ্রগতির আওতায় পড়ে; ক্রমবিকাশ ও ক্রমউদ্ঘাটন একই অগ্রগতির বিভিন্ন অবস্থা; ঈশ্বর ও দানব একেরই দুই দিক; একটা জাতির যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত গুণাবলী মূর্ত হয় অবতারের মাধ্যমে; সমাজ বা জগতের উন্নতি জীবনকে বাদ দিয়ে হতে পারে না; শিক্ষার উন্নতির মাপকাঠি হবে প্রেম ও ত্যাগ; উন্নতি বা অগ্রগতির একটি অর্থ বিস্তৃতি এবং তা প্রেমের মাধ্যমে হতে পারে; অগ্রগতির ভিত্তি হবে অতীত; ধর্ম ও অগ্রগতি বিপরীত তো নয়ই, বরং একে অপরের পরিপূরক; আধ্যাত্মিক উন্নতি অন্য সকল প্রকার উন্নতির ভিত্তি; মানবের অগ্রগতির শেষ নেই, তার উদ্ভব যেখানে সেইস্থানই তার শেষ লক্ষ্য; প্রকৃতিকে জয় করে আত্মার অগ্রগতি চলবে—'চরৈবেতি'; শিক্ষার উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রকাশ; যুদ্ধের মাধ্যমে পৃথিবীর অগ্রগতি হয় না, বরং পশ্চাৎ গতি হয়; বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য একত্বে পৌছানো, ধর্ম আগেই সেই লক্ষ্যে পৌছে গেছে; যান্ত্রিক উন্নতির পিছনে আছে মানুষের মানবিক উন্নতি, তার নূতন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা, যার মূলে আছে ধর্ম। স্বামীজী অগ্রগতির কথায় আমাদের ব্যবহারিক ও নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের প্রয়োজনের কথা বাদ দেননি। তাঁর 'প্রথমে রুটি, তারপর ধর্ম', 'আমাদের ধর্মগ্রন্থে আছে সাম্যের গান, কিন্তু আমরা কার্যতঃ ঠিক উল্টা করি', 'দরিদ্রের কর্মসংস্থানের জন্য বিলাসিতারও প্রয়োজন আছে', সমাজের একাংশের সুযোগ-সুবিধা ভোগের তীব্র নিন্দা, আধ্যাত্মিকতাকে বাদ দিয়ে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের তীব্র নিন্দা, সমাজের নিম্নশ্রেণীর জাগরণের ডাক, এবং

সবশেষে তাঁর আশার বাণী—'ভারতের প্রাণশক্তি কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস প্রভৃতির মধ্যে থেকেও এখনও সজীব'—এই সবই স্বামীজীর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়।

গ্রন্থটি একদিক হতে অদ্ভুত। এতে মূল্য দেওয়া নেই। ভূমিকা নেই, পরিচ্ছেদ ও উপশিরোনামা নেই, প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত একটানা লেখা। হয়তো বিক্রয় লেখকের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু পরিচ্ছেদ ও উপশিরোনামা থাকলে পাঠকের সুবিধা হত। ছাপার ভুলও অনেক আছে এবং আলোচনা সব জায়গায় সহজপাঠ্য নয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও স্বামীজীকে বুঝবার পক্ষে এটি একটি অতুলনীয় গ্রন্থ। সমকালীন বহু মনীষীর মতামত থাকায় বিদ্বজ্জনের কাছে পুস্তকটি সমাদর লাভ করবে। আশা করি, লেখক ও প্রকাশক গ্রন্থটির বহুল প্রচারের জন্য আবশ্যকীয় ব্যবস্থা নেবেন।

—ডক্টর জলধিকুমার সরকার
ভূতপূর্ব অধ্যাপক, কলিকাতা 'স্কুল অব্ ট্রপিক্যাল মেডিসিন'

Avadhuta Gita of Dattatreya— Translated by Swami Chetanananda. Published by Advaita Ashrama, 5, Dehi Entally Road, Calcutta-14, pp. 137, Price : Rs. 8·00

মানুষ দ্বৈতভাবে থাকতে ভালবাসে। শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে অখণ্ডের ঋষি নরেন্দ্রনাথও এই অদ্বৈতভূমির আভাস-দর্শনে চীৎকার করে উঠেছিলেন—'ওগো, তুমি আমায় একি করলে, আমার যে বাপ-মা আছেন!' ঠাকুর তাঁর বক্ষ স্পর্শ করে বলতে লাগলেন,'তবে এখন থাক, একেবারে কাজ নাই, কালে হইবে।' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৯৯—১০০)

অবধূত-গীতার প্রথম সূত্রেই তাই বলা হয়েছে—

'ঈশ্বরানুগ্রহাদেব পুংসামদ্বৈতবাসনা।
মহদ্ভয়পরিত্রাণাদ্বিপ্রাণামুপজায়তে॥' ১/১

—সংসারভয়ে ভীত বিপ্রগণের চিত্তে অদ্বৈতবাসনা ঈশ্বরের কৃপায় ঘটে থাকে।

অতি চড়া সুরে গ্রন্থারম্ভ—

'যেনেদং পূরিতং সর্বমাত্মনৈবাত্মনাত্মনি।
নিরাকারং কথং বন্দেহহ্যভিন্নংশিবমব্যয়ম্॥' ১/২

—যেখানে দ্বৈতভাব প্রবেশে অক্ষম, নিরাকার, শিবস্বরূপ সেই আমারই আত্মা দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত, সেখানে কাকে আমি বন্দনা করি?

এই মূল সুরটি শেষ অধ্যায় পর্যন্ত একইভাবে বর্তমান—

'ত্বত্তীর্থযাত্রয়া ব্যাপকতা হতা তে
ধ্যানেন চেতঃপরতা হতা তে।
স্তুত্যা ময়া বাক্‌পরতা হতা তে
ক্ষমস্ব নিত্যং ত্রিবিধাপরাধান্॥' ৮/১

—হে ব্রহ্ম! তীর্থযাত্রা সম্পন্ন করে তোমার সর্বব্যাপিত্ব খণ্ডন করেছি। তুমি চিৎস্বরূপ যেখানে ধ্যানধ্যাতাধ্যেয়-ত্রিপুটিলয় ঘটে—তোমার সেই চেতঃপরতা-ধ্যেয়রূপে কল্পনা করে ধ্যানের দ্বারা নষ্ট করেছি। বাক্যের দ্বারা কখনই প্রকাশিতব্য নন (যতো বাচো নিবর্তন্তেঃ) তোমার সেই বাক্‌পরতা স্তুতি দ্বারা বিনষ্ট করেছি। তুমি আমার এই ত্রিবিধ অপরাধ ক্ষমা কর।

অবধূত-গীতা অদ্বৈতবেদান্তের উচ্চতম জ্ঞানভূমিতে আরূঢ় স্থিতপ্রজ্ঞ পরমহংস সন্ন্যাসীর উপজীব্য গ্রন্থ।

'ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা' এরূপ নিশ্চয় বুদ্ধির নাম তত্ত্বজ্ঞান। কিন্তু অবধূত-গীতার মূল সুর আরও উঁচুতে বাঁধা—

'অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি কেচন।
সমং ব্রহ্ম ন জানন্তি দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জিতম্॥'
(মহানির্বাণ তন্ত্র)

—কেউ ব্রহ্মকে অদ্বিতীয় তত্ত্বরূপে জানেন, কেউ দ্বৈতভাবে উপলব্ধি করেন। কিন্তু তাঁরা কেউই জানেন না যে ব্রহ্ম দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিত।

অতএব এই গ্রন্থের অধিকারী হচ্ছেন—অবধূতসন্ন্যাসী, যাঁর লক্ষণ অষ্টম অধ্যায়ে ৬—৯ শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। অবধূতে 'অ' শব্দের অর্থ সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার উর্ধ্বে, আদি-মধ্য-অন্তে পবিত্র আনন্দে যিনি বিরাজ করেন।

'ব'-কার হচ্ছে তাঁরই লক্ষণ—যিনি সকল বাসনাবর্জিত নিরাময়, ত্রিকালবর্জিত সদা বর্তমান ব্রহ্মস্বরূপে বিরাজমান।

'ধূ'-কার বলতে লক্ষ্য করা হয়েছে তাঁকে—যিনি দেহবোধবিরহিত, ধূলিধূসরিত দেহে নীরোগ ও পবিত্র চিত্তের অধিকারী এবং ধ্যান-ধারণাভ্যাসের উর্ধ্বে।

'ত'-কার হচ্ছে তাঁর লক্ষণ—যিনি নিরভিমান ও তত্ত্বচিন্তনে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত।

অর্থাৎ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষই এই জ্ঞানভূমির অধিকারী। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়—দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জিত জ্ঞানভূমি। যেহেতু অবধূত-গীতা তার প্রতিপাদক, অতএব সেই ব্রহ্মানুভূতির সঙ্গে এর প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক সম্বন্ধ।

প্রয়োজন কি? তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান দত্তাত্রেয় অতি সুললিত ছন্দে বলছেন—

'কিং নাম রোদিষি সখে ন জরা ন মৃত্যুঃ
কিং নাম রোদিষি সখে ন চ জন্মদুঃখম্।
কিং নাম রোদিষি সখে ন চ তে বিকারো
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥' ৩/৩৪
(নাম-শব্দটি বিস্ময়সূচক)

নিজের আত্মাকে সম্বোধন করে বলছেন—'হে বন্ধো! কেন তুমি বৃথা শোক করছ? আমি তো স্বরূপতঃ জন্ম-মৃত্যু-জরা-বিকারাদিরহিত, জ্ঞানামৃত, সমরস, গগনের ন্যায় নিরাকার।'

জন্মমৃত্যু প্রভৃতি ষড়্বিকাররূপ মহদ্ভয় থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে এই অদ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন।

প্রশ্ন হতে পারে—যিনি তত্ত্বজ্ঞ তাঁর আর এর কি প্রয়োজন? জ্ঞানরক্ষার জন্য যাজ্ঞবল্ক্যের মতো তত্ত্বজ্ঞ পুরুষকেও সন্ন্যাসাবলম্বনের শাস্ত্রে আছে।

অপর শঙ্কা হচ্ছে—এরূপ উচ্চ অদ্বৈতভূমির অধিকারী তো বিরল, তবে এই গ্রন্থ সাধারণ মানুষের কি কাজে আসবে? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান এর উত্তর দিয়েছেন—স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনা করে। সাধ্যবস্তুর লক্ষণ দৃষ্টিপথে রেখে সাধককে এগিয়ে যেতে হয়। নতুবা সাধনা দুরূহ হয়ে যায়। সেদিক দিয়ে এ জাতীয় গ্রন্থের বহুল প্রচার প্রয়োজন।

মাদ্রাজ মঠ থেকে স্বামী অশোকানন্দ প্রণীত অবধূত-গীতা পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। মূল সংস্কৃতের ইংরেজী শব্দান্তর করে শ্লোকগুলি দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ যাঁরা দেবনাগরী লিপি পড়তে অপারগ তাঁরাও সংস্কৃত শ্লোকগুলি উচ্চারণ করে পড়তে পারেন। স্বামী চেতনানন্দ সেটুকু বাদ দেওয়াতে বই-এর কলেবর হ্রাস ঘটেছে। তাছাড়া তাঁর অনুবাদ মর্মার্থ অনুযায়ী। অনেক ক্ষেত্রে স্বামী অশোকানন্দ আক্ষরিক অনুবাদের দিকে বেশি ঝুঁকেছেন। তাঁর হচ্ছে অনেকটা classical style আর স্বামী চেতনানন্দের অনুবাদ হচ্ছে popular style। দুইয়েরই রুচিভেদে পাঠক বিভিন্ন। এদিক থেকে দুটি গ্রন্থ একই বিষয়ে লিখিত হলেও প্রচারের দিক থেকে দুটিই সমানভাবে প্রয়োজন।

এতে মোট শ্লোক সংখ্যা—২৭১। আটটি অধ্যায়ে সমাপ্ত। শ্রীভগবান বিষ্ণুর অবতার—সংস্কৃত দত্তাত্রেয়-মহর্ষি অত্রি ও অনুসূয়ার পুত্র-রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর ঐতিহাসিক কাল নির্ণয় সম্ভব না হলেও জাবাল উপনিষদ্, নারদ পরিব্রাজক উপনিষদ্, যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষদ্, ভিক্ষু-উপনিষদ্ ও শাণ্ডিল্যোপনিষদে তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর রচিত এই অবধূত-গীতার উদ্দেশ্য এককথায় দ্বৈতভান নিবৃত্তি ও পরমানন্দ-প্রাপ্তি এবং তাতে স্থিতি।

—স্বামী জয়দেবানন্দ
অধ্যক্ষ, ব্রহ্মচারিপ্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বেলুড় মঠ
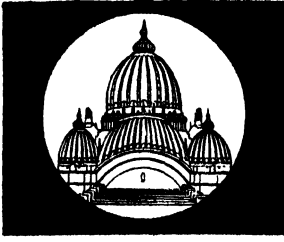
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন

আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত একটি রোগ-নির্ণায়ক কেন্দ্র নিউদিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনের টি. বি. ক্লিনিকের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। গত ১০ মে ১৯৮৫, এটি উদ্বোধন করেন লোকসভার অধ্যক্ষ শ্রীবলরাম জাকর। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ। সভায় শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

প্রার্থনাগৃহ-সহ মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন

গত ২২ মে ১৯৮৫, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির ও প্রার্থনাগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ। ভাবগম্ভীর এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বহু সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী, ভক্ত ও অনুরাগী। অনুষ্ঠান শুরু হয় ২১ মে থেকে। চলে ছয়দিন ধরে। ধর্মসভা, পাঠ, আলোচনা এবং নানাবিধ আনন্দানুষ্ঠানে পূর্ণ ছিল সমগ্র কার্যসূচী। মন্দির ও প্রার্থনাগৃহের স্থাপত্য দর্শনার্থী সকলেরই মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্থাপত্য-কলার মুখ্য রূপকার প্রখ্যাত ভাস্কর-শিল্পী শ্রীসুনীল পাল। স্বামীজী-প্রকল্পিত বেলুড় মঠস্থ শ্রীমন্দিরের অনুরূপ পূজা-মণ্ডপ ও নাটমণ্ডপের একত্রীভূত রূপকেই তিনি আদর্শ করেছেন এখানে, কিন্তু এর শিল্পরূপে দ্যোতনা রয়েছে কামারপুকুরস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ-বাসগৃহ—সেই পবিত্র মাটির ঘরখানির।

ভিত্তিস্থাপন

গত ৩০ মে, সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের প্রকল্পিত প্রার্থনালয়ের ভিত্তিস্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ।

*

বিগত ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, ত্রিচূড় রামকৃষ্ণ মঠের শাখা পালাই কেন্দ্রের নবনির্মিত সংস্কৃত কলেজের ভিত্তিশিলা স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী। গত শিক্ষাবছরের ১৯৮৩—৮৪ থেকে কলেজটি ভারত সরকারের রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থানের অনুমোদন লাভ করেছে।

*

আমেরিকার ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটনে সিয়া-টলের বেদান্ত সোসাইটির নবনির্মিত প্রশস্ত উপাসনা-কক্ষ গত ৩০ মার্চ ১৯৮৫, স্বামী অশেষা-নন্দজীর উপস্থিতিতে উৎসর্গীকৃত হয়। অনুষ্ঠানে বহু ভক্ত নরনারী উপস্থিত ছিলেন।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

শ্রীলঙ্কা শরণার্থিত্রাণ : মাদ্রাজ ত্যাগরাজ-নগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম শ্রীলঙ্কা থেকে মন্দাপম্ শিবিরে আগত বিপুল সংখ্যক শরণার্থীকে প্রাথমিক সেবাদি করে চলেছেন। প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ঐ শিবিরের স্কুলপড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের জন্য বিনাবেতনে শিক্ষাদান এবং টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের জন্য বিতরণ করা হয় ১০টি মাদুর, ৮৪ ডজন পেন্সিল, ৫০০ খানা খাতা, ৮০০ খানা শ্লেট, ১৯২ ডজন শ্লেট-পেন্সিল এবং ৩ ব্যাগ মুড়ি। এছাড়া

মন্দাপম্ ও তিরুচিতে ১,১৫০ জন ছাত্রছাত্রীর গ্রীষ্মকালীন ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে তাদের জন্য ৪৪ জন শিক্ষকের এবং নানাবিধ প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবস্থা করা হয়।

ভূপালে দুর্ঘটনাত্রাণ: বেলুড়মঠের কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত জনসাধারণের রোগনির্ণয়ের জন্য ভূপালে একটি ১০০ এম. এ. এক্স-রে যন্ত্র স্থাপনা করবেন।

মেঘালয়ে অগ্নিত্রাণ: ইষ্টখাসি হিলস্ জেলায় শেলাবাজারে অগ্নিতে মর্মান্তিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ১৭টি গৃহের 'নিজের বাড়ি নিজে কর' প্রকল্প অনুযায়ী পুনর্নির্মিত হয়েছে শিলং রামকৃষ্ণ আশ্রমের মাধ্যমে। এছাড়া ১৬টি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড়, সেলাই মেশিন, মুদির দোকানের জিনিস-পত্র সরবরাহের পর এখানকার পুনর্বাসনকার্য সমাপ্ত হয়।

উদ্বোধন-সংবাদ

গত ২৫ এপ্রিল, সন্ধ্যায় ভগবান শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব উপলক্ষে তাঁর জীবন ও অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেন স্বামী অজজানন্দ। গত ৪ মে, ভগবান শ্রীবুদ্ধের আবির্ভাব-তিথি উৎসব যথাযথভাবে উদ্‌যাপিত হয়। তাঁর জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী নির্জরানন্দ। গত ১৯ মে, 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'তে শ্রীশ্রীফলহারিণী কালীপূজা এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী অজজানন্দ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

দেহত্যাগ

অতি দুঃখের সঙ্গে আমাদের সঙ্ঘের চারজন সন্ন্যাসির দেহান্তসংবাদ জানাতে হচ্ছে এখানে:

স্বামী সুব্যানন্দ (সুখময় মহারাজ) গত ১০ মে ১৯৮৫, বিকাল ৩-১০ মিনিটে তাঁর পুরানো ব্রংকাইটিস এমফাইসিমা সহ আকস্মিক বৃদ্ধি পাওয়াতে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহত্যাগকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। হাঁপানি রোগজনিত কষ্টে তিনি প্রায়শঃ ভুগতেন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয় এবং সবরকম চেষ্টা সত্ত্বেও শেষক্ষণটি ঘনিয়ে আসে অত্যন্ত শান্তভাবে।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি দীক্ষালাভ করেন এবং ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে যোগদান করেন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সন্ন্যাস-লাভ করেন শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে। তিনি বিভিন্ন সময়ে গদাধর আশ্রম, সারগাছি, বাঁকুড়া আশ্রমে নিযুক্ত ছিলেন এবং বেলুড়মঠে বহু বছর ধরে সবজিবাগানের কাজ তত্ত্বাবধান করেছিলেন। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি বেলুড়মঠে একান্তজীবনযাপন করছিলেন। তিনি সরল হাসিখুশি স্বভাবের ছিলেন এবং অনাড়ম্বর সাধু জীবন যাপন করতেন।

স্বামী ব্যোমকেশানন্দ (ওয়ারিয়ার মহারাজ) গত ১২ মে ১৯৮৫, সন্ধ্যা ৬-৪৫ মিনিটে ত্রিচুড় রামকৃষ্ণ মঠে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে দেহ-ত্যাগ করেন। দেহান্তকালে তাঁর বয়েস হয়েছিল ৭৭ বছর। গত চার বছর ধরে তাঁকে প্রায়ই শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছে বার্ধক্যজনিত নানাবিধ উপসর্গের জন্য। সুচিকিৎসা করানো সত্ত্বেও তাঁর শারীরিক অবস্থার আদৌ উন্নতি হয়নি। বরং ধীরে ধীরে অবস্থার অবনতিই হতে থাকে।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি দীক্ষালাভ করেন এবং ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠে যোগদান করেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে। তিনি বিভিন্ন সময়ে ত্রিচুড়, চেরাপুঞ্জী ও পেলাই আশ্রমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কিছুদিনের জন্য তিরুভাল্লা আশ্রমের অধ্যক্ষও ছিলেন। ১৯৮১ থেকে তিনি একান্ত-জীবনযাপন করছিলেন। দেহত্যাগের পূর্বে বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি প্রচণ্ড শারীরিক কষ্ট পাচ্ছিলেন, কিন্তু তথাপি তিনি ছিলেন সদা হাস্যময়।

স্বামী মুকুন্দানন্দ (শশধর মহারাজ) গত ১৩ মে, রাত ৯-৪০ মিনিটে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে বারাণসী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করেন। শরীরত্যাগকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি বারাণসী রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে থাকতেন। গত ৩ মে, সকালে সহসা পড়ে গিয়ে তাঁর বাম উরুর প্রধান অস্থির উপর অংশ ভেঙে যায়। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে সেবাশ্রমে ভর্তি করা হয়। শরীরত্যাগের চারদিন পূর্বে তাঁর গলায় আলসার ধরা পড়ে—ফলে তিনি শক্ত খাবার খেতে পারছিলেন না। চিকিৎসকদের সবরকম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর জীবনরক্ষা সম্ভবপর হয়নি।

শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকে তিনি মন্ত্রলাভ করেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বারাণসী রাম-কৃষ্ণ সেবাশ্রমে যোগদান করেন। ১৯২৩-এ তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট থেকে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। সেবাশ্রমে থাকা-কালীন প্রথম চার বছর অন্যান্য সেবাকাজ ছাড়া তিনি পূজ্যপাদ স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজের সেবা করার পরম সুযোগ লাভ করেছিলেন।

তিনি সুশিক্ষিত পুরোহিতবংশ থেকে এসে-ছিলেন বলে তাঁর পূজা-অর্চা সংক্রান্ত বিধিবিধানে গভীর জ্ঞান এবং যাজনিক শাস্ত্রাদিতে প্রচুর ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর বেলুড়-মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজক ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে বাঁকুড়া, আলমোড়া, জামশেদপুর আশ্রমে নানা সেবাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন তিনি। তাঁর দেহান্তে আমরা একজন প্রবীণ, বিদগ্ধ, অমায়িক সন্ন্যাসীকে হারালাম।

স্বামী তুরীয়াত্মানন্দ (পণ্ডিতজী মহা-রাজ) গত ২৩ মে, দুপুর ১২-২৫ মিনিটে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বৎসর। সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার পূর্বে তিনি বেলুড়মঠের আরোগ্য ভবনে দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী ছিলেন বার্ধক্যজনিত নানাবিধ উপসর্গের জন্য। উপযুক্ত সবরকম চিকিৎসা সত্ত্বেও দেহত্যাগের কয়েকদিন পূর্ব থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি মন্ত্রলাভ করেন। ১৯৩৩-এ তিনি মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করেন। ২৭ বছর মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠ ছাড়া তিনি উতকামণ্ডে এবং দেওঘর বিদ্যাপীঠে ছিলেন বহুকাল। সাত বছর তিনি নটরামপল্লী রাম-কৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষও ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন তিনি। তাঁর কাছে অনেক সাধু-ব্রহ্মচারী শাস্ত্রপাঠ করেছেন। ১৯৭৩ থেকে তিনি একান্তজীবনযাপন করছিলেন বেলুড়মঠে। অমায়িক ব্যবহার ও কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ কঠোর সাধু-জীবনের জন্য সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন তিনি।

উপরি-উক্ত চারজন সন্ন্যাসীর দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করুক—এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

বিবিধ সংবাদ

জার্মান ভাষায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

ফেডারেল প্রজাতন্ত্রী জার্মানির এক সংবাদ-সূত্র থেকে জানা গেছে যে, সম্প্রতি এক জার্মান যুবক মার্টিন কেম্পশেন জার্মান ভাষায় শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণকথামৃত অনুবাদ করেন। তাঁর বয়স ৩৬ বছর। তিনি বহু পরিশ্রম করে বাংলা শিখে মূল 'কথামৃত' হতে জার্মানিতে 'শ্রীরামকৃষ্ণ—সেৎসে গট কাইনে গ্রেন্ৎসে' অনুবাদ করেন। তিনি সহজ সরল সাবলীল ভাষায় অনুবাদ করেছেন। যে-শব্দগুলি জার্মানিতে অনুবাদ করা যায় না সেগুলি যথাযথ (মূল বাংলা) রেখে দিয়েছেন। শুধু পাদটীকায় ঐ শব্দগুলির গূঢ় অর্থ তিনি জার্মান ভাষায় ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। পাঁচ ভাগ 'কথামৃত'কে তিনি তিন খণ্ডে অনুবাদ করবেন। বর্তমান সংস্করণটি তারই প্রথম খণ্ড। ডঃ মার্টিন কেম্পশেন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জার্মান ভাষায় উপাধিলাভ করে ১৯৭৩-এ কলকাতা রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কাল-চারের 'স্কুল অব ল্যাংগুয়েজে'র অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন। তিনি সেই সময়ে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে থাকতেন। সেখানে থাকতে থাকতেই স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীরাম-কৃষ্ণের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন।

তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে এম. এ. পাস করেন। 'রামকৃষ্ণ ও সেণ্ট ফ্রান্সিস অব্ আসিসি'কে নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করে গবেষণামূলক প্রবন্ধও লিখেছেন তিনি।

পরলোকে

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও মনীষী **অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী** গত ১০ মে ১৯৮৫, শুক্রবার দুপুর ১-২৫ মিনিটে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে পরলোকগমন করেন। দেহত্যাগকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। কিছুদিন ধরে তিনি নানারকম উপসর্গে ভুগছিলেন। গত ২৬ এপ্রিল, কোমরের হাড় ভেঙে যাওয়ায় তাঁকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে থাকাকালীনই তাঁর হৃদ্‌যন্ত্র দুবার আক্রান্ত হয়। ৯ মে, বৃহস্পতিবার রাত্রি থেকে তাঁর অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে যায় এবং অবশেষে শুক্রবার দুপুরে তিনি শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১১ জুন ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ, উত্তরবঙ্গের রাজসাহী জেলার নাটোর মহকুমার জোয়াড়ি গ্রামে। তিনি ছাত্ররূপে নয় বছর বয়সেই শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এসে ভর্তি হন এবং তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ স্নেহ-সান্নিধ্যে আসেন।

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন। তারপর তিনি গবেষণা করেন 'রামতনু লাহিড়ী বৃত্তি' নিয়ে। তিনি প্রথমে রিপন কলেজে ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক পদ লাভ করেন তিনি। তদানীন্তন ছাত্রসমাজে তাঁর সহজ পরিচিতি ছিল প্র-না-বি নামে।

তাঁর ছিল বহুমুখী সাহিত্য প্রতিভা। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, ছোট গল্পকার, প্রাবন্ধিক এবং সমালোচকও। নাটক, রম্যরচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'কেরি সাহেবের মুন্সী' গ্রন্থটির জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রবীন্দ্রস্মৃতি' পুরস্কার লাভ করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী' পুরস্কার লাভ করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি 'আনন্দ পুরস্কার' এবং 'শরৎ পুরস্কার'ও লাভ করেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার'। 'কমলাকান্তের আসর' তাঁর নামকরা রম্যরচনা গ্রন্থ। তিনি সম্পাদনা করেছেন—বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি মনীষীদের রচনা। তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদনার কাজও করেন। দেহত্যাগকাল পর্যন্ত তিনি টেগোর রিসার্চ ইনস্টিট্যুটের সভাপতি ছিলেন।

অধ্যাপক বিশী উদ্বোধন পত্রিকার বিশিষ্ট পাঠক ও শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের কাজকর্মের প্রতি তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা। ৮ মার্চ ১৯৮৩, একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "বর্তমান আদর্শ বিভ্রান্তির যুগে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন যে যথার্থ প্রকৃত ভারতীয় আদর্শের বর্তিকা দেশের সম্মুখে ধরে রেখেছে, তার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।" তিনি গর্ব ও বিনয়ের সঙ্গে মিশনের সাধুদের বলতেন: "আমার মতো সামান্য পদাতিকও আপনাদের অনুগামী।" জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তিনি যেন শ্রীরামকৃষ্ণময় হয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীঠাকুর সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলতেন: "ঠাকুরের কথা কি বলব—মনে হয়, তিনি আমার চিরপুরাতন বন্ধু—My Eternal Friend. and the most intimate friend—তাঁর কাছে সবকিছু খুলে বলা যায়, সব গোপন ব্যক্তিগত কথা। তাঁর কাছে সবকিছু কনফেস্ করা যায়। তিনি আমার সবকিছু দেখছেন, দেখেও ভালবাসছেন, তাঁকে কি লুকোবো? তাঁর কাছে প্রবেশাধিকার পায়নি এমন কেউ নেই।···তাঁর কাছে এলে মানুষ না হেসে পারত না। সকলে ফিরে যেত প্রসন্নতা নিয়ে। গভীর রসের সঙ্গে হাসির রসের মিলন—এ এক Rare combination. আমরা গুরু বলতে বুঝি—তিনি ২৪ ঘণ্টার গুরুমশাই। আর আমার এই ঠাকুর ২৪ ঘণ্টার আপনজন।"

এই জ্ঞানতাপস সাহিত্য-সাধকের আত্মা ভগবৎপদে চিরশান্তি লাভ করুক—এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

ভ্রমসংশোধন

বৈশাখ, ১৩৯২ সংখ্যায় ১৯৫ পৃষ্ঠার ২য় কলমের উপর থেকে ১২শ পঙ্‌ক্তিতে 'দশখানি উপনিষদ্'-এর স্থলে 'এগারখানি উপনিষদ্' এবং ২১৮ পৃষ্ঠার ২য় কলমের নিচের থেকে ১২শ পঙ্‌ক্তিতে '১৮৯২' স্থলে '১৮৯৩' পড়তে হবে।—সঃ

৮৭তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা শ্রাবণ, ১৩৯২

দিব্য বাণী

ঠাকুরের···শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সর্বজন-মোহকর নগর কীর্তন দেখিতে বাসনা হইয়াছিল।···নিজগৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া ঠাকুর দেখিয়াছিলেন, পঞ্চবটীর দিক হইতে ঐ অদ্ভুত সংকীর্তনতরঙ্গ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া দক্ষিণেশ্বর-উদ্যানের প্রধান ফটকের দিকে প্রবাহিত হইতেছে এবং বৃক্ষান্তরালে লীন হইয়া যাইতেছে; দেখিলেন, নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে সঙ্গে লইয়া ঈশ্বরপ্রেমে তন্ময় হইয়া ঐ জনতরঙ্গের মধ্যভাগে ধীরপদে আগমন করিতেছেন এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ সকলে তাঁহার প্রেমে তন্ময় হইয়া কেহ বা অবশভাবে এবং কেহ বা উদ্দাম তাণ্ডবে আপনাপন অন্তরের উল্লাস প্রকাশ করিতেছে। এত জনতা হইয়াছে যে, মনে হইতেছে লোকের যেন আর অন্ত নাই। ঐ অদ্ভুত সংকীর্তনদলের ভিতর কয়েকখানি মুখ ঠাকুরের স্মৃতিপটে উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল এবং ঐ দর্শনের কিছুকাল পরে তাহাদিগকে নিজ ভক্তরূপে আগমন করিতে দেখিয়া, ঠাকুর তাহাদিগের সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, পূর্বজীবনে তাহারা শ্রীচৈতন্যদেবের সাঙ্গোপাঙ্গ ছিল।

—স্বামী সারদানন্দ

['শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'—সাধকভাব, চতুর্দশ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪০৬-৭]
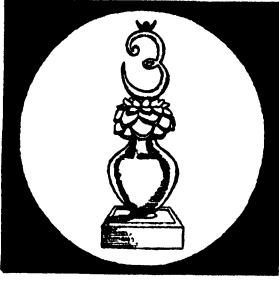
কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পঞ্চশতকের মননালোকে

আষাঢ় সমাপ্ত হইয়া শ্রাবণ উপস্থিত। আনন্দ-নিরানন্দময় বহুতর স্মৃতি, সুখ-দুঃখময় বিচিত্র সব ঘটনাবলী আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জে জমিয়া উঠিয়াছিল। বহির্জগতেও কত কিছু ঘটিয়া গেল এই কালের মধ্যে। আবার ধর্মীয় তথা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেও এই ঘনঘোর আষাঢ় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নবীন মেঘের দুন্দুভিতে ভক্ত মানব শুনিতে পায় জগন্নাথের রথচক্রের ঘর্ঘর অনুরণন। স্মরণ করায় আরও একটি অনিন্দ্য-সুন্দর চিত্র: জনসমুদ্রের মাঝে ঘূর্ণায়মান রথচক্রকে গতিমুখর করিয়া তুলিতেছে এক দেব-মানবের ভাব-প্রেরণা—স্বয়ং যিনি রথাগ্রে নর্তনরত,—লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়কে মথিত করিয়া গম্ভীর ছন্দে চলমান সেই জগন্নাথের রথ। এ-রথযাত্রা নিত্য যাত্রা—ভারত-মনের এক অপূর্ব শোভন চিরন্তন দ্যোতনা ইহাতে।

বর্তমান বর্ষের রথযাত্রা উদ্‌যাপিত হইয়াছে একটু অতিরিক্ত তাৎপর্যসহ। শ্রীশ্রীচৈতন্য-দেবের আবির্ভাব-পঞ্চশতবর্ষের পূর্তিকেও এই রথোৎসবের সঙ্গে স্মরণ করা হইয়াছে অনেক জায়গায়। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই জাতীয় ঐতিহ্যের ঐ পুণ্য অধ্যায়টিকে পুরীধামের রথযাত্রার সঙ্গে অন্বিত করিয়া অবলোকনের চেষ্টা হইল এবার। অবশ্য পুরীধামে রথযাত্রার স্মৃতি ঐতিহাসিক কারণেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দ্বারা সমধিক মহিমোজ্জ্বল,—রথারূঢ় জগৎপতিকে মহাপ্রভুই ভক্ত-হৃদয়ের বেদিকায় চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। যুগ যুগ ধরিয়া ভক্তের নয়নপথগামী সেই ছবি! জগন্নাথের রথের পুরোবর্তী পথে অগণিত নরের মাঝে শোভমান নরনাথ শ্রীচৈতন্য: রথস্থ জগতের নাথকে যেন প্রেমে আকর্ষণ করিয়া জগজ্জনের হৃদয়বর্তী করিতেই তিনি ব্যাকুল চঞ্চল। একখানি অনুপম ভাবালেখ্য।

কালের স্রোত অবিরাম বহিয়া চলিয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাবের পরে দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দ অতিক্রান্ত। এই পাঁচ শতক কালের ইতিহাস বড় বিচিত্র, বিশেষতঃ আমাদের জাতীয় জীবনের উপর দিয়া বহু বিচিত্র তরঙ্গ বহিয়া গিয়াছে—কখন আশায়-আলোকে সুউন্নত সুস্পষ্ট, আবার কখনও হতাশায় তমসায় আনত মলিন। তবে ইহাও অনস্বীকার্য যে, এই পঞ্চশতবর্ষকালের মধ্যে অন্ততঃ দুইটি শতক যুগ বিধাতার আশীর্বাদে ইতিহাসে গৌরবমণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে—থাকিবেও চিরকাল। ভারতের জাতীয় ইতিবৃত্তে অসামান্য দৃপ্ত সেই দুইটি যুগের একটি হইতেছে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আগমনধন্য সত্ত্বগত ঊনবিংশ শতক এবং অপরটি নিঃসন্দেহে শ্রীচৈতন্য-আবির্ভাবোত্তর শতবর্ষ। ভাবিতে বিস্ময় লাগে, দুইটি যুগেরই প্রাণস্পন্দন যেন সমান ছন্দের, গরিমা-সূত্রেও প্রায় অনুরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ-

বিবেকানন্দ-আবির্ভাবের পটভূমি এবং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের প্রাক্‌কালীন পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যাইবে উভয় যুগেই গৌরবের মূল কারণ একই প্রকার।

অতীতে বহির্দেশীয় আগন্তুক ভাব—উহার বিধ্বংসী প্লাবন ভারতীয় সমাজের উপর বিভিন্ন সময়ে নানা আকারে আঘাত হানিয়াছে। নবাগত পাঠানগণের পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলেও সমাজের সর্বস্তরে দারুণ বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল,—সাধারণ মানুষকে যখন ভীষণভাবে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল, ঠিক তখনই শ্রীচৈতন্যদেব সমাজের আপামর সকলের সমক্ষে ভক্তির প্রশস্ত উদার রাজপথ খুলিয়া দিয়াছিলেন। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন: 'চৈতন্য ভক্তির অবতার; জীবকে ভক্তি শিখাতে এসেছিলেন।'

পঞ্চদশ শতাব্দীর কথা ইহা।

ঊনবিংশ শতকের ব্যাপারও প্রায় অনুরূপ। পাশ্চাত্য জীবন-দর্শনের প্রতি মোহ এবং জড়-বিজ্ঞানের প্রভাব ভারতীয় জীবনধারাকে অতিশয় চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল—জীবনের সহজ ভার-সাম্য তখন বিনষ্ট। অথচ, ঐ মোহ এবং প্রভাবকে এড়াইবার কোন তাৎক্ষণিক উপায়ও ছিল না, কেন না যুগের গতি সারা পৃথিবীর মনুষ্যসমাজকে পরস্পরের এত কাছাকাছি আনিয়া দিয়াছে যে, মানুষে মানুষে ব্যবধান অতি স্বাভাবিক নিয়মেই ঘুচিবার পথে—যথেষ্ট ঘুচিয়া গিয়াছিলও সেই কালে। ভারতবর্ষ পৃথিবীর মানচিত্রের যে অংশেই অবস্থিত থাকুক, সাম্প্রতিক যুগের ভৌগোলিক বিচারে ভারত তথা ভারতবাসী কাহারও নিকট হইতে আর দূরবর্তী নহে—অতএব বিশ্বের আলো-বাতাস ও ভাবনা-সংস্কারের প্রভাব অযাচিতভাবেই তাহার প্রতিটি অঙ্গকে স্পর্শ করিতে বাধ্য।

আমরা যে-শতকের কথা স্মরণ করিতেছি, ততদিনে ভারতীয় ভাবধারাতে পশ্চিমী রঙের আভা বহুল পরিমাণেই লাগিয়া গিয়াছে! তখন ভারতকে ভারতরূপে বাঁচিবার জন্য একমাত্র উপায় ছিল—আগত সমস্ত রকম মত-ভাব ও দর্শনকে আন্তরিক আত্মসাৎ করিয়া লওয়া—আপন করিয়া ঘরে তুলিয়া আনা ও বরণ করা। এতাবৎকাল যাহা ঘটিতেছিল, তাহা কিন্তু ছিল ঠিক বিপরীত। নবাগত ভাবাদর্শকে সনাতনপন্থী কেহই নিজের ঘরে ঠাঁই দিতে প্রস্তুত ছিল না—ফলে সংঘর্ষের বীজ দানা বাঁধিতেছিল,—ছড়াইতেছিল বিদ্বেষ। পক্ষান্তরে উগ্র নবীনের দল যাহা কিছু নূতন তাহাকে আত্মসাৎ নহে, নিজেরাই তৎসাৎ হইয়া আত্মবিলুপ্তির নেশায় উন্মত্ত হইয়া ছুটিয়া মরিতেছিল। আধুনিক পরিভাষায় উহাকেই বলা হইতেছিল প্রগতি! সমাজের সেই ঘোরতর বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে, মানুষের নিদারুণ সংকটকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। শিক্ষা-সংস্কৃতির মহাপীঠ কলিকাতা মহানগরীর উপকণ্ঠে গঙ্গা-তীরস্থ দক্ষিণেশ্বর দেবালয়ের পুণ্যক্ষেত্র হইতে তিনি সোচ্চারে ঘোষণা করিয়াছিলেন: 'যত মত তত পথ'—'যত্র জীব তত্র শিব'—'জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে সেবা'। ঊনবিংশ শতকের ইতিহাস, তাই এক বিশেষ দৃষ্টিতে বলিষ্ঠ মানব-ধর্মের—নবতর সমন্বয়াদর্শের উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠা-পর্ব।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠা-পর্ব শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে—কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারে বুঝিয়া লওয়া মোটেই কষ্টকর নহে যে, উহার সূচনানুষ্ঠান সেই চৈতন্যযুগেই। অর্থাৎ, আমরা যে-কথা বলিতেছিলাম, প্রবহমান কালের সদ্য-সমাপ্ত পঞ্চশত বর্ষ—যাহা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্মৃতিকে বহন করিয়া আনিয়াছে, উহা শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতি হইতেও বিচ্ছিন্ন নহে কোন মতে। এই পাঁচ শতাব্দ কালের প্রারম্ভে ও অন্তে

দুইটি 'শতক যুগ', যথাক্রমে দুইটি মহান্ আবির্ভাবের দ্বারাই মানবেতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরসমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। অতএব ভারতবর্ষের এই পাঁচশতবর্ষের ইতিবৃত্তকে কেবলমাত্র ভজন-কীর্তন-ভাষণমুখর উৎসবের মাধ্যমেই প্রচার নহে,—উহাকে পুনঃ পুনঃ পঠন ও মনন আবশ্যক—পুনর্লিখনেরও প্রয়োজন আছে। জাতির সম্বিৎ ফিরাইয়া আনিতে সহায়ক হইবে এই প্রয়াস। বাস্তবিক পক্ষে 'ভারতবর্ষ' বলিতে নিছক ভৌগোলিক সীমায় বিধৃত একটি মহাদেশমাত্রকে নহে—ততোধিক তাহার আর একটি অস্তিত্বকে—একটি ভাব-ভারতবর্ষকেও বুঝিতে হইবে। নচেৎ, ভারতের ধ্যান-জ্ঞানের—উহার জীবন-তত্ত্বের কোন ধারণাই হইবে না। আলোচ্যমান পাঁচশত বর্ষের ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, সেই ভাব-ভারতবর্ষের আভাস কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

সন ৮৯১—ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব সন। ভারতবর্ষে তখন পাঠান লোদী-বংশের প্রবল প্রতাপ। বাংলার মসনদেও সুলতানরা দোর্দণ্ড দাপটে অধিষ্ঠিত। বাদশাহ ও নবাবগণ ভোগবিলাস এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্বেই মত্ত থাকিতেন, দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা, সাধারণ মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা জীবনযাত্রার মান এবং সামাজিক বিধিবিধান লইয়া তাঁহারা আদৌ মাথা ঘামাইতেন না। সমাজের উচ্চস্তরের বিদ্যাচর্চা, বাহ্যিক ন্যায়-নীতি-ধর্ম ইত্যাদি কিছুটা অব্যাহত থাকিলেও, সাধারণ শ্রেণীর মানুষের দুর্দশার সীমা ছিল না। শাসকগোষ্ঠীর ধর্ম, সংস্কার, আচার-আচরণ জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে বাধ্য—এ-ক্ষেত্রেও উহার ব্যতিক্রম ছিল না। রাজানুগ্রহ-লাভের প্রত্যাশায় সমাজের নিম্নতলের মানুষ কখন স্বেচ্ছায়, কোন সময়ে বা অসুবিধায় পড়িয়া দলে দলে ধর্মান্তরিত হইতে থাকে। সমাজের উপরতলার তথাকথিত উচ্চশ্রেণীতে সুবিধাভোগী স্বার্থান্বেষী কিছুসংখ্যক দাম্ভিক ব্যক্তির দুর্ব্যবহার ও কপটতাই ঐ স্বধর্মত্যাগের মূলে ইন্ধন যোগাইতেছিল। উচ্চবর্ণের মধ্যে যে সম্মান-প্রতিপত্তি বিরাজ করিত, তাহা উহাদের চরিত্রের গুণে মোটেই নহে,—তাহার প্রধান কারণ ছিল উহাদের অর্থের বল, সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং আনুষঙ্গিক আরও কিছু অমানবিক শক্তি। ধর্ম-কর্ম, বিদ্যাচর্চা, দান-ধ্যানের উদ্দেশ্য ছিল—সংসার-ভোগ। শান্তি, সাম্য, মুক্তি ইত্যাদি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল নিছক পণ্ডিত ব্যক্তিদের রচনায় ও বক্তৃতায় ব্যবহারের বিষয়—ব্যক্তিজীবনে বা সমাজে উহার কোন প্রয়োগিক প্রশ্ন ছিল না। বরং অশান্তি, বিভেদ ও বৈষম্যই ছিল তদানীন্তন সমাজের স্বাভাবিক লক্ষণ। জীবজগৎ ও ঈশ্বর সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণা ছিল খুবই বিকৃত ও বিপরীত। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের লেখনীতে ঐ কালের সমাজচিত্র:

'যক্ষপূজে মদ্যমাংসে, নানা মতে জীব হিংসে, এই মত হইল সর্বদেশ।'

সমাজের সেই সঙ্কটাকীর্ণ কালে প্রকৃত ধর্মের সংস্থাপন ও সংরক্ষণ এবং মানবচিত্তে ধর্মের যথার্থ উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করাইতে,—আচণ্ডাল ব্রাহ্মণে, হিন্দু-মুসলমান সকলকে শান্তির ও মুক্তির পথ প্রদর্শন করিতে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। মানুষের পরিচয় এবং মানুষ-জীবনের তাৎপর্য কি—ইহাই কালোপযোগী সহজ পন্থায় বুঝাইয়া দিতে তিনি আগমন করিয়াছিলেন। জগৎকে তিনি শিক্ষা দান করিয়াছেন আপন আচরণ সাহায্যে,—মাত্র শাস্ত্রোপদেশের মাধ্যমেই নহে।

'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।'

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকটলীলায় তাঁহার স্বীয়

জীবনই ছিল জীবের প্রতি তাঁহার সর্বোত্তম শিক্ষা—শিক্ষার জীবন্ত উদাহরণ। তাঁহার প্রাত্যহিক আচরণই ছিল প্রকৃষ্ট ধর্মদেশনা,—স্বীয় লোক-ব্যবহারই ছিল তাঁহার রচিত উপদেশ-গ্রন্থ। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, আটটি মাত্র শ্লোক-সম্বলিত 'শিক্ষাষ্টক' ব্যতীত শ্রীচৈতন্যদেবের অন্য কোন রচনা জগদ্বাসী পায় নাই,—না পাওয়াটাই ইতিহাসের অসাধারণ বিশেষত্ব বা রহস্য। কারণ তাঁহার দৈনন্দিন জীবনচর্যাই হইতেছে বিশ্ব-মানবের পক্ষে এক অনুপম অবশ্যপাঠ্য জীবনী তথা রচনাবলী।

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীচৈতন্যের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন: 'তাঁহার প্রেমের সীমা ছিল না। পুণ্যবান্ পাপী, হিন্দু মুসলমান, পবিত্র অপবিত্র, বেশ্যা পতিত—সকলেই তাঁহার ভালবাসার ভাগ পাইত, সকলকেই তিনি কৃপা করিতেন;··· তাঁহার সম্প্রদায় দরিদ্র দুর্বল জাতিচ্যুত পতিত—সমাজে পরিত্যক্ত সকল ব্যক্তিরই আশ্রয়স্থল।'

শ্রীচৈতন্যদেবের এই মানব-সুহৃদ্ মূর্তিখানিই আজ পৃথিবীর সকল মানুষের হৃদয়মন্দিরে পূজিত হইতেছেন। তিনি সাক্ষাৎ ভগবান বা ভগবানের অবতার—তিনি পূর্ণাবতার বা অংশাবতার; কিংবা সন্ন্যাসী, যোগী, মহাত্মা, অথবা পরমহংস কি অবধূত, কিংবা তিনি প্রেমিক ভক্ত বা তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী—এ-সকল সূক্ষ্ম বিচার সাধারণের পক্ষে অনধিকার চর্চা। ঐ বিচারের উপযুক্ত সাধন-সামর্থ্য কয়জনেরই বা আছে? কিন্তু আমরা দেখিতেছি, উপনিষদের ঋষিগণের ধ্যানলব্ধ সেই পরমাত্মাই এক বিশেষ যুগ-সন্ধিক্ষণে, অবিকল মানুষের রূপ লইয়া মানুষেরই মাঝে অবতীর্ণ হইয়াছেন,—কোন নির্দিষ্ট কালের জন্য নহে, নির্দিষ্ট দেশের জন্যও নহে—সমগ্র মানবজাতির হিতের জন্য।

আধুনিক জগৎ মানুষ-কেন্দ্রিক। সমাজ জাগিয়া উঠিতেছে, মানুষকেই পূর্ণ অধিকারে—তাহার পরাকাষ্ঠা মহিমাতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে। মানুষ আজ বুঝিতে শিখিয়াছে, পরকালে মুক্তি-কামনা নহে,—চরমকাম্য জীবন্মুক্তি। তাহার সকল সাধনার উৎকর্ষ সেই পরম পুরুষার্থলাভের প্রযত্নে। ভগবৎপ্রেমও তাই মনুষ্যপ্রেমে প্রযুক্ত। বিগত পঞ্চশতকের প্রারম্ভকালেই এই প্রেম সর্ব-প্রথম বিপুল আলোড়ন তুলিয়াছিল,—যাহার সমুদ্রায়িত রূপ ইতিহাস প্রত্যক্ষ করিয়াছে এই মাত্র সেদিন—আলোচ্য পঞ্চশতবর্ষকালের শেষ পর্যায়ে। প্রথম সূচনায় উক্ত আলোড়নের কেন্দ্রবিন্দুতে দেখিয়াছিলাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে—পরে পরিণত ঊর্মি-শীর্ষে সেই তিনিই পুনরায় সর্বনয়ন-গোচর হইয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণবেশে। যে প্রেম-প্রবাহকে জগৎ দেখিয়াছিল সমুত্থিত তরঙ্গা-কারে, উহাকেই 'উন্মদ প্রেম পাথার'-রূপ পরিগ্রহ করিতে আরও কিছু সময় লাগিয়াছিল;—প্রত্যক্ষ হইয়াছিল মাত্র বিগত শতকে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহার ভাবে-কীর্তনে, নামে-নর্তনে, শিক্ষায়-আচরণে, অশ্রুতে-কম্পনে, হর্ষে-বিলাপে, সমাধিতে-ব্যুত্থানে,—তাঁহার অন্তর্দশায়-বাহ্যদশায়—সর্বাবস্থায় মানবের জন্য অনন্যসাধারণ আদর্শ সংস্থাপনা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীহরির প্রেমকে তিনি মর্ত্যে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন—সকল শ্রেণীর ও স্তরের মানুষকে ঐ হরিপ্রেমে মাতাইয়া তুলিয়া এক করিয়া দিয়াছেন!

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিতামৃতকার তাঁহার জীবনকে 'আদি' 'মধ্য' ও 'অন্ত্য'—এই তিনটি পর্যায়ে বিশ্লেষ করিয়াছেন। তাঁহার এই ত্রিবিধ প্রকটলীলার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি আচরণ সমকালীন মানুষের জন্য তো বটেই—চিরকালের মনুষ্যসমাজের জন্য এক স্বচ্ছ আদর্শ—শিক্ষাপ্রদর্শাগার স্বরূপ। 'জীবে

সম্মানিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান'—তাঁহার শিক্ষার নিষ্কর্ষ ইহাই। তিনি 'ভক্তির অবতার'—ভগবদ্‌ভক্তিই তাঁহার সকল শিক্ষার মাধ্যম—সর্ববিধ উপদেশের চরমতম লক্ষ্য। এককথায়, ভক্তিই সাধ্য—ভক্তিই সাধন। সে-ভক্তি সার্বত্রিক, সার্বকালিক, সার্বজনিক ও সার্বভৌম ধর্ম—শ্রীচৈতন্য-চরিতে এই শিক্ষাই নিয়ত দেদীপ্যমান। এই ভক্তি দ্বারাই তিনি সর্বশ্রেণীর মানুষকে ঐক্য-সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন,—বিশ্বমানবতার পথ-রেখা রাখিয়া গিয়াছেন। মানবের মধ্য দিয়াই ভগবদ্‌ভক্তির ধারাকে প্রবাহিত করিয়া অধ্যাত্ম জগতে এক অভূতপূর্ব সরস সাধন-পন্থার প্রবর্তন করিয়াছেন তিনি। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত এই ভগবৎ-প্রেমের স্নিগ্ধস্পর্শ হইতে কেহই নিজেকে অনধিকারী ভাবিয়া দূরে সরিয়া থাকিতে পারে নাই। স্থান-কাল-পাত্রের দুর্ভেদ্য প্রাচীরকেও রক্ষা করা যায় নাই। গলিত-কুষ্ঠী বাসুদেবের চৈতন্য-কৃপায় এবং শিক্ষায় 'নষ্টকুষ্ঠ, রূপপুষ্ট ও হইয়া আচার্যত্ব লাভ; কারাগৃহে শ্রীসনাতনের নিরন্তর ভগবদ্‌-ভজন; জগন্নাথ (জগাই) ও মাধব (মাধাই) হেন দর্পী দুরাচারী মদ্যপ রাজপুরুষের প্রেমিক ভক্তে রূপান্তর; শ্রীবাস-ভবনের পরিচারিকা 'দুঃখী' দাসীর অসামান্য সেবানিষ্ঠাগুণে 'সুখী' নাম প্রাপ্তি; কুলীনগ্রামের দরিদ্র, শূকরচারণকারী ডোমের শ্রীকৃষ্ণ-গানে রতি; নবদ্বীপে বস্ত্রসীবনকারী যবন দর্জীর বৈষ্ণবতা লাভ প্রভৃতি ঘটনাগুলিই উক্ত সর্বাবগাহী ভগবৎপ্রেম—তথা মানব-অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত।

হোসেন শাহের ন্যায় প্রবল প্রতাপান্বিত বিধর্মী বাদশাহের, মওলানা সিরাজুদ্দীন বা চাঁদ কাজীর ন্যায় পরাক্রান্ত প্রদেশপালের, বিজলী খানের ন্যায় পাঠান নবাব-নন্দনের ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং চৈতন্যদেবের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ইত্যাদি ঘটনাবলী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতুলনীয় অসাম্প্রদায়িক ধর্মপ্রভাবেরই নিদর্শন। পাঠান পীরের এবং সশিষ্য কট্টর বৌদ্ধের সনাতন ভাগবত ধর্মে অনুরাগের কাহিনীও শ্রীচৈতন্য-জীবনীতে সুবিদিত ঘটনা। দস্যু-তস্কর পর্যন্ত শ্রীচৈতন্য-কৃপায় প্রেম-ভক্তির অধিকার লাভে বঞ্চিত হয় নাই—এরূপ দৃষ্টান্তও ভূরি ভূরি রহিয়াছে।

শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীগদাধর পণ্ডিত-প্রমুখের ন্যায় সমাজের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত কুলীন ব্রাহ্মণগণ মহাপ্রভুর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া 'তৃণাদপি সুনীচ' ধর্মের মূর্ত প্রতীক হইয়াছিলেন। অপর-দিকে আবার নিম্নশ্রেণীর ভুঁইমালীকুলে উদ্ভূত শ্রীঝড়ু ঠাকুর, যবনকুলে লালিত শ্রীহরিদাস, কায়স্থ-বংশজাত শ্রীরামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্য-কৃপা-বলে নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ-মধ্যে পূজিত হইয়াছেন।

শুধু পুরুষ কেন? চৈতন্যচন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় তৎকালীন নারী সমাজও সমানভাবেই আলোকিত হইয়াছিল। জননী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নামোল্লেখ এখানে প্রগল্‌ভতা,—কিন্তু সমকালীন নারীভক্ত যাঁহারা বিশ্ববন্দিতা হইয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যাও বড় কম নহে। অতি সাধারণ নীচজাতীয়া স্ত্রীলোকও শ্রীচৈতন্যের অমোঘ কৃপা-শক্তির বলে অধ্যাত্ম রাজ্যে নমস্যা হইয়াছেন, যেমন রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিতা বারবনিতা—উত্তরকালে পরমা বৈষ্ণবী মহান্তী; জগন্নাথ-মন্দিরের দেবদাসী মহিলাগণের পরবর্তী-জীবনও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সাধারণ গৃহস্থ শ্রীপরমেশ্বর মোদকের পত্নী 'মুকুন্দার মা' এবং সেই অখ্যাত ওড়িয়া গ্রাম্য রমণীর চৈতন্যকৃপালাভের আখ্যায়িকাও সুপরিচিত। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য-গৃহিণী সীতাদেবী, শ্রীবাস-পত্নী মালিনী দেবী, শ্রীরাঘব-ভগিনী দময়ন্তী এবং শ্রীশিখি মাহিতির বিদুষী ভগিনী শ্রীমতী মাধবী দেবী প্রমুখ নারীভক্তগণের

নাম শ্রীচৈতন্যলীলায় চিরভাস্বর হইয়া আছে।

শ্রীমহাপ্রভুর ভাব একটি বিশেষ অঞ্চলেই আবদ্ধ থাকে নাই—ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তাঁহার শিক্ষাধারাকে তিনি স্বয়ং-ই বহন করিয়া ফিরিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষার অনুসরণে বলিতে হয়—'তিনি (শ্রীচৈতন্য) নগ্নপদে ভারতের দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়া আচণ্ডালকে ভগবানের প্রতি প্রেমসম্পন্ন হইতে ভিক্ষা করিতেন।' মনে রাখা উচিত, অদ্য হইতে পাঁচশতবর্ষ পূর্বের ভারতবর্ষে পরিবহণ-ব্যবস্থা কী ছিল! তখনকার যানবাহন বলিতে প্রধানতঃ পদ-বাহনই বুঝিতে হইবে—বিশেষতঃ একজন ভিক্ষু সন্ন্যাসীর পক্ষে। সেই যুগেও লোকহিতব্রতী পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতে সমগ্র পৃথিবীর মানুষের ছবিই সদাসর্বদা ভাসিয়া উঠিত।—'পৃথিবী পর্যন্ত যত আছে দেশ-গ্রাম'—ইহাই ছিল চৈতন্যদেবের প্রেম-প্রচারণার পরিধি-ক্ষেত্র।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাবের পাঁচশত বর্ষ পূর্তিকে বিশ্বমানব আজ স্মরণ করিতেছে। মানবপ্রেমী সেই মহাপরিব্রাজক সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যে আমাদেরও সভক্তি প্রণাম যৎকিঞ্চিৎ বাক্য-পুষ্পাঞ্জলি সহ নিবেদিত হইতেছে। পৃথিবীর চতুর্দিকে আজ নানাবিধ দুর্লক্ষণ,—কোথাও শান্তি নাই। গৃহে, অরণ্যে, কোলাহলে, নিভৃতে—তপোবনে, পর্বতগুহায়, দেবস্থানে সর্বত্রই সমান অবস্থা! দিগন্তগ্রাসী এক মহাপ্লাবন আসিয়া পড়িয়াছে! সেই প্লাবনে রক্ষা পাইতে হইলে জগৎ-মহাতরীকেই আশ্রয় করিতে হইবে—মানুষকে ভালবাসিয়া সকল দেশের মানুষের সহিত মিলিতে হইবে। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের প্রেমাংশকে বাদ দিয়া কেবল শ্রী ও চৈতন্যকে বরণের প্রয়াস বিড়ম্বনাই মাত্র। আমরা সেই প্রেমের ঠাকুরকেই পুনঃ পুনঃ স্মরণ করি—যাঁহার অনুগ্রহে জীবনে শ্রী চৈতন্যের প্রকাশ স্বতই হইয়া থাকে।

হরিময় বিশ্ব—প্রতি জীবের হৃদয়ে সেই এক শ্রীহরি। ইহাই চৈতন্য। এই চৈতন্যের উপলব্ধিতেই সংসারের সকল শ্রী—আর ইহারই জন্য উপায় হইতেছে প্রেম। এই উপায়েরই চরম উৎকর্ষ কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে। দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ-দূষিত আজিকার পৃথিবীতে শ্রীচৈতন্যের সেই শিক্ষাই আমাদের একান্তভাবে স্মরণীয়—যাহা তিনি রায় রামানন্দকে প্রদান করিয়াছিলেন :

'কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ আছয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়॥
কিন্তু যাঁর যেই ভাব সেই সর্বোত্তম।
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তারতম॥'

তাঁহার এই শিক্ষাকে গ্রহণ করিলে মানুষে মানুষে কলহের ও বিভেদের অবসান আপনিই হইয়া যাইবে—আমাদের দৃষ্টির আচ্ছন্ন-দোষ কাটিয়া সংসারে শান্তি আনয়ন করিবে। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের প্রতি অনুরাগের নিবিড়তম তাৎপর্য বুঝি এখানেই।

সমুদয় ভারতেই শ্রীচৈতন্যের প্রভাব লক্ষিত হয়। যেখানেই ভক্তিমার্গ পরিজ্ঞাত, সেখানেই লোকে তাঁহার বিষয় সাদরে চর্চা করে ও তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। আমার বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, সমুদয় বল্লভাচার্য-সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্য-প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের সংশোধিত শাখা মাত্র। ...তিনি নগ্নপদে ভারতের দ্বারে দ্বারে প্রচার করিয়া ফিরিতেন, আচণ্ডালকে অনুনয় করিতেন, যাহাতে সকলে ভগবানকে ভালবাসে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

মিনতি

[গান]

স্বামী বিরজানন্দ

শ্রীশ্রীস্বামীজীর বিশিষ্ট সন্ন্যাসি-শিষ্য এবং জগজ্জননী সারদাদেবীর অন্যতম প্রিয় সন্তান—শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ষষ্ঠ অধিনায়ক শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজীর রচিত এই ভক্তি-গীতির রচনা কাল ১৩০১ বঙ্গাব্দ—তাঁর বরাহনগর মঠ-জীবনে।

কেমনে তোমায় পাব হরি।
যদি তার গো দয়া করি।
করিতে সাধন-ভজন, অথবা ধ্যান-আরাধন, এমন শকতি না ধরি।
ছার ভবের বাসনায়, সদা মোর মন ধায়, বোঝালে বোঝে না কি করি।
পড়েছি অকুল পাথারে, বিষম বাসনা-সাগরে, অহং অহং রাজে যে বারি।
এ ঘোরে হতে উত্তীর্ণ, ভরসা আর নাই অন্য, বিনে তা শ্রীপদতরী।
সংসারে মায়া-মোহ পাশে, বদ্ধ হয়ে অনায়াসে, রই যে তোমায় পাশরি।
এ নির্গুণ কালীকৃষ্ণে, যদি দেখা দাও স্বগুণে, চরণে মিনতি করি॥

সুভাষচন্দ্রের জীবন ও চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দ

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯২ সংখ্যার পর]

৭

পরবর্তী পর্ব ১৯২৮—১৯৩২—পাঁচ বৎসরের। এই পর্বে কিছু কম তিন বৎসর তিনি কারামুক্ত জীবনযাপন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে যে-প্রচণ্ড সংগঠনীশক্তি ও কর্মক্ষমতা দেখাতে সমর্থ হন, তার সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যায়—অসাধারণ। তখন পরিণত যৌবন তাঁর, কারাবাসের কঠিন পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে দেহ-মনের উপর দিয়ে, আত্মসমীক্ষার অবাধ সুযোগ পেয়েছেন, ফলে চিন্তায় পরিণত এবং সেই চিন্তাকে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রয়োগ করবার জন্য প্রস্তুত; বাংলা ও ভারতের রাজনৈতিক জীবনে তার প্রয়োজনও ছিল, কারণ দেশবন্ধুর দেহান্তে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক জগতে, গান্ধী-নীতি দ্বিধাগ্রস্ত, আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেশে জাড্যের বিস্তার। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে মুক্তিপ্রাপ্ত সুভাষচন্দ্র কয়েকমাস বিশ্রাম নিয়ে, স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হওয়ামাত্র, কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন,—এবং কিছুদিনের মধ্যে বাংলা ও ভারতের রাজনৈতিক জগতে শক্তিশালী নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হন। কোন সন্দেহ না রেখে বলা যায়, এইকালে সুভাষচন্দ্র জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে, অথবা একাকী—কংগ্রেসের বামপন্থী আন্দোলনের নেতা।

এই পর্বে সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতি, কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র, সর্বভারতীয় কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক, সর্বদলীয় সংবিধানরচয়িতা সমিতির সদস্য, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে তিনি গান্ধীজীর ধীরে-চলো নীতির প্রধান প্রতিবাদী, ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়করূপে সামরিক শৃঙ্খলাযুক্ত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের অসাধারণ সফল দৃষ্টান্তস্থাপক, একই কংগ্রেসে গান্ধীজীর ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপনকারী, ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, প্রচণ্ড প্রভাবশালী 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার কর্ণধার, বাংলা ও ভারতে বিক্ষোভ-আন্দোলনের এক প্রধান সংগঠক (সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলনে তাঁর সফল স্মরণীয় ভূমিকা), ছাত্র ও যুব আন্দোলনের মুখ্য নেতা, বহু যুবসম্মেলনের সভাপতি বা অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ও ক্ষেত্রবিশেষে সফল নেতা, বিপ্লবী যতীন দাসের অনশনে, ও বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর ফাঁসিতে মৃত্যুর পরে কংগ্রেসের ভিতরে-বাইরে ঝড়-সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব, আন্দোলন ও প্রচারের দ্বারা গান্ধীজীকে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণে এবং পরবর্তী আইন অমান্য আন্দোলনে প্রণোদিত করার পিছনে প্রধান প্ররোচক শক্তি—সত্যই বিরাট ভূমিকা তাঁর এইকালে।

আমরা চমৎকৃত হয়ে দেখি, এইকালের সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের পশ্চাদ্বর্তী মানসিক পটভূমিকা সৃষ্টিতে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা ও ব্যক্তিত্বই মুখ্য শক্তি। এক কথায় বলা যায়—স্বামীজীর চিন্তার আদলেই সুভাষচন্দ্রের চিন্তা গঠিত হয়েছিল। তিনি ভারতবর্ষীয় রাজনৈতিক জীবনে বিবেকানন্দের চিন্তার প্রধান বিস্তারকারীদের অন্যতম—অন্যান্যদের মধ্যে আছেন নিবেদিতা, অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন, এমন কি গান্ধী।

সুভাষচন্দ্র যে, রাজনীতিতে বিবেকানন্দ-চিন্তার আনুগত্য করছেন, তা সমকালীন অনেকের কাছেই ধরা পড়েছিল। ১৯২৮ ডিসেম্বরে যুব-সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্রের যে-বক্তৃতা অত্যন্ত সমালোচনার কারণ হয়, যাতে গান্ধী-দর্শন ও অরবিন্দ-দর্শনের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ক্ষতিকরতার কথা বলা হয়েছিল—সেই বক্তৃতায় সুভাষচন্দ্র যে, স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার প্রতিধ্বনি করেছিলেন—তা আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। সুভাষচন্দ্র অবশ্য গান্ধী-দর্শন বা অরবিন্দ-দর্শনের মৌল নীতির বিরুদ্ধে কিছু বলেননি, তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে ঐ দর্শন দুটি কী প্রকার পশ্চাদ্‌গামী দৃষ্টি-ভঙ্গি, তৎসহ নিষ্ক্রিয়তা আনছে, তারই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য : গান্ধী-দর্শনের অনুগামীরা আধুনিকতার বিরোধী, জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধিতে অনাগ্রহী, শরীরচর্চা বা সামরিক শিক্ষা তাঁদের কাছে অবাঞ্ছিত এবং বৃহৎ শিল্প পাপ, পারলে গোটা দেশকে তাঁরা গোরুর গাড়ির যুগে ফিরিয়ে দেন। আর পণ্ডিচেরীর দর্শন—ধ্যান, প্রাণায়াম, যোগের শ্রেষ্ঠতায় এমনই বিশ্বাসী যে, তা নির্জন যোগ-জীবনের মাহাত্ম্য প্রচারেই ব্যাপৃত। ফল—নৈষ্কর্ম্যের প্রশ্রয়।

এই দুই দর্শন বা জীবননীতির বিরোধিতা করার সময়ে সুভাষচন্দ্র বিবেকানন্দকেই শিরোধার্য করে এগিয়েছিলেন। তিনি বলেন :

"[অরবিন্দ-আশ্রমের] প্রচার অনেককেই একটা কথা ভুলিয়ে দিয়েছে—বর্তমান পরিস্থিতিতে আধ্যাত্মিক অগ্রগতি কেবল অবিরাম নিঃস্বার্থ কর্মের দ্বারাই সম্ভব—প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করলেই তবে তাকে জয় করা যায়। যখন সমস্যা ও সংকটে আমরা চতুর্দিকে আক্রান্ত তখন ধ্যানের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করা দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু নয়। সবরমতী ও পণ্ডিচেরীর চিন্তা-ধারার মৌল রূপ নয়, ব্যবহারিক রূপের দ্বারা সৃষ্ট নৈষ্কর্ম্যবাদের বিরুদ্ধেই আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের এই পবিত্র ভূমিতে আশ্রম, যোগী, ঋষি নতুন কোন জিনিস নয়, সমাজে তাঁদের মর্যাদার আসন ছিল। ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু যদি স্বাধীন, সুখী, মহান নব-ভারত গঠন করতে চাই, তাঁদের নেতৃত্ব আমরা অনুসরণ করব না।...ভারতে এখন আমাদের প্রয়োজন কর্মবাদ। সুদৃঢ় আশাবাদে আমাদের উদ্দীপ্ত হতে হবে। আধুনিক পৃথিবীতে আমাদের বাঁচতে হবে—আধুনিক অবস্থার উপযোগী নীতি গ্রহণ করতেও হবে। পৃথিবীর পরিত্যক্ত এক কোণে আর আমরা পড়ে থাকতে পারি না। স্বাধীন হবার পরে ভারতকে তার আধুনিক শত্রুদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই আধুনিক পদ্ধতিতে লড়াই করতে হবে।

"তাই বলে আমি আধুনিকতার ঝোঁকে অন্য অনেকের মতো অতীতের গৌরবকে বিস্মৃত হতে পারি না। অতীতকে ভিত্তি করে অবশ্যই আমাদের উত্থিত হতে হবে। ভারতের নিজস্ব সংস্কৃতি আছে—নিজের প্রণালীতেই তাদের বিকাশ সাধন করে যাওয়া নিশ্চিত প্রয়োজন। দর্শন, সাহিত্য, শিল্প এবং বিজ্ঞানে পৃথিবীকে আমাদের কিছু দেবার আছে, পৃথিবী তা পাবার জন্য অপেক্ষা করছে। এক কথায় বলতে গেলে, আমাদের সমন্বয়ে পৌঁছতে হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমাদের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবীর ও কর্মীদের কেউ-কেউ ইতিমধ্যেই ব্যাপৃত হয়েছেন। একদিকে আমাদের 'বেদের যুগে ফিরে যাও' ধ্বনিকে রুখতে হবে, অন্যদিকে আধুনিক ইউরোপের নানা রস রুচির অর্থহীন খ্যাপামিকে বর্জন করতে হবে।"

উদ্ধৃত অংশে সুভাষচন্দ্র যে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাকেই নিজের ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন তা বুঝতে আনন্দবাজারের সুবিখ্যাত চিন্তাশীল সম্পাদক, বিবেকানন্দ-জীবনীকার সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের অসুবিধা হয়নি। ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৮, আনন্দবাজারের সম্পাদকীয়তে তিনি লিখেছিলেন :

"তিনি [সুভাষচন্দ্র] তাঁহার অভিভাষণে এমন কথাও বলিয়াছেন—'ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারত গঠনে সন্ন্যাসীর নেতৃত্ব আমরা মানিব না।' ভাল কথা। শিবাজীর গুরু রামদাস-স্বামী ছিলেন, সে কথাও ভুলিব না। আমরা কেবল জিজ্ঞাসা করিব—সবরমতী ও পণ্ডিচেরীর যোগ, ধ্যান, সন্ন্যাস, আশ্রম অগ্রাহ্য করিয়া যৌবনের, তথা ভারতের, যে-ভবিষ্যৎ লক্ষ্য—জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে ভারতের যাহা দিবার আছে—সে সম্পর্কে যৌবনকে সচেতন করিয়া কর্মযোগের যে-আদর্শের প্রতি সুভাষবাবু অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাও বাঙালী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের চিন্তার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র। এবং এই সন্ন্যাসীর চিন্তা ও উপদেশের অতি সামান্য অংশই সুভাষবাবুকে যৌবনের সম্মুখে ভারতের বিধি নির্দিষ্ট দায়িত্ব স্মরণ করাইয়া দিবার রসদ জোগাইয়াছে।"

সুভাষচন্দ্র কিন্তু কদাপি গোপন করেননি—তিনি বিবেকানন্দের কিছু কিছু আদর্শকে রাজনৈতিক জীবনে প্রসারিত করতে চাইছেন। সুভাষচন্দ্রের এইকালের বক্তৃতা ও রচনা থেকে সে-বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

তার আগে ভেবে নেওয়া যেতে পারে—স্বাধীনতাকামী ভারতবর্ষের কাছে স্বামীজীর বাণীর কোন্ কোন্ দিক বিশেষভাবে উদ্দীপক মনে হয়েছিল।

(১) আত্মশ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাসের জাগরণ;

(২) জাতীয় ইতিহাস, সভ্যতা, সংস্কৃতির প্রতি প্রীতি; এবং বর্তমান ও ভাবী পৃথিবীতে দান করবার মতো বস্তু ভারতের আছে, এই বিশ্বাস; অর্থাৎ ভারতের একটা মিশন আছে;

(৩) ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডত্বে বিশ্বাস, এবং মাতৃভূমি ভারতের প্রতি তীব্র অনুরাগময় প্রেম;

(৪) নানা ধর্ম, ভাষা ও আচারের দেশ ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের আবিষ্কার; সমন্বয়বোধ;

(৫) ভারতের সাধারণ মানুষের সুপ্ত শক্তিতে বিশ্বাস; জনগণকে সমানাধিকার দানের উপরই নির্ভর করছে ভারতের সত্যকার উত্থান; সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদ গঠিত হবে ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে; জনশিক্ষার দ্বারা জনগণকে জাগরিত করতে হবে; নারীকেও আত্মপ্রতিষ্ঠ করতে হবে;

(৬) আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ঐহিক উন্নতির প্রয়োজন, তার জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার;

(৭) জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে আদানপ্রদানের প্রয়োজনীয়তা;

(৮) তীব্র মুক্তিচেতনা, স্বাধীনতা-চেতনা, গতিশীলতা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সংগ্রামের মনোভাব; বিপ্লবচেতনা; সেইসঙ্গে সেবা ও প্রেমের অনুভূতি;

(৯) লক্ষ্যলাভের জন্য পূর্ণ আত্মবলিদান, —তৎসহ দেহে-মনে সমৃদ্ধ শক্তিশালী চরিত্র; মানুষ তৈরির ধর্ম;

(১০) এই সকলকে সম্ভব করবার জন্য ত্যাগী যুবকদের সংগঠন।

বিবেকানন্দের বিশাল চিন্তার অত্যন্ত অসম্পূর্ণ এই খসড়া। তবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—এই সকল ধারাপথেই সুভাষচন্দ্রের চিন্তা প্রবাহিত

হয়েছে। রাজনৈতিক কর্মী ও নেতারূপে সুভাষচন্দ্র বিবেকানন্দের সকল সূক্ষ্ম সুগভীর চিন্তাকে জনগোচর করা সম্ভব মনে করেননি; তাঁকে স্বামীজীর জাতিগঠনমূলক কতকগুলি মূল চিন্তাকে মোটা ভাষায় বারবার ঘোষণা করতে হয়েছে—যাতে সেগুলি জনগণের মর্মভেদ করে যায়। আরও স্মরণ করিয়ে দেব, এই পর্বে সুভাষচন্দ্র স্বামীজীর যেসব চিন্তাকে প্রচারবিষয় করেছেন, সেগুলি যে পূর্ববর্তী পর্বগুলিতে তাঁর অজ্ঞাত ছিল এমন নয়, তিনি বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী যথেষ্টই পড়েছিলেন—কিন্তু কাল গতে গ্রহণের ও প্রয়োগের ব্যাপারে মাত্রাভেদ ঘটে গিয়েছিলই। প্রথম যৌবনে তিনি সাধারণভাবে বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিকতা, চরিত্রগঠনের নির্দেশাবলী, বা ভারতের অধ্যাত্ম সভ্যতার মহিমাঘোষক উক্তিগুলিতেই আবিষ্ট ছিলেন—পরবর্তী কালে জোর দিয়েছেন স্বামীজী-প্রচারিত সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা তত্ত্ব, নারী ও জনগণের মুক্তি, এবং সমন্বয়বাদের উপর।

সুভাষচন্দ্রের দুটি সভাপতির অভিভাষণ এক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যায়—যে-দুটি রচনায় সুভাষচন্দ্র কার্যত ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিবেকানন্দের ব্যাখ্যাতার কাজ করতে চেষ্টা করেছেন। তার প্রথমটি রংপুরে ৩০ মার্চ ১৯২৯, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রদত্ত, [সুভাষ রচনাবলী ২।৭৭—১০৩] দ্বিতীয়টি হুগলী জেলা ছাত্র সম্মেলনে ২১ ১৯২৯, প্রদত্ত। [ঐ, ১৬৬—১৭৪]।

সুভাষচন্দ্রের ভাষণাবলীর মধ্যে রংপুর ভাষণ মূল্যবান। এর মধ্যে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন ও তার বিবর্তন সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাভাবনার পরিচয় আছে। প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের নানা পর্বের কথা বলার পরে, বাংলার প্রাণসত্য সম্বন্ধে তিনি চিত্তরঞ্জনের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, আর্যসভ্যতার সঙ্গে বাংলার সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কথা জানিয়েছেন, জোর দিয়েছেন জনগণকেন্দ্রিক বাংলার মানবতাবোধের উপরে। রক্তমিশ্রণ যে, বাংলায় জাতি ও আচারগত বৈচিত্র্যের কারণ, একথার সঙ্গে বাংলায় মুসলমান শাসন, বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের দানের কথা এনেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর অবসানের পরে ইংরেজ আগমন ও সাংস্কৃতিক সংঘাতের কথা তুলেছেন। তারপর রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রসঙ্গে বলেছেন: "গৃহবিবাদ ও মতভেদ ঘুচাইবার জন্য তিনি [রামমোহন] উদার বেদান্ত তত্ত্ব প্রচার করেন। যে-সমস্ত আবর্জনা বহু শতাব্দী হইতে পুঞ্জীভূত হইয়া হিন্দুসমাজকে পূতিগন্ধযুক্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা দূর করিবার জন্য সংস্কার আরম্ভ হইল, এবং ব্রাহ্মসমাজ সৃষ্ট হইল। এই আন্দোলনের ফলে খ্রীস্টীয় ধর্ম ও খ্রীস্টীয় সভ্যতার আক্রমণ হইতে বাঙালী আত্মরক্ষা করিল।"

এর পরেই সুভাষচন্দ্র রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ এনে দেখিয়ে দিয়েছেন—নবজাগরণ আন্দোলনের ভাবগত পূর্ণতা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে ঘটেছিল—এবং পরবর্তী কালে সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, ও অন্যান্য শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সেই প্রভাবে নির্ধারিত ধারাতে ঘটেছে। এখানে আছে সুভাষচন্দ্রের উৎকৃষ্ট মূল্যায়ন:

"রামমোহনের বেদান্ত প্রচারের মধ্যে যে সমন্বয়ের সূচনা আমরা দেখিতে পাই তাহা উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিল। রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁহার জীবনের অপূর্ব ও অলৌকিক সাধনার বলে, বিভিন্ন সাধন পদ্ধতির (যেমন কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান) মধ্যে সমন্বয়, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে (যেমন শাক্ত, বৈষ্ণব, যোগী, শৈব ইত্যাদি)

সমন্বয়, এবং বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে (যেমন খ্রীস্টীয় ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, হিন্দুধর্ম ইত্যাদি) সমন্বয় স্থাপন করিয়া গেলেন। পরমহংসের অনুভূতি ও সাধনার উত্তরাধিকারী হইলেন প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দ এবং তারপর সমগ্র বঙ্গবাসী। এই সমন্বয় স্থাপনের সঙ্গে-সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন দিক দিয়া—কাব্যে, সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, ক্রীড়া ও ব্যায়ামকৌশলে সৃষ্টি ও নূতন প্রচেষ্টা চলিতেছে। এতদ্ব্যতীত সমাজে পূর্ণ সাম্য স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে—এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালী জাতি সাহিত্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে।”

মূল্যবান মন্তব্য। সাধারণভাবে মনে করা হয়, সুভাষচন্দ্র বিবেকানন্দ সর্বস্ব; শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মনোভূমে পশ্চাদ্বর্তী। সুভাষচন্দ্রের আত্ম-জীবনীর বক্তব্য থেকেও মনে হয়, তিনি ব্যক্তিগত অধ্যাত্মসাধনাতেই কেবল শ্রীরামকৃষ্ণকে গ্রহণ করেছিলেন। উদ্ধৃত বক্তব্যে সেই প্রকার ধারণার পূর্ণ খণ্ডন লক্ষ্য করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক উন্মোচিত চেতনাস্রোত কেবল অধ্যাত্মজীবনকে নয়, ঐহিক সৃষ্টির নানাধারাকে সঞ্জীবিত করে-ছিল—একথা সুভাষচন্দ্র সুস্পষ্ট প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন।

এর পরে তিনি এনেছেন বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ :

“পরমহংসের আরব্ধ ও অসম্পূর্ণ কাজ স্বামী বিবেকানন্দ হাতে লইলেন। ভারতের বহুযুগ-সঞ্চিত জ্ঞানের সম্পদ দেশবিদেশে বিকীর্ণ করিবার জন্য তিনি প্রাচীন বৌদ্ধ পরিব্রাজকের মতো জ্ঞানের প্রদীপ হস্তে লইয়া সাগরপারে চলিলেন। এতদিন পরে ভারতবাসী ঘর ছাড়িয়া বাহিরের জন্য পাগল হইল; বিশ্বদরবারে দিবার মতো সামগ্রী নিজের ঘরে খুঁজিয়া পাইল; তারপর রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রামানুজম্, রামন প্রভৃতি ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও মনীষিগণ কতদিক দিয়া বিশ্ব-সভ্যতাকে পরিপুষ্ট করিয়াছেন। এইসব মহা-পুরুষের আজীবন সাধনার ফলে আজ ভারতীয় জাতি বুঝিতে পারিয়াছে যে, তাহাদের একটা আদর্শ আছে—বাঁচিবার উদ্দেশ্য আছে—পৃথিবীতে জাতি হিসাবে একটা মিশন আছে।”

বহির্জগতে, ভারতীয় সভ্যতার আত্ম-বিস্তারের পথ বিবেকানন্দ প্রথম একালে খুলে দিয়েছেন, এবং সেই পথ ধরেই অন্যে অগ্রসর হয়েছেন—এই বক্তব্যের পরে ভারতীয় জাতির জন্য বিবেকানন্দের দানের প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বিবেকানন্দের ‘মানুষ তৈরির’ সাধনা এবং ‘গণশক্তির উজ্জীবন’ সাধনার কথা আনলেন :

“নিজের দেশের নবীন জাতি সৃষ্টির কাজও বিবেকানন্দ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ব্যক্তির সমষ্টিই জাতি। খাঁটি মানুষ তৈয়ারী না হইলে স্বাধীন ও বলবান জাতি জন্মিতে পারে না। তাই তিনি বলিলেন—Man making is my mission—খাঁটি মানুষ প্রস্তুত করাই আমাদের জীবনের কর্তব্য। তারপর খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করিবার জন্য তিনি শ্রেণীবিশেষের মধ্যে দৃষ্টি আবদ্ধ না রাখিয়া সমগ্র সমাজের মধ্যে খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই বাণী অমর হইয়া এখনও বাঙালীর ঘরে ঘরে ঘুরিতেছে—‘তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছো?…তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে।…এরা সহস্র-সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা!…অতীতের কঙ্কালময়—এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভারত।’

“এই তো বাংলার সোস্যালিজম্। এই

সোস্তালিজম্ এর জন্ম কার্ল মার্কসের পুঁথিতে নয়। এই সোস্তালিজম্-এর জন্ম ভারতের শিক্ষা-দীক্ষা ও অনুভূতি হইতে।"

বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে কি-ভাবে দেশবন্ধু নিজের জীবন ও সাধনায় রূপদান করেছিলেন তার কথা সুভাষচন্দ্র এর পরে বলেছেন। লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে—সুভাষ-চন্দ্র প্রায়শঃই দেখাতে চেষ্টা করেছেন—অরবিন্দ ও চিত্তরঞ্জন স্বামীজীর আদর্শকে রাজনীতিতে প্রসারিত করেছেন (একথা বলার সময়ে তিনি নিবেদিতার সংশ্লিষ্ট ভূমিকার বিষয়ে নিশ্চয়ই অনবহিত ছিলেন)—অরবিন্দ তাকে প্রবাহিত করেছেন পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে প্রয়াসের ক্ষেত্রে, এবং চিত্তরঞ্জন তদতিরিক্ত সমাজতান্ত্রিক প্রচেষ্টায়।

সুভাষচন্দ্র পূর্বোক্ত রচনায় এর পরে দেশ-বন্ধুর সাধারণ মানুষের প্রতি অসীম প্রেমদ্যোতক উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যা বিবেকানন্দের চিন্তা ও উক্তির কাব্যিক তরলিত প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। [২।১১—৯০]। [ক্রমশঃ]

ঃ—সুখ

শ্রীমতী গীতি সেনগুপ্ত

সাহিত্যসেবিকা

আমি সুখেরে করিগো ভয়।
সে যে হৃদয় ধাঁধাঁনো ক্ষণিকের সাথী
জীবনের সাথী নয়॥
সে যে আসে অকারণে যায় ক্ষণে ক্ষণে
সে যে দারুণ ছলনাময়॥
সুখ এলে কাছে তাই
আমি বারে বারে চমকাই।
ব্যথা চুপি চুপি আসে থাকে পাশে পাশে
চিরদিনই সে যে রয়॥

আমি দুখেরে করি না ভয়।
সে যে কুসুমের মতো মমতা মাখানো
সে যে চিরকল্যাণময়॥
তার অনলে দহিয়া নীরবে সহিয়া
এ জীবন সোনা হয়॥
দুখ এলে কাছে তাই
আমি ধরিয়া রাখিতে চাই।
সুখ আসে উড়ে উড়ে থাকে দূরে দূরে
নির্মম নির্দয়॥

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি

ডক্টর দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়
রীডার, বাঙলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

অতি প্রাচীনকাল থেকে আমরা সমাজ-সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলাম। এই সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক অতি গভীর এবং সমাজ ধর্মনির্ভর। সমাজের উন্নতিতেই আমাদের উন্নতি। তাই প্রাচীনকালে সমাজের উপর আমাদের মমতার অন্ত ছিল না। সমাজের অনুশাসনকে কোন সময়েই অগ্রাহ্য করবার উপায় ছিল না—একমাত্র মোক্ষলাভের জন্য সর্বভূতে আত্মদৃষ্টি বা ঈশ্বরবোধ হলে অবশ্য সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্কের ঊর্ধ্বে উঠতে পারা যেত। ব্যক্তি ছিল—বহু ব্যক্তি মিলে যে সমাজ গড়ে তোলে তার কথা ছিল এবং বহু সমাজ যে বিশ্বমানবসমাজ রচনা করে তার ধারণাও ছিল খুব স্পষ্ট। কিন্তু সমাজ ও বিশ্বমানবসমাজের সম্পর্ক বিষয়ে ধারণা ছিল অস্পষ্ট। কিছু সংখ্যক সমাজ মিলে যে একটা জাতি বা রাষ্ট্র গড়ে তোলে এ-বোধ সাধারণের ছিল না। দেশের শাসনের ভার আমরা রাজার উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম। দেশকে জাতিকে রাষ্ট্রকে 'আমার' মনে করতে শিখিনি। উনিশ শতকে ইংরেজী সভ্যতাও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এবং আমাদের প্রতি ইংরেজদের বিরূপ মনোভাবে ও অত্যাচারে ধীরে ধীরে এই নূতন বোধটি সর্বসাধারণের চিত্তে জাগ্রত হয়েছে। খ্রীষ্টান মিশনারীদের হিন্দুধর্ম আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় সর্বপ্রথম আমাদের মধ্যে জাতীয় ভাবটি ফুটে উঠতে থাকে। পাশ্চাত্য দেশগুলির সঙ্গে তুলনায় নিজ-দেশের দৈন্য সম্পর্কেও আমরা অবহিত হতে থাকি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অনেক কবি কবিতায় ও গানে দেশের প্রতি মমতায় দেশের দুঃখ-দুর্দশা ও দারিদ্র্যের চিত্র তুলে ধরতে থাকেন। এঁদের গানে ও কাব্যে কল্পনা ও উচ্ছ্বাসের মাত্রা কিছু অধিক থাকলেও আন্তরিকতার অভাব ছিল না। এঁরা সকলেই বাংলার কবি—কিন্তু তাঁদের ভাবনায় বাংলা নয়, সমগ্র ভারত-ভাবনা রূপ পেয়েছিল। তখনও দেশবাসী রাজনৈতিক দিক থেকে জেগে ওঠেনি। একই হিন্দু-সংস্কৃতির ধারাকে প্রায় সমগ্র ভারতে বহমান দেখে, একই ইংরেজ শক্তির অধীনে সমগ্র ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করে এবং বাংলার বুকে বসে ইংরেজদের সমগ্র ভারত-শাসনের প্রয়াস নিরীক্ষণ করে সম্ভবত এঁদের মনে বাংলার পরিবর্তে ভারত-ভাবনা জাগ্রত হয়েছিল। ঈশ্বরগুপ্তের 'দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া', রঙ্গলালের 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে ?' মধুসূদনের দেশমাতাকে 'শ্যামা জন্মদে' বলে সম্বোধন এবং 'মেঘনাদবধ কাব্যে' রামচন্দ্রের স্বর্ণলঙ্কা আক্রমণকে বিদেশীর অন্যায় অনুপ্রবেশরূপে দেখে সেদিন দেশবাসী তাঁদের প্রাণের কামনা চরিতার্থ করতেন। পদ্মিনী ও প্রমীলার চরিত্রের বীরাঙ্গনা নারীর দৃষ্টান্ত পেয়ে তাঁরা আশ্বস্ত হতেন। নাট্যকার দীনবন্ধুর নাটকে ইংরেজদের অকথ্য অত্যাচারের চিত্র এবং মনোমোহন বসুর নাটকগুলির জাতীয়-ভাব নানাভাবে তাঁদের অনুপ্রাণিত করত।

এ সময় চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও জাতীয়তার ভাব ফুটিয়ে তুলতে নানা চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে রাজা রামমোহনের স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বজাত্যাভিমান, রাজনারায়ণ বসুর 'জাতীয়-গৌরব-সম্পাদনী সভা'র প্রতিষ্ঠা, নবগোপাল মিত্রের 'দেশ-পূজা' ও 'হিন্দু-মেলা' প্রতিষ্ঠার কথাও বিস্মৃত হতে পারি না। বঙ্কিম-পূর্ব বাংলা-সাহিত্যে ও বাংলার

চিন্তাশীল সমাজে এইভাবেই জাতীয়তার উন্মেষ ও দেশপ্রীতির সুর অল্প অল্প করে ফুটে উঠছিল।

ঠিক এইরকম সময়েই এসেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। প্রথম জীবনে তিনি নাস্তিক ছিলেন এবং ইংরেজীতেই লেখকরূপে আত্মনিয়োগ করার ইচ্ছেও যে ছিল একথা মিথ্যা নয়। কিন্তু যেদিন থেকে বাংলাভাষার অনুশীলনে তিনি প্রতিভার সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন, সেদিন থেকেই তাঁর মধ্যে জাতি-প্রীতির লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে এই দেশপ্রীতির চেতনাটি পুষ্ট হতে থাকে এবং এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত এই দেশপ্রীতির একটি নূতন তত্ত্ব খাড়া করেন। তাঁর এই দেশপ্রেম অতিশয় গভীর এবং সমস্ত জীবনব্যাপী তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসার ফলশ্রুতি স্বরূপ যে ভগবদ্ভক্তি তারই অন্তর্গত। কিন্তু সেকথা পরে।

'মৃণালিনী'তে সর্বপ্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রীতির অঙ্কুর লক্ষ্য করা যায়। সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গদেশ আক্রমণ করলে এ-দেশের শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজা লক্ষণসেন খিড়কি-দরজা দিয়ে ভয়ে পলায়ন করেন—জাতির এ অপবাদ তিনি সহ্য করতে পারেননি। ইতিহাসের ঐ কাহিনীকে তিনি বিশ্বাস করেননি। বাঙালীর ভীরুতার কলঙ্ককে তিনি মানেননি। বাংলাকে যুদ্ধে জয় করা সম্ভব নয়,—চাতুর্যেই একে জয় করা হয়েছিল এবং মন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতাও তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বলে তিনি মনে করেছিলেন। আরও পরে 'বঙ্গদর্শন'-এ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' নামক প্রবন্ধে তিনি এর সুন্দর জবাব দিয়ে বলেছিলেন, "সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, একথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।"

ইতিহাসের সত্য-চিত্র উদ্ধার করে বা সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক সত্যের উপর স্বদেশপ্রীতিকে বা জাতীয়তাবোধকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ বঙ্কিমের দেশপ্রীতির নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া গেল। 'একটি গীত' ও 'আমার দুর্গোৎসব'-এ এই দেশপ্রেম ঘনীভূত রূপ ধারণ করেছে। জাতির প্রতি ভালবাসা এ-গ্রন্থের নানা প্রবন্ধেই লক্ষণীয় হয়েছে, তবে 'আমার দুর্গোৎসব'-এর ধ্যানে কমলাকান্ত 'মৃন্ময়ী কৃত্তিকা-রূপিণী-অনন্তরত্নভূষিতা এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা' যে মাকে দর্শন করেছেন এবং ভবিষ্যতে যাঁকে আবার দর্শন করবেন বলে আশা পোষণ করেছেন—সেই মা-ই তাঁর উদ্দিষ্ট জন্মভূমি। লক্ষণীয় এই যে, এই দেশজননীর সঙ্গে তিনি হিন্দুর দেবী-দুর্গাকে একাত্ম করে দেখেছেন। তাঁর সোনার বাংলা যেদিন পরাধীন হল, সেদিন থেকেই মায়ের দুর্দিন—সেদিন থেকে অধীর আগ্রহে তাঁর সন্তানদের প্রতীক্ষা—কবে মায়ের আবার সেই হাস্যময়ী সুবর্ণময়ী রূপ দেখা দেবে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গানটির মধ্যেও দেশমাতৃকার অপরূপ সৌন্দর্য ও ভবিষ্যৎ-গৌরবময়-চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। মায়ের 'সুজলা-সুফলা মলয়জশীতলা মূর্তি' বঙ্কিমের চিত্তকে উদ্বেল করেছে এবং ভবিষ্যৎ জননীর শৌর্য-বীর্য-ঐশ্বর্য, বিদ্যা, বলে সমন্বিতা রূপের কাল্পনিক চিত্রে তিনি বিমুগ্ধ হয়েছেন। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে গানটি সন্নিবেশিত হলেও তার কয়েক বছর পূর্বেই এটি রচিত হয়েছিল। এই উপন্যাসের সন্তানদলও দেশমাতৃকার পূজারী। একটি গভীর জঙ্গলের মধ্যে আনন্দময় কাননে সন্তানদলের 'আনন্দমঠ'। মঠের অধ্যক্ষ সত্যানন্দ একটি প্রায়ান্ধকার কক্ষে মহেন্দ্রকে প্রথমে 'দেবী দর্শন' করিয়েছিলেন। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী একটি প্রকাণ্ড চতুর্ভুজমূর্তির

বামে আলুলায়িতকুন্তলা লক্ষ্মী—শতদলমালায় শোভিতা ও কতকটা ভয়গ্রস্তা। দক্ষিণে সরস্বতী। আর ঐ চতুর্ভুজ বিষ্ণুর কোলে আর একটি মোহিনীমূর্তি—লক্ষ্মী ও সরস্বতীর চেয়ে বেশি সুন্দরী ও ঐশ্বর্যময়ী। সত্যানন্দ বিশেষ করে এই মূর্তিটির দিকে মহেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ব্রহ্মচারী জানালেন—উনিই মা এবং 'আমরা যাঁর সন্তান',—সন্তানদলের সকল কর্মে উৎসাহ ও প্রেরণা ইনিই দান করেন। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে নিয়ে গিয়ে দেবীর আরও তিনমূর্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সর্বালঙ্কারভূষিতা হাস্যময়ী ঐশ্বর্যময়ী এক সুন্দরী মূর্তি, ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ক্ষীণ আলোকে হৃতসর্বস্বা এক নগ্নিকা কালিকামূর্তি, আর একটিতে সুবর্ণনির্মিতা দশভুজা এক হাস্যময়ী প্রতিমা। মা যা ছিলেন, মা যা হয়েছেন ও মা যা হবেন—মায়ের এই তিনমূর্তি। জগদ্ধাত্রী, কালী ও দুর্গা—এই তিন দেবীরূপে বঙ্কিমচন্দ্র দেশমাতৃকার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রূপকে বুঝিয়েছেন। হিন্দুর একই শক্তি-দেবীর তিন-রূপের সঙ্গে দেশজননীকে একাত্ম করে দেখার পরিকল্পনাটি বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পূর্ণ নিজস্ব। কিন্তু 'আনন্দমঠে' বিষ্ণুর অঙ্কে শায়িতা যে মাতৃমূর্তিকে প্রথম মহেন্দ্র দেখেছেন তিনি কে? জগতের পালনকর্তা বিষ্ণু সেখানে নিজ অঙ্কে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন। ইনিও ঐশ্বর্যময়ী, সুন্দরী ও মোহিনী—কিন্তু ইনি তো লক্ষ্মী বা সরস্বতী নন। মনে হয় বঙ্কিমের কবি-কল্পনায় ইনি দেশজননীর দেশ-কালাতীত রূপ। এখনও সন্তানদল আত্মশক্তিতে ও সর্বদিকে প্রস্তুত হয়ে ওঠেনি বলে তিনি বিষ্ণুর আশ্রিতা। অবশ্য এই রূপের মধ্য দিয়েই তিনি সন্তানদলের মধ্যে প্রেরণা-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে চলেছেন।

আবার 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত—যেটি এ উপন্যাসের সবচেয়ে বড় গৌরব সেখানেও মাতৃ-রূপ-বন্দনা আছে। দেশের প্রাকৃতিক রমণীয় দৃশ্যাদির মধ্যে মাকে সন্তানদল প্রত্যক্ষ করেন। দেশের জলে, স্থলে স্নিগ্ধ বায়ুতে ও শ্যামল শস্য-ক্ষেত্রে মায়ের রূপ প্রতিভাত হয়। পূর্ণিমারাত্রির স্নিগ্ধ আলোকে মায়ের হাসি ফুটে ওঠে, বনের কুসুম-সৌন্দর্যে তাঁর রূপ দীপ্যমান হয়ে ওঠে—বনের মর্মরে ও পাখির কলতানে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যায়। এই যে মায়ের রূপ এতে তিনি 'সুখদা' 'বরদা' 'ক্ষেমঙ্করী'। কিন্তু মায়ের আর একরূপও আছে—যেখানে তিনি ভয়ঙ্করী শক্তি-রূপা। তখন সপ্তকোটি কণ্ঠের কলনাদ তাঁর কণ্ঠে। দ্বিসপ্তকোটিহস্তধৃত শাণিত অস্ত্র তাঁর হাতে—সন্তানকে রক্ষার জন্য তখন তিনি ভীষণা।

এই দুই রূপেই জননী সন্তানদের সর্বস্ব। তিনি তাদের বিদ্যা, ধর্ম, প্রাণ, বাহুতে শক্তি ও হৃদয়ে ভক্তি।

> "ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
> কমলা কমল-দল বিহারিণী
> বাণী-বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাম্
> নমামি কমলাম্ অমলাম্ অতুলাম্
> সুজলাং সুফলাং মাতরম্
> বন্দে মাতরম্
> শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
> ধরণীং ভরণীং মাতরম্।"

আনন্দমঠের দেবীর ঐ তিনমূর্তির মধ্যে শেষোক্ত দেবী দুর্গার রূপ অর্থাৎ দেশজননীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল-রূপকে প্রতিষ্ঠিত করাই সন্তানদলের অভিপ্রেত। বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্যের প্রভাবে দেশকে শুধু মা বা জননী বলেই সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি দেশকে গভীরভাবে সেবা ও ভক্তির কথা বলেছেন। ভক্তির চূড়ান্ত আদর্শ দেবতায়। আবার ভক্তির পাত্র বা পাত্রীর আকার না থাকলে ভক্তের চিত্ত স্থির হয় না। তাই বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুর শ্রেষ্ঠ দেবী

দুর্গার সঙ্গে দেশমাতৃকাকে এক করে দেখেছেন এবং দেশমাতৃকাকে বোঝানোর জন্য ঐ দেবীর রূপ কল্পনা করেছেন। তাছাড়া যে-হিন্দুর চিন্তায় সর্বভূতেই ঈশ্বর, সে-হিন্দু দেশকে দেবতারূপে ধ্যান অনায়াসেই করতে পারে।

আনন্দমঠেই বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি ভাবনার পরিণত রূপ দেখতে পাওয়া যায়। এ উপন্যাসের কাহিনীকে অষ্টাদশ শতকের অরাজক বাংলার বুকে স্থাপিত করা হয়েছে। যে-বৎসর বঙ্গদেশে মন্বন্তর হয়, তখন বাঙলায় চলছে মুসলমানী শাসনের অব্যবস্থা। বাঙলার মুসলমান শাসকগণ কেন্দ্রের দুর্বলতার সুযোগে অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছিলেন। তখন ইংরেজরা আদায় করেন খাজনার টাকা দেওয়ান হিসেবে, আর দেশ-শাসন করেন মীরজাফর ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা। শাসনের নামে পীড়ন আর নির্যাতন দেশবাসীকে সহ্যের শেষ সীমায় নিয়ে গিয়েছিল—ঠিক এই পরিবেশেই দেখা দেয় সন্ন্যাসিবিদ্রোহ। ইতিহাসের এই তথ্যের উপর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অসাধারণ কল্পনাশক্তিবলে নূতন সৌধ নির্মাণ করেন। বীরভূম জেলার অজয়-নদের তীরে আনন্দমঠ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করে সন্তানদল দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে কৃতসংকল্প হয়। দেশই তাঁদের জননী—সন্তানদল অনন্যমাতৃক। এই সন্তানদলের সঙ্গে বারবার মুসলমান ও ইংরেজদের ছোটখাটো সংঘর্ষ হয়েছে। দুবার বৃহৎ সংঘর্ষে বহু সৈন্য নিহত হলেও শেষ পর্যন্ত সন্তানদলের বীরত্বে তাদের জয়লাভ ঘটে। কিন্তু সন্তানদলের শেষ জয়লাভের পর যখন দেশ-শাসনের প্রকৃত সুযোগ এল এবং সনাতনধর্ম নিষ্কণ্টক হল, তখন আনন্দমঠের মহাপুরুষ সত্যানন্দকে সন্তানদল ভেঙে দেবার আদেশ করলেন। যে-প্রয়োজনে সত্যানন্দ এসেছিলেন তাঁর কর্তব্য সমাপন হয়েছে আর প্রাণীহত্যার প্রয়োজন কি? সত্যানন্দ তীব্র মর্মযন্ত্রণায় কাতর হয়ে মাতৃরূপা জননীর দিকে চেয়ে বললেন, "হায় মা, তোমায় উদ্ধার করিতে পারিলাম না। আবার তুমি ম্লেচ্ছের হাতে পড়িবে। হায় মা, কেন আজ রণক্ষেত্রে আমার মৃত্যু হইল না।" তখন মহাপুরুষ তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে, দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করে তাঁর দল জয়লাভ করেছে। পাপের কখনও পবিত্র ফল হয় না। তাছাড়া ইংরেজ রাজা না হলে সনাতন হিন্দুধর্মেরও পুনরুত্থানের সম্ভাবনা নেই। এরপর মহাপুরুষ সত্যানন্দকে বোঝালেন যে, প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, ধর্মাত্মক নয়। আবার এ জ্ঞানও দুরকম—বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক জ্ঞানই আসল। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান না জন্মালে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মাবার সম্ভাবনা নেই। ইংরেজ এ-জ্ঞানে অত্যন্ত সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় পটু। সুতরাং ইংরেজকেই এখন রাজা করতে হবে। এই কারণেই মহাপুরুষ সত্যানন্দকে যুদ্ধে নিরস্ত করে তাঁর অনুসরণ করতে বলেছিলেন।

আনন্দমঠের এই কথাকে ভালভাবে না বুঝলে বঙ্কিমকে ঠিক বোঝা যাবে না। যদি মনে করা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন, তাঁদের ভয়ে উপন্যাসের শেষে তাঁদের রাজা করবার কথা বলেছেন, তাহলে তাঁর প্রতি খুবই অবিচার করা হবে। সন্তানদল যুদ্ধে জয়লাভ করলেও এত বড় দেশ শাসনের মতো ক্ষমতা তখনও তাঁদের হয়নি—দেশের সকল মানুষ তখনও ঐক্যবদ্ধ হয়নি—একটা বড় দেশকে চালনার যে-জ্ঞান তাও তাদের হয়নি। সুতরাং আরও কিছুকাল গোপনে গোপনে দেশবাসীকে প্রস্তুত হওয়ার কথা তিনি বলেছেন। আর ইংরেজদের কাছ থেকেই নিজেদের দেশকে নিজেদের হাতে নেবার জন্য কিছু কিছু বাইরের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কিন্তু তাদের কাছে

জ্ঞানের পূর্ণতা ঘটবে না। অন্তর্বিষয়ক জ্ঞানের জন্য আমাদের উপনিষদ্, দর্শন ও পুরাণ বিশেষ করে শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতাকে বিশেষ ভাবে আশ্রয় করতে হবে। স্বদেশপ্রীতির এই তত্ত্বকথা বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮৮-এ প্রকাশিত ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থে সুন্দর-ভাবে বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে দেশপ্রীতি সম্পর্কে একটি নূতন ধারণা দিয়েছেন। পাশ্চাত্যের দেশপ্রীতির সঙ্গে তার পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। তাঁর দেশপ্রীতি ইউরোপীয় Patriotism নয়। ইউরোপীয় দেশ-প্রীতি তাঁর মতে 'ঘোরতর পৈশাচিক পাপ'। তিনি বলেছেন, "ইউরোপীয় Patriotism ধর্মের তাৎপর্য এই যে পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই দুরন্ত Patriotism-এর প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতিসকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর যেন ভারতবর্ষের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্য ধর্ম না শেখেন।"

পাশ্চাত্যের দেশবাৎসল্য বড়ই সংকীর্ণ। তা তাদের দেশের মানুষের কল্যাণ ও উন্নতির চিন্তা ছাড়িয়ে আর উঠতে পারে না। তাই তাদের দেশপ্রেম অন্য দেশের, অন্য জাতির বা পৃথিবীর সকল মানুষের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করতে পারে না। নিজ দেশবাৎসল্যকে অতিক্রম করে বিশ্বমানুষের কল্যাণের চিন্তায় মানুষ উদ্বুদ্ধ না হতে পারলে সে দেশপ্রেম বঙ্কিমের কাছে অর্থ-হীন। অথচ ভারতীয় হিন্দুর তত্ত্ব-চিন্তায় এ-বিরোধের সমাধান ছিল। বঙ্কিম ধর্মতত্ত্বে তার চমৎকার ইঙ্গিত করেছেন। আত্মপ্রীতি থেকে স্বজনপ্রীতি; স্বজনপ্রীতি থেকে দেশপ্রীতি এবং দেশপ্রীতি থেকে বিশ্বমানবপ্রীতিতে যেতে হবে। যাওয়া খুব কঠিনও নয় ভারতীয়দের কাছে। কারণ ধাপে ধাপে আত্মরক্ষা থেকে দেশপ্রীতি আসার সময় মানুষ নিজ স্বার্থকে ত্যাগ করছে—কিন্তু সর্বভূতে আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বরজ্ঞানের ধারণা তাকে বিশ্বপ্রীতিতে নিয়ে যেতে পারে। বঙ্কিমের দেশপ্রীতি তাঁর অনুশীলন-ধর্মের অন্তর্গত। এই ধর্মে মানুষের শারীরিকী বৃত্তি, জ্ঞানার্জনী বৃত্তি, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি এবং কার্যকারিণী বৃত্তি—এই চার-বৃত্তির সুসমঞ্জস অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও পরিণতিতেই মানুষের মনুষ্যত্ব—তাই সুখ ও তাই ধর্ম। আর এই সকল বৃত্তির ভগবৎ-অনুবর্তিতাই হল ভক্তি। তিনি যে কার্যকারিণী বৃত্তির কথা বলেছেন তারই অন্তর্গত হল ভক্তি, প্রীতি ও দয়া। ভক্তির মধ্যে আবার ঈশ্বরভক্তিই শ্রেষ্ঠ। প্রীতির মধ্যে ক্রম-অনুযায়ী স্বদেশপ্রীতিই শ্রেষ্ঠ, কারণ স্বদেশপ্রীতি তো স্বদেশের মানুষের মধ্যে প্রীতিতে সীমাবদ্ধ নয়—তাকে ছাড়িয়ে বিশ্বের সকল মানুষের প্রতি প্রীতিতে গিয়ে ঠেকে—আর তা ঠেকলেই তা ঈশ্বরপ্রীতিরই সামিল হল—কেননা সর্বভূতে ঈশ্বর রয়েছেন—আর তাই হল ভক্তি। আনন্দমঠের উপক্রমণিকায় এই শুদ্ধাভক্তির কথাই বলা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ধর্মতত্ত্বে এ-বিষয়ে বলেছেন, "ভারতবর্ষীয়দের ঈশ্বরে ভক্তি ও সর্ব-লোকে সমদৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাঁহারা দেশপ্রীতিকে এই সার্বলৌকিক প্রীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রীতিবৃত্তির সামঞ্জস্যযুক্ত অনুশীলন নহে। দেশপ্রীতি ও সার্বলৌকিক প্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পর সামঞ্জস্য চাই। তাহা ঘটিলে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিবে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতিতে পরজাতি কর্তৃক আক্রান্ত হলে মার খেতে হবে—এমন কোন নির্দেশ নেই। যে আক্রমণকারী নিশ্চয়ই তাকে বাধা দিতে হবে—তার আক্রমণ থেকে আত্ম-রক্ষার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে—কিন্তু তার প্রতি 'প্রীতিশূন্য' হওয়া চলবে না।

যুদ্ধকে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত নিকৃষ্ট মনোভাব বলে নিন্দা করেছেন, কিন্তু তাঁর দেশপ্রীতিতে যুদ্ধের স্থান আছে—কিন্তু যুদ্ধ দেশপ্রীতির মূল লক্ষ্য কখনই হবে না—মূল লক্ষ্যটা হবে আপসের দিকে।

বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে তাঁর স্বদেশপ্রীতিতে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের প্রয়োজনে ইংরেজদের রাজা করার কথায় একালের অনেকেই বঙ্কিমের কঠোর সমালোচনা করেন। কিন্তু এ-কালের মানুষ সে-কালের সত্য-চিত্রের কথাটা মনে রাখেন না বলেই এমন ভুল করেন। তাঁরা কি ভুলে যান রাজা রামমোহনের কথা। তিনি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী আর্নল্ডকে বলেছিলেন যে, ইংরেজ এদেশের লোকের বহির্বিষয়ক জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য আরও চল্লিশ বছর রাজা হয়ে থাকুন। তাছাড়া সিপাহী-বিদ্রোহ-দমনের সময় ইংরেজদের ভয়াবহ মারমুখী মূর্তি ভারতের মানুষকে তাঁদের প্রতি বিদ্বিষ্ট করলেও ইংরেজদের পাণ্ডিত্য, উদারতা, এবং কঠোরভাবে দেশের অরাজকতা ও চোর-ডাকাতদের উপদ্রব বন্ধ করবার মতো অদ্ভুত শক্তি এদেশের অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এটা ছিল যুগের হাওয়া। বঙ্কিমচন্দ্র এই হাওয়াতেই হোক অথবা তাঁর ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিশক্তির জন্যই হোক, (তিনি তাঁর ধর্মতত্ত্বে যা বলেছেন তাতে যা বুঝি) তিনি ইংরেজদের সংস্রব তখনই ত্যাগ করতে চাননি। এতে বঙ্কিমের স্বদেশপ্রীতির মর্যাদা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে আমরা মনে করি না। ইতিহাসের সত্যও প্রমাণ করে যে, ভারতীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগ্রত হয়ে ঘনীভূত হতে আরও চৌষট্টি বছর লেগেছে, তবেই ভারত স্বাধীন হয়েছে।

আনন্দমঠে মুসলমান ও ইংরেজদের সম্মিলিত শক্তির সঙ্গে সন্তানদলের সংঘর্ষ হয়েছে। তাই বলে বঙ্কিমকে সাম্প্রদায়িক বা মুসলমান-বিদ্বেষী বলা চলে না। তখনকার দিনে অর্থাৎ ইংরেজ-শাসনে প্রকাশ্যে ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধের চিত্র অঙ্কন করা সহজ ছিল না। তাই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের চিত্রের আবরণে তা দেখানো হত। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে স্পষ্টভাবেই দেখা যায়, বঙ্কিম মুসলমান-বিদ্বেষী মোটেই ছিলেন না। তাঁর সমস্ত জীবনব্যাপী সাধনায় লব্ধ যে-ধর্ম তার অনুশীলন হিন্দু হোক মুসলমান হোক যিনিই করুন তিনিই ধার্মিক। কিন্তু তিনি বলেছেন, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ের "নবাবগণ ধর্মবর্জ্জিত ছিলেন, ক্ষমতাবর্জ্জিত ছিলেন, সাহসবর্জ্জিত ছিলেন। সুতরাং আনন্দমঠে এরূপ শাসনকর্তৃগণকে (তাঁহাদের সমাজকে নয়) দেশের শত্রু বলা দোষের নয়।" ধর্মবর্জ্জিত অত্যাচারী শাসনকর্তাগণকে নিন্দা করার অর্থ সমগ্র সমাজকে হেয় করা বুঝায় না। চন্দ্রশেখরে মীরকাসেমকে বাঙলার শেষ রাজা বলা হয়েছে, কারণ পরের নবাবেরা কেউই রাজত্ব করেননি। মীরকাসেমের রাজত্বের শেষ সময় দেশে রাজা ছিল না—কিন্তু কর আদায়ের নিদারুণ অত্যাচার ছিল বলে অত্যাচারী কর-আদায়কারী মুসলমানদের দেশের শত্রু বলা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলমান বঙ্কিমসাহিত্যে একটা ভাবের প্রতীক মাত্র। স্বাধীনতার পরিপন্থী শক্তিরূপে যেখানে যে-কেউ এসেছে, সেখানে সেই আক্রমণেরও বিষয় হয়েছে। তাই বঙ্কিমের স্বদেশপ্রীতিতে মুসলমান-বিদ্বেষ নেই।

আরও একটি কথা বঙ্কিম-সমকালে অধিকাংশ কবি ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই বাংলাদেশের হলেও তাঁদের স্বদেশ-ভাবনা ভারত-ভাবনারই যে সামিল সে-কথা পূর্বে বলেছি। বঙ্কিমও ভারতের কথাই ভেবেছেন ('ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধ), কিন্তু তিনি বাঙালীর ও বাংলাদেশের কথাও অনেক ভেবেছেন। তিনি জানতেন, আগে নিজের দেশকে ভাল করে জানতে হবে—তারপরে সমগ্র ভারতবর্ষকে—তারও পরে বিশ্বজনীন ভারতীয় আদর্শকে। তাঁর 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত দিব্যপ্রেরণায় রচিত এক অপূর্ব গীত। বঙ্গদেশের রূপই এর মূলদেশে নিহিত ছিল। তবুও তা সমগ্র ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হয়ে উঠেছে। দেশ-জননীর সাকারমূর্তির বন্দনা অহিন্দুরাও করতে পারেন।

বাঁকুড়া জেলার লোকসংস্কৃতিতে লৌকিক দেবদেবী-প্রসঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণেন্দু চৌধুরী

[পূর্বানুবৃত্তি]

জিতাষ্টমী ও শেয়াল-শকুনিপূজা

বৈদিক দেবতা জিমূতবাহন এবং মা-ষষ্ঠীর উদ্দেশ্যেই এই পূজা করে থাকেন মেয়েরা। লোকবিশ্বাস এইরূপ যে, এই দেবতার পূজা করলে নারী পুত্রবতী হয়, জীবনে সুখ-শান্তি এবং দীর্ঘায়ু লাভ করে। ভাদ্র বা আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ-পক্ষের অষ্টমী তিথিতে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে দিয়েই এই পূজা করানো হয়। ঘট, ধূপ, দীপ, গঙ্গাজল, গঙ্গামৃত্তিকা, তুলসীপাতা, বাঁশপাতা, আম্রপল্লব, যব, তিল, দূর্বা, ফুলের মালা প্রভৃতি উপকরণ এই পূজার প্রধান সামগ্রী। নৈবেদ্যর মধ্যে শশা, পান, ছোলাভিজা, হরিতকী প্রভৃতি। এছাড়াও দীপ, দক্ষিণা সে তো আছেই। পূজার পর শাঁখ বাজানো হয়। এই জিতাষ্টমীর দিনে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ-পরিবারে পূজিতা ও আরাধ্যা মৃন্ময়ী দেবীর কল্পারম্ভ হয়। জিতাষ্টমী ও তার পরের দিনে কল্পারম্ভে মল্লরাজাদের মৃন্ময়ী দেবীর মন্দিরে আসেন বড়-ঠাকরুন নামক দেবী, মান চতুর্থীর দিনে মেজ-ঠাকরুন আর যিনি ষষ্ঠীর দিনে আসেন তিনি ছোট-ঠাকরুন নামে অভিহিতা। মানিকলাল সিংহ-কৃত "পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি" গ্রন্থ থেকে এই কথা জানা যায়।

জিতাষ্টমীর দিন বিকেলে ছেলেদের দিয়ে বটগাছের সরু ডাল ভাঙিয়ে ব্রতীরা ঘরের উঠানে পোঁতেন। তারপর বটডালটিকে পদ্মফুল ও শালুকফুল দিয়ে সাজিয়ে পূজা করা হয়। বট-ডালের গোড়ায় অর্থাৎ মাটির দিকে যে অংশটা পোঁতা আছে সেখানে শিকড়গুচ্ছ কচি ধানগাছ, মানকচু, হলুদ, জয়ন্তী প্রভৃতি রাখা হয়। পূজার পর ছোলাভিজা ও শশা প্রত্যেককে দেওয়া হয়। এই পূজায় বলি দেওয়া নিষিদ্ধ। ব্রতীরা বলেন, "মা-ষষ্ঠীর প্রিয় গাছ বট।" বাঁকুড়া শহরের সন্নিকটবর্তী বড় গ্রাম হল সানবাঁধা। সেখানে বটতলাতে আগেও জিতাষ্টমীর পূজা হত, এখন আর হয় না। বট, অশ্বত্থ, নিম, কদম, বেল, বকুল, তমাল প্রভৃতি গাছকে মানুষ দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। সানবাঁধা গ্রামে ঢুকবার মুখে আছে তমালতলা। লোকবিশ্বাস রাধা-কৃষ্ণ দোলনায় করে এখানে দুলেছেন। এখানে যে তমালগাছটি আছে সেটিও বৃহদাকার এবং সুবিশাল উঁচু। নূতন বস্ত্র পরবার আগে লোকে তা থেকে ডগ বা সুতো ছিঁড়ে বেঁধে দিয়ে আসে। প্রতীক হিসাবে পূজারও এখানে বেশ প্রচলন আছে। তমালগাছকে বাঁকুড়ার লোকে সাক্ষিগোপাল-জ্ঞানে পূজা করে। ঝুলন-পূর্ণিমার দিনে সেই কারণেই এখানে অনেক জায়গাতেই তমালবৃক্ষের পূজা করা হয়। জিতাষ্টমীর সঙ্গে অবশ্য তমালের কোন সম্পর্ক নেই—যা সম্পর্ক তাহল ঐ বটবৃক্ষের সঙ্গে। ঐ বটডালের কাছে ব্রতীরা নিজেদের হাতে-গড়া ছোট ছোট শেয়াল, শকুনি-গুলিকে শালপাতার ডোঙায় (কেউ কেউ বলেন ঠোঙায়) করে পাশে নামিয়ে রেখে হলুদে ছোপানো বস্ত্রখণ্ড দিয়ে ঢেকে রাখে। পূজোর সময় শেয়াল-শকুনিদের কপালে ও চোখে যথা-ক্রমে সিঁদুর ও কাজল পরানো হয়। ব্রতিনীরা নিরম্বু উপবাসে থাকেন সারাদিন ধরে। পূজার পর মেয়েরা পরস্পর অন্য মেয়েকে কাজল পরান, সখ্যভাব যাতে আরও বেশি করে গড়ে ওঠে তার জন্য। বশীকরণ বিদ্যার প্রতীক হল এই কাজল। জিতাষ্টমীর পরের দিনে ব্রতীরা সামনা-সামনি নদী, পুকুর বা জলাশয়ের ধারে বটডাল,

শেয়াল, শকুন প্রভৃতি বিসর্জন দিয়ে নিজেরা ডুব দিয়ে বাড়িতে আসবার আগেই ফলজাতীয় জিনিস (সাধারণত শশা) খেয়ে থাকেন। কেউ কেউ আবার ঐখানেই চিঁড়া, দুধ গুড় মেখে খান। স্নানের পর ব্রতীরা সূর্যদেবতা ও মেঘকে প্রণাম করে বলেন, "হে মেঘখণ্ড, তুমি জিমূতবাহনের বাহন; তোমাকে প্রণাম করি। হে সূর্যদেব, তোমার মতন আমি যেন পবিত্র ও দীপ্তিমান হই।" ব্রতীরা প্রথমে বটগাছের ডালটি বিসর্জন দেন, তারপরে যথাক্রমে শকুনি ও শেয়াল। শকুনি ও শেয়াল বিসর্জন দেবার সময় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বলতে থাকে—

"শকুনি গেল ডালে,
শিয়াল গেল খালে
ও শিয়াল তুই মরিস না,
লোক হাসিটা করিস না।
শিয়াল গেল খাল-কে
শকুনি গেল ডাল-কে।"

বাঁকুড়ার জনমানসে প্রচলিত গল্পকথা থেকে জানা যায় যে, শেয়ালকে 'খালে' পাঠানোর বন্দোবস্ত এই জন্যই যে, শেয়াল ঠিকভাবে ব্রতটি পালন করেনি; জিতাষ্টমীর দিনে সে পুকুরপাড় থেকে হাঁস ধরে নিয়ে গিয়ে তার রক্তমাংস খেয়েছে; এমনকি মরা বেড়াল ছানার মাংসও তারপরে খেয়েছে। অন্যদিকে শকুনি শত প্রলোভনেও ভোলেনি; গরু মরে পড়ে আছে, মাংস দেখেও খায়নি—কাছে গিয়েও ফিরে এসেছে। এই পূজা শুধু মেয়েরাই করে থাকেন।

বাঁকুড়া জেলায় দেবীপূজারও বেশ প্রচলন আছে। রামপুর, শালতোড়া, মালিয়াড়া প্রভৃতি গ্রামে দেবীপূজা হয়। আশ্বিন-সংক্রান্তি থেকে কার্তিক-সংক্রান্তি পর্যন্ত দেবালয়ে প্রত্যেক ব্রতী চোদ্দটি মাড়ুলীতে সন্ধ্যাবেলায় চোদ্দটি প্রদীপ দিয়ে দেবতার উদ্দেশে বাতি দেখায়। একে বলা হয় দেবীপূজা। অবশ্য দেওয়ালীর দিনেই কেবলমাত্র চোদ্দটি মাড়ুলী ভোরবেলায় দিয়ে যান মালিয়াড়া গ্রামের ব্রতীরা; অন্যান্য দিন একটি করে। মালিয়াড়া গ্রামে দেওয়ালীতেই দেবীপূজা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু শালতোড়া গ্রামের বাসিন্দারা কার্তিক-সংক্রান্তি পর্যন্ত দেবীপূজা করেন। সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ জেলে দেওয়ার পরে তা থেকেই কাজল পেড়ে নেন ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে পরানোর জন্য। দেবীপূজায় কেবলমাত্র মেয়েরাই অংশ গ্রহণ করতে পারেন। মনে হয়, এই দেবী হচ্ছেন লক্ষ্মী। কারণ মেয়েরা যখন কাজল পাড়তে থাকেন কাজললতায় তখন তাঁরা বলতে থাকেন—

"এবগণ দেবগণ তিন তুলসী নারায়ণ
নারায়ণের জলটুকু পড়ল সাগরে;
সাগর তো শুকিয়ে গেল পশ্চিম নগরে।
পশ্চিম পশ্চিম একাদশ
ধনে পুতে বাড়ে দশ
বাবা সন্ন্যাসীর চরণে।
আজ ভৈরব থাকবে কাল তুলসীর বনে
কাল তোমাকে নিয়ে যাবো ছোট মাড়ুলী দিয়ে।
ছোট মাড়ুলী বড় মাড়ুলী মাড়ুলী তলায় ঘর,
এক পাতা তুলসী দিয়ে তিষ্ট বরাবর।
সাঁঝ দিলাম সলতে দিলাম স্বর্গে দিলাম বাতি
সব ঠাকুরের সন্ধ্যা নাও মা লক্ষ্মীসরস্বতী।"

বড়ামপুজা

বাউরি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরাই এই পূজা করে থাকেন। গাছতলায় মাটির বা পাথরের হাতি-ঘোড়া রেখে এই পূজা করা হয়। বৎসরে মাত্র একদিন (পৌষ-সংক্রান্তির দিনে) এই পূজা বাউরিরা নিজেরাই করেন। পূজার পরে শূকরও বলি দেন তাঁরা।

ভাদুপূজা

ইন্দপুর, ইন্দাস তালডাংরা প্রভৃতি অঞ্চলে এই ভাদুপূজার বেশ প্রচলন আছে। এখানে জনশ্রুতি এরূপ যে, পঞ্চকোটের রাজকুমারী হলেন ভাদু বা ভদ্রেশ্বরী দেবী। ১লা ভাদ্র থেকে ভাদুপূজা শুরু হয় এবং শেষ হয় ১লা আশ্বিন ভাদুর মন্ত্রও ভাদু গান। তুষুগানের ন্যায় ভাদু-গানও এই মধ্যরাঢ়ের একটি বিশেষ লোকোৎসব বা লোকসংস্কৃতি। তবে একথা সত্যি, তুষুগানের ন্যায় ভাদুগান এখনও বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি, স্বল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই সীমিত আছে। ভাদুকে অনেকেই 'কৃষিদেবী' বলেন; বিশেষতঃ মধ্যরাঢ়ে বসবাসকারী মানুষেরা, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই সাধারণত ভাদুগান গেয়ে থাকে। ভাদুমূর্তি দিয়েই ভাদু-পূজা হয়। বাঁকুড়া শহরতলীর অন্তর্গত বড়-সোলোআনা, যুগীপাড়া, বরদুক প্রভৃতি অঞ্চলেও অনেক ছোট-বড় ভাদুমূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। ভাদুপূজাতেও ভাদুগানই প্রধান, একটি ভাদু-গান তুলে ধরছি—"আয়লো তোরা দেখে যা/ ভাদু দেখে হইছি লো দিশাহারা/রূপের ছটা ঘন-ঘটা, আলো আঁধার করা লো/আনমনেতে বসে আছে যেন ক্ষেপী লো।"

ভৈরবপূজা

বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত বাদুল্লাড়া রোডের পাশে (উপস্থিত যেখানে রেলওয়ে ওভারব্রীজটি দেখা যায়) একটি মন্দির আছে; মন্দিরটির নাম 'ভৈরবস্থান'। ভৈরবস্থানের লাগোয়া একটি অশ্বত্থগাছ আছে। আগে অশ্বত্থগাছের তলাতেই পূজা করেছেন ৺তারা-চাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১২৬৮ সন থেকে ১৩১০ সন পর্যন্ত। ছাতনার রাজার দেওয়া এই নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি (১৭ বিঘা)-র অংশেই বর্তমান মন্দিরটি পরবর্তী কালে নির্মাণ করা হয়েছে। বাঁকুড়া জেলার বহু গ্রামেই ভৈরব দেবতা পূজিত হন। সাধারণত অশ্বত্থ, তেঁতুল, শেওড়া, আঁকড় প্রভৃতি গাছের তলাতেই তাঁর পূজা হয়, ভৈরব দেবতার পূজা বাঁকুড়া জেলার অধিকাংশ অধিবাসীই করে থাকেন। সাধারণত তিনি 'মহাকাল ভৈরব' নামেই বেশি পূজিত; তবে 'জামবোনো ভৈরব', 'কুদরা ভৈরব', 'ঝোড় ভৈরব', 'বাবা ভৈরব' প্রভৃতি নামেও পূজিত হন। অনেকের মতে ভৈরব দেবতা হলেন 'বাবা শিব' বা 'বাবা ভোলানাথ'।

শীতলাপূজা

বাঁকুড়ার লোকে বলে 'শীতলা মায়ের পূজা'। কেওট, করঙ্গা, মেটে, তিলি, লোহার—সাধারণত এঁরাই পূজক। এই পূজার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রথমে চাল-পয়সা আদায়; কেউ কেউ আবার বলে বলে যান—'বি. ডি. আর দুর্গা-মেলায় শীতলা মায়ের পূজা হবে। আপনারা সবাই চাল পয়সা পাঠাবেন।' দেখা গেছে, শহুরে জলহাওয়ার মধ্যে যাঁরা মানুষ হয়েছেন, তাঁরাও নিজের ছেলেমেয়েদের হাতে পূজার নিমিত্ত চাল, আলু, পয়সা, কেউ কেউ আবার সিঁদুরও পাঠিয়ে দেন। প্রায় প্রত্যেক বাড়ি থেকেই কিন্তু সেগুলি যায়, দু-একঘর মাত্র বাদ যায়। বাঁকুড়ার আর কোথাও কিন্তু এরকম-ভাবে পূজা হতে দেখা যায় না।

চণ্ডীপূজা

মা-চণ্ডীর উগ্রমূর্তিকে অনেকেই খুব ভয় করেন। ভয়েই হোক কিংবা ভক্তিতেই হোক তিনি পূজা পেয়ে আসছেন বহু আগে থেকেই। চণ্ডীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামের মধ্যে একটি নাম হল 'বুঁয়াইচণ্ডী'। বাঁকুড়ার লোকে বলে 'বুঁয়াইচণ্ডীর মন্দির'। স্টেশনের নাম বুঁয়াই-চণ্ডী, গ্রামের নামও বুঁয়াইচণ্ডী। 'বুঁয়াইচণ্ডীর মেলা' উপলক্ষে বি. ডি. আর. থেকে স্পেশাল ট্রেন

ছাড়ারও বন্দোবস্ত আছে। বাঁকুড়ার লোকের মুখে মুখে ফেরে একটি কথা—"সব তীর্থ বারবার, বুঁয়াইতীর্থ একবার"। গঙ্গাসাগর মেলার প্রবাদ-বাক্যটিই যেন এখানে একটু পালটিয়ে বলা হয়েছে—"সকল তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার।" অবশ্য গঙ্গাসাগর মেলার ন্যায় অত যাত্রীর ভিড় এখানে হয় না। মেলাটি বসে সেই সময়টা শীত বা বসন্তর কোনটাই নয়। আষাঢ় মাসের সাত তারিখ (অম্বুবাচী) থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত মেলাটি বসে। মন্দিরটির ভিতরে 'বুঁয়াইচণ্ডী' দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ইন্দপুর থানার 'আটবাইচণ্ডী' গ্রামের চামুণ্ডামূর্তিটিও চণ্ডী-রূপেই পূজিত। বুঁয়াইচণ্ডী মন্দিরে জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় দুই মাসই প্রচুর ভিড় হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে সোম ও শনিবারে ভক্ত পুণ্যার্থীদের আগমন হয়।

ইতুপূজা

কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন বড় সরায় (মাটির পাত্র) মাটি ভর্তি করে তার উপর ধান, সিঁদুর, কলমিলতা, সরষে, মটরফুল, তিল, তুলসী, হরিতকী, হলুদগাছ, কচু, মান প্রভৃতি দিয়ে ইতু পাতা হয়। অগ্রহায়ণ মাসে যে রবিবারগুলি পড়ে অর্থাৎ প্রত্যেক রবিবারে ইতুপূজা হয়। এই পূজা করে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থেকে বড় মেয়ে-মানুষেরা অর্থাৎ বাড়ির গিন্নী, বউ, ঝি প্রভৃতি প্রত্যেকেই। ইতুর গান গেয়ে ইতুপূজা করা হয়। ইতুপূজা উপলক্ষে বাঁকুড়া জেলায় একটি গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি এইরূপ—

অবন্তী নগরের ব্রাহ্মণ দম্পতির দুই মেয়ে ছিল, তাদের নাম উমনো আর ঝুমনো। ভিক্ষে করে তারা সংসার চালাত কোনরকমে। ব্রাহ্মণের একদিন পিঠে খেতে মন গেছে, ব্রাহ্মণী পিঠে তৈরি করছে। ব্রাহ্মণ অন্য ঘরে বসে তাওয়া পিঠের অর্থাৎ পিঠে ভাজার ছেঁড-ছুড আওয়াজ গুনছে! ব্রাহ্মণী কটা পিঠে তৈরি করল তা ব্রাহ্মণের এখন জানা হয়ে গেছে। খেতে বসবার সময় গুনতিতে চারটি পিঠে কম। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করল, 'কে খেয়েছে, কে খেয়েছে?' ব্রাহ্মণী বলল, তোমার দুই মেয়ে উমনী-ঝুমনী। ব্রাহ্মণ কোন কথা না বলে মেয়ে দুটিকে পিসির বাড়িতে রেখে আসতে যাচ্ছে, কারণ সেখানে পেট ভরে দুমুঠো খেতে পাবে। পথে যেতে যেতে সন্ধ্যে নেমে এল; মেয়ে দুটির খুব ঘুম পেল, ঘুমিয়েও পড়ল গভীর বনের মধ্যে। ব্রাহ্মণ সুযোগ বুঝে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের মধ্যেই মেয়ে দুটিকে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল!

পরদিন মেয়ে দুটি ইতুপূজার শেষে বর চাইল—তাদের বাবার সব দুঃখ যেন ঘুচে যায়। ইতুর ইচ্ছায় মেয়ে দুটি বাড়িতে ফিরে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত বলতে ব্রাহ্মণ নিজের রাগকে সংবরণ করে, সব শুনে খুব খুশি হলেন।

একদিন অবন্তী নগরের রাজা তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে মাঘ মাসের পয়লা তারিখে অর্থাৎ 'এখান পরবে'র দিনে হরিণ শিকারে বেরিয়ে-ছিলেন। (বিষ্ণুপুরের ইতিহাস বলে মল্লরাজারাও ঐদিন শিকারে বেরোতেন। বর্তমানে শুধু সাঁওতালরা এই দিন শিকারে বেরোয়, কিন্তু প্রত্যেক বাঁকুড়াবাসীই আজও এই দিনটিকে 'মাংসাহারের দিন' বলে জানে। এছাড়াও বিষ্ণু-পুরের মন্দিরগাত্রে টেরাকোটা অলঙ্করণের মধ্যেও হরিণ শিকারের দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।) তৃষ্ণার্ত হয়ে অবন্তী নগরের রাজা ব্রাহ্মণের বাড়িতে এসে জল খেতে চাইল। মেয়ে দুটি জল খেতে দিল, রাজা মেয়ে দুটির রূপে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করতে চাইলেন। ব্রাহ্মণ উমনোর বিয়ে দিলেন রাজার সাথে, আর ঝুমনোর বিয়ে দিলেন মন্ত্রীর সাথে। উমনো শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় মাছ-ভাত খেয়ে পান চিবোতে চিবোতে গেল। আর ঝুমনো ইতুর প্রসাদ খেয়ে নিরামিষ আহার

গ্রহণ করল। রাজা আর মন্ত্রী কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বিয়ে করে উমনো-ঝুমনোকে নিয়ে যায়নি, পরের বছর অগ্রহায়ণ-সংক্রান্তিতে বিয়ে হয়েছিল। বিয়ে করে নিয়ে যাওয়ার পরে রাজার রাজ্যে অমঙ্গল দেখা দিল। রাজা উমনোকে তাড়িয়ে দিলেন। উমনো আশ্রয় নিল ঝুমনোর বাড়িতে। ঝুমনো ব্যাপারটা আগেই ধরেছিল। সে বলল, দিদি ইতুর কোপেই তোর এইরকম হচ্ছে। পরে অগ্রহায়ণ মাস পড়তেই ঝুমনো উমনোকে দিয়ে ইতুপূজা করিয়ে বর চাওয়ালো। তখন রাজার আবার সুসময় দেখা দিল। রাজার মনে পড়ল উমনোকে। উমনো সেজে-গুজে স্বামীর কাছে যেতেই স্বামী তাকে গ্রহণ করল। অনেকদিন সুখে-শান্তিতে থাকার পর পুষ্পক রথে চড়ে তারা স্বশরীরে স্বর্গে গেল যুধিষ্ঠিরের ন্যায়।

কিংবদন্তীর আকারে প্রচলিত এই গল্পকথা বাঁকুড়ার নারীসমাজের মনে আজও গেঁথে আছে। তাঁদের কারও কারও মতে বাঁকুড়া জেলার "অম্বিকা নগরই অবন্তী নগর"। সে যাই হোক, অগ্রহায়ণ-সংক্রান্তির দিন সূর্যোদয়ের আগে পুকুরে নদীতে কিংবা ছোট জলাশয়ে ইতুবিসর্জন দিয়ে তুষু পাতা হয়।

পীরপূজা

মুসলমান-অধ্যুষিত এলাকায় বা গ্রামে পীর-পূজার প্রচলন আছে। লোকেরা বলে 'পীরতলা'। পীরতলাতেও হাতি, ঘোড়া থাকে এবং তাদেরই পূজা হয়। বাঁকুড়া শহরের বড়বাজার এলাকায় রাস্তার ধারে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো একটি বেদীর মতন করা আছে। সেখানেই পূজা হয়। বাঁকুড়া শহরের মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত কেঁঠারডাঙা অঞ্চলেও পীরতলা রয়েছে। এছাড়াও পুনিশোল গ্রামেও পীরতলা রয়েছে, প্রত্যহই পীরপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

তুষুপূজা

স্থান বিশেষে কেউ বলেন 'তুষু' আবার কেউ বা বলেন টুসু। সে যাই হোক, টুসু ও তুষু যে একই দেবী এ বিষয়ে কেউ দ্বিমত পোষণ করেন না—পণ্ডিতেরাও না। বাঁকুড়ার পশ্চিমাংশের অর্থাৎ ছাতনা, শালতোড়া, ইন্দপুর, খাতড়া, রানীবাঁধ প্রভৃতি থানার অধীনে যে সমস্ত গ্রাম আছে, সেই সমস্ত গ্রামের মানুষদের মুখ থেকে জানা যায় কথাটা 'তুষু নয় টুসু'। কিন্তু বাঁকুড়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের বক্তব্য 'টুসু' কথাটা ভুল উচ্চারণ—তাঁদের বক্তব্য তুষু। কারণস্বরূপ তাঁরা বলেছেন, "ইতুপূজার পরে অগ্রহায়ণ-সংক্রান্তিতে ধানের তুষ দিয়ে তুষু পাতা হয়, তাই এর নাম হয়েছে তুষু।" ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণও তাঁদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। এক মতে রয়েছে—"পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত মাস হল পৌষ, পুষ্যা নক্ষত্রের অন্য নাম তষ্য", অর্থাৎ তষ্য>তুষু>টুসু। দ্বিতীয় যুক্তিটি হল "দন্ত্যবর্ণ মূর্ধণ্যবর্ণে পরিণত হতে পারে"—সেইজন্যই তুষু>টুসু কথাটি এসেছে। তৃতীয় যুক্তিটি হল—"মনে হয় টুসু নামটির উদ্ভব হয়েছে 'উষা' বা 'ওষা' নামক ব্রতগুলি থেকে। উড়িষ্যার পাহাড়ী অঞ্চলের হিন্দুভাবাপন্ন ভুঁইয়ারা এখনও এই উষা বা ওষা ব্রতগুলি পালন করে থাকেন।··· এই উষা বা ওষা শব্দটিই এই অঞ্চলের কথ্য ভাষায় উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী হয়তো টুসুতে পরিণত হয়েছে।"

বাঁকুড়ার শতকরা হারে বেশি গ্রাম্য জন-সাধারণের মুখের কথা 'তুষু'। তাঁদের সঙ্গে এই তুষু দেবতার যে অন্তরঙ্গ যোগ তা আজও বর্তমান রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, "ধানের তুষ দিয়ে পূজা করা হয় বলে তুষু"—এই মতকেও অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

টুসু মেয়েদেরই দেবী—মেয়েরাই তুষুপূজা

করে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছেলে ও মেয়ে একসঙ্গেই তুষুগান গেয়ে তুষুপূজা করে থাকে। বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণদিকে সোনামুখী থানা থেকে মাইল পাঁচ-ছয় দূরে অবস্থিত একটি গ্রাম চাউল্যা। সেখানকার প্রবীণদের মুখ থেকে জানা যায়—শস্য যাতে নষ্ট না হয় তার জন্যই তুষু দেবীর শরণাপন্ন হয়ে তুষুকে ডাকার রীতি চলে আসছে। তাঁকে লক্ষ্মী দেবী বলেই পূজা করতে হয়। তুষ-তুষলী কে? তাঁরা নারায়ণ ও লক্ষ্মী। শ্রীযুক্ত মাণিকলাল সিংহ মহাশয় কিন্তু তাঁর "দক্ষিণরাঢ়ের তুষু পর্বে ঐতিহাসিক পট-ভূমিকা" প্রবন্ধে (৩২ বর্ষ/৩৪ সংখ্যা/দেশ/১৩৭২) ছাতনার উত্তর-পূর্বে শুশুনিয়া পাহাড়ে (উচ্চতা ৪৪০ মিটার প্রায়) আবিষ্কৃত খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর দক্ষিণরাঢ়ের রাজা 'চন্দ্রবর্মার শিলালিপি' বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, "চন্দ্রবর্মা বিষ্ণুর উপাসক। চক্র বিষ্ণুর প্রতীক। কিন্তু দীপশিখা কেন উৎকীর্ণ হইয়াছে? এই বিষ্ণু পুষ্য, পৌষের রবি। এই পুষ্য বা বিষ্ণু চক্রাকার—চক্রাকারে তিনি পরিভ্রমণ করেন। তিনিই পৃথিবী-পালক অগ্নি-তাপ-শিখার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই দেবতার কল্যাণময়ী বরদাত্রী শক্তি হইলেন লক্ষ্মী বা রাই। কৃষিজাত রবিশস্য ধান্য, সরিষা, গুঞ্জা, তিল, রমাকলাই। পৌষ মাসে ক্ষেতে সরিষা জন্মে—সরিষার নাম রাই। লক্ষ্মীর অপর নাম রাই। রমাকলাই এই মাসের উৎকৃষ্ট ফসল। পিঠে পার্বণে রমার পুর অপরিহার্য। কলাই-এর নাম রমা—লক্ষ্মীর একটি নাম রমা। সমস্ত ঘিরিয়া পুষ্য বা বিষ্ণুর পূজা। তাঁহারই শক্তিরূপিণী লক্ষ্মীকে নিয়ে দক্ষিণরাঢ়ের তুষু পার্বণ। তুষুর 'আলোখলা' চন্দ্রবর্মার বিষ্ণুচক্র অনুযায়ী গঠিত। বৃত্তাকারে চৌদ্দটি দীপশিখা চতুর্দশ তিথির প্রতীক এবং কেন্দ্রের বৃহৎ দীপশিখাটি পূর্ণিমার দ্যোতক।"

তুষু কাদের উপাস্যা দেবী? বর্তমান কালের দিকে তাকিয়ে বলতে ইচ্ছে করে সকলেরই। কারণ বাঁকুড়া জেলায় প্রায় প্রতিটি পল্লীগ্রামেই কোন না কোন গৃহস্থের বাড়িতে সন্ধ্যা বেলায় তুষুপূজা হতে দেখা যায়। তুষুপূজার মন্ত্র হল তুষু-গান; তুষুগানই হল তুষুর প্রাণ, তুষুগানই চিরকাল ধরে তুষুকে অমর করে রাখবে—রেখেছেও। তুষুগান যাঁরা না শুনেছেন তাঁরা তুষুসঙ্গীতের সৌন্দর্য—তুষুগানের রস উপলব্ধি করতে পারবেন না। তুষুসঙ্গীতের সুর শুনে মুগ্ধ হননি, এমন লোক আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। 'বাঁকুড়ি' অঞ্চলের মানুষের মনের অশান্তি এই গানের মধ্যে দিয়ে অনেকটা ধুয়ে মুছে যায় নিমেষের মধ্যে—মানুষ তাতে মজে গিয়ে জাগতিক সমস্ত দুঃখ জ্বালা ভুলে গিয়ে এক অপূর্ব আনন্দানুভূতি লাভ করে। তুষু মূলতঃ দেবী। তাই অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের ন্যায় তুষুগান গাওয়ার আগে দেবীর সামান্য বন্দনা অর্থাৎ তুষু-বন্দনা করা হয় গানের মধ্যে দিয়ে—

"ওঠো ওঠো ওঠো তুষু, উঠকরাতে বসেছি
তোমারি সব সঙ্গীগুলি চরণতলে বসেছি।
সাঁজ লাওমা সন্ধ্যা লাওমা স্বর্গে লাওমা বাতি গো।"

এই গানটি ভাদুল গ্রামের নমোপাড়া থেকে সংগৃহীত। তুষু-বন্দনাগীতিটি সব জায়গাতেই প্রায় একই রকম, একটু আধটু পরিবর্তন এই যা।

তুষুগানগুলিকে বিচার করলে অনেক সময়ে তুষুকে কিছুতেই দেবী বলতে ইচ্ছে করে না—মনে হয়, তিনি মর্ত্যেরই একজন অতি চেনা পরিচিতা সাধারণ মেয়ে যেন! তার বায়না—তার ভাল লাগা, মন্দ লাগা, তার খাওয়া, পরা, থাকা, ইচ্ছে, ঘুমোনো প্রভৃতি সমস্ত কিছুই প্রকাশিত হয়েছে গানের মধ্যে দিয়ে। যেমন—

"ডাক্তারবাবু ডাক্তারবাবু আর থাবো না জলসাবু
সর্দিতে ধরেছে মাথা, আনাবো কমলালেবু।"

"তুষু উঠছেন কদমগাছে খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে
কচি কদম পেড়ো না, পাকলে কদম সবাই খাবে;
কেউ তো মানা করবে না।
নামবার সময় নামলেন তুষু
শিবের মাথায় ফুল দিয়ে।"

(কদমফুল থেকে কদম তৈরি হয়; কদম পাকলে খেতে খুব সুন্দর লাগে। এটা সর্বজনস্বীকৃত না হলেও যাঁরা খেয়েছেন একমাত্র তাঁরাই এর মিষ্টতা, মধুরতা ও গন্ধ সম্পর্কে লোককে জানাতে পারবেন। কেউ কদম খেলে সেই গন্ধ বহু দূর থেকেও নাকের মধ্যে আসে। গন্ধটা কিরকম ঠিক বোঝাতে পারছি না, তবে মৃগনাভির ন্যায় গন্ধ নয়।) গানটির মধ্যে দিয়ে মা তার মেয়ে তুষুকে কচি কদম ছিঁড়তে মানা করছে। নিজের মেয়ের যা কিছু করে—যা কিছু হয় সবই বাঙালী মায়ের চোখে ভাল ঠেকে। শুধু তাই নয়, নিজের মেয়েকে ভাল শাড়ি ও ভাল গয়না দিতে সব মায়েরই ভাল লাগে—ইচ্ছে জাগে। নিচের গানটির মধ্যে দিয়ে সেই ভাবই প্রকাশিত হয়েছে। মা নিজের মেয়ের সুখে সুখী হতে চান, কিন্তু অন্যের সুখ দেখলেই বুক ফেটে যায়! তুষুগানে বলা হয়েছে—

"আমার তুষু স্নান করতে যাচ্ছে
জোড়া শঙ্খ বাজিয়ে
ওদের তুষু স্নান করতে যাচ্ছে
জোড়া কুকুর ভেকিয়ে।
আমার তুষু স্নান করে এলো
কিবা পরতে দেবোগো
ঘরে আছে ঢাকাই শাড়ি
তাই বার করে দাওগো।
ওদের তুষু স্নান করে এলো
কিবা পরতে দেবোগো
ঘরে আছে ছেঁড়া কানি
তাই বার করে দাওগো।
আমার তুষু মুড়ি ভাজে
চুড়ি ঝলমল করেগো
ওদের তুষু মুড়ি ভাজে
হাতা ঠকঠক করেগো।"

অনুরূপ আর একটি গানে দেখতে পাই তুষুর বিয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু শাশুড়ির সঙ্গে বনিবনাদ না হওয়ায় তুষু বাপের বাড়িতে চলে এসেছে! কিংবা হয়তো বাপের বাড়িতে দুদিনের জন্য বেড়াতে এসেছে। তুষুর মা তুষুকে খেতে দিয়েছে মেয়ে কি খেতে ভালবাসে সেকথা চিন্তা করে—

"আমার তুষুর খিদে পেয়েছে কিবা খেতে দেবোগো
ঘরে আছে মিঠাই মণ্ডা তাই বার করে দাওগো।
ওদের তুষুর খিদে পেয়েছে কিবা খেতে দেবোগো
ঘরে আছে চোঁয়া মুড়ি, তাই বার করে দাওগো।
এমন সময় খবর এলো, মরেছে তুষুর শাশুড়ি
মরেছে মরুক আরো মরুক চন্দন কাঠে
পোড়াবো;
চারধারে চার লাইট জেলে বামুন ভোজন
করাবো।"

এই গানটির অন্য পাঠও শোনা যায়। বক্তব্য একই। মেয়ের যন্ত্রণা মায়ের বুকেও যন্ত্রণা এনে দেয়—ব্যথা সৃষ্টি করে। তুষুর শাশুড়ির মৃত্যু-কামনা মনে মনে করলেও প্রকাশ্যে মুখে উচ্চারণ করতে পারেন না; কিন্তু সত্যি সত্যিই যখন শাশুড়ির মৃত্যুসংবাদ কানে এসে পৌঁছায় তখন তুষুর মাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে যেন বাঁচেন। মৃত্যুতে শোক প্রকাশ না করে তাই তুষুর মা বলে—

"এ-চালে পুঁই ও-চালে পুঁই পুঁয়ের থাকে
মেচুড়ী,
খেতে খেতে খবর এলো, মইচে টুসুর শাশুড়ি।
মরুগ মরুগ আরো মরুগ চন্দন কাঠে পুড়াবো,
চন্দন কাঠে পুড়ি পরে হাড় জিরাবো।"

বাঁকুড়ার সব অঞ্চলেই তুষু বা ভাদুগান এক সুরে গাওয়া হয় না। তুষুগান শ্রুতি ও স্মৃতিনির্ভর। প্রায় এক বছর বাদে শিশুরাও নিজেদের স্মৃতিকে রোমন্থন করে অনায়াসে গানগুলি একের পর এক গেয়ে চলে—কাউকে ধরিয়েও দিতে হয় না! বর্তমানকালে পোরকুলের মেলায় বা শহরের অনেক জায়গাতেই তুষুমূর্তি (ময়ূরবাহনা, অশ্ববাহনা) দেখতে পাওয়া যায়। লোকমুখে শোনা যায়—নাকি তুষুমূর্তির রেওয়াজ আগে ছিল না। আধুনিককালে যে সমস্ত পণ্ডিত তুষু নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন তাঁরাও এই কথাটা স্বীকার করেছেন। তবে এখনও বেশির ভাগ জায়গাতেই তুষুখলা (একতলা, দুতলা, তিনতলা), আলোখোলা, তুষুপ্রদীপ, চৌদল অর্থাৎ মন্দিরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট তুষু-ভেলারই প্রাধান্য বেশি। অনেকে তুষুখলাকে তুষুসরাও বলে থাকেন। তুষুর প্রসাদ হিসাবে মূলামুড়িই বেশি নজরে আসে। এছাড়াও চিনি, চিঁড়া (বাঁকুড়ি অঞ্চলের মানুষেরা বলেন, "চিঁড়াভাজা দিস নাই লো?" কেউ কেউ আবার বলেন, "চিঁড়া দিয়ে পূজা করতে হবেক নাই লো লে, এমনিই কর; ঢেঁকে ছাঁটা চিঁড়ে আজ দিয়ে যায় নাই।") দুধ, আদাকুচি, রম্ভা, আপেল প্রভৃতিও থাকে। কোন কোন জায়গায় ধানের তুষের বদলে নদীর বালি দিয়ে 'তুষু পাতা হয়। সরষেফুল, কাঁটাফুল, গ্যাঁদাফুল, মূলাফুল প্রভৃতি দিয়ে তুষুপূজা করা হয়।

পূজা মানেই উৎসব, আর উৎসব মানেই পূজা একথা আক্ষরিক অর্থে সত্য তা বলা যেতে পারে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের দিকে তাকিয়ে। বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণদিকে অর্থাৎ শালতোড়া, ছাতনা, ইন্দপুর, খাতড়া, রানীবাঁধ থানার অধীনে যে সমস্ত গ্রাম আছে—সেখানে বিভিন্ন ধরনের নাচেরও প্রচলন আছে, যেমন—চৌ-নৃত্য (পুরুলিয়ার ন্যায়), সাঁওতালি-নৃত্য, কাঠি-নৃত্য, শিব-নৃত্য (উদয়শঙ্করের নৃত্যের সঙ্গে কিছুটা মিল থাকলেও পরিবেশ সৃষ্টিতে অক্ষম), ঝুমুর-নাচ, বুলবুলি-নাচ, পাতা-নাচ, খঞ্জনি-নাচ প্রভৃতি। মানবেতর প্রাণীর নৃত্যের মধ্যে এই অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় সাপ, বানর, নেউল, ইঁদুর, ভালুক (বাঁকুড়ার কোন দুর্ভেদ্য জঙ্গলেই তথা অরণ্যে ভালুক নেই, অবলুপ্ত হয়ে গেছে) প্রভৃতির খেলা তথা নৃত্য। তুষু আর ভাদু-নৃত্যের কথা আগেই বলেছি। যাঁরা এখানে আসবেন বা এসেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন নাচ আর গান যেন এখানকার মানুষের প্রাণ। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব সাধারণত লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করেই নাচ, গান, ছড়া প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে একথা মোটামুটি ভাবে নিঃসন্দেহে বলা যায় সমস্ত কিছু বিচার-বিবেচনা করার পর। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন কাজ করতে করতেও এখানকার মানুষ আপন মনে গান গেয়ে উঠে; বিশেষতঃ সাঁওতাল পুরুষ ও রমণীরা, কুলি, কামিন, মজুর ও চাষীরা। গান যে এ অঞ্চলের মানুষের নিজস্ব সম্পদ তা এখানে এলেই বোঝা যায়। "ভাটিয়ালীগান গায় মাঝিদের সুরে"—তাও শোনা যায়; বাউলগান তাও শোনা যায়; তবে বেশির ভাগই আগমনী-সঙ্গীত। অবশ্য এখানের অনেক বাউলই বীর-ভূমের কেন্দুলি মেলায় প্রতি বছর যায়। মাঠে যাবার তাড়া থাকে, পাছে ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয়ে যায়, এই ভয়ে সাধারণত প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই একজন না একজন বাউল নিযুক্ত থাকে, ভোর চারটের সময় ঠাকুরের নামগান অর্থাৎ বাউলগান করে করে গোটা গ্রাম ঘুরে বেড়ায়।

অষ্টাবক্র-গীতা

অনুবাদক : স্বামী ধীরেশানন্দ

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯২ সংখ্যার পর]

শিষ্যোক্তমাত্মানুভবোল্লাসনামকং দ্বিতীয়ং প্রকরণম্

শিষ্য চিদ্রূপ আত্মা অনুভব করিয়া গুরুকৃত উপকার খ্যাপনার্থ পূর্বসংস্কারবলে বাধিতানুবৃত্তিবশতঃ প্রতীয়মান মোহবিড়ম্বনা স্মরণ করিতেছেন :

অহো নিরঞ্জনঃ শান্তো বোধোঽহং প্রকৃতেঃ পরঃ।
এতাবন্তমহং কালং মোহেনৈব বিড়ম্বিতঃ ॥১॥

অন্বয় : অহো ! অহং নিরঞ্জনঃ শান্তঃ বোধঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। এতাবন্তং কালম্ অহং মোহেন এব বিড়ম্বিতঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ : কি আশ্চর্য ! আমি সর্ব উপাধিবিহীন, সর্ববিকারাতীত, স্বপ্রকাশচিদ্রূপ ও মায়ান্ধকারসংস্পর্শশূন্য। অহো ! শ্রীগুরুপ্রদত্ত উপদেশলাভের পূর্ব[১] পর্যন্ত দেহ ও আত্মার অবিবেকরূপ কি মোহ দ্বারাই না এতদিন আমি বিড়ম্বিত অর্থাৎ বঞ্চিত হইয়াছি ! ॥ ১ ॥

১ বর্তমানে আমি শ্রীগুরুকৃপালব্ধ আত্মানন্দ অনুভবে ধন্য হইয়াছি,—ইহাই বিবক্ষিত অর্থ।

আমার পূর্ব মোহ আর নাই। শ্রীগুরুকৃপায় এখন আমার দেহাত্মবিবেক জাগ্রত হইয়াছে —এই কথাই শিষ্য যুক্তিসহ বলিতেছেন—

যথা প্রকাশয়াম্যেকো দেহমেনং তথা জগৎ।
অতো মম জগৎ সর্বমথবা ন চ কিঞ্চন ॥২॥

অন্বয় : যথা একঃ (অহং) জগৎ প্রকাশয়ামি তথা এনং দেহং (প্রকাশয়ামি), অতঃ সর্বং জগৎ মম, অথবা কিঞ্চন চ (মম) ন ॥ ২ ॥

অনুবাদ : অচেতন এই জগৎকে যেমন এক আমিই প্রকাশ করিয়া থাকি, তদ্রূপ আমিই এই স্থূল দেহেরও প্রকাশক।[১] অতএব দৃশ্য এই দেহাদি সর্ব জগৎ আমার অর্থাৎ আমাতে অধ্যস্ত। অথবা (পারমার্থিক দৃষ্টিতে) দেহাদি কিছুই আমাতে[২] নাই (আমাতে অধ্যস্ত নহে) ॥ ২ ॥

১ তাহা হইলে দেহ ও জগতের আত্মা সহ কি সম্বন্ধ এই শংকার উত্তরে বলিতেছেন যে, একমাত্র আধ্যাসিক সম্বন্ধ ব্যতীত আর কোন সম্বন্ধই হইতে পারে না। কিন্তু পরমার্থদৃষ্টিতে তাহাও নাই।

২ এইরূপে অধ্যারোপ ও অপবাদের দ্বারা আমি মায়াসংস্পর্শবিহীন বোধস্বরূপ আত্মা, ইহাই স্পষ্টীকৃত হইল। (২।১ দ্রঃ)

বিচারোৎপন্ন নির্দ্বৈত আত্মানুভব বর্ণিত হইতেছে—

সশরীরমহো বিশ্বং পরিত্যজ্য ময়াধুনা।
কুতশ্চিৎ কৌশলাদেব পরমাত্মা বিলোক্যতে ॥৩॥

অন্বয় : অহো ! অধুনা সশরীরং বিশ্বং পরিত্যজ্য কুতঃ চিৎ কৌশলাৎ এব ময়া পরমাত্মা বিলোক্যতে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ : অহো! কি আশ্চর্য! শাস্ত্র ও আচার্যোপদেশলব্ধ চাতুরী সহায়ে[১] আমি এখন লিঙ্গশরীর ও কারণশরীর সহ দৃশ্যমান সমগ্র বিশ্বের পৃথক্ সত্তা নিষেধপূর্বক এক অদ্বিতীয় পরমশ্রেষ্ঠ আত্মানুভবে মগ্ন হইয়াছি ॥৩॥

১ পরমাত্মার সাক্ষাৎকারের অন্য কোন উপায় নাই।

বিশ্বের পৃথক্ সত্তারাহিত্য দৃষ্টান্তসহ বর্ণিত হইতেছে—

যথা ন তোয়তো ভিন্নাস্তরঙ্গাঃ ফেনবুদ্বুদাঃ।
আত্মনো ন তথা ভিন্নং বিশ্বমাত্মবিনির্গতম্ ॥৪॥

অন্বয় : যথা তরঙ্গাঃ ফেন-বুদ্বুদাঃ তোয়তঃ ভিন্নাঃ ন (ভবন্তি) তথা আত্ম-বিনির্গতং বিশ্বম্ আত্মনঃ ভিন্নং ন (ভবতি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ : তরঙ্গ ফেন ও বুদ্বুদ যে-প্রকার জল হইতে ভিন্ন নহে (কারণ জলই তাহার উপাদান), আত্মা হইতে উৎপন্ন বিশ্বও সেই প্রকার আত্মা হইতে ভিন্ন নহে[১] ॥ ৪ ॥

১ জলতরঙ্গাদিতে যেমন স্বচ্ছ জল সর্বত্র অনুস্যূত হইয়া থাকে, তিদ্রূপ আমিও তদ্রূপ এই সমগ্র বিশ্বের অধিষ্ঠানভূত হইয়া বিদ্যমান। আমাতেই এই বিশ্ব প্রতীত হইতেছে, অতএব আমা হইতে ভিন্ন উহার কোন পৃথক্ সত্তাই নাই।

অন্য দৃষ্টান্ত সহায়ে সর্বত্র আত্মানুভবের বর্ণন—

তন্তুমাত্রো ভবেদেব পটো যদ্বদ্ বিচারিতঃ।
আত্মতন্মাত্রমেবেদং তদ্বদ্ বিশ্বং বিচারিতম্ ॥৫॥

অন্বয় : যদ্বৎ পটঃ বিচারিতঃ (সন্) তন্তুমাত্রঃ এব ভবেৎ তদ্বৎ ইদং বিশ্বং বিচারিতং (সৎ) আত্ম-তন্মাত্রম্ এব (ভবতি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ বিচার[১]দৃষ্টিতে পট যেরূপ কেবল তন্তুরূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, বিচার সহায়ে এই বিশ্বও[২] তদ্রূপ এক আত্মসত্তামাত্ররূপে প্রতিভাত হয় ॥ ৫ ॥

১ স্থূলদৃষ্টিতে পট তন্তু হইতে বিলক্ষণরূপে প্রতীয়মান হইলেও বিচারদৃষ্টিতে তাহা নহে।

২ স্বসত্তাদ্বারা তন্তু পটের সর্বত্র সেরূপ অনুগত হইয়া থাকে, অধিষ্ঠানভূত আত্মাও তদ্রূপ নিজের সত্তা ও স্ফুরণ দ্বারা বিশ্বের সর্বত্র অনুস্যূত।

আত্মার সর্বব্যাপকত্ব বিষয়ে দৃষ্টান্ত—

যথৈবেক্ষুরসে ক্লৃপ্তা তেন ব্যাপ্তৈব শর্করা।
তথা বিশ্বং ময়ি ক্লৃপ্তং ময়া ব্যাপ্তং নিরন্তরম্ ॥৬॥

অন্বয় : যথা এব ইক্ষুরসে ক্লৃপ্তা শর্করা তেন ব্যাপ্তা এব, তথা ময়ি ক্লৃপ্তং বিশ্বং ময়া নিরন্তরং ব্যাপ্তম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ : ইক্ষুরসে কল্পিত শর্করা যেরূপ সেই মধুর রসের দ্বারা সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ নিত্যানন্দ স্বরূপ আমাতে কল্পিত এই বিশ্বও আমাদ্বারা বাহ্য ও অভ্যন্তরে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে[১] ॥ ৬ ॥

১ অতএব এই বিশ্ব বস্তুতঃ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং 'অস্তি-ভাতি-প্রিয়' রূপে আমিই সর্বত্র অবস্থিত—ইহাই শ্লোকদ্বয়ের বিবক্ষিত অর্থ।

বিশ্ব যদি চিদাত্মা হইতে ভিন্ন নহে তবে উহা ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয় কেন, এই শংকার উত্তরে বলিতেছেন—

আত্মাজ্ঞানাজ্জগদ্ ভাতি আত্মজ্ঞানান্ন ভাসতে।
রজ্জ্বজ্ঞানাদহির্ভাতি তজ্‌জ্ঞানাদ্ ভাসতে ন হি ॥৭॥

অন্বয়: জগৎ আত্ম-অজ্ঞানাৎ ভাতি, আত্মজ্ঞানাৎ ন ভাসতে। অহিঃ রজ্জু-অজ্ঞানাৎ ভাতি, তদ্-জ্ঞানাৎ হি ন ভাসতে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ: আত্মবিষয়ক অজ্ঞানবশতঃই জগৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে, অধিষ্ঠানভূত আত্মার জ্ঞান হইলে আর (আত্মা হইতে পৃথগ্‌রূপে কোন) জগৎ দৃষ্টিগোচর হয় না। (এই বিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্ত—) যেমন রজ্জুস্বরূপের অজ্ঞানবশতঃই ভ্রান্তি সর্প দেখা যায়, রজ্জুর জ্ঞান হইলে আর ঐ সর্প-প্রতীতি হয় না ॥ ৭ ॥

অজ্ঞানদশায় আত্মপ্রকাশের অভাবে জগৎ কি করিয়া প্রকাশিত হয়, এই শংকার উত্তরে বলিতেছেন—

প্রকাশো মে নিজং রূপং নাতিরিক্তোঽস্ম্যহং ততঃ।
যদা প্রকাশতে বিশ্বং তদাহং ভাস এব হি ॥৮॥

অন্বয়: প্রকাশঃ মে নিজং রূপম্, অহং ততঃ অতিরিক্তঃ ন অস্মি। যদা বিশ্বং প্রকাশতে তদা অহম্ এব হি ভাসঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ: প্রকাশ অর্থাৎ নিত্যবোধই আমার স্বাভাবিক রূপ, আমি সেই সদা স্বপ্রকাশ নিত্যবোধ হইতে কখনই ভিন্ন নহি। যখন বিশ্ব প্রতীতিগোচর হয় তখন আত্মস্বরূপ[1] আমাদ্বারাই তাহা প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

১ অবিলুপ্ত স্বরূপচৈতন্যই সর্ব পদার্থের প্রকাশক। উহা পদার্থ প্রকাশের সাধক, বাধক কখনই নহে। নতুবা কোন জড়পদার্থের সিদ্ধিই হইতে পারে না। আত্মস্বরূপ প্রকাশের অভাব হইলে আত্মারই অসত্ত্বাপ্রসঙ্গ হইবে এবং জগদান্ধ্য অর্থাৎ জগতেরও অপ্রতীতি ঘটিবে। অতএব আত্মস্বরূপচৈতন্যবলেই জগৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে, ইহাই স্বীকার্য।

স্বপ্রকাশচৈতন্যস্বরূপ আমাতেই অজ্ঞানবশতঃ বিশ্ব প্রকটিত হয়, ইহাই মহা আশ্চর্য। ইহাই দৃষ্টান্ত সহকারে বলিতেছেন—

অহো বিকল্পিতং বিশ্বমজ্ঞানান্ময়ি ভাসতে।
রূপ্যং শুক্তৌ ফণী রজ্জৌ বারি সূর্যকরে যথা ॥৯॥

অন্বয়: অহো! অজ্ঞানাৎ বিকল্পিতং বিশ্বং ময়ি ভাসতে। যথা শুক্তৌ রূপ্যং রজ্জৌ ফণী, সূর্যকরে বারি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ: অহো, কি আশ্চর্য! (অজ্ঞানবশতঃ) শুক্তিকাতে রজত, রজ্জুতে সর্প এবং সূর্যকিরণে প্রতীয়মান মৃগজলের ন্যায় অজ্ঞানবলে কল্পিত এই বিশ্ব আমাতে প্রতিভাত হইতেছে ॥ ৯ ॥

মায়ার বিকার বলিয়া বিশ্ব মায়াতেই উৎপন্ন ও বিলীন হয়, আত্মাতে নহে—এই সাংখ্যমত নিরাকরণ করিতেছেন—

মত্তো বিনির্গতং বিশ্বং ময্যেব লয়মেষ্যতি।
মৃদি কুম্ভো জলে বীচিঃ কনকে কটকং যথা ॥১০॥

অন্বয়: যথা কুম্ভঃ মৃদি, বীচিঃ জলে, কটকং কনকে (তথা) বিশ্বং মত্তঃ বিনির্গতং, ময়ি এব লয়ম্ এষ্যতি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ: মৃত্তিকাতে ঘটের, জলে লহরীর ও স্বর্ণে বলয়ের ন্যায়, আমা হইতে উৎপন্ন এই জগৎ আমাতেই বিলীন[১] হইবে (বিলয় হইয়া থাকে) ॥ ১০ ॥

১ এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি'।—তৈঃ ৩।১

ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ হইলে বিকারিত্ববশতঃ মৃদাদির ন্যায় তাঁহার বিনাশিত্ব প্রাপ্তি হইবে,—এই শংকার উত্তর—

অহো অহং নমো মহ্যং বিনাশো যস্য নাস্তি মে।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তং জগন্নাশেঽপি তিষ্ঠতঃ ॥১১॥

অন্বয়: অহো অহং! ব্রহ্মাদি-স্তম্ব-পর্যন্তং জগৎ-নাশে অপি তিষ্ঠতঃ যস্য মে বিনাশঃ ন অস্তি, (তস্মৈ) মহ্যং নমঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ: অহো, কি আশ্চর্যরূপ আমি! ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্ত সর্ব জগৎ-বিনাশকালে অর্থাৎ প্রলয়কালেও আমি থাকি, আমার[১] বিনাশ নাই। অতএব (এই) আমাকে[২] নমস্কার ॥ ১১ ॥

১ আমি জগতের বিবর্তোপাদানকারণ বলিয়া আমার বিনাশ নাই।

২ সর্বকার্যের উপাদান, সর্বোৎকৃষ্ট ও অবিনাশী (ব্রহ্ম) আমাকে প্রণাম।

দেহবান্‌রূপে প্রতীত হইলেও আত্মা বস্তুতঃ দেহাদিধর্মরহিত—

অহো অহং নমো মহ্যমেকোঽহং দেহবানপি।
ক্বচিন্নগন্তা নাগন্তা ব্যাপ্য বিশ্বমবস্থিতঃ ॥১২॥

অন্বয়: অহো অহং! মহ্যং নমঃ। দেহবান্ অপি একঃ অহং ক্বচিৎ গন্তা ন, আগন্তা ন, অহং বিশ্বং ব্যাপ্য অবস্থিতঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ: অহো! আশ্চর্যরূপ আমাকে নমস্কার। দেহধারী হইয়াও আমি এক অদ্বিতীয়, কোথাও গমনাগমন আমার নাই। আমি সর্ব বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হইয়া আছি[২] ॥ ১২ ॥

১ স্থিতি-চাঞ্চল্যাদিযুক্ত জলোপাধিবিশিষ্ট হইয়াও সূর্য যেমন একই, আমিও তদ্রূপ সুখদুঃখাদিমান্ দেহোপাধিবিশিষ্ট হইয়াও এক অদ্বিতীয়।

২ পরিচ্ছিন্ন অহংকার হইতে আমি বিলক্ষণ, পৃথক্।

[ক্রমশঃ]

'নরেন শিক্ষে দিবে'

ডক্টর জলধিকুমার সরকার

চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ভূতপূর্ব শিক্ষক।

নরেন্দ্রনাথের অসাধারণত্ব সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক কথা বলে গেছেন : 'এত ভক্ত আসছে, ওর মতো কেউ নেই', 'পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল', 'নরেন্দ্র জালা', 'নরেন্দ্র বড় দীঘি', 'নরেন্দ্র রাঙা চক্ষু, বড় রুই', 'খুব আধার, বড় ফুটোওলা বাঁশ', 'নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়', 'ঈশ্বরকোটি', 'নরেন্দ্র কাহাকেও কেয়ার করে না', 'পাতাল ফোঁড়া শিব', 'যেন খাপখোলা তরোয়াল নিয়ে বেড়াচ্ছে', 'নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর' 'আমি নরেন্দ্রকে আত্মার স্বরূপ মনে করি' ইত্যাদি। আবার 'কথামৃতে' দেখা যায় যে, তিনি নরেন্দ্রকে মৌখিক অনেক উপদেশ দিয়েছেন, আশ্বাস দিয়েছেন, আদেশ করেছেন, তাঁর সম্বন্ধে আশা প্রকাশ করেছেন ('আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বট গাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে'), তাঁর প্রতি অভিমান প্রকাশও করেছেন, কিন্তু স্বহস্ত-লিখিত আদেশ মাত্র একবারই করেছেন বলে আমরা জানি। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কাশীপুরে রোগশয্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ একটি কাগজ ও পেন্সিল নিয়ে নিবিষ্ট মনে লেখেন : 'নরেন শিক্ষে দিবে'। 'শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে ডেকে পাঠান, তাঁর হাতে তুলে দেন হুকুমনামা। নরেন্দ্র বিদ্রোহ করেন, বলেন : আমি ওসব পারব না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন : তোর হাড় করবে।'[১] নরেন সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বহস্ত-লিখিত ঐ একটি মাত্র বাক্যেরও যে যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, এ বিষয়ে নিশ্চয় কেউ দ্বিমত করবেন না।

উপরি-উক্ত ক্ষুদ্র বাক্যটির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ সম্ভব—নরেন শিক্ষে দিবে (অর্থাৎ নরেনের উপরই শিক্ষার ভার অর্পণ), নরেন শিক্ষে দিবে (অর্থাৎ অন্যান্য যা কিছুই করুক শিক্ষণকার্যই তার প্রধান কাজ হবে), নরেন শিক্ষে দিবে (অর্থাৎ নরেনের উপর শিক্ষা দেওয়ার আদেশ)। প্রত্যেকটি অর্থের আলাদা আলাদা বিশ্লেষণ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে, কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধের সীমারেখায়, বিভিন্ন সম্ভাব্য বিশ্লেষণে অথবা, আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের মধ্যে না গিয়ে আমরা সহজ সাধারণভাবেও বুঝতে পারি যে, নরেন্দ্রনাথের ভাবী কাজ হবে জগৎকে শিক্ষা-দান বা জ্ঞানদান। সেই শিক্ষাদানরূপ কাজ তিনি কিরূপ সফলতার সঙ্গে করে গেছেন সেইটিই হবে আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

'শিক্ষার' সংজ্ঞা নিয়ে প্লেটো, রুশো, হার্বার্ট, স্পেন্সার, পেস্টালোজিজ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী প্রভৃতি বহু মনীষী এত সব মত প্রকাশ করে গেছেন যে, সেগুলির মধ্যে সার সত্যটিকে সহজভাবে ধরতে পারা সাধারণের পক্ষে সুগম হয় না। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, শিক্ষার সরল সংজ্ঞা হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ। স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা বহু আলোচিত এবং এর উপর বহু প্রবন্ধ ও পুস্তক রচিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তা শিক্ষাবিদ্‌দের চিন্তার খোরাক যোগাতে থাকবে। বর্তমান নিবন্ধের বিষয় উক্ত শিক্ষাতত্ত্ব নয়,—পরন্তু শিক্ষাদাতারূপে স্বামীজীকে অবলোকনের কথঞ্চিৎ প্রয়াস সাধারণ অর্থে 'শিক্ষক' বলতে

উদ্বোধন, বৈশাখ ১৩৮৭, পৃঃ ১৮১

যা বুঝায় স্বামীজীকে কিন্তু কোনভাবেই সে-পর্যায়ে ফেলা যায় না, যদিও পূর্বাশ্রম-জীবনে তিন-চার মাস তিনি বিদ্যাসাগর মশায়ের স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন। স্বামীজী বিশেষ করে যাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন, এবং ভাবীকালের যাঁদের জন্য উপদেশ ও নির্দেশ রেখে গেছেন, তাঁদের মধ্যে অল্পবয়স্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক দুই-ই আছে, এবং সে শিক্ষা কোন দেশ, কাল বা ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। স্বামীজী যে শিক্ষার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলেন, তা হচ্ছে মানুষকে আত্মজ্ঞান দেওয়া, সে-যে সৎ, চিৎ ও আনন্দের স্বরূপ এবং তার মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা অজ্ঞানের আবরণে ঢাকা পড়ে আছে, তার সন্ধান দেওয়া এবং ভারতীয় ঋষিদের তপস্যা-অর্জিত জ্ঞানসম্ভার যে বেদান্তের মধ্যে নিহিত আছে, তার প্রতি জগৎকে আকৃষ্ট করা। সেজন্য স্বামীজী সম্পর্কে 'শিক্ষক' শব্দটির চেয়ে 'আচার্য' শব্দটি অধিকতর প্রযোজ্য।

শিক্ষাবিষয়ক আধুনিক গ্রন্থাদি থেকে জানা যায় যে, উত্তম শিক্ষকের লক্ষণ হবে এইরকম: তিনি হবেন স্বাস্থ্যবান, প্রসন্নচিত্ত, স্নেহপ্রবণ, ধীর ও শান্তমূর্তি। তাঁর থাকবে বিষয় সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, মিষ্ট স্বর, বিশুদ্ধ উচ্চারণ ক্ষমতা, ভাষার উপর দক্ষতা, বিচার ক্ষমতা, মানসিক স্থৈর্য এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, যার ভিত্তি হল চরিত্রবত্তা, উচ্চ চিন্তাধারা এবং সুনির্দিষ্ট মতবাদ।[২] অনায়াসেই বলা যেতে পারে যে, স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে এই গুণগুলির সবগুলিই বর্তমান ছিল। স্বামীজীকে শিক্ষক হিসাবে বিচার করতে হলে পড়তে হবে তাঁর জীবনী, লেখা প্রবন্ধ, কবিতা ও চিঠিপত্র, অন্যের সহিত আলোচনা-প্রসঙ্গ, বক্তৃতা ও তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় লিখিত বিবরণী। সঙ্ঘ-পরিচালনার ব্যাপারে তিনি তাঁর গুরুভাই ও শিষ্যদের যে-সব নির্দেশ দিয়ে গেছেন, সেগুলিকেও তাঁর শিক্ষণকার্যের মধ্যে ফেলা যায়। ঠিক কি কি বিশেষত্ব নিয়ে স্বামীজী তাঁর স্বল্পকালীন প্রচারকের বা আচার্যের জীবনে দেশে ও বিদেশে অসংখ্য নরনারীর মনে তাঁর ভাবধারা প্রবেশ করিয়ে তাঁদের গুণমুগ্ধ অনুরাগী বা শিষ্য পর্যায়ে এনে ফেলেন এবং ভাবীকালের অনুসন্ধিৎসুদের জন্য সহজলভ্য জ্ঞানভাণ্ডার রেখে গেলেন, নিম্নলিখিত কয়েকটি শিরনামায় সেগুলিকে মোটামুটি ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

(ক) **বক্তব্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা:** শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছিলেন, যে-সব শক্তির একটি মাত্র বিকাশের ফলে মানুষ জগদ্বিখ্যাত হতে পারে, 'নরেন্দ্রের ভিতরে এরূপ আঠারটি শক্তি বিদ্যমান।' এই বিরাট শক্তির ধারক হয়ে নরেন্দ্রনাথ যে-কোন বিষয় অধ্যয়ন করেছিলেন—ন্যায়, দর্শন, অধ্যাত্মতত্ত্ব, জ্যোতিষ, ইতিহাস প্রভৃতি তারই গভীরে প্রবেশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তাঁর শিখবার ইচ্ছা এত প্রবল ছিল যে, যোগসাধনার শারীরিক ভিত্তি যে মস্তিষ্ক ও স্নায়ু, তার গঠনপ্রণালী জানবার জন্য ছাত্রজীবনে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে শারীরতত্ত্ব বিষয়ক ক্লাসে বক্তৃতা শুনতে যেতেন। তাঁর রচনা, বক্তৃতা বা প্রশ্নোত্তর, সব কিছুর মধ্যেই দেখা যায় যে, আলোচনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তিনি কোনরূপ অস্পষ্টতা রাখেন নাই। যে-কোন শিক্ষক ভালভাবেই জানেন যে, নিজের পরিষ্কার ধারণা না থাকলে কোন বিষয় ছাত্রদের মনে অনায়াসে প্রবেশ করানো যায় না। শুধু ছাত্রজীবনে নয়, পরিব্রাজক অবস্থায় এবং বিদেশে

২ Modern Education—its aims and principles by J. Chakravarty, 1965, p. 212

ভ্রমণকালে সুযোগ পেলেই তিনি বিভিন্ন বিষয়ক পুস্তক অধ্যয়ন করতেন। নিবেদিতার ভাষায়: 'তিনি আধিকারিক পুরুষরূপেই শিক্ষা দিতেন, পণ্ডিতদের মতো নয়। কারণ তিনি যে-বিষয়ে শিক্ষা দিতেন, সে-বিষয়ের উপলব্ধির গভীরে তিনি অবগাহন করিয়াছেন।'[৩]

(খ) **বুঝাবার ক্ষমতা**: যে-কোন শিক্ষকের পক্ষে এটি একটি বিশিষ্ট গুণ এবং এই ক্ষমতা শিক্ষকের বিদ্যাবত্তা থাকলেই হয় না। মনে রাখতে হবে যে, স্বামীজীর শিক্ষণকার্যের অনেক অংশই বিদেশে, এবং অধিকাংশ বিদেশীদের কাছে বেদান্তের ভাবধারা অপরিচিত ছিল। সেই ভাবধারা তাদের বোধগম্য করানো সহজ কাজ ছিল না। বিষয়বস্তু কঠিন হলেও শ্রোতৃ-বর্গকে শুরু হতেই আকৃষ্ট করার জন্য স্বামীজী কখন কখন বিষয়টির শব্দার্থ দিয়ে আরম্ভ করেছেন, কোথাও বা আরম্ভ করেছেন কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা দিয়ে, কখন বা আরম্ভ শ্রোতাদের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন রেখে, কখন বা আরম্ভ একটি কাল্পনিক ছবি এঁকে, আবার অনেক বিষয়ের অবতারণা আখ্যায়িকার মাধ্যমে। স্বামীজী প্রাচীন উপাখ্যানাদিরও অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিলেন। কুমারী ওয়াল্ডোর (হরিদাসী) ভাষায়: 'এক মুহূর্তে তিনি আমাদিগকে কৌতুকজনক হিন্দু পৌরাণিক গল্প হইতে একেবারে গভীর দর্শনের মধ্যে লইয়া যাইতেন।'

অনেক সময় তিনি বক্তৃতার পরে শ্রোতাদের প্রশ্ন আহ্বান করতেন এবং প্রশ্নের মান বা ন্যায্যতা যাই হোক, তাঁর ঝটিতি উত্তরদান, শ্লেষযুক্ত প্রত্যুত্তর ও হাস্যকৌতুক সকলকে খুশি করত, অথচ তার দ্বারা মূল অধ্যাত্মচর্চার ধারা কখনও ক্ষুণ্ণ হত না। অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তরেও স্বামীজী কিরূপ কৌতুকজনক জবাব দিতেন তার একটি উদাহরণ দিয়েছেন ম্যারী লুইস্ বার্ক।[৪] আমেরিকার বহুস্থানে তাঁকে একটি বিশেষ প্রশ্ন নানাভাবে করা হত—'তোমাদের দেশে নাকি নবজাতককে গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়?' স্বামীজীর উত্তর, 'হাঁ, একমাত্র আমিই রক্ষা পেয়েছি।' অন্যত্র উত্তর—'আমি মোটা ছিলাম বলে কুমীরের খাওয়ার সুবিধা হয় নাই।' প্রশ্ন—'নবজাত মেয়েদের নাকি কুমীরের মুখে দেওয়া হয়?' উত্তর—'হাঁ, এখন পুরুষরাই সন্তান প্রসব করে।' শুধু প্রশ্নোত্তর কালে নয়, বক্তৃতার সময়, লেখার বা আলোচনাকালেও কৌতুককর কথা বলে শ্রোতার মন হালকা করে দিয়ে তাঁদের উচ্চ ভাব গ্রহণ করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিতেন। তিনি বারে বারে জিজ্ঞাসিত হয়েও বিরক্ত না হয়েও বলতেন: 'আপনাদের যত ইচ্ছা প্রশ্ন করতে থাকুন,...আপনারা যতক্ষণ না বুঝবেন, ততক্ষণ আপনাদের অব্যাহতি নাই।'

শ্রোতার বিদ্যাবুদ্ধির মান অনুযায়ী শিক্ষককে তাঁর বক্তব্যকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দিতে হয়, এবং স্বামীজীর এ-বিষয়ে যে বিশেষ কৃতিত্ব ছিল, তা তাঁর বিভিন্নজনকে লেখা বক্তৃতায় এবং চিঠিপত্রে সুস্পষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও এক সময় লাটু মহারাজের কাছে এই বুঝানোর ব্যাপারেই তাঁকে মৃদু তিরস্কার পেতে হয়েছিল। কাশ্মীরের একটি মন্দির দেখে এসে তিনি জানালেন, মন্দিরটি দুই-তিন হাজার বৎসরের পুরানো। লাটু মহারাজ—'তুমি বুঝলে কেমন করে? হামায় বুঝাও—ওখানে কি সেকথা লিখা ছিল?' স্বামীজী—'তুই যদি লেখাপড়া শিখতিস, তাহলে হয়তো

৩ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, ১৩৮১, পৃঃ ১/০

৪ **Swami Vivekananda: His second visit to the West—New Discoveries—Mary Louise Burke, 1973, p. 296.**

বোঝাতে চেষ্টা করতুম।' লাটু মহারাজ উচ্চ-হাস্য করে বললেন—'ওঃ বুঝেছি! তুমি এমন বিদ্বান যে হামার মতন গণ্ডমূর্খকে বুঝাতে পার না।' একথা শুনে সকলে হেসে উঠেছিল।

(গ) **বাগ্মিতা:** ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো ধর্মসভায় বাগ্মী হিসাবে স্বামীজীর নাম সারা জগতে ছড়িয়ে গেলেও মনে রাখতে হবে যে, তার আগেই পরিব্রাজক অবস্থায় কন্যাকুমারী হতে হিমালয় পরিভ্রমণকালেই তাঁর জন্মগত বাগ্মিতা প্রমাণিত হয়েছিল। ধর্মসভায় বাগ্মী হিসাবে স্বামীজীর সাফল্য সর্বজনবিদিত। এ-সম্বন্ধে বেশি না বলে আমেরিকার একটি সংবাদপত্রের ১১ এপ্রিল ১৮৯৪ সংখ্যার একটি উদ্ধৃতি দিলেই যথেষ্ট হবে—'কার্যক্রমের শেষ মুহূর্তের পূর্বে বিবেকানন্দকে বক্তৃতা দিতে দেওয়া হইত না; ইহার উদ্দেশ্য ছিল, লোককে শেষ পর্যন্ত ধরিয়া রাখা।' ভাল বাগ্মী হতে গেলে প্রয়োজন হয়—বক্তার আন্তরিকতা ও ব্যক্তিত্ব, বক্তব্যের অন্তর্নিহিত চিন্তাধারা, গলার স্বরে মোহিনী শক্তি এবং বলবার ক্ষমতা। স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের বহু নিদর্শন তাঁর বাল্যজীবনের ও ছাত্রজীবনের বর্ণনায় উল্লিখিত আছে, এবং এই ব্যক্তিত্ব থাকায় বাল্যে তিনি সহচরদের নেতা হয়ে উঠেছিলেন এবং পরবর্তী কালে তাঁর গুরুভাইরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে নেতা বলে মেনে নিয়েছিলেন। বিদেশে অভিনেত্রী বার্নহার্ড, গায়িকা মাদাম কালভে, দার্শনিক পল ডয়সন প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের মনীষীদের স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পিছনে আছে তাঁর বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব। ক্যালিফোর্নিয়ায় বক্তৃতার জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষায়: 'বক্তা হিসাবে তিনি ছিলেন অনুপম; অন্যান্য বক্তারা নোটের সাহায্যগ্রহণ করেন, তিনি তাহা কখনও করিতেন না।...তিনি বক্তৃতাকালে যেন নিজেরই খানিকটা সত্তা বিলাইয়া দিতেন, যেন কোন অতীন্দ্রিয় উপলব্ধিস্তর হইতেই কথা বলিতেন। বেদান্ত-দর্শনের অতিগম্ভীর তত্ত্বগুলি যখন শুষ্ক মতবাদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিত, তখন তাঁহার ব্যক্তিত্ব হইতে নিঃসৃত কি একটা সজীব পদার্থের শক্তিতেই যেন উহা সংঘটিত হইত।...ফলতঃ তিনি শুধু বক্তাই ছিলেন না; তিনি ছিলেন একজন উচ্চতম শ্রেণীর আচার্য।' এখানে ভগিনী দেবমাতার কোন একদিনের অভিজ্ঞতা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'তিনটা বাজিতে না বাজিতে হল, সিঁড়ি, জানালা, রেলিং সবই লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এমনকি অনেকে নীচে এই আশায় দাঁড়াইয়া রহিল, যদি বা সৌভাগ্যক্রমে উপরের হলের বক্তৃতার কিছুটা শুনিতে পায়। অকস্মাৎ সব নিস্তব্ধ হইয়া গেল, সিঁড়িতে শান্ত পদক্ষেপ শুনা গেল এবং স্বামী বিবেকানন্দ অতি সমুন্নত দেহে মধ্যবর্তী বারাণ্ডা ধরিয়া মঞ্চে আরোহণ করিলেন। তাঁহার ভাষণ আরম্ভ হইল; অমনি আমার পূর্বস্মৃতি, দেশ, কাল, পাত্র সমস্ত লীন হইয়া গেল—কিছুই অবশিষ্ট রহিল না—শুধু শূন্য মধ্যে একটিমাত্র স্বর নিনাদিত হইতে লাগিল।' স্বামীজীর কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে রোমাঁ রোলাঁ লিখেছেন: 'বক্তৃতা আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ঐশ্বর্যময় গম্ভীর কণ্ঠস্বর অধিকার করে ফেললে বিপুল মার্কিনী অ্যাংলো-স্যাকসন শ্রোতৃমণ্ডলীকে।...তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল (মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড একথা আমায় বলেছিলেন) ভায়োলোন সেলোর মতন চমৎকার।' অন্তর্নিহিত অর্থ বোধগম্য না হলেও কেবল উচ্চারণ ও মিষ্ট কণ্ঠস্বরের জন্যই বক্তৃতাকালে তাঁর উচ্চারিত সংস্কৃত স্তোত্র বিদেশী শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করত। স্বামীজীর বাগ্মিতা সম্বন্ধে লাটু-মহারাজের মন্তব্য: 'স্বামীজীর আসবার দিন-দশেকের মধ্যে (২৮শে জানুআরি, ১৮৯৭) শোভাবাজার রাজবাটীতে একটা বড় সভা

হয়েছিল, জানো। সেখানেই স্বামীজীর লিক্‌চার প্রথম শুনলাম। বেশ দেখতে পেলুম স্বামীজীর ফায়ার করবার শক্তি বেড়ে গেছে। তাঁর কথা শুনতে শুনতে লোকগুলোর দিল্ (উৎসাহ) যে বেড়ে গেছে বেশ বুঝতে পারলাম।' আর আমেরিকায় নিজের প্রচারকার্যের সফলতা সম্বন্ধে স্বামীজীর নিজের মন্তব্য আরও উপভোগ্য : 'কি বাঘ ঘরে ঢুকিয়েছেন, তা বাছাধনেরা টের পাচ্ছেন।...গোঁড়া বেটাদের পর্যন্ত আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে, আর এখন সকলে বড়ই ভক্তি করছে—বাবা ব্রহ্মচর্যের চেয়ে কি আর বল আছে ?' এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, স্বামীজীর বক্তৃতাশক্তি সম্বন্ধে বাগ্মীবর সুরেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন : 'ভারতবর্ষে যত বাগ্মী দেখিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে তিনি সর্বোত্তম ছিলেন।'

(ঘ) **ইংরেজী ভাষার উপর দখল :** স্বামীজীর বক্তৃতার ভাষা, স্থানোপোযোগী শব্দ-প্রয়োগ এবং প্রকাশভঙ্গি শ্রোতৃবর্গকে আকৃষ্ট করত। বিদেশীয় ভাষায় বেদ-উপনিষদ্ বর্ণনা-কালে সঠিক অর্থব্যঞ্জক শব্দচয়ন আজও পাঠকদের বিস্ময়-সৃষ্টি করে। বক্তৃতাকালে তাঁর ভাষার উপর দখল সম্বন্ধে আমেরিকার বহু পত্র-পত্রিকায় প্রশংসা বার হয়েছিল।

(ঙ) **সাধারণ শিক্ষক হতে ভিন্নতা :** শিক্ষাদানকালে স্বামীজী যে নিজেকে জাহির করতে চেষ্টা করতেন না, এ-সম্বন্ধে নিবেদিতা বলেছেন : 'হিন্দুধর্মের এই প্রবক্তার মধ্যে যদি এমন কিছু থাকিত যাহা তাঁহার নিজস্ব তবে স্বামী বিবেকানন্দের মান ক্ষুণ্ণ হইত।...তাঁহার বাক্য-সমূহ (সকল আচার্যের ন্যায়) বেদ-উপনিষদের দ্বারাই সমৃদ্ধ।' নিজের জায়গায় স্বামী অভেদানন্দকে দিয়ে আমেরিকায় বক্তৃতা করতে দিয়ে এবং তাতে সাফল্য দেখে শুধু যে তাঁর বদন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল তা নয়, গুরুভ্রাতা যাতে সম্পূর্ণ বাধাহীন সুযোগ পান এই উদ্দেশ্যে নিজেকে মুছে ফেলে স্বামীজীর যেন তৃপ্তির অবধি ছিল না। এ ছাড়া পরবর্তী কালে তাঁর অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের ও নিবেদিতাকে জনগণের সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা সর্বজনবিদিত।

স্বামীজী বলতেন যে, হিন্দু শিক্ষকদের মতো পাঠ চালাবার ব্যয়ের ব্যবস্থা করা শিক্ষকদের কর্তব্য। নিউইয়র্কে তাঁর বেদান্তপ্রচার আরম্ভ-কালে, স্বেচ্ছায় প্রদত্ত দানে বাড়িভাড়ার খরচ চলত, অভাব পড়লে অন্যত্র বক্তৃতা দিয়ে ক্লাস চালাবার খরচ যোগাড় করতেন। তা ছাড়া যখনই সুযোগ পেতেন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে থেকে প্রাচীন গুরুকুল প্রথায় শিক্ষাদানের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন, যেমন সম্ভব হয়েছিল সহস্র-দ্বীপোদ্যানে।

শিক্ষক সাধারণত খুশি হন যদি ছাত্র তাঁর মতবাদকে সম্পূর্ণভাবে মেনে নেয়। খ্যাতিমান ধর্মপ্রচারক ও শিল্পীদের মধ্যে আবেগশীল নর-নারীকে আকর্ষণ করার যে ক্ষমতা থাকে, বিবেকানন্দও সেই ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু স্বামীজী চাইতেন তাঁর শ্রোতৃবর্গ যেন তাঁদের নিজস্বতা না হারান। ম্যারী লুইস্ বার্ক এই প্রসঙ্গে একটি চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করেছেন।[৫] নিউইয়র্কে একবার বক্তৃতাদান-কালে হঠাৎ মধ্যপথে বক্তৃতা বন্ধ করে স্বামীজী বাইরে চলে গেলেন। সকলে অবাক! পরে তাঁকে এ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানালেন যে, শ্রোতাদের দিকে চেয়ে তাঁর মনে হল যে তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলে

৫. Ibid., p. 135.

তন্ময় হয়ে তাঁর কথা শুনছিলেন এবং সেই অবস্থায় তাঁদের মনে তিনি যা খুশি ঢুকিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু সেরূপ করা ছিল তাঁর স্বভাবের বিরুদ্ধে এবং সেইজন্য তিনি বক্তৃতা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীকে জানিয়েছিলেন যে, শুধু ভারতেরই কল্যাণের জন্য নয়, অপর দেশ-সমূহের জন্যও তাঁকে কোন একটি বিশেষ কাজ করতে হবে। মনে হয়, সেই বিশেষ কাজটি হল শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচার করা, এবং এইটাই শ্রীরামকৃষ্ণের লিখিত 'শিক্ষে' দেওয়া। কুমারী ম্যাকলাউড স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম দর্শনের ঘটনা বর্ণনায় বলেছেন: 'তিনি প্রথম যে-কথাটি বলিলেন, তাহা এখন আমার ঠিক মনে নাই; কিন্তু তখন উহা আমার অভ্রান্ত সত্য বলিয়াই প্রতীতি হইয়াছিল। তিনি যে দ্বিতীয় কথাটি বলিলেন, তাহাও ছিল সত্য, আর তেমনি সত্য ছিল তৃতীয় কথাটি। তারপর সাত বৎসর আমি তাঁহার কথা শুনিয়াছি এবং যাহা কিছু তিনি বলিয়াছেন সবই আমার নিকট ছিল অভ্রান্ত। সেদিন হইতে আমার নিকট জীবনের অর্থ অন্যরূপ হইয়া গেল।' মনে হয়, স্বামীজী-লিখিত বা কথিত যে অমূল্য সম্পদ এখন আমাদের নাগালের মধ্যে, তা আগামী শতশত বৎসর মানবসমাজকে শিক্ষা দেবে এবং সকলের কাছে জীবনের প্রকৃত অর্থ উদ্ঘাটন করতে থাকবে।

'জাগাও আমায়'

[গান]

শ্রীঅটলচন্দ্র দাশ

বর্ষীয়ান ভক্তকবি।

আমায় তুমি ঘোরাতে চাও
আমার আপন কর্ম দিয়ে,
চতুর, তোমার সে বাসনার
পাচ্ছে পরশ আমার হিয়ে।
তাই তো, জেগে আছি সদাই,
অবসর মোর একটুও নাই,
কখন তুমি মনে মনে
মনেরে মোর যাও ভুলিয়ে।

সঙ্গ তোমার অঙ্গে মম
রঙ্গ তোলে কী বিভঙ্গে,
রঙ্গ-রাজ হে, অভিজ্ঞতায় বাজাই
যে তাই মনমৃদঙ্গে।
তাল-লয় তার তোমার পানে
ধায় অবিরাম মুক্ত প্রাণে,
পরশে তার চমকে উঠি
জাগাও আমায় চমকিয়ে ॥

পথ ও পথিক

শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

'ভাক্ত যেন ভয়ে নাহি হয়, পদানত পৃথিবীর কারো কাছে'

পৃথিবী আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে আর আমি তিলে তিলে মরে যাচ্ছি—এই ক্লীবতার উর্ধ্বে কোনও ক্রমে উঠতে হবে। পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী যখন সারা ভারত পর্যটন করছেন তখন তাঁর সন্ন্যাসীর ঝোলায় দুখানি বই থাকত, শঙ্করাচার্যের 'বিবেকচূড়ামণি' আর টমাস আ কেম্পিস-এর 'দি ইমিটেশান অফ ক্রাইস্ট'। কেম্পিস বলছেন :

> The Lord is my light and my
> deliverance ; whom
> have I to fear ? Though a whole
> host were arrayed
> against me, my heart would be
> undaunted.

জীবনে ভয়ের শেষ নেই। প্রকৃতিকে যতই বশে আনা যাক, প্রকৃতির এক ফুৎকারে শতশত মানুষের জীবনদীপ নির্বাপিত হতে পারে। যে কোনও মুহূর্তে মারক ব্যাধি আমাদের আস্ফালন স্তব্ধ করে দিতে পারে। ভয় আছে জীবিকা না পাবার, পেয়ে হারাবার। আর আছে মানুষ। মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু মানুষ।

এই যে বাংলাদেশের সমুদ্রকূল ছুঁয়ে এত বড় একটা ঘূর্ণীঝড় বয়ে গেল, মুছে গেল শতশত প্রাণের বেঁচে থাকার ক্লিন্ন, ক্লিষ্ট ইতিহাস। তারপর। তারপরের ইতিহাস আরও নিদারুণ। খেয়ালী প্রকৃতি মানুষের মুখ চেয়ে কাজ করে না। কিন্তু মানুষ! ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ জীব। তারা কি করছে! এখনও যাদের পুনর্বাসন হল না। অনিকেত। অনাহার আর ব্যাধিপীড়িত, তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে জোতদারের ভাড়াটে গুণ্ডা। একখণ্ড জমির দাম, মানুষের জীবনের চেয়ে দামী।

হিরোসিমা, নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমা পড়ার পর, যে কজন প্রাণে বেঁচেছিলেন তাদের মধ্যে একটি বাচ্চা মেয়ে প্রশ্ন করেছিল, মানুষের ওপর মানুষ কিভাবে এমন নিষ্ঠুর হতে পারে! আমরা কি এমন করেছি যে, আমেরিকা আমাদের দুটো শহর একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিল!

ডেসমণ্ড মরিস তাঁর 'দি হিউম্যান জু' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখছেন :

Under normal conditions, in their natural habitats, wild animals do not mutilate themselves, masturbate, attack their offspring, develop stomach ulcers, become fetishists, suffer from obesity, form homosexual pair, bonds or commit murder.

কিন্তু শহরবাসী সুসভ্য মানুষ কি করে! বলা নিষ্প্রয়োজন, এই সবই সেখানে নিত্য ঘটে চলেছে নির্বিচারে। মরিস প্রশ্ন করছেন, তাহলে পশুতে আর মানুষে কি মূলগত একটা পার্থক্য বিদ্যমান! আপাতদৃষ্টিতে সেইরকমই মনে হতে পারে। আসলে তা নয়। পশুকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে কৃত্রিম পরিবেশে ঠেসে দিলে আজকের

মানুষের মতোই আচরণ করবে। চিড়িয়াখানায় খাঁচায় পশুদের মধ্যে ওই একই বিকৃত আচরণ লক্ষ্য করা যাবে। তার মানে, আমাদের আজকের শহর শুধু 'কংক্রিট জঙ্গল' নয়, 'হিউম্যান জু'—মানুষের চিড়িয়াখানা।

Go back you are heading for disaster. অন্য কোনও জীবনের কথা ভাবো। এ জীবন তোমাকে মেরে ফেলবে। কে শুনবে, এই সতর্কবাণী। আমরা নিজেদের জালেই দু-ভাবে জড়িয়ে পড়েছি। এক ভূমিকায় দর্শক, অন্য ভূমিকায় অংশগ্রহণকারী। ভোক্তা। যে বাজি ধরা হয়েছে তার অঙ্ক হু হু করে বেড়েই চলেছে। **The stakes are rising higher all the time, the game becoming more risky, the casualties more startling, the pace more breathless.**

আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে, অসউইজ, বেলসেন, ডাচাউ, কনসেণ্টেশান ক্যাম্পে মারণ-যজ্ঞের কথা ভেবে এখনও আতঙ্কে শিউরে উঠি। অথচ সারা পৃথিবীটাই এখন এক বিশাল কন-সেণ্ট্রেশান ক্যাম্প। ইথিওপিয়ায় মানুষ কি ভাবে মরছে। কেন মরছে! কার দোষে মরছে! জুনের প্রথম সপ্তাহের টাইম ম্যাগাজিনে যে সব ছবি ছাপা হয়েছে, দেখলে মনে হবে হিটলার ফিরে এসেছেন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে। এক মৃত মহিলা, কঙ্কালসার, তাকে বসিয়ে কবরে দেবার আগে প্রথামত স্নান করানো হচ্ছে। একটি শিশু, দিনের পর দিন অনাহারে যেন বৃদ্ধ। ম্যাগাজিনের পাতা থেকে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে সভ্য দুনিয়ার দিকে। অনুচ্চারিত প্রশ্ন—'বল, তোমরা কি বলবে?' কয়েক যোজন দূরে ভোগের দুনিয়ায় বাফুনেরা লাট খাচ্ছে। মিয়ামি কি ফ্লোরিডার সমুদ্রসৈকতে স্কচের ফোয়ারা ছুটছে। লাইফ ম্যাগাজিনেও ইথিওপিয়ার ছবি। কঙ্কালসার মা সন্ত সন্তান প্রসব করেছেন। শিশুটি পড়ে আছে পায়ের ফাঁকে। তখনও ছিন্ন হয়নি নাড়ীর যোগ। পাশেই পড়ে আছে অস্ত্রোপচারের কাঁচি। তলায় ক্যাপসান, মা যদি এবার বাঁচে, প্রসূতীসদনে থাকার অধিকার মিলল।

এ তো চূড়ান্ত দুর্ভোগের ঘটনা। এর পাশে প্রতিদিন সাধারণ মানুষের জীবনে কি ঘটছে! মানুষ আসছে লাখে লাখে। প্রতিদিনই নব-জাতকের কান্না হয় এখানে না হয় ওখানে। অথচ জীবিকা নেই। বাসস্থান নেই। প্রচ্ছন্ন দাস ব্যবসা আজও চলছে। সর্বত্র শোষণ। নিষ্পেষণ। কোনও ক্রমে ধুঁকতে ধুঁকতে বেঁচে থাকা। শিক্ষার সুযোগ কজন গ্রহণ করতে পারে! কজন পায় উন্নত চিকিৎসার সুযোগ! প্যারিসের রাজপথে নতমস্তক ভিখিরী। নিউইয়র্কে স্যুপের লাইনে বেকারের দল। ইংল্যাণ্ডের ফুটবল সমর্থক বেলজিয়ামে গিয়ে মেরে দিয়ে এল একদল নিরীহ দর্শক। ধর্মের নামে ইরানী যুবক ছুটছে ইরাকে জীবন দিতে। মাইনপাতা যুদ্ধ-ক্ষেত্রের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবে এই আত্মোৎসর্গী যুবকেরা। মাইনমুক্ত ক্ষেত্রে ছুটে আসবে পরবর্তী ইরানী সৈন্যদল।

মধ্যযুগ শেষ হয়েছে? ক্যালেণ্ডারে কত সাল চলেছে? রাজা, মহারাজা, ওমরাও, অমাত্যদের যুগ কি শেষ হল? সাধারণ মানুষ পেষাই হচ্ছে কিসে?

কবীর দাসজীর কি মনে হয়েছিল! মানুষের নিষ্পেষণ দেখে:

চলতী চক্কী দেখিকে দিয়া কবীরা রোয়।
দুইপট ভীতর আয়কে সাবিত গয়া ন কোয়॥
ভাই বীর বটাউআ ভরি ভরি নৈন ন রোয়।
জাকা থা সো লে লিয়া দীনহা থা দিন দোয়॥
বীর পথিক অমন করে অঝোরে কেঁদো না।
বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ভিক্টর ই ফ্রাঙ্কল অসউইজ

থেকে কোনও ক্রমে বেঁচে ফিরে এসেছিলেন। একদিকে মৃত্যু, অন্যদিকে মনস্তত্ত্ববিদের অন্বেষা। মানুষকে পশুবানাবার শক্তিশালী চক্রান্ত। এস. এস. অফিসারের ডাইনে বামে মাথা দোলানর ওপর নির্ভরশীল শতশত অসহায় নরনারী শিশুর মরণ-বাঁচন। গ্যাসচেম্বারে যাবার আগে বেঁচে থাকার ধরন পশুর মতো। পরিধেয়হীন উলঙ্গ দেহ। অনাহার। অকথ্য পরিশ্রম। চাবুক, বুটের লাথি। আত্মবিশ্বাস প্রায় ভেঙে পড়ে। ডাক্তার ফ্রাঙ্কল শুধু দেখে চলেছেন, এই একসট্রিম অবস্থায় মানুষ কি সত্যিই পশু হয়ে যায়! না, কিছু মানুষ দেহসীমা লঙ্ঘন করতে পারে: ফ্রাঙ্কল লিখছেন—Inspite of all the enforced physical and mental primitiveness of the life in a concentration camp, it was possible for spiritual life to deepen. স্বামীজীও তো এই একই সত্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন—"Persecution (অন্যায় অত্যাচার) না হলে জগতে হিতকর ভাবগুলি সমাজের অন্তস্তলে সহজে প্রবেশ করতে পারে না।"

বিবেকানন্দ সঙ্গীত

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ইংরেজী বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

সপ্তঋষির এক ঋষি তুমি
নররূপী ভগবান
শ্রীরামকৃষ্ণের তুমি যে নরেন
ভক্তপ্রাণের প্রাণ।

ভারত-আত্মার মূর্ত বিবেক
তুমি যে বিবেকানন্দ
ত্যাগ ও সেবার মূর্তি তুমি যে
তুমি যে সচ্চিদানন্দ।

প্রেম ও করুণা শুদ্ধ বুদ্ধ
মুক্তপরমানন্দ
সন্ন্যাসী তুমি
ভক্তপ্রাণের স্বামীজী বিবেকানন্দ

তোমার রূপ

শ্রীরতিকান্ত ভট্টাচার্য
সাহিত্যসেবী।

অসীমের মাঝে অসীম তুমি
রূপের মাঝারে অরূপ
ক্ষুদ্রের মাঝে বৃহৎ তুমি
দুঃখেরই মাঝে সুখ।
খণ্ডের মাঝে অখণ্ড তুমি
মৌনের মাঝে মূক
বন্ধনের মাঝে মুক্ত তুমি
(প্রভু!) এই তো তোমার রূপ॥

পুস্তক সমালোচনা

জননী সারদেশ্বরী— শ্রীঅর্চনাপুরী। প্রাপ্তিস্থান : শ্রীসত্যানন্দ দেবায়তন, ১, ইব্রাহিমপুর রোড, যাদবপুর, কলিকাতা-৩২। ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ২৭২; মূল্য : বার টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটি "শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী দেবীর শত-বার্ষিকী উপলক্ষে" প্রথম প্রকাশিত। বর্তমান প্রকাশ ইহার ৩য় সংস্করণ। গ্রন্থটির তিনটি প্রকাশ-ই ইহার জনপ্রিয়তারই পরিচায়ক।

সুলেখিকা সন্ন্যাসিনী অর্চনাপুরী মুখ্যতঃ পূর্বসূরী-লিখিত আকর গ্রন্থগুলি থেকেই শ্রীশ্রীমার জীবনের ঘটনা পরম্পরাকে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং মায়ের জীবনের দিব্যলীলাকে উপলব্ধির জন্য লেখিকার "ধ্যান ও অনুভূতির সুরকম্পন" আমাদের ভাবনা ও অনুভূতিকে সহজেই উদ্বুদ্ধ করে।

শ্রীশ্রীমার জীবনের ঘটনাবলী পূর্ব থেকে জানা থাকলেই লেখিকার কাব্যময় কথকতার সুর-ধ্বনিকে আরও উপভোগ করা যায়। প্রথম পাঠকের পক্ষে এই রসনিস্যন্দী কাব্য কথিকার আবেদন যথেষ্ট হলেও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর গদ্যময় অনুসরণে কিছুটা দুরাসাধ্যতা পরিলক্ষিত হয়। এই বাধা দূর করার জন্যই তৃতীয় সংস্করণের শেষাংশে "পাঠকের সুবিধার্থে এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীসারদা-মার জীবনলীলার বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর একটি সূচী সন্নিবেশিত হয়েছে।" কাব্যময়,—প্রকাশভঙ্গিমায় ইহা একটি সুরললিত গ্রন্থটির ভাষা কথিকা। ঘটনা বর্ণনার ব্যগ্রতা ইহাতে স্বল্প,—পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিকের কাব্যময় অনুভবে ইহা ধীর-গতি এবং শ্রুতিমধুর।

ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা জীবনের আধ্যাত্মিক মূল্য সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়ে গ্রন্থখানির গুরুত্ব আরও বর্ধিত করেছে।

এই সংস্করণের ১৭৬ পৃষ্ঠায় "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যুগ"—উল্লেখ করা হয়েছে। "দ্বিতীয়" মহাযুদ্ধ সম্পর্কে একটু খটকা লাগে। পরবর্তী সংস্করণে এই সংশয় দূর হলে ভাল। গ্রন্থটির শেষাংশে শ্রীমার উপদেশ সংকলন গ্রন্থটির উপযোগিতা বৃদ্ধি করেছে। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

—ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর

নেতাজী ইনস্টিট্যুট ফর্ এশিয়ান স্টাডিজ-এর ফেলো

স্বামী সদাত্মানন্দ—প্রকাশক : স্বামী সম্বিদা-নন্দ, রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম, দার্জিলিং—৭৩৪-১০১। পৃঃ ১২+১১৫; মূল্য : বার টাকা।

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের অন্যতম প্রিয় শিষ্য, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ, স্বামী সদাত্মানন্দজীর (১৮৯৯—১৯৮৩) পুণ্য জীবনকাহিনী এই গ্রন্থে বিবৃত। শ্রীরামকৃষ্ণচরণে-সমর্পিত এই জীবন পবিত্রতার আধার—যেখানে দেখি ভক্তি, জ্ঞান ও সেবা তথা নিষ্কাম কর্মের সমন্বয়।

২৪ পরগনার ডায়মণ্ডহারবারের অন্তর্গত ঘাটেশ্বর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। পূর্বাশ্রমে নাম ছিল চণ্ডিকাপ্রসাদ হালদার। পিতা অম্বিকাচরণ এবং মাতা হেমাঙ্গিনী দেবী উভয়েই ছিলেন একান্ত ধর্মনিষ্ঠ। জনকজননীর

জীবনকেন্দ্রে স্থিত উচ্চাদর্শ সহজেই চণ্ডিকা-প্রসাদের চরিত্রে সঞ্চারিত। বইটিতে সদাত্মানন্দজীর জীবন চার পর্ব অথবা অধ্যায়ে বিভক্ত। সংসার-আশ্রমের প্রথম একুশ বছর নিয়ে এই জীবনের প্রারম্ভিক পর্ব। অল্প বয়সে তিনি পিতৃ-মুখে শুনেছিলেন সকলের আত্মা এক, অভিন্ন। সেই সময় থেকেই তাঁর চিত্ত ঈশ্বরাভিমুখী। এই আধ্যাত্মিক প্রবণতার মূলে একদিকে সৎ শিক্ষা ও সৎ পরিবেশ, অন্যদিকে শুভ সংস্কার। কাঁথি রামকৃষ্ণ আশ্রমে যোগদানে তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্বের আরম্ভ। এখানেই তাঁর দীক্ষালাভ, নিঃস্বার্থ কর্মেরও শিক্ষা। তিন বছর পরে ২৪ বছর বয়সে শুরু হয়েছে তৃতীয় পর্ব। ষোল বছরব্যাপী এই তৃতীয় পর্ব কেটেছে গুরুসান্নিধ্যে, গুরুসেবায় এবং তাঁর নির্দেশ মতো কর্মসম্পাদনে। প্রথমে ব্রহ্মচর্য, পরে সন্ন্যাসলাভ এই পর্বে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দজীর দেহত্যাগের পর বেদান্ত মঠ পরিচালনার দায়িত্ব যাঁদের উপর স্বভাবতই এসে পড়ে, সদাত্মানন্দজী তাঁদের অন্যতম। এই সময়ে অর্থাৎ ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জীবনের চতুর্থ পর্বের সূচনা। এই চতুর্থ বা শেষ পর্বের কালপরিধি চার দশকেরও অধিক। পর্বটির সূচনার প্রস্তুতি-কাল বলা যায় চার বছর ১৯৩৯—৪৩—যে-সময়ে স্বামী চিৎস্বরূপানন্দজী বেদান্ত মঠের প্রথম অধ্যক্ষ রূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সদাত্মানন্দজী অধ্যক্ষ পদে বৃত হলেন ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ; সেই সময় থেকে ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর অর্থাৎ শরীরত্যাগ পর্যন্ত তিনি মঠাধীশ। সরলতার প্রতিমূর্তি সদাত্মানন্দজীকে এই শেষ পর্বেও দেখি সম্পূর্ণ নিরভিমান। সতত পরহিতে রত, নিজেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের একান্ত অনুগত সেবকমাত্র বোধ করে তিনি তখন বলতেন : 'ঠাকুর আমি তোমার, তুমি আমাকে দিয়া যাহা করাইবে আমি তাহাই করিব।'

জীবনচরিতটি তথ্যাকীর্ণ নয়। স্বল্পপরিসর এই গ্রন্থে সদাত্মানন্দজীর বহির্জীবনের একটি পরিচ্ছন্ন রূপরেখা আমরা পাই, সেই সঙ্গে তাঁর অন্তর্জীবনের একটি আভাস। তাঁর দিনলিপি-সহ বিভিন্ন রচনা এবং লিখিত উপদেশ এই গ্রন্থের অন্যতম উল্লেখযোগ্য উপাদান। এই উপাদান একদিকে যেমন প্রামাণিক, অন্যদিকে তেমনই তার ব্যবহারও নিপুণ এবং কার্যকর।

সদাত্মানন্দজীকে এই গ্রন্থে দেখি—যেকথা আগেই বলেছি—একাধারে জ্ঞানী, কর্মযোগী ও ভক্তরূপে। শান্তচিত্ত এই সন্ন্যাসীর জ্ঞানের স্নিগ্ধ দীপ্তি প্রতিফলিত তাঁর বিভিন্ন রচনায়। এই জ্ঞানী সাধুই আবার সেবাপরায়ণ, নিষ্কাম কর্মী—যাঁর সম্পর্কে অভেদানন্দজীর একটি উক্তি : 'চণ্ডী মঠের মা।' আর ভক্তি ছিল তাঁর সহজাত আন্তর সম্পদ। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি তাঁর একটি ব্যাকুল নিবেদন উল্লেখযোগ্য : 'ঠাকুর শুধুমাত্র তোমাকে চাই, আর কিছু নহে। ঠাকুর শুধুমাত্র তোমাকে ভালবাসি। আর ভালবাসি তাদের যারা তোমাকে ভালবাসে।'

আশা করা যায়, বইটি সহৃদয় ভক্তিমান পাঠকদের সমুচিত সমাদর লাভ করবে।

—শ্রীজ্যোতির্ময় বসু রায়
প্রবীণ লেখক ও সাহিত্য-সমালোচক

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন
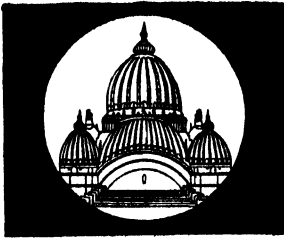
আসামে বন্যাত্রাণ : শিলচর রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের মাধ্যমে কাছাড় জেলায় বন্যার্তদের মধ্যে চাল, শিশুখাদ্য ও কেরোসিন তেল বিতরণ করা হয়। এছাড়াও তাদের মধ্যে বিতরণের জন্য বিমানযোগে শিলচর আশ্রমে পাঠানো হয়েছে : ১০০০খানা শাড়ি, ১০০০-খানা ধুতি, ১০০০খানা চাদর, ২০০০খানা ছেলে-মেয়েদের জামা, ৫৫৫খানা বড়দের জামা, ২০০-খানা লুঙ্গি এবং ১০০খানা পশমী কম্বল।

শ্রীলঙ্কা শরণার্থিত্রাণ : মাদ্রাজ ত্যাগরাজনগর রামকৃষ্ণ মিশন, শ্রীলঙ্কা থেকে মন্দাপম্ শিবিরে আগত বিপুলসংখ্যক শরণার্থীকে প্রাথমিক সেবাদি কার্য যথাযথভাবে করে চলেছে। এসব ছাড়াও তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয় ১০,৬১২ জনের রান্না-করা খাবার, ৮,৮২০খানা বান্, ১৬৭খানা শার্টের কাপড়, ৩৬ ডজন পেন্সিল, ১০৮খানা শ্লেট ও ২৬২খানা খাতা।

বাংলাদেশে ঘূর্ণিবাত্যাত্রাণ : সম্প্রতি বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়ে হাজার হাজার মানুষ মারা যায়। শত শত ব্যক্তি গৃহহারা হয়ে পড়ে। ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন ও বরিশাল রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে সোনাগাজি ও ভোলা অঞ্চলে প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের মধ্যে ১,২০০ বাসনপত্র, ৩০০ লণ্ঠন, ১৫০ খানা কম্বল, ৩০০ খানা শাড়ি ও লুঙ্গি, ৬০০ খানা পুরানো কাপড়, ১০ ব্যাগ গুঁড়া দুধ প্রভৃতি বিতরণ করা হয়।

প্রার্থনালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন

গত ১৩ জুন ১৯৮৫, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ জামশেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির সাকচিস্থ ছাত্রাবাসের নবনির্মিত প্রার্থনালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

উদ্বোধন-সংবাদ

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা : সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী অজজানন্দ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

দেহত্যাগ

অতি দুঃখের সঙ্গে আমাদের সঙ্ঘের তিনজন সন্ন্যাসীর দেহান্তসংবাদ জানাতে হচ্ছে এখানে :

স্বামী শমানন্দ (ভুবন মহারাজ) গত ৪ জুন ১৯৮৫, দুপুর ১-৫০ মিনিটে কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ৮৭ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। হৃৎপিণ্ডের একাংশে অকস্মাৎ রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে হৃদ্‌যন্ত্রে গুরুতর চাপ সৃষ্টির ফলে তাঁর দেহান্ত হয়। তিনি বার্ধক্যজনিত নানাবিধ উপসর্গে ভুগছিলেন। গত মে মাসের শেষের দিকে তিনি সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছিলেন তাঁর পায়ে শোথের চিকিৎসার জন্য। তাঁকে উপযুক্ত চিকিৎসকদের দিয়ে সবরকমের চিকিৎসা করানো হয়, কিন্তু অকস্মাৎ শেষ সময়টি ঘনিয়ে আসে। বেশিদিন তাঁকে রোগকষ্টে

ভুগতে হয়নি। অন্তিম সময় পর্যন্ত তাঁর সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হবিগঞ্জ (অধুনা বাংলাদেশে) রামকৃষ্ণ আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে যোগদান করেন। তিনি কুলগুরুর কাছ থেকে মন্ত্রলাভ করেছিলেন। ১৯২৯-এ তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। হবিগঞ্জ রামকৃষ্ণ আশ্রম ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে বরানগর, রাজকোট, মেদিনীপুর, কাঁকুড়গাছি ও বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমের কর্মী ছিলেন। ১৯৭১ থেকে তিনি বেলুড়মঠে একান্তজীবন যাপন করছিলেন। শান্ত ও কঠোর সাধুজীবনের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধার্হ ছিলেন।

স্বামী আশুতোষানন্দ (বটকৃষ্ণ মহরাজ) গত ১২ জুন, বিকাল ৩-৫৫ মিনিটে বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ৭৮ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গত ২ জুন তাঁকে সেবাশ্রমে ভর্তি করা হয় ডানদিকের অন্ত্রবৃদ্ধিজনিত হারনিয়ার অস্ত্রোপচারের জন্য। ভালভাবে অস্ত্রোপচার কার্য সম্পন্ন হলেও অস্ত্রোপচারের কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর অবস্থার দ্রুত অবনতি দেখা যায়। চিকিৎসকদের সবরকমের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রশান্তভাবে তিনি চিরনিদ্রায় মগ্ন হন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট দীক্ষা লাভ করেন এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেন। ১৯৩৮-এ তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করেন শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের নিকট। ঢাকা মিশন ছাড়া তিনি বিভিন্ন সময়ে বোম্বে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন এবং বারাণসী রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের কর্মী ছিলেন। তিনি কিছুদিন বেলুড়মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজকও ছিলেন। তাঁর সরল ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

স্বামী উত্তমানন্দ (সৌরেন মহারাজ) গত ১৯ জুন, ভোর ৫টার সময় বারাণসী রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে ৮৩ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। গত একমাস যাবৎ তিনি মোটামুটি ভালই ছিলেন এবং একবার মাত্র বারাণসী সেবাশ্রমে চিকিৎসার্থ ভর্তি হয়েছিলেন—ঐকালে দেহের অনার্দ্রতা ও কোষ্ঠকাঠিন্যই প্রধান উপসর্গ ছিল। সুচিকিৎসায় তিনি কিছু ভাল হয়েও উঠেছিলেন। এমন কি শরীর ত্যাগের দিন তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস মতো ভোরে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের মঙ্গলারতি দর্শন করেন এবং নিজ শয়নকক্ষে ফিরে যান। কিন্তু তার ঘণ্টাখানেক বাদে তিনি খুবই অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন এবং অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই সব শেষ হয়ে যায়।

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন তিনি এবং ১৯২৪-এ কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে যোগদান করেন। ১৯৩২-এ তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। বহু বছর ধরে পুরী রামকৃষ্ণ মঠ এবং পরে কিষাণপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষতা ছাড়াও তিনি রেঙ্গুন ও বোম্বে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কর্মী ছিলেন। ১৯৭০ থেকে তিনি একান্তজীবন যাপন করছিলেন। ১৯৭৬ থেকে এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি বারাণসী রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে বাস করছিলেন। অনাড়ম্বর সাধুজীবন যাপনের জন্য তিনি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

লোকান্তরিত সন্ন্যাসিত্রয়ের দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণচরণে চিরশান্তি লাভ করুক—এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

বিবিধ সংবাদ

স্বামীজীর নামে এশিয়াটিক সোসাইটিতে অধ্যাপক পদ

৯ জুন ১৯৮৫, এশিয়াটিক সোসাইটির কাউন্সিলের সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, স্বামী বিবেকানন্দের নামে ওরিয়েণ্টাল স্টাডিজের অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করা হবে। ভারতে এই প্রথম স্বামীজীর নামে অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করা হল। এই পদটি অলঙ্কৃত করবেন বিখ্যাত ভারত-তত্ত্ববিদ্ কানাডার টোরেণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ এ. এল. ব্যাসম। উল্লেখ্য, তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলন সমীক্ষায় আন্তর্জাতিক পর্ষদের সভাপতি।

উৎসব

রায়গঞ্জ (পশ্চিম দিনাজপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৫—৭ এপ্রিল ১৯৮৫, তিনদিন ধরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার জন্মোৎসব ও যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তিনদিনের বক্তাগণ ছিলেন স্বামী ভাগবতানন্দ, স্বামী আত্মপ্রভানন্দ, শ্রীঅর্দ্ধেন্দু সেন প্রভৃতি। যুবসম্মেলনে পশ্চিম দিনাজপুর, মালদা, কোচবিহার, শিলিগুড়ি, নকশালবাড়ি প্রভৃতি অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিরা যোগদান করেন।

কসবা (দক্ষিণ কলিকাতা) শ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ সংঘে গত ৫—৭ এপ্রিল, তিনদিন ধরে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ১৫০তম জন্মতিথি-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে ৭ এপ্রিল, রবিবারের সভায় ভাষণ দান করেন স্বামী অজজানন্দ, ডঃ নিমাইসাধন বসু এবং ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর।

হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে গত ২৮ ও ২৯ এপ্রিল, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আবির্ভাব-উৎসব সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের সভায় প্রব্রাজিকা শুদ্ধাপ্রাণার সভাপতিত্বে ভাষণদান করেন প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা। স্বামী অমলানন্দের পৌরোহিত্যে দ্বিতীয় দিনের সভায় বক্তা ছিলেন স্বামী উমানাথানন্দ এবং বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

ভাটপাড়া (২৪ পরগনা) শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ১, ১২ ও ১৯ মে, তিনদিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের শুভ আবির্ভাব-উৎসব এবং আন্তর্জাতিক যুববর্ষ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুচারুরূপে উদ্‌যাপিত হয়। বিভিন্ন দিনের আয়োজিত সভায় বক্তা ছিলেন স্বামী স্মরণানন্দ, স্বামী দিব্যানন্দ, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা প্রমুখ। যুবসম্মেলনে ১৬০ জন যুবক অংশগ্রহণ করেন।

বালুরঘাট (পশ্চিম দিনাজপুর) শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ সেবা ও সংস্কৃতি তীর্থে গত ১০—১২ মে, তিনদিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-উৎসব নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। বিভিন্ন দিনের বক্তাগণ ছিলেন স্বামী অমৃতত্বানন্দ, স্বামী দেবরাজানন্দ, স্বামী গিরিশা-নন্দ, প্রব্রাজিকা বিজ্ঞানপ্রাণা, প্রব্রাজিকা ভাস্বর-প্রাণা প্রভৃতি।

—বিশেষ দ্রষ্টব্য—

* অতঃপর বর্তমান পৃষ্ঠাসংখ্যা নিচে।

* পুনর্মুদ্রিত অংশের পৃষ্ঠাসংখ্যা উপরে।

পুনর্মুদ্রণ

২য় বর্ষ, ১৫শ সংখ্যা ● আশ্বিন ১৩০৭ (পৃষ্ঠা ৪৪৯—৪৬০)

উদ্বোধন

২য় বর্ষ।] ১লা আশ্বিন। (১৩০৭ সাল) [১৫শ সংখ্যা

পরলোকবাদ।

স্বামী সারদানন্দ লিখিত।] [২৪১ পৃষ্ঠার পর।

পরলোকবিশ্বাসের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণের মত আমরা দেখিয়া আসিলাম। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বক্তব্য কি, তাহা এখন বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্ডিতগণ বলেন—জাগতিক জড়শক্তিবিকাশের পশ্চাতে ইচ্ছাময় দেবতা সকলের কল্পনারোপ হইতে পরলোকবিশ্বাস স্রোত পরিবর্দ্ধিত ও পূর্ণকায় হইতে পারে, কিন্তু উহার উৎপত্তির নিমিত্ত স্থানান্তরে অন্বেষণ করিতে হইবে। মানবের অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধা ও ভালবাসাতেই উহার মূল নিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যাইবে। আবহমান কাল ব্যাপিয়া মানুষ বিশেষশক্তিসম্পন্ন মানবের পূজা ও উপাসনা করিয়া আসিতেছে। আবহমানকাল ব্যাপিয়া সংশয়াত্মার গর্ব্বিত মস্তক বীরনর ও বীরনারীর চরণপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়াছে। নামরূপলোপকরী কালাম্বুধির সিকতাভূমিতে তাঁহাদের চরণচিহ্নই শ্রান্ত ভ্রান্ত মানবের একমাত্র জীবনাশ্রয়। এ বীরোপাসনার মূল কোথায়? কোথা হইতে মানুষ সমেন্দ্রিয়বিশিষ্ট সমশক্তিক অপর এক মনুষ্যকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে এবং তাঁহার কথায় জীবন মরণ পণ করিতে শিখিল? বলিতে পার—জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি বা অন্য কোন এক বা অধিক মানসিক শক্তিতে মোহিত ও স্তম্ভিত হওয়াই ইহার কারণ। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিলে দেখিবে, ভালবাসাই ইহার মূল। এই অনিত্য অসুখময় স্বার্থজীবন জগতে মানুষ ভালবাসারই কাঙ্গালী। কণামাত্র নিঃস্বার্থ ভালবাসাতেই কষ্টপ্রদ দাসত্ব-শৃঙ্খলও সুখের বলিয়া পরিধান করে। ভালবাসার মন্দিরেই হৃদয় মন, প্রাণ, সর্ব্বস্ব ইচ্ছায় উৎসর্গীকৃত করে। সমাজ-সংস্কারক! তুমি ভাবিতেছ, কেন তোমার যুক্তিযুক্ত সারগর্ভ বাক্য সকল সহস্র চেষ্টাতেও সমাজ-মনে প্রবিষ্ট হইতেছে না। ধর্ম্মনেতা! তোমার অশেষ উদ্যমেও সমাজে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত হইতেছে না দেখিয়া, তুমি রুষ্ট ও ভগ্নোদ্যম হইতেছ। রাজনীতিজ্ঞ! তোমার জিহ্বা ও লেখনী নীরব নহে, অথচ কোন ফলই পাও না। শিক্ষক! তোমার অদ্ভুত পাণ্ডিত্যেও ছাত্রদিগের মন ভিজিতেছে না। কারণ কি? ইহা কি কালের বিপরীতগতি অথবা অদৃষ্ট অথবা জগৎ উন্মত্ত হইয়াছে? অনুসন্ধান কর, দেখিবে জগৎ যেমন তেমনিই আছে; কিন্তু নিজের ভিতর এক বৃহৎ অভাব বর্ত্তমান। আর এই এক অভাবই সমস্ত শ্রম পণ্ড করিতেছে। সে অভাব আর কিছুই নহে; স্বার্থগন্ধহীন যথার্থ ভালবাসা, যাহা জগতের গুরুপদবাচ্য বীরনর ও বীরনারীর মানসিক গঠনের প্রধান উপাদান। একথা শুনিয়া হয়ত কেহ কেহ হাসিবেন। বলিবেন, তবে কি জগতে সত্যের উপাসক কেহ নাই, ছিল না, এবং থাকিবে না। ভালবাসার মোহনরবে মুগ্ধ হইয়া, তবে কি ভ্রম প্রমাদ অসত্য সমূহকে সত্যামৃত বলিয়া গলাধঃকরণ করিতে হইবে? কথাগুলি শুনিতে আপাততঃ অতীব মনোহর ও যুক্তিগর্ভ। কিন্তু সত্যলাভের প্রধান সাধন অন্বেষণ করিয়া দেখিলে কি নিঃস্বার্থ ভালবাসা ভিন্ন অপর কোথায় পাওয়া যায়?

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯২ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সঃ

(শ্রাবণ, ১৩৯২, পৃঃ ৪০১)

মাধ্যাকর্ষণ, ক্রমবিকাশ, জড় ও শক্তির অবিনাশিতা এবং এক শক্তির শক্ত্যন্তরপরিণমন প্রভৃতি জড় বিজ্ঞানের তত্ত্ব সমূহ, দেশকালনিয়ততরঙ্গায়িত চিত্তপ্রচার, এক চিত্তের চিত্তান্তরে শক্তিসংক্রামিতা, সংযমসহায়ে মানসিক এক শক্তির ভিন্নরূপে পর্য্যবসান, মনোনিরোধ বা সমাধিসাধনে দেশকালাতীত শুদ্ধসত্যে বর্ত্তমানতা প্রভৃতি অন্তর্বিজ্ঞানের গভীরতর তত্ত্বনিচয়ও মানবমনের তত্তৎ বিষয়ে স্বার্থশূন্য অনুধ্যানেই কি আবিষ্কৃত হয় নাই ? দেশকালের রাজত্বে যথার্থ অনুরাগই সত্যলাভের প্রধান সাধন। আবার দেশকালের পারে যদি তোমার দৃষ্টি ছুটিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে দেখিবে এবং বুঝিবে "সত্যম্ জ্ঞানমানন্দম্ ব্রহ্ম"—সত্য, জ্ঞান এবং আনন্দ তিনে এক এবং একে তিন। যাহা সত্য, তাহাই জ্ঞান এবং তাহাই আবার আনন্দ ; এবং দেশকালমধ্যগত সত্য, জ্ঞান এবং অনুরাগ সেই অপার আনন্দের আংশিক বিকাশমাত্র।

বীরনরনারীর পূজার কথা দূরে থাকুক। তাঁহাদের লোকাতীত প্রেম বজ্রের ন্যায় আপন বলে অভিমান-শৃঙ্গের মস্তক চূর্ণ করিয়া মানবহৃদয়ে ভক্তি ও পূজার প্রস্রবণ খুলিয়া দিবে—সমাজের স্রোত পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যদিকে প্রবাহিত করিবে—নাস্তিক অবিশ্বাসী ও দাম্ভিকের মস্তক তাহাদের ইচ্ছার বিপরীতেও নত করিয়া লইবে। থাকুক এখন সে সকল দেবাগ্রণী ভগবৎপ্রতীম নরনারীর কথা। ইতিহাস সহায়ে কালের নিবিড় যবনিকার অন্তরালে যতদূর দৃষ্টি করি, ততদূর মানব মানবের পূজা করিতেছে দেখিতে পাই। বহু প্রাচীন কালে মনুষ্য সমাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবিভক্ত ছিল। আদিম দলপতি চন্দ্র সূর্য্য বা বিশেষ কোন শক্তিমান্ পদার্থের ঔরসজাত এ বিশ্বাস সকল দলে সকল দেশেই সমভাবে প্রসিদ্ধ ছিল। ভারতের চন্দ্রসূর্য্যবংশোদ্ভব রাজাগণ, ইংলণ্ডের সূর্য্যপুত্র ড্রুইদ-দল এবং মিশর, জাপান, নরওয়ে ও আমেরিকার পৌরাণিক ইতিবৃত্ত এ বিষয় সপ্রমাণ করে। প্রত্যেক দলের ভিন্ন ভিন্ন উপাস্য দেবতা ছিল। যখন একদল অপর দলকে পরাভূত করিত, তখন বিজীত দলের নাম লোপ হইয়া বিজেতাদের দল পুষ্ট হইত। এইরূপে একদল অন্য অনেক দলের উপর আধিপত্য বিস্তার করতঃ, ক্রমে এক এক জাতির সৃজন। তখন বিজেতাদলের উপাস্য দেবতাও দেব-দেবী উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সকলের পূজনীয় হইতেন। বাইবেল পাঠে এইরূপে য়্যাভে দেবতার দেব-দেবত্ব-প্রাপ্তি স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। আর এক কথা, এই সকল ক্ষুদ্র দলের প্রত্যেক ব্যক্তির বিশ্বাস ছিল যে, সে তাহার দলপতির বংশজাত। সকলে এক পিতা মাতা হইতে উৎপন্ন ও এক পরিবার কেবল কালে বহুশাখা বিভক্ত হইয়াছে মাত্র এই বিশ্বাসই আবার উক্ত দলের ভিতর গাঢ় একতাবন্ধন সহানুভূতি এবং দলপতির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি জন্মাইবার হেতু হইত। ঐ শ্রদ্ধা ভক্তিই আবার দেহান্তে ঐ সকল দলপতির পূজার নিমিত্ত মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইত। এইরূপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পিতৃলোকের উপাসনা সকল দেশে প্রচলিত। জাপানের সিণ্টো-ধর্ম্ম এইরূপেই উপস্থিত হয়। রাজা প্রজা সকলেই একবংশোদ্ভূত—রাজা কেবল তাহাদের দলপতি এবং আদিপিতার নিকট বংশধর, এই বিশ্বাসই জাপাননিবাসীদিগকে প্রত্যেক রাজার সমাধির উপর বিশাল মন্দির এবং ভোগরাগাদির বন্দোবস্তে প্ররোচনা জন্মায়। মিশরের বিস্ময়জনক পিরামিদ্ মন্দির এবং আমাদের পিতৃ পক্ষে তর্পণ শ্রাদ্ধাদি এবং সমাধিস্থলে শিবস্থাপনা প্রভৃতি এই পিতৃউপাসনার পরিচায়ক। বিশেষ শক্তিসম্পন্ন দলপতি, জীবৎকালে যাহার দয়া দাক্ষিণ্য বলবীর্য্য প্রভৃতি গুণনিচয় হৃদয় মনকে আকর্ষিত করিয়া পূজা করাইত, দেহান্তে তিনি যে আদৌ থাকিলেন না, নিজদলের

মঙ্গলামঙ্গলের সহায়তা করিতেছেন না, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভালবাসা একথা মানবমনে কখনই স্থান দানে সমর্থ নয়। জগতের ধর্ম্মেতিহাস পর্য্যালোচনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, জগতে কোনরূপ উপাসনা প্রচলনের পূর্ব্বে এই পিতৃউপাসনা বিশেষরূপে প্রচলিত। কোনরূপ দেব-দেবীর উপাসনা শিখিবার পূর্ব্বেই, হৃদগত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা মানবকে তাহার পূর্ব্বপুরুষদের উপাসনা করিতে শিখাইয়াছে। অতএব পরলোকবিশ্বাস স্রোত যে এই পিতৃউপাসনা দ্বার দিয়া ভালবাসা হইতে সমুত্থিত, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

পিতৃউপাসনার উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া আমরা তৃতীয় শ্রেণীর পণ্ডিত-গণের মতানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। পিতৃউপাসনার মূল যে কেবল এই আলোকাঁধারের সম্মিলন-ভূমি কল্পনারাজ্যে, একথা জগতের ধর্ম্মেতিহাস সপ্রমাণ করে না। মিশরের ইতিবৃত্তপাঠে অবগত হই, পিতৃপুরুষদের 'কা' নামক সূক্ষ্মশরীর জীবিতসম্মুখে আবির্ভূত হইতেছে, ভোগরাগ দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছে, সম্মান উপাসনা না করিলে 'ধ্বংস করিব' বলিয়া ভয় দেখাইতেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদোক্ত সপ্তম ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়, উদ্দালকারুণি রাজা জনকের সভায় ব্রহ্মবিদ্ যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিতেছেন, মদ্রনিবাসী পতঞ্চলপুত্র কাপ্যের বনিতাতে গন্ধর্ব্বের আবেশ হইয়াছিল এবং তত্রস্থ যাজ্ঞিকদিগকে গভীর আধ্যাত্মিক প্রশ্ন সকলের জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিয়া দিয়াছিল। অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থেও এইরূপ প্রেতাত্মার আবির্ভাব পাঠ করা যায়। অপবিত্র মনের নিকট যেমন দুষ্কৃতকারী অশুচি প্রেতাত্মা সম্মুখীন হয়, সেইরূপ পবিত্র মানবের সম্মুখে শুচি শুভকারী প্রেতাত্মার আবির্ভাবের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানপ্রধান ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি দেশ সমূহেও এ বিষয়ের অনেক অনুসন্ধান হইতেছে এবং অনেকে প্রেতাত্মার সন্দর্শনে পরলোকাস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ হইতেছে। দেশীয় ও বিদেশীয় কয়েকজন ধীর বিদ্বান্, ধার্ম্মিক ও সত্যপ্রিয় বন্ধুও লেখককে বিশ্বস্তসূত্রে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা প্রেতাত্মার সন্দর্শন লাভে সমর্থ হইয়াছেন। প্রেতাত্মার যথার্থ সন্দর্শনেই হউক, অথবা ভক্তি ভালবাসা প্রণোদিত ছায়াময়ী কল্পনা সহায়েই হউক, মানবমনে পরলোকবিশ্বাস-বীজ প্রথম উৎপন্ন হয়, ইহাই দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্ডিতগণের মত।

শেষ শ্রেণীর পণ্ডিতেরা বলেন, পুরাণেতিহাস অবলম্বনে মানবসৃষ্টির সর্ব্বাদিস্তর স্পর্শ করা কখনই সম্ভবপর নয়। যদি শিক্ষা ও কর্ম্ম সহায়ে মানবের উন্নতি ও ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিনিচয়ের ধীর বিকাশ যুক্তিসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে শত শত বর্ষ যে সে পিতৃউপাসনা বা জড় ও জড়শক্তিতে ইচ্ছাময় চৈতন্যারোপপূর্ব্বক তত্তৎ পদার্থের উপাসনা না করিয়া দিন যাপন করিয়াছে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। পরলোকবিশ্বাস-বীজ কি তৎসময়ে তাহার মনে বিন্দুমাত্রও ছিল না বা উক্ত বিশ্বাস থাকিবার কোনরূপ কারণ কি আমরা এখান হইতে দৃষ্টিগোচরে আনিতে পারি না? এমন কোন বৃত্তি কি মানবমনে বিদ্যমান্ দেখি না, যাহা তখনও যেমন, এখনও সেইভাবে বর্ত্তমান এবং তাহা হইতে কি এ বিশ্বাস-বীজ বিকশিত হইবার সম্ভাবনা দেখিতে পাই না? দূরগামী কল্পনাবাহনে তৎকালীন মানবমনে নিদ্রা, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার নূতনত্ব অলৌকিকত্ব এবং গুরুত্বের বিষয় ভাবিয়া দেখিবার পূর্ব্বে প্রলয়ান্তে প্রথম সৃষ্টিবিকাশ একবার শাস্ত্র সহায়ে আলোচনা করা যাউক।

(শ্রাবণ, ১৩১২, পৃঃ ৪১১)

প্রলয়নিশা অবসানপ্রায়। জলধির অবাতক্ষুব্ধ স্তিমিত সলিলরাশির ন্যায় বিচিত্রনামরূপধারী মায়া বা সৃজনী শক্তি এক্ষণে অপ্রতর্ক অবিজ্ঞেয় প্রসুপ্তন্যায় অবস্থিত, দেশকালাবলম্বনে নিয়ত ঘূর্ণায়মান অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড সমূহের গতিজনিত গগনব্যাপী স্নিগ্ধ গম্ভীর ঘোষ এখন স্থির, শান্ত, ও নিস্তব্ধ। রূপরসাদির মোহন স্পর্শ নীরব ও কারণলীন। দেশ, কালের প্রচার নাই। ভূত ভবিষ্যৎ অনন্ত বর্ত্তমানে শয়িত। অনন্ত মন অনন্ত সমাধিমগ্ন। লীলাময়ের লীলাবিলাসে, সহসা চেতনের কোমলস্পর্শে প্রকৃতিশক্তি কম্পিত ও জাগরিত হইল। স্পন্দনবাত এক হইতে দুই, দুই হইতে বহুভাব, ধারণ করিল। দেশ, কাল এবং কার্য্যকারণ-ধারা প্রবাহিত হইল। ক্রমে কম্পন হইতে তেজ, তেজ হইতে অপ্ বা পদার্থের তরলীভূত অবস্থা এবং তাহা হইতে ক্ষিতি বা পদার্থের দৃঢ়কঠিনাবস্থার ক্রমবিকাশ উপস্থিত হইল। যুগের পর যুগ ছুটিল—অনন্ত গগন নিত্য নূতন নূতন গ্রহ নক্ষত্র সূর্য্য খচিত হইতে লাগিল। তাহার কতকাল পরে, আবার শস্যশ্যামলা বসুন্ধরা নীহারাবগুণ্ঠনে সুন্দর সাজে প্রথম মানবকে কোলে লইয়া উপবিষ্ট হইলেন। বায়ু, তেজ প্রভৃতি জাগতিক শক্তিনিচয় কখন কোমল, কখন বা কঠোর স্পর্শে, শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ, ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাব এবং অভাব বোধ করাইয়া মানব শিশুর শিক্ষা এবং বৃত্তি-বিকাশ-কার্য্য গ্রহণ করিল। অভাব বোধে উদ্যমের আবির্ভাব হইল। আবার উদ্যমের অবসানে দিনান্তে সুখময়ী নিদ্রা আসিয়া বাহ্য জগতের নামরূপাবরণকারী নিশার ন্যায় নবীন মানবের অন্তর্জগতের বৃত্তি সমুদায় মোহময় আবরণে আবরিত করিল। তখন কোথায় বা মনঃ-প্রচার, কোথায় বা ইন্দ্রিয়-প্রচার—স্মৃতি বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত স্তব্ধ নিস্পন্দ রহিল এবং ভিতরে চেতন পুরুষ, যিনি শরীর ও ইন্দ্রিয় সহায়ে এতক্ষণ বাহিরের রূপরসাদি অনুভব করিতেছিলেন, যেন কোন এক নূতন রাজ্যে উপনীত হইলেন। সে রাজ্যের অধীশ্বরী ছায়াকায়া স্বপ্ন দেবী। কুহকিনী বাসনা এবং কল্পনা তাঁহার চিরসঙ্গিনী। দেশ, কাল, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ প্রভৃতি নিয়ম সকল তাহাদের মোহন রবে ও মধুর স্পর্শে ঘূর্ণিত, আকুঞ্চিত, প্রসারিত এবং কখন বা এককালে লুপ্ত হইয়া যায়। তাহাদের ইঙ্গিতে বায়সকণ্ঠে শুদ্ধ তান লয় সমুদিত হইয়া প্রাণ মোহিত করে, কুরূপ সুরূপ, অলব্ধ লব্ধ এবং অসম্ভবও কোথা হইতে সম্ভবপর অনুভূত হয়, আবার কখন বা সামান্য পিপীলিকা দংশনও ব্যাঘ্রাদি-আক্রমণের ন্যায় ভীষণ প্রতীয়মান হইয়া আতঙ্কে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। নিদ্রাভঙ্গে এ সকল ছায়ার শাসন কোথায় লুকায়, তাহার কোন নিদর্শনই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সকলই অলীক ইন্দ্রজালতুল্য প্রতীয়মান হয়। এইরূপে নিদ্রার পর জাগরণ এবং জাগরণের পর নিদ্রার অধিকার প্রত্যহ আসিয়া উপস্থিত হয়। জাগরণ সময়ে স্বপ্নস্মৃতি আসিয়া আবার নবীন মানবকে চিন্তান্বিত করে। সে ভাবিতে থাকে—রাত্রিকালে যে সকল সুন্দর দেশে ভ্রমণ করিলাম, সুন্দর নরনারীর সহিত আলাপ করিলাম, সুন্দর বা ভীষণ দৃশ্য সমূহ দর্শন করিলাম, সে সব কোথায়, কোন রাজ্যে। স্বভাবতঃ সত্যপ্রিয় ও বিশ্বাসপ্রবণ তাহার হৃদয়ে একথা তখন উদিত হয় না যে, সে সকল অলীক কল্পনাপ্রসূত। সে ভাবে জাগরণ কালের দৃশ্যানুভূত পদার্থ সমূহের ন্যায় সে সকলও সত্য—কোন না কোন স্থানে আছে, যথায় সে কোন প্রকারে উপনীত হইয়াছিল। ইহলোকে সে সকল দেখিতে না পাওয়ায় তাহার মনে সহজেই উদয় হয় যে, তবে দৃশ্যমান এই লোক ভিন্ন অপর একটা আছে, যথায় সে সময়ে সময়ে

গমন করিয়া থাকে। এইরূপে স্বপ্নানুভূত বিষয় সমূহ হইতেই পরলোকে বিশ্বাস তাহার মনে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত ও কালে দৃঢ়প্রোথিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত তিন মতের মধ্যে বিচার করিতে হইলে স্বপ্নদৃশ্যজগৎ হইতে মানবমনে পরলোক-বিশ্বাসের ধীরবিস্তার যুক্ততর এবং সম্ভবপর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ইহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। তবে এই প্রকারে বিশ্বাস-বীজ অঙ্কুরিত হইলেও প্রথম ও দ্বিতীয় মতোক্ত প্রকারে যে ইহা কালে বর্দ্ধিত ও পুষ্টকায় হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। [ক্রমশঃ]

আদর্শ ও বাস্তব।

স্বামী শুদ্ধানন্দ লিখিত।

মানুষের আশা অনেক, মানুষ চায় অনেক। মানুষ ধরাকে স্বর্গ করিতে চায়, আপনাকে দেবতা, এমন কি, ঈশ্বর করিতে। চায় পদে পদে সে তাহার বিপরীত দেখিলেও, পদে পদে সে ভগ্নাশ হইলেও, তাহার আশার নিবৃত্তি হয় না। কথায় বলে, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ, কিন্তু এ আশা বুঝি শ্বাস বিগত হইলেও যায় না ; দেহ ভস্মধূলিতে পরিণত হইবার পরও বুঝি সেই ধূলি-রাশি হইতে উত্থিত হইয়া আত্মা কি একটা অনন্ত আকাঙ্ক্ষায় আবার নবোদ্যমে নব কলেবর পরিগ্রহ করে। মানুষ তুঙ্গগিরিশৃঙ্গযাত্রী পথিক পর্ব্বতের এক শৃঙ্গে উঠিলে দেখিতে পায়, সম্মুখে আর এক শৃঙ্গ। এইরূপে শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ—অতি দূরে সেই সুধাধবল হিমানীমণ্ডিত অভ্রভেদী সর্বোচ্চ চূড়া—যেন ইন্দ্রজালের ন্যায় অথবা স্বপ্নের ন্যায়—যেন স্বর্গের সহিত—কি এক গভীর রহস্যময় রাজ্যের সহিত—মিশিয়া রহিয়াছে। পথিক তাহাই দেখে—তাহার মনোহারিত্বে কখন আনন্দে নাচিয়া উঠে, আত্মহারা হয়, আবার কখন বা তাহার অনধিগম্যত্ব কল্পনা করিয়া দুঃখে ম্রিয়মান হয়। অথবা সে যেন উত্তর-পশ্চিম পথের (North-West Passage) আবিষ্কারক-পদাকাঙ্ক্ষী। কত সুবৃহৎ অর্ণবপোত, কত নরনারী এই দুরাকাঙ্ক্ষাবশে তুষারপ্রদেশে তুষার-সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছে, কে বলিতে পারে ? তবু অপরে সেই সুনিশ্চিতমৃত্যু প্রদেশে যাইতে উদ্যত। ইহাই মানবজীবনের গভীর প্রহেলিকা। ইহা কি আলেয়ার অনুসরণ অথবা বিকট উন্মত্ততা ? মানবজীবন কি বিয়োগান্ত নাটক—না মিলনান্ত ? অথবা গভীর মহাশূন্যে মহানির্ব্বাণই জীবনের সুনিশ্চিত ও পরমপ্রার্থনীয় পরিণতি ?

মানুষ, আশাসম্বল মানুষ, এ গভীর প্রশ্নের উত্তর দাও। ইহার উত্তরেই তোমার জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে।

মানুষের দুইটী চক্ষু ছাড়া আর একটী চক্ষু আছে। সেই চক্ষু সকলেরই আছে, তবে অল্পাধিক প্রস্ফুটিত। সেই চক্ষে মানুষ বর্ত্তমানের ঘন কুহেলিকা ভেদ করিয়া ভবিষ্যতের গভীর-গর্ভস্থ রত্নরাজি অবলোকন করে ও তৎপ্রতি তৃষান্বিত হয়। আর এই দুইটী চক্ষু ? এই দুইটী দেখে—বর্ত্তমান, দেখে—কেবল সম্মুখদেশের ক্ষুদ্র অংশ, আর তাহাকেই বাস্তব বলিয়া অতি যত্নে পোষণ করে। কিন্তু কে বলিতে পারে—আজ যাহা ভবিষ্যৎ, কাল তাহা বর্ত্তমান হইবে না ? কে বলিতে পারে—আজ যাহা প্রার্থনীয় রহিয়াছে, কাল তাহা লব্ধ হইবে না ? কে বলিতে পারে—আজ যাহা 'দূরাৎ সুদূরে' কাল তাহা 'তদিহান্তিকে চ' হইবে না ?

(শ্রাবণ, ১৩১২, পৃঃ ৪১৩)

জগতের ইতিহাস—অল্পসংখ্যক স্বপ্নদ্রষ্টার ইতিহাস। ঈশা, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, চৈতন্য আদি এক একজন স্বপ্নদ্রষ্টা। তাঁহাদের স্বপ্ন—লক্ষ লক্ষ জাগ্রদভিমানিগণের কার্য্যের প্ররোচক। তাঁহারা স্বপ্নে ভবিষ্যতের চিত্র দেখেন, দেখিয়া তাহাই উচ্চরবে ঘোষণা করেন। তাঁহাদের মত যোগনিদ্রার আবেশ যাঁহাদের কিয়ৎ পরিমাণে আসিয়াছে, তাঁহারাই সেই স্বপ্নগুলির কিয়ৎ পরিমাণ মর্ম্ম উদ্ঘাটন করেন—করিয়া জনসাধারণের ভাষায় জনসাধারণকে প্রচার করেন। কিন্তু তাঁহারা অন্ততঃ তাঁহাদের সময়ে উন্মত্ত বিবেচিত, উপেক্ষিত, ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ বা নাস্তিকাপবাদে উপহসিত।

তাই সময়ে সময়ে চিত্তে সংশয় হয়—স্বপ্ন বেশী বাস্তব, অথবা এই বাস্তব বলিয়া প্রতীত বস্তু সমুদয়ই বাস্তব? তোমার যাহা ভাল লাগে তাহাকে তুমি বাস্তব বলিয়া, আর সকলকে আদর্শ, কাল্পনিক বা আকাশকুসুম নামে অভিহিত করিয়া থাক। তোমার যাহা ভাল লাগে, তাহাই প্রাকৃতিক, সম্ভব, সহজাবস্থা, আর সব অপ্রাকৃতিক, অসম্ভব, কৃত্রিমাবস্থা—তুমি এ বিভাগপ্রণালী কোথা হইতে শিখিলে? স্বার্থমলিন মনোমুকুরে সত্যসূর্য্য কখনই প্রতিভাত হইবে না। আমার যাহা লাভের শক্তি নাই, তাহা অসম্ভব নহে। বরং 'অসম্ভব' শব্দটীকে প্রাজ্ঞদিগের অভিধান হইতে উঠাইয়া দিয়া কার্য্য কর, দেখ, জগতে কি যুগান্তর উপস্থিত হয়!

ঐতিহাসিক, প্রকৃত জগতের ইতিহাসের তত্ত্ব বল দেখি, প্রাণিতত্ত্ববিৎ, প্রাণিগণের স্বরূপতত্ত্ব বল দেখি, আর যেখানে যত প্রকৃত বৈজ্ঞানিক আছ, সকলেই স্ব-স্ব বিজ্ঞানের সাক্ষ্য দেও দেখি, কেমন আদর্শের উপর বিশ্বাস, আদর্শকে বাস্তব বলিয়া বিশ্বাস হয় কি না?

সকলের উপর, হে ক্রমোন্নতিবাদিন্, তোমার কি সাক্ষ্য? ক্রমোন্নতির গতি কি এক স্থানে স্থগিত হইয়া যাইবে? না, তা ত কখনই হইতে পারে না। যত উন্নতি, তত গতি, তত বেগে গতি, তত অতৃপ্তি, তত আকাঙ্ক্ষা—পরমাদর্শে পরিণতিতেই শান্তি।

আর হে বিভিন্ন জগদ্বিশ্লেষণকারী পণ্ডিতগণ! যেখানে কোন ঘটনা প্রাণের এই গভীর আকাঙ্ক্ষার—প্রাণের এই সুস্পষ্ট ধ্বনির অনুমোদন না দেয়, সেখানে গর্ব্বিত না হইয়া নিউটনের সহিত সমস্বরে বিনীতভাবে বল, 'আমার অজ্ঞাত ঘটনা এখনও অনেক আছে—জ্ঞাতের সহিত তুলনায় অজ্ঞাতই সব।' সেই সামান্য জ্ঞাত ঘটনার প্রমাণে এই সার্ব্বজনীন হৃদয়োত্থিত ধ্বনির অপলাপ করিও না।

উন্নতি—উন্নতিই জগতের নিয়ম। গতিই জীবন, স্থিতিই মৃত্যু। গতিশীল আক্রমণকারীর ন্যায়, নিজভূমিতে দৃঢ় বলিয়া আক্রমণে সাহসী; আর স্থিতিশীলের নিজভূমি-রক্ষণেই সমস্ত শক্তির বিনিয়োগে দুর্ব্বলতার পরিচয়।

আদর্শ অবস্থালাভ সম্ভব—এই দৃঢ়বিশ্বাসই সকল বিশ্বাসের মূল। এই বিশ্বাস যাহার আছে, তাহার সব আছে; যাহার নাই, তাহার কিছুই নাই। আদর্শ অবস্থা লাভ সম্ভব—অবশ্যই সম্ভব। কোটি কোটি পরাজয়ও আদর্শলাভের অসম্ভবনীয়তার উদাহরণ হইতে পারে না। জগতে মহাপুরুষ, ঈশ্বরাবতারগণ আসিয়া এই আদর্শাবস্থা দেখাইয়া যান—দেখাইয়া যান, "দেখ, দেখ সকলে, আমি এই অবস্থা লাভ করিয়াছি :—

'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।'

আমি পাপ তাপ মৃত্যু দুর্ব্বলতা সকলকেই পরাজয় করিয়াছি। আমি মৃত্যুঞ্জয়, আমি শুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত,—"শিবোঽহং শিবোঽহম্।"

(৮৭তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৃঃ ৪১৪)

ভারতের জাতীয় জীবন।

(স্বামী সচ্চিদানন্দ লিখিত।)

অনন্ত জলধি বক্ষে ছোট বড় কত তরঙ্গ ওঠে, খেলা করে, আবার জলের বিম্ব জলে লয় পায়। জলরাশি-সমষ্টির সহিত ব্যষ্টি জলকণার সম্বন্ধ, কতদূর আদান-প্রদান, গর্ব্বিত মানব তাহা জানিবার চেষ্টা করে না—করিবার শক্তিও নাই। জড় ছাড়িয়া উদ্ভিজ্জগতে আসিলে, অজ্ঞানের আবরণ ক্রমে সরিতে থাকে; এখানেও আলোয় আঁধার মিশ্রিত। প্রাণীজগতে, পশু, বিশেষতঃ মানুষ সমাজে, একের সহিত অন্যের সম্পর্ক, সকলের মধ্যে অন্যান্য নির্ভরতা, প্রত্যেকের এক একটী ভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া আসা, তাহার পরিপুষ্টি ও সফলতা, শেষে অপরের মধ্যে সেই উদ্দেশ্য বিস্তার, নিজের যা কিছু ছিল পরকে দিয়া স্বার্থত্যাগজনিত সুখশান্তির ক্রোড়ে চির বিশ্রাম, সমষ্টির মহান্ উদ্দেশ্যর সহিত ব্যষ্টির সাদর পরিণয়, প্রতিপদে স্বর্ণাক্ষরে বিজ্ঞাপিত হইবে। একটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বালুকাকণা স্থানান্তরিত কর—অসীম জড়বিশ্বের গতিসাম্য অনন্ত কালের জন্য ভাঙ্গিয়া ফেলিলে। ঐ নগণ্য কীট আজ মরিয়া গেল, অতীতের কত দিন হইতে তাহার আয়োজন চলিয়া আসিতেছে। বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া জন্ম, শৈশবে সেই উদ্দেশ্যর সাধনোপযোগী শরীরগঠন, যৌবনে তাহার পরিস্ফুরণ, বার্দ্ধক্যে তাহার বিস্তার, অন্তে কাজ সারিয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ,—এই অবস্থাসমূহের একীকরণের নাম জীবন। বীজ রোপিত হইল; ক্রমে অঙ্কুর, ছোট গাছ, বড় গাছ, ডাল, পাতা; ফুল এখন ফোটে নাই, ফোটাইবে বলিয়া বৃক্ষ স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তদুপযোগী ভাবে গঠিত করিতেছে; এই বৃক্ষের শৈশবাবস্থা। দ্বিতীয় অবস্থা,—বৃক্ষ ফুল ফলে শোভিত, পুষ্পসৌন্দর্য্যে ভাবুকের প্রাণ আলো করিয়া, সৌরভে অরণ্যানী মাতোয়ারা, ফলদানে ক্ষুধিতের বুভুক্ষা তৃপ্ত করিয়া, বৃক্ষজীবনের উদ্দেশ্য সার্থক করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে একবীজ হইতে সহস্র, অযুত ভাবী বৃক্ষের বীজ উপ্ত, একদিকে এক কেন্দ্রে যে উদ্দেশ্য সফলীকৃত, অন্যদিকে শত কেন্দ্রে সে উদ্দেশ্যর ভবিষ্যৎ বিস্তারের দ্বার উন্মুক্ত। অবশেষে নাশ—বৃক্ষজীবনের শেষ যবনিকা। শৈশবে আহার বিহারে স্বভাবচিহ্নিত পথে স্ব স্ব শরীর গঠন, যৌবনে আত্মরক্ষা, পরস্পরের সহিত মিত্রভাবে মিলন ও শত্রুভাবে সবিদ্বেষ সংঘর্ষণ, প্রধানতঃ সন্তানোৎপদন দ্বারা, পাশবিক কেবলমাত্র কায়িক, কুত্রাপি স্বল্পাধিক মানসিক শক্তির বিকাশ ও বিস্তার, পরবর্ত্তী পুত্রপৌত্রাদ্য-পত্যবর্গে সেই শক্তির বীজ পরিচালিত করিয়া বার্দ্ধক্যে অন্তর্দ্ধান, এই সকল দেখিয়া আধুনিক চিন্তাশীল পণ্ডিতমণ্ডলী পশুজীবনে কোন না কোন উদ্দেশ্যর ধারাবাহিক ক্রমোন্নতি নিশ্চিত বলিয়া স্থির করিতেছেন।

মানুষের মহত্ত্ব, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় পশ্চাৎ রাখিয়া অতীন্দ্রিয় চিত্ত ও চিদাকাশে বিচরণ করিবার শক্তিতে। পরা ও অপরা-বিদ্যা ইন্দ্রিয়াতীত জগতের বিষয়। অপরা-বিদ্যা অনেক সময় কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় লইয়া নাড়া চাড়া করে, কিন্তু তাহার চরম উৎকর্ষ মানসিক বৃত্তির উদ্বোধনে। পরা-বিদ্যা 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' সত্যে প্রতিষ্ঠিত। যাঁহার

(শ্রাবণ, ১৩১২, পৃঃ ৪১৫)

জীবনের উদ্দেশ্য শরীরবুদ্ধি ছাড়িয়া মন ও অধ্যাত্মজ্ঞানরাজ্যে যত দূর অগ্রসর, তিনি তত অধিক মানুষ নামার্হ।

বৈষম্যে সৃষ্টি, জীবন; সমতায় নাশ, মৃত্যু—না অমরত্ব। আজ যদি সকল স্থানে শক্তির ওজন সমান হইত, জগতে গতি বলিয়া কিছুই থাকিত না। স্থূল প্রকৃতির পশ্চাৎ বিরাট্ মনোময় সূক্ষ্ম জগৎ অবস্থিত; তোমার, আমার প্রত্যেকের মন সেই বিরাটের এক একটী অংশ; চিন্তা সমুদয় সেই অংশের, হ্রদে তরঙ্গের ন্যায়, অবস্থাভেদ। নির্ব্বাত শান্ত জলে কি ঢেউ ওঠে? সকলেরই চিন্তা যদি এক ও একভাবাপন্ন হয়, আর চিন্তা বলিয়া কিছুই রহিবে না; চেতন মূর্ত্তি জড় পুত্তলিকায় পরিণত হইবে। ব্যক্তিগত রুচি-পার্থক্য এই বৈষম্য-নীতির ফল। সংসারবাদী আমরা; বহু জন্মান্তরে বার বার যে উদ্দেশ্যপথে জীবন চালিত হইয়াছে, এ জীবনও স্বতঃ, আমার প্রতিকূল চেষ্টা সত্ত্বেও, সেই দিকে ছুটিবে। ছেলেবেলা থেকে কেউ গান ভালবাসে, সহজে স্বরতালের সামঞ্জস্য বোঝে; অন্য একজনের কাছে গন্ধর্ব্বকণ্ঠানুকারী মোহিনী গীতলহরী বৃশ্চিক-দংশন, সারা জীবনটা গলা সাধিয়াও "সা"র মাত্র ঠিক হলো না। দিনে একঘণ্টা পড়িয়া সুবোধ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান পাইল; শত চেষ্টা, কত সুবিধা, কত প্রীতি,—তাহার প্রতিদান, "গুরু মহাশয় মরিলে গুরুমহাশয় হবে, বাবা না মলে নিস্তার নাই"। গাছতলায় থাকা, সন্ন্যাস আমার সক্, হাজার অর্থের প্রলোভনে তাহা ছুটিবে না। বেশী টানিলে ছিঁড়িয়া যাইবে। আমার মত, তোমার হইতে ভিন্ন; তোমার যা ভাল লাগে, জোর করিয়া আমায় দিতে এলে, সদিচ্ছার পরিবর্ত্তে অপমাননা, অমৃতের স্থলে বিষ উঠিবে। মানুষকে উন্নত করিতে হইলে, তাহার রুচি-বৈষম্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, "তুমি যা ক'চ্ছ সব ভুল, আর আমি যা ব'লছি সব ঠিক", ইত্যাদি স্পর্দ্ধা বাক্যের আশ্রয় না করিয়া, সে যে পথে এত দিন চলিয়া আসিতেছে সেই পথই বজায় রাখিয়া, আস্তে আস্তে উন্নতির সোপান দেখাইতে হইবে। মহাপুরুষেরা বলেন, সকল বৈষম্যের শেষ সীমা এক। ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি যিনি, তিনিই সদাচার্য্য।

জীবনোদ্দেশ্যের ব্যক্তিগত বৈষম্যের ন্যায় জাতিগত বৈষম্য আছে। পাশ্চাত্য জাতির জীবনোদ্দেশ্য অপরা-বিদ্যা, ভারতবাসীর জাতীয়-জীবন পরা-বিদ্যার সত্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত। ভারতবর্ষে যত ধর্ম্মালোচনা, যত ধর্ম্মসম্প্রদায়, যত দিগ্বিজয়ী ধর্ম্মাচার্য্যের অভ্যুত্থান, এরূপ কুত্রাপি নাই। ইয়োরোপ, আমেরিকা সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলনে উদ্বেলিত। ভারতবাসী ধর্ম্মকথায় উৎসাহিত। এখানে সামাজিক উন্নতি, বা আর যা কিছু বল, ধর্ম্মের মধ্য দিয়া। ইংলণ্ডের নিম্নতম কৃষক পর্য্যন্ত রাজনীতি-আকাশের ক্ষুদ্রতম মেঘখণ্ডের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করে; জিজ্ঞাসা কর, কোন্ দলের হাতে শাসন ভার, সে নিজে কোন্ দলের পক্ষে, তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিবে। আমাদিগের দেশের সাধারণ লোকের এ সমস্ত বিষয়ে নিষ্ঠা নাই, কোনই খবর রাখে না। কিন্তু সে দিন চিকাগো শহরে এক মহতী ধর্ম্মসভা হইয়া গিয়াছে, সে সভায় তাহাদের দেশের এক নিঃসম্বল সন্ন্যাসী আপনার অপ্রতিম প্রতিভাবলে শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রান্ত হইয়া, বিধর্ম্মী যবনের মধ্যে তাহাদের সনাতন ধর্ম্মের জয়পতাকা প্রোথিত করিয়াছেন, এ খবর কুটীরবাসীর মুখ হইতে প্রাসাদান্তপুরাবরুদ্ধ মহিলাগণের, সকলের মুখে। জাতীয়-জীবন-যন্ত্র কোন্ সুরে বাঁধা, ইহা হইতে অনুমেয়।

(৮৭তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৃঃ ৪১৬)

৮৭তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ভাদ্র, ১৩৯২

দিব্য বাণী

যদা ধর্মগ্লানির্ভবতি জগতাং ক্ষোভণকর-
স্তদা লোকস্বামী প্রকটিতবপুঃ সেতুধৃগজঃ।
সতাং ধাতা স্বচ্ছো নিগমগুণগীতো ব্রজপতিঃ,
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ॥

—শ্রীশঙ্করাচার্য

—ধর্মগ্লানি যখনই জগৎকে বিত্রস্ত করেছে, স্বয়ং জন্মরহিত হয়েও তখনই যিনি লোকনায়করূপে আবির্ভূত হয়ে ধর্মমর্যাদা রক্ষা করেছেন,—যিনি সংসারে সকল মঙ্গলের ধাতা, যিনি পবিত্র নির্মল, নিগমাদি শাস্ত্র যাঁর গুণগীতে মুখর, সর্বাশ্রয় সেই লোকনাথ ব্রজপতি কৃষ্ণ আমার নয়নপথে আসুন।
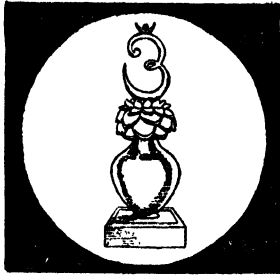
কথাপ্রসঙ্গে

'মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে'

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন: 'গীতা সব শাস্ত্রের সার।' বিশ্বের অধ্যাত্ম-সাহিত্যে গীতার তুলনা নাই। গীতার সশ্রদ্ধ অনুশীলনে সংসারের যাবতীয় সমস্যার পথ খুঁজিয়া পাওয়া যায়—সংসারকে বন্ধন মনে না হইয়া, আত্মজ্ঞান লাভের জন্য মহাসুযোগ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। সংসার-কুরুক্ষেত্র তখন নিছক যুদ্ধ-ভূমিই নহে,—শ্রীভগবানের কণ্ঠোদ্গীত সঙ্গীতে মুখর মহোৎসব-ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়। গীতা ভবদ্বেষিণী। গীতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী-শরীর,—গীতার মন্ত্র-ধ্বনিতে তাঁহারই হৃৎস্পন্দন। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—'উপনিষদ্ হইতে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কুসুমরাজি চয়ন করিয়া গীতারূপ এই সুদৃশ্য মাল্য গ্রথিত হইয়াছে।'

গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ব্যাপী যত উপদেশ ছড়াইয়া রহিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের সেই সকল বাণীর মর্মকথা কিন্তু একটিই: জীব-জগৎ-ঈশ্বর একই নিত্যবস্তুর নানা অভিব্যক্তি। সেই অবিতথ সত্যের প্রচলিত নাম ভগবান। তাঁহাকে জানিলেই শান্তি,—যতক্ষণ না-জানা ততক্ষণই অশান্তি দ্বন্দ্ব ক্ষোভ শোক। শ্রীভগবান গীতামুখে এই জানিবার নানাবিধ উপায়কেও নির্দেশ করিয়াছেন—গীতোক্ত আঠারটি যোগের রহস্য ইহাই। লক্ষণীয় যে, সকল যোগের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত কিন্তু সাধন,—জ্ঞান-ভক্তি-ধ্যান ও কর্ম-সমন্বিত ভজন।

ভগবানকে জানা এবং তাঁহাকে জানিবার জন্য সাধনের কথা নীতি হিসাবে মানিয়া লইলেও ভগবদ্‌বিশ্বাসী মানুষ পারে না উহাকে জীবনে রূপায়িত করিতে। জন্ম জন্ম অর্জিত সংস্কারের তাড়নায় মন সুখ খুঁজিয়া বেড়ায় বহির্জগতের রূপ-রস-স্পর্শ ও শব্দ-গন্ধাদির মধ্যে,—অন্তর্জগতের সংবাদ কর্ণে পশিলেও মর্মে প্রেরণা দেয় না! রাগ-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব এবং আসক্তি-মোহাদির দ্বারা সদা ক্ষুভিত চিত্ত তাই স্বভাবতঃ ভজনবিমুখ হইয়া সংসারের অন্ধগলিতেই ঘুরিয়া মরে,—গীতাদি শাস্ত্রে বহুধা ব্যক্ত সরল প্রশস্ত রাজপথে উঠিতেই চাহে না—বা উঠিলেও চলিতে পারে না। সংসারে সতত বিমুগ্ধ মানব—শান্তি, কল্যাণ ও আনন্দের জন্য লালায়িত,—কিন্তু আকৃষ্ট নহে। ইহাই আশ্চর্য মায়া। অথচ, সংসারের যে-কোনও বস্তুতে কোনপ্রকার ঐশ্বর্য, শ্রী, বীর্য, তেজ, শক্তি, সৌন্দর্য বা মাধুর্যের সামন্যতম প্রকাশ দেখিলেও সেদিকে তাহার চিত্ত ধাবিত হয়—দুর্বার টান অনুভব করিয়া থাকে সে। মানব-চিত্তের এই প্রবণতা স্বতঃস্বাভাবিক—এককথায় সর্বমানবিক। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা অনেকেই জানিয়াও জানি না—ঐ শ্রী, তেজ, শোভা—ঐ চিত্তাকর্ষণী শক্তি শ্রীভগবানেরই অঙ্গ—তাঁহা হইতেই যাবতীয় মাধুর্য মঙ্গল ও আনন্দ উৎসারিত। সংসারে যে যে বস্তুতে ভগবানের বিশেষ বিশেষ প্রকাশ থাকে—কার্যতঃ সেই সেই

বস্তুর প্রতিই আমরা মনের টান—চিত্তের আকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকি। এই বিশেষ প্রকাশের নাম ভগবানের বিভূতি।

শ্রীভগবানের বিভূতি আমাদের সমক্ষে কত ভাবেই না রহিয়াছে,—কিন্তু আমাদের অন্ধ নেত্র সেই সকল শিল্প-সৌন্দর্য, তেজোমাধুর্যকে উপভোগ করিলেও, ভগবানকে কোথাও দেখিতে পায় না। বিভূতির মাধ্যমে ভগবানকে অনুসন্ধানের চেষ্টা থাকিলে অবশ্যই তাঁহাকে ধরা যায়,—তিনি দৃষ্টিপথে আসিবেনই। এইরূপ চেষ্টাও এক বিশিষ্ট সাধনপন্থা—অধ্যাত্মরাজ্যের একটি সুপ্রশস্ত রাজপথ। গীতামুখে শ্রীভগবান ইহাকেই নির্দেশ করিয়াছেন বিভূতি-উপাসনা-যোগ বলিয়া। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সর্বাপেক্ষা সার্বজনিক ও কাব্যিক উহার দশম অধ্যায়—যেখানে কেবল এই বিভূতি যোগেরই ব্যঞ্জনা। বিভূতির মধ্যে শ্রীভগবানের প্রকাশকে পরোক্ষে অনুভব করিতে করিতে, ক্রমে সেই সর্বব্যাপী অনন্ত বিভূতিময়কেই সর্বত্র প্রত্যক্ষ করা সম্ভবপর হয়।

শ্রীভগবানের মহিমাতে,—তাঁহার মাধুর্য-সৌন্দর্যাদি গুণরাশিতে আকৃষ্ট হইতে না পারিলে, জীবনে ভক্তির প্রবাহ স্থায়ী হইতে পারে না। ভক্তিধারাকে ছেদশূন্য ও নিরন্তর রাখিবার জন্য সর্বত্র সকল কিছুতে ভগবানের বিভূতিকে হৃদয়ঙ্গম করিতে প্রয়াসী হওয়া একটি উৎকৃষ্ট সাধন,—সর্বোত্তমও বলা যাইতে পারে। মানুষের সদা চঞ্চল মনকে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে উত্তরণের পক্ষে ইহাই সর্বাপেক্ষা অনায়াস-সাধ্য ও সুনিশ্চিত উপায়।

এই বিশ্ব-সংসার শ্রীভগবান হইতে উৎসারিত,—তিনিই সৃষ্টির উৎস। শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব মায়া-মনুষ্য,—দেহধারী পুরুষোত্তম স্বয়ং। তত্ত্বান্বেষী অর্জুনকে তাই তিনি সোচ্চারে জানাইয়া দিয়াছিলেন: 'অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।' সমগ্র জগদ্-ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার বিভূতি। —কোথায়, কোন্ অংশে, কী-বস্তুতেই-বা ভগবদ্-বিভূতি নাই? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ে তো বটেই,—সকল অধ্যায়ের মধ্যেই এই ভগবদ্-বিভূতির আভাস পাওয়া যায়—কোথাও অতি সংক্ষেপে, কখনও ইঙ্গিতে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইহাও এক অনন্য বিশেষত্ব: সর্বত্র ঈশ্বর-দৃষ্টি বা ব্যবহারিক বেদান্ত-রূপ অপূর্ব সাধন-কৌশল কুরুক্ষেত্রের সমরভূমিতে অর্জুনকে উপলক্ষ করিয়া জগৎকে শিক্ষাদান। গুড়াকেশ অর্জুনকে সম্মুখে রাখিয়া সেদিন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিত্যকালের সর্বমানবের জন্যই তাঁহার চিরন্তন উপদেশ। আচার্য শ্রীধর স্বামী যথার্থই বলিয়াছেন:

'উক্তাঃ সংক্ষেপতঃ পূর্বং সপ্তমাদৌ বিভূতয়ঃ।
দশমে তা বিতন্যন্তে সর্বত্রেশ্বর-দৃষ্টয়ে ॥

... ...

ইন্দ্রিয়দ্বারতশ্চিত্তে বহির্ধাবতি সত্যপি।
ঈশদৃষ্টিবিধানায় বিভূতিঃ দশমে অব্রবীৎ ॥'

অর্থাৎ, পূর্বে গীতার সপ্তমাদি অধ্যায়ে সংক্ষেপে ভগবদ্-বিভূতি বর্ণনা করা হইয়াছে। এই দশম অধ্যায়ে সেই বিভূতিসমূহই, সর্বত্র ঈশ্বর-দৃষ্টি বিধানের উদ্দেশ্য লইয়া আরও বিস্তারিত বলা হইতেছে।···ইন্দ্রিয়দ্বার-পথে চিত্ত বাহ্য বিষয়ে ধাবিত হইলেও যাহাতে ঈশ্বরের দিকেই উদ্দিষ্ট হয়, তাহারই জন্য শ্রীভগবান এখানে বিভূতি-উপাসনার অবতারণা করিয়াছেন।

বিশ্ব-চরাচরের সব কিছুতেই শ্রীভগবানের মহিমা ব্যক্ত—তাঁহারই বিভূতি সর্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে। ভগবানের বিভূতির ধ্যান কিংবা সর্বতোব্যাপ্ত তাঁহার বিশ্বমূর্তির উপাসনা ভক্তির ফল্গুধারাকে অব্যাহত রাখিবার একটি চমৎকার

উপায়—সকল পরিস্থিতিতেই মনকে ভগবদ্‌মুখী রাখিতে এক অতুলনীয় সহজ সাধনা। এইরূপ নিরন্তর প্রবহমান—অবাধিত অপরিচ্ছিন্ন ভক্তি দ্বারাই প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে,—অথবা বলিতে পারা যায়, উক্ত অখণ্ড ভক্তিপ্রবাহই ক্রমে জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। শ্রীভগবান এই কারণেই জ্ঞান তথা সর্বাত্মিকা ভক্তিলাভের সহজ উপায় হিসাবে তাঁহার বিভূতি-উপাসনার নির্দেশ দিয়াছেন। প্রারম্ভে এ-কথাও স্পষ্ট বলিয়া রাখিয়াছেন—সততযুক্ত হইয়া প্রীতিসহ যাহারাই আমার ভজনা করে, আমি তাহাদিগকেই বুদ্ধি-যোগ প্রদান করিয়া থাকি—যাহার সাহায্যে উহারা কালে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। ভক্ত সাধক-সাধিকাকে কৃপা করিবার জন্যই আমি উহাদের বুদ্ধিতে উদিত থাকি এবং জ্ঞান-দীপ জ্বালিয়া দিয়া তাহাদের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া দেই।

'তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাম্ উপযান্তি তে॥
তেষাম্ এব অনুকম্পার্থম্ অহম্ অজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়ামি আত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥'

এই ভগবদুক্তি হইতে বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে, ভক্তিপথে ও জ্ঞানপথে কোথাও বিরোধ নাই—বরং পরস্পর পরিপূরক। এবং বিভূতি-উপাসনা-যোগে জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় একান্ত অপরিহার্য,—ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের চরম উৎকর্ষও এখানে স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। আর ইহাও সত্য যে, অনন্তরূপী ভগবানকে ভালবাসিলে, তাঁহার বিভূতিতে তন্ময়তা আসিলে—চিত্তের যে একাগ্রতা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, তাহাকেই শাস্ত্রীয় ভাষায় বলা হয় ধ্যান। উল্লেখ বাহুল্য যে, সর্বতোবিকীর্ণ ভগবদ্-বিভূতিকে উপলব্ধি করিতে যথেষ্ট যত্ন, চেষ্টা ও উদ্যমের অপেক্ষা অবশ্যই রহিয়াছে—এবং যাহার প্রেরণা সর্বতোভাবে ভগবৎ-প্রীতি। কামনা-বিহীন এই ভগবদ্-ভক্তিমূলক ক্রিয়া-প্রচেষ্টাকেই কর্মযোগ আখ্যা দেওয়া হয়। সুতরাং, বিভূতি-উপাসনা-যোগের মহিমান্বিত অনন্যতায় মুগ্ধ না হইয়া পারা যায় না। শ্রীভগবান যেন এই একটিমাত্র যোগের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে জ্ঞান-ভক্তি-ধ্যান-কর্মকে সম্পুটিত করিয়া দিয়া—অতি সুকৌশলে যোগ-চতুষ্টয়ের সমন্বয় সাধন করিয়া দিয়াছেন! গীতায় শ্রীভগবানের সমস্ত উপদেশের মধ্যেই এই যোগ-সমন্বয়ের ঐকতান—কিন্তু বিভূতি-উপাসনা-যোগে উহা আরও সুগম্ভীর, সোচ্চার ও প্রাঞ্জল।

সর্বাত্মক ভগবদ্-দৃষ্টি, বা সকল কিছুতেই ঈশ্বরাবলোকন—গীতার ভাষায় যাহাকে বলা চলে বিভূতি-যোগসিদ্ধি, তাহা জীবনে কীভাবে রূপায়িত হয়, অথবা উহার বাস্তব প্রকাশ কেমন হইতে পারে,—এমন প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে। বিশেষ দুইজন দ্রষ্টা পুরুষের নিভৃত পত্রালাপ হইতে ঐ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব। শ্রীশ্রীহরি মহারাজ—স্বামী তুরীয়ানন্দ তদীয় অন্তরঙ্গ সখা স্বামী প্রেমানন্দকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন:

'তোমার সঙ্গের সকল অতীত স্মৃতিই আমার বিশেষ আরামদায়িনী। কেনই বা এরূপ না হইবে? তোমাতে প্রভু ভিন্ন অন্য কিছুরই তো স্থান নাই। মনে পড়ে মঠের একদিনের কথা। সে সময় মঠ আলমবাজারে ছিল। তুমি কথাচ্ছলে সেদিন দৃষ্ট সকল পদার্থ হইতেই প্রভুর স্মৃতি জাগরিত করিতে লাগিলে। সেদিন দেখিয়াছিলাম তোমার "যথা যথা দৃষ্টি পড়ে, তথা তথা কৃষ্ণ স্ফুরে" বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল! এমন বস্তুটি দেখিলে না, যাহা হইতে প্রভুকে স্মরণ না করিলে। তোমার মনে আছে কিনা জানি না। আমার কিন্তু উহা চিরদিনের জন্য হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া আছে। সেদিন আমি বুঝিয়াছিলাম যে, ইহারই

নাম তাঁহাতে "ডাইলিউট্" (dilute)—মগ্ন হইয়া যাওয়া।···তোমার সংসার ঠাকুরের সংসার, "ঘোর সংসার" নহে।···ইহা কেবল প্রেমের।'

—'যথা যথা দৃষ্টি পড়ে, তথা তথা কৃষ্ণ স্ফুরে' —ইহাই হইতেছে ভগবদ্-বিভূতি অবলোকনের স্বাভাবিক লক্ষণ। ফলকথা, ঐ অবস্থায় একটি নূতন দৃষ্টিশক্তি খুলিয়া যায়—যাহাতে ভাল-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত, উচ্চ-নীচ, সাধু-অসাধু সকলপ্রকার ভেদ ও বৈষম্যের মধ্যেও এক অভেদ 'সম'-কে—একই আত্মারাম কৃষ্ণকে—প্রিয়তম রামকৃষ্ণকে—পুরুষোত্তম শ্রীহরিকেই নানাভাবে প্রকট বলিয়া উপলব্ধি হইয়া থাকে। তখন এই সংসারকেই বোধ হয় 'গোবিন্দের সংসার'। সেই দিব্য সংসারে সকলেরই নিজস্ব স্থান থাকে—সকলেই স্ব স্ব মহিমায় সম্মানিত—কেহই সেখানে বাদ যায় না, কিছুই বাদ পড়ে না। স্বামী প্রেমানন্দের সেই দৃষ্টিকে লক্ষ্য করিয়াই হরি মহারাজ লিখিয়াছিলেন: '···দৃষ্ট সকল পদার্থ হইতেই প্রভুর স্মৃতি জাগরিত করিতে লাগিলে।···এমন বস্তুটি দেখিলে না, যাহা হইতে প্রভুকে স্মরণ না করিলে।··· ইহারই নাম তাঁহাতে "ডাইলিউট্"—মগ্ন হইয়া যাওয়া।···তোমার সংসার ঠাকুরের সংসার।'

দৃষ্ট সকল বস্তুতেই শ্রীভগবানের স্মৃতি জাগরিত হইবার কারণ হইতেছে—সর্ববস্তুতেই তাঁহার বিভূতি। এই ভগবদ্-বিভূতিই প্রভুকে স্মরণ করাইয়া দেয়, উদ্দীপনা লইয়া আসে। আর ঐ 'ডাইলিউট্' হইয়া যাওয়ার রহস্য হইতেছে, অবাধ নিরবচ্ছেদ ভক্তিপ্রবাহে ডুবিয়া যাওয়া——তন্ময় হওয়া। গীতোক্ত বিভূতি-উপাসনার তাৎপর্য এখানেই। এই জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে ইহাকে 'উত্তম যোগ' আখ্যা দিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবানের অনন্ত বিভূতির মধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপে কেবল শ্রেষ্ঠ কয়েকটি মাত্রেরই উল্লেখ আছে। অধ্যায়ের সূচনাতেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন,—তিনিই সর্বভূতের অন্তরে আত্মা,—সুতরাং আত্মারূপেই তাঁহাকে ধ্যান করা শ্রেয়ঃ। কিন্তু কেহ যদি ঐ-রূপ ধ্যানে অক্ষম হয়, তবে তাহার উচিত—বাহিরের যে যে বস্তুতে ভগবানের প্রকাশ অধিক ব্যক্ত, সেই সেই বস্তুতেই তাঁহাকে ধ্যান করা। উপসংহারে সরল কথায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন: 'হে সখে অর্জুন, যাহা বলিতেছি অবধারণ কর। স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু বিদ্যমান, সকলেরই উৎপত্তি-কারণ আমি। আমাকে বাদ দিয়া সৃষ্টিতে সকলই অবিদ্যমান। আমার দিব্য বিভূতির কিছু সীমা নাই। তোমাকে তথাপি যে-কয়টি বিভূতির আভাস মাত্র দিলাম, উহা আমার অন্তহীন বিভূতির খুবই সামান্য পরিচয়। মোট কথা, যাহা কিছু ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীযুক্ত, শক্তিসম্পন্ন, জানিবে ঐ-সকল আমারই তেজঃ-সম্ভূত।···অধিক জানিয়া কী হইবে তোমার? শুধু এইটুকু মাত্র জানিলেই যথেষ্ট তোমার পক্ষে যে, আমার শক্তির মাত্র একাংশেই এই জগৎকে আমি ধারণ করিয়াছি।'

ব্রহ্মের একাংশে—একপাদ মাত্রেই এই জগদ্-রূপ ইন্দ্রজাল ভাসিয়া বেড়াইতেছে। অপর তিন পাদ, অর্থাৎ তাঁহার মহিমার অধিকাংশই মায়ার অতীত—অমৃত। অনন্ত এই জগদ্বিকাশ শ্রীভগবানেরই অসীম মহিমার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক অংশ মাত্র। এই সত্যটিকে ধারণা করাও বিভূতি-উপাসনা-যোগের অন্যতম লক্ষ্য। শ্রীভগবানের আশ্চর্যতম বিভূতি হইতেছে, তাঁহার এই জগন্মূর্তি —বিশ্বরূপ। মানব-বুদ্ধি এই বিশ্বরূপের ধারণা করিতেই হত-বিহ্বল হইয়া যায়,—বিশ্বের অতীত, নাম-রূপের পারে যে বস্তু তাহার ধারণা কে করিবে? সেই প্রপঞ্চাতীত অব্যক্তরূপের ধারণা সাধারণ মানব-বুদ্ধির অগম্য। শ্রীভগবানের

সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিভূতি তাই—তিনি স্বয়ং প্রপঞ্চাতীত হইয়াও যে এই প্রপঞ্চময় সাজিয়াছেন ইহাই। তিনি নির্গুণ হইয়াও সগুণ—'নির্গুণ গুণময়'! তিনি এক অদ্বিতীয়—তবুও তিনি বহুরূপী! বিভূতির পরাকাষ্ঠা বোধ হয় এখানেই।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-প্রোক্ত এই বিভূতি-যোগ দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে যেমন চরম, কাব্য হিসাবেও অনবদ্য। 'বিষ্টভ্য অহম্ ইদং কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতো জগৎ।'—বিশ্ব-কবিতায় একটি অনন্য-সাধারণ পঙ্‌ক্তি। যিনি নিত্য, তিনিই লীলার আনন্দে উদ্বেল হইয়া সসীমের মাঝে ধরা দিয়াছেন! অথচ, নিজের অসীমত্বকেও সরাইয়া রাখেন নাই কোথাও। তাই তো তিনি ধরা দিয়াও সাধারণ চক্ষে চির অ-ধরাই থাকিয়া গিয়াছেন! তিনি যেমন বিশ্বময়—যেময় সর্বময় ব্যক্ত, তেমনই আবার 'স্বে মহিম্নি'—স্ব-মহিমায় সমুজ্জ্বল। দার্শনিক বুঝি এই কারণেই বলেন,—তাঁহার যেমন স্বরূপ-লক্ষণ আছে, তেমনই আছে তাঁহার তটস্থ-লক্ষণ। অসীমের সঙ্গে সসীমের এই নিবিড়তা, নির্গুণের সাথে সগুণের এমন মাখামাখি,—নিত্য ও লীলার এই প্রণয়ালিঙ্গনই গীতোক্ত বিভূতি-উপাসনা-যোগের মর্ম-রহস্য।

'ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া,
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা॥'

(—রবীন্দ্রনাথ)

সর্বাত্মক ভগবদ্-বিভূতির কাব্যরূপ যেন অনেকটা এইরকমই। ভাব আর রূপ; অসীম আর সসীম—উভয়েরই দিব্য লীলা-কথা এই বিভূতি-যোগ। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার উল্লিখিত দশম অধ্যায়টি তাই এক অনুপম তত্ত্বময় কাব্য।

*

শ্রীকৃষ্ণ খুব স্পষ্ট কথায় অর্জুনকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, সংসারে ভাল-মন্দ, দোষ-গুণ তাবৎ কিছুরই এক অন্তরাত্মা তিনি—অর্থাৎ ভগবান। 'অহমাত্মা গুড়াকেশ! সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।' আরও বলিয়াছেন—তিনিই সর্বভূতের আদি মধ্য ও অন্ত—'অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥' সংসারে তবে কাহাকে বরণ করিব, আর কাহাকেই বা বর্জন করিয়া চলিব? অসৎ প্রবৃত্তি এবং সৎ বৃত্তি, উভয়ত্রই তাঁহার শক্তি—বিভূতি। স্বামী বিবেকানন্দও তো সেই সত্যই ঘোষণা করিয়াছেন: 'পুত্র তরে মায়ে দেয় প্রাণ, দস্যু হরে—প্রেমের প্রেরণ!!…/রোগ-শোক, দারিদ্র্য-যাতনা, ধর্মাধর্ম, শুভাশুভ ফল,/সব ভাবে তাঁরি উপাসনা…।' শ্রীভগবানই প্রেমস্বরূপ। সর্ববৃত্তিতে, সর্ববস্তুতে, সর্বরূপে ও সর্বগুণে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করাই তো ভক্তের ভক্তির পরাকাষ্ঠা—জ্ঞানীর চরম উপলব্ধি—ধ্যানীর সার্থক চিত্ত-সমাধান—কর্মযোগীর নিরাসক্ত উপাসনা।

শ্রীভগবানের অনন্তভাবের—আন্তর বা বাহ্য যে-কোনও বিভূতি বা ভাবই আমাদের মনকে শুদ্ধ, পবিত্র, শান্ত এবং ভগবদ্‌ভাবে আবিষ্ট করিবার পক্ষে যথেষ্ট। গীতার বিভূতি-উপাসনা-যোগে শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য, শম, সুখ, দুঃখ, স্মৃতি, কাম, মেধা, ক্ষমা, মৌন, চেতনা প্রভৃতি আন্তর ভাবগুলির সবিশেষ উল্লেখ যেমন করিয়াছেন,—তেমনই বেদ-বিদ্যা, দেবতা, ঋষি, মন্ত্র, ব্যক্তি, জীব, স্থাবর, জঙ্গম ইত্যাদি আরও কত বিশেষ বিশেষ বাহ্য বিভূতির বর্ণনাও করিয়াছেন। এই সব ভগবদ্-বিভূতির সম্যক্ চিন্তা—এবং জীবনে আরোপ ও অনুসরণের ফলে মানুষ স্বতই শ্রীভগবানের ভাব-রসে অভিষিক্ত হইতে পারে। ভগবানকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন হয় না—তিনি নিজেকে এমনভাবে বিস্তার করিয়া বিরাজ করিতেছেন যে, দেখিবার ইচ্ছা থাকিলে

অনায়াসেই তাঁহাকে দেখা যায়—যে-যেখানে আছে,—সে-সেখানে থাকিয়াই তাঁহাকে পাইতে পারে,—সন্নিধির আনন্দে ভরপুর থাকাও সম্ভব।

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য, 'বিভূতি' কথার তাৎপর্য লিখিয়াছেন 'বিভূতিং বিস্তারম্'—অর্থাৎ 'বিভূতি'র মর্মার্থ হইতেছে 'বিস্তার'। শ্রীমৎ আনন্দ গিরিও এই ভাষ্যের টীকায় লিখিয়াছেন : 'বিবিধা ভূতিঃ ভবনং বৈভবং সর্বাত্মকত্বম্'—বিবিধরূপে সৃষ্টিতে অভিব্যক্তির—সর্বাত্মকত্বের মহিমা।

ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমী প্রতি বর্ষে আমাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব স্মরণ করাইয়া থাকে। 'আবিঃ'—প্রকাশ। বিশ্বমানবের মাঝে সেই অবিস্মরণীয় প্রকাশকে আমরা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করি—নানা দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করি—অনুধ্যান করি, জীবনের অন্ধকার ঘুচাইবার জন্য। তাঁহার প্রয়োজন আমাদের কোনদিনই মিটিবে না,—কারণ তাঁহার উপদেশ আমাদিগের ব্যষ্টি ও সমাজ-জীবনে শান্তি, সাম্য ও সংহতির সহজ সরল পন্থা নির্দেশ করিয়া থাকে—ঈশ্বরকে খুব কাছে আনিয়া দেয়—মানুষের ঐশী সত্তার প্রতি আমাদের বিভ্রান্ত দৃষ্টিকে টানিয়া লয়—আত্মশক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ করে—ক্লীবতা হইতে পৌরুষে উত্তরণ ঘটায়। শ্রীকৃষ্ণের গীতা ঘোষণা করে : শুদ্ধ ব্রহ্ম যেমন ঈশ্বর হইয়াছেন—তেমনই তিনি মানুষও সাজিয়াছেন—জীব-জগদ্‌রূপে প্রতিভাত হইতেছেন। এই আধ্যাত্মিক অভেদ-বোধই আমাদের জীবন-লক্ষ্য। একমাত্র এই সত্যের আবিষ্কার করাই হউক আমাদের সকল শিক্ষা-দীক্ষা-সাধনার উদ্দেশ্য।

স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীমতী কনকপ্রভা দাশগুপ্তকে লিখিত]

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণশরণং

RAMKRISHNA MISSION
BELUR P. O. HOWRAH DIST.
Dated 1/1/1926

মা কনক

তোমার চিঠি পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আগেও একখানা চিঠি পাইয়াছিলাম। আমার শরীর তেমন মন্দ নয়। একটু বাত আছেই [,] ও তেমন কিছুই নয়। মঠের অন্যান্য সব কুশল। শ্রীশ্রীঠাকুরের চিন্তা করিয়া যাও। শান্তি পাইবে। তিনিই শান্তিময়। আর অন্য বিষয়ে শান্তি পাবে না। খুব শ্রদ্ধা বিশ্বাসের সহিত তাঁর পূজা, তাঁর চিন্তা, তাঁর কাছে প্রার্থনা করিতে থাক। যতই তাঁর চিন্তা করিবে ততই পরম কল্যাণ। তিনি অহেতুক কৃপাময়, তাঁকে ভালবাসিলে পরমানন্দ পাইবে। আমার খুব আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিও। তোমার খুব বিশ্বাস ভক্তি পবিত্রতা দিন দিন বর্দ্ধিত হউক।

ইতি—
তোমাদের শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

(২)

RAMKRISHNA MATH
BELUR P. O. HOWRAH DIST.
DATED 10/3/1926

মা কনক

তোমার পত্র পাইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় তোমরা শারীরিক কুশলে আছ জানিয়া আনন্দিত হইলাম।

শ্রীশ্রীপ্রভুর কৃপায় তোমরা শারীরিক মানসিক কুশলে থাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম করিয়া প্রাণে আনন্দ লাভ কর, তোমাদের জীবন ধন্য হউক ইহাই আন্তরিক প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম নিয়মিত ভাবে সকাল সন্ধ্যায় যতটা পার করিতে চেষ্টা করিবে। তোমরা তাঁর পরমপবিত্র অভয় নাম পেয়েছ তোমাদের ভাবনা কি? ঐ নামের প্রভাবেই তোমাদের ভক্তি বিশ্বাস বৃদ্ধি হবে [,] মন পবিত্র হবে [,] প্রাণে বিপুল আনন্দ লাভ করিবে প্রভুর কৃপায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের পরম দয়াল অহৈতুক কৃপাসিন্ধু [।] তাঁকে যে অবস্থায় যে ভাবেই ডাক তাহাতেই তিনি কৃপা করিবেন। মা [,] সর্ব্বদা মনে রাখবে তোমরা তাঁর ভক্ত [,] তোমাদের পশ্চাতে সর্ব্বদা তিনি আছেন এবং তোমাদের কল্যাণ করিতেছেন। যখন যেখানে থাক সেইখানেই তোমাদের সঙ্গে ২ আছেন জানিও।

আমি আশীর্ব্বাদ করি তোমার জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস বৃদ্ধি হউক। তুমি তাঁর নামে প্রাণে আনন্দ লাভ কর [।]

খোকা মহারাজ কলিকাতাতেই আছেন এবং এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় অনেকটা ভাল আছেন।

মঠের খবর শ্রীশ্রীপ্রভুর কৃপায় ভাল [।] আমার শরীর একরূপ চলে যাচ্ছে। এখানে আজ আটদিন হইল রোজ জল হচ্ছে [,] তাই গরম একেবারেই নাই বরং বেশ শীত আছে।

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহ আশীর্ব্বাদ জানিবে [।] মাঝে ২ তোমার কুশল দিবে [।]

ইতি—
তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

ভ্রমসংশোধন

আষাঢ় (১৩৯২) সংখ্যায় পৃষ্ঠা ৩০৯-এর দ্বিতীয় কলমে ১৬ ও ১৮ লাইনে 'বৃহদারণ্যক'-এর স্থলে পড়িতে হইবে 'ছান্দোগ্য'।

সমুদ্রের আঁচলছায়ায়

শ্রীচিরঞ্জীব ভট্টাচার্য

বিশিষ্ট লেখক—আনন্দবাজার পত্রিকা সংস্থার সংশ্লিষ্ট।

দেশভ্রমণে জ্ঞানবৃদ্ধি হয় বলে যাঁরা বলেন আমি তাঁদের দলে নই। কেননা শুনেছি, অজ্ঞান তামস দূর হলে মানুষ ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। প্রকৃত জ্ঞান হয় তখনই। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সে-অবস্থায় লোপ পায়। শুধু মানুষ কেন সকল অস্তিত্বশীল বস্তুই যে আসলে এক ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ সেই উপলব্ধি আসে। সোঽহম্ এবং তত্ত্বমসি তত্ত্ব প্রাঞ্জল হয়। আসল জ্ঞান বলে তাকেই—এই অভেদ বোধকে।

ভ্রমণ মানে এখানে দেশভ্রমণ, তীর্থপর্যটনের কথা বলছি না। তীর্থপর্যটনের প্রসঙ্গ আলাদা—সেখানকার সুর স্বতন্ত্র। কিন্তু দেশভ্রমণে কী হয়? একস্থানের মানুষ গাছপালা, পশুপাখি এবং প্রকৃতি কিভাবে অন্য অঞ্চলের ঐসকল বস্তু থেকে পৃথক এ বুদ্ধি জন্মে। অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি। সুতরাং দেশভ্রমণ মানে জ্ঞান থেকে অজ্ঞানতায় যাওয়া। ভ্রমণ অতএব ভ্রমের সৃষ্টিকারী। তবে আমার নিজের অভিজ্ঞতায় দুটি লাভ দেখেছি। এক, ভ্রমণে পায়ের বাত সারে। হাঁটাহাঁটির দরুন বাত পায়ে জমে থাকতে পারে না। বিদায় নেয়। কিন্তু যেহেতু এনার্জির বিনাশ নেই অন্য রূপ গ্রহণ আছে মাত্র, বাতও বিনষ্ট হয় না। স্থান পরিবর্তন করে অন্য ফর্মে বিরাজ করে। সে তখন আশ্রয় নেয় মুখে। ভ্রমণকারীর বাতচিতও তাই বেড়ে যায় ক্রমশঃ। এক-একটি ভ্রমণ সমাপনান্তে তাই সে তার সফর নিয়ে নানা গালগল্পে মেতে ওঠে। সফরী ফরফরায়তে কথাটির সৃষ্টিও বোধ হয় এই কারণেই। সফর শেষে তাই নিয়ে বাগাড়ম্বর না করতে পারলে যে সবই বৃথা। (শিক্ষিত ব্যক্তিরা চটবেন না। অশিক্ষিত চাষাভুষোরাও মাঝে-মধ্যে অনেক খাঁটি কথা বলে ফেলে।)

আমারও হয়েছে তাই। একবার বেড়ালেই ভিতরে অনেক কথা জমে ওঠে। তখন সেই কথাগুলোও বেড়াতে চায়। বন্ধ থাকতে চায় না আর মনের ভিতরে। বেরোবার রাস্তা খোঁজে, তাই কাগজ-কলম নিয়ে বসি। বাসি হবার আগেই লিখে ফেলি। ভাবি আসলের উপরে মাঝে মাঝে নকল রঙও দিই বসিয়ে। এটাই যে দস্তুর। বিশ্বাস না হয় বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনীগুলো পড়ে দেখুন, এত ঘটনার ঘনঘটা কারও জীবনে সত্যিই ঘটে কি? পারসেণ্টেজ কষলে বোধ হয় দেখা যাবে ঘটনা ৩০%, কল্পনা ৭০%। অবশ্য লেখকরা সবাই কল্পনাবিলাসী। তাঁদের পোয়েটিক লাইসেন্স আছে। আমি লেখক নই বলে পোয়াটাক কল্পনাও নেই। অতএব এ রঙ চড়ানো, এ রঙ-বাজি, আমার কাজ নয়। তাই যা দেখি তাই লিখতে বাধ্য হই। এ লেখাটি তেমনই একটি সোডার বোতল থেকে নির্গত জলধারা। ভিতরের চাপে বাইরে নির্গতি। শুধু গ্যাস নেই এই যা তফাত।

অন্যান্য বহুবারের মতই এবারও আমার সঙ্গী বাবুই। যাব দীঘা। বাবুই টিকিট কেটে এনেছে রেল-বাসের [illegible] (এখন এটি বন্ধ হয়েছে।) এক্সপেরিমেণ্ট করার জন্য। আমার ব্যাপারটা খুব একটা পছন্দ হয়নি। সোজা বাসে গেলেই হত। এসপ্লানেড থেকে দীঘা। কিন্তু কিছু করার নেই। টিকিট কাটা হয়ে গেছে যখন।

টিকিট তো কেটেছি। কিন্তু ট্রেনের টিকিটি যে দেখা যায় না। আসবার কথা সেই সকাল ছ-টা বাজতে দশে। এখন সাড়ে ছ-টা। কত ট্রেন আসে, কত ট্রেন যায়। কিন্তু আমাদের নির্দিষ্ট গাড়ি আর আসে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

এদিকে পায়ে শেকড় গজিয়ে গেল। অবশেষে ; না বাঁকের মুখে ধোঁয়া দেখা গেল না। যত্র তত্র ধূমঃ তত্র তত্র বহ্নিঃ। এখানে যত্র যত্র ধূমঃ তত্র তত্র বাষ্পীয় শকটঃ। আমরা তো যাব ইলেকট্রিক ট্রেনে। তাই ধোঁয়াটে ব্যাপার নেই। সোজাসুজি গাড়িই দেখা গেল। একেবারে হুড়মুড়িয়ে এসে পড়তেই আমরাও দুদ্দাড় করে ঢুকে পড়লুম তার জঠরে। এবং বেরিয়েও এলুম তৎক্ষণাৎ। আমাদের জন্য নির্দিষ্ট কামরাটি পুরীযাত্রিবিক্ত। তিষ্ঠোয় সাধ্যি কার? ইতিমধ্যেই আমাদের গাড়ির কণ্ডাক্টার গার্ড এসে হাজির হলেন। এবং সব শুনে বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করে অন্য কামরায় আমাদের স্থানান্তরিত করলেন। আমরা দুজন অবশ্য সকলের সঙ্গে একত্র কামড়া-কামড়ি না করে দুসরা কামরায় জায়গা করে নিলুম। গার্ড ভদ্রলোক বিশেষভাবে সহৃদয়তার সঙ্গে সাহায্য করলেন। বস্তুতঃ ভদ্রলোককে আমার অষ্টমাশ্চর্য মনে হয়েছিল। রেলে এ জাতীয় ব্যবহার এ জীবনে আর কখনও পাইনি।

আমাদের কামরাটি ছিল ফাঁকা। শুধু আমরা দুজন। ফলত রাজার মতই চললুম। মাঝে মেচেদা স্টেশনে কিনলুম সিদ্ধ ডিম এবং সিঙারা। প্রাতরাশের আশে। হাওড়ায় সকালে ট্রেন ধরব বলে সেই পাঁচটায় বেরিয়েছি। পেটের মধ্যে খাণ্ডবদহন চলছিল। এবার কথঞ্চিৎ শান্ত করা গেল। ইতিমধ্যে কামরায় একজন নবাগন্তুক এসেছে। একটি বছর দশেকের ছেলে, হাফ-প্যাণ্ট হাফশার্ট পরনে। খালি পা, দরজার কাছে বসে নিজের মনে ঠোঙা থেকে ঢেলে ঢেলে মুড়ি খাচ্ছিল তেলেভাজা দিয়ে। খাওয়া শেষ হলে আপন মনে গান ধরল, 'মন তুমি কৃষি কাজ জান না'। তারপর, 'মায়ের এমনি বিচার বটে'! তৃতীয় গানটি একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং ফিল্মে ব্যবহৃত নয়। চমক লাগল। ছেলেটিকে ডাকলুম।

—তোর নাম কি?

—সনাতন বেরা।

—বাবা কি করে?

—বাবা মরে গেছে।

—কিসে?

—কলেরায়।

—তুই কার সঙ্গে থাকিস?

—মার সঙ্গে।

—আর কে কে আছে তোর?

—দুটো বোন আছে।

—মা কি করে?

—মা অন্য লাইনে ভিক্ষে করে।

—গান শিখলি কার কাছে?

—মার কাছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতটির কলি তুলে বললুম, এ গান কার কাছে শিখলি?

—একটা বাবুর কাছে। রেলে করে যাচ্ছিল।

—রবি ঠাকুরকে চিনিস?

—হ্যাঁ।

আমরা চমৎকৃত হলুম।

—চিনিস? কি করে সে বলতো?

—খড়্গপুর লাইনে মুড়ি বেচে।

—দিনে কত রোজগার করিস?

—তিনটাকা-চারটাকা। মাকে গিয়ে দিয়ে দি। সকালবেলা মা চল্লিশ পয়সা দেয় মুড়ির জন্যে। চেয়ে চিন্তে তেলেভাজা পেয়ে যাই কখনও-সখনও।

—আচ্ছা যা।

বাবুই ছেলেটিকে পাঁচটি টাকা দিল। ছেলেটা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর চলে গেল আবার দরজার কাছে। আমাদের সময়টা এইভাবেই কেটে গেল। আমরা পৌঁছে গেলুম তমলুক স্টেশনে। নেমে আসতেই সেই গার্ড ভদ্রলোক বললেন—

আমাদের বাস বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে জায়গা রেখে একটু বাথরুম টাথরুম করে নিন। তারপর ছাড়ব।

—তার মানে? জায়গা নাও পেতে পারি নাকি?

—না, তা নয়, জায়গা ঠিকই আছে। তবে সীট নাম্বার নেই। বাছাবাছির সুযোগ তাই যে আগে উঠবে তারই।

অগত্যা আগে বাসেই যাওয়া গেল। ততক্ষণে সব ফুল। শুধু শেষের লম্বা সীটটি বাদে। আমরা দুজনে তারই দুদিকের দুটি জানলা দখল করলুম।

গাড়ি ছাড়ল। লক্ষ্য করলুম, রাস্তার দুধারে নতুন কচি কচি গাছে ভরে গেছে। মাঝে মধ্যে বোর্ড দেখলুম, সামাজিক বনসৃজন প্রকল্প। বেশ ভাল লাগল ব্যাপারটি। সর্বত্র যখন বনবধ যজ্ঞ চলেছে তখন এই প্রচেষ্টা সত্যিই সুখকর। মনে পড়ল উত্তরবঙ্গের বহুস্থানে এজাতীয় বন দেখেছি। মালদা রায়গঞ্জের রাস্তাগুলি তো সবুজ হয়ে গেছে। শুনলুম বন এবং পর্যটনমন্ত্রী পরিমল মিত্রের (বর্তমানে প্রয়াত) ব্যক্তিগত উৎসাহে এই অরণ্য গড়ে তোলা হচ্ছে।

কিন্তু এ সৌন্দর্য উপভোগ করা বোধ হয় আমাদের কপালে ছিল না। আমি বসেছিলুম বাঁদিকের জানলায়। অকস্মাৎ ডানদিকের কপালে একটি আঘাত পেয়ে চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল। চেয়ে দেখি বাবুই। বাসের প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে ও ওর জানলা থেকে বিচ্যুত হয়ে আমার গায়ে এসে পড়েছে। ওর দিকে তাকাতে তাকাতেই ও আবার ঝাঁকুনির চোটে ওর জানলার দিকে চলে গেল। ক্রমশ ঝাঁকুনির চোটে আমরা সবাই নাচতে লাগলাম। বাসের দেয়ালে, সীটে, অপর-যাত্রীর গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে চলা। এ যেন জীবনযুদ্ধ। ঘাত-প্রতিঘাত ছাড়া এগোবার উপায় নেই। এবারে বাসের ছাদের সঙ্গেও যাত্রীদের মাথার ঠোকাঠুকি শুরু হল। এ উদয়শঙ্করী ওরিয়েন্টাল ডান্স নয়। একেবারে আমেরিকান জ্যাজ। অথবা তাও নয়। কেননা জ্যাজের শিল্পীরা নাচেন নিজের ইচ্ছেয়। আমরা নাচছি নিজের ওপরে কর্তৃত্ব হারিয়ে। বরঞ্চ একে বলা চলে ট্যারেন্টুলা ডান্স। দক্ষিণ আমেরিকার বিষাক্ত মাকড়সার কামড়ে লোকে যে-নাচ নাচতে নাচতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে এ যেন সেই নাচ। কোন কোন জায়গায় রাস্তা বলে কিছু নেই। গাড়ি নিজে বেছে নেয় কোন্ দিকটা কম বিপজ্জনক। এক-একটি গর্তের মধ্যে নাবলে ওঠার আগে পর্যন্ত রাস্তা-গাড়ি কিছুই দেখা যায় না। আর আছে কয়েকগজ দূরে দূরেই তাবড় তাবড় হাম্প। পাড়ার বা গ্রামের লোকের ইচ্ছে মতই এইসব হাম্পের সৃষ্টি। ছোট ফিয়ট বা স্ট্যাণ্ডার্ড গাড়ি কিভাবে যে এগুলো পার হয় কে জানে! সবার প্রাণপাখি যখন ঝাঁকুনির চোটে দেহপিঞ্জর থেকে উধাও হবার জোগাড় তখন সবারই মনে মনে প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে, শেষ কর এ চলা। রেহাই দাও আমাদের!

কে বলে ঈশ্বর নেই? কে বলে থাকলেও তিনি বধির? বাসের সকলের মিলিত আর্তনাদ তাহলে তাঁর কানে পৌঁছল কেমন করে? হঠাৎ দুম করে একটা আওয়াজ। টায়ার ফাটল। গাড়ি একধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমরা কিছু-ক্ষণের জন্য রেহাই পেলাম। আধঘণ্টা তো বটেই। গার্ড সাহেব আমাদের সঙ্গে এই বাসেই যাচ্ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম, আর কতক্ষণ এই ঝাঁকুনি সইতে হবে? তিনি খুব বিনীতভাবে বললেন, আর না, ঝাঁকুনির রাস্তা এখানেই শেষ হয়ে গেল। ওঃ, ঈশ্বর তা হলে উল্টা বুঝলি রাম!

টায়ার সারানো হলে আবার চলা। ক্রমশঃ হাওয়ায় অন্য অনুভূতি। অন্য গন্ধ। বুঝলুম সমুদ্র সন্নিকট। অল্পক্ষণ পরেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া

গেল। বিশাল জলরাশি, তীরের কাছে ম্যাড়ম্যেড়ে রঙ। দূরে ক্রমশঃ নীল, তবে এ নীল ঘন-নীল নয়, আকাশী নীল, বাস থামল সমুদ্র-পাড়েই।

নামতেই রিক্সাওয়ালার ভিড়। হোটেলের দালালদের ভিড়, কানের কাছে প্রস্তাবও পেলুম 'যা চাই' পাবার। বাবুই রীতিমত বিরক্ত। আমি অধিকতর পোড়-খাওয়া বলে অতটা চমকালুম না। আমাদের হাতে একটি করে মাঝারি স্যুটকেস। জায়গা ঠিক করা ছিল, সী হকে। রিক্সায় উঠে নাম বলতেই নিয়ে গেল তরতরিয়ে। দেড় মিনিটেই পৌঁছে গেলুম। আমরা নবাগত, তাই জানতুম না। বাস টার্মিনাস থেকেই হোটেলটি দেখা যায়। হেঁটেই আসতে পারতুম। মধ্যবিত্ত মন খুঁত খুঁত করতে লাগল।

আমরা পৌঁছুতেই একছোঁয়ে হাত থেকে বাক্স দুটি নিয়ে বেয়ারা হাজির করল দোতলায় ভি আই পি রুমে। বলা বাহুল্য আমরা এঁদের অতিথি হিসেবে এসেছিলুম বলেই ঐ ঘরে থাকতে পেলুম, নইলে নিজেদের ট্যাঁকের টাকায় নিশ্চয়ই ওখানে উঠতুম না। শুনলুম আগের দিন এক নামী চিত্রাভিনেত্রী উঠেছিলেন ঐ ঘরে। বেয়ারার ভাবখানা এই যে, আমরা যেন অতিরিক্ত আরাম পাব সেই জন্যে।

এ মহলে এই একটিই ঘর। সমুদ্রের দিকে মুখ করে। ঘর বলে ভুল করলুম স্যুইট, কিন্তু ঘর দেখার তর সইল না। সমুদ্র ডাকছে। চড়া রোদ মাথায় নিয়েই নেমে এলুম জলের ধারে। বেশ শক্ত বালির ভিত সেখানে। অনেকে গাড়ি চালিয়ে সমুদ্রকে ধারে রেখে চলে যাচ্ছেন। চলছে সেখানে মোটর বাইকও, সমুদ্রের জল তাদের চাকা ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে, বালির ওপরে এখানে সেখানে পড়ে আছে বিঘৎ খানেক লম্বা পেটফোলা কতকগুলো মাছ (স্থানীয় লোককে শুধিয়ে জানতে পেলুম মাছ নয়, এক ধরনের সামুদ্রিক ব্যাঙ।)। কাঁধে বাঁক ভর্তি মাছ নিয়ে আসছে জেলেরা অদূরের কোনও ঘাট থেকে। ঢেলে বিক্রি করছে সেসব পাইকারি হারে। বাবুইয়ের বড় ইচ্ছে, পমফ্রেট মাছ কিনে নিয়ে যাই হোটেলে। ভাজা খাবে। কাঁটাতে ওর ভয় বলে সমুদ্রের এজাতীয় কাঁটাহীন মাছের ওপর ঝোঁক। আমি নিজে সামুদ্রিক মাছ পছন্দ করি না। গন্ধের জন্য, মিষ্টিজলের মাছই পছন্দ আমার। কাঁটামাছেই স্বাদ বেশি হয়। প্রাকৃতিক নিয়মে জীবনরক্ষার এক-এক অদ্ভুত ব্যবস্থা এক-এক-জনের। সামুদ্রিক কাঁটাহীন মাছের গায়ে থাকে বোটকা গন্ধ, স্বাদহীনতার বর্ম। আর মিষ্টিজলের মাছের গায়ে থাকে কাঁটা। তার স্বাদু শরীরের রক্ষাকবচ। যাই হোক, বেশ কিছুটা মাছ কেনা গেল। দর কলকাতার থেকে কম তো নয়ই বরং বেশিই বলা যেতে পারে, আসলে আমাদের মতো খুচরো ক্রেতাদের জন্য কোন উৎসাহ নেই ব্যাপারীদের, নেবে তো নাও। নইলে পথ দেখো। ডায়মণ্ডহারবার, মালঞ্চ, কোলাঘাটেও দেখেছি একই ব্যাপার। এদিকে সমুদ্র বয়ে যাচ্ছে পায়ের ওপর দিয়ে। কিন্তু সামুদ্রিক উদ্দামতা নেই কোথায়? উদ্দামতা না থাকলে যেন সমুদ্র বলেই মনে হয় না। মনে পড়ে যায় পুরীর জলের তর্জন-গর্জন, প্রকৃতি, মানুষ সবাইকে যেন আহ্বান করছে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য। সেই আহ্বানে স্থির থাকা আমার মতো ক্ষেপার পক্ষে সম্ভব হয়নি কোনবারই। জামাপ্যাণ্ট পরিহিত অবস্থাতেই ঝাঁপিয়ে পড়েছি কতবার। শুনেছি পদ্মার জলেরও এ জাতীয় আকর্ষণ আছে। কবিগুরু নাকি একবার বোট থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাহুর তাড়নায় বেশ কিছুক্ষণ জলমন্থন করে শান্ত হয়েছিলেন।

এখানে জলে নামলুম না, ফিরে এলুম হোটেলে। বালুতীরের পাশ দিয়ে বেশ বড় ঝাউ

বনের অস্তিত্ব দেখেছিলুম আগের বারে। এখন সে বিলুপ্ত। পাড় ভাঙা রোধ করতে পাথরের চাই জড়ো করা আছে তীর বরাবর। আঘাটায় এরই ফাঁকে ফাঁকে স্থানীয় লোকেদের প্রাতঃকৃত্য সমাপন। সেসবের দুর্গন্ধে বাতাস ব্যথিত। তবে হোটেল কর্তৃপক্ষ তাঁদের হোটেলের সামনের অংশটুকুকে ঝকঝকে রাখবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন সর্বদা। কিছু গাছও লাগানো হয়েছে। ঝাউ-এর সাথে নারকোল। চৌহদ্দির মধ্যে ফুলের বাগান। মিনি পশুশালা।

আজ শনিবার, কলকাকলিতে ভর্তি হোটেল। বেশির ভাগই কলেজের ছাত্রছাত্রী। কথা, চীৎকার, হই-হই, হা-হা। যৌবনের জয়গান। আমাদের পাশ দিয়েই একটা দল আহ্লাদের মারামারি করতে করতে চলে গেল। পেছন পেছন আসছিলেন এক প্রৌঢ়। মন্তব্য করলেন, দেশটা উচ্ছন্নে গেল। আমার কিন্তু মনে হল যে, আনন্দের কাঙাল হয়ে বিশ্বশুদ্ধ ঋষি-মনীষী নানান পন্থা খোঁজার চেষ্টা করেছেন তারই টুকরো টাকরা এরা পেয়েছে। মনে মনে বললুম, সারা-জীবন যেন এরা এই আনন্দের মোহর আঁচলে বেঁধে রাখতে পারে। আর এদের উপচে-পড়া ফেনায় যেন কিছু রামগরুড়ের খুশির পাখনা গজায়!

হোটেলের খানা ছিল বড় জব্বর রকমের। সেটি মেরে ঘরের বারান্দায় এসে বসলাম। কিন্তু উঠতে হল একটু বাদেই। লু বইছে যেন। ঘরে এসে পাখার তলায় লম্বমান। বিকেল পর্যন্ত বেকার, সঙ্গে বইপত্র কিছু আনিনি। অতএব অগতির গতি নিদ্রাদেবীর আরাধনা। দেবী প্রসন্না ছিলেন। ঘুম ভাঙলো পাঁচটা নাগাদ্। দেখলুম বাসের ব্যথা বিলকুল সাফ। চোখ মুখ ধুয়ে আবার চললুম সমুদ্র সন্দর্শনে।

এবার পাড়ে বেশ ভিড়। নানান বেশের নরনারী জড়ো হয়েছে তীরে। বয়সের হিসেব করলে যুবক-যুবতীই বেশি। এটা জাস্ট উইক এণ্ডের ভিড়। বিশেষ ছুটির সময় বয়স্করাও আসেন বহুল পরিমাণে। আসল কথা পথের ধকল দূরে সরিয়ে রাখে তাদের। তা না হলে হাতের কাছেই এ সমুদ্র আরও কত জনপ্রিয় যে হত!

সমুদ্রে ভ্রমণের জন্য দেখলাম একটি লঞ্চের বন্দোবস্ত আছে। লঞ্চটি হোটেলের নিজস্ব। শুনলুম এখন আর চড়া যাবে না। কাল সকালে আবার। তাই হাঁটতে লাগলুম পাড় ধরে। বাবুই রয়ে গেল ঘাটে। কয়েকটা বালিয়াড়ি পার হয়ে গেলুম। সমুদ্রের দিকে চোখ না ফিরিয়ে এগুলোর দিকে তাকালে মনে হয় মরুভূমিতে এসে পড়েছি। অনেকটা এগিয়ে যেতে যেন একটা গ্রামের দেখা পেলুম। প্রহরী কুকুরটি সরবে আমাকে ধমকাতে লাগল। একটি কিশোরী—সবুজ শাড়ি, লাল কৃষ্ণচূড়া রঙের ব্লাউজ, সিঁথিতে মেটে সিঁদুরের প্রলেপ, তাকে ধমকে দিল। তবুও যুক্তিযুক্ত মনে করলুম না আর এগোন। বালিয়াড়ি থেকে নামলুম জলের দিকে। তারপর আবার হাঁটা। সূর্য এখন অস্তাচলের মুখে। আঁধারের কালো আর লাল আলোর লড়াই, কে জেতে কে হারে করতে করতে ঝুপ করেই প্রকৃতির লোড শেডিং। অদূরে জেলেডিঙিগুলো মনে হচ্ছে ভৌতিক। ভৌতিক দাঁড়ি-মাঝি—সব মিলিয়ে এক অপরূপ পরিবেশ।

একদিকে দেখলুম, গোটা কয়েক লোক গোল হয়ে বসে মদ্যপান করছে। বোধ হয় এরা জেলে। একটা কলাই করা বাটিতে খানিকটা ছোলা মটর সেদ্ধ। আর খান কয়েক তেলে ভাজা। আমায় দেখে একটু আড়াল দিয়ে বসল। একজন আবার গান ধরল একটা, হিন্দি ফিল্মের গান। কিন্তু গলাটি বড়ই মিঠে। মনে হল যদি মাঝি না হয়ে এ গায়ক হত তবে বোধ হয় বেশি সফল হতে

পারত জীবনে। অবশ্য সফলতা মানে যদি আনন্দে থাকা হয় তবে হয়তো এ সফল হয়েই আছে। সামাজিক সাফল্যের সাথে সাথেই তো আসে অভাববোধ। যা থেকে দুঃখ। তথাকথিত অভাবী লোকের অভাব বরং অনেক সীমিত। অল্পেই তুষ্টি, অল্পই এদের ভূমা।

একটা চক্কর শেষে আবার হোটেলের ব্যালকনি। চারিদিকে সরকারি লোড শেডিং। সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখি অসংখ্য তারা দুলে দুলে ভাসছে। এটা কেমন করে সম্ভব। সমুদ্রের চঞ্চল জলে তো তারার ছায়া পড়ার কথা নয়। তাছাড়া আকাশেও তো তারা নেই। মেঘ। তবে? একটু পরেই রহস্যটা পরিষ্কার হল। ওগুলো জলে ভাসমান জেলেডিঙির আলো। অন্ধকারে শনশন বাতাসের শব্দ, মাঝে-মধ্যে মানুষের কণ্ঠস্বর আর অদৃশ্য বিস্তারের মাঝে দোলায়মান জোনাকি—সব মিলে মনটাকে টেনে নিয়ে গেল আনন্দলোকে। কখন যে আমরা গানের স্রোতে ভেসে গেছি বুঝতেও পারিনি। মনে যদি সুর লাগে কণ্ঠের সাধ্য কি বাধা হয়ে দাঁড়ায়!

পরদিন সকালে সমুদ্র কালির বরণ। আকাশের দোয়াতটি উল্টে গেছে বোধ হয়। কিন্তু জেলেদের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। সেই ঠেলে ঠেলে নৌকো জলে ভাসানো। মাইল দুমাইল লম্বা রশি টেনে টেনে কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় জাল গোটানো, মাছ তোলা কোনটাতেই কামাই নেই। বালিতে অনেক ঝিনুক, নানান রঙের। কিছুক্ষণ ছেলেমানুষের মতো তাই কুড়োলুম। কয়েকজন পাশ দিয়ে যাবার সময় বিদ্রূপের হাসি হেসে গেলেন। তাও বুঝতে পারলুম। কিন্তু আমার তখন সেদিকে লক্ষ্য করার সময় নেই কেবলই মনে হতে লাগল এ সংগ্রহ অমূল্য। কাউকে দিয়ে ভারমুক্ত হই। একটি দশ-বারো বছরের মেয়ে পায়ে পায়ে আমার কাছে এসে আমার পাগলামি দেখছিল। আমি তার হাত দুটো আমার সংগ্রহ দিয়ে ভরিয়ে দিলুম। সে কি বুঝলো কে জানে। গালে লজ্জার অরুণিমা লাগল। খুশিও হল। আমার দিকে চেয়ে বলল, তুমি খুব ভাল। আমার জীবনে এরকম ভাল লাগার মুহূর্ত আর আসেনি। আমি চোখের জল গোপন করতে সমুদ্রের দিকে তাকালাম। মেঘ কেটে গিয়ে তার জলে তখন রোদের চাদর বিছিয়ে গিয়েছে।

লঞ্চটিকে দেখলাম ডিজেল দিয়ে চালু করা হচ্ছে। একটি বড় দল সেটির প্রথম দাবিদার। অগত্যা আমরা অপেক্ষা করে রইলুম। কখন এরা ফিরে আসে। দলটি সমেত লঞ্চ চলে গেল। দূরে বেশ দূরে। ক্রমশঃ সমুদ্রে ঢেউ উঠল, আকাশে বাতাস। যত নৌকো ছিল সব ফিরে এল। বিপদ আসছে নাকি! কিন্তু সেই লঞ্চটি যেন ঢেউয়ের তালে তালে ক্রমশঃ দূরে চলে যেতে লাগল। হোটেল কর্তৃপক্ষ নৌকো পাঠালেন দুটো। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওরা ফিরে আসছে না। দূরে কোথায় দূরে দূরে ভেসে যাচ্ছে। শুনলুম প্রপেলারে জালের দড়ি আটকে বন্ধ হয়ে গেছে।

আমার কেবলই মনে হতে থাকল ঐ লঞ্চে যাঁরা গেছেন তাঁদের বদলে আমি থাকলে বড় ভাল হত। সমুদ্রের ভালবাসার আলিঙ্গনে আমার বুকটা ভরে উঠত। না হয় হারিয়েই যেতাম। ভালবাসার ঢেউয়ে কে না হারিয়ে যেতে চায়! আর আমার একবুক প্রেম সমুদ্র ছাড়া কেই বা সইতে পারবে?

লঞ্চের লোকগুলোর প্রতি হিংসে বোঝাই মনে ফিরে এলুম হোটেলে

শিবমহিম্নঃ

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য

[আষাঢ়, ১৩৯২ সংখ্যার পর]

১৬। মহী পাদাঘাতাদ্ ব্রজতি সহসা সংশয়পদং
পদং বিষ্ণোর্ভ্রাম্যদ্ভুজপরিঘরুগ্নগ্রহগণম্।
মুহুর্দ্যৌর্দৌস্থ্যং যাত্যনিভৃতজটাতাড়িততটা
জগদ্রক্ষায়ৈ ত্বং নটসি নন্থ বামৈব বিভুতা ॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : হে ঈশ ! জগদ্রক্ষায়ৈ ত্বং নটসি (নৃত্যসি) (সন্ধ্যায়াং জগন্তি জিঘাংসন্তং বরলব্ধং তৎকালবলং মহারপক্ষসং নিজতাণ্ডবেন মোহয়সীত্যর্থঃ)। ত্বং তু জগতাং রক্ষায়ৈ নটসি জগন্তি তু ত্বত্তাণ্ডবেন সংশয়িতানি ভবন্তীত্যাহ— মহী (তব) পাদাঘাতাৎ (চরণাঘাতাৎ) সহসা সংশয়পদং ব্রজতি। বিষ্ণোঃ পদম্ (আকাশম্) ভ্রাম্যদ্ভুজপরিঘরুগ্নগ্রহগণম্ [ভ্রাম্যদ্ভিঃ ভুজরূপ পরিঘৈঃ (আঘাতৈঃ) রুগ্নাঃ (পীড়িতাঃ) গ্রহগণাঃ যত্র তৎ তথা] তথা দ্যৌঃ (স্বর্লোকঃ) অনিভৃতা (অসংবৃতা) যা জটাস্তাভিঃ তাড়িতং তটং (প্রান্তদেশং) যস্যাঃ সা তথা মুহুঃ দৌস্থ্যং (দুঃস্থত্বং) যাতি। নন্থ বিভুতা (পরমমহত্তা প্রভুতা) বামা এব (প্রতিকূলৈব) ভবতি। (অনুকূলমাচরত্যপি কিঞ্চিৎ প্রতিকূলমাচরন্তীত্যেব শব্দার্থঃ)

ভাবানুবাদ : হে ত্রিপুরহর ! তোমার প্রলয়-নৃত্যের প্রতি পদক্ষেপে পৃথিবী ধ্বংসোন্মুখ হইয়া সংশয়াপন্ন হইয়া থাকে। আকাশে ভ্রমণশীল গ্রহ-গণ লৌহমুদ্গর সদৃশ তোমার বাহুদ্বয়ের আঘাতে রুগ্ন হইয়া পড়ে। পুনঃ পুনঃ জটা তাড়িত হইয়া আকাশ শ্রীহীন হইয়া যায়। এইভাবে জগৎরক্ষার জন্য তুমি নৃত্য করিয়া থাক। তোমার ধ্বংসশীল নৃত্য জগতের মঙ্গলের জন্যই হইয়া থাকে। এই-খানেই তোমার অলোকসামান্য প্রভুত্ব।

১৭। বিয়দ্ব্যাপী তারাগণগুণিত ফেনোদ্গমরুচিঃ
প্রবাহো বারাং যঃ পৃষতলঘুদৃষ্টঃ শিরসি তে।
জগদ্ দ্বীপাকারং জলধিবলয়ং তেন কৃতমি-
ত্যনেনৈবোন্নেয়ং ধৃতমহিমদিব্যং তব বপুঃ ॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : বিয়দ্ব্যাপী (আকাশব্যাপী) তারাগণগুণিত ফেনোদ্গমরুচিঃ [তারাগণেন (নক্ষত্রবৃন্দেন) গুণিতা (শুভ্রত্বাদি গুণ সজাতীয়ত্বাৎ বর্ধিতা) ফেনোদগমরুচিঃ যস্য সঃ] বারাং প্রবাহঃ তে শিরসি পৃষতলঘুদৃষ্টঃ (পৃষতাদ্বিন্দোরপি লঘুরল্পতরঃ পৃষতলঘুঃ স এব দৃষ্টঃ আলোকিতঃ। তেন জলধিবলয়ং জগদ্ দ্বীপাকারং কৃতম্ ইতি অনেনৈব ধৃতমহিমদিব্যং বপুঃ উন্নেয়ম্।

ভাবানুবাদ : প্রলয়কালীন নৃত্যের সময় তোমার মস্তকস্থিত জটার মধ্যে বিশাল জলপ্রবাহ জল-বিন্দুবৎ দৃষ্ট হইতেছিল এবং তারাগণ ফেনার ন্যায় শোভাসম্পন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছিল। সেই জলবিন্দুই দ্বীপাকার জগৎকে জলধিরূপে বেষ্টন করিয়াছিল। এইভাবে তোমার বপু সুন্দর মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া উন্নীত হইয়াছিল। ইহা দ্বারাই তোমার দেহের মহত্ত্ব ও বিশালত্ব সম্যগ্-রূপে অনুমিত হয়।

১৮। রথঃ ক্ষৌণী যন্তা শতধৃতিরগেন্দ্রো ধনুরথো
রথাঙ্গে চন্দ্রার্কৌ রথচরণপাণিঃ শর ইতি।
দিধক্ষোস্তে কোঽয়ং ত্রিপুরতৃণমাড়ম্বরবিধি-
র্বিধেয়ৈ ক্রীড়ন্ত্যো ন খলু পরতন্ত্রাঃ প্রভুধিয়ঃ ॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : হে ত্রিপুরহর ! ত্রিপুরতৃণং দিধক্ষোঃ তব কোঽয়মাড়ম্বরবিধিঃ ত্রয়াণাং পুরাণাং সমাহারঃ ত্রিপুরং তদেব তৃণম্ অনায়াসেন নাশ্যত্বাৎ তদ্দগ্ধুমিচ্ছতঃ তব কোঽয়ং মহৎ প্রয়োজনমুদ্দিশ্য ইব সম্ভ্রমরচনা নহি। অল্পে প্রয়োজনে ন মহান্ প্রয়াসঃ উচিতঃ ইত্যর্থঃ। রথঃ ক্ষৌণী (পৃথিবী), যন্তা (সারথী) শতধৃতিঃ

(ব্রহ্মা), অগেন্দ্রঃ (পর্বতশ্রেষ্ঠঃ মেরুঃ) ধনুঃ অথো রথাঙ্গে (রথচক্রে) চন্দ্রার্কৌ (সূর্যাচন্দ্রমসৌ) রথচরণপাণিঃ (চক্রপাণিঃ বিষ্ণুঃ) শরঃ ইতি। ত্রিপুরতৃণম্ (ত্রিপুররূপতৃণম্) দিধক্ষোঃ (দগ্ধুমিচ্ছোঃ) তে কোঽয়ম্ আড়ম্বরবিধিঃ ? আড়ম্বরবিধিনা অলম্ ইত্যর্থঃ। বিধেয়ৈঃ (স্বাধীনপদার্থৈঃ) ক্রীড়ন্ত্যঃ প্রভুধিয়ঃ (ঈশ্বরস্য বুদ্ধয়ঃ) ন খলু পরতন্ত্রাঃ (পরাধীনাঃ)।

ভাবানুবাদ : ত্রিপুরাসুরকে বধ করিবার সময় পৃথিবী তোমার রথ হইয়াছিল, ব্রহ্মা সেই রথের পরিচালক হইয়াছিলেন, পর্বতশ্রেষ্ঠ মেরু ধনুকের কার্য করিয়াছিলেন, রথের অঙ্গের শোভাবর্ধন করিয়াছিলেন সূর্য ও চন্দ্র, ভগবান্ বিষ্ণু ধনুকের শরের কার্য সম্পন্ন করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ত্রিপুরাসুরকে তৃণের ন্যায় দগ্ধীভূত করিবার জন্য হে শিব ! তুমি কত না অনায়াসেই এত আড়ম্বর করিয়াছিলে !! যাঁহারা সর্বাধীশ, তাঁহারা বশীভূত ব্যক্তিগণ দ্বারা কার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা কখনও পরাধীন হন না।

১৯। হরিস্তে সাহস্রং কমলবলিমাধায় পাদয়োর্যদেকোনে তস্মিন্ নিজমুদহরন্নেত্রকমলম্।
গতো ভক্ত্যুদ্রেকঃ পরিণতিমসৌ চক্রবপুষা
ত্রয়াণাং রক্ষায়ৈ ত্রিপুরহর জাগর্তি জগতাম্॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : হরিঃ তে পাদয়োঃ সাহস্রং কমলবলিম্ [সহস্রসংখ্যক পরিমাণকমলানাং (পদ্মানাং) বলিম্ (উপহারং)] আধায় (সমর্প্য) তস্মিন্ একোনে সতি (একেন কমলেন ভক্তিপরীক্ষার্থং ত্বয়া গোপিতেন হীনে সতি) যৎ নিজং নেত্রকমলম্ উদহরৎ (উৎপাটিতবান্)। অসৌ ভক্ত্যুদ্রেকঃ (ভক্তেঃ সেবায়াঃ অত্যন্তপ্রকর্ষঃ) চক্রবপুষা (সুদর্শনরূপেণ) পরিণতিং গতঃ। (সঃ সুদর্শনঃ) ত্রয়াণাং জগতাং রক্ষায়ৈ জাগর্তি (ত্রিজগৎ রক্ষায়ৈ তৎপালনার্থং সাবধান এব বর্ততে)। সৌরপুরাণে দৃশ্যতে যৎ পুরা জালন্ধর নামাসুরবধার্থে যঃ ভূম্যাং চরণাঙ্কিতেন চক্রং মহেশেন সৃষ্টং তদেব দেবাসুর সংগ্রামেঽসুরবধার্থং বিষ্ণুভক্ত্যা সন্তুষ্টো মহেশো বিষ্ণবে দত্তবান্।

ভাবানুবাদ : ভগবান শ্রীহরি তোমার পাদপদ্মে সহস্রকমল অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদান করিতে অগ্রসর হইলে একটি পদ্ম কম পড়িয়া যাওয়ায় নিজ নয়নপদ্ম তোমার চরণে বলিরূপে সমর্পণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ভগবানের ভক্তির আতিশয্যের সীমা জগৎ রক্ষার জন্য এইখানে চক্ররূপে পরিণতি লাভ করিয়াছিল অর্থাৎ ঐ সেবার অত্যন্ত প্রকর্ষ চক্রমূর্তিতে পরিণত হইয়া ত্রিজগৎ রক্ষার নিমিত্ত সর্বদা বিষ্ণু করে বর্তমান রহিয়াছে।

২০। ক্রতৌ সুপ্তে জাগ্রৎ ত্বমসি ফলযোগে ক্রতুমতাং
ক্ব কর্ম প্রধ্বস্তং ফলতি পুরুষারাধনমৃতে।
অতস্ত্বাং সংপ্রেক্ষ্য ক্রতুষু ফলদানপ্রতিভুবং
শ্রুতৌ শ্রদ্ধাং বদ্ধা দৃঢ়পরিকরঃ কর্মসু জনঃ॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : ক্রতুমতাম্ (যাগাদি কর্মকারিণাম্) ক্রতৌ (যাগাদিকর্মণি) সুপ্তে (লীনে, স্বকারণে সূক্ষ্মরূপতাং প্রাপ্তে ধ্বস্তে সতি বা) ত্বং (তেষাং যজ্ঞকারিণাম্) ফলযোগে (যাগকর্মকরণফলদান-প্রসঙ্গে) জাগ্রৎ অসি (প্রবুদ্ধ এব বর্তসে)। পুরুষারাধনমৃতে (ঈশ্বরারাধনং বিনা) প্রধ্বস্তং (বিনষ্টম্) ক্ব কর্ম ফলতি ? অতঃ ক্রতুষু ফলদান প্রতিভুবং (ফলদানায় লগ্নকমিব) ত্বাং সংপ্রেক্ষ্য শ্রুতৌ শ্রদ্ধাং বদ্ধা কর্মসু জনঃ দৃঢ়পরিকরঃ (দৃঢ়ভাবেন কৃতপরিকরঃ অর্থাৎ কৃতোদ্যমঃ ভবতি)। কশ্চিৎ উত্তমর্ণঃ প্রমাণনিশ্চিতং দীর্ঘকালাবস্থানং স্বধনার্পণ সমর্থং কঞ্চিৎ প্রতিভুবং নিরূপ্য অধমর্ণে পলায়িতে মৃতে বা এতস্মাদেব কুশলিনঃ প্রতিভুবঃ সকাশাৎ স্বধনং প্রাপ্স্যামি ইতি অভিপ্রায়েণ যস্মৈ কস্মৈ চিৎ অধমর্ণায় ঋণং প্রযচ্ছতি তদ্বৎ অধমর্ণস্থানীয়ে যজ্ঞকর্মণি প্রলীনেঽপি পরমেশ্বরাদেব প্রতিভূস্থানীয়াদেব ফলং প্রাপ্স্যামি ইতি

অভিপ্রায়েণ উত্তমর্ণস্থানীয়ো যজমানঃ নিঃশঙ্কমেব কর্ম অনুতিষ্ঠতি ইতি ভাবঃ (মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকানুসরণে লিখিতম্)।

ভাবানুবাদ : যজ্ঞ সম্পাদনকারিগণের যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে তুমি সেই যজ্ঞ রক্ষা করিতে প্রস্তুত থাকিয়া যজ্ঞেশ্বররূপে যজ্ঞকর্তাকে যজ্ঞের ফল দান করিতে সজাগ থাক। যজ্ঞেশ্বরকে আরাধনা না করিলে প্রণষ্টযজ্ঞ ফলদান করিতে পারে কি? যজ্ঞফল দান করিতে তুমি প্রতিনিধি (প্রতিভূ) রূপে বর্তমান থাকায় জনসাধারণ বেদসম্মত আচারাদি-যুক্ত কর্ম করিতে সর্বদাই দৃঢ়পরিকর হইয়া থাকে।

২১। ক্রিয়াদক্ষো দক্ষঃ ক্রতুপতিরধীশস্তনুভৃতা-
মৃষীণামার্ত্বিজ্যং শরণদ সদস্যাঃ সুরগণাঃ।
ক্রতুভ্রংশস্ত্বত্তঃ ক্রতুফলবিধানব্যসনিনো
ধ্রুবং কর্তুঃ শ্রদ্ধা বিধুরমভিচারায় হি মখাঃ॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : ক্রিয়াদক্ষঃ দক্ষঃ, ক্রতুপতিঃ, তনুভৃতাম্ অধীশঃ (প্রজাপতিত্বাৎ) ঋষীণাম্ আর্ত্বিজ্যম্ (ঋত্বিগত্বম্), সদস্যাঃ (সভ্যাঃ, উপদেষ্টারঃ) সুরগণাঃ। হে শরণদ! এতাদৃশ সর্বসামগ্রী সম্পত্তাবপি ক্রতুফলবিধানব্যসনিনঃ (যজ্ঞফল নিষ্পাদনকার্যে নিষ্ঠাপরায়ণজনাৎ) ত্বত্তঃ ক্রতুভ্রংশঃ (অভবৎ)। শ্রদ্ধাবিধুরং (ভক্তি-রহিতানুষ্ঠিতাঃ) মখাঃ (যজ্ঞাঃ) কর্তুঃ অভিচারায় (ধ্বংসায়, নাশায়) ধ্রুবম্ (নিশ্চিতম্)।

ভাবানুবাদ : যজ্ঞপতি প্রজাধীশ যজ্ঞক্রিয়ানিপুণ দক্ষ, ঋষিগণের পৌরোহিত্য, সদস্য দেবতা সকল বর্তমান থাকিলেও যজ্ঞনিয়মবিরোধী তাঁহাদের সমক্ষেই দক্ষের যজ্ঞ তুমি ধ্বংস করিয়াছিলে। ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, যজ্ঞেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন না হইলে যজ্ঞে বিঘ্ন সমুপস্থিত হইবেই।

২২ প্রজানাথং নাথ প্রসভমভিকং স্বাং দুহিতরং
গতং রোহিদ্‌ভূতাং রিরময়িষুমৃষস্য বপুষা।
ধনুষ্পাণের্যাতং দিবমপি সপত্রাকৃতমমুং
ত্রসন্তং তেঽদ্যাপি ত্যজতি ন মৃগব্যাধরভসঃ॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : হে নাথ! রোহিদ্‌ভূতাম্ (মৃগীভূতাম্) স্বাং দুহিতরম্ (সন্ধ্যাম্) রিরময়িষুম্ ঋষস্য বপুষা গতং (প্রাপ্তম্) অভিকং (কামুকম্) সপত্রাকৃতম্ (শরতাড়িতম্) (সহ পত্রেণ শরং শরীরে প্রবেশ্যাতিব্যথাং নীতঃ সপত্রাকৃতস্তাদৃশমি-বাত্মানং মন্যমানং রূপকমেতৎ) প্রসভম্ (হঠেন, অনিচ্ছন্তমপি) ত্রসন্তং দিবম্ যাতম্ অপি (প্রজানাথম্) ধনুষ্পাণেঃ তে মৃগব্যাধরভসঃ (মৃগহত্যায়ামুৎসাহাতিরেকঃ) অদ্যাপি ন ত্যজতি। ব্রহ্মা স্বদুহিতরম্ সন্ধ্যামতিরূপিণীমালোক্য কাম-বশো ভূত্বা তাম্ উপগন্তুমুদ্যতঃ। সা চায়ং পিতা ভূত্বা মামুপগচ্ছতীতি লজ্জয়া মৃগরূপা বভূব। ততস্তাৎ তথা দৃষ্টা ব্রহ্মাপি মৃগরূপং দধার তচ্চ দৃষ্ট্বা ত্রিজগন্নিয়ন্তা শ্রীমহাদেবেনায়ং প্রজানাথঃ ধর্ম-প্রবর্তকো ভূত্বাপ্যেতাদৃশং জুগুপ্সিতমাচরেতীতি মহত্যপরাধে দণ্ডনীয়ঃ ময়া ইতি পিনাকমাকৃষ্য শরঃ প্রক্ষিপ্তঃ ততঃ স ব্রহ্মা ব্রীড়িতশ্চ সন্ মৃগশিরো নক্ষত্ররূপো বভূব ততঃ শ্রীরুদ্রস্য শরোঽপি আর্দ্রা নক্ষত্ররূপো ভূত্বা তস্য পশ্চাদ্ভাগে স্থিতঃ তথা চাদ্যামৃগশিরসো সর্বদা সন্নিহিতত্বাদদ্যাপি ন ত্যজতীত্যুক্তম্।

ভাবানুবাদ : প্রজাসৃষ্টিকারী ব্রহ্মা কামাসক্ত হইয়া মৃগদেহধারিণী স্বীয় দুহিতার পশ্চাদনুসরণ করিলে হে শিব! তুমি ধনুতে শর নিক্ষেপ পরায়ণ হইয়া স্বর্গেতেও সভীতচিত্ত ব্রহ্মার অনুসরণ করিয়াছিলে। আজ পর্যন্তও ব্যাধ মৃগের পশ্চাদনুসরণতার ভাব ত্যাগ করিতে সক্ষম হয় নাই। [ক্রমশঃ]

শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার

স্বামী অলোকানন্দ

বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে নিযুক্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে এসেছেন বহুধরনের মানুষ। কত উকিল, ব্যারিস্টার, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, বরেণ্য জ্ঞানিগুণী ভক্ত সজ্জনেরা ছুটে এসেছেন 'রসের সন্ধানে'। রানী রাসমণির কালীবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণরূপী মনোমুগ্ধকর কুসুমটি সবারই আকর্ষণের বস্তু। তিনি কিন্তু নিত্যই বলেছেন: কি জানি বাপু, আমি তো কিছুই জানি না। নিরভিমান শ্রীরামকৃষ্ণকে তাই অসাধারণ কিছু মনে করা সম্ভব হয়নি সাধারণ মানুষের পক্ষে। তবুও কিছু রসিক মানুষের দৃষ্টি এড়াতে পারলেন না। সেই সব রসিক-কুলের মধ্যে তৎকালীন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক তথা বঙ্গদেশে আধুনিক বিজ্ঞান-গবেষণার যিনি পুরোধা সেই ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার হলেন অন্যতম।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন শ্যামপুকুর বাড়িতে চিকিৎসার জন্য অবস্থান করছেন তখনই চিকিৎসা-সূত্রে মহেন্দ্রলাল এসে পড়েন তাঁর কাছে। অবশ্য মথুরবাবুর জীবিতকালে তিনি দক্ষিণেশ্বর কালী-বাড়িতে এসেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণকেও দেখে-ছিলেন; কিন্তু তখন ঘনিষ্ঠতা হয়নি। মহেন্দ্র-লালের তখনকার জীবনধারা অন্যখাতে বইছিল। অবশ্য মহেন্দ্রলাল আবাল্য দৃঢ়চেতা, বিচারপ্রবণ ও নির্ভীক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। জীবনে বহু কৃতিত্বের কাজ তিনি করে গেছেন।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে সসম্মানে এম. ডি. পাশ করেও পরে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল দত্তের প্রেরণায় হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করেন এবং পরবর্তী জীবনে তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ হোমিওপ্যাথ রূপে বিখ্যাত হয়েছিলেন। অ্যালোপ্যাথি থেকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় আসার জন্য তাঁকে বহু সমালোচনা শুনতে হয়, কিন্তু সত্যনিষ্ঠ সাধক মহেন্দ্রলাল নিজের স্বভাব গুণেই সেই সমস্তকে উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন। তিনি 'Calcutta Journal of Medicine' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। দেশ-বাসীর বিজ্ঞানচর্চার সুবিধার্থে তিনি 'Indian Association for the cultivation of Science' সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আবার কোন সময়ে কলকাতার সেরিফ্‌ ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যও হয়েছিলেন।

এইরূপ বিবিধ গুণাবলী সমন্বিত মানুষটি যখন শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে এলেন তখন তাঁর অন্তরের আসল উৎসটির হল উদ্ঘাটন। যুক্তি-বিজ্ঞানে নিপুণ ডাক্তার সরকার যখন ভক্ত পরিবেষ্টিত ঠাকুরকে দেখলেন, তখন ভক্তদের ভক্তি, ঠাকুরকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে পূজা, তাঁর পদধূলি গ্রহণ ইত্যাদিকে কিছুটা আতিশয্য বলেই মনে হয়েছিল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামপুকুর বাড়িতে প্রথম দর্শন দিনে ডাক্তার-রোগী সম্পর্কের মধ্য দিয়েই সাক্ষাৎকার পর্ব শেষ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় দিন থেকেই সম্পর্ক বা অবস্থার পরিবর্তন দেখা দেয়। চাপা পড়ে থাকা ফোয়ারার মুখ নিপুণ কারিগরের হাতে পড়ে উন্মোচিত হয়। সত্য-সঙ্কল্প, দৃঢ়চেতা মহেন্দ্রলাল নিজেকে একটু একটু করে শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে সমর্পণ করেন। নিত্যই বিচারের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরতে গিয়ে বারে বারে পরাস্ত হয়ে স্তম্ভিত হয়ে যান। ডাক্তারীর বাঁধাধরা নিয়মকানুন সব চলে যেতে লাগল। অন্যান্য সব রোগী ফেলে এসে শ্রীরাম-কৃষ্ণের মধুর সান্নিধ্যে ডাক্তার সরকারের ঘণ্টার

পর ঘণ্টা কেটে যায়। এ যেন কি এক শক্তিশালী চুম্বকের আকর্ষণ! জীবনে বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, দৃঢ় নিয়মানুবর্তী মানুষটি যেন কি এক অপার্থিব আকর্ষণে নিজের অমূল্য সময় নষ্ট করতেও দ্বিধা-বোধ করছেন না। এমনি একদিন সময় চলে যাচ্ছে দেখে গিরিশবাবু সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন —'আপনি এখানে তিন-চার ঘণ্টা রয়েছেন, কই রোগীদের চিকিৎসা করতে যাবেন না?' শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপী কর্মনাশা নদীতে সন্তরণশীল ডাক্তার তখন জবাব দিয়েছিলেন—'আর ডাক্তার! আর রোগী! যে পরমহংস হয়েছে, আমার সব গেল!'

বাড়ি ফিরে গিয়েও চলতে থাকে সেই এক ঠাকুরেরই চিন্তা। ভুলতে পারেন না। এখানে বাপ ছেলের হাত ধরে আছে, তাই পড়বারও কোন ভয় নেই। কথাপ্রসঙ্গে একবার ডাক্তার সরকার বলেছিলেন—'মহাশয়! রাত তিনটে থেকে পরমহংসের ভাবনা আরম্ভ হয়েছে—ঘুম নাই। এখনও পরমহংস চলছে।'

ঠাকুরের সরলতা প্রভৃতি গুণে আকৃষ্ট হলেও মহেন্দ্রলালের যুক্তিবাদী মন অধ্যাত্মরাজ্যের ভাব, সমাধি প্রভৃতিকে মূর্ছারোগ ব্যতীত উচ্চপর্যায়ের কিছু ভাবতে তখনও অপারগ ছিল। কিন্তু কাল পূর্ণ হল ১৮৮৫-র শারদীয়া মহাপূজার সন্ধিক্ষণে। সেদিন মহেন্দ্রলাল বিকাল চারটায় শ্যামপুকুরের বাড়িতে চিকিৎসা-সূত্রে উপস্থিত। নরেন্দ্রনাথ দেবীবিষয়ক ভজন গাইছেন। ঠাকুর মহেন্দ্র-লালকে গানের অর্থ বুঝিয়ে দিতে দিতে মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হচ্ছেন। ঠিক সন্ধিক্ষণে ঠাকুর গভীর সমাধিমগ্ন হলেন। যুক্তিবাদী ডাক্তার পরীক্ষার জন্য অগ্রসর হলেন। অপর এক ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে ঠাকুরের হৃৎস্পন্দনাদি পরীক্ষা করে চোখে আঙুল দিয়েও পরীক্ষা করলেন কিন্তু 'হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল, বাহিরে দেখিতে সম্পূর্ণ মৃতের ন্যায় প্রতীয়মান ঠাকুরের এই সমাধি সম্বন্ধে বিজ্ঞান কোনরূপ আলোক এখনও প্রদান করিতে পারে নাই; পাশ্চাত্য দার্শনিক উহাকে জড়ত্ব বলিয়া নির্দেশ ও ঘৃণা প্রকাশ পূর্বক নিজ অজ্ঞতা ও ইহসর্বস্বতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; ঈশ্বরের সংসারে এমন অনেক বিষয় বিদ্যমান, যাহাদের রহস্যভেদ দর্শন-বিজ্ঞান কিছুমাত্র করিতে সক্ষম হয় নাই—কোনও কালে পারিবে বলিয়াও বোধ হয় না' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩৩০)।

অন্য একদিন ভক্ত পরিবেষ্টিত শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিত মহেন্দ্রলাল নরেন্দ্রনাথের সুমধুর কণ্ঠে 'আমায় দে মা পাগল করে' ইত্যাদি গানটি শ্রবণরত ভক্তবৃন্দের ভাবাবস্থা দর্শন করে বিস্মিত হলেন। ভাব প্রশমিত হওয়ার পর ঠাকুর ডাক্তারকে বললেন—

'কেমন সমাধিভাব দেখিলে এখন ॥
অপরের চক্ষে নয় স্বচক্ষে দেখিলে।
তোমার বিজ্ঞানশাস্ত্রে ইহাকে কি বলে ॥
সায়েন্সেতে সমাধিকে কিবা নামে কয়।
ঢং কি যথার্থই ইহা প্রতীতি কি হয় ॥'

(শ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, পৃঃ ৬০৩)

উত্তরে ডাক্তার সরকার চরম পরাজয় স্বীকার করে বলেন—

'অনেকের হতেছে ঢং বলিব কেমনে ॥'

(ঐ)

এখন থেকে মহেন্দ্রলালের জীবনে পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে—তিনি সর্বদাই শ্রীরামকৃষ্ণ-চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন। পুঁথিকারের অনুপম ভাষায় বলা চলে—

'এখন বড়ই মুগ্ধ মজিয়াছে মন।
ডাক্তার ডাক্তার নাই পূর্বের মতন ॥'

'বৈজ্ঞানিক', 'গম্ভীরাত্মা' ডাক্তার এখন থেকে

শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে এক মুগ্ধ শ্রোতা। চিকিৎসা-সূত্রে উপস্থিত হয়ে নিজেই চিকিৎসিত হলেন ভবরোগবৈদ্যের কাছে। শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের প্রায় ১৮ বৎসর পর ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ ফেব্রুআরি মহেন্দ্রলাল লোকান্তরিত হন। জীবনের শেষাংশে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে প্রভূত অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাঁর একমাত্র পুত্র অমৃতলালও ঠাকুরের অশেষ কৃপালাভে ধন্য হন। মহেন্দ্রলাল সরকারের শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে আগমন বা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবে নিমজ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সূচিত হয়েছিল জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মধ্যে এক প্রেমবন্ধন। বিজ্ঞানের যুক্তি শেষ হতেই জন্মলাভ হয়েছিল ভক্ত মহেন্দ্রলালের। এ যেন ভবিষ্যৎ জগতে বিজ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয়ের ইঙ্গিত। মহেন্দ্রলাল সরকারই যেন এই সমন্বয়ের প্রতিভূ স্বরূপ হলেন।

প্যারিস পেরিয়ে

ডক্টর অমিয়কুমার হাটি

[আষাঢ়, ১৩৯২ সংখ্যার পর]

এক-এক জায়গার এক-এক নিয়ম। বেল্ট পরার কারণ, পথ দুর্ঘটনায় ছিটকে পড়ে আঘাত পাবার সম্ভাবনা কম—যা দ্রুত গাড়ি চলে ওখানে! পাশাপাশি দুটো পথ থাকে, সাদা দাগ মাঝখানে, একটা পথে ৮০ কিলোমিটার, আর-একটিতে ১২০ কিলোমিটার বেগে পুলিসও তৎপর থাকে। ১২০-র জায়গায় ১৩০ ওঠালেই ধরবে, পথেই জরিমানা। এত নিয়মকানুন করেও ইউরোপ-আমেরিকায় পথ দুর্ঘটনা দিন দিন বাড়ছেই। তার অন্যতম কারণ মদ খেয়ে গাড়ি চালানো। এদের এ অভ্যাসের ছোঁওয়া আমাদের দেশেও লেগেছে।

ক মিনিটই বা সময় লাগল স্টেশনে পৌঁছুতে! টিকিট কাটবার মতো যাত্রী বোধ হয় একা আমিই ছিলাম। আর যে ২।৪ জন এসেছেন এই ভোরে, তাঁরা ডেলি প্যাসেঞ্জার বলেই মনে হল

যদিও তাঁকে সাহেব বলে মনে হচ্ছিল, তাহলেও ভারতীয় কায়দায় আভূমি নত হয়ে প্রণাম করলাম। স্বামী ঋতজানন্দজী মৃদু স্পর্শ দিলেন। বললেন, "এখানে ওসব নিয়ম নেই। সাবধানে যেও।" পরে জেনেছি উনি দক্ষিণ-ভারতীয়।

স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়েই রইলেন। ট্রেন এল। উঠবার আগের মুহূর্তেও দেখলাম তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এখনও মাঝে মাঝে সেই দৃশ্য ভাসে মানসচক্ষে।

আমি কি মানুষ দেখলাম? না দেবতা? না মানুষ? এতখানি অভিভূত ইদানীংকালে হইনি। আমি কি যোগ্য ছিলাম? যোগ্য যদি নাও থেকে থাকি, তাহলে যোগ্য কি হতে পারব?

শীত আছে এই সাত সকালে, তবে বেশি নয়, আমাদের দেশের পৌষ-মাঘ মাসের মতো। অক্টোবরের শেষ। এবার শুরু হবে শীতের পালা। শীতের প্রকোপ সাংঘাতিক। যদিও ঢেল আধুনিক উপকরণ ঘরে, স্কুল-কলেজে শীতের হাত থেকে বাঁচার, তাহলেও প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে, শুধু ভারতীয়ই-বা কেন, শীতের দেশের

লোকেদের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে, শীত ওরা সহ্য করতে পারে না। তাই শীতের শুরুতেই গুনগুনানি শোনা যায়, শীত যদি এসে গেল, বসন্ত আর কত পিছনে থাকতে পারে ?

হুশ করে ছেড়ে দিল ট্রেন। লহমায় মিলিয়ে গেল গ্রেট.জ্। আমার কামরায় গোটা ২৫।৩০ যাত্রী। এ যেন কোন শীতের সকালের বর্ধমান-হাওড়ার ভোরের ট্রেন! সাহেব-মেমরা গুটিসুটি মেরে এ-কোণে ও-কোণে বন্ধ জানালার ধারে বসে কেউ ঘুমুচ্ছে, কেউ ঢুলছে, কেউ-বা প্রাকৃতিক শোভা দেখছে। আরে—এ-যে দেখি ঠিক আমাদের দিদিমণির মতন—এক মেম-সাহেব চোখ থেকে চশমা খুলে নিয়ে চশমার দু-দিকের কাচে কয়েকটা 'হা' দিলেন, তারপর রুমাল দিয়ে পরিপাটি করে মুছে চশমাটা পরলেন! দিদিমণি অবশ্য রুমালের বদলে চশমা মোছেন শাড়ীর খোঁটে।

প্যারিস পৌঁছে গেলাম। পৌঁছে গেলাম প্যারিসকে বিদায় জানাতে। গত রাতে স্বামী ঋতজানন্দজী বারবার বলে দিয়েছিলেন, স্টেশনে আসার পথেও আজ বলে দিয়েছেন, প্যারিস-এ ট্রেন থেকে নেমে কোন্ গেট পেরিয়ে কোন্‌দিকে গিয়ে বিমানবন্দর যাবার ৩৫০ নম্বর বাস ধরতে হবে।

কাজেই কোন অসুবিধে হল না—ভিড়েরও বালাই নেই, যাকে বলে বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসলাম একটা আসনে। তবে, বাস ছাড়ার পর মনটা উসখুস করে উঠল, কারণ দুটো। এখানে নিয়ম, বাসে উঠেই ভাড়াটা দিতে হয়, ভুলবশতঃ সেটা দিইনি। দ্বিতীয়তঃ, আশেপাশে সাহেব-মেম যাঁরা আছেন, 'পারলে আংলে' বলে আলাপ জমিয়ে আপাততঃ একটিই আমার জিজ্ঞাস্য, "ডি গল বিমানবন্দরে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ টার্মিনাস এলে দয়া করে আমাকে একটু বলে দেবেন কি ?" কারণ ওখানেই বাস থেকে নেমে আমাকে পরের বিমান ধরতে হবে। দুঃখ হচ্ছিল, কণ্ডাক্টর (একটি বাসে একজনই, সাহায্যকারীও আর কেউ থাকে না) চিড়িয়ামোড়, গোলপার্ক বা থিয়েটার রোড বলে তারস্বরে কেন চেঁচান না! বাস-ট্যাক্সি-গাড়ি নিস্তব্ধতার এরকম প্রতীক হলে চলে কী করে? কানের পর্দা-ফাটানো বারবার বিকট হর্ন নেই, রোকো রোকো নেই, বাসের উৎকট আওয়াজ নেই, এসপ্ল্যানেড থেকেই কলেজ স্ট্রিট-চিড়িয়ামোড়-ডানলপ বলে খোলা বাজারের মতো পরিত্রাহি ডাক নেই, বাসের ভিতর ঝগড়া নেই, নেই অশোভন, অশালীন কোন আচরণ! নেই জোরে ছোটো বলে তাগাদা। পরিবেশ এদের সহিষ্ণু করে তুলেছে, আর আমরা কত অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছি!

আমার দিনটি ভালই যাবে বুঝি! এক ভদ্রমহিলা উঠলেন, আমারই পাশে বসলেন, এবং জানলাম, তিনিও নামবেন ব্রিটিশ এয়ার-ওয়েজ টার্মিনাসে। অতএব নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কিন্তু টিকিট কাটা? ২।৩ বার এগিয়ে গিয়েও ব্যর্থ হলাম, কণ্ডাক্টর কোন আমলই দিতে চাইলেন না। অথচ ভীড় তো তেমন বেশি নেই! ভাষাও বুঝতে পারছি না, বোঝাতেও পারছি না। একি! এ-যে এসেই গেল নামবার জায়গা! ভদ্রমহিলা ইঙ্গিত করলেন, নিজে এগিয়ে চললেন, নামতে হবে। পকেট থেকে ফ্রাঁ বের করলাম। তাও কণ্ডাক্টর নিলেন না, ইঙ্গিতে বোঝালেন, তাড়াতাড়ি নেমে পড়তে। ব্যাপারটা কি? সঠিক জানারও উপায় রইল না—ভাষা চালাচালি করা যাবে না বলে। সব স্বভাব না মিললেও, ২।১টা স্বভাবে হয়তো মেলে আমাদের দেশের কণ্ডাক্টরদের সঙ্গে। বারবার টিকিট চাওয়ার তাগাদা নাই বা থাকল, তাড়ার

তাগাদা হয়তো আছে, তাই কি এই টিকিট না কাটা? সে যাই হোক, ফ্রান্সের কাছে বিদায়ের দিনে ঋণী থেকে গেলাম গোটা ত্রিশ টাকার মতো।

বিশাল এলাকা নিয়ে প্যারিসের উপকণ্ঠে ডি গল বিমানবন্দর। যত বিমানবন্দর দেখেছি, সব থেকে মনে হল সুন্দর। ভিতরে ঢুকলাম। ভিড় সেরকম নেই। কিন্তু নার্ভাসনেস্-টি যাবে কোথায়? আমার অবস্থা দেখে আমারই বয়সী এক সহৃদয় আমেরিকান দেখিয়ে দিলেন কোথায় ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ-এর কাউন্টার। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ-এর বিমানেই প্যারিস পেরিয়ে লণ্ডনের বিমানবন্দর হিথরো-তে নামব। তবে সঙ্গে সঙ্গে বিমান বদল করে পাড়ি দেব নিউইয়র্ক, ফেরার পথে থাকব কয়েকদিন লণ্ডনে।

আমেরিকান ভদ্রলোক এত সহৃদয় যে, আমার দুহাতে দুটো মোট দেখে একটা নিজে বইতে চাইলেন; অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁকে বাধা দিলাম।

গোলাকার কাঠামোর এই অতি আধুনিক বিমানবন্দরটি কারুশিল্পেরও এক অপরূপ নিদর্শন। ৩০।৩১টা গেট। সবগুলো একরকম। উঠে যাওয়া গোলাকার একটা পথে এসকালেটর বেয়ে যেতে হবে উপরে, ক তলা কে জানে, বিমান ধরতে। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সাজাবার কায়দাতেও আছে রুচির পরিচয়।

সময় হাতে ছিল অঢেল। যা যা করণীয়, ধীরে ধীরে শেষ করলাম। ফ্রাঁ ভাঙিয়ে আবার ডলার নিলাম। বিমানের টিকিট দেখালাম, বোর্ডিং পাশ পেলাম অর্থাৎ বিমানে ওঠার ছাড়-পত্র। দুটো মালই দুহাতেই রইল, এখানে এটুকু ওরা কিছু মনে করে না।

নিজেকে বেশ বড় গোছের কেউকেটা ভি. আই. পি.-ভি. আই. পি. মনে হচ্ছিল সময় সময়। একই দিনে পৃথিবীর তিনটে উল্লেখযোগ্য শহরে পায়ের ধুলো দিচ্ছি—প্রাতরাশ সারছি প্যারিসে, দুপুরে লণ্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে ক্ষণিক বিশ্রাম, তার কিছু পরেই, বেলা থাকতেই নিউইয়র্ক রাতের আহারটা হবে আজ ওখানেই একেই বলে থ্রিল…উত্তেজনা!

এতকাল দেশে, বা দেশ থেকে প্যারিস অবধি আমাদের দেশীয় বিমানেই চেপেছি—যথাক্রমে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস বা এয়ার ইণ্ডিয়াতে। প্যারিস থেকে হিথরো—ছোট, এই ঘণ্টাখানেকের যাত্রা, কিন্তু ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ-এর বিমানে। তুলনামূলকভাবে দেখলে সারা দুনিয়ায় এয়ার ইণ্ডিয়ার কোন তুলনা নেই সত্যিই—মনে হয় সেরা। আকাশবালাদের পেলব মুখগুলিতে ভারতীয় মায়া মাখানো, আতিথেয়তাও অতুলনীয়, ব্যবহারও খুব ভাল, খাবারদাবার একেবারে প্রথম শ্রেণীর। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ-এ একটু ঠাণ্ডা পানীয় পর্যন্ত দিল না—ব্যবহারে পেলাম না আন্তরিকতার ছোঁওয়া, কেমন যেন ব্যবসা ব্যবসা ভাব—বেনিয়ার জাত বলেই কি? অন্য যে-কোন দেশের বিমানপথের তুলনায় ভারতীয় বিমানে যাতায়াত বেশি আরামপ্রদ, প্রীতিপ্রদ, যেন আত্মীয়তার সূত্র গড়ে ওঠে, শুধু ভারতীয়রাই নন, অন্য দেশের লোকেরাও অনেকেই এটা স্বীকার করেন, জানেন। এয়ার ইণ্ডিয়ার ব্যবসাও তাই ভাল, এটি একটি বেশ লাভ-জনক সংস্থা।

৯

আমার কাছে পকেটে একটা কাগজে বিভিন্ন দিন বিমানে নামা-ওঠার যে সময়সূচী ছিল, সেটা দেখতে গিয়ে চোখ কপালে উঠল, সারা শরীর হিম হয়ে এল, ভি.আই.পি.-ভি.আই.পি. ভাবটা একেবারে উবে গেল।

তখন ইংলিশ চ্যানেলের উপর দিয়ে বিমান উড়ে চলেছে।

কিন্তু একি? আমার ট্রাভেল এজেণ্ট যে আমাকে একেবারে ডোবাবার বন্দোবস্ত করেছে! হিথরো বিমানবন্দরে এ বিমান নামবে পৌনে একটায়। অথচ সময় সারণীতে লেখা দেখছি, নিউইয়র্ক যাবার বিমান ধরতে হবে ঠিক একটায়। সে আবার এয়ার ইণ্ডিয়ার উড়ো-জাহাজ। টিকিট দেখলাম, তাতেও তাই লেখা। এতো মহা বিপদ! যত ভি. আই. পি. যেই হোক না কেন, ১৫ মিনিটে এরকম বিমান বদল কোন রকমেই সম্ভব হতে পারে না। কী হবে তাহলে? এসবের বেলায় নিয়মকানুনই বা কী? উসখুস শুরু করলাম।

—"কী হল তোমার?" শুধালেন পাশের ভদ্রলোক। আমেরিকান সাহেব।

খুব সহৃদয়। যাবেন নিউইয়র্ক। থাকেন সেখানেই। তবে তার আগে লণ্ডনে কয়েকদিন কাটাবেন। ব্যবসায়ী। কিন্তু যখন জানলেন, একজন শিক্ষক আমি, তখন থেকেই ব্যবহারটা বদলে গেল, বেশ সম্ভ্রমপূর্ণ। আক্ষেপ করে-ছিলেন, উনি যখন নিউইয়র্ক যাবেন, তখন আমি সেখান থেকে লণ্ডন পাড়ি দেব। নাহলে ওখানে একদিন আমি যেতে পারতাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে!

ওঁর প্রশ্নে আমি আমতা আমতা করি।

"তুমি বেশ একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছ মনে হচ্ছে। কিন্তু কেন?"

আমার সমস্যার কথা বললাম। টিকিটটা দেখালাম ওঁকে।

মুখে একটা কৌতুককর হাসি ফুটে উঠল।

—"হাসছ? কী হবে আমার? আজ তো নিউইয়র্কের বিমান ধরা যাবে না। আমি জানব কী করে? ভুল বা দোষ তো আমার ট্রাভেল এজেণ্টের। এ-ধরনের সমস্যা দেখা দিলে নিয়মকানুনই বা কি?"

—"তোমার ট্রাভেল এজেণ্ট কোন ভুল বা দোষ করেনি। ঠিকমতো যোগাযোগ করে বরং সময় বাঁচিয়েছে তোমার।"

—"কী রকম?"

—ফ্রান্সের সময় আর ইংলণ্ডের সময় আলাদা। আমরা তো ফ্রান্সের সময় অনুযায়ী একটা নাগাদ নামব হিথরোতে, তখন ইংলণ্ডের সময় ১১-৩০টা মাত্র। কাজেই আরও পুরো দেড়ঘণ্টা সময় পাবে তুমি প্রফেসর, নিউইয়র্কের বিমান ধরার জন্যে।

তখনও কৌতুকে চিকচিক করছে তাঁর চোখ-দুটো। হয়তো আমি শিক্ষক বলেই আমার সামনে হো-হো করে হাসলেন না।

এই তো পাশাপাশি দুটো দেশ। তাদের সময়ের যে এতখানি তফাত কে জানত! অবশ্য হতেই পারে। বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের সময়ের তফাতই তো আধঘণ্টা।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। অনেক অনেক ধন্যবাদ জানালাম আমেরিকান ভদ্রলোকটিকে।

এসে গেছি হিথরো। লণ্ডন। দারুণ কর্মব্যস্ত বিমানবন্দর। মৃদু করমর্দন করে শুভেচ্ছা জানিয়ে সাহেব বিদায় নিলেন।

বিদেশে এরকম কত টুকরো টুকরো বিপদ বিরাট হয়ে মনের আকাশে ছায়া ফেলে। অথচ সব সময় সাহায্যের হাত যেন প্রসারিত আছে। অনেক অনেকবার অনেক বিচিত্র পরিস্থিতিতে পড়েছি, কিন্তু কোনটাই আসল বিপদ হয়ে দেখা দেয়নি। তবে, সদা সজাগ তো থাকতেই হবে!

হিথরো-তে আর-একটা ব্যাপার দেখলাম। সেটা হল ব্রিটিশদের কৌতুকপ্রিয়তা। এখানেও হেতু আমি। কিন্তু নিজেই খুব উপভোগ করেছি।

প্রথম ঘটনাটা ঘটল আমার ন্যাকড়ার স্যুটকেশটা ওজন করার সময়। মাত্র ৬ কেজি! যে মহিলা ওজন করছিলেন, খুব মনোযোগ দিয়ে স্যুটকেশে আঁটা কাগজে পড়লেন নাম, ধাম, কোথা থেকে কোথায় চলেছি। সব দেখে-শুনে নেড়েচেড়ে সবাইকে দেখিয়ে হেসে বললেন, "হাল্কা বেড়ানোর আদর্শ উদাহরণ!"

কী আর বলি! ধন্যবাদটা তো জানাতেই হয় এখানে কথায় কথায়। সেটা জানালাম তাঁকে, তার পরেই একটা প্রশ্ন করে বসলাম তাঁকে, "যদি কিছু মনে না করেন, ম্যাডাম, কখন পৌঁছুব নিউইয়র্ক?"

—"এইতো এখন ১২॥টা, আপনার বিমান ছাড়বে ঠিক একটায়, রোদ্দুর থাকতে থাকতে ৩॥টা নাগাদ পৌঁছে যাবেন, ডঃ হাটি, নিউইয়র্কে কেনেডি বিমানবন্দরে।"

এত কম সময়ে লণ্ডন থেকে নিউইয়র্ক? এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমানে উঠে বসে আবার জানতে চাই ওখানকার কর্মীদের কাছ থেকে—"কতক্ষণ উড়তে হবে আকাশে?"

—"৬ ঘণ্টা।"

—"তাহলে তো নিউইয়র্ক পৌঁছুব সন্ধ্যা ৭টায়!"

—"সেটা লণ্ডনের সময়, আসলে তখন নিউইয়র্কে বাজছে বিকেল ৩॥টা।"

ব্রিটিশ ভদ্রমহিলার নির্মল এ কৌতুক কখনও কি ভুলতে পারব?

আসলে আটলান্টিকের উপর দিয়ে জেট যুগের এটা ২৫তম বছর। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ অক্টোবর বি.ও.এ.সি-র জেট বিমানযাত্রা শুরু হয়। আগে সময় লাগত ডবল—১২ ঘণ্টা। এখন কনকর্ডে তিন ঘণ্টাতেও এ-পথ অতিক্রম করা যায় আকাশপথে।

৬ ঘণ্টার এই আকাশবিহার কিন্তু বেশ বিরক্তিকর। ভি.ডি.ও-তে সিনেমা শুরু হল—তো পুরানো বই—একই ফিল্ম দেখেছি—বোম্বাই থেকে রোম আসার সময়।

আমার পাশে ছিলেন এক ভারতীয় মহিলা ও তাঁর বাচ্চা ছেলে। ওঁরা বরোদার। কিন্তু চিকাগোতে আছেন ৬ বছর ধরে। ছোট ছেলেটি বমি করছিল। ওঁদের জায়গা দিতে পিছনে চলে এলাম, ঘুমুলাম একটু। কিন্তু ঠিক ঘুম-আসে না যেন। ভাসছিল, প্যারিসের ছবি —অ্যানেসি—গ্রেট্‌জ। ভাসছিল, আইফেল টাওয়ার। (এর ভিতরে যে ৯১১টি সিঁড়ি আছে পুরানো লোহার, ওজন যার প্রায় হাজার টন, সেগুলো খুলে নিলামে দেওয়ার কথা। গত সংখ্যায় মারাত্মক একটা ভুল ছিল অসাবধানতাবশতঃ—আইফেল টাওয়ার নীলামে দেওয়া হবে, ভাঙা হবে এইরকম—আসলে তা অবাস্তব এবং অসম্ভব। সিঁড়িগুলো খুললে আইফেল টাওয়ার অনেকটা ভারমুক্ত হবে, আর ৪টা লিফট করা হবে তার বদলে)। এবার যেখানে চলেছি, সেই নিউইয়র্কে কতখানি অনিশ্চয়তা যে আবার অপেক্ষা করছে, কে জানে! একঘেয়ে ক্লান্তিকর নিরবিচ্ছিন্ন আকাশে ওড়া আর ভাল লাগছে না একদম। কিন্তু অবচেতন মনে কেন এরকম একটা ভাব জাগছে যে, নিউইয়র্ক যত দেরিতে আসে, যত পরে নামা যায় ততই ভাল! কেন বিষণ্ণতা, বিমর্ষতা গ্রাস করতে চাইছে? দুটো ঠিকানা তো আছেই আমার কাছে, একটি নিউইয়র্কে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের এবং অপরটি কলকাতার বিখ্যাত এক ওষুধব্যবসায়ী লহরচাঁদ বাবুর গুরুদেব সুশীল মুনির আশ্রমের—নিউইয়র্ক সংলগ্ন স্ট্যাটেন আইল্যাণ্ডে। তবে, নিউইয়র্ক নাকি বিরাট—বিরাট বড় শহর, খুঁজে পাব তো সে-সব ঠিকানা? পৌঁছুতে পারব তো? ভয়টা কি সেইখানেই? সেইজন্যেই?

১০

নিউইয়র্ক বিমানবন্দরে পা দিয়েই একটা ভীষণ মজাদার পরিস্থিতিতে পড়লাম। একেবারে পুলিসের হাতে। সেটা আগে বলে নেওয়া দরকার।

কোন বিমানবন্দরে নামবার সময় বিদেশীদের একটা ফর্মে লিখিতভাবে জানাতে হয় সঙ্গে কী কী আছে। জামা, কাপড়, ক্যামেরা, বইপত্র এমন কি অবশিষ্ট একটু কফি ও চিঁড়েও আছে। সেটুকুই বা লিখব না কেন? দিলাম তো সব কিছু লিখে, তার জের যে এতটা গড়াবে, কে ভেবেছিল?

স্থটকেশটা সবে ছাড়িয়েছি, এমন সময় সামনে এক সিকিউরিটি অফিসার, আরক্ষা পুলিস, বিমানবন্দরের।

—"আপনার নাম ডঃ হাটি?"

—"হ্যাঁ?"

—"আপনি কি ব্যবসায়ী?"

—"না, কেন?"

এবার স্থটকেশে সাঁটা কাগজটায় চোখ পড়ল। জানলেন, শিক্ষক, কোন মেডিক্যাল কলেজের। তখন একটু সমীহ ভাব, "আপনি কি মশলাপাতি নিয়ে যাচ্ছেন?"

—"না-না তাও নয়, কেন বলুন তো?"

—"লেখা আছে আপনার জিনিসের তালিকায় কফি—আরও কী যেন—"

—"আধ প্যাকেট শুকনো কফি অবশ্যই আছে বাকিটা ফ্রান্সে খেয়েছি, খুলে দেখাব বাক্স? আরও আছে চারটি চিঁড়ে, মানে,"—চিঁড়েটা কী বস্তু বোঝাতে যাই—

"না-না—দুঃখিত, আপনি যেতে পারেন, কিছু মনে করবেন না।" বললেন পুলিসপ্রবর।

—"ধন্যবাদ।" সোজা এবার আরক্ষা বেড়ার বাইরে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে ঝলমলে রোদ। নিউইয়র্ক বিকেলেও যেন হাসছে। আমি কিন্তু চুপচাপ এক জায়গায় বসলাম। ভাবলাম। শ্রদ্ধেয় স্বামী অভজানন্দজী আগেই চিঠি দিয়েছেন স্বামী আদীশ্বরানন্দজীকে। অনিল মহারাজ। বেলুড়ে বিদ্যামন্দিরে পড়ার শেষদিকে উনি ছিলেন আমাদের হোস্টেলে, তখন ব্রহ্মচারী। ঠিক করলাম ওঁকেই প্রথম ফোন করব।

ফোন করতে গেলে ডলার ভাঙাতে হবে। কার কাছে পাব ভাঙানী, কে আমার জন্যে নিয়ে বসে আছে? বিমানবন্দরের অনুসন্ধান অফিসের এক বয়স্কা ভদ্রমহিলা খুব সাহায্য করলেন, এক ডলার ভাঙিয়ে দিলেন। আমাদের দেশের মতো ভাঙানী দুর্লভ বলে মনে হল না তেমন।

একবার ফোন করে মহারাজকে পাওয়া গেল না। যিনি ধরেছিলেন, তিনি আধ ঘণ্টা পর ফোন করতে বললেন। আধ ঘণ্টা পর ফোন করাতে মহারাজকে পেলাম। খুব সম্ভবতঃ চিনতে পারলেন, কিন্তু প্রথমেই যা বললেন, তাতে তো আমার মাথায় হাত। বললেন, "একটা ক্যাব (অর্থাৎ ট্যাক্সি) নিয়ে চলে এস।"

বিদ্যুৎ ঝলকের মতো অ্যানেসি স্টেশনে ভারতীয় এক তরুণ বিজ্ঞানী আমাকে নিউইয়র্ক সম্পর্কে সাবধান করে যে কতকগুলো 'টিপস্' দিয়েছিলেন, তার একটা মনে পড়ল, বলেছিলেন, "পারতপক্ষে নিউইয়র্কে ট্যাক্সিতে চাপবেন না।"

বিমানবন্দর থেকে মহারাজের কাছে যেতে আমার লাগবে অন্ততঃ ৫০ ডলার। আর, রাতের আশ্রয়টি ওখানে নয়, উনি ফোন করে দেবেন ওয়াই. এম. সি. এ-তে, মহারাজের কাছে গেলে সেখানে ফিরতে আরও ৩০।৪০ ডলার-এর ধাক্কা! একরাতেই আমার পকেটের বিদেশী মুদ্রার ৪ ভাগের একভাগ শেষ!　　　[ক্রমশঃ]

বেদমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ

ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর

নেতাজী ইনস্টিট্যুট ফর্ এশিয়ান স্টাডিজ-এর ফেলো।

বেদ অখিল ধর্মের মূল

বেদ শুধু হিন্দুধর্মেরই নয়,—বেদ পৃথিবীর সকল ধর্মেরই মূল। ভারতবাসীরা যাকে সনাতন ধর্ম বা বৈদিক ধর্ম বলে আচরণ করেন,—বিদেশীরা তাকেই বলেন হিন্দুধর্ম। হিন্দুধর্ম কোন ব্যক্তিবিশেষের মতবাদ নয়,—এ-ধর্ম অজ্ঞাত কাল থেকেই ভারতে আচরিত এবং অনন্তকাল এর স্থায়িত্ব। বেদের সারাংশ উপনিষদ্ বা বেদান্ত। উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য ধর্মাচরণই সনাতন ধর্ম;—উপনিষদের দর্শন বেদান্তই ধর্মদর্শনের শেষ কথা। উপনিষদেই বিচিত্রভাবে একই সাধনার সত্যতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সকল মানুষই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে একই সত্যের সন্ধানী। এই সত্য এক, কিন্তু বিপ্রগণ তাকে বহুভাবে উপদেশ করেন—"একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।"

মানুষের ধর্ম হল—শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তভাবে প্রতিষ্ঠা

সকল ধর্মেরই উদ্দেশ্য মানুষের পাশবিক-ভাবের বিলোপ এবং দেবভাবের উদ্বোধন। ধর্ম হল জীবনের রূপান্তর,—পশু সত্তা থেকে দৈবী-সত্তায় উন্নয়ন। ধর্মের বাহ্য আচার হল—দৈবী-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার বিচিত্র প্রয়াস। বেদ—তথা উপনিষদ্ প্রচার করে যে, মানুষ স্বভাবতই শুদ্ধ-মুক্ত-স্বাধীন আনন্দ-অমৃত স্বরূপ। নিজ কর্ম-বশেই মানুষ নিজেকে ক্ষুদ্র, হীন, দুর্বল ও অসহায় মনে করে সুখ-দুঃখের ভাগী হয়। মানুষের কর্মই মানুষের বন্ধন এবং মুক্তির হেতু। নিজ কর্মের দ্বারা মানুষ নিজেকে সুখ-দুঃখের অধীন করেছে,—আবার নিজ কর্ম দ্বারাই মানুষ সুখ-দুঃখের অতীত হতে পারে। যে কোন উপায়ে এই সুখ-দুঃখের পারে যাওয়াই ধর্মের উদ্দেশ্য।

বেদই মানুষের অনন্ত-অসীম-শুদ্ধপূর্ণ সত্তার কথা প্রথম ঘোষণা করেছে। বেদেই মানুষকে আশ্বাস দিয়েছে—"অমৃতের পুত্র" বলে,—"অমৃতস্য পুত্রাঃ।" বিশ্বের সকল ধর্মানুগামীই এই অমৃতের সন্ধানী। আর "শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য এই যে, তিনি সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক এবং বেদান্তের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যাতা" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৭৩)। বেদ-প্রসূত ধর্মই সকল ধর্মের মূল।

শ্রীকৃষ্ণই সনাতন ধর্মের একমাত্র ব্যাখ্যাতা

শ্রীকৃষ্ণের প্রচারের মাধ্যমেই আমরা সনাতন ধর্মের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি। এক সত্যবস্তুকে বিপ্রগণ কিভাবে বহুরূপে প্রচার করেন—তার মূর্ত দৃষ্টান্ত শ্রীকৃষ্ণ। উপনিষদের—সনাতন ধর্মের একটা উদার ভাব আছে। এই উদারভাবের আশ্রয়েই ভারতীয় সনাতন ধর্ম চিরজীবী। প্রথমতঃ মানুষকে জানতে হবে তার স্বরূপকে,—যে স্বরূপে সে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম-সদৃশ শুদ্ধ মুক্ত। তার বিচারবুদ্ধি, সংস্কার এবং ক্ষমতা অনুসারে তাকে অগ্রসর হতে হবে—এই পরিপূর্ণ সত্তার উপলব্ধির পথে। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ বা কর্ম—অথবা তার নিজস্ব যে কোন ধারণা এবং ভাবনাকে অবলম্বন করেও সেই পূর্ণতার পথে সে অগ্রসর হতে পারে।

বেদ মানুষকে এই ধর্মাচরণের সার্বিক অধিকার দিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ গীতাকে ধর্মসাধনার এই সর্বজনসাধ্য পন্থাগুলির সত্যতাকেই দৃঢ়ভাবে

—যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেছেন। গীতায় যে ধর্মের কথা আছে তা কোন সাম্প্রদায়িক নয়। গীতা বেদেরই প্রতিধ্বনি করে ঘোষণা করেছে —"ধর্ম এক,—তার উপলব্ধির পন্থা ভিন্ন মাত্র।" সকল ধর্মের মধ্যে একত্ব স্থাপন করাই শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য।—"আমাদের দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করিয়া ঊর্ধ্বে এবং সম্মুখে আগুয়ান মানবজাতিকে উদার দৃষ্টিতে দেখিতে শেখানোই শ্রীকৃষ্ণের মহতী কীর্তি। তাঁহার বিশাল হৃদয় সর্বপ্রথম সকলের মতের মধ্যে সত্যকে দেখিতে পাইয়াছিল, তাঁহার শ্রীমুখ হইতেই প্রত্যেক মানুষের জন্য সুন্দর সুন্দর কথা প্রথম নিঃসৃত হইয়াছিল।" (ঐ—৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৯)।

পরবর্তী ধর্ম—শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত সনাতন ধর্মেরই শাখা মাত্র

ভারতের বা ভারতেতর দেশের সকল ধর্মমতের মূলই শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত সনাতন ধর্ম। জ্ঞান, ভক্তি বা কর্মকে অবলম্বন করেই বুদ্ধ, খ্রীষ্ট এবং মহম্মদ ধর্ম প্রচার করেছেন। কর্মফলবাদ বা ভক্তিবাদের কথাই সাধারণ নীতিবাদের মাধ্যমে এই সকল ধর্মপ্রবক্তার ধর্মদেশনায় প্রচারিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ এই সকল মতবাদের সাধনার সত্যকে স্বীকার করে, এদের মধ্যে যে একটা সমন্বয়ভাব আছে, তাও বলেছেন। এই সকল মহামানবের ধর্ম বিশেষকালে, বিশেষ সমাজে—প্রয়োজন ছিল। এর প্রয়োজন এবং সত্যতাকে স্বীকার করেও বলা যায়—এই সকল ধর্ম অনেকটাই সাম্প্রদায়িক, —কখনও সর্বজনীন এবং সনাতন নয়।

"শ্রীকৃষ্ণের প্রাচীন বাণী—বুদ্ধ, খ্রীষ্ট ও মহম্মদ —এই তিন মহাপুরুষের বাণীর সমন্বয়। এই তিন-জনের প্রত্যেকেই এক-একটি মত প্রবর্তন করিয়া চূড়ান্তভাবে প্রচার করিয়াছেন। কৃষ্ণ এই মহা-পুরুষগণের পূর্ববর্তী। তবু আমরা বলিতে পারি কৃষ্ণ পুরাতন ভাবসমূহ গ্রহণ করিয়া সেগুলির সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। যদিও তাঁহার বাণীই প্রাচীনতম। বৌদ্ধধর্মের প্রগতি তরঙ্গে তাঁহার বাণী সাময়িকভাবে নিমজ্জিত হইয়াছিল। আজ কৃষ্ণের বাণীই ভারতের বিশিষ্ট বাণী।" (ঐ—৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৫)

গীতা—বৈদিক ধর্মেরই সর্বজন-গ্রাহ্য ব্যাখ্যা

বৈদিক ধর্ম সনাতন এবং সর্বজনগ্রাহ্য। যে যেভাবেই উপাসনা করুক না কেন,—সে একই সত্যের উপাসনাই করছে,—এরূপ উদার বাণী শুধু বেদেই আছে। কিন্তু এই সূত্রটির বিশদ ব্যাখ্যা আছে শ্রীকৃষ্ণের জীবনে এবং শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে। গীতাই একমাত্র গ্রন্থ যা স্পষ্ট ভাষায় সাকার, নিরাকার—অরূপ বা বিশ্বরূপ, ঐশ্বরিক বা ব্রহ্মের সত্তাকে স্বীকার করেছে। গীতাই মানুষকে ব্রহ্মের স্বরূপ বলে ঘোষণা করেছে,—আবার দাস্যভাবে ঈশ্বরের উপাসনারও প্রশংসা করেছে। গীতাতেই ভগবানকে এক এবং বহু বলা হয়েছে। উপাসনা পদ্ধতি সম্পর্কেও গীতা বেদের স্বাধীন চিন্তাকেই তুলে ধরেছে। রুচির ও সংস্কারের পার্থক্য অনুসারে মানুষ ভগবানকে জ্ঞান, কর্ম, যোগ এবং ভক্তি যে কোনভাবেই উপাসনা করার স্বাধীনতা পেয়েছে। প্রত্যেক মত এবং পথকেই গীতা তুল্যমূল্য দিয়েছে। বৈদিক ধর্মের সনাতনত্ব প্রতিপন্ন হয়—বিশেষতঃ গীতার মাধ্যমে। গীতা প্রবক্তা—শ্রীকৃষ্ণই বৈদিক ধর্মের যথার্থ ব্যাখ্যাতা। ভারতের বা ভারত বহির্ভূত অন্যান্য ধর্মপ্রবক্তার মধ্যে একটি ভাবই বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে। গীতায় এবং শ্রীকৃষ্ণে মূর্ত হয়েছে—সর্বজনের সর্ব-কালের ধর্মচেতনা। এইজন্যই বেদ অপৌরুষেয়, অথবা সর্বপৌরুষেয়।

শ্রীকৃষ্ণজীবন—ভারতীয় সনাতন ধর্মসাধনারই ফলশ্রুতি

শ্রীকৃষ্ণ-ব্যাখ্যাত গীতাই বেদের একমাত্র

যথার্থ ভাষ্য নয়। শ্রীকৃষ্ণের জীবনও বৈদিক অধ্যাত্মসাধনার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। গীতা গ্রন্থে যে যেভাবে সাধনার দ্বারা মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশের কথা বলা হয়েছে—শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে তার প্রত্যেকটিই মূর্ত হয়ে উঠেছে। অন্যান্য অবতারগণ স্থান এবং কাল বিশেষে যেভাবে ধর্মসংস্থাপন করেছেন, শ্রীকৃষ্ণ তদপেক্ষা ব্যাপকতরভাবে এবং চিরন্তনকালে গ্রহণযোগ্য ধর্ম নিজ জীবনে আচরণ করে দেখিয়েছেন। কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তি বা প্রেমের পন্থা অবলম্বন করে মানুষ কিভাবে পূর্ণ এবং সিদ্ধকাম হতে পারে—এর মূর্ত দৃষ্টান্ত স্বয়ং

শ্রীকৃষ্ণ গৃহী ও সন্ন্যাসীর—কর্মী ও যোগীর সমন্বয় মূর্তি

শ্রীকৃষ্ণ একাধারে আদর্শ সন্ন্যাসী এবং অভূতপূর্ব গৃহী ছিলেন। তাঁর মধ্যে বাল্যকাল থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত বিস্ময়কর রজঃশক্তির বিকাশ দেখা গিয়েছিল। তাঁর রজোগুণের পরিণতি হয়েছিল ত্যাগস্নিগ্ধ প্রশান্তিতে। রজোগুণ মানুষকে বিষয়ে আসক্ত করে। কিন্তু অদ্ভুত কর্মযোগী শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে অভূতপূর্ব অনাসক্তি মূর্ত হয়ে উঠেছিল। বিশ্বের কল্যাণের জন্য তিনি বহু যুদ্ধের নায়কত্ব করেছিলেন। তিনি অনেককে সিংহাসনে বসিয়ে রাজা করেছেন, কিন্তু নিজে কখনও সিংহাসনে বসলেন না। যাঁর ইচ্ছায় ভারতের রাজাগণ নিজ সিংহাসন ছেড়ে দিতেন—তিনি কখনও রাজা হতে চাননি। অনাসক্তিই অধ্যাত্মসাধনার শেষকথা। শত কর্মবহুল জীবনযাপন করেও শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন অনাসক্তির চরম আদর্শ। অনাসক্ত কর্মী এবং সঙ্গবর্জিত সন্ন্যাসী স্বরূপতঃ এক। গোপীপ্রেমের কেন্দ্রপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ এই অনাসক্তির,—দেহসুখবর্জিত ঈশ্বরানুরাগের দৃষ্টান্তই দেখিয়েছেন তাঁর বৃন্দাবনলীলায়।

শ্রীকৃষ্ণই ভারতীয় অধ্যাত্মচেতনার ও ধর্মবোধের চরম দৃষ্টান্ত

ভারতবর্ষ শুধু গৃহত্যাগীর সন্ন্যাস জীবনকেই সকলের পক্ষে আদর্শ করতে বলেনি। গৃহী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির সংখ্যাই চিরকাল অধিক। বাস্তবতঃ গৃহী থেকেই,—আনুষ্ঠানিক প্রব্রজ্যার সন্ন্যাস গ্রহণ না করেই—সর্বতোমুখী অধ্যাত্মচেতনার বিকাশের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। বৃহত্তর জনসমাজকে রজোগুণে উদ্বুদ্ধ করে—কিভাবে অনাসক্ত সত্ত্বগুণে উন্নীত করতে হয়—শ্রীকৃষ্ণ তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অধ্যাত্মসাধনার মতবৈচিত্র্যের সমন্বয়সাধনে, নিষ্কাম কর্মযোগ অনুষ্ঠানে, এবং সর্বতোভাবে অনাসক্তির দৃষ্টান্ত স্থাপনে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রই ভারতের আদর্শ। শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত গীতাই একমাত্র সর্বজনস্বীকার্য অধ্যাত্ম শাস্ত্র।

ভারতে বহিরাগত যে কোন ভাবকে গ্রহণ ও স্বাঙ্গীভূত করার ক্ষমতা,—সকল মতকে আপন করে নেবার জাদুশক্তি,—সকল মানুষকে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা দেবার উদারতা এবং সকলকেই ব্রহ্মের অংশরূপে ঘোষণা করার সাহস শ্রীকৃষ্ণই দিয়েছেন।—শ্রীকৃষ্ণই বেদমূর্তি,—শ্রীকৃষ্ণই ভারতাত্মা।

শ্রীশ্রীমা ও রাখালরাজা

ডক্টর তারকনাথ ঘোষ

সুপরিচিত প্রাবন্ধিক।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বলতেন, মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা) একটি ছেলেকে তাঁর কোলে বসিয়ে দিয়ে বলছেন, "এটি তোমার ছেলে।" শুনে তিনি শিউরে উঠে বলেছেন, "সে কী! আমার আবার ছেলে কী!" মা তাতে হেসে বুঝিয়ে দিলেন—সাধারণ সংসারিভাবে ছেলে নয়, ত্যাগী মানসপুত্র।—এই দর্শনের অল্পদিন পরে রাখাল (পরবর্তী কালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ) এলে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেই বুঝলেন, এই সেই ছেলে।

'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'য় [১ম ভাগ পৃঃ ২৩৬] এই ঘটনার বর্ণনা—স্বামী শান্তানন্দকে শ্রীশ্রীমা বলছেন—"ঠাকুরের সাধন-অবস্থায় কত রকম প্রলোভনের জিনিস দেখে তিনি জড়সড় হতেন এবং সে-সব প্রলোভনের জিনিস তিনি চাইতেন না। একদিন তিনি পঞ্চবটীতে হঠাৎ দেখলেন, একটি ছেলে তাঁর নিকটে এল। তিনি তাতে চিন্তা করতে লাগলেন, এ আবার কি হল? তখন মা বুঝিয়ে দিলেন, মানসপুত্ররূপে ব্রজের রাখাল আসবে। যখন রাখাল এলো তখন তিনি বললেন, 'এই আমার সেই রাখাল এসেছে। তোমার নামটি কি বল দেখি?'—'রাখাল।' 'হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক।' ঠাকুর যেমন পঞ্চবটীতে দেখেছিলেন ঠিক তেমনি।"

শ্রীশ্রীমা পরমা জননী—সতেরও মা, অসতেরও মা! সকলেই তাঁর সন্তান। কিন্তু ঠাকুরের মানসপুত্র—ব্রজের রাখাল, সেজন্য তাঁর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। তিনি দক্ষিণেশ্বরে এলে শ্রীরামকৃষ্ণ আর শ্রীশ্রীমা তাঁর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। অন্য ভক্তরা ঠাকুরের ঘরে মেঝেয় বা বারান্দায় শুতেন, রাখালের শোওয়া ঠাকুরের ঘরেই ক্যাম্প-খাটে। আর সব ভক্ত মেঝেয় মাদুরে বসতেন, রাখাল বসতেন ঠাকুরের কোল ঘেঁষে। রাখালের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা—মিছরি-মাখন, তাঁর প্রিয় খাদ্য খিচুড়ি। পরবর্তী কালে কোন ভক্ত এই বিশেষ ব্যবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করলে শ্রীশ্রীমা বলেছেন, "রাখাল যে ছেলে!" [ব্রহ্মানন্দচরিত, ১ম অধ্যায়: স্বামী প্রভানন্দ]—একবার (শ্রীশ্রীমার) জন্মোৎসবের সময় শ্রীশ্রীমা কাশীধামে ছিলেন। ঐদিন তিনি সব ত্যাগী সন্তানকে একটি করে সুতীর কাপড় দিয়েছেন, রাখাল মহারাজকে দিয়েছেন একটি রেশমী কাপড়। এ নিয়ে কেউ একজন প্রশ্ন করলে শ্রীশ্রীমা একই উত্তর দিয়েছেন, "রাখাল যে ছেলে!" [ঐ, ৫ম অধ্যায়]

'আমার সেই রাখাল' অর্থাৎ ব্রজের রাখাল—ব্রজরাজের লীলাসহচর! 'শ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি'তে অক্ষয়কুমার সেন লিখেছেন,

> এখন রাখাল যিনি পূর্বেও রাখাল ॥
> ভবিষ্যতে তিনিই রাখাল পুনঃ পরে।
> রাখালের রাখালত্ব কিসেও না মরে ॥

রাখালের রাখালত্ব অর্থাৎ বালকভাব শেষ পর্যন্ত অটুট। পরিণত বয়সে তিনি যখন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ তখনও এই বালকভাব! ব্রহ্মচারী অশোককৃষ্ণকে শ্রীশ্রীমা প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন [শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, পৃঃ ২১১], "দেখছ না, রাখালের কেমন বালকভাব, এখনও যেন ছোট ছেলেটি!"—ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনি রঙ্গরস করতেন (অবশ্য বড়োরাও বাদ পড়তেন না), বিশেষত মাঝে মাঝে যখন বলরাম-মন্দিরে—ভক্তরাজ বলরামের পূত ভদ্রাসনে অবস্থান করতেন, তখন বসু-পরিবারের ছেলে-

মেয়েরা তাঁর খেলার সাথী হয়ে উঠত।

উনিশশো সতেরো-আঠারোয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ বেশ কিছুদিন বলরাম-মন্দিরে (কয়েকদিনের জন্ত ১নং উদ্বোধন লেনে 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'তেও) বাস করেছিলেন। এত কাছে থেকেও তিনি অন্ত সাধুদের মতো শ্রীশ্রীমাকে নিত্য বা মাঝে মাঝেও প্রণাম করতে আসেন না লক্ষ্য করে উদ্বোধন কার্যালয়ের কর্মী চন্দ্রমোহন দত্ত শ্রীশ্রীমাকে প্রশ্ন করেন, "মা, বাবুরাম মহারাজ, শরৎ মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, খোকা মহারাজ, হরি মহারাজ সকলেই আপনাকে প্রণাম করে যান, মহারাজ (অর্থাৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ) আসেন না কেন?" শ্রীশ্রীমা উত্তরে বলেন, "রাখাল তো নারায়ণ, সে আমার কাছেই আছে—আমাকে যখন ইচ্ছা করে তখনই দেখতে পায়।"—চন্দ্রমোহন বলরাম-মন্দিরে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে এই প্রশ্ন আর উত্তরের কথা বললে তিনি শোনামাত্রই এমন স্থির আর গম্ভীর হয়ে গেলেন যে তাঁর আর দেহের হুঁশ আছে বলে মনে হল না। চন্দ্রমোহন তা দেখে ভয় পেয়ে একরকম পালিয়েই গেলেন। [ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা: ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্ত; ব্রহ্মানন্দ চরিত: স্বামী প্রভানন্দ]

স্বামী ঈশানানন্দ তাঁর স্মৃতিচারণে স্বামী ব্রহ্মানন্দের শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করার একটি বর্ণনা দিয়েছেন। [মাতৃসান্নিধ্যে—'মাতৃসান্নিধ্যে স্বামী ব্রহ্মানন্দ']:

"পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তখন [১৯১৮ খ্রীঃ] বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন। একদিন সকালে তিনি উদ্বোধন-বাড়িতে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে আসিলেন। তখন বেলা ৯টা হইবে। মা দক্ষিণের ঘরে খাটের উপরে পা ঝুলাইয়া চাদর মুড়ি দিয়া বসিয়া আমাকে বলিলেন, 'শরৎকে ব'লে রাখালকে শরতের ঘর থেকে ডেকে আনো।' আমি ঐ কথা শরৎ মহারাজকে বলায় পূজ্যপাদ রাখাল মহারাজ আগে আগে আমি তাঁহার পিছনে পিছনে মায়ের নিকট আসিলাম। আমি দেখিতেছি—মহারাজের পা দুটি থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। মহারাজ মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলি লইয়া বলিতেছেন, 'মা, রাধী কেমন আছে? এ রাধী, রাধু কোথায়?' মা মহারাজের দাড়ি ধরিয়া চুমু খাইয়া, মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া ধীরে ধীরে রাধুর অসুখের কথা বলিলেন। তারপর মা মহারাজের শরীর সুস্থ আছে কিনা, তাঁহার সঙ্গের ছেলেরা কেমন আছে ইত্যাদি কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন। মহারাজ সংক্ষেপে জবাব দিয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং শরৎ মহারাজের ঘরে গিয়া বসিলেন। দেখিলাম, মহারাজ ঘামিয়া উঠিয়াছেন।

মা আমাকে যেমন যেমন বলিলেন, সেইভাবেই একটি রেকাবিতে কয়েকটি বিস্কুট, কমলালেবু ও মিষ্টি সাজাইয়া মায়ের হাতে দিলাম। মা রেকাবিটি ঠাকুরকে একটু দেখাইয়া, নিজে সামান্ত জিহ্বা দ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিলেন, 'রাখালের হাতে দিয়ে এসো।' আমি শরৎ মহারাজের ঘরে গিয়া রাখাল মহারাজের হাতে রেকাবিটি দিলাম। শরৎ মহারাজ বলিলেন, 'মায়ের প্রসাদ একাই সব খাবেন?' মহারাজ উত্তর করিলেন, 'শরৎ, তুমি তো রোজই মায়ের প্রসাদ খাচ্ছ। আবার এতেও ভাগ বসাবে? তা নাও; তুমি হলে মায়ের স্বামী, তোমাকে সন্তুষ্ট না করলে তাঁর কাছে যাওয়া যায় না।' শরৎ মহারাজ বলিলেন, 'সে তো আপনিই নিযুক্ত করেছেন দাদা।' দুই গুরুভ্রাতা মহা আনন্দে প্রসাদ খাইতে লাগিলেন। আমি কুঁজো হইতে দুই গ্লাস জল দিয়া আসিলাম।"

শ্রীশ্রীমার লোকাতীত দৃষ্টিতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ

স্নেহের পুতলী রাখাল—পরিণত বয়সেও বালক-স্বভাব, আবার সাক্ষাৎ নারায়ণ ; শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সম্পর্কে স্বামীজীকে (তখন নরেন্দ্রনাথ) বলেছেন, "রাখালের রাজবুদ্ধি আছে, ইচ্ছে করলে সে একটা রাজ্য চালাতে পারে।" ঠাকুরের একথা স্মরণ রেখেই সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতারা স্বামীজীর নির্দেশে তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের অধ্যক্ষ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে 'স্বামীজী' যেমন স্বামী বিবেকানন্দ, তেমনই 'মহারাজ'—স্বামী ব্রহ্মানন্দ। কালক্রমে মঠ আর মিশনের অধ্যক্ষরূপে তাঁর অসামান্য দূরদৃষ্টি আর সহজাত পরিচালনাশক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে।

শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করার সময় তিনি যে চঞ্চল বালকের মতো আচরণ করেছেন সে কেবল ভাবসংবরণ করার জন্য।—রাখালের 'নারায়ণত্ব' জানলেও তাঁর 'সন্তানত্ব' অবশ্য শ্রীশ্রীমার কাছে আরও বড়। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের বছর-তিনেক পরে রাখাল একান্তে তপস্যা করতে উৎসুক হয়ে তাঁর অনুমতির অপেক্ষা করছেন শুনে শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী থেকে বলরামবাবুকে লিখেছেন, "শুনিলাম রাখাল পশ্চিমে যাইবে। গেলবারে জগন্নাথে শীতে কষ্ট পাইয়াছিল। শীত অন্তে ফাল্গুন মাস নাগাত গেলে ভাল হয়। তবে যদি একান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে তাহা হইলে আর কি বলিব?"—তাঁর অনুমতি পেয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ফাল্গুন মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে না পেরে অগ্রাণের শেষেই উত্তরভারতে তীর্থ-পরিক্রমা শুরু করেছেন। [শ্রীমা সারদাদেবী—'সঙ্ঘমাতা']

শ্রীশ্রীমা দুর্গোৎসব উপলক্ষে বেলুড় মঠে এলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ একবার মহাষ্টমীর দিন একশো আটটি পদ্ম দিয়ে তাঁর শ্রীচরণ পূজা করেছিলেন। —কাশীধামের একটি ঘটনা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় [শ্রীমা সারদা দেবী—'বেলুড় ও কাশী']। শ্রীশ্রীমা তখন 'লক্ষ্মীনিবাসে' আছেন [১৯১২ খ্রীঃ]। স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রতিদিন সকালে তাঁকে দেখতে সেখানে এসে গোলাপ-মার কাছে শ্রীশ্রীমার কুশলপ্রশ্ন করে পরে 'বালকের মত রঙ্গ' করতেন।—"এইরূপে একদিন নীচের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে মাস্টার মহাশয় ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন, এবং উপরের বারাণ্ডা হইতে গোলাপ-মা বলিলেন, 'রাখাল, মা জিজ্ঞাসা করেছেন, আগে শক্তিপূজা করতে হয় কেন?' মহারাজ উত্তর দিলেন, 'মার কাছে যে ব্রহ্মজ্ঞানের চাবি। মা কৃপা করে চাবি দিয়ে দোর না খুললে আর উপায় নেই।' এই বলিয়া তিনি বাউলের সুরে গান ধরিলেন—

শঙ্করী-চরণে মন মগ্ন হয়ে রও রে।
মগ্ন হয়ে রও রে, সব যন্ত্রণা এড়াও রে ॥
এ তিন সংসার মিছে, মিছে ভ্রমিয়া বেড়াও রে।
কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী অন্তরে ধিয়াও রে ॥
কমলাকান্তের বাণী, শ্যামা মায়ের গুণ গাও রে।
এ তো সুখের নদী নিরবধি, ধীরে ধীরে
যাও রে ॥

গীত গাহিতে গাহিতে তিনি ভাবোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং উহা শেষ হইবামাত্র 'হো, হো, হো' করিয়া হাসিয়া সবেগে চলিয়া গেলেন। এই অপূর্ব ভাব ও নৃত্য শ্রীমা উপর হইতে দেখিয়া আনন্দ করিতেছিলেন ; আর নীচে দ্রষ্টা ছিলেন মাস্টার মহাশয় এবং অপর দুই-একজন ভক্ত।"

কেবল ভাবোন্মত্ত অবস্থায় বা তত্ত্বরূপে নয়, সহজ দৃষ্টিতেও মহারাজের কাছে শ্যামা মা আর শ্রীশ্রীমা এক!

শ্রীশ্রীমা যখন লীলাসংবরণ করেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন ভুবনেশ্বর মঠে। স্বামী সারদানন্দের টেলিগ্রামে এই সংবাদ পেয়ে "মহারাজ বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, শুইয়া পড়িলেন। খানিক পরে উঠিয়া বলিলেন, আমি হবিষ্য করব। মায়ের

শিষ্য যারা আছ তিনদিন হবিষ্য করবে, জুতো পরবে না। নিজেও তিনি তিনদিন হবিষ্য করিলেন ও কয়েকদিন জুতা ব্যবহার করেন নাই। দুঃখ করিয়া একবার শুধু বলিয়াছিলেন, এতদিন পাহাড়ের আড়ালে ছিলাম।—শালিখার পঞ্চাননবাবু শ্রীশ্রীমায়ের অস্থি সংগ্রহ করিয়া নিজের বাড়িতে রাখেন। পরে সেকথা অবগত হইবামাত্র মহারাজ তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন: যত শীঘ্র পার শ্রীশ্রীমার অস্থি মঠে দিয়া আসিবে, আর তাহা না হইলে গঙ্গায় দিবে। গৃহস্থঘরে নানা অশুচিতার মধ্যে এ বস্তু রাখিতে নাই।"
[ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা—'শ্রীশ্রীমা ও মহারাজ']

কে তুমি

শ্রীঅজিতকুমার সু

লেখক ও কবি।

কে তুমি বাজাও সেই চিরন্তন আড়বাঁশি?
তোমার বাঁশির সুরে আয়ত দুচোখে দেখি রঞ্জিত ভুবন।
কখন বা নিদারুণ উত্তাপে চোখে আসে জল,
ধুয়ে যায় রঙিন কাজল।
দীর্ণ দেয়ালে দেখি হিজিবিজি দাগগুলি ব্যঙ্গ করে অবিরাম;
ফাগের ফাগুন মাস বর্ষা হয়ে দারুণ ভাসায়।
কে তুমি রাখাল, নীপমূলে হাস সুমধুর?
ধূসর দেয়াল ধরে আবার দাঁড়াই।
বাড়াই নতুন হাত নতুন দৃশ্যের দিকে,
পেছনে যার ঝুলে থাকে বিচিত্রিত পর্দাখানি।
সুরে সুরে পর্দাগুলি উঠে আর নামে।
গলা টিপে ধরি কারও, কখন বা গলাগলি করি।
পিঠবস্ত্রে তোমার, আড়াল করেছো তুমি অনন্ত অতীত।
কাল-যমুনার তীরে কতকাল দাঁড়িয়ে রয়েছো!
গোপীমন করছো উতলা।
অহংকংসের শির যথাকালে কেটে ফেলছো সুদর্শনে।
হাতের মুঠোয় দিচ্ছ গুচ্ছ গুচ্ছ শান্তিপুষ্প—
শ্রীরাধাহৃদয়ে যারা কান পেতে থাকে তোমার বাঁশির দিকে,
তাদের দুহাতে।
কে তুমি হে রহস্যময় অদৃশ্য অসীম?···

হেপাটাইটিস

ডক্টর জলধিকুমার সরকার

কলিকাতা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ভাইরলজি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থার ভাইরাসজনিত রোগ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সমিতির ভূতপূর্ব সদস্য।

সম্প্রতি খবরের কাগজের দৌলতে 'হেপাটাইটিস' (Hepatitis) কথাটি অনেকের জানা হয়ে গেছে এবং জণ্ডিস (Jaundice) রোগ এবং হেপাটাইটিস রোগ সমার্থক বলে ধরে নেওয়া হয়। আসলে, 'হেপাটাইটিস' কথাটির অর্থ হল যকৃৎ (liver)-এর প্রদাহ, এবং এই প্রদাহের ফলে অনেক সময় জণ্ডিস হয় বলে দুটিকে এক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এ বৎসর মে মাস পর্যন্ত কলিকাতার ছয়টি বড় হাসপাতালে পাঁচশতেরও বেশি হেপাটাইটিস রোগী চিকিৎসিত হয়েছে। এর কারণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থার ব্যাপারে নানা ধরনের বিবৃতি সংবাদপত্রে বার হওয়ায় জনসাধারণ অল্প-বিস্তর বিভ্রান্ত। সেজন্য এই বিষয়ের কিছু আলোচনার প্রয়োজন।

যকৃতের প্রদাহ যদিও অ্যামিবা (Amoeba—আমাশয়ের জীবাণু) বা অন্য কারণে হতে পারে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর কারণ হল ভাইরাস (Virus—জীবপরমাণু), এবং ভাইরাসজনিত হেপাটাইটিসই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

জণ্ডিস কিভাবে হয়[১] সে-সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায় যে, আমাদের রক্তে যে লাল রক্তকণিকাগুলি (R. B. C.—Red Blood Cell) থাকে তাদের কিছু অংশ আয়ুষ্কাল শেষ হবার জন্য প্রতিনিয়ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। রক্তকণিকার ভিতরের হিমোগ্লোবিন (Haemoglobin)-এর পরিবর্তিত রূপ হল হরিদ্রাভ বিলিরুবিন (Bilirubin), যা সামান্য মাত্রায় (১০০ মিলিলিটার রক্তে ০·৫—০·৮ মিলিগ্রাম) সকলের রক্তেই থাকে। যকৃতের কোষগুলি এটিকে কিছুটা পরিবর্তিত করে পিত্তাংশ হিসাবে পিত্তস্থলীতে পাঠিয়ে দেয় অন্ত্রে খাদ্য পরিপাক করার জন্য। যকৃতে প্রদাহ হলে কোষগুলি সেই কাজ করতে পারে না। এর ফলে রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা বেড়ে গিয়ে চোখ, প্রস্রাব ইত্যাদিকে হলদে করে, অর্থাৎ জণ্ডিসের সৃষ্টি হয়। মনে রাখা দরকার যে, অন্য কারণেও (যেমন যকৃতে ক্যান্সার, পিত্তস্থলীতে পাথুরি) জণ্ডিস হতে পারে।

ভাইরাসজনিত হেপাটাইটিস প্রধানতঃ দুই প্রকার—ইনফেকসাস (Infectious) হেপাটাইটিস যার ভাইরাসের নাম হেপাটাইটিস 'এ' ভাইরাস (HAV—সংক্ষেপে ভাইরাস 'এ'), এবং সিরাম (Serum) হেপাটাইটিস, যার ভাইরাসের নাম হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাস (HBV—সংক্ষেপে 'বি' ভাইরাস) বা অস্ট্রেলিয়া অ্যান্টিজেন (Australia Antigen)। দুটি ভাইরাসের আক্রমণ প্রথা এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে পার্থক্য থাকায় দুটি রোগের গুরুত্ব এবং প্রতিরোধ প্রথা বিভিন্ন হয়ে পড়েছে। সাধারণভাবে যে-কোন প্রকার হেপাটাইটিস রোগের প্রধান লক্ষণগুলি হল ক্ষুধামান্দ্য, গা বমি, জ্বর, জণ্ডিস প্রভৃতি।

ইনফেকসাস হেপাটাইটিস (হেপাটাইটিস 'এ')

রোগীর মলমূত্রে এবং থুতুতে প্রচুর পরিমাণে ভাইরাস নির্গত হয়ে খাদ্য ও পানীয়কে দূষিত করে। এই সব মলমূত্র ড্রেনে গিয়ে কোনরকমে পানীয় জলে মিশলে এককালে অনেকের

১. উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৮৬, সংখ্যায় আলোচিত

হেপাটাইটিস হতে পারে। মাছির মাধ্যমেও রোগ ছড়ায়। বৎসরের যে-কোন সময় রোগ হতে পারে, তবে এদেশে গ্রীষ্মের শেষে ও বর্ষার প্রারম্ভে বেশ কিছু লোকের হেপাটাইটিস দেখা দেয়। শরীরে ভাইরাস প্রবেশের ১৫—৪৫ দিনে রোগের শুরু হয়। মৃত্যুর হার শতকরা এক, এবং বাকি অধিকাংশই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। এই অসুখে অনেক শিশুর জণ্ডিস দেখা দেয় না এবং মৃত্যুর হারও কম। রোগের প্রাদুর্ভাব হলে ভাইরাস ধ্বংস করার জন্য পানীয় জলে যে পরিমাণ ক্লোরিন বাড়ানো উচিত, নানা কারণে তা সম্ভব হয় না বলে জল ফুটিয়ে নিয়ে পান করাই নিরাপদ। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে উন্নত ধরনের ব্যবস্থার ফলে এই হেপাটাইটিস বেশ খানিকটা কমে গেছে।

সিরাম হেপাটাইটিস
(হেপাটাইটিস 'বি')

প্রধানতঃ পূর্ব-ব্যবহৃত ইনজেকশন্-সূচের মাধ্যমে (খাদ্য-পানীয়ের মাধ্যমে নয়) এই রোগ ছড়ায়। মশার কামড়ে এবং যৌন মিলনের মাধ্যমেও এক হতে অন্যতে ভাইরাস ছড়াতে পারে। ভাইরাস প্রবেশের ২—৩ মাস পরে হেপাটাইটিস দেখা দেয়। অধিকাংশ রোগী আরোগ্য লাভ করলেও শতকরা দশজন রোগীর রক্তে ভাইরাস জীবিত থেকে যায়, যাদের বলা হয় ক্রনিক ক্যারিয়ার (Chronic carrier বা দীর্ঘকাল ভাইরাসবাহী)। সারা পৃথিবীতে বর্তমানে ২০ কোটি এই ধরনের (অর্থাৎ ক্যারিয়ার) লোক আছে। এদের কেউ কেউ সুস্থ থাকে, কেউ কেউ বা ক্রমশঃ যকৃৎ নষ্ট হওয়ার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয় (Chronic active with Progressive disease)। এইরূপ ক্যারিয়ার-মাতার গর্ভ থেকে সন্তান প্রসবের পথে নবজাতের শরীরে ভাইরাস ঢুকে পড়ে। আর আপাত সুস্থ ক্যারিয়ারের রক্তদানের ফলে রোগ যে কি ভীষণ ভাবে ছড়াচ্ছে তা চিন্তার বিষয় হয়ে পড়েছে। সেইজন্য রক্ত-দানকারী (Blood donor)-র রক্তে 'বি' ভাইরাস আছে কিনা অর্থাৎ সে ক্যারিয়ার কিনা, তা পরীক্ষা করা উচিত এবং অনেক হাসপাতালে করা হয়। এরূপ ক্যারিয়ারকে ইন্জেকশন্ দিলে সেই সিরিঞ্জের সূচে ভাইরাস লেগে থাকে, যা শুধু স্পিরিট দিয়ে মুছলে ধ্বংস হয় না, জলে ফুটানো দরকার। যাঁরা নেশার জন্য ইন্জেকশন্ নিতে অভ্যস্ত (Drug-addict), তাদের অনেকের রক্তে এই ভাইরাস পাওয়া যায়। সিরাম হেপাটাইটিস-এ পূর্বোক্ত হেপাটাইটিস অপেক্ষা জ্বর কম হয় ও জিজ্ঞাসা করলে কিছুকাল আগে কোন ইন্জেকশন্ বা রক্ত নেওয়ার কথা জানতে পারা যায় অনেক ক্ষেত্রে। যকৃতে ক্যানসার এবং যকৃৎ শুষ্ক (Cirrhosis of liver) হওয়ার সঙ্গে এই ভাইরাসের ক্যারিয়ার হওয়ার সম্পর্ক পাওয়া গেছে।

'বি' ভাইরাসের গুরুত্বের জন্য ক্রমবর্ধমান এই হেপাটাইটিস নিয়ে সারা জগতে প্রচুর পরিমাণে গবেষণা হচ্ছে। এর ফলে জানা গেছে যে, বেশ কিছু লোকের জণ্ডিস রোগ ভাইরাস 'এ' বা ভাইরাস 'বি' দ্বারা হয় না, অন্য একরকমের ভাইরাস—নন্ 'এ'/নন্ 'বি' (Non-A/Non-B) ভাইরাস দ্বারা হয় যা ইন্জেকশন্ বা পানীয়ের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। তাছাড়া সম্প্রতি কয়েক জায়গায় হেপাটাইটিস রোগী হতে আর একটি ভাইরাস আবিষ্কৃত হয়েছে যার নাম দেওয়া হয়েছে ডেল্টা (Delta) ভাইরাস। এই ভাইরাসটির নিজের হেপাটাইটিস করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু 'বি' ভাইরাসের সাহায্যে সাংঘাতিক ধরনের হেপাটাইটিস-এর সৃষ্টি করে।

লেবরেটরির সাহায্য না নিয়ে কোন রোগীর হেপাটাইটিস-এর কারণ কী ভাইরাস,

তা জানা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে খুব কম লেবরেটরিতেই এরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা আছে। এর ফলে রোগ নির্ণয় বিষয়ে নানা মত ও বাগ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ভাইরাস ধ্বংস করার অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ আজ পর্যন্ত বার হয়নি। তবে 'এ' এবং 'বি' ভাইরাসের প্রতিরোধক টিকা তৈরি হয়েছে ও আরও উন্নত ধরনের কম মূল্যের টিকা তৈরির প্রচণ্ড চেষ্টা চলছে। সুস্থ লোকের রক্ত হতে তৈরি গ্যামা গ্লোবিউলিন (Standard Gamma Globulin) ইন্‌জেক্‌শন্ নিলে মাস পাঁচ-ছয় হেপাটাইটিস 'এ'-র আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায় বলে, বহু বিদেশী পর্যটক গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে আসবার আগে এই ইন্‌জেক্‌শন্ নেন।

জনৈক সন্ন্যাসীর স্মৃতিতে

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

অধ্যক্ষ, স্যাক্রামেন্টো বেদান্ত কেন্দ্র, আমেরিকা।

কুড়ি বৎসরের স্মৃতি ভিড় করে আজ এককক্ষণে
হাসিমাখা মুখখানি তব বার বার পড়িতেছে মনে,
যে আহ্বান উঠেছিল বেজে একদিন অন্তর-গভীরে
অনুসরি তাহা ক্লান্তিহীন চলে ব্রত বিশবর্ষ ঘিরে,
নাহি ছিল ভয় ও সংশয়, নাহি ছিল দুঃখ শোক মোহ
রামকৃষ্ণ-অনুরাগে বাঁধা সদা জাগা পরম উৎসাহ।

পৃথিবীর অজস্র বিক্ষেপে নাহি যাঁর কাঁপে মনঃপ্রাণ
মানুষের সেবা তৎপর একলক্ষ্যে যিনি আগুয়ান,
তিনিই তো শ্রেষ্ঠ ভক্ত ধন্য তাঁর জনক-জননী
সত্যের আলোক দীপ্ত সার্থক জীবন তাঁর গণি।

ঠাকুরের অতি প্রিয়জন গুরুপ্রাণ হে সন্ন্যাসী দীন
স্মৃতি তব মোদের হৃদয়ে চিরদিন রবে অমলিন।

প্রাচীনতম অটোবায়োগ্রাফি

ডক্টর পরশুরাম চক্রবর্তী

হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক—শাস্ত্র-পুরাণ-সাহিত্য বিষয়ক লেখক ও সমালোচক।

অটোবায়োগ্রাফি হল আত্মজীবনী—কোনও ব্যক্তিবিশেষের জীবনের কার্যকলাপের হিসাব-নিকাশ। আত্মজীবনীতে কোনও ব্যক্তি নিজের কথা নিজে বলে যান। আত্মজীবনীকে আত্ম-দর্পণও বলা যায়। বর্তমানে আত্মজীবনী এক বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে। আমরা মহাত্মা গান্ধীর, জওহরলাল নেহরুর এবং আরও অনেকের আত্মজীবনীর সঙ্গে পরিচিত। আত্ম-জীবনী রচনার উৎস খুঁজলে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের খোঁজ নিতে হয়। পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ হল—ঋগ্বেদ। বয়স প্রায় ৬ হাজার বৎসর। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের কয়েকটি মন্ত্রে এই আত্ম-জীবনীর বীজ নিহিত আছে। এই বীজ আছে ইন্দ্রসূক্তে ও দেবীসূক্তে। এই উৎস বা বীজ প্রসঙ্গেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। একে প্রাচীন-তম বলার কারণ—এর প্রাচীনত্বের নিরিখে। কাল নিয়ে তর্কবিতর্ক চলতে পারে, কিন্তু আপাততঃ আমাদের উপজীব্য হল এর বিষয়বস্তু। বিষয়বস্তুর উপস্থাপনাই বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য। বর্তমান কালের আত্মজীবনীমূলক রচনা বিস্তৃত বা ব্যাপক, কিন্তু আত্মজীবনীর উৎসের আকার-প্রকার খুবই সংক্ষিপ্ত। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৪৮, ৪৯, ১১৯ ও ১২৫-সংখ্যক সূক্তে সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী আছে। বিষয়বস্তু উপস্থাপনের পূর্বে বেদের কাল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন, তবেই প্রাচীনতম বলা যুক্তিগ্রাহ্য হবে।

বেদের কালঃ বেদ অপৌরুষেয় ও নিত্য। বেদ কোনও মানুষের রচনা নয়—এ নিত্য বর্তমান—ঈশ্বরের নিঃশ্বসিত। নিত্যত্ব স্বীকার করায় যা নিত্য—তাঁর উৎপত্তিও নেই বিনাশও নেই। তাই বেদের রচনাকালের প্রশ্নই ওঠে না। পক্ষান্তরে যাঁরা বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, তাঁরা বলেন, প্রাগৈতিহাসিক যুগে কোনও এক সময়ে বেদ রচিত হয়েছিল। তাই তাঁরা বেদের রচনাকালের বিচার করে থাকেন। অবশ্য বেদের মধ্যে বেদ যে অপৌরুষেয়—তার প্রমাণস্বরূপ যথেষ্ট শ্রুতি-বচন যেমন আছে; সেই সঙ্গে এমন আভাসও আছে যে—বেদ ঋষিদের রচনা। যাঁরা বেদকে পৌরুষেয় বলে মনে করেন তাঁরা তাই শ্রুতিবচন উদ্ধৃত করেই নিজমত সমর্থন করেছেন এবং বেদের কালনির্ণয়ে চেষ্টা করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু পণ্ডিত বেদের পৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করেন। অবশ্য পণ্ডিতগণ বেদ-রচনার কাল সম্বন্ধে একমত নন। কেউ অতি প্রাচীন-কাল, কেউ নিকটবর্তীকাল; আবার কেউ কেউ মধ্যবর্তীকাল ধরেছেন। ভারতের মনীষী বালগঙ্গাধর তিলক, কেটকার, সি. ভি. বৈদ্য, অবিনাশচন্দ্র দাস প্রমুখ এবং পাশ্চাত্যের মহামতি ম্যাক্সমুলার, য়াকোবি, বেবর, হুইট্নি, ম্যাক্‌ডোনেল, ভিণ্টারনিৎস, গ্রাসমান, বুলার প্রভৃতি পণ্ডিত বেদের রচনাকাল নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ খ্রীঃ পূর্ব ছয় হাজার বৎসর পর্যন্ত উর্ধ্বে গিয়েছেন, কেউ কেউ আবার খ্রীঃ পূর্ব এক হাজার অবধি নিম্নতম সীমারেখা টেনেছেন।

খ্রীষ্টধর্মের বাইবেল ও ইসলামধর্মের 'কুরাণ' বলতে একখানি মাত্র ধর্মগ্রন্থকে বোঝায় এবং

তার কাল নির্ণয় করা সহজ ও সম্ভব। কিন্তু 'বেদ' বলতে একটামাত্র গ্রন্থ বোঝায় না। বেদ বলতে চারটি বেদের চারটি সংহিতা, প্রতি বেদের 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থসমূহ, আরণ্যকরাজি ও উপনিষদ্রাশি বোঝায়। সুতরাং বেদের একটি নির্দিষ্ট কাল হতে পারে না। মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ রচনার ভিন্ন ভিন্ন কাল হবে। সেইজন্যই বেদের রচনাকাল নির্ণয় করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। এ বিষয়ে ম্যাক্‌স্‌মূলারের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য —"Whether the Vedic hymns were composed in 1000, or 1500, or 2000, or 3000 B. C, no power on earth will ever determine"—(Griffith lectures on Physical Religion 1889) অর্থাৎ 'বেদমন্ত্ররাজি খ্রীঃ পূর্ব ১০০০ অথবা ১৫০০ অথবা ২০০০ বা ৩০০০ বৎসর কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহা পার্থিব কোন শক্তিই কখনও নির্ণয় করিতে পারিবে না।' মনীষী বালগঙ্গাধর তিলক তাঁর 'Artic Home' ও 'Orion' নামে বিখ্যাত গ্রন্থ দুটিতে বেদ থেকে প্রাপ্ত জ্যোতিষ বিষয়ক তথ্য বিচার করে স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বেদের প্রাচীন সংহিতার কাল ৬০০০ খ্রীঃ পূর্ব থেকে ৪০০০ খ্রীঃ পূর্ব পর্যন্ত, এবং পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদির কাল ৪০০০ খ্রীঃ পূর্ব থেকে ২৫০০ খ্রীঃ পূর্ব পর্যন্ত। বেদজ্ঞ মার্কিন পণ্ডিত ব্লুমফিল্ড ৪৫০০ খ্রীঃ পূর্ব বৈদিক যুগের প্রারম্ভ কাল বলে ধরেছেন। অধ্যাপক সি. ভি. বৈদ্য সম্পূর্ণ বৈদিক যুগ ৪৫০০ খ্রীঃ পূর্ব থেকে ৮০০ খ্রীঃ পূর্ব পর্যন্ত ধরেছেন। ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ মে, বুদ্ধপূর্ণিমায় ভগবান্ বুদ্ধদেবের ২৫২৮তম জন্মজয়ন্তী পালিত হল। ভগবান্ বুদ্ধের জন্মের অনেক হাজার বৎসর পূর্বে বেদের রচনা। তাহলে বহু মতের বিচারের অরণ্যে দিশাহারা না হয়ে বলা যেতে পারে বেদের সংহিতাভাগের সূচনা ৬০০০ খ্রীঃ পূর্বে এবং বৈদিক গ্রন্থসমূহের রচনাকালের শেষ সীমা ১০০০ খ্রীঃ পূর্ব বৎসর ধরা যেতে পারে। অনেক মনীষীর প্রমাণবচন (বেদের রচনাকাল বিষয়ে) উদ্ধৃত করা গেল না স্থানাভাবে। ডঃ যোগীরাজ বসু মহাশয়ের রচিত 'বেদের পরিচয়' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য ও আলোচনা আছে।

বৈদিক মন্ত্রের বৈশিষ্ট্যঃ বৈদিক মন্ত্রগুলির বৈশিষ্ট্য নিরুক্তগ্রন্থে উল্লিখিত আছে।[১] ঋক্‌মন্ত্রগুলি তিনপ্রকার—পরোক্ষকৃত, প্রত্যক্ষকৃত ও আধ্যাত্মিক। পরোক্ষকৃত হল—সকল নামবিভক্তিযুক্ত, বিশেষতঃ প্রথমপুরুষে কথিত। যেমন—ইন্দ্র স্বর্গে থেকে পৃথিবী শাসন করেন ইত্যাদি। প্রত্যক্ষকৃত হল—ঋক্‌গুলি মধ্যমপুরুষযুক্ত, যেমন—হে ইন্দ্র! তুমি বলে প্রধান। তুমি শত্রু দমন করেছ, আমাদের বল দাও ইত্যাদি। আর আধ্যাত্মিক হল ঋক্‌গুলি 'আমি' সর্বনামযুক্ত অর্থাৎ উত্তমপুরুষে কথিত। উত্তমপুরুষযুক্ত মন্ত্রের সংখ্যা খুবই অল্প। দশম মণ্ডলের ৪৮, ৪৯, ১১৯ ও ১২৫-সংখ্যক সূক্তেই কেবল উত্তমপুরুষের প্রয়োগ দেখা যায়। উত্তমপুরুষে কথিত ঋক্‌গুলিই প্রাচীন আত্মজীবনীর উৎস—

১ "তাস্ত্রিবিধা ঋচঃ—পরোক্ষকৃতাঃ প্রত্যক্ষকৃতা আধ্যাত্মিক্যশ্চ। তত্র পরোক্ষকৃতাঃ সর্বাভির্নামবিভক্তিভির্যুজ্যন্তে, প্রথমপুরুষৈশ্চাখ্যাতস্য। ইন্দ্রো দিব ইন্দ্র ঈশে পৃথিব্যাঃ (১০।১৮।৩২) ...অথ প্রত্যক্ষকৃতা মধ্যমপুরুষযোগাস্ত্বমিতি চৈতেন সর্বনাম্না। ত্বমিন্দ্র বলাদধি (১০।১৫৩।২),... আধ্যাত্মিক্য উত্তমপুরুষযোগা অহমিতি চৈতেন সর্বনাম্না। যথৈতদিন্দ্রো বৈকুণ্ঠঃ (১০।৪৮,৪৯), লবসূক্তং (১০।১১৯) বাগাম্ভৃনীয়ম্ (১০।১২৫) ইতি। পরোক্ষকৃতাঃ প্রত্যক্ষকৃতাশ্চ মন্ত্রা ভূয়িষ্ঠাঃ, অল্পশঃ আধ্যাত্মিকাঃ। (নিরুক্ত—৭।১।১—৩)।

এগুলোকেই সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী বলা যেতে পারে।

আত্মজীবনীর বিষয়বস্তু ঃ ইন্দ্রের আত্মজীবনী—ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৪৮-সংখ্যক সূক্তের দেবতা বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র। ঋষিও ইন্দ্র। ১১টি ঋক্। (মূল সূক্তের বঙ্গানুবাদ ব্যবহার করছি)। (ইন্দ্র বলছেন)—১। আমি সম্পত্তিসমূহের প্রধান অধীশ্বর হয়েছি। আমি চিরকালই সকল সম্পত্তি জয় করে নিই। প্রাণিগণ পিতার ন্যায় আমাকে ডেকে থাকে। যে দাতা, আমি তাকে ভোগের সামগ্রী দিয়ে থাকি। ২। আমি অথর্বা ঋষির বক্ষস্থল রোধ করেছিলাম। আমি বৃত্রের নিকট গাভী সমস্ত কেড়ে ত্রিতকে দিয়েছিলাম। আমি দস্যুদের সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছিলাম। আমি দধীচের নিকট এবং মাতরিশ্বার নিকট গাভী সমস্ত তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। ৩। আমারি জন্য ত্বষ্টা লৌহময় বজ্র নির্মাণ করে দিয়েছেন, দেবতারা আমার জন্য কার্য নিরূপণ করে দিয়েছেন। আমার সৈন্যগণ সূর্যের সৈন্যের ন্যায় দুর্ধর্ষ, যে যা কিছু করেছে বা যা ভবিষ্যতে করবে, সকলেই আমার উপর নির্ভর করে। ৪। যখন কেউ স্তবের সাথে সোমরস দিয়ে আমাকে পরিতুষ্ট করে তখন আমি দাতা ব্যক্তিকে সহস্রাধিক গো, অশ্ব, মনুষ্য ও পশু, বাণ দ্বারা জয় করে দিই এবং অস্ত্রশস্ত্র শাণিত করি। ৫। কেউ কখন কোন সম্পত্তি আমার নিকট জয় করে নিতে পারেনি, মৃত্যুর নিকট কখন আমি নত হইনি। হে পুরুবংশীয়গণ! তোমরা সোমরস প্রস্তুত করে যা ইচ্ছা আমার নিকট যাচ্ঞা কর। দেখ আমার বন্ধুত্ব যেন কখন তোমরা হারিও না। ৬। এই যে সকল শত্রু, যারা প্রবল নিশ্বাস ত্যাগ করতে করতে দু-দুজন করে অস্ত্রধারী ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, যারা স্পর্ধাপূর্বক আমাকে আহ্বান করছিল, আমি ইন্দ্র, কঠোর বাক্য উচ্চারণপূর্বক তাদের এমন প্রহার করলাম যে, তারা নিধন হল। তারা নত হল, আমি নত হবার নই। ৭। যদি একজন আসে তাকেও আমি পরাভূত করি, যদি দুজন আসে তাদেরও পরাভব করি, তিনজন এসেই বা আমার কি করতে পারে? যেরূপ কৃষক ধান্য মর্দন করবার সময় পুরাতন ধান্যস্তম্ভ অনায়াসেই মর্দন করে, আমিও সেরূপ যত শত্রু আসুক না কেন অনায়াসে নিধন করি। ইন্দ্র যাদের প্রতি বিমুখ, সে সমস্ত শত্রু কি আমাকে নিন্দা অর্থাৎ পরাভব করতে পারে? ৮। আমিই গুঙ্গুদের দেশে প্রজাবর্গের মধ্যে অতিথিগুলির পুত্রকে স্থাপন করেছি, তিনি তাদের শত্রুসংহার করেছেন, বিপদ নিবারণ করছেন এবং মূর্তিমান্ ভক্ষ্য-ভোজ্যের মতো তাদের পালন করছেন। যে সময়ে পর্ণয় এবং করঞ্জ নামক শত্রুদ্বয়কে বধ করা হয়েছিল এবং বৃত্রের সাথে যে তুমুল যুদ্ধ হয়, তাতে আমার নাম বিখ্যাত হয়েছিল। ৯। আমাকে যে নমস্কার করে, সে সকলেরই আশ্রয় স্থানস্বরূপ হয়, সে অন্নবান্ ও ভোগবান্ হয়, তোমরা তার সাথে বন্ধুত্ব কর এবং গোধন গ্রহণ কর, এ দুই কার্য তোমাদের তার নিকট সম্পন্ন হবে। সে ব্যক্তির যুদ্ধ উপস্থিত হলে আমি নিজেই তার পক্ষে উজ্জ্বল অস্ত্র ধারণ করি, আমার প্রসাদে সে ব্যক্তি সকলের নিকট প্রশংসাভাজন হয়, সকলে তাকে স্তব করে। ১০। দৃষ্ট হল যে, দুজনের মধ্যে একজন সোমযাগ করেছে। পালনকর্তা ইন্দ্র তার পক্ষে বজ্র ধারণপূর্বক তাকে শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন করলেন। আর তার যে শত্রু সে তীক্ষ্ণতেজা সোমযাগকারী ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করতে উদ্যত হল, সে অন্ধকারমধ্যে আবদ্ধ হয়ে রইল। ১১। আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ—এরা সকলেই দেবতা, আমিও দেবতা। অতএব

আমি তাঁদের স্থান উৎখাত করি না, তাঁরা আমাকে এ উদ্দেশে নির্মাণ করেছেন, যে আমি চমৎকার অন্ন উৎপাদন করব। সে নিমিত্তই আমাকে কেউ পরাজয় বা হিংসা করতে পারে না, কেউ আমার সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে না।

৪৯ সূক্ত। ইন্দ্র ঋষি। তিনিই দেবতা। ১১টি ঋক্।

(ইন্দ্র বলছেন)—১। স্তবকারী ব্যক্তিকে আমি চমৎকার সম্পত্তি দান করি। আমি যজ্ঞানুষ্ঠানের পদ্ধতি করে দিয়েছি, এতে আমারই ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। আমি যজ্ঞকর্তাব্যক্তির উৎসাহদাতা হয়ে থাকি, আর যারা যজ্ঞ করে না তাদের যুদ্ধেই পরাভব করি। ২। স্বর্গের দেবতারা এবং ভূচর ও জলচর জন্তুরা আমাকে ইন্দ্র এ নাম দিয়েছে। আমার দুই তেজস্বী ঘোটক আছে, তারা অদ্ভুতলীলাবিশিষ্ট এবং অতিবেগবান্। আমি অন্ন উপার্জনের জন্য দুর্ধর্ষ বজ্র ধারণ করি। ৩। আমি কবি নামক ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য অৎক নামক ব্যক্তিকে প্রহারের দ্বারা বধ করেছি। আমি রক্ষণোপযোগী নানাকার্য সাধন করে কুৎস নামক ব্যক্তিকে রক্ষা করেছি। আমি শুষ্ণ নামক ব্যক্তির বধের জন্য বজ্র ধারণ করেছিলাম। আমি দস্যুজাতিকে "আর্য"—এ নাম হতে বঞ্চিত রেখেছি। ৪। কুৎস বেতসু নামক প্রদেশ কামনা করেছিল, আমি তার পিতার ন্যায় বেতসু প্রদেশ তার বশীভূত করে দিলাম, এবং তুগ্র ও স্মদিভ—এ দুই ব্যক্তিকে কুৎসের বশীভূত করে দিলাম। আমার প্রসাদেই যজ্ঞকর্তা শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হয়। আমি পুত্রের ন্যায় তাকে প্রিয়বস্তু প্রদান করি, তাতে সে দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে। ৫। যেকালে শ্রুতর্বা আমার শরণাগত হল এবং স্তব করতে লাগল, আমি মৃগয়া নামক ব্যক্তিকে তার বশীভূত করে দিলাম। আমি বেশকে আয়ুর বশীভূত করে দিয়েছি; আমি বটগৃভিকে সব্যের বশীভূত করে দিয়েছি। ৬। আমি সে ইন্দ্র, যেমন বৃত্রের হন্তা হয়ে বৃত্রকে নিধন করেছিলাম। সেরূপ দাসজাতীয় নববাস্ত্ব ও বৃহদ্রথ নামক দুই ব্যক্তিকে ভগ্ন করেছি। সে সময়ে ঐ দুই শত্রু বৃদ্ধি ও বিস্তারপ্রাপ্ত হচ্ছিল, আমি তাদের পশ্চাৎ সংলগ্ন হয়ে সূর্যালোক সমুজ্জ্বলিত এ ভুবনের বহির্ভূত করে দিলাম। ৭। আমার যে শীঘ্রগামী ঘোটক-গুলি আছে তারা আমাকে বহন করে, আমি সে বহনে সূর্যের চতুর্দিকে বিচরণ করি। যখন মনুষ্য সোম প্রস্তুত করে শোধন করবার জন্য আমাকে অনুরোধ করে, আমি তখন দাসজাতীয় ব্যক্তিকে প্রহার করে দ্বিখণ্ড করি, ঐ দশার জন্যই সে জন্মেছে। ৮। আমি সপ্ত শত্রুপুরী ধ্বংস করেছি। যে যত বড় বন্ধনকর্তা হোক, আমি তা অপেক্ষাও অধিক বন্ধনকর্তা। তুর্বস ও যদু—এ দুই ব্যক্তিকে আমি বলবান্ বলে খ্যাত্যাপন্ন করেছি। আমি অন্যান্য ব্যক্তিকেও বলে বলী করেছি। নবনবতি নগরকে আমি বিনষ্ট করেছি। ৯। আমি জল বর্ষণ করে থাকি, যে সপ্তসিন্ধু দ্রবময় মূর্তিতে পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়, আমিই তাদের স্ব স্ব স্থানে রেখে দিয়েছি। আমার সকল কার্যই শুভ-কর, আমিই জল বিতরণ করে থাকি। আমি যুদ্ধ করে যজ্ঞকর্তার জন্য পথ পরিষ্কার করে দিয়েছি। ১০। গাভীর দেহে আমি এরূপ বস্তু রেখে দিয়েছি, যা দেব ত্বষ্টা রচনা করতে পারেননি। অর্থাৎ গাভীগণের আপীনমধ্যে মধু অপেক্ষাও মধুরতর অতি চমৎকার পরিষ্কার দুগ্ধ উৎপাদন করে দিয়েছি। সেই আপীন নদীর ন্যায় দুগ্ধ বহন করে। তা সোমের সাথে মিশ্রিত হলে তাকে অতি চমৎকার করে তোলে। ১১। (পরোক্তিতে বলছেন) এরূপে ইন্দ্র আপন প্রভাবে দেবমনুষ্যসৌভাগ্য সম্পন্ন করেন, তাঁরই ধন আছে, তাঁর ধনই যথার্থ। হে ইন্দ্র! হে ঘোটকবিশিষ্ট! হে বিবিধ কার্যকারী! তোমার

কার্য তোমার নিজের আয়ত্ত। দেবমনুষ্যগণ ব্যস্তসমস্ত হয়ে তোমার সেই সমস্ত কার্যের স্তব করছেন।

১১৯ সূক্ত। লবরূপী ইন্দ্র দেবতা। তিনিই ঋষি। ১৩টি ঋক্। (ইন্দ্র বলছেন) ১। আমার মানসই এই যে, গো, অশ্ব দান করি। আমি অনেকবার সোমপান করেছি। ২। যেমন বায়ু বৃক্ষকে কম্পিত ও উন্নমিত করে সেরূপ সোমরস আমাকর্তৃক পীত হয়ে আমাকে উন্নমিত করেছে। আমি অনেকবার সোমরস পান করেছি। ৩। যেরূপ শীঘ্রগামী ঘোটকেরা রথকে উন্নমিত রাখে, সেরূপ সোমরসগুলি আমাকর্তৃক পীত হয়ে আমাকে উন্নমিত করে রেখেছে। আমি অনেকবার ইত্যাদি। ৪। যেরূপ গাভী হম্বারবে বৎসের প্রতি যায় সেরূপ স্তব আমার দিকে আসছে। আমি অনেকবার ইত্যাদি। ৫। যেরূপ ত্বষ্টা (ছুতার) রথের উপরিভাগ নির্মাণ করে সেরূপ আমি মনে মনে স্তব রচনা করেছি অর্থাৎ স্তোতার মনে স্তব উদয় করে দিই। আমি অনেকবার ইত্যাদি। ৬। পঞ্চজনপদের যে মনুষ্য আছে, তারা কেউ কখন আমার দৃষ্টি অতিক্রম করতে পারে না। আমি অনেকবার ইত্যাদি। ৭। দুই দ্যাবাপৃথিবী মিলিত হয়ে আমার এক পার্শ্বেরও সমান হবে না। আমি অনেকবার ইত্যাদি। ৮। আমার মহিমা স্বর্গলোককে এবং এ বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে অতিক্রম করে। আমি অনেকবার ইত্যাদি। ৯। আমার এরূপ ক্ষমতা যে যদি বল, তবে এ পৃথিবীকে একস্থান হতে অন্য স্থানে সরিয়ে রাখতে পারি। আমি অনেকবার ইত্যাদি। ১০। এ পৃথিবীকে আমি দগ্ধ করতে পারি। যে স্থান বল সে স্থান ধ্বংস করতে পারি। আমি অনেকবার ইত্যাদি। ১১। আমার এক পার্শ্বদেশ আকাশে আছে আর-এক পার্শ্বদেশ নিচের দিকে অর্থাৎ পৃথিবীতে রেখেছি। আমি অনেকবার ইত্যাদি। ১২। আমি মহতেরও মহৎ, আমি আকাশের দিকে উঠেছি। আমি অনেকবার ইত্যাদি। ১৩। আমাকে স্তব করে, আমি দেবতাদের নিকট হব্য বহন করি এবং আমি হব্য গ্রহণ পূর্বক চলে যাই। আমি অনেকবার, ইত্যাদি।

১২৫ সূক্ত। দেবীসূক্ত। পরমাত্মা দেবতা। বাক্ ঋষি। ৮টি ঋক্ (মহর্ষি) অম্ভৃণ নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁর কন্যা বাক্। ইনি ব্রহ্মবিদুষী—ব্রহ্মকে জেনেছেন তিনি। 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'—ব্রহ্মজ্ঞই ব্রহ্ম হয়ে যান। এই দেবী বাক্ আত্মোপলব্ধি করেছেন। আত্মানুভূতির দ্বারা নিজেকে জগৎরূপে—সকলের অধিষ্ঠাতৃরূপে জেনেছেন। জগতের সবকিছুই তিনি হয়েছেন —একথা স্বমুখে ব্যক্ত করেছেন।

বাগ্দেবীর উক্তি—১। আমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সঙ্গে বিচরণ করি, আমি আদিত্যদের সঙ্গে এবং সকল দেবতাদের সঙ্গে থাকি, আমি মিত্র ও বরুণ—এ উভয়কে ধারণ করি, আমিই ইন্দ্র ও অগ্নি এবং দুই অশ্বিদ্বয়কে অবলম্বন করি। ২। আমি শত্রুনাশকারী সোমদেবকে, ত্বষ্টাকে এবং পূষা ও ভগকে ধারণ করি; হবিষ্মান্ দেবগণের তৃপ্তিসাধনকারী এবং সোমাভিষবকারী (সোমলতা হইতে সোমরস আহরণকারী) যজমানের জন্য ধনাদি বিধান করি। ৩। আমি ঈশ্বরী, ধনসমূহের প্রদানকারিণী, পরব্রহ্মজ্ঞানবতী ও যজ্ঞার্হগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা; ঈদৃশগুণবিশিষ্টা, প্রপঞ্চরূপে বহুভাবে অবস্থিতা এবং বহুভূতমধ্যে জীবরূপে প্রবিষ্টা আমাকেই দেবতারা বহুদেশে (কর্মরূপে) সম্পাদন করিয়া থাকেন। ৪। যে অন্ন ভক্ষণ করে সে আমার দ্বারাই করে; যে দর্শন করে, শ্বাসপ্রশ্বাসাদি করে, কথিত বিষয় শ্রবণ করে, সেও আমার দ্বারাই করে; যাহারা ঈদৃশা আমার বিষয়ে জ্ঞানহীন, তাহারা সংসারে

হীন হইয়া থাকে; হে কীর্তিমান্ সখে, শ্রবণ কর, শ্রদ্ধা দ্বারা লভ্য বস্তু তোমায় উপদেশ করিতেছি। ৫। আমি স্বয়ং দেবগণের দ্বারা ও মনুষ্যগণের দ্বারা সেই ব্রহ্মাত্মক বস্তুর উপদেশ করিতেছি; ঈদৃশরূপা আমি যাহাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি সেই সেই পুরুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ করি; তাহাকে ব্রহ্মা করি, তাহাকেই ঋষি করি, তাহাকেই উত্তম প্রজ্ঞাশালী করি। ৬। ব্রাহ্মণদিগের দ্বেষকারী অসুরকে নাশ করিবার জন্য আমি মহাদেবের ধনু জ্যা সংযুক্ত করি, আমি সজ্জনের রক্ষার জন্য সংগ্রাম করি এবং আমিই স্বর্গ ও মর্ত্যে অন্তর্যামী-রূপে প্রবেশ করি। ৭। আমি দ্যুলোককে সর্বাধার পরমাত্মার উপরিভাগে উৎপন্ন করিয়াছি, বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত ব্রহ্মচৈতন্যই আমার কারণ; সুতরাং সমস্ত প্রাণীতে প্রবেশ করিয়া আমিই বিবিধরূপে বর্তমান আছি; অধিকন্তু ঐ স্বর্গাদিকেও আমি নিজ মায়াত্মক দেহের দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়াছি। ৮। সমস্ত ভূতবর্গকে উৎপাদন করিয়া আমিই বায়ুর ন্যায় স্বাধীনভাবে প্রবৃত্ত হই; আকাশের এবং পৃথিবীর ঊর্ধ্ববর্তিনী আমিই মহিমায় এতাদৃশ হইয়াছি।

আত্মজীবনীগুলির মধ্যে ইন্দ্রের আত্মজীবনী নিঃসন্দেহে বিষয়বস্তুতে অপেক্ষাকৃত বড়, তবুও বলা যায় দার্শনিকতত্ত্বে ও লীলাবৈচিত্র্যে দেবীসূক্তই শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়। ভক্তজনের কাছে এর আবেদন ব্যাপক। দেবীসূক্তকে অবলম্বন করেই বিশাল 'চণ্ডীগ্রন্থ' গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন পুজোৎসবে, স্বস্ত্যয়নাদি কর্মে চণ্ডীপাঠকালে শ্রীজগদম্বাপ্রীতির জন্য দেবীসূক্ত পাঠের বিধান আছে। সপ্তশতী পাঠান্তে এই সূক্তের পাঠে বিনিয়োগ হয়ে থাকে। বাংলাদেশে দুর্গাপূজায় চণ্ডীপাঠকালে দেবীসূক্ত পঠিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় পরবর্তী কালের মহাকাব্যেও সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপদর্শনযোগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের কথা কিছু বলেছেন।

অতীতকে অগ্রাহ্য করে কোনও ঐতিহ্য গড়ে উঠতে পারে না। সুন্দর ও মহৎ হতে গেলে নিজেদের অতীত সুন্দর ও মহতের খোঁজ নিতে হয়। বর্তমানকালে আত্মজীবনীমূলক রচনার গৌরবের দিনে প্রাচীন এই আত্মজীবনীর অবদান অস্বীকার করি কি করে?

হে প্রিয় পৃথিবী

শ্রীমতী নিভা দে
কবি ও লেখিকা।

হায় প্রিয় পৃথিবী
তোমাকে সর্বংসহা পেয়ে
মানুষের ক্ষিধে আর মেটে না
খুঁড়ে-খুঁড়ে খুঁজে-খুঁজে তছনছ করে ফেলে তোমাকে।
অথচ মানুষের মাঝে আছে আজও কিছু মানুষ
সহ্যের আনন্দে যারা তোমাকেও হারাতে পারে—
সর্বংসহা সেই সব মানুষের শ্রম
তোমাকে করে আরো রমণীয় সুন্দর—
হে প্রিয় পৃথিবী,
তারা হয় প্রিয়তর তাই আমাদের কাছে
আরো আরো বেশি।

নানা প্রসঙ্গে

চিরন্তন কাহিনী

উমা শিবকে জিজ্ঞাসা করলেন: হে নাথ, কাকভুষণ্ডীর কথা কোথায় শুনলেন? আর মহাজ্ঞানী বিষ্ণুসেবক গরুড় মুনিগণের কাছে না গিয়ে ওই কাকের কাছেই বা কেন গেল?

উত্তরে শিব বললেন: প্রিয়ে, সে-কাহিনী শুনলে জীবের সমস্ত মোহ দূর হয়ে যায়। ভবসাগর অনায়াসে পার হওয়া যায়।

প্রিয়ে, তুমি পূর্বে দক্ষকন্যা সতী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলে। দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা শুনে তুমি অপমানিতা হয়ে অভিমানে দেহত্যাগ করেছিলে। তোমার দেহত্যাগে আমি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ি। শোক-অপনোদনের জন্য চারিদিকে পরিভ্রমণ করে বেড়াই। কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলাম না। অবশেষে আমি সুমেরু পর্বত থেকে দূরে চারটি শিখরবিশিষ্ট নীল পর্বতে উপস্থিত হই। সেখানে এক মনোরম পরিবেশে এই কাকভুষণ্ডী বাস করে। কল্পান্তেও তার বিনাশ নেই। মোহ, কাম, শোক, তাপ সে-পর্বতের ত্রিসীমানায় যেতে পারে না। সেখানে ওই কাক হরিভজন ছাড়া আর কিছুই করে না। বহু পাখি তার মুখে শ্রীরামচরিত গান শোনে। আমিও আনন্দের সঙ্গে রাজহাঁসের দেহধারণ করে তার মুখে শ্রীরামচরিত-কথা শুনি। তারপর আমি কৈলাসে ফিরে আসি।

হে শিবানি, গরুড় কেন কাকভুষণ্ডীর কাছে গিয়েছিল সেকথা এবার শোন। রঘুনাথ যখন লঙ্কায় রাবণের সঙ্গে যুদ্ধের খেলা খেলছিলেন, তখন তিনি ইন্দ্রজিতের নাগপাশ-বাণে বন্দী হন। নারদ গরুড়কে তাড়াতাড়ি প্রভুর বন্ধন ছেদন করার জন্য পাঠান। গরুড় রঘুনাথের বন্ধন মুক্ত করে দেয়, কিন্তু তার মনে সংশয় জাগে—রামনাম জপ করে মানুষ ভববন্ধন মুক্ত হয়, আর তুচ্ছ এক রাক্ষস কি করে নাগপাশে তাঁকে বেঁধে ফেলল! এতো বড় অদ্ভুত ব্যাপার! গরুড় তার সংশয়ের কথা নারদকে বলল। নারদ তাকে বললেন: প্রভুর মায়া বোঝা বড় কঠিন। তুমি বরঞ্চ ব্রহ্মার কাছে যাও। তিনিই তোমার সব সংশয় দূর করে দেবেন। গরুড় ব্রহ্মার কাছে গেলে তিনি আবার তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। আমি তখন কুবেরের কাছে যাচ্ছিলাম। সেই সময় তাকে রামচরিত-কথা বললেও বুঝতে পারত না। কারণ দীর্ঘকাল ধরে সাধুসঙ্গ করে চিত্তশুদ্ধি না হলে রামচরিত-কথা বোঝা যায় না। আর যেহেতু সে নিজে পাখি, তাই পাখির কথাই সে ভাল বুঝবে। এইজন্য গরুড়কে আমি কাকভুষণ্ডীর কাছে পাঠিয়েছিলাম।

হে গৌরি, গরুড় আমাকে প্রণাম করে কাকভুষণ্ডীর কাছে নীলগিরিতে চলে গেল। সর্বদা হরিকথা হয়। সেখানে শোক-মোহের কোন সংস্রব নেই। অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। এরকম মনোহর পরিবেশ দূর থেকে দর্শন করে গরুড়ের আনন্দ হয় এবং তার মোহ দূর হয়ে যায়।

হে শিবানি, কাকভুষণ্ডী প্রতিদিনের মতো তার আশ্রমে বটবৃক্ষতলে বসে অন্যান্য পাখিদের সামনে রামচরিত গুণগান শুরু করতে যাবে এমন সময় গরুড় সেখানে এসে উপস্থিত হয়। কাক তাকে আদরের সঙ্গে আপ্যায়ন করে তার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করল। গরুড় বলল: তুমি ধন্য, স্বয়ং শিব তোমার স্তুতি করেন। আমি যেজন্য এখানে এসেছি তা তোমার দর্শনমাত্রেই হয়েছে। তোমার আশ্রম দেখে আমি কৃতার্থ। তোমার মুখে রামকথা শুনতে চাই।

কাক আনন্দের সঙ্গে রামচরিত বর্ণনা আরম্ভ করল। তার মুখে রামকথা শুনে গরুড়ের রামায়ণের প্রতি বিশ্বাস জন্মায়। রামচন্দ্রের প্রতি দৃঢ় ভক্তি হয়। শ্রীহরির মনুষ্যদেহধারী রূপ—রামচন্দ্রের লীলাখেলায় তার আর কোন সন্দেহ রইল না।

হে গৌরি, গরুড়ের সংশয় দূরীভূত হওয়ায় কাক বলল: প্রভুর মায়ায় কে না নাকানি-চুবানি খেয়েছে। স্বয়ং ব্রহ্মা, শিব, নারদ প্রভৃতি কেউই তাঁর মায়া থেকে নিস্তার পাননি। আর সাধারণ মানুষের কথা আর কি বলব! রঘুপতির মায়ার অসীম শক্তি। তাঁর সম্বন্ধে আমারও একবার মোহ হয়েছিল হে গরুড়, শোন সে-কাহিনী:

প্রভু যখন মনুষ্যদেহধারণ করে দশরথের পুত্র হন তখন আমি অযোধ্যায় যাই। প্রভু অপরূপ সুন্দর বালকরূপে রাজপ্রাসাদের উঠানে খেলায় সদা ব্যস্ত। আমিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরি। তিনি ধরতে এলে আমি পালিয়ে যাই। তখন তিনি আমাকে পিঠে দেখান। কাছে যাই আনন্দ পান, পালিয়ে গেলে কাঁদেন। সাধারণ বালকের মতো তাঁর বাল্যলীলা দেখে আমার মোহ হয়। যিনি জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, তাঁর এ কিরূপ লীলা—বুঝতে পারি না, মোহগ্রস্ত হই। তাঁর শ্রীচরণে ভক্তি থাকায় মায়া আমাকে আবৃত করলেও দুঃখ দিতে পারল না।

তাঁর অদ্ভুত বাল্যলীলা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আমাকে ধরার জন্য তিনি হাত বাড়িয়েছেন, আমি দূরে উড়ে পালিয়ে গেছি। আমি উড়তে উড়তে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত চলে গিয়েছি, তাঁর হাতও সে-পর্যন্ত গিয়েছে। তাঁর হাত ও আমার মধ্যে দূরত্ব মাত্র দু আঙুল। ভয় পেয়ে চোখ বুজি। চোখ খুলে দেখি আমি অযোধ্যায়। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। তখনই তাঁর মুখের মধ্যে চলে গেলাম। তাঁর উদরের মধ্যে দেখলাম অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। তাঁর অনন্ত সৃষ্টি। প্রায় একশত কল্প ধরে শত শত লোক পরিভ্রমণ করেছি। শেষে এই আশ্রমে এসে উপস্থিত। অযোধ্যায় তাঁর জন্মোৎসব হওয়ার কথা শুনে, সেখানে গিয়ে তা দেখেছি। তাঁর উদরে যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে, তেমনি সৃষ্টিতে একমাত্র তিনিই বিদ্যমান রয়েছেন। দেখে আমি বিমুগ্ধ হই। আমার এই অবস্থা দেখে তিনি হাসতে লাগলেন। প্রভুর চরিত্র ও বিভাব দেখে আমি নিজের শরীরবোধ ভুলে মাটিতে পড়ে যাই। তাঁর সুকোমল হস্ত দ্বারা তিনি আমাকে স্পর্শ করেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত মোহ দূর হয়ে গেল। প্রভু আমাকে বর চাইতে বললেন। তোমার প্রতি আমার শুদ্ধাভক্তি দাও—এই বর আমি প্রার্থনা করি। শ্রীভগবান সেই শুদ্ধাভক্তি আমাকে দান করে বলেন: 'এই ভক্তিবলে সমুদয় শুভগুণ তোমার হৃদয়ে বাস করবে। জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক সহজলভ্য হবে এবং মায়াজনিত কোন ভ্রম তোমাকে আর কখনও বিচলিত করবে না।' অনেক অত্যাশ্চর্য কথা বলে প্রভু আরও বললেন: 'হে কাক, তুমি সকল মায়া ত্যাগ করে আমার ভজনা কর, কাল তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।' শিশু-বালক রামের

প্রবোধবাক্যে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হল। এইভাবে তাঁর কাছে শুদ্ধাভক্তি লাভ করে এই আশ্রমে ফিরে আসি এবং তাঁর পাদবন্দনা করে দিনযাপন করি।

হে গৌরি, কাকভুষণ্ডী এইভাবে শ্রীরামচন্দ্রের নামগুণকীর্তন করে। শুনে গরুড়ের শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি যে সংশয় উপস্থিত হয়েছিল তা দূর হয়ে যায়। গরুড় কাকের ভূয়সী প্রশংসা করে তার কাকদেহ ধারণের কারণ জিজ্ঞাসা করে। তখন কাকভুষণ্ডী নিজের সম্বন্ধে বলেন: হে পক্ষিশ্রেষ্ঠ, জপ, তপস্যা, যজ্ঞ, দান, বৈরাগ্য প্রভৃতির মূল রামভক্তি লাভ। এই কাকদেহে আমি রঘুনাথের শ্রীচরণে ভক্তিলাভ করি। মৃত্যু আমার ইচ্ছাধীন হলেও আমি এই পক্ষিদেহ ত্যাগ করিনি। কারণ দেহ ছাড়া ভজন হয় না। আমি বহু দেহধারণ করেছি, কিন্তু এখনকার মতো সুখী কখনও হইনি। তাই এই কাকদেহের প্রতিই আমার এত মমতা।

হে খগপতি, আমার প্রথম জন্মের কথা শোন: আমি প্রথম কল্পের কলিযুগে শূদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করি। শিবের সেবক ছিলাম। অন্যান্য দেবতার নিন্দা করতাম। আবার আমার খুব অভিমানও ছিল। অযোধ্যাতে আমি থাকতাম, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা জানতাম না। রামচন্দ্রগত-প্রাণ না হলে তাঁর মহিমা জানা যায় না।

হে খগেশ, অনেক বছর অযোধ্যায় বাস করার পর আমি মহা বিপদে পড়ি। দারিদ্র্য ও দুঃখের মধ্যে পড়ে উজ্জয়িনী যাই এবং শিবের সেবা করে ধনসম্পদ উপার্জন করি। সেখানে এক শিবপূজক ছিলেন। তিনি সত্যিকারের একজন দয়ালু ও উদার সাধু ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কখনও হরি বা অন্য কোন দেবতার নিন্দা করতেন না। তাঁকে আমি গুরুরূপে বরণ করি। আমি তাঁর সঙ্গে কপট আচরণ করলেও তিনি কিন্তু সর্বদাই আমার সঙ্গে পুত্রবৎ ব্যবহার করতেন। আমি হরি নিন্দা করলে তিনি সদুপদেশ দিয়ে নিন্দা থেকে বিরত হতে বলতেন। আমি দুষ্ট ও নীচকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। আমার হৃদয় ছিল মলিন। একদিন আমি শিবমন্দিরে বসে জপ করছি। আমার গুরুদেব সেখানে এসে উপস্থিত হন। আমি উঠে দাঁড়াইনি এবং তাঁকে প্রণামও করিনি। গুরুর প্রতি আমার এই অশ্রদ্ধা ভগবান শঙ্কর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি আমাকে অভিশাপ দিলেন: 'গুরুর প্রতি অবমাননার জন্য তুই অজগর সাপরূপে জন্মিয়ে কোন বড় গাছের কোটরে বাস করবি।' অভিশাপবাক্য শুনে আমার দয়াল গুরুদেব হাহাকার করে উঠলেন। কাঁদতে কাঁদতে শিবস্তুতি করতে লাগলেন আমার অপরাধ মার্জনা করার জন্য। তাঁর স্তুতিতে শিব প্রসন্ন হলেন। আকাশবাণী হল: 'এ ব্যক্তির পাপ নিদারুণ হলেও তোমার কোমল ব্যবহার দেখে এর প্রতি কৃপা করব। তবে আমার শাপ ব্যর্থ হওয়ার নয়। একে সহস্রবার জন্ম গ্রহণ করতে হবে। নতুন জন্ম হলেও পূর্বজন্মের জ্ঞান লোপ পাবে না। যেহেতু রঘুপতির অযোধ্যাপুরীতে জন্ম এবং আমার সেবায় মন দিয়েছিল, এজন্য আমার অনুগ্রহে এর হৃদয়ে রামভক্তির উদয় হবে।'

কালবশে আমি বিন্ধ্যপর্বতে সাপ হয়ে জন্মগ্রহণ করলাম। তারপর বিভিন্ন দেহধারণ করে রামভজনা করি। একদিন মেরুপর্বতের শিখরে বটচ্ছায়ায় লোমশমুনি বসে আছেন মুনিবরকে শ্রদ্ধাপূর্বক প্রণাম করলে তিনি আমার উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন। আমি তাঁকে সগুণ ব্রহ্মের আরাধনার কথা জিজ্ঞাসা করি। তিনি রঘুপতির গুণ বর্ণনা করে, শেষে নির্গুণ ব্রহ্মের বিচার-বিশ্লেষণ আরম্ভ করেন। নির্গুণ ব্রহ্মের কথা

আমার হৃদয়কে স্পর্শ করল না। আমি স্বচক্ষে কিভাবে রঘুনাথকে দর্শন করতে পারি, তা জিজ্ঞাসা করি। তিনি সেকথার কোন উত্তর না দিয়ে নিগু‍র্ণ ব্রহ্মের মত প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। আমিও সগুণ ব্রহ্মের মত প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করতে লাগলাম। মুনিশ্রেষ্ঠ এতে বিরক্ত হলেন। তাঁর কথার অবমাননার জন্য তিনি আমাকে অভিশাপ দিলেন: 'তোমাকে শিক্ষা দিচ্ছি, অথচ তুমি আমার সঙ্গে তর্ক করছ। কাকের মতো সব কথাতেই তুমি ভয় পাও। তুমি স্বপক্ষ প্রতিষ্ঠা চাও। তুমি এখনই পাখিদের চণ্ডাল অর্থাৎ কাক হও।'

হে গরুড়, আমি সে-শাপ মাথা পেতে নিলাম। আমি তখনই কাক হয়ে শ্রীরামকে স্মরণ করতে করতে উড়ে গেলাম। মুনিবরের কোন দোষ নেই। আমি রঘুনাথের ভক্ত জেনে, তিনি আমাকে আদর করে রামমন্ত্র দিলেন। তিনি আমাকে বালকরূপ শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান শেখান। তাঁর কাছে কিছুকাল আমাকে রেখে রামচরিত বর্ণনা করেন এবং বলেন, যার হৃদয়ে রামভক্তি নেই তাকে একথা বলো না। তারপর তিনি আমাকে আশীর্বাদ করেন: 'তুমি অভিমান-শূন্য হও। তুমি ইচ্ছা মতো যে-কোন রূপ গ্রহণ করতে পার। মৃত্যু তোমার ইচ্ছাধীন, তুমি জ্ঞান-বৈরাগ্যের নিবাসস্থান হও। তুমি যেখানে বাস করবে সেখান থেকে একযোজন দূর পর্যন্ত অজ্ঞান ব্যাপ্ত হবে না। কোন দুঃখ তোমাকে স্পর্শ করবে না। শ্রীরামচন্দ্রের সকল মহিমা তুমি অনায়াসে জানতে পারবে।' লোমশমুনির আশীর্বাদ লাভ করে আমি এই আশ্রমে সাতাশ কল্প কাল ধরে বাস করছি। এখানে রঘুনাথের গুণবর্ণনা করি আর শ্রদ্ধাসম্পন্ন পাখিরা তা আদর করে শোনে। এই হচ্ছে আমার কাকদেহ ধারণের ইতিহাস।

হে পার্বতি, পরম ভক্ত কাকভূষণ্ডীর পুণ্যকথা এত সময় ধরে শুনলে তো। তার কথা যে ভক্তিসহকারে শ্রবণ করবে, তার সমস্ত মোহ দূর হয়ে যাবে [রামচরিতমানস, উত্তরার্ধ]

স্মৃতি:

সত্যযুগের আবির্ভাব; ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে

সেইবার কাশীতে একদিন বাবুরাম মহারাজ— পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দজী দাউজীর (দাদাজী-বলরাম) মন্দির দেখতে গেলেন, সঙ্গে আমি, যোগী (কৈবল্যানন্দ) ও বলাইদা (অবধূতানন্দ)। প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড, সেবাশ্রমের কাছেই। এমন সুন্দর মূর্তি ও হাসি খুবই কম দেখা যায়। এখানে আমাদের আশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারীরা গোপনে জপধ্যান করতে আসেন, বিশেষতঃ চারুবাবু (স্বামী শুভানন্দ)। জুঁই, বেল, মল্লিকার ঝাড় চারিপাশে। এখানে আবার টোল আছে, বিদ্যার্থীদের থাকবার ছোট ছোট ঘর। ব্যাকরণ, স্মৃতি, ন্যায়, বেদান্ত প্রভৃতি মোটামুটি পড়া হয়, বিদ্যার্থীরা খেতেও পায়। বাবুরাম মহারাজ একখানা বেঞ্চিতে বসে বলতে লাগলেন—

"এসব হিন্দু আমলের প্রাচীন ঠাট কেবল বজায় আছে। শাস্ত্র, পণ্ডিত, বিদ্যার্থীদের প্রতি রাজা-রাজড়া হতে সাধারণ লোকের আর তেমন শ্রদ্ধা নেই, কারণ সংস্কৃত ভাষার দ্বারা এখন আর অন্নসংস্থান হয় না। কারণ ম্লেচ্ছ রাজা, তাদের ভাষা ও শাস্ত্র না পড়লে চাকরি-বাকরি পাওয়া যায় না, তারা রাজ্য চালায় তাদের ভাষা ও শাস্ত্র দিয়ে, এতে ভারতের মূল সনাতন অনুশীলন একেবারে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। একটা পণ্ডিতের মাইনে ত্রিশ-চল্লিশ টাকা, কিন্তু একটা

প্রফেসারের মাইনে দেড়শ-দুশ থেকে চার-পাঁচশ টাকা।—কে সংস্কৃত পড়বে? বা দেশ-বিদেশ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার নিয়ে এসে সংস্কৃতের পুষ্টিসাধন কোরে তাকে বাঁচিয়ে রাখবার কার দায় পড়েছে? ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাচীন যা কিছু সব নষ্ট করা, ভুল প্রমাণ করা, প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে পুষ্ট কোরে তোলা নয়,—এর নাম হচ্ছে রিসার্চ। এইটে সিদ্ধ হলেই প্রাচ্যের পাশ্চাত্যের নিকট শিষ্যত্ব কায়েমী হয়। এ বিদ্যা গঠনমূলক একেবারেই নয়, এ হলো ধ্বংসাত্মক নীতি। স্বামীজী শেষদিন আমাকে বলে গেলেন, যাতে প্রাচীন ধারা বজায় থাকে, অথচ নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও তার সহিত অনুশীলন হয়, এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়বার জন্ত। বেলুড় গাঁয়ে বেড়াতে বেড়াতে দেখালেন, 'এই সব জমি নিয়ে এখানে ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।' এ সব টোলে বড় জোর দু-চারটে গোঁড়া পুরুত-টুরুত তৈরি হতে পারে যাতে 'জনেউ' (পৈতা) 'সাদির' (বিবাহের) ঠাটটা বজায় থাকে। আবার এ সব পুরুতরা নীচ জাতির যজন-যাজন করে না, তাহলে জাত যাবে, পতিত ব্রাহ্মণ হয়ে যাবে। এতে যে কি ভীষণ অনর্থের সৃষ্টি হচ্ছে এই অদূরদর্শী বামুনরা তার কিছুই বুঝতে পারছে না; এরা ইংরেজী শিখে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম হতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমগ্র হিন্দুজগতের মহাশত্রু হয়ে দাঁড়াবে। স্বামীজী ব্রাহ্মণদের ধ্বংস করতে বলেননি, পরন্ত সমস্ত জাতটাকে ব্রাহ্মণদের সদাচার এবং শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে ব্রাহ্মণ কোরে তুলতে বলেছেন। তিনি যে শূদ্র জাতির আবির্ভাবের কথা বলেছেন, যাদের ব্যবহারিক ধর্ম হচ্ছে সেবা-ধর্ম, বেদান্তের ভিত্তিতে। তারা আধুনিক অপদার্থ শূদ্র নয়, তাদের নবীন রূপ হবে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সমবায়ে এক অভূতপূর্ব জাতি, যাদের ব্যবহারিক জীবনের নৈতিক মান স্বামীজী প্রচারিত শ্রীরামকৃষ্ণাদর্শ-ভিত্তিতে। সেই আদর্শ 'হংস' জাতি গড়ে তোলবার ভার দিয়ে গেছেন স্বামীজী তোদের ওপর; এ আদর্শ সুসম্পন্ন যদি করতে পারিস তো ফের সত্যযুগের আবির্ভাব হবে। আর সে হবেই। স্বামীজী বলতেন, 'ঠাকুরের পাদস্পর্শে ধীরে ধীরে সত্যযুগের আবির্ভাব হচ্ছে; তবে তার মধ্যকার ব্যাপারটা অনেক ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে তৈরি হবে।' বড় কাজ কি আর একদিনে হয় ?"

[স্বামী বাসুদেবানন্দের স্মৃতি-চারণা থেকে]

জ্ঞান-বিজ্ঞান

মোটর ও বিমানচালকদের ঘুম পাওয়ার সংকেত-যন্ত্র

ইজরায়েলের জেরুসালেমে 'জানাণ্ড' নামক কোম্পানি 'অনগার্ড' (Onguard) নামে একটি ছোট ইলেকট্রনিক যন্ত্র আবিষ্কার করেছে যেটি চশমার সঙ্গে লাগানো থাকলে, চোখের পাতা আধ সেকেণ্ডের বেশি বোজা থাকবামাত্র এমন একটি শব্দ হতে থাকবে যাতে চালক তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে সচকিত হয়ে যাবেন। যন্ত্রটির বিভিন্ন অংশ আমেরিকা ও ইজরায়েলের বিভিন্ন কোম্পানি তৈরি করেছে। সম্প্রতি এটি আমেরিকার বাজারে বিক্রয় হচ্ছে—দাম ১২০ ডলার (প্রায় এক হাজার টাকা)। এটির তৈরিতে দুটি বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে: একটি হল, সাধারণ চোখের পাতাপড়া হতে ঘুম পাওয়া আলাদা করা; অন্যটি হল সেই আলাদা করার যন্ত্র, ব্যাটারি, সুইচ, এবং ঘণ্টা সমেত একটি ছোট হাল্কা ধরনের যন্ত্র করা, যেটি চশমার সঙ্গে লাগানো সম্ভবপর হয়। এর ব্যাটারি ১০০ ঘণ্টা কার্যকরী থাকে। এই যন্ত্রের প্রস্তুতকারক কোম্পানি সাধারণতঃ ইজরায়েলের রক্ষীবাহিনীর জন্য নানারূপ জটিল যন্ত্রপাতি তৈরি করে। সম্প্রতি এরা বধিরদের জন্ত 'টেলারাম' নামক একটি ছোট রেডিও আবিষ্কার করেছে যেটি পকেটে থাকলে, টেলিফোন বাজা ও শিশুর কান্না বোঝা যাবে, কারণ তখন এটি কাঁপতে থাকবে।

দেশ-বিদেশ

ওয়ান্‌চো ও তাংসা

ওয়ান্‌চো আদিবাসীরা তিরাপের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে বসবাস করে। তাদের সমাজ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। সমাজের গ্রামপ্রধানরা 'ওয়াংহাম' এবং সাধারণ আদিবাসীরা 'ওয়াংপান' নামে পরিচিত। 'ওয়াংহাম'দের সমাজের উপর প্রভাব প্রতিপত্তি প্রচণ্ড রকম। তারা 'ওয়াং-পান'দের মেয়ে বিয়ে করতে পারে, কিন্তু তাদের মেয়েকে 'ওয়াংপান'রা বিয়ে করতে পারে না। 'ওয়াংহাম'-বাবা এবং 'ওয়াংপান'-মায়ের সন্তানকে 'ওয়াংশা' এবং 'ওয়াংশা'-বাবা ও 'ওয়াংপান'-মায়ের সন্তানকে 'ওয়াংসু' বলে। ওয়াংহামের রক্ত ওয়াংশা ও ওয়াংসুর মধ্যে আছে বলে তারা সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত।

বাইরে থেকে সাজ-পোশাক দেখে সমাজের কে উঁচু কে নিচু বোঝা মুশকিল। তবে তাদের সামাজিক অনুষ্ঠানের সময় উঁচু-নিচু শ্রেণী পৃথক করা কোন অসুবিধা হয় না। অনুষ্ঠানে ভোজনের সময় কখনই 'ওয়াংহামে'র পঙ্‌ক্তিতে 'ওয়াংপান'রা বসতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে ওয়ান্‌চোসমাজ পরিচালনা করে 'ওয়াংহাম', 'ওয়াংশা' এবং 'ওয়াংসু' আদিবাসীরা। 'ওয়াংহাম' ও 'ওয়াংপান' এই দুই গোষ্ঠী বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত।

ওয়ান্‌চো আদিবাসীরা চার প্রকারের বাড়ি তৈরি করে। (১) বসতবাড়ি, যাকে তারা 'হাম্' বা কোম্ বলে; (২) গোলাবাড়ি—'পুং'; (৩) খামারবাড়ি—'তাপ্'; (৪) অবিবাহিত পুরুষদের একত্র শোয়ার বড় ঘর—'পা' বা 'পান্'। পুরুষদের মতো মেয়েদের কোন শোয়ার ঘর নেই। বসতবাড়ির মধ্যে একটি বড় ঘরে অবিবাহিত মেয়েরা একত্র শোয়। সেই ঘরকে 'নাউসাজিপ হাম্' বা 'মিন্' বলে। তারা গোলা-বাড়ি তৈরি করে মাটি থেকে বেশ কিছু উঁচুতে। আর অন্য যে তিনরকমের বাড়ি আছে তা তারা মাটির উপরেই তৈরি করে। বসতবাড়ির ছোট সংস্করণ হল খামারবাড়ি। গ্রামপ্রধানদের খামারবাড়ি সাধারণ আদিবাসীদের থেকে একটু অন্য রকমের। তাদের খামারবাড়িকে দূর থেকে দেখলে মনে হয় কচ্ছপের পিঠের মতো।

বাড়িগুলি সাধারণত তৈরি হয় পাহাড়ের ঢালু জায়গায়। ঘরের চাল ঢালুর উপরে একাংশ এবং অপরাংশটি ঢালুর নিচে কাঠের বড় বড় খুঁটির আড়ার উপরে থাকে। 'টোকো' গাছের পাতা দিয়ে চাল ছাওয়ায়। প্রত্যেক বাড়িতে খোলা বারান্দা আছে। বাড়ির ঘরের সংখ্যা বাড়ানো হয় গৃহস্বামীর স্ত্রী এবং পরিবারের আত্মীয়স্বজনের সংখ্যানুযায়ী।

ওয়ান্‌চো পুরুষরা লেঙ্গুটি ও মেয়েরা বিশেষ ধরনের স্কার্ট পরে। মেয়ে-পুরুষ উভয়েই শাল পরে। তবে এ-সব পোশাক অধুনা। পূর্বে তাদের কোন কাপড় পরতে দেখা যেত না, কিন্তু হাতির দাঁতের প্রচুর গহনা, পুঁতির মালা তারা পরত।

ওয়ান্‌চো পুরুষ ও মেয়েরা সারা গায়ে উলকি আঁকে। ওয়ান্‌চোর উচ্চশ্রেণীর মেয়েরা নাভির কাছে ক্রশ এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে উলকি আঁকে। পুরুষরা চশমার মতো করে চোখের উপর নকশা করে। ঘাড়ে, গলায়, বুকে, হাতে, পায়ে এবং পেটে বিভিন্ন ধরনের উলকি আঁকে। ওয়ান্‌চোরা উলকিকে 'হু' বলে, তবে 'চু' নামটি বেশি প্রচলিত।

সমাজে পদমর্যাদা অনুযায়ী ওয়ান্‌চোরা শরীরের বিভিন্ন স্থানে উলকি আঁকে। মেয়েদের ক্ষেত্রে এটি বিশেষ করে প্রযোজ্য। গ্রামপ্রধানদের পরিবারগুলি শরীরের নানাংশে বিশদভাবে উলকি আঁকে, কিন্তু নিম্নশ্রেণীরা সেক্ষেত্রে অতি সাধারণ-ভাবে। মাথা-শিকারকারীরা মুখমণ্ডলে এবং

শরীরের বিভিন্ন অংশে এমনভাবে উলকি আঁকে যা বীরত্ব ব্যঞ্জকের চিহ্ন।

শরীরে উলকি আঁকার জন্য তাদের অশেষ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরীক্ষা দিতে হয়। শরীরে উলকি আঁকার দিন একটি অনুষ্ঠান ও ভূরি-ভোজের আয়োজন করা হয়। যার শরীরে উলকি আঁকা হবে, তার গায়ে প্রথমে কালো রঙের নকশা করে নেওয়া হয়। তারপর শিঙের সুচালো অংশ দিয়ে শরীরে বিদ্ধ করা হয়, গায়ের চামড়া ফেটে যায় এবং তাতে ঘা হয়। সেই ঘায়ের উপর একটি বিশেষ গাছের রস করে লাগিয়ে দেওয়া হয়। এতে ঘা খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। উলকি আঁকিয়েরা খুব সুদক্ষ হয়। উলকি আঁকার জন্য তাদের টাকা-পয়সা দেওয়া হয় না, তবে সম্মানার্থে চাল, মাংস প্রভৃতি দেওয়া হয়। শরীরের নানাংশের উলকির নাম বিভিন্ন। মেয়েদের ও পুরুষদের উলকির চিহ্ন আলাদা আলাদা।

মেয়েরা বিভিন্ন বয়সে শরীরের নানাংশে উলকি আঁকে। প্রথম উলকি আঁকে ৬।৭ বছর বয়সে। এইভাবে তারা চারবার উলকি আঁকে শেষ উলকি আঁকে সন্তান প্রসব করার সময়

নোকতে আদিবাসীদের মতো ওয়ান্‌চোরাও অতীতে মাথা-শিকার করত। তারা বীরত্ব, শৌর্য-বীর্য প্রদর্শনের জন্য মাথা-শিকার করত। মাথা-শিকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হত এক গ্রামপ্রধান ও আর-এক গ্রামপ্রধানের মধ্যে। সাধারণ আদিবাসীরা যদি ভুলবশতঃ কোন গ্রামপ্রধানের মাথা-শিকার করে ফেলত, তবে তাকে প্রচণ্ড শাস্তি পেতে হত। এজন্য তার গ্রামকেও জ্বালিয়ে দেওয়া হত।

ওয়ান্‌চোদের জীবনযাত্রার মধ্যে বহু আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাদের জীবন নানাবিধ অনুষ্ঠানে ভরা। সামাজিক নানাবিধ অনুষ্ঠান তাদের জীবনকে সুখময় করে তোলে। বন্ধ্যা নারীর সমাজে কোন গুরুত্ব নেই। যে-মুহূর্তে তার বন্ধ্যাত্ব ধরা পড়ে সে-মুহূর্তেই তাকে বিবাহ-বিচ্ছেদের সম্মুখীন হতে হয়। স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হলে বাপের বাড়ি থেকে তাকে স্বামীর ঘরে নিয়ে আসা হয় যাতে কোন অপদেবতার দৃষ্টি তার উপর না পড়ে। পাঁচ-ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা হলে তার শরীরের বিভিন্ন অংশে উলকি এঁকে দেওয়া হয়। তাকে সম্পূর্ণ আলাদা ঘরে রাখার ব্যবস্থা করা হয় যাতে ভাবী সন্তানের কোন অনিষ্ট না হয়। অন্তঃসত্ত্বা নারীকে কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেওয়া হয় না। মৃত কোন পশু-পাখির মাংস ও মাছ খেতে দেওয়া হয় না। তাকে আকাশের রামধনুর দিকে তাকাতেও দেওয়া হয় না পাছে গর্ভসন্তানের কোন অমঙ্গল হয়। তখন সে সাপ মারে না, তবে অন্যদের সঙ্গে শিকারে বা মাছ ধরতে যায়। এই সময় বাড়ির কেউ কোন জিনিস বিক্রি করে না।

সন্তান প্রসব করার পর পাঁচদিনের মধ্যে তাকে ঘর থেকে বেরুতে দেওয়া হয় না। সে দশদিনের পর বাড়ির বাইরে যাওয়ার অনুমতি পায়। ছদিন পরে নবজাত শিশুর মাথা সম্পূর্ণ কামিয়ে দেওয়া হয়। এইদিন শিশুর বাবা গ্রাম-বাসীদের সঙ্গে মাছ ধরতে যায়। শিশুর মাথা কামানোর শেষ হওয়ার পূর্বে তাদের মাছ ধরে বাড়ি ফিরে আসতে হবে। এইরকম নিয়ম। এই দিন শিশুর নাম রাখা হয়। ভূরিভোজনের ব্যবস্থা হয়। শুয়োর মারা হয়। এক থেকে তিন-মাসের মধ্যে শিশুর অন্নপ্রাশন হয়। এই সময় বিরাট উৎসবের আয়োজন করা হয়। মুখে ভাত দেওয়ার জন্য শিশুর মামাকে নিমন্ত্রণ করা হয়।

বৃদ্ধ বয়সে মারা যাওয়াকে ওয়ান্‌চোরা স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মনে করে। কিন্তু অল্প বয়সে অসুখ-বিসুখে বা অপঘাতে মৃত্যুকে তারা

তারা চোখে দেখে না। এটা কোন অপদেবতার দৃষ্টির ফলে হয় বলে তারা বিশ্বাস করে। বাড়ির সামনে ২৪ ঘণ্টা শবদেহকে রেখে, আত্মীয়স্বজনরা একত্র মিলিত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করে।

ওয়ান্‌চোরা কল্যাণকর দেবতাকে 'রংগ্‌' বলে। তিনি আকাশেই থাকেন। আর অশুভের দেবতা পৃথিবীতে থাকে। নাম 'বোরাং', খুব শক্তিমান।

তাংসা

তিরাপ জেলার পূর্ব পাহাড়ে তাংসা আদিবাসীরা বাস করে। অন্যান্য আদিবাসীদের মতো কোন দেবতা তাদের কল্যাণ করে। কিন্তু অধিকাংশ অপদেবতা তাদের অসুখ-বিসুখ দিয়ে বিপদের মধ্যে ফেলে। এইরকম তাদের বিশ্বাস।

বর্তমান অরুণাচলপ্রদেশের সরকার অনেক স্কুল-কলেজ, সেবিকা (nursing)-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রভৃতি খুলেছে। আদিবাসীরা ধীরে ধীরে শিক্ষিত হচ্ছে। অরুণাচলের রাজধানী ইটানগর দেখলে আধুনিক শহরের ছোঁয়া বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন পাহাড়ের অধিকাংশ আদিবাসী আজও অশিক্ষিত। জীবনযাত্রার মান অতি নিম্ন।

নরোত্তমনগর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়

তারা বহু গোষ্ঠীতে বিভক্ত। সাধারণভাবে তাংসার অর্থ—পাহাড়ী মানুষ। টাং—পাহাড় এবং সা—মানুষ। তবে তারা এইভাবে তাংসার অর্থ করে না।

তাংসাদের গৃহনির্মাণ পদ্ধতি ওয়ান্‌চো বা নোকতেদের থেকে পৃথক। তাংসা-মেয়েরা বয়নশিল্পে সুদক্ষা।

তারা বহুরকম দেবতায় বিশ্বাসী। কোন চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। তাদের মধ্যে শিক্ষার আলোক নিয়ে গিয়ে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করে, তাদের সুনাগরিক করে গড়ে তোলার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন অরুণাচলে দুটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং একটি হাসপাতাল আরম্ভ করেছে। আলঙে একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ইটানগরে একটি হাসপাতাল আছে যেগুলি সম্বন্ধে পূর্বের সংখ্যাগুলিতে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান সংখ্যায় আলোচ্য : তিরাপ

জেলার নরোত্তমনগরে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়।

নরোত্তমনগর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় তে ১১১ জন ছাত্রকে নিয়ে প্রথম ক্লাস শুরু হয় ১ জুলাই, ১৯৭২। তিরাপ জেলার মাপায়া পাহাড়ের পাদদেশে গভীর জঙ্গলের মধ্যে ২৫০ একর জমি নিয়ে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে। ইংরেজী মাধ্যমের (English medium) আবাসিক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এটি। বর্তমানে ছাত্রসংখ্যা ৩৮০। বিদ্যালয়ে একটি গ্রন্থাগার আছে যার গ্রন্থসংখ্যা ৬৪১০ এবং ৮৭টি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা। বড় একটি অডিটোরিয়ামও আছে। সেখানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-বক্তৃতা, বিতর্কসভা প্রভৃতি হয়।

নোকতে, ওয়ান্‌চো, তাংসা প্রভৃতি আদিবাসী ছেলেরা এই বিদ্যালয়ে পড়ে। তাছাড়া অরুণাচলের অন্যান্য জেলার আদিবাসী ছেলেরাও এখানে পড়ে। যেমন মিশমি, আদি, আপতানি, নিশি, হিল মিরি প্রভৃতি আদিবাসী ছেলেরা।

এই বিদ্যালয়ে ছাত্রদের উন্নত জীবনযাত্রা, সামাজিক উন্নতি, জাতীয়তাবোধ, ধর্ম ও নীতি শেখানো হয়। জীবনযাত্রার মান করার জন্য তাদের শেখানো হয় আধুনিক কৃষি-পদ্ধতি, ট্রাক্টর চালনা, গো-পালন, মুরগী-চাষ, দর্জির কাজ, টাইপরাইটিং, ছুতার মিস্ত্রির কাজ, বেতের কাজ প্রভৃতি। এছাড়া ব্যায়াম, খেলাধূলা, গান-বাজনা, বক্তৃতা-বিতর্ক, অভিনয় প্রভৃতিও শেখানো হয়। এইভাবে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ঘটিয়ে তাদের সুনাগরিক করে গড়ে তোলার চেষ্টা হয় এখানে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই জেলার খোন্‌সাতে আদিবাসী মেয়েদের শিক্ষার জন্যও দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের পরিচালনায় ১৯৭৩-এ একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। বিদ্যালয়ে ৩০০ জনের মতো মেয়ে পড়াশুনা করে। এদের মধ্যে ২২৬ জন ছাত্রী-আবাসে থাকে। মেয়েরাও যাতে স্ব-নির্ভর হয়ে অর্থ উপার্জন করে উন্নতমানের জীবন যাপন করতে পারে তার জন্য তাদের বয়ন, সূচিশিল্প প্রভৃতি শেখানো হয়। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বয়স্কা মহিলাদেরও নানাবিধ শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত হচ্ছে।

অডিটোরিয়াম

পথ ও পথিক

শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

পদ্মলোচনের শাঁক

স্বামীজী একদিন শিষ্যকে বললেন, 'যাতে ব্রহ্মবিকাশের সাহায্য করে তাই ভাল কাজ। সব কাজই প্রত্যক্ষ না হোক পরোক্ষভাবে আত্মতত্ত্ব-বিকাশের সহায়কারী ভাবে করা যায়। তবে ঋষিপ্রচলিত পথে চললে ওই আত্মজ্ঞান শিগ্‌গির ফুটে বেরোয়। আর যাকে শাস্ত্রকারগণ অন্যায় বলে নির্দেশ করেছেন, সেগুলি করলে আত্মার বন্ধন ঘটে, কখন কখন জন্ম-জন্মান্তরেও সেই মোহবন্ধন ঘোচে না।'

এ যুগের মানুষের কাছে আবার আত্মতত্ত্ব কি? দেহতত্ত্বই সারকথা। প্রথমে লুটবো তারপর ভোগ করব। আমি আর আমার ভোগ। এর বাইরে আর কিছু নেই। সমাজের চেহারাও ঠিক সেইরকম দাঁড়িয়েছে। সভ্যতা বাইরের মুখোশ মাত্র। ভেতরে পাশবিকতা। মানুষের অত্যাচারে মানুষই অতিষ্ঠ। অথচ ঋষিরা বলে গেছেন, সারা ভারতবর্ষ এক সাধনপীঠ। অসাধারণ লক্ষণসমূহ প্রস্ফুটিত হয়ে আছে দিকে দিকে। ভারত হল বৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গণ।

আমাদের অবহেলায়, আমাদের উদাসীনতায় আমরা সব হারাতে বসেছি। আত্মবিস্মৃতির শিকার হয়েছি। এখন মানুষের হাতে মানুষ শিকার হচ্ছে। বাঘ ভালুকে আর কটা মানুষ মারে। মানুষ মরছে মানুষের হাতে। একালের মানুষ যেন ছাগল। ধরো আর যে কোনও ছুতোয় কাট। এখন এই আমাদের বীরত্ব।

অবাক হতে হয়, এই হল বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের দেশের হাল। সভ্য মানুষের পাশবিকতা সম্পর্কে রুসোর বিশ্লেষণ ভারি সুন্দর! তিনি বলছেন, বন্য মানুষের লড়াই ছিল খাদ্যের লড়াই। খাদ্যের অধিকার নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলত না। কারণ সে লড়াইয়ে ব্যক্তিগত বা জাতিগত অহঙ্কারের প্রকাশ ছিল না, as pride does not enter into the fight, it is ended with a few fisticuffs, the victor eats, the vanquished goes off to seek better luck elsewhere and all are pacified.

সভ্য মানুষ দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক বেশি অসভ্য। রুসো বলছেন, 'যোদ্ধা প্রয়োজন যেই মিটল, অমনি শুরু হল বাড়তি ধান্দা, তারপরই এল বিলাসিতা, তারপর এল প্রাচুর্য', তারপরই সেই দুষ্ট চক্র, then Subject, then Slaves—he does not have a moment of respite. Cut every throat until he is master of the whole universe.

এই কারণেই মানুষের সভ্যসমাজে কি ধনী, কি দরিদ্র সবাই অসুখী। রুসো লিখছেন, Men are wicked. মানুষ স্বভাবে দুর্বৃত্ত। আমাদের এই বিষণ্ণতা আর নিত্য অভিজ্ঞতায় অনবরতই তার প্রমাণ মিলবে। তবু বলব মানুষ কিন্তু প্রকৃতই সুন্দর। মানুষকে দুর্বৃত্ত করেছে কে? করেছে দ্রুত পরিবর্তন। সভ্যতা আর জ্ঞান যত বাড়ছে, মানুষ ততই দুষ্টপ্রকৃতির হয়ে উঠছে।

ঠাকুর বলছেন, 'জ্ঞান সদর মহল পর্যন্ত যেতে পারে। ভক্তি অন্দরমহলে যায়।'

ভক্তি কাকে বলে? এই মেডইজির যুগে ভক্তিকেও আমরা ইজি করে নিয়েছি। বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে টুক করে একটি নমস্কার। না সেলাম, না স্যালুট, না নমস্কার। শিক্ষিত, সভ্য মানুষ ঠাকুর-নমস্কার করছে, যদি কেউ দেখে ফেলেন। আবার কারুর কারুর ভক্তি মানে বিকট গলায়, মা মা চিৎকার। এদিকে গর্ভধারিণী মাতা ছেঁড়া ট্যানা পরে ঘুরছেন। কারুর কাছে ভক্তি মানে শ্মশানের বটতলায় কল্কে সেবন।

স্বামীজী সার কথা বলে দিয়েছেন, 'মুখ্যা ভক্তি ও মুখ্য জ্ঞানে কোন প্রভেদ নেই। মুখ্যা ভক্তি মানে হচ্ছে—ভগবানকে প্রেমস্বরূপে উপলব্ধি করা। তুই যদি সর্বত্র সকলের ভিতরে ভগবানের প্রেমমূর্তি দেখতে পাস তো কার উপর আর হিংসাদ্বেষ করবি?'

এই প্রেমই হল ব্রহ্মবিকাশ। আমরা সবই শিখেছি। আকাশে উড়তে শিখেছি। চাঁদের মাটিতে পা ফেলেছি। এক বোমায় বিশাল একটা শহর ওড়াতে পারি। সমুদ্রের অতলে রোবট নামিয়ে হারাধন তুলে আনতে পারি। পারি না ভালবাসতে।

যে পরিবারে আমাদের বসবাস, সেই পরিবার যদি প্রেমহীন হয় তাহলে আমরা মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসকের প্রয়োজন অনুভব করি। প্রেমহীন সংসারের শিশু নিষ্ঠুর হয়, স্বার্থপর হয়। বয়স্করা আত্মহননের প্রবণতা অনুভব করেন। উন্মাদ হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

সমাজ হল বৃহৎ পরিবার। প্রেমহীন সমাজের মানুষ যেমনটি হওয়া উচিত তেমনটিই হচ্ছে। অ্যাগ্রেসিভ। চরম স্বার্থপর। চরম নিষ্ঠুর। **'Cut every throat until he is master of the whole universe'.** আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় চেঙ্গিজ অথবা তৈমুর কিংবা আলেকজাণ্ডার নেই। আমরা একটু ছিঁচকে ধরনের। ঠাকুরের ভাষায় ম্যাদামারা। আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিবারের কষ্টার্জিত অর্থের শ্রাদ্ধ করে যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কা হচ্ছেন, তাঁদের লক্ষ্য বাঁধা মাস মাইনের একটা ভাল চাকরি। তারপর জীবনের সেই সহজ সরল ন্যাশান্যাল হাইওয়ে—বিবাহ, সুকন্যাসহ সযৌতুক। যৌতুকের ব্যাপারে কৌতুক চলবে না। একটু এদিক ওদিক হলেই সহজ সমাধান বধূ-নির্যাতন। শেষ অস্ত্র, কেরোসিন সিঞ্চন ও অগ্নিসংস্কার। বর্তমানের অতিপুণ্যকর্ম।

স্বামীজী বলছেন, 'মেয়েদের পূজা করেই সব-জাত বড় হয়েছে। যে দেশে, যে জাতে মেয়েদের পূজা নাই। সে দেশ, সে জাত কখনও বড় হতে পারে নি। কস্মিনকালে পারবেও না। তোদের জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ এই সব শক্তিমূর্তির অবমাননা করা।'

আজ থেকে ৮৪ বছর আগে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড়মঠে বসে স্বামীজী এই উক্তি করেছিলেন। তার মানে আমাদের মানসিকতা তখনও যা ছিল, এখনও তাই আছে। একটুও বদলায়নি। মাত্র কয়েক বছর আগে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দদাস লিখেছিলেন—

'বাঙালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?
বৃথা ও ইংরেজী শিক্ষা,
বৃথা ও পাশ্চাত্ত্য দীক্ষা,
হৃদয়ে নাহিক মোট জ্ঞানের উদয়।'

কি করে হবে! কেউ তো কোনও দিন আমাদের বললেন না, ওহে মানুষ হও। যাঁরা বলেছিলেন, তাঁদের আমরা এক কথায় বাতিল করে বসে আছি। আর সেইটাই নাকি ইনটেলেকচুয়ালিজম্। ঠাকুর বলছেন, সংস্কার চাই, তা না হলে, ওই ভাগবত পাঠ হচ্ছে, ছোকরা মুখ বেঁকিয়ে উঠে গেল। বললে, কি

বেড়োড় বেড়োড় করছে।

উইলহেলম রাইখ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর ধরন-ধারণ বড় ভাল বিশ্লেষণ করেছেন। যাঁরা আমাদের মুক্তি চান, মানবজাতির বিকাশ চান, তাঁদের আমরা শূলে চড়াই। যিশুকে ঝুলিয়ে দিলুম ক্রুশে।

'You have no sense organ for the truly great man. His way of being, his suffering, his longing, his raging, his fight for you are alien to you.

আমরাই আমাদের পরম শত্রু। মহামানবরা আসেন ফিরে ফিরে চলে যান। আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে। শিক্ষা, শিল্প, সভ্যতার শাঁক ভোঁভোঁ খুব বাজছে। ঠাকুরের কথায়, ও শাঁক হল পদ্মলোচনের শাঁক। ঠাকুর এখন হেঁকে বলছেন, মন্দিরে তোর নাহিক মাধব ! / পোদো, শাঁক ফুঁকে তুই করলি গোল/তায় চামচিকি এগারজনা দিবানিশি দিচ্ছে হানা।

পুস্তক সমালোচনা

স্বামী বিবেকানন্দ ও আমাদের সম্ভাবনা—শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক: অখিল ভারত যুব মহামণ্ডল, 'ভুবন-ভবন', পোঃ বলরাম ধর্মসোপান, খড়দহ, চব্বিশ পরগনা। আশ্বিন ১৩৯১ (অক্টোবর ১৯৮৪)। পৃষ্ঠা ২+৩৭৮। মূল্য টাকা।

গ্রন্থটির প্রারম্ভে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের (সম্প্রতি মহাসমাধিলীন) আশীর্বাণী গ্রন্থরচনার মূলগত উদ্দেশ্য, ভাবনা আর তাৎপর্যের সারসূত্র। আশীর্বাণীর কয়েক ছত্র—"বর্তমান যুগে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শই আমাদের জাতীয় জীবনে সার্বিক অভ্যুদয়ের একমাত্র নির্ভরযোগ্য দিগ্‌দর্শন। স্বামীজীর এদেশের যুবকদের উপর ছিল গভীর আস্থা ও প্রচুর প্রত্যাশা। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই যুবশক্তিই চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিকবলে বলীয়ান হয়ে উঠে এদেশের অগণিত পিছিয়ে-পড়া মানুষের সেবা করবে এবং ক্রমে জগৎসভায় ভারতবর্ষকে তাঁর যোগ্য মর্যাদার আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে।"

ভারতের যুবশক্তির উপর স্বামী বিবেকানন্দের এই বিশ্বাসে একান্ত শ্রদ্ধার উপরই 'অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল'-এর প্রতিষ্ঠা এবং ঐ সংগঠনের মুখপাত্ররূপেই নবনীহরণের পরিচয় তথা এই গ্রন্থের লেখকরূপে আত্মপ্রকাশ। বস্তুত এই গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধের অধিকাংশই মহামণ্ডলের মাসিক দ্বিভাষিক পত্রিকা 'বিবেক-জীবন'-এ বাংলা সম্পাদকীয়রূপে প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাদিতে নিবন্ধগুলির প্রকাশকালের উল্লেখ বা আনুষঙ্গিক বিবরণ থাকলে তথ্যের দিক দিয়ে মূল্যবান হত। তবে প্রায় সব-কটি রচনাই কালনিরপেক্ষ—স্বামীজীর যেসব আদর্শ চিরায়ত, নবনীহরণ সেগুলির পরিচয় দিয়ে পাঠক সাধারণকে—বিশেষত যুবসমাজকে সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন। নিছক বিদ্যানির্ভর আলোচনা বা বিচারনায় প্রবৃত্ত হবার প্রয়াস তিনি করেননি।

সংকলিত প্রবন্ধগুলিকে দশটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে।—(১) স্বামী বিবেকানন্দ—ব্যক্তি ও মন, (২) সমস্যা ও সমাধান, (৩) স্বামী বিবেকানন্দ ও যুবসমাজ, (৪) শিক্ষা: সমাজের সকল

ব্যাধির মহৌষধ, (৫) ধর্ম : স্বরূপ ও সমাজে এর স্থান, (৬) জীবনগঠনের উপকরণ, (৭) ব্যবহারিক জীবনে আধ্যাত্মিকতা, (৮) মনুষ্য-মনের বিভিন্নরূপ : প্রকাশ ও প্রভাব, (৯) সমাজ ও সেবা, (১০) বিশ্বমানবের কল্যাণে। এছাড়া আছে 'পরিশিষ্ট'—'একটি যুব আন্দোলন'

লেখক ধর্ম প্রসঙ্গে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন, কিন্তু শাস্ত্রমর্ম-উদ্ঘাটন বা তত্ত্ববিচারে প্রবৃত্ত হননি। স্বামীজীর চিন্তার মূলকেন্দ্র মানুষ আর সেই মানুষকে তিনি ধর্ম বা অধ্যাত্ম-শক্তিতে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন—লেখক একথা নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। বলেছেন—"স্বামীজীর কথা, মানুষের ভেতরের শক্তির স্ফুরণই ধর্ম। সে ধর্মের প্রকাশ অকল্যাণের অপনোদনে, কল্যাণকর্মের সম্পাদনে, নিরন্নের অন্নদানে, অজ্ঞানের জ্ঞানদানে, অত্যাচারের প্রতিরোধে, শুভবুদ্ধির উদ্বোধনে।" (পৃঃ ১১)।—"ইন্দ্রিয়-প্রকৃতিদাস মানুষের কোন কল্পনাদর্শান্বিত বিগ্রহের সম্বর্ধনা নয়, সর্বশক্তিজ্ঞানাধার মানুষের স্বরাজ্যচ্যুত ধূলাধূসরিত জীবন্ত দেহমনাশ্রিত সত্তার পূজাই স্বামী বিবেকানন্দের মানবতা।" (পৃ ২৯)—স্বামী বিবেকানন্দের মানবকেন্দ্রিক মানবকল্যাণমূলক ধর্মচেতনা বা অধ্যাত্মবোধের মূলে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ছিল বলে লেখক অনুভব করেছেন।

বেশির ভাগ নিবন্ধই সুখ্যাত যুবসমাজকে লক্ষ্য করেই লেখা। দীর্ঘকাল যুব-সংগঠনের সঙ্গে সংযুক্ত নবনীহরণ প্রত্যক্ষ করেছেন—"যুবজনের সমস্যাই হ'ল, তাদের যা আছে—জীবন, শক্তি, মন, বুদ্ধি, আবেগ, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, সবল দেহ, সতেজ ইন্দ্রিয়—এগুলোর সদুপযোগ তারা জানে না।" (পৃঃ ১০০)—সেই সঙ্গে বলেছেন—"স্বামীজীর কাছে যুবসমাজ একটা সমস্যা নয়। যুবশক্তি একটা সম্পদ।" (পৃঃ ১০৮)—যুবশক্তিকে জাগ্রত ও সংহত করে তুলে কল্যাণকর্মে, বহুমুখী সংগঠনে তাদের নিয়োগ করার যে ভাবনা স্বামীজীর অন্তরে ছিল এবং তাঁর উদাত্ত আহ্বানে যা প্রকাশিত হয়ে বাংলার যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিল—লেখক সেই ভাবনাটিরই বর্তমান কালে রূপায়ণ দেখতে উৎসুক হয়ে স্বামীজীর বাণী নানাভাবে বিশ্লেষণ করে যুবগোষ্ঠীকে সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন। 'পরিশিষ্ট' অংশে 'বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল' সম্পর্কিত কটি নিবন্ধে যেন উপসংহারের মতো মূল বক্তব্যকে সূত্রাকারে গ্রথন করা হয়েছে।

নবনীহরণের ভাষাভঙ্গি ঋজু, বেগবান, আবেগময়, সেইসঙ্গে ওজঃশক্তিতে পরিপূর্ণ। রচনাশৈলীর সবচেয়ে বড় গুণ এই যে, সুষমাময় হলেও তাতে কৃত্রিম অলংকরণের প্রয়াস নেই; ফলে বক্তব্যের আবেদন অব্যাহতভাবে পাঠকের কাছে পৌঁছয়।

মুদ্রণাদির পারিপাট্য প্রশংসনীয়। প্রচ্ছদ-পটে স্বামীজীর আচার্যমূর্তি চিত্রটি (ফোটোগ্রাফ থেকে) অবশ্যই আকর্ষণীয়। ঐ চিত্রটি ধর্মপ্রবক্তা যুগাচার্যের ভাবমূর্তি। মনে হয়, যুগনায়ক ভারতপুরুষরূপে স্বামী বিবেকানন্দের সুপরিচিত পরিব্রাজকমূর্তি চিত্রটি মুদ্রিত হলে সেটি এই গ্রন্থে নিবদ্ধ আদর্শ আর ভাবনার পক্ষে আরও বেশি তাৎপর্যময় ও উপযোগী হত।

—ডক্টর তারকনাথ ঘোষ
প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য-সমালোচক
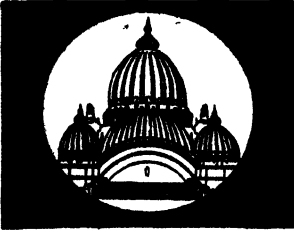
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

সর্বভারতীয় যুবসম্মেলন

২৪ থেকে ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৮৫

স্থান : বেলুড় মঠ, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ

যুবসম্মেলনে যুবক-যুবতী প্রতিনিধিদের যোগদানের বয়ঃসীমা ১৬ থেকে ৩০ বছর। প্রায় ১৫,০০০ মতো প্রতিনিধি নেওয়া হবে।

উদ্বোধনী ও বিদায়ী সভা, মুক্ত অধিবেশন, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনা, তীর্থযাত্রা, মঠ থেকে শোভাযাত্রা সহকারে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত প্রভৃতি সম্মেলন-সূচীর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া সন্ধ্যায় আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকবে। যুবপ্রতিনিধিরা আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, আবৃত্তি, বক্তৃতা, সঙ্গীত প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

আলোচনার বিষয়বস্তু :

১। জনসাধারণের উন্নতিসাধনে স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পনা।
২। জাতীয়-সংহতি দৃঢ়ীকরণে যুব-নেতৃত্বের ভূমিকা।
৩। পল্লী-পুনর্গঠনে যুবসমাজের ভূমিকা।
৪। ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনে মূল্যবোধের উপযোগিতা।
৫। বর্তমান যুবসমাজের সমস্যা ও তার সমাধানের পথ।
৬। নিরক্ষরতা, বর্ণ বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে যুবসমাজের কর্তব্য।

আলোচনার মাধ্যম : ইংরেজী, হিন্দী ও বাঙলা

যুবপ্রতিনিধি নির্বাচন :

সম্মেলন কর্তৃপক্ষ আলোচনা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে সক্ষম একটি যুবপ্রতিনিধিদের তালিকা গঠন করবেন—বেলুড় মঠের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র হতে পাঠানো নামের তালিকার উপর ভিত্তি করে। সম্মেলনে যোগদানেচ্ছু যে-কোন যুবপ্রতিনিধি নির্ধারিত ফর্মে তাঁর অংশগ্রহণের ইচ্ছাকে ব্যক্ত করে শাখাকেন্দ্রে তা জমা দিতে পারেন।

নির্ধারিত সংখ্যক প্রতিনিধি যাঁরা আলোচনাদিতে অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত হবেন, সম্মেলনের তিনদিন পূর্বে তাঁদের আলোচনা-শিবিরে যোগদান করতে হবে। এজন্য প্রতিনিধি হওয়ার খরচ ব্যতীত অতিরিক্ত কোন খরচ তাঁদের দিতে হবে না।

প্রতিনিধি হওয়া এবং অন্যান্য বিষয় বিশদ জানার জন্য রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কোন নিকটবর্তী শাখাকেন্দ্রে অথবা নিম্নের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে :

Secretary
Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission Convention
Golpark, Calcutta—700029

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ
সাধারণ সচিব
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন
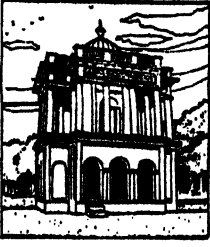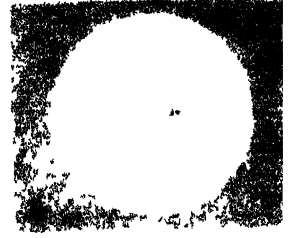
নিবেদিতা শিল্প পুরস্কার

গত ৯ জুন হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে নিবেদিতা শিল্প পুরস্কার প্রদান করা হয় বিশ্বভারতী কলাভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, রবীন্দ্র-নাথের সান্নিধ্যধন্য, শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর ছাত্রদের অন্যতম, অবনীন্দ্র-পুরস্কারে সম্মানিত শিল্পী শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা মহাশয়কে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী অভ্রজানন্দ। শিল্পীকে একটি সুদৃশ্য ফলক ও একসেট 'লেটার্স অব্ সিস্টার নিবেদিতা' গ্রন্থ উপহার দেন আশ্রম-সম্পাদক শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সভাপতি-মহারাজ ত্রিশজন শিশু-শিল্পীকে পুরস্কার দেন। শিল্পী শ্রীদেববর্মা তাঁর স্মৃতিচারণে অবনীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বলেন, 'যোগীর ধ্যান চোখ বুজে, আর শিল্পীর ধ্যান চোখ খুলে।' সভাপতি-মহারাজ শিল্পের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার যে অভিন্ন সম্পর্ক তার অপূর্ব ব্যাখ্যা করেন। সুদৃশ্য ফলকটি নির্মাণ করেন শ্রীনিত্যানন্দ ভকত, সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীঅসীম দত্ত ও শ্রীঅমিত ঘোষ। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভায় স্বাগত ভাষণ দেন ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরিচিতি প্রদান করেন অধ্যাপক ধ্রুব মুখোপাধ্যায়। সভাশেষে ধন্যবাদ-জ্ঞাপক ভাষণ দিয়েছেন ডঃ চন্দন রায়চৌধুরী।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **শতদল ঘোষ** গত ১০ মে ১৯৮৫, ৮৫ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কাঁচড়াপাড়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তিনি আমেরিকায় গিয়েছিলেন। তাঁর স্বামী অমলকৃষ্ণ ঘোষ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্ত্রী-শিক্ষা আন্দোলনের ব্যাপারে বহু মহিলা-সংগঠনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি দক্ষিণেশ্বর সারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের নানা কর্মধারায় বিশেষ-ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অনেক শাখাকেন্দ্রের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

তাঁর আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে চিরশান্তি লাভ করুক—এটাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

*

হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমের আবাসিক সভ্য ও অন্যতম প্রধান কর্মী **সুধীরকুমার চৌধুরী** (পটলবাবু) গত ১৯ জুন, ৮৯ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর কর্মদক্ষতায় আশ্রমের নৈশবিদ্যালয় ও অনাথ ভাণ্ডারের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। তিনি অকৃতদার ছিলেন। তাঁর জীবন সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর ছিল। সাধু ও ভক্তজনের সেবা-পরিচর্যায় তাঁর ছিল পরম তৃপ্তিবোধ,—সাধনজ্ঞানেই তা তিনি আজীবন করেছেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

তাঁর দেহনির্মুক্ত আত্মা শান্তি লাভ করুক—শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে আমাদের এই প্রার্থনা।
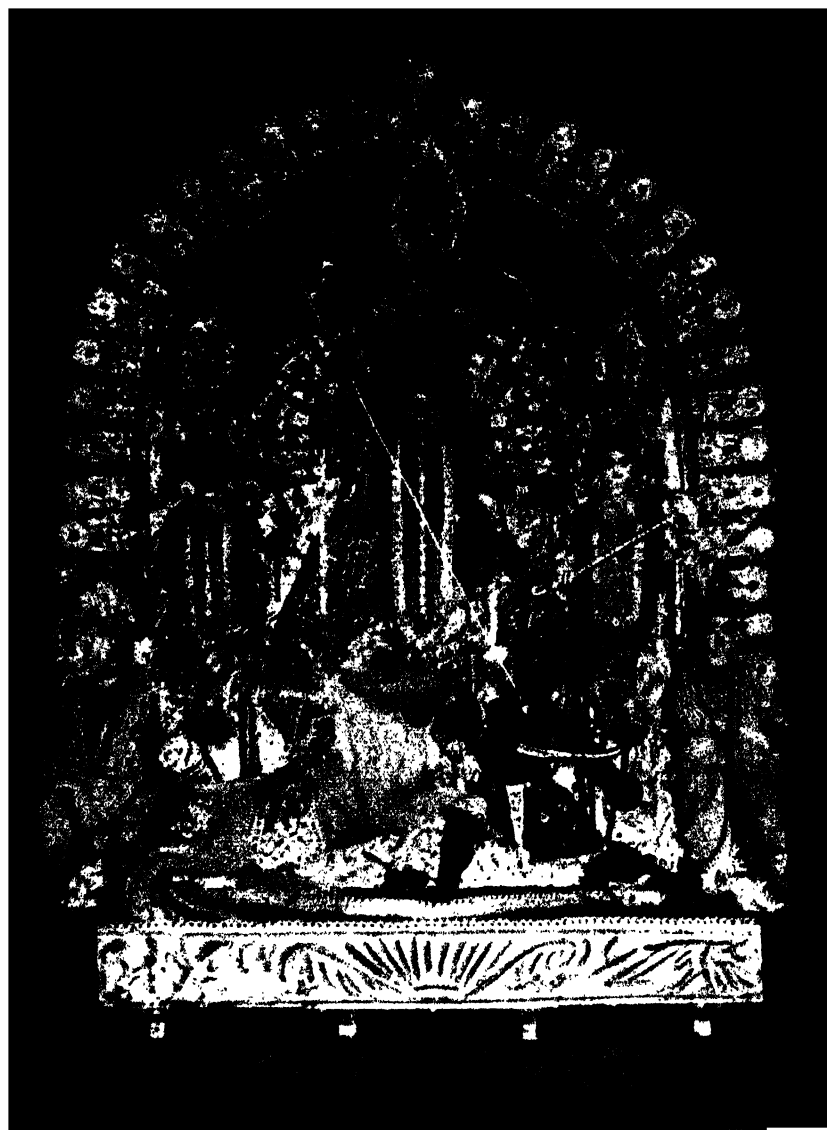
শ্রীশ্রীদুর্গা

বেলুড় মঠে পূজিত প্রতিমা
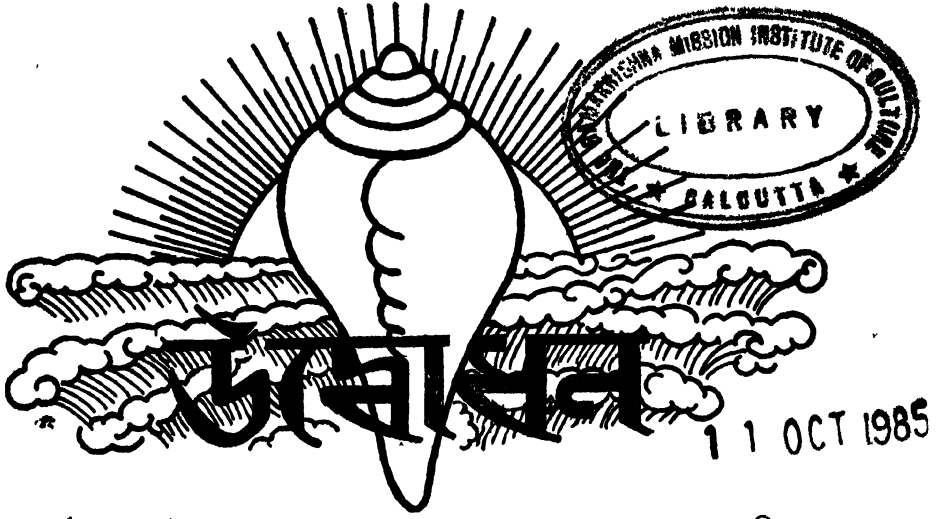
৮৭তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা আশ্বিন, ১৩৯২

‘এবার যদি এলি উমা’

[একটি অপ্রকাশিত আগমনী সঙ্গীত]

এতদিন পরে পুর আলো করে কে এলি রে ঈশানী।
আমার যে তোর তরে, দিবানিশি আঁখি ঝরে,
ভুলে ছিলি কেমন করে, মনে পড়েনি বলে জননী॥
তোরে না হেরে তারা, হারা হয়েছি নয়নতারা,
তারা বেয়ে পড়ে ধারা, ও মা ভবদারা দিবস-রজনী॥
কপালগুণে হয়ে রাজার ঘরণী, পেয়ে তোমা হেন মণি,
আমি নিরানন্দে দিন গণি, পিতৃগুণে মেয়ে হলি পাষাণী॥

এবার যদি এলি উমা, কিছুদিন থাক্ হেথা মা,
ও মা হর-মনোরমা—ভোলানাথে ভুলিয়ে, ঘরে রাখ ভবানী॥

—স্বামী বিরজানন্দ

কথাপ্রসঙ্গে

'নমস্তস্যৈ নমো নমঃ'

ভয়ার্ত সন্তানদের প্রতি জননীর সেই প্রতিশ্রুতিকে আজ একান্তভাবে স্মরণ করিতেছি। তিনি বলিয়াছিলেন—স্বীয় সন্তানের অসুরভাব বিনষ্ট করিয়া তাহাকে দেবভাবে পূর্ণ করিতে তিনি বারবার অবতীর্ণ হইবেন।

'ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যামি অরি-সংক্ষয়ম্॥'

জননীর পুত্র-কন্যাগণ সকলেই কিছু সমান নহে, সম-প্রকৃতি লইয়া জন্মায় না। মাতৃস্তন্যের পুষ্টি ও ঋদ্ধিকেও তাই তাহারা সমভাবে সমান আনন্দে ভোগ করিতে পারে না। স্বার্থপর ভোগপরায়ণ অসুর-প্রকৃতি সন্তান নিয়তই উদ্ধত চেষ্টা করিতেছে, শান্তিপ্রিয় সরলচরিত্র ভ্রাতা-ভগিনীকে দূরে হঠাইয়া মাতৃ-সম্পদে কেবলমাত্র নিজের ভোগাধিকারকে সবলে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে। জননীর স্নেহ-সাম্রাজ্যে অসুর-ভ্রাতা-গণই নিজেদের আধিপত্য-বিস্তারে সদা প্রয়াসী! এইরূপই তো ঘটিয়া আসিতেছে চিরকাল। বুঝি-বা ইহাও প্রকৃতির নিয়ম,—মাতৃশক্তির আবির্ভাবের পটভূমিও এইভাবেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। পরমাপ্রকৃতি জননী সন্তান-কলহে বিচলিতা না হইয়া পারেন না, যেমন দৃশ্যমান বহিঃপ্রকৃতিতে কোথাও অসামঞ্জস্য দেখা দিলে স্বতই প্রতিবিধানও নামিয়া আসে। বায়ুমণ্ডলের তাপ-বৈষম্যই তো সমতা-বিধায়ক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাসহ, সুশীতল বর্ষণের হেতু হইয়া থাকে। বিবদমান উন্মত্ত সন্তানগণের অসুর-বীর্যকে নির্জিত করিয়া সংসারে সুখ-শান্তি বিধান করিতে বিশ্বজননীর প্রকাশও পুনঃ পুনঃ হইয়া আসিতেছে—হইবেও চিরকাল।

অহঙ্কার-মত্ত এবং মমতান্ধ পুত্রকন্যাগণ সংসারের যাবতীয় শুভকে সবলে নির্বাসন দিতে বদ্ধপরিকর হয়,—উঠিয়া পড়িয়া লাগে, যাহাতে এই সমাজ হইয়া দাঁড়ায় একমাত্র তাহাদেরই যথেচ্ছ ভোগক্ষেত্র। শান্তিপ্রিয় শিষ্টজন নির্যাতিত হইতে থাকে—সর্বপ্রকার সৎ ও কল্যাণ উহাদের উৎপীড়নে সাময়িক স্তব্ধ হইয়া পড়ে। সৃষ্টির প্রারম্ভকাল হইতেই এই ধারা চলিয়া আসিতেছে। আবার ইহাও ততোধিক সত্য যে, ঐরূপ দুর্যোগের চরমাবস্থাই সন্তান-দুঃখহারিণী জননীর কৃপা-দৃষ্টিকে বারবার আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে। জগৎপালিনী মাতৃশক্তির ইহাও এক বিস্ময়কর লীলা। বুঝি তিনি ইচ্ছা করেন, তাঁহার সন্তানগণ তেজস্বী, বীর এবং সংগ্রামক্ষম হউক সকলে,—বসুন্ধরা হউক বীরভোগ্যা।

কাম-ক্রোধ-লোভাদি রিপুকে বশীভূত করার পরেও কিন্তু দুর্মদ আরও দুই শত্রুর নিরন্তর পীড়ন মানুষকে বিপর্যস্ত রাখে অনুক্ষণ। একটু বিচার করিলে দেখা যাইবে, অন্যান্যদের অপেক্ষা শেষোক্ত এই দুই শত্রুর তাড়নাতেই জীব সর্বাধিক অশান্তি ভোগ করিয়া থাকে—ব্যষ্টি ও

সমষ্টি-জীবনে উভয়তঃ। দুর্ধর্ষ এই অরিদ্বয়ের নাম অহঙ্কার ও মমত্ব—'আমি' এবং 'আমার'। সংগ্রামে ইহাদিগকে পরাভূত করিতে হইলে আত্মশক্তির উদ্বোধন-মূলক সাধনায় তৎপর হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নাই। ঐ সাধনবলে উদ্বোধিত আত্মশক্তিরই আর এক নাম মাতৃবল। মাতৃবলে বলীয়ান সন্তান অনায়াসেই 'অহং' ও 'মমত্ব'-রূপ দুর্জয় অসুরকে বিনাশ করিয়া দেবত্বের স্বাধিকারকে ফিরিয়া পাইতে পারেন —যুগে যুগে ইহাই তো ইতিহাসে প্রত্যক্ষ হইতেছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যের মধ্যম ও উত্তরচরিত্রে মেধা ঋষি একটি অপূর্ব ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন—যাহা সকল যুগের মানুষের পক্ষে অমর জীবন-দর্শনও বটে। ঋষি-বর্ণিত সেই কাহিনীর সংক্ষিপ্ত রূপ-রেখা হইতেছে :

দেবতা ও অসুরের দীর্ঘ কলহ। অসুরগণ দেব-ভ্রাতাগণকে সহ্য করিতে পারে না। পরিণামে যুদ্ধ এবং যুদ্ধে অসুরদেরই বিজয়। পরাভূত দেবতারা অসুরাধিপতি মহিষাসুরের নিষ্ঠুর অত্যাচারে জর্জর হইয়া অসহায়ভাবে পৃথিবীতে বিচরণ করিতে থাকিলেন। স্বর্গ হইতে নিরাকৃত দেবগণ শ্রীভগবানের শরণ লইলেন। ভগবদ্-অনুগ্রহে দেবতাদের প্রসুপ্ত আত্ম-শক্তি জাগ্রত হইল,—সকলের অন্তর-উৎসারিত তেজঃপুঞ্জে গঠিত হইয়াছিল এক অনিন্দ্য-সুন্দর মাতৃমূর্তি। 'সমস্ত দেবানাং তেজোরাশিসমুদ্ভবাম্' জননী দুর্গার সেই আবির্ভাবে মহিষাসুর-প্রপীড়িত দেবতাদের আনন্দের অবধি ছিল না। অতঃপর শুরু হইল প্রচণ্ড সংগ্রাম। দেব-ঋষি-বন্দিতা সিংহবাহনা দেবী অবলীলাক্রমে অসুরগণের দেহে অস্ত্রনিক্ষেপ দ্বারা উহাদিগকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিলেন। অসুর শক্তির পরাভবে এবং দেব-শক্তির পুনর্জাগরণে যুদ্ধ কিন্তু তখন আর যুদ্ধ থাকে নাই—রূপ নিয়াছিল এক আনন্দমুখর মহোৎসবের।

'অবাদয়ন্ত পটহান্ গণাঃ শঙ্খাংস্তথাপরে।
মৃদঙ্গাংশ্চ তথৈবান্যে তস্মিন্ যুদ্ধ-মহোৎসবে॥'

সেই বিপুল সংগ্রাম, ক্রমে বিপুলতর বেগে ভিন্নগতি প্রাপ্ত হইল। স্বয়ং অসুরাধিপতি নিজগণ সহ নিঃশেষে ভূপাতিত হইল। দেবী দুর্গার খড়্গাঘাতে মহিষাসুর ছিন্নমস্তক হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছিল। জীবিত অসুরসৈন্যরা হাহাকার করিতে করিতে ইতস্ততঃ পলায়ন করিল এবং দেবতারা সকলে মহোল্লাসে বিজয়োৎসবে মাতিয়া উঠিলেন। ঋষি-মুনি-দেবতাদের দ্বারা স্তুত হইয়া দেবীও অপ্রকট হইলেন,—সন্তানবৎসলা জননী আশ্বাস দিয়া গিয়াছিলেন বিপদ্‌কালে স্মরণ-মাত্রেই তিনি পুনরাবির্ভূতা হইবেন এবং মহাবিপদ্ তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হইবে। 'ভবতাং নাশয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ।'

দেবগণ হৃতরাজ্য ফিরিয়া পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিরঙ্কুশ শান্তি তাঁহাদের ভাগ্যে ছিল না। বহিঃশত্রু বিনষ্ট হইয়াছিল ঠিকই, কিন্তু গোপন শত্রুতা তাঁহাদের জন্য আরও অপেক্ষা করিতে-। উক্ত দেবীমাহাত্ম্যের উত্তরচরিত্রে মুখ্যতঃ সেই কাহিনীই বিশদ বিন্যস্ত। শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অসুর ভ্রাতৃদ্বয় দেবতাদিগকে নানাভাবে বঞ্চনা করিতে শুরু করে। উভয় ভ্রাতার দৌরাত্ম্যে দেবগণ পুনরায় স্বর্গাধিকার হারাইলেন। প্রবঞ্চিত দেবগণ জননীর পূর্ব-আশ্বাস স্মরণ করিয়া একান্ত-চিত্তে মাতৃ-আরাধনা করিবার জন্য নগাধীশ হিমালয়ের ক্রোড়ে প্রস্থান করিলেন এবং নিভৃতে মহামায়ার আরাধনায় রত হইলেন। আশ্চর্য মধুর ছন্দে মাতৃ-স্তুতি রচনা করিয়া তাঁহারা আকুল কণ্ঠে উহা গাহিতে থাকিলেন,—কিন্তু প্রত্যক্ষতঃ কোন কিছুর জন্য কামনা ছিল না তাঁহাদের ঐ স্তবমালায়। শুধুই মাতৃমহিমা ও মাতৃস্বরূপকে

বাঙ্‌ময়ী করা হইয়াছিল সুললিত সেই স্তোত্রে,—আর সুস্পষ্ট ভাষায় পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইতেছিল 'নমো নমঃ'। দেবগণের হৃদয়-উৎসারিত ঐ 'নমো নমঃ' উচ্চারণ যেন তাঁহাদের সকল 'আমি আমার' বোধকে বিনত করিয়া মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলিস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। জলধারা ঊর্ধ্ব হইতে নিম্নে প্রবাহিত হইয়া থাকে—করুণাধারাও সেইরূপ বিনতচিত্তে—যেখানে 'অহং'-এর উন্নত টিপি ধুইয়া মুছিয়া দ্রব হইয়া মাটিতে মিশিয়া গিয়াছে, সেখানেই প্রবর্ষিত হয়। 'নমঃ' শব্দের নিহিত তাৎপর্যার্থ হইতেছে—'ন মম'। 'আমার নহে', 'আমি নহি' এইরূপ দ্যোতনাই ছিল দেবতাদের কণ্ঠোদ্গীত সেই স্তবের প্রতি গমকে।

অতিসৌম্যা বিদ্যারূপিণী তিনি,—আবার ঘোর অবিদ্যারূপেও সেই তিনিই অতি ভীষণা। জগতের আশ্রয়রূপিণী সর্ববিরামদায়িনী তিনি,—সকল কৃতিরূপা ক্রিয়ারূপেও তিনিই। সেই সর্বময়ী জগজ্জননীকেই দেবতারা প্রণাম জানাইতেছিলেন বারবার—উদার সুস্পষ্ট 'নমো নমঃ' ব্যঞ্জনাসহ। সোচ্চারে গাহিতেছিলেন :

'অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ।
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ॥'

নিরহঙ্কৃত দেবতাদের সেই আকুল প্রার্থনায় জননী দুর্গা পুনঃ প্রকট না হইয়া পারেন নাই,—দেব-সন্তানগণের অভীষ্ট পূর্ণ করিয়াছিলেন তিনি। ঋষি মেধা সেই কাহিনীই সবিস্তার বর্ণনা করিয়া শুনাইয়াছেন উল্লিখিত দেবীমাহাত্ম্যের অবশিষ্টাংশে। অপরাজিতা জগদম্বিকা বিচিত্র ভাবে ও ভঙ্গিতে নিজেকে ব্যক্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে অসুর-অনুচরগণকে নিধন করেন,—অবশেষে নিশুম্ভকে ও শুম্ভকেও চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করিয়া দেবশক্তিকে জয়ী করিয়াছিলেন। সৃষ্টিতে শান্তি ও কল্যাণ এইভাবেই ফিরিয়া আসিয়াছিল। পুনরায় পুণ্য বায়ু বহিতে লাগিল, সূর্য উজ্জ্বলতর কিরণ ঢালিতে থাকিল—পূত যজ্ঞাগ্নিশিখা সর্বদিকে উৎপন্ন অমঙ্গলসূচক সকল কোলাহলকে প্রশমিত করিয়া শান্ত ও সৌম্যভাবে আবার জ্বলিয়া উঠিল।

'ববুঃ পুণ্যাস্তথা বাতাঃ সু-প্রভঃ অভূদ্‌দিবাকরঃ।
জজ্বলুঃ অগ্নয়ঃ শান্তাঃ শান্তদিগ্‌জনিতস্বনাঃ॥'

পুরাণকার যে অসামান্য কুশলতার সহিত দেবীমহিমা খ্যাপনের প্রসঙ্গে দেবত্বের প্রতিষ্ঠা-কৌশলটিও শিখাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই সর্বকালের সকল সমাজের জন্য অন্ধকারে আলোক বর্তিকা স্বরূপ। মহিষাসুর সাঙ্গোপাঙ্গ সহ বধ হইলেও দেবতাগণের দুঃখ-দুর্ভোগ পূর্ণ নিরাকৃত হইতে কিন্তু আরও বিশেষ কিছুর অপেক্ষা ছিল,—জগদম্বার প্রভূত অনুগ্রহ-ভাজন হইয়াও নিরুদ্বেগ শান্তি-সম্পদ্ লাভ করিবার জন্য কঠিনতর সাধনার প্রয়োজন হইয়াছিল তাঁহাদের। আবশ্যক হইয়াছিল, অহঙ্কার ও মমত্বকে নিঃশেষে মাতৃচরণে সমর্পণ করিবার।

সমষ্টিজীবনে যাহা সত্য, ব্যষ্টির ক্ষেত্রেও তাহাই। মহিষাসুর-বধের নিশ্চিন্ততা দেবতাগণকে আত্মপ্রসাদ আনিয়া দিয়াছিল, কিন্তু সাধকোচিত চৈতন্য আনে নাই। বাহিরের বাধা দূর হইলেও অন্তরের গভীরে লুকানো সংস্কার অস্মিতা ও আসক্তি গোপনশত্রুতা করিয়াই চলিতেছিল। উহারা এইরূপই করিয়া থাকে সকলের ব্যক্তি-জীবনেও। শুম্ভ ও নিশুম্ভ প্রত্যেকের জীবনেই সুযোগ-সন্ধানী দৃষ্টি লইয়া ওত পাতিয়া রহিয়াছে। মায়ের কৃপাতে আমাদের সংসার-সুখ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাদি বাধামুক্ত হইয়াছে, স্বর্গীয় বৈভব আমাদের করমুষ্টিতে, সার্বিক ক্ষমতা আমাদের অধিকারে—এইরূপ অহঙ্কৃত আত্মশ্লাঘা

যখনই পাইয়া বসে, তখনই চমক ভাঙিয়া যায়! শুম্ভ ও নিশুম্ভ ততক্ষণে উহাদের যথেচ্ছ তাণ্ডবে জীবনকে বিপর্যস্ত ও লণ্ড-ভণ্ড করিয়া তুলে! কেবল পুরাণে নহে, প্রতি সমাজে ও ব্যক্তিতে ইহাই চিরন্তন প্রত্যক্ষ ঘটনা। পুরাণ তাই চিরপুরাতনই বটে,—মানবের জীবনপুরাণ।

গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব তিনের দয়ার পরেও আমাদের ঈপ্সিত শান্তি বহুদূরে থাকিয়া যায়। 'অনিচ্ছন্নপি বলাদিব নিয়োজিতঃ'—অনিচ্ছা সত্বেও কে যেন ঘাড় ধরিয়া আমাদিগকে সংসারের কদর্যপথে চালনা করে, দুঃখের স্বপ্নে বিনিদ্র রাখে।

দেবীমাহাত্ম্যের এই উত্তরচরিত্র অতিশয় গহন এবং গভীর ব্যঞ্জনাময়। শুম্ভ—অস্মিতার প্রতীক। বিচিত্র সংসার—ধন-জন গৃহ, বিত্ত-প্রতিষ্ঠা-খ্যাতি, শরীর-রূপ-স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিচিত্র শোভাময় এই বিশ্ব জুড়িয়া কেবলই 'আমি'। 'আমি' 'আমি'—ইহাই অস্মিতা। যে শুম্ভ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন এই শুম্ভ শব্দ, উহারও তাৎপর্যার্থ শোভাময়ই বটে! নিশুম্ভ হইতেছে মমত্ববুদ্ধি—আসক্তি—'আমার' 'আমার' ভাব। যেখানে 'আমি'—সেখানেই 'আমার'। 'আমি' ও 'আমার'—শুম্ভ ও নিশুম্ভ পরস্পর সহোদর। 'আমি' ও 'আমার'-রূপ শুম্ভ-নিশুম্ভকে পরাভূত করিতে না পারিলে ব্যক্তিজীবনে কিংবা সমাজ-জীবনে স্থায়ী শান্তি দূরপরাহত। ইহারই জন্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন স্ব-স্ব হৃদয়ের নিভৃতে প্রসন্ন মাতৃ-আবির্ভাবের।

শরতের নীল আকাশে নিরবচ্ছিন্ন আলোক-বিস্তার থাকে না। মাঝে মাঝেই মেঘের আনাগোনা চলিতে থাকে,—মেঘ ও রৌদ্রের এই দ্বন্দ্ব, প্রশান্ত গগনকে ক্ষণে ক্ষণে অনুজ্জ্বল করিয়া তুলে! কিন্তু আকাশের এই ম্লানরূপকে—নিরাশার ছায়াটিকেই মাত্র না দেখিয়া, প্রেরণা-দায়ক উহার অপর দিকটিকেও আমরা দেখি না কেন? ভাসমান পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘমালা পুরাণোক্ত সেই দেবতা-কণ্ঠের প্রার্থনা-ধ্বনিকেও বহন করিয়া ফিরিতেছে। উহারই অনুরণন আমাদের হৃদয়-তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠুক:

'দেবী প্রপন্নার্তি হরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বং,
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥'

…দাদা, জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখাব, তবে আমার নাম। তুমি জমি কিনে জ্যান্ত দুর্গা মাকে যে দিন বসিয়ে দেবে, সেই দিন আমি একবার হাঁফ ছাড়ব। তার আগে আমি দেশে যাচ্ছি না। যত শীঘ্র পারবে—।…

মা-ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে। ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে। দেখছ কি ভায়া, ক্রমে সব বুঝবে। এইজন্য তাঁর মঠ প্রথমে চাই।…আমেরিকা ইওরোপে কি দেখছি?—শক্তির পূজা, শক্তির পূজা। তবু এরা অজানতে পূজা করে, কামের দ্বারা করে। আর যারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিকভাবে, মাতৃভাবে পূজা করবে, তাদের কী কল্যাণ না হবে! আমার চোখ খুলে যাচ্ছে, দিন দিন সব বুঝতে পারছি। সেইজন্য আগে মায়ের জন্য মঠ করতে হবে। আগে মা আর মায়ের মেয়েরা, তারপর বাবা আর বাপের ছেলেরা, এই কথা বুঝতে পার কি?

স্বামী বিবেকানন্দ

আগমনী

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

'আনন্দমেলা'র সম্পাদক। সাহিত্য আকাদেমী, আনন্দ পুরস্কার এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পুরস্কার ছাড়াও তারাশংকর স্মৃতি, উল্টোরথ ও শিরোমণি
সাহিত্য-সম্মানে বিভূষিত যশস্বী কবি ও প্রাবন্ধিক।

বেহুলার ভেলা যেভাবে
দুঃখের নদীতে ভাসতে-ভাসতে একসময়
স্বর্গলোকে গিয়ে ঢুকেছিল,
ঠিক সেইভাবেই
অনন্ত নৈরাশ্যের মধ্যে ভাসতে-ভাসতে এখন
অলৌকিক এক আলোর বৃত্তের মধ্যে এসে
ঢুকে পড়েছে আমাদের এই
দুঃখী নগর, কলকাতা।

তার মাথার উপরে
কালো কুচ্ছিত মেঘগুলো এখন
রং পালটে
একটু একটু করে সাদা হয়ে যাচ্ছে। আর সেই
মেঘের কানা উপচে
কলকাতার বাড়িঘর আর রাস্তাঘাটের উপরে
গড়িয়ে পড়ছে
ঈশ্বরের হাসির মতন আলো।

স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[প্রাপক : শ্রীপ্রমদাদাস মিত্র]

[১]

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

কাশ্মীর

কানন বল (বৃহস্পতিবার)

পূজনীয়েষু— 17. 4. 90

শ্রীনগর হইতে এ পথে আজ চারি দিন হইয়াছে। কিয়দ্দূরে কয়েকটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান আছে, নাম—মার্ত্তণ্ড, বৈরিনাগ, অনন্তনাগ ইত্যাদি। সে সকল স্থান দর্শনের জন্য যাইতেছি। সমুদয় দর্শন করিয়া ১০/১৫ দিনে পুনঃ শ্রীনগরে পৌছিব। আপনার প্রেরিত পত্র পাইতে বিলম্ব হইবে।

কি সুন্দর স্থান হইয়া যাইতেছি—তাহা বলিতে পারি না। প্রকৃতির কি গাম্ভীর্য্য! কি পবিত্র ভাব! চতুষ্পার্শ্বে হিমালয়ের শুভ্র শিখরে বেষ্টিত এক অতীব চমৎকার ফল ফুলে সরোবরে শোভিত উপত্যকা ভূমি। পর্ব্বত প্রদেশের পবিত্রতার কথা কি লিখিব? যদিও পবিত্র হৃদয়ের জন্য সকল স্থানই পবিত্র, তথাপি এ সকল স্থান দর্শন করিলে যে পবিত্র ভাবের আরও বৃদ্ধি করে তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে, যে কেবল দেশ কালের সৌন্দর্য্যের জন্য ভ্রমণ করে যথার্থই তাহার বিশ্রাম সপ্ত ভুবনেও নাই। এ সকল কথা শীঘ্রই আপনার নিকট স্বমুখে শুনাইবার ইচ্ছা রহিল। বোধ হয় বর্ষার আরম্ভে ও …দিকে যাত্রা করিব। একথা কাহাকেও জানাইবেন না।

গত পত্রে আপনাকে যাহা লিখিয়াছি তাহা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম হইবার নহে, কিন্তু কি করিব? বালকের পত্র এইরূপই হইবে। ক্ষমা করিবেন। পত্র লিখিতে জানি না। আমার বোধ হয় নির্ব্বিঘ্ন দেশভ্রমণই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। প্রকৃতি বিশেষে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করিতে পারে। তিব্বত ভ্রমণে চিত্তের অবস্থা জানিতে পারা যায় ও পরীক্ষা হয়। তিব্বতে আমার মনে আছে গত বৎসরই একদিন একাকী চলিতে চলিতে জলাভাবে তৃষ্ণায় প্রাণ যায় যায় হইয়াছিল। সে অবস্থাতেও এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। এ অবস্থা ৩ বৎসরে তিন দিন ঘটিয়াছিল। তদ্দেশের সে গভীর পবিত্র ভাবে ডুবিয়া কিছুই মনে থাকিত না। অথবা ভ্রমণে নিরস্ত করিতে পারে না।

সংস্কৃতে তিব্বতকে "উত্তর কুরু" কহে লিখিয়াছেন। আমি দয়ানন্দের কোন গ্রন্থে 'ত্রিবীষ্টপ' কহিতে দেখিয়াছি, আর্য্যদের আদি নিবাস ছিল। সেদেশের লোক আর্য্যদের "ফাফ্‌পা" কহে, আর আমাদের বড় ভক্তি করে। আমাদের সকল প্রকার দেবদেবীর পূজা করে। শাস্ত্রে বড় বিশ্বাস। সদা পাঠ করে। মঠস্থ ব্যক্তিদের আর কোন কর্ম্ম নাই। যে সকল নিয়ম আছে তাহার একটি লঙ্ঘন করিলে আর রক্ষা নাই। বিশেষ দোষ করিলে একেবারে মঠের বাহির করিয়া দেয়।

তিব্বতের রাজা লাহমা (লামা)। লাহমা (লামা) - যাহারা অধিক উন্নত। কয়েক শ্রেণীর আছে। প্রবর্ত্তকদের 'ডাবা' কহে। তিব্বতের সমস্ত আয় মঠাদিতে ব্যয় হয়। এখনও

জাতিস্মর অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। যথার্থই অতিশয় পুণ্যভূমি। কোন প্রকার উপদ্রব শূন্য। সে যাহা হউক এক্ষণে কোন নির্ব্বিঘ্ন স্থানে বসা। না বসিলে আর উপায় নাই। নরেন্দ্রনাথের আজ্ঞা শিরোধার্য্য, তাহাই কর্ত্তব্য। এ সকল কথা তাঁহাকে কিছু লিখিবেন না। এক্ষণে তিনি কিছুদিন গাজীপুরে থাকিবেন। আমিও শীঘ্র পৌঁছিব। পাওহারী বাবার কথা অনেক লিখিয়াছেন। তিনি এক অদ্ভুত যোগী, আপনার কি সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইতি—

সতত আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
গঙ্গাধর

আপনি ৺কাশীধামে বাস করেন ও নানাপ্রকার সাধুমহাজনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং শাস্ত্রাদি অনেক দেখিয়াছেন। অতএব কৃপা করিয়া এ দাসকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিবেন। অবশ্য অবশ্য; দেখুন কদাচ ভুলিবেন না। সদা আশীর্ব্বাদ করিবেন। ৺বিশ্বনাথের ধ্যানকালে যেন এ দাসকে না ভুলেন। আমার এ প্রার্থনা পূরণ করিবেন। আর অধিক কি লিখিব ? আপনার অনুগ্রহ আমি ভুলি নাই।

এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোগোন অধিকাংশই শাক্ত ও বৈষ্ণব। এখানে যে সকল দেবীর স্থান আছে তথায় একত্র হইয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া এমন মধুর কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ করে, আহা! সে ভাব বড় সুন্দর। কাশ্মীরের কথা আর বিশেষ কি লিখিব, আপনি জানেন। আজকাল এখানে শীতের লাঘব হইয়াছে। স্বাস্থ্য অতি উত্তম, সকল প্রকারে অনুকূল।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বাবাজীর কোমরের বেদনা কেমন লিখিবেন। আজ ২/৪ দিন হইল আমি তাঁহার ২ খানি পত্র পাইয়াছি, কিন্তু তাঁহার শরীরের কথা আমাকে কিছু বিশেষ কিছু লিখেন নাই। আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন। আর সকলকে প্রণাম জানাইবেন।

শ্রীনরেন্দ্র বাবাজী যদি কিছুদিনের জন্য এ সকল স্থানে আসিয়া থাকেন ত তাঁহার শরীরের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর হইবে। যাতায়াতেও বড় সুগম। আমি লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি কিছু বলেন নাই।

আমার দুর্ভাগ্য আপনাকে এমন পত্র লিখিতে পারিলাম না যাহাতে সকল কথা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। তজ্জন্য ক্ষমা করিতে হইবে। যতদিন না পৌঁছাতে পারি, ততদিন যেরূপ মনে হইবে লিখিব।

যেরূপ একখানি 'ভগবদ্গীতা' গুটকা কেবল মূল আমি আনিয়াছিলাম ঠিক সেরূপ এক-খানি মুম্বাই (বোম্বাই) ছোট গীতা এ ঠিকানায় পাঠাইবেন। গঙ্গা বিষ্ণুর ছোট গুটকা মূল গীতা। নিবেদনামিতি—

C/o Pandit Wash Kak, Dy Commr. Srinagar Khas mahal

আপনার—**গঙ্গাধর**

To Babu Pramada Das Mitra

Benares City

[২]

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

গাজীপুর
May, 1890

পূজনীয় মহাশয়ের চরণে সহস্র সহস্র প্রণাম—

দাসের এখানে পৌঁছিয়া ২ দিন হইয়াছে, সে দিন দিলদারনগর ষ্টেশনে সমস্ত রাত্রি থাকিতে হইয়াছিল। তথা হইতে রাত্রি ৫ ঘটিকার ট্রেণে তারীঘাটে আসিয়াছিলাম। দিলদার-নগর ষ্টেশনে প্রাতঃকালে যেমন উঠিয়া বসিয়াছি, দেখি দাসের সম্মুখে আপনি শয়ান !! নিশ্চিত হইয়াছিলাম যে আপনি আসিয়াছেন। কি ভ্রম! আপনি কি জানেন? ইহার কারণ কি? দাসের বোধ হয় কেবল অতিশয় স্নেহ ও সংসর্গেই এরূপ ভ্রম হয়।

গতকল্য পাওহারী বাবাজীর আশ্রমে ছিলাম। তাঁহার বাণী শ্রবণে কৃতার্থ হইয়াছি। তিনি সাক্ষাৎ বিনয়ের মূর্তি। এমন বিনীত ভাব আর কোথাও দেখি নাই। বাবাজী এ দাসের প্রতি বিশেষ কৃপা করিয়াছেন। তাঁহার 'দাস ও সরকার' ভিন্ন অন্য কোন সম্ভাষণ নাই। আমাদের নরেন্দ্র স্বামীর বহু প্রশংসা করিলেন। বাবাজীর সকল কথা ত আপনি বিদিত আছেন। আমি আর কি লিখিব।

পাওহারী বাবার কথা শ্রবণে দাস কৃতার্থ হইল। কথা শুনিলেই তাঁহার দর্শন হয়। তাঁহার দর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

বহুকাল পরে গতকল্য দাসের শরীর ব্যাপিয়া বেদনা ও জ্বর হইয়াছিল। একদিনের জ্বরেই পেটে সেই পুরাতন প্লীহা দেখা দিয়াছে। এক্ষণে কিঞ্চিৎ সুস্থ আছি। এজন্য ২/৩ দিন এখানে থাকিতে হইল। আজকাল এখানে খুব আঁধি ও ঝড় হইতেছে। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ না হইলে যাইতে পারিব না।

আপনার ওখানে ত গরম কাহাকে বলে জানিতেই পারি নাই। আপনার সৎসঙ্গের কথা মনে হইলে দাসের মনে এক বিমল ভাবের উদয় হয়। এ দাসকে কদাচ ভুলিবেন না, আর সদা আশীর্ব্বাদ করিবেন।

শরীর অসুস্থ হইবার কারণ বোধ হয় কেবল পূবে হাওয়া ও অত্যন্ত গ্রীষ্ম। তদ্ভিন্ন আর অন্য কোন কারণ দেখিতেছি না। কিছু চিন্তিত হইবেন না। বোধ হয় আর বেশী বাড়িবার সম্ভাবনা নাই।

বাবাজীর আশ্রমটি বড় শান্তিময়। কল্য রাত্রি তথায় ছিলাম। আশ্রমের নিকট একটি গ্রাম আছে। তাঁহার আশ্রমে রাত্রিতে কেহ থাকিতে পায় না। বাবাজীর কাছে ২/৩ দিন থাকিবার জন্য প্রতিশ্রুত আছি। সুতরাং থাকিতে হইল। শরীরও কিঞ্চিৎ অসুস্থ। এক্ষণে পেটের প্লীহার স্থানে অল্প বেদনা বুঝিতেছি।

এখানের শ্রীযুক্ত গগন বাবু ও শ্রীসতীশ বাবু যথার্থই অতিশয় উদার প্রকৃতির লোক। এক্ষণে গগন বাবুর বাড়ীতে আছি। আপনি বরাহনগর হইতে কোন পত্র পাইয়াছেন কি? অগ্য

আমি একখানি পত্র দিলাম। বোধ হয় তাহার উত্তর পর্য্যন্ত এখানে আছি। আপনি যদি পারেন শীঘ্রই একখানি পত্র লিখিবেন। কিমধিকমিতি।—

[সতীশ বাবুর ঠিকানা :···]

আপনার চিরানুগত দাস
গঙ্গাধর।

পুঃ—আপনার কাছে আমি অনেক শিক্ষা পাই এবং সদাই শিক্ষা দিবেন। আর আশীর্ব্বাদ করুন যেন তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে পারি।···আপনি কেমন আছেন? আপনি ধন্য! শত সহস্র ধন্য। আপনি সদা সর্ব্বদা সেই প্রাণনাথকে হৃদয়ে দেখিতেছেন, সে বিমল সুখের ভাগী এই দাসকেও করিবেন। নিবেদনমিতি।—যদি ২/৩ দিনের মধ্যে পত্র আসে ত লিখিবেন, নহিলে নহে। (শরীর সুস্থ হইলেই যাইব) আজিকার রাত্রি ও কালিকার রাত্রি থাকিতেই হইবে। শরীর অসুস্থ না হইলে এই দুই রাত্রি থাকিয়া চলিয়া যাইব। আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন।

দাসানুদাস—**গঙ্গাধর**

[৩]

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

গাজীপুর
C/o সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
গোরাবাজার······**Ganj**
29. 5. 90

পূজনীয় মহাশয়ের চরণে সহস্র সহস্র প্রণাম—

অদ্য ৩ দিন হইল দাসের অত্যন্ত জ্বর হইতেছে। দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। বেলা ১২ ঘটিকার সময় আসে, অত্যন্ত শীত ও কম্পের সহিত। এ কি **Influenza**? সর্ব্ব শরীরে বেদনা হয়। এক্ষণে ভোগের কিঞ্চিৎ বিরাম হইয়াছে মাত্র, বিলক্ষণ জ্বর আছে। আপনাকে লিখিয়া কেবল চিন্তিত করা। কিন্তু না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। কিরূপে যে পত্র লিখিতেছি তাহা আর কি বলিব। বড় দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে। যাহা হোক ভাল হইয়াছে, একবার ত ভোগ ছিল। কল্যকার দিন দেখিয়া চিকিৎসা না করিলে আরোগ্য হওয়া কঠিন হইয়াছে—ইঁহারা বলিতেছেন। আপনি শারীরিক কেমন আছেন? আপনার চিরানুগত এ দাসকে কদাচ ভুলিবেন না। দাসকে শীঘ্রই আপনার শুভ সংবাদ দিয়া সুখী করিবেন। আর কি লিখিব। শরীর কাহিল, কিছুদিন ভোগাইবে। অতএব আরোগ্য না হইলে কোথাও যাওয়া অসম্ভব। আপনার হস্তাক্ষর পাইলে দাস অত্যন্ত আনন্দিত হইবে।

—দাস **গঙ্গাধর**

স্বামী শুদ্ধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[প্রাপক : ব্রহ্মচারী বুদ্ধচৈতন্য, যিনি পরে স্বামী ভাস্বরানন্দ।]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

উদ্বোধন কার্য্যালয়
১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার
কলিকাতা।

প্রিয় বুদ্ধচৈতন্য,
10. 8. 25

বহুদিন পরে তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি। তোমাদের ওখানকার সমুদয় ব্যাপার বহুদিন হইতে সমুদয় জানিয়া আসিতেছি এবং আমরাও সময়ে সময়ে বিচলিত হইলেও শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় পরিণামে ভালই হইবে এই বিশ্বাসে অনেকটা নিশ্চিন্ত আছি। আমাদের কোন কাজে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বা কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার সময় রীতিমত আত্মপরীক্ষা করা উচিৎ। ভাবা উচিৎ, যে আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের মহিমা প্রচারের জন্য কার্য্য করিতেছি অথবা নিজেদের কোন প্রকার সূক্ষ্ম স্বার্থের প্রেরণা আমাদিগকে এইরূপ কার্য্য করাইতেছে। এইরূপ বিচারপরায়ণ হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে সদাসর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিলে তিনি কখনও বেতালে পা পড়িতে দেন না [।]

বাস্তবিকই কার্য্যের মধ্য দিয়াই আমাদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়। মেঘ অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। ওখানকার লোকের প্রকৃতি যেরূপই হউক আমাদিগকে যথাসম্ভব তাহাদের ভাল দিক দেখিতে হইবে এবং নিজেদের সাধন ভজন ও চরিত্রবল দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে যে আমরা যথার্থই ভগবান রামকৃষ্ণদেবের আদর্শের অনুসরণ করিতেছি। সর্ব্বদাই যেন আমাদের আদর্শের দিকে দৃষ্টি থাকে। আমাদের মূল মন্ত্র স্বামিজী কথিত "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" এটি যেন কখনও ভুল না হয়। তথা হইতেই আমাদের সকল কল্যাণ হইবে। এবং যাহারা না বুঝিয়া এক্ষণে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে তাহারাও বুঝিতে পারিলে ক্রমশঃ মিত্র হইয়া দাঁড়াইবে।

মঠে মহাপুরুষ মহারাজ এবং পুরীতে শরৎ মহারাজ প্রভৃতি সকলে ভাল আছেন। আমার শরীর কিছু খারাপ হওয়ায় আমি কিছুদিন হইতে উদ্বোধনে রহিয়াছি। তুমি আমার ভালবাসাদি জানিবে। এবং বিদেহানন্দ ও সোমেশ্বরানন্দকেও জানাইবে। নূতন বাটীর কতদূর হইল জানিতে বাসনা [।] আগামী Easter-এ বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ-মিশন-মহাসম্মেলন হইবে। তাহাতে আমাদের সকল কেন্দ্র হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি নিমন্ত্রিত হইবে। বিস্তারিত বিবরণ শীঘ্র ছাপান পত্রে জানিতে পারিবে। ইহাতে প্রায় দেড় হাজার টাকা খরচ হইবে। তোমাদের ওখান হইতে ঐ উদ্দেশ্যে যদি কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে পার তাহা হইলে ভাল হয়। সকল কেন্দ্রের প্রতিনিধিবর্গ মিলিত হইয়া যাহাতে ভাবের আদান-প্রদান করিতে পারে এবং মিশনের আদর্শ বুঝিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারে এবং সকল কার্য্যগুলি প্রণালীবদ্ধ সুশৃঙ্খলভাবে চলে এবং কার্য্যের আরও প্রসার হইতে পারে তাহার জন্য এই উদ্যম।

এখানে প্রতিমা করিয়া শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার আয়োজন হইতেছে। সম্প্রতি পূর্ণিয়া জেলার আরারিয়া মহকুমায় কলেরা Relief হইয়াছিল। তথায় একটি নূতন কেন্দ্র খুলিবার আয়োজন চলিতেছে। তোমরা যদি মধ্যে মধ্যে 'উদ্বোধন' 'প্রবুদ্ধ ভারত' প্রভৃতিতে প্রবন্ধ পাঠাও তবে ভাল হয়। সোমেশ্বরানন্দকে এ বিষয় বলিও।

ইতি—
তোমার শুদ্ধানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী

স্বামী গম্ভীরানন্দ

গত ২২ মে ১৯৮৫ নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন অন্তে সমাগত ভক্ত নরনারী ও সাধুমণ্ডলীর উদ্দেশে পূজ্যপাদ সঙ্ঘাধীশ মহারাজের অভিভাষণ—টেপরেকর্ড থেকে অনুলিখিত।

শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন হয়েছিল বিশেষ প্রয়োজনে। তাঁকে যুগাবতার আমরা বলে থাকি, কিন্তু তিনি শুধু এই যুগের জন্য আসেননি। তাঁর বাণী এবং জীবনীর অর্থ প্রকাশিত হতে হাজার হাজার বছর কেটে যাবে। তাঁর প্রভাব বিস্তারিত হতে থাকবে ঘর থেকে ঘরে, দেশ থেকে বিদেশে—সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে অনেক সময় লাগবে। তাঁর কতটুকু আমরা আজ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছি বা বুঝতে পারি—আর কতটুকুই-বা ভাষায় প্রকাশ করে বলতে পারি। সে অসম্ভব ব্যাপারেতে আমার মতো ব্যক্তির পক্ষে প্রবেশ করা অসম্ভব। তথাপি, অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে আমাকে দু-চার কথা বলতে হবে, তাই সংক্ষেপে বলছি। সংক্ষেপে বলছি এইজন্য যে, বয়স হয়ে গেছে, স্বাস্থ্যও ভাল নয়—আমরা এখন ক্রমে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৌঁছে যাচ্ছি। জীবন্ত আর প্রায় নই বললেই চলে। এই অবস্থায় বক্তৃতা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, মানবজীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানলাভ। তার উপায় কি? উপায়ও তিনি বলে গেছেন তাঁর বাণীতে এবং সেই উপায়কে রূপায়িত করেছেন নিজের জীবনে। যাঁরা তাঁর বাণী এবং জীবনীর সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা জানেন তিনি কি বলে গেছেন এবং কি করে গেছেন এবং তার তাৎপর্য কত সুদূর বিস্তারিত।

তিনি একটি কথা বলে গেছেন,—কলিতে নারদীয় ভক্তি। ভগবানলাভের উপায় কি? বলেছেন, কলিতে নারদীয় ভক্তি। সর্বস্ব অর্পণ করে, তাঁর জন্য ব্যাকুল হয়ে—সত্য, সরলতা ইত্যাদি অবলম্বন করে সারাজীবন তপস্যায় নিরত থাকা—এই হচ্ছে ভগবানলাভের উপায়। তিনি নিজে মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছেন,—মা এই নাও তোমার শুদ্ধি, এই নাও তোমার অশুদ্ধি, এই নাও তোমার কর্ম, এই নাও তোমার অকর্ম, এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। সেই শুদ্ধাভক্তির জন্য তিনি প্রার্থনা করেছেন এবং আমাদেরও বলে গেছেন এই ভক্তি অবলম্বন করেই ভগবানের কাছে পৌঁছাতে পার। নারদ তাঁর ভক্তি সূত্রেতে বলেছেন যে, ভক্তির যদি সংজ্ঞা দিতে হয়, সেই সংজ্ঞাটা কি, না—তাঁর প্রতি পরমপ্রেমস্বরূপ। 'তাঁর প্রতি' বললেন, কোন বিশেষ দেবতা বা দেবীর নাম করলেন না। সাধারণভাবে সকলভাবেতে বললেন 'তাঁর প্রতি'। ভগবান যে রূপেতেই থাকুন, যে রূপ ধারণ করে আসুন, মানবের মনেতে তিনি যেভাবেই উপস্থিত হোন না কেন, তাঁর প্রতি যে পরমপ্রেমস্বরূপ একটা ভাব—তাই-ই হচ্ছে ভক্তি। প্রেম বলতে আমরা সাধারণতঃ মানবজীবনের সর্বোত্তম, সন্নিকট সম্বন্ধ বলে বুঝে থাকি, যে-সম্বন্ধ অবলম্বন করে মানুষ মানুষের কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় হয়ে থাকে—তাকে আমরা বলি প্রেম। সেই প্রেমের যা পরম অবস্থা,—সেই অবস্থার সঙ্গেও তুলনা করলেন না, বললেন সেই পরমপ্রেমের মতো। ভগবানের যে-প্রেম তার কাছে জাগতিক যত প্রকারের আমাদের অনুভূতি বা জাগতিক যত

প্রকারের বিশ্বাস প্রত্যয় ইত্যাদি আমাদের রয়েছে—সবকে পেরিয়ে যায় ভগবৎপ্রেম। এমন ভগবৎপ্রেমের কথাকেই ঠাকুর ভক্তি বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং তারই কথা বলে গেছেন আমাদের সকলকে গ্রহণ করতে। নিজের জীবনে তিনি তাই করেছেন।

ভক্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নারদ ভক্তির বাইরের লক্ষণ বলেছেন এবং ভিতরের দিক থেকেও সংজ্ঞা দিয়েছেন। বাইরের দিক থেকে ভক্তির লক্ষণ যদি দেখতে যাই, তবে কি দেখব ? দেখব,—ভগবানেতে সর্বপ্রকার কর্ম অর্পণ করা এবং তাঁর দর্শন পাচ্ছি না বলে পরম ব্যাকুলতা।—তাকেই বলে ভক্তি-লক্ষণ। তাঁর কাছে সমস্ত কিছু অর্পণ করে দেওয়া। ঠাকুর বলছেন, তাঁর নিজের বলতে কিছু নেই। মা যেমন চালান তেমনি তিনি চলেন, মা যেমন বলান তেমনি করে তিনি বলেন—এই ছিল তাঁর ভাব সর্বদা। এটা মুখের কথা নয়। ঠিক একেবারে প্রাণের কথা। তাঁর জীবন এবং বাণীতে তিনি তাই প্রকাশ করে গেছেন,—মায়ের ইঙ্গিতে তিনি পরিচালিত হচ্ছেন। যা কিছু কথা তাঁর ভিতর থেকে বেরিয়েছে, জীবনটা যে ভাবেতে প্রকাশিত হয়েছে—সবই হয়েছে মায়ের দ্বারা। মা যেমন করেছেন ঠিক তাই ঘটেছে। এই হল তাঁর প্রতি সমস্ত অর্পণ করা।

তারপরে তাঁর পরম ব্যাকুলতা। এই আপনারা যাঁরা ভক্ত, যাঁরা তাঁর জীবনী পড়েছেন—তাঁরা জানেনও। আমাকে নতুন করে কিছু বলতে হবে না। তিনি গঙ্গাতীরে কাতর হয়ে পড়ে 'মা মা' বলে ডাকতেন—বলতেন, মা আরও একটা দিন ফুরিয়ে গেল আজও তোর দর্শন পেলাম না। পাশে লোক দাঁড়িয়ে যেত, তারা বলত লোকটা হয়তো পেটের ব্যথাতে কষ্ট পাচ্ছেন, হয়তো এইজন্যই কান্নাকাটি করছেন—তারা ভিতরের কথা কি করে জানবে! তারা বলত—শূল-ব্যথা। শূল-ব্যথাতে লোকটি ক্রন্দন করছেন। কিন্তু আদতে তিনি যে মায়ের জন্য কাঁদছেন সেটা তো তারা বুঝত না। তারপর এমন দিন এল যখন সে বিরহ আর তাঁর সহ্য হয় না—কালীমন্দিরে প্রবেশ করে দেখেছেন সেখানে একটি খড়্গ ঝুলছে দেয়ালেতে, সেই খড়্গ দিয়ে প্রাণত্যাগ করার জন্য তিনি চেষ্টিত হলেন—এমন সময়েতে তিনি মা-কালীর দর্শন পেলেন। এই ব্যাকুলতা—পরম ব্যাকুলতা,—তাঁকে না হলে চলে না! এই ব্যাকুলতা অবলম্বন করেই তিনি মাকে পেয়েছিলেন।

আর ঠাকুর বলেছিলেন, সত্যই হচ্ছে কলির তপস্যা। সত্যকে অবলম্বন করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। কথাটা উঠলেই নানা মনেতে নানা প্রশ্ন জাগে,—সত্য নিয়ে কি আমরা সংসারে বেঁচে থাকতে পারি ? কথা তা নয়। কথা হচ্ছে, সত্যটাকে অবলম্বন আমাকে অবশ্যই করতে হবে, মানুষ জন্ম যখন গ্রহণ করেছি এবং ভগবানকে যখন আমি লাভ করতে পারি।—পারছি না সেটা আমার ত্রুটি, সেটা আমার দুর্বলতা। কিন্তু যেমন স্বামীজী বলেছিলেন, 'রামকে পেলাম না বলে কি শ্যামকে নিয়ে ঘর করতে হবে ?' তা তেমনি ভাবেতে সত্যকে যেহেতু আমি ধরতে পারলুম না তা বলে কি মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে ? তা কখনও নয়। সত্যকে আমাকে যেমন করেই হোক প্রাণপণে চেষ্টা করে ধরে রাখতে হবে, সত্যেতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এটা হল সাধারণ মানুষের পক্ষে। কিন্তু ঠাকুরের পক্ষে সে সত্য কি ছিল ? সত্যকে যে তিনি ধরেছিলেন তা নয়, সত্য ধরেছিল তাঁকে। যেমন নিজে বলেছেন,—যে বাবার হাত ধরে চলে তার পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে, কিন্তু বাবা যার হাত ধরেন সে পড়ে না। দৃষ্টান্ত—ঠাকুর গেছেন

নবদ্বীপে। মহাপ্রভুর জায়গা দর্শন করতে। কিন্তু কোন উদ্দীপনা তাঁর মনেতে জাগছে না। বললেন, এখানে এলাম কিসের জন্য ? এখানে তো কোন উদ্দীপনা জাগছে না। তারপরে নৌকো করে যখন ফিরছেন,—গঙ্গাবক্ষে,—তখন হঠাৎ বলছেন, এইরে এলোরে এলোরে। তিনি দেখতে পাচ্ছেন মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ দুজন যেন তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন। অতঃপর ইতিহাসের পাতা উল্টে আমরা জানতে পারি যে, মহাপ্রভুর জন্মস্থান যেটি ছিল সে জন্মস্থানটি ধুয়ে গঙ্গাগর্ভে চলে গেছে। সুতরাং নবদ্বীপে মহাপ্রভুর উদ্দীপনা যদিও তিনি পাননি, পেলেন তিনি গঙ্গাগর্ভে। সত্য তাঁকে জানিয়ে দিল যে আমি এই। তাঁকে কষ্ট করে সত্যটাকে জানতে হয়নি। সত্য তাঁকে ধরেছিল হাত, সত্যই তাঁকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি গেলেন মল্লিকদের বাড়িতে। শম্ভু মল্লিক মশাই তাঁকে বললেন যে, তুমি পেটের ব্যথায় ভুগছ, যাবার সময় এই ওষুধটুকু আমার কাছ থেকে নিয়ে যেও। এখন, কার্যোপলক্ষে শম্ভুবাবু বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়েছেন, আর ফিরছেন না, দেরি হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরকে কালীমন্দিরে ফিরে আসতে হবে। সুতরাং তিনি ভাবলেন—ওই তো ওষুধের মোড়কটা রয়েছে, শম্ভু তো এইটে দিতে চেয়েছিল। সেইটে তুলে নিলেই তো হল। সেইটে তুলে নিলেন তিনি হাতে। কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে তিনি আর রাস্তা দেখতে পান না। সামান্য একটুখানি দূরে কালী-মন্দির থেকে, রাত্রে চলা এমন কোন অসুবিধা নয়, কিন্তু যতই কালীমন্দিরের দিকে এগিয়ে যেতে চাচ্ছেন পা তাঁর চলে যাচ্ছে পাশে ড্রেনের দিকে। বারবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ফিরে যখন শম্ভুবাবুর বাড়ির দিকে তাকাচ্ছেন—সব পরিষ্কার। তখন বুঝলেন, তাই তো, এতো মিথ্যাচার হয়ে গেছে। শম্ভু বলেছিল তার হাত থেকে নিতে, আমি তো হাত থেকে নিইনি। সুতরাং ফিরে এসে আবার শম্ভুবাবুর বাড়িতে পৌছলেন, তখন ভিতরে সবাই চলে গেছে। বাইরে দরজা বন্ধ। জানালা দিয়ে মোড়কটি ভিতরে ফেলে দিয়ে বললেন, 'এই তোমাদের ওষুধ রইলো গো।' তারপরে যখন ফিরলেন দক্ষিণেশ্বরের দিকে সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। তিনি ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। এই হল,—সত্য তাঁকে ধরেছিল। সত্য তাঁকে সত্যপথেতে পরিচালিত করেছিল। সেই কথাই যেটা নিজের জীবনেতে তিনি অনুভব করেছিলেন—ভক্তি, সত্য—তারই কথা তিনি বলে গেছেন আমাদের গ্রহণ করতে।

আর বলেছেন তিনি—সরলতা। শিশুর মতো সরল হতে হবে। মা বলেছেন, ও ঘরে জুজু, ও ঠিক ধরে রেখেছে সেখানে জুজু। মা বলেছেন, ও তোর দাদা—সে কামারই হোক আর কুমোরই হোক না কেন, ব্রাহ্মণের ছেলে হলেও সে এক-পাতে বসে খাবে কেননা মা বলেছে দাদা। এই সরলতা। তিনি যাচ্ছেন গাড়ি করে কলকাতায়। কে বলেছিল শরতের হিম মাথায় লাগালে শরীর বেশ ভাল হয়। মাথা বের করে খুব শরতের হিম লাগালেন, তারপরে সর্দিকাশি। এই ছিল তাঁর সরলতা। তাঁর বাবাও ছিলেন তেমনি সরল। সরল না হলে সরল ভগবানকে লাভ করতে পারা যায় না।

আরও কয়েকটি কথা আমি আপনাদের সংক্ষেপে বলছি। কত কথাই তিনি বলে গেছেন! তিনি বলেছেন—সাধনার উপায় স্বরূপে সাধুসঙ্গ করা, সৎগ্রন্থ পাঠ করার কথা। ভক্তদের তিনি সেগুলো শিখিয়েছেন, তিনি দেখিয়েছেন।

সত্যেতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভগবানকে লাভ করে তাঁর মনে আকাঙ্ক্ষা জাগল যে, আমি ভক্তদের

নিয়ে থাকব। সংসারীদের কথাশুনে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেল—আর কতদিন ধরে চলে। মা তাঁকে বললেন যে, তোর ভক্তরাও আসবে, তাদের সঙ্গে তুই কথাবার্তা বলতে পারবি। কিন্তু তারা তো আসছে না তখনও, দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাই কুঠির ছাতে সন্ধ্যের সময় উঠে ডাকছেন,—ওরে কে কোথায় আছিস তোরা আয়। ভক্তরা সেই আহ্বান শুনলেন, তাদের প্রাণে জাগল আকুতি। ভক্তরা ক্রমে ক্রমে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাদের তিনি দিনরাত নানা ভাবেতে সাধনার পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা শোনাতে লাগলেন, যা কথামৃততে প্রকাশিত হয়েছে, লীলাপ্রসঙ্গেতেও লিখিত হয়েছে, যা স্বামীজী তাঁর নানারকম বক্তৃতাতে ব্যাখ্যা করেছেন।—এই সবটা মিলেই হল শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী। শুধু কথামৃত নিয়ে নয়—ঐ লীলাপ্রসঙ্গ নিয়ে এবং স্বামীজীর বাণী ও রচনা—সবটা নিয়েই হল শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও তাঁর বক্তব্য।

তিনি আবার রামকৃষ্ণ সংঘের প্রতিষ্ঠা করলেন কাশীপুরে। তিনি তাদের গেরুয়া বস্ত্র দিলেন, তাদের ভিক্ষা করালেন এবং নরেন্দ্রনাথকে নেতারূপে স্থির করে তিনি তাকে নানারকম পরামর্শ দিলেন,—কিভাবে সংঘ গড়তে হবে, কিভাবে ভাইদের ধরে রাখতে হবে।

ভক্তদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি তাদের সৎসঙ্গ দান করতে লাগলেন। নানারকম কীর্তনাদিতে তিনি যোগ দিতে লাগলেন। নাচেন, গান করেন, মুহুর্মুহুঃ সমাধি হয়। তাঁর অবস্থা দেখে ব্রাহ্মসমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় একদিন বলেছিলেন, 'বাবা এ যেন ভূতে পাওয়া।' আর দৃষ্টান্ত তো সংসারে খুঁজে পাওয়া গেল না—এইজন্য ভূতে পাওয়া। ভগবান এমন ভাবেতে তাঁকে ধরে বসেছেন যে, এ জগতের কোন হুঁশই নেই। একেবারে ঈশ্বরেই তিনি মত্ত। এই যে মত্ত হয়ে যাওয়া, এই ভাব শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়ে দিয়ে গেলেন তাঁর জীবনেতে যে, না মাতলে,—ভগবানকে পাবার জন্য এমনি করে সর্বস্বহীন হয়ে সর্বহারা হয়ে তাঁকে প্রাণপণে না ডাকলে তাঁকে পাওয়া যায় না। এইভাবেতে তিনি তাঁর জীবনেতে যা উপলব্ধ বস্তু, নানাভাবেতে প্রচার করলেন। এবং তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন মাস্টার মশাইকে, নরেন্দ্রনাথকে, স্বামী সারদানন্দকে, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইত্যাদি আরও অনেক বড় বড় ভক্তদের, যাঁরা তাঁদের অনুভূতি, তাঁদের শোনা কথা সমস্ত লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন, ব্যাখ্যা করে গেছেন, বলে দিয়ে গেছেন।—সেই সমস্ত থেকেই আমরা আজ শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয় পাচ্ছি নানাভাবেতে। তাই বলছিলাম পাচ্ছি, আপনারা আরও পাবেন। আমি যতটুকু বললুম, তাতে আপনারা সকলেই বলবেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি। আরও অনেক কিছুই আছে। সত্যিই তো তাই। গোড়াতেই তো বলেছি। কতটুকু আমি বুঝেছি, আর কতটুকু আপনাদের বুঝিয়ে বলতে পারি এ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাতে। এ সম্ভবপর নয়। তাঁর জীবন, যতদিন যাবে, যত বছর যাবে, যত যুগযুগান্ত যাবে, ততো আরও বেশি প্রকাশিত হতে থাকবে। তাঁর জীবনের পূর্ণ তাৎপর্য গ্রহণ করতে মানবের সহস্র সহস্র বৎসর লেগে যাবে। আজও যীশুখ্রীষ্ট বেঁচে আছেন, আজও মহম্মদ বেঁচে আছেন, আজও বুদ্ধ বেঁচে আছেন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র—এখনও তাঁরা রয়েছেন এবং থাকবেন। তাঁরা থাকবেন আরও সহস্র সহস্র বৎসর ধরে। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী এবং তাঁর জীবন এইমাত্র তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করেছে—চলবে আরও কত সহস্র সহস্র বৎসর ধরে। তিনি বলেছিলেন ঘরে ঘরে তাঁর ছবির পুজো হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনারা আরও দেখতে পাবেন, কত ঘরে কত গ্রামে, কত শহরে, কত জায়গায় নানারকমভাবে মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, ভক্ত সমাগম হচ্ছে, ভাবপ্রচার হচ্ছে। আরও কত হবে। সহস্র সহস্র ব্যক্তি দীক্ষার জন্য লালায়িত হয়ে আপনা থেকে ছুটে আসছে!—এ-সব কার প্রেরণা? এ তাঁরই প্রেরণা। যেমন মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ বলতেন, তিনিই তাঁর ভক্তদের নিয়ে আসেন আর আমি তাদের সকলকে তাঁরই শ্রীচরণে অর্পণ করে দিই। এ-সব তাঁরই কাজ। শ্রীরামকৃষ্ণ এ-সব লীলা করে যাচ্ছেন। এই কটি কথা বলে আমি আপনাদের কাছ থেকে আজকে বিদায় গ্রহণ করছি। ধন্যবাদ।

'খণ্ডন-ভব-বন্ধন জগ-বন্দন বন্দি তোমায়'

শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আনন্দ-পুরস্কারে সম্মানিত খ্যাতনামা গল্পকার, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক। আনন্দবাজার পত্রিকার সহ-সম্পাদক।

কথামৃতের শেষ পরিচ্ছেদে এসে প্রাণটা হুহু করে ওঠে। ঠাকুরের ঘরের দেয়ালে টাঙানো গৌর নিতাইয়ের ছবি একখানা বেশি ছিল। গৌর নিতাই সপার্ষদ নবদ্বীপে সংকীর্তন করছেন। রামলাল শ্রীরামকৃষ্ণকে বলছেন, 'তা হলে ছবিখানি এই এঁকে মাস্টারকেই দিলাম।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'আচ্ছা, তা বেশ।'

সব ছাড়ার পালা। যাকে যা দেবার আছে সব দিয়ে যাচ্ছেন একে একে যা বলার আছে সব বলে যাচ্ছেন।

ঠাকুর হঠাৎ একদিন মৌনী হলেন। সকাল ৮টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত। সেদিন ছিল মঙ্গলবার। ১১ অগস্ট ১৮৮৫ আগের দিন গেছে অমাবস্যা। শ্রীম লিখছেন: 'শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখের সঞ্চার হইয়াছে। তিনি কি জানিতে পারিয়াছেন যে, শীঘ্র তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন! জগন্মাতার ক্রোড়ে আবার গিয়া বসিবেন? তাই কি মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন? তিনি কথা কহিতেছেন না দেখিয়া শ্রীশ্রীমা কাঁদিতেছেন। রাখাল ও লাটু কাঁদিতেছেন। বাগবাজারের ব্রাহ্মণী এই সময় আসিয়াছিলেন, তিনিও কাঁদিতেছেন। ভক্তেরা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আপনি কি বরাবর চুপ করিয়া থাকিবেন?'

শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘিরে যে লীলা শুরু হয়েছিল তা শেষ হয়ে আসছে। এইবার প্রদীপ একদিন নিববে। কাল চলে যাবে ইতিহাসের গর্ভে। তারই ইঙ্গিত সর্বত্র। শ্রীম লিখছেন: 'শ্রীরামকৃষ্ণ—রোগ সারাবার কথা বলতে পারি না। আবার ইদানীং সেব্য-সেবক ভাব কম পড়ে যাচ্ছে। একবার বলি মা তরবারির খাপটা একটু মেরামত করে দাও; কিন্তু ওরূপ প্রার্থনা কম পড়ে যাচ্ছে, আজকাল আমিটা খুঁজে পাচ্ছি না। দেখছি তিনিই এই খোলটার ভিতর রয়েছেন।'

এই কথার পর ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে গোস্বামীজীর কীর্তন শুরু হল। অনুমতি নেওয়ার কারণ, ঠাকুর অসুস্থ। কীর্তন হলেই ভাবাবেশ হবে। ভাবাবেশ হলেই গলায় চাপ পড়বে। কীর্তন শুনতে শুনতে ঠাকুর যথারীতি ভাবাবিষ্ট হলেন। দাঁড়িয়ে উঠে শুরু করে দিলেন ভক্তসঙ্গে নৃত্য। রাখাল ডাক্তার শ্রীমের সঙ্গে এসেছিলেন ঠাকুরের চিকিৎসার জন্যে। তাঁরা ঠাকুরের ভাবাবেশ দেখলেন। তাঁর ভাড়াটিয়া গাড়ি অপেক্ষা করছে বাইরে। কলকাতায় ফিরতে হবে। উঠে পড়লেন। একে একে প্রণাম সেরে বিদায়ের পালা।

শ্রীরামকৃষ্ণ সস্নেহে মাস্টারকে বললেন, 'তুমি কি খেয়েছ?'

এ হল ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বরের কথা। এরপর আর মাত্র একটি দিন। বৃহস্পতিবার ২৪ সেপ্টেম্বর। পূর্ণিমার রাত। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ঘরের ছোট খাটটির উপর বসে আছেন। মাস্টার প্রভৃতি ভক্তেরা বসে আছেন মেঝেতে। গলার জন্যে ঠাকুর কিছুটা কাতর।

শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারকে বলছেন, 'এক একবার ভাবি দেহটা খোল মাত্র। সেই অখণ্ড (সচ্চিদানন্দ) বই আর কিছু নাই।'

কথামৃতের মূলপর্ব শেষ হচ্ছে এইভাবে: 'তা হলে ছবিখানি এঁকেই (মাস্টারকে) দিলাম'—রামলাল এই কথা বলতে বলতে দেয়ালে

টাঙানো ঠাকুরের অতি প্রিয় ছবিখানি খুলে নিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে গৌর নিতাইয়ের ছবি একখানা বেশি ছিল: গৌর নিতাই সপার্ষদ নবদ্বীপে সংকীর্তন করছেন।

ঠাকুর বললেন, 'আচ্ছা তা বেশ।'

এরপর সামান্য একটু সংযোজন, 'ঠাকুর কয়েকদিন প্রতাপের ঔষধ খাইতেছেন। গভীর রাত্রে উঠিয়া পড়িয়াছেন, প্রাণ আইটাই করিতেছে। হরিশ সেবা করেন, ঐ ঘরেই ছিলেন; রাখালও আছেন; শ্রীযুক্ত রামলাল বাহিরে বারান্দায় শুইয়া আছেন। ঠাকুর পরে বলিলেন, "প্রাণ আইটাই করাতে হরিশকে জড়াতে ইচ্ছে হল; মধ্যম নারায়ণ তেল দেওয়াতে ভাল হলাম তখন আবার নাচতে লাগলাম।"'

'সমাপ্ত' লেখায় অপূর্ব এক লীলার সমাপ্তি। এর পরেই পরিশিষ্ট। 'বরাহনগর মঠ। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি আজ ৺শিবরাত্রির উপবাস করিয়া আছেন। দুই দিন পরে ঠাকুরের জন্মতিথি পূজা হইবে। বরাহনগর মঠ সবে পাঁচ মাস স্থাপিত হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্যধামে বেশীদিন যান নাই।…আজ সোমবার ৺শিবরাত্রি, ২১শে ফেব্রুআরি ১৮৮৭।…পূজা শেষ হইয়া গেল। শরৎ তানপুরা লইয়া গান গাইতেছেন—

শিব শঙ্কর বম্ বম্ (ভোলা)
কৈলাসপতি মহারাজরাজ!…

'নরেন্দ্র কলিকাতা হইতে এইমাত্র আসিয়াছেন। এখনও স্নান করেন নাই। কালী নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মোকদ্দমার কি খবর?

'নরেন্দ্র (বিরক্ত হইয়া)—তোদের ওসব কথায় কাজ কি?

'নরেন্দ্র তামাক খাইতেছেন ও মাস্টার প্রভৃতির সহিত কথা কহিতেছেন:

"'কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না করলে হবে না। কামিনী নরকস্য দ্বারম্। যত লোক স্ত্রীলোকের বশ। শিব আর কৃষ্ণ এঁদের আলাদা কথা। শক্তিকে শিব দাসী করে রেখেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সংসার করেছিলেন বটে, কিন্তু কেমন নির্লিপ্ত। —ফস্ করে বৃন্দাবন কেমন ত্যাগ করলেন!"'

কথামৃতের এই পর্যায়টি উল্লেখ করলাম দুটি কারণে। প্রথম কারণ, আমরা যে লীলায় প্রত্যক্ষ অংশ নিতে পারিনি বা নিলেও দেহরূপ বদলাতে বদলাতে বর্তমানের নামরূপে এসে বিস্মৃত, সেই লীলার অমৃত স্বাদে কথামৃত জমজমাট। ঠাকুর, পরম ভক্ত শ্রীমর মাধ্যমে অক্ষরের মালায় স্তব্ধ করে রেখে গেছেন, সেই কাল, সেই ভাব, সেই আন্দোলনকে। ঠাকুরের হাঁটাচলা, ওঠাবসা, ফিরে তাকানো, কথা বলা, হাত নাড়া, ক্ষণে ক্ষণে ভক্তদের আসা-যাওয়া, নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে কাষ্ঠপাদুকার শব্দ তুলে মা ভবতারিণীর মন্দিরে গিয়ে ঘণ্টাবাদন, পঞ্চবটীতে ঘুরে বেড়ানো, ভক্তসঙ্গে লীলাপ্রসঙ্গ, আরতির কাঁসর ঘণ্টা, কথামৃতের দুই মলাটে চিরকালের জন্যে বন্দী হয়ে আছে। আজও জীবন্ত।

দ্বিতীয় কারণ, ঠাকুর যেই নিত্যধামে আরোহণ করলেন দক্ষিণেশ্বর যেন ফাঁকা হয়ে গেল। 'নন্দকুল চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।' পদব্রজে অথবা নৌকাপথে কি ফিটনে চড়ে, দূর দূর থেকে ভক্তরা আর আসেন না। মা আছেন; কিন্তু সেই পঞ্চবটীর সাধনপীঠের প্রাণপুরুষ ফিরে গেছেন অমর্ত্যলোকে। দেবী আছেন; কিন্তু তাঁকে জাগ্রত করার সাধকপ্রবর নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। তীর্থ আছে, স্মৃতি আছে, লীলা নেই। অন্তরঙ্গ পার্ষদ যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সেই মুহূর্তের শূন্যতা দুঃসহ। সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছেন। কোথায় তাঁরা দানা বাঁধবেন। বরাহনগরের জীর্ণ কুঠিতে তাঁরা সমবেত হয়েছেন, ঠাকুরের পট প্রতিষ্ঠা হয়েছে, পূজার্চনাদিও হচ্ছে, সাধন-

ভজনেরও কমতি নেই ; কিন্তু কারুরই মন বসছে না। যিনি চলে গেলেন তাঁর তো কোনও দ্বিতীয় হয় না। কথামৃতের পরিশিষ্টাংশ যেন দীর্ঘ একটি বিলাপের মতো। সন্তানদের অনেকটা দিশাহারা অবস্থা।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের 'টাকা মাটি আর মাটি টাকা' ভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আত্মদর্শন, 'যা পাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।' 'গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।' তিনি কিছু প্রতিষ্ঠা করে যাননি। বিশেষ কোন মত, বিশেষ কোন পথ, বিশিষ্ট কোন অর্ডার। বেছে বেছে, আধার বুঝে, দশ-বারটি বৈরাগ্যবান্ যুবকের অন্তরে বীজ ফেলে গিয়েছিলেন। এ-যেন তাঁর নিজেরই 'প্যারেবল্স'-এর ধারা অনুসরণ। পাখি ঠোঁটে করে বীজ নিয়ে যেখানে সেখানে ফেলে। কোনটা পাথরে পড়ল, কোনটা পড়ল জলে, কোনটা মরুভূমিতে, ঠিক জায়গায় যেটি পড়ল, সেইটিই অঙ্কুরিত হল, ধীরে ধীরে পরিণত হল বিশাল বৃক্ষে। মঠ, মন্দির, মসজিদ অথবা কোন অর্ডারে ঠাকুর নিজেকে জড়াতে চাননি। তাঁর অসাধারণ মতবাদ—যত মত তত পথ।

'যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।'

আমার মত, আমার পথ বলে যাঁরা দম্ভ করতেন, ঠাকুর মুচকি হেসে বলতেন, ওরে, ও যে মতুয়ার বুদ্ধি।

'যদি হৃদয় মন্দিরে মাধব প্রতিষ্ঠা করতে চাও, যদি ভগবান লাভ করতে চাও, শুধু ভোঁ ভোঁ করে শাঁক ফুঁকলে কি হবে! আগে চিত্তশুদ্ধি কর, মন শুদ্ধ হলে ভগবান্ পবিত্র আসনে এসে বসবেন। চামচিকার বিষ্ঠা থাকলে মাধবকে আনা যায় না। এগারজন চামচিকে একাদশ ইন্দ্রিয়—পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় আর মন। আগে মাধব প্রতিষ্ঠা—তারপর ইচ্ছা হয় বক্তৃতা লেক্‌চার দাও! আগে ডুব দাও। ডুব দিয়ে রত্ন তোল, তারপর অন্য কাজ। কেউ ডুব দিতে চায় না। সাধন নাই, ভজন নাই, বিবেক-বৈরাগ্য নাই, দু-চারটে কথা শিখেই অমনি লেক্‌চার! লোকশিক্ষা দেওয়া কঠিন। ভগবানকে দর্শনের পর যদি কেউ তাঁর আদেশ পায় তাহলে লোক-শিক্ষা দিতে পারে।'

'তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বাৎ ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ ॥'

তিনি নিজে দম্ভশূন্য, সাধারণের থেকেও সাধারণ মানুষ ছিলেন। বুঝতেই দিতেন না, তিনি অবতার। দক্ষিণেশ্বরে এসে কেউ ধর্মকথা, তত্ত্বকথা শুনতে চাইলে, লহমায় দেখে নিতেন আধারটি কেমন। যেই দেখতেন মতুয়া, অমনি বলতেন, যাও না যাও, ওই মন্দিরে মা -ভবতারিণী আছেন, পঞ্চবটী, বেলতলা, গঙ্গা, বিল্‌ডিং ছ্যাখো, সিনারি দেখ।

ঠাকুরের পক্ষে সম্ভব ছিল না, টাটে বসে গুরু-গিরি করার। তিনি সার জানতেন, ঈশ্বর মন দেখেন। মুখে এক, মনে আর এক, ও চলবে না।

'লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥'

তাঁর কাছে অনেকে এসেছেন, একবার, দু-বার, বহুবার, দর্শন হয়েছে, শ্রবণ হয়েছে, এঁদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনই 'ইনার-অর্ডারে' স্থান পেয়েছিলেন। মায়ের পায়ে দেবার জন্যে বেছে বেছে তুলে নিয়েছিলেন মাত্র কয়েকজনকে। তাঁদের তিনটানকে একটান করে দিয়েছিলেন। ঠাকুর বলতেন, 'তিন টান একত্র হলে তবে তিনি দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের ওপর, মায়ের সন্তানের ওপর, আর সতীর পতির ওপর টান। এই তিন

টান যদি কারও একসঙ্গে হয়, সেই টানের জোরে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে।'

ঠাকুর যাঁদের তুলে নিয়েছিলেন, তাঁদের তিনটান এক হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের দিকেই ধাবিত হয়েছিল।

'তেজস্তরন্তি তরসা ত্বয়ি তৃপ্ততৃষ্ণাঃ
রাগে কৃতে ঋতপথে ত্বয়ি রামকৃষ্ণে।
মর্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্মিনাশং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো!'

ঠাকুর একদিন শ্রীমকে বলেছিলেন, 'দেখ, চাষারা হাটে গরু কিনতে যায়; তারা ভাল গরু, মন্দ গরু বেশ চেনে। ল্যাজের নীচে হাত দিয়ে দেখে। কোনও গরু ল্যাজে হাত দিলে শুয়ে পড়ে, সে গরু কেনে না। যে গরু ল্যাজে হাত দিলে তিড়িং-মিড়িং করে লাফিয়ে উঠে, সেই গরুকেই পছন্দ করে। নরেন্দ্র সেই গরুর জাত; ভিতরে খুব তেজ!' ঠাকুর হাসছেন আর বলছেন, 'আবার কেউ কেউ লোক আছে, যেন চিঁড়ের ফলার, আঁট নাই, জোর নাই, ভ্যাৎ ভ্যাৎ করছে।'

ঠাকুরের ভাব আর স্বামীজীর তেজ দুয়ে মিলে সারা বিশ্বে যে ভাবান্দোলন হয়ে গেল তার কি কোনও তুলনা আছে? অবতার পুরুষরা এই ভাবেই একটা প্লাবন সৃষ্টি করে দিয়ে যান। গৌতম বুদ্ধ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য করেছিলেন। করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ

'অযুত কণ্ঠে বন্দনা-গীতি ভুবন ভরিয়া উঠিছে,
(তব) অমিয় বারতা দেশ দেশান্তরে
হৃদয়ে হৃদয়ে পশিছে।'

গীতায় ভগবান বলছেন,

'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো
বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥'

শ্রীরামকৃষ্ণ এই সত্যেই স্থিত হয়েছিলেন,

'যা নাই—তা হ'তে কিছু হয় না প্রকাশ,
থাকে যদি—কিছুতেই নাই তার নাশ।'

তিনি ছিলেন। তিনি আছেন। তিনি সত্য অবিনাশী। ঠাকুরের সার কথা ছিল, ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুলতা। 'এই ব্যাকুলতা। যে পথেই যাও, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শাক্ত, ব্রহ্মজ্ঞানী—যে পথেই যাও, ঐ ব্যাকুলতা নিয়েই কথা। তিনি তো অন্তর্যামী, ভুল পথে গিয়ে পড়লেও দোষ নাই—যদি ব্যাকুলতা থাকে। তিনিই আবার ভাল পথে তুলে লন। আর সব পথেই ভুল আছে। সব্বাই মনে করে আমার ঘড়ি ঠিক যাচ্ছে, কিন্তু কারও ঘড়ি ঠিক যায় না। তা বলে কারু কাজ আটকায় না। ব্যাকুলতা থাকলে সাধুসঙ্গ জুটে যায়, সাধুসঙ্গে নিজের ঘড়ি অনেকটা ঠিক করে লওয়া যায়।'

ঠাকুর বড় আয়োজন করে দেহধারণ করেছিলেন। ঠাকুরের কথায়, 'মা, আমি কি যেতে পারি! গেলে কার সঙ্গে কথা কব? মা, কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী শুদ্ধ ভক্ত না পেলে কেমন করে পৃথিবীতে থাকব!'

একান্তে দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুরের এই সব কথা হয়েছিল। এরপর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে বলছেন, 'তুই রাত্রে এসে আমায় তুললি, আর আমায় বললি, "আমি এসেছি।"'

শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীকে তখমা দিয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীমকে একদিন একখানা কাগজে লিখে বলেছিলেন, 'নরেন শিক্ষা দেবে।'

নরেন্দ্র পরে শুনে ঠাকুরকে বলেছিলেন, 'আমি ওসব পারব না।'

ঠাকুর বলেছিলেন, 'তোর ঘাড় করবে।'

তিরোধানের পর সন্তানেরা যে একটু বিপদে পড়বে ঠাকুর মানসচক্ষে তা দেখেছিলেন। দেখে শ্রীমকে একদিন বলেছিলেন, 'তোমরা রাস্তায়

কেঁদে কেঁদে বেড়াবে, তাই শরীর ত্যাগ করতে একটু কষ্ট হচ্ছে।'

তিরোধানের অব্যবহিত পরের অবস্থা শ্রীম লিখে গেছেন। নরেন্দ্রনাথ তখনও বিশ্বজয়ী বীর বিবেকানন্দ হননি। বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় দুলছেন। গুরুভ্রাতাদের দায়িত্ব নিয়ে কখন বরাহনগর মঠে, কখন কলকাতায়। অর্থকষ্ট, নানা সংশয়। ঠাকুরের অনন্ত পরীক্ষা চলেছে। 'তুই পারবি না, তোর ঘাড় পারবে।'

'যোগ-ভোগ, গার্হস্থ্য-সন্ন্যাস, জপ-তপ, ধন-উপার্জন,
ব্রত ত্যাগ তপস্যা কঠোর, সব মর্ম দেখেছি এবার ;
জেনেছি সুখের নাহি লেশ, শরীরধারণ বিড়ম্বন ;
যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয় !'

শ্রীম লিখছেন : 'দু-তিনজনের ফিরিয়া যাইবার বাড়ী ছিল না। সুরেন্দ্র তাঁহাদের বলিলেন, ভাই তোমরা আর কোথা যাবে ; একটা বাসা করা যাক। তোমরাও থাকবে আর আমাদেরও জুড়াবার একটা স্থান চাই। তা না হলে সংসারে এরকম করে রাত দিন কেমন করে থাকব। সেইখানে তোমরা গিয়ে থাক। আমি কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরের সেবার জন্যে যৎকিঞ্চিৎ দিতাম। এক্ষণে তাহাতে বাসা খরচা চলিবে। সুরেন্দ্র প্রথম প্রথম দুই এক মাস টাকা ত্রিশ করিয়া দিতেন। ক্রমে যেমন মঠে অন্যান্য ভাইরা যোগ দিতে লাগিলেন, পঞ্চাশ, ষাট করিয়া দিতে লাগিলেন। শেষে ১০০ টাকা পর্যন্ত দিতেন। বরাহনগরে যে বাড়ী লওয়া হইল, তাহার ভাড়া ও ট্যাক্স ১১ টাকা। পাচক ব্রাহ্মণের মাহিনা ৬ টাকা, আর বাকী ডালভাতের খরচ।'

শ্রীরামকৃষ্ণ অর্ডারের এই শুরু। শ্রীম লিখছেন : 'ধন্য সুরেন্দ্র! এই প্রথম মঠ তোমারি হাতে গড়া। তোমার সাধু ইচ্ছায় এই আশ্রম হইল! তোমাকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মূলমন্ত্র কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ মূর্তিমান করিলেন। কৌমার-বৈরাগ্যবান শুদ্ধাত্মা নরেন্দ্রাদি ভক্তের দ্বারা আবার সনাতন হিন্দুধর্মকে জীবের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন। ভাই তোমার ঋণ কে ভুলিবে? মঠের ভাইরা মাতৃহীন বালকের ন্যায় থাকিতেন—তোমার অপেক্ষা করিতেন, তুমি কখন আসিবে। আজ বাড়ীভাড়া দিতে সব টাকা গিয়াছে—আজ খাবার কিছু নাই—কখন তুমি আসিবে—আসিয়া ভাইদের খাবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে! তোমার অকৃত্রিম স্নেহ স্মরণ করিলে কে না অশ্রুবারি বিসর্জন করিবে।'

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-লীলা পাঠকের সামনে ঠাকুরের তিরোধান আর নরেন্দ্রের স্বামী বিবেকানন্দ হবার মাঝখানের কয়েকটি বছর যেন শূন্যতায় ভরা। শ্রীম প্রথম দিকের সংগ্রামের চিত্র যখন যেমন সুবিধে কথামৃতের পরিশিষ্টাংশে লিপিবদ্ধ করেছেন ঠিকই, তবে বেশ বোঝা যায় প্রাণ-পুরুষের প্রয়াণে তিনিও ধীরে ধীরে অন্তর্মুখী হয়ে আসছেন। অন্তরে তাঁকে আসন দিয়ে মগ্ন হয়ে পড়েছেন। তখন তাঁর ভাব :

'My Soul, in everything and yet beyond everything, you must find your rest in the Lord, for He is the eternal rest of the Saints'.

যাঁর কাজ তিনি ঠিকই করিয়ে নেন। অল্প ব্যবধান, তার পরেই অনবদ্য আর একটি লীলা কাহিনী—'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'। লিপিকার আর এক গৃহী-সাধক, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। ঠাকুর কৃপা করেছিলেন শ্রীমকে। স্বামীজী কৃপা করলেন, শরচ্চন্দ্রকে। শ্রীমর প্রথম দর্শনের কাহিনী বড় অপূর্ব। 'বসন্তকাল, ইংরাজী ১৮৮২ 'র ফেব্রুআরী মাস।'

'মাষ্টার সিধু [বরাহনগরের সিদ্ধেশ্বর মজুমদার]র সঙ্গে বরাহনগরের এ বাগানে ও বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে এখানে [দক্ষিণেশ্বরে] আসিয়া পড়িয়াছেন।'

শ্রীম অবাক হয়ে দেখছেন, এক ঘর লোক সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। তাঁরা ঠাকুরের কথামৃত পান করছেন। 'ঠাকুর তক্তপোশে বসিয়া পূর্বাস্য হইয়া সহাস্যবদনে হরিকথা কহিতেছেন।'

দ্বিতীয় দর্শনে, ঠাকুরের ঘর বন্ধ ছিল। দরজায় দাঁড়িয়ে বৃন্দে।

শ্রীম প্রশ্ন করলেন—'হাঁগা, সাধুটি কি এখন এর ভিতর আছেন?'

বৃন্দে—হাঁ, এই ঘরের ভিতর আছেন।

মাস্টার—ইনি, এখানে কতদিন আছেন?

বৃন্দে—তা অনেকদিন আছেন।

মাস্টার—আচ্ছা ইনি কি খুব বইটই পড়েন?

বৃন্দে—আরে বাবা বইটই। সব ওঁর মুখে।

১৮৮২ আর ১৮৯৭, পনের বছরের ব্যবধান। স্থান, নির্জন, নিরালা, দক্ষিণেশ্বর নয়, খাস কলকাতা। বাগবাজারে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। আর সেই বসন্তকাল। ফেব্রুআরি মাস। নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দ। বিলেত থেকে সবে তিন-চারদিন হল ফিরেছেন। প্রিয়নাথবাবুর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ। স্বামী তুরীয়ানন্দ শরচ্চন্দ্রকে স্বামীজীর সামনে উপস্থিত করলেন। শরচ্চন্দ্র স্বামীজীর সেই দিব্যকান্তির কোনও বর্ণনা দেননি। ঠাকুর যাঁকে বলতেন, 'নরেনের অখণ্ডের ঘর।'

স্বামীজী ছিলেন, 'অল ফোর্স', দীপ্ত অগ্নিশিখা। সংস্কৃতে সম্ভাষণ করলেন। সাধু নাগমহাশয়ের কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। স্বামীজী 'কিষ্টফিষ্ট'র চেয়ে প্রকৃত মানুষ চাইতেন। কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, সবিবেক কর্মী। শিষ্যকে বললেন:

'মা ভৈষ্ট বিদ্বংস্তব নাস্ত্যপায়ঃ
সংসারসিন্ধোস্তরণেঽস্ত্যপায়ঃ।
যেনৈব যাতা যতয়োঽস্য পারং
তমেব মার্গং তব নির্দিশামি॥'

—হে বিদ্বন্! ভয় পেয়ো না, তোমার বিনাশ নেই, সংসার-সাগর পার হবার উপায় আছে। যে পথ অবলম্বন করে শুদ্ধসত্ত্ব যোগী এই সংসার-সাগর পার হয়েছেন সেই পথের নির্দেশ তোমায় আমি দিচ্ছি।

ঠাকুর শ্রীমকে অন্যভাবে বলেছিলেন, অনেক নরম করে সহজ করে। প্রথমে জিজ্ঞেস করে-ছিলেন, বিয়ে করেছিস? শ্রীম যেই বললেন, হ্যাঁ, ঠাকুর হতাশ হয়ে বললেন, যাঃ। প্রথম ধাক্কা। ছেলে হয়েছে শুনে, দ্বিতীয় ধাক্কা। শ্রীম বুঝতে পারছেন, ধীরে ধীরে ঠাকুর তাঁর অহংকার চূর্ণ করে দিচ্ছেন। শেষে পথও বাতলে দিলেন কৃপা করে—'তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙ্গতে হয়। তা না হলে হাতে আটা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।'

স্বামীজী শরচ্চন্দ্রকে শঙ্করাচার্যের 'বিবেকচূড়া-মণি' পাঠ করতে বললেন। দেখিয়ে দিলেন বেদান্তের পথ। নিজের পথ। ঠাকুর বলতেন রসেবশে, স্বামীজী বলতেন, 'আমাদের ভেতর অনন্ত শক্তি, অপার জ্ঞান, অদম্য উৎসাহ।' আর 'চেতনের লক্ষণ কি?' 'প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।' 'যেখানে struggle, যেখানে rebellion, সেখানেই জীবনের চিহ্ন, সেখানেই চৈতন্যের বিকাশ।' রস বশ নয়। একেবারে বিদ্রোহ।

স্বামীজী শিষ্যকে বললেন, 'সকলকে গিয়ে বল্—"ওঠ, জাগো, আর ঘুমিও না; সকল অভাব, সকল দুঃখ ঘুচাবার শক্তি তোমাদের নিজের ভিতর রয়েছে, একথা বিশ্বাস করো, তাহলেই ঐ শক্তি জেগে উঠবে।" ঐকথা সকলকে বল্

এবং সেই সঙ্গে সাদা কথায় বিজ্ঞান দর্শন ভূগোল ও ইতিহাসের মূল কথাগুলি mass-এর ভেতর ছড়িয়ে দে। আমি অবিবাহিত যুবকদের নিয়ে একটি Centre তৈয়ার করব—প্রথম তাদের শেখাব, তারপর তাদের দিয়ে এই কাজ করাব, মতলব করেছি।'

দক্ষিণেশ্বরে মা-ভবতারিণী, ধূপ, ধুনো, আরতি, ধ্যান, প্রাণায়াম। প্রাণপুরুষ ঠাকুর নিত্যধামে। সময় এগিয়ে গেছে পনের বছর। স্বামীজী পাশ্চাত্য কাঁপিয়ে এসেছেন। মেটিরিয়ালিস্টদের কাছে চাইতে যাননি, দিতে গিয়েছিলেন—বেদান্তধর্ম।

'আমাদের দেশে আছে মাত্র এই বেদান্তধর্ম। পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনায় আমাদের এখন আর কিছু নেই বললেই হয়।' স্বামীজী মিরার পত্রিকার সম্পাদককে বলছেন, 'ধর্মের চর্চায় ও বেদান্তধর্মের বহুল প্রচারে এদেশ ও পাশ্চাত্য-দেশ—উভয়েরই বিশেষ লাভ। রাজনীতিচর্চা এর তুলনায় আমার কাছে গৌণ উপায় বলে বোধ হয়।'

দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে ঠাকুর বেরিয়ে এসেছেন বিশ্বমঞ্চে। একদিকে ভোগবাদী পাশ্চাত্য, আর একদিকে দরিদ্র প্রাচ্য। মাঝখানে প্রকৃত সাম্যকার বিবেকানন্দ। ক্লাসকে নয় জাগাতে চাইছেন মাসকে। মঠ তখনও বেলুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মঠ আলমবাজারের ভাড়া বাড়িতে। স্বামীজী কখন বাগবাজারে, কখন আলম-বাজারে, কখন কাশীপুরে। যখন যেখানে, সেই-খানেই ভক্ত ও বিদ্বজ্জন সমাগম। কেউ আসছেন বিশ্বমানবকে চোখের দেখা দেখতে। কেউ আসছেন ক্ষুদ্র স্বার্থে। কেউ আসছেন, প্রাণের টানে পথের সন্ধান পেতে।

যিনি যেভাবেই আসুন, বৈদান্তিক, কর্মযোগী, তেজোময় স্বামীজীকে ঘিরে দক্ষিণেশ্বরের মতো শান্ত, একান্ত লীলা জমছে না। জমতে পারে না। কারণ, 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।' মন্দিরে, মসজিদে নয়, নাকটেপা প্রাণায়াম, ধ্যান জপে নয়, পথ অন্য, কর্ম অন্য।

'একটি জীবের মধ্যে ব্রহ্মবিকাশ হলে হাজার হাজার লোক সেই আলোকে পথ পেয়ে অগ্রসর হয়। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরাই একমাত্র লোকগুরু। এ-কথা সর্বশাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হয়। অবৈদিক, অশাস্ত্রীয় কুলগুরুপ্রথা স্বার্থপর ব্রাহ্মণেরাই এদেশে প্রচলন করেছে। সেজন্য সাধন করেও লোক এখন সিদ্ধ বা ব্রহ্মজ্ঞ হতে পাচ্ছে না। ধর্মের এ-সকল গ্লানি দূর করতেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ—শরীর ধারণ করে বর্তমান যুগে জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর প্রদর্শিত সার্বভৌম মত জগতে প্রচারিত হলে জগতের এবং জীবের মঙ্গল হবে।'

স্বামীজীর পরিকল্পনা 'মান্দ্রাজ ও কলিকাতায় দুইটি কেন্দ্র করে সর্ববিধ লোক-কল্যাণের জন্য নূতন ধরনে সাধু সন্ন্যাসী তৈরি করতে হবে।'

স্বামীজী মা-ভবতারিণীর কাছে ঐহিক কিছু প্রার্থনা করতে পারেননি। চেয়েছিলেন, শুদ্ধা-ভক্তি, বিবেক বৈরাগ্য। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে গোপাললাল শীলের বাগানে বসে শিষ্যকে বললেন :

'তুই কি বলছিস? মানুষেই তো টাকা করে। টাকায় মানুষ করে, একথা কবে কোথায় শুনেছিস? তুই যদি মন মুখ এক করতে পারিস, কথায় ও কাজে এক হতে পারিস তো জলের মতো টাকা আপনা-আপনি তোর পায়ে এসে পড়বে।'

মা-কালীকে তিনি আবাহন করেছিলেন, রক্ষাকারিণী শ্যামা হিসেবে নয়।

'করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে,

তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড
বিনাশে!
কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মাগো আয় মোর
পাশে।
সাহসে যে দুঃখ-দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে
বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি
কাছে আসে।'

ঠাকুর আর স্বামীজীতে এই তফাত। গৃহী, সন্ন্যাসী, ভোগী ত্যাগী সকলকে নিয়েই ছিল ঠাকুরের মহতী পরিবার। তাঁর দৃষ্টি সকলের ওপরেই ছিল। তিনি ছিলেন—ভবরোগবৈদ্যম্। যেমন বলতেন, 'মা রাঁধেন ছেলেদের পেট বুঝে। একই মাছ কাউকে দিচ্ছেন ভাজা, কোনও ছেলেকে ঝোল, কোনও ছেলেকে ঝাল।' ঠাকুর কোনও প্রার্থীকে বললেন, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ। বৈরাগ্য। তিনটান একটান কর। সংসারে থাক দাসীর মতো। কাউকে বললেন, না হয় সদারা সহবাস হল। দিনান্তে না হয় একবারই তাঁর নাম নিলে। শিবের সংসার কর। সত্ত্ব গুণের সাধনা চালা। মা, তুমি আছ, আর আমি আছি। বিষয়ীর সঙ্গ বেশি করিসনি। আঁষটে গন্ধ সংসারী নাই বা হলি। অহঙ্কার বিসর্জন দে। তুঁহু তুঁহুতেই হাম্বার মুক্তি। রাজার ছেলের মাসোহারার অভাব হয় না। ঠাকুরের সব কিছুর মধ্যে একটা Personal Touch ছিল। তাঁর কথামত তিনি ছিলেন উত্তম বৈদ্য। রোগীকে ওষুধ দিতেন না, খাইয়ে দিয়ে পাশে বসে থাকতেন, সেবা করতেন। শ্রীমকে প্রথম সাক্ষাতেই বলেছিলেন, একটু বেশি বেশি, ঘনঘন আসবে। কাজলের ঘরে থাকলে গায়ে কালি লাগবেই।

স্বামীজী ছিলেন, Wide, ব্যাপক। তাঁর সব পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল Mass. একজন নয়, বহুজন। বহুজনহিতায়। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, 'তুই নিজের মোক্ষ চাইছিস? তুই স্বার্থপর হবি কেন? তুই হবি বিশাল বটবৃক্ষের মতো। তোর ছায়ায় এসে কত মানুষ বসবে।'

শরচ্চন্দ্র সেই স্বামী বিবেকানন্দকে পেয়েছিলেন। প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল। অসীম তেজ। শরচ্চন্দ্রকে একদিন বলছেন:

'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণ করে যে এই ideal ভুলে যায়, "বৃথৈব তস্য জীবনম্"। পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মুছাতে, পুত্রবিয়োগবিধুরার প্রাণে শান্তি দান করতে, অজ্ঞ ইতরসাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করতে, শাস্ত্রোপদেশ-বিস্তারের দ্বারা সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্ম-সিংহকে জাগরিত করতে জগতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।

'"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" আমাদের জন্ম; কি করছিস সব বসে বসে? ওঠ—জাগ, নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর, নরজন্ম সার্থক করে চলে যা। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"।'

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ একটি প্রজ্জ্বলিত হোমকুণ্ড। বিবেকানন্দ অগ্নি, রামকৃষ্ণ দ্যুতি। প্রায় পাঁচটি বছরের একটি দিনলিপি। স্বামীজী বলতেন, Practical Religion. শিষ্যকে একদিন বলছেন—মঠ প্রতিষ্ঠার পুণ্য দিনে। বহু পরিকল্পনা তাঁর। একটা International Religious Centre হবে। শিষ্য বললেন, 'মহাশয়, আপনার এ অদ্ভুত কল্পনা!' স্বামীজী বললেন, 'কল্পনা কি রে? সময়ে সব হবে। আমি তো পত্তন-মাত্র করে দিচ্ছি—এরপর আরও কত কি হবে! আমি কতক করে যাব, আর তোদের ভেতর নানা idea দিয়ে যাব। তোরা পরে সে-সব work-

out করবি। বড় বড় Principle কেবল শুনলে কি হবে? সেগুলিকে practical field-এ দাঁড় করাতে—প্রতিনিয়ত কাজে লাগাতে হবে। শাস্ত্রের লম্বা লম্বা কথাগুলি কেবল পড়লে কি হবে? শাস্ত্রের কথাগুলি আগে বুঝতে হবে। তারপর জীবনে সেগুলিকে ফলাতে হবে। বুঝলি? একেই বলে Practical Religion.'

স্বামীজী তাঁর স্বল্প জীবনকালে ঝটিকার মতো বয়ে গেছেন। স্বদেশ বিদেশ, বিদেশ স্বদেশ, পরিব্রাজক সন্ন্যাসী। শরচ্চন্দ্র অসীম নিষ্ঠায়, গুরু-কৃপায় সেই মহাজীবনকে চিরস্পন্দমান করে রেখে গেছেন। অক্লান্ত নদী, সাগর মোহনায় বিশাল হয়েছে, চলার ছন্দে কিছু ক্লান্তি এসেছে। যা চেয়েছেন তা হয়নি। শিষ্যের জীবনের হতাশা কাটাতে প্রয়াণের কয়েকদিন আগে বলছেন, 'হবে বই কি। আকীট-ব্রহ্মা সব কালে মুক্ত হয়ে যাবে—আর তুই হবিনি! ও-সব weakness মনেও স্থান দিবিনি। শ্রদ্ধাবান্ হ, বীর্যবান্ হ, আত্মজ্ঞান লাভ কর্, আর "পরহিতায়" জীবনপাত কর্—এই আমার ইচ্ছা ও আশীর্বাদ।'

শিষ্য শরচ্চন্দ্র জানতেন না গুরুর সঙ্গে এই হবে তাঁর শেষ কথা। স্বামীজী বলছেন, 'আগামী রবিবার আসবি তো?'

শিষ্য বললেন—'নিশ্চয়'।

স্বামীজী—'তবে আয়; ঐ একখানি চলতি নৌকাও আসছে। রবিবারে আসিস।' শরচ্চন্দ্র নৌকো ধরার জন্যে ছুটছেন। স্বামী সারদানন্দ বলছেন, 'ওরে কলার ত্নুটো নিয়ে যা। নইলে স্বামীজীর বকুনি খেতে হবে।' শিষ্য বললেন, 'আজ বড়ই তাড়াতাড়ি, আর একদিন লইয়া যাব —আপনি স্বামীজীকে এই কথা বলিবেন।'

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ শেষ হচ্ছে এইভাবে: 'চলতি নৌকার মাঝি ডাকাডাকি করিতেছে, সুতরাং শিষ্য ঐ কথাগুলি বলিতে বলিতেই নৌকায় উঠিবার জন্য ছুটিল। শিষ্য নৌকায় উঠিয়াই দেখিতে পাইল, স্বামীজী উপরের বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন। সে তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিল। নৌকা ভাটার টানে আধঘণ্টার মধ্যেই আহিরিটোলার ঘাটে পঁহুছিল।'

নদীর টান। আর সময়ের টানে আমরা ১৯০২ থেকে চলে এসেছি ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। জীবনের দুই সঙ্গী কথামৃত আর স্বামি শিষ্য-সংবাদ। ঐহিক কিছু সঙ্গে যাবে না। কি হল আর কি হল না, সে বিচারেও কাজ নেই। পরমপ্রাপ্তি হল কৃপা। স্বামীজীর সেই কথা—

'তাঁর কৃপা যারা পেয়েছে, তাদের মন-বুদ্ধি কিছুতেই আর সংসারে আসক্ত হতে পারে না। কৃপার test কিন্তু হচ্ছে কাম-কাঞ্চনের অনাসক্তি। সেটা যদি কারও না হয়ে থাকে, তবে সে ঠাকুরের কৃপা কখনই ঠিক ঠিক লাভ করেনি।'

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই কানে বাজে মঠের প্রার্থনা সঙ্গীত, 'খণ্ডন-ভব-বন্ধন জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।' যেখানেই থাকি হুহু গঙ্গার বাতাস এসে লাগে গায়ে। আমার নিজের অনুভূতি, কথামৃত আর স্বামি-শিষ্য-সংবাদ —অনুপম, অনাবিল এক জ্যোতির্ময় জগতে প্রবেশের দুই বিশাল স্তম্ভ। ঢুকে যাও, ঢুকে যাও, সব ভুলে যাও। স্বামীজীর আদর্শে দাও নিজেকে ঝাড়া—সব weakness ঝরে যাক, আর ঠাকুরের আদর্শে বসে পড়—মনে, বনে, কোণে।

'মন নিয়ে কথা'

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

বিগত ৩০ অগস্ট ১৯৬৭, দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনে আয়োজিত একটি ভক্ত-সমাবেশে প্রদত্ত লোকান্তরিত সংঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের ভাষণ থেকে গৃহীত।

একটা প্রশ্ন সবাই করেন, "আমি জপধ্যান করছি কিন্তু মন স্থির হয় না, জপ করতে ভাল লাগে না।" এটা কিছু নতুন প্রশ্ন নয়। যারা ধর্মজীবন যাপন করতে চায় এবং যারাই চেষ্টা করেছে, তাদের সবারই মনে এরকম প্রশ্ন জাগে। এমনকি গীতাতেও অর্জুনের মনে এই একই প্রশ্ন জেগেছিল, যখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যোগের কথা বললেন, মনকে স্থির করার কৌশল শেখালেন। শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন বলেছিলেন, "তুমি মনের লয় ও বিক্ষেপশূন্য অবস্থার কথা যা বললে, তা বুঝলাম। কিন্তু চঞ্চল মনে ঐ সমত্বভাব স্থায়ী হবে কেমন করে, তা বুঝে উঠতে পারছি না। বাতাসের গতিকে আবদ্ধ রাখা যেমন দুঃসাধ্য, আমার অতি চঞ্চল মনকে বিষয়-বাসনা থেকে নিবৃত্ত করাও তেমনই অসাধ্য।" তার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, "তুমি যা বলছ ঠিকই—মন যে দুর্নিরোধ এবং চঞ্চল তাতে সন্দেহ নেই। তবে নিয়মিত অভ্যাস এবং বিষয়-বৈরাগ্যের দ্বারা চঞ্চল মনকে আয়ত্তে আনা যায়।"

প্রথমে দরকার চিত্তশুদ্ধি। মনটা যখন শুদ্ধ হয়, তখন জপধ্যান ভালভাবে হয়। চিত্তশুদ্ধি করতে গেলে সর্বাগ্রে সাধন—আমাদের যাবতীয় কাজকর্ম ভালভাবে, অর্থাৎ নিষ্কামভাবে করতে হবে। সংসারে যে-সব কাজ আছে, সেগুলিকে যদি আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে ও নিষ্কামভাবে করি আর নিষিদ্ধ কর্মগুলিকে ত্যাগ করি, তাহলে তা নিশ্চয়ই চিত্তশুদ্ধিকর হবে। আমার এটা চাই, ওটা চাই, এইরকম কামনাগুলিকেও বর্জন করে শুধু কর্তব্য হিসাবে যে-সব কর্ম সংসারে থাকলে করতেই হয়, মাত্র সেগুলিকে আন্তরিকতার সঙ্গে করে চললে চিত্তশুদ্ধি নিশ্চয়ই হবে। আর তা না হলে স্বামীজী যা বলেছেন—সংসারে যাদের সঙ্গে আমাদের লেন-দেন করতে হয়, তাদের সবাইর ভিতরে আমরা যদি ভগবানকে দেখি এবং সেই ভাব নিয়ে তাদের সেবা করে যাই, তাতেও আমাদের মন শুদ্ধ হবে ও জপধ্যানের সহায়ক হবে। আমরা সব সময় বলি যে, সংসারের ঝামেলাতে জপধ্যান করতে পারছি না; কিন্তু সংসারের ঝামেলার মধ্যেও যদি এমনভাবে মনকে তৈরি রাখি যে, কর্তব্যবুদ্ধিতে সব কাজ করে যাব কিন্তু কোনরকম কামনা থাকবে না কর্তব্য পালনের মধ্যে, অর্থাৎ নিষ্কামভাবে সব কর্ম করে যাব,—অথবা যদি সংসারে সবার ভিতরে ভগবানকে দেখে সেই তাঁরই সেবা-বুদ্ধিতে সব করে যাই, তাহলে এই সংসারের কোন ব্যাপারকেই খুব ঝামেলা বলে আর বোধ হবে না। আর যখন জপধ্যান করতে বসব, তখন ঠিক সেইভাবেই করব—কাজকর্ম করবার সময় যেভাবে ভগবানের পূজা-বুদ্ধিতেই সব করেছিলুম, এখনও সেই ভগবানকেই চিন্তা করতে বসেছি—এ-ও তাঁরই পূজা। এভাবে সংসারের কাজকর্ম এবং জপধ্যানের সঙ্গে বেশ একটা যোগাযোগ করে নেওয়া চলে। তাতে সংসারের ঝামেলা অতটা বোধ হবে না, বরং একটা সামঞ্জস্য বোধ হবে সব ব্যাপারে। এইরকম ভাব নিয়ে যদি কাজকর্ম করা যায়, তাহলে সহজে চিত্তশুদ্ধি হতে পারে।

চিত্তশুদ্ধি হলে মনের ভিতর বিচার জাগে যখন মনেতে বিচার জাগে, তখন আমরা ধরতে পারি যে সৎ-অসৎ কি। যদি আমরা বিচার

করতে থাকি যে, বাস্তবিক এই জগতে কোন্‌টা সত্য, তখন দেখব যে, একমাত্র ভগবানই হচ্ছেন সত্য, বাকী সবই হচ্ছে মিথ্যা। এক ঈশ্বরই বস্তু, আর সবই অবস্তু—শ্রীশ্রীঠাকুর এককথায় বলে দিয়েছেন। এরই নাম সদসৎ বিচার। এরকম বিচারের দ্বারা যখন দেখি যে, ভগবানই একমাত্র সত্য, অন্য সবই দুদিনের ব্যাপার, তখনই আমাদের ভগবানলাভ করার ইচ্ছা আন্তরিক হয়। আর ভগবানলাভ করার জন্য ঠিক ঠিক ইচ্ছা যখন হয়, তখন আমরা খুঁজে বেড়াই, কার কাছে গেলে তাঁকে পাবার পথের সন্ধান জানতে পারব। তখনই সে গুরুর কাছে যায় এবং গুরুর কাছে গিয়ে উপদেশপ্রার্থী হয়।

যদি সংসারের কাজগুলো এরকম একটা ভাব নিয়ে করতে করতে—শুদ্ধ নিষ্কামকর্মের ফলশ্রুতি-স্বরূপ চিত্তশুদ্ধির পথেই চলা যায়, তাহলে জপ-ধ্যানের পক্ষে সেটা অনেক সহায়তা করে। না-হলে বাস্তবিক সমস্ত দিন যদি মন কেবলই ঘুরে বেড়াতে থাকে, তখন জপধ্যানের জন্য শুধু বসা-মাত্রই হয়, আর কিছু হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, "তুমি যে-কথা বলছ সেটা ঠিকই। তবে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশ করতে পারা যায়।" অভ্যাস মানে হচ্ছে—সব সময় লেগে থাকতে হবে,—ভাল লাগে কিনা সেটা অত ভাবার দরকার নেই। প্রথমেই কারও ভাল লাগে না, কিন্তু নিয়মিত অভ্যাসের ফলে ক্রমে আনন্দ পাওয়া যায়। সকাল-সন্ধ্যাতে জপধ্যানের অভ্যাসটি রাখতে হবে এবং করতে করতে মন স্থির হবে, আর তখন জপধ্যানও ভাল লাগবে। গোড়াতে মনে হবে যে, এটা ভয়ঙ্কর নীরস এবং কোনই আনন্দ পাওয়া যায় না। কিন্তু ওষুধ-গেলার মতো নিয়ম করে অভ্যাসটি রাখতে হবে। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী আমাদের কাছে বলতেন, "যা বলেছি তিন-চার বছর করে যাও, তারপর যদি কিছু না হয়, তবে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করো।" তিন-চার বছরের মধ্যে কোনরকম প্রশ্ন করতে গেলে তিনি কিছুই শুনতেন না। অন্ততঃ তিন-চার বছর না-হলে ঠিক ঠিক তুমি এগোচ্ছ কিনা বোঝা যায় না। সেজন্য গোড়াতেই এ-সব প্রশ্ন করতে গেলে মহারাজ পছন্দ করতেন না।

এইভাবে কিছুদিন লেগে থাকলে তখন অভ্যাস পাকা হয়। অভ্যাস বরাবর করে যেতে হবে। আর বৈরাগ্য মানে—বিচার করে তোমার মনে কি কি বাসনা আছে সেগুলিকে খুঁজে বের করতে হবে এবং বিচারের সাহায্যেই সেগুলিকে আগে ত্যাগ করতে হবে, যেগুলি আমাদের মনকে চঞ্চল করে তোলে। একটা পুকুরে যদি খুব শান্ত স্থির জল থাকে, চাঁদের প্রতিবিম্ব (reflection) তাতে ঠিক ঠিক দেখতে পাওয়া যায়। আর যদি জলে একটা ঢিল ছুঁড়ে দেওয়া হয়, জলে তখন ঢেউ খেলতে থাকে। সেই ঢেউতে কিন্তু আর চাঁদ ভাল দেখতে পাওয়া যায় না। মনেতেও ঠিক তাই। আমাদের মনে যদি বাসনা থাকে এবং তলা থেকে নানা কামনার বুদ্‌বুদ্‌ উঠতে থাকে, তখন মন চঞ্চল হতে বাধ্য। ঐ অবস্থায় মনে তরঙ্গ খেলতে থাকে, আর তাতে নিজ ইষ্টকে ভাল করে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। বিচার করে করে বাসনা-কামনাগুলিকে ক্রমে ত্যাগ করতে পারলে মন শুদ্ধ হবে এবং ইষ্টকেও ভাল করে দেখতে পাওয়া যাবে। অভ্যাস ও বৈরাগ্য হচ্ছে দুই উপায়। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন বলে গেছেন, মহর্ষি পতঞ্জলির যোগসূত্রেও ঠিক তাই-ই বলা আছে, "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।" মনকে স্থির করতে গেলে এই দুটো উপায় ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

আবার আর-একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়,

—মনে নানারকম, কত কি চিন্তা আসে। জপধ্যান করতে বসলেই এমনও সব কথা মনে ওঠে, যেটা আমি আগে কখনও কল্পনাই করিনি! ব্যাপারটি হচ্ছে যে, জপধ্যানের সময়ে যখন আমাদের মন একটু স্থির হয়ে আসে, তখন যে-সব জিনিস আমাদের মনের নিচের স্তরে থাকে সেগুলি বুদ্‌বুদের মতো উপরে উঠতে থাকে। আর তখনই তো বুঝা যায়, আমাদের মনের ভিতরে কি কি সব জিনিস আছে। সেটা বুঝলেই পারা যাবে সেগুলিকে বিচার করে করে ত্যাগ করতে।

আর-একটা কথা হচ্ছে যে, আমরা মনকে Suggestions দিতে পারি। আমরা যদি মনকে ক্রমাগত বলতে থাকি—যেরকম Psychiatrist-রা করে থাকে, যেন অনেকটা সেরকম—মনকে Suggestions দিতে থাকি, তাহলে মন সে-গুলিকে মেনে নেয়। যদি আমরা বিচার করে মনকে বারবার বুঝিয়ে বলি, "দেখ, ভগবানলাভ করলে, তাঁর চিন্তা করলে তুমি আনন্দ পাবে, সংসারের দুঃখকষ্ট থাকবে না"—তাহলে ক্রমে মন সেটা স্বীকার করে এবং কিছুটা শান্ত হয়। তাতে জপধ্যানের পক্ষে সুবিধা হয়। অন্য আর-এক উপায় আছে—মনকে খুব করে শাসিয়ে বলতে হয়, "এই সময় তুমি ওসব চিন্তা করতে পারবে না। এখন তোমাকে ভগবানের চিন্তা করতে হবে।" মনকে এইভাবে জোর করে শাসালে সে একটু শান্ত হবে। সুতরাং এরকম-ভাবে শাসন করে, অথবা Suggestions দিয়ে মনকে বারবার বলতে বলতে মনের এটা পাকা সিদ্ধান্ত হয়ে যায় যে, বাস্তবিকই ভগবানের চিন্তাতে বেশ আনন্দলাভ হয়, তাহলে কেন আর অন্য সব চিন্তা করা? এই দুই উপায় দ্বারাও মনে যে-সব আজেবাজে চিন্তা আসে সেগুলিকে আস্তে আস্তে দূর করা যায়।

সাধনা একদিনের ব্যাপার নয়, সমস্ত জীবন-ভোর করে যেতে হবে। সব সময় আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, মনের উপর নজর রাখতে হবে—মন কি করছে না করছে। আর যেই দেখব যে, মন একেবারে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে, তখন তাকে ঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করতে হবে। এইভাবে সব সময়েই সতর্ক থাকলে সাধন-ভজনের বিঘ্ন দূর করা সম্ভবপর হবে।

The Practice of the presence of God নামে একটি ছোট বই আছে,—ব্রাদার লরেন্স বলে একজন খ্রীষ্টান সাধুর কথা ও তাঁর কিছু চিঠিপত্র। তিনি ষাট বছর রান্নাঘরের কাজ করেছিলেন, কিন্তু তিনি ভগবানলাভ করে-ছিলেন। তিনি কাজের মধ্যেও সব সময় ভগবানের চিন্তা করতেন। মনে মনেই তাঁর শরণাগত হয়ে সদাসর্বদা তাঁর চিন্তা করতেন—কাজের ঝামেলার মধ্যেও তাঁর মনটি থাকত একমাত্র ভগবানের দিকে। আমরাও যদি আমাদের সংসারের কাজকর্মের মধ্যে সর্বদা ভগবানের চিন্তাটি বজায় রাখার চেষ্টা করি, তাহলে আমাদেরও বা সেইভাবে হবে না কেন? শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন অর্জুনকে, "তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।"—তুমি সর্বদা আমার চিন্তা কর এবং লড়াইও কর। আমাদেরও সংসারের লড়াই চলবে, কিন্তু সব সময় মনকে রাখতে হবে ভগবানের 'শ্রীচরণে'। এইভাবে যদি আমরা চলি তাহলে জপ, ধ্যান, এবং একাগ্রতা প্রভৃতি যা কিছু আমাদের সাধনার বিষয়, তা সার্থক ও সফল হবে।

ধ্যান ঃ সকল যোগের পূর্ণতাসাধক

স্বামী প্রেমেশানন্দ

শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর কৃপাধন্য বিশিষ্ট সন্তান—শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের লোকান্তরিত বরণীয় সন্ন্যাসী।

এতাবৎ অপ্রকাশিত নিবন্ধটি স্বহস্ত-লিখিত।

॥ ১ ॥

মানবজীবনের বিবর্তনের শেষ সীমায় তাহার চিত্তে বিবেক নামক বুদ্ধির বিকাশ হয়, তখন সে অন্তর্জগতের তত্ত্ব জানিবার জন্য কৌতূহল অনুভব করে। সৌভাগ্যবশতঃ কেহ কেহ বৈদিক ধর্মের আত্মবিজ্ঞানের কথা জানিতে পারে। তাহার ফলে ক্রমেই তাহার বুদ্ধিতে সৃষ্টির সমস্ত রহস্য ধরা পড়ে। কিন্তু এই সম্বন্ধে সকল কথা জানিতে ও বুঝিতে পারিলেও এই জগৎ হইতে নিজেকে সরাইয়া পূর্ণত্ব লাভ করা সম্ভব হয় না। প্রায়শঃ দেখা যায়, যাঁহারা ব্রহ্মবিজ্ঞানের বিষয় সব কথা জানেন, তাঁহারাও দেহমনের বন্ধন হইতে মুক্ত নহেন। যাঁহারা নিদিধ্যাসন করিয়া 'আমি যে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত' তাহা বোধে বোধ করেন, মাত্র তাঁহারাই জন্মমরণের হাত হইতে মুক্তিলাভ করেন। নিদিধ্যাসনই মুক্তিলাভের সাক্ষাৎ উপায়, জ্ঞানবিচার নহে। তাই যোগের পথ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সচেতন না হইলে জ্ঞান ব্যর্থ হয়।

আমরা দেখিয়াছি, ধীমান মহৎ তত্ত্বজ্ঞানীরাও ব্যবহারে বিজ্ঞানীর মতো চরিত্রবল প্রায়ই দেখাইতে পারেন না। বিচার করিতে করিতে অনেকেরই মাথা খারাপ হইয়া যায়। কিন্তু যাঁহারা নিদিধ্যাসন অর্থাৎ যোগাভ্যাস করিয়া চিত্তকে ব্রহ্মাভিমুখী করেন, তাঁহারা পূর্ণজ্ঞান-লাভ না করিলেও তাঁহাদের জীবনে অপূর্ব মাধুর্যের বিকাশ হইয়া থাকে।

॥ ২ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, বহু-জন্ম পুণ্যকার্য করিলে মানুষের চিত্ত শুদ্ধ হয়। তাহার ফলে শেষজন্মে সাধকের মনে ভগবান-লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হয়। 'যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্'—ইত্যাদি।

ভগবানের উপর মনের টান থাকিলেও, ভগবানের সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্যন্ত দেহমনের প্রবৃত্তি নিরোধ করিতে পারা যায় না। সাক্ষাৎ-কার করিতে হইলে ভগবানের সৌন্দর্য মাধুর্য এবং ঐশ্বর্য নিয়া মাতিয়া থাকিলে মন 'প্রত্যক্-চেতনাভিমুখী' নাও হইতে পারে; সাধারণতঃ দেখা যায়, ভক্তরা ভগবানের সেবাপূজা মহিমা-কীর্তন ও ঘোষণা নিয়া মাতিয়া থাকায়, মন অন্তরের দিকে বেশি দূর অগ্রসর হয় না। কখন কখন অভিমান বশে অভক্তকে অবহেলা অবজ্ঞা করা, অন্য মতাবলম্বীদিগকে ঘৃণা করা প্রভৃতি দুষ্কার্যে ভক্তের চিত্ত অতি নিম্নগামী হইয়া পড়ে; এইরূপে আরও নানাপ্রকার অসংখ্য বাধা ভক্তকে ভগবানলাভের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া থাকে। তাই ভগবানের চিন্তায় তন্ময় হইতে না পারিলে ভক্তিসাধনায় সিদ্ধি সম্ভব নহে। ভক্তিসাধনার পথেও তাই নিদিধ্যাসনই শেষ ধাপ। 'ঈশ্বর প্রণিধান' ব্যতীত ভক্তিপথে মুক্তিলাভ সম্ভব নহে।

॥ ৩ ॥

মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক কর্মকেও যোগের সহায়করূপে পরিণত করা যায়। তাহা করিতে হইলে কর্মের ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও মনকে কর্মমুক্তির দিকে টানিয়া রাখিতে হয়। যদি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে মুক্তি যে আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য তাহা বুঝিতে পারি এবং সর্বদা ঐ মুক্তিরূপ আদর্শের দিকে মনকে টানিয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলে কর্মের মধ্যেও মনে 'মৃদু নিদিধ্যাসনের' ভাব

থাকিতে পারে। মৃত্যু বলিবার কারণ এই যে, কর্ম সুসম্পন্ন করিতে হইলে মনের অনেকখানি কর্মের দিকে দিতেই হইবে, তখন মনের একটি অংশে মাত্র মুক্তির চিন্তা অবস্থান করিবে।

কর্মযোগের একটি সুপ্রসিদ্ধ উদাহরণ আছে, বড়মানুষের বাড়ির ঝি! ঝিটি নিজ সংসার পরিচালনে অক্ষম বলিয়া বাধ্য হইয়াই বড়মানুষের বাড়িতে ঝিগিরি করিতে আসে। সে নিশ্চিত-রূপে জানে তাহার একটি স্বগৃহ ও কয়েকটি স্বজন আছে, যাহাদের জন্য সে খাটিতেছে এবং বাবুর বিন্দুমাত্র অসুবিধা হইলেই তাহাকে তাড়াইয়া দিবে। অবশ্য আমরাও সত্যসত্যই নিজ নিকেতন পরিত্যাগ করিয়া দেহমনের 'ঝিগিরি' করিতেছি বাধ্য হইয়া। কিন্তু আমরা তো তাহা জানি না, জানিলেও বুঝি না, বুঝিলেও স্বগৃহে প্রত্যাগমনের আকাঙ্ক্ষা মনে আনিতে পারি না।

সুতরাং বড়মানুষের বাড়ির ঝি হইতে যাওয়া আমাদের পক্ষে একটি ভাঁওতামাত্র। জ্ঞানবিচার করিয়া আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত জানিলাম, ভগবানের সৌন্দর্য মাধুর্যে মুগ্ধ হইলাম, তথাপি দীর্ঘকাল নিরন্তর পরম শ্রদ্ধার সহিত নিদিধ্যাসন না করিলে ঐ পথে বেশিদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। আর কর্মের মধ্যে মনকে ছড়াইয়া দিয়া মুক্তিপথে অগ্রসর হওয়া কি যে দুরূহ ব্যাপার তাহা কি আর বলিতে হয়?

শ্রীভগবান বলিয়াছেন, বজ্রদৃঢ় দেহ ও মন যাঁহাদের ছিল সেই ক্ষত্রিয় রাজগণ ঐ কর্মযোগ সাধন করিতেন। সুতরাং কর্মযোগ অত্যন্ত কঠিন সাধনা। 'ইমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।'

তবে অনন্ত জীবনের কর্মের অভ্যাস সহসা পরিত্যাগ করা একান্ত অসম্ভব বলিয়া সর্ব যোগ সাধনারই আদিতে নিষ্কামতা অভ্যাস করিবার জন্য কর্ম করা অপরিহার্য। সেইজন্যই আমাদের মতন অনধিকারীদিগকে স্বামীজী এত কর্মের প্রেরণা দিয়াছেন। কিন্তু নিষ্কামকর্ম করিতে হইলেই কর্মের উদ্দেশ্য মুক্তির নিদিধ্যাসনা সম্বন্ধে সতত সচেতন থাকিতেই হইবে। কর্ম করিতে করিতে মনের টান ঐ দিকে তো থাকিবেই এবং 'ফুরসৎ' পাইলেই নিদিধ্যাসনে মনকে তুলিয়া রাখিতে হইবে—যেমন ছুটি পাইলেই ঝিটি বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হয়।

তাহা হইলে কর্মযোগেরও শেষ সোপান ধ্যানযোগ।

॥ ৪ ॥

অসাধারণ ধীমান, ভাবুক ও পরার্থপর ব্যক্তিরা জ্ঞান বা ভক্তি বা কর্মের সহায়ে মুক্তিলাভ করিতে পারেন; কিন্তু এইরূপ অধিকারী জগতে অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। আমাদের মতন সাধারণ লোকের পক্ষে অনেক সময়ই খুব ফলপ্রদ হয় না। কুস্তিগীরেরা ব্যায়াম করিয়া খুব আনন্দ পায়; ঠিক তেমনি বুদ্ধিমান লোকেরা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় সম্বন্ধে বিচার করিয়া বুদ্ধিচর্চার আমোদ লাভ করেন। ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য সব দেশেই কত দার্শনিক পণ্ডিত রহিয়াছেন, যাঁহাদের চিন্তাপ্রণালী অত্যন্তই চিত্তাকর্ষক। আমরা উপন্যাস পড়িয়া যে আনন্দ পাই, মানসিক কসরৎ-কারীরা ঐ সব গ্রন্থপাঠে ঠিক তেমনই আনন্দ পাইয়া থাকেন। তবে অবশ্য বেদান্তমতে চিন্তা করিলে মন বহু ঊর্ধ্বে উঠিয়া যায় ঠিকই, কিন্তু মনকে স্বস্বরূপে তন্ময় না করিতে পারিলে মুক্তি-লাভের কোন সম্ভাবনাই নাই।

ভক্তিশাস্ত্রে যে প্রেম-প্রীতির কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহা তো উপন্যাসে লিখিত মানুষের প্রীতি-মিলন-বিরহের আকর্ষণেরই একটি উচ্চতর রূপ। খুব একটি সুন্দর মূর্তির প্রতি ভালবাসায় হাসা-কাঁদা, নাচা-গাওয়াতে খুব সুখ লাভ হয়। অনেক স্থলে ভগবানের সৌন্দর্য মাধুর্য কীর্তন করিতে করিতে বহু ভক্তের সমাধি (ভাব) হইতে

দেখা যায়। ইহাও একপ্রকার মানসিক কসরৎ।

যথারীতি সাধন সহায়ে দেহাত্মবুদ্ধি দূর না করিলে মুক্তি অসম্ভব। যুগাবতার পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণাশ্রিত ভবনাথ, ছোট নরেন প্রভৃতি অনেকের ভাব হইত, কিন্তু তাহাদিগকেও পরে যথারীতি সংসার করিতে হইয়াছিল।

মোট কথা যথারীতি যোগাভ্যাস করিয়া ধাপে ধাপে মনকে উপরে তুলিয়া চিদাকাশে লইয়া না গেলে বিষয়-বাসনা দূর হয় না। শ্রীগীতা 'ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ' ইত্যাদি হইতে পরবর্তী শ্লোক পর্যন্ত দুইটি মন্ত্রে এই কথাই স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন। তাহার সারমর্ম এই যে, নিজের বোধশক্তিকে দেহমন হইতে ঊর্ধ্বে তুলিয়া স্বস্বরূপ বোধ না হওয়া পর্যন্ত শান্তি-লাভ অসম্ভব। জ্ঞানবিচারে মুক্তির স্বরূপ বুঝা যায়, ভক্তিতে মুক্তির স্বরূপ ঈশ্বরের চিন্তায় রুচি হয়, নিষ্কামকর্ম বুদ্ধিকে মার্জিত করিয়া দেয়;—কিন্তু ধ্যানযোগই সর্বশেষে জীবাত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করিতে পারে। ধ্যান-যোগের সহায়তা না নিলে পূর্বোক্ত যোগত্রয়ের ফললাভ সুদূর পরাহত। সকল যোগেরই তো এক সুর, জীবকে ঈশ্বরের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া, সুতরাং মুমুক্ষুর প্রথম হইতেই ধ্যানাভ্যাস একান্ত আবশ্যক।

॥ ৫ ॥

হিন্দুদের নিয়ম ছিল প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা জ্যোতির্ময় সূর্যকে ধ্যান করিবে। ৭।৮ বৎসর বয়স হইতেই তাহা শিখানো হইত; এখনও ব্রাহ্মণদের মধ্যে কচিৎ কেহ প্রত্যহ গায়ত্রী জপ করিয়া থাকেন। সেই জাপকদের মধ্যে কচিৎ কেহ এক-আধটু ধ্যানও অভ্যাস করিয়া থাকেন। ধ্যানকেই হিন্দুরা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্ লাভের প্রধান উপায় বলিয়া জানিতেন। মনঃসংযোগ অভ্যাস না থাকিলে সংসারের সামান্য কাজও সুসম্পন্ন হয় না; বড় বড় সকল কাজেই বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন দেখা যায়।

ধ্যানযোগের অভ্যাস উঠিয়া যাওয়ার পর ঈশ্বরের নাম জপ প্রবর্তন করা হইয়াছিল, তাহাও ধ্যানেরই একটি নিম্নস্তর। জপেও সিদ্ধিলাভ করা যায়। ('স্বাধ্যায়াদিষ্ট দেবতাসম্প্রয়োগঃ।' —পাতঞ্জল সূত্র)

কিছুদিন পূর্বে আধুনিক তথাকথিত শিক্ষিতগণ কোন কাজ করিবার পূর্বে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার রীতি প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহা যোগেরই ঈষৎ আভাস।

যোগাভ্যাস তিরোহিত হওয়ায় হিন্দুজাতির সব দিকে অবনতি হইয়াছে। যে ব্যক্তি দিনে অন্ততঃ তিনবার মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া জগতের ঊর্ধ্বে তুলিয়া রাখিতে পারে, তাহার জীবনে আত্মার অনন্ত মহিমার একটু না একটু প্রকাশ হওয়াই স্বাভাবিক। আমার পিছনে যে অনন্ত শক্তি রহিয়াছে তাহার সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান বিশ্বাস না থাকিলে মানবজীবনের ঊর্ধ্বগতি হইবার তো কোন উপায় নাই।

জগতের সব রহস্য, ব্রহ্মের সব তত্ত্ব জানিলেও মানুষ তো দেহ মনের 'খোয়াড়' হইতে মুক্তি পাইবে না। তাই তো হিন্দুরা শিশুকাল হইতে ঊর্ধ্বে উঠিবার একমাত্র পথ ধ্যান বা নিদিধ্যাসন শিক্ষা দিতেন।

॥ ৬ ॥

নিষ্কামভাবে কর্ম করিতে করিতে সংসারে বিরক্তি হইল, জ্ঞানবিচার করিতে করিতে সর্ব-প্রকার উপাধিবর্জিত আমিই সত্য—জ্ঞেয় জানিলাম এবং জগৎস্বরূপ মিথ্যা বুঝিলাম। ব্রহ্মের অনন্ত সৌন্দর্য মাধুর্যের আকর্ষণে মুগ্ধ হইলাম; কিন্তু দেহমনের দাসত্ব ঘুচাইতে না পারায় পূর্ণ শান্তি তো পাইলাম না।

তখন মহর্ষি পতঞ্জলি আসিয়া একটি অত্যাশ্চর্য

সরল সোজা রাস্তা দেখাইয়া দিলেন—যে রাস্তা ধরিয়া চলিতে চলিতে পূর্ণ শান্তি লাভ নিশ্চিত। তিনি বলিলেন, শরীর-মনকে যম-নিয়মের দ্বারা ধুইয়া মুছিয়া নির্মল কর; তাহার পর বাহিরের সকল কর্ম বন্ধ করিয়া আসন করিয়া বসিবে। উপবিষ্ট থাকিয়া প্রাণশক্তির সাহায্যে মনকে নিষ্ক্রিয় কর। অতঃপর বুদ্ধির মধ্যে যে সত্ত্বগুণের প্রকাশ আছে, তাহা 'বোধ' করিয়া বসিয়া থাক। এইরূপ থাকিতে থাকিতে সৃষ্টির সমস্ত রহস্য তোমার নিকট প্রকাশিত হইবে। সৃষ্টির সৌন্দর্য মাধুর্য এবং ঐশ্বর্য সম্বন্ধে যখন সম্পূর্ণ উদাসীন হইবে, তখন সৃষ্টির অতীত গুণাতীত 'চিৎ' বস্তুকে অনুভব করিয়া পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারিবে।

ইহাই অধ্যাত্ম বিদ্যালাভের শেষ ধাপ। দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়া বসিয়া গেলে শান্তি লাভ সুনিশ্চিত; শ্রীশ্রীবুদ্ধদেবের জীবন ইহার জ্বলন্ত উদাহরণ।

॥ ৭ ॥

ধ্যানযোগের বিঘ্ন বিষয়ে বুদ্ধ, যীশু প্রভৃতি মহাপুরুষদের জীবনে উল্লেখ আছে। যেমন সংসারে দেখা যায়, যে যত শিক্ষিত হয়, ভাল ভাল ভোগ সম্বন্ধে সে তত সচেতন হয়। একটি অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক পরম তৃপ্তির সহিত ডাল ভাত খায়, কিন্তু শিক্ষিত বাবুর বহু উপকরণ না হইলে ভোজনে তৃপ্তি হয় না। অধ্যাত্ম সাধনার ফলেও মানুষের রুচি বাড়িয়া থাকে এবং রুচি অনুযায়ী অনুভবও আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই সব সাধকদের মধ্যে যাঁহারা নিষ্কামকর্ম করিয়া দেখিয়াছেন যে, কর্ম কখন শেষ হয় না; উপাসনা করিয়া দেখিয়াছেন ভগবানের উপর তীব্র ভাল-বাসা না থাকিলে মনকে জগৎ হইতে ঊর্ধ্বপথে চালাইতে সব সময় ইচ্ছা প্রবল থাকে না; জ্ঞান-বিচার করিয়া দেখিয়াছেন, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুর তত্ত্ব জানিতে পারিলেও প্রাণে শান্তি হয় না; তাঁহারা সাধন পথের কোন বিঘ্নতেই বিচলিত হন না এবং পরমানন্দে উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে করিতে পূর্ণ শান্তি লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীমায়ের একটি কথা

স্বামী ধীরেশানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের অন্যতম প্রবীণ বিদগ্ধ সন্ন্যাসী।

শ্রীশ্রীমা একটি ত্যাগী ভক্ত সন্তানকে বলিতেছেন (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২।২৮৬): "যেমন ফুল নাড়তে চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবত্তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। নির্বাসনা যদি হতে পার এক্ষুণি হয়।"

সংসার-বন্ধন-মুক্তি বিষয়ে পুনঃ একটি স্ত্রীভক্তকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন: "স্বামী বল, পুত্র বল, দেহ বল—সব মায়া। এই সব মায়ার বন্ধন কাটতে না পারলে পার পাওয়া যায় না। দেহে মায়া দেহাত্মবুদ্ধি, শেষে এটাও কাটতে হবে। কিসের দেহ, মা, দেড় সের ছাই বইতো নয়? তার আবার গরব কিসের? যত বড় দেহখানাই হোক্ না, পুড়লে ঐ দেড় সের ছাই। তাকে আবার ভালবাসা! হরিবোল, হরিবোল…।" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১।১১৬)

শ্রীশ্রীমায়ের কথাগুলি অতি প্রসন্ন, সরল, মধুর, মর্মস্পর্শী ও সাবলীল কিন্তু উহার তাৎপর্য অতি গম্ভীর। তাই এই বিষয়ে বেদান্ত কি বলেন আমরা তাহাই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

শ্রীশ্রীমার বাণী—"ভগবত্তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।" ভগবত্তত্ত্ব আলোচনা অর্থ—তত্ত্ববিচার। তত্ত্ব অর্থাৎ (তৎ ও ত্বম্) পরমাত্মা ও জীবাত্মার স্বরূপবিষয়ক বিচার

বেদান্তের ঘোষণা—"বিচারাৎ জায়তে জ্ঞানম্, জ্ঞানাৎ মোক্ষমবাপ্যতে।"—তত্ত্ববিচার-প্রভাবেই জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং একমাত্র জ্ঞানই মোক্ষ-প্রাপক।—বেদান্তের এই কথাটিরই সমর্থন বা ইঙ্গিত মায়ের কথাতে পাওয়া যাইতেছে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলিয়াছেন: "মানুষ আপনাকে চিনতে পারলে ভগবানকে চিনতে পারে। 'আমি কে'—ভাল করে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায়, 'আমি' বলে কোন জিনিষ নেই। হাত, পা, রক্ত, মাংস ইত্যাদি—এর কোন্‌টা 'আমি'? যেমন প্যাঁজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার করলে 'আমি' বলে কিছু পাইনে। শেষে যা থাকে তাই আত্মা—চৈতন্য। 'আমার' 'আমিত্ব' দূর হলে ভগবান দেখা দেন।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ, ১১)।—ঠাকুরের এই উপদেশটিতেও আমরা দেহাত্মবুদ্ধিত্যাগের সুন্দর বিচারধারা লক্ষ্য করিতেছি। ইহাও বেদান্তোক্ত বিচারধারারই প্রতিধ্বনি—ইহা আমরা পরে লক্ষ্য করিব।

বিচারই বেদান্তের একমাত্র মুখ্য সাধন। বেদান্ত বলেন, দেহেতে আত্মত্ববুদ্ধিই সর্ব বন্ধনের, সংসার দুঃখের মূল। মায়াপ্রভাবে আমরা নিজ পারমার্থিক নিত্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপটি ভুলিয়া নিজেকে দেহমনবুদ্ধিবিশিষ্ট ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন জীব বলিয়া নিশ্চয় করিয়া বসিয়া আছি ও সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছি—ইহাই আশ্চর্য!

শ্রুতি বলেন, যিনি নিজেকে অভয় ব্রহ্মরূপে জানেন তিনি অভয় ব্রহ্মরূপ-ই হইয়া যান। গুরু সম্প্রদায়বিদ্ শ্রুত্যেকশরণ আচার্যগণ ঘোষণা করিয়া থাকেন যে, শ্রুতিনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া বা উপায় অবলম্বনেই বিচার সহায়ে জ্ঞানোদয়ে জীবের মিথ্যা দেহাত্মবুদ্ধি দূর হইয়া ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হইয়া থাকে।

শ্রুতির মুখ্য উপদেশ—'নেতি, নেতি'। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্য পদার্থ আমরা গ্রহণ করিতেছি উহার কোনটিই সত্য নহে। সর্বদৃশ্যপ্রপঞ্চ এইরূপে নিষিদ্ধ হইয়া গেলে সর্বশেষে নিষেধের (বা বাধের) অযোগ্য যে বস্তু থাকেন তাহাই ব্রহ্ম। তাহাই স্বরূপতঃ তুমি।

এই বিষয়টি বুঝাইবার জন্যই শ্রুতি প্রথম ব্রহ্ম হইতেই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-আদি কল্পনা করিয়া আত্মাতে ক্রিয়া কারক ফলাদির অধ্যারোপ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ আত্মা (জীব) পুণ্য-পাপাদিকর্মের কর্তা ও হস্তপাদাদিমান শরীরধারী, এইরূপ আরোপ করিয়া থাকেন। পুনঃ বিচার সহায়ে ঐ আরোপিত বিশেষতাসমূহ নিষেধ অর্থাৎ 'অপবাদ' করিয়া জীবকে শুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। যেমন কাগজ, কালি, রেখা প্রভৃতি সহায়ে অক্ষরজ্ঞান হইয়া থাকে, কিন্তু কাগজ, কালি কোনটাই অক্ষর নহে। তদ্রূপ জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-আদির মূল কারণ এক ব্রহ্ম ইহা বুঝাইয়া কল্পিত সর্ববিশেষতার নিবৃত্তির জন্য 'নেতি, নেতি'—এই উপদেশ সহায়ে সর্ববস্তুর অপবাদ করিয়া থাকেন।

এই 'অধ্যারোপ-অপবাদ'-রূপ প্রক্রিয়াই বেদান্তোক্ত সর্বপ্রক্রিয়া বা বিচারধারার মূল। ব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধ উৎপাদন করাইবার জন্য এই 'অধ্যারোপ-অপবাদ' ভিন্ন অন্য কোন উপায় বা প্রক্রিয়া বেদান্তে নাই। আচার্য শংকরও স্বকৃত ভাষ্যাদিতে ইহা বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন।

বেদান্তমতে ব্রহ্ম নিত্যপ্রাপ্ত ও সর্ববিশেষণ-রহিত। সর্বাত্মা ব্রহ্ম কোন সাধনদ্বারা প্রাপ্য না হইলেও শ্রুতি তাহাতে প্রাপ্যত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। সিদ্ধবস্তু ব্রহ্ম নিত্যপ্রাপ্ত হইলেও অজ্ঞানবশতঃ ভ্রমে উহা অপ্রাপ্তের ন্যায় প্রতিভাত হয়। ভ্রম, জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন সাধনদ্বারা নিবৃত্ত হইতে পারে না। ভ্রম নিবৃত্ত হইলেই ব্রহ্ম যেন

পুনঃ প্রাপ্ত হন। এইরূপে ব্রহ্মের প্রাপ্যত্ব অধ্যারোপিত ও জ্ঞান ভিন্ন অন্য সাধনের অপবাদ করা হইয়াছে।

ব্রহ্মকে জ্ঞেয় বলা হয়, ইহারও তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মাতিরিক্ত আর কিছু জ্ঞেয় নাই। ব্রহ্মে জ্ঞেয়ত্বের আরোপ ও ব্রহ্মভিন্ন সর্বপদার্থের জ্ঞেয়ত্বের অপবাদ বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মে সর্ব-কারণত্বও আরোপিত, উহাদ্বারা কার্যত্বের নিষেধ অভিপ্রেত। এইরূপে কারণত্বও নিষিদ্ধ হইলে অবশেষে সর্ববস্তুর স্বরূপ এক ব্রহ্মই অবশেষ থাকেন।

বেদান্তোক্ত বিভিন্ন প্রক্রিয়া বা বিচারধারার একটু আলোচনা করা যাইতেছে।

(ক) **সামান্যবিশেষ প্রক্রিয়া:** বৃহদারণ্যক উপনিষদে দুন্দুভি (ভেরী), শংখ ও বীণার দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয়। ঐ সকলে আঘাতজন্য সামান্যধ্বনি ও বিশেষধ্বনির ভেদ থাকিলেও সামান্যধ্বনি হইতে পৃথক্ করিয়া বিশেষধ্বনিকে গ্রহণ করা যায় না, কারণ সামান্যধ্বনি হইতে অতিরিক্ত কোন বিশেষধ্বনি হইতেই পারে না। শব্দ সামান্য ও বহুবিধ হইতে পারে। পুনঃ ঐ সকল শব্দসামান্য একটি শব্দ মহাসামান্য হইতে পৃথক্ নহে। রূপরসাদি বিষয়েও এরূপ বোদ্ধব্য। পরিশেষে ইহাই যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হয় যে, এক সৎসামান্য হইতে ভিন্ন অন্য কোন সামান্যবিশেষ-ভাব হইতেই পারে না। সর্ববস্তুতেই এক সত্তা অনুগত। উহাই আত্মা। জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে এক আত্মারূপ সত্তা সর্বত্র সমভাবে একরূপে বিদ্যমান। এইরূপে দেখা যায় বিশেষ সত্তা কল্পিত ও এক সত্তাসামান্যই সত্য। বিশেষ সত্তার অপবাদ দ্বারা স্থাপিত এক সত্তাসামান্যভাবও কল্পিত বা অধ্যারোপিত, কারণ সুষুপ্তি প্রলয়াদি-কালে এক আত্মা বিদ্যমান থাকিলেও উহাতে সত্তাসামান্যভাব বলিয়া কিছু থাকে না। অতএব সত্তাসামান্য বলিয়া কিছু বিশেষ বস্তু নাই। উহাও একটা অধ্যারোপ মাত্র। এক আত্মাই আছেন। চিদ্বস্তুব্যতিরিক্ত সামান্যবিশেষভাব বলিয়া কিছু নাই। সামান্যবিশেষভাবরহিত চিদাত্মাতে বুদ্ধির প্রবেশ করাইবার জন্যই এই সামান্যবিশেষভাবের কল্পনা। ইহা 'অধ্যারোপ-অপবাদ' প্রক্রিয়ার একটি অবান্তর ভেদ, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

(খ) **দৃগ্‌দৃশ্যবিচার প্রক্রিয়া:** দৃশ্যত্ব নিষেধ করিবার জন্য আত্মাতে দ্রষ্টৃত্ব আরোপিত হয়। ইহাও দ্বৈতরাহিত্য বুঝাইবার উদ্দেশ্যে একটি উপায় মাত্র। দ্রষ্টৃত্ব ব্রহ্মবোধ উৎপাদনের একটি উপায়। ব্রহ্মই একমাত্র দ্রষ্টা, ইহা জানা সুগম। ইহাও একটি অধ্যারোপ। সর্বশেষে এই আরোপিত দ্রষ্টৃত্বও নিষিদ্ধ হইয়া এক দৃগ্‌-মাত্র চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই অবশেষ থাকেন।

ইন্দ্রিয়াদি সহায়ে বাহ্যবিষয়সমূহ আমরা অনুভব করিয়া থাকি। এ স্থলে চেতন জীব দ্রষ্টা ও জড় বিষয় দৃশ্য। বিচার দ্বারা দৃশ্য বিষয় হইতে পৃথক্ করিয়া দ্রষ্টার স্বরূপ নির্ণয় করাকেই 'দৃগ্‌-দৃশ্যবিবেক' নামে বলা হইয়া থাকে। দ্রষ্টা সর্বদা 'অহং' বা 'আমি'—এই বোধের বিষয়, আর দৃশ্য 'ইদং' বা 'ইহা'—এইরূপ অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে। দ্রষ্টা কখনও 'ইদং' অর্থাৎ দৃশ্যকোটির অন্তর্ভুক্ত হন না। যদি দ্রষ্টা কখনও দৃশ্যবর্গের অন্তর্ভুক্ত হন তবে তাহা গৌণ বা মিথ্যা দ্রষ্টা। যেমন বলা হয় যে, রাজা চররূপ চক্ষুদ্বারা দর্শন করেন। এখানে বস্তুতঃ চরই সব দর্শন করে। রাজার দ্রষ্টৃত্ব এস্থলে গৌণ, মুখ্য নহে। দেহেন্দ্রিয়াদি দর্শন করে, এখানে দেহেন্দ্রিয়াদির দ্রষ্টৃত্ব মিথ্যা, গৌণ নহে। দেহেন্দ্রিয়াদি সর্বথা দ্রষ্টা নহে। দ্রষ্টা হলেন চেতন আত্মা। দেহেন্দ্রিয়াদি জড়, উহারা দ্রষ্টা হইতে পারে না। চৈতন্যস্বরূপ আত্মার স্বভাবভূত জ্ঞান বা দৃষ্টিই

পারমার্থিক দ্রষ্টৃত্ব। লৌকিক ঘটপটাদির জ্ঞান-রূপ দৃষ্টি অন্তঃকরণ বৃত্তিরূপা বলিয়া উহা অনিত্য। বিষয়াকারা বৃত্তি উৎপন্ন হইলেই চৈতন্য ব্যাপ্ত হইয়া উহাতে চিদাভাস উৎপন্ন হওয়াতে সকলে উহাকেই জ্ঞান বা দৃষ্টি বলিয়া থাকে। অন্তঃকরণ-বৃত্তির আরোপের অপেক্ষাতেই লৌকিক দ্রষ্টৃত্ব হইয়া থাকে। দেহমন ইন্দ্রিয়াদিতে অভিমান-বশতই আত্মচৈতন্যে প্রমাতৃত্ব বা দ্রষ্টৃত্ব আরোপ হয়। লৌকিক দ্রষ্টা সুষুপ্ত্যাদি অবস্থাতে থাকে না। তখন জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়রূপ ত্রিপুটী বিভাগ-রহিত সর্বব্যবহারাতীত এক জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই থাকেন। উহাই পরমাত্মার অলুপ্তদ্রষ্টৃত্ব। এই জ্ঞান হইলে দ্রষ্টা-দর্শন-দৃশ্যরূপ বিভাগ অপবাদ অর্থাৎ নিরাকরণ হইয়া যায়। জাগ্রৎ স্বপ্নে এক চৈতন্যজ্যোতিকেই উপাধিদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি বা জ্ঞান বলা হয় মাত্র। উহা আত্মার পরিচ্ছিন্ন রূপ, মিথ্যারূপ, কারণ উহা ঔপাধিক। ভিন্ন ভিন্ন উপাধিবশতই আত্মাতে ভিন্ন ভিন্ন নাম, রূপ ও কর্মের আরোপ হইয়া থাকে। কেবল জ্ঞপ্তি বা নির্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ আত্মাই পারমার্থিক দ্রষ্টা।

(গ) **পঞ্চকোশবিচার প্রক্রিয়া:** উপনিষদে পঞ্চকোশবিচারের বিষয় বলা হইয়াছে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়াদি কোশে ক্রমশঃ আত্মত্ব অধ্যারোপ করিয়া পূর্বপূর্ব কোশের আত্মত্ব নিরাকৃত হইয়াছে। এইরূপে বুঝানো হইয়াছে যে, আত্মা পঞ্চকোশাতীত ও সর্বদ্বৈত-কল্পনারহিত। যথা: তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ব্রহ্মের সত্য, জ্ঞান, অনন্ত—এইরূপ লক্ষণ বর্ণন করিয়া তৎপর বলিয়াছেন যে,এই ব্রহ্মকে বুদ্ধিরূপ গুহাতে জানিতে হইবে। তদনন্তর ব্রহ্ম হইতে আকাশাদি-ক্রমে জগৎ ও দেহাদি সৃষ্টির বর্ণনা করিয়াছেন। অন্ন হইতে উৎপন্ন বলিয়া ভৌতিক দেহকে অন্ন-রসময় বা অন্নময় কোশ বলা হইয়াছে। সাধারণ লোকে এই দেহকেই আত্মা বলিয়া জানেন। এই আরোপের অনুবাদপূর্বকই শ্রুতি বলেন যে, ইহা আত্মা নহে। ইহা হইতে ভিন্ন ও আন্তর প্রাণময় কোশই আত্মা। এইরূপে অন্নময় কোশে গৃহীত স্বাভাবিক আত্মবুদ্ধি প্রাণময়ে সঞ্চারিত করিয়া থাকে। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশরূপ আত্মা বর্ণন করিয়া সর্বশেষে উহার পুচ্ছরূপ ব্রহ্মের নিরূপণ করিয়াছেন ও উহাই সর্বান্তর আত্মা এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন। বিচার্য এই যে, পুরুষের পাঁচটি আত্মা হয় না। বহিরঙ্গ কোশে আত্মবুদ্ধিকে, অন্তরঙ্গ কোশে ও সর্বশেষে সর্বান্তরতম ব্রহ্মে জীবকে পরিনিষ্ঠিত করাই এখানে শ্রুতির তাৎপর্য। এই প্রক্রিয়ায় উত্তর উত্তর কোশে আত্মবুদ্ধি আরোপ করতঃ পূর্বপূর্ব কোশের আত্মত্ববুদ্ধি অপবাদ করা হইয়াছে। সর্বশেষে এক ব্রহ্মেই আত্মবুদ্ধি নিশ্চিত-রূপে প্রমাণিত হওয়ায় এই পঞ্চকোশবিচারও ব্রহ্মাবগতির একটি উপায় বা প্রক্রিয়া বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

আমরা দেখিয়াছি শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন: "দেহাত্ম-বুদ্ধি, শেষে এটাও কাটতে হবে।" শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীতেও আমরা এই কথাই লক্ষ্য করিয়াছি। উভয়বিধ বাণীতেই শ্রুত্যুক্ত 'পঞ্চকোশবিচারের' কথাই স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ। শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুর কথিত স্থূলদেহ বা অন্নময়কোশ এই স্থলে পঞ্চকোশের উপলক্ষণ, ইহাই বুঝিতে হইবে।

(ঘ) **অবস্থাত্রয়বিচার প্রক্রিয়া:** জীবের তিনটি অবস্থা প্রসিদ্ধ,—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। স্বপ্ন ও জাগ্রতে দর্শনাদি ক্রিয়া হয়, কিন্তু সুষুপ্তিতে তাহা হয় না। চৈতন্যরূপ আত্মার আশ্রয়েই এই তিন অবস্থার সত্তা ও প্রতীতি হইয়া থাকে। অবস্থাসমূহ পরিবর্তনশীল। কিন্তু অবস্থাগত ধর্ম হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ পৃথক্ ও উহাদের সহিত অসংবদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা সর্বাবস্থাতে অনুগত

থাকেন। আত্মচৈতন্য বিনা উক্ত অবস্থাত্রয়ের ও তাৎকালিন প্রপঞ্চের উপলব্ধিই হইতে পারে না। অতএব এক আত্মাই সত্য ও তদ্ভিন্ন অবস্থাদি সব মিথ্যা। সুষুপ্তিতে জীব পরমাত্মাসহ একীভূত হইয়া অবস্থান করে। সুতরাং এক নিষ্প্রপঞ্চ সৎস্বরূপ আত্মাই জীবের যথার্থ স্বরূপ—ইহা নিশ্চিত অবগত হওয়া যায়।

জ্ঞানস্বরূপ আত্মা হইতে ভিন্নরূপে স্বপ্ন বা জাগ্রতের কোন পদার্থের অনুভবই হইতে পারে না। ঐ সকল বস্তুসমূহ জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে। উহা জ্ঞানস্বরূপই। সুষুপ্তিকালে জীব সৎসহ এক হইয়া যায়। ঐকালে স্ব-লীন হইয়া যায় বলিয়াই ঐ অবস্থার নাম 'স্বপিতি'। যদিও সর্বাবস্থাতে আত্মা নির্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপেই অবস্থান করেন, তথাপি অবস্থাসমূহ পরস্পর একে অপরটিতে থাকে না। এজন্যই অবস্থানগুলি রজ্জুতে কল্পিত সর্পের ন্যায় মিথ্যা আর জ্ঞানস্বরূপ সর্বাবস্থাতে অব্যভিচরিতরূপে বিদ্যমান থাকেন বলিয়া সত্য।

স্বপ্নে কল্পিত দেহাদিতে ও জাগ্রদবস্থাতে স্থূল দেহেন্দ্রিয়াদিতে অভিমানী বলিয়া জীবের প্রমাতৃত্ব অর্থাৎ জ্ঞাতৃত্ব প্রতীত হয়। কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থাতে ঐ অভিমান না থাকাবশতঃ প্রমাতৃত্বও থাকে না। এজন্যই শ্রুতি বলেন যে, সুষুপ্তিকালে জীব আপনস্বরূপে লয় হইয়া যায়। স্বরূপ হইতে বিচ্যুতি কাহারও হইতে পারে না। অতএব স্বপ্ন ও জাগ্রতের প্রমাতৃত্ব একটা আভাস বা প্রতীতি-মাত্র। স্বপ্নাবস্থার প্রমাতৃত্ব যে একটা মিথ্যা প্রতীতিমাত্র এ বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দিগ্ধ। ইহা সর্বসম্মত যে, স্বপ্নাবস্থায় শরীর ইন্দ্রিয়াদিসহ আত্মার কোন বাস্তব সম্বন্ধ হয় না। তথাপি জাগ্রতের ন্যায় সে অবস্থায় জীবের শ্রোতৃত্ব, জ্ঞাতৃত্বাদি সবই প্রতিভাত হয়। অতএব স্বপ্নের ন্যায় জাগ্রতের প্রমাতৃত্বাদিও মিথ্যা উপাধিকৃত। উভয় অবস্থাই সর্বতোভাবে তুল্য। স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্ন জাগ্রতের মতোই মনে হয়।

সুষুপ্তিতে জীব সদাত্মাসহ এক হইয়া যায়—এই শ্রুতি জীবের স্বাভাবিক অবস্থাবোধক। জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে অবিদ্যাকল্পিত প্রমাতৃত্ব ও অন্যরূপপ্রাপ্তি মিথ্যা। ইহার সহিত তুলনা করিয়াই সুষুপ্তিতে স্বরূপপ্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। এই জন্যই এই স্ব-স্বরূপ প্রাপ্তি ও পররূপ প্রাপ্তির কথা 'অধ্যারোপ-অপবাদ' প্রক্রিয়ার অনুসারেই বলা হয়। উহার উদ্দেশ্য ব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধ উৎপাদন ছাড়া আর কিছুই নহে। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় উপাধিসম্বন্ধবশতঃ আত্মার যেন পররূপপ্রাপ্তি হয়। উহার অপেক্ষাতেই সুষুপ্তিতে স্বরূপপ্রাপ্তি বলা হয় মাত্র, কারণ এই অবস্থাতে আত্মার কোন উপাধিসম্পর্ক থাকে না। বস্তুতঃ সর্বাবস্থাতেই আত্মা স্বরূপতঃ নিরুপাধিক নির্বিশেষ চৈতন্যরূপেই বিদ্যমান থাকেন। স্বপ্নে দেহেন্দ্রিয়াদি কিছু না থাকিলেও মুহূর্তমধ্যে যেমন কল্পিত দেহেন্দ্রিয়াদি ও তজ্জনিত ব্যবহারাদি অনুভব হইয়া থাকে, জাগ্রতেও তদ্রূপ।

অবস্থাত্রয়-প্রক্রিয়া সহায়ে বিচার দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে, আত্মা সর্ব অবস্থা হইতে বিলক্ষণ বা পৃথক্। এই পৃথকত্বকেই তুরীয় বলা হয়। তুরীয় কোন অবস্থাবিশেষ বা অজ্ঞাত বস্তুবিশেষ নহে। অবস্থাত্রয় হইতে পৃথকত্বই আত্মার তুরীয়ত্ব। তিন অবস্থার বর্ণন, এই তিন অবস্থাসহ আত্মার মায়িক সম্বন্ধজ্ঞাপন (ইহাই অধ্যারোপ) ও পুনঃ উহার নিষেধ (অপবাদ) দ্বারা ঐ সমূহ অবস্থার অতীত সর্ব অবস্থাবিহীন আত্মার প্রতিপাদন উদ্দেশ্যেই করা হইয়া থাকে।

এইরূপে দেখা যায়, শ্রুতি নানা উপায়ে ব্রহ্ম-স্বরূপ অববোধ করাইবার উদ্দেশ্যে প্রথম দেহেন্দ্রিয়াদি যাবতীয় দৃশ্যপ্রপঞ্চ অধ্যারোপ

করিয়া তৎপর উহার অপবাদ (নিরসন বা নিষেধ অর্থাৎ মিথ্যাত্ব) প্রতিপাদন করিতেছেন। এই প্রক্রিয়াসমূহের যে কোন একটির বিচার করিলে অবশেষে বুদ্ধি সর্বপদার্থের অভাবদ্বারা উপলক্ষিত একমাত্র শুদ্ধ-প্রকাশ, চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপেই থাকিয়া যায়। 'অধ্যারোপ-অপবাদ' প্রক্রিয়া ব্যতীত ব্রহ্মাববোধের আর অন্য কোন উপায় নাই।

দেহাত্মবুদ্ধির ত্যাজ্যতা অর্থাৎ অপবাদ ঘোষণা করিয়া শ্রীশ্রীমা বেদান্তোক্ত 'অধ্যারোপ-অপবাদ' রূপ প্রক্রিয়ার কথাই সাক্ষাৎ ব্যক্ত করিলেন না কি? শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীতেও আমরা উহাই লক্ষ্য করিয়া থাকি।

বেদান্ত বলেন, ব্রহ্ম সকলের আত্মা। উহা সদা অপরোক্ষ স্বভাব হইলেও অবিদ্যাবশতঃ জীবের নিকট আচ্ছাদিত বা ব্যবহিত হইয়া আছে। এই অবিদ্যানিবৃত্তির একমাত্র উপায় ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ নিজেকে ব্রহ্মরূপে জানা। ইহাই তত্ত্বজ্ঞান—যাহার বিষয় প্রারম্ভে শ্রীশ্রীমার কথায় উল্লেখ করা হইয়াছে। জীবের স্বরূপ-বিস্মরণকারী অবিদ্যার নাশ করিবার আর অন্য কোন সাধন বা উপায় নাই। তত্ত্ববিচারই এই জ্ঞানলাভ করিবার একমাত্র সাধন।

কিন্তু যাহাদের চিত্ত বিষয়-ভোগবাসনার দ্বারা কলুষিত, তাহাদের পক্ষে বেদান্তের এই শুদ্ধ বিচারমার্গ পর্যাপ্ত নহে। বিচারের গভীর প্রদেশে তাহাদের মন প্রবেশই করিবে না। তাই তাহাদের চিত্তশুদ্ধির জন্য অর্থাৎ চিত্তকে প্রত্যগাত্মাভিমুখী করিবার জন্য নিষ্কামকর্ম, বিবিধ উপাসনা, যোগাভ্যাসাদি নানা উপায় শ্রুতিতে বিহিত হইয়াছে। দুশ্চরিত্র, দুষ্ট আচরণ হইতে নিবৃত্ত না হইলে ধর্মলাভ হয় না। তত্ত্বজ্ঞানলাভ সে ব্যক্তির পক্ষে শুধু সুদূরপরাহত নহে, একান্ত অসম্ভব।—"আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ"—শুদ্ধ আচরণবিহীন পুরুষের কখনও জ্ঞানলাভ হয় না। 'কঠ' উপনিষদ্‌ও এই কথাই বলিয়াছেন: "নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ…।" (১৷২৷২৩)

অন্তঃকরণের মল, বিক্ষেপ ও আবরণ এই ত্রিবিধ দোষের জন্যই তত্ত্ববিচারে মন নিবিষ্ট হয় না এবং তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ও হয় না। মল (পাপাদি ও বিষয়-ভোগবাসনার সংস্কার), বিক্ষেপ (বিষয়চিন্তাজনিত চাঞ্চল্য) ও আবরণ (অজ্ঞান) এই তিনটিই প্রধান প্রতিবন্ধক। মলবিক্ষেপরহিত শুধু আবরণমাত্রাবশিষ্ট সাধকই বেদান্তোক্ত বিচারমার্গের অধিকারী।

নিষ্কামকর্মানুষ্ঠানে যাহার চিত্ত মলদোষরহিত হইয়া কথঞ্চিৎ শুদ্ধ ও অন্তর্মুখ হইয়াছে, তাহারই উপাসনাতে অধিকার, কারণ উপাসনা মানস-সাধনা। বিষয়বিক্ষিপ্ত চিত্ত দ্বারা উপাসনা হয় না। কথঞ্চিৎ শুদ্ধচিত্ত ও অন্তর্মুখ পুরুষের পক্ষেই উপাসনা সম্ভবপর। উপাসনা দ্বারা বিক্ষেপ দূর হইয়া চিত্ত একাগ্র হইয়া থাকে। একাগ্রচিত্ত পুরুষই বেদান্তবিচারসমর্থ। ঐরূপ অন্তর্মুখ সাধকের জন্য শ্রুত্যুক্ত শমদমাদি (মুণ্ডক উপনিষদ্, ১৷২৷১৩) ও স্মৃত্যুক্ত অমানিত্বাদি (গীতা, ১৩৷৭—১১) তত্ত্বজ্ঞানের সাধনরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎ অন্তরঙ্গ সাধন। নিষ্কামকর্ম বাহ্য প্রতিবন্ধক দূর করে মাত্র। শুদ্ধচিত্ত সাধকের পক্ষে শমদমাদি সাধন অতি সুলভ। পূর্বজন্মানুষ্ঠিত নিষ্কাম-কর্মাদির দ্বারা শুদ্ধচিত্ত পুরুষের আর বর্তমান জন্মে নিষ্কামকর্মাদি অবশ্য অনুষ্ঠেয় নহে। কর্ম জ্ঞানোৎপত্তির সহায়ক বলিয়া পরম্পরাক্রমে মোক্ষের সাধন।

উত্তমাধিকারীর উপদেশবাক্য শ্রবণমাত্রই জ্ঞান ও কৃতার্থতা হইয়া থাকে। তাহার আর কোন কর্তব্য অবশেষ থাকে না। একবার বেদান্তবাক্য শ্রবণমাত্র যাহার বাক্যার্থানুভব হয়

না, তাহার পুনঃ পুনঃ বাক্যশ্রবণ ও চিত্তগত সংশয়াদিদোষ দূর করিবার জন্ত মনন অর্থাৎ তত্ত্বানুকূল বিচার প্রয়োজন, যে পর্যন্ত জ্ঞানোদয় না হয়। মন্দপ্রজ্ঞ অধিকারীর এইরূপ অভ্যাস-বলেই জ্ঞানপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। এই বিষয়টিই শ্রীশ্রীমা সুন্দর দৃষ্টান্ত সহায়ে বলিয়াছেন: "যেমন ফুল নাড়তে চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে সুগন্ধ বের হয়, তেমনি তত্ত্ববিচার করতে করতেই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।"

শ্রবণ ও মনন দ্বারা তত্ত্বানুভবে অসমর্থ পুরুষের নিদিধ্যাসন প্রয়োজন। শমদম, অমানিত্বাদি শ্রুতি স্মৃত্যুক্ত সাধন সকলের অভ্যাস যাবজ্জীবন প্রয়োজন, কারণ উহা দ্বারা জ্ঞান পরিপক্ক হইয়া থাকে। সদা আত্মৈকপরতাই জ্ঞাননিষ্ঠার লক্ষণ। জ্ঞানমার্গে নিদিধ্যাসন অর্থ অন্য বস্তু হইতে মনকে ব্যাবৃত্ত করিয়া বস্তুদর্শনার্থ প্রযত্নমাত্র। উহা যোগ-শাস্ত্রসম্মত ধ্যান নহে। রত্নপরীক্ষক যেমন বার-বার রত্ন নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, নিদিধ্যাসনাভ্যা-সীও তদ্রূপ বস্তুতত্ত্বনিশ্চয়ার্থ একাগ্রতাসহকারে বস্তুতেই চিত্ত স্থাপিত করিয়া বস্তুনিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। বস্তুবিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া যাওয়ার নামই জ্ঞান। জ্ঞানোৎপত্তির পর আর কোন কর্তব্য অবশেষ থাকে না। তখনই জীবের পরমানন্দস্বরূপপ্রাপ্তি বা ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হইয়া থাকে। রোগী দুঃখী জীব যেরূপ রোগনিবৃত্তির পর স্বস্থতা অনুভব করে তদ্রূপ দুঃখদ দ্বৈতপ্রপঞ্চ নিবৃত্ত হইলে অর্থাৎ উহা একান্ত মিথ্যা একটা সত্তাহীন প্রতীতিমাত্র ইহা নিশ্চিত হইলে জীবের দেহাধ্যাসমূলক যাবতীয় সংসারদুঃখ চিরতরে নিবৃত্ত হইয়া যায়। ইহাই জ্ঞানের প্রয়োজন। তখন জীব জানে যে তাহার দুঃখ কোনকালেই ছিল না। ভ্রান্তিবশতই সে এতকাল নিজেকে দুঃখী, কর্তা, ভোক্তা মনে করিয়া নিজের যথার্থ পরমানন্দ-স্বরূপটি ভুলিয়া ছিল। এরূপ অবস্থাকেই স্বরূপা-বস্থান বা পরপ্রাপ্তি বা ব্রাহ্মীস্থিতি বলা হয়।

এই অপূর্ব স্থিতির বিষয়টিই শ্রীশ্রীমা তাঁহার কথার শেষে ব্যক্ত করিলেন "হরিবোল, হরি-বোল" বলিয়া। অর্থাৎ প্রলয়ে যিনি সর্বজগতের হরণ বা উপসংহার নিজেতে করিয়া থাকেন, কার্যপ্রপঞ্চের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের সেই একমাত্র কারণ হরি বা ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, আর সব মিথ্যা। এই সত্য বস্তু ব্রহ্মকে জানা ও তাঁহাতে স্থিতিই জীবের একমাত্র কাম্য। এত সাধের নিজ দেহটিও কতকগুলি ছাই ছাড়া আর কিছুই নয়। লৌকিক ব্যবহারে ছাই শব্দ তুচ্ছতা বা অভাববোধক। শ্রীশ্রীমা তাহাই ইঙ্গিত করিলেন যে, দেহাদি সর্বপদার্থ একান্তই মিথ্যা, উহা বস্তুতঃ নাই। উহা মরুমরীচিকা, স্বাপ্নপদার্থ বা ভ্রান্তিদৃষ্ট রজ্জুসর্পের ন্যায় একটা সত্তাবিহীন প্রতীতিমাত্র।

তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের বাধিতানুবৃত্তিবশতঃ পূর্ব ভ্রান্তিজ্ঞানের অনুবর্তন হইলেও অর্থাৎ তিনি পূর্ববৎ আমি সুখী, আমি দুঃখী এরূপ ব্যবহার করিলেও তাহা দ্বারা তাঁহার জ্ঞানের কোন হানি হয় না। লোককল্যাণার্থ কর্ম করিলেও তাঁহার কোন কর্মবন্ধন হয় না। মুমুক্ষুদের উপদেশাদি প্রদান কালেও তাঁহার কোন বাস্তবিক কর্তৃত্ববুদ্ধি থাকে না। ইহাই জীবন্মুক্তের স্থিতি। জীবন্মুক্ত জ্ঞানী শরীরে বিদ্যমান থাকিয়াও বস্তুতঃ অশরীরী, কারণ তাঁহার দেহে আত্মবুদ্ধি নাই। দেহাত্মবুদ্ধি হইতে মুক্ত হইয়া তিনি এখন অমৃতস্বরূপ। তাই শ্রীশ্রীমা বলিলেন:

"দেহে মায়া দেহাত্মবুদ্ধি, শেষে এটাও কাটতে হবে।" "কিসের দেহ মা! দেড় সের ছাই বই তো নয়?—তার আবার গরব কিসের? যত বড় দেহখানাই হোক্ না, পুড়লে ঐ দেড় সের ছাই। তাকে আবার ভালবাসা! হরিবোল, হরিবোল…।" এক হরি বা সর্বকারণ ব্রহ্মই চিন্তনীয়। তাঁর কথাই বলা, তাঁকে জানাই কর্তব্য। তাহা হইলেই মানবজীবন সার্থক হইবে, জীবন মধুময় হইবে। ইহাই শ্রীশ্রীমায়ের কথার অভিপ্রায়।

প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে যুবমানসে বিবেকানন্দ-সাহিত্যের প্রভাব

ডক্টর শিশির কর

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক ও শিশু-সাহিত্যিক—আনন্দবাজার পত্রিকার বার্তাবিভাগের সহসম্পাদক।

প্রবন্ধটি উদ্বোধন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে লেখক কর্তৃক পঠিত (তারিখ, ৬ এপ্রিল, ১৯৮৫)।

গোড়ার কথা: জাতীয়তার বিবেকানন্দ: স্বামী বিবেকানন্দ একবার (১৮৯৭) নাগ মহাশয়কে (শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তশ্রেষ্ঠ দুর্গাচরণ নাগ) বলেছিলেন: "আমার এখন একমাত্র ইচ্ছা, দেশটাকে জাগিয়ে তুলি—মহাবীর যেন নিজের শক্তিমত্তায় অনাস্থাপর হয়ে ঘুমুচ্ছে—সাড়া নেই, শব্দ নেই। সনাতন ধর্মভাবে একে কোনরূপে জাগাতে পারলে বুঝব ঠাকুরের ও আমার আসা সার্থক হল। কেবল ঐ ইচ্ছাটা আছে—মুক্তি-মুক্তি তুচ্ছ বোধ হয়েছে।" [যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২০১]

স্বামীজী চেয়েছিলেন দেশবাসীকে জাগাতে, বিশেষ করে তরুণদের উদ্বুদ্ধ করতে দেশপ্রেমে। তাদের মধ্যে রুদ্রের প্রকাশ হোক—এই ছিল তাঁর কামনা। রুদ্রস্তুতিটি স্বামীজীর তাই খুব প্রিয় ছিল। তিনি প্রায়ই তা আবৃত্তি করতেন।

আদর্শভ্রষ্ট ও পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে মত্ত তাঁর দেশের যুবকদের উদ্দেশে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন: "হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?…"

স্বামীজীর প্রভাব কীভাবে যুবকদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদা জাগিয়ে তুলেছিল, সেকথা আছে অধ্যাপক শংকরীপ্রসাদ বসুর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' বইয়ে: "বিবেকানন্দ তারপর ভারতবর্ষে এলেন, সশরীরে নয়, সংবাদের রথে চড়ে—এবং ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত কাঁপতে লাগল সেই বার্তা-শিহরণে। ঐ সংবাদগুলি পরাধীন পতিত ভারতবর্ষকে তার সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বস্তু এনে দিল—আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস। ভারতবর্ষে তখন দেশনেতা বা সমাজসংস্কারকের অভাব ছিল না; ভারতীয় সমাজের দোষের চেহারাটা দেশী-বিদেশী সকলের কল্যাণে বে-আব্রু হয়ে পড়েছিল পুরোপুরি, রোগের নিদান কাগজপত্রে লিখিত হয়ে, বক্তৃতামঞ্চে কথিত হয়ে, ভারতভূমিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল—আত্মাবমাননার সেই বিপুল আয়োজনের মধ্যে নির্বাসিত মর্যাদাকে নিজের মধ্যে আহ্বান করে বিবেকানন্দ যেন ঘোষণা করেছিলেন, 'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগোরে সকল দেশ'—জাতিপ্রাণ সহর্ষে তখন সাড়া দিয়েছিল, বন্দনা গেয়েছিল সেই মানুষটির যিনি লজ্জিত করতে আসেন নি, উদ্বুদ্ধ করতে এসেছেন, ক্ষুণ্ণ করতে আসেন নি, এসেছেন পূর্ণ করতে।" [বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৮]

এদেশের যুবচিত্তকে স্বামীজী কীভাবে জাগিয়েছিলেন, সেকথা লিখেছেন তাঁর সমকালীন রবীন্দ্রনাথও: "আধুনিক কালের ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোনো আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন, তোমাদের সকলের

মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি,—দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটা যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্রভাবে বিচিত্র ত্যাগে ফলছে। তাঁর বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েছে তখনি শক্তি দিয়েছে। সেই শক্তির পথ কেবল একঝোঁকা নয়, তা কোনো দৈহিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত নয়, তা মানুষের প্রাণমনকে বিচিত্রভাবে প্রাণবান করেছে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যেসব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে···।" [বিশ্ববিবেক, পৃঃ ১৭৯/রবীন্দ্রজীবনী, ৪র্থ খণ্ড]

স্বামীজীর প্রভাব সম্পর্কে নিবেদিতার তো অসংখ্য উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। 'বিবেকানন্দের কাজ হিসাবেই তিনি রাজনীতি গ্রহণ করেন।'

বিবেকানন্দের প্রভাব সমুদ্রের জোয়ারের মতো প্রবেশ করেছে ভারতের মর্মকেন্দ্রে, বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দের এই মন্তব্য। তিনি বলেছিলেন: বিবেকানন্দের প্রভাব এখনও বিপুলভাবে কাজ করছে আমরা দেখতে পাই···যা এমন কিছু, যা সিংহপ্রতিম, বিরাট, সম্বোধিদীপ্ত; যা সমুদ্রের জোয়ারের মতো প্রবেশ করেছে ভারতের মর্মকেন্দ্রে এবং তা দেখে আমরা সোচ্ছ্বাসে বলে উঠি, ঐ দেখ, বিবেকানন্দ এখনো জেগে মাতৃমর্মে, মাতৃ-সন্তানদের মর্মলোকে। [বিবেকবাণী, পৃঃ ১৬৬]

মনীষী ও ঐতিহাসিকদের মন্তব্য: বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্বাধীনতাসংগ্রামীদের লেখা ও মন্তব্য থেকে প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে তরুণদের উপর স্বামীজীর কী বিপুল প্রভাব, তার অজস্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে ব্রিটিশ আমলা ও গোয়েন্দাদের নানা মন্তব্য ও উক্তিতেও। কখন গোপন মন্তব্য বা কখন প্রকাশ্য প্রতিবেদন।

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও বিশিষ্ট দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন স্বামীজীর প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন: "As a student in one of the classes, in Matriculation or so, the letters of Sri Vivekananda used to be circulated in manuscript form among us all. The kind of thrill which we enjoyed, the kind of mesmeric touch that those writings gave us etc.···" [বিশ্ব-বিবেক, সম্পাদনা: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, শংকর; পৃঃ আট (গ্রন্থপঞ্জী)]

দেখা যাচ্ছে, প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে স্বামীজীর বাণী হাতে লিখে ইস্তাহারের মতো যুবকদের মধ্যে বিলি করা হত। স্বামীজীর কর্মযোগ, ভারতীয় পত্রাবলী, মুক্তিসংগ্রামীদের কাছে অতি প্রিয় গ্রন্থ ছিল। স্বামীজীর লেখার প্রভাব কী তীব্র ছিল, সেকথা লিখেছেন স্বাধীনতাসংগ্রামের একাধিক ইতিহাসকার: "···বিপ্লবের যুগে পুলিশ যেখানেই বিপ্লবীদের বাসা তল্লাস করিয়াছেন সেইখানেই বিবেকানন্দের গ্রন্থরাজি দেখিতে পাইয়াছিলেন। শেষ ও শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রও বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলীর একান্ত অনুরক্ত পাঠক ছিলেন।" [বিশ্ববিবেক, পৃঃ ২৫৮]

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্ ও ঐতিহাসিক বিমান-বিহারী মজুমদারের ওই মন্তব্য, তিনি তাঁর Militant Nationalism in India বইয়ে লিখেছেন: "In every gymnasium, i.e, exercise cult of the Revolutionary party of Bengal, His work entitled, 'From Colombo to Almora' was read." সমকালে ও পরবর্তী অনেক ঐতিহাসিক তরুণদের উপর স্বামীজীর প্রভাবের কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করেছেন, মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসকার এবং একজন মুক্তিযোদ্ধা কালীচরণ ঘোষ তাঁর The

Roll of Honour গ্রন্থে লিখেছেন: "Swamiji's message influenced the minds of young Bengalee with a spirit of burning patriotism and created in some a tendency for stern political activity.…" [The Roll of Honour, p 30]

স্বামীজী যুবকদের বলেছিলেন, মাতৃভূমির সেবায় আত্মনিয়োগে ও দেশের স্বাধীনতার জন্য সচেষ্ট হতে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর History and Culture of Indian people গ্রন্থে একথা লিখেছেন: "বিবেকানন্দ ভারতীয় জাতীয়তাবোধকে পাঁচস্তর প্রস্তরের উপর স্থাপন করেছিলেন। যথা—রাজনৈতিক মুক্তির জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা, অতীত গৌরব ও ভারতের মহত্ত্বের জন্য গৌরববোধ, ভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শে ভারতের ঐক্য, গণজাগরণ এবং শারীরিক শক্তি ও শৌর্যের বিকাশ। একদল যুবককে, যাঁরা তাঁর কাছ থেকে পথনির্দেশ ও আশীর্বাদ চেয়েছিলেন, তিনি বলেন, আমার জীবনের মিশন হচ্ছে মানুষ তৈরি। আমার মিশন তোমরা কাজে ও বাস্তবে রূপায়ণের চেষ্টা কর। মাতৃভূমির সেবাই হবে তোমাদের কর্তব্য। প্রথম চাই ভারতের রাজনৈতিক মুক্তি।

"অন্যত্র তিনি বলেছেন: আগামী পঞ্চাশ বছর মাতৃভূমি তোমাদের আরাধ্য দেবতা হউক। অন্য সব অকেজো দেবতা এই কয়েক বছর ভুলিলে ক্ষতি নাই।" [Ibid, Vol. X, p. 493]

মুক্তিযোদ্ধাদের কথা: প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে তরুণদের উপর স্বামীজীর লেখার প্রভাবের কথা লিখেছেন বহু ঐতিহাসিক। তবে এ সম্পর্কে উদ্ধৃতি না বাড়িয়ে সেযুগে মুক্তিসংগ্রামী তরুণরা স্বামীজীকে কী চোখে দেখতেন তা দেখা যাক। প্রথমেই আসি সুভাষচন্দ্রের বিষয়ে। কারণ বাংলা তথা ভারতের তরুণদের তিনিই সবচেয়ে প্রিয় নেতা ছিলেন। তিনি চিরতারুণ্যের প্রতীক আমাদের দেশে। তাঁর কথায় তাঁর জীবনে বিবেকানন্দের সাহিত্যের প্রভাব! "হঠাৎ নজর পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের বইগুলির উপর। কয়েকপাতা উল্টেই বুঝতে পারলাম এই জিনিসই আমি এতদিন ধরে চাইছিলাম। বইগুলো বাড়ি নিয়ে গিয়ে গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম। পড়তে পড়তে আমার হৃদয় মন আচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগল। দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল। আমি তাঁর বই নিয়ে তন্ময় হয়ে রইলাম। আমাকে সবচেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁর চিঠিপত্র ও বক্তৃতা। তা থেকে তাঁর আদর্শের মূল সুরটি আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলাম। 'আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়'—মানবজাতির সেবা ও আত্মার মুক্তি—এই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ।"

স্বামীজীর পথই হল সুভাষচন্দ্রের পথ। পরবর্তী কালের নেতাজীর পথ: "বিবেকানন্দের আদর্শকে যে সময়ে জীবনে গ্রহণ করলাম, তখন আমার বয়স পনেরও হবে কিনা সন্দেহ। বিবেকানন্দের প্রভাব আমার জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিল। তাঁর আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের বিশালতাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করার মত ক্ষমতা তখন আমার ছিল না—কিন্তু কয়েকটা জিনিস একেবারে গোড়া থেকেই আমার মনে চিরকালের জন্যে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। চেহারায় ও ব্যক্তিত্বে আমার কাছে বিবেকানন্দই ছিলেন আদর্শ পুরুষ। তাঁর মধ্যে আমার মনের অজস্র জিজ্ঞাসার সহজ সমাধান খুঁজে পেয়েছিলাম। স্বামী বিবেকানন্দের পথই আমি বেছে নিলাম।"

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের অন্যতম নায়ক, যুগান্তর দলের হরিকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন: "বিপ্লব আন্দোলনে স্বামীজীর প্রভাব? উত্তরে একটা কথাই যথেষ্ট—তাঁর প্রভাব ও প্রেরণা সর্বাধিক। তাঁর বাণীর উদ্দীপনা ছাড়া বিপ্লব

আন্দোলন ঐভাবে হত কিনা সন্দেহ।"

বিপ্লবী ডঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়ঃ "একদিকে বঙ্কিমের আনন্দমঠ এবং অন্যদিকে স্বামীজীর উৎসাহবাক্য নতুন ভোরের খবর দিতে লাগল। 'পত্রাবলী', 'ভারতে বিবেকানন্দ', 'ভাববার কথা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য,' 'বর্তমান ভারত', 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া স্বামীজীর ইংরেজী বক্তৃতাগুলিও—যেমন Lectures from Colombo to Almora—পড়তাম। স্বামীজীর অবদানহিসাবে এসব তো গেল গৌণ (indirect) প্রভাব। আমাদের মনে তার চেয়েও মুখ্য (direct) প্রভাব বিস্তার করল অনুশীলনের স্থাপয়িতা সতীশ বসুর উক্তি।...স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল জাগ্রত, সমুন্নত, একযোগে যুক্ত স্বাধীন ভারত।" [বিশ্ব-বিবেক, পৃঃ ২৫৪]

অহিংস স্বাধীনতাসংগ্রামীদের উক্তিঃ প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে তরুণদের উপর স্বামীজীর লেখার দুর্নিবার প্রভাবের উল্লেখ পাই অসংখ্য মনীষী, লেখক, মুক্তিসংগ্রামীর লেখায়। শ্রেষ্ঠ অহিংস যোদ্ধা মহাত্মা গান্ধীর ভাষায়: "I have gone though his work very thoroughly and after having gone through them, the love that I had for my country became a thousand-fold." [ঐ, ১৪৬]

যুবকদের উপর স্বামীজীর প্রভাব সম্পর্কে প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে জননায়ক, মুক্তিসংগ্রামীদের অসংখ্য উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। আর-একজনের কথাই উল্লেখ করব যিনি মুক্তিসংগ্রামে যেমন ছিলেন প্রথম সারিতে, নবভারতের রূপায়ণেও ছিলেন এক নম্বর ব্যক্তি। সেই জওহরলাল নেহেরুর সশ্রদ্ধ মন্তব্য: "যদি আমাকে বালক ও যুবকদের নিকট একজন আদর্শ পুরুষের নামোল্লেখ করিতে হয় আমি প্রথমেই স্বামী বিবেকানন্দের নাম করিব। তিনি ছিলেন শক্তি ও তেজের প্রতীক।—স্বামীজী যাহা কিছু লিখিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন তাহা ছিল সজীব ও প্রাণবন্ত; তাঁহার বাণী ও কার্য লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।" (বিবেকবাণী, পৃঃ ১৯৪)

পদস্থ সরকারী ব্যক্তিদের মন্তব্যঃ স্বামীজীর লেখা ও বাণী আমাদের দেশের তরুণদের সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে। মুক্তি-সংগ্রামে, বিশেষ করে বিপ্লব আন্দোলনে সবচেয়ে শক্তিশালী বারুদ ছিল স্বামীজীর লেখায়। তাই বিপ্লবীদের যে-কোন ঘাঁটিতে তল্লাসীর সময় কোন না-কোন স্বামীজীর বই পাওয়া গেছে। তাই সমকালে এবং পরবর্তিযুগে তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর লেখা সম্পর্কে, তাঁর প্রতিটি সংস্থা সম্পর্কে রাজশক্তির বিরূপতা কমেনি। বরং যতই দেশে মুক্তিসংগ্রাম সক্রিয় হয়েছে, ততই তা বেড়েছে। ব্রিটিশ সরকার বুঝেছিলেন, এদেশে মুক্তিসংগ্রামে কী বিপুল প্রেরণা যোগাচ্ছে স্বামীজীর জীবন ও বাণী। একাধিক পদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষ একথা লিখেছেন। আর্ল অব রোনাল্ডস্ আটক বিপ্লবীদের কাছ থেকে জেনেছিলেন, কে এইসব মুক্তি যোদ্ধাদের প্রেরণা দিচ্ছেন। তিনি তাঁর 'দি হার্ট অব আর্যাবর্ত' গ্রন্থে লিখেছেন যে, তরুণদের বিপ্লবীদলে আনার জন্য স্বামীজীর পত্রাবলী পড়তে দেওয়া হত।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে বিচারপতি রাউলাটের নেতৃত্বে গঠিত রাউলাট কমিটি বা সিডিসন কমিটির রিপোর্টেও অনুরূপ তথ্য আছে:

"নিজেদের মতে দীক্ষিত ব্যক্তিগণের জন্য ষড়যন্ত্রকারীরা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ করেছিলেন। তাঁদের পাঠ্যসূচীর মধ্যে ছিল: ভগবদ্‌গীতা, বিবেকানন্দের রচনা, এবং ম্যাৎসিনী ও গ্যারিবল্ডির জীবনকথা।"

স্বামীজীর এই প্রভাবের কথা বারবার পাই

সিডিশান কমিটির প্রতিবেদনে : "Vivekananda died in 1902; but his writings and teachings survived him, have been popularised by the Ramkrishna Mission and have deeply impressed many educated Hindus. From much evidence before us it is apparent that this influence was perverted by Barindra and his followers in order to create an atmosphere suitable for the execution of their projects." [Sedition Committee Report, 1918]

স্বামীজীর লেখার ও স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত সংস্থার প্রভাব তাঁর মৃত্যুর পর আরও বাড়তে থাকে। শাসকসমাজ স্বামীজীর লেখা সম্পর্কে এত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে যে, তাঁর লেখার যাতে প্রচার না হয়, সেদিকে ছিল তাদের সতর্ক দৃষ্টি। তল্লাসীর সময় অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে স্বামীজীর বইপত্র পেলে পুলিশ আটক করত। তাঁর বই নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবও ওঠে।

গোয়েন্দা রিপোর্টে[১] দেখা যায়, স্বামীজীর পত্রাবলী বাজেয়াপ্ত করার প্রস্তাবও উঠেছিল। স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল এস. আর. দাসের ভিন্ন মত না থাকলে পত্রাবলী বাজেয়াপ্ত হতই। মূল্যবান সেই গোপন নথিটি এই : "In the middle of 1915 Government of Bengal proposed to take action against the printer and publisher of 'Patrabali', Part I, 4th edition of Swami Vivekananda for contravening Sec 4 (c) of Press Act, 1910, Accordingly English translation of the alleged objectionable passages of the book was sent to Sri S. R. Das, Standing Councel for legal opinion. Sri Das after going through the whole book, gave a seven pages opinion. In which he said :

'I am strongly of opinion after going through the whole book that it does not contravene Sec. 4 (C. O. of the Act I of 1910)'

"On receipt of the said opinion and on the ground that the author of the book is dead, the Government dropped the matter". [Fl. No 1068/12, 1912, Home (Pol) cong. B. Govt.]

গোপন সরকারী রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, উদ্বোধনে প্রকাশিত স্বামীজীর নিবন্ধও রাজরোষে পড়ে :

"During his life time Swamiji published a fortnightly journal from Belur Head quarter of Ramkrishna Mission called 'Udbodhon'. In one of its issues, which was subsequently considered highly objectionable as it appeared from a report D/December 1907, Swamiji wrote, 'You have all been hyponotized, [?] your ruler tell you that you are low, subjucated [?] and week [?] and what you believe to be true. I am made of earth of this country but I have not learnt to think of myself like that, so those people who used to look down upon us, by God's will, respecting me like god, peping [?] cannot lead man into salvation. What is wanted is a keenaged [?] sword and war to death. [Fl No 1068/12, Home (cong.) Beng Govt.]

১ গোয়েন্দা ও পুলিশের রিপোর্টে যে ভাষা আছে, হুবহু তাই রাখা হয়েছে—ভাষার উৎকর্ষতার জন্য কোনরকম পরিমার্জন বা সংশোধন করিনি।

শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে বিশ্বজয়ের পর স্বামীজী দেশে ফিরলে কলকাতায় তাঁকে যে বিপুল সম্বর্ধনা (২৬ ফেব্রুআরি, ১৮৯৭ খ্রীঃ) জানানো হয়, তার উত্তরে তিনি যে ভাষণ দেন, সেটিও গোয়েন্দাদের ফাইলে বন্দী আছে। স্বামীজীর ওই ভাষণ ব্রিটিশ গোয়েন্দারা ভাল চোখে দেখেননি।.

স্বামীজীর ওই ভাষণ তরুণ মুক্তিসংগ্রামীদের উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। সেকথা টেগার্টের রিপোর্টে (22/4/1914) আছে :

"In reply to an address of welcome presented to him at his arrival in Caloutta, as referred to above, Swami Vivekananda urged hearer to wake up. 'Awake', he cried, 'arise and stop not till the desired end is reached'."...

তারপর টেগার্টের মন্তব্য :

"It might be noted here that the highly revolutionary liberty leaflets which have been circulated broad-cast over the greater part of India during the last year commence with this watch-word of Vivekananda—Arise, awake and stop not till the goal is reached."

বিপ্লবীদের উপর স্বামীজীর লেখার প্রভাবের কথা সরকারী নথিপত্রে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। গোপন সরকারী ফাইলের এক জায়গায় আছে : 'In the Anusilan Samity-System Vivekananda's Work were considered as text books to be used to gather recruits. Libraries in the name of Vivekananda's were also found in the house of revolutionaries. Ramkrishna Kathamrita and Vivekananda's Karmajoga were favourite books. [Freedom Fighter Papers No 45. State Archives Writers Buildings].

স্বামীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের তরুণরা দলে দলে মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সে তথ্য বারবার গোপন গোয়েন্দা-রিপোর্টেও পাই :

"Swamiji did not concern himself much with practical politics as such, but many of his followers were afterwards found connected with the revolutionary movements of Bengal."

গোপন গোয়েন্দা প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে : "Ramkrishna Mission itself had been used in the past as a revolutionary agency under the guise of religion and philanthropy and the greatest danger in the present time lies in the unaffiliated Ashram which had grown up like mushroom in affected areas in East Bengal.

"Vivekananda commended [?] to go out and preach the gospel of Ramkrishna and found branch Ashrams throughtout [?] India. This command had been taken up by the revolutionaries of Bengal to such a good effect, that in spite of best intentions, the Belur Math were unable to control them.

"Vivekananda advised to his followers to tour the villages and attract the attention of the masses by the means of magic lantern lectures."

গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়েছে, স্বামীজীর

গঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল এবং বাংলার বাইরেও বিস্তৃত হয়েছিল।

"There are indications that the Mission and its followers were connected with revolutionary upheaval in India which has convulsed the student community in Bengal and extended its influence in Punjab and Native States."

অভিযোগ, বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগ ও সংবাদ আদান-প্রদানের কেন্দ্র ছিল এই বেলুড় মঠ :

"Of all centres of Ramkrishna Mission in India Belur Math alone seems to have been used as rendezvoes [?] of the revolutionaries. Persons holding revolutionary views visited the Math from time to time and it is believed that political Sannasis received training and instruction there."

গোয়েন্দাদের উক্তির সমর্থন পাই প্রখ্যাত বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগোর মন্তব্যে :

"When we found that recruitment is at a stand-still we had recourse to disseminating political nostrums in the guise of religion with the assistance of the Ramkrishna Mission." [An Account of Revolutionary movement in Bengal.]

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জানুআরি বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের ৫০তম জন্মোৎসবেও বিপ্লবীরা সক্রিয় অংশ নেন। সে-সম্পর্কে সরকারী গোপন রিপোর্ট ঃ

"On the occassion of Swamiji's 50th anniversary held at Belur on 29. 1. 12 several members of now defunct Anusilan Samity done the work of feeding the visitors present. After the function was over a secret political meeting was reported to have been held but not confirmed." [Ibid.]

রামকৃষ্ণ মিশনের অন্য আশ্রমেও বিপ্লবীদের আনাগোনা ছিল বলে গোপন গোয়েন্দা-রিপোর্টে আছে :

"During 1913—14 important political suspects had been unearthen in Ramkrishna Mission—Baldeo Roy at Kankhal Ashram and Beneras Ashram, Satish Dasgupta at Beneras Ashram." [Ibid.]

স্বামীজীর শিক্ষাকে তরুণ বিপ্লবীরা কীভাবে নিজেদের উদ্দেশ্য রূপায়ণে কাজে লাগাতেন, সেকথা টেগার্টের গোপন প্রতিবেদনে পাই :

"From the paper seized at the search mentioned above it also appears that a party of students went to Belur by boat for the celebration of Swami Vivekananda's birth anniversary in 1908, the river passage on this occassion called forth the following remarks from one of them, by name Harendra Chandra Pal, as recorded in his diary ; 'To-day we all seek to cross over to the other bank of this small river Ganges. When we shall be able to unfurl the banner of independence on the other side of thraldom and make all sides resound with the throbbing of triumphant drum and the cries

of "Bande Mataram" then we should be so very happy. To think of it even in imagination the mind becomes filled with energy and joy.'

"Another prominent member of Calcutta Anushilan Samity, who was about this time closely connected with the Belur Math, was Jogendra Nath Tagore, alias Jogen Thakur, a prominent member of Jugantar and Jubak-Mandali—Sarathi organisation."

পুলিশের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের স্পেশ্যাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সি. এ. টেগার্টের ওই রিপোর্টটি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২ এপ্রিল লেখা। এতে আরও আছে :

"Another incident illustrative of the method by which the members of the revolutionary party seized upon the teaching of Swami Vivekananda and adopted them to suit their own end, also came to notice about this time. Vivekananda advised his followers to tour in the villages, and attract the attention of the masses by means of magic lantern lectures. Indra Nandi, referred to above, made an extensive tour in Bengal on behalf of Maniktola gang, in the course of which he used a magic lantern to attract the attention of his hearers, on the lines laid down by the Swami. Since that time several other similar instances have been reported."

স্বামীজীর ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ছাড়া অন্য যেসব বিশিষ্ট বিপ্লবীর সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের যোগ ছিল সরকারী ফাইলে তাঁদের নাম আছে। যেমন, আলিপুর বোমার মামলার দেবব্রত বসু। ইনি পরে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ হন। আলিপুর বোমার মামলার শচীন সেন ও কুঞ্জলাল সাহা। মানিকতলা ষড়যন্ত্র মামলার ভবভূষণ মিত্র। এছাড়া আছেন : যোগেন ঠাকুর (সারথি গোষ্ঠী), তারাপদ বসু (বাঙলা ষড়যন্ত্র মামলা), পুলিন মুখার্জী, সতীশ বসু (কলকাতা অনুশীলন সমিতি), নগেন্দ্রনাথ বসু (ঢাকা), বীরেন বসু (আর্যসমাজ), ফণীভূষণ ঘোষ (চন্দননগর), যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী (আর্যসমাজ), উমাশংকর সরকার (পূর্ণদাস সমিতি, ঢাকা), রসিকচন্দ্র সরকার (গোপালপুর ডাকাতি)।

স্বামীজীর লেখা প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে দেশের তরুণদের বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। স্বামীজীর বইপত্র, চিঠি পড়েই তরুণরা আকৃষ্ট হয়েছিল মুক্তিসংগ্রামে। তারা অনুপ্রেরণা পাবার জন্য বার-বার যেতেন স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠেও। স্বামীজীর উত্তরসূরীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরও গুরুতর। সরাসরি 'স্বরাজ' প্রচারের অভিযোগ আছে সরকারী গোপন ফাইলে। স্বামীজীর নির্দেশে রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি হন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। এই সময় মিশনের ভূমিকা সম্পর্কে গোপন গোয়েন্দা-রিপোর্টে গুরুতর অভিযোগ আছে :

"These Missionaries are suspected of praeching Swaraj and Brahmananda alias Rakhal Ghose has been described as leader of these men."

রুশ বিপ্লবের অনেক আগেই, এমন কি বলশেভিক দল গড়ে ওঠারও আগে স্বামীজী চেয়েছিলেন নতুন ভারত গড়ে উঠুক এদেশের কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের নেতৃত্বে।

স্বামীজী সর্বাত্মক বিপ্লব চেয়েছিলেন—মুক্তি-সংগ্রামীরা তার সামান্যই সফল করেছিলেন—তিনি চেয়েছিলেন : "নূতন ভারত বেরুক···চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে-মালা-মুচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে।···" [বাণী ও রচনা, ৬/৮১ দ্রষ্টব্য] মহত্তর ভারত গড়তে তরুণদের প্রতি স্বামীজীর সেই ডাক আজও সফল হয়নি :

"Our ancestors were great. We must first recall that. We must learn the elements of our being, the blood that courses in our veins ; we must have faith in that blood, and what it did in the past ; and out of that faith and consciousness of past greatness, we must build an India yet greater than what she has been." [Lectures From Colombo to Almora, p. 184]

চরিত্রগঠনে সাহিত্য

শ্রীআনন্দ বাগচী

বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক—বাঁকুড়া ক্রীশ্চান কলেজের বাংলা সাহিত্যের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।
আনন্দবাজার পত্রিকার সহ-সম্পাদক।

ছেলেবেলায়, খুব ছেলেবেলায়, যখন ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে ফের মনের চৌকাঠ পেরোনোর চেষ্টা চলেছে মায়ের কোলের কাছে বসে, হাতে খড়ির শ্লেটে অক্ষরমালার আদল পেকে উঠেছে, আর সেই সঙ্গে জীবনের সবচেয়ে হালকা বইয়ের রহস্যময় কাগজের কবাট খুলে স্বরে অ-কে সাথী করে অজগর মুখ বাড়িয়েছে—প্রতিটি অক্ষরকে অর্থের সঙ্গে যুক্ত করে সেই নতুন পরিচয় মনের মধ্যে এখনও রোমাঞ্চকর হয়ে আছে। এ যেন এক হিসেবে জীবনের শুধু বর্ণ-পরিচয়ই নয় রূপরসগন্ধেরও পরিচয়। অর্ধস্পষ্ট, প্রায় পাঁজির ছবির মতো কাঠের ব্লকে (?) ছাপা সেই ছবিগুলোই সেদিন আমাদের মন মাতিয়ে তুলেছে। আজকের দিনের মতো রঙচঙের হৈচৈ ছাড়াই। আসলে মনের কল্পনাকে স্বাভাবিক বাতাস আর সুতোর টানে আকাশে ওড়াতে ঘুড়ির মতো সামান্য যেটুকু ধরতাই দরকার তাই যুগিয়েছে সেই সরলা পাঠ্য কেতাবের ছবি। লেখায় এবং রেখায় মনের স্বতঃস্ফূর্তিকেই উসকে দিয়েছে সেদিন। ছাপা অক্ষর সেদিন থেকেই আমাদের বিশ্বাস আর অন্তরঙ্গ নির্ভরতা অর্জন করেছে। সেদিনের সেই ম্যাক্সি সাইজের বোল্ড অক্ষরের স্বর আর ব্যঞ্জনবাহিনী উত্তর-কালে কলেবর কমিয়ে ছোট হয়েছে কিন্তু তার মুখের আদল একটুও বদলায়নি। ফ্রেণ্ড ফিল-জফার অ্যাণ্ড গাইড এই বর্ণমালা আমাদের যেন হাত ধরে নিয়ে গেছে জ্ঞানের আর অভিজ্ঞতার জগতে। আমাদের শিক্ষার আদিপর্ব এইরকমই ছিল। সেই একান্নবর্তী পরিবারে অভিভাবক খুব মুষ্টিমেয় ছিলেন না। সকলেই শাসনে অনুশাসনে আমাদের পদে পদে বেঁধে রাখলেও তাঁরা কিছু গায়ে গায়ে থাকতেন না। একটা দূরত্ব ছিলই। অলিগলির মতো আলো-হাওয়া বয়ে যাওয়ার পরিখা বা পরিসর থাকত। যারা সময়ের দিক থেকে এই ফাঁকটুকুর সেতু বন্ধন করে চলেছিল তারা ছাপা অক্ষরের বই, তবে পাঠ্য বই নয়। অপাঠ্যও নয় অবশ্যই। বলা ভাল বিশেষ রকমে পাঠ্য, দ্রুত এবং নিঃশব্দ পাঠ্য কেতাব। যেগুলো আমরা গোগ্রাসে গিলতাম এবং কখন কখন গুরুজনের চোখের আড়ালে গোপনে। আণ্ডার গ্রাউণ্ডে চলে যাওয়া, কামুফ্লেজের ভেকধারী সেই সব বইগুলো গৃহ-বিধানে সে-বয়সে আমাদের পক্ষে কুপথ্য বলে গণ্য হবার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। কারণ অধ্যয়ন-রূপী তপশ্চর্যার মাঝখানে 'নাটক নবেল গপ্পো' নিষিদ্ধ। ফলে পাঠ্য বইয়ের মলাট চাপিয়ে অনেক সময় পড়ার টেবিলেই খরগোশের মতো কান দুটো সজাগ রেখে রুদ্ধনিঃশ্বাসে দৃষ্টিভোজন চলত। কখন চিলেকোঠার ঘরে নিজেরাই নাগালের বাইরে চলে যেতাম।

সেযুগে বই ছিল আমাদের কাছে দুষ্প্রাপ্য বস্তু। কারণ গল্পের বইয়ের, ছোটদের রকমারি বইয়ের তখন এত ছড়াছড়ি ছিল না। অভিভাবকরাও ছিলেন বইকুণ্ঠ, আজকের মা-বাবা-কাকার মতো দরাজহস্ত ছিলেন না। ফলে আমাদের—যাদের ছিল বই পড়ার নেশা, তাদের ছাগলের দশা হয়েছিল। বাছ-বিচার ছিল না। মুখের সামনে যা পেতাম তাই চিবিয়ে যেতাম। তৎকালীন জ্ঞানবুদ্ধিতে হয়তো তার সবটা হজমও হত না। বঙ্কিমবাবু-শরৎবাবুর উপন্যাস থেকে

শুরু করে কিশোরপাঠ্য অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী কিছুই বাদ যায়নি। কিন্তু এখন ভেবে অবাক হই, গুরুপাক লঘুপাক যাই হোক না কেন সেই বইগুলো আমাদের চরিত্র নষ্ট করেনি। লেখা-পড়ায় কিছুটা ক্ষতি ঘটিয়েছে বটে কিন্তু উচ্ছন্নে ঠেলে দেয়নি বরং অন্যভাবে আমাদের পুষ্ট করেছে, পুবিয়ে দিয়েছে, পরিণত করে তুলেছে। কিছুটা পাকিয়েছে হয়তো, কিন্তু সেই অকাল-পক্কতা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দরকচা মেরে যায়নি, সাবালক মনের সঙ্গে মানিয়ে গেছে। আমাদের ছেলেবেলায় বাইরের জগতের সঙ্গে বহির্বাণিজ্য হয়েছিল এই গল্পের বই মারফত। আর তাতে আমরা আখেরে লাভবানই হয়েছিলাম।

পাশাপাশি তুলনা করলে আজকের দিনের চালচিত্র আলাদা। শিশু এবং কিশোর সাহিত্যে আপতবিচারে এখন আমরা স্বয়ংভর হয়েছি। প্রতিবছর ছোটদের জন্যে রাশিরাশি বই বেরোচ্ছে। রকমারি চরিত্রের বই। রঙ-বেরঙের পত্রপত্রিকা। কত বেরোচ্ছে আবার বন্ধও হয়ে যাচ্ছে। মোট কথা পাঠ্য বইয়ের বাইরে গল্পের বইয়ের এমন একটা খোলা বাজার তৈরি হয়ে গেছে, যেখানে ট্যাকশেসন্ নেই, নিষেধের গণ্ডী টানা নেই, হুমড়ি খেয়ে পড়ার মধ্যে উদ্বেগ-উত্তেজনা নেই। অনায়াসে হাত বাড়ালেই বই পাওয়া যায় এখন।

শুধু হাত বাড়ানোর ইচ্ছেটাই মরে আসছে ধীরে ধীরে। এই বইকুণ্ঠাকে বইরাগ্য (বৈরাগ্য) বলে ঠাট্টা করছিলেন একজন। আসল ব্যাধিটা বোধ হয় অন্যত্র। আমাদের নাগরিক জীবনে যেমন পায়ে হাঁটার চল ক্রমে উঠে যাচ্ছে, তেমনি অক্ষরে-অক্ষরে চোখ ফেলে চোখে হাঁটার ক্লেশ নিবারণের চেষ্টাও চলেছে। রাশি রাশি কমিকস্ বেরোচ্ছে এই জন্যে। আগে গল্পের অনুচিত্রণ বা ইলাসট্রেশন হত। গল্প-কাহিনীকে আরও স্বাদু এবং প্রত্যক্ষ করে তোলার জন্যে এই নির্বাচিত ছবির সংযুক্তি। কিন্তু এখন ব্যাপারটা উলটো। গল্প এখন আর কাউকে পড়তে হয় না, ছবি নিজেই গল্প বলে দেয়। শুধু তার সঙ্গে দু-চারটি কথা, না ঠিক কথাও নয় সংলাপ, ফুট-নোটের মতো জুড়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ বর্ণনা ব্যাপারটাকে কাহিনী থেকে তুলে দেওয়ার পরোক্ষ প্রচেষ্টা। সেই সঙ্গে যেন ছবির নির্বাক যুগে ফিরে যাবার চেষ্টা। যা ছিল এতকাল অলংকরণ, ছোটদের এই ধরনের বইতে তাই হয়ে উঠল অবলম্বন। ছবির সাহায্যে লেখাপড়া শেখানো থেকে শুরু করে এই গল্প বলার ব্যাপারটা ছোটদের কল্পনা, প্রবণতাকে যে অনেকখানি খেয়ে দিচ্ছে এমনই মনে হয়। আমাদের সবচেয়ে বড় পাকস্থলীটা যে মস্তিষ্কে তাতে সন্দেহ নেই। এবং এই পরিপাককর্মের শুরুতে এবং শেষে আরও দুটি বাড়তি কাজ হয় সেখানে। চর্বণ এবং রসায়ন দুটোই। তাই মগজ বা মন তার যাবতীয় খাদ্যবস্তুকে গ্রহণ করে, তাকে গুঁড়িয়ে গলিয়ে মিশিয়ে পুষ্টিসাধক রসে এবং রক্তে পরিণত করে দেয়। এই সমস্ত ব্যাপারটাই অবশ্য বিমূর্ত বা মানসিক। আক্ষরিক বা শারীরিক অর্থে রস-রক্ত নয়।

চিত্রকাহিনী বা এই কমিকস্‌গুলি শিশুদের সেই বৃহৎ পাকস্থলীটিকে রিলিফ বা বিশ্রাম দেবার নামে ক্রমশ অকেজো করে দিতে থাকে। তাকে স্মার্ট অর্থাৎ দ্রুতগামী করে তুলতে গিয়ে তার নিজস্ব চলচ্ছক্তিকে ক্রমশ পঙ্গু করে তোলে। শিক্ষাবিদ্ এবং মনোবিজ্ঞানী কি বলবেন জানি না, তবে ব্যক্তিগতভাবে এই আমার আশঙ্কা, এই আমার বিশ্বাস। চিরকালীন প্রথায় আমরা যদি খাদ্য গ্রহণ না করে প্রয়োজনীয় ক্যালরি পরিমাণ ভিটামিন মিনারেল ইত্যাদি আমরা ক্যাপস্থলে,

ট্যাবলেটে আর ইন্‌জেক্‌শনে আজীবন গ্রহণ করে যেতাম তাহলে পরিণতিটা যেমন হত অনেকটা সেইরকম আরকি।

ফলে পরিপাক ও রসাস্বাদন ক্ষমতা কমে যাচ্ছে শিশু বয়স থেকেই। সেই সঙ্গে দ্রুতপঠনের ক্ষমতাও। আখ চিবিয়ে যে শিশু আখের রস গ্রহণের আনন্দ পেল না, ফিডিংবট্‌লের নির্যাস পান করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে লাগল, তাদের জন্য দুঃখ হয়।

এত কথা বললাম এই কারণে যে, সাহিত্য আমদের চরিত্রগঠনের অন্যতম উপকরণ। সস্তা মনোরঞ্জনী পণ্য নয়, অলস বিলাসের সামগ্রী নয়। শিশুসাহিত্য বিশেষ করে। চরিত্র ও জীবন গঠনের আদিপর্বে তার গুরুত্ব অসাধারণ। তাকে খেলনা কিংবা ফেলনা কিছু ভাবলে এবং পাঠক হিসেবে ছোটদের ছোট ভাবলে অসংশোধ্য ভ্রান্তি ঘটবে।

যেহেতু ইদানীং ছোটদের বইয়ের রীতিমত বাজার আছে এবং অনেক প্রকাশকই নতুন করে ছোটদের জন্য প্রকাশনায় নেমে পড়েছেন বা নামছেন, সেহেতু ছোটদের লেখকের সংখ্যাও খুব নগণ্য নয়। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে সাহিত্য-জগতে যাঁরাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বা যাঁদেরই বই বাণিজ্যিক সাফল্য পেয়েছে তাঁরাই রাতারাতি ছোটদের লেখার দিকে সাড়ম্বরে ঝুঁকে পড়ছেন। পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেমন বাইপ্রোডাক্ট বলে একটা কথা আছে, এঁদের অনেকেরই কলমে শিশুসাহিত্য তেমনি বাইপ্রোডাক্ট। অথচ এই লেখাই তো সব চেয়ে কঠিন। শুধু ভাষার উপর দখল আর গল্প তৈরির নাটুকে কৌশল জানা থাকলেই হয় না, একটা বিশেষ মন চাই। ছোটদের জন্যে লেখা আর ছোটদের মতো করে লেখা এই দুটো ব্যাপার এক নয়। ছোটদের ফাঁকি দেওয়া শক্ত, মন পাওয়া কঠিন, তবে তাদের নষ্ট করা সহজ। শিশু খাদ্যে এবং সাহিত্যে ভেজাল দেওয়া সমান অপরাধ বলেই মনে করি।

আমাদের ছেলেবেলায় চিরকালীন সাহিত্য বা বিভিন্ন ভাষার ক্লাসিকগুলোর শিশু বা কিশোর সংস্করণের পাশাপাশি, জীবনী বা ঐতিহাসিক কাহিনীর গায়ে গায়ে অন্য ধরনের বইও চালু ছিল। ভূতপ্রেত রহস্য রোমাঞ্চ অ্যাডভেঞ্চার কি গোয়েন্দা কাহিনীর রমরমা যে একেবারে ছিল না তা নয়। এগুলোকে প্রকৃত অর্থে নিশ্চয় সাহিত্যও বলা যেত না, কিন্তু নাটক নভেলের সমান লেবেল যুক্ত হয়ে কোন কোন ঘরে সেগুলো সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। অনেক অভিভাবকের কেমন ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, ওই সব খুনজখম ডাকাতির কাহিনী আর উদ্ভট কল্পনাবিলাস ছোটদের অধ্যয়নস্পৃহাকে নষ্ট করে দিবাস্বপ্ন বা খোয়াব দেখতে সাহায্য করবে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা সেরকম কখনই ঘটেনি। গল্পের সম্মোহনে দিন কয়েক আবিষ্ট হয়ে থাকলেও এবং ছাপা অক্ষরের বিবরণকে নির্ভেজাল সত্য জ্ঞান করলেও আমাদের আদতে কোন ক্ষতি ঘটে যায়নি।

যায়নি যে তার একটা বড় কারণ তখনকার ছোটদের জন্যে লেখাগুলোর বিষয় যাই হোক সেই রচনার মধ্যে সকলেই একটা আদর্শকে নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলতেন। প্রথম কথা লেখাগুলো ছিল আন্তরিক এবং ছোটদের প্রতি ভালবাসা থেকেই জাত। নিজের ঘরের ছেলেটিকে পাঠক কল্পনা করেই অনেক লেখক সে সময় কলম ধরতেন। গল্পবস্তু যাই হোক, তার ভেতর দিয়ে মন্দের ভেতর থেকে ভালটুকুকে স্পষ্ট করে চেনাবার সঙ্গে সঙ্গে বালক ও কিশোর মনকে উদ্দীপ্ত করে তুলতেন সৎ ও সাহসিক কর্মের দিকে। বাঙালীসুলভ হীনমন্যতা দূর করে তাদের ভেতর আত্মসম্মানবোধ ও আত্মবিশ্বাস

জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে যেতেন সাধ্যমত। সেটা ছিল স্বাধীনতাপূর্ব পরাধীনতার যুগ। তাই একটা আদর্শ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কাহিনীর মধ্যে উপস্থিত থাকতই। ফলে নিজের দেশকে ভালবাসা এবং দশের কল্যাণ করার ইচ্ছে আমাদের ভিতরে কখন যে কীভাবে সংক্রামিত হয়ে গেছে বলতে পারব না।

কিন্তু শিশু বা কিশোর সাহিত্য দিয়ে শুরু হলেও চরিত্রগঠনে এবং নিয়ন্ত্রণে সাহিত্য মাত্রেরই যে একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল এবং আছে তা শুধু অনুমানসাপেক্ষ নয়, বহুবার বহুভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। বয়স্ক পাঠক-পাঠিকার ক্ষেত্রেও চরিত্র সংশোধনের প্রেরণা যুগিয়েছে সৎ সাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্র নবীন লেখকের প্রতি নিবেদনে একটা মোক্ষম শর্ত এই দিয়েছিলেন যে, যদি কেউ মনে করেন লিখে তিনি দেশের এবং দশের কল্যাণ সাধন করতে পারবেন, তবেই যেন তিনি লেখেন। আসল কথা তাই, নিজে উদ্বুদ্ধ হলে তবেই অন্যকে উদ্বুদ্ধ করা যায়। নিজে ধর্মাচরণ করে তবেই অপরকে শেখানো যায়। ধর্মে এবং জীবনে নীতিশিক্ষার প্রয়োজন আছে। আমাদের সমস্যায় সঙ্কটে পতনে প্রলোভনে, আমাদের পথভ্রষ্ট কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় সাহিত্যের দৃষ্টান্ত এবং পরামর্শ অনেক সময়েই পরিত্রাণ লাভের উপায় হয়ে ওঠে। জীবনের সবক্ষেত্রেই ধর্মবুদ্ধির জরুরী প্রয়োজন আছে। আমাদের বিবিধ আচার-আচরণ এবং তজ্জনিত কর্মফলকে ফলিতরূপে দেখতে পেলে আমাদের চোখ ফোটে, আমাদের কর্মকাণ্ডজ্ঞান এবং প্রকৃষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ হয়। রামায়ণ-মহাভারতের চরিত্রগুলি তাঁদের জীবন-সন্ধির উপসংহার দিয়ে, তাঁদের দুর্মর বিশ্বাস, অসামান্য আত্মত্যাগ, বিচিত্র জীবনদর্শন দিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে গিয়েছেন। লক্ষ লক্ষ ব্যর্থপ্রায় মানুষ জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। পেয়েছে আরোগ্য লাভের উপায়, রক্তাক্ত হৃদয়ের নিবিড় শুশ্রূষা এবং দিব্যজ্ঞান। গীতার শ্লোকগুলি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সঞ্জীবনী মন্ত্রের মতো কাজ করেছে। রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র কেবল সাহিত্যের রস যুগিয়ে যাননি। জীবনযুদ্ধের রসদ এবং দুর্লভ পাথেয় যুগিয়ে আসছেন অদ্যাবধি। কথামৃতের অন্তরদীক্ষা ও সরল সমীকরণ, বিবেকানন্দের ওজস্বী উদ্বোধন, জীবনের সুরকার রবীন্দ্রনাথে ঔপনিষদীয় নির্যাস তো সার্বজনীন প্রাপ্তি। কিন্তু বাইরেও গল্প-উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ পাঠক যে অভিভূত অনুপ্রাণিত এবং প্রভাবিত হয়েছেন তার নজির আছে। শরৎচন্দ্রের পথের দাবী, বঙ্কিমের আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরানী, সীতারাম ইত্যাদি উপন্যাস বহু বিপ্লবীকে যে অভাবিত শক্তি যুগিয়েছে সে-কথা কালক্রমে জানা গেছে।

জীবনদায়িনী তথা প্রেরণাদাত্রী হিসেবে সাহিত্যের ভূমিকা বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের পরেও এক প্রজন্মব্যাপী অন্য লেখকদের হাতে চলমান ছিল। তারপর দিনকাল বদলে গেল, সাহিত্যের পালা বদল হয়ে গেল দেখতে দেখতে। চতুর্দিকে অবক্ষয় আর হতাশা, খুনজখমের রাজনীতি আর চরিত্রহনন। জীবনে নেমে এসেছে নিরাপত্তাহীন অনিশ্চয়তা, আর্থিক নিম্নচাপ এবং মূল্যবোধের বিকৃতি। ফলে অসুস্থ মানসিকতার অন্ধকার গ্রাস করে নিচ্ছে মানুষের যাবতীয় শুভবুদ্ধিকে।

এ অবস্থায় স্বভাবতই সাহিত্য তার চারিত্রিক ঐতিহ্য থেকে স্খলিত হয়ে পড়েছে এবং পড়ছে। মুনাফাই এখন তার মোক্ষ, তাই মনোরঞ্জনের দ্রুততম এবং সহজতম পথটিই খুঁজে নিতে চেষ্টা করছে সাহিত্য। বেস্টসেলার হয়ে ওঠার প্রতিদ্বন্দ্বিতাই গ্রন্থবাণিজ্যের গূঢ়সূত্র। প্রকাশক

চাইছেন, লেখকও চাইছেন, দুপক্ষই এই লক্ষ্যভেদের নিশানায় একাগ্র একচক্ষু হয়ে রয়েছেন। দেহ-মনের সস্তা আনন্দ, আরাম এবং উত্তেজনা ঠিকমতো পাক করে পরিবেশন করতে পারলে যে হট কেকের মতো বিক্রি হয়, হাতে-কলমে এ অভিজ্ঞতা সাহিত্যবণিকদের ইতিমধ্যেই হয়েছে। সর্বাধিক বিক্রীত হতে গেলে যে সর্বাধিক বিকৃত হবারও সমূহ সম্ভাবনা সেকথা বোধ হয় খেয়াল থাকে না। কেবলই অর্থের জন্য এই অর্থহীন সাহিত্যকণ্ডূয়ন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

অনেক লেখকেরই কৈফিয়ৎ তৈরি। সমাজে এবং জীবনে যা ঘটছে একজন নিষ্ঠাবান সাংবাদিকের মতো তার সত্য চিত্র তিনি নাকি তুলে ধরতে বাধ্য। বাস্তবিকতাবর্জিত রোমান্সে বুঁদ হয়ে থাকার দিন চলে গেছে। চলে গেছে স্বপ্ন দেখার দিন। এই গন্ধময় জীবনে উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে থাকলে কি প্রলয় বন্ধ থাকবে? থাকবে না। তাই রক্ষণশীলতার গোঁড়ামি ছেড়ে ভালমন্দ সব কিছুকেই সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। সাহিত্য যেহেতু জীবন তথা সমাজের দর্পণ সেহেতু শ্লীল-অশ্লীল নির্বিশেষে বাস্তবে যা ঘটছে তাই তুলে ধরতে তাঁরা বাধ্য।

আপাতবিচারে যুক্তিটা উড়িয়ে দেবার মতো মনে হয় না। সাহিত্য দর্পণ ঠিকই, তবে হুবহু প্রতিবিম্বনই দর্পণের একমাত্র কাজ নয়। অন্তত যাকে বলি ফটোগ্রাফিক ট্রুথ তা প্রকাশ করেই তার দায়িত্ব ফুরিয়ে যায় না। আয়না হচ্ছে ক্রিটিসীজম অফ্ লাইফ—জীবন সমালোচনা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা নিজের মুখশ্রীর তারিফ খুঁজি হয়তো, কিন্তু আয়না স্তাবকতা করে না, আমাদের ভুলত্রুটি অসঙ্গতি ধরিয়ে দেয়, শুদ্ধি সংশোধনের সুযোগ দেয়।

সাহিত্যও তাই করে। আমাদের অন্যায় এবং পাপবোধকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। স্খলন-পতনের সম্ভাবনার চিহ্নগুলো দেখিয়ে দেয়। যেমন করে বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল কিংবা শরৎচন্দ্রের একাধিক উপন্যাস আমাদের অভিজ্ঞতা চিনিয়েছে। সেই সঙ্গে জীবনদর্শন, জীবনের আদর্শ আমাদের সামনে মেলে ধরে পথের নির্দেশ দেয়।

সাহিত্য তাই জীবনকে অনুসরণ না করে ভগীরথের মতো তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে নতুন দিগন্তের দিকে, নতুন জীবনের দিকে। এই অবক্ষয়, হতাশা এবং বিনষ্টির যুগে সাহিত্য নতুন বোধ ও বিশ্বাসের ছোঁয়া এনে দেবে, আমাদের চরিত্রকে এক নিয়ন্ত্রিত রূপ দেবে।

সৎ এবং কু সকল প্রকার ভাব উপলব্ধি করিলেও, মানুষ তাহার অন্তরের আদর্শবিশেষকে প্রকাশ করিতে সর্বদা সচেষ্ট রহিয়াছেন। আদর্শবিশেষের উপলব্ধি ও প্রকাশ লইয়াই মানবদিগের ভিতর যত তারতম্য বর্তমান। দেখা যায়, সাধারণ মানব রূপরসাদি ভোগসকলকে নিত্য ও সত্য ভাবিয়া তল্লাভকেই সর্বদা জীবনোদ্দেশ্য করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে,—They idealise what is apparently real. পশুদিগের সহিত তাহাদিগের স্বল্পই প্রভেদ। তাহাদিগের দ্বারা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসৃষ্টি কখনই হইতে পারে না। আর এক শ্রেণীর মানব আছে, যাহারা আপাত-নিত্য ভোগসুখাদিলাভে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া উচ্চ উচ্চতর আদর্শসকল অন্তরে অনুভব করিয়া বহিঃস্থ সকল বিষয় সেই ছাঁচে গড়িবার চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে,—They want to realise the ideal.—ঐরূপ মানবই যথার্থ সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

'দেবীমাহাত্ম্য'-তত্ত্ব ও উপাখ্যান

স্বামী প্রমেয়ানন্দ

বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী—অভিজ্ঞ লেখক।

হিন্দুদের নিত্য-আবৃত্ত অসংখ্য শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে 'দেবীমাহাত্ম্য' অন্যতম, গীতা যেরূপ মহাভারতের একটি অংশ 'দেবীমাহাত্ম্য'ও সেরূপ মহর্ষি বেদব্যাস রচিত মার্কণ্ডেয় পুরাণের একটি অংশ। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১ থেকে ৯৩—এই তেরটি অধ্যায় নিয়ে 'দেবীমাহাত্ম্য'। এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থখানিতে যে দেবী মহামায়ার লীলামাহাত্ম্য বর্ণিত ও কীর্তিত হয়েছে 'দেবীমাহাত্ম্য' নামেই তার ইঙ্গিত রয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের 'দেবী-মাহাত্ম্য' অংশের মন্ত্রসংখ্যা সাতশত। তাই গ্রন্থখানিকে 'সপ্তশতী'ও বলা হয়। তবে 'চণ্ডী'-ই গ্রন্থখানির সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং সুপ্রচলিত নাম। 'চণ্ডী' নামে প্রসিদ্ধ এই গ্রন্থখানি শক্তিসাধকদের অত্যন্ত প্রিয় এবং অবশ্য-পাঠ্য। এই পুণ্যগ্রন্থের আরাধ্যা দেবী চণ্ডী। তাই 'চণ্ডী' বলতে গ্রন্থ বিশেষ এবং দেবী উভয়কেই বোঝায়।

ভগবানকে মাতৃভাবে আরাধনা হিন্দুধর্মের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এই আরাধনার বিরাম-হীন ধারা চলে আসছে বৈদিক যুগ থেকে। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বেদ এবং তন্ত্র এই দুইকে নিয়েই ভারতীয় সংস্কৃতি। পর-ব্রহ্মের বৈদিকী আরাধনার সঙ্গে পরাশক্তির তান্ত্রিকী আরাধনার ধারাও সমান্তরালভাবে বয়ে আসছে পুণ্যভূমি এই ভারতবর্ষে। শক্তি-সাধনার অপ্রতিহত এই ধারা বৈদিকযুগ থেকে প্রবাহিত হয়ে বিবর্তিত আকারে ক্রমে পৌরাণিক এবং তৎপরবর্তী যুগে আরও বিস্তার লাভ করে এবং ব্যাপকভাবে সাধনার অবলম্বনরূপে অগণিত পাঠককে পরাশক্তি মহামায়ার আরাধনায় উদ্বোধিত করে এবং আজও করে আসছে। ভগবানকে মাতৃভাবে আরাধনা করে বহু সাধক যে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন, শক্তি-সাধনার ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। স্থান কাল ও পাত্রভেদে সাধকের সাধনার বৈচিত্র্যে মহাশক্তি প্রকটিতা হয়েছেন বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন-রূপে। বৈদিক যুগের ঋষিকন্যা ব্রহ্মবিদুষী বাক্ থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী যুগসমূহের বিভিন্ন শক্তিসাধকদের জীবন-ইতিহাসই এই ধারার বিরামহীনতা এবং গতিশীলতা প্রমাণ করে। সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, বামাক্ষেপা, শ্রীরাম-কৃষ্ণ প্রমুখ মাতৃসাধকদের জীবনে মাতৃশক্তির সঙ্গে সাধকের একাত্মতা এবং শক্তিরূপিণী মহামায়ার চৈতন্যময় ও আনন্দময় সত্তায় সাধকের আত্মলয়ের বিস্ময়কর সাধন-ইতিহাস আজও শক্তিসাধককে সমানভাবে আকর্ষণ করে, অনুপ্রাণিত করে সাধন-পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য।

বেদ-উপনিষদে অভিহিত পরব্রহ্ম এবং তন্ত্রের পরাশক্তি স্বরূপতঃ অভেদ, যেন একই টাকার এপিঠ-ওপিঠ। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়: "ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি যেমন পৃথক্ নয়, তেমনি।"[১] শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাস-গুরু শ্রীমৎ তোতাপুরীর নিকট পরাশক্তি জগন্মাতার অস্তিত্ব ছিল অলীক। কিন্তু শ্রীরাম-কৃষ্ণের সাহচর্যে শ্রীমৎ তোতা কালে বুঝতে পেরেছিলেন যে, একভাবে মহামায়া যিনি তুরীয়া-নির্গুণা, অপরদিকে তিনিই সাধকের প্রতি অনুগ্রহ-

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, গুরুভাব—পূর্বার্ধ, (১৩৭৭), পৃঃ ২৬৩

বশতঃ নানামূর্তিতে বিভাসিতা। অনুভব করতে পেরেছিলেন: "এতদিন যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া তোতা প্রাণের ভক্তি-ভালবাসা দিয়া আসিয়াছেন, সেই মা! শিব-শক্তি একাধারে হর-গৌরী মূর্তিতে অবস্থিত। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ।"[২] সে এক বিচিত্র ইতিহাস, আলোচনার স্থানও স্বতন্ত্র।

রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধির উপাখ্যান দিয়ে চণ্ডীর অবতারণা। রাজা সুরথ রাজোচিত সর্বগুণসম্পন্ন আদর্শ নৃপতি। কিন্তু একদা প্রবল বহিঃশত্রু দ্বারা তাঁর রাজ্য আক্রান্ত হলে দুর্ভাগ্য-বশতঃ যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। ফলে স্বাভাবিক-ভাবেই রাজা কিছুটা হীনবল হয়ে পড়লেন। তাঁর এই হীনবলতার সুযোগ নিয়ে নিজ মন্ত্রী এবং অমাত্যগণ তাঁকে প্রতারিত করল। বঞ্চিত করল রাজসুখ উপভোগে। অতি আপনার জন বলে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে এতদিন যাদের তিনি প্রতিপালন করে আসছিলেন তাদের নিকটই হলেন তিনি প্রতারিত ও লাঞ্ছিত। আত্মজন কর্তৃক এভাবে লাঞ্ছিত এবং রাজসুখ থেকে বঞ্চিত রাজা একদিন মৃগয়া ছলে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে আশ্রয় নিলেন গভীর বনে, মেধস্ ঋষির আশ্রমে। সংসার-কোলাহল থেকে দূরে নির্জন আশ্রমের শান্ত পরিবেশ রাজাকে মুগ্ধ করল। কিন্তু মুগ্ধ হলে কি হবে। আসক্তির বন্ধন থেকে কিছুতেই মুক্ত হতে পারছেন না। স্বজন-মোহ তাঁকে পিছন থেকে টানছে। তাদের প্রতি তাঁর বিনিদ্র উৎকণ্ঠার শেষ নেই। হৃতগৌরব, ফেলে আসা পরিজন, ধনরত্ন ও রাজসুখ উপভোগের স্মৃতি তাঁর মনকে অহরহ পীড়া দিচ্ছে। মনের এই অস্থিরতা নিয়ে যখন তিনি আশ্রমে ইতস্ততঃ ঘোরাঘুরি করছিলেন তখন সাক্ষাৎ হল স্ত্রীপুত্রাদি কর্তৃক ধনৈশ্বর্যাদি থেকে বঞ্চিত ও পরিত্যক্ত বৈশ্য সমাধির সঙ্গে। অদৃষ্টের পরিহাস! যেসব মানুষ তাঁদের এই দুর্গতির মূলে তাদেরই মঙ্গলচিন্তায় রাজা ও বৈশ্য উভয়েই আজ শোকক্লিষ্ট! পরস্পর ভাব বিনিময়ের পর অকৃতজ্ঞতার বলি রাজা এবং বৈশ্য উপস্থিত হলেন মেধস্ মুনির সম্মুখে, জানতে চাইলেন তাঁদের এই দুর্দশার কারণ। রাজা বললেন: "হে মুনিবর, আমার চিত্ত আমার বশীভূত নয় বলে হৃতরাজ্যাদিতে আমার মমতা এখনও আছে। আর এই মমতাই যে আমার দুঃখের কারণ তাও আমি জানি। কিন্তু তা জানা সত্ত্বেও হৃতরাজ্যের প্রতি আমার যে এই মমতা রয়েছে, তার কারণ কি? দেখুন, এই বৈশ্যও স্ত্রীপুত্রাদি কর্তৃক বঞ্চিত, অমাত্যাদি কর্তৃক বর্জিত এবং আত্মীয়সকল কর্তৃক পরিত্যক্ত। তথাপি তাদের প্রতি তাঁর আসক্তির শেষ নেই।"[৩] উত্তরে ঋষি বললেন: তুমি যথার্থই বলেছ। "মানবগণ প্রত্যুপকারের লোভে পুত্রাদির প্রতি অনুরক্ত হয়, সংসারের স্থিতিকারিণী মহামায়ার প্রভাবে জীবগণ মোহগর্তে এবং মমতারূপ আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়—ইহা সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। এই মহা-মায়াই জগৎপতি বিষ্ণুর যোগনিদ্রা। এই শক্তি জগতের সকল জীবকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। কাজেই এ বিষয়ে বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নেই। বিবেকীদের কী কথা? দেবী ভগবতী মহামায়া বিবেকিগণেরও চিত্তসমূহ বলপূর্বক আকর্ষণ করে মোহাবৃত করেন। সেই মহামায়া এই সমগ্র চরাচর জগৎ সৃষ্টি করেন। আবার প্রসন্ন হলে তিনিই মানুষকে মুক্তিলাভের জন্য অভীষ্ট বর প্রদান করেন।"[৪]

২ ঐ, পৃঃ ২৮৯
৩ শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১।৩৯—৪৩
৪ ঐ, ১।৫২—৫৮

"রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ বনে যাচ্ছেন। বনের সরু পথ, একজনের বেশী যাওয়া যায় না। রাম ধনুকহাতে আগে আগে চলছেন; সীতা তাঁর পাছু পাছু চলছেন; আর লক্ষ্মণ সীতার পাছু পাছু ধনুর্বাণ নিয়ে যাচ্ছেন। লক্ষ্মণের রামের উপর এমনি ভক্তি-ভালবাসা যে, সর্বদা মনে মনে ইচ্ছা নবঘনশ্যাম রামরূপ দেখেন; কিন্তু সীতা মাঝখানে রয়েছেন, কাজেই চলতে চলতে রামচন্দ্রকে দেখতে না পেয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। বুদ্ধিমতী সীতা তা বুঝতে পেরে, তাঁর দুঃখে কাতর হ'য়ে চলতে চলতে একবার পাশ কাটিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এই ত্থাখ।' তবে লক্ষ্মণ প্রাণভরে একবার তাঁর নিজ ইষ্টমূর্তি রাম-রূপ দেখতে পেলেন।"[৫]

রাজা সুরথের তখন জিজ্ঞাসা—"ভগবন্, আপনি যে দেবী মহামায়ার কথা বলছেন, সেই দেবী কে? তাঁর স্বরূপই বা কি, তাঁর উৎপত্তির ইতিহাস এবং কার্যই বা কি?"[৬] বিস্তারিত আমাদের জানতে ইচ্ছা হয়। উত্তরে ঋষি মেধস্ সেই মহাশক্তি মহামায়ার নানা মন্বন্তরে নানারূপে অবতরণের বিস্ময়কর কাহিনী একের পর এক বর্ণনা করতে লাগলেন।

অনন্ত শয্যায় যোগনিদ্রামগ্ন ভগবান বিষ্ণু। তাঁর কর্ণমল থেকে হঠাৎ উৎপন্ন হল ভীষণাকৃতি দুই দানব—মধু এবং কৈটভ। উদ্ভূত হয়েই তারা বিষ্ণুর নাভিকমলে সমাসীন প্রজাপতি ব্রহ্মার জীবননাশে উদ্যত হল। যোগনিদ্রার আবরণ সরিয়ে নিয়ে বিষ্ণুকে জাগরিত করবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মার কণ্ঠে তখন ধ্বনিত হল যোগনিদ্রারূপিণী মহাকালিকার স্তুতি। স্তবে তুষ্টা মহাকালিকা শরণাগত ব্রহ্মাকে রক্ষা করবার জন্য অপসারিত করলেন নিদ্রার আবরণ, জাগরিত হলেন ভগবান বিষ্ণু। কিন্তু সুদীর্ঘকাল যুদ্ধ করেও পরাস্ত করতে পারলেন না দুর্ধর্ষ দানবদ্বয় মধু-কৈটভকে। দেবী মহামায়ার মায়ায় মোহিত হয়ে অতিবলগর্বিত দানবদ্বয় তখন বিষ্ণুকে বর দিতে চাইল। বিষ্ণু বললেন: "তোমরা যদি আমার যুদ্ধে সন্তুষ্ট হয়ে থাক, তবে তোমরা দুজন এখনই আমার বধ্য হও। এটাই আমার একান্ত অভিপ্রায়। অন্য বরের এখন প্রয়োজন কি?"[৭] তাই হোক। কারণ—আপনার যুদ্ধকৌশলে আমরা প্রীত হয়েছি। তবে আমাদের বধ করতে হবে একটি শর্তে। জলহীন কোন স্থানে আমাদের মৃত্যু ঘটাতে হবে—"আবাং জহি ন যত্রোর্বী সলিলেন পরিপ্লুতা।"[৮] ভগবান বিষ্ণু তখন নিজের উরুর উপর রেখে দানবদ্বয়ের মস্তক ছেদন করলেন। মহামায়ার প্রসাদে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা দুর্ধর্ষ দানবদ্বয়ের দ্বারা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেলেন।

কালান্তরে মদমত্ত দৈত্যাধিপতি মহিষাসুরের অত্যাচারে দেবলোক আবার বিপর্যস্ত। পরাজিত ও লাঞ্ছিত দেবতারা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে মর্ত্যে বিচরণ করতে লাগলেন। ব্রহ্মার বরে দানবরাজ মহিষাসুর অমর। কাজেই দেবতারা নিরুপায়। অনন্যোপায় দেবতারা ব্রহ্মাকে সঙ্গে করে উপস্থিত হলেন গরুড়বাহন বিষ্ণুর সম্মুখে, বর্ণনা করলেন দৈত্যরাজ মহিষাসুরের অত্যাচারে তাঁদের দুঃখ-দুর্দশার করুণ কাহিনী। শুনতে শুনতে ক্রোধদীপ্ত বিষ্ণুর মুখমণ্ডল থেকে নির্গত হল সুমহৎ তেজোরাশি। তার সঙ্গে মিলিত হল লাঞ্ছনাক্ষুব্ধ দেবগণের পবিত্র দেহ থেকে নির্গত সমুজ্জল তেজঃপুঞ্জ। দিগ্ দিগন্ত পরিব্যাপ্ত

৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, গুরুভাব পূর্বার্ধ, পৃ (১৩৭১), পৃঃ ২৫৭—৫৮
৬ শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১।৫৯—৬১　　৭ ঐ, ১।৯৭—৯৮
৮ ঐ, ১।১০১

প্রজ্বলিত অনলসদৃশ সেই জ্যোতিঃ থেকে সহসা আবির্ভূতা হলেন দিব্য লাবণ্যবতী অপরূপা এক জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তি। শম্ভুর তেজে সেই দেবীমূর্তির মুখ, যমের তেজে তাঁর বাহুসমূহ উৎপন্ন হল। এভাবে বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন তেজের দ্বারা দেবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল উৎপন্ন হল। তারপর দেবতারা নিজ নিজ অস্ত্র থেকে বিভিন্ন অস্ত্রাদি উৎপন্ন করে দেবীকে উপহার দিয়ে তাঁকে রণসাজে সজ্জিত করলেন। দেবগণ কর্তৃক অলঙ্কার ও অস্ত্রশস্ত্রাদিতে বিভূষিতা মহাদেবী অট্টহাস্য সহকারে ভীষণ হুঙ্কারে দশদিক কম্পিত করে দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। এই ভীষণ যুদ্ধে অসংখ্য দানব এবং তাদের অনেক সেনাপতি দেবীকর্তৃক নিহত হল। তারপর দেবী চণ্ড-বিক্রমে যুদ্ধ করে শাণিত খড়্গের দ্বারা মহিষাসুরের শির দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন। পরাক্রান্ত আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে নির্যাতিতের সংঘবদ্ধ অভিযানের জয় ঘোষিত হল।

শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক প্রবল পরাক্রান্ত দৈত্যদ্বয়ের অত্যাচারে দেবলোক আবার বিপর্যস্ত। ইন্দ্র, সূর্য, কুবের, যম ও বরুণ প্রভৃতি প্রধান দেবতাগণ বলগর্বী অসুরদ্বয়ের দ্বারা স্ব স্ব অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং স্বর্গ থেকে বিতাড়িত। "বিপদকালে আমাকে স্মরণ করলে আমি তোমাদের সর্ববিধ বিপদ তৎক্ষণাৎ নাশ করব"[৯]—দেবী মহাশক্তির এই পূর্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণপূর্বক দানবভয়ে ভীত স্বর্গচ্যুত দেবতারা অপরাজিতরূপিণী মহামায়ার শরণাপন্ন হলেন, নিবেদন করলেন তাঁদের মহাবিপদের কাহিনী সবিস্তারে। শরণাগত দেবতাদের দুঃখ-কাতর অবস্থা দেবীকে বিচলিত করল। শত্রুনাশ করে এই মহাবিপদ থেকে দেবতাদের উদ্ধার করবার জন্য দেবী দানবদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। যুদ্ধে একে একে শুম্ভ-নিশুম্ভ দানবযুগলের পার্ষদ ধূম্রলোচন, চণ্ড-মুণ্ড এবং রক্তবীজ প্রমুখ অসুরগণকে ধ্বংস করে পরিশেষে দেবী নিহত করলেন শুম্ভ-নিশুম্ভকে; ঘোষণা করলেন তাঁর চিরন্তন প্রতিশ্রুতি, বিশ্বমানবের পরম আশ্বাস—"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি। / তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥"[১০]—এভাবে দানবদের প্রাদুর্ভাববশতঃ যখনই কোন বিঘ্ন উপস্থিত হবে তখনই আমি আবির্ভূতা হয়ে দেবশত্রু বিনাশ করব।

উপসংহারে ঋষি মেধস্ বললেন: "হে রাজন্, তিনিই (বিষ্ণুমায়াই) তোমাকে, এই বৈশ্যকে এবং অন্যান্য বিবেকাভিমানী পণ্ডিতগণকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছেন ও করবেন। হে মহারাজ, এই পরমেশ্বরীর শরণাগত হও। ভক্তিপূর্বক তাঁর আরাধনা কর। তিনি ইহলোকে অভ্যুদয় এবং পরলোকে স্বর্গসুখ ও মুক্তি প্রদান করবেন।"[১১]

মেধস্ মুনির মুখে জগন্মাতার অপূর্ব মহিমা ও লীলাকাহিনী শ্রবণ করে রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি খুব সন্তুষ্টি লাভ করলেন। মুনির উপদেশানুসারে তাঁরা মহামায়ার আরাধনার্থ নদীতীরে গমন করলেন এবং দেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণপূর্বক ভক্তিসহকারে কখন নিরাহারী, কখন বা স্বল্পাহারী থেকে সমাহিত চিত্তে পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, স্বদেহ-রক্তসিঞ্চিত বলি ইত্যাদি বিভিন্ন উপকরণে দেবীর পূজা করলেন। তিন বৎসর এভাবে আরাধনা করার ফলে তাঁরা জগদম্বা চণ্ডিকার প্রসন্নতা লাভে সক্ষম হলেন। পরিতুষ্টা দেবী প্রত্যক্ষভাবে তাঁদের সম্মুখে

৯ ঐ, ৫।৬
১০ ঐ, ১১।৫৪—৫৫
১১ ঐ, ১৩।১—৫

আবির্ভূতা হয়ে বললেন : "হে রাজন্ ও বৈশ্যকুল-নন্দন, তোমরা আমার নিকট যে বর প্রার্থনা করবে সন্তুষ্টা হয়ে আমি তোমাদিকে তাই প্রদান করব।"[১২]

সুরথ ও সমাধির মানসিক রুচি ও সংস্কারের বিভিন্নতাহেতু তাঁদের প্রার্থিত বরও হল বিভিন্ন। সংসারসুখাভিলাষী রাজা চাইলেন হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার এবং জন্মান্তরে চিরস্থায়ী রাজ্য। অপর-পক্ষে সংসার-বৈরাগ্যসম্পন্ন সমাধির প্রার্থনা সেই পরমবস্তুর, যা লাভ করলে সর্বপ্রকার দুঃখের হবে আত্যন্তিক নিবৃত্তি, সুদীর্ঘ সংসারবর্ত্মে গতায়াতের চির অবসান। শ্রীশ্রীজগন্মাতার কৃপায় সুরথ ও সমাধি—উভয়েরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল, স্ব স্ব প্রার্থিত বর লাভ করে তাঁরা কৃতার্থ হলেন।

সুরথ ও সমাধি দুটি নিছক কাল্পনিক চরিত্র মাত্র নয় বা তাঁদের প্রয়োজনও শেষ হয়ে যায়নি। তাঁরা আজও জীবিত আছেন এবং অনন্তকাল ধরে জীবিত থাকবেন। যতদিন মানুষ আসুরিক সম্পদ এবং শক্তিতে প্রমত্ত থেকে দৈবী চেতনা থেকে বিচ্যুত ও অশান্ত থাকবে; যতকাল জগতে নির্যাতন ও দলনকারী দানবশক্তি অন্তরে-বাইরে বর্তমান থাকবে, ততকাল রাজা এবং বৈশ্য চরিত্র মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে দানবশক্তির বিনাশ করে দৈবীশক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে।

চণ্ডীতে বর্ণিত দেবাসুর সংগ্রাম দৈবীশক্তির সঙ্গে আসুরিক শক্তির, নিঃশ্রেয়সের সঙ্গে অভ্যুদয়ের, আন্তঃশত্রুর সঙ্গে বহিঃশত্রুর চিরন্তন সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি।

মানুষের জীবনে নানা দ্বন্দ্ব। ধর্ম ও অধর্মের, বস্তুপরতান্ত্রিকতা ও আধ্যাত্মিকতার, ধনী ও দরিদ্র প্রভৃতির দ্বন্দ্বে মানবিক মূল্যবোধ ক্ষয়িষ্ণু ও বিপর্যস্ত। মাতৃশক্তির অবহেলা এবং অপরপক্ষে ভোগশক্তির প্রমত্ততায় সভ্যতা সংকটাপন্ন। এই যুগসংকটে মহামায়া মহাশক্তির আরাধনার প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। তাঁকে প্রসন্ন করতে পারলে, তাঁর বলে বলীয়ান হয়ে বাহ্য ও আন্তর শত্রু পরাভূত করে আমরা অভ্যুদয় ও আধ্যাত্মিক জাগরণ লাভ করতে সক্ষম হব, সন্দেহ নেই। মহামায়ার কাছে আমাদের কাতর প্রার্থনা—অরি সংহারপূর্বক বারবার তিনি যেমন দেবতাদের রক্ষা করেছেন ও করছেন, আমাদেরও সেরূপ রক্ষা করুন। আসুরিক শক্তির বিনাশ করে দৈবীসত্তায় আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করুন। দেবতাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরাও প্রার্থনা করি : "হে সর্বকার্য ও কারণ-রূপিণি, সর্বেশ্বরি, শক্তিময়ী দুর্জ্ঞেয়া দেবি, আপনি আমাদিকে সকলপ্রকার আপদ থেকে, সর্বপ্রকার ভয় থেকে রক্ষা করুন। আপনাকে নমস্কার।"[১৩]

১২ ঐ, ১৩।১৪—১৫
১৩ ঐ, ১১।২৪

বহুরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী ভূতেশানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ। কল্পতরু উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ২ জানুআরি, ১৯৮৪-র ধর্মসভায় প্রদত্ত ভাষণ থেকে গৃহীত।

ঠাকুরের কথাগুলি চিরপুরাতন অথচ চির-নূতন। পুরাণ শব্দটির একটি অর্থ করা হয়—'পুরাপি নব এব'। প্রাচীন হয়েও নূতন। তত্ত্বগুলি প্রাচীন কিন্তু আমরা যখনই শুনি, চর্চা করি, আমাদের কাছে যেন নূতন রূপে প্রতিভাত হয়। তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের মাধুর্য এত প্রগাঢ় যে, সেই মাধুর্যকে যখনই আস্বাদন করা যায় তখনই যেন নূতন মনে হয়। সেই পুরাণ পুরুষ বহুবার বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। ইদানীংকালে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে তাঁর যে-প্রকাশ, তারই আলোচনা এখন দেশে দেশে চলছে। আমরা যেন তার ভিতর থেকে একটা নূতন আলোর সন্ধান পাচ্ছি, দীর্ঘ বিস্মৃতির অন্ধকার ভেদ করে যে-আলোক নূতন চেতনা সঞ্চার করে আমাদের জাগ্রত করছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন আমাদের জন্য। আমরা যারা মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন, যারা স্বভাবতই স্বীয় স্বরূপকে ভুলে থাকি, ভুলে থাকি জীবনের লক্ষ্য কি এবং সেই লক্ষ্যপ্রাপ্তির উপায়ই বা কি। শ্রীরামকৃষ্ণ যে-তত্ত্বকথা বলেছেন, তা নূতন নয়, বহুশাস্ত্রে বহুবার বলা হয়েছে—কিন্তু বারংবার পড়লেও সে-শাস্ত্র ঠিক এমনভাবে আমাদের বোধগম্য হত না, অন্তরকেও এত আকৃষ্ট করত না। অবতারের বৈশিষ্ট্য এখানেই।

ভাগবতে আছে—একবার ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করবার জন্যে তাঁর সহচর রাখাল বালকদের এবং গোবৎসগুলিকে হরণ করে নিয়ে গেলেন। তিনি দেখতে চান যে, ভগবান এখন কি করেন। ভগবান প্রথমে আত্মবিস্মৃত ছিলেন। তাই চিন্তিত হলেন, ধেনুসহ সখারা গেল কোথায়? তারপর দিব্যদৃষ্টিতে সব দেখলেন। তিনি মনে মনে একটু হেসে রাখাল বালক এবং গোবৎসগুলি যেমন ছিল ঠিক সেইরকম করে আবার তৈরি করলেন। তারপর গোষ্ঠ থেকে ফিরে রাখালবালকেরা নিজেদের বাড়িতে চলে গেল এবং বাছুরগুলিও যে-যার মায়ের কাছে ফিরে গেল। এইরকম দিনের পর দিন চলছে। তাদের ব্যবহারে কোথাও কোন ব্যতিক্রম দেখা গেল না, কেবল দেখা গেল যে, বৎসদের জন্যে গাভীরা আরও বেশি ব্যাকুল এবং গোপবালকদের প্রতিও তাদের মায়েদের স্নেহ আরও বেশি। অন্য কারো নজরে না পড়লেও বলরাম কিন্তু এই পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখলেন যে, এই রাখাল ছেলেগুলি সাধারণ রাখাল নয় এবং এই বাছুরগুলিও সাধারণ বাছুর নয়, এরা সব শ্রীকৃষ্ণেরই এক-এক রূপ। আত্মার প্রতি সর্বজীবের পরম আকর্ষণ। তিনিই এদের রূপ নিয়েছেন বলে তাদের প্রতি গোমাতা এবং গোপীদের আকর্ষণ শতগুণে বেড়ে গিয়েছে। এই যে স্নেহের বৃদ্ধি, শ্রদ্ধার বৃদ্ধি, একটা চেতনার নবজাগরণ—এটাই হল ভগবানের আবির্ভাবের বৈশিষ্ট্য। তিনি যখন আসেন মানুষ নিজেকে, তার পারিপার্শ্বিককে একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে শেখে। এই দৃষ্টিই হল তাদের নব চৈতন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোচনায় আমরা দেখেছি, জন্মাবধি তাঁর প্রতি আবালবৃদ্ধবণিতার একটা অপূর্ব আকর্ষণ। এই আকর্ষণ সকলকে তাঁর দিকে টানছে। কৃষ্ণ শব্দের অর্থ কর্ষণ বা আকর্ষণ

করেন যিনি। শ্রীরামকৃষ্ণও ঠিক সেইরকম। মানুষ সবচেয়ে বোঝে এই আকর্ষণকে। বুদ্ধি দিয়ে যা বোঝা যায় না, শাস্ত্র পড়ে যার সন্ধান পাওয়া যায় না, এমন কি সদাচারপরায়ণ হয়েও যে তত্ত্বের উপলব্ধি হয় না, সেই তত্ত্বটি হল ভগবানের বস্তুমাহাত্ম্য। তিনি যখন আবির্ভূত হন তখন সকলে তাঁর প্রতি এইরকম একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ করে। আমাদের সীমিত বুদ্ধি দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে দেখব তাঁর পরিপূর্ণ স্বরূপকে বোঝা বুদ্ধির দ্বারা সম্ভব নয়, কিন্তু এই আকর্ষণটুকু সকলেই বুঝতে পারে। যেখানে তাঁর কথা হচ্ছে সে-স্থানটি যে আমাদের টেনে আনছে, সে ঐ আকর্ষণের বলে। তাঁর নাম পর্যন্ত শোনেনি অথচ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, অভিজাত-অনভিজাত নির্বিশেষে এই আকর্ষণটি চারিদিকে প্রসারিত হচ্ছে। স্বামীজী যেমন বলেছেন, 'আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেম প্রবাহঃ'—যাঁর প্রেমের প্রবাহ চণ্ডাল পর্যন্ত সকলের প্রতি অপ্রতিহত বেগে চলছে।

এই কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর তাঁর কতিপয় ভক্তকে বলেছিলেন, 'তোমাদের চৈতন্য হোক'; সেই আশীর্বাণী কেবল তৎকালে উপস্থিত কয়জন ভক্তের জন্যই নয়, আমরা যে যেখানে আছি সকলের জন্য। এমনকি যারা অনাগত তাদের জন্যও। সকলের জন্য তাঁর এই আশীর্বাদ 'চৈতন্য হোক'।

আমাদের মনে হয় 'চৈতন্য হোক' কথাটুকুকে একটু গভীরভাবে ভাবতে হবে। কিসের চৈতন্য? আমরা তো জড় নই, চেতন আছিই এবং চেতনের ধর্মই হল চৈতন্য। তাহলে নূতন করে চৈতন্য হোক বলছেন কেন? তার কারণ আমাদের যে-চেতনা আছে সেই চেতনাটি নিম্নগামী। কখন সেটা আমাদের দেহের সঙ্গে যুক্ত, কখন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে, কখন বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত—এইরকম চারিদিকে ছড়ানো আছে। যখন তিনি প্রার্থনা করছেন বা আশীর্বাদ করছেন যে, আমাদের চৈতন্য হোক—তার অর্থ আমাদের এই নিম্নগামী চৈতন্যকে ঊর্ধ্বগামী করতে চাইছেন। আমাদের যে-চৈতন্য বহির্মুখী তাকে অন্তর্মুখী, যে-চৈতন্য ভোগপ্রবণ তাকে ত্যাগময় করতে চাইছেন, আমাদের যে-চৈতন্য অনাত্মাতে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে তাকে আত্মবস্তুর দিকে আকর্ষণ করতে চাইছেন। এই আত্মবস্তুর দিকে আকৃষ্ট চৈতন্য মানুষকে পরম কল্যাণলাভে সাহায্য করবে। আমরা হয়তো বলব, তার জন্য ভগবানের দেহধারণ করে আসার দরকার কি? তিনি তো ইচ্ছামাত্রই জগৎটার রূপ বদলে দিতে পারেন! কেন তা করেন না? শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর উত্তরে বলবেন যে, তিনি কি করবেন না করবেন সে তাঁর ইচ্ছা। তিনি লীলাময়। যদি সব মনগুলো বদলে যায়, তাহলে আর লীলা চলে না। চোর চোর খেলায় কেউ চোর হতে রাজী না হলে খেলা চলে না। কাজেই তাকে চোর হতে হবে, আবার পুলিশও হতে হবে। যখন অবতার আসেন তখন তাঁর এই খেলাটাকে একটা নূতন রূপ দিয়ে যান। যেমন ঠাকুর বলেছেন, খেলার সময় যখন কোন ছেলে কিছুতেই বুড়ী ছুঁতে পারছে না, ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে, বুড়ী তখন হয়তো হাতটা বাড়িয়ে দেয় যাতে বিনা পরিশ্রমে সে ছুঁতে পারে। এইরকম আমরা যারা খেলায় শ্রান্ত-ক্লান্ত, তাদের জন্যে তাঁর হাত না বাড়িয়ে উপায় নেই।

মানুষের এইজন্যে ভগবানকে কাছে পাওয়া দরকার এবং কাছে তখনই পায় যখন সে খেলায় ক্লান্তিবোধ করে। ভগবান এই খেলা খেলছেন আমাদের নিয়ে বা আমাদের হয়ে। কিন্তু খেলার ভিতর দিয়ে আবার আমাদের সেই বোধটুকু

জাগিয়ে দিচ্ছেন যে, আমরা তাঁর থেকে ভিন্ন নই। অনেক সময় ঠাকুর তাঁর অন্তরঙ্গদের উদ্দেশে বলেছেন,—তোমাদের এইটুকু জানলেই হবে যে, তোমরা কে, আমি কে এবং আমার সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধ কি? এইটুকু জানাবার জন্য যেন তাঁর দেহধারণ করে আসা।

এই খেলা যে বড় অদ্ভুত ভাবে চলছে তা আমরা স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন হয়েও বুঝতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন মুষ্টিমেয় কয়জন ব্যক্তি তাঁর সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলেন। আবার আপাত দৃষ্টিতে যাঁরা কাছে ছিলেন, তাঁরাও তাঁর প্রতি উদাসীন ছিলেন। কাজেই তাঁর খেলা যেন তাঁর খেলুড়েদের পছন্দ করে নেওয়া। মনের মতো খেলুড়ে না হলে তাঁর খেলা জমে না। এইজন্য ঠাকুর বলতেন, কলমির দল, একটিকে টানলে সব আসে। তেমনি ভগবান যখন আসেন তাঁর খেলুড়ে সাথীরূপে বহুজন আসেন। তাঁরা পৃথক্ নন, তাঁরই বিভূতি। তিনিই বহুরূপে ভিন্ন ভিন্ন আধারের ভিতর দিয়ে নিজেকে আস্বাদন করেন। জগৎরূপের সৃষ্টি এইজন্য—তাঁকে অনেকে আস্বাদন করবে বা তিনি অনেকের ভিতর দিয়ে নিজেকে আস্বাদন করবেন। তাঁর মাধুর্য যেমন অফুরন্ত, খেলারও তেমনি বিরাম নেই। পণ্ডিতদের গুণবিভাগ অনুসারে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক—বহুরূপে তিনি নিজেকে প্রসারিত করে খেলছেন। যিনি দুর্গতি ভোগ করছেন, তিনিও তিনি, আর যিনি পরমতত্ত্ব আস্বাদন করে আনন্দে পরিপূর্ণ তিনিও তিনি। ফড়িং-এর পশ্চাতে কাঠি গুঁজে দেওয়ার মতো দুর্গতিও তাঁর ভিতর দিয়ে হচ্ছে, সুগতিও তাঁর ভিতর দিয়ে হচ্ছে। কিন্তু আমাদের মুশকিল হচ্ছে আমরা তাঁর থেকে নিজেদের বিযুক্তরূপে ভাবছি, সেইজন্যে এই অবস্থা।

ভগবান থেকে বিচ্যুত হয়ে যে দূরে সরে রয়েছে তার বিপর্যয় এই, সে জগতের ভিতরে তাঁকে না দেখে জগৎটাকে ঈশ্বর-ভিন্ন রূপে দেখছে। এইজন্য তার স্মৃতি ম্লান হয়ে গিয়েছে, সে তার স্বরূপকে ভুলে গিয়েছে। ভাগবতে বলেছেন কেন এমন হয়: 'তন্মায়য়া'—তাঁরই মায়া দ্বারা। ভাগবতে বলেছেন, 'তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা'—(১১।২।৩৭), অতএব যে জ্ঞানীব্যক্তি একান্ত ভক্তি সহকারে তাঁকে ভজনা করেন, তিনি হলেন গুরুদেবতাত্মা। গুরু এবং ইষ্ট যাঁর আত্মাস্বরূপ।

এইরকম শ্রীরামকৃষ্ণের খেলা চলছে এবং এখেলা কত বৈচিত্র্যপূর্ণ কত নিপুণভাবে তিনি খেলছেন তা তাঁর অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীটিকে দেখলে বুঝা যায়। একদিকে তিনি স্বামীজীকে তৈরি করলেন বিরাট ব্যক্তিত্ব দিয়ে, আর-একদিকে তিনি নাগমহাশয়কে তৈরি করলেন একেবারে অহমিকাশূন্যরূপে। কবি গিরিশচন্দ্রের কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা: মহামায়া স্বামীজীকে জাল দিয়ে বাঁধতে গেলেন, কিন্তু তিনি এতবড় যে জালে কুলোয় না, আর নাগমহাশয়কে বাঁধতে গেলেন, তিনি এত ছোট যে জালে আটকায় না। দুটির বৈপরীত্য আত্যন্তিক। এইরকম কত বিচিত্র খেলা। খেলোয়াড়দেরও কত বৈচিত্র্য। হয়তো এখনও এগুলি ভাল করে বুঝবার আমাদের সময় হয়নি। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের আলোচনাতেই অন্ত পাচ্ছি না, এর উপর তাঁর সুবিশাল পরিবারের সকলের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভ আমাদের সীমিত জীবনের সাধ্যায়ত্ত নয়। প্রত্যেকের ভিতরেই আমরা অল্পবিস্তর বিশিষ্টতা দেখতে পাই।

ঠাকুরের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের (রাখাল মহারাজের) বৈশিষ্ট্য—ভাবতন্ময়তা। স্বামীজীর ক্ষুরধার বুদ্ধি,—প্রবল বিবেক, যার উপর মায়া প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না, তাঁকেও দেখাচ্ছেন; গিরিশের মতো অপূর্ব বিশ্বাসী, তাঁকেও

দেখাচ্ছেন। কিন্তু গিরিশ কি নিজেই গিরিশ, না শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় গিরিশ? আমরা পূর্বোক্ত সূত্র অনুসারে মনে করি যে, দুটি ভিন্ন বস্তু নয়। গিরিশ তিনি নিজেই হয়েছেন তাঁর ভিতরে বিশ্বাসরূপ যে-ধর্ম সেটিকে প্রকট করবার জন্যে। প্রথম দৃষ্টিতেই তিনি গিরিশের ভিতরের যে-তত্ত্ব আমাদের অজ্ঞাত ছিল সেইটিকে লক্ষ্য করে বলছেন, ভৈরবের অবতার। কারণ তিনি লম্পট, মদ্যাসক্ত বর্তমানের গিরিশকে লক্ষ্য করছেন না, তিনি লক্ষ্য করছেন ভাবী গিরিশকে, যাঁকে তিনি তাঁর নিপুণ হাতে তৈরি করবেন। এইজন্যই তার সম্পর্কে ঠাকুর এত উচ্চভাব পোষণ করছেন। বলছেন, গিরিশের পাঁচসিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস, তার বিশ্বাস আঁকড়ে পাওয়া যাবে না। গিরিশ তাঁর শেষ জীবনে বলছেন, তাঁর মহত্ত্বকে যদি বুঝতে চাও তো আমাকে দেখ, আমি কি ছিলাম আর কি হয়েছি। অহঙ্কারশূন্য গিরিশ স্পষ্টভাবে নিজের কথা বলছেন। বলছেন, যা কিছু পরিবর্তন তা ভগবানের অশেষ কৃপায়, এ miracle—অলৌকিক ঘটনা জগতে অনেক ঘটে কিন্তু গিরিশকে নিয়ে যে-খেলা ঠাকুর খেলেছেন এটি অসাধারণ। গিরিশ নিজেকে দেখছেন শ্রীরামকৃষ্ণের হাতের একটি যন্ত্ররূপে। প্রথমে অশুদ্ধ অমার্জিত গিরিশরূপে এবং তারপরে শুদ্ধ পবিত্র গিরিশরূপে, গিরিশ নিজেকে দেখছেন, আর অবাক হয়ে যাচ্ছেন।

শুধু গিরিশ নয়, স্বামীজী তাঁর নিজের সম্বন্ধে বলতে গিয়েও বলছেন, আমাদের মতো এই নব্য ইংরেজী শিক্ষিত অবিশ্বাসী তরুণদের মনকে তিনি কাদার তালের মতো তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী ভাঙছেন, গড়ছেন, এর চেয়ে অলৌকিক শক্তি আর কিসে দেখা যায়? বলছেন, জড় জগতে একটা পরিবর্তন ঘটানো এমন কিছু বেশি কথা নয়, কিন্তু আমাদের মতো অবিশ্বাসী, সংশয়শীল, তর্কপ্রবণ মনকে নিয়ে তিনি কি খেলাই খেলছেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে একমুঠো রাস্তার ধুলো নিয়ে লাখ বিবেকানন্দ তৈরি করতে পারতেন।

আমরা অবাক হয়ে যাই যে, একি সম্ভব! কিন্তু স্বামীজীর এ-উক্তি অতিশয়োক্তি বা গুরুভক্তির আতিশয্য নয়। কারণ স্বামীজী বলেছেন যে, আমার মতো সংগ্রাম তাঁর সঙ্গে আর কেউ করেনি আমি যতবার তাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি ততবার পরাজিত হয়েছি। এই পরাজয়ের পরম্পরার ভিতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত যে বিবেকানন্দটি তৈরি হল তিনি বলছেন, আর একটি বিবেকানন্দ যদি থাকত তাহলে তাকে বুঝতো।

আমরা শ্রীরামকৃষ্ণরূপ অচিন বৃক্ষটিকে যেমন চিনি না, তার শাখা-প্রশাখাকেও তেমনি চিনি না। তিনি যে ডালপালা নিয়ে, পার্ষদ পরিজনবর্গ নিয়ে খেলা করেন সে-খেলাটি বুঝতে হলে প্রত্যেক জায়গায় দেখব তাঁদের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি সর্ব ঐশ্বর্যসম্পন্ন ভগবান দেহধারণ করে অবতীর্ণ এবং তাঁর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মতো। ভাগবতে বলেছেন, মায়ামনুষ্য হরি—মায়ার দ্বারা তিনি মানবরূপ ধারণ করেছেন, অবতার হয়েছেন। দেবকী বলেছিলেন যে, প্রলয়ের পর এই বিরাট বিশ্বের সকল বস্তুকে পরস্পরের দূরত্ব রক্ষা করে যিনি এই সমস্ত বিশ্বটাকে নিজের ভিতরে ধারণ করেন তিনিই আবার আমার গর্ভে জন্ম নিয়েছেন, লোকের কাছে এটি একটি বিড়ম্বনা। লোকে কি করে বিশ্বাস করবে? অসম্ভব ঘটনা! যিনি সর্বব্যাপী ঈশ্বর, অসীম, অনন্ত, তিনিই আবার এতটুকু একটি শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। ভাগবতে এ-কথাটি বেশ বলেছেন যে, তিনি জন্মগ্রহণ করলেন তাঁর স্বরূপ দেখিয়ে, তার পরেই আত্মসংবরণ করলেন, ওদের ভুলিয়ে দিলেন। ভুলিয়ে

না দিলে খেলা চলবে না, যাকে আমরা সন্তানরূপে ভালবাসব তাঁকে যদি সর্বৈশ্বর্যশালী ভগবান বলে জানি তাহলে তাঁকে সন্তানরূপে নেওয়া যায় না, তাই মায়াতেই ভুলিয়ে দিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর আকর্ষণ অব্যাহত রইল। ভগবানের লীলা এইভাবে হয়। একদিকে তিনি জ্ঞান দিচ্ছেন আবার সেই জ্ঞানকে সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন করে আপনজনরূপে ব্যবহার করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানদের ভিতরে এই ভাবই ছিল। তাঁরা কেউ বলেননি, শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁরা চিনে ফেলেছেন। আবার কেউ এ-কথাও বলেননি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের অজ্ঞাত, নাগালের বাইরের একটি বস্তু।

যাঁরা নাস্তিক, ঈশ্বর মানেন না, ভগবান সম্বন্ধে তাঁদের উদাসীনতা অবজ্ঞা সম্পর্কে গীতায় (৯।১১) ভগবান বলছেন :

'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥'

মোহাচ্ছন্ন হয়ে মানুষ আমাকে অবজ্ঞা করে মানবদেহধারী বলে। 'পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্'—সমস্ত প্রাণীর অধীশ্বর যে নিয়ন্তা আমি, আমার এই পরম তত্ত্বকে তারা জানে না। কিন্তু ভগবানকে যারা অবিশ্বাস করে, তারাও তাঁর আওতার বাইরে চলে যায় না। আমরা লৌকিক বিচার দিয়ে বুঝতে পারি যে, মানুষের আত্মার প্রতি যে অনুরাগ সেটা হল স্বাভাবিক। কোন কারণবশত নয়। আত্মাকে, নিজেকে আমরা সবাই ভালবাসি। অন্য বস্তুকেও ভালবাসি আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধের জন্য। এখন এই আত্মবস্তু যে আচ্ছাদনের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছেন অনেক সময় সেই আচ্ছাদনটি এত স্থূল হয়ে যায় যে, আমরা তার ভিতরের বস্তুটিকে বুঝতে পারি না। না পারলেও কিন্তু সেই আকর্ষণটি কম প্রবল নয়। তিনি আকর্ষণ সকলকে করছেন তবে ছদ্মবেশ থাকার জন্য আমরা এই আকর্ষণ কোথা থেকে আসছে তা হয়তো বুঝতে পারছি না। এইজন্য যখন ভক্ত বহির্মুখ তখনও কিন্তু সেই বাহ্য বস্তু যা তাকে আকর্ষণ করছে তা বাহ্য নয়।

ঠাকুর অদ্ভুত নট। যে যেমন তার সঙ্গে তেমনি ব্যবহার। গিরিশ ঠাকুরের স্বতন্ত্র কোন মর্যাদা না রেখেই অনেক সময় কথাবার্তা বলতেন, সব সময় ভাষার শালীনতাও থাকত না। তাই দেখে একজন ভক্তের মনে হল যে, হয়তো এইরকম ব্যবহার করলেই ঠাকুর খুশি হন। সেভাবেই ঠাকুরের প্রতি একদিন ব্যবহার করতে গিয়েছেন। ঠাকুর বুঝলেন, সে ভুল করছে। হেসে বললেন, ওরে তোর ও ভাব নয়। সাবধান করে দিচ্ছেন। যার যেমন ভাব তাকে সেইভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এ আর কেউ পারে না। কারো কাছে তিনি সন্তান, কারো কাছে তিনি মাতা বা পিতা, কারো কাছে তিনি শাসক, কারো কাছে সখা। 'ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।' এগুলি সব ভিন্ন ভিন্ন রকমের ছাঁচ। ধোপার গামলায় সব রঙ গুলে রাখা আছে—লাল, নীল, হলুদ, সবুজ। যে যে-রঙ চাইছে সে সেই রঙে ডুবিয়ে দিচ্ছে, এই নাও তোমার রঙ। ঠাকুর ঐরকম বলছেন যে, কার কি চাই এখানে এস, এখানে পাবে। একজন বলেছিল, আপনি গামলায় যে-রঙ গুলেছেন সেই রঙ দিন। এ-রঙ তিনি দিতে পারেন না বা দেন না, কারণ যাকে দেবেন সে তখন তাঁরই স্বরূপ হয়ে যাবে, পৃথক্ থাকবে না। এইজন্যে কত রকম রঙ নিয়ে তিনি খেলা করছেন। একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে, স্বামী ব্রহ্মানন্দের সম্বন্ধে। তিনি তখন ভুবনেশ্বরে আছেন, আত্মভাবে বিভোর হয়ে থাকেন। কলকাতার তিনটি নব্য যুবক, সকলকে শিক্ষা

দেবার জন্য তাঁদের যেন দৈবদত্ত অধিকার আছে এই ভাব নিয়ে তাঁরা ঘোরেন। তাঁরা যে হোটেলে উঠেছেন তার মালিকের কাছে জানতে চাইছেন সেখানকার দ্রষ্টব্য কি কি। মালিক বলল, লিঙ্গরাজ আছেন, এই সব মন্দির আছে ইত্যাদি। তারপরে মনে পড়ল যে, আর-একটি দ্রষ্টব্য বস্তু আছে এখানে—বেলুড়মঠের একটি শাখা আছে, সেখানে একজন সাধু আছেন, অদ্ভুত মানুষ, রাজার মতো একেবারে। সোনার গড়গড়ায় তামাক খান, আর রাজকীয় আচরণ। সেই যুবক তিনটি স্বভাবতই উগ্র হয়ে বললে, 'আপনারা তাঁকে কিছু শিক্ষা দেন না ?' 'আরে মশাই কত বড়লোক তাঁর পিছনে, আমরা কি করে শিক্ষা দেব।' 'দাঁড়ান, আমরা দেখে আসি একবার।' তাঁরা যখন মঠে গেলেন মহারাজ তখন বৈঠকখানায় বসে গল্প করছিলেন সেবকদের নিয়ে। আগন্তুকদের দেখে তিনি তাড়াতাড়ি বললেন যে, তোরা ভিতরে চলে যা, আর ভিতরের দিকের দরজাগুলি সব বন্ধ করে দে। সেবকেরা বাইরে থেকে খুব কৌতূহলী হয়ে ভাবছে, আমাদের সরিয়ে দিলেন কেন ? শুনতে পেল ঘরের ভিতরে হাসির হুল্লোড় চলছে। কিছুক্ষণ পরে যুবকরা বিদায় নিলে মহারাজ দরজা খুলতে বললেন। ব্যাপারটা হল তারা মহারাজকে শিক্ষা দিতে এসেছিল। মহারাজ তাদের সঙ্গে ধর্মকথা নয় খালি ফষ্টিনষ্টি করতে লাগলেন। আর তার থেকে অত হাসির উচ্ছ্বাস। তারা হোটেলে ফিরে গেলে মালিক বললেন, কেমন দেখলেন ? তারা বলল, আনন্দময় পুরুষকে দেখলাম। অত অহঙ্কার,অভিমান, ঔদ্ধত্য নিয়ে গিয়ে তাঁর আনন্দময় রূপ দেখে তাদের মন শান্ত হয়ে গেল। এই হল ঠাকুরের সন্তান, তাঁরই বিভূতি, তাঁরই প্রকাশ এঁদের ভিতরে।

ঠাকুরের কাছে কেউ এলে তিনি তাকে নানারকম পরীক্ষা করতেন। তাকে প্রশ্ন করে, তার চালচলন, দেহের গঠন দেখে বিচার করতেন। তারপর ঊর্ধ্বভূমিতে উঠে ভাবদৃষ্টিতে তাকে দেখতেন। আর যে যেমন আধার সেই-ভাবে তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতেন। ঠাকুরের একটি কথা যা স্বামীজীকে বলেছিলেন, দেখ্, কারো ভাব নষ্ট করতে নেই, যে যে-ভাবের তাকে সেই ভাবে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে হয়। স্বামীজী এই শিক্ষাটিকে সমস্ত জীবনে কখনও ভোলেননি। বারবার স্বামীজী বলেছেন, কারো কল্যাণ করতে হলে তোমার ভাব তার উপরে চাপিয়ে দিও না। তাকে তার ভাবে বাড়তে সাহায্য কর। প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে তিনি দাঁড়াচ্ছেন তার চরম গন্তব্য রূপে, চরম লক্ষ্য রূপে। কিন্তু প্রত্যেকেই তাঁর নিজের নিজের দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে দেখছেন।

প্রত্যেককে নিয়ে ঠাকুর খেলা করছেন। এতগুলি ঘুঁটি কিন্তু এমন খেলোয়াড়—জানেন কোন্ ঘুঁটিকে কিভাবে চালাতে হবে। ঠাকুর নিজে বলেছেন এ-কথা। তাঁর মধ্যে সর্বভাবের সমন্বয় আমরা বলি, শুধু সমন্বয় নয় প্রত্যেকটি ভাবের পরাকাষ্ঠা একমাত্র তাঁর ভিতর দিয়ে সকলে পাচ্ছেন। প্রত্যেকে দেখছেন তাঁকে পরাকাষ্ঠারূপে, পরম লক্ষ্যরূপে, গন্তব্যরূপে। 'সর্বাসাম্ অপাং সমুদ্র একায়নম্'—উপনিষদ্ বলছেন —সমুদ্র যেমন সকল জলের একমাত্র গন্তব্য।

আমরা দেখব—আমরা তাঁকে কিভাবে গ্রহণ করলে আমাদের জীবনে পূর্ণতা আনতে পারব। সকলের জন্য সব সম্ভার নিয়ে যেন তিনি বসে আছেন, যে যা চায় তাকে তাই দেবেন। এই কথারই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হল 'তোমাদের চৈতন্য হোক'। যাকে স্পর্শ করছেন, তার অনুভূতি হচ্ছে। আর-একজনের সঙ্গে তুলনা করে বলা যাবে না। তার নিজের যা লক্ষ্য তাতে সে উন্নীত হচ্ছে। এইজন্য স্বামী সারদানন্দ লীলাপ্রসঙ্গে বলেছেন, কল্পতরু মানে যে যা চায় তাকে তা দেওয়া,—তা নয়, তিনি সকলকে পূর্ণত্বে নিয়ে যাবার জন্য যা প্রয়োজন তা দিয়ে দিচ্ছেন এবং 'চৈতন্য হোক' এইটি তাঁর সেই আশীর্বাণী।

সে-আশীর্বাণী আজও এই কাশীপুরের আকাশে বাতাসে সর্বদা ধ্বনিত হচ্ছে। আমরা সেই পুণ্যভূমিতে বসে আজ তাঁর চরিত্রের সামান্য যে-আলোচনা করলাম, তাতে আমাদেরই জীবন ধন্য হবে। আমরা হয়তো তাঁর কৃপা আর-একটু বেশি করে বুঝতে সমর্থ হব। তাঁর কৃপায় আমাদের সকলের চৈতন্য হোক।

এযুগের অসুখ

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

'পদ্মশ্রী' বিভূষিতা প্রবীণা লেখিকা—জ্ঞানপীঠ, রবীন্দ্র. লীলা, সাহিত্য আকাদেমী প্রভৃতি পুরস্কারে সম্মানিতা।

মানুষ যতই সভ্য হচ্ছে, শিক্ষিত হচ্ছে, বিজ্ঞানের দুরন্ত গতিতে ধরাকে সরাজ্ঞান করছে, এবং শুধু এই পৃথিবীখানাকেই নয় পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাকাশকেও কব্জা করে ফেলতে পারছে বলে অহংকৃত হচ্ছে, ততই যে, সে উত্তরোত্তর দুঃখী বনে যাচ্ছে এতে কি সন্দেহ আছে?

সভ্য দুনিয়া থেকে 'সুখ' শব্দটা ক্রমশই নির্বাসিত। নির্বাসিত অতএব সুখের পার্ষদগণও, 'স্বস্তি শান্তি, নিরাপত্তা নিশ্চিন্ততা'। নিশ্চিন্ততা-হীন এই পৃথিবীতে 'সুখ' জিনিসটা কোথায় আশ্রয় পাবে?

তাই আজকের দুনিয়া 'সুখহীনতার' অসুখে ভুগে চলেছে। যে দেশ যত ঐশ্বর্যশালী, সে দেশ ততো অ-সুখগ্রস্ত। মহাশক্তিশালী বিজ্ঞান অনবরত তার হাতে 'সুবিধে' আর 'স্বাচ্ছন্দ্য' নামের রঙিন খেলনাগুলি এগিয়ে দিয়ে দিয়ে তলে তলে কেড়ে নিচ্ছে তার অনেক শুভ!

আজকের বিজ্ঞানের শক্তির যে শেষ নেই, তাতে তো সন্দেহ নেই। সে যে কী করতে পারে আর কী করতে না পারে, তার দৃষ্টান্ত ওই সব ঐশ্বর্যশালী দেশগুলির জলে, স্থলে, আকাশে অন্তরীক্ষে প্রতিটি ধূলিকণাতেও বিধৃত। হয়কে নয়, নয়কে হয়, রাতকে দিন, দিনকে রাত করে কেনা তার কাছে কিছুই নয়।

এই ময়দানবীয় কাণ্ডের জন্যে বিজ্ঞান তার চতুর বিদ্যার কৌশলে জননী ধরিত্রীর বক্ষ-কোটরে সঞ্চিত লক্ষ লক্ষ বছরের তৈলসম্পদ শুষে তুলে নিচ্ছে, নিঃশেষ করে উপড়ে বার করে নিচ্ছে হাজার হাজার বছর ধরে ঘুমিয়ে থাকা খনিজ সম্পদগুলি। অনায়াসে কেটে সাফ্ করে ফেলছে কত শত বছর কালের নিবিড় গভীর অরণ্যছায়া, গুঁড়িয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে কালের প্রহরী পর্বতমালাকেও। ক্ষমতার মদমত্তে যেন পৃথিবীটা দেউলে করে ফেলতেও পিছপা নয় সে!

ব্যাপরটা অনেকটা এইরকম, যেন বড়লোকের 'হঠাৎ নবাব' ছেলে সাতপুরুষের বিষয়-আশয়ের অধিকারটা হাতের মুঠোয় পেয়ে গিয়ে, তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে চলেছে। পরবর্তী বংশ-ধরেদের কি থাকল না থাকল, তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই।

প্রকৃতি অনন্ত ঐশ্বর্যময়ী! 'অপব্যয়ের ভয় নাই তার পূর্ণের দান স্মরি!' তবু তারও একটা নিয়ম আছে! নিয়মছাড়া সৃষ্টিছাড়া অপচয়ের কাণ্ড ঘটাতে থাকলে, কত জোগান দিতে পারবে প্রকৃতি?

মাঝে মাঝে অবশ্য এই উড়নচণ্ডেপণার প্রতিক্রিয়ায় প্রতিকারের চেষ্টায় প্রায় উচ্ছেদ হয়ে আসা বন্যপ্রাণীদের পুনর্বাসন দেবার শুভবুদ্ধিতে 'ব্যাঘ্রপ্রকল্প' 'হাতী-সিংহ সংরক্ষণ' ইত্যাদি ছেলেখেলার আয়োজন হয়। বনমহোৎসবের আয়োজন করে পোঁতা হয় কিছু চারা গাছ। যার বেশির ভাগই হয়তো রক্ষার ভারপ্রাপ্তদের অবহেলায় গরু-ছাগলে মুড়িয়ে খায়।

যদিবা বাঁচে, তাতে ওই হাজার হাজার বছরের অরণ্যের ক্ষতির কতটুকু কী সুরাহা হবে?

লোভ বড় ছোঁয়াচে রোগ। একবার যারা

জেনে ফেলেছে 'মরাহাতী লাখটাকা' 'কাঠের দাম সোনার তুল্য' তারা কি আর পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ভেবে লোভের হাত গুটিয়ে নেবে? চির নির্লোভ অরণ্যচারী আদিবাসীদের মধ্যেও লোভের সঞ্চার ঘটিয়ে চোরাকারবারীরা সাফ্ করে চলবেই বন আর বন্যপ্রাণী!

মানুষ ক্রমশই প্রকৃতির কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ঈশ্বরের সান্নিধ্যের অনুভূতিলাভের পরিবেশ হারাচ্ছে। যন্ত্রসভ্যতার ক্রমোন্নতিতে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, জল, বায়ু, শব্দ, স্পন্দন সব দূষিত হয়ে উঠছে, অথচ সেই সভ্যতাকেই আঁকড়ে ধরে থাকা ছাড়া গতি নেই আজকের পৃথিবীর। এই জীবন তাকে বিজ্ঞানের ক্রীতদাস করে তুলেছে।

এই অবস্থা আশঙ্কা করেই একদা দূরদ্রষ্টা ঋষি কবি বলে উঠেছিলেন, 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর।' আর লিখেছিলেন, 'মুক্তধারা'। রূপকের মধ্য দিয়ে অশনি সঙ্কেত!

কিন্তু কবির কথা শুনতে কার দায় পড়েছে? প্রকৃতিকে পরাজিত করে করে মানুষ বিজয় গর্বে উল্লসিত হচ্ছে, খেয়াল করছে না, তিলে তিলে দিনে দিনে দাস বনে যাচ্ছে নিজের হাতেগড়া দৈত্যের! তাই ক্ষমতালোভী প্রভুত্বপ্রিয় পৃথিবীর সব ঐশ্বর্যশালী দেশগুলির—গোপন ছত্রছায়াতলে বিজ্ঞানের ভূমিকা হচ্ছে বিশ্বধ্বংসী খুনে গোঁয়ারের।

সেই ছায়ার তলায় সে তৈরি করে চলেছে—মারণাস্ত্রের পর মারণাস্ত্র! ভয়ঙ্করের পর আরও ভয়ঙ্কর! স্বস্তি নেই, বিশ্রাম নেই! আরও কত বীভৎস নৃশংস অস্ত্র তৈরি করা যায়, তার মহলা চলেছে অবিশ্রাম গতিতে।

উপায় কী? বিজ্ঞান একদিকে যেমন ভেবে পুলকিত হচ্ছে এই সুন্দরী ধরণীকে মুহূর্তে ধ্বংস করে ফেলবার মতো শক্তি তার হাতে মজুদ, তেমনি সর্বদাই সশঙ্কিত হয়ে থাকছে, সেই রাক্ষসী শক্তি আর কারও ঘরে মজুদ আছে কিনা, থাকলে কতখানি?

তাসখেলায় যেমন তাসের পিঠে তাস মেরে হারজিৎ, এও প্রায় তেমনি! ত্রাসের পিঠে সন্ত্রাস, আর সন্ত্রাসের পিঠে ত্রাস বসিয়ে বসিয়ে হারজিতের অঙ্ক কষে, মরণ খেলার হারজিতের প্রস্তুতি! তবে শক্তিমানেরা অবশ্য ঠিক করে রেখেছেন, বিশ্বধ্বংস হয় হোক, তাঁর আসনটি অটুট থাকবে। ঈশ্বর-সংস্পর্শহীন সাধনার এটাই পরিণতি!

প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর লড়াইয়ে আজকের এই যন্ত্রবিজ্ঞান যেমন এক-একসময় জয়ের উল্লাসে স্ফীত হতে থাকে, তেমনি এক-একসময় প্রকৃতির প্রচণ্ড আক্রোশ ফেটে পড়ে তাকে তচ্‌নচ করতেও ছাড়ে না। তাতে বিনষ্ট হয়ে যায় লক্ষ লক্ষ প্রাণ।

কিন্তু মহাশক্তিশালী বিজ্ঞান, যে নাকি তার শক্তির সিংহভাগটাই মারণাস্ত্রের পিছনে আর মহাকাশ বিজয়ে ব্যয় করে চলেছে। সে কি আজ পর্যন্ত পেরে উঠতে পেরেছে, একটি 'মৃত'কে প্রাণ দিতে?

একথা অবশ্য বলা হচ্ছে না জগতের কল্যাণকার্যে, মানবহিতার্থে, বিজ্ঞানের অবদান কিছু কম? সেখানে তো অভাবনীয় অত্যাশ্চর্যের নিত্য নমুনায় বিস্ময়ের পর বিস্ময়। তবু মনে হয়, তার 'জীবনদায়িনী' অবদানের থেকে জীবনঘাতিনী অবদান বুঝি বেশি!

বুঝিবা ব্যাপক 'কল্যাণ কর্মের' আর 'অবশ্য প্রয়োজনীয়ের' উপকরণের থেকে বেশি আবিষ্কৃত হচ্ছে অহেতুক অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতার আর আরাম আয়েস সুবিধে স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণের!

কিন্তু না হয় তাই হল।

অতি ঐশ্বর্যশালী দেশগুলি সেইগুলির উপসত্ব ভোগ করুক, আর সুখহীনতার অসুখে ভুগে মরুক! কী করা যাবে? কিন্তু ভাবনা এই, আমাদের এই দরিদ্রদেশেও যে, পাল্লা দেবার তাল চলছে, সেই সব দেশের সঙ্গে!

আজও আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে, আজও শতকরা ষাটজন নিরক্ষর, আজও পাঁচ বছরের শিশুও জীবিকা-অর্জনের তাড়নায় 'শ্রমিকের' পাতায় নাম লেখায়, মানুষ রোগে যত না মরে তার থেকে বেশি মরে চিকিৎসার অভাবে (যদিও চিকিৎসাবিজ্ঞান আজ উন্নতির তুঙ্গে), আমাদের হাসপাতালে একখাটে দু-তিনজন রোগী গাদাগাদি করে শুতে বাধ্য হয়, এবং আরও কী হয় আর না হয় তা অবর্ণনীয়। তবু আমাদের ঘরে ঘরে রঙিন টি. ভি., ভি. ডি. ও., ফ্রীজ, জেনারেটর, রেকর্ড চেঞ্জার, টেপ্ রেকর্ডার, টেলিফোন এবং আরও অনেক কিছু!

অপর দেশের দেখাদেখি আমাদের চাহিদার তালিকা ক্রমবর্ধমান। অথচ সেই সব দেশের মতো সত্যিকার সমৃদ্ধি নেই। সমৃদ্ধির চেষ্টাই কি আছে? আমাদের মজ্জাগত অপরিসীম আলস্য, বিনাশ্রমে মুফতে সব পেতে চায়। কাজেই দিনে দিনে বেড়ে চলেছে দুর্নীতির অসংখ্য উপায়। চুরি করতে পারলেই যদি কাজ মিটে যায়, তো খেটে মরতে যাবে কোন্ নির্বোধ?

তাই আজ সমাজের শিরায় শিরায় 'ক্যানসারের' বিষের মতো ছড়িয়ে পড়েছে লোভ দুর্নীতি অন্যায় অসংযম!

দেশের উন্নতিকল্পে যে-টাকা বরাদ্দ হবে,—ধরেই নেওয়া হবে, তার সিংহভাগটি উঠবে রাঘব বোয়াল কর্মকর্তাদের পকেটে পকেটে! তার পর ঝড়তি পড়তি যা দিয়ে তৈরি হবে সেসব প্রকল্প, তার ওপরও হানা দেবে চুনোপুঁটি ছিঁচকেরা। তারা খুলে নিয়ে যাবে জলের পাইপ, বিদ্যুতের তার, পার্কের রেলিং, ম্যানহোলের ঢাকনি, রাস্তার আলোর বাল্ব্, ট্রেনের গদি, বেসিন, শাওয়ার অসংখ্য ইত্যাদি—তালিকা দিতে গেলে মহাভারত!

এককথায় লোভের তাড়নায়, চাহিদার তাড়নায় সমাজের মাথা থেকে পা পর্যন্ত অধিকাংশই তলিয়ে যেতে বসেছে নীতিহীনতার অতল গর্তে।

তাই আজ আমাদের 'সব' থেকেও কিছু নেই!

অনেকটা যেন দোয়াত আছে কালি নেইয়ের মতো। অর্থাৎ 'ব্যবস্থা' আছে 'অবস্থা' নেই। নিষ্ঠাহীন বিশ্বস্ততাহীন সততাহীন কর্মকাণ্ডের ফলে আমাদের অনেক চেষ্টায় জমিয়ে তোলা আধুনিক জীবনের সমস্ত অবদানগুলি শুধু ঘরের শোভা মাত্র!

আমাদের দূরভাষণ আছে তাতে ভাষণ নেই! দূরদর্শন আছে 'দর্শনের' স্থিরতা নেই। আমাদের ঠাণ্ডা আলমারী আছে, ঠাণ্ডা নেই। সিলিণ্ডার আছে গ্যাস নেই, হীটার আছে আগুন নেই, গীজার আছে গরম নেই। শীততাপনিয়ন্ত্রণ করে রাখতে ঘরে মেশিন আছে, তাকে চালু রাখার উপায় নেই। নেই নেই, আরও কত কিছু নেই। কারণ সবশক্তির মূলাধার 'বিদ্যুৎ' নেই।

কেন নেই? সে প্রশ্ন করার মতো লোক নেই! অন্য সব দেশগুলিতে কী করে 'ময়দানবী-লীলা' অনাহত নিয়মে চলে, আর আমাদের এমন দশা কেন, এর জবাব দেবার লোকও নেই। তাই আশা আর বিশ্বাস করবার মতো ঠাঁইও নেই।

এই 'নেই' রাজ্যের বাসিন্দা আমরা। তবুও আমাদের মধ্যে চাহিদার শেষ নেই। কাজে লাগাতে পারি না পারি, তবু থাকুক। নইলে স্ট্যাটাস থাকে না।

এই চাহিদার পিছনে রয়েছে সেই আদি ও অকৃত্রিম তৃতীয় রিপু। সুবিধে স্বাচ্ছন্দ্য আরাম আয়েসের লোভ। অথচ সর্বদাই দেখছি সে গুড়েবালি। বস্তুপুঞ্জ জমিয়ে তোলাই সার। বেশির ভাগ সময়ই 'অচলে'র কারবার! তবু আছে তো! লোকে দেখছে তো আমি অভাগা নই।

অতএব আমরাও ক্রমশঃ 'সুখহীনতার অসুখে'র শিকার হয়ে চলেছি। প্রতিনিয়ত মানুষের মধ্যেকার মনুষ্যোচিত গুণগুলি ধ্বংস হয়ে যাওয়া দেখতে দেখতে, আমরা আর কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছি না, ভালবাসতে পারছি না, আপন ভাবতে পারছি না। তিলে তিলে নিঃসঙ্গ হয়ে চলেছি, আর দাসত্ব করে চলেছি সেই সভ্যতার। যে-সভ্যতা এখনও আমাদের কাছ থেকে বহু যোজন দূরে।

সেই যান্ত্রিক সভ্যতার কথাই বলছি—যা মানুষকে অবিরত উত্তেজনার মুখে ঠেলে দিয়ে দিয়ে উন্মত্ত করে তুলছে। সেই উন্মত্ততাটি আমাদের ঘরের উঠোনে এসে গেছে, অথচ অর্থনৈতিক অবস্থাটি আসেনি। যাওবা যতটুকু আসতে পারত, তাও আমরাই আমাদের হিতাহিতজ্ঞানহীন, দেশের মঙ্গলচিন্তাহীন, দেশাত্মবোধহীন, 'ব্যক্তিস্বার্থ'টিকে বড় করে দেখতে শিখে, তাকে আসতে দিচ্ছি না।

জানি না অন্য কোন সভ্য দেশে, কেউ ভাবতে পারে কিনা দাতব্য চিকিৎসার কেন্দ্র থেকে রোগীর পথ্য, শিশুর খাদ্য চোরাচালানের পথে চলে যায় ধনবানকে আরও ধনী করতে। জীবনদায়িনী ওষুধ চলে যায় কালো বাজারে। আস্ত সুস্থ শিশুকে বিকলাঙ্গ করে দিয়ে ভিক্ষুক বানানো হয়।

এতটা নৈতিক অবনতি কি ছিল দেশে? যখন আমাদের দেশে তথাকথিত সভ্য জীবনের চাহিদা ছিল না।

বলছি না যে আগে ঘুষ খাওয়া ছিল না, চুরি-ডাকাতি, খুন-জখম ছিল না। ছিল সবই। কিন্তু এমন মহামারীর মতো ব্যাপক ছিল না।

এই ব্যাপকতার মূলে যা রয়েছে সেই 'অবস্থা-ছাড়ানো' চাহিদার মূলে আমরা মেয়েরাও কিছু কম দায়ী নয়। আমাদের মধ্যেকার লোভ আর দুরন্ত চাহিদাই অনেক সময় পুরুষকে ঠেলে দেয় দুর্নীতির পথে, অসাধু উপায়ের পথে।

যদিও বহির্বিশ্বে ক্ষমতার লোভ, প্রভুত্বের লোভ, অন্যকে পদানত করার লোভ পুরুষকে ক্রমশই সর্বনাশা পথে ঠেলে চলেছে, তবু বলব পারিবারিক জীবনে মেয়েদের কল্যাণময়ী শুভবুদ্ধি যেটুকু রাশ টানতে পারত, সেটুকুর অভাবে অথবা বিপরীতে তাকে ঠেলেই চলেছে। তাই সভ্যতার অহঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে পণপ্রথা, বধূহত্যা, বধূনির্যাতন। মূলকথা সেই লোভ।

আমরা সবসময় 'এখনকার ছেলেমেয়েদের' সমালোচনায় পঞ্চমুখ হই, কিন্তু তাদের চোখের সামনে কোন দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারছি আমরা? কোন আদর্শ!

এযুগের ছেলেমেয়েরা গুরুজনেদের মানে না। ঠিক কথা। কিন্তু মানাবার জন্যে গুরুজনেদের মধ্যেও কিছু গুণ থাকা আবশ্যক নয় কী? গুরুজনেদের মধ্যে শ্রদ্ধাযোগ্য ত্যাগ কোথায়? সংযম কোথায়? ধৈর্য, সহ্য, সহানুভূতি কোথায়? আর সর্বতোভাবে প্রশ্ন আজকের মা-বাপ গুরুজনেদের মধ্যে তাঁদের গুরুজনেদের প্রতি মান্য শ্রদ্ধা কোথায়? মা-বাবা ছেলেমেয়েদের

সামনে অনায়াসে আপন গুরুজনেদের বিরুদ্ধ সমালোচনা করে চলেছেন, ভাবছেন না এর প্রতিক্রিয়া কী? সমালোচনা করে চলেছেন, আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশী সকলেরই। আর সেটা ছোটদের সামনেই। কারণ নিজের মধ্যে কারুর জন্যেই নেই ভালবাসার সঞ্চয়।

তবে? শিশুর মধ্যে আসবে কোথায় সে জিনিস? তার মধ্যেও তো জমতে থাকবে শুধু বিদ্বেষ, ঘৃণা, উপেক্ষা, অবহেলা। মা-বাবা কি তার থেকে রেহাই পাবে?

তার ফলে আমাদের মধ্যেও যেমন সব থেকেও সুখহীনতার অসুখ, শিশুদের মধ্যেও তারই ছোঁয়াচ।

... ...

কল্পনা করতে ইচ্ছে হয়, আজকের এই মহাশক্তিমান বিজ্ঞান নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী করে না তুলে যদি ঈশ্বরের সহকারী করতে পারত।

যদি বিজ্ঞানীরা মহৎ পরিকল্পনায় তাঁদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে পারতেন মানবসমাজের সত্যকার কল্যাণে। আজ যেমনভাবে উন্নত প্রণালীর চিকিৎসা মানুষের দেহযন্ত্রের আমূল সংস্কার সাধন করে ফেলতে পারছে, তেমনি সংস্কার করে ফেলতে পারছে তার অন্তরের যন্ত্রগুলিকে! সত্যিই কল্পনা করতে ইচ্ছে করে।

অলৌকিক কোন 'এক্সরে' আবিষ্কার করে ফেলে বিজ্ঞানীরা তন্ন তন্ন করে দেখে ফেলছেন মানুষের মনের অন্ধিসন্ধি। আর তার ওষুধ প্রয়োগ করে চলেছেন, সেই মন থেকে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, হিংস্রতা, লোভ, পাপ, কুটিলতা, অসঙ্গত বাসনা, অন্যায় ইচ্ছাকে উচ্ছেদ করতে। ধীরে ধীরে মানুষ হয়ে উঠছে 'মানুষ' নামের যোগ্য!

ভাবতে ভাল লাগে সেই চিকিৎসা-পদ্ধতি আবিষ্কার হওয়ার গুণে, মানুষের সমাজে আর ত্রাস নেই, সন্ত্রাস নেই, আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় মারণাস্ত্রের পর মারণাস্ত্র তৈরির চাহিদা নেই।

সে হবে আর এক 'নেই'-এর জগৎ।

মানুষের প্রতি অবিশ্বাস নেই, অপ্রেম নেই, বিদ্বেষ নেই! নেই সর্বগ্রাসী স্বার্থপরতা!

সুস্থ সুন্দর নির্মল অখণ্ড আর একাত্ম, বিশাল এক মানবগোষ্ঠী সুখে বসবাস করবে এই জননী ধরিত্রীর স্নেহ কোলে। তখন আর থাকবে না সুখহীনতার অসুখ!

তাদের মধ্যে থেকেই কিছু জন চালিয়ে চলবে বিজ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের সমন্বয়ে উন্নতমানের মহাকাশ জয়ের সাধনা। যে-সাধনা একদিন বলে উঠতে পারবে, 'এতো যদি দিলে নাথ, আরো দিতে হবে হে! তোমারে না পেলে পরে ফিরিব না, ফিরিব না!'

'তোমাকে' বাদ দিয়ে সাধনা করে চলেই তো আমরা আজ পৃথিবীতে ডেকে আনছি এত বিপর্যয়! এত অশান্তি, এত অ-সুখ!

বুলগেরিয়ায় কিছুদিন

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

কলিকাতা 'রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিট্যুট অব্‌ কালচারে'র সচিব। মিশনের শিক্ষা ও ভাবপ্রচারের ক্ষেত্রে দেশে-বিদেশে সুপরিচিত সন্ন্যাসী।

আমি সম্প্রতি বুলগেরিয়া ও সোভিয়েত রাশিয়া ঘুরে এসেছি। উচ্চারণটা 'বুলগেরিয়া' অথবা 'বালগেরিয়া' (Bulgaria)? ওদের দেশে দেখলাম দুটো উচ্চারণই চলে। বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়াতে একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে গেছিলাম। সাহিত্যিকদের নিয়ে এই সম্মেলন। ৪৯টা দেশের ২০০ সাহিত্যিক এই সম্মেলনে আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন। বুলগেরিয়ায় ইউনিয়ন অব্‌ রাইটার্স নামে একটি লেখকগোষ্ঠী আছে। (সোভিয়েত রাশিয়াতেও ঐ একই নামে একটা প্রতিষ্ঠান আছে। খুব শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। প্রচুর পয়সা আছে এই প্রতিষ্ঠানের এবং যদিও ঠিক ঠিক সরকারের অধীন নয় কিন্তু সরকারের উপর খুব প্রভাব আছে।) তারাই উদ্যোক্তা এই শান্তি সম্মেলনের।

এই শান্তি সম্মেলন এর আগেও চারবার হয়ে গেছে। প্রথম হয় ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে। ওদের দেশে একজন মন্ত্রী ছিলেন—লুদমিলা জিবকোভা। এখন যিনি বুলগেরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান তাঁরই মেয়ে। এঁর দপ্তর ছিল সংস্কৃতি। ইনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কয়েক বছর আগে এক মোটর দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। বুলগেরিয়ার মানুষ এখনও তাঁর কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে। এঁর নামে এরা একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে—'প্যালেস অব্‌ কালচার'। এই লুদমিলা জিবকোভাই ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম আন্তর্জাতিক সাহিত্যিক সম্মেলন শুরু করেন। তারপর কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর আরও তিনটে হয়েছে। হল পঞ্চম—যেটাতে আমি আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। আমি সাহিত্যিক নই, কিছুই নই। কিন্তু তবুও তাঁরা কেন আমাকে ডাকলেন কে জানে?

ওঁদের আমন্ত্রণ পত্র পাওয়ার পর মঠের অনুমতি চাইলাম। অনুমতি পেয়ে ওঁদেরকে জানিয়ে দিলাম যে, যেতে পারব। কিছুদিন পরে দুটো টিকেট এসে উপস্থিত। একটা রোম হয়ে সোফিয়া যাওয়ার, আর-একটা মস্কো হয়ে যাওয়ার। দুটো পথেই যাওয়া যায়। রোম আমি আগে গিয়েছি। তাই ভাবলাম—মস্কো হয়ে যাব। ওঁদেরকেও সেই মতো জানিয়ে দিলাম।

কলকাতা থেকে দিল্লী রওনা হলাম ১৭ অক্টোবর, ১৯৮৪। দিল্লী এয়ারপোর্টে নেমে শুনি 'এয়ার ইণ্ডিয়া'র মাইকে খোঁজ করছে: 'স্বামী লোকেশ্বরানন্দ কি এসেছেন?' আমি গিয়ে জানালাম: 'হ্যাঁ, এসেছি।' তখন ওঁরা জানতে চাইলেন, আমার মস্কো যাওয়ার ঠিক আছে কিনা। এই খাতির যত্নের জন্য আমাকে মস্কো এয়ারপোর্টে গিয়ে একটু ভুগতে হয়েছে, সে-কথায় পরে আসছি। দিল্লী থেকে এয়ার ইণ্ডিয়ার প্লেনে চাপলাম ১৯ অক্টোবর সন্ধ্যায়। প্লেনে সবই রাশিয়ার যাত্রী। কেবল একটি ভারতীয় পরিবার—দক্ষিণ ভারতের। দিল্লী থেকে মস্কো পৌঁছতে লাগল ছ-ঘণ্টা। যখন মস্কো পৌঁছলাম, তখন মাঝরাত। সুতরাং ২০ অক্টোবর। আমাকে সবাই বলেছিল: মস্কোয় খুব শীত পড়ে, −৩০° সেন্টিগ্রেড। কিন্তু আমি যে-

সময়টা ছিলাম, খুব শীত পাইনি।—৩° বা —৪°। তবে এখানকার তুলনায় খুবই শীত। মস্কো থেকে সোফিয়ার পরবর্তী প্লেন ছিল দুদিন পর অর্থাৎ ২২ অক্টোবর। ২৩ থেকে সোফিয়ায় সম্মেলন শুরু হবে। চলবে ২৬ পর্যন্ত। এয়ার ইণ্ডিয়া থেকেই মস্কোর কোন হোটেলে এই দুদিন থাকার ব্যবস্থা করবে। এটাই নিয়ম।

মস্কো এয়ারপোর্ট সম্বন্ধে আমার খুব ভয় ছিল। কারণ কিছুদিন আগে কলকাতায় 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় একজন ভারতীয় মহিলার অভিজ্ঞতার কথা পড়েছিলাম। তিনি লিখেছেন: 'Via Moscow with no Love'. লণ্ডন থেকে তিনি মস্কো হয়ে ভারতবর্ষ আসছেন। মস্কো এয়ারপোর্টে তাঁকে অনেক দুর্গতি সহ্য করতে হয়েছে। যেন নজরবন্দী হয়ে আছেন। বাইরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। টেলিফোন করবেন একজন পরিচিত লোককে, জিজ্ঞেস করতে গেছেন বাইরে যেতে পারবেন কিনা, এয়ারপোর্টের কর্মচারীরা বলে দিল: 'No permission'. একটু কেনা-কাটা করতে পারি কি? 'No permission'. যা কিছু করতে যান, তাতেই ওরা বলে: No permission. শেষে তিনি বিরক্ত হয়ে তাদের জিজ্ঞেস করেছেন: আচ্ছা, আমি যদি এখন আত্মহত্যা করতে চাই, তাহলে কি তোমরা আমায় 'পারমিশন' দেবে? তখন তারা একটু কটমট করে তার দিকে তাকাল, কোন উত্তর দিল না। এই ঘটনা ছাড়াও, আমাকে একজন বাঙালী ভদ্রলোক বলেছিলেন যে, ওখানে ওরা ধরেই নেয় যে, প্রত্যেকটি লোক যেন চোর বা গুপ্তচর। সামরিক পোশাক পরে সব বসে থাকে, কথা বলে না, গম্ভীর। এয়ারপোর্টের বাইরে যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে পাস-পোর্ট, ভিসা এসব দেখাতে হয়। সেখানে গিয়ে দেখি টেবিলের ওপারে একজন সামরিক পোশাক পরা লোক। খুব গম্ভীর। রাশিয়ান ছাড়া অন্য কোন ভাষা বোঝে না। আর আমি রাশিয়ান বিন্দুবিসর্গও জানি না। আমার পাসপোর্টে আবার এমন একটা ছবি, যার সঙ্গে অন্য কারও চেহারার মিল থাকতে পারে, আমার চেহারার বিশেষ মিল নেই। অন্তত আমার তাই ধারণা। সেই লোকটি একবার আমার ছবির দিকে, আর একবার আমার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে। আমি হাসছি—এদিকে ভিতরে ভিতরে ভয় করছে। আমি এতক্ষণ খেয়াল করিনি—ঐ ঘরের কাছেই আর-একজন দাঁড়িয়ে আছে। শীতের জন্য তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত গরম পোশাকে ঢাকা। পুরুষ কি মহিলা বুঝবার উপায় নেই। তিনি রাশিয়ান ভাষায় ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে কি যেন বললেন। কি বললেন, বুঝলাম না, তবে কয়েক-বার ইংরেজী 'ডিপ্লোম্যাট' কথাটি শুনলাম। ঐ মিলিটারী অফিসার তখন কার সঙ্গে যেন ফোনে কথা বললেন; তারপর একটা ছাপ মেরে আমায় ছেড়ে দিলেন। আমি বেরিয়ে আসছি—তখন সেই ব্যক্তি, যিনি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি হঠাৎ বলছেন: 'Maharaj, I am Mira' —মহারাজ, আমি মীরা। আমি তো অবাক। এখানে আবার 'মহারাজ' বলে ডাকছে! গলার স্বরে বুঝলাম মহিলা। সেই মহিলা বেরিয়ে এসে আমায় বললেন: 'Maharaj, I am Mira. Do you remember me? I visited your Institute' ইত্যাদি। তখন মনে পড়ল, ঐ মহিলা কয়েক মাস আগে ইনস্টিটিউটে এসেছিলেন। তাঁর আসল নাম মারিয়ানা সালগানিন। রাধাকৃষ্ণণ যখন রাশিয়ায় রাষ্ট্রদূত ছিলেন, ইনি ছিলেন তাঁর সেক্রেটারী। খুবই বিদুষী মহিলা। ভারতবর্ষের প্রতি গভীর ভালবাসা। তাই 'মারিয়ানা'-কে পাল্টে মীরা করে নিয়েছেন। বললেন: 'আমরা আপনাকে সোভিয়েত রাইটার্স ইউনিয়ন এবং

অ্যাকাডেমী অব্ সায়েন্স-এর পক্ষ থেকে নিতে এসেছি। আপনি এখানে তাঁদের সম্মানিত অতিথি। আপনি সোফিয়া যাচ্ছেন আমরা খবর পেয়েছি। সোফিয়া যাবার আগে আপনি আমাদের অতিথি হিসাবে এখানে থাকবেন। আবার ফেরার পথে আপনাকে দিল্লীর প্লেনের জন্য এখানে যে-কদিন অপেক্ষা করতে হবে তখনও আপনি আমাদের অতিথি হিসাবে এখানে থাকবেন। আপনাকে সব ঘুরিয়ে দেখাব, বক্তৃতার ব্যবস্থাও হয়েছে।' সুতরাং এয়ার ইণ্ডিয়ার হোটেলে আমার থাকার আর প্রশ্ন উঠল না।

আমার সঙ্গে মালপত্র বলতে ছিল, একটা স্যুটকেশ আর একটা ব্যাগ। সবাই মালপত্র নিয়ে চলে যাচ্ছে—আমার মালপত্র নেই। আমার মালপত্র আর পাওয়া যায় না! শেষে আমাকে যারা নিতে এসেছিল তারা গিয়ে খুঁজে-টুঁজে নিয়ে এল। ঐ যে দিল্লীতে এয়ার ইণ্ডিয়া এত খাতির যত্ন করছিল, ওরা আমার মালপত্রের সঙ্গে দুটো 'ট্যাগ' লাগিয়ে দিয়েছে: 'Handle with special care'. ওরা বিশেষ যত্ন করে এমন জায়গায় মালপত্র দুটো রেখে দিয়েছে যে, কেউ আর খুঁজে বের করতে পারছে না!

মীরার সঙ্গে একটি যুবক ছিল। শুনলাম সেই আমার দোভাষীর কাজ করবে মস্কোতে। এয়ারপোর্ট থেকে ওরা আমাকে নিয়ে গেল 'হোটেল রাশিয়া'তে। সেটাই রাশিয়ার সবচেয়ে বড় এবং ভাল হোটেল। আমার জন্য একটা আলাদা স্যুইট-এর ব্যবস্থা ছিল। খুব ভাল আরামদায়ক ঘর। ঘরের মধ্যে টি. ভি., ফ্রিজ, রেডিও সব আছে। বাইরে অত ঠাণ্ডা—কিন্তু ঘরের মধ্যে গরম। হোটেলে আমার ঘরে পৌঁছে ওরা বলল: 'স্বামীজী, আপনার জন্য "ইণ্ডিয়ান টী" আছে।' আমি ভাবছি 'ইণ্ডিয়ান টী'-টা আবার কি? আমাদের দেশে আমরা যখন চা খাই, দুধ-চিনি মিশিয়ে দিই। অন্য দেশে দুধ, চিনি আর চা আলাদা করে পরিবেশন করে। যার যেমন ইচ্ছা, দুধ-চিনি মিশিয়ে নেয়। তাই 'ইণ্ডিয়ান টী' মানে ঐ দুধ-চিনি মেশানো চা। আমি অবশ্য ওদের বললাম না যে, আমি দুধ-চিনি ছাড়াই চা খাই—'ইণ্ডিয়ান টী' খাই না। যাই হোক, শীতের মধ্যে রাত্রিবেলা বেশ ভালই লাগল চা খেতে। রাত তখন আড়াইটা।

মস্কোয় দুদিন কাটিয়ে মস্কো থেকে আমি বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া গেলাম। মস্কোর কথা পরে বলব। কারণ সোফিয়া থেকে ফেরার সময়ও দিন কয়েক ওখানে থাকতে হয়েছিল। যাহোক সোফিয়া এয়ারপোর্টে নামতেই একজন যুবক এসে আমাকে দেখে বলছে: **'Keswarananda? Keswarananda?' Lokeswarananda**-র জায়গায় **Keswarananda.** আমি বললাম: **'Yes.'** ওরা ইংরেজী বিশেষ জানে না।

যুবকটির সঙ্গে আরও দু-একজন ছিল। ওরা আমাকে নিয়ে গিয়ে এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসাল। মালপত্র সব ওরাই নিয়ে এল। আমায় কিছু করতে হল না। জানতে চাইল: চা খাব, না কফি খাব, না ঠাণ্ডা? একটা কিছু খেলাম। কি খেলাম মনে নেই। তারপর গাড়ি করে ওরা আমাকে একটা হোটেলে নিয়ে গেল। প্রকাণ্ড হোটেল। যে ঘরে বসাল, সেখানে ঐ 'হোটেল রাশিয়া'র মতো ব্যবস্থা। আমি যখন হোটেলে ঢুকছি, তখনই 'রিসেপ্শন' থেকে একজন আমার পাশপোর্টটি নিয়ে নিল। টিকিটটিও তার কাছে রেখে দিল। ঘরে এসে কিন্তু আমার চিন্তা হতে লাগল। কলকাতায় একজন বন্ধু আমাকে বলেছিলেন, বিদেশে পাশপোর্ট কখনও হাতছাড়া করবেন না। পাশপোর্ট না থাকলে আপনি বিপদে পড়তে পারেন। তাই চিন্তা হচ্ছিল।

আমি বসে আছি আমার ঘরে। মাথায়

চিন্তাটা ঘুরছে। এমন সময় একটি যুবক এসে দেখা করল আমার সঙ্গে। মুখে দাড়ি, বেশ সপ্রতিভ সুন্দর চেহারা। ২৩।২৪ বছর বয়স। বলল: 'স্যর, আমি আপনার "ইন্টারপ্রেটার"। আমার দেরি হয়ে গেছে। দয়া করে কিছু মনে করবেন না। "রাইটার্স ইউনিয়ন" থেকে আমাকে আপনার দোভাষী নিযুক্ত করেছে। আমি সারাক্ষণ আপনার সঙ্গে থাকব।' শুধু দোভাষী নয়, 'রাইটার্স ইউনিয়ন' আমার ব্যবহারের জন্য সারাক্ষণ একটি গাড়িরও ব্যবস্থা রেখেছিল। দোভাষী যুবকটি বেশ চালাক-চতুর, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়ে। যতদূর মনে পড়ছে, তার বিষয় হচ্ছে অর্থনীতি। তাকে বললাম আমার পাশপোর্টের কথা সে খোঁজখবর নিয়ে এসে বলল: 'সব ঠিক আছে, আপনার পাশপোর্ট হোটেলে জমা রাখা আছে।' ওদেশে সব জায়গাতেই তাই দেখলাম। বোধ হয় সব দেশের হোটেলেই এই ব্যবস্থা। আমাদের দেশে কি নিয়ম জানি না।

বুলগেরিয়াতে গিয়েছিলেন স্বয়ং স্বামীজী—১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। বুলগেরিয়া সম্পর্কে স্বামীজী দুটি মন্তব্য করেছিলেন। এক: এখানে এসে মনে হচ্ছে আমি যেন ভারতবর্ষে ফিরে এসেছি। ভারতেই আছি। কথাটা বলেছিলেন সম্ভবতঃ এই কারণে যে, বুলগেরিয়ার তখন খুব দুর্দিন। ভারতের মতোই দরিদ্র। আবার ভারতের মতোই পরাধীন। বুলগেরিয়া প্রায় ৬০০ বছর অটোমান টার্কের (তুরস্কের সম্রাটের) অধীনে ছিল। এখনও তার নিদর্শন রয়েছে। তাদের ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা—অনেক কিছুর মধ্যেই সেই তুরস্কের ছাপ রয়ে গেছে খানিকটা। আর একটা মন্তব্য স্বামীজী করেছিলেন: বুলগেরিয়া ভবিষ্যতে সম্পূর্ণভাবে রাশিয়ার প্রভাবের মধ্যে পড়বে। ঠিক তাই হয়েছে।

বুলগেরিয়ার স্বাধীনতালাভের পিছনে অবশ্য রাশিয়ার অনেক অবদান আছে। স্বাধীনতার জন্য অনেক সংগ্রাম করেছে বুলগেরিয়া, কিন্তু পেরে ওঠেনি। রাশিয়ার জারেরা বারবার বুলগেরিয়াকে সাহায্য করেছে। অবশেষে বুলগেরিয়া স্বাধীন হয়। রাশিয়ার সাহায্যেই হয়। দু-লাখ রুশ সৈন্য তাতে মারা যায়। যে 'জার'-এর সাহায্যে এটা সম্ভব হয়, বুলগেরিয়া তাকে ভুলতে পারেনি। সেই জারের বিরাট মূর্তি গড়ে রেখেছে তারা। ঐ ঘটনাকে মনে রাখার জন্য ওরা একটা বিরাট গির্জাও তৈরি করেছে। সেটা এখনও রয়েছে। এই হচ্ছে প্রথম বিপ্লব। তখন যারা ক্ষমতায় আসে তারা কম্যুনিস্ট নয়। এর পরে আর-একটা বিপ্লবের মাধ্যমে কম্যুনিস্টরা ক্ষমতায় আসে। ওরা বলে এটাই ঠিক ঠিক স্বাধীনতা। এখন কম্যুনিস্টরা ঐ দেশ চালাচ্ছে।

ওদের দেশের লোক দুজনকে প্রায় পুজো করে। একজনের নাম আগে উল্লেখ করেছি—লুদমিলা জিবকোভা। আর-একজন হচ্ছেন কবি ভাপট্সারোভ। ইনি বিপ্লবের কবি। এই কবির একটি বই ইংরেজীতে অনুবাদ হয়েছে। অধিকাংশ কবিতাই শ্রমজীবীদের নিয়ে। তাঁর একটি ছোট কবিতার নমুনা দিচ্ছি: **Spring in the factory**—কারখানায় বসন্ত। কারখানার মধ্যে কারও প্রবেশাধিকার নেই। কর্মীরা সব কাজ করে চলেছে। অক্লান্ত পরিশ্রম। নীরস একঘেয়ে জীবন। এরই মধ্যে হঠাৎ দেখা গেল, কর্মীদের মধ্যে খুশির ছোঁয়া। তারা বলাবলি করছে: বসন্ত এসে গেছে। বসন্ত এসে গেছে। যারা কারখানা পাহারা দিচ্ছিল, তারা বলছে: কি করে এল? আমাদের কর্মীর তালিকায় তো বসন্তের নাম নেই। তাহলে কি করে কারখানায় ঢুকল সে? খুব উদ্বিগ্ন তারা। তারা খুঁজতে

শুরু করেছে অনধিকার প্রবেশকারীকে। শেষে দেখা গেল, যারা খুঁজছে তারাও খুব খুশি। তাদের মনেও বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে। এই সব কবিতার মাধ্যমে তিনি সাধারণ মানুষের মনে বিপ্লবের প্রেরণা যোগাতেন। তখনকার শাসকরা তাই তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তাঁর বয়স তখন মাত্র তেত্রিশ। মৃত্যুর আগে তাঁর স্ত্রীর উদ্দেশে তিনি একটা কবিতা লেখেন। খুব মর্মস্পর্শী কবিতা। কিন্তু প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেও বুলগেরিয়ার মানুষ আজও তাঁকে মনে রেখেছে। ভাপট্সারোভ এখন বুলগেরিয়ার জাতীয় কবি।

সারা বুলগেরিয়ার লোকসংখ্যা আশি লক্ষ। আমাদের কলকাতার চেয়েও কম।

পঞ্চম সাহিত্যিক সম্মেলনে আলোচনার বিষয় ছিল : আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা। আমেরিকার এক বৃদ্ধ সাহিত্যিক হারস্কিন কলওয়ে (৮৪ বৎসর বয়স) প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করলেন। তিনি শুধু সাহিত্যিক নন, সাংবাদিকও। স্পেনের যে গৃহযুদ্ধ তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। আর দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধ তো দেখেছেনই তিনি। বললেন : যুদ্ধ মানুষকে অমানুষ করে, মানুষের মূল্যবোধ, মানুষের মানবিকতা—এ সমস্ত নষ্ট করে দেয়। সবচেয়ে ক্ষতি করে শিশুদের। যুদ্ধের জন্য যে খাদ্যাভাব হয়, দেখেছি। অনাহারে শিশুরা ছটফট করছে, অনেকে মারা যাচ্ছে, দেখেছি। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আরও সব বর্ণনা দিলেন যুদ্ধের। ভয়াবহ সব বর্ণনা। এক-দিন বক্তৃতা হল, কয়েকজন বললেন। আর দুদিন ছোট ছোট দলে নানারকম আলোচনা হল। আলোচনার নানারকম বিষয়বস্তু, কিরকম কবিতা লেখা উচিত, কিরকম উপন্যাস হওয়া উচিত ; অনুবাদ, প্রকাশনের মান কেমন হওয়া উচিত ; ইত্যাদি। এই সব আলোচনা যদিও সাহিত্য বিষয়ে—হচ্ছে কিন্তু শান্তিকে লক্ষ্য রেখে। সবাই বলছে : পারমাণবিক যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। যদি তা হয়, তাহলে তা শুধু আক্রান্ত দেশ বা আক্রমণকারী দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। সারা পৃথিবী তাতে জড়িয়ে পড়বে। মানব-জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। গাছপালা, জন্তুজানোয়ার সব শেষ হয়ে যাবে। জীবন বলে কিছু থাকবে না। এখন, এই ভয়াবহ যুদ্ধ যাতে না বাধে, তার জন্য সাহিত্যিকরা কি করতে পারেন? এই ছিল আলোচনার বিষয়বস্তু। আমাকেও ওঁরা বলবার সুযোগ দিয়েছিলেন। আমার পোশাকের জন্যই সম্ভবতঃ—লক্ষ্য করছিলাম, টি.ভি., ক্যামেরা প্রায় সব সময় আমার দিকেই ঘোরানো আছে। প্রেসের লোকও সম্ভবতঃ ঐ কারণেই আমার সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী। একটা অধিবেশনের পরে একটা জায়গায় বসে হয়তো কারও সঙ্গে কথা বলছি, একজন কার্টুনিস্ট এসে দেখাচ্ছে : আমার একটা ছবি, তক্ষুণি সে এঁকেছে। আমি দেখে বললাম : মোটেই আমার মতো হয়নি। টুপি আর চশমা ছাড়া ওর মধ্যে আমার আর কোন লক্ষণ নেই। সে তখন নতুন করে আবার এঁকে দেখাল। তখন মনে হল, কিছুটা যেন আমার মতো হয়েছে। সে বলল : 'তুমি এটা সই করে দাও, আর তোমার মাতৃভাষায় একটা বাণী লিখে দাও।' সই করলাম, লোকেশ্বরানন্দ এবং বাংলা আর ইংরেজীতে লিখলাম, 'শান্তি, শান্তি, শান্তি'—'Peace, peace, peace'। পরে ওখানকার কাগজে ঐ ছবিটা বেরিয়েছিল। আমাদের কয়েকজনের বক্তৃতাও কিছুটা কিছুটা করে কাগজে বেরিয়েছিল। ওরা রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন বা সাধু-সন্ন্যাসী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানে বলে মনে হয় না। কিন্তু এটা ওরা বুঝতে পেরে-ছিল যে, আমি ধর্মজগতের লোক। ঐ সভা যখন শেষ হল, মঞ্চ থেকে যখন নেমে এলাম (এবং

অন্ত সময়ও), অনবরত লোক আমার কাছে এসে বলেছে : 'Please bless me.' আমরা তো মনে করি কম্যুনিস্ট দেশ, ধর্ম-টর্ম নেই। কিন্তু তাদেরও সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মের জন্য একটা তৃষ্ণা রয়েছে। আর, আমাদের দেশে যেমন প্রতি পাড়ায় একটা না একটা মন্দির, ওদের দেশেও তেমনি অলিতে-গলিতে গির্জা। ওদের অনেকের সঙ্গেই কথা বলে দেখলাম যে, ওরা খুবই গর্বিত, ওদের একটা ধর্মীয় দৃষ্টি আছে বলে। ওরা ধর্মের কথাই বেশি শুনতে চায়। আমাকে একজন যুবক এসে বলল : 'We are spiritually starved. Give us spiritual food.' আমাকে অনেকে এসে জিজ্ঞেস করছে : ধর্ম কি জানতে চাই। কেউ আবার জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে জানতে চায়। দেখলাম, ওদের দেশে ধর্মের ভাব মানুষের মধ্যে খুব প্রবল। সরকার এ ব্যাপারে পুরো নিরপেক্ষ। সরকার নিষেধও করছে না, উৎসাহও দিচ্ছে না। বহু লোক গির্জায় যায়। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাই বেশি—তবে অল্প বয়সী ছেলেমেয়েও আছে। ভারতীয় ধর্মের দিকে তাদের খুব ঝোঁক।

ওখানকার রাষ্ট্রপ্রধান—মিঃ জিবকোভা আমাদের একটা ভোজসভায় ডাকলেন। বিরাট একটা বাড়িতে বিরাট ব্যাপার। রাজপ্রাসাদ—রাজকীয় আয়োজন। খাওয়ার পরে সবাই আমাকে ঘিরে ধরেছে—আমার কাছে ধর্মের কথা শুনতে চায়। তারা বুঝতে পেরেছে যে, আমি একজন ভারতীয় সাধু। আমাকে এসে অনেকে বলেছে : 'আমাকে একটা মন্ত্র দাও, আমি সেটা জপ করব।' আমি বললাম : 'আমি মন্ত্র দিতে পারি না।' একজন এসে জিজ্ঞেস করেছে : 'আমাকে একজন চিঠি লিখেছে—সেই চিঠির প্রথমে এবং শেষে সে লিখেছে "ওঁ রাম"। এই "ওঁ রাম" মানে কি?' আমি জানতে চাইলাম : 'যে চিঠি লিখেছে, সে তোমাদের দেশের লোক, না ভারতীয়?' সে বলল : 'আমাদের দেশেরই লোক। সে একবার দিল্লী গেছিল। দিল্লী থেকে ফিরে এসেই দেখছি, ও ঐরকম লিখছে।' আমি বললাম : '"ওঁ" হচ্ছে ভগবানের প্রতীক। আর ভগবানকে তো আমরা নানা নামে ডাকতে পারি। "রাম" হচ্ছে ভগবানের একটি নাম।' যারা আমার কাছে আসছিল, তারা সকলে দেখলাম অত্যন্ত বিনয়ী, ভদ্র। এই বিনয়, ভদ্রতা যেন তাদের মজ্জাগত। একটি বৃদ্ধার কথা আমি ভুলতে পারব না। ভাঙা ভাঙা ইংরেজী জানে সে। আমাকে বারবার বলছে : 'Please bless my Andree.' অ্যাণ্ড্রি হচ্ছে তার ছেলে—খুব অসুস্থ। আমি বললাম : 'God will bless him.' ঐ মহিলাই আমাকে বললেন : 'আমাকে তুমি একটা বাংলা "গীতাঞ্জলি" পাঠিয়ে দেবে?' আমি বললাম : 'বাংলা তুমি জান কি? "গীতাঞ্জলি" নিয়ে কি করবে?' উনি বললেন : 'সোফিয়া ইউনিভার্সিটিতে একজন বাঙালী আছেন। তাঁর কাছে আমি একটু একটু বাংলা শিখছি। আমার ইচ্ছে "গীতাঞ্জলি" আমি বুলগেরিয়ান ভাষায় অনুবাদ করব।' আমি বললাম : 'আচ্ছা, চেষ্টা করব পাঠাতে।'

ওদের দেশে যা গির্জা আছে, আমাদের দেশে তত মন্দির নেই। সরকার থেকে গির্জাগুলি রক্ষা করা হচ্ছে। সরকারের যা বাজেট, তার শতকরা ১১ ভাগ ঐ গির্জাগুলির জন্য ব্যয় হয়। গির্জাগুলি সবই এখন মিউজিয়াম। গির্জাতে নানারকম আসবাব পত্র আছে। আর আছে 'আইকন্‌স্‌' অর্থাৎ নানারকম মূর্তি, ছবি ইত্যাদি—হীরা, মুক্তা, মণিমাণিক্য দিয়ে সব গাঁথা। শত শত বছরের সব পুরানো। আর অপূর্ব শিল্পকলা। গির্জাগুলিতে দেখলাম প্রণামীর বাক্স রাখা আছে—অনেকে সেখানে পয়সা দেয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে প্রতিষ্ঠান আমরা দেখেছি, সেটা

একটা মঠ। একটা পাহাড়ের উপর এই মঠ। পাহাড়ের নাম 'রীলা পাহাড়'। বল্কান উপত্যকার মধ্যে এই পাহাড় সবচেয়ে উঁচু। হাজার বছরের পুরানো মঠ। সোফিয়া শহর থেকে ২০০ কি. মি. দূরে। কী অপূর্ব মঠ! বিরাট জায়গা। আগে সেখানে চারশো সাধু থাকতেন। এখন মাত্র জনা চল্লিশেক আছেন। এই মঠটিও এখন একটি মিউজিয়াম। প্রচুর ধন-সম্পদ এই মঠের। কারণ দেশটা ধর্মপ্রাণ। আর এই মঠ তাদের ভালবাসার জিনিস। তাই যে যা পেরেছে, অকৃপণভাবে এই মঠকে দিয়েছে। এই মঠ ওদের ইতিহাসের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। ওদের জাতীয় জাগরণের সূত্রপাত হয়েছিল এই মঠ থেকে। মঠের সাধুরাই ঐ আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাই সরকার খুব কৃতজ্ঞ এই মঠের প্রতি এবং এই মঠ রক্ষা করার জন্য সর্বদা তারা সযত্ন। তবে সাধুদের ভরণপোষণের জন্য সরকার কোন অর্থ দেয় না। আমি ঐ সাধুদের জিজ্ঞাসা করলাম: 'কিসে চলে আপনাদের?' ওঁরা বললেন: নানারকম বই, পিকচার-পোস্টকার্ড বিক্রি করে আর পাউরুটি তৈরি করি, তা বিক্রি করে। এতেই ওঁদের চলে যায়। মনে হল ঐ মঠের পাউরুটির খুব নাম আছে। আমি অবশ্য খাইনি। কিন্তু দেখলাম দেশী-বিদেশী যারাই ঐ মঠ দেখতে আসছে, পাউরুটির খোঁজ করছে আর কিনে খাচ্ছে। বহু লোক আসে পাহাড়ের উপর ঐ মঠ দেখতে। খুব নির্জন। মাঝে মাঝে দু-একটা ভালুক ছাড়া জন্তুজানোয়ারের উৎপাতও বিশেষ নেই। আমি কল্পনায় ভাবতে চেষ্টা করছিলাম: চারশো সাধু যখন এই নির্জন মঠে থেকে ধ্যান-ধারণা, ঈশ্বর-চিন্তা করত, তখন কি অদ্ভুত আধ্যাত্মিক পরিবেশ এখানে ছিল!

ওদেশে গিয়ে আমার একটা ধারণা হয়েছে যে, বুলগেরিয়া অনেকটা রাশিয়ার কর্তৃত্বাধীনে রয়েছে। রাশিয়া এমন গাঁটছড়া বেঁধে রেখেছে যে, রাশিয়া উঠতে বললে ওঠে, আর বসতে বললে বসে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম—হয়তো ভুল হতে পারে আমার—একটা চাপা রেষারেষি ভাব দু-দেশের মধ্যে রয়ে গেছে। বুলগেরিয়া কখনও রাশিয়ার নাম করে না। রাশিয়ার 'জার' যে এক সময় ওদের স্বাধীনতা লাভ করতে সাহায্য করেছিল, দু-লক্ষ রুশ সৈন্য মারা গেছিল, —সেটা ওরা স্বীকার করে, কিন্তু ইদানীংকালে রাশিয়া ওদের সাহায্য করছে, ওরা খুব কৃতজ্ঞ—এ-ধরনের কথা একবারও বলল না।

দু-দেশের মধ্যে যে একটা রেষারেষি আছে, সেটা বেশ বুঝতে পারা গেল একটা ফুটবল ম্যাচের মধ্য দিয়ে। হোটেলে বসে আছি। হঠাৎ আমার দোভাষী ছেলেটি এসে হাজির। মুখে চোখে উত্তেজনা। বলছে: 'তুমি "সকার" জান?' 'সকার' অর্থাৎ ফুটবল। আমি বললাম: 'হ্যাঁ, জানি।' —'তোমাদের দেশে ছেলেরা সকার খেলে?' আমি বললাম: 'ছেলেরা কেন, মেয়েরাও খেলে। আমিও খেলেছি এক সময়।' তখন সে বলছে: 'তুমি সকার দেখবে? আজ খুব বড় একটা খেলা আছে। বুলগেরিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার।' আমি তখন ওকে একটু ক্ষ্যাপাবার জন্য বললাম: 'তা তোমরা কি আর রাশিয়ার সঙ্গে পেরে উঠবে? রাশিয়া নির্ঘাৎ তোমাদের হারিয়ে দেবে।' সে বলল: 'না, না, আমরাও কম না। আমরাও কতবার রাশিয়াকে হারিয়েছি।' যাই হোক, সে বলে গেল যে, রাত আটটার সময় আমার ঘরে আসবে। তখন আমি আর সে দুজনে মিলে টি. ভি.-তে খেলা দেখব। আটটার সময় তার আর পাত্তা নেই। আসলে অন্য কোথাও বসে সে টি. ভি-তে খেলা দেখায় মজে গেছে। আমার কথা আর তার মনে নেই। ঘরে টি. ভি. রয়েছে। আমি এই বোতাম সেই

বোতাম নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে দেখি পর্দায় খেলা ভেসে উঠল। দু-দলের খেলা হচ্ছে। ধারা-বিবরণীও হচ্ছে। কিন্তু কোন্‌টা যে কোন্‌ দল বোঝার উপায় নেই। কারণ ভাষা জানি না। আবার দু-দলের জার্সির রঙও টি. ভি.-তে একই রকম মনে হচ্ছে। খেলা দেখে যেতে লাগলাম। হঠাৎ একটা গোল হয়ে গেল এক-দিকে। গোটা মাঠ থমথমে; একটা হাততালি নেই, কিছু নেই। তখন মনে হল: সম্ভবতঃ বুলগেরিয়া গোল খেয়েছে। কারণ দোভাষীর কাছ থেকে এইটুকু জেনেছিলাম যে, বুলগেরিয়াতেই খেলা হচ্ছে। একটু পরে অপর পক্ষ গোল শোধ করে দিল তখন সারা মাঠে উল্লাস। তখন নিঃসন্দেহ হলাম কোন্‌ দিকটা বুলগেরিয়া আর কোন্‌ দিকটা রাশিয়া। দেখতে দেখতে আরও দুটো গোল দিল বুলগেরিয়া। সারা মাঠ আনন্দে একেবারে যেন ফেটে পড়ছে। ৩—১ গোলে হেরে গেল রাশিয়া। খেলা চলার সময় লক্ষ্য করছিলাম, বুলগেরিয়ার একটি খেলোয়াড় ১১ নং জার্সি, খুব ভাল খেলছিল। রাশিয়ানরা বারবার তাকে লাথি মারছে আর সে পড়ে যাচ্ছে। রেফারী হুইসেল দিল দু-একবার। কিন্তু খুব একটা সুবিধা করতে পারল বলে মনে হল না। বুলগেরিয়ার দু-একটা পেনাল্টি কিক্‌ পাওয়া উচিত ছিল। আমি জানি না, রেফারী কোন্‌ দেশের—বুলগেরিয়ার, রাশিয়ার, না তৃতীয় কোন দেশের।

খেলা শেষ হয়ে যাওয়ার বেশ খানিকক্ষণ পরে সেই দোভাষী ছেলেটি এসে উপস্থিত। সে এসে বলছে: 'Honourable Swami, (এই-ভাবেই সে আমায় সম্বোধন করত) I am very sorry. আমার বন্ধু-বান্ধবরা সব নিচের ঘরে ধরে বসাল। ওখানে টি. ভি. চলছিল। ওখানেই খেলা দেখতে বসে গিছলাম। আমি আর তোমার কাছে আসতে পারিনি। আমাকে ক্ষমা করো।' আমি জিজ্ঞেস করলাম: 'কি হল ফল?'—'আমরা জিতেছি।' আমি বললাম: '৩—১ গোলে?' সে অবাক: 'জানলে কি করে? তুমি খেলা দেখেছ?' আমি বললাম: 'হ্যাঁ', সে বলল: 'দেখেছ ১১নং খেলোয়াড়কে কিরকম মারছিল ওরা; আর রেফারী কিরকম দুর্বল?' আমি বললাম: 'হ্যাঁ, সেটা আমিও লক্ষ্য করেছি। দু-দলের মধ্যে ১১নং-এর খেলাই সবচেয়ে ভাল লাগল।'

বুলগেরিয়া ছোট দেশ। কিন্তু খুব সুন্দর দেশ। সারা পৃথিবী থেকে বহু পর্যটক বুলগেরিয়ায় আসে। ওদের দেশে বিশেষ কোন শিল্প নেই। ওরা বলে 'ট্যুরিজম্‌' ওদের প্রধান শিল্প। বাস্তবিক এই পর্যটকদের দৌলতে ওদের বিরাট আয় হয়। জীবনের মান বেশ উন্নত। রাস্তাঘাট চমৎকার। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ি। মানুষগুলির স্বাস্থ্যও খুব ভাল, পোশাক-পরিচ্ছদও ভাল। আর সকলেই বেশ হাসি-খুশি। সবাই কাজ পায়। অনেকে আবার ছাত্র-অবস্থাতেই বিয়ে করে। তা বলে মা-বাবার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক একেবারে শিথিল হয়ে যায় তা নয়। বুলগেরিয়া বা রাশিয়া দু-দেশেই দেখেছি, মা-বাবার প্রতি ছেলেমেয়ের খুব আকর্ষণ। ছাত্রজীবন থেকেই প্রত্যেকে একটা কাজ খুঁজে নেয়। বাবা-মার উপর নির্ভর করতে চায় না। আমার যে দোভাষী, সে ছাত্র, কিন্তু চাকরি করে। বিয়ে করেছে এবং স্ত্রীও একটি কাজ করে। ও যা হিসেব দিল তাতে মনে হল সাত-আটশো টাকা পায়। সেটা বড় কিছু নয়। ওর স্ত্রী আর একটু বেশি পায়। ছেলেটি সংবাদ-পত্রে কাজ করে। আমি বললাম: 'এই কাজটা কি তোমার মনের মতো?' ও বলল: 'হ্যাঁ, আমার মনের মতো।' আমি জানতে চাইলাম: 'তুমি সাংবাদিকতার কতখানি জানো যে, ওরা তোমাকে এই কাজের উপযুক্ত মনে করল?'

সে বলল : 'দেখ, আমি যে এক্ষুনি সাংবাদিকতার বিশেষ কিছু জানি, তা নয়। আমি দরখাস্ত করেছিলাম। আমাকে কিছু লিখতে বলেছিল, লিখেছিলাম। তারপর ওরা আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে। তাতে ওদের মনে হয়েছে, আমার মধ্যে সাংবাদিক হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এখন ওরাই আমাকে তৈরি করে নেবে।' তার স্ত্রীও একটা বাচ্চাদের স্কুলে পড়ায়। এই কাজটা ওর স্ত্রীর খুব পছন্দ নয়। তবে মাইনে বেশি। বুলগেরিয়া আর রাশিয়া দু-দেশেই শিক্ষকদের খুব মোটা বেতন।

আমার খুব ইচ্ছে ছিল বুলগেরিয়ার গ্রাম দেখা। কারণ গ্রাম দেখলে একটা দেশকে ঠিক ঠিক চেনা যায়। সোফিয়া থেকে রিলা পাহাড়ে যাবার পথে সে সুযোগ হয়ে গেল। প্রায় ২০০ কি. মি. পথ। এই ২০০ কি. মি. রাস্তার মধ্যে আর কোন শহর নেই। দু-পাশে শুধু গ্রাম। ছোট ছোট পাহাড়, তার উপর পাথরের ঘরবাড়ি। বাড়িগুলি খুব সুন্দর; সাজানো-গোছানো। যারা কাজ করছে মাঠে, অধিকাংশই মেয়ে। তাদের হাতে গ্লাভস পরা, আর জামা-জুতো পরে কাজ করছে। রাস্তার দু-ধারে যতদূর দৃষ্টি যায়, সবুজ আর সবুজ। এতটুকু রুক্ষতা নেই। জিজ্ঞেস করলাম: 'চাষের জল পাও কোথায়?' ওরা দেখালো: 'দূরে নদী আছে, মাঝে মাঝে বাঁধ দিয়ে জল ধরে রাখা আছে। সেখান থেকে লম্বা লম্বা পাইপের সাহায্যে চারিদিকে সেচের জল দেওয়া হচ্ছে।' আর-একটা দৃশ্য দেখে খুব ভাল লাগল। অসংখ্য ভেড়া চরছে—ঘাসে মুখ দিয়ে ঘাস খাচ্ছে, আর একটি লোক লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মাথায় টুপি, গায়ে আলখাল্লা আর সঙ্গে একটা কুকুর। ছোটবেলায় বাইবেলের পৃষ্ঠায় ঠিক এইরকম ছবি দেখেছিলাম মেষপালকের। আমার মনে হল, আমি যেন হঠাৎ যীশুখ্রীষ্টের যুগে চলে গেছি।

ওখানে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমাদের একটু অসুবিধে হয়। রাশিয়াতে আরও অসুবিধে হয়। ওরা আমিষ খাবার যা দেয়, তা খাওয়া চলে না। আবার নিরামিষেরও ভাল ব্যবস্থা নেই। আমিষ খাবার বলতে হয় গরুর মাংস, নয় শুয়োরের মাংস। নয়তো দুটো মিশিয়ে আর-একটা কিছু। ভারতবর্ষ বা বাংলাদেশ থেকে অন্য যাঁরা গেছিলেন, তাঁরা দেখলাম গরু-শূয়োর বেমালুম খেয়ে গেলেন। আমি খেতাম দু-এক-টুকরো রুটি, শশা, টম্যাটো আর দই। পাশ্চাত্য দেশে ওরা দইকে 'ইয়োগার্ট' বলে। খুব ভাল দই। প্রায় এক বাটী দই খেয়ে ফেলতাম। আর আইসক্রীম বা চীজ একটু আধটু খেতাম।

ভারতে ফেরার পর দিল্লীতে বুলগেরিয়ান এমব্যাসীর যিনি সাংস্কৃতিক বিভাগের প্রধান, তাঁর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। তিনি একজন মহিলা—মিসেস কামোভা। বুলগেরিয়া যাবার আগেই উনি আমাকে বলেছিলেন: 'ফিরে এসে আমাকে বলবেন, আমাদের দেশ কেমন লাগল।' সেই মতো দিল্লীতে ফিরে ওঁর কাছে গেছি। উনি আমাকে খুব খাতির-যত্ন করলেন। তারপর নানা কথাবার্তার পর জিজ্ঞাসা করলেন: 'ওদেশে তোমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোন কষ্ট হয়নি তো?' আমি বললাম; 'তোমাদের দেশের অত ভাল দই—কষ্ট হবে কেন?' কিন্তু ওঁর গর্ব দেখলাম, ওঁদের দেশের চীজ সম্বন্ধে। বললেন: 'আর চীজ খাননি? বড় ভাল চীজ আমাদের!' আমি বললাম: 'হ্যাঁ, তাও খেয়েছি।' উনি তখন বললেন: 'আমাদের দেশের সেরা চীজ আপনাকে এখন খাওয়াব।' আমি তো প্রমাদ গুনছি। রাশিয়ায় চীজ খেয়ে খেয়ে আমার তখন চীজ-এর নাম শুনলেই ভয় করছে। কি আর করব? উনি তিনরকম চীজ নিয়ে এলেন আমার জন্য। বললেন: 'ভেড়ার

দুধের চীজ, বিশেষভাবে তৈরি। ভেড়াকে নির্দিষ্ট জায়গায় বিশেষ ধরনের ঘাস খাওয়ানো হয়েছে। সেই ঘাস খেয়ে ভেড়া যে দুধ দিয়েছে, সেই দুধের থেকে এই চীজ তৈরি হয়েছে। খেয়ে দেখুন কেমন?' কি আর করি? খেলাম। কোন বিশেষত্বই বুঝতে পারলাম না। মুখে অবশ্য বলতে হল: 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাল।'

আমার দোভাষী ছেলেটির সম্বন্ধে আর একটু বলি। বেশ দায়িত্বশীল ছেলে। আমাকে যতটুকু ওর সাহায্য করার কথা, আন্তরিকভাবে করেছে। প্রতিদিনই সকাল নটা-দশটার সময় আসত। সারাদিন আমার সঙ্গে থাকত। একদিন দুপুর হয়ে গেছে, তবুও সে আর আসে না। প্রায় দুটোর সময় এল। একেবারে অন্য মানুষ। চোখ লাল, উস্কো-খুস্কো চুল। এসে পাঁচ মিনিট ধরে কি সব কথা বলে গেল, কিছু বুঝতে পারি না। শেষকালে আমি বললাম: 'কি ভাষায় কথা বলছ আমার সঙ্গে? আমি তো ইংরেজী ছাড়া কিছু জানি না।' তখন সে বলছে: 'আমি খুব দুঃখিত। কাল রাত তিনটে পর্যন্ত বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মদ খেয়েছি। এই মাত্র ঘুম থেকে উঠে এসেছি। কার সঙ্গে কথা বলছি, কোথায় এসেছি—সব আমি ভুলে গেছি। আপনি কিছু মনে করবেন না, আমাকে ক্ষমা করবেন।' খুব দুঃখ হল আমার। বললাম: 'তোমার ২৩।২৪ বছর বয়স, ছাত্র। কেন তুমি মদ খাবে?' সে বলল: 'মদ আর সিগারেট আমাদের দেশে সবাই খায়।' সেটা অবশ্য আমিও লক্ষ্য করেছি। মেয়েরাও সিগারেট খায়। বললাম: 'তা বলে তুমি এতটা মদ খাবে যে, তুমি বেহুঁশ হয়ে যাবে? স্থান-কাল ভুলে যাবে? তোমার নটা-দশটায় সময় আসবার কথা, এলে দুটোর সময়! আমার অবশ্য সেজন্য কোন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু তোমার কেন এরকম বদ অভ্যাস হবে?' সে বলল: 'আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে।' আমার যেটা ভাল লাগল, সেটা হচ্ছে এই: আমার সঙ্গে তো ছেলেটির দুদিনের আলাপ। ভিন্ দেশের লোক আমি। আমার তিরস্কারের উত্তরে সে তো আমাকে কয়েক কথা শুনিয়ে দিতে পারত! তা না করে, মাথা নিচু করে আমার ধমক শুনল, তার দোষ স্বীকার করল।

ছেলেটি বেশ সুপুরুষ আর বুদ্ধিমান। ওর মাও খুব বুদ্ধিমতী মহিলা। ফরাসী ভাষা খুব ভাল জানেন—ইংরেজী তেমন জানেন না। তিনি এসে মাঝে মাঝে খোঁজ করতেন—'ও আপনার ঠিকমতো দেখাশুনা করছে তো?' আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে ছেলেটি গোটা সোফিয়া ঘুরে দেখিয়েছে। ওরা আমার হাত-খরচ হিসেবে বেশ কিছু 'লেভ্' দিয়েছিল। [বুলগেরিয়ান মুদ্রাকে 'লেভ্' বলে। রাশিয়ান মুদ্রাকে 'রুবল্' বলে। 'লেভ্' এবং 'রুবল্'-এর দাম সমান। এক লেভ্ বা এক রুবল্ আমাদের দেশের ১৫ টাকার সমান] আমি গোটা টাকাটাই ওকে দিয়ে বলেছিলাম: 'আমার কোন হাত-খরচ প্রয়োজন নেই; তোমার দরকার হলে ব্যবহার করতে পার।' সে আপত্তি করেছে: 'না, না, তোমায় কিছু কিনতেই হবে।' আমি বললাম: 'আচ্ছা, কিনব, তবে শুধু তোমাদের দেশের জিনিস কিনব। তোমাদের দেশের কলম আছে?' সে নিয়ে গেল ওদের দোকানে। দোকানে শুধুই বিদেশী কলম। ওদের দেশে ভাল কলম তৈরি হয় না দেখলাম। শেষে কয়েকটা ডট্ পেন কিনলাম। অতি সাধারণ ডট্ পেন। আর কিছু ওখানকার লোকসঙ্গীতের রেকর্ড কিনলাম। হোটেলে একদিন হঠাৎ টি. ভি. খুলেছি, দেখি নাচ-গান হচ্ছে। সেই গানের ভাষা কিছু বুঝছি না। কিন্তু সুর একেবারে আমাদের দেশের পল্লীগীতির মতো। তখনই আমার ইচ্ছে হয়েছিল—ওদের দেশের পল্লীসঙ্গীতের কয়েকটা রেকর্ড

কেনায়। সেই রেকর্ড কয়েকটা কিনলাম।

এই দোভাষী ছেলেটি বলে যে, সে মার্কসবাদী —ধর্ম মানে না। সে বলছে: 'আমি সৎ হব, ভাল হব। তার জন্য ধর্মের কি দরকার আছে?' আমি বললাম: 'তুমি ধর্ম বাদ দিয়ে যদি সৎ হতে পার, সে ভাল কথা। কিন্তু সৎ তুমি কেন হবে? সৎ হবার জন্য নিজের দিক থেকে একটা তাগিদ তো থাকা চাই। ধর্ম না হলে সে তাগিদ আসে না।' ফিরে আসার সময় আমি ঐ ছেলেটিকে বললাম: 'আমি দেশে ফিরে তোমার জন্য কিছু পাঠাতে চাই, কি পাঠাব বল দেখি?' এদিকে ধর্ম মানে না, কিন্তু বলল: 'তোমাদের দেশের মন্দিরের একটা অ্যালবাম যদি পাঠাও, খুব খুশি হব।' আমি বললাম: 'আচ্ছা, সেরকম যদি কোন অ্যালবাম পাওয়া যায়, পাঠাব।'

এই দোভাষী ছেলেটির কথা বাদ দিলে, সাধারণভাবে আমি যা দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে ওদেশের লোক 'ধর্মপ্রাণ'। ধর্ম তাদের একেবারে মজ্জাগত হয়ে গেছে। অবশ্য আনুষ্ঠানিক যে ধর্ম, সেটাকে ওরা পছন্দ করে না। যাঁরা ধর্ম মানেন না বলেন, তাঁরা আসলে আনুষ্ঠানিক ধর্মকেই গোটা ধর্ম মনে করেন বলেই ঐরকম বলেন। আসলে তো তা নয়। ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিকটা কারও কারও ক্ষেত্রে হয়তো প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেটা ধর্মের আবশ্যিক অঙ্গ নয়। ধর্মের বহিরঙ্গ সেটা। প্রকৃত ধর্ম যেটা, সেই ধর্মকে মানতে ওদের কোন আপত্তি নেই। যে ধর্ম বলে যে, তোমার নিজের বিকাশ ঘটাও, যে ধর্ম মানুষকে নিষেধ করে নিজেকে দেহ-সর্বস্ব ভাবতে; যে ধর্ম বলে, জীবনের উদ্দেশ্য শুধু ভাল থাকা-পরা নয়; জীবনের উদ্দেশ্য মানুষ হিসেবে উন্নত হওয়া; সৎ, পবিত্র, নিঃস্বার্থ ও প্রেমিক হওয়া—সেই ধর্মকে ওরা শ্রদ্ধা করে। সেই ধর্মের কথাই ওরা শুনতে চায় বা সেই ধর্মকেই ওরা অনুসরণ করতে চায়। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ভারতীয় ধর্মচিন্তা; আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে স্বামীজী যে-ধরনের ধর্মের কথা বলে গেছেন সেই ধর্মের চিন্তা, ওদের মধ্যে ঢুকে গেছে। ওদেশের মানুষ বুদ্ধিমান মানুষ—যথেষ্ট চিন্তাশীল। তারা এই ধর্মের জন্যই উন্মুখ হয়ে আছে। লুদমিলা জিবকোভা—যাঁর উদ্যোগে এই শান্তি সম্মেলন শুরু হয়েছিল—তিনি একটা 'শান্তির ঘণ্টা' স্থাপন করেছিলেন একটা পাহাড়ের উপর। প্রকাণ্ড ঘণ্টা—বেশ কয়েকজন লোক না হলে সেই ঘণ্টা বাজানো যায় না। শান্তি-সম্মেলন চলার সময় একদিন এই ঘণ্টার কাছে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। গান চলতে লাগল। ভাষা বুঝি না, কিন্তু নিশ্চয়ই শান্তি-সম্পর্কিত গান, সেই গানের সঙ্গে ঘণ্টা বাজতে লাগল। এই ঘণ্টা যেন একটা প্রতীক। অর্থাৎ নতুন প্রভাত শুরু হল। আর হিংসা নয়, আর বিবাদ নয়। এবার শান্তি। একজন কবি এই ঘণ্টাকে উদ্দেশ করে সুন্দর কবিতা পাঠ করলেন। একদল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী সেখানে উপস্থিত ছিল। তারা কেউ কেউ গান করল, সেই গানের মর্ম শান্তি। তাদের কেউ কেউ আবার বক্তৃতা করল। সারা পৃথিবীর বয়স্কদের উদ্দেশে তারা আবেদন করেছে: 'দোহাই তোমাদের, যুদ্ধ বাধিও না। আমাদের জীবন সবে শুরু হয়েছে। জীবনটাকে আমরা দেখতে চাই। বাঁচতে চাই আমরা। যুদ্ধ বাধালে আমরা ছোটরা আর বাঁচব না।' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অনেক শিশু তাদের বাবা-মা বা অন্য প্রিয়জনদের মরতে দেখেছে, নিজেরাও ঘরের মধ্যে বন্দী থেকে অনাহারে দিন কাটিয়েছে। পরে তারাও মারা গেছে। মারা যাওয়ার আগে তাদের কেউ কেউ নিজেদের অভিজ্ঞতা ডায়েরিতে লিখে গেছে। সেইরকম কয়েকটি শিশুর ডায়েরি থেকে তারা পড়ে শোনাল: 'দুদিন কিছু খেতে পাইনি; আজ বোন মারা গেল; গতকাল বাবা মারা গেছেন।' মর্মস্পর্শী সব বর্ণনা। এখন যারা শিশু, তাদের যাতে সেই দুঃখ না পেতে হয়, সেজন্য তাদের হয়ে বুলগেরিয়ার ঐ সব ছাত্র-ছাত্রীরা পৃথিবীর সব বয়স্ক চিন্তাশীল মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছে; 'আমাদের বাঁচতে দাও।'

বিস্মৃত কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস

শ্রীরাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী

সুপরিচিত লেখক ও কাব্য-সমালোচক।

প্রকৃত কাব্যশক্তির অধিকারী হয়েও কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস আজ সাধারণ পাঠকের কাছে বিস্মৃত; অথচ তাঁর কবিচিত্তের সহজ সহৃদয়তা, দুর্নিরোধ্য আবেগ এবং গভীর বাস্তববোধ একসময় বাংলার কাব্যরসিক এবং বিদগ্ধজনের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল।···

গোবিন্দ দাস ছিলেন স্বভাবকবি। এই বিশেষণেই তাঁর কাব্যধর্মের পরিচয়। দুর্দম আবেগ এবং সহজ হৃদয়োচ্ছ্বাসের মধ্যে তাঁর কবিত্বশক্তি প্রকাশপথ বেছে নিয়েছে। সেই প্রকাশধর্মে কোনরকম কৃত্রিমতা নেই,—নেই কোন শিল্পী-মনের অহেতুক উদাত্ততা। কেবল মুক্ত মনের স্বভাব-উক্তিতেই তাঁর কলাকৃতির প্রকাশ। যদিও অনাবিল অনুভূতির একটা সহজ প্রকাশ দানের প্রবণতা কবির ছিল, তবু সেখানে ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে কাব্যজীবনের কোন ব্যবধান বা বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়নি। যাঁদের কাব্যধর্মে এই ব্যবধান সুস্পষ্ট, গোবিন্দ দাস তাঁদের দলভুক্ত হতে পারেননি। চটুল ছন্দের সৌকর্যে এবং ভাষার ভেলকিতে পাঠক চিত্তকে অভিভূত করতে তিনি অপারগ; আবার ঐ দুটির সচেতন বিন্যাসে মনের সহজ ভাবানুভূতিকে চাপা দিতেও তিনি অনিচ্ছুক। বোধ হয় সেই কারণে কবি সাধারণ পাঠকের কাছে সুপরিচিত হতে পারেননি,—বা তাঁর কবিতা সর্বত্র যথাযোগ্য সমাদরলাভ করেনি।

গোবিন্দ দাসের জন্মসাল—৪ঠা মাঘ, ১২৬১ (ইংরেজী,—১৬ জানুআরি, ১৮৫৫) জন্মস্থান,—ঢাকা জেলার ভাওয়াল জয়দেবপুর। কবির পিতার নাম, রামনাথ এবং মা,—আনন্দময়ী। 'ফুলরেণু'-কাব্যগ্রন্থে কবি নিজের ব্যক্তিপরিচয় প্রসঙ্গে লিখেছেন,—

> "জয় জয় জন্মভূমি 'জয়দেবপুর'
> জয় জয় পুণ্যময়ী ধবলা 'চিলাই'
> প্রকৃতির রত্নভাণ্ডে সুধা সুমধুর
> বিধাতা রেখেছে বুঝি আর কোথা নাই।
> এই 'দেবপুরবাসী'—দেবতা আমার,
> জননী 'আনন্দময়ী' পিতা 'রামনাথ',
> সারদা প্রেয়সী পত্নী প্রেম পারাবার
> দুহিতা 'প্রমদা', 'মণি' তাহাদের সাথ···"

কবি দরিদ্র পিতার সন্তান। পারিবারিক অবস্থা অসচ্ছল হলেও তিনি বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন। গ্রামের বিদ্যালয়ে তাঁর ছাত্রজীবন শুরু। সেখান থেকে ছাত্রবৃত্তি পেয়ে ঢাকা নর্ম্যাল স্কুলে একবছর পড়াশুনা করেছিলেন। পরে ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলেও কিছুদিন পড়েছিলেন। ঐ সময় তাঁর বিদ্যাশিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতেন ভাওয়ালরাজ কালীনারায়ণ। কিন্তু সুযোগ পেয়েও কবির বিদ্যাশিক্ষা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। এর একমাত্র কারণ,—পারিবারিক দুরবস্থা। দুর্ভাগ্য এবং দুরবস্থার প্রবল ঘূর্ণিতে কবির মানসিক স্বাস্থ্য বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তাই রাজপরিবারের অর্থানুকূল্য পেয়েও তাঁর বিদ্যাশিক্ষার বিস্তার ও বিকাশ কোনটিই আশানুরূপ হয়নি। অনেকের মতে অমনোযোগ ও অস্থিরচিত্ততার ফলে কবির বিদ্যাশিক্ষা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। এরূপ মতবাদ সর্বাংশে স্বীকারযোগ্য নয়; কারণ বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে কবির কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সঙ্গেই উত্তীর্ণ

হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ এই কৃতিত্বের জন্যই রাজপরিবারের অর্থানুকূল্য লাভ করেছিলেন। তাছাড়া তাঁর ছাত্রজীবন সহজ ও স্বাভাবিক ছিল না। সেখানে কিছুটা অস্থিরমতিত্ব প্রকাশ পেলেও সেটি কেবল দারিদ্র্য এবং দুর্ভাগ্যের কারণেই। ঐ কারণেই তাঁর বিদ্যাশিক্ষায় নানা বিভ্রাট ঘটেছিল।

ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে গোবিন্দ দাসের কোন পরিচয় ছিল না। ঢাকা নর্ম্যাল স্কুলে ইংরেজী শিক্ষার কোন সুবিধা ছিল না। সেখানে কবি সংস্কৃত ভাষা কিছুটা আয়ত্ত করেছিলেন। ইংরেজী ভাষার সঙ্গে অপরিচিত ছিলেন বলে তাঁর কাব্যে কোন ইংরেজ কবির বা ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব পড়েনি। সমকালীন বাংলাকাব্যই তাঁকে কাব্যরচনায় প্রেরণা দিয়েছিল। এই কারণে 'গোবিন্দ চয়নিকা' গ্রন্থের সম্পাদক, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কবিকে 'উনবিংশ শতাব্দীর খাঁটি বাঙালি কবি' আখ্যায় ভূষিত করেছেন ['গোবিন্দ চয়নিকা'/যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত, (১৩৫৫), পৃঃ ১১]। যেহেতু কবির কাব্যে কোন বিদেশী প্রভাব পড়েনি, সেইহেতু দেশবাসী তাঁকে 'স্বভাবকবি গোবিন্দ দাস' আখ্যায় শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন। সমকালীন কবিদের মধ্যে কবির এখানেই অসাধারণত্ব ['বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড)/ডঃ সুকুমার সেন, (১৩৫০), পৃঃ ৫২৯]।

দরিদ্রের সন্তান গোবিন্দ দাসের ব্যক্তিজীবন কোন সময় সুখের ছিল না। সমস্ত জীবন তিনি দুঃখের গহনে নিমগ্ন ছিলেন। ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনে শোক, দারিদ্র্য, উৎপীড়ন, নির্বাসন, অনশন ইত্যাদি সকল অভিশাপ সহ্য করতে হয়েছিল। সে এক অতি মর্মান্তিক জীবন…। যৌবনে প্রথমা স্ত্রী সারদাসুন্দরীর মৃত্যু কবির জীবনে এক নিদারুণ আঘাত হেনেছিল। এই দুর্ঘটনার সাত বছর পর কবি দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয়া পত্নীর নাম, প্রেমদা-সুন্দরী। কিন্তু দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের পরও তিনি প্রথমার স্মৃতি ভুলতে পারেননি। নিম্নোক্ত কয়েকটি ছত্রে কবি নিজের শোকাতুর মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন :

'সারদা পশ্চিমে ডুবে, প্রেমদা উঠিছে পূবে
জীবন গগন মধ্যে আমি দাঁড়াইয়া,
অপূর্ব্ব সুন্দরী ঊষা, অপূর্ব্ব সন্ধ্যার ভূষা,
পৃথিবীর দুই প্রান্ত উঠিছে প্লাবিয়া।…
প্রেমদা পদ্মার কূলে, কোমল শেফালী ফুলে,
করিয়া বাসর সজ্জা ডাকিছে আমায়,
সারদা 'চিলাই' তীরে আমকাঠ দিয়ে শিরে,
আঁচল বিছায়ে ডাকে চিতা-বিছানায়।…'
['কস্তুরী']

স্ত্রী-বিয়োগের এক বছর পর কবির ভ্রাতৃ বিয়োগ ঘটে ; আবার সেই বছরের কয়েক মাসের মধ্যেই কবির জীবনে আর-এক শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর প্রথমা পত্নীর শেষ স্মৃতি মণিকুন্তলা হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। কবির একটি কবিতায় এই শোকানুভূতি মর্মস্পর্শী রূপ পেয়েছে :

'তপস্বীর তপোরথে, জ্ঞানময় মহাপথে
যায় ব্রহ্মময়ী মেয়ে—সারদা তোমার,
লও সে স্নেহের বুকে, যাক মেয়ে চিরসুখে—
এ জীবনে তার তরে ভাবিব না আর।'
['কস্তুরী']

এছাড়া কবির প্রথমা কন্যা, সারদার গর্ভজাত সন্তান প্রমদার মৃত্যু কবির জীবদ্দশায় ঘটেছিল।

কবি গোবিন্দ দাসের জীবনে দ্বিতীয় অভিশাপ, —দারিদ্র্য। দরিদ্রতা হেতু জীবনে তিনি নানা দুঃখকষ্ট ভোগ করেছেন, নিদারুণ বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন এবং দিনের পর দিন বিনা চিকিৎসায় রোগযন্ত্রণা ভোগ করেছেন। আবার

জীবন-সায়াহ্নে দুরবস্থার চরমসীমায় উপনীত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করেছেন। তবে দারিদ্র্য নানা সময়ে এবং নানাভাবে তাঁকে বিপর্যস্ত করলেও, তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে এতটুকু ম্লান করতে পারেনি ; বরং দারিদ্র্যের খরতাপে কবির জীবন-বোধ দীপ্ত ও তেজোময় হয়ে উঠেছিল। এই দারিদ্র্যের খরতাপ তাঁকে ভগবদ্‌নিষ্ঠায় প্রণোদিত করেছিল। দুঃখ-শোকের আঘাতে তাঁর অধ্যাত্ম-বিশ্বাস ক্রমশঃ দৃঢ় হতে শুরু করেছিল। কয়েকটা কবিতায় গোবিন্দ দাসের ভগবদ্‌নিষ্ঠা সুব্যক্ত হয়েছে :

(১) 'শ্রীহরি শ্রীবিষ্ণু ভগবান
দীনবন্ধু করুণা নিধান
এ গৃহের গৃহী তিনি এ বিশ্ব-মন্দিরে যিনি
সর্ব্বত্র করেন অধিষ্ঠান!
তাঁর পূজা তাঁর অর্চ্চনায়
অবিচল ভকতি শ্রদ্ধায়
রহ রত সেবক সন্তান…'
['নব্যভারত' পত্রিকা/বৈশাখ, ১৩১১]

*

(২) 'সকলি ধ্বংসের পথে! সকলি ধ্বংসের পথে।
ওহে ভগবান হরি,
দেও হে করুণা করি,
তোমাতে বিশ্বাস ভক্তি অধম শরণাগতে ;
দেও হে চরণ রাঙ্গা,
ভীতচিত-ভয়-ভাঙ্গা,
হে মুকুন্দ! হে মুরারে! হে কৃষ্ণ কমলাপতে।'…
['ধ্বংসের পথে']

*

(৩) 'নাথ! সাগরে যেমন নদ নদীচয়,
কেহ কর্দ্দমাক্ত কেহ স্বর্ণময়,
চলিছে জীবন, তেমনি হৃদয়
তোমাতে মিশিবে, করুণা সাগর তুমি!…'
['আমি তোমার']

ব্যক্তিজীবনে কবি বিভিন্ন ব্যক্তির স্নেহচ্ছায়ায় বেতনভুক কর্মচারী হিসাবে কাজ করেছেন। কখন জমিদার কাছারির নায়েব-রূপে, কখন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-রূপে ; আবার কখন পত্রিকা অফিসের কার্যাধ্যক্ষ-রূপে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করেছেন। কিন্তু চাকরির প্রতি তাঁর এতটুকু মোহ বা আকর্ষণ ছিল না। জীবনধারণের আর কোন উপায় ছিল না বলেই তাঁকে অপরের দাসত্ব করতে হয়েছে। তবে যে কর্মস্থলে তাঁর চারিত্রিক আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়েছে বা মানসিক স্থৈর্যতা বিঘ্নিত হয়েছে, তখনি সেখান থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। এর পরিণতি যে কত নিদারুণ, সেকথা কদাচ ভেবে দেখেননি। শুধু তাই নয়, জীবনে নানা দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হলেও কবি কখনও মানুষের নীতিহীনতাকে প্রশ্রয় দেননি ; বরং কয়েকটি ক্ষেত্রে রূঢ় প্রতিবাদ করে নিজের দুর্ভাগ্যকে অতি সহজে বরণ করে নিয়েছেন। অনেকের আখ্যায় এটি তাঁর অব্যবস্থিত চিত্তের পরিচায়ক। যদি তাই হয়, তবে এই অব্যবস্থিত চিত্ততার মধ্যেই তিনি নিজের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কবিচিত্তের এই রূঢ় সবলতা বাংলাকাব্যে এক নতুন সুর ধ্বনিত করেছে :

'আমি ত ভাবিনি রোগ, ভেবেছি মহেন্দ্র যোগ,
তিলে তিলে পলে পলে আশায় আশায়,
ভেবেছি মরণ মাঝি লইতে আসিবে আজি,
অচিরে ভেটিব গিয়ে তব রাঙ্গা পায়!…'
['সৌরভ' পত্রিকা/কার্তিক, ১৩২২]

গোবিন্দ দাসের জীবনে তৃতীয় ও চতুর্থ অভিশাপ,—উৎপীড়ন ও নির্বাসন। চাকরি-জীবনে কোন অন্যায় অনুরোধ রক্ষা করতে পারেননি বলে কবিকে অশেষ উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়। প্রতিপালক হরচন্দ্র চৌধুরীর একটি অন্যায় অনুরোধ রক্ষা করতে অক্ষম হলে তাঁকে চাকরি ত্যাগ করে তৎকালীন 'নব্যভারত'

পত্রিকার সম্পাদক, দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর 'আনন্দ আশ্রমে' আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। সেখান থেকে কিছুদিন মধুপুরে এবং তারপর কলকাতায় ফিরে এসে তিনি 'নব্যভারত' প্রেসের কার্যাধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করেছেন। এরই ফাঁকে একসময় কলকাতার 'বিভা' পত্রিকার প্রকাশক এবং সেরপুরে 'চারুবার্ত্তা' কাগজের অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন। শেষে কয়েকবছর মুক্তাগাছার মহারাজ সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরীর জমিদারিতে নায়েব পদে নিযুক্ত হন; কিন্তু অসুস্থতার কারণে সেই চাকরি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অগত্যা চাকরির মায়া কাটিয়ে পত্নী প্রেমদার পিত্রালয়, ব্রাহ্মণ-গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সেখানেও তাঁর দুর্ভাগ্য ছায়ার মতো অনুসরণ করেছে। গ্রামের কয়েকজন দুষ্ট লোক কবির নিষ্কলুষ চরিত্রে মিথ্যা কালিমা লেপন করে জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

গোবিন্দ দাস একসময় ভাওয়ালের রাজমন্ত্রী কালীপ্রসন্ন ঘোষের চক্রান্তে নিজ জন্মভূমি (জয়দেবপুর) হতে নির্বাসিত হন। পরে কালী-প্রসন্নের নানা অপকীর্তি প্রকাশ পায়। তখন ভাওয়ালের রাজকুমারেরা নিরপরাধ কবিকে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তনের অনুরোধ জানান। দীর্ঘ এগার বছর নির্বাসনের পর কবি পুনরায় জন্মভূমির কোলে ফিরে আসেন। মাতৃসমা জন্মভূমির বাৎসল্যপূর্ণ মুখচ্ছবি অবলোকন করে তিনি যেন মুগ্ধপ্রাণ,—আবেগ-বিহ্বল। নিম্নোধৃত কবিতাটিতে কবির মাতৃবন্দনা সার্থক রূপ পেয়েছে:

'আমি পরবাসী,
ওগো শ্যামা বনভূমি, বিপুলা বিশালা তুমি,
কবিতা কল্পনা মোর তোর চিরদাসী,
আমি বা বুঝিব কি মা, তোর ঐ শ্যাম মহিমা,
তথাপি সেবিব তোরে চির অভিলাষী,
আমি, তাইতে হেথা আসি!'

['নব্যভারত' পত্রিকা / বৈশাখ, ১৩১৬]

কবির জীবনে সর্বশেষ অভিশাপ,—অনশন। শেষ জীবনে অনশনক্লিষ্ট কবি আর্থিক সাহায্যের আশায় অনেকের শরণাপন্ন হয়েছেন। একসময় তিনি ময়মনসিংহের রাজা জগৎকিশোরের শরণা-পন্ন হয়েছিলেন। মহানুভব রাজা তাঁকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কুড়ি টাকা বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। ভাওয়াল রাজপরিবার থেকেও তিনি মাসিক চব্বিশ টাকা হিসাবে নিয়মিত সাহায্য পেতেন। এছাড়া স্বগ্রামে তাঁর কিছু পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। যদিও উক্ত সম্পত্তি ভাওয়ালের রাজমন্ত্রী কালী-প্রসন্ন কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, পরে তিনি রাজানুগ্রহে ফিরে পেয়েছিলেন। ফলে, তাঁর দুরবস্থার কিছুটা সুরাহা হয়েছিল; কিন্তু কিছু-কালের মধ্যে কয়েকটা বৃত্তি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, কবির জীবনে এক নিদারুণ বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে। নিজের এবং পরিবারবর্গের ভরণপোষণের দুশ্চিন্তায় তিনি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েন। এই দুশ্চিন্তায় তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ক্রমশঃ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। একটি কবিতায় কবির আক্ষেপ অপার কারুণ্যে বিবৃত হয়েছে:

'গেলনারে অর্থকষ্ট, হায় কি কপাল—কি অদৃষ্ট!
ইহকাল পরকাল নষ্ট দারুণ দুরাশায়!'

['দিন ফুরায়ে যায়']

তখন থেকেই কবি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। 'নব্যভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি কবিতায় তাঁর সেই মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে:

'দিন ফুরায়ে যায় রে আমার দিন ফুরায়ে যায়!
মাঝের রবি ডুবছে সাঁঝে, দিনটা গেল বৃথা কাযে,
এক পা কেবল পড়ে আছে, এক পা দিছি নায়।'

['নব্যভারত' / জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮]

অতঃপর অনশনক্লিষ্ট কবি নিজের দুঃখ-দুর্দশা জানিয়ে দেশবাসীর উদ্দেশে লিখেছেন:

'ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে—
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ?

আজ যে আমি উপাস্ করি,
না খেয়ে শুকায়ে মরি,
হাহাকারে দিবানিশি
ক্ষুধায় করি ছট্‌ফট্‌…'

['নব্যভারত' / শ্রাবণ, ১৩১৮]

উক্ত কবিতাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশের নানা জায়গা থেকে কিছু কিছু সাহায্য আসতে থাকে ; কিন্তু সেই সাহায্যের পরিমাণ এতই অল্প যে, তাতে কবির জীবনরক্ষা সম্ভবপর হয়নি। অর্থাভাবে কয়েকবারই তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়নি। একবার ঢাকায় কঠিন অসুখে পড়লে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। সুচিকিৎসার ফলে সে-যাত্রায় তাঁর জীবনরক্ষা হয়েছিল। ব্যথাক্ষুব্ধ কবি ঐ সময় একটি কবিতায় নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করে লিখেছেন :

'কেন বাঁচালে আমায়—
আমি ভেবেছিনু হরি এবার করুণা করি,
ঘুচাইবে অভাগার এ-ভবের দায়,
যত দুঃখ যত ক্লেশ সকল হইবে শেষ,
কাঁদিতে হবে না আর ব্যথা বেদনায় !'

['সৌরভ' পত্রিকা / কার্তিক, ১৩২২]

ছত্রটিতে কবির প্রত্যক্ষ অনুভবের বেদনার উন্মথিত রূপ প্রকাশ পেয়েছে।

কবি গোবিন্দ দাসের জীবনে দুশ্চিন্তা ও দুর্দশার অন্ত ছিল না। একসময় পদ্মাগর্ভে তাঁর গ্রামের বসতবাটী বিলীন হয়ে যায়। ঢাকা শহরে একটি বাসগৃহের জন্য সকলের কাছে বহু আবেদন নিবেদন করেও কোন সাড়া পাননি। উপরন্তু গ্রামের সামান্য ভূ-সম্পত্তির বকেয়া খাজনা ঠিক সময়ে দিতে না পারায় জমিদার কর্তৃক নীলাম জারি হয়েছিল। রোগজীর্ণ কবি তাঁর অসহায় পরিবারবর্গের কথা চিন্তা করে ঐ ক্ষুদ্র ভূ-সম্পত্তি রক্ষাকল্পে কয়েকজন বিত্তবান ভূ-স্বামীর শরণাপন্ন হয়েছিলেন ; কিন্তু সেই প্রচেষ্টা তেমন সফল হয়নি। কবির লেখায় উক্ত ঘটনাসমূহের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় :

'পদ্মায় লইল বাটী না রাখিল ভিটা মাটি,
না রহিল তৃণটুকু শেষের সহায় !
কি বিজয় অট্টহাসে, গর্জিয়া কাঁপায়ে আসে,
আকাশ পাতাল যেন গ্রাসে সমুদায়।'

*

'গেলেও যমের বাড়ী করিবে নীলাম জারি,
শমনের বাড়ী এরা "শমন" লটকায়।'

['কেন বাঁচালে আমায়', ১৩১৮]

এক তীব্র মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে কখন অনশনে কখন বা অর্ধাশনে ঐ সময় তাঁকে দিন কাটাতে হয়েছিল। অনিয়ম আর অবহেলায় জীর্ণ দেহ ভেঙে পড়েছিল। শেষে সংসারের সকল জ্বালা, যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে দুঃখদৈন্য-ক্লিষ্ট, শোক-জর্জরিত কবি আত্মীয়-স্বজনহীন অবস্থায় ঢাকা শহরের ৺সতীশচন্দ্র ঘোষের বাড়িতে দেহত্যাগ করেন। সেই মর্মান্তিক দিনটি ছিল ১৩ আশ্বিন, ১৩২৫।

গোবিন্দ দাসের জীবন রক্ষার্থে যে-সকল মনীষী এবং সহৃদয় ব্যক্তি অগ্রণী হয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তৎকালীন সভাপতি সারদাচরণ মিত্র, সেরপুরের স্বনামধন্য জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরী, মুক্তাগাছার দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী ও কেশবচন্দ্র আচার্য চৌধুরী, 'নব্যভারত' পত্রিকার সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, 'সৌরভ' পত্রিকার সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদার, কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য (গৌরীপুর), ঢাকার ব্যারিস্টার প্রাণকিশোর বসু, 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং আরও অনেকে।

স্বভাবকবি গোবিন্দ দাসের কবিতাগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে—(১) 'প্রসূন' (১২৬১ বঙ্গাব্দ), (২) 'প্রেম ও ফুল' (১২৯৪), (৩) 'কস্তুরী' (১৩০২), (৪) 'কুঙ্কুম' (১২৯৮), (৫) 'চন্দন' (১৩০৩), (৬) 'ফুলরেণু' (১৩০৩), (৭) 'বৈজয়ন্তী', (১৩১২), (৮) 'মগের মুলুক' (১৮৯৩), (৯) 'শোক ও সান্ত্বনা' (১৩১৬) ও (১০) 'শোকোচ্ছ্বাস' (১৩১৭)। রচনাগুলির মধ্যে 'মগের মুলুক' এবং 'ফুলরেণু' ছাড়া আর সকলই গীতিকাব্য। 'মগের মুলুক' একটি ব্যঙ্গকাব্য। এই কাব্যটি নিয়ে কবির বিরুদ্ধে একসময় মামলা দায়ের হয়েছিল; কিন্তু পরে সেই মামলা প্রত্যাহৃত হয়েছিল। 'ফুলরেণু' রচনাটি কতকগুলি সনেটের সমষ্টি, এছাড়া আরও কয়েকটি কবিতা রচনা করে গোবিন্দ দাস স্বকীয় কাব্য-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। সেগুলির মধ্যে 'স্বদেশ' ('নব্যভারত'/পৌষ, ১৩১৪), 'কবে মানুষ মরে গেছে' ('নব্য-ভারত'/চৈত্র, ১৩১৭), 'উপদেশ' (রচনাকাল, বৈশাখ, ১৩১১), 'তুমি না থাকিলে' (রচনাকাল, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২), 'নৃসিংহ' (রচনাকাল, বৈশাখ, ১৩১০), 'সে কেমন?' (রচনাকাল, ফাল্গুন, ১৩০১), ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মৃত্যুর তিন বছর আগে কবি গীতার কয়েকটি শ্লোকের কাব্যানুবাদ করেছিলেন। উক্ত কাব্যানুবাদ হেমচন্দ্র চক্রবর্তী রচিত 'স্বভাবকবি গোবিন্দ দাস' গ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে। 'অ্যালেন হিউম' রচিত একটি উৎকৃষ্ট কবিতা অনুবাদ করে তিনি প্রভূত যশোলাভ করেন।

কবির শেষ কবিতা তৎকালীন 'নারায়ণ' পত্রিকায় (১৩২৫) প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর অনেক কবিতা এখনও বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকায় লুকিয়ে আছে। সেগুলির পূর্ণ সংকলন আজও সম্ভব হয়নি। বলাবাহুল্য গোবিন্দ দাসের কবিকৃতির বিস্তারিত পরিচয় জানতে হলে তাঁর সমগ্র রচনার একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন প্রয়োজন; নচেৎ কবিকল্পনার কল্পতীর্থে অবগাহন সম্ভব নয়।

কবির প্রথম কবিতা 'একদিন' রাজকৃষ্ণ রায় সম্পাদিত 'বীণা' পত্রিকায় (প্রথম বর্ষ, কার্তিক, ১২৮৫) প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত পত্রিকায় তাঁর প্রথম জীবনের অনেকগুলি কবিতা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে কয়েকটি কবিতা কোন কাব্যগ্রন্থেই স্থান পায়নি। এছাড়া তৎকালীন আরও কয়েকটি সাময়িক পত্র-পত্রিকায় কবির রচনা বিক্ষিপ্ত আকারে ছড়িয়ে আছে। সেই পত্রিকাগুলির মধ্যে রয়েছে—'নব্যভারত', 'নবজীবন', 'সৌরভ', 'প্রতিভা', 'মানসী', 'নারায়ণ', 'সাহিত্য', 'আলোচনা', 'আর্য্য কায়স্থ প্রতিভা', 'বান্ধব', 'সম্মিলনী', 'প্রকৃতি', 'Dacca Review', 'নবজীবন', 'কৌমুদী' এবং 'ভারত মিহির'। রচনাগুলির অধিকাংশই প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়নি। কবির কিশোর বয়সের রচনা, যেগুলি তিনি জয়দেবপুর বিদ্যালয়ের 'বিদ্যোৎ-সাহিনী' সভায় পাঠ করতেন, তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কিশোর বয়সেই তাঁর কাব্য প্রতিভার উন্মেষ এবং ঐ বয়সেই তিনি তাঁর কাব্যলক্ষ্মীকে কল্পনার রঙে সুষমামণ্ডিত করে কাব্যরসিকদের শ্রবণপথে কাব্যঝঙ্কারের লহর তুলেছিলেন। দুঃখের বিষয়, সেই কাব্যকলার একটি স্মৃতিও আজ অবশিষ্ট নেই।

কবি গোবিন্দ দাসের মহাপ্রয়াণের পর বাংলার যে কয়েকজন কবি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, জীবেন্দ্র-কুমার দত্ত, কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য প্রভৃতি। কবি সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:

'ফুল নীরবে যেমন ঝরে,
　　তেমনি করে মরে গেল কবি,
চলে গেল মানসযাত্রী,
　　প্রজাপতির নীরব পাখার ভরে;

হাওয়া শুধু করলে হাহা, আনমনে হায় ;
সেই সমাচার লভি
দূরে বাঁশীর সুরের ধারা কেঁপে বারেক উঠল
নিমেষ-তরে।
এই দুনিয়ার একটি কোলে
কাঁটার বনে জন্মেছিল সে যে,
ফুটেছিল সেই কেয়াফুল সাপের ডেরায়
কাঁটার মালা গলে ;
পাতায় চাপা গন্ধটুকুন পূবে হাওয়ায়
বেরুল নীড় ত্যাজে
পাথর চাপা রইল কপাল, বাদলা ক'রে রইল
চোখের জলে।'

কবি গোবিন্দ দাস একজন হতভাগ্য কবি। আজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে দিনের পর দিন জঠরের জ্বালায় অস্থির হয়ে এক অতি অসহায় অবস্থার মধ্যে ধরাধাম হতে চির বিদায় নিয়েছেন। চরম দুরবস্থার মধ্যেও নিঃশঙ্কচিত্তে পথ চলেছেন কবি দীর্ঘদিন। এই চলার পথে অনেকে তাঁর সাহসিকতার প্রতি কটূক্তি করেছে, নীতিনিষ্ঠতার প্রতি অবজ্ঞা করেছে এবং কঠোর জীবনসংগ্রামের প্রতি বিদ্রূপ করেছে। আবার অনেক সময় দুঃখদৈন্য কবির পারিবারিক জীবনকে বিরক্তিকর করে তুলেছে। তবু জীবনে মুহূর্তের জন্যেও নিজের মনুষ্যত্বকে অবমাননা করেননি তিনি।

কবির এই মনুষ্যত্বের বৈভব একদা সকলের অনুভবকে শ্রদ্ধাবিনত করেছিল,—তাঁর কাব্য-রচনাগুলি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্বভাবকবি গোবিন্দ দাসের এখানেই অক্ষয় সিদ্ধি।

শ্রীম : পল ব্রান্টনের চোখে

অনুবাদক : অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গবাসী কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবালোকে বাংলার নাট্যসাহিত্য ও মঞ্চ তথা নটগুরু গিরিশ সম্পর্কে প্রথিতকীর্তি গবেষক।

ডক্টর পল ব্রান্টন প্রথম জীবনে ছিলেন সাংবাদিক। সাংবাদিকতার সূত্রে তাঁর মধ্যে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, দর্শন ও অতীন্দ্রিয়তাবাদ সম্পর্কে আগ্রহ জেগে ওঠে। প্রবল কৌতূহল নিয়ে প্রাচ্যভূমির দেশগুলি ব্যাপক-ভাবে পরিভ্রমণ করেন তিনি এবং প্রাচ্য-ধর্মের মর্মমূলে পৌঁছবার প্রয়াস পান। তারই ফসল তাঁর সুপ্রসিদ্ধ রচনাগুলি : "দ্য সিক্রেট পাথ", "এ মেসেজ ফ্রম অরুণাচল", "দ্য কোয়েস্ট অব দি ওভারসেলফ", "দ্য ইনার রিয়েলিটি", "দ্য ইণ্ডিয়ান ফিলোজফি অ্যাণ্ড মডার্ন কালচার" প্রভৃতি।

নিচের অংশটি লেখকের "এ সার্চ ইন্ সিক্রেট ইণ্ডিয়া" গ্রন্থের 'এ্যামং দ্য ম্যাজিসিয়ানস্ এ্যাণ্ড হোলি মেন' অধ্যায় থেকে সংকলিত ও স্বাধীনভাবে অনূদিত। এই গ্রন্থটির আলোচনা প্রসঙ্গে স্যার ফ্রান্সিস ইয়ং হাজব্যাণ্ড মন্তব্য করেছেন : "'পবিত্র ভারত' (Sacred India)—বইটির যথার্থ নাম…একটি দেশ তার পবিত্রতম সম্পদটিই সংগোপনে রাখতে চায়। একজন বিদেশীর পক্ষে ইংলণ্ডের পবিত্র সম্পদ আবিষ্কার সহজ নয়—ভারতের সম্পর্কেও একথা সমভাবে সত্য। ভারতের পবিত্রতম অংশই গোপনীয়তম।…সেই গুপ্ত সম্পদকে পাওয়ার জন্য চাই কঠোর অনুসন্ধান—কিন্তু সেভাবে যারা সেই সম্পদের অনুসন্ধান করে তারা ঠিকই তার খোঁজ পায়। মিঃ ব্রান্টনের সেই দৃঢ় অধ্যবসায় ছিল, তাই শেষ পর্যন্ত তিনি তার সন্ধানও পেয়েছেন।"

ভারতে এসে ট্রেনভ্রমণকালে আকস্মিকভাবে এক ভদ্রলোকের হাতে একটি বই ব্রান্টনের চোখে পড়ল—"দি লাইফ অব রামকৃষ্ণ"। কবে যেন কার কাছে শুনেছিলেন রামকৃষ্ণই ভারতের শেষ ঋষি—আধ্যাত্মিক

অতিমানব। সব নিয়মকানুন উপেক্ষা করে ব্রান্টন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ জমালেন—তাঁর কাছে শুনলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শিষ্যদের মধ্যে আর মাত্র দু-তিনজনই জীবিত আছেন। সেই দু-তিনজনের অন্যতম অশীতিপর বৃদ্ধ, কথামৃতকার মাস্টারমশাই। সেই ভদ্রলোকের কাছ থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে কলকাতায় পৌঁছে তিনি গেলেন শ্রীম-র সন্ধানে। তাঁর সেই সন্ধান ও পরিণতির বিবরণীতেই রেখে গেছেন অন্তরতম ভারতবর্ষের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

"অবশেষে খাস কলকাতায় পৌঁছে শ্রীরামকৃষ্ণের বর্ষীয়ান ভক্ত মাস্টারমশায়ের বাড়ির খোঁজে গেলাম। রাজপথের লাগোয়া খোলা উঠান পার হয়ে পৌঁছলাম পরিকল্পনাহীন একটি বড় বাড়ির একসার খাড়াই সিঁড়ির মুখে। অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উপরতলায় উঠে নিচু দরজা দিয়ে একটি ঘরে ঢুকলাম। সমতল ছাদের দিকে খোলা একটি ছোট ঘর। দুদিকের দেওয়াল ঘেঁসে দুখানা তক্তপোশ। আলো আর খানকয়েক বই ছাড়া ঘরে আর বিশেষ কিছু নেই। একটি যুবক ঘরে ঢুকে তার কর্তার জন্য একটু অপেক্ষা করতে বলল, তিনি তখন নিচের তলায়।

"দশ মিনিট কাটল। নিচের তলার ঘর থেকে কেউ বেরুচ্ছেন—শব্দ পেলাম। তখনই মাথার মধ্যে একটা শিহরণ অনুভব করলাম—মনে হল, নিচের তলায় কেউ আমার সম্পর্কে মনঃসংযোগ করছেন। সিঁড়িতে সেই মানুষটির পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি। ধীর পায়ে উঠে তিনি অবশেষে প্রবেশ করলেন ঘরে। কে তিনি সে-কথা বলার প্রয়োজনই হল না—যেন বাইবেলের পৃষ্ঠা থেকে উঠে এলেন এক সম্মানিত ধর্মযাজক—রক্তমাংসের অবয়ব নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন মোজেসের কালের একটি শরীরী আকৃতি। তাঁর রিক্তকেশ মস্তক, দীর্ঘ শ্বেতশ্মশ্রু ও শুভ্র গুম্ফ, গম্ভীর আকৃতি, আয়ত ভাবগর্ভ দুটি চোখ, আশিবছরের পার্থিব অস্তিত্বের ভারে ঈষৎ ন্যুব্জ স্কন্ধ—ইনি মাস্টারমশাই ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না।

"তক্তপোশের উপর বসে তিনি আমার দিকে চোখ ফেরালেন। তাঁর প্রশান্ত, গাম্ভীর্যময় উপস্থিতিতে আমি উপলব্ধি করলাম—লঘু পরিহাস, হাস্যকৌতুক, এমন কি মাঝে মাঝে যে রূঢ় সন্দিগ্ধতা ও অস্পষ্ট নাস্তিকতা আমার মন আচ্ছন্ন করে—সে সবের অবকাশ এখানে নেই। ঈশ্বরবিশ্বাসে দৃঢ়মূল তাঁর চরিত্র, তাঁর মহত্ত্ব যেন তাঁর আবির্ভাবের মধ্যেই সুমুদ্রিত—যা সকলেই প্রত্যক্ষ করতে পারে।

"নিখুঁত উচ্চারণে ইংরেজীতে তিনি আমার উদ্দেশে বললেন, 'স্বাগত'।

"কাছে এসে তাঁর তক্তপোশে আমাকে বসতে বললেন। এখানে আসার উদ্দেশ্য তাঁকে জানালাম। আমার কথা শেষ হতে তিনি সস্নেহে আমার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বললেন, 'এক উচ্চতর শক্তি তোমাকে টেনে এনেছে ভারতে। এদেশের পবিত্র মানুষদের সংস্পর্শে এনেছে সেই শক্তিই; এর পশ্চাতে আছে একটি উদ্দেশ্য যা ভবিষ্যতে উদ্ঘাটিত হবে। তার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর।'

"'আমাকে আপনার গুরু রামকৃষ্ণ সম্পর্কে কিছু বলুন।'

"'তুমি এমন বিষয় উত্থাপন করলে যা নিয়ে বলতে আমার সবচেয়ে ভাল লাগে। প্রায় পঞ্চাশ বছর হল তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর পবিত্র স্মৃতি কখন আমাদের পরিত্যাগ করতে পারে না। সর্বদা তা আমাদের অন্তরে সজীব ও সুবাসিত। যখন আমি তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করি তখন আমার বয়স ২৭ বছর এবং তাঁর জীবনের শেষ পাঁচ বছর কাটিয়েছি তাঁর সান্নিধ্যে। তার ফলে আমি আজ পরিবর্তিত

মানুষ। জীবনের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গী আজ সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে গেছে। সেই দেব-মানব রামকৃষ্ণের এই হল প্রভাব। যারা তাঁকে দেখতে গেছে তাদের সকলের উপরই তাঁর এই আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। বলতে গেলে, তিনি যেন তাদের জাদু করেছিলেন—মন্ত্রমুগ্ধ করেছিলেন তিনি। একান্ত বাস্তববাদী মানুষরাও, যারা তাঁকে ব্যঙ্গ করার অভিপ্রায় নিয়ে গিয়েছিল, সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তারাও স্তব্ধ হয়ে গেছে।'

"কিছুটা বিমূঢ়ভাবেই আমি তাঁকে বাধা দিয়েছিলাম, 'কিন্তু এ ধরনের মানুষেরা, যারা আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসহীন, কেমন করে সেই আধ্যাত্মিকতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে?'

"স্মিতহাস্যে মাস্টারমশায়ের ওষ্ঠপ্রান্ত নড়ে উঠল। তিনি বললেন, 'দুজন লঙ্কা চিবিয়েছে। তার মধ্যে একজন বস্তুটির নাম জানে না—হয়তো কখন চোখেও দেখেনি। অন্যজন বস্তুটির সঙ্গে ভালভাবেই পরিচিত এবং দেখেই চিনতে পেরেছে। দুজনের কাছেই কি এর স্বাদটা একই রকম হবে না? দুজনের মুখই কি সমানভাবে জ্বলে যাবে না? একইভাবে রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিকতার মহত্ত্ব বস্তুবাদীর আস্বাদনেও বাধা হয়ে ওঠেনি—আধ্যাত্মিকতার যে প্রেরণা তাঁর থেকে বিচ্ছুরিত হত তার স্পর্শ থেকে তারাও বঞ্চিত হত না।'

"'তাহলে তিনি সত্যই আধ্যাত্মিক মহামানব।'

"'হাঁ। আমার জ্ঞান-বিশ্বাসে তার থেকেও বেশি। রামকৃষ্ণ ছিলেন সরল মানুষ—অজ্ঞ এবং বিদ্যাহীন। তিনি এতই অজ্ঞ যে নিজের নাম পর্যন্ত সই করতে পারতেন না, একখানা চিঠি লেখা তো দূরের কথা। তিনি চেহারায় সরল মানুষ—জীবনযাত্রায় সরলতর। তা সত্ত্বেও তিনি সে সময়কার ভারতবর্ষের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষের আনুগত্য লাভ করেছেন। তাঁরা রামকৃষ্ণের প্রগাঢ় আধ্যাত্মিকতার কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য হয়েছেন। রামকৃষ্ণ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন—অহঙ্কার, সম্পদ, ঐশ্বর্য, ঐহিক সম্মান প্রতিষ্ঠা মূল্যহীন। এই তুচ্ছ-বস্তুই মায়াস্বরূপ যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে। আহা! সেই অপরূপ দিনগুলি! প্রায়ই তিনি সমাধিতে ডুবে যেতেন—তখন এমনই জ্যোতির বিচ্ছুরণ হত যে, আমরা যারা তাঁকে ঘিরে থাকতাম, উপলব্ধি করতাম তিনি মানুষ নন, স্বয়ং ঈশ্বর। আরও বিস্ময়ের কথা, স্পর্শমাত্রেই তিনি যে কোনও ভক্তকে পৌঁছে দিতে পারতেন সেই অমৃতলোকে। সে-অবস্থায় তারা গভীর ঈশ্বর-রহস্য প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে উপলব্ধি করতে পারত। সে যাক। আমাকে কেমন করে তিনি প্রভাবিত করলেন সেই কথা বলি।

"'আমার পড়াশুনো পাশ্চাত্য ধরনে। বুদ্ধি-বাদের অহঙ্কারে আমার মাথা তখন পূর্ণ। কলকাতার কলেজে বিভিন্ন সময়ে ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির (পলিটি-ক্যাল ইকনমি) অধ্যাপকরূপে কাজ করেছি। রামকৃষ্ণ তখন কলকাতা থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে গঙ্গার ধারে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে বাস করেন। বসন্তকালের একটি দিনে সেখানে গিয়ে তাঁকে পেলাম। সে এক অবিস্মরণীয় দিন।—শুনলাম তাঁর আপন অভিজ্ঞতালব্ধ আধ্যাত্মিক চিন্তার সহজ প্রকাশ। আমি তর্ক করার একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর পবিত্র সান্নিধ্যে যেন বাক্-রহিত হয়ে গেলাম। সে-প্রভাব এত গভীর যে, কথায় প্রকাশ করা যায় না। সেই সরল, বিনীত মানুষটিকে ছেড়ে থাকা সম্ভব হল না—বারবার যেতে আরম্ভ করলাম। একদিন তিনি সকৌতুকে বললেন "একটা ময়ূরকে একদিন ৪টার সময় আফি-

খাইয়েছিল। পরদিন আবার ঠিক সেই সময় এসে হাজির। আফিমের নেশায়—আর একটু পাওয়ার লোভে।" সাঙ্কেতিকভাবে হলেও কথাটা খুব সত্যি। রামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে আমি যে চরম আনন্দের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম, তা আর কোথাও পাইনি। সুতরাং ঘন ঘন যে সেখানে যাব, তার মধ্যে আর আশ্চর্য কি! এইভাবেই নিছক দর্শক নয়, তার অন্তরঙ্গ ভক্ত-মণ্ডলীর একজন হয়ে গেলাম। একদিন ঠাকুর আমাকে বললেন, "তোমার চোখ, কপাল আর মুখে আমি যোগীর লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। সংসারের সব কাজ করবে কিন্তু মনটি বেঁধে রাখবে ঈশ্বরে। স্ত্রী-পুত্র, মা-বাবা সকলের সঙ্গে থাকবে —আপনজনের মতো তাদের সেবা করবে। জগতে সব কাজ করবে কিন্তু মনটিকে ফেলে রাখবে তাঁর কাছে।"

"'তাই, রামকৃষ্ণের তিরোভাবের পর যখন তাঁর অনেক শিষ্য স্বেচ্ছায় সংসারত্যাগ করে সন্ন্যাসগ্রহণ করল এবং ভারতের সর্বত্র রাম-কৃষ্ণের বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগে প্রস্তুত হল তখনও আমি আমার পেশা ছাড়লাম না। শিক্ষা-দানের কাজই চালিয়ে যেতে লাগলাম। তা সত্ত্বেও, সংসারে থেকে সংসারের বাইরে থাকার সঙ্কল্পে আমি এতই দৃঢ় ছিলাম যে, অনেকদিন গভীর রাতে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে শহরের গৃহহীন ভিখারীদের সঙ্গে সিনেট হাউসের চাতালে নিদ্রা যেতাম। এইভাবে, সাময়িক হলেও, আমি অনুভব করতাম, আমি একজন রিক্ত মানুষ।

"'রামকৃষ্ণ চলে গেছেন কিন্তু আজ তুমি সারা ভারতেই দেখতে পাবে, তাঁর প্রথম শিষ্যদের অনুপ্রেরণায় (দুঃখের কথা, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ তিরোহিত) সমাজসেবা, স্বদেশপ্রেম, চিকিৎসা ও শিক্ষার কাজ চলেছে। কিন্তু যা তুমি সহজ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করতে পারবে না তা হল সেই বিস্ময়কর মানুষটির সংস্পর্শে কত হৃদয়, কত জীবনের পরিবর্তন ঘটেছে। এর কারণ তাঁর ভাবধারা শিষ্য পরম্পরায় বাহিত হচ্ছে এবং সেই শিষ্যরা তাদের সাধ্যমত প্রচার করে চলেছে। আমার সৌভাগ্য, আমি তাঁর অনেক বাণী বাংলায় লিখে নিয়েছিলাম—সেগুলির মুদ্রিতপাঠ আজ বাংলা দেশের ঘরে ঘরে পৌঁছেছে। তার অনুবাদও ছড়িয়েছে দেশের অন্যান্য জায়গায়। সুতরাং তুমি বুঝতে পারছ, রামকৃষ্ণের প্রভাব কিভাবে তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যমণ্ডলীর সীমা অতিক্রম করে ব্যাপকতা লাভ করেছে।'

"মাস্টারমশাই তাঁর দীর্ঘ আলাপ শেষ করে স্তব্ধতায় ডুবে গেলে আমি যেন ভেসে গেলাম এশিয়া-মাইনরের সেই ক্ষুদ্র রাজ্যটিতে—যেখানে ইসরাইলের সন্তানেরা ভাগ্যের কঠিন পীড়ন থেকে সাময়িকভাবে মুক্তি পায়। তাদের মধ্যে দেখলাম মাস্টারমশাইকে পরম-শ্রদ্ধেয় প্রফেটরূপে—তাঁর জনগণের কাছে কথা বলছেন। তাঁর মহত্ত্ব, সাধুত্ব, সদাচার, ধর্মপ্রাণতা ও নিষ্ঠা স্বতঃস্বচ্ছ। বিবেকের কণ্ঠস্বর যিনি আনতমস্তকে দীর্ঘদিন ধরে গ্রহণ করেছেন—এমনি আর্যমর্যাদায় তিনি প্রতিষ্ঠিত।

"আমি অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বললাম, 'যে মানুষ কেবলমাত্র বিশ্বাসে বাঁচতে পারে না, যে মানুষ বুদ্ধি ও কার্যকারণ সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল, জানি না, রামকৃষ্ণ তার সম্পর্কে কি বলবেন।'

"'তিনি তাদের বলবেন প্রার্থনা করতে। প্রার্থনা একটা বিপুল শক্তি। রামকৃষ্ণ স্বয়ং প্রার্থনা করেছিলেন অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসু মানুষের জন্য এবং তারপরেই তাদের আগমন শুরু হয় যারা পরে তাঁর ভক্ত ও শিষ্য হয়েছিল।'

"'কিন্তু যে কখনও প্রার্থনা করেনি? তার কি হবে?'

"'প্রার্থনাই শেষ কথা। মানুষের কাছে শ্রেষ্ঠ

সম্পদ। বুদ্ধি যেখানে পরাজিত—প্রার্থনাই সেখানে সহায়।'

"বিনীত নিবেদন করলাম আমি, 'কিন্তু যদি এমন কেউ আপনার কাছে এসে বলেন যে, প্রার্থনা তাঁর মানসিকতার সঙ্গে খাপ খায় না—তাঁর প্রতি আপনার পরামর্শ কি হবে?'

"'আমি তাঁকে বলব প্রকৃত সাধুসঙ্গ করতে। যাঁদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা আছে—এইরকম সাধুদের সান্নিধ্যে বারবার আসতে। বারবার তাঁদের সংস্পর্শ অন্তরস্থিত অবিকশিত আধ্যাত্মিকতা উন্মোচনের সহায়ক হবে। উচ্চ-কোটির মানুষই আমাদের মন ও ইচ্ছাকে দৈবী-শক্তির দিকে পরিবর্তিত করতে পারেন। সর্বোপরি তাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনের বাসনাকে জাগিয়ে তুলতে পারেন। তাই তাঁদের সন্নিধি প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান। রাম-কৃষ্ণ প্রায়ই বিশেষভাবে বলতেন এই কথা।'

"এইভাবেই আমাদের আলোচনা ছিল পবিত্র ও উচ্চমার্গের। সেই সর্বময় সনাতন ঈশ্বর ভিন্ন যে মানুষের শান্তির আর কোন পথ নেই—এই ছিল আমাদের আলোচ্য বিষয়। সারা সন্ধ্যা কত লোক আসত তাঁর কাছে—সেই ছোট ঘরখানি একসময় পূর্ণ হয়ে যেত। তারা সবাই তাঁর শিষ্য। রাতের দিকেই আসত তারা। সিঁড়ি বেয়ে চারতলায় উঠে গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনত গুরুর কণ্ঠ-উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ।

"কিছুদিনের জন্য আমিও যোগ দিয়েছি তাদের সঙ্গে। রাতের পর রাত আমি উপস্থিত হয়েছি। তাঁর পবিত্র কথাগুলির চেয়ে তাঁর উপস্থিতির আধ্যাত্মিক সূর্যকিরণে অবগাহনের জন্যই আমার আকর্ষণ ছিল বেশি। তাঁকে ঘিরে পরিবেশটি ছিল কোমল, স্নিগ্ধ, মাধুর্যময়। নিজের মধ্যে তিনি যে পরমশান্তি পেয়েছিলেন তা সুস্পষ্টভাবে বিচ্ছুরিত হত। তাঁর বাণী হয়তো কখন কখন ভুলে যাই—ভুলতে পারি না সেই উদার মহৎ ব্যক্তিত্ব। যে আকর্ষণ তাঁকে বারবার টেনে নিয়ে গেছে রামকৃষ্ণের কাছে, সেই আকর্ষণেই আমাকে নিয়ে গেছে তাঁর কাছে—আমার উপরে শিষ্যের আকর্ষণ প্রয়োগের মধ্যে দিয়েই বুঝতে পারি তাঁর গুরুর আকর্ষণ ও প্রভাব কতখানি দুর্বার ছিল।

"অবশেষে শেষ সন্ধ্যা এল। তক্তপোশে তাঁর পাশে বসে আলোচনার আনন্দে ভুলে গেছি কখন কিভাবে আমাদের সময় কেটে গেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটেছে—আমাদের কথা চলেছে অব্যাহতভাবে। এবার তার সমাপ্তি। সেই মহান আচার্য আমার হাতটি ধরে ফিরে গেলেন তাঁর বাড়ির সমতল ছাদের উপর। সেখানে পূর্ণ-চাঁদের আলোয় দেখলাম টবে হাঁড়িতে চারাগাছ-গুলি সুবিন্যস্তভাবে গোলাকার সাজানো। নিচে শহর কলকাতার গৃহাভ্যন্তরের আলোকমালা।

"উদ্ভাসিত পূর্ণচন্দ্র। মাস্টারমশাই একবার চাঁদের দিকে দেখালেন, তারপর নীরব প্রার্থনায় ডুবে গেলেন। আমি ধীরভাবে অপেক্ষা করে রইলাম। প্রার্থনা শেষে তিনি আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাত তুলে শান্তভাবে আমার মস্তক স্পর্শ করলেন।

"আমি ধর্মজগতের মানুষ নই, তবু এই দেবদূতের মতো মানুষটির কাছে বিনত হলাম। কয়েকমুহূর্ত পরে তিনি মৃদুস্বরে বললেন, 'আমার কাজ শেষ হয়ে এসেছে। ঈশ্বর এই শরীরটাকে যে কাজে পাঠিয়েছিলেন তা প্রায় শেষ। যাবার আগে আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর।'

"বিস্ময়করভাবে তিনি আমাকে আলোড়িত করেছেন। সে-রাতে ঘুমের চিন্তা বিসর্জন দিয়ে পথে পথে ঘুরতে লাগলাম। অবশেষে পেঁছিলাম একটি মসজিদের সামনে—শুনতে পেলাম, মধ্য-রাতের নৈঃশব্দ্য ভেদ করে সুগম্ভীর ঈশ্বরস্তুতি-ধ্বনি—আল্লা হো আকবর—ঈশ্বর মহান। আমি অনুভব করলাম, যে বৌদ্ধিক অবিশ্বাস আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তা থেকে মুক্ত করে সহজ বিশ্বাসের জীবনে আমাকে উত্তীর্ণ করতে পারেন একজনই—মাস্টারমশাই।"

'দ্বা সুপর্ণা'

ডক্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

মানুষের জীবনের দুটি দিক,—কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ ; একটিতে ঘরে ফেরা আর একটিতে ঘর ছাড়া ; একটিতে নীড়ের ছোট গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রাখা, আর একটিতে আকাশের ব্যাপ্তিতে নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া। শুধু প্রথমটা নিয়ে মানুষ কোনদিন শান্তি পায়নি, তাই সে বারংবার দ্বিতীয়টির দিকে ঝুঁকেছে। মানুষের সত্তার দুটি দিক তাকে সব সময় দুটি বিপরীত গন্তব্যের অভিমুখে টানছে। অনেকেই এই নীড় ও আকাশের দোটানায় স্বাভাবিকভাবে দিশাহারা। স্বার্থের সংকীর্ণতা থেকে বিশ্বপ্রেমের বিশালতায় উত্তরণ তাদের কাছে সহজসাধ্য নয়। এই উত্তরণ মানুষের নবজন্মের সূচনা করে, কীট্সের ভাষায় 'dying into life' ; প্রকৃত অর্থে মানুষ দ্বিজত্বে উন্নীত হয়। পাখির জীবনে যে-দ্বিজত্ব দৈহিক, মানুষের জীবনে সে-দ্বিজত্ব আধ্যাত্মিক। পাখি মানুষের ঘরবাঁধার প্রবণতার যেমন মূর্ত প্রতীক, তেমনই প্রতীক তার আত্মিক অভীপ্সার। স্কাইলার্ক-পাখির মধ্যে ওয়র্ডসোয়র্থ এই দুই দিকের সমন্বয় মূর্ত হয়ে উঠতে দেখেছেন, 'true to the kindred points of heaven and home'। শেলির স্কাইলার্ক শুধু নভোচারী, মাটির মায়া কাটিয়ে সে উড়ে চলে ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর লোকে, ভূর্ভুবঃ স্বঃ। সে স্বাধীনতা ও দুঃসাহসের প্রতীক, সে প্রতীক সুদূরের পিয়াসার। Hal Barland বনহংস-সম্পর্কে যা লিখেছেন সেটা শেলির স্কাইলার্ক-সম্পর্কেও প্রযোজ্য : '...he is the epitome of wanderlust, limitless horizons and distant travel. He is the yearning and the dream, the search and the wonder, the unfettered foot and the wind's-will wing.'

বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে, শিল্পকর্মে, দর্শনে, ধর্মশাস্ত্রে পাখির প্রতীক ও চিত্রকল্প বারবার এসেছে। নরওয়ের নাট্যকার হেন্‌রিক্ ইব্‌সেনের 'The Wild Duck' মর্মস্পর্শী নাটক এবং সেটা ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত হলেও তার ভাবধারা ও সুর বিংশশতকী। একজন প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক একটি জার্মান চলচ্চিত্রে এ-নাটকের যে অসাধারণ রূপায়ণ করেছেন—তাতে পাখির প্রতীকটি অবিস্মরণীয় হয়ে উঠেছে।

ঋগ্বেদের একটি বিখ্যাত শ্লোক (১।১৬৪।২০) মুণ্ডকোপনিষদে (৩।১।১) ও অন্যত্র উদ্ধৃত হয়েছে : দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥ স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত 'উপনিষৎ গ্রন্থাবলী', প্রথম খণ্ডে (১৩৭৭ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২২৫) এর অনুবাদ এইভাবে করা হয়েছে :

'সর্বদা সম্মিলিত ও সমান নামধারী দুইটি পক্ষী একই বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে একটি স্বাদু ফল ভক্ষণ করে, অপরটি ভক্ষণ না করিয়া দর্শন করে।'

'সখায়া'-শব্দের 'সমান নামধারী' অনুবাদ কোন কোন সাধারণ পাঠকের কাছে স্পষ্ট-ভাবে বোধগম্য না হতে পারে। এই দুই পাখি পরস্পরের সখা, তারা মৈত্রীর অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। Wilson-এর ইংরেজী অনুবাদ 'mutual friends' কিংবা Griffith-এর 'Knit with bonds of friendship' এ-বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে।

টীকাকারেরা সাধারণত এই দুই পাখিকে যথাক্রমে জীবাত্মা ও পরমাত্মা-রূপে ব্যাখ্যা করেন। বর্তমান লেখকের ধারণা, এই দুই পাখি মানুষের ব্যক্তিজীবনের দ্বৈত সত্তার স্বরূপ। (**W. B. Yeats,** যিনি উপনিষদের অনুরাগী পাঠক এবং অনুবাদকও ছিলেন, তাঁর **'Byzantium'** কবিতার তৃতীয় স্তবকে যখন পাখিদের এনেছেন, তখন হয়তো এই শ্লোকটি তাঁর স্মরণে ছিল।) প্রথম পাখিটি মানুষের পার্থিব সত্তা, **'Of the earth, earthy',** তাকে অনিত্য ভোগের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় পাখিটি মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তা, বাইবেলে যাকে **'the new man, the heavenly man'** বলা হয়েছে, তাকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছে। (অবশ্য আধ্যাত্মিক সত্তাকে পরমাত্মা-রূপে কল্পনা করতেও কোন বাধা নেই।) ত্যাগের দ্বারা ভোগ শাশ্বত ভোগ, জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য, মানুষের মহত্তম বৃত্তি। এই বৃত্তির কথাই রবীন্দ্রনাথের সর্বাধিক প্রিয় ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা'। 'ভক্ষণ না করিয়া দর্শন করা' এবং 'ত্যাগের দ্বারা ভোগ করা' স্পষ্টতই সমার্থক। এই ত্যাগ হচ্ছে নিজের ইচ্ছাশক্তির বিসর্জন, রমণ-মহর্ষি যাকে বলেছেন 'অহংকে মুছে ফেলা'। এই কথাই রবীন্দ্রনাথের গানে ঝংকৃত হয়েছে—'তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ আমার জীবন-মাঝে'। আমরা সাধারণ মানুষ সব-সময় শুধু চেয়ে চলেছি, শুধু পাওয়ার জন্য ব্যস্ত। বহু বাসনায় প্রাণপণে চাইছি। এর ফলে আমাদের শক্তি অবিরত ক্ষয় করছি নির্বোধের মতো, ওয়র্ডসোয়র্থ যাকে বলেছেন, **'getting and spending, we lay waste our powers'।** নিজের স্বত্ব, নিজের অধিকার, নিজের মালিকানা—এই-সব নিয়ে শুধু আপনাকে ঘিরে পলে পলে ঘুরে মরছি। যে-মুহূর্তে আমরা সংসারের অনিত্যতা বুঝতে পারব, তার আসক্তির বন্ধন কাটাতে পারব, সেই মুহূর্তে আমরা মুক্তি পাব। তখনই আমরা সংসারকে সার্থকভাবে ভোগ করতে সমর্থ হব। যদি আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, এক ঐশী শক্তি সর্বভূতে সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত, তখন বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জন্য আমাদের আর কোনও মোহ থাকবে না। অবিদ্যার অন্ধকার কিন্তু এই পরম সত্যকে আমাদের দৃষ্টিগোচর হতে দেয় না। 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' আকুতির মধ্যে যে প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে সেটা এই অজ্ঞতার আঁধার দূর করার জন্য। অন্তর্নিহিত সত্যকে গ্রহণ করতে পারলে বাইরের মিথ্যা আবরণ বা **'painted veil'**-এর জন্য ব্যাকুলতা থাকবে না, তখন হৃদয়ঙ্গম হবে শেলির **'Adonais'**-এর এই পঙ্‌ক্তিগুলির প্রকৃত তাৎপর্য :

> **The One remains, the many change and pass ;**
> **Heaven's light forever shines, Earth's shadows fly,**
> **Life, like a dome of many-coloured glass,**
> **Stains the white radiance of Eternity,**
> **Until Death tramples it to fragments.**

যেটা ইন্দ্রিয়সুখকর সেটা প্রেয়, আর যেটা কল্যাণকর এবং মোক্ষের সাধনবিদ্যা, সেটা শ্রেয়। 'দ্বা সুপর্ণা'র প্রথম পাখিটিকে আমরা প্রেয়ের উপাসক-রূপে গণ্য করতে পারি, আর দ্বিতীয় পাখিটিকে শ্রেয়ের সাধক-রূপে। পাখি দুটি যেরকম পরস্পর সংযুক্ত, প্রেয় ও শ্রেয় সেইভাবে মানুষের জীবনে ওতপ্রোত। কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয়বল্লীর প্রথম শ্লোকে আমরা পাই :

> অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-
> স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ

তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥

স্বর্গত অধ্যাপক ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'নক্ষত্রমালা'—পুস্তিকায় শ্লোকটির ব্যাখ্যা এই-ভাবে করেছেন :

'যাহা পরিণামে হিতকর তাহা শ্রেয়ঃ, আর যাহা আপাতমধুর তাহা প্রেয়ঃ। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ পরস্পর ভিন্ন, তাহাদের উদ্দেশ্যও ভিন্ন, ফলও ভিন্ন। এই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয়েই মানুষের চিত্ত আকর্ষণ করে। যিনি এই দুইটির মধ্যে শ্রেয়ঃকে গ্রহণ করেন তাঁহার মঙ্গল হয়, আর যিনি প্রেয়ঃকে বরণ করেন তিনি মঙ্গলের পথ হইতে ভ্রষ্ট হন।' দার্শনিক প্লেটোর 'Phaedrus'-এ (237d) কয়েকটি ছত্র আছে যেখানে একই ভাবধারা প্রবাহিত

'আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে দুটি নিয়ামক নীতি রয়েছে। সেগুলি যেদিকেই আমাদের নিয়ে যাক না কেন, আমরা তাদের নির্দেশ অনুসরণ করি। এদের একটি হচ্ছে সুখভোগের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি, অন্যটি আহৃত বিচারবোধ যার অভিলাষ উৎকর্ষের দিকে। এই দুটি নীতি আবার কখন সুসমঞ্জস অবস্থায় থাকে, কখনও বা আমাদের অন্তরে এদের সংঘর্ষ বাধে এবং কখন এটি কখন অন্যটি জয়ী হয়।'

প্লেটো-কথিত এই নীতি দুটিকে স্বচ্ছন্দে কঠোপনিষদ্-বর্ণিত প্রেয়োমার্গ ও শ্রেয়োমার্গের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

রামকৃষ্ণদেব 'কাঁচা-আমি' ও 'পাকা-আমি'র কথা বলেছেন। কাঁচা-আমি প্রথম পাখি, 'স্বাদু ফলের' দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। পাকা-আমি নিরাসক্ত ; সে নিরপেক্ষ দর্শকের চোখ নিয়ে বিশ্বরূপের খেলাঘরে জীবনের খেলা দেখে খুশি, দ্বিতীয় পাখিটি যেমন ফল দেখেই পরিতৃপ্ত। তার আনন্দের সঙ্গে আমরা তুলনা করতে পারি **Lucretius**-এর **'De Rerum Natura'**-কাব্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে বর্ণিত নিরাপদ-সত্যের তীরে অবস্থিত সেই দর্শকের অনুভূতির যে মিথ্যার সমুদ্রে হাবুডুবু-খাওয়া লোকদের নিরাসক্তভাবে নিরীক্ষণ করতে পারে।

নরেন্দ্রপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির

শ্রীসুনীলকুমার পাল

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে সদ্য-উদ্‌ঘাটিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের স্থাপত্য ইতিমধ্যেই বহুজনের বিমুগ্ধ দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছে। বর্তমান নিবন্ধের লেখক সেই মন্দিরের মুখ্য রূপকার—ইদানীংকালের প্রখ্যাত ভাস্কর ও শিল্পী।

সমবেতভাবে একত্র বসে উপাসনার গৃহ আর পূজামন্দিরকে এক করে মিলিয়ে বেলুড় মঠে নির্মিত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির ভারতবর্ষের আধুনিক মন্দির-স্থাপত্যে প্রয়োজনের দিক ও সেই সঙ্গে সৌন্দর্যের দিক দিয়ে এক নতুন ও সার্থক সৃষ্টি। স্বয়ং স্বামীজীর পরিকল্পনার আদর্শে এর "প্ল্যানিং" হয়েছিল। মন্দিরের এই "টাইপ"কে লোকে গ্রহণ করেছে, তাই চারিদিকে এর অনুকরণ-চেষ্টাও চলছে। নরেন্দ্রপুর আশ্রমের এই মন্দিরেও উল্লিখিত ভাবকে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ পূজামণ্ডপ ও নাটমণ্ডপ এক করে এর স্থাপত্যরূপ গঠন করা হয়েছে। শুধু শিল্প-রূপ এর আলাদা। বাংলার গ্রামের দোচালা আর চারচালা এবং কাঠের কাজ মনে রেখে কংক্রীটের এই স্থাপত্য। বিশেষ করে, কামারপুকুরে ঠাকুরের মাটির ঘরখানির মায়া এই মন্দিরের মধ্যমণি। এবং এর রূপকল্পনার প্রেরণা।

মন্দির

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপক। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও কবি। বর্তমান রচনার পটভূমিকা—নরেন্দ্রপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির।

মন্দির ঈশ্বর ও মানুষের সংযোগ-সেতু। অনন্ত আকাশের উদ্দেশে সমুখিত যুক্তকর ঊর্ধ্বমুখী প্রণাম। গূঢ়তম প্রার্থনার শিলায়িত প্রতীক।

অন্তরের অন্তরে আছেন আত্মা। গুহাহিত নিভৃতে অনির্বাণ। এই মন্দিরের মাধ্যমে তিনি যুক্ত হলেন বিশ্বচরাচরের সঙ্গে। অনন্ত আর সান্ত—আপাতদৃশ্য এ পার্থক্য মন্দিরের শীর্ষচূড়া থেকে শেষ সোপান অবধি নিজেদের পরম ঐক্য ঘোষণা করলে।

তিনি ছিলেন, তিনি এলেন, তিনি যুগে যুগে ফিরে ফিরে আসবেন—এই সত্যটি বারবার বেজে চলেছে মন্দিরের সর্ব অঙ্গে, সর্ব অলঙ্করণে।

বাক্য-মনের অতীতকে আমরা স্পর্শ করতে চেয়েছি। তাই তো কবিতা, শিল্প, মন্ত্র, সুর, ছবি, ভাস্কর্য, স্থাপত্য; তাই তো ধূপ, দীপ, শঙ্খ, পুষ্প, প্রার্থনা। ভোরের মঙ্গলারতি, মানসে ও উপচারে নিত্যপূজা, সন্ধ্যার প্রদীপ, শীতল ও শয়ন।

উদ্ভাসিত তিনি পটে, প্রতীকে, বিগ্রহে, চিত্রমালায়; বঙ্কিম-রেখায়িত নানান আলপনায়, এক চূড়া থেকে আর এক চূড়ায়, স্নিগ্ধ, সৌম্য বর্ণসুষমায়। ভৈরোঁ থেকে বাগেশ্রী অবধি তাঁর অনাহতধ্বনিকে আভাসিত করে চলে সানাই। তার সব রংপরংই মূল সুরধ্বনির নানান প্রতিরূপ।

যিনি পূজারী, তাঁর পূজায় কখন এসে মিশে যায় সব ভক্তের হৃদয়। যারা মন্দিরে সমবেত, স্মরণরত, যাদের সমস্ত দিনটি এক অখণ্ড পূজার ছন্দে আবর্তিত—সকলের সব পূজা কখন এক-জনের পূজায় রূপান্তরিত হতে থাকে। আর পূজারী কখন দেবতায় মিশে যায়! দেবতা পরিব্যাপ্ত সমস্ত মন্দিরে।

তিনি তো পূজারীই ছিলেন—আমাদের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ! দক্ষিণেশ্বরে তাঁর পূজাময় ভবতারিণীমন্দির আর একরূপে ফিরে এল গঙ্গার পশ্চিমকূলে বেলুড় মঠের মন্দিরে। জগতের মাকে যিনি জাগিয়েছিলেন, তিনিই এবার জাগ্রত দেবতা। আর, সেই দেবতার দিব্যধ্যানস্পর্শে পূবে-পশ্চিমে উত্তরে-দক্ষিণে নতুন মন্দির জেগে উঠছে অবিরত।

তারা এক, তবু অনেক। হৃদয় থেকে হৃদয়ে, স্থান থেকে স্থানান্তরে, এক শিল্পী থেকে আর এক শিল্পীর দৃষ্টিপার্থক্যে। এক-এক মন্দিরে এক-এক অভিনবত্ব। সৃষ্টির মূলে যেমন এক, তবু প্রতিটি সৃষ্টিই যেমন অনন্য।

মন্দিরে মন্দিরে আপন অনন্তস্বরূপকে অভি-ব্যক্ত করেছেন ভগবান বুদ্ধ, করছেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রতি মন্দিরে তাঁদের নিত্য নব পদক্ষেপ।

বাইরে থেকে এ মন্দির স্থির, সীমাবদ্ধ। অন্তরে চিরন্তন এর রথযাত্রা। পথের এক প্রান্তে তার কাছটি থেকে আমাদের যাত্রা শুরু, আর এক প্রান্তে তারই কাছে যাত্রাশেষ। দিনের সমস্ত দাহ রাতের গভীরে মিলিয়ে যাবার সংকেত নিয়ে আসে পঞ্চপ্রদীপ। পঞ্চশিখা কখন মৌন নিশীথের লক্ষ দীপাবলী!

শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—নরেন্দ্রপুর

আলোকচিত্রী : পার্থসারথি নিয়োগী

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে মন্দির প্রতিষ্ঠা

শ্রীরণজিত মুখোপাধ্যায়

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের লোকশিক্ষা পরিষদে সংশ্লিষ্ট।

নরেন্দ্রপুর। কলকাতা থেকে ষোল কিলো-মিটার দক্ষিণে। ময়দান, রবীন্দ্রসদন, রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান, ইনস্টিটিউট অব্ কালচার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পিছনে রেখে, গড়িয়া ছাড়িয়ে নরেন্দ্রপুর। পুরনো উখিলা-পাইকপাড়া ধন্য হল বিশ্ববন্দিত স্বামী বিবেকানন্দের বাল্য-নামকে শিরে ধারণ করে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার পাথুরিয়াঘাটা থেকে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম স্থানান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই নরেন্দ্রপুরে সংস্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা-শুরু। আজ তা বিশাল এক শিক্ষাক্ষেত্র। বিদ্যালয়, মহা-বিদ্যালয়, অন্ধ বালক বিদ্যায়তন, জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল, লোকশিক্ষা পরিষদ, গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও অন্যান্য আরও কয়েকটি শিক্ষালয় নিয়ে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম এক বিরাট বনস্পতিসদৃশ প্রতিষ্ঠান—যা প্রকৃতিতে যেন গোটা ভারতবর্ষেরই একটি ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ। ভারতের সব রাজ্যের ছেলেরা এখানে শিক্ষালাভ করে।

দূর থেকে, কাছ থেকে হাজার হাজার মানুষ আসেন আশ্রমে। কেউ অভিভাবক, কেউ শিক্ষার্থী, কেউ গবেষক, আবার কেউ-বা দর্শনার্থী মাত্র। সকলেরই ইচ্ছে থাকে আশ্রমে প্রবেশ করে আশ্রমের দেবালয়ে গিয়ে অধিষ্ঠাতা দেবতার পায়ে প্রণতি নিবেদন করেন। অথচ ছাত্রাবাসের প্রার্থনাকক্ষ ক্ষুদ্র-পরিসর, ছাত্র-শিক্ষকের বাইরে দর্শনার্থীদের স্থান সেখানে হয়ে ওঠে না। বাসনা অতৃপ্ত থাকে অনেকেরই, অধিকাংশেরই। সকলেরই জিজ্ঞাসা—আশ্রমে মন্দির কই? মন্দিরবিহীন আশ্রম কেমন যেন বিগ্রহহীন দেবালয়। সেই অনুচ্চারিত জিজ্ঞাসা কালক্রমে উচ্চারিত হল। প্রাণের আকাঙ্ক্ষা নিবেদিত হতে থাকল যথাস্থানে। গ্রাম থেকে আসা কর্মিগণেরও ঐ একই আকুতি যুক্ত হল সেই সঙ্গে। হাজার হাজার তরুণ-তরুণী আজ রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদের অনুপ্রেরণায় ও সহায়তায় সঙ্ঘবদ্ধ, জগদ্ধিতায় সংকল্পবদ্ধ। অন্নহীন, বিত্তহীন তথাকথিত দুর্বল অসহায় মানুষকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করা এঁদের ব্রত। এঁরা আশ্রমে আসেন দিনে-রাতে আলোচনা-পরামর্শের জন্য। এঁরাও চাইলেন একটি মন্দির। দরিদ্র এঁরা অর্থের অভাবে—কিন্তু হৃদয় সম্পদে এঁরা ধনী। এঁরা এগিয়ে এলেন—এমনকি কিছু পরিমাণ অর্থ সংগ্রহেরও প্রতিশ্রুতিসহ। প্রাণের সাধ—একটি মন্দির—শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির। তদানীন্তন সঙ্ঘাধীশ পূজ্যপাদ বীরেশ্বরানন্দ মহারাজও অগণিত প্রাণের এই আর্তিতে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, নরেন্দ্রপুরের সমগ্র গ্রাম-সেবা প্রকল্পে তথা লোকশিক্ষার কাছে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর উৎসাহ, প্রেরণা ও আশীর্বাদ ছিল এক অমিত শক্তির উৎসস্বরূপ। যা হোক, বেলুড় মঠস্থ মিশন-কর্তৃপক্ষ অনুমোদন জানালেন—নরেন্দ্রপুরে মন্দির হোক। সবুজ সঙ্কেত পাওয়া গেল।

শত শত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপ নিতে থাকল ধীরে ধীরে। শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির যখন গড়ে উঠছে নরেন্দ্রপুরে—তখন গ্রামে-গঞ্জে, দূরে কাছে সকলেই এই মন্দির-গঠনের বিশাল ব্যয়ভার লাঘবের উদ্দেশ্যে কাজে নেমে পড়েছেন। সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় একদিন সত্যি সত্যিই মন্দির

নির্মাণ শুরু হল বিখ্যাত ভাস্কর শ্রীসুনীল-কুমার পাল ও বাস্তুকার বসু একদল কর্মিসহ মন্দিরনির্মাণে ব্যাপৃত ছিলেন দীর্ঘ পাঁচ বছর। বিভিন্ন স্থানের নানা মন্দিরের নক্‌শা সংগ্রহ হল, কত আলোচনাই হয়েছিল পূজনীয় স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী এবং পূজনীয় স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর সঙ্গে মন্দিরের গঠনশৈলীর ব্যাপারে। চিত্রশিল্পী শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন। অনেক পরিমার্জন ও পরিবর্তনের পরে শ্রীসুনীল পাল এক চূড়ান্ত রূপ দিলেন মন্দির-স্থাপত্যের।

তৈরি হল মন্দির। একশো ফুট দীর্ঘ, চল্লিশ ফুট প্রশস্ত ও পঁচাত্তর ফুট উচ্চ এই মন্দির বাংলার আটচালার প্রতিরূপ। পল্লীবাংলার কুটীর ও বিভিন্ন প্রদেশের এবং ধর্মের কিছু কিছু স্থাপত্যভঙ্গীসহ গঠিত এই মন্দির। প্রাচীন ভারতীয় মন্দিরের মতো আশ্রমস্থ এই মন্দিরের সম্মুখভাগে নাতিদীর্ঘ দুটি দীপস্তম্ভ। সম্মুখের প্রধান প্রবেশদ্বারটি ছাড়াও রয়েছে দুপাশে দশটি প্রবেশপথ দিক্‌পতিদের জন্য নির্দিষ্ট। দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরের নাগররীতির প্রভাব সম্বলিত এই মন্দিরের সম্মুখে প্রশস্ত সোপান। আশ্রমের প্রথম প্রবেশপথটি ধরে এগিয়ে এসে বাঁয়ে বেঁকে যাওয়া পথটি ধরে সামান্য এগিয়ে গেলেই প্রশস্ত সোপানশ্রেণী মন্দিরে ওঠার।

কিন্তু মন্দির তৈরি করাই তো শেষ কথা নয়। বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করতে হবে, আর বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উৎসবের মাধ্যমে এই মন্দিরপ্রাঙ্গণকে শত-সহস্র মানুষের মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠতে হবে। দেবতা প্রতিষ্ঠিত হবেন মন্দিরে,—মন্দির মানুষের হৃদয়ের প্রতীক—তাই দেবতার আসন হবে মানুষের হৃদয় জুড়ে। তবেই তো হবে সফল মন্দির-প্রতিষ্ঠা।

২১ মে, ১৯৮৫। সূর্যোদয়ের পূর্বে সানাই ভৈরবীতে ঘোষণা করল উৎসবের শুভ সূচনা। আশ্রমিকগণ স্নান সমাপনান্তে একে একে এগিয়ে এলেন মন্দিরপ্রাঙ্গণে, ভীড় করে দাঁড়ালেন যজ্ঞমণ্ডপে—যেখানে শুরু হয়েছে বাস্তুযাগ। কাশীর বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ বেদমন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে মন্দির-প্রতিষ্ঠা উৎসবের সূচনা করলেন। আশ্রমিকদের কণ্ঠে তখন গীত হচ্ছিল প্রভাতী ভজন। সুরে-তানে-লয়ে, কথায়-আচরণে, চলনে-বলনে সকলের মধ্যেই প্রকাশিত এক আকূতি—দেবতার প্রতি সভক্তি আহ্বান। সারাদিন শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণ-মননের মধ্য দিয়ে প্রস্তুতি চলল ২২ মে-র জন্য। একে একে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে পৌঁছলেন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ।

২২ মে। প্রাতঃকালে সানাই-এর সুর অনুরণিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ছাত্র, শিক্ষক, কর্মী ও ভক্তগণ মন্দির প্রদক্ষিণ করে সূচনা করলেন প্রভাতফেরীসহ আশ্রম পরিক্রমার। সকলের আগে প্রবীণ সন্ন্যাসীদের হাতে পবিত্র গৈরিক ধ্বজা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রী স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি। সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের কণ্ঠে উচ্চারিত হতে থাকল বেদমন্ত্র। অতঃপর সকলের মিলিত কণ্ঠে গীত—শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত। সব মিলিয়ে এক পবিত্র আনন্দময় পরিবেশ। ক্রমে ক্রমে সমবেত হলেন ভক্তবৃন্দ, —জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষ। মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম, যজ্ঞমণ্ডপে সপ্তশতী যজ্ঞ, বাইরে ভক্তবৃন্দের আনন্দ-গুঞ্জনে প্রাঙ্গণ মুখরিত। সকলের মধ্যেই কিন্তু একটি প্রত্যাশা, সকলের দৃষ্টিই তখন একদিকে।

আশ্রমের প্রবেশপথটি একটি সুদৃশ্য তোরণে সুসজ্জিত। রামবাগান পল্লীর শিল্পীদের তৈরি বাঁশ ও বেতের এই সুদৃশ্য তোরণ সমগ্র প্রাঙ্গণের

সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিল শতগুণ। ঐ প্রবেশপথের দিকেই তাকিয়ে আছেন সকলে। মূল মণ্ডপে সহস্র সহস্র ভক্তের উপস্থিতিতে চলছে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা। আশ্রমের বাইরে রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় আছেন দর্শনার্থী জনতা,—তাদের সবার হাতে ফুল, মালা, শাঁখ। আসবেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ। সঙ্ঘনায়কের পবিত্র হস্তের নিবেদিত অর্ঘ সূচিত করবে মন্দিরের উদ্বোধন,—দ্বারোদ্ঘাটন। মহারাজজী আশ্রমে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই বেজে উঠল শত শত শাঁখ। সমবেত মাতৃকণ্ঠের উলুধ্বনি ঘোষণা করল পূজ্যপাদ মঠাধীশ মহারাজের আগমন। হাজার হাজার নারী-পুরুষের সম্মিলিত কণ্ঠে তখন ধ্বনিত—'জয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব কি জয়'। তাঁর সঙ্গে রামকৃষ্ণ-মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসিমণ্ডলী। ধীরে ধীরে মহারাজজী এগিয়ে এলেন মন্দিরের দিকে। সমগ্র মন্দিরপ্রাঙ্গণ তখন যথার্থই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের মিলনক্ষেত্র—পুণ্যতীর্থ। আগে আগে চলেছেন পূজ্যপাদ প্রেসিডেণ্ট মহারাজ। তিনি প্রবেশ করলেন মন্দিরাভ্যন্তরে—তাঁর পবিত্র হাতের অর্ঘ নিবেদিত হল যুগাবতার শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে। উপস্থিত ভক্ত নর-নারী সকলেরই প্রাণের পূজা নিবেদিত হল সঙ্ঘগুরুর করকমলের অর্ঘ নিবেদনের মধ্য দিয়ে।

মন্দির-উদ্বোধনের পর পূজ্যপাদ গম্ভীরানন্দজী মহারাজ উদ্বোধন করলেন একটি প্রদর্শনীর। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকাহিনী ছবিতে ও কথায় বিধৃত হয়েছে এই প্রদর্শনীতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর অনিশ্চিত-উদ্দেশ্যবিহীন জনজীবনে যিনি নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন, যাঁর সহজ-সরল কথায় মানুষের মনে গেঁথে গিয়েছিল বেদান্তের সারাৎসার, যিনি সকল ধর্মকেই সমান প্রীতি ও শ্রদ্ধায় গ্রহণ করে ও করিয়ে নবযুগের সূচনা করেছিলেন—সেই অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবনালেখ্যসহ এই প্রদর্শনীটি উপস্থিত সকলের কাছেই মন্দিরের পবিত্রতা নিয়ে প্রতিভাত হয়েছিল।

এরপর মূল মণ্ডপে পূজ্যপাদ প্রেসিডেণ্ট মহারাজ ভক্তি-পিপাসায় আর্ত কয়েক সহস্র মানুষকে শোনালেন যুগাবতারের আগমনের তাৎপর্য; ব্যাখ্যা করে বোঝালেন বর্তমান এই অবক্ষয়ের যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের প্রয়োজন ও মাহাত্ম্য। পূজনীয় মহারাজ সকলের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। সকৃতজ্ঞ চিত্তে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে পূজনীয় মহারাজকে বিদায় জানালেন। ইতিমধ্যে পূজনীয় মহারাজ মন্দিরনির্মাণে যে নিঃস্বার্থ ভাস্কর তাঁর অন্তরের সমস্ত ভক্তিকে উজার করে ঢেলে দিয়েছেন সেই শ্রীসুনীল পাল মহোদয়কে, বাস্তুকার শ্রীদুর্গা বসুকে এবং কর্মী শ্রীগৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রীতি ও শুভেচ্ছার প্রতীকস্বরূপ বস্ত্র-উত্তরীয় প্রদান করেন।

এবার প্রসাদ বিতরণের পালা। কর্মিগণ প্রস্তুত। প্রস্তুত ভক্তগণও। দশ সহস্রাধিক মানুষ সুশৃঙ্খলভাবে দেবালয়ের সামনের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে গ্রহণ করলেন প্রসাদ। তৃপ্ত হয়েছিল সকলেই। একই সঙ্গে চলছে মূল মণ্ডপে ভক্তি-মূলক সঙ্গীত—পরিবেশন করছে দেশের বিখ্যাত শিল্পিগণ, কালীকীর্তন পরিবেশন করলেন আন্দুল কালীকীর্তন সমিতি, রামায়ণ গেয়ে শোনালেন শ্রীঅনাথবন্ধু অধিকারী, আশ্রমের অন্ধ বালক বিদ্যায়তনের ছাত্রগণ নিবেদন করলেন গীতি-আলেখ্য: অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ। অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত হল ধর্মসভা—রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ

মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী সুললিত ভাষায় "শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির"—এই বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ ভাষণে দেশ-বিদেশের আধ্যাত্মিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির বর্তমান বিশ্বে কী ভূমিকা পালন করছে, তা বুঝিয়ে বলেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও বাণীর পটভূমিকায়, ভারতীয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ও বর্তমান বিশ্বে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। ভক্ত-হৃদয়ের সীমাহীন আকুলতা যেন বাণীরূপ পেল সন্ধ্যার সুন্দর অনুষ্ঠানে প্রদত্ত সুললিত ভাষণে।

প্রভাতে যে উৎসবের সূচনা—সন্ধ্যায় তার পূর্ণ পরিণতি আরাত্রিকে ও ভজনে। বেজে উঠল কাঁসর-ঘণ্টা-শঙ্খ, শত কণ্ঠে গীত হল 'খণ্ডন ভববন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়'। ছোট মন্দির, কিন্তু ভক্ত যে অনেক। কিন্তু স্থানের অপ্রতুলতা প্রাণের আবেগকে বাধা দিতে পারেনি। মন্দির ছাড়িয়ে সংলগ্ন প্রাঙ্গণে হাজার হাজার মানুষ, পুরুষ-নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, তরুণ-তরুণী, শিশু, হিন্দু-মুসলমান—সকলের প্রাণের আকূতি, হৃদয়ের অর্ঘ নিবেদিত হল শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে। পরে সভামণ্ডপে বিশ্বখ্যাত বেহালাবাদক পণ্ডিত ভি. জি. যোগের বেহালাবাদনের মধ্যেও নিবেদিত হল শিল্পীর ও সহস্র সহস্র শ্রোতার ভক্তিশ্রদ্ধা।

২১ মে মন্দির-প্রতিষ্ঠা উৎসবের সূচনা। উৎসব চলল ২৬ মে পর্যন্ত। ঊষাকালের ভৈরবীতে প্রতিদিনই ঘোষিত হত দিনের শুভ অনুষ্ঠানসূচী। ঊষা থেকে নিশা—একের পর এক অনুষ্ঠান। ভক্তিগীতি, রামায়ণ গান, গানে ও কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন, বিখ্যাত শিল্পী শ্রীবুদ্ধদেব দাশগুপ্তের সরোদবাদন, শ্রীঅমরেশ চৌধুরীর প্রাণমাতানো ভজন, শ্রীসমরেশ চৌধুরীর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও ভজন, শ্রীধীরেন বসুর ভক্তিগীতি ও সন্ধ্যায় ধর্মসভা। ২৩ মে-র ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করলেন স্বামী সিদ্ধিনাথানন্দজী এবং প্রাত্যহিক জীবনে মন্দিরের তাৎপর্য বিষয়ে বললেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহকারী কর্মসচিব স্বামী প্রভানন্দজী, স্বামী হর্ষানন্দজী এবং অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ। ২৪ মে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী—এই বিষয়ে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহকারী কর্মসচিব স্বামী গহনানন্দজী এবং আলোচনা করলেন স্বামী স্মরণানন্দজী, স্বামী অমৃতানন্দজী, অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত। ২৫ মে ধর্মসভার আলোচ্য বিষয় ছিল 'স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী' রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহকারী কর্মসচিব স্বামী আত্মস্থানন্দজীর সভাপতিত্বে এই সভায় ভাষণ দেন স্বামী অজজানন্দজী, স্বামী হর্ষানন্দজী, স্বামী অকামানন্দজী এবং ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর।

২৬ মে উৎসবের সমাপ্তি দিবস। প্রাতঃকালে আশ্রমিকগণ, সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারিবৃন্দ এবং শত শত গ্রামকর্মী পরিক্রমা করলেন আশ্রম—শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত গেয়ে। মন্দিরে হল শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা। সকালে অনুষ্ঠিত হল আলোচনা-সভা। আলোচ্য বিষয়: 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব-আন্দোলন'। স্বামী জিতাত্মানন্দজী, স্বামী সুপর্ণানন্দজী, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী ও শ্রীশিবশঙ্কর চক্রবর্তী—তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ এবং ব্যক্তি-মানুষের কর্তব্য স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন ভক্ত শ্রোতাদের কাছে।

সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত ধর্মসভার বিষয় ছিল: 'সর্বধর্ম সমন্বয়'। সভাপতিত্ব করলেন স্বামী

অক্ষরানন্দজী। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বললেন স্বামী মুমুক্ষানন্দজী এবং বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে স্বামী হর্ষানন্দজী বলেন। ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে বললেন বিচারপতি শ্রী এস. এ. মাসুদ এবং খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করলেন রেভারেণ্ড বি. সি. দাস। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট ও ইসলাম—সর্বধর্মের সারমর্ম স্পষ্ট হয়ে, স্বচ্ছ হয়ে সিক্ত করল শ্রোতাদের মন। যখন সংকীর্ণ ধর্ম-জাতি-সাম্প্রদায়িক বোধ বসুধাকে খণ্ড ক্ষুদ্র করেছিল, যখন মানুষের ভেদবুদ্ধি নিজেকে অক্ষম অপদার্থ মনে করে নির্জীব হয়ে পড়েছিল, তুচ্ছ আচারের মরুবালিরাশি যখন মানুষের বিচার-বোধকে গ্রাস করেছিল, ভয় যখন মানুষকে সংকুচিত করে রেখেছিল—তখনই শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব-ধর্ম সমন্বয় ও শিবজ্ঞানে জীব-সেবার আদর্শের বাণী নিয়ে আবির্ভূত হয়ে মানুষকে চিনিয়ে দিলেন তার স্বরূপ, ঘোষণা করলেন সে দুর্বল, অক্ষম নয়। বক্তাগণ এক-একটি ধর্মের সারবত্তা ব্যাখ্যা করলেন আর তার যাথার্থ্য নিরূপণ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও আদর্শের আলোকে।

ধর্মসভার শেষে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যাত্রাভিনয়—'সাধক কমলাকান্ত'। পরিবেশক—হাওড়া শিবপুরের রামকৃষ্ণ-মন্দির।

উৎসবের প্রথম দিনে যে আনন্দের শুভ সূচনা হয়েছিল—সপ্তাহকালব্যাপী যে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল অগণিত মানুষের মধ্যে—অনুষ্ঠানের শেষদিনে শেষলগ্নে—তাতে কিঞ্চিৎ যেন বেদনার ছায়া নেমে আসে স্বাভাবিক কারণে। কিন্তু ঐ যে সামনে মন্দির—মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবতা—তিনি তো আনন্দেরই প্রতি-মূর্তি। তাঁর উপস্থিতিতে নিরানন্দের অবকাশ নেই সামান্যতম। তাই প্রতিদিন সকালে-সন্ধ্যায় শত শত শান্তিপিপাসু মানুষ, সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ আসছেন শান্ত পদবিক্ষেপে, এগিয়ে যান মন্দিরে। দেবতাকে দর্শন করে, তাঁর চরণে ভক্তির অঞ্জলি দিয়ে ফিরে যান—আবার আসবেন বলে।

মানুষ যে জিনিসটি তৈরি করে, তাতে কোন একটা idea express (মনোভাব প্রকাশ) করার নামই art (শিল্প)। যাতে idea-র expresssion (ভাবের প্রকাশ) নেই, রঙ-বেরঙের চাকচিক্য পারিপাটি থাকলেও তাকে প্রকৃত art (শিল্প) বলা যায় না। ঘটি, বাটি, পেয়ালা প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রগুলিও ঐরূপে বিশেষ কোন ভাব প্রকাশ করে তৈরি করা উচিত।

—স্বামী বিবেকানন্দ

জীবনী-সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী

ডক্টর চিত্রা দেব

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে বিশিষ্ট গবেষিকা ও লেখিকা। ভূতপূর্ব অধ্যাপিকা—বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকায় সংশ্লিষ্টা। প্রকাশিত প্রবন্ধটি বিগত ৬ এপ্রিল, ১৯৮৫ 'উদ্বোধন' কার্যালয়-প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য-সম্মেলনে লেখিকা কর্তৃক পঠিত।

ভারতীয় সাহিত্যে জীবনী-সাহিত্য রচনার ধারাটি খুব প্রাচীন। যতদূর মনে হয়, এদেশে জীবনী রচনার সূত্রপাত হয়েছিল বৈদিক যুগে। ঋগ্বেদ সংহিতার কোন কোন সূক্তের দেবস্তবে দেখা যায়, মাহাত্ম্য বর্ণনা উপলক্ষে তাঁদের জন্ম থেকে কীর্তিকথা সংক্ষেপে বর্ণিত হচ্ছে। এই দেবতার বিজ্ঞাপিকাই হল জীবনী-সাহিত্য রচনার আদিরূপ। অন্যান্য দেশেও এ-জাতীয় উদাহরণ বিরল নয়। এমনও ধারণা করা চলে, পৃথিবীর সব দেশেই দেবতা বা দেবকল্প মানবের জীবনচরিত রচনার মধ্য দিয়ে সাহিত্যচর্চা শুরু হয়েছিল। একহিসেবে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, বিভিন্ন পুরাণ এমনকি বৌদ্ধ জাতকও জীবনী-সাহিত্য।

বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখা যাবে, মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে জীবনী-সাহিত্য রচনার কোন চেষ্টা শুরু হয়নি। যদিও রামায়ণ, মহাভারত বা ভাগবত রচনার ধারাটি অব্যাহত ছিল। বাংলাদেশে আধ্যাত্মিক জীবন-সাধনার প্রেরণারূপে এসেছিলেন দুজন অলোক-সামান্য প্রতিভার অধিকারী দেবোপম মানব। তাঁরা শুধু ধর্ম-সম্পর্কিত চিন্তার ক্ষেত্রে নয়, সমগ্র দেশবাসীর জীবনে ও মননে গভীর ও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। সংক্ষেপে বলা যায়, বাঙালীর চিত্তলোক যে দুটি নবজাগরণের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, তার হৃদয় মন্থন করে যে অমৃত উঠেছিল তারই ঘনীভূত রসরূপ পরিগ্রহ করেছিলেন এই দুই দেবকল্প মহামানব শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

ভারতবর্ষে পূর্বে অবতাররূপে যে মহাপুরুষেরা এসেছিলেন তাঁরাই ছিলেন মহাকাব্যের নায়ক। কিন্তু দশাননজয়ী অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র ও কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধনিয়ন্তা দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য আছে। বরং সাদৃশ্য আছে ভিক্ষু সন্ন্যাসী বুদ্ধদেবের সঙ্গে, জৈন তাপস মহাবীরের সঙ্গে। এঁদের আবির্ভাব আলোড়ন জাগিয়েছিল উত্তর ভারতে। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে সেদিন ধন্য হয়েছিল বাঙালীর জীবন, ধন্য হয়েছিল সমগ্র বঙ্গদেশ। শ্রীচৈতন্যের অলোকসামান্য জীবনচরিত রচনার মধ্য দিয়েই বাংলায় জীবনী-সাহিত্য রচনার সূচনা হয়। তাই বাংলা চরিত-সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যজীবনীর ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীচৈতন্যের প্রভাবেই মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্য গতানুগতিক তুচ্ছতা থেকে মুক্তিলাভ করে। সেই সময় তাঁর মাহাত্ম্য প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মানবলীলার অপূর্ব বৃত্তান্ত লিখে রাখার আগ্রহ তাঁর ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে দেখা দেয়। জীবিত বা অল্পকাল পূর্বে লোকান্তরিত কোন মহামানবের জীবনী রচনা ও তাঁর সাধনার দার্শনিক ব্যাখ্যাদানের চেষ্টাও শুরু হয় তখন থেকেই। বলাবাহুল্য আধুনিক যুগে আমরা যাকে জীবনী-সাহিত্য বলে থাকি চৈতন্যজীবনীগুলি সে জাতীয় যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ জীবনীগ্রন্থ হয়নি। বরং এদের তুলনা করা যায় য়ুরোপীয় হ্যাজিওগ্রাফী

বা সন্তজীবনীগুলির সঙ্গে। এ-জাতীয় গ্রন্থে সাধকের ভাবজীবনই প্রাধান্য লাভ করে, বাস্তব-জীবন নয়। শ্রীচৈতন্যদেবও ভক্তদের কাছে ছিলেন 'ভাবের মূরতি', কিছু বাস্তব ও কিছু কল্পনায় মেশা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলোকসামান্য জীবন ও লীলামাহাত্ম্যও আধুনিক মানুষের কাছে পরম বিস্ময়। তিনি শুধু অবতার নন, অবতারবরিষ্ঠ। সুতরাং তাঁর জীবন ও সাধনাসম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে প্রচণ্ড আগ্রহ ও কৌতূহল থাকাই স্বাভাবিক। তাঁর লীলাবসানের পর তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের অন্তরেও জাগ্রত হচ্ছিল তাঁর জীবনলীলা প্রকাশের ঐকান্তিক বাসনা।

চৈতন্য-জীবনীকারদের সামনে জীবনী রচনার কোন দৃষ্টান্ত ছিল না, কিন্তু উনবিংশ শতকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী রচনার সময় এদেশে জীবনী রচনার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় রীতিই বেশ পরিচিত। বিশেষ করে ব্রাহ্ম লেখকেরা দেশীয় মহাপুরুষদের জীবনী রচনায় অত্যন্ত উৎসাহবোধ করতেন। সম্ভবত খ্রীষ্টীয় লেখকদের অনুসরণেই তাঁরা সমসাময়িক ও অনতিকাল পূর্ববর্তী বাঙালী মনীষীদের জীবনী রচনায় মনোনিবেশ করেন। বাংলা-সাহিত্যের এই নতুন শাখাটি তাঁদের হাতেই উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রথম বাণী সংকলক ও জীবনী লেখকও জনৈক ব্রাহ্ম মনীষী গিরিশচন্দ্র সেন। তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নির্দেশে 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস থেকে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণী সংকলন করেন। পরে এই সংকলন 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকায় ছিল ১৮৪টি প্রশ্ন ও তার উত্তর। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের অব্যবহিত পরে এই পুস্তিকায় সংযোজিত হয় তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

সুরেশচন্দ্র দত্তের 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি' প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। পরে তিনিও গ্রন্থটিকে ঈষৎ পরিবর্তিত করে পুনঃপ্রকাশ করেন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উপদেশ' নামে। স্বতন্ত্র আকারে ঠাকুরের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখেন রামচন্দ্র দত্ত। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' গ্রন্থে তিনি ঠাকুরের বাল্যলীলা ও সাধন-ভজনের বৃত্তান্ত এবং তাঁর পরবর্তী জীবনের যেসব ঘটনাবলী রামচন্দ্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা প্রকাশ করেন।

এর কয়েক বছর পরে অক্ষয়কুমার সেন বাংলা পয়ারের সহজ ছন্দে লিখলেন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'। পুরনো রীতিতে লেখা হলেও এই গ্রন্থটি অতীব সুন্দর, সুললিত ও সুখপাঠ্য। স্বামীজী তাঁর গ্রন্থের প্রথম খণ্ড পড়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে লিখেছিলেন, 'তার কণ্ঠে তিনি আবির্ভাব হচ্ছেন।' শুধু তাই নয়, পরবর্তিখণ্ডে লেখবার জন্যে কিছু কিছু নির্দেশও পাঠিয়েছিলেন। অক্ষয়কুমারের পুঁথিতে শ্রীমা সারদাদেবীর কথা বিশেষ ছিল না। স্বামীজীর নির্দেশে তিনি গ্রন্থে মাতৃস্তব সংযোজন করেন।

এ-সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যেরা তাঁদের গুরুদেবের জীবনচরিত রচনায় হস্তক্ষেপ করেননি। বরং স্বামীজী প্রথমদিকে তাঁর গুরু-ভাইদের এ-ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে একপ্রকার নিষেধ করেছিলেন এবং জানিয়েছিলেন, 'তাঁর জীবনচরিত যে কেউ লিখবে, তার সঙ্গে তোমরা নিজেদের জড়িত করো না বা তা অনুমোদন করো না।' গুরুভাইদের এভাবে সাবধান করে দিলেও এ-সময় থেকেই স্বামীজী ঠাকুরের জীবনী রচনার প্রয়োজন অনুভব করছিলেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখেছিলেন, 'আমি একটা পরমহংস

মহাশয়ের জীবনচরিত লিখে পাঠাব। সেটা ছাপিয়ে ও তর্জমা করে বিক্রি করবে।' স্বামীজীর লেখা ঠাকুরের জীবনের সেই সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্রই তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যের আঁকা প্রথম জীবনচিত্র।

ইংরেজীতে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী গ্রন্থ প্রথম রচনা করেন ম্যাক্সমূলার। তবে সংক্ষেপে The Hindu Saint নামে ঠাকুরের সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই প্রবন্ধই Paramhansa Ramkrishna নামে পুস্তিকাকারে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল। ম্যাক্সমূলার এই পুস্তিকা পাঠ করে প্রথমে একটি প্রবন্ধ লেখেন। পরে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংক্রান্ত আরও বহু তথ্য সংগ্রহ করে রচনা করেন Ramkrishna : his life and sayings। তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম বিদেশী জীবনীকার। স্বামীজীর নির্দেশে ম্যাক্সমূলারকে ঠাকুরের জীবনী-সংক্রান্ত কিছু কিছু কাগজপত্র ও তথ্য বেলুড় মঠ থেকে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন স্বামী সারদানন্দ। পরে এই তথ্য সংগ্রহই তাঁর নিজস্ব গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' রচনার কাজে লাগে।

এ-প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাণী ও উপদেশ সংকলনের কাজও শুরু হয়েছিল। ভক্ত-সাধারণের কাছে মহাপুরুষের জীবন ও বাণী সমার্থক। তাই ঠাকুরের জীবনী রচনারও আগে শুরু হয়েছিল তাঁর অমৃতোপম বাণী সংকলন। এ-জাতীয় সব গ্রন্থকে না হোক শ্রীম-সংকলিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত'-কে সকলেই জীবনীগ্রন্থের মর্যাদা দিয়ে থাকেন। অভিভূত হয়ে শ্রীম-কে জীবনীলেখক বস্‌ওয়েলের সঙ্গে তুলনা করেছেন অল্ডাস হাক্সলি।

মহেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসেন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময় থেকে ঠাকুরের দেহাবসানের সময় পর্যন্ত শ্রীম অন্তরঙ্গ পার্ষদের মতোই তাঁকে দর্শন করেন ও দিনলিপিতে সাক্ষাৎকারের বিবরণ লিখে রাখেন। এই সাক্ষাৎকারের যথাযথ বিবরণই কথামৃত নামে বিখ্যাত। প্রথমে মহেন্দ্রনাথ এই দিনলিপি প্রকাশের কথা ভাবেননি, কিন্তু শ্রীমার আদেশে তিনি গ্রন্থাকারে এই সাক্ষাৎকার বিবরণ প্রকাশে সম্মত হন। মনে হয়, তিনি ইচ্ছে করেই ঠাকুরের লীলাবসানের একেবারে শেষের পর্বটি বাদ দিয়েছিলেন।

কথামৃতে ঠাকুরের জীবনের বহু ঘটনার বিবরণ ছাড়াও আছে তাঁর অমূল্য উপদেশ, অমৃতোপম বাণী, আছে তাঁর আত্মস্বরূপের কথা। ভক্তদের কাছে তিনি তাঁর নিজের জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা ব্যক্ত করেছেন। ঠাকুরকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়; কারণ তাঁর চেতনার স্তর সাধনার উচ্চমার্গে অধিষ্ঠিত। খণ্ডিত মানবের পক্ষে সেই পূর্ণ মানবকে উপলব্ধি করে সেই অভিজ্ঞতা নিজের ভাষায় প্রকাশ করা কখনই সম্ভব হত না যদি না তিনি নিজেই নিজের পরিচয় ভক্তদের জানিয়ে যেতেন। অথচ জীবনীকারকে, তিনি যাঁর জীবনচরিত রচনা করবেন, তাঁর বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতেই হবে। কোন মহাত্মা বা ধর্মগুরুর জীবনী রচনায় এটি একটি বিরাট বাধা। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, অধিকাংশ গ্রন্থেই শ্রীরামকৃষ্ণকে উপলব্ধি করার চেষ্টা হয়েছে মাত্র। ঠাকুরের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়নি কারও পক্ষে। সৌভাগ্যক্রমে কথামৃতে তিনি স্বয়ং জীবনচরিত রচনার বহু সূত্র রেখে গিয়েছেন। সেজন্যে পরবর্তী লেখকেরা সকলেই শ্রীম-র কথামৃতের সাহায্য নিয়ে ঠাকুরের জীবনী রচনা করেছেন।

মহেন্দ্রনাথের অনুরোধে স্বামী অভেদানন্দ 'কথামৃতে'র ইংরেজী সংস্করণটি সম্পাদনের ভার

নেন ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। স্বামী নিখিলানন্দের সম্পাদনায় ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে যে ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাতে সাল তারিখ অনুযায়ী ঘটনাগুলিকে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলা কথামৃতে এই বিবরণ সাজানো নেই। পৌনঃ-পুনিকতা এবং প্রায় একই ধরনের বর্ণনাও দুর্লভ নয়। পড়তে পড়তে মনে হয়, কথামৃত যেন সদ্য আহরিত ফুল, সাজিয়ে গুছিয়ে একটি তোড়ায় বাঁধা হয়নি। কিন্তু তাতে এখন সদ্য তোলা ফুলের সতেজ ভাব, ভোরের শিশির লেগে রয়েছে। অপরদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনের সমস্ত ঘটনা সমস্ত বিবরণকে যথাযথভাবে সাজিয়ে গ্রথিত করেছেন স্বামী সারদানন্দ।

বাংলা জীবনী-সাহিত্যের ইতিহাসে 'শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে'র মূল্য অপরিসীম। স্বামী সারদানন্দ এই মহাগ্রন্থটি রচনা শুরু করেন ১৯০৯ অন্যদিক থেকেও গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য; কেননা এতদিন ধরে এবং এর পরেও বহুদিন পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণজীবনচরিত-লেখকরা সকলেই ছিলেন গৃহী ভক্ত। কথামৃতও গৃহী ভক্তের দৃষ্টিতে দেখা ও তাঁদের জন্যেই লেখা। এ-সময় আরও অনেকেই ঠাকুরের জীবনচরিত লেখার চেষ্টা করেন। 'উদ্বোধন' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা প্রকাশের ফলে এ-আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায়।

অন্যান্যদের মধ্যে সত্যচরণ মিত্র ও গুরুদাস বর্মণের গ্রন্থের নাম স্মরণীয়। সত্যচরণ মিত্রের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' ছাপা হয় ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে, গুরুদাস বর্মণের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত' ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে। আরও কয়েকজনের কথা আগেই বলেছি। প্রথমদিকে লেখা ঠাকুরের এই সব জীবনীগ্রন্থই প্রধানত শ্রুতিনির্ভর বিবরণ সংগ্রহ করে লেখা হয়। সত্যচরণ লিখেছেন, 'রামকৃষ্ণ পরমহংসের বিশেষ বন্ধু—ভক্ত শ্রীহরিশচন্দ্র নহূবাবধূত মহাশয়ের ঋষিতুল্য মুখ হইতে শুনিয়া' এবং গুরুদাস বর্মণের প্রধান অবলম্বন ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা। অবশ্য তিনি তৎকালে প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থও দেখেছিলেন। অক্ষয়-কুমার সেন শিহড় অঞ্চলের অনেক চাক্ষুষ বিবরণ সংগ্রহ করেন। আরও কয়েক বছর পরে ধন-গোপাল মুখোপাধ্যায় কলকাতায় এসে শ্রীম-র নির্দেশে দক্ষিণেশ্বর ও নিকটবর্তী অঞ্চলের বহু বৃদ্ধ ও প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে ঠাকুরের জীবনী রচনার ও অবতারত্বের বিবরণ সংগ্রহ করেন। অনেক সময় কিংবদন্তী ও জনশ্রুতির অন্তরালে ইতিহাস প্রচ্ছন্ন থাকে। সুতরাং এরও মূল্য আছে, কিন্তু জীবনীগ্রন্থ হিসেবে এ-জাতীয় কোন গ্রন্থকেই প্রামাণিক বলা চলে না।

স্বামী সারদানন্দের তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছিল অনেক আগে। তবু তিনি প্রথমে ঠাকুরের জীবনী লেখার কাজে হাত দেননি। 'উদ্বোধন' পত্রিকার ভার তাঁর হাতে ছিল এবং এ-সময় তিনি লক্ষ্য করেন, সাধারণ মানুষের মনে ঠাকুরের জীবন সম্বন্ধে প্রবল ঔৎসুক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর জীবনীগ্রন্থগুলি তাদের যথাযথ কর্তব্য পালন করতে পারছে না। তাঁর নিজের কথায়, 'উদ্বোধনে ছাপাবার জন্যে ঠাকুরের সম্বন্ধে তখন নানারূপ প্রবন্ধ আসত। সবগুলিই এত অধিক ভ্রমপূর্ণ যে কেটে ছেঁটে সম্পূর্ণ নতুন করে লিখতে হত। আমার কেবলই মনে হত, আমরা থাকতেই এতটা ভুল প্রচারিত হবে?'

এ-ছাড়াও আরও কিছু কিছু কারণ ছিল। সেইজন্যে স্বামী সারদানন্দ স্বয়ং এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং ১৯০৯ থেকে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ দশ বছর ধরে তিনি যে মহাগ্রন্থ রচনা করলেন সেটি হল 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'।

স্বামী সারদানন্দ ঠাকুরের জীবনকথা অতি-বিস্তৃতভাবে অনুপুঙ্খ বর্ণনাসহ উপস্থাপিত

করেছেন। তাঁর রচনা যুক্তিনিষ্ঠ, বৈজ্ঞানিক সত্যনির্ভর অথচ ঐকান্তিক ভক্তিনম্রতায় সমুজ্জ্বল। ঠাকুরের দৈনন্দিন জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবন-সংক্রান্ত সমস্ত কিছু জ্ঞাতব্য বস্তুর আকর গ্রন্থরূপে আমরা লীলাপ্রসঙ্গকে গ্রহণ করতে পারি। মধ্যযুগে কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মতো দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করে যে দুরূহ কর্ম সম্পাদন করেছিলেন এযুগে স্বামী সারদানন্দও ততোধিক কঠিন কাজ সম্পন্ন করলেন লীলাপ্রসঙ্গ রচনা করে। তাঁর মনস্বিতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লীলাপার্ষদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এ-গ্রন্থকে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদর্শন হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনসাধনার তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনেকে বুঝতে পারেননি। সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বোঝা সম্ভবও হয়নি সবসময়। অনেকে মনে করতেন, তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন এক ব্যক্তি—যাঁর সাম্প্রদায়িক মত বা দল সৃষ্টি করাই প্রধান লক্ষ্য। স্বামী সারদানন্দ স্থির করলেন এই ভ্রান্ত ধারণাও দূর করতে হবে। 'ঐ অলোক-সামান্য জীবনের সহিত সনাতন হিন্দু বা বৈদিক ধর্মের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা স্পষ্ট নির্দেশ করিয়া কেহই এ পর্যন্ত উহার অনুশীলন করেন নাই।' বলাবাহুল্য স্বামী সারদানন্দ এ-কাজটিও সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন।

লীলাপ্রসঙ্গ পড়বার সময় প্রথমে মনে হতে পারে, এ-গ্রন্থটিও হ্যাজিওগ্রাফীর মতো শুধুই সন্তজীবনী। ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যের আঁকা সাধকজীবনের চিত্র। আসলে কিন্তু তা নয়। সকলের জীবন যেমন এক ছাঁচে গড়া নয়, তেমনি সকলের জীবনচরিত একই ধরনের হতে হবে এমন কোন কথা নেই। রবীন্দ্রনাথও এই নির্দিষ্ট মাপকাঠির বিরোধিতা করেছেন। [যীশুখ্রীষ্ট ও স্বখচাইল্ড] স্বামী সারদানন্দ ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক, আধুনিক মননসম্পন্ন এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। তাঁর গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যও ঠাকুরের জীবন-সংক্রান্ত যাবতীয় ভ্রান্ত ধারণা দূর করা। তাই তীক্ষ্ণধী গবেষকের মন নিয়ে প্রতিটি ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ না করে তিনি কোন তথ্য বা কোন সংবাদ গ্রহণ করেননি। বরং জোর দিয়ে বলেছেন, 'লীলাপ্রসঙ্গের কোন কথা আমি না জেনে লিখিনি।' তাঁর এই সংক্ষিপ্ত ও দৃঢ় উক্তির মধ্যেই গ্রন্থটির প্রকৃত পরিচয় নিহিত রয়েছে।

অবশ্য স্বামী সারদানন্দের উক্তির আলোকেই আমরা বুঝতে পারি এই মহান জীবনীগ্রন্থখানির সীমাবদ্ধতা কোথায়। এ-গ্রন্থে বিবৃত সব বিবরণই সত্য কিন্তু পূর্ণ নয়। তিনি নিজেই বলেছেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্র সম্পর্কে আমরা যতদূর বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি, সমধিক সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি তদপেক্ষা অধিকতর ভাবে উহা বুঝিতে সমর্থ হইবেন। অতএব ঐ দেবচরিত্র বুঝিবার জন্য আমরা নিজ নিজ মন বুদ্ধির প্রয়োগ করিলে উহাতে দুষ্য কিছুই নাই ; কেবল ঠাকুরের চরিত্রের সবটা বুঝিয়া ফেলিয়াছি এ কথা মনে না করিলেই হইল।'

লীলাপ্রসঙ্গের খণ্ডগুলির ধারাবাহিকতা একত্রে পড়লে ক্ষুণ্ণ হয় না, কিন্তু স্বামী সারদানন্দ গ্রন্থ লেখবার সময় গুরুভাব ও সাধকভাব পূর্বে লিখেছিলেন অর্থাৎ যা গৃহীভক্তদের পক্ষে রচনা করা সম্ভব হয়নি সেই অংশ পূর্বে রচনা করেন। পরে তিনি ঠাকুরের বাল্য ও কৈশোরের কথা বর্ণনা করেন। এর ফলে গ্রন্থখানির ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হয়নি। তবে ঠাকুরের অন্ত্যলীলার বিস্তৃত বিবরণ এ-গ্রন্থে নেই। কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থের মতোই এ-গ্রন্থও অসম্পূর্ণ।

স্বামী সারদানন্দকে গ্রন্থখানি শেষ করার জন্য অন্যান্য সন্ন্যাসীরা অনুরোধ জানালে তিনি

উত্তর দিয়েছিলেন, 'আর বোধ হয় হবে না। সেরূপ প্রেরণাই পাচ্ছি না। ঠাকুরের যতটুকু ইচ্ছে ছিল করিয়ে নিয়েছেন।' এখানেও নিরাভিমানী সন্ন্যাসীর চারিত্রিক দার্ঢ্য ও সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের আরেকবার পরিচয় হয়। শ্রীমা সারদাদেবী তাঁর বরপুত্রের গ্রন্থখানি শুনতে ভালবাসতেন এবং বলতেন, 'শরতের বইয়ে সব ঠিক ঠিক লিখেছে।' তাঁর দেহাবসানের পর স্বামী সারদানন্দ গ্রন্থ শেষ করবার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। তাই মনে হয়, শ্রীমার আশীর্বাদ ও আগ্রহই ছিল তাঁর প্রেরণা।

লীলাপ্রসঙ্গের ভাষাশৈলী, উপস্থাপনারীতি, রচনারীতি প্রভৃতি বহুদিক থেকে সাহিত্যিক আলোচনা সম্ভব। আমার মনে হয়, সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রন্থখানিকে নিয়ে বিশদ আলোচনা করা যেতে পারে। স্বল্প অবকাশে এখানে সে সুযোগ নেই। লীলাপ্রসঙ্গের অন্যান্য বহু বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এর ভাষা। বিষয় যেখানে জটিল, ভাষাও সেখানে গুরুগম্ভীর। আবার ঠাকুরের লীলামাহাত্ম্য বর্ণনা অংশে তাঁর ভাষা সহজ সাধুগন্ধ। কোথাও ভাষা অস্পষ্ট বা আড়ষ্ট নয়। পড়তে পড়তে মনে হয়, তিনি যেন প্রত্যক্ষদৃষ্ট ব্যক্তি ও ঘটনার বর্ণনা দিয়ে চলেছেন। ঠাকুর ও শ্রীমার জীবনবৃত্তান্ত ও বহু খুঁটিনাটি ঘটনা তিনি সংগ্রহ করে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করেন। আজ পর্যন্ত ঠাকুরের যত জীবনীগ্রন্থ লেখা হয়েছে তাদের কোনটির সঙ্গেই লীলাপ্রসঙ্গের তুলনা করা চলে না। বাংলা জীবনী-সাহিত্যের ইতিহাসেও এ-ধরনের গ্রন্থ বিরল।

লীলাপ্রসঙ্গের পরেও ঠাকুরের বহু জীবনীগ্রন্থ লেখা হয়েছে। এখনও হচ্ছে। শুধু বাংলা গ্রন্থেরই সংখ্যা প্রায় দুশো। অবশ্য সব গ্রন্থই যে জীবনী তা নয়, বিভিন্ন দিক থেকে তাঁকে দেখার চেষ্টা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উপদেশের সংখ্যাও কম নয়। এখানকার একটি গ্রন্থাগারে অসমিয়া ভাষায় তিনটি, মলয়ালম ভাষায় দশটি, তামিল ভাষায় আটটি, উর্দু ভাষায় একটি, গুজরাটি ভাষায় সাতটি, হিন্দীভাষায় চৌদ্দটি, মারাঠী ভাষায় নটি, ওড়িয়া ভাষায় চারটি, কানাড়ী ভাষায় তেরোটি ও সংস্কৃত ভাষায় ষোলটি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী-সংক্রান্ত বইয়ের খোঁজ পাওয়া গেছে। এই সংখ্যা আরও অনেক বেশি হতে পারে।

এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে বিদেশী বইয়ের কথা। ইংরেজীতে বহু বই লেখা হয়েছে। ম্যাক্সমূলারের গ্রন্থের কথা আগেই বলেছি, তাঁর গ্রন্থ পাঠ করে স্বামীজী অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেছিলেন। তাঁর পরেই আমরা রোমাঁ রোলাঁর গ্রন্থখানির উল্লেখ করতে পারি। তার আগে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের Sri Ramakrishna ; Face of Silence-এর নাম করা যায়। ঠিক জীবনী না হলেও সশ্রদ্ধ অনুসন্ধিৎসা নিয়ে ধনগোপাল ঠাকুরের লীলাবসানের বেশ কয়েক বছর পরে ভারতে এসে তাঁর সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী ও জনশ্রুতি সংগ্রহ করেন। রোমাঁ রোলাঁ ধনগোপালের বই পড়েই শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কৌতূহলী হন ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাহায্যে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। তখনও লীলাপ্রসঙ্গের সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। তিনি শুধু দুটি খণ্ড দেখেছিলেন। ভারতবর্ষে দু-হাজার বছর ধরে যে আধ্যাত্মিক জীবনধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে বয়ে চলেছে শ্রীরামকৃষ্ণকে তারই মূর্ত প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছেন রোমাঁ রোলাঁ। স্বামী জগদানন্দের অনূদিত Shri Ramakrishna : the Great Master. 'লীলাপ্রসঙ্গে'র সার্থকতম অনুবাদ। ইংরেজীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংক্রান্ত গ্রন্থের সংখ্যাও

শতাধিক। এ-প্রসঙ্গে ক্রিস্টোফার ইশারউডের গ্রন্থটির উল্লেখ অবশ্যই করব। তবে লেখক নিজেই জানিয়েছেন, এ-গ্রন্থে নতুন কোন তথ্য দেবার চেষ্টা তিনি করেননি, লীলাপ্রসঙ্গ ও কথামৃতই তাঁর গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন। ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, জাপানী ও চীনা ভাষাতেও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী প্রকাশের খবর পাওয়া গেছে। অধিকাংশক্ষেত্রেই লীলাপ্রসঙ্গ ও কথামৃত অবলম্বনে ঠাকুরের জীবনী রচনা করা হয়েছে। বিদেশীদের ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা 'My Master' প্রভাব বিস্তার করেছে বেশি

বাংলাতেও পরবর্তিকালে যাঁরাই ঠাকুরের জীবনচরিত রচনা করেছেন, তাঁরা সকলেই উক্ত গ্রন্থদুটিকে আকর হিসেবে ব্যবহার করেছেন। স্বামী তেজসানন্দের 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী' প্রকৃতপক্ষে লীলাপ্রসঙ্গের সহজ ও সংক্ষিপ্ত রূপ। সকলের পক্ষে ঐ বিশাল গ্রন্থ পড়া সম্ভব নয় বলেই এ-গ্রন্থ লেখা হয়। মানদাশঙ্কর দাশগুপ্তের 'যুগাবতার রামকৃষ্ণ' পূর্বোক্ত গ্রন্থদুটি অবলম্বনে রচিত একখানি অসামান্য গ্রন্থ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাশ সংকলিত ও সম্পাদিত 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ' জীবনী না হলেও জীবনচরিতের বহু উপাদান সম্বলিত একখানি গ্রন্থ। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' চমকপ্রদ ও নাটকীয় ভঙ্গিতে লেখা। তবে এ-গ্রন্থের লেখক ইতিহাসকে যথাযথভাবে অনুসরণ করেননি। আকর্ষণীয় করবার জন্যেই নীরেন্দ্র গুপ্ত কথামৃত থেকে সংকলন করেছেন 'শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মচরিত।'

ঠাকুরের জীবনী রচনার ধারাটি এখনও অব্যাহত রয়েছে। এ-ব্যাপারে লেখক ও পাঠকদের আগ্রহ যত বৃদ্ধি পায় ততই ভাল। যদিও এখন ঠাকুরের জীবনীগ্রন্থগুলি দূর থেকে পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায়, গৃহী ভক্ত ও সন্ন্যাসীদের রচনায় অনেক পার্থক্য আছে। সংসারীদের ঝোঁক অলৌকিকত্বের প্রতি, সন্ন্যাসীদের লক্ষ্য আদর্শ জীবনের প্রতি। শুধু তাই নয়, তাঁরা ঠাকুরকে দেখেওছেন দু-ভাবে—সন্ন্যাসিভক্তরা অন্তরঙ্গভাবে, গৃহীরা বহিরঙ্গরূপে। উভয় ধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায় লীলাপ্রসঙ্গ ও কথামৃত পড়ার পর। তবে একটি ক্ষেত্রে উভয়েই এক, উভয়ের কাছেই ঠাকুর অহৈতুকী করুণার আধার, কৃপাসিন্ধু। ভক্তির আলোয় লীলাপ্রসঙ্গ ও কথামৃত সমান

জীবনী-সাহিত্যের ইতিহাসে পরমহংসদেবের জীবনীগ্রন্থের একটি পরোক্ষ ভূমিকা আছে। তাঁর জীবনী রচনার ধারাটি অব্যাহত থাকায় পরবর্তিকালে আমরা আরও অন্যান্য বহু সাধকের জীবনের কথা জানতে পেরেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের অন্যান্য সন্ন্যাসীদের জীবনচরিত রচনা করেও ঠাকুরের সন্ন্যাসী সন্তানেরা বাংলা-সাহিত্যের একটি দুর্বল শাখাকে পরিপুষ্ট করে তুলেছেন। এ-জাতীয় গ্রন্থের প্রয়োজন আজকের সমাজে ও সাহিত্যে খুব বেশি। ধর্মগ্রন্থ বলে এ-সব জীবনীগ্রন্থকে একপাশে সরিয়ে রাখা যায় না। জাতীয় চরিত্রগঠনের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের ত্যাগপূত জীবন, নিষ্কামকর্ম, সত্যনিষ্ঠা ও সেবার মনোভাব আদর্শ হয়ে উঠতে পারে যদি তাঁদের জীবনীগ্রন্থ বৃহত্তর ক্ষেত্রে যথাযথভাবে পরিবেশন করা যায়।

সপরিকর শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব পুরীধামস্থ নরেন্দ্রসরোবর তীরে গদাধর পণ্ডিতের
ভাগবত পাঠ শ্রবণ করছেন।

চৈতন্যদেবের দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, সেবক গোবিন্দ, শঙ্কর ও গোপীনাথ আচার্য। চৈতন্যদেবের বামে বাসুদেব সার্বভৌম, স্বরূপ গোস্বামী, রামানন্দ রায়। দণ্ডায়মান—ঠাকুর হরিদাস। ওড়িষ্যাধিপতি প্রতাপরুদ্র সাষ্টাঙ্গ প্রণত।

চার শতাধিক বৎসরের প্রাচীন এই ঐতিহাসিক চিত্রপট ওড়িষ্যার স্বাধীন নৃপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকটকালেই কোন বিখ্যাত শিল্পীকে দিয়ে আঁকিয়েছিলেন। মহাপ্রভুর অদর্শনের পরে বিরহাকুল শ্রীনিবাস আচার্যকে এই চিত্রপট প্রতাপরুদ্র কর্তৃক উপহৃত হয়। শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধর শ্রীরাধামোহন ঠাকুর উক্ত পটখানি তাঁর বিশিষ্ট শিষ্য মহারাজ নন্দকুমারকে উপহারপ্রদান করেন। মুর্শিদাবাদে মহারাজ নন্দকুমারের প্রাসাদ—কুঞ্জঘাটা রাজবাটীতে ঐ চিত্রপটখানি অদ্যাবধি সযত্নে রক্ষিত রয়েছে। মহারাজা নন্দকুমারের বর্তমান বংশধর (দৌহিত্রধারায়) শ্রীগৌরীশঙ্কর রায়ের অকুণ্ঠ সৌজন্যে মূল পট থেকে রঙীন আলোকচিত্র গৃহীত এবং অনুমতি অনুসারে প্রকাশিত।

কবিতা

শ্রীমন্-মহাপ্রভু-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রস্য পঞ্চশততম জন্মমহোৎসবে সপ্রণাম-প্রশস্তি-পুষ্পাঞ্জলিঃ

শার্দূল-বিক্রীড়িত-চ্ছন্দসা বিরচিতঃ

দাসানুদাসেন শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্তেন

ডক্টর কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত—প্রতকীর্তি প্রবীণ কবি।

যো রাকাশশিশোভিতাঽপি হৃত-ভা-রাত্র্যাম্বতীর্ণো বভৌ।
পৃথ্বীং যঃ কৃতবান্ সুমার্জিততরাং শ্রীনামসংকীর্তনাৎ॥
উৎসাহৈরপি সাধনৈশ্চ নিতরাং ধর্মে চ নিষ্ঠাং দদৌ।
শ্রীচৈতন্য-পদাশ্রিতো যদি ভবেদ্ পঙ্গুস্তরেৎ সাগরম্॥১॥

শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আবির্ভূত হন পূর্ণচন্দ্রশোভিত পূর্ণিমা রজনীতে, কিন্তু সেদিন চন্দ্রগ্রহণ থাকায় পূর্ণচন্দ্রের কিরণ মলিন দেখাইতেছিল, (এমনও মনে করা যাইতে পারে যে, চৈতন্যচন্দ্রের মুখশোভা চন্দ্রাপেক্ষাও সুন্দর বলিয়া চন্দ্রের মুখ লজ্জায় রাহুগ্রস্ত হইয়াছিল।) তিনি শ্রীশ্রীহরিনাম সংকীর্তনের দ্বারা পাপকলুষিতা এই পৃথিবীকে, সুমার্জিত ও সুপ্রসাধিত করিয়া, উজ্জ্বলতরা করিয়াছিলেন। হীনমনা জনগণের মনে নিত্য নিয়মিত সাধনায় উৎসাহ ও ধর্মে নিষ্ঠা দান করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের পদাশ্রিত জন, নিতান্ত পঙ্গু হইলেও তাঁহার মাহাত্ম্যের ও কৃপার বলে সহজেই ভবসাগর পার হইতে পারে ।১।

বীতংসেঽপি বিলে স্বখাত-সলিলে সম্মজ্জুতান্ দুষ্কৃতান্।
মাধাসোদরবজ্জনান্ ভবভয়াদ্ যো মুঞ্চতে তৎক্ষণাৎ॥
ভক্ত্যা হীনজনা-স্তথা দ্বিজগণাঃ সাম্যং সুখেনাপ্নুয়ুঃ।
শ্রীচৈতন্য-দয়াং ক্ষমাঞ্চমমতাং বিশ্বং চিরং যাচতাম্॥২॥

সংসারে দুষ্কৃতকারী পাপীগণ স্বখাত-সলিলে ডুবিয়া মরে এবং নিজেদের দুর্বুদ্ধিবশতঃ নিজেদের ফাঁদে জড়াইয়া পড়ে। এইরূপ দুষ্কৃতকারী জগাই মাধাই দুই ভ্রাতাকে ভব ভয় হইতে তিনি মুহূর্তে মুক্তিদান করিতে পারেন।

তাঁহার প্রতি শুদ্ধাভক্তি উৎপন্ন হইলে দীনহীন পতিত পামর জনগণের সহিত পবিত্র ব্রাহ্মণগণও নিজেদের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠতা ভুলিয়া আনন্দের সহিত সাম্য ও মৈত্রী বরণ করেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের দয়া, ক্ষমা ও মমতা বিশ্বজগৎ চিরদিন প্রার্থনা করুক ।২।

গ্রাম্যান্ নাগরিকাংস্তথেশবিমুখান্ সর্বান্ সমালিঙ্গ্য যো।
নাম্নৈকেনভজনাদনন্যশরণাদ্ ভক্তিং পরাং দত্তবান্॥

প্রেম্না তুষ্যতি কেবলং ন তপসা তীব্রেণ তিগ্মেন স।
শ্রীচৈতন্য কৃপানিধির্ভবতু নো বন্দারু-বৃন্দারকঃ ॥৩॥

গ্রামবাসী, নগরবাসী—এমন কি ঈশ্বরবিমুখ নাস্তিকগণকেও আলিঙ্গন করিয়া একমাত্র নাম-সংকীর্তন, ভজন ও অনন্য-শরণ হইয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করার শিক্ষাদান করিয়া তিনি তাহাদিগকে বিশুদ্ধাভক্তি দান করিয়াছিলেন,—তিনি বুঝাইয়াছিলেন যে, ঈশ্বর কেবলমাত্র অকপট প্রেম ভক্তিদ্বারাই পরিতুষ্ট হন,—তীক্ষ্ণ ও তীব্র আত্মপীড়নরূপ উপবাসাদির তপস্যা তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না। করুণা-বরুণালয় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঈশ্বরবন্দনাকারী ভক্তবৃন্দের শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র আশ্রয়রূপে বরণীয় হউন। ৩।

হিংসাদ্বেষ বশীকৃতাং চ ধরণীং প্রেম্নাবশীকৃচ্চ যো
বিষ্বক্সেন-কথাপ্লুতাং চ রসনাং সংকীর্তনে প্রীতবান্।
শূদ্রস্ত্রীশ্বপচোঽধমাংশ্চ পতিতাং নাম্নৈব মুক্তিং দদৌ
শ্রীচৈতন্যদয়া স্বভাব-সুলভা পৃথ্বীং সদা পূয়তাং ॥৪॥

হিংসা-দ্বেষ-বশীকৃত ধরণীকে শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র প্রেমের দ্বারা বশীভূত করিয়াছিলেন। তিনি জীবের ভোগ্যরসলুব্ধ রসনাকে বিষ্বক্‌সেন (বিষ্ণু) কথায় পরিপ্লুত করিয়া সংকীর্তন-গানে পরম প্রীতি দান করিয়াছিলেন। শূদ্রস্ত্রী-চণ্ডালাধমপতিত জনগণকেও নামের দ্বারাই মুক্তি দান করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের স্বভাব-সুলভ করুণা এই পৃথিবীকে সর্বদা পবিত্র করুক। ৪।

ঋদ্ধা-সিদ্ধিপরাং তথা চ পরমাত্মাপ্তিং সমাবৌ স্থিতিং।
তুচ্ছীকৃত্য সুদুর্লভাং চ নিতরাং কৃষ্ণেরতিং নীতবান্॥
কৈবল্যং চ তথা ত্রয়ীষু সুলভাং স্বর্গস্পৃহাং চিচ্ছিদে।
যৎ-কারুণ্য-কটাক্ষ-বৈভববশাত্তম্ গৌরমেব স্তুমঃ ॥৫॥

যে যোগের দ্বারা শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি, এমনকি পরমাত্মাপ্রাপ্তিরূপ সমাধিতে স্থিতিলাভ করা যায়, তাহাকেও তুচ্ছ করিয়া, সেই সুদুর্লভ যোগাপেক্ষাও আনন্দময় শাশ্বত কৃষ্ণপ্রেম তিনি দান করিয়াছিলেন। কৈবল্যমুক্তি এবং বেদাদি যজ্ঞসুলভ স্বর্গভোগলাভ ও লোভের স্পৃহার যিনি মূলচ্ছেদন করিয়াছিলেন, কেবল তাঁহার করুণাময় কটাক্ষের শক্তিদ্বারা, সেই শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রকে আমরা স্তুতি ও প্রণতি জানাই। ৫।

প্রাগ্‌জাতং কৃতকর্মলভ্য ফলজং পাপং চ তাপত্রয়ী-
সর্পীণাং চ সুতীক্ষ্ণ-জীবনহরাং প্রোৎখাত্য দংষ্ট্রাং মুদা ॥
বিশ্বং যঃ কৃতবান্ শুভঞ্চসুখদং প্রেম্নাপরিপ্লাবিতং
দ্বৈতাদ্বৈত-বিকাশভাব-মিলিতঃ কৃষ্ণোঽস্তু সর্বাশ্রয়ঃ ॥৬॥

পূর্বজন্মকৃতকর্মলভ্য-ফলজাত দুষ্কৃতি ও তজ্জনিত তাপত্রয়ীরূপ সর্পীদের প্রাণঘাতী সুতীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা যিনি অতি সহজে ও সানন্দে উৎপাটন করিয়াছিলেন, বিশ্বকে যিনি শুভদ, সুখদ ও প্রেমপ্লাবিত করিয়াছিলেন,—সেই দ্বৈতাদ্বৈত বিকাশ-ভাব মিলিত 'রাধা ভাব-দ্যুতি সুবলিত' 'অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌর'-রূপ শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণই সকলের একমাত্র আশ্রয় হউন। ৬।

বৃন্দারণ্য-নবং কৃতঞ্চ কৃতবান্ পুরীঞ্চতীর্থোত্তমাং।
বর্ণদ্বেষ-প্রথাং তথাজনিগতাং ভেদাংশ্চ যো ধ্বস্তবান্॥
সিন্ধৌবিন্দব এব সৃষ্টমখিলং স্রষ্টুশ্চ ভগ্নাংশকম্।
প্রেমানন্দতনুং রসৈকনিলয়ং চৈতন্যমেবাশ্রয়েৎ ॥৭॥

নবদ্বীপে যিনি নববৃন্দাবন রচনা করিয়াছিলেন এবং পবিত্র শ্রীক্ষেত্র বা পুরীতীর্থকেও যিনি শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলেন,—বর্ণবিদ্বেষপ্রথা ও জন্মগত জাতিভেদ প্রথা যিনি ধ্বংস করিয়াছিলেন, দ্যাবাপৃথিবী সমন্বিত অখিল সৃষ্ট জগৎ যে স্রষ্টার ভগ্নাংশমাত্র তাহা শ্রুতি-স্মৃতি হইতে অকাট্যযুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন,—সেই প্রেমানন্দতনু রসময় রসিকশেখর শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রকেই সকলের আশ্রয় করা উচিত ।৭।

ভব্যে বঙ্গশতাব্দ সায়কমিতে আগামিসংবৎসরে।
বৈদেশ্যাদি জনাস্তথাহিজনতাস্তৃপ্যন্তু গৌড়ীয়কাঃ॥
তন্নাম-স্নপিতা স্তদর্পিতধিয়ঃ ভুঞ্জন্তু সৌখ্যং পরং।
শ্রীচৈতন্যরসান্বিতা চ রমতা ভূম্নাস্তু রম্যাধরা ॥৮॥

আগামী তাঁহার পঞ্চশততম জন্মমহোৎসব বর্ষে বিদেশী ও স্বদেশী জনগণ ও গৌড়ীয় ভক্তগণ সকলেই তৃপ্তিলাভ করুন। তাঁহার নাম-সংকীর্তনে স্নাত হইয়া এবং তাঁহাকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া পরমানন্দ আস্বাদ করুন। শ্রীচৈতন্যরসাপ্লুতা হইয়া ও তাঁহার পরমরমণীয়া প্রেমভক্তিতে ভূষিতা হইয়া এই ধরণী বহু বহু গুণে রম্যতরা হউক ।৮।

জগজ্জননী সারদা

বেগম সুফিয়া কামাল
শ্রেষ্ঠ কবি—বাংলাদেশ।

মধুর শৈশবকাল কেটেছে খেলায়
কিশোর বেলায়
সুকন্যা। বধূর বেশে হয়েছ গৃহিণী
তার পরে বরণীয়া হয়েছ জননী।
জঠরে ধরনি তুমি আপন সন্তান
লালন করনি, তবু মাতার সম্মান
লভিয়াছ, মহিয়সী। অনাথের একান্ত আশ্রয়
তোমার অঞ্চল তলে স্নেহের প্রচ্ছায়
আতুর, অনাথ জনে মায়াঙ্করা মমতার মধু
সিঞ্চিয়া করেছ ধন্য, হে সাধিকা, সাধকের বধূ,
শুধু বধূ নহ তুমি, অর্ধাঙ্গিনী, জীবনের সাথী
মহতের কর্মপথে অন্তর আরতি
প্রদীপের শিখা জ্বালি করি দীপ্যমান
সাধক স্বামীরে তুমি করিয়াছ মহৎ, মহান।
তব নিষ্ঠা, ত্যাগ, সেবা সর্বজন তরে
করুণার বারিধারা প্রাণপাত্র ভরে
বিলায়েছ অকাতরে, অফুরন্ত সে মাঙ্গল্য দানে
করেছ পবিত্র, পূত, অনেক অজ্ঞানে।
নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ সেবা, ফলভারানত তরুসম
সাধক সাধন-পীঠ করি মনোরম
দৃঢ় অবিচল চিত্তে নীরব সাধিকা, সুগৃহিণী
তোমার কর্মের যোগে, তুমি আজ জগত-জননী।

যুবকদের উদ্দেশে

(আন্তর্জাতিক যুব বৎসর স্মরণে)

শ্রীঅরবিন্দ

অনুবাদক : শ্রীকানুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

Ideal of Karma Yogin থেকে অনুবাদ। অনুবাদক বিদগ্ধ লেখক ও কবি।

আহ্বান জানাই প্রত্যেক মানুষকে,
বিশেষ করে যুবকদের—
যারা ভারতের ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য জেগে উঠছে…
ভারতের কাজ—
সে যে ভগবানেরই কাজ…
পার্থিব সম্পদের দিক থেকে
তোমার কোন মূল্য নেই—
আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে
সবই তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে…
একমাত্র ভারতবাসীই সব কিছু বিশ্বাস করে,
আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য
সাহসে ভর করে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে,
সব পাবার আশায়
সব হারাতে সে প্রস্তুত…
কাজেই, সর্বাগ্রে হয়ে ওঠো ভারতবাসী,
উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত
আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি কর পুনরুদ্ধার…
উদ্ধার কর আর্য চিন্তা…আর্য নিয়মানুবর্তিতা…
আর্য চরিত্র…আর্য জীবন…
উদ্ধার কর বেদান্ত…গীতা…যোগশাস্ত্র…
শুধু মস্তিষ্ক দিয়ে নয়
হৃদয়ানুভূতির আবেগে নয়
জীবন দিয়ে—আপন জীবনে…
এই মহাসত্যের মাঝে বাঁচো—

তাহলেই তুমিও হবে মহৎ বীর্যবান শক্তিশালী
অপরাজিত… নির্ভীক।
তখন দেখবে জীবন অথবা মৃত্যু
তোমার কাছে আর কোন কিছুই বিভীষিকার নয়…
তোমার জীবনের অভিধান থেকে
বাধাবিঘ্ন আর অসম্ভব কথাটি হয়ে যাবে অদৃশ্য—
কেননা, আত্মার জাগরণেই মেলে শাশ্বত শক্তি,
বাইরের সাম্রাজ্য জয় করার পূর্বে
জয় করতে হবে আপনাকে—
আপন আন্তর স্বরাজ…
সেখানেই যে মা অধিষ্ঠিতা।
মা অপেক্ষা করছেন পূজা পাবার জন্যে—
আপন সন্তানকে শক্তি দিতে…
মায়ের ওপর বিশ্বাস রেখো
তাঁকে সেবা কর…
তাঁর ইচ্ছার কাছে
আপন ইচ্ছাকে দাও বলিদান…
তোমার ক্ষুদ্র অহংকার
দেশের বৃহত্তর অহং-এ গলে মিশে এক হয়ে যাক
তোমার স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র স্বার্থবোধ
মানবজাতির কল্যাণে হোক নিবেদিত…
তোমারই মাঝে উদ্ধার কর
সেই মহাশক্তির উৎসকে…
তাহলেই এ জীবনে তোমার সব মিলে যাবে—
সামাজিক স্বচ্ছল জীবন…
মস্তিষ্কের প্রখর বোধশক্তি…
রাজনৈতিক স্বাধীনতা…
চিন্তার জগতে প্রভুত্ব…
জগতে নেতৃত্বের অধিকার…

অপার কামনাসিন্ধুজলে

ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও কবি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভূতপূর্ব রবীন্দ্র অধ্যাপক।

সময় শ্রাবণ। বিশ্বে অফুরন্ত উপবর্ষণ।
কারো কারো কহতব্য—কাব্য আর ভালই লাগে না।
কারণ, আজকাল যতো বিষ্টি হোক্, বন্যা হোক্,—তবু
হাঁপাতে হাঁপাতে নানা টেন্‌শনে শুধু ছুটোছুটি।
সময় উড়ছে যেন,—ধরাই যায় না তার ঝুঁটি।

সুন্দরের জন্যে টান বুকের তন্ত্রীতে বাজে বটে,
কোনো কাহিনীতে কিন্তু অফুরন্ত আনন্দের দোলা
কে আর পাচ্ছে আজ? সূচনার পরেই বিকার।
যেমন কৃতিত্ব খোঁজা ঘটে বহু ঝানু প্রবীণের,
তেমন সৌভাগ্য নেই শাদামাটা ভঙ্গুর মনের।

কবিতার সত্য তবু পুরোপুরি বানানো অলীক—
একথা বলেন যাঁরা, তাঁরাও বেদনা পেতে চান,
এবং বাদল দিনে হাতে পেলে প্রথম কদম
তাঁরাও বিমুখ নন—হলপ করে তা বলা যায়।
অপার কামনাসিন্ধুজলে সকলেই নাজেহাল।

শান্ত হওয়া সুকঠিন। ভোগবতী পার হয়ে, তবে
দেখা যায় বিশ্বময়ী প্রলয়ে সৃজনে সুরঙ্গিলা।
ইচ্ছের চাবুক যেন পাহাড়ের দুরন্ত নদীরা—
পাথর ভাঙ্‌তে-ভাঙ্‌তে অগাধ বালির স্তূপ গড়ে;
সাগর আছড়ায় যাতে অন্তহীন অর্থহীন স্বরে।

নির্ভার

শ্রীসুনীল বসু

খ্যাতনামা কবি, প্রবীণ উপ-সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা।

যদি তাঁর কাছে যেতে চাও
সহজ হয়ে নাও
আরও আরও সহজ সরল
সবুজ পাখির মতন, একটি ঘাসের শিসের মত

যদি যেতে চাও তুমি প্রভুর নিকটে
আয়োজন কমাও, এতো ভার
এতো সব কাণ্ড-কারখানা, কোনো
প্রয়োজন নেই, নির্জন নির্ভার হও

যেদিন অচেনা এই গ্রহে এসেছিলে
সেই পূত প্রভাতে অথবা স্বর্গীয় রাতে
হে প্রিয় তোমার কি ছিল
ছিল শুধু স্পন্দন, ছিল শুধু চিৎকার

অর্থাৎ ছোট্ট একটি দীপশিখা
তার একটু জ্বলা, সেইটুকু
ক্ষণিক পরমায়ু, আর কিছু নয়
ক্ষণিক ফুটে ওঠা

সেই ফোটা ফুল নিয়ে
চলো যাই, চলো যাই—
তাঁর পায়ে তুমি-আমি হই অর্ঘ
জীবনের সেই সার্থকতা

যদি যেতে চাও ঈশ্বরের দিব্য দেশে
বাহুল্য দূর করো, আয়োজন দূর করো
থরো থরো হও পরম বিশ্বাসে আর সহজে
ভক্তিতে, হে বন্ধু হও লঘু পরম নির্ভার

কথামৃত

শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায়

যশস্বী কবি—রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে সংযুক্ত।

ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ।
সে কথা বলতে পারে,
মনের ভাব প্রকাশ করে আনন্দ পায়।
সে কথা আবার কখনও অমৃত হয়ে যায়
যদি তা অবতারপুরুষের হয়
যখন জীবন মরুভূমির মতো শুষ্ক হয়ে যায়,
ফল্গুধারার মতো সে কথা জীবনে স্নিগ্ধতা
এনে দেয়—
জীবনের মানে খুঁজে পায়।
আমরা সাধারণ মানুষ
রোজ কত কথা বলি,
হিসেব করলে পৃথিবীর নিঃস্ব হয়ে
যাবার কথা ছিল
কিন্তু পৃথিবী নিঃস্ব হয় না।
এক-একটা ভাব মহাসমুদ্র হয়ে যায়,
মানুষ সেই মহাসমুদ্রে অবগাহন করে
মনুষ্যত্বের সন্ধান পায়।
এক-একটা ছোট গল্প মহাভারত হয়ে যায়
যখন তা অবতারপুরুষেরা বলেন।
দর্শনের যত কঠিন তত্ত্ব,
বেদ-বেদান্ত, ন্যায়-বৈশেষিক
সব সমুদ্রে গিয়ে মিশে যায়।
আম খেতে এসে পাতা গোনার
দরকার কী!
আম খেয়ে যাও।
জীবন একটা স্বপ্ন ?
যদি স্বপ্নই হয় তবে অবাস্তব।
কিন্তু জীবন যে ভীষণভাবে সত্য।
সব সমস্যার সমাধান—
জগত ও ব্রহ্ম—দুইই সত্য।
আমরা ক্ষুদ্র সত্য থেকে বৃহত্তর সত্যে যাই।

সব ধর্মই এক
যত মত তত পথ।
মন্ত্র একটাই—শিবজ্ঞানে জীব সেবা।
সব বিরোধের অবসান—যদি বুঝে
নিতে পার, তিনিই সব হয়েছেন।
ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়, চিরন্তন ;
বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তারই প্রকাশ।
আমি কালীর ভক্ত—ব্রহ্ম বুঝি না।
তাতে কী এসে গেল ?
জানো না, কালী ও ব্রহ্ম অভেদ!
আমি মন প্রাণ দিয়ে কেবল সংসার
করে যাচ্ছি
তোমায় ডাকব কেমন করে ?
কাজের মধ্যে—
কাজ যাই কর আমার উদ্দেশ্যে কর
দেখবে আমাকেই পেয়ে গেছ।
সংসারে থাকবে, সব কাজ করবে
কিন্তু মনটা ঈশ্বরের পাদপদ্মে রেখে দিও।
জীবনের কামনা বাসনা ?
এরাও থাকবেই, এদের হাত থেকে
পরিত্রাণ নেই।
কেবল মোড় ঘুরিয়ে দাও।
পূবে যতই এগোবে
পশ্চিম ততই সরে যাবে দূরে।
শুধু এগিয়ে যাও।
কাঠুরিয়ার মতো এগোতে এগোতে
একদিন হীরকখনির সন্ধান পাবে।
সবই কথা—কিন্তু অমৃতমাখা।
আশ্বাসের কথা, জীবনের বাঁচবার কথা।
কথা যখন অমৃত হয়ে যায়
'কথামৃতের' সৃষ্টি হয়।

অর্চনা

শ্রীমতী হিমানী রায়

সুলেখিকা ও কবি।

যবে তুমি আসিবে সমুখে,
কি দিয়ে পূজিব বল ও রাঙ্গা চরণ ;
নাহি কোন উপচার পূজা আয়োজন
নিভৃত অন্তর কোণে পাতিব আসন,
আঁখিবারি দিয়া নাথ ধোয়াব চরণ
ভকতি চন্দন লয়ে সাজাব তোমায়,
চিন্তা মম অর্ঘ্য রূপে দিব তব পায়।
ধূপ দীপ জ্বালি দিব কামনা বাসনা,
মন পুষ্পাঞ্জলি দিয়া করিব অর্চনা।

শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্য হবে জয়ধ্বনি তব,
প্রেমের পশরা লয়ে নৈবেদ্য সাজাব।
আরতি প্রদীপ হবে এ দুটি নয়ন,
চিত্তপটে তব রূপ হেরি অনুক্ষণ।
কহি এ মিনতি নাথ করি জোড়কর,
যেভাবে যেথায় রাখো থেকো না
অন্তর।
কণামাত্র কৃপা তব যদি মিলে যায়
জীবন সার্থক মম আসি এ ধরায়।

প্রার্থনা

শ্রীসুনীলকুমার লাহিড়ী

প্রতিষ্ঠিত কবি।

বড় বিস্ময় লাগে—
আছো কি না আছো এই ভেবে মনে বড় সংশয় জাগে!
ঘরে ঘরে আজ ঘুরছে রাবণ, দুর্জয় যত দুর্যোধন—
গ্রামে ও গঞ্জে সহরে নগরে সদর্পে করে আস্ফালন।
কোথায় কৃষ্ণা—অনল-কন্যা—অগ্নিবন্যা আনগো তুমি,
নারীমাংসের লুব্ধ শকুন রয়েছে ভারতে ভাগাড়-ভূমি।
দুঃশাসনের পদভারে কাঁপে আজি এ নিখিল বসুন্ধরা,
বল কত দেরি মহাপ্রলয়ের—আর দেরি নয়—এসো গো ত্বরা
সহেনা আঁধার প্রলয়শঙ্খ বাজাও এবার জগন্নাথ ;
উঠুক সূর্য যুগ-অবসানে কাটুক কুটিল গভীর রাত।

অশ্রুত-অদৃষ্টযোগ

ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী
বিশিষ্ট কবি ও লেখক—নেহরু পুরস্কারে সম্মানিত।

দিগন্ত-সন্ধ্যায় শঙ্খঘণ্টা বাজে বহুদূরে,
ক্ষীণ দীপালোক ভেসে যায়—
মিশে যায় নক্ষত্র-আকাশে।
তুমি সেই ধ্বনি শুনতে শুনতে
আলোকে মিলাও।

স্তব্ধ বায়ু থমথমে আকাশ.
পাতাটি নড়ে না,
পাখিরা বাসায় ফিরে গেছে—
সর্বত্র প্রতীক্ষা এক কিসের উদ্দেশে।
তুমি অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত হও॥

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়
হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক।

দুরন্ত আঁধার ভেঙে জেগে ওঠে জ্যোতির গোলক,
সুপ্তি ভেঙে বসুন্ধরা গায়ে মাখে আলোর পরাগ ;
তোমারি প্রেমেতে দোলে হীনবীর্য কালের দোলক
আস্তিক্যে উর্বর হয় আমাদের উন্মত্ত ভূভাগ।

তোমার মেধাবী মুখে বিচ্ছুরিত অমৃতের স্বেদ,
শান্তির স্তোত্রে তোমার ললিত আহ্বান ;
তোমার চেতনা ভাঙে জীবিকার কুটিল প্রভেদ,
দুঃখীর কুটীর যেন হয়ে যায় সাজানো বাগান।

যেসব জীবন ছিল অবিশ্বাসীর নির্মম পাথর,
নাস্তিক্যে আবিদ্ধ বুকে যন্ত্রণার দারুণ শায়ক,
একে একে ধসে পড়ে ছলনার নকল নায়ক ;
পাথর চৌচির হয়, জেগে ওঠে মমতার স্বর।

আকাশের নীলাঞ্জনে তুমি যেন সোনালি ঈগল।
ডানার আওয়াজে কাঁপে মর্ত্যলোকে বন্দীর দুয়ার,
ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় লাঞ্ছিতের বেদনা-শৃঙ্খল,
আদিগন্ত অন্ধকারে ঢেউ তোলে আলোর জোয়ার।

দশমহাবিদ্যা

শ্রীমতী সাধনা মুখোপাধ্যায়
আনন্দবাজার পত্রিকায় সংশ্লিষ্ট কবি ও লেখিকা।

বিশাল পক্ষ তোমার হাত দুটো
আমার বুকটাকে ধরে রাখো
বিশাল কক্ষ তোমার ক্রোড়ভূমি
আমার দেহটিকে ধরে থাকো
তুমি কি ধূমাবতী নাকি হে কালী তারা
নাকি মাতঙ্গী ভৈরবী
কনক-কন্দুক নিয়ে যে খেলা কর
দু-হাতে দুইটি শশী রবি
ভুবন-ঈশ্বরী, ছিন্নমস্তা
নাকি হে কমলা ষোড়শী যে
হৃদয়-মৎস্য করে যে ছটফট্
তুমি আকর্ষণ বঁড়শি যে
বগলারূপিণী হে দশবিদ্যা
দ্বিভুজা নাকি হে দশভুজা
ভক্তি-হিম জমে বরফ যদি হও
শক্তি দিয়ে আমি করি পূজা

সে-নির্জনে

শ্রীশান্তশীল দাশ
সুখ্যাত কবি ও গীতিকার।

কারুর কথা আনবো না আর মনে।
তুমিই শুধু থাকবে অমার সনে।
দেখবো তোমার প্রসন্ন মুখ,
জুড়িয়ে যাবে আমার এ বুক ;
তোমারই গান গাইবো সে-নির্জনে।

কত-না জন আসে আমার ঘরে,
কত কথায় আমার এ ঘর ভরে।
তার মাঝে নেই প্রাণের পরশ,
চিত্ত আমার হয় না সরস ;
তোমায় ডাকি সেই বেদনার ক্ষণে।

সেইখানেতে তোমার আসন পাতি,
দেব বলে তোমায় মালা গাঁথি।
মালাখানি তোমার গলে
দুলবে আমার চোখের জলে ;
সফল হবে তোমার পরশনে।

মিনতি

শ্রীপ্রদোষকুমার পাল
লেখক ও কবি,—কথাসাহিত্য পত্রিকার সংশ্লিষ্ট।

আজীবন ভরে মন যে আকুল
তোমার চরণ ধরিতে
সারা দিনমান তাই তো ব্যাকুল
সেই সাধটুকু লভিতে॥
তোমারই নামেতে তোমারই ধ্যানেতে
আছে যে সকল সুখ
তোমারে ভুলিয়া থাকি যে মোহেতে
পাই তাই এত দুখ॥
সংসারে মোরা মায়াবন্ধনে
তোমারে ভুলিয়া থাকি
বেলা শেষে তাই ভাবি নির্জনে
তোমায় ডাকা যে বাকি॥
তখন দেখি যে সময় নাইরে
দিন হল অবসান
ভগ্ন হৃদয়ে সখেদে তাইরে
করি তব গুণগান॥
মিনতি আমার রাখিও হে প্রভু
দয়া করো তুমি সবে
তোমারে ভুলিয়া না রহি কভু
দুখে ভরা এই ভবে॥

অনাম-অরূপ

স্বামী নিরাময়ানন্দ

'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি'—উদ্বোধন কার্যালয়ের লোকান্তরিত অধ্যক্ষ। 'বৈভব' ছদ্মনামে পরিচিত সুপ্রসিদ্ধ কবি।

কত নামে ডাকব তোমায়
বুঝতে পারি না—
অত নামে ডেকেও তবু
আশা যে পূরে না!
ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে
তোমারি নাম উচ্চারণে
বেড়াই একা জীবনবনে—
তবু, মন যে ভরে না।

একটি নামে ডেকে তোমায়
আশা পূরে না—
একটি রূপে দেখে তোমায়
মনে ধরে না—
সকল নামে সকল রূপে
দাও গো ধরা চুপে চুপে—
ভালবাসি প্রেম-স্বরূপে
প্রাণ তো মরে না—
কার মাঝে যে কে যায় মিশে
বুঝতে পারি না।

সৃষ্টি-পত্তন

শ্রীসূর্যকুমার ভূঞা

পদ্মশ্রী-ভূষিত প্রখ্যাত অসমীয়া কবি—গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য। কবিতাটি মূল অসমীয়া থেকে অনুবাদ করেছেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর রামবহাল তেওয়ারী।

সেই প্রলয়ের দিন—
ওগো প্রভু তুমি হাতে তুলে নিলে
তোমার রুদ্র-বীণ।
আনন্দময় ছিল না বিন্দু
ছিল নির্জন অরুণ-ইন্দু
দিগ্‌দিগন্তে সমুদ্ভাসিল
ভীষণ উদ্দীপনা
যে দিনেতে তুমি হাতে তুলে নিলে
তোমার রুদ্র-বীণা।

চন্দ্র সে গেল এড়িয়ে কক্ষ,
শূন্যে মিলাল মালা-জ্যোতিষ্ক
সেদিন দীপ্তিহীনা
হে প্রভু! যেদিন হাতে তুলে নিলে
তোমার রুদ্র-বীণা।
আকাশটি হল অভ্র-আবৃত

মাটির ঠিকানা হারালো ত্বরিত
দিগন্তব্যাপী অথিরা সৃষ্টি
প্রকম্পে জল-লীনা,
তাহার উপরে উড়িল বিধাতা
তোমার রুদ্র-বীণা।

সেই তমসায় উদিল পুনঃ
লক্ষ লক্ষ তারা,
সেই বিনষ্টি করিল সৃষ্টি
অশেষ পুষ্প ধারা।
সুমুঞ্জরিল চিন্তালতিকা
নবীন সুরের নবীন কথিকা
এড়িয়ে বিশ্ব পরিল হিয়ায়
নতুন সৃষ্টি-কণা,
সেইদিন তুমি নামিয়ে রাখলে
তোমার রুদ্র-বীণা।

ধন্য-শিল্পী

শ্রীমতী গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়
সাহিত্যসেবিকা—কবি।

মাটি দিয়ে তোমা গড়েছি বলিয়ে মাটির নও মা তুমি—
আমার হিয়ার সুষমা রয়েছে তোমার মূর্তি চুমি'।
আননে তোমার যে-সুধার ধারা, নয়নে তোমার আলো—
তার সবখানি আমারই সৃষ্টি, আমারে বেসেছ ভালো!
মোর তরে তোর স্নেহ-ভাণ্ডার লুকান রয়েছে জানি—
তারই সবটুক ঢালিয়ে দিয়েছি আমার হৃদয় ছানি!
আমার শিল্প, আমার সাধনা, কল্পনা মোর যতো—
তোমারে সৃজিতে হয়েছে সফল, মাটি হ'লো মা-র মতো!
সার্থক হলো সে-মাটির স্তূপ, তোর লাবণ্য ছানি—
সার্থক মাগো! সন্তান আমি, আমার জননী তুমি!
তিল তিল করে আমারে সৃজিলে, নেই যে তোমার সীমা—
আমার কল্প-সীমায় বেঁধেছি, তোমারে হে অনুপমা!
ভেঙে গড়ি, গড়ে ভাঙি, তবু তৃপ্তি নেই যে মনে—
কোন্‌খানে যেন, কম পড়ে গেল—বসে ভাবি নিরজনে!
যা পেয়েছি, তার তুলনা যে নেই, আর কত পার দিতে—
এ ভাঙা-গড়ার শেষ নেই, তাই সুখ যে হলো না চিতে!
অপটুতা মোর করেছ যে-দূর, হেসে অপরূপ হাসি—
জননী আমার, শিল্পী আমার, তুমি সুর, আমি বাঁশি!
আপন করুণা-মাধুরী মিশায়ে ঢেকে দাও যত ভুল,
তোমারে সৃজিতে স্রষ্টা যে তাই পায় নাকো খুঁজে কূল!
আমার তুলিতে তোমার স্নেহের ধারা বহে রঙ্ হয়ে—
মাতৃ-মূর্তি আপনি বিকাশে, স্রষ্টা—সে রয় চেয়ে!
কল্পনা তার সযতনে শুধু মাকে রেখেছিল ধরে'—
তুলিখানি তবু খুঁজেছে বৃথাই রূপখনি অগোচরে!
করুণা রাশির একটি কণায় আলো হলো ধরাতল,
মায়ের মুখানি উঠিল ফুটিয়ে যেন ফোটা শতদল!
অবাক্ শিল্পী! হেরে সে মহিমা, লুটায় ও পদতলে—
দু-নয়নে তার ধারা বয়ে যায়, অস্ফুটে 'মা'! 'মা'! বলে!

আমি সন্তান! জননী আমার, আমারে সৃজিলে তুমি—
তোমারে গড়িতে সব রঙ্ লয়ে, তাই পরাজিত আমি!
তোমার করুণা মোর তুলিকায় যে-রঙ্ দিয়েছে ঢেলে—
তারই মহিমায় চিন্ময়ী তুমি, মৃন্ময়ী হয়ে এলে!
অরূপে তোমার মহিমা অপার, স্বরূপে জননী তুমি—
সন্তান-বুকে তাই মা সাধের জন্ম নিলে গো তুমি!
মৃন্ময়ী তুমি আবাহন পরে, বিসর্জনের শেষে—
আমার হৃদয়ে চিন্ময়ী হবে, এসে জননীর বেশে!
মূর্তি তোমার শিল্পী-মহিমা করুক্ প্রচার যত—
মর্মে আমার গাঁথা হয়ে রবে তুমি জ্যোতি শাশ্বত!
করুণা তোমার মাটিময় দেহে এনেছে অসীম প্রাণ—
অরূপ মহিমা সরূপে প্রকাশি' দিয়েছ স্নেহের দান!
তোমারই মাঝারে লভেছি জনম, তোমাতে কর গো লীন—
তব অপরূপ আলোকে আমার রূপ করো সমাসীন!

পঞ্চবটী

শ্রীকালীসাধন ঘোষ

লেখক ও কবি।

…বকুলতলার আরও কিছু উত্তরে পঞ্চবটী। এই পঞ্চবটীর পাদমূলে বসিয়া পরমহংসদেব অনেক সাধনা করিয়াছিলেন, আর ইদানীং ভক্তসঙ্গে এখানে সর্বদা পাদচারণ করিতেন। গভীর রাত্রে সেখানে কখন কখন উঠিয়া যাইতেন। পঞ্চবটীর বৃক্ষগুলি…ঠাকুর নিজ তত্ত্বাবধানে রোপণ করিয়াছিলেন।…আশে-পাশে বেল, জুঁই, গন্ধরাজ, গোলাপ, মল্লিকা, জবা, শ্বেতকরবী, রক্তকরবী. আবার পঞ্চমুখী জবা, চীন জাতীয় জবা।…

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ

ধরিত্রীর সীমাপ্রান্তে কুসুমিত শ্যামল বনানী,
ছায়ান্বিতা কৃষ্ণচূড়া। আরক্তিম আবাহন দূর-দূরান্তরে।
মৌসুমী বাতাস দিল বকুলের দীর্ঘশ্বাস আনি,
ঘনশ্যাম সমারোহে বর্ষা নামে প্রসন্ন অন্তরে।
করবী, মল্লিকা যূথী, গন্ধরাজ বন্দিত কানন,
নিসর্গের মহিমায় সুভাস্বর পঞ্চবটী-তল।
জন্মলভে বসুন্ধরা, হেরি পরব্রহ্মের আনন।
বিভাবরী শব্দহীন। অন্ধকার নিবিড় কুন্তল।

অন্তহীন ছায়াপথে নক্ষত্রের নীরব ভাষণে
কাহার বন্দনা গীতি। হৃদয়ের মহামৌন-ধ্বনি।
শুভ মাতৃমন্ত্রের উদ্গাতা ধ্যানমগ্ন। পঞ্চবটী ছায়ে।
তোমার অমৃতবাণী শান্ত ধীর শুদ্ধ প্রবচনে
সরল শিশুর কণ্ঠ বিনন্দিত সে বিশ্বজননী।

মন্দির ও দেউল

ডক্টর শান্তিকুমার ঘোষ

বিশিষ্ট লেখক ও কবি। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান।

পাহাড়-চূড়ায় মন্দির ঃ
পাথরের ধাপ ভেঙে পৌঁছনো দেবতার সমুখে।
নিচে অশ্রুমতী নদী, যার সরস সবুজ দু-পারে
গড়ে উঠেছে জনপদ—
জনসংঘ অধিকার করেছে নির্জনতাকে।
আমার ইচ্ছা ঢেউ তোলে নারকেল গাছ-ঘেরা ফসল খেতে,
ফোটায় শেষ গোলাপ বন্ধ্যা জমিতে।
দেবতা দেবেন স্থিতি, অবসর
উপচে-ওঠা ভালোবাসা হৃদয়ে-হৃদয়ে

*

ঘুমের ভিতর থেকে জেগে বইছে নদী
এই সকালে কুয়াশায় ঢেকে ফেলছে সাঁকো
এক-একটা বজরা বয়ে নিয়ে যায় শস্যভার বন্দর অবধি
সোনার মুহূর্তটিকে তুমি পারো যদি ধরে রাখো
আমি তাকাতে পারি না জলের দিকে—কে ধরবে
স্রোতে ভেসে-যাওয়া মালা
গোলাপ-বাগের বুকের উপর শুধু বয়ে যাচ্ছে সুবাতাস
বুলবুলির স্পষ্ট স্বর পুষ্পিত ডালে ; কাঠবিড়ালী ছাখে
গাছের ছায়ায় রামসীতার পালা
মানুষ গড়লো করজোড়ের মতো দেউল,
যা ছুঁতে চাইছে হৃদয়াকাশ

বিজয়ী

ডক্টর নূপুর গুপ্ত

সাহিত্যসেবিকা ও কবি—কলিকাতা যোগমায়া দেবী কলেজের ইংরেজী বিভাগে অধ্যাপিকা।

মৃত্যুকে শ্রদ্ধা কর,
সে এসে দাঁড়ালে বিনীত হয়ে মাথা নামাও।
জীবন এক অখণ্ড লড়াই সন্দেহ নেই,
কিন্তু সে দিতে পারে না বিজেতার গৌরব,
মৃত্যুই জীবনকে দেয় বিজয়ীর মুকুট।
জীবনের বড় পক্ষপাতিত্ব,
অনেক ভেবে, বিচার করে সে অলঙ্কার দেয়
প্রাপকের হাতে—
কাউকে শান্তি, কাউকে চিরজ্বালা,
কেউ পায় লক্ষ্মীর ঝাঁপির উপছে পড়া ধন
কেউ হাহাকার করে দু-মুঠো চালের জন্যে ;
ভরা আঁচলে আবার ঝরে নতুন উপহার
—হয়তো জীবনের খেয়াল থাকে না
কাকে কখন কি দেওয়া উচিত।
মৃত্যু কিন্তু অবিচল তার নির্বিচার আশীর্বাদ বিতরণে।
নিজের দান সে মাপে না জীবনের মাপকাঠিতে।
যুদ্ধের শেষে ক্লান্ত সৈনিকের জন্য
শান্তির প্রলেপ নিয়ে অপেক্ষা করে
চির আশ্রয়ের আশ্বাস নিয়ে।
তাই মৃত্যু নিরপেক্ষ দাতা, অবিচল দর্শনে,
সমদৃষ্টি তার মূল্যায়নে।
জীবনের চেয়ে সে মহান, নির্ভুলভাবে সার্থক।
মৃত্যু এলে তাকে শ্রদ্ধা জানাও,
শোকে বিনত হয়ে, নীরব অভিবাদনে॥

উদ্বোধনে মা

ব্রহ্মচারিণী অজিতা
শিক্ষাব্রতিনী লেখিকা ও কবি।

কলকোলাহলময় কর্মমুখর
চঞ্চল এ মহানগরী—রাজপথে জনস্রোত
বহে অবিরাম, জানে না চলেছে কেন?
সমাপিবে কোন কর্ম? উদ্দেশ্য বা কিবা
জীবনের? নাহি জানে কভু, অশ্রান্ত চরণে
তবু মিছে ছুটে চলা, কোথা? কত দূর?
কে দিবে উত্তর? নাহি তিলেক বিরাম,
নাহিক বিশ্রাম, পলকের তরে নাহি শান্তি
বৃথা যাত্রা লক্ষ্যহীন—শুধু গতি আর গতি!
সহসা থামিল পান্থ। কোন
যাদুমন্ত্রবলে বুঝি অন্ধ লভেছে দিঠি,
হেরিয়া সুমুখে ওই শান্তির আলয়
স্তব্ধ, বাক্যহারা, মরুভূ-মাঝারে মরূদ্যান!
লবণাম্বুরাশি মাঝে এ যে অমৃত-নিঝর!
শান্ত এবে শ্রান্ত চিত—জুড়ায় জীবন,
মাতৃস্নেহ সুধাস্বাদে তৃপ্ত তপ্ত প্রাণ।
ক্ষুদ্রায়তন সে নিলয়,—
নাই নয়ননন্দন কারু-কাজের চমৎকারিত্ব,
অথবা বিশাল প্রাসাদের বিপুলত্বের গৌরব,
স্থাপত্যে কি ভাস্কর্যেও নয় খ্যাতি
বিশ্বজোড়া,
অনুপস্থিত—বৈভবের গর্বিত জলুস।
নিরাভরণ, অনাড়ম্বর—তবু কী অপরূপ
মহিমায় মাখা! মহীতলে মেলে না
উপমা,
'ত্রিদিব-অধিক' এ যে 'মহতো মহীয়ান'
পরশিয়া মাতৃ-পদ-রজ-দিব্য অমৃত সম্পদ।

ত্যাগের দিব্যদ্যুতি ঝলকে
গৈরিক, পুষ্পচন্দনের পবিত্র সৌরভ,
ঘণ্টার ধীর-উদাত্ত ধ্বনি, সৌগন্ধ ধূপের,
কর্মব্যস্ত সন্ন্যাসীর প্রশান্ত আনন,—কক্ষ
প্রান্তে
পর্যঙ্কে আসীন অপরূপা মাতৃমূর্তিখানি
'প্রতিমা স্নেহের'। দিব্য এ আলয়ে সদা
বিরাজেন জননী আমার। নহে 'দশভুজা'
'দশপ্রহরণধারিণী' কিংবা 'দেবী অষ্টভুজা'।
নহে 'চতুর্ভুজা, ত্রিনয়নী, ত্রিদিববাসিনী'।
দ্বিভুজা মানবী—মাতা মম, মাতা সবাকার,
দুখানি নয়নে ক্ষরে স্নেহসুধা অনিবার।
অতুলন প্রেমের পাথার।
বুঝি 'করুণা' ধরিয়া কায় এসেছে ধরায়,
চরণকমলতলে নীরবে প্রণত নিত্য
তনয়-তনয়া 'মা'র—প্রাণের আকুতি শত,
আর্তি অন্তরের সকরুণ,—নিবেদিছে সবে।
'মা' বিনে বুঝিবে কেবা ব্যথা সন্তানের,
কে দিবে সান্ত্বন তারে,—হরিয়া সন্তাপ?
জগতের মাতা সবাকার।
প্রসাদে যাহার জাগে চিত্তে আনন্দ-অপার,
বাঞ্ছিত কৃপাকণা যাঁর, তপঃ সুকোঠর
যুগ যুগ ধরি' করে যোগিঋষিবর,
বারেক প্রণমি' পদে ধন্য পুর-নর,
পাবন সে অমৃতনাম—'মা সারদামণি'।
'উদ্বোধন' আলো করি রাজেন জননী
'মাতৃপীঠ'—পুণ্যতীর্থে নমি সদা নমি।

রামায়ণীঃ তৃতীয়-চতুর্থ সর্গ

(রামায়ণ রচনা—কুশ ও লবের রামায়ণ গান)

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

অসিতকুমার একাধারে শিল্পী, সাহিত্যিক ও কবি। তাঁর সাহিত্য ও কবি-প্রতিভা বিকাশের মূলেও ছিল রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ আশীর্বাদ ও প্রেরণা। সমগ্র বাল্মীকি-রামায়ণের ভাবাবলম্বনে পদ্যানুবাদ 'রামায়ণী' অসিতকুমারের অক্ষয় কীর্তি। অপ্রকাশিত 'রামায়ণী'র একটি অধ্যায় (তৃতীয়-চতুর্থ সর্গ) এখানে মুদ্রিত হল। শিল্পী-কন্যা শ্রীমতী অতসী বড়ুয়ার সৌজন্যে 'রামায়ণী'র পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া গেছে।

ধীমান বাল্মীকি
ধর্মার্থ সহিত হিত শ্রীরামচরিত
নারদ ঋষির কাছে শুনিয়া সমগ্র
সমধিক জানিবারে
বিধিমত বসি দর্ভাসনে করি আচমন
রহি কৃতাঞ্জলিপুটে হইলেন যোগমগ্ন
অনন্তর ধ্যানে
শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সীতা প্রজাবর্গসহ
ভার্যাদের সাথে
দশরথ রাজনের হাস্য বাক্য, গতি সর্ব;
লক্ষ্মণ সীতার সনে বন-পর্যটনে
সত্যসন্ধ রামের বীক্ষণ
হেরিলেন ধর্মাত্মা বাল্মীকি
'করতলগত যেন আমলক ফল'।
যোগপথাশ্রিত হয়ে হরিয়া সকল
সাগররত্নের মতো ধর্মার্থ কামার্থগুণে
অতি সারবান সর্বশ্রুতিমনোহর
রচিলেন মহামতি
রঘুবংশ শ্রীরামচরিত নারদবর্ণিত
শুভ সন্দর্ভের সার।

মহামুনি গ্রন্থে তাঁর
রাম-লব্ধ রাজ্য আর রাবণ সংহার,
সীতার উদ্ধার, বহু শক্তি পরিচয়
লোকনিষ্ঠা, ক্ষমা, সাম্য সকল বিষয়
বিচিত্র পদেতে রচি
চতুর্বিংশ সহস্র শ্লোকেতে
পঞ্চশত সর্গভাগে
ছয় কাণ্ডে রচি
আরো সপ্তকাণ্ডে তাহা করিয়া সমাপ্ত
গাঁথিলেন সপ্তমণি সমুজ্জ্বল হার।
গ্রন্থশেষে উপজিল
চিন্তা শুধু তাঁর
হবে ইহা কিরূপে প্রচার
জগতের হিত-যোগ্য দিব্য সমাচার?
হেনকালে মুনিবেশী
তরুণ কিশোর দুটি আশ্রম নিবাসী
কুশীলব ভ্রাতা আসি
বাল্মীকিরে করেন প্রণাম।
মেধাবী, বেদজ্ঞ, বুদ্ধি অতি সুমার্জিত
স্বরসংযুক্ত দেখিয়া বাল্মীকি
করুণানিলয় মুনি ত্রিকালজ্ঞ ধীর
সাদরে উভয়ে করিয়া গ্রহণ
রাবণ-নিধন আর রামের চরিত
স্বরচিত রামায়ণ করালেন গীত।
শিক্ষা লভি দুটি ভ্রাতা
পাঠে, গানে সুমধুর
দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিত তানে
ষড়জ, ঋষভ আদি সপ্তস্বর দানে
তন্ত্রী বাদ্যে লয়ে সমে গীতিযোগ্য যাহা

কৃতান্ত রাবণ বধ
শ্রীরামের জয়
শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, ভয়ানক,
বীর, আদি রসাত্মক গাহিলেন কাব্য মধুময়
গন্ধর্বতত্ত্বজ্ঞ কুশলব গন্ধর্বের রূপ
মধুকণ্ঠ, সুধাভাষী
সর্বগুণে সুলক্ষণ রয়েছে প্রকাশি।
রাম অনুরূপ দুটি
তাঁরি বিম্বে সমুৎপন্ন প্রতিবিম্ব যেন।

মহানন্দে রামগান করে ভ্রাতৃদ্বয়
সাধু, ঋষি, দ্বিজ শুনি
প্রীত অতিশয়।
কুশীলব রামায়ণ গীতি
শ্রুতিমাত্র জাগে প্রীতি পুলক বিস্ময়
প্রেমাশ্রুতে গদগদ স্তব্ধ সবে রয়।
গীত-মুগ্ধ ঋষি মুনি সাধুবাদ দানি
তাঁহাদের তরে
কলস, বল্কল দেন সবারে আদরে।
কেহ কৃষ্ণাজিন কেহ যজ্ঞসূত্র, হার,
কমণ্ডলু, মৌঞ্জী, কেহ কৌপীন বসন,
কষায় বস্ত্রেরে আর জটার বন্ধনী
কাষ্ঠ সংগ্রহের রজ্জু, যজ্ঞপাত্র আনি
রাখেন তাঁদের কাছে
বহু কাষ্ঠ ভার,
উড়ুম্বরী রচা পীঠ, কুটজকুসুম
দেন উপহার
যথাসাধ্য যাঁর।
আর যারা করে নাই দান
রাখিবারে মান
বাল্মীকির অনুপম কবিত্বের প্রশংসা করিয়া
একবাক্যে কুশীলবে আশীর্বাদ দানি
'দীর্ঘজীবী হও' কহি গেলেন চলিয়া।

কুশীলব ভ্রাতৃদ্বয়
সুখোদ্দীপ্ত আয়ুষ্কর গাহি রামায়ণ
করিলেন সর্বত্রই সুখ্যাতি অর্জন।
একদা সহসা তাঁরা
রাজপথে অযোধ্যায় গীত গাহি ভ্রমিবার
কালে
তাঁহাদের সাথে
রামচন্দ্র মহারাজ নয়নে নয়ন
ঘটিল মিলন।
রামায়ণ-গীতি শুনি নৃপতি শ্রীরাম
সাদরে তাঁদের ভবনে আনিয়া
বসালেন হেম সিংহাসনে।
লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন আর ভরতের সাথে
লইয়া আসন দিলেন আদেশ রাম
গাহিবারে গীত। কহিলেন পুনরায়
"দেবতুল্য নবীন তরুণ
ভ্রাতা দুটি এসেছেন হেথা
নিকটে তাঁদের
বিচিত্রার্থপ্রদ
অপূর্ব আখ্যান সবে করহে শ্রবণ।"
রামের অনুজ্ঞায়
গীতি-মার্গ বিধানের মতে
তন্ত্রীলয়ে সুমধুর
সর্বগাত্র মন হৃদি উল্লাসজনক
কুশীলব গীতে রত হলেন দুজনে।
নৃপ রাম শুনি রামায়ণ
কহিলেন অনুজেরে
"গায়কেরা মুনিবেশী
আছে তবু রাজ-চিহ্ন দেহেতে অঙ্কিত
উপাখ্যান গীতি এই মাধুর্যে ভরিয়া
মোর খ্যাতি যশেতে পূরিত।"
রামচন্দ্র সভাসীন
কীর্তি নিজ হবে স্থায়ী ভাবি
শুনিতে আসক্তি তাঁর হল সমধিক।

'নমো সম্বুদ্ধায়'

স্বামী বিবেকানন্দ

সঙ্কলক (গদ্য-ছন্দে) : অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক—বিভাগীয় প্রধান।
সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কারে সম্মানিত খ্যাতকীর্তি বিবেকানন্দ-গবেষক।

॥ ১ ॥

বুদ্ধ আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর।

তিনি এসেছিলেন আমার ঘরে, জীবনে আমার, একেবারে বাল্যকালে।
তখন স্কুলে পড়ি, ধ্যান করছি রুদ্ধ ঘরে,
অকস্মাৎ আবির্ভূত জ্যোতির্ময় পুরুষ, সম্মুখে,
মুখে অপূর্ব আলোক মুণ্ডিত মস্তক, দণ্ড-কমণ্ডলু হস্তে প্রশান্ত সন্ন্যাসী,
ভাষাময় নয়নে তাকিয়ে আমার দিকে, যেন কিছু বলবেন।
অভিভূত আমি, প্রণাম করেছি সাষ্টাঙ্গে, কিন্তু ভয় পেয়েছি,
দ্বার খুলে বেরিয়ে এসেছি নির্বোধের মতো,
শোনা হয়নি তাঁর কথা।
জানি তবু জানি—প্রভু বুদ্ধই এসেছিলেন আমার কাছে।

তারপর একদিন বুদ্ধগয়ায় ধ্যানে বসেছি বোধিবৃক্ষতলে,
আর শিউরে উঠেছি—এও কি সম্ভব!—
যে-বায়ুতে নিশ্বাস নিয়েছিলেন তিনি—
তাতেই শ্বাস নিচ্ছি আমি!
যে-মাটিতে বিচরণ করেছিলেন—
তাতেই অবস্থিত আমিও!!

বুদ্ধ।
তিনি সেই একমাত্র যাঁতে আবির্ভূত এবং বিঘোষিত এই বার্তা—
'মৃত্যু মহা অভিশাপ—অভিশাপ এ-জীবন।
মৃত্যু ও জীবনের লয় যে-নির্বাণে—
তাই হোক মানবের ধ্রুব আশ্রয়।'

ওঁ নমো ভগবতে সম্বুদ্ধায়।

॥ ২ ॥

জগৎ দেখেনি তাঁর মতো সংস্কারক
যিনি বলেছেন স্থির কণ্ঠে :
কিছু শুনেছ বলেই তাকে বিশ্বাস করো না ;
বংশানুক্রমে কোনো মত পেয়েছ বলেই তাকে বিশ্বাস করো না ;
প্রাচীন কোনো ঋষির বাক্য বলেই তাকে বিশ্বাস করো না ;
কোনো তর্কে অভ্যাসে জড়িত হয়েছ বলেই তাকে বিশ্বাস করো না ;
বিচার করো, বিশ্লেষণ করো, ত্মাখো যুক্তির সঙ্গে মেলে কিনা ;
ত্মাখো তা সকলের কল্যাণকর কিনা,
যদি হয়, তবেই গ্রহণ করো,
আর জীবন যাপন করো সেই মতো।

তার্কিক ব্রাহ্মণকে বুদ্ধ প্রশ্ন করলেন—
আপনারা ব্রহ্মকে দেখেছেন ?
—না।
আপনাদের পিতা ব্রহ্মকে দেখেছেন ?
—মনে হয় না।
আপনাদের পিতামহ ব্রহ্মকে দেখেছেন ?
—জানি না।
হে বন্ধুগণ ! যাঁকে না দেখেছেন আপনি,
না দেখেছেন আপনার পিতা বা পিতামহ,
সেই অদৃশ্যের দ্বারা দাবিয়ে রাখতে চান অন্যদের—
কি আশ্চর্য !

ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে ব্রাহ্মণদের মধ্যে চলেছে তুমুল তর্ক,
কোলাহল, বিষাক্ত বাক্য-বিনিময়।
বুদ্ধ শান্তভাবে সব শুনলেন, পরে বললেন,
আপনাদের শাস্ত্র কি বলেছে—ঈশ্বর ক্রোধী ?
—না, বলেনি।
আপনাদের শাস্ত্র কি বলেছে—ঈশ্বর অন্যের ক্ষতিকারক ?
—না, বলেনি।
আপনাদের শাস্ত্র কি বলেছে—ঈশ্বর অপবিত্র ?
—না, অবশ্যই বলেনি।
আপনাদের শাস্ত্র এ-বিষয়ে কী বলেছে ?

—শাস্ত্র বলেছে—ঈশ্বর পবিত্র, ঈশ্বর প্রেমময়, ঈশ্বর মঙ্গলময়।
স্নিগ্ধ হাসিতে বুদ্ধ বললেন, হে বন্ধুগণ!—
তাহলে কেন আপনারা চেষ্টা করেন না পবিত্র ও মঙ্গলময় হতে—
যাতে ঈশ্বরকে জানতে পারেন?

ধর্মে অলৌকিকতার প্রচণ্ড বিরোধী বুদ্ধের কাছে শিষ্যরা সোৎসাহে বললেন—
এক অলৌকিক ক্রিয়াকারীর কথা।
সে লোকটি নাকি শূন্য থেকে মৃৎভাণ্ড নামাতে পারে।
তেমন একটি পাত্র বুদ্ধকে দেখানোও হল।
লাথি মেরে সেটি ভেঙে বুদ্ধ বললেন—
কদাপি অলৌকিকতার উপরে ধর্মকে দাঁড় করাবে না।
অনুসন্ধান করো বিশুদ্ধ সত্যের,
অগ্রসর হও আত্মজ্যোতির আলোকে।

সত্যের জন্য বুদ্ধের নির্ভয় সন্ধান,
প্রতিটি প্রাণীর জন্য অপূর্ব প্রেম,
জগতে অনন্য।
ধর্মজগতের মহাসেনাপতি বুদ্ধ,
সিংহাসন অধিকার করেছিলেন
অপরকে দান করার জন্যই।

॥ ৩ ॥

বুদ্ধ প্রেরণ করতেন প্রেমপ্রবাহ—
উত্তরে ও দক্ষিণে, পূর্বে ও পশ্চিমে, ঊর্ধ্বে ও নিম্নে—
যতক্ষণ না পূর্ণ হয়ে যায় সমগ্র জগৎ সে অনন্ত স্রোতে।
সম্মুখে রয়েছে আলোকিত বিশ্বজগৎ,
এ বিশ্বের সবকিছু আমাদের,
বাহু প্রসারিত করে আলিঙ্গন করো জগৎকে।

মহারণ্যে বুদ্ধের ধ্যান আত্মমুক্তির জন্য নয়।
জগৎ জলছে—নির্গমনের পথ চাই—
বাঁচার জন্য।
জগতে এত দুঃখ কেন—কেন—
সেই যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত তিনি।

অনুসরণ করো তাঁকে—বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে যিনি
পাঁচশতবার জন্মেছেন ও মৃত্যুবরণ করেছেন—
সেই শ্রীবুদ্ধকে।

॥ ৪ ॥

বুদ্ধের ধর্ম দ্রুত ছড়িয়েছিল তাঁর দর্শনের জন্য নয়,
সে দর্শনের সব কথা গ্রাহ্যও নয়, যেহেতু যুক্তিসঙ্গত নয় সর্বদা,
বুদ্ধের বিস্তারের কারণ তাঁর অপূর্ব প্রেম।
মানব-ইতিহাসে সেই প্রথম একটি বিশাল হৃদয় করুণায় বিগলিত,
সিক্ত করেছিল সর্বপ্রাণীকে।

ঈশ্বরকে ভালবেসেছে মানুষ কিন্তু ভুলেছে মনুষ্য-ভ্রাতাকে।
ঈশ্বরের জন্য প্রাণ দিয়েছে সে—নিয়েছেও প্রাণ—
ঈশ্বরেরই নামে।
বলি দিয়েছে নিজ সন্তানকে, লুণ্ঠন করেছে অন্য দেশ ও জাতিকে,
খুন করেছে লক্ষ-লক্ষ মানুষকে,
সিক্ত করেছে ধরিত্রী রক্তে শুধু রক্তে,
সবই ঈশ্বরের নামে—ঈশ্বরেরই নামে।
বুদ্ধের শিক্ষাতে মানুষ প্রথম মুখ ফেরাল অপর ঈশ্বরের দিকে,
সে ঈশ্বর—মানুষ।
বুদ্ধের ভিতর থেকে উঠেছিল বিশুদ্ধ প্রেম আর জ্ঞানের ঢেউ,
তা ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল দেশের পর দেশ,
পূর্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ—সর্বদিক—সর্ব প্রান্ত।

অসাম্যের বিরুদ্ধে চির সংগ্রামী,
জাতিভেদ খণ্ডনকারী,
অধিকারবাদ নাশকারী,
সর্ব প্রাণীর সাম্যবিঘোষক,
লক্ষ-লক্ষ পদদলিতের পরিত্রাতা—
তিনি তথাগত—বুদ্ধ।

॥ ৫ ॥

বুদ্ধের এই দারুণ বার্তা :
উন্মূল করো নিজ হৃদয়ের স্বার্থপরতা,
উন্মূল করো সকলই যা স্বার্থে ভোলায় মানুষকে।

স্ত্রী নয়—পুত্র নয়—পরিবার নয়—না না—
আবদ্ধ হয়ো না সংসারে।
স্বার্থশূন্য হও! স্বার্থশূন্য হও!

অতন্দ্র বুদ্ধের বাণী :
তীব্রগতি কাল, নশ্বর জগৎ, দুঃখ সর্বস্ব যেখানে।
তোমার ঐ উত্তম খানা, সুন্দর বসন, আরামের আবাস!
হে মোহনিদ্রিত নর-নারী—
ভেবেছ কি কোটি-কোটি ক্ষুধাতুরের কথা যারা মৃত্যুপথযাত্রী!
শুধু দুঃখ, শুধু দুঃখ—ভুলোনা এই মহাসত্য।
জগতে প্রবেশের মুখে শিশু কাঁদে,
সেই তার প্রথম উচ্চারণ।
কান্নাই সত্য জগতে—সকলে কাঁদছে—কাঁদবে।
এই জেনে ত্যাগ করো স্বার্থ।

আচার্যদের মধ্যে বুদ্ধই সর্বাধিক শিখিয়েছেন
আত্মবিশ্বাসী হতে।
যেখানে স্বাধীনতা সেখানেই শান্তি—তিনি বলেছেন।
যেখানে অধীনতা সেখানেই দুঃখ—তিনি বলেছেন।
মানুষে রয়েছে অনন্ত শক্তি,
কেন সে কেবলই প্রার্থনা করবে ঈশ্বরের কাছে?
প্রতি শ্বাসে উপাসনা করছ তোমরা—একথা ভুলো না।
আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি—এও উপাসনা।
তোমরা শুনছ—এও উপাসনা।
শরীর-মনের এমন মুহূর্ত কি সম্ভব যখন মানুষ
দিব্যশক্তির প্রকাশলীলার অংশী নয়?
প্রার্থনা কি যাদুমন্ত্র যে শব্দোচ্চারণেই অলৌকিক ফল লাভ?
না—না—প্রত্যেককে শ্রমে ও ধর্মে পৌঁছতে হবে গভীরে,
অনন্ত শক্তির উৎসে।
শ্রমই সর্বোচ্চ প্রার্থনা—বাক্য নয়।
কর্মের দ্বারা উপাসনা করো—নীরবে।

প্রলোভন এসেছিল বুদ্ধের কাছে, হাতছানি দিয়ে বলেছিল,
ছেড়ে দাও সত্যের সন্ধান,

ফিরে যাও সংসারে, পুরনো জীবনে, জুয়াচুরি আর মিথ্যার জগতে,
ভ্রান্ত শব্দে চিহ্নিত করো সদ্‌বস্তুকে।
প্রলোভনের ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে সেই মহাকায় পুরুষ বলেছিলেন,
সত্যের সন্ধানে মৃত্যুও শ্রেয়—অজ্ঞানের জীবনের চেয়ে,
যুদ্ধক্ষেত্রে বিনাশও শ্রেয়—পরাভূত জীবনের চেয়ে।

শত্রু বা মিত্র, কেউ কখনো বলতে পারেনি
সর্বজনের হিত ছাড়া বুদ্ধ একটি নিঃশ্বাসও নিয়েছেন,
একটুকরো রুটিও খেয়েছেন।
কল্যাণের জন্যই তিনি কল্যাণকৃৎ।
প্রেমের জন্যই তিনি প্রেমিক।

বুদ্ধের শিষ্যরা প্রশ্ন করলেন—আমরা সৎ হব কেন ?
বুদ্ধ বললেন—তোমরা সদ্‌ভাব পেয়েছ উত্তরাধিকারসূত্রে,
সদ্‌ভাবের উত্তরাধিকার রেখে যাও পরবর্তীদের জন্য।
এসো আমরা চেষ্টা করি সমষ্টিগত সাধুতার বৃদ্ধির জন্য,
এসো আমরা সদাচরণ করি সদাচরণের জন্যই।
মানুষের দুঃখের জন্য মানুষই দায়ী,
মানুষের সদাচরণের প্রশংসা মানুষই পাবে।
সমুদ্রের ঢেউ নেমে যাবার সময়ে সঞ্চারিত করে যায়
পরবর্তী ঢেউয়ে উত্থানের শক্তি,
তেমনি এক আত্মা দিয়ে যায় নিজের শক্তি—
ভবিষ্যৎ আত্মায়।

॥ ৬ ॥

হে পাশ্চাত্ত্যবাসিগণ ! তোমরা বলছ—
ক্রুশবিদ্ধ হলে বৃদ্ধি পেত বুদ্ধের মহিমা।
হায়—ঠিক !
রোমক নিষ্ঠুরতার হে পূজারীগণ !
তোমরা কেবলই চাও অসাধারণ কাণ্ড, এপিক গর্জন,
'হেঁটমুণ্ডে অতলস্পর্শে গহ্বরে নিক্ষেপের'
মিল্টনী চীৎকার।
খ্রীষ্টকে পেরেক ঠুকে মারা হয়েছে, তিনি ককিয়ে কেঁদেছেন,
খুবই পছন্দ তোমাদের।

জীবনের সামান্য ঘটনার কবিত্ব তুচ্ছ তোমাদের কাছে,
আমাদের কাছে কিন্তু নয়।
অপূর্ব লাগে বুদ্ধের জীবনের ছোটখাটো ঘটনাগুলি।
যেমন ধরো না কেন—
মৃতপুত্র বুকে নিয়ে মা এসেছে কাঁদতে-কাঁদতে—
'হে বুদ্ধ! হে প্রভু! জীবন দান করো পুত্রের,
সকলই সাধ্য তোমার।'
বুদ্ধ বললেন করুণা-কণ্ঠে,
'মাতঃ! প্রাণভিক্ষা করছ পুত্রের?
তার আগে ভিক্ষা করে আনো এক মুঠো শ্বেত সরিষা,
এমন গৃহ থেকে যেখানে প্রবেশ করেনি মৃত্যু।'
শুধু এই? এত সামান্য? এখনই আনছি—
ছুটে বেরিয়ে গেল জননী, সারাদিন ঘুরল দ্বারে-দ্বারে,
কিন্তু পেল না, কারণ মৃত্যু নেই এমন গৃহ নেই।
মৃত্যুস্রোতের কূলে দাঁড়িয়ে পুত্রহারা মা জেনেছিল—
জীবনের অনিবার্য সত্য—
মৃত্যু।

আরও কাহিনী—
বুদ্ধ কাঁধে তুলে নিয়েছেন ছাগশিশুটিকে।
ছাগশিশু খুঁড়িয়ে হাঁটছিল যূপকাষ্ঠের দিকে—
বলির পশুদের সঙ্গে।
বুদ্ধ এসে দাঁড়ালেন রাজদ্বারে,
পুণ্যলোভাতুর নৃপতিকে বললেন,
হে মহারাজ! ছাগশিশুকে বলি দিলে যে-পুণ্য
তারো চেয়ে বহুগুণ পুণ্য পাবে মানুষকে বলি দিলে।
আমি প্রস্তুত—ছাগশিশুর স্থান নিতে।

হেলায় রাজসম্পদ ত্যাগ করে বুদ্ধ নেমেছেন পথে—
এর নাটকীয় সৌন্দর্যে মুগ্ধ তোমরা, হে, পাশ্চাত্যবাসী!
ওটা কোনো বিরাট ব্যাপার নয় ভারতবর্ষে।
এক ক্ষুদ্র রাজার পুত্র গৌতম, কি-বা ঐশ্বর্য তাঁদের,
তাঁর মতো ত্যাগ অনেকেই করেছেন পূর্বে।
কিন্তু কোনো তুলনা নেই নির্বাণ-পরবর্তী ঘটনার,

সহজের অপূর্ব সৌন্দর্যে পূর্ণ সেগুলি।—

রাত্রি গভীর, বৃষ্টি ঝরছে অবিরাম।
বুদ্ধ দাঁড়ালেন এসে এক গোপের কুটীরে,
ছাঁচের নীচে দেওয়ালের গা-ঘেঁষে।
ছাঁচ দিয়ে জল ঝরছে। বাতাসের ঝাপট।
জানলা দিয়ে গোপ চকিতে দেখল সন্ন্যাসীকে।
'বা! বা! গেরুয়াধারী যে! থাকো ওখানে।
ওই তোমার ঠিক জায়গা।'
গান ধরল সে—
'গোরু-বাছুর উঠেছে গোয়ালে, আগুনে তপ্ত ঘর,
নিরাপদ পত্নী আমার, সুখে নিদ্রিত সন্তানেরা,
সুতরাং মেঘগণ! আজ রাত্রে—
তোমরা বর্ষণ করো স্বচ্ছন্দে।'
বুদ্ধ উত্তর দিলেন—
'আমার মন সংযত, ইন্দ্রিয় প্রত্যাহৃত,
হৃদয় দৃঢ় ও সুস্থির।
সুতরাং হে মেঘগণ! আজ রাত্রে—
তোমরা বর্ষণ করো স্বচ্ছন্দে।'
গোপ গাইল—
'খেতের ফসল কাটা শেষ, খড় উঠেছে খামারে,
জলভরা নদী, মজবুত বাঁধানো পথ,
সুতরাং হে মেঘগণ! আজ রাত্রে—
তোমরা বর্ষণ করো স্বচ্ছন্দে।'

গাইতে—গাইতে—লাগল গোপ,
উত্তর দিয়ে গেলেন বুদ্ধ একই ভাবে।
ক্রমে নম্র হয়ে এল গোপের কণ্ঠ,
নত হল সে বুদ্ধের চরণে,
অনুতপ্ত হৃদয়ে—শিষ্যত্বের জন্য।

মৃত্যুতে মহীয়ান বুদ্ধ—জীবনের মতোই।
অন্ত্যজ জাতির এক মানুষ আহার্য দিল তাঁকে,
দুষ্ট উপাদানে, অশুচি পরিবেশে প্রস্তুত খাদ্য।
বুদ্ধ শিষ্যদের বললেন, তোমরা খেয়ো না এ-জিনিস,
কিন্তু আমি তো পারব না প্রত্যাখ্যান করতে।

যাও, বলে এসো ঐ মানুষটিকে,
আমার সর্বোচ্চ সেবা সে করেছে,
আমাকে মুক্ত করেছে এই দেহের বন্ধন থেকে।

বুদ্ধ বিদায় নেবেন পৃথিবী থেকে,
বৃক্ষতলে বিছানো চীর,
সিংহের ন্যায় দক্ষিণপার্শ্বে শয়ান আনন্দময় পুরুষ,
মৃত্যুর প্রতীক্ষায়।
প্রিয় শিষ্য আনন্দ কাঁদছিলেন।
বুদ্ধ তিরস্কার করে বললেন,
জেনে রাখো, বুদ্ধ ব্যক্তিবিশেষ নন,
ওটি এক উচ্চ অবস্থা, যে-কেউ লাভ করতে পারে।
অন্য কাউকে অর্চনা নয়—
আত্মদীপো ভব।
সিংহ যেমন ভীত নয় শব্দে,
জালবদ্ধ নয় বায়ু, জললিপ্ত নয় পদ্মপত্র,
তেমনি একাকী বিচরণ করো গণ্ডারের মতো।
দৃষ্টি দিও না পথের দিকে, গ্রাহ্য করো না কোনোকিছু,
অগ্রসর হও গণ্ডারের মতো একাকী।

শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে তথাগতের,
সকলে নীরব, রুদ্ধশ্বাস।
দূরাগত একজন সহসা ছুটে এল সেখানে,
উপদেশপ্রার্থী।
হবে না, সম্ভব নয়—শিষ্যরা ফেরালো তাকে।
বুদ্ধ থামালেন।
বুদ্ধ বললেন, ওকে আসতে দাও,
তথাগত সর্বদা প্রস্তুত।

সত্য—গভীরভাবে সত্য—এই কাহিনী।
আমি দেখেছি রামকৃষ্ণকে
অন্তিমক্ষণে একই কাজ করতে।
রামকৃষ্ণ সদা প্রস্তুত।

'সাবধান'

(ছেঁড়া কাগজ জুড়ে চিত্ররূপ)

শিল্পাচার্য নন্দলালের রচনা

সৌজন্যে ঃ বিশ্বরূপ বসু।

শান্তিনিকেতন (শাল বীথি)

নতুন ধান

শিল্পাচার্য নন্দলালের চিত্র।

সৌজন্যে : বিশ্বরূপ বসু।

বিমলেশ্বরের পথে

স্বামী চৈতন্যানন্দ

বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী—'উদ্বোধন' পত্রিকায় সংশ্লিষ্ট।

উত্তরকাশী। ১৫ নভেম্বর, ১৯৮৪। রাত
টা। স্বামী ব্রজেশানন্দ ও আমি শ্রীরামকৃষ্ণ
টির থেকে বেরিয়ে পড়লাম। দুজনের গায়ে
রম জামা, চাদর। মাথায় কান-ঢাকা টুপি।
াতে লাঠি, টর্চলাইট, ভিক্ষাপাত্রে গঙ্গাজল ও
বেলপত্র। হেঁটে মাইলখানেকের মতো রাস্তা
গলাম। উজেলীতে। এখানে সাধু-মহাত্মারা
াকেন। এক মহাত্মার কুটিয়ায় গিয়ে আমরা
জন হাজির হলাম। কুটিয়াতে দুজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী
মামাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমরা
য়েতেই তাঁরা কফি তৈরি করে ফেললেন।
ারজন মিলে কফি ও বিস্কুট খেয়ে বেরিয়ে
ড়লাম। প্রায় ভোর ৬টা। তখনও কিছু
ন্ধকার—আকাশ পরিষ্কার হয়নি। বেশ শীত
াছে। উত্তরকাশীর বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে হেঁটে
লাম। আমরা যাব বিমলেশ্বর শিবজীকে দর্শন
রতে। উত্তরকাশীর পশ্চিমে যে সুউচ্চ পাহাড়
ার শিখরে বিমলেশ্বর-মন্দির। শিখরের উচ্চতা
ই হাজার ফিটের মতো। আমরা যে-রাস্তা
য়ে যাব সেভাবে না গিয়ে শর্ট-কাট রাস্তা ধরেও
ওয়া যায়। তবে আমরা একটু ঘুরে যাচ্ছি
থে কিছু দর্শনীয় জিনিস আছে বলে।

হরিদ্বারের বাসরাস্তা ধরে জানসুতে চলে
লাম। এখান থেকেই পাহাড় চড়াই আরম্ভ।
াহাড়ের গা-বেয়ে আমরা উঠছি। মাঝে মাঝে
াম পড়ছে। সকালবেলা। পূর্ব পাহাড়ের
া থেকে সূর্য উঠছে। গ্রামের শিশু থেকে বৃদ্ধ-
া সবাই হাতজোড় করে 'ওঁ নমো নারায়ণায়,
ামীজী' বলে আমাদের প্রাতঃশুভেচ্ছা জানাচ্ছে।
কেবারে ছোট শিশুরা 'ওঁ নমো নারায়ণায়,
স্বামীজী' সম্পূর্ণ বলতে পারছিল না। তারা আধ-আধ করে 'ওঁ, স্বামীজী' বলছিল। শুনতে ভারী ভাল লাগছিল। আজও পাহাড়ী মা-বাবারা ছোটবেলা থেকে ছেলেমেয়েদের সাধু-মহাত্মাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে শেখায়!—ভাবতে ভাবতে পথ চলছিলাম।

চড়াই ভেঙে উঠছি। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করছি। সাধু-মহাত্মাদের জীবন-কাহিনী আলোচনা করছি। কখন-বা স্বামীজীর 'সন্ন্যাসীর গীতি' থেকে কিছু কিছু স্তবক আবৃত্তি করছি। আবার কখন উঠে আসা নিচের পথের দিকে তাকিয়ে দেখছি দেওদার ও চিরগাছের জঙ্গল। মনে হচ্ছিল, নিচের গাছগুলি যেন পাহাড়ের গায়ে সবুজের একটি আস্তরণ বিস্তীর্ণ করেছে।

কখন আমরা এসে গেছি সাল্ড গ্রামে। গ্রামে ঢোকার মুখে জগন্নাথের মন্দির পড়ে। মন্দিরটি বহু প্রাচীন বলে লোকমুখে প্রচলিত। এখানকার মূর্তি পুরীর জগন্নাথের মতো নয়। বিষ্ণুমূর্তি। বসা অবস্থা। হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। জগতের নাথ বলে তাঁর নাম জগন্নাথ। মনে হয়, সেই হিসাবে মন্দিরের নাম জগন্নাথ-মন্দির। ত্যাগভূমি হিমালয়ে জগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশের সময় মনে মনে প্রাণের প্রার্থনা জানালাম:

ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনকমাণিক্যবিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং সকলজনকাম্যাং বরবধূম্।
সদা কালে কালে প্রমথপতিনা গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

পরিবেশ শান্ত। কোন বাতাস বইছে কি বইছে না বোঝা যাচ্ছে না। দেওদার ও

চিরগাছগুলি উন্নতশিরে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে আছে। প্রভঞ্জনের সঙ্গে বায়ুক্রীড়া করে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করার তাদের যেন কোন অধিকার নেই। মন্দিরের ভিতর গাঢ় অন্ধকার। টর্চের আলো জ্বেলে প্রভু জগন্নাথকে প্রণাম করে মন্দিরের চার-কোণে আমরা চারজন বসে পড়লাম। মন আপনা-আপনি শান্ত হয়ে গেল। জোর করে শান্ত করতে হল না। গভীর নিস্তব্ধতার মাঝে একটি সোঁসোঁ শব্দে মন তন্ময় হয়ে গেল। মনে হল, সারা হিমালয় জুড়ে যেন অনাহত ওঁ-কার শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে। এমন সময় মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক সাধুটি চা-পানের জন্য আমাদের ডাকলেন। আমাদের উঠতে ইচ্ছা করছিল না। উঠতে বাধ্য হলাম—নতুবা আমাদের গন্তব্যস্থান বিমলেশ্বরে যেতে দেরি হবে। চা-পানের পর জগন্নাথদেবকে পুনঃপ্রণাম করে সান্ড্ গ্রামে প্রবেশ করলাম।

এই গ্রামে মাধুকরী করার ইচ্ছা হল আমাদের। বেলা ৮২।৯টা। এত সকালে কি মাধুকরী পাওয়া যাবে? সাধারণত গ্রামের মানুষ দুপুর ১১২টার কমে খায় না। এখানে কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। মেয়েরা রান্না-বান্না এবং সংসারের অন্যান্য কাজ সেরে, খাওয়া-দাওয়া করে মাঠে কাজ করতে যায়। পুরুষরা বাড়িতে ছেলে-মেয়েদের দেখাশুনা করে। আর লাঙল দিয়ে জমি চাষ করে দেয়। তারপর ফসল রোপণ করা থেকে ঘরে ফসল কেটে তোলা পর্যন্ত মেয়েদের কাজ। মেয়েরা ঘরে এবং বাইরের সমস্ত কাজ করে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বলছেন: 'ঋষিরা কত খাটত। সকালবেলা আশ্রম থেকে চলে যেত। একলা সমস্ত দিন ধ্যান চিন্তা করত, রাত্রে আশ্রমে ফিরে এসে ফলমূল খেত।' একথা প্রসঙ্গে আমাদের পথপ্রদর্শক শুভ্রকেশ-শ্মশ্রুমণ্ডিত গৌরবর্ণ বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বললেন, এই ট্রাডিশন এখনও কিছুটা আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কিরকম? তিনি বললেন, প্রাচীনকালে মুনি-ঋষিরা বনে-জঙ্গলে যখন তপস্যা করতে যেতেন তখন তাঁদের পরিবারের মেয়েরা সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করতেন। তা না হলে তাঁদের পক্ষে সংসারনির্বাহ করা সম্ভব হত না। মুনি-ঋষিরা সারাদিন তপস্যা করে বন-জঙ্গল থেকে আশ্রমে ফিরে এসে কিছু খেয়ে শুয়ে পড়তেন, আবার ভোরে উঠে চলে যেতেন। সেজন্য সংসার চালাবার জন্য মেয়েদের খুব খাটতে হত। সে-ধারা এখনও কিছুটা দেখা যায়—পাহাড়ী গার্হস্থ্য জীবনে। পুরুষরা তপস্যা করতে বনে-জঙ্গলে যায় না, তারা ঘরে ছেলে-মেয়েদের দেখাশুনা ও ক্ষেতে হালচাষ করে—এই পর্যন্ত তাদের কাজ। সংসারের বাকী আর সব কাজ মেয়েরাই করে।

সান্ড গ্রামে আমরা যখন মাধুকরী করতে ঢুকছি তখন গ্রামবাসীদের যাদের সঙ্গে পথে আমাদের দেখা হল তারা 'ওঁ নমো নারায়ণায়, স্বামীজী' বলে অভ্যর্থনা জানাল। আমরাও প্রতি নমস্কার করলাম। আমরা কয়েকটি বাড়িতে 'নারায়ণ হরি' বলে দাঁড়ালাম। যাদের রান্না হয়ে গেছে তারা খুব শ্রদ্ধাসহকারে ভাত-ডাল, মাঠা (ঘোল) ভিক্ষা দিল। যাদের রান্না হয়নি তারা ভিক্ষে দিতে না পারায় মনে কষ্ট পাচ্ছিল। তারা বারবার বলছিল: 'স্বামীজী, শুকা ভিক্ষা লে যাইয়ে'—স্বামীজী, আপনারা শুকা (রান্না না করা চাল-ডাল) ভিক্ষা নিয়ে যান। আমরা বললাম: 'নহী পুক্কী ভিক্ষা চাইয়ে'—না, আমাদের পুক্কী (রান্না-করা) ভিক্ষা চাই। কোন কোন বাড়িতে কাঁচা শাক-ডাল নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। গ্রামবাসীদের সহৃদয় ব্যবহার দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এরা গরীব কিন্তু সাধু-মহাত্মাদের খাওয়ানোর জন্য নিজেদের মুখের অন্ন তুলে

দিতেও এদের এতটুকু দ্বিধা হয় না। এখানে এসেই বুঝলাম 'অতিথিদেবো ভব' কথার তাৎপর্য। ভারতের আবহমানকালের ট্রাডিশন অশিক্ষিত গ্রামের মানুষগুলি আজও বহন করে চলেছে। যেখানে বিংশশতাব্দীর তথাকথিত শিক্ষিত মানুষগুলি শিক্ষার আলোক পেয়েও দিন দিন হয়ে যাচ্ছে কুটিল, বক্র, সদা সন্দেহপরায়ণ। সেখানে অশিক্ষিত এই মানুষগুলি সহজ, সরল, সেবাপরায়ণ। ত্যাগে মহীয়ান। ভারতের চিরন্তন আদর্শ ত্যাগ ও সেবাকে বহন করে চলেছে।

মাধুকরী জিনিস নিয়ে আমরা গ্রামের বাইরে এলাম। খানিকটা সমতল দেখে বসে পড়লাম আমরা। চারজনে ভাগ করে নিলাম মাধুকরীর সমস্ত জিনিস। ইষ্টদেবতার উদ্দেশে নিবেদন করে খুব তৃপ্তিসহকারে খেলাম। খাওয়ার পর আবার পাহাড় চড়াই। ভরা-পেটে পাহাড় চড়াই মোটেই আনন্দদায়ক নয়। তবু আমাদের চড়াইয়ে উঠতে হবে নতুবা বিমলেশ্বরে পৌঁছাতে দেরি হয়ে যাবে। চড়াইয়ের মাঝে জেঞ্জা (বা গেঞ্জা) নামে একটা গ্রাম পড়ল। এর পরে আর কোন গ্রাম নেই। শুধু চড়াই ও দেওদার ও চিরগাছের গভীর জঙ্গল। গাছগুলি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল, তারা যেন পাহারা দিচ্ছে কেউ কোন শব্দ করে গিরিরাজের ধ্যানভঙ্গ না করে। সদা জাগ্রত প্রহরী তারা। কোন পাখির ডাকও শুনতে পাচ্ছিলাম না। শুধু মহামৌনতার সোঁসোঁ শব্দ। দক্ষরমান বাতাস বৃক্ষপাতায় মৃদু মরমর ধ্বনি তুলতেও যেন সাহস করছিল না। যেন নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদেরও কোন কথা বলে এই অপূর্ব নীরবতা ভঙ্গ করতে ইচ্ছা করছিল না, তবু মাঝে মাঝে 'ওঁ' শব্দে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে ধ্যানমগ্ন গিরিরাজকে সম্ভাষণ করছিলাম। ওই ওঁ-কার ধ্বনি পাহাড় থেকে পাহাড়ান্তরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। যেন গিরিরাজ ধ্যান থেকে ব্যুত্থিত হয়ে আমাদের আন্তরিক সম্ভাষণের প্রতি-সম্ভাষণ জানাচ্ছিলেন। গুরু-গম্ভীর প্রতিধ্বনি শুনে আমাদের সমস্ত শরীর শিহরিয়ে উঠছিল।

চড়াই উঠতে উঠতে মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছিলাম জঙ্গলের মধ্য দিয়ে মেয়েরা ঘাস কেটে পিঠে করে নিয়ে যাচ্ছে। জঙ্গলের মধ্যে একটি যুবকের সঙ্গে দেখা হল। সে আমাদের বলল : এই জঙ্গলে লাল রঙের একটা ষাঁড় এসেছে সম্প্রতি। মানুষ দেখলেই সে শিঙ দিয়ে গুঁতিয়ে দিচ্ছে। আপনারা একটু সাবধানে যাবেন। আমরাও চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সাবধানে চড়াইয়ে উঠতে লাগলাম।

পৌঁছে গেলাম খড়িয়ানি পাহাড়ে। এই পাহাড়ের চূড়ায় এক 'বিরকত' মহাত্মা থাকেন—বৈদান্তিক সাধু। পাণ্ডিত্য ও সাধুজীবনের জন্য তিনি উত্তরকাশী সাধুসমাজে সুপরিচিত। এই নির্জন জঙ্গলে কুটিয়া বেঁধে তিনি একান্তে বাস করেন। কয়েকদিন পূর্বে সেই লাল রঙের ভয়ঙ্কর ষাঁড়টি শিঙ দিয়ে গুঁতিয়ে তাঁকে পাহাড় থেকে ফেলে দেয়। তিনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সম্প্রতি ছাড়া পেয়ে তিনি কুটিয়ায় ফিরে এসেছেন। আমাদের পথপ্রদর্শক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গে এই 'বিরকত' মহাত্মার খুব পরিচয় আছে। তিনি আমাদের ভাল সাধু দর্শন করাবেন বলে এখানে নিয়ে এসেছেন। মহাত্মার নাম স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ। তিনি কৈলাস আশ্রম থেকে সন্ন্যাস নিয়েছেন। বাঙালী শরীর। এই পাহাড়ের চূড়ায় ১১ বছর ধরে আছেন। পাহাড়ী গ্রামবাসীরা কুটিয়া তৈরি করে দিয়েছে।

মহাত্মার কুটিয়ায় পৌঁছে গেলাম। তিনি কুটিয়ার বাইরে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। কুটিয়ার ভিতরে গিয়ে বসার জন্য অনুরোধ করলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে

ভিতরে প্রবেশ করতেই চমকে উঠলাম। তিনি যেখানে বসে শাস্ত্রাদি পাঠ করেন, তার ঠিক ডানদিকের দেওয়ালে টাঙানো কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো শ্রীশ্রীঠাকুরের বড় একটি ছবি। হিমালয়ের এমন দুর্গম অঞ্চলে ওইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্রপট দেখে বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হলাম। মনের ভাব গোপন রেখে তাঁকে প্রশ্ন করলাম: ষাঁড়ে কি করে গুঁতিয়ে দিল? তিনি বললেন: কুটিয়ার কিছুটা নিচে ব্যাসকুণ্ডে জল আনতে গিয়েছিলাম। রোজ যেরকম যাই সেদিনও সেরকম গিয়েছিলাম। সে-সময়ে ষাঁড়টি গুঁতিয়ে দেয়। আমি পাহাড় থেকে গড়িয়ে একটি গর্তের মধ্যে পড়ে যাই।

—তারপর কি হল?

—আমি অচৈতন্য হয়ে পড়ি। কিছু সময় পরে জ্ঞান ফিরে এলে শুনতে পাই যে, ষাঁড়টি পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে তখনও রাগে গর্জন করছে।

—তারপর আপনি কি করলেন?

—আমি গর্ত থেকে উঠে জঙ্গলের অন্য-একটি রাস্তা ধরে কোনরকমে হাঁটতে চেষ্টা করি—কুটিয়ায় ফিরে আসার জন্য। এমন সময় পথে ভারত-তিব্বত-সীমান্তের দুজন জওয়ানের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তাঁরা আমাকে ধরাধরি করে তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। সেখানে খুব ভালভাবে তাঁরা আমাকে চিকিৎসা করেছেন। সুস্থ হয়ে মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ফিরেছি।

এই সব কথা যখন আমাদের বলছিলেন তখন তাঁর মুখে কোন ভয়ের চিহ্ন দেখিনি। স্মিতমুখে কথাগুলি বলছিলেন, আর তাঁর পায়ের ও হাতের বাঁধা-ব্যাণ্ডেজ এবং কপালে ও পায়ে শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতচিহ্নগুলি আমাদের দেখাচ্ছিলেন। সহসা তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন: ঈশ্বরের কী করুণা! হঠাৎ দুটি লোক পাঠিয়ে আমাকে সরকারী তাল হাসপাতালে রেখে চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করে দিলেন! অন্য কোন হাসপাতালে এত ভাল চিকিৎসা হত কিনা সন্দেহ আছে। তিনি সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। কথাগুলি বলতে বলতে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর চোখ দুটি ছলছল করে উঠল। তাঁর ঈশ্বরনির্ভরতা দেখে আমরা অভিভূত হয়ে পড়লাম। প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার জন্য তাঁকে প্রশ্ন করলাম: আচ্ছা মহারাজ, এই নির্জন স্থান আপনার কেমন লাগছে?

—ভাল লাগছে। ভাল লাগছে বলেই তো আজ ১১ বছর এখানে পড়ে আছি।

—এই জঙ্গলের মধ্যে আপনি খাবার ব্যবস্থা কি করেন?

—দু-তিন মাস অন্তর একদিন গ্রামে ভিক্ষা করতে যাই। চাল, ডাল, আটা প্রভৃতি ভিক্ষা পাই।

—একসঙ্গে দু-তিন মাসের অত জিনিস একা বয়ে নিয়ে আসতে পারেন?

—গ্রামের একটি যুবক কুটিয়ায় বয়ে দিয়ে যায়। যুবকটি আমার কাছে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ে।

—রাত্রে কোন জন্তুজানোয়ার উপদ্রব করে না?

—বাঘ-ভালুক এই জঙ্গলে আছে। বাঘের সঙ্গে কখন কখন আমার সাক্ষাৎ হয়। এই কুটিয়ার সামনে মাঝে মাঝে বসেও থাকে।

বাঘের কথা শুনে আমরা ঘাবড়ে গেলাম। আমাদের ভয় হতে লাগল। এই জঙ্গল দিয়েই তো আবার আমাদের ফিরতে হবে! যাই হোক, ভয়ের কথা প্রকাশ না করে, মুখে সাহস দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: কিরকমভাবে কুটিয়ার সামনে বসে থাকে? তিনি বললেন: একবার সন্ধ্যার কিছু আগে ঘরের দরজার সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি। একটা বাঘ হাত কুড়ি দূরে বাইরে বসে

আছে। আমি বাঘটির দিকে তাকিয়ে আছি, আর সেও আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। আমার মনের ভাবটি এই যে, বাঘটি যেই দরজার দিকে এগিয়ে আসবে, আমি অমনি দরজাটা বন্ধ করে দেব। কিন্তু দেখলাম, কিছু সময় পরে বাঘটি উঠে জঙ্গলে চলে গেল। আমরা আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম: এইরকম ঘটনা আর কখনও ঘটেছে? তিনি স্মিতমুখে বললেন: হ্যাঁ, ঘটেছে। একদিন রাত্রে শুয়ে আছি। রাত তখন ১২।১টা হবে। হঠাৎ দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দেওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম। কয়েকবার ধাক্কা দেওয়ার পর আর কোন সাড়া-শব্দ নেই। কিছু সময় পর আবার ধাক্কার শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর আর কোন শব্দ শুনতে পেলাম না। সকালে উঠে দেখি, বারান্দায় বাঘের পায়ের ছাপ, আর দরজায় (অঙ্গুলি নির্দেশ করে) ওই যে গেরুয়া-কাপড়ের পর্দা আছে তার উপর থাবার চিহ্ন। মহাত্মাজী উঠে গিয়ে পর্দায় থাবার ছাপটি আমাদের দেখালেন। তিনি এমন-ভাবে কথাগুলি বলছিলেন যে, শুনে মনে হচ্ছিল আমরা যেন প্রাচীন যুগের কোন অরণ্যবাসী সাধু-মহাত্মার কাহিনী শুনছি।

স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দের সাধন-ভজনের কক্ষটি দেখার ইচ্ছা হল আমাদের। সঙ্গী বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ও আমি উঠে কুটিয়ারই সংলগ্ন নির্জন অন্ধকার একটা কক্ষে প্রবেশ করলাম। ঘরের কোথায় কি আছে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বিশ্বেশ্বরা-নন্দজী একটা টেমি আমাদের কাছে এনে দিলেন। ক্ষীণালোকে দেখলাম মেঝেয় কম্বল-পাতা। দেওয়ালের গা-ঘেঁষে একটি ছোট পূজার বেদী। বেদীর উপরে কোন্ কোন্ দেবতার ছবি আছে বোঝা যাচ্ছিল না। টেমিটি বেদীর কাছে নিয়ে দেখলাম, কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো দুর্গার ও মা-কালীর দুটি ছবি। মা-কালীর ছবিটি—মা-কালী দাঁড়িয়ে, আর তাঁর পায়ের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা বসে আছেন। তাঁকে একবার নিভৃতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, শ্রীরামকৃষ্ণের ও মায়ের ছবিও আপনার পূজা-বেদীতে রেখেছেন! অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি বলেছিলেন: 'শ্রীরামকৃষ্ণের বই পড়েই তো আমার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়েছে। তাঁর কৃপাতেই তো সংসার ত্যাগ করতে পেরেছি।' কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমাদের জানালেন, শ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে সংস্কৃতে একটি স্তব রচনাও করেছেন।

কুটিয়া থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। বাইরে এসে চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগলাম। দূরে যমুনোত্রীর তুষারশৃঙ্গ, জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের চূড়া এবং নিচে গেঞ্জা গ্রাম। অপূর্ব পরিবেশ, মন আপনা থেকে শান্ত হয়ে যায়। তবে জন্তুজানোয়ারের ভয়ে মন বিক্ষিপ্তও হয়।

বিশ্বেশ্বরানন্দজীকে দেখতে উত্তরকাশীর সিরোর গ্রামের বয়স্ক ব্রহ্মচারী দেবচৈতন্য গত-কাল এসেছিলেন। তিনি আমাদের চা তৈরি করে খাওয়ালেন। এই চায়ের ব্যবস্থা আগে থাকতে করে রেখেছিলেন আমাদের পথপ্রদর্শক সেই স্বামীজী।

চা-পানের পর আমরা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ২য় শিখরেশ্বরের দিকে রওনা হলাম। শিখরেশ্বরের উচ্চতা ৮½।৯ হাজার ফিট। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গেলাম। গভীর জঙ্গল। স্বামীজীর 'সন্ন্যাসীর গীতি'র অপূর্ব সেই স্তবকটি মনে পড়ে গেল:

উঠাও সন্ন্যাসি, উঠাও সে তান,
হিমাদ্রিশিখরে উঠিল যে গান—
গভীর অরণ্যে পর্বত-প্রদেশে
সংসারের তাপ যথা নাহি পশে,
যে সঙ্গীত-ধ্বনি-প্রশান্ত-লহরী

সংসারের রোল উঠে ভেদ করি ;
কাঞ্চন কি কাম কিম্বা যশ-আশ
যাইতে না পারে কভু যার পাশ ;
যথা সত্য-জ্ঞান-আনন্দ-ত্রিবেণী—
সাধু যায় স্নান করে ধন্য মানি,
উঠাও সন্ন্যাসি, উঠাও সে তান,
গাও গাও গাও, গাও সেই গান—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

স্তবকটি উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি করতে করতে আমরা পথ চলতে লাগলাম। পাহাড় থেকে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি হতে লাগল। আমাদের সারা শরীর রোমাঞ্চিত হতে লাগল। এইভাবে পথ চলতে চলতে ১ম শিখরেশ্বরে এসে পৌঁছলাম। শিখরেশ্বরের মাথায় সঙ্গে-আনা গঙ্গাজল ঢেলে স্নান করালাম। তাঁকে আমাদের অন্তরের প্রণতি জানিয়ে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দু-চোখভরে দেখতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর হৃষ্টচিত্তে আমরা খাড়াই পাহাড় ধরে নিচে নামতে লাগলাম। পাহাড়ী রাস্তা না ধরে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বেপথে ধীরে ধীরে নামছি। খাড়াই পাহাড়। জংলী কাঁটাঘাসে ভর্তি, ইতস্তত পাথরের বোল্ডার পড়ে আছে। সন্তর্পণে তার উপর দিয়ে নামছি। আবার সবার হাতে লাঠিও নেই। আমাদের পথপ্রদর্শক বৃদ্ধ সাধুর কাছে শুধু ছাতা, তার উপর তাঁর কাঁধে প্রায় দশ কেজি ওজনের একটি ঝোলা। পায়ে আবার হাওয়াই চপ্পল। যদিও তিনি পাহাড় চড়াই-উতরাইয়ে সুদক্ষ। তবু তাঁর খাড়াই-এ নামতে অসুবিধা হচ্ছিল। কাঁটাঘাস পায়ে ফুটছিল। আমাদেরও পায়ে কাঁটা ফুটছিল। পায়ে বেদনা হচ্ছিল।

খড়িয়ানি পাহাড়ের বিশ্বেশ্বরানন্দজীকে দেখতে-যাওয়া ব্রহ্মচারী দেবচৈতন্যও আমাদের সঙ্গে আসছিলেন। আমরা মোট পাঁচজন এই-ভাবে পথ চলছি। হঠাৎ আমার পায়ের তলা থেকে একটা বড় পাথর সরে গেল। কোনরকমে শরীরের ভার সামলে নিলাম। একটু অসাম্য হলেই কয়েক শত ফিট নিচে গড়িয়ে পড়তাম। আমার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যেত না। যাই হোক ভগবৎকৃপায় বেঁচে গেলাম। পায়ের তলা থেকে সেই বিরাট পাথর খণ্ডটি গড়িয়ে নিচে একটা গাছের গায়ে লেগে চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে গেল। আমার বুক কেঁপে উঠল। ভাবলাম—পড়লে আমারও অবস্থা ওইরকম হত। দেবচৈতন্যজী আমাকে বললেন: সাবধানে নামুন। পাথর গড়িয়ে পড়লে—নিচে হয়তো পাহাড়ী মেয়েরা ঘাস কাটছে—তাদের গায়ে পাথর লাগলে মৃত্যু অবধারিত। আমার ভয় হতে লাগল—ওই পাথরের টুকরো কারোর গায়ে লাগেনি তো! নিচে থেকে কোন করুণ আর্তনাদের আওয়াজ শোনা গেল না। অবশ্য অত উপর থেকে শোনাও সম্ভব নয়। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, কারোর গায়ে যেন পাথরের টুকরো না লাগে।

আমাদের মধ্যে পথপ্রদর্শক ছাড়া আর-এক-জন বৃদ্ধ ছিলেন। পথপ্রদর্শকের চেয়ে তাঁর বয়স কিছু কম। তিনি কিছুটা স্থূলকায়। খাড়াই-এ নামতে নামতে তিনি কয়েকবার পড়ে যেতে যেতেও সামলে নিয়েছেন। তবে তাঁর মনের জোর খুব। তরুণদেরও হার মানায়। প্রচণ্ড উৎসাহ। সদা হাস্যমুখ। পথপ্রদর্শক সাধুটি সবার থেকে বয়সে বড়। তবু তিনি রাস্তায় আমাদের খাওয়ার জন্য ফ্লাস্ক ভর্তি কফি, বাদাম, ডালমুট, রাস্ক বিস্কুট প্রভৃতি কাঁধে করে বহন করছিলেন সারাটা পথ। একহাতে ছাতা, আর কাঁধে ওই সব জিনিস-ভর্তি ঝোলা। পথ চলতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে, তবু মুখে সদা হাসি। তাঁরও প্রচণ্ড উৎসাহ। কোন বাধাকে পরোয়াই করেন না। তাঁর উৎসাহেই এই বেপথের আমাদের অভিযান।

অজানা পথে এইভাবে নামতে নামতে হঠাৎ আমরা একটা রাস্তার উপর এসে পড়লাম। সেখান থেকে দেখা গেল বিমলেশ্বরজীর মন্দির। 'জয় বাবা বিমলেশ্বরজী কি জয়' বলে আমরা আনন্দে জয়ধ্বনি দিতে লাগলাম।

বিমলেশ্বর-মন্দিরে পৌঁছালে ওখানকার একজন গ্রামবাসী আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন: আপনারা খাড়া পাহাড় থেকে সোজা নেমে পড়লেন যে! রাস্তা ভুল করে কি এভাবে এলেন? উত্তরে আমরা বললাম: না, এমনি। অজানা পথে চলতে ভাল লাগে, তাই এভাবে এলাম। তিনি আর কিছু বললেন না। শুধু আমাদের মুখের দিকে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। হয়তো ভাবলেন—বিপদসঙ্কুল পথে চলতে ভাল লাগে—এতো বড় অদ্ভুত কথা!

মন্দিরে পৌঁছিয়ে আমাদের সঙ্গে-আনা গঙ্গা-জল, বেলপাতা, ধূপ দিয়ে বাবা বিমলেশ্বরজীকে পূজা ও প্রার্থনা করলাম। কিছু সময় পরে মন্দিরের বাইরে এলাম। মন্দির সংলগ্ন যজ্ঞবেদীর পাশে এক সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসী বসে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। 'ওঁ নমো নারায়ণায়' বলে আমরা তাঁকে নমস্কার করলাম। তিনিও প্রতি-নমস্কার করলেন। তিনি ঠাণ্ডা জল পান করালেন আমাদের। আমরাও পথশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ঠাণ্ডা জল পান করে পরিতৃপ্ত হলাম।

উত্তরকাশী সাধুসমাজের অধ্যক্ষ স্বামী অখণ্ডা-নন্দজীর কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম বিমলেশ্বর শিবজীর মন্দিরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে। অনেক-দিনের পুরানো। তবে কত বছর আগের তৈরি তা তিনি সঠিক জানেন না বলে আমাদের জানিয়েছিলেন। বিমলেশ্বরজীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি তাঁর নিজের জীবনের একটি ঘটনা আমাদের বলেছিলেন;

শিবচতুর্দশী উপলক্ষে বিমলেশ্বর শিবজীকে পূজা দিতে তিনি গিয়েছিলেন। সঙ্গে আরও বেশ কয়েকজন সন্ন্যাসিব্রহ্মচারী ছিলেন। পূজান্তে তাঁরা শিবমহিম্নঃস্তোত্র সমবেত কণ্ঠে পাঠ করছিলেন। এমন সময় শিবলিঙ্গের পাশ থেকে একটি বড় কালো সাপ বেরিয়ে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে। তাঁরা আবিষ্ট হয়ে স্তোত্র পাঠ করছিলেন, সাপের দিকে দৃষ্টি পড়লেও তাঁদের মনে কোন ভয়ের সঞ্চার হয়নি। পাঠশেষে সাপটি অদৃশ্য হয়ে যায়। তাঁদের মনে ভয়ের উদ্রেক হয়। তাঁদের ধারণা হয়, সাক্ষাৎ শিবজী শিবমহিম্নঃস্তোত্র শোনার জন্য সাপের রূপ ধরে বেরিয়ে এসেছিলেন।

প্রত্যেক বছর শিবচতুর্দশী উপলক্ষে এখানে বহু ভক্ত নরনারী পূজা দিতে আসেন। গ্রাম-বাসীদের বিশ্বাস বিমলেশ্বর শিবজী খুব জাগ্রত। তারা এই মন্দির খুব প্রাচীন বলে দাবী করে। মন্দিরটি বিভিন্ন সময়ে কোন কোন ধর্মপ্রাণ মহান্ ব্যক্তির দ্বারা সংস্কৃত হয়েছে।

যজ্ঞবেদীর কাছে উপবিষ্ট সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসীর নাম স্বামী অদ্বৈতানন্দ। তিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-সম্প্রদায়ের। বয়স মনে হল চল্লিশের মতো। গ্রামবাসীদের কাছে শুনলাম, তিনি ১৬ ডিসেম্বর পৌষসংক্রান্তির দিন কুটিয়ার ভিতর চলে যাবেন। অনেকদিন আর বাইরে বেরুবেন না। আরও শুনলাম, তিনি কয়েক মাস আগে একাদিক্রমে ২০ দিন একাসনে বসে কিছু না খেয়ে ধ্যানস্থ ছিলেন। গ্রামবাসীরা তাঁকে দেবতার মতো দেখে। তারা মন্দিরের সব কাজ-কর্ম করে দিয়ে যায়। তাঁর খাবার গ্রাম থেকে কুটিয়ায় বয়ে দিয়ে যায়। উত্তরকাশীর অনেক সাধু তাঁকে সম্ভ্রমের চোখে দেখেন, আবার কেউ কেউ বিরূপ কটাক্ষও করেন। যাই হোক, এই স্বল্পভাষী সৌম্যদর্শন মহাত্মাকে আমাদের ভাল লেগেছে।

আবার পাহাড়ী রাস্তা না ধরে বেপথে আমরা নেমে পড়লাম। অজানা পথ। 'সন্ন্যাসীর গীতি' থেকে আবৃত্তি করতে করতে চলতে লাগলাম। বিকেল হয়ে এল। সমতল দেখে এক জায়গায় আমরা পাঁচজনে বসে পড়লাম। পথপ্রদর্শক স্বামীজী কফি, বিস্কুট, বাদাম প্রভৃতি যেগুলি এতটা পথ বয়ে আনছিলেন, এবার সে-গুলির সদ্ব্যবহার করা হবে। তাঁর কাঁধের বোঝাটাও খালি হবে বলে তিনি নিশ্চয়ই মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। এতটা চড়াই-উতরাইয়ের পথ দশ কেজির মতো ভারী জিনিস বহন করা আরামদায়ক মোটেই নয়। যিনি বহন করেন তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারেন। স্থূলকায় সাধুটি সন্ধ্যার পূর্বে পৌঁছানোর জন্য তাড়াতাড়ি আমাদের খেতে বলছিলেন। তাঁর ভয়—বাঘ-ভালুকের জঙ্গল! তার উপর আবার সেই বদমেজাজী ষাঁড়টি ঘুরে বেড়াচ্ছে! কখন যে কোথা থেকে আমাদের উপর চড়াও হবে তার ঠিক নেই। সদা সন্ত্রস্ত—চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি। কফি ও অন্যান্য জিনিস খাওয়ার জন্য আমাদের সময় দিলেন মাত্র পাঁচ মিনিট। কিছুতেই তার বেশি সময় দেবেন না। এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে বার কয়েক আবার তাড়াও দিলেন তাড়াতাড়ি খাওয়ার জন্য। আমাদের মধ্যে একজন তাঁকে একটু রাগাবার জন্য বললেন: আপনি ষাঁড়ের ভয়ে আমাদের তাড়াতাড়ি খেতে বলছেন। আপনার এত ভয়! তাড়াতাড়ি খেয়ে কি আরাম হয়? গলায় যে বিষম লাগবে। তিনি অমনি ধমক দিয়ে বললেন। বাঘ অথবা ষাঁড় এলে কে কোথায় চোঁচা দৌড়িয়ে পালিয়ে যাবে তার ঠিক নেই! এখন মুখে খুব বড় বড় সাহসের কথা বলছে! সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। সন্ধ্যার আগে আমাদের উত্তরকাশীতে ফিরতেই হবে। আমরা আর তাঁকে রাগাবার সাহস পেলাম না। সুবোধ বালকের মতো তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম। সন্ধ্যা হয়ে এলে বেপথে হাঁটা যাবে না। যদিও আমাদের কাছে টর্চলাইট আছে, তবু জঙ্গলের মধ্যে খাড়াই পাহাড় থেকে নামা অসম্ভব।

আমরা দ্রুত খাড়াই থেকে নামার চেষ্টা করলাম। ফলে স্থূলকায় মহাত্মাজী কয়েকবার পড়ে গেলেন। কোনরকমে লাঠি আর পাহাড়-গায়ের ঘাস ধরে নিচে গড়িয়ে পড়ার হাত থেকে বেঁচে গেলেন। একবার পড়লে কয়েক শত ফিট নিচে। হাড়-গোড় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।

খুব কষ্টে উত্তরকাশীতে আমরা সন্ধ্যা ৫॥টার মধ্যে পৌঁছে গেলাম। সারাদিনের হাঁটা-হাঁটিতে আমাদের খুব খিধে পেয়েছে। এই সময় ভিক্ষে কোথায় পাওয়া যাবে? সত্রে সকালে ভিক্ষা দেয়। এখন কি করা যায়—ভাবছি আমি আর ব্রজেশানন্দ। এই চিন্তা বেশিক্ষণ আমাদের উদ্বিগ্ন করেনি। অভিজ্ঞ দুই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বিমলেশ্বরে যাওয়ার আগে থাকতে সব ব্যবস্থা করে গেছেন। বৃদ্ধ শুভ্রকেশী সন্ন্যাসী রান্নায় খুব সুদক্ষ। কুটিয়াতে এসেই তিনি খিঁচুড়ি চাপিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে খিঁচুড়ি রান্না হয়ে গেল। সারাদিনের হাঁটায় পেটে প্রচণ্ড খিধে, বাইরে ঠাণ্ডা পড়ছে। এই সময়ে গরম গরম খিঁচুড়ি খেতে দারুণ লাগছিল। খাওয়ার পর প্রফুল্লচিত্তে ব্রজেশানন্দ ও আমি দুজনে আমাদের কুটিয়ায় ফিরে এলাম।

রাস্তায় স্মরণ করতে করতে আসছিলাম আজকের তীর্থযাত্রার কথা। মনের আনন্দে পথে চলেছি। সহসা চিন্তাধারার ছেদ পড়ল। সাধু-মহাত্মাদেরই স্থান উত্তরকাশীতে বর্তমান জগতের আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। এই আধুনিকতার সংস্পর্শে এসে পাহাড়ী গ্রামের সহজ সরল মানুষগুলির মনও দ্রুত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। আধুনিকতার সঙ্গে কি সহজ-সরলতার সহাবস্থান কখনও হতে পারে না?

মনে মনে

শ্রীশীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আনন্দ-পুরস্কারে সম্মানিত যশস্বী লেখক। 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকায় সংবদ্ধ খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক, গল্পকার, সাংবাদিক। কিশোর সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সুপরিচিত।

আমার একাধিক বুদ্ধিজীবী বন্ধু ভূতে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু তাঁদের বিলক্ষণ ভূতের ভয় আছে। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন, কিন্তু অলৌকিক কিছু দেখাতে পারলে ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করতে রাজি আছেন, এঁরা অনেকেই জ্যোতিষশাস্ত্রের বিরুদ্ধে, কিন্তু নিজের কোষ্ঠীর ছকটি এঁদের মুখস্থ। বুদ্ধিজীবীদের কথা বাদ দিচ্ছি, সাধারণ মানুষের কথাই ধরা যাক। আজকের দুনিয়ায় অধিকাংশ সাধারণ মানুষই এই মানা না-মানার আলো-আঁধারেতে বাস করেন। কোন্‌টা কুসংস্কার, কোন্‌টা ধর্ম, কোন্‌টা পাপ, কোন্‌টা পুণ্য, কোন্‌টা অলৌকিক আর কোন্‌টা ঈশ্বরপ্রেম সে বিষয়ে তাঁদের ধাঁধা এবং বিভ্রান্তি বেশ প্রকট।

যাঁরা নাস্তিক তাঁরাও নমস্য! এঁরা জ্ঞানের কথা বলেন, জ্ঞানীর ভান করেন। কিন্তু কথা হল, জ্ঞানী হওয়া কি সোজা? ঈশ্বর শুধু বাইরে নেই, অন্তরেও—একথাটা যিনি বলবেন তাঁকে তো দুনিয়া হাঁটকে-মাটকে, সৃষ্টিরহস্য ভেদ করে সব কিছু জানার পর বলতে হবে, আমি সব জানি, সব দেখেছি, তারপর বলছি যে, ঈশ্বর আমাতেই, এখানেই—সর্বত্র সকলের মধ্যে, ভালতে মন্দতে। প্রকৃত জ্ঞানীকে সর্বজ্ঞ হতেই হবে, হতেই হবে ত্রিকালদর্শী। প্রকৃত জ্ঞানী তাই প্রকৃতই প্রণম্য, তাঁদের কোন সমস্যা নেই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তাঁদের নিয়ে, যাঁরা নিজেরাই সহস্র সমস্যায় জড়িয়ে—অথচ জ্ঞানীর মতো ভাব দেখিয়ে চলেন ফেরেন। এঁরা কিন্তু নিজেদের নাস্তিক ভেবে গর্বিত!

সমস্যা দ্বিধাদ্বন্দ্বগ্রস্ত মানুষকে নিয়ে, যাঁরা মুখে বলেন, এটা মানি না, ওটা স্বীকার করি না, তমুকটা কুসংস্কার। অথচ মুখে বললেও ভিতরে ভিতরে তাঁদের একটা ভয়, অস্বস্তি, মানার ইচ্ছা ও দুর্বলতা থেকেই যায়।

এছাড়া আর একদল আছেন যাঁরা আস্তিকও নন, নাস্তিকও নন, এঁরা অকৌতূহলী, প্রশ্নশূন্য, ঈশ্বর নিয়ে, ধর্ম নিয়ে, তাঁদের মাথা ব্যথা নেই, ঈশ্বর থাকতে পারেন, না থাকতেও পারেন, তাঁদের কোন কিছুতেই কিছু এসে যায় না।

এই সমাজেই আবার পাশাপাশি আর-এক প্রবণতা লক্ষ্য করি, সেটা গুরুবাদের ব্যবসা, গড বিজনেস। কিছু মানুষ হঠাৎ গায়ে গুরুর তকমা লাগিয়ে আবির্ভূত হন, নিজেদের ঈশ্বরপ্রতিম—ঈশ্বরপুত্র—স্বয়ং ঈশ্বর বলে ঘোষণা করেন এবং তা প্রমাণ করতে চটজলদি লেগে যান নানা অলৌকিক কাণ্ড প্রদর্শন করতে। এই নিয়ে লেগে যায় গুরু বা গডম্যানদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও। সাধারণ মানুষের ধারণা জন্মাতে থাকে যে, ধর্ম মানেই হচ্ছে অলৌকিক, অঘটন, ভুতুড়ে কাণ্ডমাণ্ড। এইসব প্রবণতা প্রকৃত ধর্মের পথ থেকে মানুষকে বহুদূর ভ্রষ্ট করে দেয়, মায়ামৃগের হাতছানি তাকে নিয়ে যায় নানা আঘাটায় নাকানি চোবানি খাওয়াতে।

কিছুকাল আগে অযোধ্যায় এক সাধুর আশ্রমে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। কয়েকজন বাঙালী শিষ্যের সঙ্গে আমি একই ঘরে অবস্থান করি। তাঁরা প্রায়ই গুরুর মহিমা কীর্তন করতেন। আমি মন দিয়ে শুনতাম এবং বুঝবার চেষ্টা

করতাম তাঁদের গুরুর জীবনদর্শন কী। কিন্তু তিনদিন ধরে তাঁরা যে আলোচনা করলেন তা সবই ছিল গুরুদেবের নানা অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড। কাকে কীভাবে তিনি কোন্ বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন তারই বিবরণ। গল্পগুলো আমি একটুও অবিশ্বাস করিনি, প্রকৃত সাধকদের মধ্যে কিছু ক্ষমতা জন্মায় একথা আমি জানি। কিন্তু সেই ক্ষমতার উপরে তাঁরা নির্ভর করেন না বা সেই ক্ষমতার ভিতর দিয়ে তাঁকে চেনা যায় না। প্রেম এবং জ্ঞানই সেই দুই মহা অলৌকিক যার ভিতর দিয়ে সাধুকে চিনতে হয়। ওই শিষ্য-কতিপয়ের সঙ্গে তিনদিন আলোচনার পরেও আমি যখন বুঝে উঠতে পারলাম না যে, তাঁদের গুরুদেবের প্রচারিত আদর্শ কী, তখন একদিন তাঁদের বললাম, আপনাদের গুরুদেব ক্ষমতাবান মানুষ, তিনি আপনাদের বিপদে আপদে সদা রক্ষা করেন এও বুঝলাম। এখন বলুন যিনি গুরু হয়েও শিষ্যদের এত সেবা করছেন তাঁর জন্য তাঁর শিষ্যরা কী করেছেন? তাঁর আদেশ বা উপদেশ আপনারা কতটা প্রতিপালন করেন? বলা বাহুল্য এসব প্রশ্নের সদুত্তর পাইনি। এঁদের উপাস্য দেবতা রামচন্দ্র, আশ্রমে রামসীতার বিগ্রহই পূজা হয়। আমি জানতে চেয়েছিলাম, আপনারা কি বর্ণাশ্রম মানেন? তাঁরা বললেন, না, আমরা ওসব মানি না। অসবর্ণ বিয়ে? তাঁরা জবাব দিলেন, ওতে ওঁদের কোনও বাধা নেই। তখন আমি বললাম, আপনারা যাঁর উপাসক সেই রামচন্দ্র কিন্তু বর্ণাশ্রম মানতেন। ভক্ত শম্বুক বর্ণাশ্রম ভেঙেছিলেন বলে রামচন্দ্র তাঁকে হত্যা করতে দ্বিধা করেননি। তাহলে আপনারা মানেন না কেন? এ প্রশ্নেরও সদুত্তর মেলেনি।

আসলে এখানেও সেই দ্বিধা, সেই আলো-আঁধারি, শুধু সাধারণ মানুষকে দোষ দিয়ে কী হবে? এই দ্বিধার দোলাবলে আমাদের গোটা রাষ্ট্রযন্ত্র এবং প্রশাসনও দোদুল্যমান নয়? খবরের কাগজে প্রায়ই গণ-বিবাহের কথা পড়ি, সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে অসবর্ণ বিবাহের পাত্র-পাত্রীকে পুরস্কৃত করার ঘোষণা থাকে, পড়ে শঙ্কিত হই। এই রাষ্ট্রনেতারাই তো কথায় কথায় গীতার বাণী স্মরণ করেন এবং গীতাকে অনুসরণ করার কথা বলেন; আশ্চর্য এই গীতায় স্বয়ং ভগবান যে চতুর্বর্ণ তাঁরই সৃষ্ট বলে ঘোষণা করেন এবং বর্ণ-সংকর সৃষ্টির বিরুদ্ধাচরণ করেন।

কালপ্রাচীন প্রথাপ্রকরণের মধ্যে অনেক ময়লা জমে উঠতেই পারে, কিন্তু তা বলে গোটা প্রথাটাকেই বর্জন বা পরিহার এক হঠকারী অবিমৃষ্যকারিতা। কারণ ওই প্রথার সৃষ্টি যে মৌলিক শ্রেণীবিভাগের উপর তা উৎখাত করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। গোটা প্রকৃতির মধ্যেই প্রকট রয়েছে ওই শ্রেণীবিভাগ, শ্রেণীবৈশিষ্ট্য এবং তাদের বিভিন্ন উপযোগ। গুণ এবং কর্ম অনুসারে মানুষের মধ্যে যে শ্রেণীবিভাজন হয়েছিল তার মধ্যে অবৈজ্ঞানিক কিছু নেই। বরং সেটিকে জোর করে উড়িয়ে দিয়ে "মানুষ সব সমান" গোছের ফতোয়া জারি করাটাই অবৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিবিরোধী। তবে বর্ণাশ্রমকে কেন্দ্র করে যে স্বার্থের লড়াই বা মানুষকে অবদমিত রাখার চক্রান্ত ও প্রয়াস বড় হয়ে উঠেছিল সেই ময়লাটুকুর অপসারণ বড় দরকার। আর সেই জরুরী কাজটুকু হয়নি বলেই এখনও ভারতবর্ষে ধর্ম নিয়ে, শ্রেণীভেদ নিয়ে, ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে এত বাদ-বিবাদ, এত দাঙ্গা ও নরমেধ। বামুন কায়েত শূদ্রে বিয়ে দিলেই কি সব চুকে যাবে? না কি সবাইকে পঙ্‌ক্তিভোজনে বসিয়ে দিলেই জাতপাতের গোঁড়ামির অবসান ঘটবে? আমাদের সরকারের বা প্রশাসনের কাছে ব্যাপারটা বোধ হয় তত স্বচ্ছ নয়।

ধর্মের গোড়ার কথায় একজন ব্যক্তি-ঈশ্বর নন, —সকল জীবের আত্মা পরম ঈশ্বর—অস্তি-ভাতি প্রিয়ই সেখানে মুখ্য। ঈশ্বরকে বুঝি বা না বুঝি, আমরা যে আছি, এটা বুঝি সবাই—এবং এই বুঝা বা জানাটা সকলেরই প্রিয়। এই অস্তিত্ব, অস্তিত্ববোধ এবং আনন্দময় অস্তিত্ব—এটাই তো আমাদের সকলেরই কাম্য। বৃদ্ধি, উন্নতি আমরা চাই—ওই অস্তিত্বের, বোধের ও আনন্দের। আর সেই বৃদ্ধিকে অবাধ করতে গেলে যে-আচরণ অবশ্যপালনীয়, তাকেই বলি ধর্ম।

একা তো কেউ বাঁচে না, তার বাঁচার উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে তার পারিপার্শ্বিক থেকে, সমাজ বা রাষ্ট্রের বাতাবরণের ভিতর থেকে। পারিপার্শ্বিক না বাঁচলে মানুষই বা বাঁচবে কিসের নির্ভরতায়? তাই নিজের স্বার্থেই মানুষকে ওই পারিপার্শ্বিকের সেবা করতে হয়। সেই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে মানুষ, গাছপালা, জীবজন্তু সব কিছুই আছে। আর জীবসেবা তাই হয়ে ওঠে শিবসেবা, সেটাই শ্রেষ্ঠ ধর্মলক্ষণ। শুধু পরের উপকার করাই তো নয়, তাতে যে নিজেরই উপকার। পাড়ার ছোঁড়াগুলো আড্ডাবাজ, খারাপ কথা বলে, নানা কু-অভ্যাসের দাস আর তাদের সঙ্গে মিশে আমার ছেলেটাও গোল্লায় যাবে—এই আশঙ্কায় কোনও পিতা যদি নিজ পুত্রকে রক্ষা করতে ওই পাড়ার ছেলেদেরও সৎপথে ফেরানোর চেষ্টা করেন, তবে সেটা ধর্মও হল, কর্মও হল, আর এই নেশা যদি একবার পেয়ে বসে, তবে মানুষ ক্রমে ক্রমে বৃহৎ জগৎ-সংসারের চিন্তায় অগ্রসর হতে থাকে। বাণপ্রস্থ বা ব্রহ্মভাবনা যাই বলি না কেন দুইয়েরই অর্থ বৃহৎ বা বিস্তারের দিকে যাওয়া। নিজের চতুষ্পার্শ্বের সমাজ সংসারের ভালর জন্য কিছু না করে কখনই ওই বৃহতের দিকে যাওয়া যায় না।

কিন্তু সে অনেক বড় কথা। ছোটো কথায় বলি, ধর্ম হল ভালবাসা। ভালবাসা কথার অর্থ যাকে ভালবাসি তার ভালতে বাস করি। ছোট্ট কথা বটে, কিন্তু তলিয়ে ভাবলে মাথা ঘুরে যায়। আজকাল তো দেখি স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে ভুলভাবে ভালবাসছে। সংসারে শান্তি নেই তাই, মা-বাবা যে ভালবাসছে পুত্র-কন্যাকে তার মধ্যে থেকে যাচ্ছে কত ভুল। মা-বাপের সঙ্গে ছেলেমেয়ের বাড়ছে প্রজন্মগত ব্যবধান। বন্ধুতে বন্ধুতে ভালবাসাবাসি? তাই আর সেরকম টিকে থাকছে কই? আস্তে আস্তে বুঝি ভালবাসাটাও উবে যাচ্ছে দুনিয়া থেকে।

তাই মাঝে মাঝে মনে হয়, ভাত-কাপড় নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান নয়, টাকা-পয়সা নয়, বিংশ শতাব্দীর মানুষ দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে ওই একটা জিনিসেই, ভালবাসা।

ঠাকুর আমাদের রক্ষা করুন।

প্রথমে অজ্ঞান এবং যাহা কিছু মিথ্যা তাহা ত্যাগ করিতে হইবে, তবেই সত্যের প্রকাশ হইবে। যখন আমরা সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধরিতে পারিব, তখন প্রথমে আমরা যাহা কিছু ত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহাই আর একরূপ ধারণ করিবে, নূতন আকারে প্রতিভাত হইবে, তখন সবই—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই—ব্রহ্মময় হইয়া যাইবে, তখন সবই উন্নত ভাব ধারণ করিবে, তখন আমরা সকল পদার্থকে নূতন আলোকে বুঝিব।

—স্বামী বিবেকানন্দ

আণ্টার্কটিকা অভিযান

ডক্টর সুদীপ্তা সেনগুপ্ত

প্রখ্যাত ভূতাত্ত্বিক, প্রথম বাঙালী তথা অন্যতরা ভারতীয় মহিলা যিনি সম্প্রতি পৃথিবীর তলদেশে হিমময়ী দুর্জ্ঞেয় কুমেরুতে ভারতীয় অভিযানে অংশ নিয়েছেন। পর্বতাভিযানেও খ্যাতকীর্তি—হিমালয়ের 'রটি' প্রভৃতি অভিযানে সফল যাত্রী। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে 'ললনা' অভিযানের সহনেত্রী—হিমালয়ের এক অজেয় অনামী শৃঙ্গ (২০,১০০ ফিট) জয়ের গৌরব অর্জনকারিণী। লণ্ডনের ইম্পিরিয়েল কলেজে রয়েল কমিশনের প্রাক্তন ফেলো। সুইডেনের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপিকা। স্কটিশ হাইল্যাণ্ড, স্পেন, সুইডেন ও নরওয়ের আর্কটিক অঞ্চলে ভূতত্ত্বের গবেষিকা। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়াতে প্রাক্তন বিজ্ঞানী। বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব-বিভাগে অধ্যাপিকা। সাহিত্য, সঙ্গীত ও চারুশিল্পে সুকুশলা—বিশিষ্ট লেখিকা।

পৃথিবীর একেবারে দক্ষিণ কোণায় যে এক বিশাল মহাদেশ লুকিয়ে আছে সেকথা গ্রীকেরা কল্পনা করেছিলেন দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমির যুগেই। এই মহাদেশের নাম দিয়েছিলেন তাঁরা আণ্টার্কটিকোস—যার অর্থ হল সপ্তর্ষিমণ্ডলের বিপরীতে। দক্ষিণের এই মহাদেশ থেকে উত্তর আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখা যাবে না বলেই এই নামকরণ। তারপর বহু শতাব্দী কেটে গেছে এই মহাদেশকে জানতে। দুঃসাহসী নাবিক ক্যাপটেন জেমস কুক ১৭৭২ থেকে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ এই মহাদেশ আবিষ্কারের আশায় বরফ-জমা দক্ষিণ সমুদ্রে অভিযান চালিয়েছেন। কিন্তু প্যাক্ আইসের দুস্তর বাধা ভেদ করে আণ্টার্কটিকাতে পৌঁছতে পারেননি। তবে আণ্টার্কটিকা মহাদেশ পরিক্রমা করে তিনি প্রমাণ করলেন যে, যদি কোন মহাদেশ থেকেও থাকে দক্ষিণ মেরুতে তার সঙ্গে উত্তরের ভূখণ্ডের কোন যোগ নেই। তিনিই প্রথম কুমেরু বৃত্ত অতিক্রম করেছিলেন।

জেমস কুক দক্ষিণ সমুদ্রে তিমি আর সীলের প্রাচুর্যের কথাও উল্লেখ করেছিলেন; ফলে ইওরোপ ও আমেরিকা থেকে দলে দলে তিমি-শিকারীর দল পাড়ি জমাল দক্ষিণ সমুদ্রে। এমনই এক তিমি-শিকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাথানিয়েল পামার ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে দাবী জানান যে, তিনি মূল মহাদেশ আবিষ্কার করেছেন। একই খ্রীষ্টাব্দে রুশ অভিযাত্রী ভন বেলিংসহাওসেন ও ব্রিটিশ অভিযাত্রী জন ব্র্যান্সফিল্ড একই দাবী জানান। আজ সঠিক জানা মুশকিল তাঁরা সত্যিই মূল ভূখণ্ড দেখেছিলেন, অথবা বরফে ঢাকা কোন দ্বীপের অংশকেই মূল মহাদেশ ভেবে ভুল করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দী থেকেই শুরু হল একের পর এক অভিযান। এই সময় বেশ কয়েকটি অভিযান হয় আণ্টার্কটিকাতে। তবে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযানগুলি পরিচালিত হয় এই দুর্গম মহাদেশে। ধীরে ধীরে এই মহাদেশের নানান অংশ আবিষ্কৃত হল—বহু মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্য সংকলিত হল। পালতোলা জাহাজে চেপে এই দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা যে মূল্যবান তথ্য আহরণ করেছেন, নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করেও, তার মূল্য আজও আণ্টার্কটিকা অভিযানের ইতিহাসে অনন্ত। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার এই অংশকে তাই বলা হয় আণ্টার্কটিকা অভিযানের 'হিরোয়িক পিরিয়ড'। স্কটের ডিসকভারি ও টেরানোভা অভিযান, আমুণ্ডসেনের ফ্রামহাইম অভিযান, শ্যাকলটনের নিমরোড

এপারে বরাহনগর ওপারে বেলুড়। বর্ষাকাল। সবে বৃষ্টি হয়ে গেছে। গঙ্গায় গেরুয়া জল। বরাহনগরের ঘাটে বসে আঁকা। সিল্কের ওপর জলরঙের ওয়াশ। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসু যে ধারার প্রবর্তক, সেই ধারায় অঙ্কিত 'বর্ষণস্নাত বেলুড় মঠ'।

আণ্টার্কটিকার 'দক্ষিণ গঙ্গোত্রী'-তে ভারতীয় স্থায়ী গবেষণা-কেন্দ্র
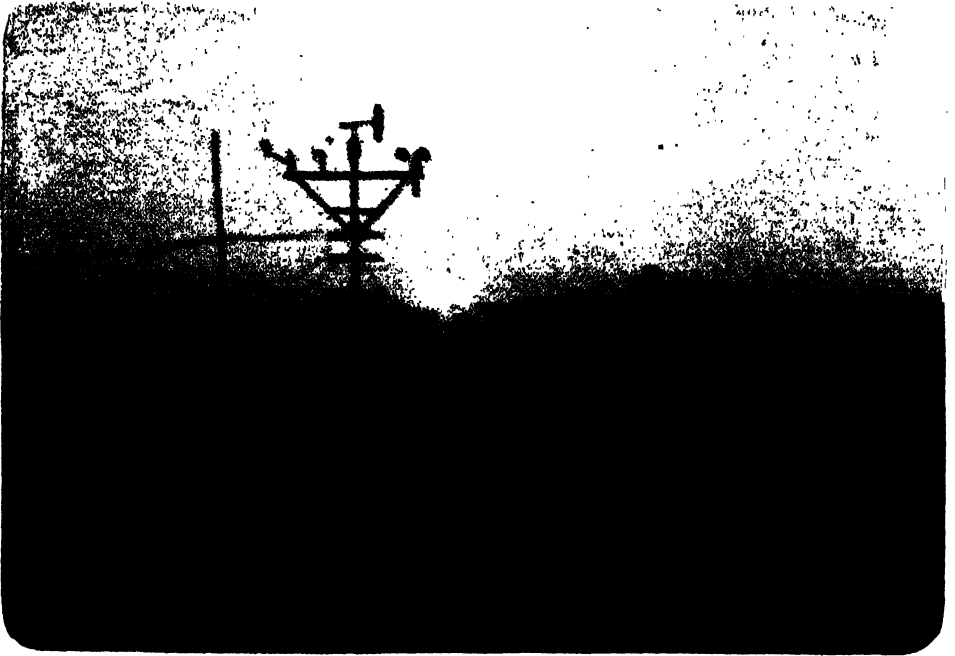
আণ্টার্কটিকায় সূর্যাস্ত

আলোকচিত্রী : সুদীপ্তা সেনগুপ্ত

ও অরোরা অভিযান এই সময়েই হয়েছে। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর আমুণ্ডসেন দক্ষিণ মেরুতে ওড়ালেন নরওয়ের জয়পতাকা। স্কট একমাস পরে পেঁছিলেন সেখানে তাঁর চারজন সঙ্গী নিয়ে। আমুণ্ডসেন সুস্থদেহে সদলবলে ফিরে এসেছেন কিন্তু স্কট ও তাঁর সঙ্গীদের প্রাণ দিতে হয়েছিল প্রতিকূল প্রকৃতির কাছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আণ্টার্কটিকা অভিযানের রূপও পালটাতে লাগল। এরোপ্লেন, হেলিকপ্টার, আইসব্রেকার জাহাজ, স্নোট্রাক্টর আর নানান রকম আধুনিক যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হতে লাগল প্রতিকূল প্রকৃতিকে জয় করার জন্য। একটি দুটি উৎসাহী ব্যক্তির পরিবর্তে সরকারী ব্যবস্থাপনায় অভিযান পরিচালনা হতে শুরু হল। ১৯৫৭—৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ বছরে আণ্টার্কটিকাতে বিশদ সমীক্ষা করার কর্মসূচী নিয়ে বারোটি দেশ সেখানে স্থায়ী গবেষণাগার স্থাপন করল। এই সম্মিলিত গবেষণার ফল এত ভাল পাওয়া গেল যে, আণ্টার্কটিকাকে বিজ্ঞানের মহাদেশ বলে চিহ্নিত করে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটনে আণ্টার্কটিকা চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তির বলে আণ্টার্কটিকাতে কোন দেশের মালিকানা গ্রাহ্য করা হবে না, এই মহাদেশে কেবল বৈজ্ঞানিক গবেষণাই চলবে, কোনরকম মিলিটারি কার্যকলাপ চলবে না, আণ্টার্কটিকার প্রাণী ও পরিবেশের কোন ক্ষতি হয় এমন কিছু করা সেখানে বারণ। আর্জেণ্টিনা, চিলি, ব্রিটেন, নরওয়ে, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জাপান, সাউথ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল মূল স্বাক্ষরকারী। ক্রমে ক্রমে এই চুক্তিতে যোগ দিয়েছে পোল্যাণ্ড, স্পেন, পূর্ব জার্মানি, ব্রেজিল, ভারত ও চীন।

ভারতবর্ষ আণ্টার্কটিকা গবেষণায় যোগ দেয় ১৯৮১—৮২ খ্রীষ্টাব্দে। ডক্টর সৈয়দ জহুর কাশিমের পরিচালনায় প্রথম অভিযান হয়। ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জানুআরি আণ্টার্কটিকা মহাদেশে প্রোথিত হল ভারতীয় পতাকা। ১৯৮২—৮৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরায়নার নেতৃত্বে হল দ্বিতীয় অভিযান। এই অভিযানে ভারতীয় স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্র বানাবার প্রাথমিক সমীক্ষা চালানো হয়। ১৯৮৩—৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় অভিযান হয় ডক্টর হর্ষ গুপ্তার নেতৃত্বে। বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা ছাড়াও এই অভিযানের প্রধান দায়িত্ব ছিল একটি স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের। আর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সক্রিয় উৎসাহে দুজন মহিলা বিজ্ঞানীকেও অন্তর্ভুক্ত করা হল তৃতীয় অভিযাত্রী দলে। ন্যাশনাল ইন্‌স্টিট্যুট অফ ওশেনোগ্রাফির মেরিন বায়োলজিস্ট ডক্টর অদিতি পন্থ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি ভূতত্ত্ববিদ্ হিসাবে নির্বাচিত হলাম।

তৃতীয় অভিযান শুরু হল ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর গোয়ার মার্মাগাও বন্দর থেকে। দলে ছিল একাশীজন সদস্য। আর্মির কোর অফ ইঞ্জিনিয়র্স-এর আটত্রিশজন; তাঁদের দায়িত্ব স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্রটি বানানোর। নেভী ও এয়ারফোর্স থেকে এসেছে তেরজন করে সদস্য। তাদের দায়িত্ব কুমেরু অঞ্চলে হেলিকপ্টারের সাহায্যে অভিযাত্রী ও অভিযানের মালপত্র পেঁৗছে দেওয়া। বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন্য ছিলেন ষোলজন বিজ্ঞানী ও ডকুমেণ্টারি ফিল্ম তোলার জন্য একজন ক্যামেরাম্যান। ফিনল্যাণ্ড থেকে আইসব্রেকার জাহাজ ফিনপোলারিস ভাড়া করা হল। ভারতীয় সদস্য ছাড়া জাহাজের অফিসার ও কর্মী ছিলেন আটাশজন। ১০ ডিসেম্বর মরিশাস পেঁৗছই।

সেখানে চারদিন থাকা হয় কিছু খাদ্যসামগ্রী, খাবার জল ও কিছু যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করার জন্য। ১৪ ডিসেম্বর শুরু হয় আবার সমুদ্রযাত্রা। এবারে আণ্টার্কটিকাতেই পেঁাছে হল যাত্রা শেষ।

গর্জনশীল চল্লিশাতে খুব একটা ঝড়-জলের সম্মুখীন হতে হয়নি, কিন্তু তারপর থেকেই শুরু হল প্রবল ঝড়। পঞ্চাশ ও ষাট ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশ বরাবর বিশেষ কোন ভূখণ্ডের বাধা না থাকাতে এই অংশের সমুদ্র সদাই উত্তাল ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ। আমাদের জাহাজখানা পাঁচদিন ধরে সেই উত্তাল সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে প্রবেশ করল প্যাক আইসের সীমানায়। তখন সম্পূর্ণ অন্য দৃশ্য। যেদিকে দু-চোখ যায় কেবল ভাঙা বরফের রাশি। আণ্টার্কটিকাকে ঘিরে রয়েছে এই দক্ষিণ সমুদ্র—ভারত, প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরের দক্ষিণ অংশ। বছরের বেশির ভাগ সময়ই এই দক্ষিণ সমুদ্রের উপরিভাগ জমে বরফ হয়ে থাকে। এই সামুদ্রিক বরফ সাধারণত তিন-চার মিটার পুরু হয়। গ্রীষ্মকালে এর কিছুটা অংশ ভেঙে সমুদ্রের স্রোতের টানে উত্তরে চলে আসে। পরের শীতে আবার এই ভাঙা টুকরোগুলি নতুন করে জমে যায়। আণ্টার্কটিকাকে ঘিরে এই জমে যাওয়া ভাঙা সামুদ্রিক বরফের এক বলয় তৈরি হয়। এই অঞ্চলকেই বলা হয় প্যাক আইস। কুমেরু অঞ্চলে প্রবেশের প্রধান বাধাই হল এই প্যাক আইসের বেড়াজাল।

২৬ ডিসেম্বর আমরা এই বেড়াজাল ভেদ করে পরিষ্কার নীল জলে এসে পড়লাম। অদূরে অক্ষত সামুদ্রিক বরফ—ফাস্ট আইস। ২৭ ডিসেম্বর আমাদের জাহাজ সেই ফাস্ট আইসে গিয়েই নোঙর করল। সেখানকার তিন মিটার পুরু বরফ কাটার ক্ষমতা আমাদের ফিনপোলারিসের ছিল না। সেখান থেকে মূল হিমসোপান তিন কিলোমিটার দূরে। পৌছনো মাত্র ছুটে এল পেঙ্গুইনের দল। আণ্টার্কটিকা ছাড়া অন্য কোথাও এই পেঙ্গুইনদের দেখা যায় না। কুমেরু অঞ্চলের পাঁচটি প্রজাতির মধ্যে প্রধান হল অ্যাডেলি ও এম্পেরর পেঙ্গুইন। এম্পেরর পেঙ্গুইন আকারে বড়, লম্বায় প্রায় সাড়ে চার ফুট। অ্যাডেলিরা লম্বায় আড়াই ফুট মতন হয়। এদের প্রধান খাদ্য হল দক্ষিণ সমুদ্রের চিংড়ি মাছ—ক্রিল। আণ্টার্কটিকার অন্যান্য প্রাণী—যেমন সীল এবং তিমিদেরও প্রধান খাদ্য এই ক্রিল। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই ক্রিলই হয়তো ভবিষ্যতে পৃথিবীর খাদ্যসমস্যা সমাধান করবে। পেঙ্গুইন ছাড়া আণ্টার্কটিকাতে আরও দু-তিন ধরনের পাখি দেখা যায়। শিকারী পাখি স্কুয়া, যাকে বলা হয় আণ্টার্কটিকার বাজ, এদের মধ্যে প্রধান। পেঙ্গুইনের ডিম বা শিশু এবং ছোট পাখি পেট্রেলই এই শিকারী স্কুয়ার প্রধান খাদ্য। তবে আজকাল রিসার্চ স্টেশনের ধারেও এরা উড়ে বেড়ায় খাবারের লোভে।

আণ্টার্কটিকায় পৌছনোর দিন থেকেই শুরু হয়ে গেল কর্মব্যস্ততা। মূল শিবির ও স্থায়ী গবেষণা কেন্দ্রের স্থান নির্বাচন করে ফেলা হল প্রথম দিনেই। ২৮ ডিসেম্বর আটাশজন ইঞ্জিনিয়র ও জওয়ানদের একটি দল চলে গেল মূল শিবির স্থাপন করতে। স্নো ট্র্যাক্টরগুলিকে সামুদ্রিক বরফের উপর দিয়েই চালিয়ে নিয়ে মূল বরফ-ভূমিতে রেখে আসা হল। জওয়ানদের একটি দল ও বিজ্ঞানীদের উপর ভার দেওয়া হল অভিযানের মালপত্র ও বাড়ি তৈরি করার সরঞ্জাম হেলিকপ্টারে বোঝাই করার। আশা ছিল সাতদিনের মধ্যেই এই মাল খালাসের কাজ শেষ হয়ে যাবে। তারপর বিজ্ঞানীরা নিজের নিজের সমীক্ষা শুরু করতে পারবেন। কিন্তু তার আগেই ঘটে গেল দুর্ঘটনা।

সমস্ত মালপত্র পাঠানো হচ্ছিল হেলিকপ্টারের

তলায় নেটে ঝুলিয়ে। বড় হেলিকপ্টার প্রতাপ এভাবে আড়াই টন মাল বহন করতে পারে। এভাবে মাল পাঠানোর ফলে খুব তাড়াতাড়ি কাজ হতে লাগল। আমরা একবারের মাল পাঠিয়ে হেলিকপ্টার ফিরে আসার আগেই দ্বিতীয় দফার মাল তৈরি করে রাখতাম। মূল শিবিরে গিয়ে হেলিকপ্টার নেট নামিয়েই ফিরে আসত। পরের বার আবার মাল নামিয়ে আগের বারের নেট ফেরত নিয়ে আসত। ততক্ষণে মূল শিবিরে ওরাও মাল নামিয়ে নেট খালি করে রেখেছে। উনত্রিশ তারিখও এভাবেই মাল নিয়েছিল প্রতাপ হেলিকপ্টার। প্রথম দফায় মাল পৌঁছনোর পর আবার দ্বিতীয় দফায় মাল নিয়ে উড়বার সময় জাহাজের ক্রেনের দড়িতে হেলিকপ্টারের রোটর ব্লেড গিয়ে ধাক্কা খেল। মুহূর্তের মধ্যে হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ল হিমশীতল জলে। আমরা নিরুপায় দর্শকের মতো জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে দেখছি জানলা ভেঙে বেড়িয়ে আসবার চেষ্টা করছেন পাঁচজন আরোহী। নেভীর চেতক হেলিকপ্টার সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গিয়ে দড়িতে ঝুলিয়ে উদ্ধার করল একজনকে। বাকীদের রেসকিউ বোট নিয়ে উদ্ধার করা হল। হেলিকপ্টার ততক্ষণে তলিয়ে গেছে গভীর সমুদ্রে। এত ঠাণ্ডাজলে মানুষের পক্ষে আধঘণ্টার বেশি সময় বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আমাদের সৌভাগ্য পাঁচজনকেই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। একজনের চোট কিছুটা গুরুতর ছিল, তার সুস্থ হতে সপ্তাহ তিনেক লেগেছিল। বাকীরা কয়েকদিন বাদেই আবার কাজে যোগ দিয়েছিলেন।

চোদ্দ মিলিয়ন পঞ্চাশ হাজার বর্গ কিলোমিটার আয়তনের আণ্টার্কটিকা মহাদেশের শতকরা আটানব্বই ভাগই দু-তিন কিলোমিটার পুরু হিমবাহে ঢাকা। হিমবাহের গভীরতা কোন কোন জায়গায় সাড়ে চার কিলোমিটারেরও বেশি। এই মহাদেশীয় হিমবাহে সঞ্চিত আছে পৃথিবীর আটাত্তর শতাংশ মিষ্ট জলের ভাণ্ডার। বর্তমানে আণ্টার্কটিকা ছাড়া কেবলমাত্র গ্রীনল্যাণ্ডেই মহাদেশীয় হিমবাহ আছে। তবে তা আয়তনে আণ্টার্কটিকার তুষারক্ষেত্রের দশভাগের একভাগ। এই ২৯,০০০০০ ঘন কিলোমিটার বরফের চাপে আণ্টার্কটিকার ভূপৃষ্ঠ ৬০০ মিটার নিচে নেমে গেছে। যদি কোনদিন এই বরফ গলে যায় তবে সারা পৃথিবীর সমুদ্রপৃষ্ঠ ৬০ মিটার বেড়ে যাবে, অর্থাৎ সমস্ত বন্দর প্লাবিত হয়ে যাবে।

১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জানুআরি আমরা পাঁচজন বিজ্ঞানী শির্মাকার পাহাড়ের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। মূল শিবির স্থাপিত হয়েছে তীর থেকে ১৩ কিলোমিটার অভ্যন্তরে। আরও ৭০ কিলোমিটার ভিতরে এই শির্মাকার ওয়েসিস মাউণ্টেন রেঞ্জ অবস্থিত। ভারতীয়রা নাম দিয়েছেন দক্ষিণ গঙ্গোত্রী পর্বতমালা। চারিপাশের বরফের মধ্যে যখন ছোট একটি পর্বতশ্রেণী মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে তাকে বলা হয় ওয়েসিস মাউণ্টেন রেঞ্জ। এখানে যদি পাহাড়ের উচ্চতা হিমবাহের গভীরতা থেকে বেশি হয় তবেই তা বরফ ভেদ করে দৃশ্যমান হয়, ঠিক যেমন জলের মধ্যে মাথা তুলে থাকে দ্বীপ। শির্মাকার পাহাড়ের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা করাই আমাদের প্রধান কাজ। তিনজন ভূতত্ত্ববিদ—ডক্টর মদনলাল, রবীন্দ্র সিং ও আমি, জীববিজ্ঞানী প্রভু মাতোন্দকর ও ডক্টর অলক ব্যানার্জি, সেখানে তাঁবু করে একমাস থাকব। বাকীরা হয়তো দু-একদিন করে কাটিয়ে যাবেন, তবে তাঁদের প্রধান কাজ হয় মূল শিবিরে নয়, জাহাজে থেকেই।

ভূবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, প্রায় দু কোটি বছর আগে আণ্টার্কটিকা গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড নামে

এক বিশাল মহাদেশের অংশ ছিল। ক্রমে ক্রমে সেই বিশাল মহাদেশ ভেঙে তৈরি হয়েছে দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া আণ্টার্কটিকা ও ভারতবর্ষ। আণ্টার্কটিকার প্রাচীন যুগের পাথরের সঙ্গে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের অন্যান্য মহাদেশগুলির পাথরের খুবই সাদৃশ্য। আণ্টার্কটিকাতে পাওয়া গিয়েছে কয়লার স্তর এবং গ্লসপটেরিস পাতার ফসিল যার ফলে প্রমাণিত হয় সেখানে এককালে ছিল উষ্ণ নিরক্ষীয় আবহাওয়া।

আমরা শির্মাকার পাহাড়ের পঁয়ত্রিশ বর্গ কিলোমিটার এলাকার ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। একটি ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরি করা ছাড়াও নানান নমুনা সংগ্রহ করে এনেছি ভারতবর্ষে ফিরে গবেষণাগারে পরীক্ষা করার জন্য। আমরা সাধারণত সকাল নটায় কাজে বেরোতাম, ফিরতে রোজই রাত নটা হয়ে যেত। জানুআরি মাসের প্রথম দিকে সেখানে চব্বিশ ঘণ্টাই দিনের আলো। ২৩ জানুআরি প্রথম রাত হল আধঘণ্টার জন্য। তারপর থেকে ধীরে ধীরে রাতের পরিধি বাড়তে লাগল। আমরা যখন মার্চ মাসে আণ্টার্কটিকা থেকে রওনা দিলাম তখন সেখানে ঘণ্টা তিনেকের মতো রাত হত।

প্রায় মাসখানেক বাদে শির্মাকার রেঞ্জের ফিল্ডওআর্ক সমাপ্ত করে আমরা ফিরে এলাম বেস ক্যাম্পে। সেখানে হিমবাহ গবেষণার কিছু কাজ করা হবে। তখন ফেব্রুআরি মাসের মাঝামাঝি। তাপমাত্রা অনেক নিচে নেমে গেছে। জানুআরি মাসের গড় তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ফেব্রুআরি মাসে প্রায়ই মাইনাস ২০ পর্যন্ত নামত। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সেই সময় তুষার-ঝড়ও অনেক বেশি হতে লাগল। জানুআরি মাসে ব্লিজার্ডের সংখ্যা ছিল মাত্র দুই। ফেব্রুআরি মাসে তিন-চারদিন পর পরই প্রবল ব্লিজার্ড শুরু হয়ে যেত, আর সেই ঝড় চলত পাঁচ-ছয়দিন ধরে। তবে সৌভাগ্যের কথা, তখন আমাদের গবেষণাকেন্দ্রের বাইরের কাঠামো সম্পূর্ণ। ভিতরের কাজ ব্লিজার্ড হলেও চলতে থাকে।

২৪ ফেব্রুআরি ভারতের স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্র "দক্ষিণ গঙ্গোত্রী"-র উদ্বোধন হল। ভারতীয় পতাকার নিচে সব ধর্মের উপাসনা করার পর দলনেতা ডক্টর হর্ষ গুপ্তা শীতের অধিনায়ক কর্নেল সত্যস্বরূপ শর্মার হাতে বাড়ির ভার অর্পণ করলেন। ভারতীয় ইঞ্জিনিয়র ও জওয়ানদের অসীম অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতায়ই এই দুঃসাধ্য কাজ সম্পূর্ণ হল মাত্র দু-মাসে। গর্বের কথা এই যে, এখন পর্যন্ত আর কোন দেশ মাত্র দু-মাসে আণ্টার্কটিকাতে একটি স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্র সম্পূর্ণ করতে পারেনি। দোতলা এই বাড়িটি দু-ভাগে ভাগ করা। একদিকে আছে গবেষণাগার, সার্জারি ও মেডিকাল রুম, লাউঞ্জ, লণ্ড্রি, রান্নাঘর, স্নো মেলটিং প্লাণ্ট ও বয়লার রুম। এই দিকের দোতলাতে আছে কমিউনিকেশন রুম, অফিস ঘর, ডার্করুম, শোবার ঘর, শাওয়ার এবং টয়লেট। অন্য ব্লকে আছে জেনারেটর রুম, নানা ধরনের ওআর্কশপ, জ্বালানী রাখার এক বিশাল ট্যাঙ্ক এবং গ্যারাজ। তার দোতলায় আছে স্টোর। সারা বছরের রসদ সেখানে জমা করা আছে। সারা বছরের জ্বালানী তেল রাখা হয়েছে বাড়ি থেকে আধ কিলোমিটার দূরের ফুয়েল ডাম্পে। সপ্তাহে একদিন সেখান থেকে ড্রাম এনে বাড়ির ট্যাঙ্কে ভর্তি করে রাখতে হবে। বাড়িটি সম্পূর্ণ তাপনিয়ন্ত্রিত। ভিতরের তাপমাত্রা আরামদায়ক পনেরো ডিগ্রী সেলসিয়াস।

পেঙ্গুইন—আণ্টার্কটিকার খোদ অধিবাসী।

'দক্ষিণ গঙ্গোত্রী' পর্বতমালা—শির্মাকার রেঞ্জ।

আলোকচিত্রী ঃ সুদীপ্তা সেনগুপ্ত

প্যাক আইসের বাধা ভেদ করে ফিনপোলারিস এগিয়ে চলেছে। দিগন্তে হিমশৈল।
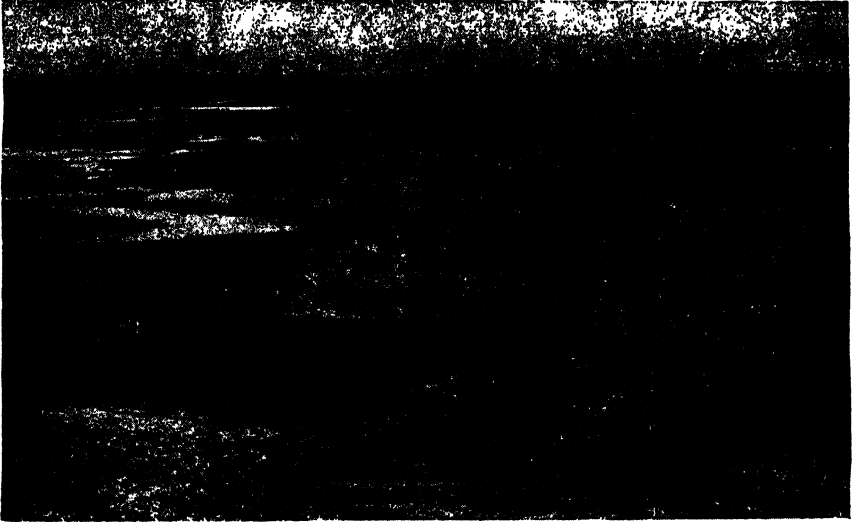
বরফ-জমা সমুদ্র।

আলোকচিত্রী : সুদীপ্তা সেনগুপ্ত

এছাড়া বাড়ির ঠিক মধ্যিখানে বসানো হয়েছে একটি গম্বুজ। এটির সাহায্যে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব। এখান থেকে পৃথিবীর যে-কোন জায়গায় টেলিফোন করা যায়, টেলেক্স পাঠানো যায়।

উদ্বোধনের পরদিন থেকেই শুরু হয়ে গেল প্রবল তুষার-ঝড়। এবারের ঝড়ের দাপট সব-চেয়ে বেশি; ঘণ্টায় দুশো কিলোমিটার বেগে হাওয়া চলছে, তাপমাত্রা মাইনাস ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং দৃশ্যমানতা শূন্য; তবে এবারে আমরা আর তাঁবুর মধ্যে বন্দী নেই, আমরা সবাই উঠে এসেছি নতুন গবেষণাকেন্দ্রের নিরাপদ আশ্রয়ে। ইঞ্জিনিয়রদের সুবিধেই হল যে, ফেরবার আগে ঝড়ের মুখে বাড়ির খুঁটিনাটি ব্যবস্থা কেমন-ভাবে কাজ করে সে-সম্বন্ধে আন্দাজ পাওয়া গেল, যাতে দরকার মতো ডিজাইনের অদলবদল করা যায়। আর কিছুদিন বাদেই বারোজন বাদে আমরা সবাই ফিরে আসব ভারতবর্ষে। শীতের দলের এই বারোজনকে এই বাড়িতে থেকেই কুমেরুর দীর্ঘ শীতের রাত্রির মোকাবেলা করতে হবে।

ঝড় আসল ২৮ ফেব্রুআরি। ততদিনে বাড়ির সামনে ঝড়ে উড়ে আসা বরফ জমে দোতলা পর্যন্ত পেঁাছে গেছে। একতলার মূল দরজা দিয়ে বেরোনো অসম্ভব। আমরা দোতলার ইমার্জেন্সী দরজা দিয়ে সোজা বাইরে বেরিয়ে এলাম। বাইরে তখন ঝকঝকে সূর্যের আলো। আমাদের বরফে চলার গাড়ির প্রায় সবটাই ডুবে গেছে বরফে, বাড়ির চারপাশেও তখন একতলা সমান উঁচু বরফের রাশি। কুমেরুর বরফ একেবারে শক্ত জমাট বাঁধা। সেই বরফ পরিষ্কার করা বিশেষ সহজ কাজ নয়। দুটো গাড়িকে উদ্ধার করতে লেগে গেল প্রায় চার ঘণ্টা। প্রায় বিকেল চারটের সময় শীতের দলকে বিদায় দিয়ে আমরা বাকীরা ফিরে এলাম জাহাজে।

জাহাজ তখন মূল হিমসোপানে নোঙর করা। সামুদ্রিক বরফ সবই ভেঙে চলে গেছে। তবে আরও একটি শীত আসছে; তাই সমুদ্র আবার নতুন করে জমতে শুরু করেছে। সমুদ্র জমে যাওয়ার আগেই আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে কুমেরু অঞ্চলের বাইরে।

১ মার্চ দুপুর তিনটেতে আমাদের যাত্রা হল ঘরের দিকে। তার আগে শীতের দল এসেছিল আমাদের বিদায় জানাতে, তাদের আর-একটি বছর কাটাতে হবে এই হিমশীতল মহাদেশে। দীর্ঘ অন্ধকার রাত্রিযাপনের পর আবার সূর্য উদয় হলে পরের গ্রীষ্মে চতুর্থ অভিযান তাঁদের ফিরিয়ে আনতে আসবে, তখন আবার নতুন দল থেকে যাবে তাঁদের জায়গায়। দক্ষিণের এই হিমভূমিতে স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্র দক্ষিণ গঙ্গোত্রীতে এইভাবেই চলবে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের গবেষণা। বরফের পাড়ে দাঁড়ানো কয়েকটি মানুষকে শুভকামনা জানিয়ে তাঁদের ও আণ্টার্কটিকাকে বিদায় জানালো বাকী সদস্যরা। ধীরে ধীরে ফিনপোলারিস এগিয়ে চলল উত্তরে। যাত্রা শেষ হল গোয়ার মার্মাগাও বন্দরে ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ মার্চ দুপুর বারোটায়।

তিনদিন পরে ফিরে এলাম কলকাতায়। আবার শুরু হয়ে গেল গতানুগতিক জীবন; তবে সঞ্চিত রইল অমূল্য কয়েকটি দিনের অপূর্ব অভিজ্ঞতা।

ভক্ত ভবনাথ

শ্রীজ্যোতির্ময় বসু রায়

আনন্দবাজার পত্রিকার ভূতপূর্ব সাংবাদিক—সুপরিচিত লেখক ও সাহিত্য-সমালোচক—বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে সংশ্লিষ্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর গৃহী-ভক্তদের মধ্যে ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়কে সুস্পষ্টভাবে ঈশ্বরকোটি রূপে চিহ্নিত করেছেন। এ-বিষয়ে তাঁর নির্দেশ সম-সময়ে লিপিবদ্ধ। নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল—এই তিনটি নাম একসঙ্গে উচ্চারণ করে তিনি বলেছেন: '...এরা সব নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি। এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ।' (কথামৃত, ১।৭।৬)। ভবনাথের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর সাক্ষাৎ নারায়ণকে দর্শন করতেন। (কথামৃত, ২।২।১)। কথামৃতকার শ্রীম তাঁর স্বগত-চিন্তায় বলছেন: '[ঠাকুর] বলেন, এরা [নরেন্দ্র, নারায়ণ] ও অন্যান্য ছেলেরা—রাখাল, ভবনাথ, পূর্ণ, বাবুরাম; ইত্যাদি—সাক্ষাৎ নারায়ণ, আমার জন্য দেহধারণ করে এসেছে!' (কথামৃত, ১।১৬।১০)।
শ্রেষ্ঠ বলরাম বসুকে তিনি নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ প্রভৃতিকে খাওয়াতে বলতেন। বলতেন: 'এদের খাইও, তাহলে অনেক সাধুকে খাওয়ানো হবে।' (কথামৃত, ৪।৩।১)

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একান্ত প্রিয়, উচ্চকোটির এই ভক্ত ভবনাথের কিছু পরিচয় কথামৃত গ্রন্থে আছে। এছাড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের অন্যান্য গ্রন্থে এবং আরও এক বা একাধিক অন্য বইয়ে এবং কিছু পত্র-পত্রিকায় ভবনাথের উল্লেখ পাওয়া যায়; তাঁর জীবন সম্পর্কে কিঞ্চিৎ তথ্যও। ভবনাথের জীবৎকাল মোটামুটি বত্রিশ কিংবা তেত্রিশ বছর ধরা যেতে পারে। এই স্বল্পস্থায়ী জীবনের পূর্ণ বৃত্তান্ত বোধ হয় কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। ভবনাথ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত পাঠক-দের চিত্তে অনেক জিজ্ঞাসা—যা সম্যক পূর্ণ করা আজ অত্যন্ত কঠিন। যাই হোক, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সামান্য তথ্য-উপাদানের সাহায্যে তাঁর জীবনচরিতের মোটামুটি একটি কাঠামো নির্মাণের চেষ্টা করা যেতে পারে। কোনও গবেষক অদূর ভবিষ্যতে এই প্রয়াসের অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি দূর করে দেবেন, এই আশায় আমরা বর্তমান কর্মে ব্রতী হয়েছি।

দক্ষিণেশ্বরের নিকটে বরাহনগর বা বরানগরের কলুপাড়ায় [বর্তমান অতুলকৃষ্ণ ব্যানার্জি লেনে] ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম—সম্ভবত ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে। পিতা রামদাস চট্টোপাধ্যায়, জননী ইচ্ছাময়ী দেবী (কালীজীবন দেবশর্মা-সংকলিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-অভিধান', ১৩৮৯, পৃঃ ২৩৪)। ভবনাথের জন্মকাল নির্ধারণে শ্রীম-র একটি বিবরণ সহায়ক। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ মার্চ তারিখের দিনলিপিতে ভবনাথের বর্ণনায় তিনি বলছেন: 'ভবনাথ এখনও সংসারে প্রবেশ করেন নাই। বয়স ১৯।২০, গৌরবর্ণ, সুন্দর দেহ।' (কথামৃত, ২।২।১)। এখানে মনে হয়, শ্রীম বলতে চেয়েছেন, উক্ত সময়ে ভবনাথ ১৯ অতিক্রম করেছেন, কিন্তু ২০-তে উপনীত হননি। তখন তাঁর বয়স সাড়ে উনিশ ধরলে জন্মসময় দাঁড়ায় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর। স্বামীজীর চেয়ে ভবনাথ কয়েক মাসের ছোট ছিলেন বলেই মনে হয়।

ভবনাথ ছিলেন তাঁর পিতামাতার একমাত্র পুত্র (লীলা-অভিধান, পৃঃ ২৩৪)। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কিছু আগেই তিনি

বরানগরের আদর্শনিষ্ঠ কর্মবীর শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে সামাজিক সৎকর্মে প্রবৃত্ত হন। ধর্মবিশ্বাসে ব্রাহ্ম, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় একান্ত উদারচেতা ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম 'রসদদার'-রূপে কথিত শম্ভুনাথ মল্লিকের গৃহে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে শশিপদবাবুর পরিচয় হয় (কুলদাপ্রসাদ মল্লিক, 'নবযুগের সাধনা', দ্বিতীয় সং, পৃঃ ৪২৬)। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি শশিপদবাবুর গভীর শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ স্নেহভালবাসাও তিনি লাভ করেন। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, স্ত্রী-শিক্ষা, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন, নানা-ধর্মের সমন্বয়-সাধন, শ্রমিকদের লেখাপড়া শেখানো প্রভৃতি ছিল তাঁর কর্মসূচীর অন্তর্গত। বরানগর তাঁর কর্মক্ষেত্র। তিনি ও তাঁর সহ-কর্মীরা নৈতিক পুনরুজ্জীবনের উপর জোর দেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে (১৮৭৫ ?) একটি সংস্থা গঠিত হয়; নাম 'আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা'। যেসব নবীন যুবক ও কিশোর এই সভায় যোগ দেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কালীকৃষ্ণ দত্ত, দাশরথি সান্যাল ও ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়। সানডে স্কুল, নীতি বিদ্যালয় প্রভৃতি এই সভার মাধ্যমে পরিচালিত হত। সংস্থার সদস্যরা ধর্ম, নীতি-শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তারের প্রয়োজনে একটি লাইব্রেরি স্থাপন করেন—নাম 'আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভার পুস্তকালয়'। এই পুস্তকালয় বা পাঠাগার দেখা-শুনার দায়িত্ব যাঁদের উপর ন্যস্ত ছিল তাঁদের মধ্যে ভবনাথের নাম অগ্রগণ্য। কিশোরদের মধ্যে তিনি অল্পদিনেই অনেকের নজরে আসেন। কর্মী হিসাবে তিনি ছিলেন অমিততেজ। নরেন্দ্র-নাথ দত্তের (পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ) সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং ক্রমে সেই পরিচয় পরিণত হয় গভীর বন্ধুত্বে। নরেন্দ্রনাথ কখন কখন আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভার আলোচনায় আসরে যোগ দিতেন। (সুজিত সেনগুপ্ত, 'বরানগর পিপলস লাইব্রেরি', দেশ, ১০ জুলাই ১৯৮২, পৃঃ ৩২ ; 'নবযুগের সাধনা', পৃঃ ৪২৩)।

নবীন যুবক ভবনাথের কলকাতায় ব্রাহ্ম-সমাজে যাতায়াত ছিল। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁর অনুরক্তির মূলে ছিল সম্ভবত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত' গ্রন্থে ভবনাথের যে-পরিচয় দিয়েছেন সেখানে তিনি বলেছেন: '[ভবনাথ] ব্রাহ্মণতনয় হইলেও ব্রহ্মজ্ঞানী…।' (১৯৮৩ সং, পৃঃ ১৭৬)। এই পরিচয় যথার্থ হলে আমাদের বুঝতে হবে, তিনি ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। সে যাই হোক, আমরা তাঁর আচরণে দেখতে পাই, তিনি ধর্মবিষয়ে মুক্ত-চিত্ত। ভক্তি, বিশ্বাস এবং পরমজ্ঞান লাভ যে ধর্মের সার কথা, এই বোধ তাঁর মধ্যে স্পষ্ট দেখা গিয়েছে। এক্ষেত্রেও প্রথম দিকে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব কার্যকর হয়ে থাকতে পারে। তাছাড়া অবশ্যই ছিল পূর্বসংস্কারের শক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হলেন কেমন করে ? এই প্রশ্নের বিচারে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, শশিপদবাবুর কাছেই তিনি প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, তিনি ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত বিশিষ্ট ভক্তদের নিকট তাঁর কথা শুনেছিলেন। তাছাড়া কেশবচন্দ্রের পত্রিকার মাধ্যমেও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অসাধারণ ঈশ্বরানুরাগের বিষয়ে জেনে থাকতে পারেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে কবে তিনি প্রথম উপনীত হন, সঠিক সেই তারিখ নির্দেশ করা আপাতত সম্ভব নয়। শ্রীম কথামৃত

প্রথম ভাগের উপক্রমণিকায় বলেছেন: 'ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তরা ইং ১৮৭৯, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ঠাকুরের কাছে আসিতে থাকেন।...১৮৮১-র শেষ ভাগ ও ১৮৮২-র প্রারম্ভ এই সময়ের মধ্যে নরেন্দ্র, ভবনাথ, বাবুরাম, বলরাম, নিরঞ্জন, মাষ্টার, যোগীন আসিয়া পড়িলেন।' এই বিবরণ থেকে মনে হয়, ভবনাথ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যে উপনীত হয়েছিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল বলেছেন: '[ভবনাথ] পড়িবার সময়ই প্রভুর কৃপাভাজন হন।' (লীলামৃত, পৃঃ ১৭৬)। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ভবনাথের কলেজে পড়াশুনা চলার কথা।

দক্ষিণেশ্বরে ভবনাথের প্রথম আগমনের মুহূর্তেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিশ্চিতই তাঁর এই বিশিষ্ট ভক্তকে চিনে নিয়েছেন; ভক্তও বাঁধা পড়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের অহেতুক, সীমাহীন ভালবাসার সূত্রে। ১৮১৮-র শেষভাগ থেকে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট—প্রায় পাঁচ বছর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য সঙ্গ ও পারমার্থিক উপদেশলাভের সৌভাগ্য হয়েছিল ভবনাথের। পড়াশুনা এবং আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভার কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে তিনি নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার সময় করে নিতেন। প্রথম দিকে, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষায়, নবানুরাগের কালে, মনে হয়, তিনি সেখানে ঘন ঘন যেতেন। সাংসারিক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার পর এই যাতায়াত হয়তো একটু কমে যায়—যে-কারণে আমরা ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২ ফেব্রুআরি দেখছি, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে বলছেন: 'তুই এত দেরীতে দেরীতে আসিস কেন?' উত্তরে ভবনাথ বলেছিলেন: 'আজ্ঞে, পনের দিন অন্তর দেখা করি।' (কথামৃত, ৫।১৬।১)। যাই হোক, অনায়াসে অনুমান করা চলে যে, পাঁচ বছরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটেছে শতাধিকবার। কথামৃত গ্রন্থে সহজবোধ্য কারণেই ভবনাথের দেখা আমরা এতবার পাই না, পাই তার চেয়ে অনেক কম। শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে যাতায়াত আরম্ভ করেছেন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ থেকে। তিনি সাধারণত রবিবার এবং অন্যান্য ছুটির দিনে যেতেন। সেইসব বিশেষ দিনের কতকগুলিতে মাত্র ভবনাথ উপস্থিত থাকতে পেরেছেন। কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভবনাথ সংবাদ প্রায় কুড়িটি পর্যায়ে আছে। তাছাড়া কয়েক জায়গায় তাঁর উল্লেখ রয়েছে, যেক্ষেত্রে আসরে তিনি অনুপস্থিত। কথামৃতে যে-বিবরণ ও তথ্য-উপাদান আছে, প্রধানত তার সাহায্যেই কিন্তু আমরা ভবনাথের অনুপম চরিত্র ও আধ্যাত্মিক মানসিকতার ছবিটি মনে মনে রচনা করে নিতে পারি। সেই সঙ্গে ভবনাথের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভালবাসা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি ভবনাথের ভক্তি ও আনুগত্যের চিত্রটিও। কথামৃত অনুসরণ করে ভবনাথকে যেমন আমরা দক্ষিণেশ্বরে দেখি, তেমনই আবার দেখি বলরাম-ভবনে, গিরিশচন্দ্রের গৃহে, অধরচন্দ্র সেনের বাড়িতে, সুরেন্দ্রের বাগানে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আলয়ে—পানিহাটির মহোৎসবেও।

১৮৮৩, ১৮৮৪ ও ১৮৮৫ এই তিন বছরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তরা তাঁর জন্মোৎসব পালন করেন। এই বিশেষ তিনটি দিনেই ভবনাথ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত ছিলেন। (চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় রচিত 'শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতি-কথা'য় দেখা যায়, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কাশীপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব খুব সংক্ষেপে সারা হয়েছিল। সেই উৎসবে উপস্থিত বিশিষ্ট ভক্তদের তালিকায় ভবনাথের নাম নেই [পৃঃ ২৬৬]।) কথামৃতে উক্ত তিনদিনের আনন্দসংবাদের যে-বিবরণ আছে, সেখানে ভক্তদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন ভবনাথ। ১৮৮২-র জন্মোৎসবে ভবনাথ তাঁর বন্ধু কালীকৃষ্ণের

ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়
(কাশীপুর উদ্যানবাটীতে)

সঙ্গে একটি গান গেয়েছিলেন : 'ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী,/সবে মিলে তব সত্যধর্ম ভারতে প্রচারি।' শ্রীম লিখেছেন : 'ঠাকুর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া এক মনে গান শুনিতেছেন। গান শুনিতে শুনিতে মন একেবারে ভাবরাজ্যে চলিয়া গিয়াছে।' (কথামৃত, ২।২।১)। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভবনাথ সুকণ্ঠ ছিলেন এবং তাঁর গান শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুর খুবই ভালবাসতেন। ভক্ত বলরামের গৃহে একবার দেখা যায়, নরেন্দ্রনাথের গানের পর তিনি ভবনাথকে গাইতে বলছেন। ভবনাথ সেদিন গেয়েছিলেন : 'দয়াঘন তোমা হেন কে হিতকারী।/সুখে দুঃখে সম, বন্ধু এমন কে, পাপ-তাপ-ভয়হারী।' (কথামৃত, ৪।৩।১)। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার নবমী দিবসে একবার তিনি গেয়েছিলেন : 'গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ কোরো না।/ও দুটি চরণ বিনে আমার মন, অন্য কিছু আর জানে না॥ গান শুনে ঠাকুর সমাধিস্থ হন।' (কথামৃত, ২।১৭।১)। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট ভবনাথের গাওয়া আর-একটি গানের উল্লেখ পাওয়া যায় বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের পূর্বোক্ত গ্রন্থে (পৃঃ ১৭৬)। সেখানে তিনি বলেছেন : ' "তুমি বন্ধু, তুমি নাথ নিশিদিন তুমি আমার", তাঁর [ভবনাথের] এই গীতটিতে প্রভু সমাধিস্থ হইতেন··· ।'

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জন্মোৎসব শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথির অনেক পরে, ২৫ মে তারিখে, পালিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শারীরিক অসুস্থতার জন্য এই বিলম্ব। সেদিনের উৎসবের একটি দৃশ্য : '[কীর্তনের আসরে] ঠাকুর গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস কথা শুনিতে শুনিতে দণ্ডায়মান হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। অমনি ভক্তেরা গলায় পুষ্পমালা পরাইয়া দিলেন। ভবনাথ, রাখাল ঠাকুরকে ধারণ করিয়া আছেন —পাছে পড়িয়া যান।' (কথামৃত, ৪।১৩।৩)। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, সমাধিস্থ অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুর যে-কয়েকজন শুদ্ধচিত্ত ভক্তের স্পর্শ সহ্য করতে পারতেন, ভবনাথ তাঁদের অন্যতম। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালও এইকথা বিশেষভাবে বলেছেন তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে (পৃঃ ১৭৬)। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জন্মোৎসবে দেখি, নরেন্দ্রনাথের 'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি' গানটি শ্রবণমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুর বাহ্যশূন্য, সমাধিস্থ। অনেকক্ষণ পরে সমাধিভঙ্গ হলে, ভক্তেরা ঠাকুরকে আহারের জন্য বসিয়েছেন। কিন্তু তখনও ভাবের আবেশ রয়েছে ; ঠিক মতো খেতে পারছেন না তিনি। ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে ভবনাথকে বেছে নিয়ে বলছেন : 'তুই দে খাইয়ে।' 'ভাবের আবেশ রহিয়াছে, তাই নিজে খাইতে পারিতেছেন না। ভবনাথ তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিতেছেন।' (কথামৃত, ৫।১৬।১)।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে ভবনাথকে অধিকাংশ সময়ে দেখি স্বল্পবাক্। দ্রষ্টা-আচার্যের নিকট অনুগত শিক্ষার্থী-শিষ্যের ভূমিকাই তিনি পালন করেছেন। এই শিষ্যের কাজ তখন প্রধানত শ্রবণ এবং সেই সঙ্গে মনন। আর মাঝে মাঝে, লক্ষ্য করা যায়, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব-ঋদ্ধ কথা শুনে ভক্তের আনন্দ প্রকাশ। উদাহরণ স্বরূপ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সত্ত্বরজস্তম—এই ত্রিগুণ-সম্পর্কিত অসাধারণ কথিকাটি শোনবার পর ভবনাথ তাঁর ভাবোচ্ছ্বাস গোপন করতে পারেননি। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন বললেন, তিনগুণের মধ্যে সত্ত্ব শ্রেষ্ঠ হলেও সেও অন্য দুটির মতো তস্করসদৃশ, সে 'বন্ধন খোলে বটে ; কিন্তু ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারে না।···ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারে না, কিন্তু পথ দেখিয়ে দেয়'—ভবনাথ তখন, যেন স্বগত, বলে উঠেছেন : 'কি চমৎকার কথা!' (কথামৃত, ৪।১৩।১)। কখন কখন তিনি দুই-একটি প্রশ্ন করেছেন, নিবেদন করেছেন দুই-একটি সংশয়ের কথা। যেমন, শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ করে

তিনি কতকটা বিভ্রান্ত, সেকথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জানাচ্ছেন : 'আমি চণ্ডী বুঝতে পারছি না। চণ্ডীতে লেখা আছে যে, তিনি টক টক মারছেন। এর মানে কি ?' শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর অনমুকরণীয় ভঙ্গীতে বুঝিয়ে দিয়েছেন : 'ওসব লীলা। আমিও ভাবতুম ঐ কথা। তারপর দেখলুম সবই মায়া। তাঁর সৃষ্টিও মায়া, সংহারও মায়া।' (কথামৃত, ২।২৪।১)। ভবনাথ সম্পর্কে বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের বিচার : 'এমন প্রেমিক কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।' (লীলামৃত, পৃঃ ১৭৬)। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন ঈশ্বরপ্রেমিক এবং মানব-প্রেমিক। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে একদিন তিনি বলেন : 'লোকের সঙ্গে মনান্তর হলে মন কেমন করে। তাহলে সকলকে তো ভালবাসতে পারলুম না।' ওই প্রসঙ্গে পরে আবার : 'খৃষ্ট, চৈতন্য, এঁরা সব বলে গেছেন যে, সকলকে ভালবাসবে।' ঠাকুর ভক্তের দুশ্চিন্তা দূর করে দেন এই বলে যে, সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন বলেই সকল মানুষকে ভালবাসতে হয়। ভক্তের কাজ ভগবানের শরণাগত হওয়া, তাঁর চিন্তা করা। অন্য চিন্তা বৃথা ; তাঁকে পেলে সকলকেই পাওয়া যায় (কথামৃত, ২।১৭।৪)।

ভবনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে উচ্চকোটির ভক্তরূপে চিহ্নিত করেন, সেকথা এই রচনার প্রারম্ভেই বলা হয়েছে। নানা সময়ে তিনি ভবনাথের ভক্তিভাবের প্রশংসা করতেন। এই ভক্তটির কোমল স্বভাব লক্ষ্য করে ঠাকুর তাঁর মধ্যে প্রকৃতির ভাব মূর্ত দেখতেন। নরেন্দ্রনাথ ও ভবনাথ তাঁর দৃষ্টিতে যথাক্রমে পুরুষ ও প্রকৃতি। উভয়ের সম্পর্কে তিনি বলেছেন : ওদের 'অরূপের ঘর।' (কথামৃত, ৪।১৪।১ ; ৪।২০।২)। স্বামী সারদানন্দ বলেছেন : 'বিনয়, নম্রতা, সরলতা ও ভক্তিবিশ্বাসের জন্য ভবনাথ ঠাকুরের বিশেষ প্রিয় হইয়াছিল। তাহার রমণীর ন্যায় কোমল স্বভাব ও নরেন্দ্রনাথের প্রতি অসাধারণ ভালবাসা দেখিয়া ঠাকুর কখন কখন রহস্য করিয়া বলিতেন, "জন্মান্তরে তুই নরেন্দ্রের জীবনসঙ্গিনী ছিলি বোধ হয়।"' (লীলাপ্রসঙ্গ, ৫/পৃঃ ২১২)। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের মন্তব্য : '[ভবনাথের] অঙ্গকান্তি যেমন গৌর, অন্তরও সেইরূপ। …ভগবানের ভজন সময় ইনি এমন রোদন করিতেন তাতে পাড়ার লোক জমা হয়ে যেত। যেন একটা কি কাণ্ড ঘটছে। প্রভু…বলিতেন—নরেনের পুরুষভাব, তাই গম্ভীর ; ভবনাথের প্রকৃতিভাব, তাই প্রেমবিভোর।' (লীলামৃত, পৃঃ ১৭৬)। ভবনাথের ভক্তিবিশ্বাস এবং নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিশেষ ভাবপ্রসঙ্গে ঠাকুরের আরও কয়েকটি উক্তি উদাহৃত হল ; 'আহা তার [ভবনাথের] কি ভাব! গান না করতে করতে চক্ষে জল আসে। হরিশকে দেখে একেবারে ভাব। বলে, এরা বেশ আছে। হরিশ বাড়ী ছেড়ে এখানে [দক্ষিণেশ্বরে] মাঝে মাঝে থাকে কিনা!…ভবনাথ এসব ছোকরার কেন উদ্দীপন হয় ? কি জান ? মানুষ সব দেখতে একরকম, কিন্তু কারুর ভিতর ক্ষীরের পোর! যেমন পুলির ভিতর কলাইয়ের ডালের পোরও থাকতে পারে, ক্ষীরের পোরও থাকতে পারে, কিন্তু দেখতে একরকম। ঈশ্বর জানবার ইচ্ছা, তাঁর উপর প্রেমভক্তি, এরই নাম ক্ষীরের পোর।' (কথামৃত, ২।৬।৩)। 'ভবনাথের কেমন ভক্তি দেখেছ ? নরেন্দ্র, ভবনাথ—যেমন নরনারী। ভবনাথ নরেন্দ্রের অনুগত।' (কথামৃত, ২।৭।২)। 'ভবনাথ নরেন্দ্রের জুড়ী—দুজনে যেন স্ত্রীপুরুষ! তাই ভবনাথকে নরেন্দ্রের কাছে বাসা করতে বললুম।' (কথামৃত, ৪।২০।২)। ভগবানের নামে ভবনাথ যে পরম প্রশান্তি অনুভব করতেন সেকথা তিনি নিজমুখেই একবার ঠাকুরকে বলেন : 'হরিনামে আমার গা যেন খালি হয়।'

ভক্তের এই কথায় স্বভাবতই প্রসন্ন হয়েছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তিনি তখন বলেন: 'যিনি পাপ-হরণ করেন তিনিই হরি। হরি ত্রিতাপ হরণ করেন।' (কথামৃত, ৪।১৯।৩)।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে ভবনাথ ক্রমশ বৈরাগ্যবান হয়ে ওঠেন। তাঁর অন্তরে জাগে ত্যাগের স্পৃহা। উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন শুনলেন, ভবনাথ পান ও মাছ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। একথা শুনে ঠাকুর বলেছেন: 'সে কি রে! পান মাছে কি হয়েছে? ওতে কিছু দোষ হয় না! কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ।' (কথামৃত, ৪।৩।১)। বস্তুত ভবনাথের মনোগত ইচ্ছা ছিল সংসারত্যাগ করে সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করা। কিন্তু, আমরা জানি, তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। পিতামাতার আগ্রহে তাঁকে বিবাহ করতে হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের শুরুতে অথবা ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষাংশে তাঁর বিবাহ হয় মল্লিকপুরের অভয়চরণ ভট্টাচার্যের কন্যা কিরণশশীর সঙ্গে (লীলা-অভিধান, পৃঃ ২৩৫)। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল জানাচ্ছেন, পত্নী যাতে ধর্ম-চর্চায় সহায়ক হন এই অভিপ্রায়ে তিনি শ্রীমতী কিরণশশীকে দক্ষিণেশ্বরে এনেছিলেন এবং প্রভু 'নবদম্পতিকে শুভাশিস করেন।' (লীলামৃত, পৃঃ ১৭৬)। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ভবনাথ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন: 'ভবনাথ কেমন সরল! বিবাহ করে এসে আমায় বলছে, স্ত্রীর উপর আমার এত স্নেহ হচ্ছে কেন? আহা! সে ভারি সরল! তা স্ত্রীর উপর ভালবাসা হবে না? এটি জগন্মাতার ভুবনমোহিনী মায়া।' (কথামৃত, ৫।১৪।১)। জগন্মাতার মোহিনী মায়া ভবনাথকে অব্যাহতি দেয়নি ঠিকই, কিন্তু তিনি তবুও তাঁর অন্তরে ত্যাগের ইচ্ছা কিছুকাল পর্যন্ত জাগিয়ে রেখেছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর আমরা দেখি, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সম্মুখে হঠাৎ তিনি ব্রহ্মচারী বেশে উপস্থিত—'গায়ে গৈরিক বস্ত্র, হাতে কমণ্ডলু, মুখে হাসি।' শ্রীরামকৃষ্ণদেব তখন বলেন: 'ওর মনের ভাব ঐ কিনা, তাই ঐ সেজেছে।' (কথামৃত, ২।১৭।৩) ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভবনাথ প্রসঙ্গে বলছেন: 'ভবনাথ বিয়ে করেছে, কিন্তু সমস্ত রাত্রি স্ত্রীর সঙ্গে কেবল ধর্মকথা কয়! ঈশ্বরের কথা নিয়ে থাকে দুজনে। আমি বললুম, পরিবারের সঙ্গে একটু আমোদ-আহ্লাদ করবি, তখন রেগে রোখ করে বললে, কি! আমরাও আমোদ-আহ্লাদ নিয়ে থাকবো?' (কথামৃত, ৩।১২।১)।

মহামায়ার মায়া ভবনাথকে নিষ্কৃতি দেয়নি। ১৮৮৫-র শেষের দিক থেকে ঠাকুরের নিকট তাঁর যাতায়াত কমে আসে বলে মনে হয়। নিদারুণ ব্যাধিতে আক্রান্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন শ্যাম-পুকুরে এবং পরে কাশীপুরে, সেই সময়ে ভবনাথ তাঁর কাছে গিয়েছেন বটে, কিন্তু পূর্বের মতো অল্পদিনের ব্যবধানে নয়। নিজের শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যেও ঠাকুর ভবনাথের জন্য ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন বোধ করেছেন, সেই সঙ্গে ভক্তের ব্যবহারে ব্যথিতও। এই ভাবের প্রকাশ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর শ্রীম-র নিকট তাঁর কথায়: 'এই অসুখ হওয়াতে কে অন্তরঙ্গ, কে বহিরঙ্গ বোঝা যাচ্ছে। যারা সংসার ছেড়ে এখানে আছে তারা অন্তরঙ্গ। আর যারা "কেমন আছেন মশাই?" জিজ্ঞাসা করে তারা বহিরঙ্গ ভবনাথকে দেখলে না? শ্যামপুকুরে বরটি সেজে এলো। জিজ্ঞাসা করলে, "কেমন আছেন?" তারপর আর দেখা নাই। নরেন্দ্রের খাতিরে ঐরকম তাকে করি, কিন্তু মন নাই।' (কথামৃত, ৪।৩১।১)। উদ্ধৃত অংশটি পড়ে আমরা যদি ভেবে বসি, ঠাকুর ভবনাথকে প্রত্যাখ্যান করছেন অথবা মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখছেন, তাহলে

কিন্তু আমরা ভুল করব। ঠাকুরের ওই উক্তিতে স্পষ্টত রয়েছে বেদনার সুর; বালকস্বভাব ঠাকুরের অভিমানই বুঝি প্রকাশ পেয়েছে এখানে। মুখে 'মন নাই' বললে কী হবে, ভবনাথের চিন্তা যথার্থই রয়েছে ভক্তবৎসল ঠাকুরের অন্তর জুড়ে। তার প্রমাণ আমরা পাই শ্রীম-র ২২ এপ্রিল ১৮৮৬-র বিবরণে—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় ও ব্যবহারে। শ্রীম জানাচ্ছেন: 'ভবনাথ বিবাহ করিয়াছেন;—কর্মকাজের চেষ্টা করিতেছেন। কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরকে দেখিতে আসিতে পারেন না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভবনাথের জন্য বড় চিন্তিত থাকেন, কেননা ভবনাথ সংসারে পড়িয়াছেন।' সেদিন ঠাকুর নরেন্দ্রকে বলেন: 'ওকে [অর্থাৎ ভবনাথকে] খুব সাহস দে।' আবার ভক্তকে স্বয়ং সাহস দিয়ে বলছেন: 'খুব বীরপুরুষ হবি। ···ভগবানেতে মন ঠিক রাখবি;···। পরিবারের সঙ্গে কেবল ঈশ্বরীয় কথা কবি।' পরে ভবনাথকে ইসারা করে বলেছেন: 'আজ এখানে খাস।' (কথামৃত, ২।২৭।২)।

অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে ভবনাথকে আর আমরা দেখতে পাই না। তাঁর দেহত্যাগের পূর্বে ভবনাথ আরও কয়েকবার কাশীপুরে এসে থাকতে পারেন,—সম্ভবত এসেছিলেন কিন্তু সেই-রকম ঘটনার বিবরণ বা উল্লেখ আমাদের সন্ধানে আসেনি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধির সংবাদ পাওয়ার পর তিনি অবশ্যই কাশীপুরে এসেছিলেন; কাশীপুর মহাশ্মশানে যাত্রার পূর্বে ভক্তদের নিয়ে তাঁর যে আলোকচিত্র গৃহীত হয়, সেই চিত্রে ভক্তদের সঙ্গে বিষণ্ণ ভবনাথকে দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোধানের পর তাঁর ত্যাগী শিষ্যরা বরানগরে যে-মঠ স্থাপন করেন, দশ টাকা ভাড়ায় সেই বাড়ির ব্যবস্থা করে দেন ভবনাথ। 'মুনসীদের বাড়ি' নামে অভিহিত এই গৃহের এক অংশে আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভার পাঠাগার ছিল—যে-পাঠাগারের সঙ্গে একদা ভবনাথ বিশেষভাবেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই পাঠাগার দেখাশুনা করতে পারতেন না বলেই মনে হয়। কুলদাপ্রসাদ মল্লিকের 'নবযুগের সাধনা' গ্রন্থে এ-ব্যাপারে অনুরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায় (পৃঃ ৪২৭)। তিনি তখন বরানগর মঠে আসার যথেষ্ট সুযোগও করে উঠতে পারতেন না। এ-বিষয়ে মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানাচ্ছেন ('শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী'—২ / পৃঃ ৪৪): 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর ভবনাথের বরাহনগরের মঠে যাতায়াত অতি কম হইয়াছিল, তখন তিনি পুনরায় B. A. পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং কলিকাতায় বাদুড়বাগানের এক মেসে থাকিতেন। তাহার পর তিনি School Sub-Inspector-এর কর্ম লইয়া অপর স্থানে গিয়াছিলেন। এইজন্য বরাহনগরের মঠে আসিতে পারিতেন না, আলমবাজারের মঠে অবসর পাইলেই মাঝে মাঝে আসিতেন এবং পূর্বের ন্যায় আনন্দ করিয়া সকলের সহিত মিশিতেন।' যে-কর্মের উল্লেখ এখানে দেখি, সেটি তিনি সম্ভবত ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পেয়েছিলেন। মোটামুটি ওই সময়ে তিনি দক্ষিণ কলকাতায় চলে আসেন (লীলা-অভিধান, পৃঃ ২৩৫)।

বরানগরের মঠে ভবনাথ যে-কয়েকবার আসতে পেরেছিলেন তার মধ্যে বিশেষ একটি দিনের স্মৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের পঞ্চম অধ্যক্ষ স্বামী শুদ্ধানন্দের মানসপটে দীর্ঘকাল অঙ্কিত ছিল। শুদ্ধানন্দজীর সেই স্মৃতিকথা প্রকাশ করেছেন স্বামী কমলেশ্বরানন্দ তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরিকর প্রসঙ্গ' গ্রন্থে (পৃঃ ৬৫)। স্মৃতিচারণ করতে করতে স্বামী শুদ্ধানন্দ বলেছিলেন: 'বরাহনগর মঠে ভবনাথবাবু এসেছেন। তিনি দুঃখ করছেন:

"তোমরা সব ত্যাগ করে ভগবানকে ডাকছ আর আমরা সংসারে হাবুডুবু খাচ্ছি।" ভবনাথবাবু একটি গান গেয়েছিলেন মনে আছে: "কেন অমিয় ভ্রমে গরল কর পান। / কেন আপাত-সুখেতে মজি ভুল পরিণাম। / ভেবেছ কি সার তবে চিরদিন এইভাবে যাবে?" ইত্যাদি। শশী মহারাজ [স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ] তাঁকে উৎসাহ দেবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দিলেন: "গৃহস্থ কতগুলি মাছ এনে কতক জিইয়ে রেখে দিয়েছে এবং কতক খোলায় চাপিয়ে ভাজছে। আমাদের এখন তিনি ভাজছেন। তোমাদের জিইয়ে রেখে দিয়েছেন। আবার সময় হলে তোমাদেরও খোলায় চাপাবেন।"'

সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ার জন্য ভবনাথের মনে যে-বেদনাবোধ ছিল তার একটি পরিচয় পাওয়া যায় উক্ত বিবরণে। শ্রীশ্রীঠাকুর কবে এবং কীভাবে তাঁকে 'খোলায় চাপালেন', সে-বৃত্তান্ত আমাদের জানা নেই। তবে আমরা জানি, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে একদিন বলেছিলেন: 'অবতারের উপর ভালবাসা এলেই হোলো।' (কথামৃত, ৫।১২।৬)। অর্থাৎ সেই ভালবাসা থাকলে আর কিছুর দরকার হয় না। আমরা একথাও জানি যে, ঠাকুরের প্রতি ভবনাথের ভক্তি ও ভালবাসায় বিন্দুমাত্র খাদ ছিল না। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাক বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের কথা: 'ঠাকুরের প্রতি ইঁহার [ভবনাথের] যেরূপ ভালবাসা তার কণামাত্র পেলে আমরা কৃতার্থ হই।' (লীলামৃত, পৃঃ ১৭৬)।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদর্শনের পর ভবনাথ প্রায় দশ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর জীবনের এই শেষ কয়েক বছরের ঘটনা সম্পর্কে তথ্য দুর্লভ। আবার যে-কয়েকটি ঘটনা জানা যায় সেগুলির পারম্পর্য নির্ণয় করাও কঠিন। যাই হোক, মোটামুটি বলা যায় যে, ভবনাথ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর শেষ আট বছর বিদ্যালয় পরিদর্শকের সরকারী কর্ম করেন। সেই কর্ম উপলক্ষে তাঁকে কিছুকাল কলকাতার বাইরে থাকতে হয়। কলকাতায় যখন তিনি থাকতেন তখন গুরুভাইদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চেষ্টা করতেন। সুযোগ সুবিধা মতো তাঁর বরানগর ও আলমবাজার মঠে যাতায়াতের কথা আগেই বলা হয়েছে। এছাড়া তিনি ঠাকুরের গৃহী ভক্তদের কাছেও যেতেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর ভক্ত মনোমোহনের গৃহে সৎ প্রসঙ্গ করবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যেসব ভক্ত আসতেন তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত 'ভক্ত মনোমোহন' গ্রন্থে (পৃঃ ২১০—১১)। এই তালিকায় একটি বিশিষ্ট নাম ভবনাথ। কলকাতার বাইরে, বিশেষত পূর্ববঙ্গে, থাকার সময়ে তিনি নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ক্রমে হীনস্বাস্থ্য হয়ে পড়েন। ভবনাথের দুই কন্যার মধ্যে একটি—সম্ভবত বড়টি—আড়াই বছর বয়সে মারা যান। অপর কন্যা প্রতিভার বয়স যখন আনুমানিক ছয় বছর, ভবনাথের তখন দেহত্যাগ হয়—দক্ষিণ কলকাতায় একটি ভাড়াবাড়িতে। ঘটনার কাল ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ (সম্ভবত ওই খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধের কোন সময়)। আজ থেকে প্রায় দুই দশক আগে শ্রীমতী প্রতিভা (মুখোপাধ্যায়) এক সাক্ষাৎকারে ভবনাথ-স্বামীজীর সৌহার্দ্য সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন: 'বাবার অবর্তমানে আমার বিয়েতে বেলুড় মঠ থেকে টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল।' (সতীশ-চন্দ্র নাথ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিজন ভবনাথ', উদ্বোধন, কার্তিক ১৩৭৭)।

স্বামীজী ও ভবনাথের মধ্যে প্রীতি-ভালবাসার কথা আগেই বলা হয়েছে। এখানে বিশেষ করে একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চাই। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পিতার আকস্মিক মৃত্যু এবং সাংসারিক

অভাব-অভিযোগ নরেন্দ্রনাথের মনে এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল ; কিছুদিন পরে তিনি চিত্তের অশান্তি ও সংশয় অতিক্রম করতে সক্ষম হন। এই সময়ে নরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তিকর কথা শোনা যায়, যা ভবনাথও বিশ্বাস করে বসেছিলেন এবং ব্যথিত চিত্তে সাশ্রুনয়নে ঠাকুরের কাছে বিবৃত করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেকথা শুনে ভবনাথকে তিরস্কার করে বলেন : চুপ কর, মা বলেছেন, সে কখনও ওইরকম হতে পারে না। আর কখনও আমাকে ওই সব কথা বললে তোদের মুখ দেখতে পারব না। (লীলাপ্রসঙ্গ, ৫।২১৮—১৯)। এখানে আমাদের বুঝতে হবে, ভবনাথ ঠাকুরের নিকট উক্ত প্রসঙ্গ যে তুলেছিলেন তার মূলে ছিল তাঁর তীব্র দুঃখবোধ ; আর এই দুঃখের মূলে ছিল নরেন্দ্রনাথের প্রতি গভীর, ঐকান্তিক ভালবাসা। বলা বাহুল্য, ঠাকুরের স্পষ্টোক্তিতে তিনি আশ্বস্ত বোধ করেন এবং তাঁর ভুল ভেঙে যায়। নরেন্দ্রনাথ ও ভবনাথের বন্ধুত্ব চিরকাল অক্ষুণ্ন থাকে। বিদেশে গিয়েও স্বামীজী তাঁর বন্ধুকে ভোলেননি। বিদেশ থেকে লেখা স্বামীজীর বেশ কয়েকটি পত্রে ভবনাথের উল্লেখ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে ভবনাথ কী দিয়েছেন? এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে সঙ্ঘের প্রথম মঠবাড়ির কথা। বরানগরের মুনসীদের বাড়ির ব্যবস্থা যে তিনি করে দেন, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। শুধু বাড়ির ব্যবস্থা করে দেওয়া নয়, সেটি বাসযোগ্য করে তুলতেও তিনি বিশেষভাবে হাত লাগিয়েছিলেন (চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, 'শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা', পৃঃ ২৯১)। দ্বিতীয়ত, তিনি সঙ্ঘকে দিয়েছেন—শুধু সঙ্ঘকে নয়, সারা বিশ্বের শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীকে—ঠাকুরের মহাযোগী-মূর্তির সেই বিখ্যাত ফোটোগ্রাফটি। এ-বিষয়ে নানা গবেষণার ফলে এখন নিশ্চিতরূপে জানা গিয়েছে যে, আলোকচিত্রটি গৃহীত হয় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে, রবিবার ; এবং ভবনাথের উদ্যোগেই এটি তোলা সম্ভব হয়েছিল (সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 'শ্রীরামকৃষ্ণের ফটোপ্রসঙ্গে', উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৬৯ ; পীযূষকান্তি রায়, 'শ্রীরামকৃষ্ণের সেই বিখ্যাত ফটো', দেশ, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ ; দেবপ্রসাদ গর্গের চিঠি, দেশ, ২৭ অক্টোবর ১৯৮৪)। আমরা জানি, ওই আলোকচিত্রটিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং পুষ্পার্ঘ দিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, পুষ্পার্ঘের ফুল তিনি ভবনাথকে দিয়ে আনিয়েছিলেন ('শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা' পৃঃ ২৬৬)। ওই আলোকচিত্র-গ্রহণ কর্মের প্রধান হোতা যে ভবনাথ, তারই স্বীকৃতিস্বরূপ বুঝি ঠাকুর তাঁকে দিয়েই বিশেষ ফুলটি আনিয়ে নিলেন।

ভবনাথ ছিলেন সুলেখক। কুলদাপ্রসাদ মল্লিক 'নবযুগের সাধনা'য় ভবনাথের লেখা দুখানি বইয়ের উল্লেখ করেছেন : 'নীতিকুসুম' ও 'আদর্শ নরনারী'। এছাড়া 'সখা' পত্রিকায় তাঁর একটি বিশিষ্ট রচনার (১৮৮৮) কথা জানা যায়। এই রচনার বিষয় : শ্রীরামকৃষ্ণ।

নিবন্ধটির কিছু অংশ নিচে উদ্ধৃত হল :

'...আমরা যাঁহার কথা বলিতেছি তিনি ঠিক চৈতন্যের ন্যায় ঈশ্বরভক্ত এবং তাঁহারই ন্যায় ভাবুক। অনেকে স্বচক্ষে ইঁহার ঐশ্বরিক ভাব দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত করিয়াছেন। সহজ সহজ কথায় কঠিন ধর্মকথাসকল এমন পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিতেন যে বালক ও মহিলাগণ অবাধে তাহা বুঝিতে পারিতেন।...

'পরমহংসকে দেখিয়া শ্রীকেশবচন্দ্র সেন মুগ্ধ হন, পরমহংসও তাঁহার প্রতি ভালবাসা স্থাপন করেন। কেশবচন্দ্র তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন, কখন তাঁহার কোন কথার প্রতিবাদ করিতেন না।...

'তিনি গুরুগিরি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। তাঁহার নিকট যাহারা সর্বদা গমনাগমন করিতেন তাহারা তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনিও তাহা-দিগকে প্রণাম করিতেন। তিনি বলিতেন, "আমি সকলের দাসানুদাস।" স্ত্রীলোকমাত্রকেই তিনি আনন্দময়ী মা'র ছায়া জানিয়া মাতৃবোধে প্রণাম করিতেন। তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিতেন না·

'কি হিন্দু, কি খ্রীষ্টান, কি মুসলমান, কি ব্রাহ্ম, কি শিখ যিনি যে ধর্মাক্রান্ত হউন সকলকেই তিনি তাহাদের উপযোগী উপদেশ প্রদান করিতে পারিতেন।···তিনি সত্যবাদীকে বড় শ্রদ্ধা করিতেন, নিজে যাহা বলিতেন তাহা নিশ্চয়ই করিতেন।···

'অনেকের বিশ্বাস মানুষ পুস্তক পাঠ না করিলে জ্ঞানী এবং ধার্মিক হইতে পারে না। পরমহংস-চরিত পাঠে সে সন্দেহ দূর হইবে সন্দেহ নাই।' (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস', পৃঃ ৮১—৮৩)।

লেখক এখানে অল্প কথায় শ্রীরামকৃষ্ণচরিত সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁর সমকাল সম্পর্কে গবেষণায় প্রবন্ধটি বিশেষ মূল্যবান।

ভক্ত ভবনাথের মূর্তিখানি শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগীদের চিত্তে অম্লান। আর তাঁর স্মৃতি সশ্রদ্ধভাবে ধারণ করে রেখেছে বরানগরের একটি প্রতিষ্ঠান : বরানগর পিপলস্ লাইব্রেরি। এই নিবন্ধের প্রথম দিকে আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভার যে-পাঠাগারের কথা বলা হয়েছে, সেই পাঠাগার এবং দক্ষিণ বরাহনগর পাবলিক লাইব্রেরি নামে একটি সংস্থা সংযুক্ত হয়ে বরানগর পিপলস্ লাইব্রেরি গঠিত হয় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। নানা উত্থান-পতনের পর ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষাংশে বরানগর পিপলস্ লাইব্রেরি বরানগরের কুঠিঘাট রোডে তার নিজস্ব ভবনে সংস্থিত হয়। পুরাতন ইতিহাস স্মরণ করে বর্তমান পাঠাগারের পরিচালকরা ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়কে এই সংস্থার প্রধান প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা দিয়েছেন। পাঠাগার-ভবনে প্রবেশ করলেই দেখা যাবে ভবনাথের একটি বৃহৎ তৈলচিত্র। আর দেখা যাবে শ্বেত-প্রস্তরফলকে মুদ্রিত ভবনাথ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেই বিখ্যাত উক্তি : 'নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল ; এরা সব নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি। এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ।'

মুখের ভিতরের ক্যানসার

ডক্টর অমিয়কুমার হাটি

মেডিকেল এন্‌টোমল্যাজির প্রধান অধ্যাপক এবং প্যারাসাইটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান, স্কুল অব্‌ ট্রপিক্যাল মেডিসিন, কলিকাতা। ১৯৮৫-তে রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত।

বহুবছর ধরেই জানা আছে যে, দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে মুখের ক্যানসারের হার পৃথিবীর অন্য জায়গার তুলনায় বেশি। অনেক আগে, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রতিবেদনে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছিল, ভারতে তামাক ব্যবহারের সঙ্গে মুখের ক্যানসারের সম্পর্ক রয়েছে। পরে আরেকটি সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে, যাদের ক্যানসার হয়নি, তাদের তুলনায় যাদের মুখের ক্যানসার হয়েছে, তারা বেশি তামাক চিবোয়। মুখের ক্যানসারের হার উত্তর ভারতে কয়েক শতাংশ মাত্র, যদিও কোন কোন গোষ্ঠীতে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত। জাতিগতভাবে, যে কোন জাতির তুলনায় ভারতীয়দের মধ্যে মুখের ক্যানসারের হার বেশি—এবং সম্ভবতঃ এটা পানসুপারির সঙ্গে তামাক চিবানোর জন্যে।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বেশির ভাগ মানুষই মুখের ক্যানসার নিয়ে যখন চিকিৎসকের কাছে আসেন, তখন অনেক দেরি হয়ে যায়, রোগ অনেকটা এগিয়ে যায়। সারার সম্ভাবনা থাকে না। ক্যানসার প্রথমে আরম্ভ হয় দাঁতের মাড়িতে নির্দোষ একটা ছোট সাদা ছোপের মতো আকার নিয়ে এবং মারাত্মক পরিণতি এড়ানো যেতে

পারত এরকম অনেক ক্ষেত্রেই যদি তখন, সেই মুহূর্তে তামাকের ব্যবহার বন্ধ করা যেত—তাহলে দুষ্ট ফোটকে রূপান্তরিত হতে আর পারত না ঐ নির্দোষ সাদা ছোপটা।

মুখের ক্যানসারের, অতএব, একটা ক্যানসার পূর্ববর্তী স্তর আছে। যদিও এমন কোষকলায় এটা শুরু হয়, সেখানে পরীক্ষা করে সব সময় এই ক্যানসার-পূর্ববর্তী স্তর ধরা খুব সহজ হয় না। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ক্যানসার-পূর্ববর্তী স্তর হল একটা সাদা ছোপ—ইংরেজীতে যাকে বলা হয়—লিউকোপ্লেকিয়া অথবা লাল ছোপ (ইরাইথো-প্লেকিয়া), এর মধ্যে লাল ছোপ কদাচিৎ দেখা যায়, কিন্তু সাদা ছোপ দেখা যায় অনেক সময়েই, মুখের ভিতর মাড়িতে, জিভে, গালে, টাগরায় বা তালুতে।

ভারতে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ৩৫,০০০ লোকের উপর একটা সমীক্ষা করা হয়। এরা সবাই তামাক খেতে অভ্যস্ত ছিল। এই সমীক্ষার লক্ষ্য ছিল, গ্রামের লোকেরা, যারা তামাক খায়, তাদের কতজনের ভিতর ক্যানসার-পূর্ববর্তী স্তর খুঁজে পাওয়া যেতে পারে এবং যাদের মধ্যে ঐ ক্যানসার-পূববর্তী স্তর খুঁজে পাওয়া যাবে, তারা যদি ধূমপান বন্ধ করে, তাহলে তাদের ক্যানসার হবার সম্ভাবনা কমে যায় কিনা এটা দেখা।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তামাক খাবার ধরন-ধারণও বিভিন্ন। উত্তরাঞ্চলে কিছুটা তামাক নিচের ঠোঁটের পিছন দিকে রেখে দেবার রেওয়াজ আছে। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অভ্যাস হল একটা ছোট মাটির নলের ভিতর দিয়ে ধূম-পান করা, দক্ষিণে পানের সঙ্গে তামাকমণ্ড রেখে দেয় লোকে গালে পুরে, এবং পূর্বাঞ্চলে প্রায় ২০ লক্ষ লোকের একটা অদ্ভুত অভ্যাস—সিগারেটের জলন্ত অংশটা মুখের ভিতর নিয়ে ধূমপান করা (উল্টো ধূমপান—বা চুট্টা)—বেশি দেখা যায় অন্ধ্রে—স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে। যে সব লোক নিয়মিত এইভাবে সিগারেট খায়, তাদের তালুতে ক্যানসার হবার ঝুঁকি থাকে খুব বেশি।

সাদাছোপের প্রাদুর্ভাবের হার দেখা গেল এক-এক জায়গায় এক-একরকম—০.২ শতাংশ উত্তরাঞ্চলে, কিন্তু ৫ শতাংশ তাদের মধ্যে যারা মুখের ভিতর জলন্ত সিগারেট নিয়ে ধূমপান করে। এই সাদাছোপ ধরতে গেলে শুধু তাদেরই মধ্যে দেখা গিয়েছিল, যারা তামাক খায় বা ধূমপান করে। যারা তামাক ব্যবহার করে না, তাদের মধ্যে সাদাছোপ দেখা যায়নি বললেই হয়।

দশবছর ধরে সমীক্ষায় দেখা যায়, দক্ষিণ-ভারতে ২.২ শতাংশ সাদাছোপ পরে ক্যানসারে রূপান্তরিত হয়েছে। সেই তুলনায় উত্তরাঞ্চলে ০.৩ শতাংশ সাদাছোপ কয়েক বছর পর ক্যানসারে পরিণত হয়েছে।

যেহেতু এটা স্থিরীকৃত হয়েছে যে, ক্যানসার-পূর্ববর্তী স্তর ধরতে গেলে তাদেরই হয় যারা পানের সঙ্গে তামাক বা দোক্তা খায়, বা বিড়ি, সিগারেট খায় বা চুট্টা খায়—সেইহেতু এটা নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত যে পরখ করে দেখা, ক্যানসার-পূর্ববর্তী স্তরের অবস্থায় তামাক ব্যবহার বন্ধ করে দিলে পরিণতি কী হয়।

ক্যানসার-পূর্ববর্তী স্তর যাদের ছিল, দেখা গেল, তারা যদি তামাক ব্যবহার বন্ধ করে অথবা একদম কমিয়ে দেয়, তাহলে ঐ স্তরটা কমে যায়। ক্যানসার-পূর্ববর্তী স্তরে অবস্থিতি সত্ত্বেও যারা তামাকের ব্যবহার বন্ধ করে না, তাদের সঙ্গে পরিসংখ্যানগতভাবে তুলনা করেই এ সিদ্ধান্তে আসা গেছে। অর্থাৎ শেষোক্ত লোকেদের ক্যানসার হবার সম্ভাবনা বাড়ে, পূর্বোক্ত লোকেদের ক্যানসার হবার সম্ভাবনা কমে।

এই সমীক্ষা ক্যানসার নিয়ন্ত্রণে একটি গুরুত্ব-পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করছে—যা মুখের ক্যানসার ছাড়া অন্য ক্যানসারের ব্যাপারেও প্রযোজ্য—মানুষের ব্যক্তিগত অভ্যাস কিছু বদলালে স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে।

শঙ্করাচার্যের দেবীপূজা

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

আমেরিকা স্যাক্রামেণ্টো বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ—'উদ্বোধন' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক। বর্তমান নিবন্ধটি শঙ্করাচার্য লিখিত দেবী চতুঃষষ্ট্যুপচার স্তোত্রম্ অবলম্বনে রচিত।

আচার্য শঙ্কর দেবীপূজায় বসিয়াছেন। চৌষট্টি উপচারে দেবীর মানসপূজা করিবেন। মনে মনে পূজা করিলে অনেক সুবিধা। যে-কোন উপচার যে-কোনও স্থান হইতে যে-কোনও সময়ে নিমেষে সংগ্রহ করা যায়। ছুটাছুটি করিতে হয় না।

প্রথমে আবাহন। "মা ঝটিতি জাগৃহি জাগৃহি।" জগজ্জননি তাড়াতাড়ি জাগিয়া ওঠো, জাগিয়া ওঠো। প্রত্যূষে তোমার মঙ্গল-গীতি গাহিতেছি। চোখ মেলিয়া চাও। তুমি ঘুমাইয়া থাকিলে এই বিশ্ব-সংসারের সকল ক্রিয়া থামিয়া যাইবে। তুমি ব্রহ্মশক্তি মহামায়া। যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহা তোমারই শক্তিতে অতএব মা জাগো। কৃপা কটাক্ষ দ্বারা—"জগদিদং জগদম্ব সুখী কুরু"—এই জগৎকে সুখী কর।

মা, তোমার 'সমর্চনার' জন্য একটি মণিময় মণ্ডপ নির্মাণ করিয়াছি। উহার দশদিকে সুবর্ণ কুম্ভ স্থাপন করা হইয়াছে। আমার পূজা গ্রহণ করিবার জন্য মা তাড়াতাড়ি এস।

কনককলসশোভমানশীর্ষং
জলধরলম্বিতসমুল্লসৎপতাকম্।
ভগবতি তব সন্নিবাস হেতো-
র্মণিময়মন্দিরমেতদর্পয়ামি।

তোমার নিবাসের জন্য মেঘস্পর্শী স্বর্ণ পতাকাশোভিত মণিময় মন্দির মনে মনে রচনা করিলাম। জগজ্জননি, তোমার জন্য নবরত্ন শোভিত স্বর্ণময়ী একটি শিবিকা (পাল্কী) সংগ্রহ করিয়াছি। নরম গদী আছে, তাহাতে তুমি বসিবে। বেদিকায় একটি বিবিধ কুসুমাকীর্ণ রত্ন-সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে। স্বর্ণনির্মিত পাদপীঠে পদযুগল রাখিয়া মা তুমি দশদিক আলো করিয়া ঐ সিংহাসনে উপবিষ্টা হও।

তাহার পর মণি ও মুক্তানির্মিত চারিটি স্বর্ণ-স্তম্ভযুক্ত একটি নূতন বিশাল চন্দ্রাতপ সমর্পণ।

অতঃপর পাদ্য-অর্ঘ্য এবং আচমনীয়। মা, তোমার পদ্মযুগলের ন্যায় কোমল পা দুটিতে দূর্বা ও অপরাজিতা এবং অন্য পুষ্পসহ এই পাদ্য নিবেদন করিলাম। গন্ধপুষ্প, যব, সর্ষপ, দূর্বা, তিল, কুশ, খই মিশ্রিত হেমপাত্রে নিহিত অর্ঘ্য কৃপা করিয়া গ্রহণ কর। করকমলে জায়ফল, কঙ্কোল ও লবঙ্গের সুগন্ধযুক্ত অমৃত-শীতল এই জল গ্রহণ কর আচমনের জন্য।

এই যে সোনার বাটিটি—উহাতে মধুপর্ক আছে। রত্নখচিত ঢাকনি খুলিয়া ধরিতেছি। জননী উহা স্বীকার কর। তোমার স্নানের জন্য আর-একটি স্বর্ণপাত্রে নানা সুগন্ধিপুষ্প দ্বারা সুবাসিত চম্পকতৈল আছে। ভক্তিভাবে স্বর্ণচূর্ণ ও নাগকেশর মিশ্রিত বিলেপন এবং কস্তুরিকা মিশ্রিত স্নানজল কল্পনা করিলাম। তুমি যখন এই স্বচ্ছ নির্মল জলে স্নান করিতেছ তখন বৈদিক ও তান্ত্রিক মন্ত্র পাঠ হইতেছে চিন্তা করিলাম। উদয়োন্মুখ সূর্যের ন্যায় মনোহর এই উত্তম দিব্যবস্ত্র এবং মুক্তাখচিত অতুলনীয় উত্তরীয় তোমাকে নিবেদন করিলাম।

ভগবতি, তোমার কেশপাশ স্নিগ্ধ করিয়া অতি সমাদরে চিরুনী দ্বারা দিতেছি—তাহার পর পদ্ম ও চম্পক-সজ্জিত করিয়া স্বর্ণসূত্র দ্বারা বাঁধিয়া দিলাম। স্বর্ণশলাকা দ্বারা তোমার দুই চোখে 'সৌবীরাঞ্জন' (সুর্মা) বিন্যস্ত হইয়াছে। কী সুন্দর দেখাইতেছে মা, তাহা কি আর বলিব।

তাহার পর পূজক শঙ্করাচার্য মায়ের কটি বাঁধিবার জন্য কাঞ্চী (চন্দ্রহার), স্তনদ্বয়ের মধ্যে অনুপম মুক্তাহার, গলদেশে ২৭টি মুক্তানির্মিত হার, বাহুতে কেয়ূর, মণিবন্ধে রত্নবলয়, কর্ণ দুটিতে তাটঙ্ক নামে কর্ণভূষণ, মস্তকে চূড়ামণি বিন্যাস করিলেন। সবই মনে মনে—মানসপূজা। দেবীর নির্মল ললাটতলে কুঙ্কুম, কস্তূরী, কর্পূর ও অগুরু-দ্বারা তিলক রচনা করিলেন। দেহে অঙ্গরাগ, পাদদ্বয়ে চন্দন লেপন দ্বারা পূজা করিলেন। মা, তোমার সিঁথিতে সাদরে ন্যস্ত সিন্দুর আমার হৃদয়কমলে আনন্দ বিস্তার করিতেছে। ঐ সিন্দুরের সূর্যের ন্যায় রক্তবর্ণকান্তি চিত্তের সকল অন্ধকার দূর করিয়া দেয়।

মন্দার, কুন্দ, করবী, লবঙ্গফুল, মালতী, বকুল, অশোক, কাঞ্চন, করবী, কেতকী, কর্ণিকার, অপরাজিতা—এই সব পুষ্প তোমার পূজার জন্য সংগ্রহ করিয়াছি। পারিজাত, মল্লিকা, চাঁপাফুল আরও নানাবর্ণের নানা আকৃতির পুষ্পসম্ভারও আনিয়াছি। জবা, পদ্ম তো আছেই।

এইবার ধূপ। লাক্ষারস সম্মিলিত, কর্পূরসহ 'শ্রীবাস' (ধুনা) মিশ্রিত, কর্পূরে সুগন্ধিত, গোঘৃত দ্বারা আলোড়িত, চন্দন, অগুরু প্রভৃতি নানা উপকরণ দ্বারা ধূপ কল্পনা করিলাম। জননি, পরম স্নেহে উহা স্বীকার কর। ধূপের পর দীপ। রত্নালঙ্কিত সোনার পাত্রে গব্যঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে। তাম্রবর্ণ তাহার শিখা অন্তরের ও বাহিরের সকল অন্ধকার দূর করিয়া দিতেছে। এইবার নৈবেদ্য। দধি, দুগ্ধ, পায়স মহাশাল্যন্ন পিঠ্য, অমৃতের চেয়েও রসযুক্ত, কতপ্রকারের তরকারী—আরও নানাবিধ খাদ্য মানসপূজক আচার্য দেবীর জন্য কল্পনা করিতেছেন। জম্বুফল, কদলী, নারিকেল, দাড়িম্ব, নারঙ্গ এবং ছোট-বড় আরও নানা ফল মনে মনে নিবেদন করিলেন। পানের জন্য সর্বোত্তম দুগ্ধ। মধু এবং অমৃততুল্য জল।

উষ্ণোদকৈঃ পাণিযুগং মুখঞ্চ
প্রক্ষাল্য মাতঃ কলধৌত পাত্রে।
কর্পূরমিশ্রেণ সকুঙ্কুমেন
হস্তৌ সমুদ্বর্তয় চন্দনেন॥

—মা, স্বর্ণপাত্রে উষ্ণজল দ্বারা তোমার পাণিযুগল ও মুখ ধোও, পরে কুঙ্কুমযুক্ত চন্দন দিয়া হাত দুটি লিপ্ত কর।

অতঃপর পূজক জগন্মাতাকে মুখশুদ্ধি দিতেছেন—সুপারী, কর্পূর, লবঙ্গ, খদির এবং কঙ্কোলযুক্ত তাম্বুল। তাহার পর আরতি। বৃহৎ স্বর্ণপাত্রে বিশাল ডমরুসদৃশ গোধূম দীপ রাখিয়া প্রচুর ঘৃত দিয়া প্রজ্বালিত দীপ অতি বিনয়ের সহিত মায়ের মুখের সম্মুখে সাড়ে তিনবার দেখানো হইল—আর প্রার্থনা—"ভূয়াত্তে কৃপার্দ্রঃ কটাক্ষঃ"—তোমার কৃপাকটাক্ষ আমার উপর পতিত হোক্।

আরতি হইয়া গেলে জ্ঞান-ভক্তির মূর্তি শঙ্করাচার্য দেবীর মাথার উপরে পূর্ণচন্দ্রবিম্বসদৃশ প্রভাসম্পন্ন নানা রত্নশোভিত লোকত্রয়ের আহ্লাদজনক উজ্জ্বল মুক্তাজাল পরিবৃত বিশ্বকর্মা-নির্মিত ছত্র ধরিলেন।

তাহার পর চামর দ্বারা ব্যজন এবং পুনরায় সমস্ত শরীরে সহস্র প্রদীপ দ্বারা আরতি। আরতির পর নানা কলাকুশলবিৎ নটনটীর নৃত্য-গীত। অতঃপর দেবীর ভ্রমণের জন্য একটি দ্রুতগতিশীল অশ্বশোভিত মণিময়চক্রচতুষ্টয়যুক্ত স্বর্ণময়চন্দ্রাতপযুক্ত রথ পূজক কল্পনা করিলেন।

পরিখীকৃত সপ্ত সাগরং
বহুসম্পৎসহিতং ময়াম্ব তে বিপুলম্।
প্রবলং ধরণীতলাভিধং
দৃঢ়দুর্গং নিখিলং সমর্পয়ামি॥

মা, ত্রিভুবনে যাহা কিছু আছে সবই তো তোমার। তোমাকে আমি কি দিতে পারি? সপ্তসাগর যাহার পরিখারূপে অবস্থিত, বিপুল পৃথিবীরূপ দৃঢ় দুর্গ তোমাকে সমর্পণ করিলাম।

গন্ধর্বকন্যাগণ গীতবাদ্য দ্বারা তোমার মহিমা কীর্তন করিতেছে। ব্রহ্মা তাঁহার চতুর্মুখে যাঁহার মহিমা কীর্তন করিতে পারেন না, তাঁহার পূজা কি আমাকর্তৃক সম্ভবপর?

হে জগজ্জননি, তুমি আমার হৃদয়কমলে সর্বদা বিরাজ কর।

সাহিত্যের আলোকে শ্রীচৈতন্য

শ্রীহর্ষ দত্ত

প্রতিভাবান সাংবাদিক ও সাহিত্যিক—'দেশ' সাপ্তাহিকের সঙ্গে যুক্ত।

॥ ১ ॥

আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে বাঙালীর প্রবহমান জীবনচর্যার ধারায় একটি মহাজীবন আবির্ভূত হয়েছিলেন, মাত্র সাতচল্লিশ বছরের জীবনযাত্রার মধ্যে দিয়ে লোক-অলোকের ঊর্ধ্বে এক অনিঃশেষ জগৎ গড়ে তুলেছিলেন, তারপর প্রাকৃতিক নিয়মেই নশ্বর দেহ তিনি ত্যাগ করেছিলেন। কালের প্রেক্ষাপটে, অতীত ইতিহাসের স্মৃতিচারণে এইটুকুই হয়তো সংবাদ। কিন্তু এখানেই, এত সংক্ষেপিত রূপারোপেই এর শেষ নয়। সেই মহাজীবন—যাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য—বাঙালীর ধ্যানে-জীবনে-অনুধ্যানে যে-প্রভাব, যে-বাণী, যে-আলো রেখে গেছেন তা সূর্যের মতো চিরন্তন, চির-উজ্জ্বল, কালোত্তীর্ণ। আমাদের কালের এক বিনম্র বৈষ্ণবরস-সাধকের ভাষায়: 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের উদয় বাঙ্গালায় এক মহত্তম আবির্ভাব, অবিস্মরণীয় প্রকাশ। পরাধীনতার নিগড়ে বন্দী বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে সে-এক অভিনব অভ্যুদয়। মুক্তির সে-কি অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দ! আচণ্ডাল ব্রাহ্মণের মিলন-উৎসবের সে-কি অপরূপ সমারোহ! গ্রামে গ্রামে আবির্ভূত হইল কবি, গায়ক, সজ্জন। বাঙ্গালী এক নূতন জাতিরূপে নবজন্ম লাভ করিল। এক মহামানবের চরণাঙ্কিত সরণি নরনারীকে মানবতার পথে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিল। শশিকিরণোচ্ছল সমুদ্রের মতো শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের করুণাধন্য বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন নব-জাগরণের জোয়ারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।' (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়: ভূমিকা—বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ গ)।

এই 'নবজাগরণের জোয়ারে' বাঙালীর জীবনে শুধু নয়, বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও ব্যাপক পরিবর্তন ও অভিনবত্বের কালজয়ী ছোঁয়া লাগল। বাংলা-সাহিত্যের অঙ্গনে একটি নূতন সাহিত্য-বনস্পতির জন্ম হল। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'চৈতন্যজীবনী-সাহিত্য'। চৈতন্যদেবের জীবৎকাল থেকেই তাঁর জীবন ও বাণীকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে এই শাখাটি। আশ্চর্যের বিষয়, বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষপাদে এসেও চৈতন্যদেবের জীবন ও বাণী অবলম্বনে 'চৈতন্যজীবনী-সাহিত্য' লেখা হচ্ছে। অর্থাৎ পাঁচশ বছর ধরে ক্রমান্বয়ে। নিরবচ্ছিন্নভাবে। মধ্যযুগেই সংস্কৃত ও বাংলা মিলিয়ে রচিত হয়েছে বারোখানি গ্রন্থ। নাটক ও কাব্যাকারে লিখিত এই গ্রন্থগুলি হল: সংস্কৃতে—

(১) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম্: মুরারি গুপ্ত
(২) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম্ মহাকাব্যম্: কবি কর্ণপুর পরমানন্দ সেন
(৩) শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক: কবি কর্ণপুর পরমানন্দ সেন
(৪) চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী: প্রেমদাস
(৫) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত: শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী
(৬) স্বরূপ দামোদরের কড়চা: স্বরূপ দামোদর

বাংলায়—

(১) শ্রীচৈতন্যভাগবত: বৃন্দাবন দাস
(২) শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত: কৃষ্ণদাস কবিরাজ
(৩) চৈতন্যমঙ্গল: লোচন দাস
(৪) চৈতন্যমঙ্গল: জয়ানন্দ

(৫) গৌরাঙ্গ বিজয় : চূড়ামণি দাস

(৬) গোবিন্দদাসের কড়চা : গোবিন্দ দাস

উল্লিখিত গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও গণ্য-নগণ্য বহু কাব্যজীবনী এরপর লেখা হয়েছে। সেই সব অখ্যাত ভক্তকবি বা কবিযশঃপ্রার্থীদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আমরা উনবিংশ শতকে দৃষ্টি দিয়েও পেয়ে যাই শ্রীচৈতন্য-দেবের পূত-পুণ্যজীবনী অবলম্বনে রচিত সাহিত্য। যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নবীনচন্দ্র সেনের 'অমৃতাভ'। গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটক 'চৈতন্য-লীলা', 'নিমাই সন্ন্যাস'। তারপর এই শতকের প্রারম্ভ থেকে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের 'অমিয় নিমাই চরিত', রাধাগোবিন্দ বসাকের 'মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ', স্বামী সারদেশানন্দের 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-দেব', প্রফুল্লকুমার সরকারের 'শ্রীগৌরাঙ্গ', গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর 'শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ', সুধা সেনের 'মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর 'অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ', সুখেন্দুশেখর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিত ও বাণী'। এছাড়াও বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে অথবা হচ্ছে। স্থানাভাবে সেই গ্রন্থগুলির নামোল্লেখ করতে না পারলেও সেগুলির কথা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করি। আমরা কয়েকটির মাত্র নামোল্লেখ করলাম।

যুগ যুগ ধরে রচিত, লিখিত, পঠিত চৈতন্য-জীবনীগুলির আদিগন্ত প্রসারিত ব্যাপকতা একটি মহাগ্রন্থের নাম স্মরণ করিয়ে দেয়। তা হল রামের জীবনচরিত—রামায়ণ। কোনও একটি গ্রন্থ নয়, সবকটি চৈতন্যজীবনী গ্রন্থকে এক সঙ্গে স্মরণ করে নাম দিতে পারি 'চৈতন্যায়ন'। প্রত্যেকটি গ্রন্থের অধিদেবতা যেখানে 'নন্দপুরচন্দ্র শচীনন্দন' এবং তাঁর বাণী, সেখানে এই অখণ্ড সম্মিলনের ধারণা নামকরণ খুব অন্যায় হবে না। অমূলক অকল্পনা বলেও মনে হবে না নিশ্চয়ই।

॥ ২ ॥

চৈতন্যজীবনী-সাহিত্যগুলিতে শ্রীচৈতন্যকে কোন্ দৃষ্টিতে, কোন্ আলোকে দেখেছেন কবি? এই জিজ্ঞাসার উত্তরের আগে প্রথমেই বলতে হবে—মধ্যযুগের কবি যে-দৃষ্টিতে ও ভাবে দেখেছেন আধুনিক জীবনীকার ঠিক সে-পথে নয়। মধ্যযুগের কবি যুগোচিত আবেগ ও সংস্কারে উদ্বেলিত হয়েছেন, আধুনিক লেখক জীবনী বর্ণনায় যুক্তি ও যুগের প্রেক্ষিকায় শ্রীচৈতন্যকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। কিন্তু, একথা ভুললে চলবে না, মধ্য ও আধুনিক—দু-যুগের স্রষ্টাই ভক্তিবিনম্র চিত্তে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে একটি প্রণাম নিবেদন করেছেন।

মধ্যযুগের কবি একদিকে শ্রীচৈতন্যকে 'স্বয়ং ভগবান', 'কৃষ্ণাবতার'রূপে অধ্যাত্মচেতনার তুরীয়লোকে উন্নীত করতে কিছু মাত্র দ্বিধা করেননি। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র একটি শ্লোকে 'তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য' বলে চৈতন্য ও কৃষ্ণকে অভিন্নরূপে দেখা হয়েছে। মরমী কবি শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম জানিয়েছেন: 'রাধাভাব-দ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্' বলে। কবির এই প্রয়াস অবশ্যই সমকালীন যুগচেতনার প্রতিফলন। চৈতন্যজীবনী-কাব্যগুলিতে তৎকালীন সমাজের ধর্মকর্মের যে সুস্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তাতে একথা স্পষ্ট যে, বৈষ্ণবভক্তেরা সে-সময়ে সর্বশক্তি-মান ঈশ্বরের আবির্ভাব প্রার্থনা করেছিলেন। বৃন্দাবন দাস জানিয়েছেন যখন 'কৃষ্ণনামভক্তি শূন্য সকল সংসার', তখন অদ্বৈত প্রভুর আকুল প্রার্থনায় কৃষ্ণ কলিযুগে চৈতন্য নামে ও রূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছেন—'অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য-অবতার।' অবশেষে 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে'র কবি শ্রীচৈতন্যের শ্রীমুখ দিয়েই বলিয়েছেন :

'তোর উচ্চ সংকীর্তনে নাড়ার হুঙ্কারে।
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ আইনু সর্বপরিবারে॥

সাধু উদ্ধারিমু দুষ্ট বিনাশিবু সব।
তোর কিছু চিন্তা নাই পড় মোর স্তব॥'

অন্যদিকে, সাহিত্যের আলোক চৈতন্যদেবের দৈবসিক্ত জীবনের ব্যাখ্যা, বর্ণনা ও প্রতিষ্ঠায় প্রতিফলিত হলেও, মধ্যযুগের মানব কবি মর্ত্য-ভূমির বাতায়ন থেকে চৈতন্যজীবনের মানুষী মহিমার রূপটিকে প্রত্যক্ষ করেছেন। মহাপ্রভুর বাল্য-কৈশোর ও যৌবনের যে-রূপটিকে কবি বহুবর্ণে এঁকেছেন, তা যেন আমাদের চেনা একজন গৌরকান্তি মানুষের জীবনচিত্র। যে-জীবন বাল্যের চাঞ্চল্য, কৈশোরের বৈচিত্র্য ও যৌবনের বাসন্তিক মাধুর্যে লীলায়িত।

চৈতন্যচরিতগুলিতে শচীনন্দনের নরলীলার বর্ণনা স্নিগ্ধ মধুর ও বাস্তব রসে সমৃদ্ধ। যেমন শিশুচৈতন্যের চিত্ররূপ :

'শচীর আঙিনা মাঝে ভুবন মোহন সাজে
গোরাচাঁদ দেয় হামাগুড়ি।
মায়ের অঙ্গুলি ধরি ক্ষণে চলে গুড়ি গুড়ি
আছাড় খাইয়া যায় পড়ি॥'

চৈতন্য এখানে অলৌকিক দেবশিশু নন, বাংলার লৌকিক চিরন্তন শিশুদের সঙ্গে অভিন্ন।

কিশোর গৌরাঙ্গের বিদ্যাদর্প, মুরারি গুপ্তের সঙ্গে পরিহাস ও ব্যঙ্গকৌতুক প্রভৃতি এ-বিষয়ে স্মরণীয়। পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণের পর দেশে ফিরে গৌরাঙ্গ পূর্ববঙ্গের কথার অনুকরণ করে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের পরিহাস করতেন। কবির ভাষায় :

'বঙ্গদেশী বাক্য অনুসরণ করিয়া।
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া॥'

যৌবনের অগ্রদূত, নবীন অধ্যাপক গৌরাঙ্গ মর্ত্যমানুষেরই মতো রাগে ক্রুদ্ধ হয়েছেন, গার্হস্থ্য ও দাম্পত্যজীবনে একনিষ্ঠ হয়েছেন। আবার সংসারত্যাগের পূর্বমুহূর্তে গৌরাঙ্গের দুহাত ধরে যখন শচীমাতা অশ্রুবেদনায় সিক্ত হয়ে মিনতি করেন : 'না যাইহ না যাইহ বাপ মায়েরে ছাড়িয়া'—তখন ভগবান চৈতন্যের চারিদিকে মানবজীবনের সুখ-দুঃখের পরিচিত জীবনরসই ঘনিয়ে আসে।

জীবনের শেষ কয়েকবছর অর্থাৎ অন্ত্যলীলা-পর্বে শ্রীচৈতন্য 'অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্যমহিমা' নিজে আস্বাদন করেছিলেন ও ভক্তগণকে তার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়েছিলেন। এই দিব্যোন্মাদ ভাবজীবনের যে-রসবর্ণনা চরিতকাব্যগুলির মধ্যে পাই, সেখানেও কৃষ্ণচৈতন্যের মানবীয় মহিমার স্পর্শ লেগেছে। কৃষ্ণৈকশরণ, কৃষ্ণপ্রাণ ও রাধাভাবে ভাবিত শ্রীচৈতন্য সমুদ্রের জলে যমুনা ভ্রমে ঝাঁপ দিয়েছিলেন একদিন। ভক্তরা তাঁকে জল থেকে উদ্ধার করার পর তিনি চোখের জলে হৃদয়-প্রাণ ভিজিয়ে করুণকণ্ঠে বলছেন :

'স্বপ্ন দেখিলাম বৃন্দাবনে।
দেখি কৃষ্ণ রাস করে গোপীগণ সনে॥
জলক্রীড়া করি কৈল বন্য ভোজন।
দেখি আমি প্রলাপ কৈল হেন লয় মন॥'

—আমি সেই গোপীজীবন প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের জলকেলি দেখছিলাম, ওগো তোমরা আমার সেই সাধের স্বপ্ন কেন ভেঙে দিলে ?

মধ্যযুগের কবি প্রথমে ভক্ত, তারপর কবি, না প্রথমে কবি তারপরে ভক্ত—একথার মীমাংসা অসম্ভব। শুধু বিতর্ক এড়িয়ে, বলা যায় সেই শ্রদ্ধান্বিত মানুষগুলির মধ্যে কবি ও ভক্তের এক অপূর্ব বিরল সমন্বয় ঘটেছিল। তাই ভক্তের জীবনদৃষ্টি নিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁরা 'দেবতা' করেছেন একদিকে, অন্যদিকে জীবনরসিক কবির দৃষ্টিতে মানুষ চৈতন্যের জীবনাচরণ নিরীক্ষণ করেছেন। দুদিক থেকেই তাঁরা সার্থক। চৈতন্যদেবকে পরিপূর্ণরূপে ভাবীকালের জন্য অশেষ-অনন্ত করে রেখে যাওয়ার জন্য আমরা

তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। মধ্যযুগের কবিদের আমরা প্রণাম জানাই।

আধুনিক চৈতন্যজীবনীকারও ভক্ত। কিন্তু আধুনিক জীবন-নির্ভর নির্মোহ এবং অনেকক্ষেত্রেই নৈর্ব্যক্তিক চেতনার আলোকে চৈতন্যের পুণ্য-জীবনের চিত্রখানি এঁকেছেন। ভক্তপ্রবর প্রফুল্লকুমার সরকার তাঁর 'শ্রীগৌরাঙ্গ' গ্রন্থের ভূমিকায় তাই লিখেছেন : 'একদিকে কবি-ভক্তের নিরঙ্কুশ কল্পনা ও অতিপ্রাকৃত বর্ণনা, অন্যদিকে শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াত্মার অবিশ্বাস, বিদ্রূপ ও উপেক্ষা—উভয়কেই পরিহার করিয়া ঐতিহাসিক সত্যের ভিত্তির উপরে আমি শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত্র বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। ভক্ত, সাধক, গুরু, লোকশিক্ষক, ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ হিসাবেই তাঁহার জীবনকে আমি উপলব্ধি করিয়াছি। বলা বাহুল্য, ভক্তের শ্রদ্ধা ও ভক্তির উপরে আঘাত করিবার কোন ইচ্ছা আমার নাই, তাঁহাদের সঙ্গে আমার কোন বিরোধও নাই।'

যুক্তির সঙ্গে নিষ্ঠা, কল্পনার সঙ্গে বাস্তবতাকে মিলিয়ে নিয়ে আধুনিক লেখক চৈতন্যপূজার উপচার সাজিয়েছেন। আবার সেই শ্রদ্ধার্ঘ্যটির চারপাশে ধূপের সুগন্ধী ধোঁয়ার মতো আবর্তিত হচ্ছে অন্তরের ভক্তিনম্র আবেগ। একটি মহৎ জীবনের স্বরূপ-চিত্রণে এ-যুগের স্রষ্টার বিনীত চিত্ত। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর 'অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ' গ্রন্থের মুখবন্ধই তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ :

'সাধন ভজন নেই, শাস্ত্রজ্ঞান নেই, নেই বা ইষ্টনিষ্ঠা, তবু যে মহাপ্রভুর পুণ্যজীবনী লিখতে প্রবৃত্ত হলাম এ শুধু তাঁরই কৃপায়।··· "এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল। তাঁর অনুসন্ধান বিনা করয়ে সফল।" সুতরাং সেই করুণার ধারাস্নানেই আমার যাত্রা। রসিকশেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ। "মহাকৃপাপাত্র প্রভুর জগাই-মাধাই। / পতিত-পাবনগুণের সাক্ষী দুই ভাই॥" তবে আর ভয় কী, কুণ্ঠা কিসের।'

চৈতন্যজীবনচরিত থেকে আমরা সামগ্রিক-ভাবে চৈতন্যদেবকে কোন্‌রূপে, কোন্‌ভাবে পেলাম? এর মূল্যায়নে আমরা বলব : পরম সৌভাগ্যে আমরা পেলাম এক মহৎ জীবনকে, যিনি একাধারে মানুষ, একাধারে দেবতা। যিনি আপন জীবনের সাধনার মধ্যে দিয়ে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে প্রেমধর্মের নিগড়ে বেঁধেছিলেন, মানুষের অন্তরে সুপ্ত দেবতাকে জাগ্রত করে-ছিলেন, 'হরের্নামৈব কেবলম্'—এই ছোট্ট মন্ত্রটি দান করেছিলেন। আর পেলাম তাঁর জীবন ও সাধনা থেকে উৎসারিত এক বাণী—শত আঘাত পেলেও মানুষকে ভালবাসো। এই বাণী আজকের হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে প্রযোজ্য, সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য, সমস্যা-দীর্ণ সমাজের এক-মাত্র অবলম্বন ও সান্ত্বনা। এই বাণী চিরদিনের। বলা বাহুল্য চৈতন্যজীবনী-সাহিত্যগুলি বিগত কয়েকশ বছর ধরে নীরবে সেই বাণীর প্রচার করে চলেছে।

॥ ৩ ॥

জীবনের বাতায়ন থেকে একদল কবি যখন চৈতন্যদেবকে উপলব্ধি করছিলেন, ঠিক তখনই, সমসময়ে বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় অভিসিঞ্চিত আর-একদল কবি চৈতন্যদেবের জীবন ও বাণী নিয়ে রচনা করছিলেন যুগান্তকারী কিছু গান বা পদ। বৈষ্ণবপদাবলীর ধারায় যে-পদগুলি গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ ও গৌরচন্দ্রিকা অভিধায় খ্যাত। পর চৈতন্যযুগের পদাবলীতে এই দুই ধারার গীত এক অভূতপূর্ব অশ্রুতপূর্ব সংযোজন।

গৌরাঙ্গবিষয়ক পদগুলির মধ্যে দিয়ে কবি বা পদকর্তা আলোকপাত করেছেন শ্রীচৈতন্যের মানবীয় জীবনলীলার অন্তস্তলে। নবদ্বীপচন্দ্র গৌরাঙ্গকে, গোরাচাঁদকে, নিমাইকে কবি

আপনরসের মাধুরী মিশিয়ে মূর্ত করে তুলেছেন। কবি পরমানন্দ বড় আনন্দে, বড় বিশ্বাসে অন্তরঙ্গ সুরে বলছেন :

'পরশমণির সাথে কি দিব তুলনা রে
　　পরশ করিলে হয় সোনা।
আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাহিয়া রে
　　রতন হইল কত জনা॥
　　শচীর নন্দন বনমালী।
এ তিন ভুবনে যার　　তুলনা দিবার নাই
　　গোরা মোর পরাণ-পুতলি॥'

কিংবা পদকর্তা গোবিন্দ ঘোষ নবদ্বীপবাসীদের প্রাণপ্রিয় মানুষটি যখন সবকিছু ত্যাগ করে সন্ন্যাসের কঠিন পথে অগ্রসর হচ্ছেন, তখন আকুল কণ্ঠে কেঁদে বলছেন :

'হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচান্দেরে ফিরাও॥
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়।
নয়ান-পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায়॥'

কবি জানেন, বিশ্বপথিক এই প্রেমের দেবতাটি ঘরে ফিরে আসবেন না, তবুও গৌরাঙ্গের মানস-প্রতিমা অঙ্কনে তিনি তৃপ্ত, অক্লান্ত।

গৌরচন্দ্রিকার পদগুলির বিষয়ও শ্রীগৌরাঙ্গ। কিন্তু গৌরাঙ্গবিষয়ক পদের সঙ্গে তার সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। রাধাকৃষ্ণবিষয়ক লীলাকীর্তনের প্রারম্ভে সেই 'পালার রসদ্যোতক যে গৌরপদ গীত হয়', সেই পদগুলিই গৌরচন্দ্রিকা। এই পদগুলির মূল অবলম্বন রাধাভাবে তদেকাত্ম কৃষ্ণ-স্বরূপ চৈতন্তের ভাবসাধনা। কবি মনীষী চণ্ডীদাসের পূর্বরাগের পদে আছে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা হয়ে :

'ঘরের বাহিরে　　দণ্ডে শতবার,
　　তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন,　　নিশ্বাস সঘন,
　　কদম্ব-কাননে চায়॥'

রাধাভাবিত শ্রীচৈতন্তের কৃষ্ণপ্রেম সাধনায় ঠিক এই একই অবস্থার প্রতিরূপ দেখে ভক্ত কবি লিখলেন :

'আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপ-চন্দ।
করতলে করই বয়ান অবলম্ব॥
পুন পুন গতাগতি করু ঘর পন্থ।
খেনে খেনে ফুল বনে চলই একান্ত॥'

এযুগের কবি লিখেছিলেন, 'বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরিল কায়া।' বস্তুতপক্ষে, গৌরাঙ্গবিষয়ক ও গৌরচন্দ্রিকার পদগুলি পাঠ করলে মনে হয়, কবিপ্রাণ বাঙালীর অন্তরলোক থেকেই চৈতন্তের জন্ম। এই পদগুলি বৈষ্ণব-পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত। অতএব বৈষ্ণবপদাবলীর সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য এই পদগুলির মধ্যেও বিধৃত। সুধী সমালোচকের ভাষায়, 'ছন্দে তাহার জঙ্গমতা, সুরে তাহার যৌবনের আবেগ, ভাবে সঞ্জীবন প্রবাহ, ভাষায় বনকুসুমের কোমলতা, লালিত্য এবং সৌরভ। আর ব্যঞ্জনায় লোকালয়ে অলৌকিক লোকের দূরাগত প্রতিধ্বনি। মর-জগতের সঙ্গে চিন্ময়ধাম গোলোকের সেতুবন্ধ "বৈষ্ণবপদাবলী"।' গৌরাঙ্গবিষয়ক ও গৌর-চন্দ্রিকার পদের সম্মিলনে আমরা অনায়াসে, কোন্ পুণ্যফলে পেয়ে যাই 'গীতিময় বিগ্রহ' শ্রীচৈতন্যদেবকে। পদগুলির সমস্ত সার্থকতা এইখানেই।

॥ ৪ ॥

আমরা এতক্ষণ বলেছি, সাহিত্যের কোন্ আলোকে শ্রীচৈতন্যের মহাজীবন উদ্ভাসিত হয়েছে। সাহিত্যে এই বিশেষ অবতারণা ছাড়াও বাংলা-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় চৈতন্তপ্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। কবিতায়, উপন্যাসে, গল্পে, নাটকে, প্রবন্ধে এবং সর্বোপরি ধর্মতত্ত্ব আলোচনায়। চৈতন্য-আবির্ভাব অথবা চৈতন্য-বাণী সম্পর্কে সাহিত্যস্রষ্টাগণ তাঁদের রচনায়

প্রাসঙ্গিক উল্লেখ করেছেন অকুণ্ঠভাবে, বর্ণনায় অথবা উপমায়, তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় অথবা রস প্রতিষ্ঠায় —যেখানেই প্রয়োজন হয়েছে—শ্রীচৈতন্যকে সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রত্যেকে স্মরণ করেছেন। সেই শত সহস্র উল্লেখের বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া অসম্ভব। আমরা শুধু একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ও এক শ্রেষ্ঠ স্রষ্টার রচনা থেকে চৈতন্যপ্রসঙ্গ উদ্ধার করে সমাপ্তি অর্ঘ্য সাজাব।

সর্বযুগের বিচারে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ শ্রীচৈতন্যপ্রসঙ্গ বিভিন্ন প্রসঙ্গে, বিভিন্নভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এদের মধ্য থেকে মাত্র কয়েকটির চয়ন :

'ঠাকুর আজ [১৮৮৪, ২১শে সেপ্টেম্বর] কলিকাতায় ষ্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দেখিতে যাইবেন।...

'ঠাকুর হাসিতেছেন। কেহ কেহ বলিলেন, বেশ্যারা অভিনয় করে। চৈতন্যদেব, নিতাই, এসব অভিনয় তারা করে।

'শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদিগকে)—আমি তাদের মা আনন্দময়ী দেখ্‌বো।

'তারা চৈতন্যদেব সেজেছে, তা হলেই বা। শোলার আতা দেখ্‌লে সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়।...

'অভিনয় সমাপ্ত হইল। ঠাকুর গাড়ীতে উঠিতেছেন। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন দেখ্‌লেন? ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আসল নকল এক দেখলাম।"

মহেন্দ্র মুখুয্যের কলে যাইতেছে। হঠাৎ ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রেমভরে আপনা-আপনি বলিতেছেন,—

"হা কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! জ্ঞান কৃষ্ণ! প্রাণ কৃষ্ণ! মন কৃষ্ণ! আত্মা কৃষ্ণ! দেহ কৃষ্ণ!" আবার বলিতেছেন, "প্রাণ হে গোবিন্দ, মম জীবন!"...

'মাষ্টার (স্বগতঃ)—ঠাকুর সকলের মঙ্গলের জন্য ভাবিতেছেন। চৈতন্যদেবের ন্যায় ইনিও কি ভক্তি শিখাইতে দেহধারণ করিয়াছেন?'

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ)

'শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বরের উপর ভালোবাসা এলে একটুতেই উদ্দীপন হয়। তখন একবার রাম নাম করলে কোটি সন্ধ্যার ফল হয়।

'মেঘ দেখলে ময়ূরের উদ্দীপন হয়, আনন্দে পেখম ধরে নৃত্য করে। শ্রীমতীরও সেইরূপ হ'তো। মেঘ দেখলেই কৃষ্ণকে মনে পড়তো।

'চৈতন্যদেব মেড়গাঁর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। শুনলেন, এ গাঁয়ের মাটিতে খোল তৈয়ার হয়। অমনি ভাবে বিহ্বল হলেন,—কেননা হরিনাম কীর্তনের সময় খোল বাজে।' (ঐ, ৩য় ভাগ)

'শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা তোমার এসব দেখে কি বোধ হয়?

'মণি—আমার বোধ হয়, তিনজনেই এক বস্তু! —যীশুখৃষ্ট, চৈতন্যদেব আর আপনি—এক ব্যক্তি!

'শ্রীরামকৃষ্ণ—এক এক! এক বই কি। তিনি (ঈশ্বর),—দেখ্‌ছনা,—যেন এর উপর এমন ক'রে রয়েছে!

'এই বলিয়া ঠাকুর নিজের শরীরের উপর অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন—যেন বল্‌ছেন, ঈশ্বর তারই শরীর ধারণ ক'রে অবতীর্ণ হয়েই রয়েছেন।' (ঐ, ৩য় ভাগ)

'ঠাকুর গঙ্গার ধারের গোল বারান্দায় বসিয়াছেন কাছে বিজয়, ভবনাথ, মাষ্টার, কেদার প্রভৃতি ভক্তগণ। ঠাকুর এক-একবার বলিতেছেন—"হা কৃষ্ণচৈতন্য!"...

'বিজয়—চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে বল্লেন, "নিতাই, আমি যদি সংসার ত্যাগ না করি, তা

হলে লোকের ভালো হবে না। সকলেই আমার দেখাদেখি সংসার করতে চাইবে। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করে হরিপাদপদ্মে সমস্ত মন দিতে কেহ চেষ্টা করবে না!"

'শ্রীরামকৃষ্ণ—চৈতন্যদেব লোকশিক্ষার জন্য সংসার ত্যাগ করলেন।

'সাধু-সন্ন্যাসী নিজের মঙ্গলের জন্য কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করবে। আবার নির্লিপ্ত হলেও, লোকশিক্ষার জন্য কাছে কামিনীকাঞ্চন রাখবে না। ন্যাসী—সন্ন্যাসী—জগদ্‌গুরু! তাকে দেখে তবে তো লোকের চৈতন্য হবে!' (ঐ,/৪র্থ ভাগ)

কথামৃতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে এবং কথামৃতকার শ্রীম-র ব্যাখ্যায় চৈতন্যপ্রসঙ্গ কোন্ ব্যঞ্জনায় উন্নীত হয়েছে—তার ব্যাখ্যা দেওয়া বাহুল্য মাত্র। ভক্তগণের হৃদয়ে চৈতন্যপ্রসঙ্গের শুভ্র স্নিগ্ধ আলোখানি অবলীলায় উদ্ভাসিত হবে।

এবার এক শ্রেষ্ঠ স্রষ্টার রচনালোকে শ্রীচৈতন্য। তিনি রবীন্দ্রনাথ। বুদ্ধদেব, যীশু-খ্রীষ্ট প্রমুখ দেবমানবের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে কয়েকটি রচনায় প্রণাম নিবেদন করেছেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে নিবেদিত তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতাও এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সেই তুলনায় চৈতন্যদেব সম্পর্কে বিশেষভাবে তিনি কিছু লেখেননি। কিন্তু তাঁর বিপুল রচনা সম্ভারের ইতস্তত সুনির্দিষ্ট প্রসঙ্গে চৈতন্যদেবের উল্লেখ ও চৈতন্য-আবির্ভাবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আমরা পাই। ৪ জুলাই, ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে কাদম্বিনী দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলছেন: 'এই বৈষ্ণবকাব্য এবং চৈতন্য-মঙ্গল প্রভৃতি কাব্য অবলম্বন করে চৈতন্যের জীবনী আমি অনেক বয়স পর্যন্ত বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করেছি।' অতএব রবীন্দ্র-সাহিত্যে চৈতন্যপ্রসঙ্গের অবতারণা স্বাভাবিকভাবেই স্থান করে নিয়েছে। আমরা এখানে দুটি মাত্র প্রসঙ্গের উল্লেখ করছি।

এক, 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যদেবকে দেখেছেন বাংলাভাষার বাণীবিগ্রহ-রূপে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য একটি মহৎ ও বিশেষ কার্য সম্পাদন করেছিলেন। কবির ভাষায়: 'চৈতন্য বঙ্গভাষায় তাঁহার প্রেমাবেগ সর্বসাধারণের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া-ছিলেন।'

দুই, মধুররসের কাব্যসৃষ্টির একমাত্র প্রেরণা ও উৎসরূপে শ্রীচৈতন্যকে গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্র-নাথ। 'সাহিত্য' গ্রন্থের এক জায়গায় তিনি লিখছেন: 'বর্ষাঋতুর মতো মানুষের সমাজে এমন এক-একটা সময় আসে, যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুররূপে বিচরণ করিতে থাকে। চৈতন্যের পরে বাংলাদেশের সেই অবস্থা আসিয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আর্দ্র হইয়াছিল। তাই দেশে সে-সময় যেখানে যত কবির মন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সকলেই সেই রসের বাষ্পকে ঘন করিয়া কত অপূর্ব ভাষা এবং নূতন ছন্দে কত প্রাচুর্যে এবং প্রবলতায় তাহাকে দিকে দিকে বর্ষণ করিয়াছিল।'

প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত 'বৈষ্ণব কবিতা'র কয়েকটি পঙ্‌ক্তি স্মরণ করি:

সত্য করে কহো মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে।···
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে!

কার নয়ন, কার মুখ, কার আঁখি?—কবির এই আন্তরিক অবাক-জিজ্ঞাসার উত্তরে একটি

সুখের কথাই আমাদের অন্তরে উদ্বেলিত হয়ে উঠে। তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। যিনি 'দেবতারে প্রিয়' করেছিলেন, 'প্রিয়েরে দেবতা'।

সাহিত্যের আলোকে শ্রীচৈতন্য-বিষয়ে আলোচনা আরও বিস্তারিত হতে পারে। আরও অনেক বিষয় নিয়ে শ্রদ্ধাবনত আলোচনা করা যেতে পারে পাতার পর পাতা। এই আলোচনার হয়তো শেষ টানা যাবে না কোথাও। অতলান্ত সাগরের মতোই এর গভীরতা ও বিস্তৃতি। অবিরত ঊর্মি-বিভঙ্গ। অপরিমেয় চৈতন্যসাহিত্য-রূপ জলকল্লোলের ধ্বনি অশেষ, অনন্ত। আমরা সেই বিপুল জলরাশি থেকে সামান্য একটু করপুটে তুলে নিয়ে অঞ্জলি নিবেদন করলাম। আলোচনার এই শেষপর্বে এসে মনে হচ্ছে আমাদের আলোচনার নাম হওয়া উচিত ছিল—চৈতন্যের আলোকে সাহিত্য। সাহিত্যের আলোকে চৈতন্য নয়। যিনি দোলপূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে আবির্ভূত হয়ে জগৎ-সংসারকে আলোকিত করেছিলেন, সাহিত্যের সাধ্য কি যে, তাঁর উপরে আলোকসম্পাত করে! বরং তাঁর জীবন ও বাণীকে গ্রহণ করে বাঙালীর সাহিত্য স্বয়ং আলোকিত হয়েছে। স্বর্ণের উজ্জ্বলতা লাভ করেছে।

আমরা মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পাঁচশত বৎসর আবির্ভাবজয়ন্তীর শুভলগ্নে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও সহস্রপ্রণাম নিবেদন করি :

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার : একদিনের কথা

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিট্যুট অব্ কালচারের প্রকাশন-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত।

'মুক্তিসঙ্ঘ'—পরবর্তী কালে 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সর্বাধিনায়ক ('সুপ্রীম কম্যান্ডার'), অবিভক্ত বাংলার বিপ্লবীদের 'বড়দা', প্রখ্যাত বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের নাম বাংলার মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। শোনা যায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'পথের দাবী'র সব্যসাচী চরিত্রের ধারণা ও কল্পনা হেমচন্দ্র ঘোষের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। মাত্র পাঁচ বছর আগে (৩১ অক্টোবর, ১৯৮০) তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন। বাংলার অগ্নি-যুগের ইতিহাসের এই অন্যতম নায়ক জীবিত-কালেই কিংবদন্তীর পুরুষের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বাংলার বিপ্লব যুগের একটি অধ্যায়ে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের রীতিমত ত্রাসের কারণ। দেশের জন্য বহুবার কারাবাস, বহু নির্যাতন ও লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন তিনি। সেই দেশপ্রেমিক আত্মনিবেদিত মানুষটিকে দেখবার, তাঁর সঙ্গে কথা বলবার প্রথম সুযোগ আমার হয়েছিল ১৯৭৮-এর ২৬ মার্চ। প্রথম সাক্ষাতের পর আরও চারদিন আমাদের দেখা হয়েছিল। শেষ সাক্ষাৎ করেছিলাম ২৬ এপ্রিল, ১৯৭৮। রোমাঞ্চকর আমার সেই অভিজ্ঞতার কাহিনী। স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে লেখা বিভিন্ন বই থেকে তাঁর সম্বন্ধে আগেই অনেক কথা জানতাম। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের "স্বামী বিবেকানন্দ : পেট্রিয়ট্-প্রফেট" এবং ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের

"ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব" গ্রন্থ এবং অন্যান্য নানা সূত্রে জেনেছিলাম যে, হেমচন্দ্র ঘোষ এবং তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ সহকর্মী স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের ব্রতে প্রত্যক্ষ-ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁকে দেখার আগ্রহ বহুদিন ধরেই মনে ছিল। আর সেই আগ্রহের প্রধান কারণ হল : (১) স্বামীজীকে দেখেছেন, তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন এমন একজন মানুষকে দেখব যিনি নাকি স্বামীজীরই বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর মুখে স্বামীজী সম্পর্কে স্মৃতিচারণ শুনব এবং (২) ভারতবর্ষের জাতীয় জাগরণে তথা স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বামীজীর প্রভাব সম্পর্কে একজন প্রবীণতম এবং শীর্ষস্থানীয় মুক্তিসংগ্রামী হিসেবে তাঁর এবং সাধারণ ভাবে মুক্তিসংগ্রামীদের কি ধারণা তা জানব।

প্রথম সাক্ষাতের দিনেই তাঁর কাছে আমার আসার উদ্দেশ্যটি জানালাম। আলোচনার বিষয় স্বামীজী হওয়াতে তিনি খুব আনন্দের সঙ্গে আমার প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলেন। সেই অনুসারে আমি সবসুদ্ধ পাঁচদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করে-ছিলাম। তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের বিভিন্ন দিনে তিনি আমাকে যা বলেছিলেন তার একটি সুদীর্ঘ লিখিত প্রতিবেদন তাঁর অনুমোদনের জন্য তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলাম ২ মে, ১৯৭৮। ঐ ব্যাপারে তাঁকে প্রয়োজনীয় অনুরোধ জানিয়ে এসেছিলাম আমাদের শেষ সাক্ষাতের দিন অর্থাৎ ২৬ এপ্রিল, ১৯৭৮। সুখের বিষয়, তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের সেই সুদীর্ঘ প্রতি-বেদনটি তিনি অনুমোদন করেছিলেন, যা এখন আমি উপস্থাপিত করতে যাচ্ছি। প্রতিবেদনে তাঁর অনুমতিসূচক স্বাক্ষরের তারিখ ৬ মে, ১৯৭৮। আমার আর-একটি অনুরোধের ফল-শ্রুতি হিসেবে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের শেষদিন অর্থাৎ ২৬ এপ্রিল পেয়েছিলাম তাঁর স্বাক্ষরিত (তারিখ ২৩ এপ্রিল, ১৯৭৮) "স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" শিরোনামে তাঁর একটি পৃথক প্রবন্ধ।

বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ

প্রথম দিন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম : স্বামী-জীকে যখন আপনি দেখেন তখন আপনার বয়স কত ছিল ? উত্তরে হেমচন্দ্র বললেন : "আঠারো-উনিশ বছর। আমার জন্ম ১৮৮২ কিংবা ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। ঠিক কোন খ্রীষ্টাব্দটা সে নিয়ে একটা

সন্দেহ আছে। তবে এ-দুটিরই কোন একটা হবে। অর্থাৎ আমি এখন ৯৫।৯৬ বছরের বৃদ্ধ।"

সুতরাং আমি যখন তাঁকে দেখলাম তখন তিনি শত বৎসরের প্রান্ত-সীমায় উপনীত—তাঁর নিজের কথায় "৯৫।৯৬ বছরের বৃদ্ধ"। কিন্তু দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে, প্রায় একটা গোটা শতাব্দীর পুরানো দেহটা বয়সের ধর্মে কিছুটা জীর্ণ এবং অপটু হলেও তাঁর মন তখনও যুবকের মতো সতেজ, স্মৃতিশক্তি তখনও অদ্ভুত প্রখর এবং কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা এবং তেজস্বিতায় তিনি তখনও একটি ঋজু এবং শক্তিমান ব্যক্তিত্ব। তাঁর কাছে বসে সেটি অনুভব না করে পারছিলাম না। জাতীয় জাগরণে স্বামীজীর ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ২৬ এপ্রিল প্রসঙ্গক্রমে তিনি ভারতীয় রাজনীতির এক বিখ্যাত জাতীয় নেতার ভূমিকাকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর মতের সমর্থনে হেমচন্দ্র এক বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিকের লেখা একটি বই থেকে তাঁর মন্তব্য উদ্ধৃত করেন এবং তাঁর নিজের সংগ্রহ থেকে বইটি আমাকে তৎক্ষণাৎ দিয়ে এবং পৃষ্ঠাসংখ্যার উল্লেখ করে তা মিলিয়ে নিতে বলেন। বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছিলাম, তাঁর স্মৃতি অসাধারণভাবে নিখুঁত। হেমচন্দ্র তারপর বললেন: "ইংরেজ রাজশক্তি ভারতবাসীকে নৈতিক, মানসিক, বৌদ্ধিক সকল দিক দিয়ে চিরকালের জন্যে পরাধীন করে রাখার যে সুদূরপ্রসারী গভীর ষড়যন্ত্র করেছিল তা স্বামীজীই সর্বপ্রথম বুঝতে পেরেছিলেন এবং জাতিকে সেই ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের বিষয়ে সচেতন করে দিয়েছিলেন।" লক্ষ্য করেছিলাম, এই বয়সেও হেমচন্দ্র দেশের সাম্প্রতিক ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সামাজিক গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন। শুনলাম যে, এখনও রোজ পড়াশুনা করেন। ওঁর পাশেই দেখলাম বই-এর স্তূপ। হালকা স্বাদের বই একটাও নজরে পড়ল না। অন্যান্য অনেক বই-এর মধ্যে আমার চোখে পড়ল এরকম কয়েকখানা বই-এর নাম উল্লেখ করছি: ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের "হিস্ট্রী অব্ দি ফ্রীডম মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া", মাইকেল এডওয়ার্ডস্-এর "দি লাস্ট ইয়ারস অব্ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া", নিবেদিতার "দি মাস্টার অ্যাজ আই স হিম", ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের "ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব", ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের "স্বামী বিবেকানন্দ: পেট্রিয়ট-প্রফেট", আর. জি. প্রধানের "ইণ্ডিয়াস স্ট্রাগল ফর স্বরাজ", মোহিতলাল মজুমদারের "বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ" ও "জয়তু নেতাজী", রোমাঁ রোলাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীদ্বয় এবং স্বামী গম্ভীরানন্দের "শ্রীমা সারদাদেবী"।

যে-কদিন হেমচন্দ্রের কাছে গিয়েছি প্রত্যেকদিনই দেখেছি স্বামীজীর কথা বলতে গেলেই বারবার তাঁর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে তাঁর বার্ধক্যজীর্ণ দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ একটা বলিষ্ঠ পৌরুষের আভায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তখন ভাবছিলাম, কী বিরাট শক্তিধর তাহলে ছিলেন সেই পুরুষকেশরী যাঁর শুধুমাত্র নামের উচ্চারণে, প্রায় আশী বছর আগে অল্প কয়েকদিনের জন্যে যাঁর সান্নিধ্যে আসার, কথা শোনার স্মৃতি রোমন্থনে এই পঞ্চনবতিপর বৃদ্ধ বিপ্লবী নায়ক এখনও প্রচণ্ডভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। যেন অন্য এক মানুষ হয়ে যান।

॥ ১ ॥

প্রথম যেদিন গেলাম সেদিন (২৬ মার্চ, ১৯৭৮) হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: স্বামীজীকে আপনি কবে দেখেছিলেন?

হেমচন্দ্র বলেছিলেন: "১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ১৯ তারিখ। স্বামীজী সেদিন প্রথম

ঢাকায় পদার্পণ করেন। সেদিনই তাঁকে দর্শন করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বস্তুতঃ স্বামীজী যে মুহূর্তে ঢাকা রেল-স্টেশনের প্ল্যাটফরমে নামলেন তখনই আমি তাঁকে দেখেছি। স্বামীজীকে দর্শন করার জন্যে সেদিন স্টেশনে অসংখ্য মানুষের ভিড় হয়েছিল। যে-কয়জন ভাগ্যবান স্বেচ্ছাসেবক স্বামীজী এবং তাঁর সঙ্গে আর যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের সেই বিরাট উৎসাহী জনতার মধ্যে দিয়ে অতি কষ্টে 'কর্ডন' করে ঘিরে স্টেশনের বাইরে তাঁদের জন্যে অপেক্ষারত দুটি সুদৃশ্য সাজানো ঘোড়ার গাড়ির কাছে নিয়ে গিয়েছিল, আমি ছিলাম তাদেরই অন্যতম। স্বামীজীর ট্রেন স্টেশনে পৌছানোর অনেক আগে থেকেই স্টেশনে এত ভিড় হয়েছিল যে, সকলের দম আটকে যাবার যোগাড় হয়েছিল। আর তাঁকে নিয়ে ট্রেন যখন স্টেশনে এসে পৌঁছাল তখন স্টেশন ছাপিয়ে গেল মানুষের ভিড়। স্বামীজীকে স্বাগত-অভ্যর্থনা জানাতে সেদিন ঢাকার সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সম্মানে এক বিরাট শোভাযাত্রার আয়োজন হয়েছিল। অত প্রকাণ্ড এবং অত স্বতঃস্ফূর্ত শোভাযাত্রা ঢাকার মানুষ তার আগে কখনও দেখেছিল বলে মনে হয় না। সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষ, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, সম্ভ্রান্ত-অসম্ভ্রান্ত—সকলেই সেই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিল। তবে সকলের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল যুবকদের, বিশেষ করে ছাত্রদের উৎসাহ-উদ্দীপনা। দলে দলে অসংখ্য ছাত্র ঐ শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিল। সে-দৃশ্য আমার চোখের সামনে আজও যেন ভাসছে। বাস্তবিক, সেটি ছিল একটি অপূর্ব দৃশ্য। এই প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট কিন্তু একটি অসাধারণ ঘটনার কথা মনে পড়ছে। শোভাযাত্রায় যে-সব ছাত্ররা যোগ দিয়েছিল তারা এবং অন্যান্যরা বারবার পরমহংসদেবের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছিল। কিন্তু একবার ছাত্ররা স্বামীজীর নামে জয়ধ্বনি দেয়। মাত্র একবারই। কিন্তু যেই মাত্র শোভাযাত্রা থেকে সমস্বরে তাঁর নামে জয়ধ্বনি দেওয়া হল তৎক্ষণাৎ স্বামীজী তার প্রতিবাদ করলেন এবং তার পুনরাবৃত্তি করতে নিষেধ করলেন। গভীর আবেগের সঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন : 'আমি পরমহংসদেবের দাসানুদাস। জয়ধ্বনি যদি আপনারা দিতে চান শুধু তাঁর নামেই জয়ধ্বনি দিন।' বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দের গুরুভক্তি এবং বিনয়ের দৃষ্টান্তে সবাই তখন একেবারে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল।[১]

"অন্যান্য অসংখ্য যুবক ও বয়স্ক দর্শনার্থীর মতো আমি এবং আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা রোজই স্বামীজীকে দর্শন ও প্রণাম করতে ঢাকায় স্বামীজীর বাসস্থান ফরাসগঞ্জে মোহিনীবাবুর (মোহিনীমোহন দাসের) বাড়িতে যেতাম। পরম আগ্রহে তাঁর কথা শুনতাম। এইভাবে আমি এবং আমার বন্ধুরা স্বামীজীর শিষ্যদের, বিশেষ করে গুপ্ত মহারাজের (স্বামী সদানন্দের) নজরে পড়ি এবং তাঁদের স্নেহচ্ছায়ায় আসতে সমর্থ হই। স্বামীজী এবং তাঁর শিষ্যরা ঢাকা এবং ঢাকার কাছাকাছি যে সমস্ত প্রসিদ্ধ স্থান দেখতে গিয়েছেন আমি সর্বত্রই তাঁদের সঙ্গে গিয়েছি। ঠাকুরের ভক্ত নাগমশায়ের জন্মস্থান দেওভোগেও আমি স্বামীজীর সঙ্গে গিয়েছি। বলা বাহুল্য, ঢাকার জগন্নাথ কলেজ এবং পগোজ স্কুলপ্রাঙ্গণে স্বামীজী ইংরেজীতে যে দুটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন—তাও আমি শুনেছি। সুতরাং অসংখ্য মানুষের সঙ্গে স্বামীজীর অপূর্ব বাগ্মিতা এবং তাঁর সেই

---

১ স্বামীজী যখন পাশ্চাত্য থেকে এসে কলকাতায় পদার্পণ করেন, তখন শিয়ালদহ স্টেশন থেকে তাঁকে শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সময় শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা স্বামীজীর নামে জয়ধ্বনি দেন। স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ করেন এবং বলেন, একান্তই যদি জয়ধ্বনি দিতে হয়, তবে তা দিন শ্রীরামকৃষ্ণের নামে। অধ্যাপক জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন শোভাযাত্রীদের অন্যতম। তিনিই এই কথা স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীকে জানিয়েছিলেন।

আমি : আচ্ছা, যে-সব বিখ্যাত ভারতীয় বাগ্মীনেতার বক্তৃতা আপনি শুনেছেন তাঁদের সঙ্গে বাগ্মী হিসেবে স্বামীজীর বিশিষ্টতা কোন্ হিসেবে, আপনার মনে হয় ?

হেমচন্দ্র ঘোষ : "দেখুন, স্বামীজীর বক্তৃতা যখন আমি শুনেছি তখন আমার অল্প বয়স। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ঐভাবে বিচার করার শক্তি তখন আমার কম ছিল। আর অন্যান্যদের বক্তৃতা যখন শুনেছি তখন আমার বয়স বেশি। সুতরাং মূল্যায়নের ক্ষমতাও বেশি। তবে যত-দূর আমার মনে হয়, আকর্ষণীয় চেহারা এবং অপূর্ব কণ্ঠস্বর ছাড়াও স্বামীজীর মধ্যে এমন একটা অতিরিক্ত কিছু শক্তি ছিল যা অন্যান্যদের মধ্যে ছিল না। আর সেই শক্তিটি হল, আমার বিবেচনায়, স্বামীজীর 'ইনার ফোরস্' অথবা যাকে বলা যায়, 'দি ফোরস্ অব্ হিজ্ ডিভাইন্ ইন্স্-পিরেশন্'—যেটাই কিনা শব্দের আকারে প্রচণ্ড স্রোতের মতো তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসত এবং শ্রোতাদের মনের উপর প্রবল গতিতে এসে আছ্ড়ে পড়ত আর তাদের একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে পৌঁছে দিত চেতনার এক গভীরতম স্তরে। তাই স্বামীজী যখন বক্তৃতা করতেন শ্রোতাদের কাছে, ভাষা তখন কোনরকম বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারত না। তাঁর কথার আবেদন ছিল এত অনিবার্য এবং এত অব্যর্থ। একথা আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। স্বামীজী যখন বক্তৃতা করতেন তখন তা ছিল তাঁর অন্তরের অনুভূত আবেগেরই বহিঃপ্রকাশ। যে-ভাবনাকে, যে-চিন্তাকে তিনি উপলব্ধি করেছেন, তা-ই স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে তাঁর কণ্ঠ দিয়ে বক্তৃতার মাধ্যমে উৎসারিত হত। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে এরকমটি ছিল না।

"যাই হোক, আমি আগেই বলেছি যে, স্বামীজী ঢাকায় থাকা কালে তাঁকে প্রত্যেকদিনই আমি দর্শন করেছি এবং নানাভাবে সে সুযোগ আমার হয়েছিল। কিন্তু যদিও স্বামীজীকে তাঁর আশ্চর্য কণ্ঠস্বর শোনার সৌভাগ্য আমাদেরও হয়েছিল—যার দ্বারা পাশ্চাত্যের মানুষকে তিনি মুগ্ধ করেছিলেন—জয় করেছিলেন। অবশ্য তখন স্বামীজীর ইংরেজী বক্তৃতা পুরোপুরি বোঝা আমাদের মতো অল্পবয়সী ছেলেদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসেনি আমাদের। কারণ আমার স্পষ্ট মনে আছে যে, তাঁর বক্তৃতার আগুন এবং বিচ্ছুরিত শক্তিতরঙ্গ আমাদের সম্পূর্ণভাবে অভিভূত করে দিয়েছিল। পরবর্তী জীবনে আমি ভারতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মীনেতার বক্তৃতা শুনেছি। কিন্তু স্বামীজীর সঙ্গে বাগ্মী হিসেবে তাঁদের কারুরই তুলনা হয় না। স্বামীজীর কি বীর্যময় দৃপ্ত ভঙ্গী, কি তাঁর রাজোচিত অপূর্ব পৌরুষময় চেহারা! বক্তৃতার সময় শ্রোতাদের মনগুলোকে যেন তিনি তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে রাখতেন। শ্রোতারা যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনত। আর ইংরেজী ভাষার উপর কি তাঁর অসাধারণ দক্ষতা! কি অনবদ্য সাবলীল এবং স্বচ্ছন্দভাবে তিনি অনর্গল বলতে পারতেন ইংরেজী! আর যখন বলতেন তখন কত শক্তিময় হয়ে উঠত সেই ভাষা! আর সবার উপরে ছিল তাঁর সেই অপূর্ব মাধুর্যময় কণ্ঠস্বর এবং তাঁর বিরাট উজ্জ্বল দুটি চোখ। মানুষের তো দূরের কথা, দেবতারও দুর্লভ বোধ হয় ঐরকম অপূর্ব চোখ। আজ থেকে প্রায় আশী বছর আগে আমি স্বামীজীকে দেখেছি, তাঁর বক্তৃতা শুনেছি। কিন্তু আজও সেই অপূর্ব চোখ দুটিকে আমি ভুলতে পারিনি। আর তাঁর সেই স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর যেন আজও আমার কানে বাজছে। জীবনে বহু বড় বড় মানুষের সংস্পর্শে আমি এসেছি। তাঁদের মধ্যে দু-চারজনই মাত্র আমার মনে স্থায়ী কোন দাগ রেখেছেন। আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দেখছি যে, একমাত্র স্বামীজীই আমার মনে যে-দাগ রেখেছিলেন তাই আমার সত্তার গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে।"

ঢাকায় আসার প্রথম দিনেই আমি দর্শন করেছিলাম তবু আমি মনে করি, তাঁকে সত্যিকারের 'প্রথম' এবং 'প্রকৃত' দর্শন আমি করেছিলাম স্বামীজীর ঢাকা থেকে চলে যাবার দু-একদিন আগে।[২] যে-কারণে ঐ দিনটিকে আমার স্বামীজীকে 'প্রথম' এবং 'প্রকৃত' দর্শনের দিন বলছি তা হল এই : ঐ দিনই স্বামীজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে এবং একান্তে দেখা করার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ঐ দিন এবং তার পরের দিন স্বামীজীর সঙ্গে আমার ঐ সাক্ষাতের ফলে আমি জীবনে এক নতুন আলোকের সন্ধান পেয়েছিলাম, যা আমার জীবনের গতিপথকে নির্ধারিত করে দিয়েছিল। অবশ্য ঐ দুর্লভ দর্শনের এবং তাঁর আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণা লাভের সৌভাগ্য শুধু আমার একারই হয়নি। আমার সঙ্গে ঐ দুদিনই ছিল আমার 'বাছাইকরা' কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, যেমন শ্রীশচন্দ্র পাল, আলিমুদ্দিন আমেদ প্রভৃতি। সবসুদ্ধ আমরা ছিলাম দশ-বারোজন। তাদের মধ্যে একমাত্র আমি ছাড়া আর সকলেই আজ পরলোকের বাসিন্দা। এটা একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে, আমাদের ঐ দলের প্রত্যেকেই পরবর্তী কালে হয়েছিল এক-একজন দুর্ধর্ষ মুক্তি-সংগ্রামী। যুগনায়কের সঙ্গে সেই সাক্ষাৎকার তাই শুধু আমারই জীবনের ভবিষ্যৎ যাত্রাপথকে উন্মুক্ত করে দেয়নি, আমাদের সেই বন্ধুগোষ্ঠীর সকলেরই করেছিল। আমাদের সকলের কাছেই সেই সাক্ষাৎকার যেন একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। তখন থেকেই প্রকৃতপক্ষে আমি এবং আমার বন্ধুরা সবাই দেশের মুক্তির জন্যে নিজেদের উৎসর্গ করার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলাম। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে আমরা কয়েকজন ঢাকায় 'মুক্তি-সঙ্ঘ' গঠন করেছিলাম যা পরে 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'-এ রূপান্তরিত হয় আরও বৃহৎ আকারে ব্যাপক কর্মসূচী ও পরিকল্পনার ভিত্তিতে। সুতরাং 'মুক্তিসঙ্ঘ' অথবা পরবর্তী কালের 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'-এর প্রকৃত অর্থে জন্মলাভ হয়েছিল তখনই যখন স্বামীজীর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারের সৌভাগ্য আমরা পেয়েছিলাম। স্বামীজীর সঙ্গে আমাদের ঐ সাক্ষাতের আগে আমরা ছিলাম বন্ধু—'ফ্রেণ্ডস্'। আর তার পর থেকে আমরা হলাম একই আদর্শে বিশ্বাসী ও একই উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত মরমীসুহৃদ্ —'কমরেড্‌স-ইন্-ফেইথ্'। স্বামীজীর প্রেরণা আমাদের প্রত্যেককে একটি অখণ্ড এবং অচ্ছেদ্য বন্ধনসূত্রে চিরকালের জন্যে বেঁধে দিয়েছিল।

"এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই আমার মনে আসছে স্বামীজীর প্রিয় শিষ্য শ্রদ্ধেয় গুপ্ত মহারাজের কথা। গুপ্ত মহারাজ আমাদের বলতেন যে, তিনি হলেন 'স্বামীজীর বান্দা'। গুপ্ত মহারাজই আমাদের স্বামীজীর সঙ্গে ঐভাবে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি তাঁর জন্যেই ঘটা সম্ভব হয়েছিল। সেই মহাপ্রাণ, সদানন্দময় এবং বীর্যবান তেজস্বী সন্ন্যাসীর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। চরিত্র এবং প্রকৃতিতে গুরুর দেওয়া 'সদানন্দ' নামটি তাঁর ক্ষেত্রে হয়েছিল সম্পূর্ণ সার্থক। সিস্টার নিবেদিতা যেমন ছিলেন আত্মনিবেদনের জীবন্ত প্রতিমা, স্বামী সদানন্দও তেমনি ছিলেন তাঁর নামের জীবন্তবিগ্রহ। ঈশ্বরের অনুগ্রহে সিস্টার নিবেদিতাকেও দেখা এবং তাঁর প্রচুর স্নেহ-ভালবাসা লাভ করার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। আমার মনে হয়, স্বামীজী ভারতের কল্যাণের জন্য যেমন প্রাণ চাইতেন, সিস্টার নিবেদিতা এবং গুপ্ত মহারাজ ছিলেন তারই জলন্ত আদর্শ। যাই হোক, আমি

২ ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ৫ এপ্রিল স্বামীজী চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শনে যান। সেখান থেকে গোহাটি হয়ে যান কামাখ্যা। "স্বামীজীর ঢাকা থেকে চলে যাবার দু-একদিন আগে" হলে তারিখটি হওয়া উচিত সম্ভবতঃ ৩ এপ্রিল।

বলছিলাম, স্বামীজীর সঙ্গে আমাদের সেই বিশেষ সাক্ষাতের সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে গুপ্ত মহারাজের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার কথা। আর স্বামীজীর করুণার কথা কি বলব! তাঁর শরীরের অবস্থা তখন বিশেষ ভাল ছিল না এবং সারাদিন সব সময় তাঁর কাছে অসংখ্য দর্শনপ্রার্থীর ভিড় লেগেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পর পর দুদিন আলাদাভাবে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের সঙ্গে পরম স্নেহে কথা বলেছেন। আমরা শুনেছিলাম যে, ভারতবর্ষের কত রাজা-মহারাজা, আমেরিকা-ইংলণ্ডের কত গণ্যমান্য, সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি স্বামীজীকে দর্শনের জন্য লালায়িত হয়ে থাকেন এবং তাঁর দর্শন পেলে নিজেদের কৃতার্থ মনে করেন। ঢাকাতেও আমরা নিজের চোখেই দেখেছিলাম শহরের উকিল, কলেজের অধ্যাপক, বহু সম্ভ্রান্ত মানুষ, স্থানীয় কংগ্রেসের নেতা এবং কলেজের ছাত্ররা কিভাবে রোজ দলে দলে স্বামীজীকে দর্শন করার জন্যে, তাঁর কথা শোনার জন্যে মোহিনীবাবুর বাড়িতে আসতো। এ-সব জেনে এবং দেখেও আমরা তাঁর সঙ্গে আলাদাভাবে দেখা করার আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম। আর আশ্চর্য, তিনিও কয়েকটা অর্বাচীন বালখিল্যের আবদার অনুমোদন করলেন! শুধু অনুমোদন করলেন তাই নয়, তিনি এমন অন্তরঙ্গভাবে আমাদের সঙ্গে কথা বললেন, এমন আগ্রহের সঙ্গে বললেন যে, আমাদের তখন মনে হয়েছিল যেন আমরা তাঁর বাণীকে রূপদান করতে পারব, তাঁর আশা পূর্ণ করতে পারব! স্বামীজীর কথার বিশেষত্বই হল এই যে, একজন যত নগণ্য এবং তুচ্ছ হোক না কেন স্বামীজীর কথা তার মধ্যে একটা প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ও প্রেরণা সঞ্চারিত করে দেয়। সুতরাং স্বামীজীর নিজের মুখ থেকে যখন আমরা তাঁর কথা সাক্ষাৎভাবে শুনেছিলাম তখন আমাদের মধ্যে তার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। যাই হোক, এটা এখনও আমার কাছে মাঝে মাঝে একটা রহস্য বলে মনে হয় যে, কেন, কি জন্যে বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দ আমাদের জন্যে এতখানি করলেন? কারণ, আমি তো জানি, স্বামীজীর সেই দুর্লভ অনুগ্রহ পাওয়ার কোন যোগ্যতাই আমাদের ছিল না। তবে এ পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে যা পড়েছি বা জেনেছি তাতে আমার মনে হয় যে, ভারতের জন্যে তাঁর অপরিসীম উদ্বেগ এবং দেশের তরুণ ও যুবকদের উপর তাঁর বিরাট আশা—যাদের তিনি উত্থিত ও জাগ্রত দেখতে চেয়েছিলেন—এর একমাত্র ব্যাখ্যা। আর আমরা যতই অযোগ্য হই না কেন এটা তো ঘটনা যে বিবেকানন্দ নামক সেই বিরাট আগুনের কয়েকটি ক্ষুদ্রতম স্ফুলিঙ্গ ছিটকে এসে আমাদের সত্তায় প্রবেশ করেছিল। এবং সেই মহা-আগুনের অণুমাত্রও যদি কারোর মধ্যে কোনভাবে একবার প্রবেশ করে তাহলে তা কখনই নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারবে না। সে ব্যক্তি সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হোন বা না হোন, একদিন না একদিন দেখা যাবেই যে, সেই ক্ষুদ্রতম অগ্নিস্ফুলিঙ্গটি ক্রমশ বিস্তৃত হতে হতে তার সমগ্র সত্তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। আর ঠিক তাই হয়েছে আমাদের ক্ষেত্রে। ভারতের স্বাধীনতা যারা ছিনিয়ে নিয়েছিল 'মুক্তিসঙ্ঘ' অথবা 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' যদি ভারত থেকে তাদের দূর করে দেওয়ার ব্যাপারে সামান্যতম ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে, তবে তার মূলে ছিল সেই বিরাট আগুন থেকে ছিটকে আসা কয়েকটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেগুলি একদিন গুটিকয় কিশোর এবং তরুণের বুকের মধ্যে প্রবেশ করেছিল এবং যেগুলিই নিঃসন্দেহে পরবর্তী কালে তাদের অকুতোভয়ে মুক্তি-

দুঃসাহসিক অভিযানে ব্রতী করেছিল। বিপ্লব-পথের সেই অভিযাত্রীদের ভবিষ্যৎ স্বামীজী নিশ্চয় তখনই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শুধু প্রত্যক্ষই করেননি; তারা যখন তাঁর পদপ্রান্তে বসেছিল সেই ক্ষণগুলিতে তিনি যেন নিজের হাতে তাদের ললাট-লিপি লিখে তাদের ভবিষ্যৎকে নির্মাণ করেছিলেন। বাস্তবিক সেই মুহূর্তগুলি ছিল আমাদের কাছে 'মোমেণ্টস্ অব্ ইপিফ্যানি'—আমাদের জীবনে এক পরম আবির্ভাবের মুহূর্ত।

"স্বামীজীর মাকেও আমরা দেখেছি। তিনিও ঢাকাতে এসেছিলেন স্বামীজীর ঢাকাতে আসার ক'দিন বাদে। তিনি অবশ্য ঢাকাতে ছিলেন না। ছিলেন নারায়ণগঞ্জে—ঢাকা থেকে মাইল আষ্টেক দূরে। একালের শঙ্করাচার্যকে যিনি ভারতবর্ষকে উপহার দিয়েছিলেন সেই মহীয়সী নারীর চরণ স্পর্শ করে আমরা কৃতার্থ হয়েছিলাম। সেদিন ছিল আমাদের জীবনের আর একটি স্মরণীয় দিন যেদিন স্বামীজী ও তাঁর মাকে আমরা নারায়ণগঞ্জে একত্র দেখেছিলাম। তাঁকে দেখে আমাদের মনে হয়েছিল যে, তিনি ছাড়া আর কেউ-ই স্বামীজীর মা হতে পারতেন না।

"প্রায় দীর্ঘ আশী বছর আগে স্বামীজীকে আমরা দেখেছিলাম। কিন্তু তাঁর স্মৃতি আজও আমার মনে অম্লান হয়ে রয়েছে। তা আমার কাছে গতকালের ঘটনার মতো স্পষ্ট। মাঝে মাঝে সে-সব কথা আমার স্মৃতিতে ঝলসে ওঠে। এই স্মৃতিই আমার জীবনের শেষ দিনগুলির শক্তি ও তৃপ্তির উৎস। পিছনে ফেলে আসা আমার দীর্ঘ জীবনের দিকে চেয়ে দেখি। ছোট-বড় নানা ঘটনা স্মৃতিতে এসে প্রায়ই ভিড় করে। কিন্তু স্বামীজীর সঙ্গে আমাদের সেই সাক্ষাতের মুহূর্তগুলিই রোমন্থন করে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাই আমি। কি এক পুরুষসিংহ যে ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন ভারতবাসী কি এখনও তা বুঝেছে?"

হেমচন্দ্র তাঁর স্বাক্ষরিত প্রবন্ধে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে বলেছেন: "বীর সন্ন্যাসীর কাছে আমরা গিয়েছিলাম আমাদের পথনির্দেশ চাইতে। সারা ভারতবর্ষে তিনিই তখন সবচেয়ে আলোড়নকারী ব্যক্তিত্ব। পরাধীন ভারতে স্বাধীনতার মন্ত্রগুরু, মুক্তির চৈতন্যদাতা। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সেই দিনটি আমাদের জীবনের একটি মাহেন্দ্রক্ষণ। সেদিন স্বামীজী পরম স্নেহে কাছে বসিয়ে আমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছিলেন। ক্ষাত্রতেজের জলন্ত মূর্তি, বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বসে, তাঁর মুখ থেকে সরাসরি অগ্নিবাণী শুনছি—একথা স্মরণ করলে এখনও সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সেদিন সেই পুরুষ-সিংহের মুখ থেকে নির্গত বীরবাণী আমাদের দেহ-মনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। সে তো শুধু বাণী নয়—মন্ত্র, যা অন্তরের সুপ্ত শক্তিকে উদ্বোধিত করে।...স্বামীজীর মধ্যে আমরা দেখেছিলাম প্রচণ্ড দেশপ্রেমের প্রকাশ। ব্যক্তিগত-ভাবে আমি মনে করি, আমার দেশপ্রেমের প্রকৃত শিক্ষা তাঁরই কাছ থেকে পাওয়া। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচিত হয়ে বুঝেছিলাম দেশের প্রতি ভালবাসা কাকে বলে। ভারতবর্ষের প্রকৃত জাগরণ এনেছিলেন তিনিই।"

হেমচন্দ্রের কাছ থেকে সেদিন যখন বিদায় নিলাম তখন তিনি বললেন: "আবার আসবেন। আপনাদের সঙ্গে কথা বললে আনন্দ পাই। আপনারা স্বামীজীকে ভালবেসে ঘর ছেড়েছেন, আমরাও তাঁর ভালবাসার টানেই ঘর ছেড়েছিলাম একদিন। সংসার, স্বজন, ভবিষ্যৎ সব ভাবনা তখন তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। শুধু এক ভাবনা ছিল আমাদের কি করে দেশকে স্বাধীন করব। সে ভাবনার বীজ, সে স্বপ্নের নেশা স্বামীজীই আমাদের চেতনায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।" হেম-চন্দ্রকে কথা দিয়েছিলাম আবার আসব। শুনে তাঁর চোখ দুটো মনে হল চিক চিক করে উঠল খুশিতে। আবার স্বামীজীর প্রসঙ্গে আলোচনা করতে পারবেন বলেই কি? ঠিক তাই। নিজেই তার উত্তর দিলেন: "আবার স্বামীজীর কথা হবে—যা আমার আত্মার আনন্দ।"

বিবেকানন্দের ইসলাম-ভাবনা

অধ্যাপক আবুল হাসনাত

বহরমপুর কলেজে ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক।

ভারতবর্ষের সনাতন ঐতিহ্যের মহান ব্যাখ্যাতা স্বামী বিবেকানন্দ ইসলাম-সম্পর্কে কিরূপ ধারণা পোষণ করতেন এবং ইসলাম-ধর্ম ও তার আদর্শের প্রতি তাঁর কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, দ্বিধা-দীর্ণ বর্তমানের নিকট এটি একটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন। বিবেকানন্দ স্বদেশে ও বিদেশে নিরলসভাবে বেদান্ত তথা সনাতন ভারতের ধর্ম, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, ভাষা ইত্যাদির উন্নত মহিমার কথা কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। তিনি হিন্দুধর্মকে বিশাল পক্ষ দান করেছিলেন, যাতে সে আকাশে পুনরায় উড্ডীন হতে পারে এবং তার জাড্য মোচন করে তার বিশ্ববিজয় সম্পন্ন করতে পারে। আর ঠিক এই কারণেই তাঁকে ইসলাম-সম্পর্কে একান্তই উদাসীন বলে মনে করা কারও কারও পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়েছিল। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁর ইসলাম-ভাবনা সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ-সম্পর্কে দীর্ঘতর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপিত করার যথেষ্ট উপাদান বিদ্যমান।

রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের পরিবারের মতো নরেন্দ্রনাথের পরিবারেও একটা ইসলামী পরিমণ্ডল ছিল। মোঘল ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে আরবী-ফারসী (বিশেষ করে ফারসী) ভাষা-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ভারতের অভিজাত হিন্দু-পরিবারে খুব স্বাভাবিক-ভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত বিখ্যাত অ্যাটর্নি ছিলেন। আইন-ব্যবসায় উপলক্ষে উত্তর ভারতের নানাস্থানে তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। লক্ষ্ণৌ, লাহোর প্রভৃতি অঞ্চলে কর্ম উপলক্ষে থাকাকালে তিনি মুসলমানী আদব-কায়দা, পোশাক-পরিচ্ছদে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি আরবী-ফারসী-উর্দুতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন।[১] তিনি বাইবেল ও শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে কোরানও বিশেষভাবে পাঠ করেছিলেন। পারিবারিক এই পটভূমিতেই নরেন্দ্রনাথের—ভাবী বিবেকানন্দের আবির্ভাব।

এই পরিবেশগত উদারতার প্রভাব নরেন্দ্র-নাথের বাল্যজীবনেই পরিলক্ষিত হয়েছিল। বাল্যকালে পিতার মুসলমান মক্কেলের নিকট সন্দেশ খাওয়া বা মুসলমান মক্কেলের জন্য নির্দিষ্ট হুঁকায় টান দেওয়ার ঘটনা অনেকের নিকট পরিচিত। এই বৈপ্লবিক প্রয়াস দ্বারা তিনি হিন্দু-সমাজের দীর্ঘদিন পোষিত কঠিন জাতিত্বের ধারণাকে নাড়া দিতে চেয়েছিলেন। বিডন স্ট্রীটে পীরুর রেস্টুরেণ্টে মাংস আহার করার ঘটনার কথা জেনে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "বেশ করেছিস, ভালো হল, তোদের সব কুসংস্কার দূর হয়ে গেল।"[২]

পরবর্তী কালেও এই বিষয়ে বিবেকানন্দের উদারতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু বর্ণনা করেছেন, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ আবু পাহাড়ের এক গুহায় তপস্যা-কালে স্থানীয় এক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের আতিথ্য গ্রহণ করেন। মুনশী জগমোহন লাল বিস্মিত হয়ে বিবেকানন্দকে প্রশ্ন করেন, "আপনি তো হিন্দু-সাধু, আপনি মুসলমান বাড়িতে আছেন কি করে? আপনার খাদ্য হয়ত কখনো-সখনো ছুঁয়েই

---

১ স্বামী বিবেকানন্দ—ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৩, পৃঃ ১০০

২ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৩

ফেলল ?" বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন, "আপনি বলছেন কি ? আমি তো সন্ন্যাসী, আপনাদের সমস্ত বিধিনিষেধের ঊর্ধ্বে। আমি ভাঙ্গীর (মেথরের) সঙ্গে পর্যন্ত খেতে পারি।···আমি দেখি, বিশ্ব-প্রপঞ্চের সর্বত্র ব্রহ্ম প্রকাশিত আছেন। আমার দৃষ্টিতে উচ্চ-নীচ নেই।"[৩]

বিবেকানন্দের এই মানসিক উদারতাই তাঁকে ফারসী সুফী কবিদের উদার মানবতার দিকে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর প্রথম শিষ্য স্বামী সদানন্দ বাল্যকালে জৌনপুরে থাকাকালে মুসলমান-বন্ধুদের কাছে সুফীদের রচনা ও সাধনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে মুগ্ধ হন এবং সুফী মতে প্রভাবিত হন। বিবেকানন্দ সদানন্দের নিকট সুফী কবিতার রস আস্বাদন করেছিলেন। পারস্যের মহাকবি হাফেজের বিখ্যাত গজল—যার প্রথম লাইন "আগার আঁ তুর্কে শিরাজী বা-দাস্ত্ আবাদ দেলে মা-রা" (কাজী নজরুল ইসলাম এর অনুবাদ করেছিলেন এইভাবে—"যদিই কান্তা শিরাজসজনী ফেরৎ দেয় মোর চোরাই দিল্ ফের" ইত্যাদি)—এর দ্বিতীয় লাইনের অর্থ হল এইরকম—"(সেই প্রিয়তমার) গালের কালো তিলের বিনিময়ে আমি সমরখন্দ ও বোখারাও বিলিয়ে দিতে পারি।" এই কবিতাটি আবৃত্তি করতে গিয়ে বিবেকানন্দ আনন্দে বলে তেন, "ছাখো, যে-মানুষ প্রেমসঙ্গীতের সমাদর করতে প্রস্তুত নয়, তার মূল্য আমার কাছে কানাকড়িও নয়।"[৪] বিবেকানন্দ বিখ্যাত ফারসী-কবি রুমীর সুফী-ভাবনার দ্বারাও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। প্রেমের উপলব্ধি ও অনুভূতির ক্ষেত্রে প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ একাকার হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে রুমীর নিম্নলিখিত কবিতাটি বিবেকানন্দের খুব প্রিয় ছিল :

"প্রিয়তমের কাছে গিয়ে দেখলাম—রুদ্ধ দ্বার। করাঘাত করলাম দ্বারে। ভিতর থেকে ভেসে এল কণ্ঠস্বর : কে তুমি ?

আমি বললাম—আমি, আমি।

রুদ্ধ দ্বার।

আমি ফিরে এলাম—আবার গেলাম—দ্বারে করলাম আঘাত। প্রশ্ন ভেসে এল পূর্ববৎ—কে তুমি ?

আমি—আমি—এই যে—এই গো—

রুদ্ধ দ্বার।

তৃতীয়বার যখন আঘাত করলাম, তখনো ।

এবার বললাম—আমি তুমিই, হে প্রিয় !

খুলে গেল দ্বার।"[৫]

কিন্তু এসব ছাড়াও বিবেকানন্দ ইসলাম ও হজরত মহম্মদ (শান্তি) সম্পর্কে যে-সব অসাধারণ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন সেগুলি মুসলমানকে বিশেষভাবে খুশি করে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার বাসনা থেকে উদ্ভূত হয়নি। তিনি বিশ্ব-ইতিহাসপটে ইসলামের রোমান্টিক আবির্ভাব ও তার বিস্ময়কর অগ্রগতির পশ্চাতে যে জ্ঞানের, প্রেমের ও সাম্যের শক্তি, তার বিজয়-অভিযানকে ত্বরান্বিত করেছিল, সে-বিষয়ে তিনি অনেক মুসলমানের চেয়েও বেশি জানতেন। তাঁর সময় এ-দেশে কার্লাইলের "হিরো এণ্ড হিরোওয়ারশীপ" বহুল-পঠিত গ্রন্থ ছিল। বিবেকানন্দ সম্ভবতঃ ঐ গ্রন্থের অন্তর্গত "হিরো অ্যাজ প্রফেট" এবং "হিরো অ্যাজ পোয়েট" প্রবন্ধদুটিতে হজরত

৩ ঐ, পৃঃ ৩৮৪

৪ ঐ, পৃঃ ১৫৪

৫ ঐ, পৃঃ ১৫৬। দ্রষ্টব্য : The Dabistan or School of Manners, translated by David Shea and Antony Troyer, Vol. III, p. 292

মহম্মদের অপেক্ষাকৃত (স্যার উইলিয়াম ম্যুর প্রমুখদের রচনার তুলনায়) নিরপেক্ষ পরিচয় লাভ করে থাকবেন। তিনি গিবনের "ডিক্লাইন এণ্ড ফল অফ রোমান এম্পায়ার" গ্রন্থ ছাত্রাবস্থায়ই পাঠ করেছিলেন। সেখানে বিশ্ব-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের আবির্ভাবের তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন।[৬] পরবর্তী কালে এ-বিষয়ে তিনি আরও গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন। তিনি "পরিব্রাজক" গ্রন্থে[৭] এ-বিষয়ে জ্ঞান-আহরণের বিড়ম্বনার একটি সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। প্রাচীন প্রাচ্য সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি ফরাসী গ্রন্থের (ম্যাসপেরো-কৃত "ইস্তোয়ার আঁসিএন ওরিআঁতাল"—এনসেণ্ট ওরিয়েণ্টাল হিসট্রি) ইংরেজী অনুবাদ সম্পর্কে যখন তাঁকে বলা হল, এই অনুবাদে খ্রীষ্টান-ধর্ম-বিরোধী অংশগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে, তিনি মূল ফরাসী গ্রন্থ পাঠ করে এর সত্যতা উপলব্ধি করলেন। এ-গ্রন্থেও তিনি ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক তথ্য লাভ করেন।

তাঁর এই-সব গ্রন্থ পাঠ এবং নিজস্ব মুক্ত উদার চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় বিদেশে হজরত মহম্মদ ও তাঁর ধর্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা দান করার সময়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুআরি মাসে ক্যালিফোর্নিয়ায় প্যাসাডোনা শেক্‌স্‌পীয়ার ক্লাবে বিবেকানন্দ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "তারপর আমাদের দৃষ্টি সেই মহাপুরুষ মহম্মদের দিকে নিপতিত হয়, যিনি জগতে সাম্যবাদের বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন।…মহম্মদ সাম্যবাদের আচার্য…।"[৮] ঐ বৎসরই মার্চ মাসে সানফ্রান্সিসকোতে তিনি হজরত মহম্মদ সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "…জাতি বর্ণ বা অন্য কিছুর প্রশ্ন নাই। সেই সাম্যভাবে যোগ দাও।"[৯] বিবেকানন্দ ইসলাম-ধর্মের সরলতার যথার্থ চিত্র ঐ বক্তৃতায় তুলে ধরেন। ইসলাম যে-আনুষ্ঠানিকতাকে বর্জন করেছে এ-বিষয়ে বিবেকানন্দ অন্য প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, "পৌরোহিত্যের ভাব একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দেওয়া, সেটা একমাত্র মুসলমান-ধর্মই করিয়াছে। …প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম এই ভাবটিই আনিতে চেষ্টা করিয়াছে।"[১০]

জ্ঞান-বিজ্ঞান সংস্কৃতির প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী এবং সে-ক্ষেত্রে ইসলামের অগ্রগতির প্রতি বিবেকানন্দ ছিলেন একান্তই শ্রদ্ধাশীল। তিনি আধুনিক ইউরোপের নবজাগরণের পশ্চাতে ইসলামীয় সংস্কৃতির উদার জ্ঞানচর্চার অবদানের কথা বহুস্থানে আলোচনা করেছেন। মধ্যযুগের ধর্মান্ধ খ্রীষ্টান-সম্প্রদায়ের বিজ্ঞান-বিরোধিতার সঙ্গে ইসলামের মুক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার তুলনা করে দেখিয়েছেন, ইসলামে বিজ্ঞান-অনুরাগ কত প্রবল ছিল। তিনি এমন কথাও বলেছেন, "নিউ টেস্টামেণ্টে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো বিজ্ঞান বা শিল্পের প্রশংসা নেই। কিন্তু এমন বিজ্ঞান বা শিল্প নেই যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোরান বা হাদিসের বহু বাক্যের দ্বারা অনুমোদিত বা উৎসাহিত নয়।"[১১] এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ এতদূর পড়াশুনা করেছিলেন যে,

---

৬ Gibbon : The Decline and Fall of Roman Empire, Vol. V. Ch.—50

৭ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১১০

৮ ঐ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৭

৯ ঐ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৯—৪০

১০ ঐ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৭

১১ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ৫ম খণ্ড, উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৯২

মুসলিমগণ কর্তৃক আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরী পোড়ানো যে একেবারে ভ্রান্ত এবং ক্রীশ্চানরাই যে এই কাজ করেছিলেন তাও তিনি অবহিত ছিলেন। "পরিব্রাজক" গ্রন্থে তিনি স্পষ্ট বলেছেন, "সে আলেকজেন্দ্রিয়া মূর্খ, গোঁড়া, ইতর ক্রিশ্চানদের হাতে প'ড়ে ধ্বংস হয়ে গেল…।"[১২] বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার ৬ষ্ঠ খণ্ডে সম্পাদক মহাশয় এই ঘটনার একটি ইতিহাস-ভিত্তিক বিবরণ দিয়েছেন।[১৩] এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় (১৯৬৯ সংস্করণ, পৃঃ ১০৩২) আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরী-প্রসঙ্গে আসল ঘটনা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ভারতবর্ষে ইসলাম—এই প্রসঙ্গেও বিবেকানন্দ ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। লুণ্ঠনকারী মুসলমানদের সম্পর্কে তিনি ছিলেন কঠোর। কিন্তু এ-দেশীয় মুসলিম সম্রাটদের মহত্ত্ব স্বীকার করতে বিবেকানন্দ কুণ্ঠিত হননি কোনদিন। বিশেষ করে আকবর প্রসঙ্গে তো তিনি প্রশংসায় মুখর। এ-বিষয়ে তিনি একটি সুন্দর কথা বলেছেন। "আল্লোপনিষদ্" গ্রন্থে "আল্লা" এবং "মহম্মদ" শব্দ অনেকবার ব্যবহার করা হয়েছে ভেবে অনেকে মনে করেন যে, এই উপনিষদে মুসলিমদের আল্লাহ সম্বন্ধে এবং হজরত মহম্মদের আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। বিবেকানন্দ বলছেন, এই উপনিষদ্ প্রক্ষিপ্ত। আকবরের সময় যে বিচিত্র ভাববিনিময় ক্রিয়াশীল ছিল, এই উপনিষদ্ সম্ভবতঃ সেই সময়ই "রচিত" হয়েছিল।[১৪] এবং আমাদের মনে হয় বিবেকানন্দ ঠিকই বলেছেন।

বিবেকানন্দের ইসলাম ও মুসলমান প্রীতি লক্ষ্য করে ভগিনী নিবেদিতা তাঁর সম্পর্কে বলেন, "ইসলামের নাম উচ্চারণমাত্রে আচার্যদেবের মনে যে-চিত্রের উদয় হইত, তাহা উক্ত ধর্মাবলম্বীদের সাগ্রহ ভ্রাতৃত্ববোধের চিত্র—যাহা সাধারণ মানুষকে স্বাধীনতা দান করিয়াছে এবং উচ্চ অবস্থার মানুষদের মনে গণতান্ত্রিক চেতনা আনিয়া দিয়াছে।…মুসলমানেরা যে কেবল নিম্নবংশে-জাত মানুষের সামাজিক অধিকার উন্নীত করিয়াছিল, তাহাই নয়, তাহারা এই অতি শান্তস্বভাব জাতির মধ্যে সংগঠিত সংগ্রাম ও প্রতিরোধের আদর্শকে সংরক্ষিত ও বর্ধিত করিয়াছিল।"[১৫]

সকল ধর্ম সম্পর্কে এই উদার দৃষ্টিভঙ্গী বিবেকানন্দ কিভাবে লাভ করলেন? তাঁর নিজস্ব চিন্তা-চেতনার গভীরতা নিশ্চয়ই তাঁকে সাহায্য করেছে। ভারতীয় বেদান্তের সুউচ্চ মহিমাও ক্রিয়াশীল ছিল। ইসলামের উদার সাম্যভাব কম দায়ী ছিল না। তাঁর পূর্বাশ্রমের উদার পারিবারিক পরিবেশ তাঁর মনে গভীর ছাপ রেখেছিল। এই সর্বব্যাপী সাম্য ও সুফীভাব দ্বারা ভারতের বহু মনীষীই প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে এ-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবই ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামীভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি কিছুদিন ইসলাম-সাধনাও করেছিলেন। এবং ঐকালে মসজিদেও গিয়েছেন।[১৬] ইসলাম-ধর্ম ও সুফীভাব সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচিতির বিষয়ে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের "স্বামী বিবেকানন্দ" গ্রন্থে অনেক তথ্য আছে।[১৭] এ-বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনার অপেক্ষা রয়েছে।

---

১২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৯৭
১৩ ঐ, পৃঃ ৪৯৯
১৪ ঐ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২২৫
১৫ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৯—৪০০
১৬ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে ইসলাম—স্বামী প্রভানন্দ
১৭ স্বামী বিবেকানন্দ—ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ১৮২—৮৩

বিবেকানন্দ তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে শব্দ ব্যবহার ও প্রয়োগের মধ্যেও তাঁর ইসলামী সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রমাণ দিয়েছেন। বিবেকানন্দের বাংলা ভাষা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী, বেগবান এবং মাটির কাছাকাছি। বাংলা ভাষায় —বিশেষ করে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কথ্য ভাষাতে যে-সব আরবী-ফারসী-শব্দের ব্যবহার রয়েছে সেগুলি এ-ভাষাকে জীবনমুখী করে রাখতে অনেকটা সাহায্য করেছে। বিবেকানন্দ তাঁর রচনায় বহু আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন : বাকী, হুঁশিয়ার, জবাব, রোজ, জমি, খুব, খবর, হুকুম, মুশকিল, দখল, আসবাব, ঈশা (বহুস্থানেই যীশুখ্রীষ্ট না বলে ঈশা বলেছেন ; "ইমিটেশন অফ ক্রায়েস্ট" গ্রন্থের নামকরণ করেছেন—"ঈশানুসরণ"), বাদশাহ, পয়গম্বর, সুফী এবং আরও অসংখ্য আরবী-ফারসী শব্দ। আজ যখন আমরা জোর করে "আবহাওয়া"কে বদলে "জলহাওয়া" করছি, তখন বিবেকানন্দের শব্দভাণ্ডারের দিকে একটু লক্ষ্য রাখলে ভাল হয় না কি? বিবেকানন্দের এই শব্দ-প্রয়োগ যে সংস্কৃতি-সমন্বয়ে সাহায্য করেছে এ-কথা অস্বীকার করা যায় না।

বিবেকানন্দের এই সমন্বয়-ভাবনার পরম পরিচয় বিধৃত রয়েছে মহম্মদ সরফরাজ হোসেনকে লিখিত তাঁর অতি বিখ্যাত পত্রে (১০ জুন, ১৮৯৮)। এই পত্রে সমন্বয়ধর্মী বিভিন্ন কথার মধ্যে তিনি বলেছেন, "এইজন্য আমার দৃঢ় ধারণা যে, বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্মপরিণত (আদর্শযুক্ত) ইসলাম-ধর্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানব-সাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক।···

"আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে—হিন্দু ও ইসলাম-ধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইসলামীয় দেহ—একমাত্র আশা।"[১৮] বিবেকানন্দ এইরূপ একটি মহান ভারতের চিত্র মনে মনে কল্পনা করেছিলেন। এই কথার দ্বারা বিবেকানন্দ মস্তিষ্ক ও দেহের মতো বেদান্ত ও ইসলামের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক এবং একের অন্যের উপর নির্ভরশীলতার ইঙ্গিত করেছিলেন বলে মনে হয়। আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত এই উক্তির মধ্যে নিহিত থাকতে পারে। "বৈদান্তিক মস্তিষ্ক" বলতে ভারতীয় মনীষার "transcendent" রূপ এবং "ইসলামীয় দেহ" বলতে ইসলামের প্রধানতঃ immanent রূপ-এর কথাও তিনি বলে থাকতে পারেন। ইসলামের গণতন্ত্র, সাম্য, মানবপ্রেম সবই এই ভাবনার ইসলামে ঈশ্বরচিন্তা এবং জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীতে immanent ভাবনা অনেকাংশে প্রবল ছিল বলে মানুষের প্রতি ইসলামে বার বার দৃষ্টি ফেরানো হয়েছে।

যাই হোক। ইসলামের মূল স্পিরিট তিনি যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং মহান ভারত গড়বার স্বপ্নে তিনি ইসলামকে যথাযোগ্য মর্যাদার ভূমিকাই দিতে চেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বের মানবপ্রেমী ধর্মগুরু অনেকের অপেক্ষা অধিকতরভাবে ইসলামের মনীষাতে ও মানব-প্রেমের গহনে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। এ-বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন। বর্তমানের বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত সংস্কৃতি-চেতনার মুহূর্তে স্বামী বিবেকানন্দের ইসলাম-চিন্তার বিশ্লেষণ একটি নতুন আলোক প্রদর্শন করবে, সন্দেহ নেই।

১৮ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯

ভক্তি—রামকৃষ্ণের বাণী এবং জীবনীতে

শ্রীচিরঞ্জীব ভট্টাচার্য

আনন্দবাজার সংস্থায় যুক্ত বিশিষ্ট লেখক।

ধর্ম তথা দর্শন কোনটাতেই আমার অধিকার নেই। আর 'বেদান্ত' শুরুতেই অধিকারীর যে সকল লক্ষণ বর্ণনা করেছেন তাতে মাদৃশাঃ ক্ষুদ্র-জন্তবঃ ধারে কাছেই ঘেঁষতে পারে না। তবে কিনা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি, 'কোন গুণ নাই মোর কপালে আগুন' এবং দার্শনিক বন্ধুরা বলেন ব্রহ্ম 'নিগুর্ণ' এবং 'তত্ত্বমসি'। অতএব আমিই যখন 'সেই' তখন মোরে আজ থামায় কে রে! অধিকারী অনধিকারীর ভেদাভেদ করুক যারা জ্ঞানবিচারী। আমি তো মুক্ত পাগল। ঘাটাঘাটের বাছাবাছি নেই। জল পেলেই হল। পান করে তৃষ্ণা মেটাই। যা মনে আসে বলি। পাঠক-পাঠিকাদের ক্ষমাশীলতার অন্ত নেই। তাঁরা আমাকে ক্ষমা করেই আসছেন। মাঝে মধ্যে ফোঁস করেন বটে। তবে ছোবল মারেন না। আর যাঁকে নিয়ে আজ সোচ্চার চিন্তা করব তিনি তো মূর্তিমান অভয়—ক্ষমার অবতার। তাঁকে আমার ভয় নেই।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবনে এবং বাণীতে যা উল্লেখ করেছেন তা থেকে তাঁকে অদ্বৈতবাদী বলে ধারণা করতে কোন অসুবিধা হয় না। ব্রহ্মের সঙ্গে ব্যক্তির অভেদত্বই তাঁর মূল কথন। সকল ধর্মেরই মূল লক্ষ্য ব্রহ্মোপলব্ধি। তিনি নিজে সকল ধর্মাচরণ করে একই লক্ষ্যে পৌঁছেছেন বারবার। তবে সর্বসাধারণের জন্য ঠাকুরের উপদেশ ছিল ভক্তিমার্গ। জ্ঞানমার্গ নয়। তাঁর (ঈশ্বরের) শরণ যে নেয় বিবেক-বৈরাগ্য এবং জ্ঞান তার কাছে আশীর্বাদের মাধ্যমে স্বাভাবিক-ভাবেই নেমে আসে। প্রেমের আকুতি থাকলে আপনি প্রভু দেবেন ধরা।

ধর্ম সম্বন্ধে ঠাকুর বলেছেন, 'যত মত তত পথ', অর্থাৎ এক-একটি ধর্ম এক-একটি পথ মাত্র। পথের মূল উদ্দেশ্য বাড়ি পৌঁছনো, বাড়ি বলতে ব্রহ্ম। সব কিছুরই শেষ কথা। পথ বাড়ি নয়, পথে কেউ থাকে না, অতএব ধর্মও শেষ আশ্রয় হতে পারে না। কিন্তু বাড়ি পৌঁছুতে গেলে যেমন পথের প্রয়োজন হবেই, ধর্মের প্রয়োজনীয়তাকেও তেমনি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অর্থাৎ যদিও কেবল ব্রহ্মই সত্য তবুও তাঁর কাছে পৌঁছতে হলে জাগতিক ব্যক্তির কাছে ধর্মও সত্য। এই তত্ত্বটি কিন্তু রামানুজের মতের সঙ্গে মিলে যায়। ঠাকুরের মতে কালী, কৃষ্ণ, শিব, আল্লা, গড সবই একেরই নানান নাম। আমরা আমাদের সুবিধের জন্য সেই ব্রহ্মকে নানান নামে ডাকি। রামানুজও বলেছিলেন ব্রহ্ম সত্য। কিন্তু সেই পরমব্রহ্মে মিলনের আগে যে ধাপগুলি আছে পার্থিব লোকের কাছে তার সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। তাই ঈশ্বর জাগতিক লোকের জন্য অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞানলাভ না হওয়া পর্যন্ত সত্য বৈকি। যিনি এই জাগতিকতার ওপরে উঠতে পারেন তাঁর কাছে তখন শুধু ব্রহ্মেরই অস্তিত্ব আছে। বাকী সব মিথ্যা—ব্রহ্মেই প্রতিভাসিত। দুটি পর্বে দুরকম সত্য বলেই তাঁর অদ্বৈতে কিছু বিশেষ আছে—তিনি তাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। আর শঙ্করাচার্যের মতে ব্রহ্ম ব্যতীত আর সব মিছে। মায়ার খেলায় আমাদের রজ্জুতে সর্পভ্রম। যখন মায়ার আবরণ ঘুচে যাবে তখন সত্য উন্মোচিত হবে। সর্প হবে অদৃশ্য। সূর্য যখন ঢাকা থাকে মেঘে, তখন দেখি না তাকে। কিন্তু মেঘ কেটে গেলেই তাঁর অস্তিত্ব ধরা পড়ে। মায়ার

বাঁধন টুটলেই শুধু ব্রহ্মের দর্শন মেলে।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সবিকল্প সমাধিতেও তাঁর শুদ্ধাভক্তিরঞ্জিত দ্বৈত সম্পূর্ণ বিলীন নয়। এই ভাবমুখ সমাধিতে তিনি ঈশ্বরের বিভিন্নরূপ প্রত্যক্ষ করতেন। একই সোনা বিভিন্নরূপে বিভিন্ন নাম পায়। ঈশ্বরও তেমনি নানারূপে নানান নামে বিরাজমান। সাধনার এই স্তর তিনি কাটিয়ে দ্বৈতকে নিঃশেষে বিলয় করে দেন তোতাপুরীর সান্নিধ্যে আসার পর। অদ্বৈতবাদী সাধু তোতাপুরী চল্লিশ বছরের সাধনায় যে নির্বিকল্প সমাধিতে পৌঁছুতে পেরেছিলেন ঠাকুর তিনদিনেই সেখানে পৌঁছে গেলেন। সমাজ-সংসার মিছে সব। মিছে জীবনের কলরব। তাঁর সঙ্গে মিলন হল দ্বৈতহীন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার। শুধু সচ্চিদানন্দে ডুবে যাওয়া। কিন্তু এ পর্যায়ে পৌঁছুবার জন্য সবিকল্প সমাধির সিঁড়িটিকেও তো অস্বীকার করা যায়নি। তাই ঠাকুরের মধ্যে দুটি সত্যই কি দেদীপ্যমান হয়নি ?

তাছাড়া অদ্বৈতবাদী শঙ্করের মতে ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে জগৎ মিথ্যা হয়ে যায়। অথচ ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য—নির্বিকল্প সমাধিলাভের পরেও তিনি পার্থিব ব্যাপারে অত্যন্ত বিচক্ষণের মতো পরামর্শ দিতেন তাঁর চারপাশের লোকজনদের। আধুনিক ব্রাহ্মধর্মের ভক্তিরসের নদীতে ডুব দিয়ে, সচ্চিদানন্দ-সাগরে পৌঁছনোর ধারণাকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। ডুব দিলে 'চিকের আড়ালে' যারা আছে, অর্থাৎ বাড়ির বৌ কাচ্চাবাচ্চার কী হবে? সংসারী লোক যাঁরা তাঁরা চটকরে সচ্চিদানন্দ-সাগরে পৌঁছুবে কি করে ? ডুবতে হবে আবার ভেসেও উঠতে হবে মাঝে মাঝে। কেশবচন্দ্রকে ঠাকুর বলেছিলেন এই কথা। অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং জগৎ দুইই সত্য। জ্ঞানীর পক্ষে জগৎ মিথ্যা, কিন্তু জগৎকে ভুলে থাকা মিথ্যে ভাবা সংসারী লোকের সাজে না।

নব্য ব্রাহ্মধর্মকে ব্রহ্মরূপ সানাই-এর পোঁ ধরা এবং হিন্দুধর্মকে বহুদেবদেবীরূপ রাগরাগিণীর সঙ্গে তুলনা করে তিনি ভক্তিবাদের স্বীকৃতিই দিয়েছেন। তাই আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাঁকে মনে হয়েছে অদ্বৈতবাদী হয়েও তিনি দ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈতকেও উড়িয়ে দেননি—বরং সাধারণের জন্য অধিকারী ভেদে সরলভক্তির পথই নির্দেশ করেছেন। কথামৃতে বারবার পড়েছি, ঠাকুর বলছেন—কলিতে নারদীয় ভক্তি।

দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যে-সমন্বয় রহিয়াছে, তাহা জগতের কাছে স্পষ্টরূপে দেখাইতে হইবে। শুধু ভারতের নয়, সমগ্র জগতের সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে, তাহাই দেখাইতে হইবে।...বৈদান্তিক সম্প্রদায়গুলি যে পরস্পর-বিরোধী নহে, পরস্পর সাপেক্ষ, একটি যেন অন্যটির পরিণতি-স্বরূপ, একটি যেন অন্যটির সোপান স্বরূপ...।

—স্বামী বিবেকানন্দ

ইসলামের অন-ইসলামি সম্পদ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

'আনন্দ' পুরস্কারে সম্মানিত বিশিষ্ট সাহিত্যিক—লোকসংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন, প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে সুপণ্ডিত—জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ও গল্পকার। আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত।

॥ ১ ॥

খ্রীষ্টীয় নবম শতকে আব্বাসীয় খলিফাদের আমলেই ইসলামী ঐশীতত্ত্ব তথা সৃষ্টিতত্ত্বকে একটা মজবুত ভিত্তি দেওয়ার চেষ্টা চোখে পড়ে। তৎকালীন পণ্ডিত জনেরা ইসলামকে অনেকখানি নমনীয় করে তোলেন এবং গ্রীক, সিরীয়, ভারতীয় (সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি) ও পহ্লভি ঐতিহ্য থেকে ইসলামকে নতুন ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা শুরু করেন। ওইসব ভাষার গ্রন্থাদি আরবিতে অনুবাদ হতে থাকে। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে প্রধানত বিজ্ঞান ও দর্শনসংক্রান্ত উৎসের দিকেই।

কোন চিন্তাই স্বয়ম্ভু বা সমাজবিচ্ছিন্ন আকাশকুসুম যেমন নয়, তেমনি অঋণীও নয়। এখনও পণ্ডিতদের মধ্যে বিবাদ আছে: হোমার মোজেসের কাছে, না মোজেস হোমারের কাছে ঋণী? এতে কৌতুকের ব্যাপার থাকলেও সত্য আছে। মানুষের সব চিন্তাই পরস্পর-সম্পর্কিত উৎস থেকে জাত। প্রত্যেক ধর্মেই একদল পণ্ডিত দেখা যাবে, যাঁরা মনে করেন, তাঁদের ধর্ম বা আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা Sui generis—স্বয়ম্ভু। যুক্তি, সাধারণ জ্ঞান এবং ঐতিহাসিক অন্বেষণ এর বিভ্রান্তি দূর করতে পারে।

অবশ্য ইসলাম নিজেই বলেছে, সে কোন নতুন ধর্ম নয়। প্রথম মানুষ আদমই প্রথম মুসলমান এবং ইসলামই পৃথিবীতে ঈশ্বর-নির্ধারিত ধর্ম, যুগে-যুগে পয়গম্বররা যা শোধন করে আসছেন। আপাতদৃষ্টে এই তত্ত্বের মধ্যে গোঁড়ামি লক্ষ্য করা গেলেও তার প্রতিপাদ্যের অন্তর্নিহিত দৃষ্টিভঙ্গীটি উদার। কারণ প্রফেটরা পৃথিবীর সর্বত্র আবির্ভূত হন এবং ধর্ম শোধন করেন—এই স্বীকৃতিটিও ওই তত্ত্বে থেকে গেছে। তাছাড়া 'মুসলমান' শব্দটির অর্থই হল আত্মসমর্পণকারী, যে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এদিক থেকে বিচার করলে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ-কারী মাত্রেই 'মুসলমান'। একজন ধার্মিক হিন্দু-কেও আরবি ভাষায় 'মুসলমান' বলা যাবে। যে-কোন ধর্মকেই বলা যাবে 'ইসলাম', কারণ সব ধর্মই আত্মসমর্পণ। কিন্তু সংস্কারের ভবীকে ভোলানো কঠিন। মুসলমান এবং হিন্দু দুপক্ষই চটে যাবেন। কাজেই মুসলমান মুসলমানই থাকুন এবং হিন্দু হিন্দুই থাকুন, যদিও আরবে গেলে দেখা যাবে ভারতীয় মুসলমানকেও হিন্দু বলা হচ্ছে। (একবার এক হিন্দু ফিল্মস্টারের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটলে কৌতুকচ্ছলে 'তালাক' শব্দ ব্যবহার করে তিরস্কৃত হয়েছিলাম। কারণ তালাক শুধু মুসলমানের বেলায় নাকি প্রযোজ্য! ভদ্রলোককে বোঝাতে পারিনি আরবি ভাষায় বিবাহ-বিচ্ছেদকেই 'তালাক' বলে। ভাষার ব্যাপারেও মানুষের সংস্কার কী দুর্মর!)

কোন ধর্মই Sui generis নয়। ধ্যানযোগে ঐশী-উপলব্ধি হয়তো সম্ভব। কিন্তু ধর্ম জিনিসটা বেজায় জাগতিকও বটে। সে-কারণে ধর্মের সঙ্গে সমাজবিধান, নীতিশাস্ত্র, দর্শন এইসব ব্যাপার অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। অতীতে বিজ্ঞানও ধর্মচিন্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। দর্শন ও বিজ্ঞান ছিল ধর্মের গণ্ডিতে দাঁড়িয়ে পরস্পরের হাতে হাত রেখে। গ্রীস, আরব, ভারত, চীন সর্বত্র। আর

এই সব জাগতিক বিষয় ধর্মের সংশ্লিষ্ট ছিল বলেই এক ধর্মের জ্ঞানী অন্য ধর্মের জ্ঞানীর কাছে হাত পাততে দ্বিধা করতেন না। তাছাড়া মানুষের নিজের যেমন গতিশীলতা আছে, তেমনি তার চিন্তা ও অভিজ্ঞতাও সচল। আবার জ্ঞানীরা নিজেরাই বিশ্বপরিক্রমা করে বেড়াতেন। সংগ্রহ করতেন অন্য জাতি অন্য দেশ ভিন্ন ধর্ম ভিন্নতর সংস্কৃতির নিদর্শনগুলি। এভাবেই চিরদিন প্রত্যেকটি ধর্ম ও দর্শন নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রত্যেকটি সভ্যতা অপরাপর সভ্যতাকে আত্মসাৎ করেছে। আর মানুষের এই স্বভাবটাকে জানতে হলে খুঁটিয়ে ইতিহাস পড়ার দরকার আছে। আমরা অনেকেই ইতিহাসবিমুখ।

ইহুদি, খ্রীষ্টান, এমন কী হিন্দু ও বৌদ্ধ তত্ত্ব থেকেও ইসলাম সম্পদ সংগ্রহ করেছিল শুনলে কেউ কেউ বিস্ময়ে মূর্ছিত হতেও পারেন। কিন্তু কথাটা ঐতিহাসিক সত্য। আসলে, গোড়াতেই যা বলেছি, ইসলামকে যথাযথভাবে দর্শন ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল সেই সময় থেকে, যখন ইসলাম আরবদেশের সীমানা ডিঙিয়ে অন্য দেশ ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভিন্ন চিন্তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাকে মোকাবিলা করতে হচ্ছিল তাদের সঙ্গে। বোঝাপড়ার দরকার যেমন ছিল, তেমনি ইসলামের তত্ত্বকে যাচাই করতেও হচ্ছিল অপর তত্ত্বের নিরিখে।

শুরুতেই বলেছি, ইসলামকে তাই নমনীয় করা হয়েছিল। অর্থাৎ ইসলাম নিজেকে প্রতিষ্ঠার স্বার্থে অপরাপর তত্ত্বসমূহকে গ্রহণে দ্বিধা করেনি। নিজেকে আরও ভালভাবে ব্যাখ্যা করার স্বার্থেও ইসলাম এই নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছিল। তার ফলে দেখা গেল পরবর্তী আর দুটি শতকের মধ্যেই আরবের মরুভূমির সরল চিন্তাধারা ডালপালা মেলে দিয়ে বিশাল ও জটিল এক বৃক্ষে পরিণত হয়েছে।

খ্রীষ্টীয় নবম শতকে আব্বাসীয় খলিফাদের আমলেই ইসলামের চিন্তাধারায় গভীর এই রূপান্তরের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল।

॥ ২ ॥

বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে আরবদের নিজস্ব একটি বিস্মিত ভাবনা বরাবরই ছিল। কিন্তু প্রকৃত অর্থে 'the philosophy of Nature' এবং cosmology বা সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে আরব-ভাবনাটি ছিল অন্যান্য আদিম ট্রাইবদের মতোই স্থূল এবং সরল। আরবি 'ৎব্'-ধাতুনিষ্পন্ন তাবিয়াহ্ শব্দটিতে প্রকৃতি বোঝাত। কিন্তু পরবর্তিকালে আরব পণ্ডিতরা লাতিন natura এবং গ্রীক physis-এর অর্থে তাবিয়াহ্-কে সম্প্রসারিত করেন। একই কথাটিকে আরবি অনুবাদকরা তাবিয়াহ্ কথাটির অর্থেই সিরীয় শব্দ 'Kjono' থেকে বদলে 'কিয়ান' করে নিয়েছিলেন। তাবিয়াহ্ কোরানে পাওয়া যায় না। কিন্তু তব্ বা ৎব্ পাওয়া যায়। সুন্নি এবং শিয়া উভয় সম্প্রদায়ের তফ্‌সিরকার বা টীকাকার পণ্ডিতরা শব্দটির অর্থ করেছেন পর্দা বা ওড়না, যা মানুষকে ঈশ্বর থেকে পৃথক করে রেখেছে। অর্থাৎ ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে প্রকৃতি নামক জিনিসটি একটি বিলম্বিত ধূসর পর্দার মতো দাঁড়িয়ে আছে। প্রকৃতির পর্দা উন্মোচিত হলেই ঈশ্বরদর্শন ঘটবে বা মানুষ ঈশ্বরের সন্নিধানে পৌঁছুতে পারবে।

খুব তাৎপর্যপূর্ণ এই বক্তব্য, কারণ এখান থেকেই যুক্তিবাদী দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলামের প্রথম পদক্ষেপ। প্রকৃতি-অধ্যয়নের (Study of Nature) প্রতি মনোযোগিতার উৎসও এখানে।

একথা সত্য, ইসলামের প্রথম যুগেই অর্থাৎ পয়গম্বরের মৃত্যুর পর ইসলামি চিন্তাধারা যথার্থ

দর্শনের রূপ নিতে শুরু করে। তাঁর জামাতা হজরত আলির সমকালে হাসান বসরি এর প্রথম রূপকার। কিন্তু তাঁকে 'মুতাজিলা' বা সম্প্রদায়-ত্যাগী বলে কোণঠাসা করা হয়। হাসান বসরিই প্রথম মুতাজিলা দার্শনিক। কিন্তু মুতাজিলা দর্শনে যুক্তিবাদের চেয়েও আবেগেরই ছিল প্রাধান্য এবং বহু পরে সুফিদর্শনে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও মুতাজিলা-আবেগ মিলেমিশে গিয়েছিল। তাহলেও philosophy অর্থে আমরা যাকে দর্শন বলে জানি, গ্রীকচিন্তায় যার উন্মেষ ঘটেছিল এবং মিশর, ইউরোপ এবং পশ্চিম এশিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার অনুসরণ ইসলামে দেখা যায় আব্বাসীয় খলিফাদের যুগেই।

॥ ৩ ॥

বহু ইসলামি পণ্ডিত স্রষ্টা ও সৃষ্ট বিশ্ব বোঝাতে 'হক্' এবং 'খাল্ক্' ব্যবহার করেছেন। সুন্নি দার্শনিকদের মধ্যে 'আশারীয়' গোষ্ঠীর ধর্মতত্ত্বে স্রষ্টা ঈশ্বর দেশকালাতীত সত্তা এবং বিশ্ব বা 'তনজিহ্' হল দেশকালাধীন। হক্ এবং খাল্কের মধ্যে ব্যবধান তাঁদের মতে অসীম। খাল্কের অন্তর্ভুক্ত জিনিস হল প্রকৃতি। এই প্রকৃতি হল প্রত্যক্ষ বাস্তবতাসমূহের সমষ্টি। 'স্রষ্টার পরমা শক্তিতে প্রকৃতি নিরন্তর দ্রবীভূত হয়ে চলেছে।' আরিস্তোতল্-বর্ণিত সৃষ্টি-তালিকার দশটি শ্রেণীর মধ্যে শুধু সারপদার্থ, স্থান এবং গুণ বিষয়গত বাস্তবতা (objective realities)। সময়, দেশ (space) এবং 'বস্তু' (matter) পরমাণুতে বিভক্ত। এই হল আশর্ গোষ্ঠীর প্রতিপাদ্য। তাঁদের মতে, সব আংশিক এবং তাৎক্ষণিক 'কারণ'কে 'পরম কারণ' গ্রাস করে ফেলেছে। ঈশ্বরই সেই পরম কারণের মূলাধার। যা আপাতদৃষ্টে প্রকৃতির নিয়ম বলে মনে হচ্ছে, তা প্রকৃতিরই স্বভাব। আগুনের স্বভাব যেমন পোড়ানো।

সদা ভ্রাম্যমাণ ইশরাকি সাধু এবং সুফিরা আবার ভারতীয় হিন্দু বেদান্ত ও বৌদ্ধ মায়াবাদী দর্শনচিন্তার পাশাপাশি অবস্থান করছেন। তাঁরা ঈশ্বরের দেশকালাতীত সত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু প্রতীকী (তস্‌বিহ্) ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্ব-বর্ণিত মধ্যবর্তী পর্দা উন্মোচন সম্ভব বলে মনে করলেও প্রকৃতিজগতকে একটি ভাবজগতের ছায়া বলে বিশ্বাস করতেন। এক্ষেত্রে গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর কথাও মনে পড়ে যায়। যা ছায়া, তা মায়া মাত্র। প্রকৃত সত্তার নিছক প্রতীক। বস্তুর প্রতীক বস্তু নয়। হিন্দু বেদান্ত-ভাবনা নবম শতকেই অনুবাদের মাধ্যমে আরবে পৌছেছিল। তাই 'আনাল্ হক্' বা 'সোঽহম্' তত্ত্বকে সুফি-চিন্তায় দেখা যায়। আবার ইশরাকি সাধু বিসায়াহ্ তো বলতেন, 'এর পর শূন্যতা।' বৌদ্ধ নাগার্জুনের শূন্যতাবাদের ছাপও খুঁজলে না মেলে এমন নয়, যেখানে ঐশ্বরিক সত্তাও নামহীন শূন্যতায় দ্রবীভূত।

ইসলামি দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রধান ঘাঁটিগুলি ছিল আলেকজান্দ্রিয়া, অ্যান্টিওখ, এদেসা, নিসিবিস, হারান এবং জানদিসাপুরে। এইসব ঘাঁটিতে নতুন 'স্কুলের' অভ্যুদয় ঘটে এবং এগুলি সবই অন-ইসলামি উৎস থেকে সংগৃহীত জ্ঞান-সম্পদে সমৃদ্ধ হতে থাকে। মুতাজিলাদের ঐতিহ্য থেকে কট্টর যুক্তিবাদী এবং নৈয়ায়িকরা যা আত্মসাৎ করেছিলেন, তার সঙ্গে আহরিত বিজ্ঞান সম্পদ যুক্ত হয়। অভ্যুদয় ঘটে জ্যোতির্বিদ্ এবং গণিতবিদ্‌দেরও। হারানে বাস করতেন সেবিয়ান সম্প্রদায়। তাঁদের সংগ্রহে ছিল চালদিয়ান এবং গ্রীক বিজ্ঞানের বহু সম্পদ। ইসলামি পণ্ডিতরা তাঁদের কাছেও হাত বাড়িয়ে-ছিলেন। নবম শতক নাগাদ ইসলামের শক্তি থিতু হতে পেরেছিল। এভাবে অন-ইসলামি সূত্রে সংগৃহীত জ্ঞানই ইসলামকে একটা স্থায়ী

এবং শক্তিশালী আকৃতি দিতে পারল। পণ্ডিতরা দেখিয়ে দিয়েছেন, এমন কী ইসলামি সমাজ-বিধান, যাকে শরিয়া বা শরিয়ৎ বলা হয়, তাও রোমান আইনের কাছে ঋণী।

হিজরি চতুর্থ শতক (খ্রীষ্টীয় দশম শতক) নাগাদ এইসব পণ্ডিতের আবির্ভাব ঘটে ইসলামি জগতে। আবু নাসের আল-সারাবি, আবুল হাসান আল-মাসুদি, ইয়াহিয়া ইবনে-আদি, ইব্রাহিম ইবনে-সিনান, আবুল ফরজ আল-ইস্পাহানি, আবুল হাসান আল-আম্মিরি প্রমুখ।

তারপরই আবির্ভাব ঘটে তিন বিশ্বখ্যাত পণ্ডিতের। তাঁরা হলেন: ইখ্ওয়ান আল-সাকা, আলবিরুনি এবং ইব্নে সিনা—যিনি Avicena নামে ইউরোপীয় বিশ্বে সুপরিচিত। আল-বিরুনির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ছিল গভীর। তিনিই পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র ইসলামি জগতে নিয়ে যান। দেখা যায়, নবম শতক থেকেই সংস্কৃত গ্রন্থাদি আরবিতে অনুবাদ শুরু হয়েছিল এবং পরবর্তী শতক পর্যন্ত এই অনুবাদ চলেছিল। ইখ্ওয়ান আল-সাকার গ্রন্থাদিতে দেখা যায়, তিনি নয়া-পিথাগোরীয় এবং হার্মেটীয় প্রতীক ব্যবহার করছেন। গ্রীক পিথাগোরাসের ঐতিহ্য থেকেই নয়া-পিথাগোরীয় চিন্তার অভ্যুদয় ঘটেছিল। হার্মেটীয় (Hermetic) চিন্তাধারা তৎকালীন ইহুদি, খ্রীষ্টান ও মুসলিম সাধুদের মধ্যে তো ছিলই। সদা ভ্রাম্যমাণ আরিস্তোতলীয় (Peripatetic) গোষ্ঠীর সাধুদের মধ্যেও অনেকে মুসলিম ছিলেন। বিশেষ করে প্রখ্যাত পণ্ডিত ইবনে সিনা বা আবু সিনাকেও মুসলিম Peripatetic বলা হয়েছে আরবি গ্রন্থাদিতে। ইসলামে আরিস্তোতলীয় প্রকৃতি-দর্শনের উন্মেষ ঘটে তাঁরই মাধ্যমে। (দ্রষ্টব্য: সৈয়দ হোসেন নাসেরের An introduction to Islamic Cosmological Doctrines, U. S. A. ১৯৭৮ সংস্করণ।)

সামগ্রিকভাবে ইসলামকে আমরা তিনটি ভাগে সুস্পষ্টভাবে বিভাজিত করতে পারি। পবিত্র বিধান (শরিয়াহ্/শরিয়ত), পন্থা (তরিকাহ্) এবং সত্য (হকিকাহ্)। প্রথমটি হল বাস্তব জীবনসংক্রান্ত বিধান—যার ব্যাখ্যা নিয়ে সুন্নি ও শিয়ার মধ্যে বিভেদ রয়েছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টি সুফিবাদের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। পন্থা এবং সত্য-সংক্রান্ত চিন্তাধারা একান্তভাবে মরমী চিন্তাধারা (esoteric)।

ইসলামে বিজ্ঞান-সংক্রান্ত চিন্তাধারাকেও মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়। তা হল: নকৃলি এবং আকৃলি। প্রথমটিতে বোঝায়, যা কিছু সঞ্চারিত করা যায় বা পাত্রান্তরে, স্থানান্তরে পাঠানো যায়। দ্বিতীয়টিতে বোঝায়, বোধি বা প্রজ্ঞা। ইব্নে খালেদুন 'মোকাদ্দিমা' গ্রন্থে এর বর্ণনা করেছেন (অনুবাদ: F. Rosenthal, নিউইয়র্ক, ১৯৫৮) বিস্তারিতভাবে। বিজ্ঞান-সংক্রান্ত ইসলামি ভাবনা বিজ্ঞানের তিনটি শাখা কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছিল: জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিতবিজ্ঞান এবং রসায়নবিজ্ঞান। কিন্তু গ্রীকদের বেলাতেও যেমনটি ঘটেছিল, ইসলামি পণ্ডিতদের বেলাতেও তাই, আবার হিন্দুদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত রয়েছে এবং তা হল: আকৃলি বা বোধি দিয়ে প্রকৃতি-বিশ্লেষণ। এঁরা সবাই একালের বিজ্ঞানীর মতো শুধু গণিত ও প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়ায় নয়, Vision-এর মাধ্যমেও প্রকৃতি তথা বস্তু ও রূপের বিশ্লেষণ করতেন। নকৃলি-প্রক্রিয়া ছিল স্থূলভাবে প্রকৃতিকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রকৃতি ও তার স্বরূপ জানতে তাঁরা নির্ভর করতেন Vision-এর ওপরও—যা বোধিসঞ্জাত।…
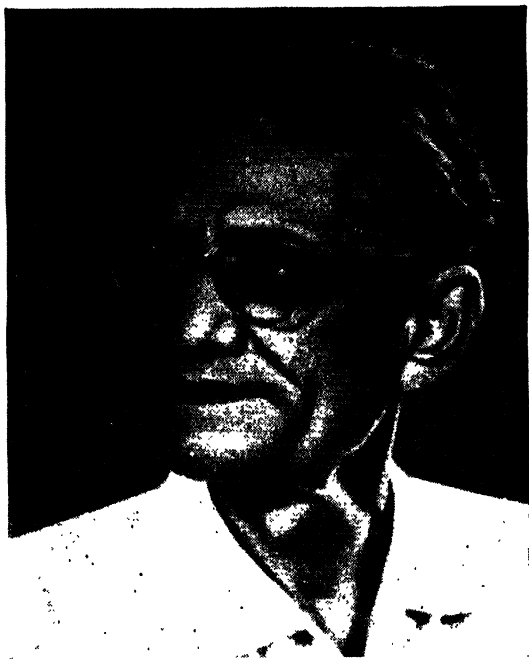
শিল্পী অসিতকুমার হালদার

সৌজন্যে : অতসী বড়ুয়া।

শিল্পী অসিতকুমার হালদার

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা

প্রখ্যাত প্রবীণ শিল্পী—রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলালের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যধন্য—অবনীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত।

পূজার ছুটির শেষে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে এসে ভর্তি হয়েছিলাম ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে। আশ্রম বিদ্যালয়ের শ্রেণীবদ্ধ শালগাছের পূর্বপ্রান্তে বীথিকাগৃহে ও দেহলী বাড়ির সংলগ্ন পশ্চিম দিকের নতুন বাড়িতে তখন শিশুবিভাগের ছাত্রগণ বাস করত। বীথিকাগৃহের গৃহাধ্যক্ষ তখন ছিলেন অধ্যাপক কালীমোহন ঘোষ। নতুন বাড়ির গৃহাধ্যক্ষ ছিলেন বিদ্যালয়ের ড্রইং শিক্ষক সন্তোষকুমার মিত্র। বয়সে ছোট ছিলাম বলে আমি বীথিকাগৃহে বাস করতাম। উড়িষ্যার একটি ত্রিভঙ্গমূর্তি অবলম্বনে আঁকা রেখাচিত্র একবার প্রবাসী পত্রিকায় ছাপানো হয়। সেই রেখাচিত্রটিকে দেখে আমি নকল করেছিলাম। কালীমোহন বাবু আমার নকল করা রেখাচিত্রটি দেখে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং চিত্রটিসহ আমাকে সন্তোষ মিত্রের নিকটে পাঠিয়ে দেন। তিনিও চিত্রটি দেখে প্রশংসা করেন এবং আমাকে শিল্পী অসিতকুমার হালদারের নিকটে নিয়ে যান। অসিতবাবু তখন নতুন বাড়ির একটি গৃহে বাস করছিলেন। গৃহটি ছিল দেহলী বাড়ির সংলগ্ন পশ্চিম দিকে। সন্তোষ মিত্রের কাছ হতে আমার আঁকা রেখাচিত্রটি নিয়ে আমাকে বললেন "তুমি তো আঁকতে জান দেখছি" এই বলে তাঁর পাশের একটি কাঠের ডেস্কের ধারে বসিয়ে দিলেন। একটি সাদা ড্রইং কাগজ ও পেন্সিল দিলেন এবং রামায়ণ বইটি খুলে শিল্পী নন্দলালের আঁকা অহল্যা উদ্ধারের ছবি থেকে রামচন্দ্রের ছবিটি নকল করতে বললেন। আমার জীবনে সেই প্রথম দেখা অসিতকুমার হালদারের সঙ্গে। পরবর্তী জীবনে ছয় দশকের কিছু উর্ধ্ব কাল ধরে তাঁকে নানাভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। চিত্রবিদ্যায় শিক্ষক রূপে, শিল্প ও সাহিত্য আলোচনায়, রবীন্দ্রসংগীত গাইবার কালে সঙ্গীরূপে, শীতের দিনে গাছের ছায়ায় বসে শিল্প সাহিত্য আলোচনার আড্ডার মধুর স্মৃতি জড়ানো দিনগুলির কথা ভাবলে এই বৃদ্ধ বয়সেও মনে বড় আনন্দ বোধ করি।

অসিতকুমারের পিতা সুকুমার হালদার ইংরেজ রাজত্বকালে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে চাকরি করতেন। শিল্পীর মাতা সুপ্রভাদেবী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় কন্যা শরৎকুমারীর কন্যা ছিলেন। অসিতকুমার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। স্কুলের পড়া সমাপ্ত করে কলকাতা সরকারি চারুকলা বিদ্যালয়ে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের নিকটে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার অভিপ্রায়ে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভর্তি হয়েছিলেন। সহপাঠীদের মধ্যে নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, ভেঙ্কটপ্পা ইত্যাদিরা ছিলেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে হিরণ্ময় রায়চৌধুরী ও অসিতকুমার, লিওনার্ড জেনিংসের নিকট ভাস্কর্যে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। চিত্র অঙ্কনের বিষয় নির্বাচনে শিল্পীরা প্রথম দিকে প্রেরণা লাভ করেছিলেন ভারতীয় দেবদেবীর আখ্যান, রূপকথা, পৌরাণিক কাহিনী, মহাকাব্য, ভারতীয় ইতিহাসের ঘটনা ইত্যাদি থেকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বন্ধন হতে মুক্তিলাভের প্রেরণা ভারতীয় সংস্কৃতিকে পুনরুদ্ধারের সহায়তা করেছে। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর ছাত্র শিল্পিগোষ্ঠী ভারতীয় চারুকলাকে

পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়াসী হয়েছিলেন।

কলকাতায় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সোসাইটির দ্বিতীয় বর্ষের চিত্র প্রদর্শনীতে অসিতকুমারের অঙ্কিত বিরহিণী যক্ষপত্নী, যশোদা, শ্রীকৃষ্ণ, সীতা, নৃত্যরতা অপ্সরা, হংস-দময়ন্তী চিত্রগুলি ছিল। নবীন শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্রগুলিকে প্রবাসী পত্রিকায় নিয়মিতভাবে ছাপিয়ে পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় জনসাধারণের মনে শিল্পবোধকে জাগ্রত করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

লণ্ডন হতে ১৯০৯-তে লেডি হেরিংহাম ও মিস লুক ডরোথি আর্চার অজন্তা গুহার দেওয়াল-চিত্র নকল করবার জন্য এদেশে এসেছিলেন। হ্যাভেল, ভগিনী নিবেদিতা ও অবনীন্দ্রনাথের উদ্যোগে প্রথমবার নন্দলাল, অসিতকুমার এবং ১৯১০-এ দ্বিতীয়বার অসিতকুমার, ভেঙ্কটপ্পা ও সমরেন্দ্র গুপ্তকে লেডি হেরিংহামের সহযোগিরূপে অজন্তায় পাঠানো হয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে এসে অজন্তা-প্রভাবযুক্ত কতগুলি পৌরাণিক বিষয় নিয়ে অসিতকুমার কয়েকটি চিত্র এঁকেছিলেন। তার মধ্যে সীতা, শিব-পার্বতী, গুহক ও রামচন্দ্র, মাতা যশোদা ইত্যাদি চিত্রগুলি প্রভূত প্রশংসা লাভ করেছিল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা সরকারি চারুকলা বিদ্যালয় ত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শান্তিনিকেতনে এসে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে নিয়ে চিত্রবিদ্যা শিক্ষাদানের চেষ্টা তিনি করেছিলেন।

১৯০৯-তে অবনীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বিখ্যাত শিল্প সমালোচক এ. কে. কুমারস্বামীর সঙ্গে এবং ১৯১২-তে রাঁচীর নিজ বাড়িতে বিখ্যাত জাপানি শিক্ষাবিদ্ ওকাকুরার সঙ্গে পরিচয় হয়। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ দ্বারা আহূত হয়ে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে যোগীমারা প্রাচীন গুহাচিত্রের নকল করেছিলেন। ১৯১৫-র ২৩ মার্চ লর্ড কারমাইকেল ও তাঁর পত্নী শান্তিনিকেতনে আগমন করেছিলেন। অসিতকুমার তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র মণি গুপ্ত, ডি.এল.রায়, শরদিন্দু, ধীরেন দেববর্মাকে নিয়ে আম্রকুঞ্জের আমগাছগুলির গোড়ায় পদ্মের পাপড়ির আকারে মাটি কেটে তার মধ্যে লাল কাঁকর ভরাট করে নকশা করিয়েছিলেন। সেই সময়ে কারমাইকেল-বেদিটি অসিতকুমারের নকশায় তৈরি করা হয়। কলকাতা সরকারি চারুকলা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পার্সী ব্রাউন অসিতকুমারকে ভাইস প্রিন্‌সিপ্যালপদে নিয়োগ করেছিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বাগগুহা পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন।

অসিতকুমার ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে যখন দেহলী বাড়ির সংলগ্ন গৃহে বাস ও কাজ করছিলেন তখন পিয়ার্সন সাহেবও নিকটেই অন্য একটি গৃহে বাস করতেন। অসিতবাবু ও পিয়ার্সন সাহেবের মধ্যে গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল। পিয়ার্সনের পরিচিতা একজন মার্কিন মহিলা মিসেস ট্রাসী শান্তিনিকেতনে বেড়াতে আসেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা কবিতা অবলম্বনে অসিতকুমার একটি চিত্র এঁকেছিলেন। শিল্পিবন্ধুর এই চিত্রটি পিয়ার্সন মিসেস ট্রাসীকে দেখালে তিনি চিত্রটির উচ্চ প্রশংসা করে পাঁচশত টাকা মূল্য দিয়ে চিত্রটি ক্রয় করেন। সেই সময়ে ভারতীয় যে-কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আঁকা ছবি একশত বা দেড়শত টাকার মধ্যে বিক্রি হত। অসিতকুমারের ছবি পাঁচশত টাকায় বিক্রি হওয়াতে শিল্পিমহলে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। শান্তিনিকেতনে বরাবর একসঙ্গে তাঁকে বাস করতে না দেখলেও মাঝে মাঝে প্রায়ই এখানে এসে বিভিন্ন গৃহে বাস করতে দেখেছি। শান্তিনিকেতনে বড় ফটকের থেকে চীনাভবনের মাঝামাঝি রাস্তার উত্তরদিকে খড়ের ছাউনি

দেওয়া একটা পাকা দেয়ালসহ বাড়ি ছিল। এই বাড়িতেও তাঁকে একবার বাস করতে দেখেছি। তখন তিনি রবীন্দ্রনাথের "তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে" গানটি অবলম্বনে একটি ছবি এঁকেছিলেন। ছবিটি কলাভবনের সংগ্রহে রাখা আছে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলাভবনের অধ্যক্ষ পদে অসিতকুমার যখন শান্তিনিকেতনে সপরিবারে বাস করতে এলেন তখন তিনি এই গৃহেই ছিলেন। পরবর্তিকালে আগুন লেগে বাড়িটি নষ্ট হয়ে যায়।

১৯১৫-র ৭ই পৌষ উৎসবের সময়ে শান্তিনিকেতনে ফাল্গুনী নাটক অভিনয় হয়, রবীন্দ্রনাথ অন্ধবাউল সেজেছিলেন। কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এই অভিনয় হয় ১৯১৭-র জানুআরি মাসে। অসিতকুমার ও পিয়ার্সন সাহেব এই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন ডাকঘর নাটকেও অসিতকুমার দইওয়ালা সেজেছিলেন। রবীন্দ্র-নাটকে যাঁরা ভাল অভিনয় করতেন বলে সুখ্যাতি ছিল অসিতকুমার তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে অসিতকুমারের শান্তিনিকেতনে সস্ত্রীক আগমন ১৯১৯-এ একথা পূর্বে বলেছি। তার পূর্বে কলকাতা সরকারি চারুকলা বিদ্যালয়ে তখন চাকরি করতেন। তাঁর নিকটে যে-সব ছাত্র ছবি আঁকায় শিক্ষা লাভ করতেন তাঁদের মধ্যে হীরাচাঁদ দুগার, অর্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকিঙ্কর ঘোষ ছিলেন। অসিতকুমারের সঙ্গে তাঁরাও শান্তিনিকেতনে চলে আসেন। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা ও উক্ত তিনজন শিল্পিছাত্রদের নিয়ে কলাভবনের প্রথম গোড়াপত্তন হয়। ১৯১৯ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত কলাভবনের প্রথম অধ্যক্ষের পদে অসিতকুমার ছিলেন। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সপ্তাহে দুদিন করে শান্তিনিকেতনে আসা যাওয়া করলেও পাকাপাকিভাবে কলাভবনের কাজে যোগদান করেন ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে। কলাভবনের কাজে যোগদান করে শান্তিনিকেতনে শিল্পী অসিতকুমারের অবস্থান তাঁর জীবনের নূতন অধ্যায় সূচনার সুযোগ এনে দিয়েছিল। নূতন নূতন ছবি আঁকার কাজ ভিন্নও রবীন্দ্রসংগীত যা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় তা গাইবার সুযোগ পেলেন। দ্বারিক নামক গৃহের দোতলায় ছিল কলাভবন আর নিচের তলায় ছিল সংগীতভবন। সংগীতভবনের মাঝের হলঘরটিতে ডোয়ার্কিন কোম্পানির তৈরি ভাল একটি অর্গান রাখা ছিল। প্রতি সন্ধ্যায় উত্তরায়ণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচিত নূতন গান শেখাতেন। পরদিন সকালে ছবি আঁকার ফাঁকে সংগীতভবনে এসে অসিতদা, অর্ধেন্দু ও আমি শেখানো গানগুলি গাইতাম, অর্গানটি আমি বাজাতাম। অসিতদার যেমনি সুন্দর চেহারা, অন্তরটিও ছিল তেমনি সুন্দর ও স্পষ্টবাদী। তিনি আমাদের শিক্ষক হলেও অন্তরের দিক দিয়ে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। প্রথমদিকে কলাভবনের শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা খুব একটা সচ্ছল ছিল না, প্রতিমাসে মাইনে অল্পই পেতেন অন্যসব সরকারি আর্ট স্কুলের শিক্ষকদের তুলনায়। তা হলেও মনে আনন্দের কোন অভাব ছিল না। একবার বসন্তকালে হোলি উৎসবের সকালের দিকে শালবীথিকার রাস্তার উপরে সতরঞ্চি পেতে দীনেন্দ্রনাথ গানের ছেলেমেয়েদের নিয়ে গুরুদেবের বসন্তের গান গেয়ে আসর জমিয়েছেন। সংগীতভবনের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রীও গানের দলে আছেন। অধ্যাপক জগদানন্দবাবু বেহালা ও আমি এস্রাজ নিয়ে গানের সঙ্গে যোগ দিয়েছি। গানের আসরে আশ্রমের অনেকে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অসিতদা, নন্দলালবাবু, তেজেশবাবু, গৌরদা, তপনদা ইত্যাদি আরও অনেকে আছেন। তখনকার দিনে হোলির

সময়ে শান্তিনিকেতনে রঙ বা আবির খেলার প্রচলন হয়নি। বেলা এগারটা পর্যন্ত গান চলেছিল। সন্ধ্যার দিকে দ্বারিকের দোতলায় কলাভবনে দীনুবাবুর উপস্থিতিতে তাঁর চা-চক্রের গোষ্ঠীদের নিয়ে বিশেষ গানের আসর বসে। ভীমরাও শাস্ত্রী হিন্দি হোলির গান গাইবেন। এই গানের আসরে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন তপন চট্টোপাধ্যায়, অসিতদা, সরোজদা, তেজেশবাবু, গৌরদা ইত্যাদি। গান যখন খুব জমে উঠেছে তখন হঠাৎ অসিতদা তাঁর লম্বা লম্বা হাত, পা নিয়ে সরোজদার সঙ্গে ধরাধরি করে উঠে আসরের মাঝখানে অপূর্ব ভঙ্গিতে এধার-ওধার চলে নৃত্য করতে শুরু করলেন। সেই নৃত্যের ভঙ্গি এই বৃদ্ধ বয়সেও চোখের উপর ভেসে ওঠে। নন্দলালবাবু, সুরেনবাবু ও আমরা কয়েকজন কলাভবনের ছাত্ররাও ঐ সন্ধ্যার গানের আসরে যোগদান করেছিলাম।

খুব সম্ভব ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে একদিন সকালে কলাভবনে বসে ছবি আঁকছি এমন সময় অসিতদা এসে বললেন, 'চল, পিয়ার্সনের ওখানে যাই, তাঁকে নিয়ে বর্ধমান রেল স্টেশনে গিয়ে রবিদাদা মশায়কে রিসিভ করব। তিনি বিদেশ ভ্রমণের পরে বোম্বে-কলকাতাগামী রেলগাড়িতে আজ সকালের দিকে বর্ধমান রেল স্টেশনে এসে পৌছবেন।' উত্তরায়ণ অঞ্চলে কোনার্ক নামক বাড়িটিতে তখন পিয়ার্সন বাস করছিলেন। অসিতদার সঙ্গে কোনার্ক-বাড়িটিতে এসে দেখি পিয়ার্সন সাহেব একটি চিঠি টাইপ করছিলেন। আমাদের দেখেই বললেন, 'তোমরা একটু বস, আমি চিঠিটির টাইপ শেষ করি।' এই বলে সামনের টেবিলে একটি প্লেটে করে কতগুলি সন্দেশ খেতে দিলেন। নিজে তিনি ভীম নাগের সন্দেশ খেতে খুব ভালবাসতেন। কলকাতায় গেলেই কিছু সন্দেশ সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন। আমাদের সন্দেশ খাওয়া হয়ে গেলে দেখি পিয়ার্সন সাহেব ইতিমধ্যে জামা-কাপড় পরে প্রস্তুত। তিনজনে বোলপুর রেল স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরলাম। বর্ধমান রেল স্টেশনে পৌছে ওভারব্রিজ দিয়ে যখন পার হচ্ছিলাম তখন লক্ষ্য করলাম বোম্বে-কলকাতাগামী ট্রেনটি ভিন্ন প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে আছে। তাড়াতাড়ি করে ছুটে গিয়ে ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরাগুলিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আমরা তিনজনে মিলে খুঁজে বেড়াচ্ছি, কোথাও তাঁকে দেখতে পেলাম না, একটু অবাক হলাম সবাই। এমন সময় দেখা গেল রেলগাড়ির শেষপ্রান্তের তৃতীয় শ্রেণীর কামরাগুলির দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে আসছেন। আমরা তাড়াতাড়ি করে তাঁর নিকটে গেলাম এবং পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই তিনি বলে উঠলেন, 'ভৃত্য নীলমণিকে বোম্বে পাঠানো হয়েছে আমাকে দেখাশুনো করে নিয়ে আসবার জন্য। কিন্তু আমাকেই সমস্ত পথটায় নীলমণির খোঁজখবর করতে হয়েছে। বর্ধমানে গাড়ি বদল করতে হবে এ-বিষয়ে তার কোন খেয়াল নেই, দিব্বি ঘুমাচ্ছিল, বলে এলাম জিনিসপত্তর নিয়ে নামবার জন্য।' প্রথম শ্রেণীর যে কামরায় তিনি বসেছিলেন সেখান থেকে তাঁর জিনিসপত্তর তা াতাড়ি করে নামিয়ে আনলাম। পরবর্তী বোলপুরগামী রেলগাড়ি ধরে আমরা সকলে বর্ধমান রেল স্টেশন ত্যাগ করেছিলাম।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা হয় ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে। তখন সিংহল থেকে এলেন সদ্ধর্ম বাগীশ শ্রীযুক্ত ধর্মধর রাজগুরু মহাস্থবির। তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি সাহিত্য, বৌদ্ধ দর্শন, মনোবিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যাপনা করতেন। ক্রমে ক্রমে আরও কয়েকজন সিংহলী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। পুরাতন লাইব্রেরির সংলগ্ন পশ্চিমদিকের একটি

গৃহে তাঁরা সকলে বাস করতেন। গৃহটির নাম ছিল গুরুগৃহ। অসিতদার আঁকা তাঁর শ্রেষ্ঠ ও বড় আকারের কোনাল চিত্রটি যখন আঁকছিলেন তখন উক্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের স্টাডি করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। ইণ্ডিয়ান সোসাইটির চিত্র-প্রদর্শনীর থেকে কলকাতার চিত্রদরদী প্রফুল্লনাথ ঠাকুর কোনাল চিত্রটি ক্রয় করেন। প্রফুল্লনাথ ঠাকুর অসিতদার অনেক ভাল ভাল চিত্র পূর্বেই ক্রয় করেছিলেন।

গোয়ালিয়র মহারাজার আমন্ত্রণে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর ও অসিতকুমার হালদার গোয়ালিয়রে বাগগুহার প্রাচীরচিত্র নকল করতে গিয়েছিলেন। ১৯২৩-এ তাঁর বন্ধু উইলি পিয়ার্সনের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন। সেই যাত্রায় সেখানে ছয় মাস থাকার কালে ফ্রান্স ও ইতালি দেশ পরিদর্শন করেন। দেশে ফিরে এসে জানতে পারেন কলাভবনের সঙ্গে তাঁর সংস্রব ছিন্ন হয়েছে। পরিবার নিয়ে এ অবস্থায় খুব অসুবিধায় পড়লেন। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের সুপারিশে জয়পুর রাজকীয় কলানিকেতনে অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে। পরের বছরে ১৯২৫-এ তিনি লখনউ সরকারি চারুকারু বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এইখানে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের সুযোগ পেয়ে শিল্পীর প্রতিভা নানাদিকে বিকাশ লাভ করেছিল। সরকারি চারুকারু বিদ্যালয়ের সমস্ত বিভাগে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের দ্বারা তিনি এর প্রভূত উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়েছিলেন। এ-বিষয়ে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের তথ্যাদিপূর্ণ একটি প্রশংসামুখর সুন্দর প্রবন্ধ প্রবাসী পত্রিকায় তখন ছাপা হয়।

কয়েকটি সম্মান লাভও তিনি করেছিলেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিলাতের রয়েল সোসাইটি অব্ আর্টের ফেলো নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৫৯-এ ভারতীয় ললিতকলা আকাদেমীর সদস্য হন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে লখনউ সরকারি চারুকারু বিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করে বাকি জীবন তিনি লখনউ শহরেই অবস্থান করেন। লখনউ আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষপদের শেষের দিকে তাঁর নূতন উদ্ভাবনা "লেকটিক্" চিত্র নামে থি প্লাই কাঠের স্বাভাবিক দাগগুলির সাহায্যে চিত্র এঁকে তার উপরে গালার পাতলা প্রলেপ দেওয়া হত। এই সব চিত্রে অভিনবত্ব থাকলেও তাঁর প্রথম যুগের চিত্রের সেই ভাব-গভীরতার, আবেগের অভাব দেখা যায়। "লেকটিক্" চিত্রগুলি মডার্ন আর্টধর্মী বলা চলে।

সাহিত্যিক অসিতকুমারের দক্ষতা প্রকাশ পায় তাঁর প্রবন্ধে,কবিতায়, গল্পে, নাটকে ও স্মৃতিকথায়। তাঁর লিখিত পুস্তকের সংখ্যা প্রায় আঠারখানি হবে, তার মধ্যে অজন্তা (১৩২০ বঙ্গাব্দ), বাগগুহা ও রামগড় (১৩২৮ বঙ্গাব্দ), য়ুরোপের শিল্পকথা (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ), ভারতের শিল্পকথা (১৩৪৬ বঙ্গাব্দ), রবিতীর্থে (১৩৬৫ বঙ্গাব্দ), ঋতুসংহার, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, খেয়ালিয়া, মেঘদূত এগুলি তাঁর উৎকৃষ্ট লেখা।

অসিতকুমারের রেখাচিত্রগুলি ও রঙিন চিত্রগুলি প্রধানত লিরিক্যাল বা গীতধর্মী ; রসে, ছন্দে অপূর্ব। তিনি নিজেও ছিলেন হাসিতে, কথায়, গানে, আনন্দে সর্বদা উচ্ছল ও প্রাণচঞ্চল। ১৯২৫ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত লখনউ সরকারি চারুকারু বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদে যখন তিনি কর্মরত ছিলেন তখন আমি অনেকবার লখনউতে বেড়াতে গেছি। আমার এক আত্মীয়া লখনউতে থাকতেন, তাঁর ওখানে গিয়ে উঠতাম, আবার অনেক সময়ে অসিতদার বাড়িতেও গিয়ে উঠেছি। আমাকে পেলে তিনি খুব আনন্দিত হতেন। গল্পে, গানে, তাঁর লিখিত কবিতা পাঠে দিনগুলি মুখরিত হয়ে উঠত। বাড়িতে একটা অর্গান বাজনা ছিল, সেটা

বাজিয়ে আমার কাছ থেকে যতটা সম্ভব তাঁর অজানা রবীন্দ্রসংগীতগুলি শিখে নেবার চেষ্টা করতেন। লক্ষ্য করতাম রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি কি গভীর আকর্ষণ ও ভালবাসা। অসিতদা বেশ ভালই গান করতে পারতেন। পুরাতন টেনিস খেলার জাল কেটে তিনটি হেমক বা ঝুলন্ত দোলনার মতো তৈরি করে কয়েকটি বড় বড় গাছের ডালে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। হেমকের মধ্যে কম্বল ও বালিশ থাকত। শীতকাল, অসিতদা বিদ্যালয়ের ছুটি উপভোগ করছিলেন। সকাল নয় ঘটিকার মধ্যে অসিতদা, তাঁর এক পিসতুতো ভাই যোধাদা ও আমি হেমকে গিয়ে আরাম করে বসতাম এবং নানা গল্প, সাহিত্য, শিল্প বিষয়ে আলোচনা হত। মাঝে মাঝে নিকটেই বাড়ির থেকে মুখরোচক খাদ্য ও চা পরিবেশিত হত। শীতের ঠাণ্ডার মধ্যে মধ্যাহ্নের রোদ বড় মিষ্টি বোধ হত। আর-একবার লখনউতে গেছি। তখন তিনি সরকারি চারুকারু বিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করে সেখানেই গোমতী নদীর ধারে সিভিল লাইনের একটি বাড়িতে বাস করছিলেন। গ্রীষ্মকাল শুরু হয় হয়। অপরাহ্ণ বেলা চার ঘটিকার কাছাকাছি সময়ে আমাকে নিয়ে নিকটেই ভাস্কর হিরণ্ময় রায়চৌধুরীর বাড়িতে গেলেন। ঘরের দরজা বন্ধ দেখে হীরুদা, হীরুদা বলে ডাকলেন। দরজা খুলতেই দেখি ঘর অন্ধকার,—বুঝা গেল, হীরুদা দিবানিদ্রা দিচ্ছিলেন। অসিতদার সঙ্গে আমাকে দেখেই সাদরে ডেকে নিয়ে বসালেন। হীরুদা ছিলেন গল্পের রাজা, নানারকম গল্প বলতে পারতেন। সেদিনের গল্পের প্রসঙ্গে বলেছিলেন—জয়পুর মহারাজার ভাণ্ডারে প্রচুর হীরা, জহরত ছিল। সেগুলির আসল, নকল যাচাই ও মূল্য ঠিক করার জন্য একজন বৃদ্ধ, অভিজ্ঞ জহুরীকে আনা হয়েছিল। জহুরী এমনি ওস্তাদ ছিল যে, হীরা, চুন্নি পাথরটি হাতের মুঠির মধ্যে ধরেই পাথরের উত্তাপ অনুভব করে কোন্‌টি আসল ও কোন্‌টি নকল পাথর বলে দিতে পারত। এমনি সূক্ষ্ম উত্তাপ বোধ ছিল লোকটির। কলকাতার এক দোকান থেকে আমি একটি আংটি খরিদ করে আঙুলে পরেছিলাম। অসিতদা আংটিটি দেখে ভাল লাগায় আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর আঙুলে পরা আংটিটি হীরুদাকে দেখিয়ে বললেন, "তুমি তো সেই পাকা জহুরীর দেশে কিছু কালের জন্য ছিলে, তোমারও নিশ্চয়ই পাথর চেনবার বিদ্যে কিছুটা জানা থাকবে, বল তো এই আংটির পাথরের মূল্য কত হতে পারে?" এই বলে নিজের আঙুল থেকে আংটিটি খুলে হীরুদার হাতে দিলেন। তিনি ভাল করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আংটিটি দেখে গম্ভীরভাবে বললেন, তিনশত টাকা তো হবেই। এই কথা শুনে অসিতদা বললেন, এত বেশি হবে না। তার পরে দুইশত টাকা হয়ে যখন দেড়শত টাকায় নামল তখন হীরুদা বললেন, এর চাইতে আর কিছুতেই কম হতে পারে না। অসিতদা হাসতে হাসতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ধীরেন, ঠিক কত মূল্য ফাঁস করে দাও।" চৌরঙ্গীর এক দোকান থেকে পনের টাকায় কিনবার কথা বলতে হীরুদা একটু থ হয়ে গেলেন এবং নিজের জহুরী বিদ্যার দৌড় কত দূর বুঝতে পেরে আর গম্ভীর থাকতে পারলেন না, একটু হেসে ফেললেন। হীরুদাকে সেদিন খুব ঠকানো গেছিল।

অসিতদার কাছ থেকে যেমন আন্তরিক স্নেহ সর্বদা পেয়েছি, তেমনি তাঁর উদার হস্ত সর্বদা প্রসারিত ছিল যে-কোন প্রকার সাহায্য করবার জন্য। মন তাঁর এত উদার ছিল যে, অতীতের তিক্ততা সহজে ভুলে গিয়ে সকলকেই সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসতেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসে অমিয় চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে রবীন্দ্রনাথ

লখনউতে এসেছিলেন। এলাহাবাদ ও কানপুরেও সে-যাত্রায় একই কারণে গিয়েছিলেন। তখন লখনউর বিশিষ্ট বাঙালী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বন্ধুদের সহায়তায় বেশ কিছু টাকা বিশ্বভারতীর জন্য অসিতদা সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ একদিন অসিতদার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হন। অসিতদাকে দেখে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন, "অসিত, তোমাকে দেখতে এখন বেশ খোলতাই হয়েছে।" উত্তরে অসিতদা নাকি বলেছিলেন, "রবি দাদামশাই, এখন যে আমি সিলভারটনিক খাই।" এ-কথাটা পরে অসিতদা হাসতে হাসতে আমাকে বলেছিলেন।

তাঁর নিজের সংগ্রহ করা চিত্র এবং নিজের আঁকা অনেক চিত্র এলাহাবাদ সরকারি সংগ্রহ-শালায় প্রদান করেন। অন্যত্র কতকগুলি মিউজিয়ামেও তিনি নিজের আঁকা চিত্র প্রদান করেন। অবনীন্দ্রনাথের প্রথম যুগে বাংলায় অসিতকুমার শিল্পী হিসাবে যতটা পরিচিত ছিলেন, পরবর্তিকালে সেটা কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়,—তার প্রধান কারণ জীবনের শেষের দিকে তিনি উত্তর ভারতেই বরাবরের জন্য বসবাস করে-ছিলেন বলে। উত্তর ভারতে তিনি বিশিষ্ট শিল্পিরূপে সর্বজন পরিচিত ছিলেন। ভারতীয় শিল্পজগতে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিবেকানন্দগতপ্রাণ শরচ্চন্দ্র

শ্রীমতী ছায়া বন্দ্যোপাধ্যায়

'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-প্রণেতা শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী'র বিদুষী দৌহিত্রী।

'আজ আপনাকে আর এড়িয়ে যেতে দেব না; বলুন—আপনি আমাকে দীক্ষাদানে ধন্য করবেন?'

ব্যাকুল শরচ্চন্দ্রকে নাগমশায় সস্নেহে ধুলো থেকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'আমি সামান্য লোক, আমি এসবের কি জানি। স্বয়ং শঙ্কর আপনার গুরু হবেন।'[১] ব্যথিত শরচ্চন্দ্র নাগমশায়ের আশ্বাস বাক্যে পুলকিত হলেও শান্ত হলেন না। এ কেবল স্তোক-বাক্য, নিজে এড়িয়ে যাবার জন্য। জ্ঞানিভক্ত শরচ্চন্দ্রের হৃদয় কিন্তু অচিরেই শান্ত হয়ে আসে—মন বলে উঠল: নাগমশায়ের মতো সিদ্ধপুরুষের মুখের বাক্য কখনও নিষ্ফল হবে না। সুতরাং অপেক্ষা করা যাক।

বৃহৎ কোন সম্ভাবনার আগে পরম করুণাময় ঈশ্বর সবার অলক্ষ্যে প্রাথমিক পর্ব নীরবে সমাধা করে রাখেন। পুববাংলা (বর্তমান বাংলাদেশ) ফরিদপুরের মাদারীপুর মহকুমার অখ্যাত পল্লী কোটাপাড়ার এক শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ইতিপূর্বেই উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করে উপযুক্ত চাকরি অন্বেষণে কলিকাতায় বসবাস করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম বিশিষ্ট গৃহিসন্তান নাগমশায় পূর্বপরিচিত সুহৃদ; পিতৃস্থানীয়, পরম আত্মীয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনিই প্রথম শরচ্চন্দ্রকে দক্ষিণেশ্বরে ও আলমবাজার মঠে নিয়ে যান। তাঁরই আগ্রহে শরচ্চন্দ্র পরিচিত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) ও যোগীন মহারাজের (স্বামী যোগানন্দ) সঙ্গে। বরাহনগরের পরে আলমবাজারের সেই পুরানো

১. "নাগমহাশয়"—বিনোদিনী মিত্র।

বাড়িতে তখন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ স্থানান্তরিত। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানদের কঠোর তপস্যা এবং ভগবদ্‌ব্যাকুলতায় শরচ্চন্দ্র এক চুম্বকের মতো আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলেন। কর্ম থেকে অবসর পেলেই তিনি সেখানে গিয়ে জমায়েত হতেন। স্বামীজীর শিষ্য কানাই মহারাজের (স্বামী নির্ভয়ানন্দ) সঙ্গে হাটবাজার করা, সাধুদের উচ্ছিষ্ট বাসন মাজা এবং শশী মহারাজের আদেশে স্বহস্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ রান্না ইত্যাদি কর্মে শরচ্চন্দ্র নিজেকে পরম ধন্য মনে করতেন। স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনলাভ কিন্তু তখনও পর্যন্ত শরচ্চন্দ্রের জীবনে ঘটে ওঠেনি। স্বামীজী ঐ সময়ে পরিব্রাজকরূপে, ভারতবর্ষ পর্যটন করছিলেন এবং তার কিছুদিন পর আমেরিকা যাত্রা করেন। শরচ্চন্দ্র বিমুগ্ধচিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের কাছ থেকে স্বামী বিবেকানন্দের কথা শুনতেন।

সম্ভাবনাময় এক বনস্পতির প্রকাশ-উপযোগী নানাবিধ প্রস্তুতিপর্ব চলেছে তখন। উচ্চশিক্ষিত, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র ক্রমশঃ অধ্যাত্মজীবনের প্রাথমিক শিক্ষা এইসব বালসন্ন্যাসীদের কাছ থেকে গ্রহণ করতে লাগলেন। বেদান্তানুরাগী শরচ্চন্দ্র ক্রমেই তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের জন্য উতলা হতে থাকেন। 'শিবমহিম্নঃ' স্তব পাঠ করার জন্য সংস্কৃত জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তের একাগ্রহৃদয়ই অধিক কাম্য ; শশী মহারাজের কাছ থেকে এই কথা শুনে শরচ্চন্দ্র ধারণা করতে পারলেন যে, উপলব্ধির রাজ্যে শুষ্ক জ্ঞান নয়,—ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞানের সাধনই সমধিক প্রয়োজন। ভক্ত ও ভগবানের হৃদয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা না থাকায়—এক ছিলিম তামাক সেজে, ভোগের পর শ্রীরামকৃষ্ণের পটের সামনে আধ ঘণ্টা পর্যন্ত ধরে শশী মহারাজের দাঁড়িয়ে থাকা দেখে তাঁর মনে হত, নিশ্চয়ই এঁর মাথায় ছিট আছে। ভাবাবেশে নাগমশায়ের এখানে ওখানে পড়ে যাওয়া এবং দুই গুরুভাই—নাগমশায় ও শশী মহারাজ মুখোমুখি বসে "জয়গুরু" "জয়গুরু" বলতে বলতে সাশ্রুনয়নে ও রুদ্ধকণ্ঠে অবস্থান—সবই তাঁর কাছে নিছক পাগলামি মনে হত। কিন্তু বিধাতার অলক্ষ্য নির্দেশে বিচারপ্রবণ শরচ্চন্দ্রের হৃদয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির রস জারিত হতে থাকে। ভক্তের হৃদয়েই ভগবানের বাস। নিজেকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে প্রিয়তম ইষ্টের সঙ্গে যে একাত্মতাবোধ—জীবনের সকল সাধনা—সকল বিচার—সকল ভক্তির সেটা তো শেষ কথা। রসময়ী ধরিত্রীর ঋতুতে ঋতুতে রূপ পরিবর্তনের মতো শরচ্চন্দ্রের আন্তর-প্রকৃতিতেও অপূর্ব বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের প্রকাশ ঘটতে থাকল—হৃদয়ানুভূতির এক-একটি দ্বার উত্তরোত্তর উন্মোচিত হতে লাগল। বেদান্ত-বিচারের প্রখর নিদাঘশেষে ভক্তির রসধারা এল জীবনে। জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির সার্থক মিলন ঘটল। নবজীবনের আবির্ভাবের শঙ্খ বেজে উঠল।

স্বামীজী দেশে ফিরে এলেন,—সারা বিশ্বে আত্মার বিজয় ঘোষণা করে, তুমুল আলোড়ন তুলে। শরচ্চন্দ্র চললেন তাঁকে দর্শন ও অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসের শেষভাগে এক মধ্যাহ্নে, অন্তর-দেবতার অমোঘ বিধানে, শ্রীগুরুর সঙ্গে শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর চাক্ষুষ মিলন ঘটল। স্বামি-শিষ্যের প্রথম মিলন-স্থান বাগবাজারে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। স্বামীজীর চরণ-সমীপে তাঁকে সেদিন নিয়ে গিয়েছিলেন—স্বামী তুরীয়ানন্দজী। তেজোদৃপ্ত যুবকের প্রাথমিক পরিচিতিতেই বিবেকানন্দ হলেন চমৎকৃত, আকৃষ্ট, —শরচ্চন্দ্র হলেন মুগ্ধ,—সম্মোহিত। এরপর চলল দেয়া-নেয়ার পালা। একজন শুধু বিতরণে উন্মুখ,—অন্যজনে প্রাণভরে কুড়িয়ে নিতে।

ক্রমশঃ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ মে, দীক্ষালাভের

বিশেষ দিনটি এগিয়ে আসতে লাগল। শরচ্চন্দ্র অবশ্য ইতিমধ্যে মনে-প্রাণে স্বামীজীকেই গুরুপদে গ্রহণ করেছেন। কয়েকদিন আগে এক প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে তিনি আলমবাজার মঠে গিয়ে উপস্থিত। স্বামীজী তখন খালি গায়ে—মেঝেতে মাতুর বিছিয়ে বিশ্রাম করছেন। নীরবে শরচ্চন্দ্র গিয়ে কাছে বসলেন হঠাৎ তিনি দেখেন, সাক্ষাৎ 'শঙ্কর' সম্মুখে শয়ান রয়েছেন শরচ্চন্দ্র বিদ্বান, তার উপর বিচারশীল। কোন দৃশ্যকে বা ঘটনাকে বিনা যুক্তিতে মেনে নেবার পাত্র নন। নিজের চোখকে মার্জন করে ভাল করে নিরীক্ষণ করে দেখেন,—হ্যাঁ সত্যই—জ্যোতির্ময় শায়িত শঙ্কর। ভয় সঙ্কোচ কাটিয়ে আরও নিকটবর্তী হয়ে সুস্পষ্টই দেখেন—যোগমগ্ন অপরূপ শিব-মূর্তি, মানব শরীর নয় কিংবা দৃষ্টির ভ্রমও নয়। বিস্ময়ের আর কূল-কিনারা পান না ; এমন সময়, —অন্ধকার রাত্রিতে সহসা বিদ্যুতালোকে আলোকিত পথের দিশার মতো, কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রুত সাধু নাগমশায়ের সেই ভবিষ্যদ্-বাণীর কথা মনে পড়ে যায়। শরচ্চন্দ্র নিঃসংশয় ও নিশ্চিন্ত হলেন। অপেক্ষা করে রইলেন, কবে স্বামীজী তাঁকে শিষ্য বলে সস্নেহে গ্রহণ করবেন। শিবাবতার স্বামীজী শরচ্চন্দ্রকে গ্রহণ করলেন আপন সন্তানরূপে,—আনুষ্ঠানিক অর্থেই তাঁকে দীক্ষা প্রদান করলেন। স্বামীজীর বিশিষ্ট সন্ন্যাসিশিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দের দীক্ষাও ঐদিনেই হয়েছিল।

স্বামীজী বারবারই শিষ্যকে যাচাই করে দেখেন, তরুণ শিষ্যের মনের দৃঢ়তা ও হৃদয়ের গভীরতা কতখানি। বুঝতে চাইলেন,—গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে অথবা ছাদের উপর থেকে লাফিয়ে পড়লে তার কল্যাণ হবে বিবেচনা করে ঐরূপ আদেশ করলে শিষ্য তা পালন করবে কিনা। বৃহস্পতিবারের বারবেলায় গঙ্গায় নৌকোযাত্রায় গুরুভাইরা সবাই আপত্তি জানালে, স্বামীজী শিষ্যকে বললেন—"চল্ বাঙাল, আমার সঙ্গে"—এও শিষ্যের পক্ষে আর-এক পরীক্ষা! মাঝ-গঙ্গায় হাওয়ার গতি তীব্র হওয়ায় নৌকো খুব জোরে দুলতে লাগল। বাঙালের গুরুভক্তি ততক্ষণে টলোমলো—বুক ভয়ে টিপ্‌টিপ্ করছে। কিন্তু, যেই গুরুর দিকে চোখ পড়ল—দেখে, গুরু নির্বিকার—পরম প্রশান্তি তাঁর চোখে-মুখে,—আনন্দ ভরপুর হৃদয়ে গুণগুণ করে গান গাইছেন। ব্যস্, হৃদয় হতে সব সংশয়, ভয় মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল। এই যে সমর্পণ—এ অতি বিরল। এই বিশ্বাসও অতি দুর্লভ! শরচ্চন্দ্রের জীবনে সমর্পণ ও বিশ্বাস শেষ দিনটি পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। বরং বলা চলে, উত্তরোত্তর দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে। নিবেদিতার হাতে ছোঁয়া মিষ্টি এবং জল খাইয়ে আচারনিষ্ঠ শিষ্যের গোঁড়ামির আর-এক পরীক্ষা নিলেন গুরু। রহস্য করে সবাইকে শুনিয়ে স্বামীজী বলেছিলেন—'আজ এই ভট্‌চায্-বামুন নিবেদিতার এঁটো খেয়ে এসেছে।' দুষ্টুমিভরা হাসি নিয়ে শরচ্চন্দ্রের দিকে ফিরে বললেন—'তার ছোঁয়া মিষ্টি না হয় খেলি, তাতে অত আসে যায় না। কিন্তু তার ছোঁয়া জলটা কি করে খেলি?' তৈরি উত্তর—'গুরুর প্রসাদরূপ অমৃত গ্রহণ করেছি। এবং আপনার আদেশে চণ্ডালের ভাতও খেতে পারি।' পরীক্ষার শেষ নেই! আরও একবারের মতো গুরুভক্তির পরীক্ষা হয়েছিল। সর্বগ্রাসী সূর্যগ্রহণের পুণ্যক্ষণে নৈষ্ঠিক গোঁড়া ব্রাহ্মণ যে গঙ্গাস্নান ও জপধ্যানে ডুবে যাবে বলাই বাহুল্য। ছলনা করলেন ব্রহ্মবিদ্ গুরু। স্বামীজী সেদিন কলকাতায় বলরাম-ভবনে। শিষ্যের সেদিন সুযোগ হয়েছিল শ্রীগুরুর জন্য নিজ হাতে রান্না করার। স্বামীজী তাঁর আদরের 'বাঙাল' সন্তানের হাতে পূর্ববঙ্গীয় রন্ধনরীতিতে প্রস্তুত আহার্য

খুব তৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। স্বামীজী সেদিন খুশি হয়ে বলেছিলেন—'এমন কখনও খাইনি।' কিছুক্ষণের মধ্যেই চারিদিকে শাঁক-ঘণ্টা বেজে উঠলে এবং মেয়েদের উলুধ্বনিতে মুখরিত হলে স্বামীজী শিষ্যকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন—'ওরে গেরন লেগেছে—আমি ঘুমোই, তুই আমার পা টিপে দে।' শিষ্যও পরমানন্দে শ্রীগুরুর পদসেবায় রত হয়ে ভাবতে থাকেন—'এই পুণ্যক্ষণে গুরুপদ সেবাই আমার গঙ্গাস্নান ও জপ।' সূর্যগ্রহণের মতো বিশেষ কালে বা পুণ্যক্ষণে গুরুপদ সেবাই যে গঙ্গাস্নান ও জপ-ধ্যানেরও অধিক পুণ্য বহন করে, এই দুর্লভ শিক্ষা-লাভের এমন প্রত্যক্ষ যোগাযোগও বা কয়জনের জীবনে ঘটে!

এরপর চলল শরচ্চন্দ্রকে নিজের যোগ্য শিষ্য করে গড়ে তোলার পালা। স্বামীজী স্বয়ং তাঁকে শাস্ত্রপাঠ করাতে লাগলেন। ঋগ্‌বেদের কঠিন ভাবার্থ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জলের মতো সহজ করে দিলেন। শঙ্করাচার্যের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের অংশ বিশেষের প্রতি কটাক্ষ করে এক-দিন খোঁচা দিলেন স্বামীজী। শঙ্করাচার্যের প্রতি গভীর অনুরাগবশতঃ শরচ্চন্দ্র কিন্তু ঐ খোঁচাকে নীরবে সহ্য করতে না পেরে,—তেজোদৃপ্ত স্বরে শ্রীগুরুর মন্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন। যেমন অগ্নি তাঁর তেমনই শিখা। পশুরাজ সিংহ যেন বারবারই লেজে কামড় দিয়ে শাবকের অন্তর্নিহিত শক্তির পরীক্ষা নিচ্ছে। যুগাচার্য স্বামীজী তাঁর প্রিয় শিষ্যকে প্রকৃত অর্থেই বেদান্তজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন এবং উত্তরজীবনে তাঁর সেই গুরুদত্ত আত্মবিদ্যার শক্তি সমধিক পরিস্ফুরিত হয়েছিল। কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের পরে বৈদান্তিক শরচ্চন্দ্র তাঁর ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ আচার্যের ভাবানুগ 'বিবেকভাষ্য'—এই শিরো-নামে একখানি ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অসমাপ্ত সেই বেদান্তভাষ্যের ভূমিকাংশটি মাত্র 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ১৩৬৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

বেদান্তজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী শিষ্যকে গড়ে তুলেছিলেন আদর্শ ভক্তরূপে। শিখিয়ে-ছিলেন ভক্তিরাজ্যের শ্রেষ্ঠ সাধন আত্মনিবেদন—সমর্পণ। তাই তো দেখা যায় যখন সমর্পণ,—শরচ্চন্দ্র সেখানে অনুনয় বিনয় করে গুরুকৃপা ভিক্ষা করছেন,—'বলুন, এ জীবনেই ঈশ্বরলাভ হবে কিনা,—আপনি বলে দিলেই হবে।'

১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত, শরচ্চন্দ্রের সমগ্র জীবনে এই জ্ঞান ও ভক্তির আশ্চর্য সমন্বয়ই মূল-মন্ত্র হয়ে দেখা দিয়েছে। ব্রহ্মবিজ্ঞানের সঙ্গে গুরু-ভক্তির অত্যাশ্চর্য সমীকরণই তাঁর সাংসারিক জীবনের সমস্যাবহুল দিনেও তাঁকে কখন অবসন্ন হতে দেয়নি। শ্রীগুরুর স্থূল অন্তর্ধানের পরে সম্পূর্ণ বিবশ শরচ্চন্দ্রকে উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে আবার সামলে নিতে কিঞ্চিৎ সময় নিয়েছে ঠিকই—কিন্তু সেই বিহ্বলতাও ভগবদ্‌বিরহেরই নামান্তর। 'স্বামীজীর প্রতি', 'পূর্বস্মৃতি' প্রভৃতি রচনায় প্রকাশিত তাঁর হৃদয়ের সেই বিরহ-বিধুর-ভাব বড়ই করুণ! হৃদয়ব্যথা, জলভরা মেঘের মতো গুচ্ছ গুচ্ছ এখানে ওখানে চাপ বেঁধে রয়েছে—কবিতার ছত্রে ছত্রে; বড় নিবিড়, মর্ম-বেদনা মাখা! কথার ছলে, আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে শ্রীগুরুপ্রদত্ত মূল্যবান উপদেশগুলিই তাঁর ব্যক্ত হয়েছে জীবনের অন্তিম দিনেও।

সে ১৯১১/১২ খ্রীষ্টাব্দের কথা। শরচ্চন্দ্র তখন ফরিদপুরের কুরাশি গ্রামের কোটাপাড়ায় বাস করছেন। সম্ভবতঃ মেদিনীপুর থেকে বরিশালে বদলীর প্রাক্‌কালে। গুরুর অদর্শন-জনিত ব্যথা ততদিনে পরিণতরূপ নিয়েছে। প্রথমা কন্যা সন্তান—সাড়ে তিন বৎসর বয়সে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত। প্রাণের আশা

আর নেই। ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম থেকে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরা শরচ্চন্দ্রের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর কথা শোনার জন্য এসেছেন। শরচ্চন্দ্র শ্রীগুরুর আলোচনায় তন্ময় হয়ে তখন অন্য জগতে বিচরণ করছেন। এমন সময়ে অন্দর মহলে কান্নার রোল উঠল। পরিচারিকা এসে খবর দিল—'দাদাঠাকুর, দিদিমণি যে চলে গেলেন, একবার এসে দেখে যাবেন না?' শরচ্চন্দ্র নীরবে উঠে ঘরের জানলাগুলি বন্ধ করে দিলেন—পাছে ভিতর-বাড়ির কান্নার শব্দ এসে প্রসঙ্গের বিঘ্ন করে। বললেন—'শরীর আসবে আবার যাবে, কিন্তু আজকের মতো দুর্লভ দিন আর জীবনে আসবে না। এঁরা শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজীর কথা শোনবার জন্য এসেছেন, কাঁদবার দিন অনেক আসবে কিন্তু স্বামীজীর কথা শোনবার লোক জীবনে সব সময়ে পাওয়া যাবে না। স্বামীজীর কত দয়া! এই দারুণ শোকের ক্ষণটিতে ঠিক নিজের জন পাঠিয়ে দিয়েছেন!!'

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গৃহিশিষ্য শ্রীবাসের জীবনে অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে। মহাপ্রভু শ্রীবাসের গৃহে পদার্পণ করেছেন, খোল-করতাল যোগে কীর্তন চলেছে। পীড়িত পুত্রকে নিয়ে বাড়ির ভিতরে তখন যমে-মানুষে সংগ্রাম চলছে। শেষ পর্যন্ত শ্রীবাসের পুত্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। পুত্রহারা জননীর হাহাকারে—বাড়ির ভিতরে সমুপস্থিত সকলে ক্রন্দনে ভেঙে পড়লেন। ক্রন্দনের রোল পাছে বহির্বাটীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তনে বাধা সৃষ্টি করে, তাই শ্রীবাস স্বয়ং বাড়ির ভিতরে ছুটে গিয়ে সান্ত্বনা দিতে থাকেন—

'পরম গভীর ভক্ত মহা তত্ত্বজ্ঞানী।
স্ত্রীগণেরে প্রবোধিতে লাগিলা আপনি॥
"তোমরা ত সব জান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা।
সম্বর ক্রন্দন সভে চিত্তে দেহ ক্ষমা"॥'
(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

শুধু তাই নয়, স্বয়ং চৈতন্যদেব যখন জানতে চান, বাড়িতে কোন দুঃখজনক কিছু ঘটেছে কিনা—জ্ঞানিভক্ত শ্রীবাস করজোড়ে উত্তর দিয়েছিলেন—'...প্রভু মোর কোন দুঃখ।/যার ঘরে সুপ্রসন্ন তোমার শ্রীমুখ॥'

শরচ্চন্দ্র সরকারি কর্ম উপলক্ষে অবিভক্ত সেই বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় থেকেছেন ইংরেজ আমলের পোস্টাল সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট পদ ভারতীয়দের পক্ষে বেশ উচ্চ সম্মানার্হ ছিল। শরচ্চন্দ্রের ঐ কর্মজীবনও কিন্তু শ্রীগুরু এবং তদীয় ভাবধারা থেকে কোন ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হতে পারেনি। যেখানেই অবস্থান করতেন, সেখানেই তাঁকে ঘিরে একটি ভক্ত-পরিমণ্ডল গড়ে উঠত—যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ, মা এবং স্বামীজীর ভাবে নিজ নিজ জীবন গঠনের সুযোগ পেতেন অনায়াসে—স্বামীজীর একজন প্রিয় শিষ্যের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য তাঁদের আধ্যাত্মিক যাত্রাপথের পরম সহায়ক হত! এখানে উল্লেখ্য শরচ্চন্দ্রের অক্ষয়কীর্তি 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থের (দুই খণ্ডে) প্রণয়ন,—এই কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্যেই সাধিত হয়েছে। এই 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে শুধু নয়, ভারতীয় ধর্মসাহিত্যের ইতিহাসে এক অসাধারণ অবদান-স্বরূপ।

অদ্যাবধি সহস্র সহস্র আদর্শবাদী তরুণ-তরুণী মাত্র এই গ্রন্থ-মাধ্যমেই বিবেকানন্দ-তড়িৎ-স্পৃষ্ট হয়েছেন—অনাগতকালে এই গ্রন্থ আরও কত প্রাণকে স্পর্শ করবে তা কে জানে! উল্লেখ বাহুল্য, গ্রন্থোক্ত 'শিষ্য'-ই হচ্ছেন লেখক শরচ্চন্দ্র স্বয়ং। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় শরচ্চন্দ্রের রচনাবলীর সংখ্যা বিপুল—কেবল প্রবন্ধ নয়, কবিতা এবং গানও রচনা করেছেন। সংস্কৃত স্তবস্তুতির সংখ্যাও সামান্য নয়। বর্তমান প্রবন্ধে সে-সবের বিশদ উল্লেখ ও আলোচনার অবকাশ নেই। কিন্তু কোনদিন তাঁর সমগ্র রচনাবলী প্রকাশিত হলে, রামকৃষ্ণ-

বিবেকানন্দ-সাহিত্যানুরাগীদের পক্ষে তা হবে পরমপ্রাপ্তি। উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত 'সাধু নাগমহাশয়' গ্রন্থের প্রণেতাও শরচ্চন্দ্র। অধুনা দুষ্প্রাপ্য শঙ্করাচার্য-প্রণীত 'বিবেকচূড়ামণিঃ' প্রকরণগ্রন্থের বঙ্গানুবাদও বৈদান্তিক শরচ্চন্দ্রের জ্ঞাননিষ্ঠার উজ্জ্বল সাক্ষ্য। শরচ্চন্দ্র সুগায়কও ছিলেন। শ্রীশ্রীমাকে গান শোনাবার দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁর কয়েকবার হয়েছে। মা তাঁর সন্তানের কণ্ঠে গান শুনে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করতেন, বলতেন— 'আহা! কি ভাব! কি গান!' বেলুড়মঠেও শরচ্চন্দ্র স্বরচিত গান গাইতে গাইতে বিভোর হয়ে যেতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতির পরে যখন তিনি দুহাত তুলে নেচে নেচে নিজ-রচিত গান গাইতেন—তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ এবং গিরিশচন্দ্র প্রমুখ ঠাকুরের লীলাসঙ্গীরাও এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতেন।

শরচ্চন্দ্র যখন বর্ধমানে কর্মরত, সেইকালে শ্রীশ্রীমা শরচ্চন্দ্রের বাসভবনে একবার দু-তিনদিন বাস করে তাঁর সেবা গ্রহণ করেছিলেন।[১]

শরচ্চন্দ্র ছিলেন একনিষ্ঠ গুরুভক্ত। প্রসঙ্গতঃ একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে, যাতে তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাববাহী রূপটি যেমন সুপরিস্ফুট, ঠিক তেমনই তাঁর অনন্য গুরুভক্তিরও একখানি উজ্জ্বল আলেখ্য ব্যক্ত। সম্ভবতঃ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ। শরচ্চন্দ্র তখন মেদিনীপুরে ডাকবিভাগের প্রধান কর্মকর্তা—পোস্টাল সুপারিন্টেন্ডেণ্ট। যথারীতি সেখানেও তাঁকে ঘিরে একটি ভক্তগোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল—যাঁরা নিয়মিত পাঠপ্রসঙ্গ-চর্চাদি করতেন তাঁর সঙ্গে। শহরে নাড়াজোল-জমিদারের কাছারি বাড়িতে অনুষ্ঠিত একদিনের ঐরূপ আলোচনাচক্রে জনকয়েক উদ্ধত নাস্তিক যুবক স্বামীজী সম্পর্কে কিছু বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করে,—উদ্দেশ্য শরচ্চন্দ্রকেই একটু বিব্রত করা। শরচ্চন্দ্র যুবকদের মন্তব্যের প্রত্যুত্তরে যুক্তিসহ অনেক কথা বলেন—কিন্তু কার্যতঃ সবই নিষ্ফল হয়। অধিক রাত্রে অনুষ্ঠান শেষে শরচ্চন্দ্র সেখানে জল পর্যন্ত গ্রহণ না করে, গৃহে ফেরার জন্য উঠে দাঁড়ান। এত রাত্রে ব্রাহ্মণ অতিথি অভুক্ত ফিরে গেলে গৃহস্বামীর অকল্যাণ হবে, এই আশঙ্কায় প্রবীণ ভদ্রলোকরা, বিশেষ করে জমিদার-পরিবারের কর্তাব্যক্তিরা শরচ্চন্দ্রের কাছে কাতরে মিনতি জানাতে থাকেন, অন্ততঃ সামান্য কিছুও যাতে গ্রহণ করেন। শরচ্চন্দ্র দৃপ্তকণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছিলেন—যেখানে গুরুনিন্দা হয়, সে-স্থান অপবিত্র। উপযুক্ত প্রতিকারে অক্ষম হলে, তৎক্ষণাৎ স্থানত্যাগ করাই শাস্ত্রের উপদেশ। অতএব, তাঁর পক্ষে ঐ অনুরোধ রক্ষা আদৌ সম্ভবপর নয়। কিন্তু নাড়াজোল জমিদার-পরিবারের বয়োবৃদ্ধরা তাঁর দৃঢ় পণ শুনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন—যে-কোন মূল্যেই এই অশুভ ঘটনার প্রতিবিধান করতে তাঁরাও কৃতসঙ্কল্প হলেন। শরচ্চন্দ্র তখন শর্ত দিলেন, যদি এই গৃহে,—যেখানে স্বামীজীর নিন্দা হয়েছে, সেখানেই ঠাকুর-স্বামীজীকে প্রতিষ্ঠা করে তিনি পূজা করতে পারেন, তাহলেই এর প্রতিবিধান সম্ভবপর। স্বামীজীর নিন্দা যে-স্থলে হয়েছে, সে-স্থলকে আগে পবিত্রীকৃত না করলে, সেখানে ঠাকুর-স্বামীজীর আসন বসানো যাবে না। আর এই পবিত্রীকরণ সম্ভব হবে, যদি ঐ গৃহকে চিরতরে উৎসর্গ করা হয় শ্রীরামকৃষ্ণেরই উদ্দেশে। কার্যতঃ তাই হয়েছিল। গৃহস্বামী ঐ কাছারি বাড়িটিকে বেলুড়মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের নামে বিধিমত অর্পণ করে দিতে সম্মত হলেন ঐ রাত্রিতেই। অতঃপর শরচ্চন্দ্র

১। ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য-প্রণীত 'শ্রীশ্রীসারদা দেবী', পৃষ্ঠা ২৩৩

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

সৌজন্যে : ছায়া বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেখানে ঠাকুরকে ও স্বামীজীকে স্বহস্তে বসিয়ে পূজা করেন এবং প্রসাদগ্রহণ করেন। মেদিনীপুরের বর্তমান রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রতিষ্ঠা এই ভাবেই হয়েছিল—যদিও পুরাতন সেই গৃহটি আজ সেখানে অদৃশ্য।

স্বামীজীর স্থূল দেহ অপ্রকট হবার পরে শিষ্য শরচ্চন্দ্র আরও চল্লিশ বৎসর ধরাধামে ছিলেন। জীবনের শেষ ছয় মাস তিনি কোটাপাড়া গ্রামের বাড়িতে অবস্থান করেন। স্বামীজী আদর করে 'বাঙাল' বলে তাঁকে ডাকতেন—গুরুদত্ত সেই স্নেহ-অভিধাকে তিনি সগৌরবে সর্বত্র খ্যাপন করেছেন—জীবন-নাট্যের শেষাঙ্কেও তাই বুঝি পুব-বাংলার শান্তিময় ক্রোড়েই আবার ফিরে চলে গিয়েছিলেন। স্বামীজী তাঁর এই জ্ঞানী কিন্তু গৃহিসন্তানটিকে স্নেহভরে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন 'বাঙাল, সংসারে পাঁকাল মাছের মতো থাকবি।' শিবাবতার শ্রীগুরুর অমোঘ আশীর্বাদ শিষ্যের জীবনে কতখানি ফুটে উঠেছিল, সে-পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর নিজের আত্ম-কথনে। উত্তরজীবনে তিনি 'আমার কথা'-তে লিখেছেন :

'শ্রীশ্রীস্বামিপাদ সমস্ত দেবদেবী-মূর্তি অতিক্রম করিয়া কেন আমার সমগ্র হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছেন। কেন তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞান হইতেও শ্রেষ্ঠ বোধ হয়···তাহা আমিও বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু যতই দিনের পর দিন যাইতেছে, ততোই বুঝিতে পারিতেছি, তিনি ভিন্ন আমার আর ইষ্ট নাই। তিনি ভিন্ন আমার সুখ নাই, শান্তি নাই ও আশ্রয় নাই।···তাঁহার স্মরণ মনন ভিন্ন আমার আর দ্বিতীয় তপস্যা নাই। তিনি আমায় যে এরূপ পাগল করিয়া যাইবেন, অগ্রে তাহা বুঝিতে পারি নাই। ···আমার জ্ঞান, ধ্যান, জপ, তপস্যা সেই স্বামিপাদে পর্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমি আমিহারা হইতেছি।··· অনন্ত নীল গগন, যেখানে সৃষ্টি বিসৃষ্টির কল্পনা স্থান পায় না, সেখানেও তাঁহাকে কোটীসূর্য-উদ্ভাসিত চিদ্‌ঘন মূর্তিতে ভাসমান দর্শন করিয়াছি। ···শঙ্কর, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, রাম, কালী, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি যখনি যাঁহার ধ্যান করি, দেখিতে পাই, আমার সেই প্রাণারাম, স্বামিপাদ সেই সেই মূর্তিতে বিরাজিত। সে রূপচ্ছটায় দিগ্‌দিগন্ত উদ্‌ভাসিত হইয়া যায়। কল্পনার সহায়তায় সূর্যলোক, চন্দ্রলোক যথায় যাই, সেখানেই সেই দিব্যমূর্তি বিরাজিত দেখিতে পাই। ইহা ত্রিশপথান্বিত সত্য।' (উদ্বোধন, নবম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ১৩১৪)

উল্লিখিত আত্মচরিতাংশ—শরচ্চন্দ্রের আত্মারই উজ্জ্বল আলেখ্য। স্বামীজীই তাঁর আত্মা—গুরু ইষ্ট প্রাণারাম। জগদ্‌গুরুর কৃপাবলে বলীয়ান একজন প্রকৃত জীবন্মুক্তের আত্মোপলব্ধির ঘোষণা এমন সুস্পষ্টই হয়ে থাকে—যেমন শুনে থাকি আমরা ব্রহ্মবিদ্ ঋষিদের উদ্‌গীত মন্ত্রগুলি।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ অগস্ট শরচ্চন্দ্র শ্রীগুরু-পাদপদ্মে চিরকালের জন্য বিলীন হন। তাঁর বড় সাধ ছিল—'যেন আমার গুরুভ্রাতৃগণের মুখে শেষকালে শুনিতে পাই "বিবেক আনন্দ নামে হোক ভবে জয় জয়।" সে সাধও পূর্ণ হয়েছিল অক্ষরে অক্ষরে অথবা ততোধিক মাত্রায়। অন্তিম সময়ে প্রাণাধিক প্রিয় সুহৃদ্ ও গুরুভ্রাতা স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ পত্র লিখে জানালেন : জয় রামকৃষ্ণের জয়! জয় স্বামীজীর জয়! প্রতি নিঃশ্বাসে বল। কিসের ভয়, কিসের ভাবনা! তুমি যে বৈদান্তিক, তোমার আবার রোগ কি, শরীর কি! তুমি যে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পূর্ণ ব্রহ্ম পরমাত্মা! ওয়াহ্ গুরুজী ফতে।'

পুস্তক সমালোচনা

গায়ত্রী-রহস্য—রামপদ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ২৫৭-বি বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২। পৃঃ ২০৪; মূল্য: লাইব্রেরী: ৩৫ টাকা, সুলভ: ৩০ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটি প্রথম ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এটি তাহার দ্বিতীয় মুদ্রণ, যাহা গ্রন্থকার পরলোকগমনের পর তাঁহার পুত্র সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন। দুইশত পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে চারিটি পরিচ্ছেদে যথাক্রমে ওঁকারতত্ত্ব, ব্যাহৃতিতত্ত্ব, দেবতাতত্ত্ব এবং গায়ত্রীতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে এবং পরিশিষ্টে গায়ত্রীমন্ত্রের অনেকগুলি সংস্কৃত ভাষ্য, যেগুলি শঙ্কর, সায়ণ, মহীধর প্রভৃতি রচিত এবং কোন কোন উপনিষদে, পুরাণে বা তন্ত্রে উদ্ধৃত তাহা সংযোজিত করা হইয়াছে।

গায়ত্রী বৈদিক সাধনার সার-সর্বস্ব এবং ভারতবর্ষের অগণিত জনগণের প্রাণদায়িনী রক্ষা-কবচ। বেদের মধ্যেই উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে: 'বিশ্বামিত্রস্য গায়ত্রং রক্ষতি ভারতং জনম্।' বিশ্বামিত্র ঋষির গায়ত্রীছন্দে নিবদ্ধ এই মন্ত্রটি ভারতের জনগণকে আজও রক্ষা করিতেছে। অনেকেই অবগত আছেন যে, বিশ্বামিত্রের এই মন্ত্রটি একটি সাবিত্রী ঋক্, সবিতাদেবতাসম্বন্ধীয় স্তুতি। এই সাবিত্রী মন্ত্রই আমাদের কাছে ছন্দের মহিমায় গায়ত্রীমন্ত্ররূপে সুপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এই মন্ত্রের গান করিলেই ত্রাণ লাভ করা যায়, 'গায়ত্রী প্রোচ্যতে তস্মাদ্ গায়ন্তং ত্রায়তে যতঃ।'

সেই গায়ত্রীর আদিতে ও অন্তে ওঁকার। ওঁকারের পরে ব্যাহৃতিত্রয় অর্থাৎ 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' যুক্ত করিয়া ইহার জপ বিহিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ সেই দৃষ্টিতেই গ্রন্থকার এখানে গায়ত্রী-রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া ওঁকারতত্ত্ব ও ব্যাহৃতিতত্ত্বের সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। অনেকের কাছে ইহা 'ধান ভানিতে শিবের গীত' বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু গায়ত্রীর সঙ্গে এগুলির অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ। গায়ত্রীর তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে তাই ওঁকার ও ব্যাহৃতিতত্ত্বের জ্ঞানও অপরিহার্য।

গ্রন্থকার যেভাবে দার্শনিক পটভূমিকায় এই তত্ত্বগুলি আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার গভীর শাস্ত্রজ্ঞান সুপরিস্ফুট। কিন্তু সাধারণ পাঠকবর্গ, যাঁহাদের তেমন শাস্ত্রজ্ঞান নাই, তাঁহারা এ গ্রন্থপাঠে কতটা উপকৃত হইবেন বা ইহার রসাস্বাদনে সমর্থ হইবেন, তাহা চিন্তার বিষয়। মূল গায়ত্রীমন্ত্রের একটি সরল সংক্ষিপ্ত হৃদয়গ্রাহী বিবরণ সংযোজিত হইলে সকলের পক্ষে বিশেষ উপকার হইত। তবে যাঁহারা ধৈর্যসহকারে শাস্ত্রের গভীরে প্রবেশ করিতে আগ্রহী তাঁহারা সৃষ্টি, মায়া, প্রকৃতি, অবিদ্যা, ঋত, সত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে এই গ্রন্থপাঠে আলোক-প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই।

গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গী, জ্ঞানের নানা আলোচনা সত্ত্বেও, মুখ্যতঃ ভক্তি-আশ্রিত। তিনি যথার্থই বলিয়াছেন: "অট্টালিকা নির্মাণে যেমন চুণ, বালি, সুরকী, সিমেণ্ট ইত্যাদির ব্যবহার অপরিহার্য্য—উহারা মধ্যে থাকিয়া প্রস্তর, ইট, দরজা, জানালা প্রভৃতি অট্টালিকার উপাদান সকলকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া রাখে—সেইরূপ কর্ম ও জ্ঞানকে দৃঢ়ভাবে সংসক্ত করিবার জন্য ভক্তির প্রয়োজন।" জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ডের মধ্যবর্তী উপাসনাকাণ্ডে তাই এই ভক্তির মন্দাকিনী প্রবাহিতা। গায়ত্রী এই উপাসনার চরম ও পরম আশ্রয়। গ্রন্থকার তাহার বিশদ পরিচয় দিয়া সকলের অশেষ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। পরিশিষ্টে গায়ত্রীর যে-সব সংস্কৃত ব্যাখ্যাগুলি সংযোজিত হইয়াছে, সেগুলির বঙ্গানুবাদও ঐ সঙ্গে দিয়া দিলে তাহা সকলের আস্বাদ্য হইত এবং গায়ত্রীর মর্মার্থ গ্রহণে সহায়ক হইত।

—ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের
ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন
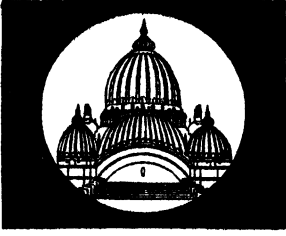
আসামে বন্যাত্রাণ : করিমগঞ্জ ও শিলচর জেলার বন্যাপীড়িত পরিবারের মধ্যে ২০০০ খানা শাড়ি, ২০০০ খানা ধুতি, ২০৩৫ খানা চাদর, ৫০০টি লুঙ্গি, ১১০৬টি বয়স্কদের জামা, ৪০০০টি ছোট ছেলেমেয়েদের জামা-প্যান্ট, ২০০ খানা পশমের কম্বল, ১০০০টি পুরানো জামা-কাপড়, চাল, আটা, দুধ, বিস্কুট, কেরোসিন তেল, ব্লিচিং পাউডার, ফিনাইল, জল-পরিষ্করণের ট্যাবলেট প্রভৃতি বিতরণের মধ্য দিয়ে এখানকার ত্রাণকার্য সমাপ্ত হয়।

শ্রীলঙ্কা শরণার্থিত্রাণ : মাদ্রাজ ত্যাগরাজনগর রামকৃষ্ণ মিশন, শ্রীলঙ্কা থেকে রামেশ্বরের নিকটবর্তী মন্দাপম্ শিবিরে আগত শরণার্থীদের প্রাথমিক সেবাকার্য করে চলেছেন। এছাড়া তুতিকোরিন, বেদারান্যাম্ ও মন্দাপম্ শিবিরের ছেলেমেয়েদের জন্য ৫৩১ খানা তোয়ালে, ১৮০০ খানা কম্বল ও ৬৩১০টি বান্ রুটি বিতরণ করেন।

বাংলাদেশে ঘূর্ণিবাত্যাত্রাণ : ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন এবং বরিশাল রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত নরনারীর মধ্যে প্রাথমিক ত্রাণ-কার্য চলছে।

পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন : ২৪ পরগনা গাইঘাটা থানার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ১৯৮৩-র ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত ঠাকুরনগর বালিকা বিদ্যালয়ের একতলার ছাদ নির্মাণ গত ২৪ অগস্টে শেষ হয়েছে। গৃহনির্মাণের কাজ এখনও চলছে।

উদ্বোধন-সংবাদ

গত ৩০ অগস্ট, স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'তে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা হয় এবং সন্ধ্যারতির পর স্বামী নির্জরানন্দ তাঁর জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। গত ৭ সেপ্টেম্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে বিশেষ পূজাদি এবং সন্ধ্যারতির পরে 'সারদানন্দ-হলে' শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী বিকাশানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা : সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী অজজানন্দ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেছেন।

দেহত্যাগ

অতি দুঃখের সঙ্গে জানানো হচ্ছে : **স্বামী রুদ্রানন্দ** (মুথুকৃষ্ণ মহারাজ) গত ৩০ জুন ১৯৮৫, সকাল ৬টায় হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতার জন্য শরীরের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে ফিজ্জির হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহান্তকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি বহুমূত্র রোগে ভুগছিলেন। গত বছর হঠাৎ মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল কিছু কালের জন্য বিঘ্নিত হলেও তা থেকে তিনি শীঘ্র সেরে ওঠেন। ১৯৮৫-র মে মাসে তিনি পুনরায় ওই রোগে প্রবলভাবে আক্রান্ত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু তাঁর অবস্থার ক্রমশ অবনতি ঘটতে থাকে। চিকিৎসকদের সবরকম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে প্রশান্তির মধ্য দিয়ে তাঁর শেষক্ষণটি ঘনিয়ে আসে।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট তিনি দীক্ষালাভ করেন এবং ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করেন। ১৯২৯-তে স্বীয় গুরুর নিকটে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। সঙ্ঘের তামিল মুখপত্র 'রামকৃষ্ণ বিজয়ম্' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব কয়েক বছরের জন্য পালন

করা ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে তিনি মাদ্রাজ মঠের অন্যান্য সেবাকার্যেও নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৩০-এর দিকে মাদ্রাজের মায়লাপুরের নিকটবর্তী অঞ্চলে অগ্নিবিধ্বস্ত এলাকায় সেবাকার্যের জন্য 'থোণ্ডার সঙ্গম্' নামে এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেন। ওই অগ্নিবিধ্বস্ত মানুষদের জন্য তিনি 'রামকৃষ্ণপুরম্' নামে একটি পুনর্বাসনও তৈরি করেন, যার অস্তিত্ব আজও বিদ্যমান। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ তাঁকে ফিজি রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ করে পাঠান। প্রথম থেকেই তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে সমাজের দরিদ্র ও অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতিসাধনের জন্য চেষ্টা করেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষি এবং আরও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের দ্বারা তিনি ওই দেশের অর্থনৈতিক জীবনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেন। নিঃস্বার্থ সেবার জন্য তিনি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। তাঁর মধ্যে কখনও নম্রতা ও বিনয়ের অভাব লক্ষিত হয়নি এবং জনসাধারণের সংস্পর্শ থেকে তিনি কখনও নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখেননি। তাঁর দেহাবসানে ফিজিবাসী এবং বিশেষতঃ এই রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ, কঠোর ও অনাড়ম্বর স্বভাবের একজন আদর্শ সন্ন্যাসীকে হারাল।

ব্রহ্মচারী শ্রুতিচৈতন্য (বিট্টল) গত ৮ জুলাই ১৯৮৫, রাত্রে মহীশূর রামকৃষ্ণ আশ্রমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গত কয়েক মাস যাবৎ তিনি নিদারুণ পেটের পীড়ায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। যথাসম্ভব চিকিৎসা করানো সত্ত্বেও তাঁর যন্ত্রণার কোনরকম উপশম হয় না।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজীর নিকট তিনি দীক্ষাপ্রাপ্ত হন এবং ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ আশ্রমে যোগদান করেন।

এঁদের দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করুক—এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

পুরুলিয়া (বাঁকুড়া) প্রবুদ্ধ ভারত সংঘের উদ্যোগে গত ২৩ ও ২৪ মার্চ ১৯৮৫, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে প্রথম দিন নবনির্মিত উপাসনালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন এবং দ্বিতীয় দিনে যুবসম্মেলন ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী জ্যোতীরূপানন্দের সভাপতিত্বে বক্তৃতা করেন স্বামী সর্বদেবানন্দ।

উত্তরাঞ্চল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচার-পরিষদের উদ্যোগে কোচবিহার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৪—২৬ মে, তিনদিনব্যাপী ২য় বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব ও যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে স্বামী গহনানন্দের পৌরোহিত্যে স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী [illegible], স্বামী সুমেধানন্দ প্রভৃতি ভাষণ দান করেন।

শ্যামপুকুরবাটী (কলিকাতা) শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ-সঙ্ঘে গত ২৭ অগস্ট সঙ্ঘের ৮ম প্রতিষ্ঠা দিবস নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। বিকালের ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী নির্জরানন্দ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শ্রীধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

দ্বারোদ্ঘাটন

গত ১৯ জুন ১৯৮৫, ভদ্রেশ্বর (হুগলী) সারদাপল্লীস্থ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নবনির্মিত প্রার্থনাগৃহসহ দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী। এই উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শ্রীঅরুণকৃষ্ণ ঘোষের পরিচালনায় বেহালা স্বরপীঠ কর্তৃক 'পতিতপাবন শ্রীরামকৃষ্ণ' গীতি-আলেখ্য পরিবেশনের পর বিকালের ধর্মসভায় স্বামী আত্মস্থানন্দের সভাপতিত্বে স্বামী গহনানন্দ ও স্বামী প্রভানন্দ ভাষণ দেন। সভারম্ভে স্বামী হিরন্ময়ানন্দের শুভেচ্ছা বাণী পঠিত হয়।

৮৭তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা কার্তিক ১৩৯২

দিব্য বাণী

শক্তিপূজা, বিশেষতঃ মাতৃভাবে শক্তিপূজা ভারতেরই নিজস্ব সম্পত্তি। মাতৃভিন্ন অন্য ভাবের শক্তিপূজার কিছু কিছু মাত্রই অন্যান্য দেশে লক্ষিত হইয়া থাকে! বাস্তবিক জগৎকারণকে 'মা' বলিয়া 'জগদম্বা' বলিয়া ডাকা একমাত্র ভারতেই দেখিতে পাওয়া যায়! আবার বহুকাল পবিত্র ও সংযত ভাবে শক্তিপূজার ফলে ভারতের ঋষিরাই প্রথম জ্ঞাত হইয়া প্রচার করিয়াছেন যে, জগদম্বা সগুণা এবং নির্গুণা উভয়ই। পুরুষ ও প্রকৃতি, ব্রহ্ম ও মায়া বলিয়া ভারতের দর্শনকার যে দুই পদার্থ জগতের মূলে নির্দেশ করিয়াছেন, উহা একই বস্তুর একই কালে বিদ্যমান, দুই বিভিন্ন ভাব বা প্রকাশবিশেষ। তবে দেশকালাবচ্ছিন্ন বা নামরূপাবলম্বনে সবাহ্যান্তর্জগৎ-উপলব্ধিকারী মানবমন একই কালে, একেবারে জগদম্বার ঐ দুই ভাব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে অক্ষম। কারণ মানবমন স্বভাবতঃ এমন উপাদানে গঠিত যে, উহা আলোকান্ধকারের ন্যায় পরস্পরবিরুদ্ধ দুইটি ভাবকে একত্রে একই সময়ে গ্রহণে অপারগ।

—স্বামী সারদানন্দ

['ভারতে শক্তিপূজা', পঞ্চম সংস্করণ, 'নিবেদন' দ্রষ্টব্য]
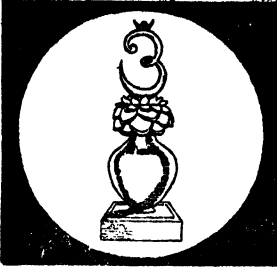
কথাপ্রসঙ্গে

বিজয়া-সম্ভাষণ

প্রাকৃতিক দুর্যোগের অবসানে নির্মল সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশের নিম্নে এই ধরণীতে জগজ্জননীর শুভাগমনে শারদোৎসব আনন্দের মধ্যে সুসম্পন্ন হইল। মহামায়ার আরাধনায় যে শক্তি, আনন্দ ও শান্তি সকলে লাভ করিয়াছেন, তাহা জীবনে চলার পথে প্রেরণা সঞ্চার করিবে—ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। দেবতাদের দেবীস্তুতিতে ব্যক্ত ও প্রার্থিত—"হে বিশ্বার্তিহারিণি দেবি, আপনি প্রসন্না হউন। ত্রিজগদ্বাসিগণের আরাধ্যা দেবি, আপনার চরণে প্রণত জনগণের প্রতি আপনি বরদাত্রী হউন।"—ইহা আমাদেরও প্রার্থনা। মহাপূজার অবসানে জগজ্জননীর সন্তানগণ পরস্পরকে শুভ ৺বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণাদি জানাইতেছেন।

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা ও অনুরাগী সকলকেই আমরা শুভ ৺বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ, নমস্কার ও শুভেচ্ছাদি জানাইতেছি।

'ত্বমেকা কল্যাণী গিরিশরমণী কালি সকলম্‌'

মহামায়ার দশভুজা মহিষমর্দিনীরূপের পূজার পর তাঁহার মহাবিদ্যা কালিকাদেবীর আরাধনার সময় সমাগত।

দশমহাবিদ্যার মধ্যে কালী শুদ্ধসত্ত্বগুণ-প্রধানা, নির্বিকারা নির্গুণব্রহ্মস্বরূপ-প্রকাশিকা। মহাভাগবত পুরাণে আছে, দক্ষযজ্ঞে শিবের বিনা নিমন্ত্রণে সতী দক্ষালয়ে গমনের জন্য শিবের নিকট জেদ প্রকাশ করেন। শিব তাঁহাকে অনুমতি না দেওয়ায় সতী নিজলীলায় স্বরূপে অবস্থান করার ইচ্ছায় অতিভয়ংকরী কালিকামূর্তি ধারণ করেন। তিনি কৃষ্ণবর্ণা, দিগম্বরী, মুক্তকেশী, মুণ্ডমালাবিভূষিতা, করালবদনা। এই ভয়ংকরী-মূর্তিদর্শনে শিব ভয়ে বিকম্পিত হইয়া দিগ্‌ভ্রান্তের ন্যায় পলায়ন করিতে উদ্যত হইলেন। শিবকে ভীত দেখিয়া সতীর করুণা হইল। তিনি তাঁহাকে যাইতে না দিবার জন্য দশদিকে দশমহাবিদ্যার মূর্তি ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই দশমূর্তির নাম—কালী, তারা, ভুবনেশ্বরী, ষোড়শী, বগলা, ধূমাবতী, ছিন্নমস্তা, ভৈরবী, মাতঙ্গী ও কমলা। পলায়ন অসম্ভব দেখিয়া শিব ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করেন। আবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া সেই ভয়ংকরী কালিকামূর্তিকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'কে তুমি শ্যামা ?' দেবী বলিলেন, 'আমিই তো সতী, সৃষ্টি-সংহারকারিণী প্রকৃতি। এই যে দশদিকে মহাভয়ংকরী দশমূর্তি দেখিতেছ—এ-সব আমারই বিভিন্ন রূপ।'

মহানির্বাণতন্ত্রে আছে: সদাশিব দেবীকে বলিতেছেন, জগৎসংহারক মহাকাল তোমার একটি রূপ মাত্র। সেই মহাকাল মহাপ্রলয়ে সমুদয় বিশ্ব গ্রাস করেন। সর্বভূতকে গ্রাস করেন বলিয়া তাঁহার নাম মহাকাল। তুমি মহাকালকে গ্রাস কর বলিয়া কালিকা নামে পরিচিতা।

নারদপঞ্চরাত্রে আছে: দক্ষগৃহে দেহত্যাগের পর সতী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তখন

তাঁহার নাম হয় কালী। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উল্লিখিত আছে: শুম্ভনিশুম্ভের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া দেবতারা মহাদেবীর স্তব করিতেছিলেন। সেই সময়ে দেবী পার্বতী তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করেন, 'আপনারা কাঁহার স্তব করিতেছেন?' তখন পার্বতীর শরীরকোষ হইতে অম্বিকাদেবী আবির্ভূতা হইয়া বলেন, 'দেবতারা আমার স্তব করিতেছেন।' শরীরকোষ হইতে জাত বলিয়া এই অম্বিকার নাম হয় কৌশিকী। কৌশিকী পার্বতীর শরীর হইতে নির্গতা হওয়ায় পার্বতী কৃষ্ণবর্ণা হইয়া কালিকা নামে হিমালয়ে খ্যাত হইলেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আরও উল্লিখিত আছে: চণ্ডমুণ্ড হিমাচলশৃঙ্গে আসীনা অম্বিকা-দেবীকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইলে ক্রোধে দেবীর মুখমণ্ডল মসীবর্ণ হয়। তখন দেবীর ভ্রুকুটি-কুটিল ললাটদেশ হইতে শীঘ্র খড়্গধরা ও পাশহস্তা ভীষণবদনা কালী বহির্গতা হইলেন।

কালীর স্বরূপ বিভিন্ন তন্ত্রে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—শ্রীরামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি শাক্তসিদ্ধগণের অনুভূতিতেও তাহা প্রমাণিত। তাঁহাদের মতে, ব্রহ্মই কালী ও কালীই ব্রহ্ম। গতিহীন ও গতিশীল সর্প যেমন একই, নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় ব্রহ্ম সেইরূপ এক।

কালিকা শব্দের বর্ণবিশ্লেষণ এইরূপ: ক্+আ+ল্+ই+ক্+আ। ক=ব্রহ্ম, আ=অনন্ত, ল=বিশ্বাত্মা, ই=সূক্ষ্মা। সুতরাং কালিকা হইলেন ব্রহ্ম, অনন্ত, বিশ্বাত্মা, সূক্ষ্মা। কালীর বীজমন্ত্র ক্রীঁ যথাশাস্ত্র উচ্চারিত হইলে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুর্বর্গ ফল প্রদান করে।

মহাশক্তির কালীরূপ কলিযুগের মানুষের ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ। কালীর উপাসক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, চন্দ্র, সূর্য, বরুণ, কুবের, অগ্নি ও অন্যান্য দেবতা। ইহা ছাড়া দুর্বাসা, বশিষ্ঠ, দত্তাত্রেয়, বৃহস্পতি এইসব ঋষিও কালীর উপাসক। বিভিন্ন তন্ত্রে কালিকার বিভিন্নরূপ গুণক্রিয়ানুসারে বর্ণিত আছে। যথা—দক্ষিণাকালিকা, সিদ্ধকালিকা, গুহ্যকালিকা, শ্রীকালিকা, ভদ্রকালী, চামুণ্ডা-কালিকা, শ্মশানকালিকা, মহাকালী প্রভৃতি।

দক্ষিণাকালীই শ্যামাকালী। তাঁহার ধ্যানে যে ভাবমূর্তি প্রকাশিত, উহার তত্ত্ব খুবই নিগূঢ়। এ-বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হইতেছে:

কালী কৃষ্ণবর্ণা। যেমন শ্বেত পীতাদি বর্ণ কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, সেইরূপ সর্বভূত কালীর মধ্যে বিলীন হয় বলিয়া যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ, তাঁহারা নির্গুণা নিরাকারা কল্যাণময়ী কালশক্তির কৃষ্ণবর্ণ নিরূপণ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, দূর হইতে দেখিলে কালী কালো। কিন্তু সাধক যত তাঁহার নিকটসান্নিধ্য অনুভব করেন, ততই দেখেন কালীর কোন বর্ণ নাই।

কালী দিগম্বরী বা দিগ্‌বস্ত্রা। বস্ত্র অর্থাৎ আবরণ। সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম আবরণ মায়া। কালীই ব্রহ্ম। সেজন্য তিনি মায়াতীতা অর্থাৎ আবরণ-শূন্যা দিগম্বরী।

কালী মুক্তকেশী: কালী মায়াতীতা। কিন্তু তিনি অনন্ত জীবকোটিকে মায়াপাশে বদ্ধ করেন। সেজন্য তাঁহার মুক্তকেশজাল মায়াপাশের প্রতীক। কেশ শব্দে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবকে বুঝায়। কেশকে অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবকে মুক্ত করেন বলিয়াও কালী মুক্তকেশী। আবার কেশবিন্যাস বিলাস-বিকার। কিন্তু তিনি নির্বিকারা বলিয়া মুক্তকেশী।

কালী ঘোরদংষ্ট্রা: কালীর বিশাল ও বিকশিত দন্ত। তাঁহার রক্তবর্ণ লেলিহান জিহ্বা তিনি দংশন করেন। শুভ্রদন্তপঙ্‌ক্তি স্বপ্রকাশ সত্ত্বগুণসূচক। বিশাল দন্ত সত্ত্বগুণের আধিক্য প্রকাশ করে। রক্তবর্ণ লোল রসনা রজোগুণের সূচক। তিনি প্রথমে রজোগুণ বৃদ্ধি দ্বারা তমোগুণ নাশ করেন। লেলিহান জিহ্বা এই তত্ত্ব প্রকাশ করে। তারপর সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি দ্বারা রজঃও নাশ

করেন। জিহ্বা দংশনের দ্বারা এই তত্ত্বটি সূচিত হয়। তাঁহার দুই ওষ্ঠপ্রান্তের বিগলিত রক্তধারা রজোগুণসূচক। রক্তধারা বহির্গত হওয়ার অর্থ তিনি রজোগুণরহিতা শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা।

কালী নৃমুণ্ডমালিনী : কালীর গলার নরমুণ্ড-মালা পঞ্চাশদ্‌বর্ণের প্রতীক। দেবী পঞ্চাশদ্‌বর্ণ-রূপিণী মহাপ্রলয়ের সময় তিনি নামরূপাত্মক (শব্দ-অর্থবিশিষ্ট) জগৎকে নিজের মধ্যে বিলীন করেন। পঞ্চাশদ্‌বর্ণময়ী দেবী হইতে শব্দার্থময় জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। আবার কল্পান্তে তাঁহাতে বিলীন হয়। দেবী ধর্মসংস্থাপনের জন্য দুষ্কৃতকারী দানবদের সংহার করেন। দানবরা তাঁহার রূপবিশেষ। তাই তাঁহার স্বরূপপ্রাপ্তি-সূচক তিনি তাহাদের মুণ্ডমালা গলায় ধারণ করেন। কালী চতুর্ভুজা ও শবরূপী শিবের বক্ষের উপর দণ্ডায়মানা। পূর্ণবৃত্তকে সমান চারিভাগে ভাগ করিলে এই চারিভাগ বৃত্তের চতুর্ভুজ হয়। মহাকালী পূর্ণরূপা ও মহাকাশরূপিণী। যেহেতু আকাশ ব্রহ্ম, কালীও ব্রহ্ম, সেজন্য মহাকাশকে পূর্ণবৃত্ত ধরা হয় বলিয়া কালী চতুর্ভুজা। তাঁহার বামদিকের উপর-হাতের খড়্গের অর্থ—দেবী জ্ঞানখড়্গের দ্বারা নিষ্কাম সাধকদের মোহপাশ ছেদন করেন। বামদিকের নিচের হাতের নরমুণ্ডের অর্থ—নিরাসক্ত মোহমুক্ত ভাগবতী বুদ্ধিসম্পন্ন, দেবীর চরণে নিবেদিতজীবন প্রিয় সাধককে দেবী তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া কখনও হাতছাড়া করেন না। তত্ত্বজ্ঞানের আধার মস্তক, সেজন্য নরমুণ্ড তাঁহার হাতে শোভা পায়। দেবীর ডানদিকের উপরের হাতে অভয়মুদ্রা এবং নিচের হাতে বরমুদ্রার দ্বারা শরণাগত সাধককে অভয় ও অভীষ্ট বর প্রদান করেন। তিনি শবরূপী শিবের বক্ষের উপর বাম বা দক্ষিণ পদ রাখিয়া দণ্ডায়মানা। অর্থাৎ একপদ অতীতে এবং একপদ ভবিষ্যতে রাখিয়া কালের অধিষ্ঠাত্রী কালী দাঁড়াইয়া আছেন শিবের উপর। শিব নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম, শবও নিষ্ক্রিয় বলিয়া শব নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতীক। শিব ও শক্তি অভিন্ন; সেজন্য শবরূপী শিবকে দেবীর নির্গুণব্রহ্মস্বরূপ বলা হয়। তিনিই আবার সগুণব্রহ্মরূপে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী কালী। কালী কখনও তাঁহার নির্গুণ স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হন না। ইহাই দেবীর শবরূপী শিবের হৃদয়ের উপর অবস্থিতা হইবার কারণ।

কালী শ্মশানবাসিনী ও ভয়ংকরী : শ্মশান অর্থাৎ যেখানে মৃত শরীর চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া বিলীন হয়। কালরূপে তিনি জীবকে সংহার করেন। জীবের স্থূলদেহ অগ্নিসৎকার দ্বারা শ্মশানেই বিলুপ্ত হয়। শ্মশান সংহারের সূচক। সেজন্য কালী শ্মশানবাসিনী। আবার চিতাগ্নিও কালী স্বয়ং। এই জন্য বহ্নিরূপা কালী শ্মশানবাসিনী। সাধকের সূক্ষ্ম বাসনাময় শরীর জ্ঞানাগ্নিতে তাঁহার হৃদয়ে দগ্ধীভূত হয়। সেজন্য সাধকের হৃদয়েই আছে শ্মশান।

এই হৃদয়-শ্মশানে মুক্তিদায়িনী কালী অবস্থান করেন। স্বামী বিবেকানন্দ এই ভাবটি তাঁহার বিখ্যাত 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতায় উল্লেখ করিয়াছেন, 'চূর্ণ হোক্ স্বার্থ সাধ মান, হৃদয়-শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।' পাশমুক্ত শিবতুল্য জীবের শুদ্ধ হৃদয়ে কালীর অধিষ্ঠান।

কালীমূর্তি ভয়ংকরী : মহাশক্তির সংহার-কার্য যে ভয়ংকর তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করি, যখন কোন দুর্ঘটনা বা ভূমিকম্প, মহামারী, জলপ্লাবন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে বহুলোকের একসঙ্গে মৃত্যু হয়। সেজন্য মহাশক্তির ভয়ংকর-রূপ তাঁহার মূর্তিতেও প্রকাশিত। কিন্তু মূর্তি-রহস্যজ্ঞ সাধকের নিকট তিনি করুণাময়ী আনন্দ-ময়ী জননীর মূর্তিতে প্রকাশিতা। তাঁহার এই প্রসন্নরূপের কথা ধ্যানে প্রকাশিত—হসন্মুখী, সুখপ্রসন্নবদনা, স্মেরানন-সরোরুহা-রূপে। এই

প্রসঙ্গে স্মরণীয় শ্রীরামকৃষ্ণের চৈতন্যরূপিণী সাক্ষাৎ জীবন্ত প্রতিমা কালীর সহিত সস্নেহ আচরণ ও অনুষ্ঠান।

কালীর কটিদেশ শবহস্তনির্মিত কাঞ্চী-শোভিত। হাত মানুষের কাজ করিবার যন্ত্র। সেজন্য হাত কর্মের প্রতীক। কল্পান্তে সমস্ত জীব তাহাদের স্থূলদেহ ত্যাগ করে। তাহাদের কর্মসংস্কারসমূহ সূক্ষ্মদেহে থাকে। সগুণব্রহ্মরূপিণী কালীর কারণশরীরে এইসব সূক্ষ্মদেহ বীজাকারে কল্পারম্ভ পর্যন্ত থাকে। মুক্তিলাভ না হওয়া পর্যন্ত জীবকে এইভাবেই অবস্থান করিতে হয়। এইজন্য মৃতজীবদের হস্তসমূহের দ্বারা নির্মিত কাঞ্চী বিরাটরূপিণী মহাকালীর কটিদেশে শোভিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তিতেও এভাবটি পরিস্ফুট। প্রলয়ের সময় মা সৃষ্টির বীজ সব সংগ্রহ করিয়া রাখেন। যেমন বাড়ির গৃহিণীরা তাঁহাদের গৃহে একটি হাঁড়িতে কুমড়োবীচি, লাউবীচি, নীলবড়ি ইত্যাদি সঞ্চিত করিয়া রাখেন।

এইরূপে মহাকালীর মূর্তির আরও বিভিন্ন তত্ত্ব বিভিন্ন তন্ত্রে সুন্দরভাবে উল্লিখিত আছে।

দক্ষিণাকালীর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত স্তোত্র কর্পূরাদি স্তোত্র স্বয়ং মহাকাল রচিত। এই স্তোত্রে দেবীর প্রধানমন্ত্র, ধ্যান, যন্ত্র, সাধনা ও প্রার্থনার উল্লেখ রহিয়াছে। ২২টি স্তবকের মধ্যে ২টির অনুবাদ এখানে দেওয়া হইল :

'জননি, তুমি জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টি কর ও পালন কর এবং প্রলয়কালে পৃথিবী প্রভৃতি সবই সংহার কর। সুতরাং অহো, তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই ত্রিভুবনপতি বিষ্ণু এবং তুমিই রুদ্র। তুমিই এই সমস্ত হইয়াছ। তোমাকে আমি কি স্তব করিব? হে কালি, তুমি ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ও ব্যোম; তুমি কল্যাণবিধায়িনী গিরিশরমণী; তুমি অদ্বিতীয়া হইয়াও সর্বরূপে বিরাজিতা; হে মাতঃ, তোমার আবার কি স্তব হইবে? তুমি শুধু নিজকৃপায় নিরাশ্রয় আমার প্রতি প্রসন্না হও—যেন এই জন্মান্তে আমার আর পুনর্জন্ম না হয়।' কালী-পূজায় সময়ে এই স্তোত্র অবশ্যই পাঠ করিতে হয়।

দক্ষিণাকালীর পূজায় সময় কবচও পাঠ করা বিশেষ বিধি। কবচের অর্থ বর্ম—যা বিপক্ষের অস্ত্রসমূহ হইতে দেহকে রক্ষা করে। দেবতা বা দেবীর বিশেষ মন্ত্রকে কবচ বলা হয়। লৌহবর্মের ন্যায় দেবীর মন্ত্র সাধকের অঙ্গাদি রক্ষা করে।

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষভাবে ও ভারতের অন্যান্য স্থানেও দক্ষিণাকালী বা শ্যামাকালীর পূজা ও উপাসনা প্রচলিত। বহু সাধক শ্যামাসঙ্গীতের মাধুর্য আস্বাদনপূর্বক গভীরভাবে কালীসাধনায় মগ্ন হইয়াছেন এবং জগজ্জননীর দর্শনলাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। এই সব সাধকদের স্বরচিত সঙ্গীতসমূহ মাতৃভাবের সাধকদের সাধনার চিরন্তন প্রেরণাস্বরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক গীত কয়েকটি মর্মস্পর্শী মাতৃসঙ্গীত সকল মাতৃসাধকের উদ্দীপনার জন্য উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(১) শ্যামা মা কি আমার কালো রে।
(২) শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখান উড়তেছিল।
কলুষের কুবাতাস পেয়ে গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল॥
(৩) কালীনামের গণ্ডী দিয়া আছি দাঁড়াইয়া।
(৪) কে জানে কালী কেমন। ষড়্দর্শনে না পায় দরশন।
(৫) আয় মন বেড়াতে যাবি। কালী কল্পতরু-মূলে চারিফল কুড়ায়ে পাবি॥
(৬) মজলো আমার মনভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।
(৭) যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।

'প্রেমিক' সাধকের একটি বিখ্যাত গান এখানে উল্লেখ করা যায়—ইহার মধ্যে অপূর্বভাবে মায়ের অসীম অনন্তত্বের কথা বলা হইয়াছে।

মা তুমি কে কেউ জানে না।
তোমায় নানা লোকে ব'লছে নানা॥
বেদাগমে পুরাণেতে বলে গেছে নানাখানা,
তাই যে তোমার ঠিক মহিমা একথা তো কেউ বলে না॥
বেদান্তে যে আছে অন্ত তা ত কভু যায় না জানা।
সাংখ্যপাতঞ্জল মীমাংসায় মীমাংসা কিছুই হল না॥
অনন্তরূপিণীর অন্ত বৈশেষিকেতেও মিলে না,

চিদাকাশে যার যা ভাসে তাই তাদের
বোধের সীমানা ॥
প্রেমিক বলে গোলেমালে সেরে গেছে সব
ক'জনা,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শূলপাণি (তোমার) স্বরূপ দেখতে
সবাই কানা ॥

আধুনিক কালে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে এই কালী-সাধনার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ গুরুত্ব আমরা লক্ষ্য করি। হৃদয়ের সমস্ত প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা-ভক্তি উজাড় করিয়া দিয়া তিনি কালীকে মাতৃভাবে—একান্তভাবে আপনার মা জ্ঞানে—সাধন করিয়া তাঁহার দর্শনলাভে কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। পরবর্তিকালে তিনি দক্ষিণেশ্বরে যে-সব কঠিন সাধনা করিয়াছেন তাহা জগদম্বার দর্শনের পর তাঁহারই নির্দেশে। বিশেষভাবে চৌষট্টি-তন্ত্রের প্রতিটি সাধনায় তাঁহার স্বল্পকালের মধ্যে সিদ্ধিলাভ আমাদিগকে চমৎকৃত করে। তিনি বলিয়াছেন, এ-যুগে ঈশ্বরকে মাতৃভাবে উপাসনা করাই বিশেষ উপযোগী। মাতৃভাব অতি শুদ্ধ-ভাব। মা সন্তানের ব্যাকুল প্রার্থনা শুনিয়া তাহা সত্বর পূরণ করেন। সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে তিনি জগদম্বার প্রকাশ দেখিয়া তাঁহাদিগকে মাতৃবৎ ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। এমন কি পতিতা নারীদের মধ্যেও তিনি সেই জগজ্জননীর মূর্তি দর্শন করিয়া সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাইয়াছেন।

এ-যুগে মাতৃভাবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ শ্রীমা সারদাদেবীরূপে। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'তে উল্লেখ আছে, তিনি তাঁহার দেবীরূপের পরিচয় দিয়াছেন—'লোকে বলে কালী'। ইহা ছাড়াও অনেক-ক্ষেত্রে তাঁহার এই দেবীরূপের পরিচয়ের অভিব্যক্তি আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে দেবী ষোড়শীজ্ঞানে পূজা করিয়া জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এক অপূর্ব আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। জগতে ঈশ্বরের মাতৃভাব প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীমা সারদাদেবীকে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার স্থূলদেহ-ত্যাগের পর দীর্ঘ ৩৪ বৎসরকাল এই ধরাধামে রাখিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও কর্মক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের এই জগদম্বার শক্তির লীলা দেখা যায় স্পষ্টতঃই। দক্ষিণেশ্বরে জগদম্বার নিকট তাঁহার বিবেক-বৈরাগ্য, জ্ঞান-ভক্তি, অবাধ দর্শন প্রার্থনা, পরিব্রাজক-জীবনে কন্যাকুমারী মন্দিরে মায়ের নিকট ভারতের অবহেলিত জনগণের দুঃখদুর্দশা মোচনের জন্য কাতর প্রার্থনা এবং কাশ্মীরে ক্ষীরভবানীর মন্দিরে মায়ের দৈববাণী-শ্রবণ প্রভৃতি এই মহাশক্তির লীলা স্মরণ করিয়া আমরা স্তম্ভিত হই। স্বামীজী নিজেও বলিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁহাকে মা-কালী বলিতেন, তিনিই শ্রীশ্রীঠাকুরের স্থূলদেহত্যাগের পর স্বামীজীর মধ্যে অবস্থান করিয়া তাঁহাকে সব কাজ করাইয়াছেন। স্বামীজীর স্বরচিত দুইটি বিখ্যাত কবিতা 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' ও '**Kali the Mother**'-এর মধ্যে এই মহাকালীর বিরাট মহিমা-উপলব্ধির প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই।

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষদের অনুভূতিজনিত বাণীসমূহ হইতে আমরা জানিতে পারি শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ—এই তিন সেই এক মহাশক্তির বিভিন্ন রূপ। তাঁহাদের ত্রয়ী জীবন এই মহাশক্তির সহিত অভিন্নরূপে অবস্থান করিয়া লোককল্যাণসাধন ও যুগধর্ম-সংস্থাপনরূপ কার্য করিয়াছেন। তাঁহাদের জীবন ও বাণীর অনুধ্যানে এই দিকটি সুপরিস্ফুট হয়।

বর্তমান যুগে মানুষের জীবন দুঃখ-যন্ত্রণায় ভারাক্রান্ত। তাহারা এই মহাশক্তির প্রকাশ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণীতে অনুভব করিয়া শান্তি ও আনন্দলাভ করিবে—ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আমরা ভক্তিনম্রচিত্তে এই মহাশক্তি শ্রীশ্রীকালিকার শ্রীপাদপদ্মে সর্বতোভাবে শরণ লইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি—মা, তোমার করুণাময়ী আনন্দময়ী রূপের কথা আমরা শ্রীগুরু ও শাস্ত্রমুখে শুনিয়াছি। মানুষের মধ্যে তমো-রজোগুণজাত যে আসুরীভাব আছে, তাহা জয় করিবার শক্তি শরণাগতদের প্রদান কর, যাহাতে তাহারা সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তোমার কল্যাণময়ী রূপের ধারণা করিতে পারে। তোমারই এই জগল্লীলায় তোমারই কাজ-রূপ উপাসনা সানন্দে অনুষ্ঠান করিয়া এই জীবনের অন্তে তোমার নিত্য নির্গুণ পরমপদ লাভ করিয়া আমরা যেন কৃতকৃতার্থ হইতে পারি। তোমার অপার করুণায় বর্তমান জগতের যথার্থ কল্যাণ হউক—ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

নিষ্ফলা শক্তিপূজা

স্বামী চৈতন্যানন্দ

উদ্বোধন পত্রিকার সহায়ক।

দুর্গাপূজা হয়ে গেল। ৺বিজয়ার কোলাকুলি ও মিষ্টিমুখ করলেন বঙ্গসন্তানগণ। পূজার কদিন বেশ আনন্দে কাটল। বুঝতে পারলাম না কখন দিনগুলি কেটে গেল। এমনি করে প্রতিবছর কদিন আনন্দে কেটে যায়।

পূর্বের তুলনায় বর্তমানে পূজার সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গেছে। আজ পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপূজা হয় বেশ কয়েক হাজার। শুধু কলকাতাতেই তিন হাজারের মতো। পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও বাঙালী প্রবাসীরা দুর্গাপূজা করে থাকেন। তারও সংখ্যা নেহাত কম নয়। গুণে দেখলে কয়েকশ তো হবেই।

তারপর পর পর লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, সরস্বতীপূজা প্রভৃতি হয়। এমনি করে মহাশক্তির বিভিন্নরূপের আরাধনায় আমরা মেতে উঠি। সারা বছরটা আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়ে কেটে যায়। বাঙালী হিন্দুরা বোধ হয় শক্তিপূজা সবচেয়ে বেশি করে।

মনে একটি প্রশ্ন জাগে, এত শক্তিপূজা করে আমাদের কি ফল লাভ হচ্ছে? সমাজের দিকে তাকালে বেশ বোঝা যায়, মহাশক্তির আরাধনায় সারা বছর ব্যস্ত থাকলেও আমরা আসলে নির্বীর্য, ধর্মহীন, বিদ্যাহীন, ধনহীন, অন্নহীন ও শ্রীহীন হয়ে পড়ছি। চারদিকে কেমন একটা তমসাচ্ছন্নভাব। কর্মক্ষেত্রে সর্বত্র মহা অলসতার চিহ্ন। সমাজে প্রত্যেকের কর্তব্য কর্ম আছে, কিন্তু কর্তব্য পালন করার লোক নেই। গীতায় (১৪।১৩) আছে:

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥

—"হে কুরুনন্দন, কর্তব্যাকর্তব্য বিবেকের অভাব, অনুদ্যম, কর্তব্যে অবহেলা ও মূঢ়তা প্রভৃতি লক্ষণ তমোগুণ বৃদ্ধি পেলে জন্মে।"

বিদ্যার্থীদের দিকে তাকালে বোঝা যায়, তারা তথাকথিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি থেকে কি শিক্ষা পাচ্ছে! এই শিক্ষার পরিণতিই বা কি! এ-বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই। সমাজের সামান্য চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই তা ভাল করে জানেন। শিক্ষার নামে কি অরাজকতা চলছে। আজ নৈতিকচরিত্রের মান কোথায় নেমে গেছে! সমাজে সর্বত্র উপরি-উক্ত গীতায় বর্ণিত তমোগুণ-বৃদ্ধির প্রকাশ।

খবরের কাগজ খুললেই দেখা যায়—বধূহত্যা, নারীনির্যাতন, ব্যাঙ্ক-ডাকাতি, অবহেলাজনিত ট্রেনদুর্ঘটনা, দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার চক্র-চক্র, ছোট ছেলেমেয়ে চুরির চক্র, মারামারি, খুনোখুনি প্রভৃতি। বেশি বিস্তারিত করে বলার প্রয়োজন নেই। কাগজ যাঁরা পড়েন, তাঁরা হাড়ে হাড়ে তা জানেন। কাগজের প্রায় সবটা জায়গা জুড়ে আসুরিক শক্তির প্রকাশ। আতঙ্কের সঙ্গে প্রতিদিনের কাগজ খুলতে হয়।

সারা বছর ধরে শক্তিপূজার এই কি ফল? তবে যে শাস্ত্রে বলে, শক্তির আরাধনা করলে চতুর্বর্গ ফল—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ হয়? এ-সব কি মিথ্যা? শাস্ত্র জোর দিয়েই বলেন, এ-সব মিথ্যা নয়। ঠিক ঠিকভাবে পূজাকার্য সুসম্পন্ন হলে, ফল পাওয়া যাবেই। স্বামী সারদানন্দ বলছেন, "প্রসিদ্ধি আছে, শক্তিপূজার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়, বিশেষতঃ কলিতে; অন্য দেবতা সব নিদ্রিত।" কোন কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পাঁচটি কারণের প্রয়োজন হয়। গীতায় (১৮।১৪) আছে:

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥

—"উপযুক্ত দেশ, উদ্যমশীল কর্তা, সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়-গ্রাম, বারবার উদ্যম এবং দৈব।" সাধারণ জ্ঞানে আমরা বুঝতে পারি যে, কোন গন্তব্য-স্থানের পথে অগ্রসর হতে গেলে এক হাতে দৈব ও অপর হাতে পুরুষকারকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হয়। নচেৎ শুধু একটিকে ধরে অগ্রসর হওয়া যায় না। ভারতের পূর্ব পূর্ব ঋষিরা মনোবিজ্ঞান, শরীর-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, রাজনীতি প্রভৃতিতে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন শুধুমাত্র মন্ত্রজপের দ্বারা বা উদ্যমশূন্য হয়ে দৈবের উপর নির্ভর করে নয়। ভারতের তান্ত্রিক অবধূতেরা যে-সব ধাতুঘটিত ওষুধ বা নানারকম বিষপ্রয়োগে বিভিন্ন রোগশান্তির উপায় আবিষ্কার করেছিলেন, তাতে তাঁদের কত উদ্যম ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। "কত সাধকের অনুরাগ-ভক্তিপূত হৃদয়েই শক্তিপূজার ফলেই না ঐ সকলের এক-একটি আবিষ্কৃত হইয়াছে।"

শাস্ত্রের পূজাবিধি অনুযায়ী পূজা করতে হয়। পূজায় যে-সব উপকরণের প্রয়োজন তা জোগাড় করা আয়াসসাধ্য হলেও বিশেষ চেষ্টা করে জোগাড় করতে হয়। পূজার সময় চিত্তকে সংযত ও স্বার্থত্যাগের দ্বারা পরিশুদ্ধ করে দেবীর পাদপদ্মে নিবেদন করতে হয়। ধর্মলাভের জন্য ত্যাগের অবশ্যই প্রয়োজন। শাস্ত্র বলেন, "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ"—ত্যাগ ছাড়া অমৃতত্ব লাভ হয় না। ত্যাগের দ্বারাই একমাত্র ধর্মলাভ হয়। পূজায় যে বলি হয়, তার অর্থ স্বার্থত্যাগ—দেবীর পায়ে শরীর-মন সম্পূর্ণ উৎসর্গ করা। হোমের তাৎপর্য—অন্তরের কামনা-বাসনা, লোভ-মোহ প্রভৃতি হোমাগ্নিতে আহুতি দেওয়া। বিল্বপত্র যে আহুতি দিই তা অনুকল্পমাত্র।

উপরি-উক্তভাবে কি আমরা শক্তিপূজা করে থাকি? করি না বলেই তো শক্তিপূজার কোন ফল লাভ হয় না। পূজার নামে বাহ্যাড়ম্বর। এক পূজার মূর্তি ও মণ্ডপের সঙ্গে অন্য পূজার মূর্তি ও মণ্ডপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মাইকের কান-ফাটানো শব্দে আকাশ-বাতাস উত্তাল। বৃদ্ধ ও অসুস্থ রোগীর প্রাণ ত্রাহি মধুসূদন!

বর্তমানের শক্তিপূজা বাহ্যাড়ম্বরের পূজা। ভক্তি-শ্রদ্ধাহীন পূজা। স্বামী সারদানন্দ বলছেন: পূজাবিধির অঙ্গহানি বা পূজা শ্রদ্ধাহীন হলে পূজার সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায় না। সময়ে সময়ে বিপরীত ফল লাভ হয়। তাই তো আমরা শক্তির আরাধনায় কোন সুফল পাচ্ছি না। সাধারণ নিয়ম আছে—যার যা দরকার তাতে তা না দিলে কাজ হয় না। যেমন—কেমিষ্ট্রি ল্যাবরেটারিতে গিয়ে যদি আমি জল তৈরি করতে চাই, শুধু জল জল করে চিৎকার করলে কি জল উৎপন্ন হবে? হবে না। জল তৈরির জন্য প্রয়োজন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। এবং যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জল তৈরি করতে হবে তার যন্ত্রপাতিরও দরকার। সমস্ত কিছু উপকরণ ঠিক ঠিক হলে তবেই জল তৈরি হবে। কোনটির একটি কম হলে হবে না।

দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যায় মানুষ যদি মৃতপ্রায় হয়, তখন যদি শুধু খোল-করতাল নিয়ে উচ্চৈঃ-স্বরে হরিনাম করি, তাহলে তাদের বাঁচানো যাবে? যদি কেউ সেভাবে করতে চায় তা বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়। ওই সব মানুষদের বাঁচানোর জন্য উদ্যম ও শ্রদ্ধাসহায়ে সর্বাগ্রে অন্নবস্ত্র, ওষুধপথ্য ও গৃহের ব্যবস্থা করতে হবে। বাঁচানোর জন্য যে উপকরণের প্রয়োজন তার একটিও বাদ দিলে হবে না। তেমনি শক্তিপূজার ফল শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী ও শ্রদ্ধাভক্তিসহ না হলে কোন সুফল পাওয়া যাবে না। তাই সারা বছর ধরে শক্তির আরাধনা করেও পূজার ফল উৎপন্ন হয় না। সবই নিষ্ফলা পূজা।

নিবেদিতা ও লোকসংস্কৃতি

ডক্টর সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বাণিজ্য শাখায় সচিব, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। লোকসংস্কৃতি বিষয়ক লেখক।

নিবেদিতা ছিলেন আয়ারল্যাণ্ডের কন্যা কিন্তু ভারতবর্ষের ভগিনী। সমুদ্রবিধৌত সাগরদ্বীপ আয়ারল্যাণ্ডে যাঁর জন্ম, শৈশবকাল যাঁর কেটেছে আয়ারল্যাণ্ডের খাল বিল নদী নালা সমন্বিত নৈসর্গিক পরিবেশে এবং অজস্র রূপকথা উপকথার গল্প শুনে, কত শত নাবিকের নৌ-যাত্রার কিংবদন্তীর কাহিনী শুনে কিংবা ব্যালাড এবং লোকসঙ্গীতের সুরমূর্ছনার মধ্য দিয়ে যাঁর কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে তিনি যখন ভারতে এলেন তখন তাঁর পরিপূর্ণ যৌবন, চিত্তে সন্ন্যাসিনীর ভাব, চোখে পরম গুরু স্বামী বিবেকানন্দের ভারতবর্ষকে ভালবাসার স্বপ্ন। আসলে ভারতবর্ষে পদার্পণ করার পূর্বেই নিবেদিতা ভারতবর্ষের প্রকৃত রূপ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, ভারতবর্ষকে ভালবেসেছিলেন। অবশ্য স্বামীজীর মধ্য দিয়েই। কেবল নিবেদিতাই নন, স্বামীজীর সমস্ত বিদেশী শিষ্য-শিষ্যারাই ভারতবর্ষকে ভালবেসেছিলেন স্বামীজীর মধ্য দিয়ে, স্বামীজীর কথা, স্বামীজীর বক্তৃতার মধ্য দিয়ে। সিস্টার ক্রিষ্টিন তাঁর রেমিনিসেন্সের মধ্য দিয়ে বলেছেন—আমি মনে করি, আমাদের ভারত-প্রেমের জন্ম হয়েছিল যখন স্বামীজীকে I-n-d-i-a শব্দটি তাঁর সেই অপূর্ব স্বরে উচ্চারণ করতে শুনেছিলাম। একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হয়। যখন ভাবি—পাচ অক্ষরের একটি ক্ষুদ্র শব্দে অত কিছু ধরিয়ে দেওয়া যায়! তাতে ছিল ভালবাসা, তৃপ্তিময় বাসনা, গৌরব, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পূজা, উদ্দীপ্ত শৌর্য, ঘরে ফেরার ব্যাকুলতা—এবং পুনশ্চ ভালবাসা—ভালবাসা। —কোন বিরাট গ্রন্থও এইভাবে অপরের মধ্যে অনুরূপ অনুভূতি সঞ্চারে সমর্থ নয়। অন্যের অন্তরে প্রেম সঞ্চারের যাদুশক্তি ওঁর মধ্যে ছিল।

স্বামীজীর শিক্ষাপ্রণালীর ধারাই ছিল এই-রকম। যদি কোন ইউরোপীয় লোক ভারতের জন্য কাজ করেন তবে তাঁকে ভারতের প্রণালীতেই কাজ করতে হবে। তাই নিবেদিতা তাঁর 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' গ্রন্থে স্বামীজীর শিক্ষাপ্রণালীর সম্পর্কে বলেছেন যে, একদিকে ভারতীয় ভাবধারায় কোন্‌গুলি মুখ্য কোন্‌গুলি গৌণ তা যেমন ঠিক রাখতেন তেমনি অতি সামান্য খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলোকেও বাদ দিতেন না, যে-সকল খাদ্য শাস্ত্রসম্মত, শুধু তাই আহার করা এবং হাতে করে গ্রাস ওঠানো, মেঝেয় বসা ও ঘুমানো, হিন্দু আচার সকল পালন করা এবং হিন্দু চোখে যে-সকল আচরণ সু বা কু বলে গণ্য তাদের সেইমত সম্পূর্ণরূপে মেনে চলা —এগুলির প্রত্যেকটি তাঁর মতে সেই ভারতীয় ভাব আয়ত্ত করার উপায় স্বরূপ। এর থেকে বোঝা যায় যে,স্বামীজী এইসব বিদেশী নরনারীদের মধ্যে কিভাবে ভারতবর্ষীয় জীবনধারাটিকে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। এদেশের ভাষা, রীতিনীতি, আদব-কায়দা, অভ্যাস ও আচার-আচরণ, খাদ্যগ্রহণ, বেশভূষা, হাঁটাচলা, ভাল-লাগা মন্দলাগা সমস্ত কিছুকেই ওদের মধ্যে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। একবার একটি চিঠিতে মিসেস ওলিবুলকে স্বামীজী লিখছেন—"সুদীর্ঘ ভ্রমণ শেষ করে—আশা করি, আপনি এখন ভালভাবে বিশ্রাম নিচ্ছেন, এবং নিবেদিতাও বিশ্রাম নিচ্ছে। আমার একান্ত

ইচ্ছা যে, আপনারা কয়েক ঘণ্টার জন্য কলকাতার পশ্চিমের কয়েকটি গ্রামে গিয়ে কাঠ, বাঁশ, বেত, অভ্র এবং খড়ের তৈরী পুরাতন বাংলার চালাঘর দেখে আসুন। এই বাংলোগুলো অপূর্ব শিল্প-নৈপুণ্যের নিদর্শন। হায়! আজকাল শুয়োরের খোঁয়াড়ের মতো ঘরগুলোরও 'বাংলো' নাম দেওয়া হয়।" [পত্রাবলী, ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৭৮৪]

এইভাবেই স্বামীজী নিবেদিতাকে লোক-সংস্কৃতির দীক্ষায় লোকজীবনের চর্চায় ভরপুর করে তুলেছিলেন। নিবেদিতা তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—"কোন একটি প্রথা শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তর্নিহিত আদর্শটিকে দেখাইয়া দিবার স্বামীজীর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। আজি পর্যন্ত আমরা ফুঁ দিয়া আলো নেবানোকে মহা অপবিত্র ও অসভ্য জনোচিত কার্য ভাবিয়া শিহরিয়া উঠি। আবার শাড়ি পরা ও ঘোমটা দেওয়ার অর্থ অভিমান ও হামবড়াইয়ের পরিবর্তে সর্বদা নম্র-মধুরভাবে সকলকে মানিয়া চলা—এ-সকল বাহ্য ব্যাপার কত পরিমাণে এক-একটি আদর্শের অভিব্যক্তি বলিয়া ভারতের সর্বসাধারণের নিকট পরিচিত।" [স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, পৃষ্ঠা ২৮৬]

লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গে একজন বলেছেন যে, লোকসংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের জীবনযাত্রাপ্রণালীর একটা ধারা। প্রত্যেক জাতি বা গোষ্ঠীর জীবন-যাত্রাপ্রণালীর একটি পরিবর্তনশীল অথচ নির্দিষ্ট ধারা আছে যার মধ্য দিয়ে একটা জাতির জীবনী-শক্তি প্রবাহিত হয়। স্বামীজী ভারতীয় লোকায়ত সংস্কৃতি এবং শাস্ত্রীয় সংস্কৃতির দুটি ধারাকে সার্থক-ভাবে অনুধাবন করেছিলেন এবং তা অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন, ভারতীয় জীবনযাত্রার ধারা তৈরি হয়েছে কয়েক হাজার বছরের জীবনচর্চার প্রবাহের মধ্য দিয়ে। সেখানে স্বামীজীর বিশ্বাস ছিল—"ভারতীয় চিন্তা, ভারতীয় দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপারের উপর প্রতিষ্ঠিত।" সুতরাং স্বামীজী তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী তাঁর আলোচনার মধ্যে সব সময় ভারতীয় জীবন-যাত্রার খুঁটিনাটি বিষয়গুলিকে উপস্থিত করতেন। ফলে সেগুলি লোকজীবনের ভিত্তি-মূলের সঙ্গে গ্রথিত হয়ে যেত। যা ছিল তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও বক্তব্যের মূল উৎস-স্বরূপ। তাই আমরা যদি শ্রীরামকৃষ্ণকে সর্বোত্তম অর্থে লোকসংস্কৃতির প্রতীক পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত করি, স্বামীজী সেই লোকসংস্কৃতির প্রতীককে সর্বদাই ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করেছেন শিক্ষকের ভূমিকায়, আর নিবেদিতা ও অন্যান্য সকলে সেগুলিকে নিজের জীবনে ছাত্রদের মতো গ্রহণ করেছেন, আচরণ করেছেন এবং লোকসংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে লোকায়ত হয়ে উঠেছেন। তাই একজন গবেষক প্রকৃত অর্থেই তাঁকে নিবেদিতা লোকমাতারূপে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন।

নিবেদিতা ভারতীয় লোকসংস্কৃতির ধারাকে স্বামীজীর মধ্য দিয়ে দেখার চেষ্টা করলেও, সে দেখা ছিল তাঁর প্রাথমিকভাবে দৃষ্টির উন্মোচন। এই পর্বটিকে যদি আমরা তাঁর জীবনে লোক-সংস্কৃতির উন্মেষ পর্বরূপে চিহ্নিত করি, তাহলে পরবর্তী ক্ষেত্রে নিবেদিতা রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, নাটক ইত্যাদি পাঠের মধ্যে দিয়ে যে লোকায়ত ভারতবর্ষকে অনুধাবন করবার চেষ্টা করেছিলেন তা হচ্ছে তাঁর বিকাশপর্ব। আর যখন নিবেদিতা তাঁর জীবনের শেষপ্রান্তে এসে লোকজীবনের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে ফেলে একদিকে যেমন জাতীয় শিল্প ও লোকশিল্পের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এবং সেগুলিকে লোকায়ত জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে নিজেকেও লোকায়ত জীবনের সঙ্গে একাত্ম

করে তুললেন সেটিকে বলা যেতে পারে, তাঁর জীবনে লোকসংস্কৃতির পরিণতি পর্ব। তাই নিবেদিতা যখন বলেন—"এমন একটি শক্তি ও গতির উৎস নিশ্চয় আছে, যা যুগ যুগ ধরে ভারতীয় জনগণের সমগ্র সাংস্কৃতিক জীবনকে পথ দেখিয়েছে এবং রঞ্জিত করেছে। সে উৎস পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ জাতির প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে। এই হল সেই চলমান বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, যার থেকে নানা ভাষা যেন পৃথক পৃথক গোষ্ঠীর মতো জন্ম নিয়েছে।" [নিবেদিতা রচনা সংগ্রহ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৬] তখন ভারতীয় ইতিহাসের উৎস সম্পর্কে নিবেদিতার গবেষণা আমাদের চমকিত করে। ভারতীয় জীবনযাত্রা-প্রণালী ও গ্রামীণ লোকায়ত সংস্কৃতির ধারায় যে রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আজও প্রবাহিত হয়ে চলেছে এবং উচ্চতর শাস্ত্রীয় সংস্কৃতির সঙ্গে গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির ধারা যে ভারতীয় জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত তা নিবেদিতার গবেষক দৃষ্টিতে সার্থক-ভাবে ধরা পড়েছে। লিখিত সাহিত্যের সঙ্গে মৌখিক সাহিত্যের যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে বর্তমান, নিবেদিতা তাকেও আবিষ্কার করেছিলেন। ভারতবর্ষে চিরকাল লোকসাহিত্য উচ্চতর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, আর উচ্চতর সাহিত্য অর্থাৎ লিখিত সাহিত্য লোকসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। নিবেদিতার লোকসংস্কৃতির দৃষ্টিতে ভারতীয় সাহিত্যধারার এই সম্পর্কটি ধরা পড়েছিল। তিনি বলছেন: এক—ইংরেজী শিক্ষিতসম্প্রদায় ব্যতীত সকলের কাছে এই বই দুটি কাল্পনিক সাহিত্যের প্রতীক ও মান। কাহিনী সকলে জানে, গ্রাম্য নাটকে ও ঠাকুমাদের গল্পে চরিত্রগুলি পরিচিত এবং ছোট থেকে বরাবর এদের উল্লেখ অবিরাম পাওয়া যায়। দুই—পঞ্চদশ শতাব্দীর হিন্দী রামায়ণের লেখক তুলসীদাস উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলির লোকদের জীবনের অন্যতম উৎস। তিন—এগুলির চর্চার ভার থাকে ছাত্রের ব্যক্তিগত পাঠ বা পেশাদার গায়ক, কবি ও যাযাবর কথকদের গভীর পরিশ্রমের উপরে। [ঐ, পৃষ্ঠা ১৮৭]

নিবেদিতা ভারতীয় জীবন সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎসস্থল অনুসন্ধান করতে গিয়ে এমন একটি সঠিক জায়গায় পৌঁছেছিলেন যা হচ্ছে ভারতীয় লোকসংস্কৃতির ভিত্তিভূমি। এককথায় বলা চলে, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎস হচ্ছে লোকায়ত জীবন। তাদের ভাব ভাবনা এগুলি প্রথমে তাদের আচার-আচরণে জীবনযাত্রায় সংগ্রথিত হয়ে, লোকায়ত সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারায় মৌখিক ঐতিহ্যে যাকে 'ভারব্যাল ট্রাডিশান' বলে তার মধ্য দিয়ে লিখিত ঐতিহ্যে অর্থাৎ 'রিটিন ট্রাডিশানে' পৌঁছে যায়। নিবেদিতা ভারতবর্ষের লোকায়ত এই বৈশিষ্ট্যের মূলসূত্রটি সার্থকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর সিদ্ধান্ত রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি সংস্কৃত সাহিত্যের উৎস ছিল লোকায়ত মৌখিক গল্প কাহিনীর ধারা। পরে এগুলি লিখিত ঐতিহ্যের মধ্যে আশ্রয় লাভ করে, লিপিবদ্ধ হয়ে কাব্যাকারে লোকসমাজে প্রকাশিত হয়। আবার সেগুলি পরবর্তী ক্ষেত্রে গীত, গাথা, কিংবদন্তী গল্প কাহিনী ইত্যাদি রূপে পেশাদার গায়ক, কবি, যাযাবর কথকদের মাধ্যমে আবার ছড়িয়ে পড়ে লোকজীবনের মধ্যে। জন্ম নেয় আরও নতুনতর লোকজীবন ভিত্তিক অলিখিত কাব্যকাহিনী। এইভাবেই চলে ঐতিহ্যের অনুবর্তন, এইভাবেই ভিত্তিমূলের সঙ্গে উপরিতলের যোগসূত্র গড়ে ওঠে—ট্র্যাডিশান সমানে চলে। এই হচ্ছে নিবেদিতার দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ—যার সংস্কৃতি লোকায়ত ভিত্তিভূমির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে যুগ-যুগান্তর ধরে।

ভারতীয় আত্মাকে, ভারতবর্ষের সত্তাকে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন নিবেদিতা। তিনি তাঁর গবেষণার দৃষ্টিতে ধরতে পেরেছিলেন, ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাটি দাঁড়িয়ে আছে যেমন লোকসংস্কৃতির ভিত্তিমূলে তেমনি তার সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শ্রেণীর ধর্মীয় ভাবনা এবং ধর্মনৈতিক আচার-অনুষ্ঠানের একটি গভীর মিশ্রিত-রূপ যুক্ত হয়ে আছে। ভারতীয় জীবন-ধারার লোকায়ত আচার-অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে তিনি এই মৌল সংস্কৃতির রূপ লক্ষ্য করেছিলেন। তাই তিনি যখন বলেন—বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে আমরা যখন পড়াশোনা করি, যা প্রাচীনতর হিন্দুধর্মের ভাষান্তর মাত্র, তখন আমরা সন্দেহ করতে পারি না যে, প্রতীক চিহ্নযুক্ত পতাকা, শাঁখ, বাদ্য, ধূপ ইত্যাদি সহ মিছিল প্রাচীন ভারতীয় পূজা অনুষ্ঠানের একটি প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর একটি দৃঢ় বিশ্বাস ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল যে, প্রাচীন রীতিনীতি ও ধারাগুলি ভারতবর্ষের সমাজ-জীবনে আবার ফিরে আসা উচিত; কারণ সে-গুলিই একদিন ছিল ভারতীয় লোকজীবনের ভিত্তিমূল। যেমন ধর্মীয় মিছিলের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি যে-সব আচার-অনুষ্ঠানের উল্লেখ করেছেন তা আশ্চর্যজনক। তিনি বলেছেন—বিয়ের সময় বরের চারপাশে সাতজন নারীর আলোর মশাল নিয়ে প্রদক্ষিণ করা বা মৃত পিতাকে দাহ করার সময় পুত্রের জ্বলন্ত আগুন নিয়ে চারিদিক প্রদক্ষিণ করার মধ্যে প্রাচীন ভারতবর্ষের লোকজীবনে মিছিলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কেবল এই নয়, নিবেদিতা ভারত-বর্ষের লোকায়ত শিক্ষাপদ্ধতির মূল সত্যটিকেও আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রাচীনকালে অনেক স্বল্পশিক্ষিতা মাতা তাঁর সন্তানকে ভাল-বাসার মধ্য দিয়ে শ্রেষ্ঠ করে তুলতে পেরেছিলেন। তার কারণস্বরূপ তিনি বলেছিলেন—প্রাচীনকালে বালিকাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে ব্রতকথা ছিল একটি প্রধান উপাদান। এই ব্রতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বালিকারা সমাজ ও পরিবারকে ভালবাসা এবং উন্নত করার এমন একটি শিক্ষা পেত যা পরবর্তী কালে তার পরিবার-জীবনকে সার্থক করে তুলতে সহায়তা করত।

ভগিনী নিবেদিতা বাংলার লোকসংস্কৃতির একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষিকা ছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেনের "ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য" গ্রন্থে বঙ্গ-লোকসংস্কৃতির প্রতি নিবেদিতার নিগূঢ় আকর্ষণের একটি সার্থক পরিচয় পাওয়া যায়। একদিন দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বাংলা সাহিত্যের ছড়া সংকলন "শূন্য পুরাণ" থেকে শিব সম্পর্কে কয়েকটি ছড়া শুনিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি ছড়া ছিল, তাতে ভক্ত বলছে—"হে শিব, তুমি কেন ভিক্ষা করিয়া খাও? ভিক্ষা বড় হীনবৃত্তি, কোন-দিন কিছু জোটে; আর কোনদিন রিক্ত ভাণ্ডে ফিরিয়া আস। তুমি চাষ করিয়া ধান বোন, তাহা হইলেই তোমার এ কষ্ট দূর হইবে। হে প্রভু, তুমি কতদিন উলঙ্গ হইয়া অথবা 'কেঁওদা' বাঘের ছাল পরিয়া কাটাইবে? যদি কার্পাস বুনিয়া তুলো তৈরী কর—তবে কাপড় পরিতে পাইয়া কত সুখী হইবে।" তখন নিবেদিতা এই কবিতাটি শুনে আশ্চর্য হয়ে কথাটি বারবার উচ্চারণ করেই কেবল বিস্ময় প্রকাশ করেননি, এক অসাধারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন ঐ লোককাব্যের পঙ্‌ক্তি কটি দিয়ে। তিনি বলেছিলেন যে, সাধারণ ভক্ত এবং উপাসক ঠাকুরের কাছে ধন, যশ, মান, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বর প্রার্থনা করে কিন্তু এই গ্রাম্য ছড়াটিতে ভক্ত তার উপাস্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়েছেন, নিজের দুঃখের কথা তাঁর মনে নাই, তার ঠাকুরের দুঃখে প্রাণ গলে গেছে, ঠাকুরের কষ্ট যাতে নিবারণ হয় ভক্তের ভাবনার লক্ষ্য হয়েছে। এটি নিবেদিতার

কাছে একটি অসাধারণ দার্শনিক উপলব্ধির ক্ষেত্রকে উপস্থিত করেছিল যেখানে ভক্ত কাঁদে ভগবান তরে।

বাংলার লোকসাহিত্যের প্রতি নিবেদিতার একটি বিশেষ শ্রদ্ধাভাব ছিল। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যর আশুতোষের উৎসাহে ও দীনেশচন্দ্র সেনের তত্ত্বাবধানে যখন লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় ছড়া, গীতি, ব্যালাড ইত্যাদির সংগ্রহ চলছিল এবং ছাপার অক্ষরে গ্রন্থাকারে মৈমনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা ইত্যাদি নামে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন নিবেদিতা কেবল দীনেশচন্দ্রকে উৎসাহ দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি তিনি ঐসব সংগৃহীত ব্যালাড-গুলিকে অনুবাদেও সাহায্য করেছিলেন। এই সব ছড়া গীতিকা সম্পর্কে নিবেদিতার ধারণা কিরূপ ছিল তা তাঁর একটি মন্তব্য থেকে সঠিক-ভাবে অনুধাবন করা যায়। দীনেশ সেন নিবেদিতার স্মৃতি রোমন্থনে বলেছেন—"তিনি বলিতেন, বড় বড় লম্বা শব্দ লাগাইয়া যাঁহারা মহা-কবির নাম কিনিয়াছেন, পল্লীগাথার অমার্জিত ভাষার মধ্যে অনেক সময় তাঁহাদের অপেক্ষা ঢের গভীর ও প্রকৃত কবিত্ব আছে। আপনি কৃষকগণের গান অবজ্ঞা করিবেন না, তাদের মেঠো সুরে রাগিণী না থাকিলেও কারুণ্য আছে, —তাদের সরল কথায় আভিধানিক জ্ঞান না থাকিলেও প্রাণ আছে, আর তাদের কুঁড়ে ঘরে সোনা-রূপার থাম না থাকিলেও আঙিনায় শিউলি ও মল্লিকা ফুলের গাছ আছে।" কি অসাধারণ বিশ্লেষণ এবং বাংলার লোকসংস্কৃতির প্রধান উপাদান লোকসাহিত্যের গীতিকা সম্পর্কে, লোকগীতি সম্পর্কে নিবেদিতার সার্থক মূল্যায়ন।

লোকশিল্প সম্পর্কে নিবেদিতার ছিল অসাধারণ উৎসাহ। ভারতশিল্পের পুনরুজ্জীবনে তাঁর অনন্যসাধারণ অবদানের কথা—কোন-মতেই অস্বীকার করা যায় না। অবনীন্দ্র-নাথ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখদের শিল্পকর্মে উৎসাহ দেওয়া মানে ভারত শিল্পের প্রাচীন ঐতিহ্য ও নিদর্শনের দিকেই দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়া। নিবেদিতা তাই করেছিলেন। সর্বোপরি এইসব শিল্পীদের শিল্পকর্মে লোকশিল্পের মাধ্যম থেকে উপাদান গ্রহণে উৎসাহ দেওয়া এবং ভারতীয়ত্বের প্রতিষ্ঠা করা—এ সমস্ত কিছুর মধ্যেই নিবেদিতার প্রেরণা প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছে। একবার খড়দার ন্যাড়ানেড়ীদের মেলায়, হলুদ ও কালো রঙে রঞ্জিত স্ত্রী-মূর্তির মাথায় একটা খোঁপা ও জগন্নাথের হাতের মতো অর্ধ-সমাপ্ত দুখানি হস্ত সমন্বিত পুতুল দেখে একটাকা দিয়ে কেবলমাত্র সেগুলি ক্রয়ই করেননি, দীনেশ-বাবুকে বলেছেন—"দীনেশবাবু, ওই পুতুলগুলি আমার এত কেন ভাল লেগেছে শুনবেন? ৩০০০ খ্রীঃ পূর্বের অর্থাৎ এখন হইতে প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্বের অনেকগুলি জিনিস সম্প্রতি ক্রীট দ্বীপ হইতে ডাঃ ইভান্স আবিষ্কার করিয়া বিলাতে লইয়া আসিয়াছেন। আমি এবার বিলাত যাইয়া সেগুলি দেখিয়া আসিয়াছি; সেই সংগ্রহের ভিতর অবিকল এই পুতুলের মতো পুতুল দেখিয়া আসিয়াছি।" সুতরাং বলা চলে নিবেদিতার এই যে দৃষ্টিভঙ্গী এর সূত্রপাত ঘটেছিল স্বামীজীর মধ্য দিয়ে। কিন্তু পরে তা হয়ে উঠেছিল একজন প্রকৃত গবেষকের প্রজ্ঞাদৃষ্টি।

ধর্মস্থান সংক্রান্ত লৌকিক ছড়া

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অবসরপ্রাপ্ত আই. এ. এস., পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনসংযোগ বিভাগের ভূতপূর্ব সচিব। বঙ্গসংস্কৃতি ও মন্দিরভাস্কর্য বিষয়ক বহু গ্রন্থ প্রণেতা এবং সুখ্যাত গবেষক।

গ্রাম-বাংলায় যাঁরাই কিছু ঘোরাঘুরি করেছেন তাঁরা জানেন, অজ্ঞাত পল্লী-কবিদের দ্বারা অজানা সময়ে রচিত নানান স্থানের রকমারি বিবরণসংবলিত বহু লৌকিক ছড়া এখনও লোকের মুখে মুখে ফেরে। সেগুলিতে বিশেষ বিশেষ জায়গার নিন্দা-প্রশংসা, বিবিধ জনপদ বা অঞ্চলের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় খ্যাতি-অখ্যাতির পরিচয়, স্থানীয় আর্থনীতিক, বাণিজ্যিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্ত, প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর কীর্তিকলাপ, নামজাদা মিষ্টান্ন বা উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগান প্রভৃতি কীর্তিত। প্রবাদবাক্যের মতোই এই মৌখিক ছড়াগুলির উৎসভূমি স্থানীয় জনমানস যার সমর্থনে সেগুলি পুষ্ট ও প্রচলিত। এই বহুবিচিত্র ছড়া-ভাণ্ডার বাংলাসাহিত্যের এক অনুদ্‌ঘাটিত অংশ যেখানে ছড়ানো মণিমুক্তাগুলি দিনে দিনে লুপ্ত হচ্ছে লোকস্মৃতি থেকে। যেগুলি এখনও বিলীন হয়নি, বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বার্থে, সেগুলি অবিলম্বে প্রবন্ধ বা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হওয়া উচিত।

বর্তমান নিবন্ধে, স্থানাভাবে, আমরা কেবল ধর্মস্থান সংক্রান্ত ছড়াগুলির আলোচনা করব। সরজমিন ও পত্রযোগে অনুসন্ধানের ফলে আমরা পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার, বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলি, মেদিনীপুর ও ২৪-পরগনার নানাস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত বেশ কিছু এজাতীয় মৌখিক ছড়া সংগ্রহ করতে পেরেছি। উল্লিখিত জেলাওয়ারি ক্রম অনুসারে আমরা অতঃপর সেগুলির উল্লেখ ও আলোচনা করব। দুঃখের বিষয়, পূর্ববাংলা থেকে এই শ্রেণীর কোনও ছড়া পাওয়া যায়নি। প্রথম জেলা কোচবিহারের ছড়াটি হল—

বলরামপুরের বাঁশ।
কোচবিহারের রাস॥

বলরামপুর তুফানগঞ্জ থানার খুব বড় গ্রাম যেখানে প্রচুর বাঁশ পাওয়া যায়। কোচবিহার শহরের সুবিখ্যাত রাস-উৎসবই কিন্তু ছড়াটির আসল উদ্দিষ্ট। সে-বিষয়ে 'কোচবিহার জেলার পুরাকীর্তি' পুস্তকের (গ্রন্থনা: ডঃ শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায়; সম্পাদনা: বর্তমান লেখক; কলকাতা, ১৯৭৪: পৃঃ ৪০-৪১) নিম্নলিখিত উদ্ধৃত অংশটি প্রাসঙ্গিক। "মহারাজ নৃপেন্দ্র-নারায়ণ কর্তৃক ১৮৮৯-৯০ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান মদন-মোহন মন্দিরটি নির্মিত।...রাসপূর্ণিমার সময় প্রায় দশদিন ধরে সেখানে এক বিরাট উৎসব ও মেলা বসে। নৃপেন্দ্রনারায়ণ প্রবর্তিত এখানকার রাস-উৎসব উত্তরবঙ্গের লোক-উৎসবগুলির মধ্যে বৃহত্তম বললে অত্যুক্তি হয় না।"

পরবর্তী দুটি ছড়া বীরভূমের। সে-জেলায় অনেকগুলি পীঠ ও উপপীঠ থাকার কারণে জেলাবাসী হিন্দুদের গর্ব স্বাভাবিক। নিচের ছড়াটিতে সেই আত্মপ্রসাদ ও ছয়টি পীঠের বিবরণ প্রকাশিত।

নলহাটিতে মা ললাটেশ্বরী,
লাভপুরে মা ফুল্লরা।
সাঁইথিয়ায় মা নন্দেশ্বরী,
তারাপীঠে মা জয়তারা॥

বোলপুরে কঙ্কালীতলা,
বক্রেশ্বরে মা'র পায়ের তলা,
এই ছয় পীঠ নিয়ে বীরভূমের বড় গলা ॥

বীরভূমের অপর ছড়াটিতে তিনটি বিভিন্ন স্থানের ধর্মীয় উৎসবের তুলনামূলক গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে।

মুলুকের অপরাজিতা,
মঙ্গলডিহির রাস।
ভুরকুণ্ডার ডেঙোঠাকুর,
শুনতে উপহাস ॥

অর্থাৎ, বোলপুর থানার মুলুক গ্রামের বিখ্যাত অপরাজিতা দেবীর অর্চনা এবং ইলামবাজার থানার মঙ্গলডিহির সাড়ম্বর রাস-উৎসবের সঙ্গে সিউড়ি থানার আদিবাসী-পল্লী ভুরকুণ্ডার ডেঙো-ঠাকুরের সামান্য পূজার তুলনা উপহাসের সামিল।

পুরুলিয়ার ছড়াটিতে সে-জেলার তিনটি শৈবতীর্থের শিবদের গয়াধামের সুপ্রসিদ্ধ গদা-ধরের সমমর্যাদার বলে প্রচ্ছন্ন দাবি করা হয়েছে।

বুধপুরের বুধেশ্বর।
আনাড়ার বাণেশ্বর।
অযোধ্যার দামোদর।
গয়াধামের গদাধর ॥

বুধপুর, আনাড়া ও অযোধ্যা, যথাক্রমে—মান-বাজার, পারা ও বড়বাজার থানায় অবস্থিত। সেসব স্থানের শিবের কিছু স্থানীয় প্রতিপত্তি আছে। ছড়াটি সেজন্য উৎকট অঞ্চলপ্রীতির নিদর্শন।

বাঁকুড়ার ছড়া তিনটি মোটামুটি স্বতঃবোধ্য। প্রথমটির বয়ান—

হাজীপুর, গাজীপুর, মধ্যে খোলাখালি।
তার মধ্যে আছেন এক চামুণ্ডা-কালী ॥

উল্লিখিত গ্রামগুলি সবই বিষ্ণুপুরের পাশের থানা জয়পুরে অবস্থিত। লৌকিক ছড়ায় স্থান করে নিলেও এই কালীর খ্যাতি কাছাকাছি এলাকাতেই সীমাবদ্ধ।

দ্বিতীয় ছড়াটিতে কোনও বিশেষ জায়গার নাম করা হয়নি বটে। তবে পূজার 'থানে' অধিষ্ঠিতা এরকম বেশভূষায় সজ্জিতা মনসামূর্তি বাঁকুড়ার যত্রতত্র দেখা যায়।

পাঁচমুড়ার হাতি ঘোড়া,
পুরুলিয়ার 'লা' (লাক্ষাজাত আলতা)।
বিষ্ণুপুরের শাঁখা প'রে,
সেজেছেন মনসা মা ॥

তালডাংরা থানার পাঁচমুড়া গ্রামে প্রস্তুত পোড়া-মাটির হাতিঘোড়া (বিশেষত লম্বা-গলা ঘোড়া) এখন জগদ্‌বিখ্যাত ; পুরুলিয়ায় লাক্ষা ও লাক্ষা-জাত দ্রব্য যথেষ্ট উৎপন্ন হয় আর বাঁকুড়া জেলার মহকুমা-শহর বিষ্ণুপুরের শঙ্খশিল্পীদের দক্ষতা সুবিদিত।

বাঁকুড়া শহরে যে রথযাত্রা-উৎসব হয় তা এমন কিছু প্রসিদ্ধ না হলেও স্থানীয় জনসাধারণ, বিশেষ করে আদিবাসী নরনারীদের কাছে, তা খুবই আকর্ষণীয়। সে-সম্প্রদায়ের কোনও অজ্ঞাত গ্রাম্য কবি হয়তো নিচের ছড়াটির রচয়িতা।

চল্ লো সই !
বাঁকুড়ার রথ দেখতে যাই ॥
তোদের হলুদমাখা গা।
তোরা রথ দেখতে যা ॥
আমরা হলুদ কুথায় পাব।
আমরা লেউটা (উল্টা) রথে যাব ॥

বর্ধমানের দুটি ছড়া কাটোয়া থানার অগ্রদ্বীপ ও কালনা থানার বাঘনাপাড়া সম্পর্কে। উভয় স্থানই প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থ। প্রথম ছড়াটি এই—

নেড়ানেড়ী দোলে।
অগ্রদ্বীপের কোলে ॥

নেড়ানেড়ী বলতে মুণ্ডিতমস্তক বৈষ্ণব (বিশেষত প্রাক্তন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী) স্ত্রী-পুরুষকে বোঝায়। বারুণীস্নানের মেলায় তাঁরা দলে দলে অগ্রদ্বীপে আসেন। এই প্রসঙ্গে অমিয় বসু কর্তৃক সম্পাদিত এবং প্রাক্তন পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ থেকে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বাংলায় ভ্রমণ' নামের প্রচুর তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ (এখন দুষ্প্রাপ্য) থেকে নিচের উদ্ধৃতিটি প্রাসঙ্গিক। "··ইহা প্রাচীন নবদ্বীপের অন্তর্গত একটি পল্লী। এখানে চারি শত বৎসরের অধিককাল পূর্বে চৈতন্যদেবের নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত এক গোপীনাথ বিগ্রহ আছেন। চৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ গোবিন্দ ঘোষঠাকুর এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। কথিত আছে, অন্তিম-কালে তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাদের মধ্যে কে তাঁহার শ্রাদ্ধের অধিকারী হইবেন। ইহাতে তিনি উত্তর দেন, গোপীনাথকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করেন, সেজন্য গোপীনাথই তাঁহার শ্রাদ্ধের অধিকারী। আজিও প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের কৃষ্ণা-দ্বাদশী তিথিতে (বারুণীস্নান-তিথি) গোপীনাথ বিগ্রহকে শ্রাদ্ধোপযোগী বেশভূষায় সজ্জিত করা হয়।"

'সাহেবধনী' লোকধর্ম গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের এক উপশাখা। তাঁদের প্রভাব-পরিমণ্ডল নদীয়া, বর্ধমান ও হুগলি জেলার স্থানবিশেষে বিস্তৃত। জাতিভেদ ও মূর্তিপূজার বিরোধী এই সম্প্রদায়ে পঙ্‌ক্তিভোজন সহ সকলের সমানাধিকার স্বীকৃত। এই ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক গীতিকার জাদু-বিন্দুরচিত একটি ছড়ায় বাঘনাপাড়ার বৈষ্ণব-উৎসবের বিবরণ নিম্নরূপ—

এখনও নেড়ীনেড়ায় আসে এই বাঘনাপাড়ায়
আনন্দে নাচে গায় গাছের গোড়ায়।
কেন্থা-করোয়া (কাঁথা-কমণ্ডলু) সব তাদের
গলায়।

হুগলির দুটি ছড়া শ্রীরামপুর থানার মাহেশ ও মগরা থানার বংশবাটি (বাঁশবেড়ে) সম্পর্কে। মাহেশের রথযাত্রা-উৎসব সুপ্রসিদ্ধ। একমাত্র পুরী ছাড়া এত বড় রথের মেলা আর কোথাও দেখা যায় না। স্থানীয় প্রাচীন ও সুগঠিত জগন্নাথ-মন্দির (বিগ্রহ: জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বল-রাম) থেকে আশপাশের বাসিন্দাদের মধ্যে সংবৎসর প্রচুর প্রসাদ বিতরণ করা হয়ে থাকে। সেই সুবাদে দেবতার ভোগ হিসাবে নিবেদিত সামান্য ভাত, খিচুড়ি ও পায়েস সাধারণ্যে উচ্চ মর্যাদা লাভ করে নিচের ছড়াটিতে স্থান করে নিয়েছে।

খিচুড়ি, অন্ন, পায়েস।
এ তিন নিয়ে মাহেশ॥

দ্বিতীয় ছড়াটি এককালীন প্রখ্যাত সংস্কৃতচর্চাকেন্দ্র বংশবাটির অতীত গরিমার স্মারক। যথা—

পরিপাটি বংশবাটি স্থান মনোহর।
যেদিকে তাকাই দেখি সকলই সুন্দর॥
বিদ্যাবিশারদ কত পণ্ডিতের বাস।
সুগৌরবে শাস্ত্রালাপ করে বারো মাস॥

মেদিনীপুরের ছড়া মাত্র একটি হলেও সেটি ডেবরা থানার অন্তর্গত প্রায় অপরিচিত এক চিত্তাকর্ষক তীর্থক্ষেত্র সম্পর্কে। তার আঞ্চলিক খ্যাতি অবশ্য যথেষ্ট কেননা সেটির বয়ান—

যা নাই ভাণ্ডে (অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে)।
তা কেদার-কুণ্ডে॥

খড়্গপুর-ঝাড়গ্রাম রেলপথের মধ্যবর্তী স্টেশন বালিচক থেকে তিন মাইল দূরবর্তী কেদার গ্রামের কেদারেশ্বর শিবমন্দির সম্বন্ধে 'বাংলায় ভ্রমণ' গ্রন্থে (প্রাগুক্ত) বলা হয়েছে—"কেদারেশ্বর 'ভুড়ভুড়ি কেদার' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। রাজা তোডরমল্লের রাজস্ব তালিকায় কেদারকুণ্ড পরগণার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং অনুমিত হয় যে তৎপূর্ব হইতেই এখানে এই শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। রাজা যুগলকিশোর রায়

নামক জনৈক প্রাচীন জমিদার এই শিবমন্দিরের নির্মাতা বলিয়া কথিত। মন্দিরের পার্শ্ববর্তী একটি কুণ্ড হইতে সর্বদাই ভুড়ভুড় শব্দে বুদ্বুদ উঠে। এইজন্য শিবের নাম 'ভুড়ভুড়ি কেদার' হইয়াছে। সম্ভবতঃ নিকটস্থ ক্ষীরাই নদীর সহিত এই কুণ্ডের কোনরূপ যোগ থাকার জন্য এইরূপ জলবুদ্বুদ উঠিয়া থাকে। পৌষ-সংক্রান্তিতে এই কুণ্ডে স্নান করিলে সন্তান লাভ করা যায় এই বিশ্বাসে বহু নারী ঐ দিন এখানে সমবেত হন এবং তদুপলক্ষে এখানে সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা বসে।"

নদীয়ার দুটি ছড়ার মধ্যে প্রথমটি, প্রত্যাশিতভাবেই, নবদ্বীপ সম্বন্ধে। সেখানকার ব্যাপক ধর্মীয় পরিবেশ গ্রামীণ ছড়াকারদের নম্র-মানস ও সরল ভাষায় কিভাবে ব্যক্ত হয়েছে দেখুন।

কোষাকুষি, চন্দনের টিপ।
এ তিন নিয়ে নবদ্বীপ ॥

চৈতন্য-বৈষ্ণবধর্মের 'সাহেবধনী' শাখা ছাড়া আর-একটি উপশাখা 'কর্তাভজা' সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র কল্যাণী থানার অন্তর্গত ঘোষপাড়ায়। সেখানে তাঁদের আরাধ্যা 'সতী-মা'র সমাধিতে তাঁর প্রতিকৃতি উপাসিত হয়, দোলপূর্ণিমার সময় সপ্তাহব্যাপী এক বিরাট মেলা বসে এবং অদূরের 'হিমসাগর-দিঘি'র জলকে ভক্তেরা সর্বরোগহর, বিশেষত যাবতীয় চক্ষুরোগের নিরাময়কারক বলে মনে করেন। এই সম্প্রদায়ের গীতিকার জাদুবিন্দুর রচিত একটি ছড়ায় আছে—

কত দাই এসে ঘোষপাড়ায়।
মায়ের কৃপাবলে অবহেলে মন্দ রোগ তাড়ায় ॥
ডুবে হিমসাগরের শীতল জলে,
দূর হয়ে যায় আপদবালাই ॥

২৪-পরগনার তিনটি ছড়ার মধ্যে প্রথমটি সাগরদ্বীপের (সাগর থানা) দক্ষিণতম প্রান্তে কপিলমুনি-মন্দিরের সামনে সমুদ্রস্নানের মহাপুণ্যের কথা অতি সংক্ষেপে, খাঁটি গ্রাম্য ছড়ার আঙ্গিকে, ব্যক্ত হয়েছে। যথা—

সব তীর্থ বার বার।
সাগরতীর্থ/গঙ্গাসাগর একবার ॥

পশ্চিমবঙ্গে সর্বভারতীয় খ্যাতির তীর্থ এই একটিই। পৌষ-সংক্রান্তির প্রত্যূষে মরিবাঁচি করে এখানে একটা ডুব দিতে পারলে যে অক্ষয় স্বর্গবাস সেই দৃঢ় প্রত্যয়ে ভারতের দূরদূরান্তর থেকে প্রতি বৎসর কয়েক লক্ষ যাত্রী অশেষ পথশ্রম উপেক্ষা করে এখানে সমবেত হন। এমনই চলছে স্মরণাতীত কাল থেকে।

দ্বিতীয় ছড়াটি খড়দহ থানার অধীন বিখ্যাত বৈষ্ণব-কেন্দ্র পানিহাটি সম্পর্কে। খুব কম ক্ষেত্রেই এসব স্থান-বিবরণী ছড়ার আনুমানিক রচনাকাল বা রচয়িতার নাম জানা যায়। এটি বিরল ব্যতিক্রম যেহেতু প্রায় চার'শ বছর আগে লিখিত জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থের এটি এক অংশ।

পানিহাটি সম গ্রাম নাহি গঙ্গাতীরে।
বড় বড় সমাজ সব পতাকা-মন্দিরে ॥

অর্থাৎ, পতাকাশোভিত বহু মন্দিরে গুরুত্বপূর্ণ সব বৈষ্ণব-সংস্থার অবস্থিতির জন্য পানিহাটির তুল্য গ্রাম গঙ্গাতীরে আর নেই। স্থানটি চৈতন্যদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ পারিষদ রাঘব পণ্ডিতের শ্রীপাট নামেও পরিচিত। গঙ্গাতীরে যে সুপ্রাচীন ঘাটটির ভগ্নাবশেষ আজও দেখা যায়, সেখানে, ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে পুরী থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়, শ্রীচৈতন্য অবতরণ করেছিলেন বলে জনশ্রুতি। এখানকার অপর পুরাসম্পদ, প্রায় সাত'শ বছরের পুরাতন এক বটগাছ যার ছায়ায় গৌর-নিতাই নাকি একদা বিশ্রাম করেছিলেন। সেখানে একটি ছোট কক্ষের মধ্যে চৈতন্যদেবের পদচিহ্ন রক্ষিত আছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা-ত্রয়োদশী তিথিতে এখানে অনুষ্ঠিত এক মহোৎসবে দেশ-বিদেশের বৈষ্ণবরা আজও যোগ দেন। শ্রীচৈতন্য ও তাঁর

নিকটতম সহচরদের স্মৃতিপূত এহেন পুণ্যস্থানে বহু গুরুত্বপূর্ণ বৈষ্ণব-প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব প্রত্যাশিত।

তৃতীয় ছড়াটি জগদ্দল থানার অন্তর্গত প্রখ্যাত শাস্ত্রচর্চাকেন্দ্র ভট্টপল্লী বা ভাটপাড়া সম্পর্কে। যথা—

পাঁজি, পুঁথি, স্তোত্রপড়া।
এ তিন নিয়ে ভাটপাড়া॥

এ-ছড়ার যিনি লেখক তাঁর ইতিহাসজ্ঞান বা বিদ্যার দৌড় আর-পাঁচজন গ্রামীণ ছড়াকারের থেকে বেশি না হওয়ায় তিনি ভাটপাড়ার পণ্ডিত-সমাজে অতি উচ্চস্তরের শাস্ত্রচর্চা ও সংস্কৃত-অধ্যয়নকে 'পাঁজি, পুঁথি, স্তোত্রপড়া'র অধিক কিছু ভাবতে পারেননি। সেজন্য প্রাগুক্ত 'বাংলায় ভ্রমণ' পুস্তকটি থেকে আর-একটি উদ্ধৃতি এক্ষেত্রে একান্ত প্রাসঙ্গিক। "ভাটপাড়া বা ভট্টপল্লী অতি পুরাতন গ্রাম। ইহা বাংলাদেশে সংস্কৃতচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র। ভাটপাড়া নানা শাস্ত্র-অধ্যাপক ও বহু পণ্ডিতের জন্মস্থান। ইহাদের মধ্যে নিমাই তর্কপঞ্চানন, হলধর তর্ক-চূড়ামণি, তারাচরণ তর্করত্ন, রাখালদাস ন্যায়রত্ন, মধুরাম সার্বভৌম, শিবচন্দ্র সার্বভৌম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ভাটপাড়ার পণ্ডিতমণ্ডলীর শাস্ত্রীয় মতামত সমগ্র বঙ্গে সম্মানিত।"

ধর্মস্থান সংক্রান্ত লৌকিক ছড়া বিষয়ে এ-নিবন্ধটি গভীর পরিতাপের সঙ্গে এখানেই শেষ করছি। কেননা পূববাংলা থেকে সমশ্রেণীর একটিও ছড়া সংগৃহীত হয়নি। অথচ সেখানে সীতাকুণ্ড, চন্দ্রনাথ পাহাড়, মেহার, লাঙ্গলবন্ধ প্রভৃতি বহু হিন্দুতীর্থ এবং অসংখ্য ধর্মপ্রাণ পীর-দরবেশের দরগা-মাজার ও প্রসিদ্ধ সব মসজিদ-কেন্দ্রিক মোসলেম পুণ্যস্থানের অভাব নেই। পশ্চিমবঙ্গের বহু ধর্মস্থানও আমাদের আলোচনা থেকে বাদ পড়েছে। বর্তমান নিবন্ধ লেখক এসব ছড়া সংগ্রহে তাঁর একক প্রচেষ্টার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। সেজন্য তাঁর সংগ্রহের কাজ অব্যাহত আছে। ভবিষ্যতে যদি এ-বিষয়ে কোন গ্রন্থ রচিত হয় তা হলে তাতে আরও অনেক অনুরূপ ছড়ার উল্লেখ করা যাবে, এমনই আমাদের বিনীত বিশ্বাস। ইতোমধ্যে অপরাপর গবেষকরা যদি এদিকে মনোনিবেশ করেন তবে এই অনধীত বিষয়টি উপযুক্ত মর্যাদায় বিশদভাবে আলোচিত হবার উপায় হয়।

প্রসীদ বরদে দেবি

ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর
নেতাজী ইনস্টিট্যুট ফর্‌ এশিয়ান স্টাডিজ-এর ফেলো।

শুদ্ধ আমি, পূর্ণ আমি—আমি মায়াতীত,
এবে ক্রীড়াপুত্তলিকা জন্মমৃত্যুভীত,—
অসহায় চলিতেছি তোমারি ইঙ্গিতে।
মহামায়া, তব লীলা না পারি বুঝিতে—
কেন মোরে নিয়ে যাও যথা ইচ্ছা তব,
ভাঙ্গি, গড়ি ক্রীড়াগৃহ নিত্য নব নব।
এ অনন্ত যাত্রা-ক্লান্ত থামিবারে চাই,—
লঙ্ঘিব তোমার ইচ্ছা হেন সাধ্য নাই॥

জ্ঞানীরও চেতনা তুমি করিয়া হরণ
পুনঃ মুক্তি দাও তারে,—যদি লয় মন!
তুমি বন্ধ-হেতু মাগো,—মুক্তি তব ঠাঁই
ছাড়িব তোমার মায়া হেন সাধ্য নাই।
(তাই) 'প্রসীদ বরদে দেবি!' লইনু শরণ।
মায়ামোহবন্ধ মোর করগো ছেদন॥

প্রকৃতি-পরিবেশ ও মানসিক কারণে দৈহিক রোগ

ডক্টর জগদিন্দ্র মণ্ডল

অধ্যাপক, ফলিত মনোবিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

"বড় বিস্ময় লাগে"—গানটি ভেসে আসছিল। নীরব স্তব্ধ রাত্রি, নীলাকাশের আঁচলে অগণিত নক্ষত্র। পরিচ্ছন্ন মৃদুমন্দ বাতাস। সুবাসিত ফুলের হাওয়ায় কানাকানি। এমনি একটা পরিবেশ ভাবতে কেমন ভাল লাগে। মন ভরে উঠে—প্রাণের আরাম হয়। কিন্তু এমনি পরিবেশ আমাদের চারপাশ থেকে কতদূরে সরে যাচ্ছে। এখন শুনি শরৎকাল,—কিন্তু শিউলি দেখতে পাই না। এই নগর-জীবনে ধোঁয়াকালি, কোলাহল, স্বস্তি নেই। দলে দলে মানুষ দ্রুত ছুটছে, পথ দীর্ণ, ছিন্নভিন্ন। চোখ কষ্ট পায়, মন উত্তেজনায়, উদ্বেগে ক্লিষ্ট হয়। সবুজ গাছগাছালি বড় একটা চোখে পড়ে না। অথচ এই শহরেরই এখানে ওখানে যেটুকু গাছ, যেটুকু সবুজের আভা, সেখানে গাছে গাছে লাল, হলুদ, নীলের ছোপ। যেদিনের যে রঙ্গ, যেদিনের যে ফুল, যেদিনের যে ফল। যেই শরৎ, অমনি শিউলি। যেই বসন্ত অমনি কৃষ্ণচূড়া। লাল টকটকে কৃষ্ণচূড়া, সে তো বসন্তেরই চিহ্ন। পৃথিবীর আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত, জোয়ার ভাঁটা, ফুল ফোটা, ফুল ঝরা —এসব পরিবর্তন আমাদের চারদিকে ঘটছে, আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে, আমাদের অনুভূতির মধ্যে ধরা পড়ছে। মনের জগতে এরা আছে। আমাদের প্রত্যক্ষ চারপাশ, আমাদের নিকট, আমাদের দূরান্বিত প্রকৃতি-পরিবেশ, আমাদের অস্তিত্বকে, আমাদের দেহ-মনকে প্রভাবিত করছে। পরিবেশ আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত—আমাদের অস্তিত্বের সহভাগ।

অনেকেই এখন প্রশ্ন করছেন—মানুষের সৃষ্ট পরিবেশ, মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপযোগী হচ্ছে কি? আমাদের নিশ্বাস-বায়ু আর অমলিন থাকছে কি? আলো-আকাশ আমাদের জীবন থেকে নিয়ত দূরে সরে যাচ্ছে না কি? জীবনে যান্ত্রিকতা আমাদের ক্রমে রূঢ় করে তুলছে না কি? পরস্পরের সম্পর্কে কৃত্রিমতা ও নিতান্ত স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকছে কি? মনে-দেহে আমরা দীর্ণ জীর্ণ হতে হতে ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়ছি না কি? এইসব প্রশ্ন এখন অনেককেই ভাবিয়ে তুলছে। পরিবেশ, পরিবেশ-নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এখন ভাবনা-চিন্তা আরম্ভ হয়েছে। পরিবেশ দূষণ, পরিবেশের প্রভাবে জীবন-যাত্রার হেরফের, পরিবারের কাঠামো, পারিবারিক সম্পর্ক, জীবনের দ্রুতগতি, জীবন-ধারণে যে প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ধ্বস্তা-ধ্বস্তিতে বিব্রত বিধ্বস্ত জীবনে যে অস্বাচ্ছন্দ্য, যে অস্বাস্থ্যকর অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, সে-সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে এখন উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা আরম্ভ হয়েছে। কোন না কোন ভাবে জীবন-যাত্রায় মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য ঘনীভূত হচ্ছে। মানসিক রোগ ও মানসিক কারণে শারীরিক বহুরোগের প্রকোপ ইদানীং বহুগুণ বেড়ে গেছে।

পরিবেশ দুরকমের—ভৌতিক বা **physical environment**, মানসিক বা **psychological environment.** মানসিক পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে পারস্পরিক সম্পর্ক। পরিবারে, কর্ম-সংস্থায়, সমাজ-সংস্থায়, বিদ্যালয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্কের ধারা, মানসিক পরিবেশের রূপ-প্রকৃতি নির্ধারণ করে। ভৌতিক পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রধানত বাইরের প্রকৃতি—আলো, উত্তাপ, জলবায়ু, পরিসর, স্থান-উচ্চতা, ঋতু পরিবর্তন ও আনুষঙ্গিক আর যা কিছু।

এটা অবশ্য ঠিক যে, ভৌতিক পরিবেশের বিষয়টি দৈহিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে যতটা সম্পর্কান্বিত, তুল্যমানে মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে ততটা নয়, কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্য যেহেতু দৈহিক স্বাস্থ্যকে বাদ দিয়ে নয়, সেইহেতু ভৌতিক পরিবেশও মনের স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। ঠিক সেইভাবেই বলা চলে মানসিক পরিবেশ, অর্থাৎ পরিবারে, বিদ্যালয়ে, কর্মক্ষেত্রে ও বৃহত্তর সমাজ-প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্কের প্রকার-ভেদে যে পরিবেশের উদ্ভব হয় তা মানসিক স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ন্ত্রণে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই এটা মনে রাখতে হবে, দেহের অসুখ যেমন মনকে প্রভাবিত করে, কাতর ও পীড়িত করে, ঠিক তেমনি মনের অসুখও দেহের অস্বস্তি, কোন কোন ক্ষেত্রে দেহের অসুখ ঘটিয়ে থাকে। এইসব অসুখ নিয়ে আমরা এখন খুবই চিন্তিত। মাত্রাধিক রক্তের চাপ, হৃদ্‌রোগ, পেপ্‌টিক আলসার, কোলাইটিস্‌, এসব রোগের প্রকোপ এখন যথেষ্ট বেড়ে গেছে। হৃদ্‌রোগ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মৃত্যুর সাক্ষাৎ কারণ—অসহায়ভাবে এর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে। অপরিকল্পিত নগর ও যন্ত্র-জীবনে পরিবেশের অস্থিরতা, জটিল প্রতিযোগিতা, অতিমাত্রিক দ্রুততা, নিরাপত্তার অভাববোধ, মানসিক দ্বন্দ্ব ও উদ্বেগ থেকে মনের উপর যে চাপের সৃষ্টি হয় তার পরিণতি হিসাবেই এইসব রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটছে কিনা, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা ভাবছেন। সর্বাংশে কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হলেও, পারিবেশিক অস্থিরতা ও অবস্থার সঙ্গে যে, এইসব রোগের একটা বিশেষ পৌনঃপুনিক সম্পর্ক আছে, সেটা এখন স্পষ্ট। পরিবেশের অস্থিরতা ও মাত্রাধিক চাপ শরীরের কোন্‌ অংশে কীভাবে চাপের সৃষ্টি করে, তা শারীরবিদ্যার পর্যালোচনা করে দেখানো যেতে পারে। এইসব রোগকে মানসিক কারণ-জাত বা এককথায় সাইকোসোমাটিক রোগ বলে অভিহিত করা হয়।

পরিবেশের প্রভাব যে, এইসব রোগের জন্য কতটা দায়ী, তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে, পরিবেশ ও মানুষের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের সূত্রটি আলোচনা করে। পরিবেশ বলতে এখানে মানসিক পরিবেশের কথাই বলা হবে। আমাদের আচরণের নির্ধারকের অনেকটাই জন্ম-সূত্রে প্রাপ্ত; যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রত্যাবর্ত-ক্রিয়া প্রভৃতি, আবার আচরণ নির্ধারকের অনেকটাই পরিবেশ-নিয়ন্ত্রিত। পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যরক্ষা করে চলতে হয়। পরিবেশের প্রকার ও চারিত্র-বৈশিষ্ট্যের উপর অভিযোজনের (adjustment) প্রকার ও পরিসর নির্ভর করে। পরিবেশের আনুকূল্য ও প্রতিকূলতা নির্ণয় করে, মনের উপর কতটা চাপ পড়বে ও কীভাবে সঙ্গতি রক্ষা করে একজন চলবে।

কোন ব্যক্তির চিন্তাভাবনা, প্রতিন্যাস, মূল্য-বোধ ও আচার-আচরণ তার সামাজিক, অর্থ-নৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। গোল্ডষ্টাইন, ডলার্ডমিলার পরিবেশের, বিশেষ করে সাংস্কৃতিক পরিবেশের ব্যক্তি-জীবনের উপর প্রভাব ও ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য ও ভার-সাম্য নিয়ন্ত্রণে তার ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী এরিক ফ্রোম বলেছেন, ব্যক্তির সামাজিক অভিযোজন প্রক্রিয়াতে ব্যক্তির অন্তর্জাত চাহিদা ও সামাজিক চাহিদার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া চলে। সমাজসংস্কৃতির প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তিকে তার একটি সামাজিক চরিত্র গঠন করতে হয়। কিন্তু সমাজ-প্রকৃতির মধ্যেই যদি রূপান্তর ঘটতে আরম্ভ করে, যদি সাংস্কৃতিক জীবনের পরিবর্তন হতে থাকে, তাহলে তা ব্যক্তির

সামাজিক চরিত্রের মধ্যে বিশৃঙ্খলা আনবেই। তাঁর মতে বংশগতি ও পরিণমন-প্রক্রিয়া হল জৈবিক আধার, কিন্তু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল অনুকূল না হলে, ব্যক্তি ব্যক্তিতে সহযোগিতা সহমর্মিতার পরিমণ্ডল না থাকলে, ব্যক্তির জন্মগতিতে প্রাপ্তশক্তির যথাযথ বিকাশ ঘটে না, তার প্রয়োজন মেটে না, তার উদ্বেগের নিরসন হয় না। সুলিভান বলেছেন, সব মানুষেরই দুটি লক্ষ্য—একটি হল তার জৈবিক চাহিদা পূরণ, অপরটি হল তার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক চাহিদা পূরণ। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদার মধ্যে পড়ে, একজনের সামাজিক স্বীকৃতি, সামাজিক মর্যাদা ও সমাজে পারস্পরিক সুসম্পর্ক। ব্যক্তিত্ব গঠনে এই সমাজসংস্কৃতির প্রভাব অপ্রতুল। মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক রোগের নিয়ামক হিসাবেও সমাজসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

মনোবিজ্ঞানী মাস্‌লো বলেছেন, প্রতিটি মানুষ মূলতঃ জন্মগতভাবে ভাল, ভাল না হলেও অন্তত ভালও নয়, মন্দও নয় এমন একটা অবস্থায় থাকে। প্রতিটি মানুষের মধ্যে এবং স্বভাবতই প্রতিটি শিশুর মধ্যেই থাকে সুস্বাস্থ্যের অভিলাষ, বিকশিত হয়ে উঠার জন্য একটি আন্তরিক প্রেরণা এবং সর্বোপরি জন্মগত শক্তি প্রতিভার স্ফুরণের স্বতঃ-স্ফূর্ত উদ্দীপনা। বিকৃত পরিবেশ মানুষকে বিকৃত করে, অসুস্থ করে। অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও বিকৃত সমাজসংস্কৃতি, ব্যক্তির চিন্তার জগতকে অসুস্থ করে তোলে, বিকৃত করে তোলে। মানুষ স্বভাবতঃ সৃজনশীল, সে ধ্বংস করতে চায় না। কিন্তু বিকৃত পরিবেশের জন্য মানুষের আন্তঃপ্রকৃতি যদি বিকাশপথে বাধা পায়, তার ব্যক্তিত্বের বিকাশে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয় তাহলে সে বিদ্রোহী হয়ে উঠে, ধ্বংস-প্রবণতা তখন তাকে পেয়ে বসে। মাস্‌লো আরও বলেছেন, মানুষের মধ্যেই রয়েছে সুবিচার পাওয়ার জন্মগত চাহিদা, রয়েছে সততা, সৌন্দর্য, সুসামঞ্জস্যের প্রতি জন্মগত আকর্ষণ। জৈবিক মৌল চাহিদার মতো, মানুষের এই আন্তর চাহিদাও জন্মগত ও মৌল। এই আন্তর চাহিদার অপূরণও মানুষকে অসুস্থ করে তুলতে পারে।

সমাজ-জীবনে ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে কতটা সততা আছে, কতটা সৌন্দর্য ও সামঞ্জস্য আছে, তা নির্ণয় করবে সমাজে মানসিক সুস্থতা অসুস্থতার মাপকাঠি। এদিক থেকে সমাজ-বিবর্তন, সামাজিক-নিয়মশৃঙ্খলার গতি-প্রকৃতি সামাজিক ভারসাম্য কতটা রচনা করে চলেছে, সেটা বিচার করে দেখতে হয়। সমাজ এক জায়গায় থেমে নেই, এর পরিবর্তন হয়ে চলেছে, হচ্ছে প্রতিনিয়ত, এই পরিবর্তন মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে যত সহায়ক হয়, তত সামাজিক ভারসাম্য রক্ষিত হয়। জৈবিক ও সাংস্কৃতিক মৌল চাহিদা পূরণে সমাজ যত অসমর্থ হয়, সামাজিক সুস্থতা তত বিঘ্নিত হয়, ব্যক্তি-জীবনের ভারসাম্যও নষ্ট হয়। মোটের উপর সমাজ-পরিবেশ যে, ব্যক্তির সুস্থতা অসুস্থতার নির্ণায়ক এটা বহু পরীক্ষায় নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষ করে মানসিক কারণে যে দৈহিক রোগ হয় তাতে সমাজ-পরিবেশের চাপ বিশেষভাবে কাজ করে।

সাইকোসোমাটিক রোগের কারণ নির্ণয়ে সব দিক থেকে বিচার করা হয়েছে। সামাজিক-পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে অন্য সব সম্ভাব্য কারণ-গুলিও বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে। জৈবিক উত্তরাধিকার ও তজ্জনিত কোন খুঁত যদি থেকে যায়, তবে সেটা শারীরক্রিয়ায় কোন বিকৃতি নিয়ে আসতে পারে। কারও কারও মতে, এই বিকৃতি বা অসঙ্গতি সাইকোসোমাটিক রোগের জন্য পূর্বেই জমি তৈরি করে রাখতে পারে। এই

বিকৃতি বা অসঙ্গতিই যে সাইকোসোমাটিক রোগের একমাত্র কারণ তা নয়, এই অবস্থার সঙ্গে সামাজিক চাপ, পারিবারিক চাপ যোগ দিলে তবেই এ রোগের সংলক্ষণগুলি প্রকাশ পায়।

গ্রেগরী ও রোসেন দেখেছেন যে, আন্ত্রিকক্ষত রোগীদের নিকট-আত্মীয়দের মধ্যেও আন্ত্রিক রোগের প্রকোপ বেশি। নিকট-আত্মীয়দের মধ্যে অন্তবিধ শারীরক্রিয়ার বিকৃতিও পরিলক্ষিত হয়, যেমন—হাঁপানী, মাইগ্রেইন, থাইরোয়েড্ গ্রন্থির অতি-ক্রিয়া প্রভৃতি। এ থেকে অনেকে অনুমান করেন যে, সাইকোসোমাটিক রোগে বংশগতির একটা ভূমিকা আছে।

ডাইট্রি ও জনসন্ দেখেছেন, যেসব ব্যক্তিদের মধ্যে A, B বা AB গ্রুপের রক্ত রয়েছে তাদের থেকে যাদের মধ্যে 'O' শাখার রক্ত রয়েছে তাদের মধ্যে আন্ত্রিকক্ষত বা পেপ্টিক বা ডিউডি-নাল আলসার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি কাজ করে। এই সমীক্ষার ফল থেকে অনেকে মনে করেন, ব্যক্তি জন্মগতসূত্রে সাইকোসোমাটিক রোগে আক্রান্ত হওয়ার জন্য শারীরিক দিক থেকে তৈরি থাকে, পরিবেশের চাপে এদের রোগাক্রান্তির সম্ভাবনা শতগুণে বেড়ে যায়। কিন্তু জন্ম-সূত্রে খানিকটা ভঙ্গুর এইসব ব্যক্তিরা যদি অপেক্ষাকৃত অনুকূল সমাজ-পরিবেশে লালিত ও অভ্যস্ত হয়, তাহলে এদের সাইকোসোমাটিক রোগ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে প্রশমিত হয়। ডাইবেটিস, মাত্রাধিক রক্তচাপ, হৃদ্‌রোগ প্রভৃতির ক্ষেত্রে জন্ম-সূত্রের ভূমিকা কোন কোন ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়।

সাইকোসোমাটিক রোগের জন্য আবেগজনিত কারণগুলি বেশি করে কাজ করে। আবেগের সঙ্গে শারীরক্রিয়ার পরিবর্তনের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। রাগ, ভয়, দুঃখ এমনিতর আবেগের সময় যেমন আমাদের সকলের মধ্যেই শারীরিক পরিবর্তন হয়, যেমন হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়, রক্ত-সঞ্চালন দ্রুততর হয়, অনেক সময় মুখ শুকিয়ে আসে, শরীর ঘামতে থাকে, ঠিক তেমনি দৈনন্দিন-জীবনে কোন অস্থিরতা, অত্যধিক ভয়, দুশ্চিন্তা বা চাপা রাগ থাকলেও শারীরক্রিয়ায়, বিশেষ করে স্বয়ংনিয়ন্ত্রিত স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতার পরিবর্তনের জন্য শারীরক্রিয়ার বিভিন্ন দিকে পরিবর্তন আনে। স্বয়ংনিয়ন্ত্রিত স্নায়ুতন্ত্র (Autonomic Nervous System), মধ্যবর্তী ও প্রধান স্নায়ুতন্ত্র (Central Nervous System) এবং নালীবিহীন গ্রন্থির পরিপূরক ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তার ভারসাম্য রক্ষা করে চলে। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের দুটি অংশ আছে, Sympathetic ও Parasympathetic—এই দুটির কাজ যদিও আপাতদৃষ্টিতে বিপরীতমুখী, তবু সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় এরা একটি লক্ষ্য সামনে রেখে একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। মস্তিষ্কে আবেগ নিয়ন্ত্রণের বিন্দুটি হাই-পোথ্যালামাসে অবস্থিত, আবার এই হাই-পোথ্যালামাসই স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে। ফলে আবেগের পরিবর্তন ও উত্থানপতনের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ডের ভারসাম্যেরও হেরফের হয়। হাই-পোথ্যালামাসই Sympathetic ও Parasympathetic Nervous System-এর ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে। সাইকোসোমাটিক রোগে আবেগের চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা হাই-পোথ্যালামাসের কার্যাবলীর ভারসাম্য নষ্ট করে এবং পরিণামে Sympathetic ও Parasympathetic Nervous System-এর কার্যাবলীর ভারসাম্যও নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে পরিপাক-যন্ত্র, রক্তচলাচল, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ায় নানা-রকমের গণ্ডগোল দেখা দেয়। তাছাড়া যেহেতু

Autonomic Nervous System-এর সঙ্গে Endocrene glandsগুলির কাজের যোগাযোগ আছে, বস্তুত A. N. System, Endocrene glands-এর কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেইহেতু আবেগের অস্থিরতা Adrenal গ্রন্থিকে উদ্দীপ্ত করে। রক্তে Adrenalin নিঃসৃত হয় ও সেটা সমস্ত রক্তে পরিক্রমা করে। এইভাবে Adrenal গ্রন্থির কাজ মাত্রাধিক তীক্ষ্ণ ও উচ্চকিত হয়ে উঠে। এইভাবে দেখা যাবে, আবেগ-জীবনের অস্থিরতা কীভাবে শারীরিক ভারসাম্য নষ্ট করে ও কালক্রমে শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে আসে। সাইকোসোমাটিক রোগে যারাই ভুগছে, বুঝতে হবে তাদের আবেগ-জীবনে অস্থিরতা রয়েছে, প্রক্ষোভঘটিত কোন সমস্যায় তারা ভুগছে।

এখানেই প্রশ্ন সমাজসংস্কৃতির রূপ প্রকৃতি কেমন হবে। মানুষের দেহ-মনের সহনশীলতার একটা সীমা আছে। দেহ-মনের যথাযথ প্রকৃতির সঙ্গে যদি সমাজ-জীবন সামঞ্জস্যকারী না হয়, তাহলে মনের উপর যে চাপ পড়ে, আবেগ-জীবনে যে অস্থিরতা আনে, তা মানুষকে শারীরিক দিক থেকেও অসুস্থ করে ফেলতে পারে।

এছাড়া জৈবিক ও স্বয়ংনিয়ন্ত্রিত স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া-কল্পের ধারায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে জন্ম-সূত্রেই পার্থক্য থাকে। মনোবিজ্ঞানী উলফ্ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে জৈবিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার পার্থক্যকে 'Pulse reactor', 'Stomach reactor', 'Nose reactor'—এইভাবে অভিহিত করেছেন, অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির শারীরিক ও জৈবিক কোন অংশের কার্যকারিতায় জন্মগত-ভাবে কিছু দুর্বলতা থাকে এবং মানসিক চাপ বা আবেগ-জীবনের অস্থিরতা শরীরের সেই দুর্বল অংশকেই আক্রমণ করে।

ব্যক্তিত্বের গঠনের উপরও সাইকোসোমাটিক রোগাক্রান্তির সম্ভাবনা কিছুটা নির্ভর করে। কে কতটা মানসিক চাপ সহ্য করতে পারবে সেটা তার ব্যক্তিত্বের গঠনের দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। মানসিক ও সামাজিক চাপ বা বাইরের উত্তেজনামূলক পরিবেশ সকলে সমানভাবে সহ্য করতে পারে না। এই সহন-শীলতার হেরফের ব্যক্তিত্বের গঠনের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। কেউ এই উত্তেজনা ও চাপে ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে—কেউ বা সেটা মুখে বা নানাপ্রকার আচরণের মধ্য দিয়ে বাইরে প্রকাশ করে, আবার কেউবা তা চেপে রাখে ও অবদমিত করে। এই অবদমিত আবেগ-শক্তি তার স্বয়ংনিয়ন্ত্রিত স্নায়ুতন্ত্রের কাজ ও নালীবিহীন গ্রন্থিগুলির কাজকে প্রভাবিত করে। এর ফলে হয় পরিপাক যন্ত্রের, নয় হৃদ্‌যন্ত্রের, নয় শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়াপ্রক্রিয়ায় নানাপ্রকারের জটিল-তার সৃষ্টি করে, ব্যক্তিকে অসুস্থ করে ফেলে।

এটা পরীক্ষিত সত্য যে, যাদের মধ্যে পেপ্‌টিক বা ডিউডিনাল আলসার দেখা যায়, তারা প্রায়ই উদ্বায়ুরোগে ভুগছে, তারা প্রায়ই দুশ্চিন্তাজর্জর হয়ে থাকে, অল্পেতেই এরা রেগে যায়। এদের ব্যক্তিত্বের গড়নটাই এইরকমের। হেমিলটন্ দেখেছেন, বহু এ্যাজ্‌মা রোগীদের মধ্যেই একটা প্যারানয়েড্ লক্ষণ থাকে। ভ্রান্ত বিশ্বাসের শিকার হয়ে থাকেন এরা। এদের মধ্যে চাপা ক্রোধ ও আত্মহননের ইচ্ছাও প্রকটভাবে দেখা যায়। রিস্ দেখিয়েছেন যে, সাইকোসোমাটিক রোগীদের অধিকাংশই আবেগে অস্থির, দুশ্চিন্তা-পরায়ণ, ও আত্মবিশ্বাসহীন। কোলাইটিস রোগে যারা ভোগে তারা ব্যক্তিত্বের দিক থেকে অত্যন্ত অনমনীয় ও অবসেসিভ্ থাকে—এদের মধ্যে সব-সময় একটা পরনির্ভরতার ভাবও প্রকটভাবে দেখা যায়। গ্রিনফিল্ড ও স্টার্নবেক্ দেখেছেন, ডিউডিনাল আলসারে ভুগছে এমন রোগীদের মধ্যে সবসময় এমন একটা মানসিকতা কাজ করে

যে, এদের যা প্রাপ্য তা থেকে এরা বঞ্চিত হয়েছে। এই বঞ্চনাবোধ এদের মজ্জায় মজ্জায় কাজ করতে থাকে।

সাম্প্রতিককালে রাহ্‌নসন্‌, সালোমন ও রাহা প্রমুখ মনোবিজ্ঞানী দেখিয়েছেন, সাইকো-সোমাটিক রোগের সঙ্গে পরিবেশের চাপ ও প্রতিনিয়ত পরিবেশের মধ্যে যে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা আছে তার কিরকম যোগ আছে।

সমাজ-জীবনে তথা আবেগ-জীবনে যে অস্থিরতা, সেটা আর্থিক অনটন থেকেই হোক্‌, কারও সৃজনশীলতাকে রুদ্ধ করে দিয়েই হোক্‌, মানুষের হৃদয়হীন আচরণের জন্যই হোক্‌ বা যুদ্ধ, দাঙ্গা প্রভৃতি সামাজিক অস্থিরতার জন্যই হোক্‌, তা ব্যক্তি-জীবনের উপর অস্বাভাবিক চাপের সৃষ্টি করে—এই চাপ ধীরে ধীরে জৈবিক ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। অনিদ্রা, অক্ষুধা দেখা দেয়। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের হেরফেরের মধ্য দিয়ে কখন পরিপাকযন্ত্র, কখন শ্বাসযন্ত্র, কখন হৃদ্‌যন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়াকাণ্ডকে আক্রমণ করে।

কোন ব্যক্তি যখন তার শারীরিক ও মানসিক অস্তিত্ব ও স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে ভীতি বোধ করে, তখন প্রত্যক্ষভাবে তার প্রতিফলন দেখা দেয় স্বাভাবিক থেকে হৃৎস্পন্দনের মাত্রাবৃদ্ধি বা হ্রাসের মধ্যে, মনঃসংযোগের অভাব ও ব্যক্তি-সম্পর্কের পরিবর্তনের মধ্যে। পরিবারের অশান্তি, কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক সঙ্কট, অত্যধিক পরিশ্রম ও দায়িত্ব—এইসব অবস্থার সঙ্গে হৃদ্‌রোগে আক্রান্তির যথেষ্ট সম্পর্ক আছে। জেন্‌কিন্‌স ও হাউস্‌ সম্প্রতি এ-নিয়ে অনেক সমীক্ষা করেছেন। তাছাড়া যেসব ব্যক্তিদের কাজের মধ্যে বেশি পরিমাণে অনি-শ্চয়তা ও উদ্বেগ থাকে, যাদের কাজের পরিণামে প্রত্যক্ষভাবে অনেকের ভালমন্দ নির্ভর করে তারা এবং যাদের কর্মক্ষেত্রে নিজেদের ভূমিকার সঙ্গে তাদের আদর্শগত ভূমিকা বা তাদের সৃজন-শীল ভূমিকার সঙ্গে বিরোধ দ্বন্দ্ব রয়েছে, তারাও মানসিক চাপে ভুগতে থাকে এবং কালক্রমে সাইকোসোমাটিক রোগের শিকার হয়। এছাড়া দাম্পত্য-জীবনের অশান্তি ও অস্থিরতাও মাত্রাধিক মানসিক চাপের সৃষ্টি করতে পারে, এ-থেকেও সাইকোসোমাটিক রোগ হতে পারে। অধুনা গবেষণা করে দেখা গেছে, এইসব মানসিক চাপ ও আঘাত কীভাবে শরীরে জৈব-রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়। এইসব মানসিক চাপে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়, সিরাম কোলেশটেরল বৃদ্ধি পায়, করোনারি আর্টারীর ভিতরের পর্দার ক্ষয় ত্বরান্বিত হতে থাকে, ব্লাড্‌ প্লেট্‌লেট্‌স রক্তে দ্রুত জমা হতে থাকে (ব্লাড্‌ প্লেট্‌লেট্‌স রক্তের জমাটবাঁধা ত্বরান্বিত করে।) এবং এইগুলি জমতে জমতে করোনারি ভেসল্‌স্‌-এর মুখ সঙ্কুচিত করে দেয়।

এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা এটাই প্রমাণ করে যে, মানুষের জীবনধারা দেহ-মনের উপর কী-ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের চারিপাশ, তার পরিবার, সমাজ, বহিঃপ্রকৃতি সবকিছুই তার অস্তিত্বকে প্রভাবিত করছে—অস্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। কাজেই পরিবেশ থেকে যতটা সম্ভব কৃত্রিম চাপের উপশম ঘটানো যায় ততই মঙ্গল। মানুষের সহনশীলতাকে বুঝে, মানুষের দেহ-মনের গড়নকে বুঝে প্রকৃতি ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বহিঃপ্রকৃতির দূষণ রোধের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-প্রকৃতি, কর্মের প্রকৃতি, মানুষে মানুষে সম্পর্কের প্রকৃতির মধ্যে যে দূষণ ঘটেছে তার প্রতিরোধ ও প্রতিকারের দিকেও মনোযোগ দিতে হবে। মানসিক রোগ, বিশেষ করে, মানসিক কারণে দৈহিক রোগের প্রকোপ এখন ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশের আকাশ ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। 'কলঘরে চিলের কান্নার মতো', আমাদের জীবন-যন্ত্রণা।

শিবমহিম্নঃ

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য

[ভাদ্র, ১৩৯২ সংখ্যার পর]

২৩। স্বলাবণ্যাশংসা-ধৃত-ধনুষমহ্নায় তৃণবৎ
পুরঃ প্লুষ্টং দৃষ্ট্বা পুরমথন পুষ্পায়ুধমপি।
যদি স্ত্রৈণং দেবী যমনিরত দেহার্ধঘটনা-
দবৈতি ত্বামদ্ধা বত বরদ মুগ্ধা যুবতয়ঃ॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা: হে পুরমথন! হে যমনিরত! (হে অষ্টাঙ্গ যোগপরায়ণ!) (এতেন জিতেন্দ্রিয়ত্বমুক্তম্) ধৃতধনুষং পুষ্পায়ুধম্ তৃণবৎ অহ্নায় (শীঘ্রমেব) পুরঃ (সাক্ষাদেব) প্লুষ্টং (দগ্ধং) দৃষ্ট্বা স্বলাবণ্যাশংসা (নিজসৌন্দর্যবিষয়াশংসা) দেবী যদি দেহার্ধঘটনাৎ (তপস্যাফলস্বরূপ—দেহার্ধদানঘটনাৎ) ত্বাং স্ত্রৈণং অবৈতি (কল্পয়তি) তর্হি অদ্ধা বত যুবতয়ঃ মুগ্ধাঃ (অতত্ত্বজ্ঞাঃ)।

ভাবানুবাদ: হে ত্রিপুরমথন! স্বীয় লাবণ্যাপহরণ আশঙ্কা করিয়া পুষ্পধনু মদন তোমাকে আক্রমণ করিতে সমুদ্যত হইলে তুমি তাহাকে করিয়াছিলে। তোমার অর্ধাঙ্গিনী গৌরী, এই অর্ধদৈহিক ঘটনা বিজড়িত দেখিয়া যদি তোমাকে স্ত্রৈণ মনে করেন তবে তিনি ভুল করিবেন; কারণ যুবতীগণ অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

২৪। শ্মশানেষ্বাক্রীড়া স্মরহর পিশাচাঃ সহচরা-
শ্চিতাভস্মালেপঃ স্রগপি নৃকরোটীপরিকরঃ।
অমঙ্গল্যং শীলং তব ভবতু নামৈবমখিলং
তথাপি স্মর্তৄণাং বরদ পরমং মঙ্গলমসি॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা: হে স্মরহর! হে বরদ! শ্মশানেষু তে আক্রীড়া (আ সমন্তাৎ কেলিঃ), পিশাচাঃ সহচরাঃ (পিশিতাশনাঃ ভূতাঃ প্রেতাশ্চ তে অনুচরাঃ), চিতাভস্মালেপঃ (চিতাশবদাহস্থং ভস্ম তে অঙ্গরাগসাধনম্), স্রগপি নৃকরোটীপরিকরঃ (মনুষ্যশিরোঽস্থিসমূহঃ তে মালা, অপি শব্দাৎ অন্যদপি আব্রচর্মাদি), তব অখিলমপি শীলং (সর্বমপিচরিতম্) অমঙ্গল্যম্ ভবতু (মঙ্গল্যবিপরীতং ভবতু) নাম (কিং নস্তেন নিরূপিতেনেত্যর্থঃ), তথাপি স্মর্তৄণাং পরমং মঙ্গলমসি (স্মরণকর্তৄণাং ত্বং পরমং মঙ্গলমেবাসি নিরতিশয়ং কল্যাণমেব ভবসি)।

ভাবানুবাদ: হে মদনভস্মকারিন্! তুমি শ্মশানে ক্রীড়াপরায়ণ, পিশাচসকল তোমার সহচর, চিতাভস্ম তোমার বিভূতিপ্রলেপ, তোমার গলদেশে শোভা পাইতেছে নরমুণ্ডমালা। দেখিলে মনে হয়, তুমি অমঙ্গলকারক কিন্তু তোমাকে স্মরণ করিলে, হে বরদ! তুমি সকলের মঙ্গল দানে তৎপর হইয়া থাক।

২৫। মনঃ প্রত্যক্চিত্তে সবিধমবধায়াত্তমরুতঃ
প্রহৃষ্যদ্রোমাণঃ প্রমদসলিলোৎসঙ্গিতদৃশঃ।
যদালোক্যাহ্লাদং হ্রদ ইব নিমজ্যামৃতময়ে
দধত্যন্তস্তত্ত্বং কিমপি যমিনস্তৎ কিল ভবান্॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা: অমৃতময়হ্রদে নিমজ্য ইব (নিমজ্যমানস্য ভক্তস্য) আহ্লাদমালোক্য প্রহৃষ্যদ্রোমাণঃ (আনন্দেন ভাসমানঃ) ভবান্। (ভক্তস্য মনঃ) প্রত্যক্চিত্তে (অন্তর্মুখাবস্থায়ামবস্থিতে চিত্তে) অবধায়াত্তমরুতঃ (কুম্ভকপ্রাণায়ামেণ বায়ুনিরোধং কুর্বতঃ) প্রমদসলিলোৎসঙ্গিতদৃশঃ (আনন্দসলিলমগ্নস্য) যমিনঃ (জিতেন্দ্রিয়স্য শিবভক্তস্য) তৎ কিল কিমপি (অতিশয়-আনন্দদায়কঃ ভবান্)।

ভাবানুবাদ: সংযমিগণ পরমানন্দ অমৃতময় হ্রদে নিমজ্জমান ভক্তের আহ্লাদ অবলোকন করিয়া আপনি আনন্দে ভাসমান। আনন্দহ্রদে নিমজ্জিতাবস্থায় ধ্যানানন্দ সলিলে ভাসিতে ভাসিতে চিত্তমধ্যে প্রাণবায়ুকে বিধি অনুযায়ী সংযত করিয়া যে তত্ত্ব অনুভব করিয়া থাকেন

তাহা আপনিই। হে শিব! এইভাবে আপনি সংযমিগণের নিকট এক অপূর্বতত্ত্ব প্রকাশিত করিয়া থাকেন।

২৬। ত্বমর্কস্ত্বং সোমস্ত্বমসি পবনস্ত্বং হুতবহ-
ত্বমাপস্ত্বং ব্যোম ত্বমু ধরণিরাত্মা ত্বমিতি চ।
পরিচ্ছিন্নামেবং ত্বয়ি পরিণতা বিভ্রতু গিরং
ন বিদ্মস্তত্তত্ত্বং বয়মিহ তু যৎ ত্বং ন ভবসি॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা: ত্বম্ অর্কঃ (সূর্যঃ), ত্বং সোমঃ (চন্দ্রঃ), ত্বং পবনঃ অসি, ত্বং হুতবহঃ (অগ্নিঃ), ত্বম্ আপঃ (জলময়মূর্তিযুক্তঃ), ত্বং ব্যোম (আকাশমূর্তিস্বরূপেণ অবস্থিতঃ), ত্বমু ধরণিঃ (পৃথিবীসদৃশবহুগুণযুক্তঃ), ত্বম্ আত্মা ইতি চ (ত্বং সর্বেষাং হৃদয়ে পরাত্মস্বরূপেণ তিষ্ঠসি ইতি)। ত্বয়ি পরিণতাঃ (পরিপক্কবুদ্ধিসম্পন্নাঃ জনাঃ) এবং পরিচ্ছিন্নাং গিরং (বিভিন্নভাবেন ত্বাং প্রতিপাদয়ন্তীং বাচম্) বিভ্রতু (ধারয়ন্তু)। বয়ম্ ইহ তৎ তত্ত্বং ন বিদ্মঃ যৎ ত্বং ন ভবসি।

ভাবানুবাদ: হে শিব! তুমি সূর্য, তুমিই চন্দ্র, তুমিই পবন, তুমিই অগ্নি, তুমিই জল, তুমিই আকাশ, তুমিই পৃথিবী, তুমিই পরমাত্মস্বরূপ। সাধকের বাক্যসমূহ ইয়ত্তারূপে পরিণত হইয়া তোমাতেই বিভিন্নভাবে নির্ণীত অর্থাৎ পরিপক্ক-বুদ্ধিসম্পন্ন শিবভক্তগণ এইভাবে নানাপ্রকারে তোমাকে উপাসনা করেন, কিন্তু আমি এমন কোন তত্ত্বের বিষয় অবগত নহি যাহার মধ্যে তুমি সম্পৃক্ত নহ অর্থাৎ তুমি সর্বজ্ঞ, সর্বত্র বিচরণশীল ও সর্বান্তর্যামী।

২৭। ত্রয়ীং তিস্রো বৃত্তীস্ত্রিভুবনমথো ত্রীনপি সুরা-
নকারাদ্যৈর্বর্ণৈস্ত্রিভিরভিদধত্তীর্ণ বিকৃতি।
তুরীয়ন্তে ধাম ধ্বনিভিরবরুন্ধানমণুভিঃ
সমস্তং ব্যস্তং ত্বাং শরণদ গৃণাত্যোমিতি পদম্॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা: ওম্ ইতি পদং সমস্তং ব্যস্তং বা হে শরণদ! ত্বাং গৃণাতি (প্রকটয়তি) (সমস্তং সর্বাত্মকভাবেন) (ব্যস্তম্— [আধ্যাত্মি]কদৈবাদি ভেদেন ভিন্নতয়া)। অণুভিঃ ধ্বনিভিঃ অবরুন্ধানং (স্বতঃ উচ্চারয়িতুম্ অশক্যৈঃ সূক্ষ্মশব্দৈঃ অবরোধং কুর্বৎ) তে তীর্ণবিকৃতি (সর্ববিকারাতীতং) তুরীয়ং ধাম (অখণ্ডচৈতন্যাত্মকং ধাম) (কর্তা) ত্রয়ীং (বেদত্রয়ম্), তিস্রোবৃত্তীঃ (জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাখ্যা অন্তঃকরণস্যাবস্থাঃ), অথো ত্রিভুবনম্ (ভূর্ভুবঃ স্বঃ সমন্বিতং) ত্রীনপি সুরান্ (ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরান্) অকারাদ্যৈঃ ত্রিভিঃ বর্ণৈঃ অভিদধৎ (সমস্তং ত্বাং গৃণাতি ইতি)।

ভাবানুবাদ: বেদ তিন প্রকার; সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ভেদে মানবের বৃত্তি তিন প্রকার, ভুবন তিনটি, অকারাদি তিন বর্ণের মধ্যে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর) দেবতাত্রয় তিন অবস্থায় পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতি ক্ষুদ্র ধ্বনিও যেখানে স্বীয় অবস্থা প্রকাশনে অসমর্থ সেই তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত ধামে তোমার অবস্থিতি। সংযুক্ত বা বিযুক্তভাবে সেই স্থানে ওম্ এই শব্দ উচ্চারিত হয়।

২৮। ভবঃ শর্বো রুদ্রঃ পশুপতিরথোগ্রঃ সহমহাং-
স্তথা ভীমেশানাবিতি যদভিধানাষ্টকমিদম্।
অমুষ্মিন্ প্রত্যেকং প্রবিচরতি দেব শ্রুতিরপি
প্রিয়ায়াস্মৈ ধাম্নে প্রণিহিত নমস্যোঽস্মি ভবতে॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা: ভবঃ শর্বঃ রুদ্রঃ পশুপতিঃ অথ উগ্রঃ সহ মহান্ (মহাদেবঃ) ভীমঃ ঈশানঃ তথা ইতি (আগম প্রসিদ্ধঃ ইতি শব্দঃ সমাপ্ত্যর্থঃ)। হে দেব! যৎ অভিধানাষ্টকম্, ইদম্ অমুষ্মিন্ প্রত্যেকং শ্রুতিঃ অপি প্রবিচরতি (উল্লিখতি)। অতঃ অস্মৈ প্রিয়ায় (প্রিয় স্বরূপায়) ভবতে ধাম্নে (সর্বেষাং শরণভূতায়) প্রণিহিত নমস্যঃ (প্রকর্ষেণ বাঙ্মনঃ কায়ব্যাপারাতিশয়েন) নিহিতা নমস্যা (নমস্ক্রিয়া যেন সঃ) অস্মি। (কেবলং তুভ্যং কৃত নমস্কারে ভবামি ইত্যর্থঃ)।

ভাবানুবাদ: ভব, শর্ব, রুদ্র, পশুপতি, উগ্র, মহান্ (মহাদেব), ভীম, ঈশান তোমার এই অষ্টবিধ নামের প্রত্যেকটিই শ্রুতিতে বিদ্যমান।

হে শিব! তোমার সকলের শরণভূত এই প্রিয় অবস্থানকে আমি প্রণতি জানাই।

২৯। নমো নেদিষ্ঠায় প্রিয়দব দবিষ্ঠায় চ নমো
নমঃ ক্ষোদিষ্ঠায় স্মরহর মহিষ্ঠায় চ নমঃ।
নমো বর্ষিষ্ঠায় ত্রিনয়ন যবিষ্ঠায় চ নমো
নমঃ সর্বস্মৈ তে তদিদমিতি সর্বায় চ নমঃ॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : হে প্রিয়দব! (অভীষ্ট নির্জন বন বিহার!) নমো নেদিষ্ঠায় (অতীব নিকটবর্তিনে), দবিষ্ঠায় (অত্যন্ত দূরবর্তিনে) চ নমঃ, হে স্মরহর! (কামান্তক!) ক্ষোদিষ্ঠায় (ক্ষুদ্রতমায়) নমঃ, মহিষ্ঠায় (মহত্তমায়) চ নমঃ। নমো বর্ষিষ্ঠায় (অতিবৃদ্ধায়) হে ত্রিনয়ন! যবিষ্ঠায় (যুবতমায়) চ নমঃ। তদিদমিতি (তৎ পরোক্ষমিদমপরোক্ষমিত্যনেন প্রকারেণ অনির্বাচ্যং সর্বং যত্র সঃ তদিদমিতি সর্বঃ তস্মৈ বহুব্রীহৌ অন্যপদার্থপ্রধানাত্বাৎ ন সর্বনামতা তেন সর্বাধিষ্ঠানভূতায় তুভ্যং নমঃ ইত্যর্থঃ), সর্বায় (শিবায়) চ নমঃ।

ভাবানুবাদ : হে প্রিয়দব! তুমি ভক্ত সমীপে সাধনার স্তর ভেদে অতীব সমীপে এবং দূরে উভয় অবস্থাতেই বিদ্যমান, তোমাকে প্রণাম জানাই। হে মদনদর্পহারিন্! তুমি অতীব ক্ষুদ্র আবার বিশাল হইতেও বিশালতম, তোমাকে প্রণাম জানাই। হে ত্রিনয়ন! তুমি চিরবৃদ্ধ হইতেও প্রাচীনতম অর্থাৎ প্রাচীনতম হইতেও প্রাচীনতম, তুমি চির নবীন, চির যুবা, তোমাকে প্রণাম জানাই। তুমি সর্বরূপে সমস্তদ্রব্যের মধ্যে বিদ্যমান, তোমাকে প্রণাম জানাই। পরোক্ষ ও অপরোক্ষ সকলের অতীত যে তুমি, তোমাকে প্রণাম জানাই। [ক্রমশঃ]

মা-দুর্গার শ্রীচরণে

শেখ সদরউদ্দীন
প্রধান শিক্ষক, পানিহাটি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যাপীঠ,—সুপরিচিত কবি ও গীতিকার।

দুর্গা দেবী এলেন আবার, দিকে দিকে বাজনা বাজে—
জগন্মাতা দেখা দিলেন সবার ঘরে কন্যাসাজে।
অসুরকে নাশ করতে যিনি দশভুজা গেলেন ধেয়ে—
চণ্ডী-মাতা সেই শিবানী, উমা এলেন ঘরের মেয়ে।

সেই ভবানী মাকে ডাকি, অন্নপূর্ণা—অন্নদে!
ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদছে মানুষ, অন্নদাত্রী অন্ন দে!
সর্বহারা মানুষগুলো আবার বেঁচে উঠুক মাগো—
শুভঙ্করী মা-শঙ্করী, কৃপাময়ী তুমি জাগো!

তোমার প্রাণের সুবাস নিয়ে ফুট্‌ছে হাজার ফুলের রাশি,
তোমার আশিস্-করুণাতে সবার মুখে ফুটুক হাসি।
তোমার অসীম মহিমারই গায়রে এ মন-বিহগায়—
আমার হৃদয়-কুসুম ঝ'রে ওই পদে ঠাঁই পেতে চায়!

প্যারিস পেরিয়ে

ডক্টর অমিয়কুমার হাটি

[ভাদ্র, ১৩৯২ সংখ্যার পর]

কাজেই সবিনয়ে বললাম, "মহারাজ, আমি বরং আগামীকাল সকালে আপনার সঙ্গে দেখা করব, এখন এখান থেকে যেমন করে পারি, আমি ওয়াই এম. সি. এ. খুঁজে নিচ্ছি।"

মহারাজও অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। আরেকটা ঠিকানায়, স্ট্যাটেন আইল্যাণ্ডে ফোন করার ঝুঁকিটা আর নিলাম না। ওয়াই. এম. সি. এ.-তেই যেতে হবে। কোথায়, ঠিক জানি না, যদিও ঠিকানাটা মহারাজ দয়া করে দিয়েছেন। বলে দিলেন, সেখানে ফোন করে জানিয়ে রাখছেন।

বিমানবন্দরের বাইরে বেরুলাম। বাস আছে। শহরে নিয়ে যায়। কয়েক ডলার লাগে। এদিক-ওদিক ঘুরলাম। কয়েকজনকে শুধালাম। আলাপ হল এক জার্মান তরুণের সঙ্গে। সঙ্গে তার মা। যোগাযোগটা কেমন অদ্ভুত! নিউইয়র্ক ওঁদের চেনা—বেশ কয়েকবার এসেছেন। জার্মান তরুণটি ইংরেজী জানেন। কিন্তু ওঁর মা ইংরেজী বলতে পারেন না। —"যাবেন কোথায়? কোথায় উঠবেন?" শুধাই তরুণটিকে।—"ওয়াই. এম. সি. এ।" লাফিয়ে উঠি। আরে, আমিও তো সেখানে যেতে চাই।—"চলুন তাহলে চার নম্বর বাস যেখানে দাঁড়ায়, সেখানে। বাস নিউইয়র্ক শহরের ঠিক মাঝখানে নামিয়ে দেবে, ৩৯ বা ৩৮ নং সড়কে, সেখান থেকে ৪৭ নম্বর সড়ক, বেশি দূর নয়। হেঁটেই যাওয়া যাবে ওয়াই. এম. সি. এ.।"

ধড়ে প্রাণ পাই নতুন করে। বাসে উঠি। জিনিসপত্র সব বোঝাই করে দিতে হয় বাসের পেটে, বাইরে থেকে খোলা যায় ঢাকনা। কণ্ডাক্টর, ড্রাইভার বেশির ভাগই নিগ্রো, অনেকেই আবার মহিলা।

বাস ছুটে চলেছে। সময় অনেকটা পেরিয়ে গেছে। বিকাল বিদায় নিয়েছে। জলে উঠেছে আলো। সন্ধ্যায় সুবিশাল নিউইয়র্ক জেগে উঠেছে যেন নতুন করে। বাস ঢুকল শহরে। উৎসুক চোখে বাইরে চেয়ে দেখছি, ঘরবাড়ি, পথঘাট—সবই নতুন, অন্যরকম লাগছে। এ তো আর-একটা মহাদেশ। বাস নির্দিষ্ট স্টপে থামছে। লোকজন নামছে। জার্মান তরুণটিও সঙ্গে সঙ্গে নামছে। প্রথম প্রথম বুঝতে পারিনি। তারপর দেখলাম, প্রতিটি স্টপে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে, মালপত্র কী নামছে, না নামছে তার উপর। বলল আমাকেও, নিজের জিনিসের উপর নজর রাখতে, নাহলে কখন কে কোথায় নামিয়ে নেবে। সাহেবদের দেশ—এটি ভাবতেই পারিনি—যদিও নিউইয়র্কের অনেক কাহিনী শোনা ছিল। কমাতে হল নিউইয়র্ক নগরীর সান্ধ্য শোভা দেখার স্বাভাবিক আগ্রহটা। যদিও লেখা নেই এখানকার বাসে "মালের দায়িত্ব আরোহীর" তাহলেও দায়িত্ব এড়ানোর অপচেষ্টা আর করলাম না, বাস থামলেই বাসের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নজর রাখতে লাগলাম।

মিনিট ৪৫ পর শহরের পূর্বদিকের শেষ গন্তব্যস্থান ৩৯ নং সড়কে এসে দাঁড়াল বাস। আমরা নেমে পড়লাম। এখান থেকে যেতে হবে আমাদের ৪৭ নং সড়কে। দেখলাম, নিউইয়র্কে রাস্তা চেনাটা খুব সোজা। লম্বালম্বি ভাবে নম্বর দেওয়া রাস্তা, গুলিয়ে যাবার কোন উপায় নেই। মোটঘাট হাতে নিয়ে শুরু করলাম

তিনজনে মিলে হাঁটতে। বিরাট বোঝা জার্মান তরুণটির মায়ের হাতে। আমার একটা হালকা ব্যাগ ওঁর হাতে দিলাম, আর ভারী বোঝাটা আমি নিলাম। মাঝে জার্মান তরুণটি একটি দোকান থেকে এক কৌটো বীয়ার কিনে খেল। হয়তো দম নেওয়ার জন্তেই। মায়ের সামনেই। ভদ্রমহিলাকে কিন্তু খেতে দেখলাম না। আমি কিছু ফলমূল আর খাবার কিনলাম। সব দাম মনে নেই, তবে তিনটে বড় সাইজের সিঙ্গাপুরী কলার দাম নিয়েছিল ১২ টাকার মতো।

ধীরে ধীরে হাঁটছি। ভালই লাগছে। আলোর সাগরে ভাসছে যেন নিউইয়র্ক। মিনিট ২০।৩০-এর ভিতর পৌঁছে গেলাম ৪৭ নং সড়ক, একটুখানি ঢুকে গিয়ে ভ্যাণ্ডারবিল্ট—ওয়াই. এম. সি. এ.।

অনুসন্ধান অফিসে শুধালাম মহারাজ ফোন করেছিলেন কিনা। একজনের পরিচিতি বোধ হয় দরকার হয়। না, কোন ফোন আসেনি।

আবার আদীশ্বরানন্দজীকে ফোন করব কিনা ভাবছিলাম। জার্মান তরুণটি বোধ হয় অবস্থাটা আঁচ করতে পারলেন। তিনিই সুপারিশ করলেন। ধন্তবাদ জানালাম। ঘরও পেয়ে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে, ৭ তলায়, ২২ নম্বর ঘর।

ছোট এক চিলতে ঘর। ৭ ফুট চওড়া। বিছানা আছে। স্নান পায়খানার জায়গা বারোয়ারী, অনেকটা বে-আবরু। সাহেবদের মতো অতটা পরিষ্কার নয়। কেমন একটা ঘিনঘিনে ভাব। তা দিনে সওয়া ছুটো টাকা ভাড়ায় এর থেকে ভাল আর কী পাওয়া যাবে? নিউইয়র্কে এটাই সব থেকে সস্তায় থাকার জায়গা, রাত কাটাবার জায়গা।

কতকগুলো সামান্ত তফাত নজরে পড়ল। আমরা তালা খুলতে তালায় চাবি ঢুকিয়ে ডান দিকে ঘুরাই, এখানে দেখছি, তালা খুলতে গেলে চাবি ঘুরাতে হবে বাঁ দিকে। আলো জ্বালাতে গেলে সুইচটা নিচের দিকে টিপে দিই, ওখানে উল্টো ব্যাপার, উপরের দিকে টিপতে হবে। অর্থাৎ আলো নেভাতে গেলে যেমন আমরা সুইচ টিপি ঐরকম আর কী! আমাদের গাড়ি-ঘোড়া চলে পথের বাঁ দিক দিয়ে, এদের ডান দিক দিয়ে।

রাতে একা নিউইয়র্কের পথে বেরুনো ভয়ানক ভয়ের। তার আপাততঃ কোন দরকারও নেই। যা কিনে এনেছিলাম, তাই খেলাম, বাঁচলও কিছু। গরম জল নিয়ে এলাম কমন বাথরুমের কল থেকে। অতএব কফিও খাওয়া গেল আরাম করে। দারুণ ক্লান্ত আর পরিশ্রান্ত মনে হল তারপর। চোখের পাতায় ঘুম নেমে এল বুঝি কয়েক মিনিটেই। জেগে থাকার বৃথা চেষ্টা করলাম খানিক। আদীশ্বরানন্দজী বলেছিলেন একবার ফোন করবেন, ৮২।৯টায়। হাতঘড়ি দেখিনি, তবে ৯টা তখন বেজেই গেছে। তবু কেমন অপরাধী মনে হচ্ছিল নিজেকে! যদি ফোন করেন উনি! এই সব ভাবতে ভাবতে ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

ভোরে উঠে আগে হাতমুখ ধোওয়া সেরে নিলাম, বারোয়ারী ভিড় শুরু হতে না হতে। তারপর খবর নিলাম অফিসে, গতরাতে মহারাজ ফোন করেছিলেন কিনা! না, কোন ফোন আসেনি।

সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম। ফোনে বলেছিলাম, আজ সকালে আদীশ্বরানন্দজীর সঙ্গে দেখা করব। যেতে হবে ৯৪ নম্বর সড়ক। কতদূরই বা আর হবে! হাতে তো কাজও নেই, সময় আছে অঢেল। হেঁটেই চললাম। শহর দেখা যাবে, চেনা যাবে, জানা যাবে।

সকালটা বড় ভাল। ঝলমলে। পথ বেশির ভাগই পরিষ্কার—যদিও নিউইয়র্কের বেশ কিছু

জায়গায় নোংরা আবর্জনা দেখা যায়। এত সকালে লোকের ভিড়ও বড় একটা নেই। সবে যেন জাগছে নিউইয়র্ক। আকাশ ছোঁয়া বিশাল সব বাড়ি। বাগান। পার্ক। সেণ্ট্রাল পার্কের ধার দিয়ে চলছি। বিরাট পার্ক। দৈর্ঘ্যে আড়াই মাইল তো হবেই। সাত সকালে বেশ কিছু বুড়ো-বুড়ী, যুবক-যুবতী দৌড়ের পোশাক পরে 'জগিং' করছে—ধীরে ধীরে দৌড়চ্ছে পার্কের ধার দিয়ে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে এরা সব সময় সজাগ থাকতে চায়—এটা তার একটা নমুনা।

নিউইয়র্ক। নিউইয়র্ক। আমেরিকার প্রাণ-কেন্দ্র বললেও অত্যুক্তি হয় না। কলকাতা শহর পত্তনের সঙ্গে নিউইয়র্কের কিছু মিল আছে। ইংরেজ বেনিয়াদের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী জব চার্নক ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে এসে নেমে-ছিলেন সুতানুটিতে, তারপর সাবর্ণচৌধুরীদের কাছ থেকে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা কিনে নিয়েছিলেন ১৩০০ টাকায়। ডাচ উপনিবেশবাদীদের এইরকম ছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। এর ডাইরেক্টর জেনারেল পিটার মিনুইট ২৫০ টাকার সমান কাপড় ও কাঁচের টুকিটাকি দিয়ে ম্যানহাটন দ্বীপটা কিনলেন তখনকার আদিবাসী ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে। ওরা নাম রাখল নিউ আমস্টার-ডাম। আদিবাসীরা ছিল আলগনকিন জাতির। কলকাতার মতোই জায়গাটা তখন ছিল জলা জঙ্গল ও বন্যজন্তুতে ভর্তি। স্বার্থের সংঘাত শুরু হল। ইণ্ডিয়ানদের উৎখাত করা হল। ওদের আক্রমণ ঠেকাতে পাচিল তুলতেও হয়েছিল। এল অন্য উপনিবেশকারী ইংরেজ। এদের লড়াই বাঁধল ডাচদের সঙ্গে। জয়ী হল ইংরেজ—১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এল তাদের দখলে, ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের ভাই ডিউক অব ইয়র্কের নাম অনুসারে নিউ আমস্টারডাম নাম বদলে রাখা হল নিউইয়র্ক।

এরপর আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ। প্রাথমিক নেতৃত্ব দিয়েছিল নিউইয়র্ক শহরের "সনস অব লিবার্টি" দল। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জুলাই আমেরিকার বৃটিশ উপনিবেশগুলি পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করল। বাংলার প্রাক্তন গভর্নর লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ভার্জিনিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হলেন, জর্জ ওয়াশিংটনের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। নিউইয়র্কের মুক্তি হল আরও কিছু পরে, শেষ ব্রিটিশ সৈন্য নিউইয়র্ক ছাড়ল ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। জর্জ ওয়াশিংটন শহরে ঢুকলেন, উৎসবের মধ্যে। কলকাতার মতোই নিউইয়র্ক হল সাময়িক রাজধানী। পরে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে রাজধানী উঠে যায় ফিলাডেলফিয়াতে। তাহলেও নিউইয়র্ক গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে। বিস্তারিত এই শহরের লোকসংখ্যা এখন এক কোটি চল্লিশ লক্ষের মতো।

[ক্রমশঃ]

ভ্রমসংশোধন

ভাদ্র (১৩৯২) সংখ্যায় ৪৩১ পৃষ্ঠার প্রথম কলমের সাত লাইনে 'মহারপক্ষসং' স্থলে 'মহারাক্ষসং' পড়িতে হইবে।—সঃ

ঈশ্বরোপাসনা

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

যুগাচার্য স্বামীজীর প্রিয় শিষ্য, বিখ্যাত 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-প্রণেতা। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ অগস্ট রামকৃষ্ণ মিশনের পঞ্চদশ অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধের সংক্ষেপিত রূপ—সভার কার্যবিবরণী থেকে সংগৃহীত।

অন্বয়ী প্রমাণে আত্মজ্ঞান (directly) কদাচ হয়। সাধারণ মানব অনাদি মায়াগ্রস্ত। বেদান্তের মায়া ও সাংখ্যের প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, গুণ-বৈষম্যে সৃষ্টি। অবিদ্যাগ্রস্ত আমাদের পক্ষে যখন সৃষ্টি প্রতিভাত হইতেছে তখন বৈষম্যভাব আমাদের মধ্যেও বর্তমান। তমো আধিক্যে জড়তা, রজো আধিক্যে ক্রিয়মাণতা ও সত্ত্বাধিক্যে প্রকাশমানতা। জগতের আদিমাবস্থা তমোময়। জীবজগতে রজোপ্রাধান্য। পরাতত্ত্ববিৎ জীব সত্ত্বপ্রবণ। মনুষ্যসমাজে কেহ মোহাচ্ছন্ন, কেহ কর্মপরায়ণ, কেহ ধ্যানশীল। জীবগত, সমাজগত ও জাতিগত বিভিন্ন গুণ বিভিন্ন রূপ উচ্চাদর্শের কারণ।

যদি কীটপতঙ্গের উচ্চাদর্শ কল্পিত হইয়া থাকে, তাহা তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির অনুরূপই হইবে। তমসাচ্ছন্ন মানব স্বীয় তমোগুণের সম্প্রসারণতা-রূপ ঈশ্বর নির্দেশ করে। ভূত, প্রেত, অপদেবতা-গণ তাহাদের ঈশ্বরানুভূতির পরিসীমা। রজো-প্রধান মানব কল্পিত ঈশ্বরে বিভিন্ন শক্ত্যাদির আরোপ করিয়া জীবনের আদর্শ করিয়াছে। বেদোক্ত ইন্দ্র, সোম, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ এইরূপ ঈশ্বররূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিলেন। সত্ত্বপ্রবণ মানব তাহার উচ্চাদর্শে প্রেম দয়া প্রভৃতি স্বনিহিত গুণেরই আরোপ করে। প্রত্যেকের ঈশ্বর স্বতন্ত্র। ত্রিগুণোন্মূলিত মানবই নিরপেক্ষ অবস্থানের যোগ্য। ইহাই ভারতীয় দার্শনিকগণের উপপত্তি।

পূর্বজন্মার্জিত সংস্কার ও দেশকালনিমিত্ততা বিভিন্ন গুণপ্রবণের কারণ। বেদ বলেন বিভিন্ন কিছুই নাই। গুণাক্রান্ত মানবের ঈশ্বর সগুণ। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারীই ঈশ্বর। নির্গুণ ব্রহ্ম বাক্যাতীত ও ভাবাতীত। ভারত-বর্ষীয় দার্শনিকগণ (১) নাস্তিক ও (২) আস্তিক। নাস্তিক—চার্বাক ও বৌদ্ধ। ইহাদের দেহাত্মবাদ, দৈহিক পরিণামবাদ, ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ, সর্বাস্তিত্ববাদ, সর্বশূন্যবাদ। ন্যায়দর্শন অনুমেয় প্রমাণে ঈশ্বর প্রমাণ করেন। বৈশেষিক উপাদান ও নিমিত্তকারণ ব্যক্ত করেন। কপিল প্রবৃত্তির পরিণামে পদার্থের উৎপত্তি নির্ণয় করেন ও আত্মাকে না উপাদান, না নিমিত্তকারণ বলেন। পতঞ্জলির ঈশ্বর বেদান্তের নির্গুণ ভাবের সন্নিহিত। বেদান্ত, নিমিত্ত ও উপাদান একই নির্দেশ করেন। গৌতম দ্বৈততত্ত্বের সূত্রপাত করেন। বৈশেষিক তদ্রূপ। সাংখ্য প্রকৃতির পরিণাম হইয়াও প্রকৃতির পরপারগামিনী। পতঞ্জলির ঈশ্বরতত্ত্বে অদ্বৈততত্ত্ব সূচিত। বেদান্তের বিবর্তবাদ অদ্বৈততত্ত্বে অধ্যস্ত হইয়াছে। গৌতমের মতে জীবাত্মাবিষয়ক জ্ঞান মোক্ষদায়ক তত্ত্বজ্ঞান। বৈশেষিক মতে আত্মমনঃসংযোগের ধ্বংসই মুক্তি। কপিলের মোক্ষ (কৈবল্য) বিবেকজ্ঞানে প্রকৃতি পুরুষের স্বরূপ সাক্ষাৎ। ইঁহারা নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করেন না। হরিহরাদি পূর্বকল্পের উপাসনাসিদ্ধ জীব। পাতঞ্জলদর্শন মতে ঈশ্বর একপ্রকার পুরুষ। ব্যাস-শিষ্য জৈমিনি পূর্ব-মীমাংসায় বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠানেই মোক্ষ নির্দেশ করেন। নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যতীত কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। জীবব্রহ্মের

অভেদ উপলব্ধিই নির্বাণ মুক্তি। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মে স্বগতভেদ স্বীকার করিয়া সেব্য-সেবকানুরূপ উপাসনার পক্ষপাতী। শুদ্ধ অদ্বৈতবাদী জীব ও জগৎ উভয়ই ব্রহ্মাতিরিক্ত ও সত্য বলিয়া নির্দেশ করেন।

দার্শনিকগণ কেহই একমত নহেন। সকলের আদর্শ স্বতন্ত্র। দেহাত্মবাদী চার্বাকগণ বলিলেন, দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই। তমঃপ্রধান মানব তাহাই বুঝিল। জড়পরিণামবাদী চৈতন্যকে জড়ের পরিণাম নির্দেশ করিলেন। বিজ্ঞানবাদী শূন্য বা আকাশতত্ত্বের উপর উঠিতে পারিলেন না। প্রত্যক্ষ প্রমাণাবলম্বিগণ অজ্ঞেয়বাদ ও প্রত্যক্ষবিজ্ঞানবাদ প্রচার করিলেন। নৈয়ায়িক ঈশ্বর অনুমান করিলেন। সাংখ্যকার জগৎকে একের পরিণাম বলিলেন। পতঞ্জলি ঈশ্বরকে নির্গুণ ব্রহ্মেরই অনুরূপ করিলেন। বৈদান্তিক জীব ব্রহ্মের অভেদ দর্শন মুক্তির কারণ স্থির করিলেন। বহুত্বই দুঃখের কারণ। একত্বে উপস্থিত হইবার উক্ত মতগুলি এক-একটি আবশ্যকীয় সোপান। যত্ন করিলে বিভিন্ন মতাদি অতিক্রম করিয়া আত্মতত্ত্বে আরোহণ করা যায়। সেই যত্নের নাম উপাসনা।

উপাসনা=কোন অধিষ্ঠানে মনে মনে যথাশাস্ত্র ব্রহ্ম কল্পনা করিয়া তাহাতে চিত্তবৃত্তির বিন্যাস। উপাসনাতে নিষ্ক্রিয় আত্মাতে কর্তাদি কারক ও ক্রিয়াফল আরোপিত হয়, কিন্তু আত্মজ্ঞানে এইরূপ কল্পনার নাশ হয়। উপাসনায় চিত্তশুদ্ধি হয়, সুতরাং আত্মজ্ঞানের এক প্রকৃষ্ট উপায়। বেদে তিনপ্রকার উপাসনার ভেদ: ১। অহংগ্রহ ২। তটস্থ ৩। অঙ্গাশ্রিত। অহংগ্রহ=উপাস্যের সহিত আপনার অভেদ ভাবনা। ব্রহ্ম আবার 'মনোময়', 'প্রাণময়', ইত্যাদি। তটস্থ=প্রতীকোপাসনা=বহিরাবলম্বনে (সূর্যে বায়ুতে নামে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া উপাসনা। ইহা হইতে মূর্তিপূজা প্রবর্তিত হইয়াছে।) অঙ্গাশ্রিত=যজ্ঞাদি ও উদ্গীথ প্রভৃতি অঙ্গে "ইন্দ্রায় স্বাহু" "হোতা ওম্" বলিয়া ইন্দ্র ও ওঙ্কারের ধ্যান করা। ইহাতে কামনানুসারে ফল প্রদত্ত হয়। বহুজন্মার্জিত পুণ্যবলে বামদেবাদির শ্রবণমাত্রেই আত্মজ্ঞান হইয়াছিল। তন্নিম্ন শুদ্ধসত্ত্ব মুমুক্ষু অহংগ্রহের অধিকারী। ইহার নিম্ন যাহারা আপনাতে ধর্মবুদ্ধি উৎপাদনে অসমর্থ, তাহারা কোন প্রতীকাবলম্বন করিবে। সকাম হইয়া কোন বিশেষ ফলপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞাঙ্গ উপাসনা উদাহৃত হইয়াছে।

শ্রুতি অধিকারী ভেদে কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞানকাণ্ডে বিভক্ত। তমঃপ্রধান মানবদিগকে ধারণাশীল করিবার জন্য কর্মাধ্যায়ের অবতারণা। কর্মজনিত ফল শীঘ্র উৎপন্ন হয়। এই জন্য প্রথম ইন্দ্রাদির পূজা। সকাম কর্মপরায়ণ হইলে পর, শ্রুতি বলিলেন, অবহিত হইয়া কর্ম কর, নতুবা দুঃখ পাইবে এবং যাগাদির দ্বারা স্বর্গাদি লাভ হয় বটে কিন্তু ভোগান্তে পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখদুঃখের আশ্রয়ীভূত হইতে হয়। মানবগণ কর্মতৎপরতাবশতঃ স্বাভাবিকী জড়তা অপনয়ন করিয়াছে। সুতরাং তাহার অগ্রসর হওয়া ভিন্ন উপায় নাই। নিরবচ্ছিন্ন সুখ এখন তাহার জিজ্ঞাস্য। গীতা বলিলেন, "কর্মফলে কামনা বর্জিত হইয়া বেদোক্ত কর্মানুষ্ঠান কর। ইহাতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ হয়।" এইরূপে জীব কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম বহন করিয়া নিষ্কাম কর্মে রত হয়। নিষ্কাম কর্ম=ঈশ্বর প্রীত্যর্থ কর্ম=উপাসনা। রজঃপ্রধান কর্মী ক্রমে সত্ত্বে অগ্রসর হয়। সত্ত্বপ্রবণ করিবার জন্যই উপাসনাকাণ্ডের প্রথম অবতারণা।

প্রতীক=বহিরাবলম্বন। আব্রহ্ম সমস্তই প্রতীকরূপে কল্পিত হইতে পারে। কিন্তু সমধিক বিভূতিমান ব্রহ্মের নিকটবর্তী বলিয়া শাস্ত্রে

নির্দিষ্ট। সুতরাং উক্তরূপ প্রতীকোপাসনা সমধিক ফলপ্রদ। কিন্তু যে কোন প্রতীকে কেন ভগবদ্‌বুদ্ধি ব্যখাপিত করি না তাহাতে মনুষ্যবুদ্ধির আরোপ করিতেই হইবে। সূর্যদেব মনুষ্যরূপে কল্পিত হইয়া সপ্তাশ্বরথে পৃথিবী ভ্রমণে ব্যস্ত। শ্রুতিগণ মূর্তিমতী। মন-ইন্দ্রিয়ের বিবাদ বেদেই দৃষ্ট হয়। রামানুজ প্রভৃতি আচার্যগণ শাস্ত্রানুমোদিত ঈশ্বরবিশেষকে ঈশ্বরাবতার নির্দেশ করিয়া ভক্তিপ্রথানুবর্তন করিলেন। মহাবিভূতিমান রামকৃষ্ণাদিকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া অবতারবাদ প্রচার করিলেন। পৌরাণিক সময়ে কেহ শিবমূর্তি, কেহ গণপতি, কেহ শক্তি, কেহ বিষ্ণু প্রতীকে ঈশ্বরবুদ্ধি স্থাপন করিয়া সম্প্রদায় গঠনের সূচনা করিলেন। ক্রমে সঙ্কীর্ণ মত প্রচারিত হইতে লাগিল। কেহ বাসুদেব, কেহ শক্তি, কেহ শিবকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দিষ্ট করিতে থাকিলেন। এইরূপে বিভিন্ন প্রতীক সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের কারণ হইল।

কিন্তু অবতার হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নশ্রেণীর প্রতীক পর্যন্ত সকল উপাসনার ফল বেদান্তমতে সাযুজ্যপ্রাপ্তি বা সগুণ ঈশ্বরলাভ। কিন্তু দেহাভিমানীর পক্ষে নির্গুণ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি নিতান্ত ক্লেশকর। অতএব এই প্রতীকোপাসনা জ্ঞান রাজ্যে অগ্রসর হইবার প্রশস্ত উপায়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজমতে উপাসনা পাঁচ প্রকার। (১) অভিগমন বা ভগবন্মন্দিরাদি মার্জন (২) উপাদান (গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা) (৩) ইজ্যা (পূজা) (৪) স্বাধ্যায় (মন্ত্ররূপ স্তোত্রপাঠ ও ভগবৎ-শাস্ত্রের অভ্যাস) (৫) যোগ (একাগ্রচিত্তে ভগবদনুসন্ধান)। ইহার দ্বারা ভক্তি হয় ও মানব বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হয়। ইহারা বলেন অহংগ্রহ উপাসনা ভগবত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের অনুপযোগী। ভক্তিই অনন্যোপায়। কিন্তু বৈরাগ্য ব্যতীত পরাভক্তি স্ফুরণ হয় না। রামানুজাদির সময় হইতেই ভক্তিশাস্ত্রের মহিমা প্রচার হইয়াছে। বেদ উপনিষদ্ বা দর্শনশাস্ত্রে শ্রদ্ধা ও একনিষ্ঠ শব্দ ভিন্ন ভক্তি কথার উল্লেখ নাই পুরাণের সময় হইতে আরম্ভ হইয়া ইহাদিগের সময়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

নারদীয় ভক্তিসূত্র, শাণ্ডিল্যসূত্র, নারদ পঞ্চরাত্র, শ্রীমদ্‌ভাগবত ভক্তিগ্রন্থ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—মই, সিঁড়ি, বাঁশ, দড়ি বা অন্য কোন অবলম্বনে ছাদে উঠিতে পারা যায়, সেইরূপ অদ্বৈত তত্ত্বে পঁহুছিতে সংসার ও শিক্ষানুরূপ প্রতীক অবলম্বন করিলেই হয়। সময়োপযোগী বিভিন্ন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা ঈশ্বরাবতার বলিয়া কথিত হন। এই বৈষম্যসাম্যকারী মহাপুরুষগণ উপাসনার প্রতীকরূপে গৃহীত হন। কৃষ্ণ, রাম, শিব, চৈতন্য, বুদ্ধ, ঈশা সকলেই প্রতীকরূপে গৃহীত হইয়াছেন। সমাজের পরিবর্তনে যখন অধিকাংশ মানব একরূপ দৈন্যাবস্থাপন্ন হয়, তখনই কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্মস্থাপন করিয়া থাকেন এবং তিনিই প্রতীকরূপে পূজিত হন। অধুনা পাশ্চাত্য জড়বাদাক্রান্ত কামিনীকাঞ্চনাসক্ত জগতে সুপ্রভাত সূচনা করিবার জন্য পুণ্যক্ষণে শ্রীকামারপুকুরে সেই পুরুষোত্তমাদিত্য পুনরুদিত হইলেন। অধিকারী ভেদে তিনি উপাসনার উপযোগী যে যে পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন অধুনাতন জগতে তাহাই একমাত্র কল্যাণকর ও অবলম্বনীয়।

মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতি

শ্রীমতী স্নেহলতা সেনগুপ্তা

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের কৃপাধন্যা বর্ষীয়সী ভক্ত লেখিকা।

বাংলা ১৩৩২ সনের ফাল্গুন মাসে পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ আমাকে অসীম করুণা করে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে স্থান দিয়েছেন। আজ আমার জীবন সায়াহ্নে সেই মধুর স্মৃতি-কথা ক'টি লিখতে বসেছি। কিন্তু আমার মতো মূর্খের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের স্মৃতিকথা লেখা একেবারেই অসম্ভব মনে করি। একমাত্র শ্রীশ্রীগুরুদেবের আশীর্বাদ ও অহেতুক কৃপাই ভরসা।

একদিন বাবা (স্বর্গত গিরিজাকুমার গুপ্ত) বেলুড় মঠ থেকে এসে আমাকে বললেন, 'হ্যাঁরে, তুই বেলুড়ে দীক্ষা নিবি ?' আমি সানন্দে সম্মতি জানালাম। আমার বেলুড় মঠে দীক্ষা পাবার এত আগ্রহের মূল কারণ—আমরা ছেলেবেলা থেকেই বাবা, জ্যাঠামশাইয়ের মুখে শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর কথা শুনেছি এবং হবিগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। আমার দিদি ও ছোট ভাইবোনেরা সকলেই শ্রীশ্রীমা, পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ, কালী মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, ত্রিগুণাতীত স্বামীজীর কৃপালাভে ধন্য হয়েছে।

একদিন বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, পূজনীয় শরৎ মহারাজ বা মহাপুরুষ মহারাজ—এঁদের মধ্যে আমি কার কৃপা পেতে চাই ? আমি মহাপুরুষ মহারাজের কথা বলাতে বাবা বললেন, তিনি এখন বেলুড় মঠে নেই। তাঁর আসতে দেরি আছে। কিছুদিন যাওয়ার পরে বাবা জানালেন, মহারাজ মঠে এসেছেন এবং সাতদিন বাদেই আমার দীক্ষার দিন স্থির হয়েছে। আমার মনে তখন অসীম আনন্দ।

মহাপুরুষ মহারাজের কৃপা আমার বোন আগেই পেয়েছে,—কিন্তু তার স্বামীর দীক্ষা হয়নি। তাই নির্ধারিত দিনে আমার ও ভগ্নী-পতির দীক্ষার প্রয়োজনীয় সামান্য জিনিস নিয়ে, বাবা আমাদের নিয়ে বেলুড় মঠে পূজনীয় মহা-রাজের কাছে গেলেন। আমরা সকলেই তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম করে ধন্য হলাম। তাঁর অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত সুগৌর, সুঠাম চেহারা ও তেজোদীপ্ত সৌম্যমূর্তি দেখে চোখ জুড়াল। সেদিনের মতো অতখানি ব্যাকুলতা যদি আমার আজও থাকত !

বেলা ১০টায় আমরা গঙ্গায় স্নান করে, গঙ্গায় দাঁড়িয়েই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের উদ্দেশে প্রণাম করে মঠবাড়িতে যেতেই মহারাজ বাবাকে বললেন, আমাদের ঠাকুর-মন্দিরে নিয়ে যেতে। মন্দিরে মহারাজ তাঁর পাশে দুখানা আসনে আমাদের দুজনকে বসতে বললেন। তাঁর সামনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিরাট প্রতিকৃতি আর পাদুকা। মহারাজ এমন তন্ময় হয়ে পূজা করছিলেন যে, তাঁর সেই ধ্যানমগ্ন আরক্তিম মুখমণ্ডলের দিব্য জ্যোতিতে সমস্ত মন্দিরখানি যেন আলোকিত হয়েছিল ;—তখন মনে হচ্ছিল স্বয়ং বিশ্বনাথই জীবন্ত গুরুমূর্তিতে বুঝি এখানে আবির্ভূত।

তাঁর ঐ স্বর্গীয় বিমল জ্যোতিঃদর্শনে আমি আনন্দে এত বিহ্বল হয়েছিলাম যে, আমার সমস্ত শরীর তখন রোমাঞ্চিত এবং দুই চোখের জলে কাপড় ভিজে গিয়েছিল। আমার সর্বশরীর থরথর করে কাঁপছিল ;—কিছুতেই কম্প থামাতে পারছিলাম না।

ইতিমধ্যে মহাপুরুষ মহারাজজী শ্রীশ্রীঠাকুরের

পূজা-সম্পন্ন করে আমাদের দুইজনকে দীক্ষার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া করালেন। প্রশান্ত মহাযোগী স্নেহপূর্ণ স্নিগ্ধদৃষ্টিতে পবিত্র আসনে উপবিষ্ট আর আমরা দীক্ষার্থীরা ভক্তিবিনম্রচিত্তে মন্ত্রগ্রহণে উন্মুখ! তাঁর শ্রীমুখ-নিঃসৃত মহামন্ত্র শ্রবণের পর, তাঁরই আজ্ঞায় আমরাও তাঁর সঙ্গে কয়েকবার মন্ত্রোচ্চারণ করলাম। এরপর তিনি আমাদের জপের নিয়ম শিখিয়ে দিলেন।

স্পষ্টই মনে পড়ছে, ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের অমোঘ দৈবশক্তিতে ও তাঁর পূতস্পর্শে মনের সমস্ত বোঝা অপসারিত হয়ে প্রাণে বিমল আনন্দ অনুভূত হয়েছিল। শ্রীগুরুদেব বললেন, আজ তিনি আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করলেন। আমরা যেন সবকিছুতে একমাত্র ঠাকুরের উপরই নির্ভর করি এবং নিয়মিত তাঁকে স্মরণ-মনন করি। পরে আমরা ঠাকুরকে প্রণাম করে শ্রীগুরুদেবের পাদস্পর্শে জীবন সার্থক করে বাইরে এলাম।

একটু পরে আমরা সকলে প্রসাদ পেতে বসলাম। তখন একজন সেবক মহারাজ শ্রীগুরুদেবের প্রসাদ আমাদের দিয়ে গেলেন, পেয়ে আমরাও ধন্য হলাম। প্রসাদ পাবার পরে ঘুরে-ঘুরে সমস্ত মন্দির প্রদক্ষিণ করলাম। সব দেখা হলে আবার আমরা মহাপুরুষ মহারাজের চরণে প্রণত হয়ে তাঁর প্রাণভরা আশীর্বাদ নিয়ে ফিরে এলাম। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সন্তান মহাপুরুষজীর অপার করুণায় তাঁর শ্রীচরণে স্থান পেয়ে নিজেকে আমি পরম-সৌভাগ্যশালিনী মনে করি।

আমাদের দীক্ষালাভের পর এই পার্থিব জগতে স্থূল দেহে শিবাবতার শিবানন্দ মহারাজ আর বছর দশেকের বেশি ছিলেন না। ঐ ক'বছরে কোন উপলক্ষে দিনাজপুর থেকে কলকাতায় এলে শ্রীশ্রীগুরুদেবকে দর্শন ও প্রণাম করে পরিতৃপ্ত প্রাণে ফিরেছি। একবার বিকেল ৪টার পরে মহাপুরুষজীকে দর্শনমানসে একজন সেবক মহারাজের সঙ্গে তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি, শ্রীমহারাজ ধ্যানমগ্ন। সেই ব্রহ্মতেজোময়, ধ্যানগম্ভীর মূর্তির কাছে কোন কথা বলারই সাহস হল না আমার। কিছুক্ষণ পরে বাহ্য জগতে এসে প্রসন্ন স্নেহপূর্ণ স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে আমাকে খুব আশীর্বাদ করেছিলেন—আমার মন-প্রাণ আনন্দে ভরে গেল। এইটুকুই মনে আছে।

আর-একবার কৃষ্ণনগর থেকে মহাপুরুষ মহারাজের জন্য কিছু সর-ভাজা নিয়ে বেলুড় মঠে যাই বেলা প্রায় ১১টায়। তিনি তখন বারান্দায় গঙ্গার দিকে মুখ করে বসে। আমরা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে মিষ্টির পাত্রটি তাঁর হাতে দিতেই তিনি খুব খুশি হলেন—সেবকের হাতে দিয়ে বললেন, ঠাকুরের ভোগে ঐ মিষ্টি দিতে। আমরাও সেদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাপ্রসাদ পেলাম।

এর পরে আর সেই অন্তর্যামী ও আশ্রিত-বৎসল মহাপুরুষের সাক্ষাৎ দর্শন বা পবিত্র শ্রীচরণস্পর্শের সৌভাগ্য আমার হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

কয়েক বছর পর বোনের বাসায় গিয়ে শুনলাম, মহাপুরুষ মহারাজ অসুস্থ হয়ে শয্যা-শায়ী। সেদিনই বিকাল ৪টায় পুণ্যতীর্থ বেলুড় মঠে গিয়ে পরমারাধ্য মহারাজের শ্রীচরণদর্শনের প্রার্থনা জানালাম। শুনলাম, তিনি উপরের ঘরে আছেন, কিন্তু সেখানে তখন কাউকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। শুনে মন খুব খারাপ হয়ে গেল। আমরা বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছি। খানিক বাদে তাঁর একজন সেবক মহারাজ এসে বললেন, 'আপনারা ওপরে জানলার দিকে তাকান,—মহাপুরুষ মহারাজ আপনাদের আশীর্বাদ করবেন।' আমরা সতৃষ্ণ নয়নে তাঁর

সেই স্বর্গীয় তেজোদীপ্ত, আনন্দোজ্জ্বল শ্রীমুখ-মণ্ডলের দিকে তাকিয়ে আত্মবিস্মৃত হয়ে গেলাম। ভক্তবৎসল শ্রীগুরুদেব তাঁর কঠিন রোগগ্রস্ত দেহে শারীরিক কষ্টের দিকে গ্রাহ্য না করে তাঁর প্রকৃতিসুলভ করুণামাখা, স্নিগ্ধ অপলকদৃষ্টিতে আমাদের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাঁর বাঁ হাত-খানি (ডান হাত অবশ) তুলে এমন প্রাণস্পর্শী আশীর্বাদ করলেন যে, আবিষ্টের মতো দাঁড়িয়ে আমরা অশ্রুজলে সিক্ত হতে লাগলাম। হৃদয়ে বিদ্যুৎস্পন্দন অনুভব করলাম, আর শরীর পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চিত হতে লাগল।

সেদিনই আমরা বিপুল আনন্দ ও বিগলিত চোখের জলে শ্রীগুরুকে ইহজগতে শেষ দর্শন করে এসেছিলাম।

গ্রামের মেয়েরা কি ভাল খায় ?

শ্রীমতী নার্গিস সাত্তার

হাওড়া গার্ল'স্ কলেজের শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপিকা,—বিশিষ্ট সমাজসেবিকা এবং লেখিকা।

The Economic Times of India-র একটি খবর হল যে, হায়দ্রাবাদের একটি সংস্থার গবেষণার ফলে জানা গেছে,—গ্রামের মেয়েরা ভাল খায় 'eat better'। সমসাময়িক আর-একটি পত্রিকার খবর হল যে, যাদের একটু জমি আছে তারা ভূমিহীনদের চেয়ে নিঃসন্দেহে আর-একটু ভাল খায়। পাশাপাশি দিল্লীতেই প্রকাশিত একটি পত্রিকার খবর যে, গ্রামের মহিলাদের শতকরা ৭০ জন anaemia বা রক্তাল্পতায় ভোগে এবং মোট নারীসংখ্যার যদি শতকরা ৭০ জন অ্যানিমিয়ায় ভোগে তাহলে তারা কি করে 'better eater' হল, বোঝা বেশ কঠিন। আর জমিই বা কজনের আছে যে, তারা ভাল খাবে ? ষষ্ঠ পরিকল্পনার তথ্য যে, '50% of the rural population are landless who are most underprivileged and undernourished.' আর কে না জানে যে, এই ভারতে শতকরা ৫০ জন দারিদ্র্যসীমার নিচে। ফলে তারা স্বভাবতই ব্যাপক অপুষ্টির শিকার। এবং একথাও সত্য, কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য অনুযায়ী ১৯৮৩-৮৪-র মধ্যে খাদ্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ তার পরিমাণ ১৫১.৫ মিলিয়ন টন। এই পরিমাণ দেখে এটা দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব মনে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এত সবুজের প্লাবনে, গ্রামের মেয়ের রক্তে কেন খরা দেখা দেবে ?

হায়দ্রাবাদী গবেষণার মতে গ্রামের মেয়েরা যে আরও ভাল খায় তার দুটি প্রমাণ হাতের কাছেই। (১) একটি হল অন্ততঃ রান্নাঘরে তার অবাধ অধিকার। তার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য। কাজেই খাবারেও। (২) তাদের ভাল খাওয়া-দাওয়ার আর-একটি মহা উল্লেখযোগ্য ব্যাখ্যা হল তাদের দৈহিক ওজন। অর্থাৎ অধিকাংশ গ্রাম্য-বালা স্থূলাঙ্গী।

কোন কিছু বলার আগে নারীর মনস্তত্ত্ব তথা তার জায়া ও জননীরূপের মানসিকতাটিকে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। নিজের খাবার কথা সে বিশেষ ভাবে না। তার চিন্তা স্বামি-সন্তানদের পেটভরা নিয়ে। শুষ্ক data আর statistics দিয়ে সব সময় সব পরিস্থিতি বোঝানো দুষ্কর। Kitchen Queen সে ঠিকই। তবে সে খুবই প্রজাবৎসল। স্বামি-সন্তান (গড়ে

৬-৮)-দের খাইয়ে-দাইয়ে হাঁড়ির শেষ তলানী-টুকু অথবা বাসী, পচা, গলা, পোড়া, এককথায় 'অখাদ্য' যেটুকু থাকে, অথবা টাট্‌কা হলেও, পরিমাণে কম খাবার খেয়েই সে সন্তুষ্ট। তার স্বামি-সন্তান দুধে-ভাতে না হোক, পেট ভরে খেলো তো! সেই সুখেই সে 'হেঁসেল-রানী'! তারপরও তার অল্প আহার বাঁচিয়ে পোষা মেনিটা, বকবকম পায়রা দুটি, ডিম-পাড়া মুরগি, ল্যাজকাটা ভক্ত পাহারাদারটিকেও একটু-আধটু প্রসাদ দিতে ভোলে না। দুপুরে ফকির-ভিখারিকেও সে অভুক্ত ফেরাতে চায় না। (এটাকে এখনও গৃহস্থের পক্ষে কল্যাণমূলক বলে বিবেচিত হয়)। তাই না একজন বিখ্যাত লেখক বলেছেন, 'তোমরা অন্নপূর্ণা। তোমাদের দ্বারে আমাদের ভিক্ষা নেওয়া শেষ হবে না কোনদিন।' ভাষাটা হয়তো ঠিক মনে নেই আমার, তবে ভাবটা এই রকমই। তাছাড়া অবেলায়, অনিয়মে, উপেক্ষায়, অধিকাংশ মেয়েরই 'ক্ষিধে পড়ে যায়'। শুধু অ্যানিমিয়া কেন, একই কারণে গল-ব্লাডারের উপসর্গেও কি মেয়েরা কম ভোগে? এখন দেখা যাক Kitchen Queen হওয়া সত্ত্বেও শতকরা ৭০ জন গ্রামের মেয়ে কেন অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগছে! সে কি 'better' খাওয়ার ফলে? Home Science নামক একটি পত্রিকা (Published by Ministry of Agriculture) জনৈক বিদেশিনীকে (Margaret Reed) উদ্ধৃত করে করে জানাচ্ছে যে, 'One of the most pervasive problems facing women in developing countries is malnutrition.'—ভারতীয় পল্লীবাসিনী ভাত, গম, জোয়ার থেকে মাথাপিছু পায় ১৪০০-১৬০০ কে-ক্যালোরি (K-calorie)। কিন্তু তার প্রয়োজন ২২০০। কিন্তু এই "ফুল্লরা" ৬০০-৮০০ ক্যালোরি ঘাটতি নিয়েই বার মাস কাটায়।

এরপর গ্রামের নারীর সন্তান-জন্মের হার গড়ে ৬-৮। কাজেই সে আজও শিশু উৎপাদনের নিখুঁত যন্ত্র। বছরে বছরে নতুন সৃষ্টিকর্মের রক্তাল্পতায় মরে যায় সেও ভাল, কিন্তু নারী জনম সার্থক করে যাও! তার পরিবেশ, আজন্ম সংস্কার, তাই শিখিয়েছে তাকে। এতে তার কোন অভিযোগ নেই।

এরপর আছে ত্রুটিপূর্ণ খাদ্যাভ্যাস। 'শহরের অপেক্ষা গ্রামের মেয়েরা আরো ভাল খায়'—পড়া গেল। কিন্তু কি খায়? এবং কতটুকু খায়? ক্যালোরির খবর তো আগেই বলা হল। এবার দেখা যাক এরা কি খায়? শহরবাসিনী দরিদ্র আর গ্রামবাসিনী দরিদ্রের ফুড হ্যাবিট ভৌগোলিক ও অন্যান্য কারণে আলাদা। গ্রাম-বাসিনী তার এক চিল্‌তে উঠোনে দুটো কলা, নারকেল, পেয়ারা, পেঁপে, উচ্ছে, বেগুন, মানকচু প্রভৃতি লাগাতে পারে। তার ঘরের চালে উঠিয়ে দিতে পারে দুটো পুঁই, লাউ, কুমড়োর লতা। মাঠে-ঘাটে, পুকুর পাড়ে হিঞ্চে, নটে কলমি, শুশনিও জুটে যায়। টাট্‌কা শাকসবজির অভাব অনেকটা মেটে। পুজাপার্বনে, আত্মীয়-প্রতিবেশীর কাছে ভাল-মন্দ আহার্যও পায়। বিশেষ করে বর্ষায় নদী-খাল-বিলে কিছু চুনো-পুঁটি বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরাও ধরে। শহর-বাসিনী দরিদ্রের তুলনায় এসব খাদ্য তাজা এবং সহজলভ্য। প্রকৃতি এঁদের কিছু খেতে দেয়। আদিবাসীরা ইঁদুর, সাপ, ব্যাঙ, গাছের শিকড় প্রভৃতিও খায়। এই পর্যন্ত বাড়তি সুবিধা। গ্রামবাসিনী দরিদ্র খায় কী তার একটা তালিকা দেওয়া হচ্ছে :

প্রাতরাশ—বাসীভাত, শুকনো লংকা পোড়া, কাঁচাপেঁয়াজ।

জলখাবার—চিঁড়ে অথবা মুড়ি একটু গুড় কিংবা কাঁচা লংকা ও সর্ষের তেল সহযোগে।

(তৈরির সরঞ্জাম কেনার সামর্থ্য না থাকায় চিঁড়ে-মুড়িও কিনতে হয় খুব দরিদ্রকে)।

মধ্যাহ্ন ও রাত্রির আহার—ভাত বা রুটি আলু-বেগুন বা ঝিঙে পোড়া, আমড়া বা কচু ভাতে, কখনও পোস্ত বাঁটা, অসংখ্য শুকনো লংকা, ভাজা বা পোড়া। কদাচিৎ ডিমের ডালনা বা অমলেট। নয়তো দুটি কই, ল্যাটা, মৌরলা চচ্চড়ি বা শোল, পাঁকাল, ত্যালাপিয়ার ঝোল-সমুদ্র। ডাল রান্না গরীবের কাছে এখন বিলাস। রাতের তরকারি থেকেও কিছু বাঁচিয়ে রাখা হয়। সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে খাওয়া শেষ, কাজেই বৈকালিক আহার বলে কিছু নেই। আর মাংস উৎসবের ব্যাপার। তাই 'কুটুম এলে মারে হাঁস, ঘর গোষ্ঠী খায় মাস।' ঐ এক microscopic টুকরোতে কতটা protein intake হবে?

দরিদ্র, নিরক্ষর গ্রামবাসী মহিলার জীবন, এককথায় গণ্ডিবদ্ধ। খবরের কাগজ-পত্রিকা কেনার পয়সা বা পড়ার সামর্থ্য নেই। প্রচার-মাধ্যমগুলির ব্যাপারে তারা অন্ধ ও বধির। Breast feeding ছাড়া পুষ্টি সংক্রান্ত খবর গ্রামের মায়েরা কিছু জানেই না। কিন্তু মাতৃদুগ্ধ যারা পান করাবে তারা প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য পাবে কোথায়? খাদ্যে, পরিমাণগত এবং গুণগত—দুদিক থেকেই গ্রাম্য নারী বঞ্চিত। Quantity আগেই দেওয়া হয়েছে এবার quality-তে আসা যাক। ফেনযুক্ত ভাত, ঢেঁকি-ছাঁটা চাল, খোসাসুদ্ধ সবজি, হাল্কা তেল মশলা প্রভৃতির খাদ্যগুণ ও উপকারিতা সম্বন্ধে তারা অজ্ঞ এবং উদাসীন। দুধ-ঘি, ছানা, তাও জোটে না। অবশ্য ইদানীং চায়ের চল হয়েছে। এতে এদের না ভরে পেট, না হয় পুষ্টি। কিন্তু এদের রন্ধন-শিল্পের তারিফ করতে হয়। অর্থাৎ এক হাঁড়ি আলু, বেগুন, কচু, পুঁই-এ পঁচিশ গ্রাম কুচো চিংড়ি অথবা শোল বা সিলভার কার্প-এর এক টুকরো microscopic মুড়ো তরকারিতে ফেলে গৃহবধূটি তরকারিতে 'বেশ মাছের বাস বেরুচ্ছে' বা 'এক হাঁড়ি তরকারি বেশ মজেছে তো' ভেবে বহু-পাতে পরিবেশন করার সাফল্যে গর্বিত হতে পারে বটে! কিন্তু তা পুষ্টি যোগাতে কতটুকু সাহায্য করে? তারপর আছে সবেতেই পাঁচ ফোড়ন আর শুকনো লংকার ছড়াছড়ি। ঝালে রসনার লালা সংক্রান্ত বা Saliva-গত গুণ যত না পাওয়া যায়, খাদ্যগুণ নষ্ট হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। গরীবরা ঝাল কেন খায়? অল্প তরকারিতে বেশি পরিমাণে ভাত খেতে পারে বলে। ভাজা-ভুজি, ঝালচচ্চড়ি, শুঁটকি, বাসী জিনিস কেন তাদের পছন্দসই অথবা সহনীয়? অন্তত একটা কারণ—ঐ saving device। একথালা ফুন-ভাত, একটা আস্ত কাঁচা পেঁয়াজ, গুচ্ছের শুকনো লংকাপোড়ার সঙ্গে চটকে খাবার দরকারও ঐ কারণে। একটা-দুটো পচা অথবা টাটকা ডিম কপালে জুটলে গুচ্ছের পেঁয়াজ-লংকা আর খোলা-বাজারের ভেজাল তেলে তাকে এমন কড়া করে ভাজা হয় যে, খেতে মুখরোচক হলেও তার 'ডিমত্ব', এককথায় food value একটুও থাকে না। কিন্তু আট-দশজনকে ডিম খাওয়ানোর অন্য রন্ধন-কৌশল গরীব রমণীর জানা নেই। ওয়াটার-পোচ, স্যুপ, ভেজিটেবিল বা মাংসের সিদ্ধ শাকসবজি, মাছ এরা খাবে না। কাজেই পুষ্টির ব্যাঘাত অনিবার্য। সবজি আগে ধুয়ে কাটা, রান্নায় অল্প জল ব্যবহার করা, কাঁচা সবজির স্যালাড, অতিরিক্ত সিদ্ধ বা oven cooking না করা সম্বন্ধে শিক্ষার জ্ঞান এদের নেই। এককথায় 'No awareness about proper nutrition and good eating habits.'—পুষ্টিকর খাদ্য, সুষম আহার প্রভৃতি হল তাদের কাছে অতি দুর্বোধ্য ওলন্দাজদের ভাষা!

সবারই জানা আছে যে, ভারতবর্ষে যারা

অপুষ্টিতে ভুগছে তারা হচ্ছে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার্থী এবং গর্ভবতী ও স্তন্যদায়িনী জননী। ২৫০ মিলিয়ন ভারতীয় অপুষ্টিতে ভোগে এবং তার বড় কারণ দারিদ্র্য। এদের মধ্যে কি গ্রামবাসিনী পড়ে না? ভারতের বহুরাজ্যে, যেমন মধ্যপ্রদেশে, এমন গ্রাম আছে যেখানে ফসলের সময় ছাড়া অন্য সময় মেয়েরা দিনে মাত্র একবার খেতে পায়। অর্থাৎ দারিদ্র্য মানেই অল্প খাদ্য। ভারতে শতকরা ৪৩ জন নারী সক্ষম হয়েও বেকার। আবার যারা সামান্য কিছু রোজগার করেও তাদের সেই কষ্টার্জিত অর্থকে প্রায়শঃই তুলে দিতে হয় পুরুষদের হাতে, নেশা করার জন্য। এটা না হলে তবু মেয়েরা অপেক্ষাকৃত ভাল খেতে পেত। অন্ততঃ যে মেয়েরা জমিতে কাজ করে। বেশির ভাগ পণ্ডিতই একমত যে, 'Women's calorie intake is systematically low who suffer from marginal unnourishment.' NIN (National Institute of Nutrition)-এর মতেও প্রোটিন ঘাটতির চেয়ে বড় বিপদ হল ক্যালোরি ঘাটতি। এই রিপোর্টের মতে 'Intake of Vitamin "A", calcium along with that of calorie are too meagre. There is a deficiency of iron intake among pregnant women however.'

ক্যালোরি আর প্রোটিন intake বৃদ্ধি না পেলে, ভূমিহীনদের মধ্যে এই ঘাটতি সাংঘাতিক বেশি হবে। এমন কি মহিলা শ্রমিক বা কৃষাণীরাও তাদের আয়কে খাদ্যক্রয়ের ব্যাপারে আদৌ প্রয়োজনীয় বলে মনে করে না! অন্যদের আবার খাবার কেনার মতো আর্থিক সঙ্গতিই নেই, যদিও তারা সামান্য আয় করে। আমাদের দেশে পুষ্টির প্রয়োজন সম্বন্ধে মানুষ এতই অজ্ঞ এবং তাচ্ছিল্যভাব পোষণ করে যে, 'A rise in the family income does not necessarily result in improved nutritional levels'. বলেছেন Brita Brandtzaeg তাঁর 'Women, Food and Technology—A case in India' প্রবন্ধে। একথাই বারবার উঠছে যে 'Nutritional disorder affecting mostly women of child-bearing age is anaemia caused by iron deficiency'. একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শতকরা ৪৩ জন সক্ষম মেয়েরা বেকার। কাজেই খায় কম। কিন্তু তা বলে পরিশ্রম কম করে না মোটেই। এদের পরিশ্রম দ্বৈত ভূমিকায়। ঘরে এবং বাইরে। পুরুষদের পক্ষে সেটা প্রায় ব্যতিক্রম। মেয়েদের less calorie কিন্তু dual burden.

একটি সমীক্ষায় প্রকাশ ৪৪.৫২ জন মহিলা গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকে। এমন কি যে মেয়েরা মাত্র ১৩৮ দিন season-এ কাজ পায়, তারাও। আর গৃহকর্মে পুরুষদের সংখ্যা শতকরা ০.৮২ জন অর্থাৎ একজনেরও কম।

গ্রাম্য মেয়েদের দৈনন্দিন কাজ :

(১) রন্ধন—২ ঘ. ৫২ মি.
(২) ঘরদোর সাফাই—১ ঘ. ২০ মি.
(৩) কাপড় কাচা—১ ঘ. ১৮ মি.
(৪) গৃহপালিত পশুদের সেবা—১ঘ. ৪৭মি.
(৫) দুধ দোহা, জাল দেওয়া ইত্যাদি—
১ ঘ. ১৩ মি.
(৬) শিশুদের পরিচর্যা—১ ঘ. ৫৫ মি.
(৭) সেলাই ইত্যাদি—২ ঘ. ৩৯ মি.
(৮) মাঠের কাজ—৩ ঘ. ১৯ মি.
(৯) মাঠে খাবার নিয়ে যাওয়া—২ঘ. ২৪মি.

এই তথ্য দিয়েছেন ডঃ মিসেস হাসান তাঁর সমীক্ষায়। এছাড়াও মেয়েদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ। অবশ্য সম্পদ নিয়ে যথেষ্ট কড়াকড়ি আছে। তারপর আছে

জল আনার কাজ। বহু জায়গাতেই মেয়েদের অন্তত ২ মাইল দূর থেকে তা সংগ্রহ করতে হয়। হরিজন হলে তো কথাই নেই! এছাড়াও আর-একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে মেয়েরা, তা হল ধানভানা ইত্যাদি। পুরুষের তুলনায় গ্রামের মেয়েরা মাত্র চুয়াল্লিশ শতাংশ কৃষিকার্যের সুবিধা পায়। তারা অতি পুরাতন প্রথায় ও উপকরণ সহায়ে ক্ষেতের কাজ করে। এদের সবাইকে করতে হয় খাদ্য উৎপাদন, খাদ্য সংরক্ষণ, ফসল ঝাড়াই-বাছাই, ঝাড়া বা চালা-ছাঁকার কাজ, ফসল শুকানো—আবার বড়ি দেওয়া, আচার করা, সব। গ্রামের একটি গরীব মেয়ে দিনে ১৪ ঘণ্টা থেকে ১৮/১৯ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করে। পরিশ্রম অনুপাতে তারা পর্যাপ্ত বা পুষ্টিকর আহার পায় না। এটা নির্মম সত্য। এই কঠিন পরিশ্রমের পাশাপাশি তাদের নিম্নস্তরের খাদ্য-তালিকা আগেই বলা হয়েছে।

আবার হায়দ্রাবাদের গবেষণার দ্বিতীয় বক্তব্যে ফিরে আসতে হয়। তা হল গ্রামের মেয়েরা যে আরও ভাল খায় তার প্রমাণ হিসাবে তাঁরা তাদের দৈহিক ওজনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। মধ্যবয়সী মহিলারা মোটা হতে থাকে। সাধারণতঃ এটাকে 'middle age spread' বলা হয়। কম বয়সের ক্ষেত্রেও বিয়ের পরে, জননী হবার কিছুকাল বাদেই মেয়েরা মোটা হতে থাকে। এসবের কারণ খাদ্যগুণ, খাদ্য পরিমাণ বা পুষ্টিজনিত আহারও নয়; তা হল প্রধানতঃ biological বা metabolic কারণ। তার সঙ্গে 'better eating' বা ভাল খাওয়ার নিবিড় সম্পর্ক সব সময় থাকে না। অমর্ত সেন ও সুনীল সেনগুপ্তের কুচলি (পঃ বঙ্গের বীরভূম জেলার গ্রাম) রিপোর্টে পাওয়া গেছে যে, জন্মের সময় ছেলে ও মেয়ের ওজন সমান থাকে। তিন মাস বয়েস থেকে শিশুকন্যাদের ওজন কমতে থাকে, তার কারণ মেয়েদের ক্ষেত্রে malnutrition এবং কম medical care। এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার। যাই হোক, এই মতে ওজন তাহলে কমেই যায়! গ্রামের মেয়েদের ওজন বৃদ্ধির নানাবিধ কারণ থাকতে পারে, কিন্তু তা তারা ভাল খায় বলে নয়।

এ. কে. এম চৌধুরী বাংলাদেশের ১৪টি গ্রাম সমীক্ষা করে এক প্রবন্ধে ('Maternal Nutrition in Rural Bangladesh') বলেছেন যে, 'Bangladesh women suffered from chronic protein, caloric malnutrition mainly induced by frequent pregnancies and long periods of lactation.' ভারতের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা। গ্রামের মেয়েদের প্রধান পরিচয়ই তো তারা child producing machines! এইসব সমীক্ষার ফলাফল এবং বাস্তব চিত্র, অভিজ্ঞতা ও সাধারণ জ্ঞান থেকে, আমাদের পক্ষে 'Rural women eat better'—গ্রামের মেয়েরা ভাল খায়, এই সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়া শক্ত। অনেকেই পল্লীবালার হাঁড়ি-হেঁসেলের খবর রাখেন না। অনেক সময়, উচ্চপদস্থ সুবিজ্ঞ সমীক্ষকবৃন্দ শহরের অভিজাত অট্টালিকায় তাঁদের সুসজ্জিত শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত সেমিনার-কক্ষে বসেই গ্রামীণ সমীক্ষা-কর্ম নির্দ্বিধায় ও নির্বিবেকে চালিয়ে যান। আর আমাদের হতভাগিনী পল্লীবালারা গ্রামে বসে কোনদিন জানতেও পারবে না যে, তাদের নিয়ে পণ্ডিতমণ্ডলী গভীর গবেষণায় মগ্ন রয়েছেন এবং তাঁরা কাগজে-কলমে প্রমাণ পেয়েছেন যে 'Rural women eat better'—পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা খায়-দায় ভাল!

পথ ও পথিক

শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

‘সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা’

স্বামীজী একদিন শিষ্য শরচ্চন্দ্রকে বলছেন, ‘ঠাকুরের কথা শুনেছিস তো? তিনি বলতেন, “কৃপা-বাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে না।” কেউ কাকেও কিছু করে দিতে পারে কি রে বাপ? নিজের নিয়তি নিজের হাতে—গুরু এইটুকু কেবল বুঝিয়ে দেন মাত্র। বীজের শক্তিতেই গাছ হয়, জল ও বায়ু কেবল তার সহায়ক মাত্র।’

শিষ্য জিজ্ঞেস করলেন, ‘বাইরের সহায়তারও কি আবশ্যক আছে?’

স্বামীজী বললেন, ‘তা আছে। তবে কি জানিস—ভেতরে পদার্থ না থাকলে শত সহায়তায়ও কিছু হয় না।’

নিজের নিয়তি নিজের হাতে। ঈশ্বর, সাধনা, ধ্যান-জপ, পরের কথা। ঈশ্বরে বিশ্বাস আসবে, তবেই না উঠবে সাধনের কথা, তবেই না শুরু হবে ধ্যান-জপ। ঠাকুর বলতেন, ঈশ্বর মন দেখেন। মুখে বলি হরি কাজে অন্য করি, এই যদি হয়, তাহলে সেই বিখ্যাত শ্যামাসংগীতের লাইনটি বলতে হয়—‘সেয়ান পাগল বুঁচকিবগল, কাজ হবে না ওরূপ হলে॥’ শঙ্করাচার্য বিবেক-চূড়ামণিতে বলছেন:

অধিকারিণমাশাস্তে ফলসিদ্ধির্বিশেষতঃ।
উপায়া দেশকালাদ্যাঃ সন্ত্যস্মিন্ সহকারিণঃ॥

ফলসিদ্ধি অধিকারীর অপেক্ষা করে। কারণ, দেশকালাদি যে সমস্ত উপায় আছে, তা সবই অধিকারীর সহায়; সুতরাং তারা অধিকারীর আশ্রিত। বস্তুত প্রকৃত অধিকার না জন্মালে দেশকালাদি দ্বারা কোনও প্রকার সুফলপ্রাপ্তি ঘটে না।

অধিকারী হতে হবে। শুরু করতে হবে নিজেকে ধরে। নিজের হাতেপায়ে ধরতে হবে আগে। সুফীরা ঈশ্বর মানেন না। তাঁরা বলেন, মানুষই ঈশ্বর। এই ঈশ্বরত্ব কিভাবে লাভ করা যায়? **He who knows himself, knows his Lord.** যে নিজেকে জানে সে ঈশ্বরকেও জানে। কত কি যে লুকিয়ে আছে মানুষের ভেতরে, কখন কি যে বেরিয়ে আসবে আমার ভেতর থেকে আমিই জানি না। সুফী-সাধনধারা বলছে, কড়া নজরে রাখ নিজেকে। দেখ তোমার ‘আমি’-র কাণ্ডকারখানা। ‘আমি’ কখন কিভাবে ‘তোমাকে’ ঠকায়।

শুধু কথায় কি চিঁড়ে ভেজে! সুফী-সাধকরা সেই কারণে সতর্ক করেছেন, যা বলছ, তা কি বুঝে বলছ? ধর্মের নামে তোতাপাখির মতো কপচালে, তুমি বিপাকে পড়বে। ঈশ্বরের নাম পাড়লেই হবে না, ধারণা চাই। ধ্যান আর ধারণা। রুমি ‘ফিহি মা ফিহি’ গ্রন্থে সুন্দর একটি গল্প বলেছেন।

একজন না বলে একটা গাছ থেকে কিছু ফল পেড়ে খেয়েছে। গাছের মালিক এসে বললে, ‘জানো, না-বলে ফল পেড়ে খাওয়া অন্যায় কাজ। তোমার ভগবানের ভয় নেই?’

লোকটি বললে, ‘ভগবানে ভয়! ভয় করব

কেন? গাছ তো ভগবানের, আর আমি তাঁরই সেবক, তাঁরই গাছ থেকে ফল পেড়ে খেয়েছি।'

গাছের মালিক বললে, 'দাঁড়াও, আমি তোমার উত্তর দিচ্ছি।'

মালিক লোকটিকে গাছের সঙ্গে বেশ করে বেঁধে, সেই গাছেরই একটি ডাল ভেঙে আচ্ছা করে পেটালে। লোকটি কাঁদতে কাঁদতে বললে 'তুমি ভগবানকে ভয় করো না?'

মালিক বললে, 'ভয় করার মতো করেছি কি? তুমি ঈশ্বরের সেবক, আর এইটা, এই ডালটা, ঈশ্বরের গাছের ডাল, সেই ডাল দিয়ে, ঈশ্বরের ডাল দিয়ে ঈশ্বরেরই সেবককে প্রহার করা হয়েছে। অন্যায় তো কিছু করিনি ভাই।'

ঠাকুরের সেই মাহুত-নারায়ণ গল্পটি প্রায় একই রকম। প্রকৃতই যদি ঈশ্বরদর্শন হয়ে থাকে তাহলে হাতীও নারায়ণ, মাহুতও নারায়ণ। মাহুত-নারায়ণের কথাও শুনতে হবে তা না হলে হাতী-নারায়ণ পেড়ে ফেলে দেবে। ধূর্ত আর শঠের ঈশ্বর-ভাবনা একরকম, সৎ আর সাধুর ঈশ্বর-ভাবনা অন্যরকম।

স্বামীজী শিষ্য শরচ্চন্দ্রকে স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছেন, '"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—এই হচ্ছে সন্ন্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সন্ন্যাস না হলে কেউ কখনও ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে না—একথা বেদ-বেদান্ত ঘোষণা করছে। যারা বলে—এ সংসারও করব, ব্রহ্মজ্ঞও হব—তাদের কথা আদপেই শুনবিনি। ও-সব প্রচ্ছন্ন ভোগীদের স্তোকবাক্য। এতটুকু সংসারের ভোগেচ্ছা যার রয়েছে, এতটুকু কামনা যার রয়েছে, এ কঠিন পন্থা ভেবে তার ভয়। তাই আপনাকে প্রবোধ দেবার জন্যে বলে বেড়ায়, "একূল ওকূল—দুকূল রেখে চলতে হবে। ও পাগলের কথা, উন্মত্তের প্রলাপ, অশাস্ত্রীয় অবৈদিক মত। ত্যাগ ছাড়া মুক্তি নেই। ত্যাগ ছাড়া পরাভক্তি লাভ হয় না। ত্যাগ ত্যাগ। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" গীতাতেও আছে—"কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ"।'

কাম্যকর্ম-সমূহের হয় যদি ন্যাস,
জ্ঞানিগণ তাহাকেই বলেন সন্ন্যাস।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥
সর্বকর্মফল যদি করে পরিহার
বিচক্ষণগণ দেন ত্যাগ-নাম তার।

স্বামীজী বলছেন, 'সংসারের ঝঞ্ঝাট ছেড়ে না দিলে কারও মুক্তি হয় না। সংসারাশ্রমে যে রয়েছে, একটা না একটা কামনার দাস হয়েই যে সে ঐরূপে বদ্ধ রয়েছে, ওতেই তা প্রমাণ হচ্ছে। নইলে সংসারে থাকবে কেন? হয় কামিনীর দাস, নয় অর্থের দাস, নয় মান যশ বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের দাস। এ দাসত্ব থেকে বেরিয়ে পড়লে তবে মুক্তির পন্থায় অগ্রসর হতে পারা যায়।'

স্বামীজী চরম কথা বলেছেন। কোথাও কোনও রফা নেই। ঠাকুর অনেক নরম কথা বলেছেন। সংসারীকে একেবারে হতাশ করেননি। তিনি বললেন, 'যাদের প্রথম মানুষ-জন্ম তাদের ভোগের দরকার। কতকগুলো কাজ করা না থাকলে চৈতন্য হয় না।' আবার বলছেন, 'তবে সংসারী জীবের মন ঘোলা জল হয়ে আছে বটে, কিন্তু নির্মলি ফেল্লে আবার পরিষ্কার হতে পারে। বিবেকবৈরাগ্য নির্মলি।' আবার বলছেন, 'তোমাদের সব ত্যাগ করবার দরকার নেই। কচ্ছপের মত সংসারে থাক। কচ্ছপ নিজে জলে চরে বেড়ায়—কিন্তু ডিম আড়াতে রাখে—সব মনটা তার ডিম যেখানে, সেখানে পড়ে থাকে।' ঠাকুর আবার বলছেন, 'সংসারে টাকার দরকার বটে, কিন্তু উগুনোর জন্যে অতো ভেবো না। যদৃচ্ছা লাভ—এই ভাল। সঞ্চয়ের জন্য অতো ভেবো না। যারা তাঁকে মন প্রাণ সমর্পণ করে—যারা

তাঁর ভক্ত, শরণাগত—তারা ওসব অতো ভাবে না।' 'ভগবান লাভ করতে হলে তীব্র বৈরাগ্য দরকার। যা ঈশ্বরের পথে বিরুদ্ধ বলে বোধ হবে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতে হয়। পরে হবে বলে ফেলে রাখা উচিত নয়। কামিনীকাঞ্চন ঈশ্বরের পথে বিরোধী। ও থেকে মন সরিয়ে নিতে হবে। ঢিমে তেতালা হলে হবে না। একজন গামছা কাঁধে স্নান করতে যাচ্ছে। পরিবার বললে, তুমি কোন কাজের নও, বয়েস বাড়ছে, এখন এসব ত্যাগ করতে পারলে না। আমাকে ছেড়ে তুমি একদিনও থাকতে পার না। কিন্তু অমুক কেমন ত্যাগী।

স্বামী—কেন, সে কি করেছে?

পরিবার—তার ষোলজন মাগ, সে এক একজন করে তাদের ত্যাগ করছে। তুমি কখনও ত্যাগ করতে পারবে না।

স্বামী—এক একজন করে ত্যাগ! ওরে খেপী সে ত্যাগ করতে পারবে না। যে ত্যাগ করে সে কি একটু একটু করে ত্যাগ করে!

পরিবার [সহাস্যে]—তবু তোমার চেয়ে ভাল।

স্বামী—খেপী, তুই বুঝিস না। তার কর্ম নয়, আমিই ত্যাগ করতে পারব, এই স্থাখ্ আমি চললুম।

এর নাম তীব্র বৈরাগ্য। যাই বিবেক এল তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করলে। গামছা কাঁধেই চলে গেল। সংসার গোছগাছ করতে এল না। বাড়ির দিকে একবার পেছন ফিরে চাইলেও না। যে ত্যাগ করবে তার খুব মনের বল চাই। ডাকাত পড়ার ভাব। অ্যায়!!—ডাকাতি করবার আগে যেমন ডাকাতেরা বলে—মারো! লোটো! কাটো!'

আর স্বামীজী বলছেন অন্যভাবে। গুরু-ভ্রাতাদের দিকে তাকিয়ে বললেন,

' "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" আমাদের জন্ম, কি করছিস সব বসে বসে? ওঠ্—জাগ, নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর্, নরজন্ম সার্থক করে চলে যা। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" '

জেন সাধক যোশু গুরু মানসেনকে প্রশ্ন করলেন—'পথ কি?'

গুরু বললেন—'প্রতিদিনের জীবনই হল পথ।'

'অনুধাবন করা যায়?'

'যেই তুমি অনুধাবনের চেষ্টা করবে অমনি তুমি সরে যাবে বহুদূরে।'

'আমি যদি অনুধাবন না করি তাহলে জানব কিভাবে যে এইটাই পথ!'

'বৎস, এই পথ এমন পথ যা বুদ্ধি বা বিচার দিয়ে বোঝা যায় না, আবার বুদ্ধি বা বিচারের বাইরে এমনও নয়। যা বুঝবে তা ভুল বুঝবে। যা চিনবে, ধরে নিতে পারো তা ভুল চেনা হবে। আবার না চেনাটাও বুদ্ধিহীনতা। তুমি যদি সন্দেহাতীতভাবে সত্যপথ ধরতে চাও, তাহলে আকাশের মতো নিজেকে প্রকৃত মুক্ত করো। সৎ অসতের ঊর্ধ্বে চলে যাও। পারে চলে যাও।'

In spring, hundreds of flowers, in
autumn a harvest moon.
In summer, a refreshing breeze! in
winter snow will accompany you
If useless things do not hang in your
mind
Any season is a good season for you.

গীতাও তাই বলছেন—**any season is a good season.**

সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।

পুস্তক সমালোচনা

Some Poet Saints of India— Published by Ramakrishna Mission Ashrama, Ramakrishna Avenue, Patna—800004. pp. 144. Price : Rs. 15·00

ভারতবর্ষের বিভিন্ন যুগের আঠার জন সন্ত-কবি ও অধ্যাত্মসাধকদের জীবনী, ধর্মবোধ এবং ধর্মপ্রচার সম্পর্কিত আঠারটি প্রবন্ধের এই সংকলন গ্রন্থটির প্রকাশ খুবই সময়োপযোগী এবং অভিনন্দনীয়।

তামিলনাড়ুর থিরুনাভুক্করস, থিরুবল্লবার মানিক্যবাচকম্ এবং অণ্ডাল; কেরালার শ্রীরামানুজন এজুথাছন, গুজরাটের নরসিংহ মেহতা, আসামের শংকরদেব, মহারাষ্ট্রের তুকারাম, উত্তরভারতের কবীর, মীরাবাঈ, নানকদেব, তুলসীদাস, সুরদাস এবং সুফী শেখ ফরিদ; কর্ণাটকের বাসবেশ্বর, মিথিলার বিদ্যাপতি এবং বাংলার রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও রামপ্রসাদ—এই আঠারটি দিব্য-জীবনের আধ্যাত্মিক অনুভব এবং ইহার কাব্যময় প্রকাশ—এই সংকলন গ্রন্থে বিদগ্ধ বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে।

ভারতীয় সন্ত-কবিদের আধ্যাত্মিক সাধনার অবলম্বনীয় ভাব এবং পদ্ধতির মধ্যে,—এবং যে সকল ভাষার মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের ভাবকে প্রচার করেছেন—তার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তাদের মধ্যে একটা মৌলিক আধ্যাত্মিক ঐক্য সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের অনুভবই ভারতীয় সমাজ এবং সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য। এই সন্ত-কবিদের জীবন এবং তাঁদের কাব্যকৃতির মধ্যে এই ভারতীয় ঐক্যভাবনাই মূর্ত। এই ঐক্যসূত্রের একপ্রান্তে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, অপর প্রান্তে মানুষ। সন্ত-কবির উপজীব্য—ঈশ্বর এবং মানুষ। ইহাদের অধিকাংশই ভক্তিবাদী। দাক্ষিণাত্যের সন্তদের অধ্যাত্মসাধনা মুখ্যতঃ শিব এবং বিষ্ণুকে আরাধ্যরূপে অবলম্বন করেই অগ্রসর হয়েছে। মধ্য এবং উত্তরভারতে বিষ্ণু এবং রামেরই প্রাধান্য। মিথিলা, বাংলা এবং আসামের সন্তদের মধ্যে—বৈষ্ণব এবং শাক্ত-ভাবের সাধনা সুস্পষ্ট।

কবীর, নানক এবং সুফী-সন্ত শেখ কবিদের মধ্যে ভক্তিবাদের সঙ্গে মরমী-মানবতাবাদের একটা বিশেষ প্রকাশ লক্ষিত হয়। মধ্যযুগের সন্তদের এই ভগবদ্ভক্তিরসাশ্রিত মানবতাবাদ পরস্পরের ধর্মমতকে শ্রদ্ধা করতে এবং সামাজিক বর্ণভেদ ও ধর্মভেদকে অস্বীকার করে ঐক্যবন্ধনে সংবদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করেছে। এই অধ্যাত্ম-সাধক সন্তগণ সমাজবিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা না করেও সরল সহজ ঈশ্বরবিশ্বাস ও ভক্তিকে উপজীব্য করেই, সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য আধ্যাত্মিকভাবপুষ্ট উদার মানবধর্মী ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। সন্ত-কবিদের অধিকাংশই ছিলেন গার্হস্থ্য আশ্রমাবলম্বী, কিন্তু তাঁদের জীবনানুভবের মধ্যে ত্যাগ-বৈরাগ্য, প্রেম-প্রীতি এবং মহামিলনের সুরই প্রধান। এই জন্যই তাঁরা আঞ্চলিক হয়েও, সর্বভারতীয়,—বিশেষ কোন মতাবলম্বী হয়েও সনাতন ধর্মেরই প্রতিনিধি। ইহাদের কাব্য-ভাবনাই জাতীয় মহাকাব্য।

অতি সাম্প্রতিককালে ঈশ্বরানুরাগ-বিহীন রাজনীতি ও সমাজদর্শন যেখানে স্বার্থের জন্য ধর্মমতকে অপপ্রয়োগ করে নিজেদের মধ্যে বিরোধ, বিদ্বেষ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদকে বৃদ্ধি করতে চাইছে,—এই দুর্যোগের সময় স্বামী বেদান্তানন্দজী মহারাজ এইরূপ একখানা গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করে দেশের ও সমাজের অশেষ উপকার করেছেন। এই সকল সন্ত-কবিদের সমন্বয়, প্রেম ও ঈশ্বরবিশ্বাসের বাণী আমাদের বিবেক-বুদ্ধিকে ক্ষণিকের জন্য হলেও শুভপথে চলতে অনুপ্রাণিত করবে, আধ্যাত্মিক মানবতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে—সমাজ ও রাষ্ট্রের ঐক্যবিধায়ক অনুপ্রেরণাকে উদ্বুদ্ধ করবে।

—ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর

নেতাজী ইন্সটিট্যুট ফর এশিয়ান স্টাডিজ-এর ফেলো

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

শ্রীলঙ্কা শরণার্থিত্রাণ: মাদ্রাজ ত্যাগ-রাজনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, শ্রীলঙ্কা থেকে মন্দাপম ও তিরুচি শিবিরে আগত বিপুলসংখ্যক শরণার্থীকে প্রাথমিক সেবাদি করে চলেছেন। প্রতিদিন ঐ শিবিরের স্কুল-পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষাদান ও টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন: ২৪ পরগনার গাইঘাটা থানায় ১৯৮৩-র ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত ঠাকুরনগর বালিকা বিদ্যালয়-ভবনের পুনর্নিমাণ অগ্রগতির পথে চলেছে।

তত্ত্ব

পশ্চিমবঙ্গ ইঞ্জিনিয়ারিং জুনিয়র ডিপ্লোমা ১৯৮৫-র পরীক্ষায় বেলুড় সারদাপীঠ শিল্পায়তনের (জুনিয়র টেক্‌নিক্যাল স্কুলের) তিনটি ছাত্র যথাক্রমে ১ম, ৬ষ্ঠ ও ৯ম স্থান এবং নরেন্দ্রপুর আশ্রম জুনিয়র টেক্‌নিক্যাল স্কুলের দুটি ছাত্র যথাক্রমে ৪র্থ ও ১০ম স্থান অধিকার করেছে।

দ্বারোদ্‌ঘাটন

গত ৭ সেপ্টেম্বর রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ রাজমন্দ্রি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের নবনির্মিত সাধু-নিবাস এবং পাঠাগার ও কার্যালয়-ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। ৮ সেপ্টেম্বর তিনি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা-বিভাগের সূচনা করেন এবং প্রকল্পিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনা করেন।

১০ সেপ্টেম্বর পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজ বিশাখাপতনম্ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের মন্দির ও সাধু-নিবাসের শিলান্যাস করেন।

উদ্বোধন সংবাদ

গত ১৩ সেপ্টেম্বর স্বামী অদ্বৈতানন্দ মহারাজ, ৮ অক্টোবর স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এবং ১৪ অক্টোবর স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'তে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদি হয়। ১৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যারতির পর স্বামী অদ্বৈতানন্দ মহারাজের জীবনী ও উপদেশ আলোচনা করেন স্বামী সত্যব্রতানন্দ।

৬ অক্টোবর, রবিবার, সারদানন্দ হলে শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায় ও সহশিল্পিবৃন্দ, দাশরথি রায়ের পাঁচালি অবলম্বনে আগমনী গান পরিবেশন করেন।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা পাঠ ও আলোচনা করছেন।

বিবিধ সংবাদ

ইংলণ্ডের যুবরাজের ভারত-প্রীতি

'সান্‌ডে টাইমস্‌' পত্রিকার একটি সাক্ষাৎকারে প্রিন্স চার্লস বলেছেন যে, ভারতবাসীদের জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে এমন একটি 'অ-সাধারণ' ধারণা আছে, যেটা সত্যই বিস্ময়কর। "আমার মনে হয়, যদি আমরা বেশ কিছুকাল ঐ দেশে বাস করি এবং ভারতীয় দৃষ্টিতে সব কিছুকে দেখি, হয়তো আমরাও অনেক কিছু নূতন দেখতে পাব।" ভারতীয় দর্শনের যে একটি বিশিষ্ট অবদান আছে সে প্রসঙ্গে যুবরাজ বলেছেন যে, ঐরকম দেশে কাজ করতে না পেরে তিনি দুঃখিত। "আমার ধারণা যে, ভারতীয়দের চেয়ে আমাদের দেশের লোকেরা মৃত্যুকে অধিকতর ভয় করে। সে দেশের লোকেরা মৃত্যুকে এমন এক অদ্ভুত দৃষ্টি-ভঙ্গিতে গ্রহণ করেছে, যেটা আমাদের অর্থাৎ পাশ্চাত্যদের পক্ষে ধারণা করা কঠিন।"

উৎসব

সম্প্রতি কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি-আয়োজিত তিনটি অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়।

বিবেকানন্দ সোসাইটির ৮৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে গত ২৩ অগস্ট ১৯৮৫, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের সভাপতিত্বে এক আলোচনা-সভার আয়োজন হয়। প্রধান অতিথির ভাষণ প্রদান করেন স্বামী পুরাণানন্দ। সভার প্রারম্ভে স্বাগত-ভাষণ দেন সোসাইটির সভাপতি স্বামী নির্জরানন্দ।

গত ৯ সেপ্টেম্বর 'জাতীয় সংহতি ও শ্রীরামকৃষ্ণ' বিষয়ে 'সাধন চন্দ্র ঘোষ স্মারক বক্তৃতা' দেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন স্বামী নির্জরানন্দ।

গত ১১ সেপ্টেম্বর স্বামী অসক্তানন্দের সভাপতিত্বে স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো বক্তৃতার স্মরণ-সভায় ভাষণ দেন বিচারপতি শ্রীঅজিত নাথ রায় ও ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন

রাণীগঞ্জ বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্রের উদ্যোগে বিগত ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫ তারিখে স্থানীয় বাসন্তীদেবী গোয়েঙ্কা বিদ্যায়তনে সারা-দিনব্যাপী এক আঞ্চলিক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে রাণীগঞ্জ, আসানসোল, দুর্গাপুর ও চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি অঞ্চলের যুবপ্রতিনিধিবৃন্দ যোগদান করেন।

যুব প্রতিনিধিরা আবৃত্তি, সংগীত ও প্রশ্নোত্তরে অংশ গ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী ও আদর্শ সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন স্বামী মিত্রানন্দ, শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ, শ্রীতাপস বসু প্রমুখ বক্তাগণ।

পরলোকে

অধ্যাপক **পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়**

গত ১ অগস্ট প্রত্যূষে সিকড়াকুলীন গ্রামের শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রহ্মানন্দ ধামে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে হৃদ্‌রোগাক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তিনি অকৃতদার এবং আজীবন সংস্কৃতভাষা ও প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে অনুরক্ত ছিলেন। শ্রীরামপুর কলেজের সংস্কৃত বিভাগে তিনি প্রবীণ অধ্যাপক ছিলেন। বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি অবসর-জীবন যাপন করছিলেন এবং বিভিন্ন আশ্রমে বাস করে ভজন-পাঠ-প্রসঙ্গাদি নিয়ে কাটাতেন। তিনি বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ ছিলেন।

তাঁর দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করুক।

—বিশেষ দ্রষ্টব্য—

* অতঃপর বর্তমান পৃষ্ঠাসংখ্যা নিচে।

* পুনর্মুদ্রিত অংশের পৃষ্ঠাসংখ্যা উপরে।

২য় বর্ষ, ১৫-১৬শ সংখ্যা ● আশ্বিন ১৩০৭ (পৃষ্ঠা ৪৬০—৪৮৬)

UDBODHAN PUBLICATIONS (In English)

WORKS OF SWAMI VIVEKANANDA

MY MASTER
Price : Rs. 1,60

THE SCIENCE AND PHILOSOPHY OF RELIGION
Price : Rs. 3,00

RELIGION OF LOVE (12th Ed.)
Price : Rs. 5.00

CHRIST THE MESSENGER (9th Ed.)
Price . Rs. 1.25

A STUDY OF RELIGION
Price : Rs. 4,25

REALISATION AND ITS METHODS
Price : Rs. 3,00

SIX LESSONS ON RAJA YOGA
Price : Rs. 2,25

VEDANTA PHILOSOPHY (9th Ed.)
Page 63, Price : Rs. 3.00

WORKS OF SISTER NIVEDITA

THE MASTER AS I SAW HIM (13th Ed.)
Price : Rs. 16.00

CIVIC AND NATIONAL IDEALS (Sixth Edition)
Price : Rs. 7.00

SIVA AND BUDDHA (Sixth Edition)
Price : Rs. 1.50

HINTS ON NATIONAL EDUCATION IN INDIA (Sixth Edition)
Price : Rs. 6.00

AGGRESSIVE HINDUISM (Fifth Edition)
Price : Rs. 1.10

NOTES OF SOME WANDERINGS WITH THE SWAMI VIVEKANANDA (Sixth Edition)
Price : Rs. 7.50

BOOKS ON SRI RAMAKRISHNA

WORDS OF THE MASTER COMPILED BY SWAMI BRAHMANANDA
Price : Rs. 3.50

RAMAKRISHNA FOR CHILDREN (Pictorial) (Fourth Edition)
BY SWAMI VISHWASHRAYANANDA
Price : Rs. 6.50

BOOK ON VEDANTA

VEDANTA, ITS THEORY AND PRACTICE BY SWAMI SARADANANDA
Price : Re. 1.00

UDBODHAN OFFICE, 1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003

এ বৈষম্যের বিশেষ কারণও আছে। মধ্য-এশিয়া মূল প্রদেশ হইতে শৈশব মানবজাতির দুই শাখা, একটী ভারতবর্ষে, অন্য ইয়োরোপখণ্ডে প্রসারিত। ভারতাভিমুখী আর্য্যনামধারী তদিতরকে যবন বলিতেন। ইয়োরোপের প্রকৃতি কোমল, শান্ত। ফুল-সাজির ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ-পুঞ্জ, নাত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীমালা, দীর্ঘ উপদ্বীপগুলি যেন সমুদ্রগর্ভে রত্ন অন্বেষণে অর্দ্ধ নিমগ্ন রহিয়াছে। এ সৌন্দর্য্য একবার দেখিলে, মন আর ছাড়িতে চায় না। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির নিষ্ঠুরতাও বিদ্যমান। শীতপ্রাধান্যবশতঃ ভূমির উৎপাদিকাশক্তি অনায়াসফলপ্রদ নহে। এই চিত্তমোহিনী হৃদয়শূন্য বারবনিতার পদে যবন চিরবিক্রীত। তাহার একমাত্র উপাস্য—বহির্জগৎ; ফল,—অপরা বিদ্যা। হাজার উপাসনা করিয়াও, এ বহির্জগতের অন্ত পাইতেছে না। আপাত-সরলপ্রতীয়মান বাহ্য প্রকৃতির রূপমোহে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাকে যতই নাড়াচাড়া করিতেছে, দেখিতেছে ততই দুরারাধ্য। আর্য্যঋষিদিগের ভাগ্যচক্র অন্যপথে ঘূর্ণায়মান। ভারতীয় প্রকৃতি গম্ভীর, ধীর, স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিত। গগনস্পর্শী, তুষারকিরীট হিমাদ্রি উত্তরে সুদৃঢ় প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান, সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা, নর্ম্মদা অপরিমেয় জলরাশি লইয়া নৈরাশ্যকাতর কোন ভগ্নহৃদয়ার ন্যায় শনৈঃ সাগরসঙ্গমাভিমুখী, দুর্ভেদ্য দুর্গ সদৃশ সুবিস্তীর্ণ মহারণ্য, মরুভূমির অনবরুদ্ধ হাওয়া; মাঝে মাঝে প্রকৃতির বক্ষে ইন্দ্র ইন্দ্রাণীর অগ্নিক্রীড়া। এ সৌন্দর্য্যে আর্য্যঋষিদিগের চিত্ত প্রথমে আকৃষ্ট হইয়াছিল, সত্য; সে আকর্ষণশক্তির দুর্দ্দমনীয় প্রভাবে তাঁহারা প্রকৃতির দৃশ্যমান বহিঃস্তর ভেদ করিয়া, জড়শক্তির লীলার পশ্চাৎ চৈতন্যের কর্ত্তৃত্ব আরোপিত করিয়াছেন। এরূপ আরোপণ গাঢ় অনুরাগের ধর্ম্ম,—যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহাকে ভগবদ্ভাবে, মনের যতদূর দৌড়, ততদূর উচ্চতম আদর্শরূপে দেখা। মিত্র, ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য্য, অশ্বিনী প্রভৃতি দেবদেবীর উদ্দেশ্যে গীত বৈদিক মন্ত্র ঐ শ্রেষ্ঠ ভাবের বিকাশ। শুধু তাহাই নহে। ভারতবর্ষের সৌন্দর্য্যে কি এক অচিন্ত্য শক্তি নিহিত আছে, যাহা আগে দর্শকের চিত্ত আকৃষ্ট করে, পরে একটা ধাক্কা দিয়া যে কেন্দ্র হইতে প্রথমে চিত্তের বেগের আরম্ভ, সেই কেন্দ্রে চিত্তকে ফিরাইয়া দেয়। এই আকর্ষণ ও প্রতিঘাতের ফল,—ঋষিদিগের মন প্রথমে বহির্মুখী, পরে অন্তর্মুখী। প্রথমে, 'যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা', পরে, 'প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।' যখন বাহিরের জগৎ ছাড়িয়া দিয়া, তাঁহারা অন্তর্জগতের সত্যানুসন্ধানে কৃতসংকল্প হইলেন, তখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হেয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, অপরাবিদ্যার আলোচনায় সময় নষ্ট করা বৃথা, টুকরা টুকরা করিয়া পরিদৃশ্যমান অনন্ত বিশ্বকে কে জানিতে পারে? "হে ভগবন্, কাহাকে জানিলে এই সমস্ত একেবারে জানা যায়?" উত্তর আসিল, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" "আত্মনো বা অরে দর্শনেন ইদং সর্ব্বং বিদিতম্।"

তদবধি যবনেরা অপরাবিদ্যার উৎকর্ষসাধনে ব্যস্ত। পরাবিদ্যার আলোচনা ভারত-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় লইয়া অপরাবিদ্যার চর্চ্চায় অনেক কষ্ট ও সহিষ্ণুতা; ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় লইয়া পরাবিদ্যার আলোচনায় তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধ্যবসায় ও স্থৈর্য্যের আবশ্যক। সর্ব্বদা লোকে যে বিষয় দেখে, শোনে, তৎসম্বন্ধীয় সত্যানুসন্ধানে মানুষের বিশেষ কষ্ট

শ্রাবণ, ১৩১২ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সঃ

(কার্ত্তিক, ১৩১২, পৃঃ ৭২৫)

হয় না। যখন অতীন্দ্রিয় জগতের সত্য আবিষ্কার করিতে হয়, তখন অসাধারণ সাবধানতা ও চিত্তের একাগ্রতা দরকার; তদুপযোগী সময়ের অবসরও চাই। সুফলা মাতৃভূমির ক্রোড়ে নিশ্চিন্ত আর্য্যজাতির আত্মতত্ত্ব-অনুসন্ধানের সুবিধা বিশেষ; অনেকে সমস্ত জীবন এই ব্রতেই কাটাইতেন। আশ্রমচতুষ্টয়বিভক্ত প্রত্যেক জীবন প্রতিপদে এই মহদুদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর; উঠিতে, বসিতে ধর্ম্ম। নহিলে আজ ধর্ম্মশেখরের সর্ব্বোচ্চ আসন আর্য্যজাতির অধিকারে কেন?

যবনের প্রধান দুই প্রশাখা গ্রীক ও রোমান্। গ্রীকজীবনের জাতীয় উদ্দেশ্য বিশেষতঃ ভাস্করকার্য্যে, স্থপতিবিদ্যায় এবং সাহিত্যে। রোমানের রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, পরদেশবিজয় এবং উপনিবেশস্থাপনে। ঐ সমস্ত বিদ্যার চরম উৎকর্ষ সাধিত করিয়া, বার্দ্ধক্যে তাহাদের বীজ সমগ্র ইয়োরোপে ছড়াইয়া, গ্রীক এবং রোমান্ আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার শিক্ষকপদে বিরাজিত। ইয়োরোপীয় সভ্যতায় যা কিছু ভাল আছে, তাহার মূল উৎস গ্রীক ও রোমান্। ইয়োরোপের ঘর দুয়ার, কবির কল্পনা, সকলই গ্রীক ছাঁচে ঢালা। রাজধর্ম্ম রোমান্‌দিগের অনুকরণে। জীবনে যা করিতে হয়, তা করিয়া, এ দুই জাতি অন্তর্হিত হইয়াছে। কেবল ইহারা কেন,—সেই প্রাচীন আসিরিয়ান, ফিনিসিয়ান, বাবিলোনিয়ান, চালডিয়ান, ইজিপসিয়ান, জাতিরাই বা কোথায়? এক সময়ে ইহাদিগের বলদর্পে ধরিত্রী কম্পিতা ছিল। আজ তাহারা বিস্মৃতির অতল গর্ভে চিরনিমগ্ন।

না হইবেই বা কেন?

নশ্বর সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্ তেজনাশক, যেখানে একমাত্র অনুসন্ধেয় আপাতমধুর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, সেই মর্ত্ত্যলোক যে জাতির যথাসর্ব্বস্ব, তাহার মরণে বিলম্ব হয় না। অনিত্যের মধ্যে থাকিয়া, চিরজীবিত্ব আশা করা দুরাশা। আর সহস্র ঝটিকা ঝঞ্ঝাবাত, কত উপদ্রব, বিজাতীয় তাড়না মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তথাপি ভারতবাসী আমরা জীবিত, সংখ্যায় তেত্রিশ কোটি। তালপত্রবহ্নিবৎ কত জাতি দুদিনের জন্য আসিয়া চলিয়া গিয়াছে; হিন্দু অটল, অমর, মরিয়াও মরে না, কারণ অজ নিত্য আত্মজ্ঞান তাহার জীবনের ভিত্তি। পাশ্চাত্য জগৎ সাবধান, বিজ্ঞান-বলে হাজার আস্ফালন কর, জল মাটি বায়ু অগ্নি আমার শক্তির ক্রীড়াপুত্তলি বলিয়া যতই স্পর্দ্ধা কর, পাশববলে দুর্ব্বলের হৃদয়রুধিরপায়ী তুমি, তোমার মত যারা ছিল, তাদের যে দুর্গতির পথ, তোমারও শেষ তাই। আমাদিগের ভাগ্যগ্রহকে নমস্কার, যদাশ্রিত মাহেন্দ্র-যোগে পূর্ব্বপুরুষগণ বহির্দৃষ্টি সংযত করিয়া দৃষ্টি অন্তর্মুখী করিয়াছিলেন।

যখন আধুনিক সভ্যজাতির পূর্ব্বপুরুষ অরণ্যাশ্রয়, জন্তুর ন্যায় ছিলেন, প্রাচীনতম গ্রীক ও রোমান্ মনুষ্যসোপানের প্রথম ধাপে কেবল পদার্পণ করিতেছেন, যে অতীতের গাঢ় অন্ধকার ঐতিহাসিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ভেদ করিতে অসমর্থ, তখন আর্য্যজাতি ধর্ম্মপ্রান্তরের শেষ সীমায় উপস্থিত। ধর্ম্মজগতের চরম আবিষ্ক্রিয়া সমাপ্ত। অন্তর্জ্জগতের দুর্বোধ্য সত্য যে জাতি এত শীঘ্র স্বায়ত্ত করিলেন, বহির্জ্জগৎ যদি তাঁহাদের জীবনোদ্দেশ্য হইত, না জানি সে ক্ষেত্রে তাঁহারা কি মহদান্দোলন করিতেন। হয় নাই, আমাদেরই মঙ্গল।

ইহার পর বিস্তার। পৃথিবীর যেখানে প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া যা কিছু আছে, এই আর্য্যভূমি হইতে সত্যের অমৃত প্রবাহ শতমুখে বাহির হইয়া, তাহার জীবনী শক্তি প্রদান করিয়াছে।

(৮৭তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, পৃঃ ৭২৬)

একবার নহে, বারবার। জারক্সিসের আক্রমণ, আলেক্জাণ্ডারের দিগ্বিজয়, আরাবদিগের সহিত বাণিজ্যসম্পর্ক, যখনই যে সূত্রে ভারতবর্ষের সহিত বাহিরের অন্যদেশের মিলন ঘটিয়াছে, তখনই ভারতের ধর্ম্মসম্পত্তি তাহাদের ধর্ম্মাভাবের পূরণ করিয়াছে। বর্ত্তমান ইউরোপীয় দর্শন গ্রীক দর্শন-অবলম্বনে গঠিত। সেই গ্রীক-দর্শন ভারতীয় আত্মজ্ঞানের প্রতিধ্বনি। থেল্স, গরগিয়াস, পিথাগোরাস, প্লেটো, আর্য্যঋষিদেরই রূপান্তর। খৃষ্টধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের অসম্পূর্ণ অনুকরণ। মুসলমান-দিগের ধর্ম্ম, আর খৃষ্টধর্ম্মের, পার্থক্য নাই বলিলেই হয়। উত্তমর্ণ হিন্দুধর্ম্মের অকৃতজ্ঞ বিশ্বাস-ঘাতক অধমর্ণ হ'চ্চে জগৎ-ব্যাপী বৌদ্ধধর্ম্ম। ভারতের বিজয়পতাকা ধর্ম্মরাজ্যে উড্ডীয়মান, তুরীভেরিনিনাদিত অসিঝনৎকারবিঘোষিত জয়পরাজয় সকলে বোঝে, দেখে, ঐতিহাসিকরাও তাহার উল্লেখ করেন। কিন্তু ভারতের যুদ্ধ, বিগ্রহ, সন্ধি, অন্তর্জগতে ; অস্ত্র—প্রীতি, সহিষ্ণুতা ; সর্ব্ব ক্ষেত্রে শেষ জয় ভারতের। নিঃশব্দে ভারতীয় চিন্তাশক্তি অন্য জাতির ধর্ম্মচিন্তা চালিত করিয়াছে। কেবল অশোকের সময় বহ্বাড়ম্বরসম্বলিত মহাসমারোহের সহিত এই ধর্ম্মপ্রচার সাধিত হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

আসামের কথা।

[বাবু প্রবোধচন্দ্র দে লিখিত। পৃষ্ঠা ৪৬৪ থেকে ৪৭০ পর্যন্ত।—বর্তমান সম্পাদক।]

বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ।

আশ্চর্য্য মৎস্য।—দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরভাগে সুরিনামের নদী ও পুষ্করিণীতে এক প্রকার অদ্ভুত মৎস্য পাওয়া যায়। ইহার নাম জিম্নোটাস্। ইহারা এরূপ তড়িৎ-শক্তি-বিশিষ্ট যে, সহজেই অপর প্রাণীকে বধ করিতে পারে। ক্ষুধার্ত্ত জিম্নোটাস্ মৎস্য দেখিতে পাইলেই তাহার দিকে ধাবিত হয় ও স্বীয় অদ্ভুত শক্তির প্রভাবে আক্রান্ত মৎস্যের দেহে তাড়িত-প্রবাহ সঞ্চালিত করিয়া বধ করিয়া উহাকে ভক্ষণ করে। ক্যাপ্টেন্ ষ্টেড্ম্যান বলেন যে, তিনি একটী জিম্নোটাস্ ধরিবার জন্য বিংশতিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রত্যেকবার এরূপ আহত হন যে, তাঁহাকে অবশেষে নিরস্ত হইতে হয়। বিখ্যাত জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক ব্যারণ হাম্বোল্ট তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থে আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণ কিরূপে এই মৎস্য সংগ্রহ করে, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। যে জলাশয়ে জিম্নোটাস্ বাস করে, তাহারা তন্মধ্যে একদল বন্য অশ্ব তাড়াইয়া লইয়া যায়। মৎস্য সমূহ উত্তেজিত হইয়া অশ্বগণকে বারম্বার আক্রমণ করিয়া তাড়িত-শক্তি নিঃশেষিত করিয়া যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন সহজেই ধৃত হয়।

কাচ ও হাইড্রোফ্লুয়োরিক এসিড।—ক্যাল্সিয়ম্ ফ্লুয়োরাইড নামক খনিজ পদার্থ চূর্ণ করিয়া, তাহার সহিত গন্ধক-দ্রাবক মিশ্রিত করিলে "হাইড্রোফ্লুয়োরিক্ এসিড্ গ্যাস" নামক বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন হয়। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে গেলসাক ও থিনার্ড এই যৌগিক পদার্থ বিশুদ্ধরূপে

(কার্ত্তিক, ১৩১২, পৃঃ ৭২৭)

প্রস্তুত করেন। ইহার বিশেষ গুণ এই যে, ইহার সংস্পর্শে কাচ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এইজন্য কাচের উপর কোন চিত্র খোদিত করিতে হইলে, এই গ্যাস ব্যবহৃত হয়। প্রথমে কিঞ্চিৎ মোম গলাইয়া, কাচখানি সমভাবে আচ্ছাদিত করিয়া, ছুরির দ্বারা মোম কাটিয়া চিত্র অঙ্কিত করিতে হয়। তৎপরে এক সিসার পাত্রে ক্যালসিয়াম্ ফ্লুয়োরাইড্ চূর্ণের সহিত গন্ধক-দ্রাবক মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করিলে যখন গ্যাস্ বহির্গত হইবে, তখন ঐ কাচখানি পাত্রের উপর কিয়ৎকাল রাখিয়া মোম তুলিয়া ফেলিলে চিত্রটী কাচের উপর দৃষ্ট হইবে।

দ্রব ফ্লুয়োরিন্।—হাইড্রোফ্লুয়োরিক্ এসিড্, হাইড্রোজেন ও ফ্লুয়োরিন্ নামক মূল পদার্থের রাসায়নিক সংমিশ্রণে গঠিত। কিন্তু ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বহু চেষ্টা সত্ত্বেও রসায়নবেত্তাগণ এই যৌগিক পদার্থ হইতে ফ্লুয়োরিন্ গ্যাস বিশ্লিষ্ট করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ এই যে, জড়রাজ্যে ফ্লুয়োরিনের প্রভাব এতই অধিক যে, ইহাকে বিভিন্ন করিতে হইলে বিশেষ পারদর্শিতা ও উৎকৃষ্ট যন্ত্রের আবশ্যক। অবশেষে সুবিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক মোয়াসাঁর গভীর গবেষণার ফলে ফ্লুয়োরিন্ গ্যাস পৃথক রূপে সংগৃহীত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রফেসার মোয়াসাঁ ডিউয়ার দ্রব বায়ুর সাহায্যে এই গ্যাসকে দ্রবীভূত করিতে সমর্থ হন। এই দ্রব অবস্থায় ফ্লুয়োরিন্ বরফ অপেক্ষা ১৮৭ ডিগ্রি শীতল। বায়বীয় অবস্থায় ফ্লুয়োরিনের সংসর্গে আসিলে কয়লা, গন্ধক, লৌহ প্রভৃতি তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত হয়। ফ্লুয়োরিন্ দ্রবীভূত হইলে আর এই সকল দ্রব্যের সহিত মিলিত হয় না। কিন্তু হাইড্রোজেন গ্যাস ফ্লুয়োরিনের সংস্পর্শে আসিলেই জ্বলিয়া উঠে; একবিন্দু দ্রব গ্যাস কাষ্ঠের উপর পড়িলেই উহা প্রজ্বলিত হয়। একই পদার্থের অবস্থাভেদে গুণান্তর কত অধিক।

সমালোচনা।

['পদার্থবিদ্যা' এবং 'স্মৃতিসুলভ ভারতেতিহাস'। পৃষ্ঠা ৪৭১ থেকে ৪৭২ পর্যন্ত।—বর্তমান সম্পাদক।)

ভগবদ্‌গীতা-শঙ্করভাষ্যানুবাদ।

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত)

[গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ৮ সংখ্যক ভাষ্যের শেষাংশের অনুবাদ এবং ৯-১৫ সংখ্যক শ্লোকের মূল, অন্বয়, মূলের অনুবাদ, ভাষ্য ও ভাষ্যের অনুবাদ এবং ১৬ সংখ্যক শ্লোকের মূল, অন্বয়, মূলের অনুবাদ, ভাষ্য ও ভাষ্যের প্রথমাংশের অনুবাদ।—বর্তমান সম্পাদক।]

উদ্বোধন

২য় বর্ষ।] ১৫ই আশ্বিন। (১৩০৭ সাল) [১৬শ সংখ্যা

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত

জ্ঞানযোগ।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত রাজযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ নামক ইংরাজী পুস্তকত্রয়ের বঙ্গানুবাদ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। জ্ঞানযোগের বঙ্গানুবাদ ১লা কার্ত্তিক হইতে উদ্বোধনের প্রতি সংখ্যায় এক ফর্ম্মা করিয়া দিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। উদ্বোধনের গ্রাহক মহাশয়গণ উহা খুলিয়া যাহাতে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বাঁধাইতে পারেন, এইরূপ ভাবে উদ্বোধনে উহা সন্নিবিষ্ট থাকিবে। জ্ঞানের চর্চ্চা বঙ্গদেশে অতি বিরল। অনেকের আবার জ্ঞানের উপর বিজাতীয় বিদ্বেষ দেখা যায়। ইহার প্রধান কারণ—জ্ঞান কি, সাধারণে সেই বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ। এই জ্ঞানের ভিতর যে অতি সুন্দর কবিতা আছে, তাহা স্বামীজি তাঁহার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা দ্বারা ইয়ুরোপীয় ও আমেরিকান্ বুধমণ্ডলীর নিকট প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই সকল বক্তৃতার সময়ে বক্তা অনেক সময় এতদূর উত্তেজিত হইতেন যে, শ্রোতৃ-মণ্ডলী আপনাদের সভ্যতাসুলভ অভিমান ভুলিয়া প্রবল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন, কখন বা আপনাদের হৃদয়স্থিত ব্রহ্মকে করামলকের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইতেন। হে বঙ্গভাষাভিজ্ঞগণ; আপনারাও যাহাতে সেই সকল তত্ত্বামৃত সম্ভোগ করিতে পারেন, যাহাতে আপনারাও সেই মায়াবাদের যুক্তিপূর্ণ গভীর রহস্য, মুক্তির প্রকৃত তত্ত্ব, সংসার ও সন্ন্যাসের সম্বন্ধ, অদ্বৈতবাদের প্রকৃত ব্যাখ্যা, উহার যুক্তি এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অদ্বৈতজ্ঞান কিরূপে কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে, অর্থাৎ 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া' কিরূপে কার্য্য করা যাইতে পারে, তাহার তত্ত্ব—মোট কথা, জ্ঞানযোগ-সম্বন্ধীয় আবশ্যকীয় সমুদয় প্রাচীন শাস্ত্রীয় তত্ত্ব বর্ত্তমান বিজ্ঞানের আলোকে অতি সহজভাবে বুঝিতে পারেন, যাহাতে আবালবৃদ্ধবণিতা অতি-সামান্য মনঃ-সংযোগেই শাস্ত্রীয় জটিল ও কূট তত্ত্ব সকলও অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তজ্জন্য আমাদের এই উদ্যম। এই জ্ঞানযোগ কর্ম্ম, যোগ ও ভক্তির চূড়া স্বরূপ। অথচ ইহা এত সরল যে, কেবল পাঠমাত্র করিলেই হৃদয়ে অপূর্ব্ব উদ্দীপনা উপস্থিত হইবে—বৈরাগ্যের ভাবে হৃদয় উদ্বেল হইবে এবং অদম্য কার্য্যকারিতা উপস্থিত হইবে।

অম্বা-স্তোত্রম্।

শ্রীমৎ স্বামিবিবেকানন্দ-বিরচিতম্। (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কর্ত্তৃক অনুবাদ সহিত)

(১)

কা ত্বং শুভে শিবকরে সুখদুঃখহস্তে
আঘূর্ণিতং ভবজলং প্রবলোর্ম্মিভঙ্গৈঃ।
শান্তিং বিধাতুমিহ কিং বহুধা বিভগ্নাম্
মাতঃ প্রযত্নপরমাসি সদৈব বিশ্বে॥

(কার্ত্তিক, ১৩১২, পৃঃ ৭২১)

তুলি ঘোর ঊর্ম্মিভঙ্গে, মহাবর্ত্ত তার সঙ্গে,
এ ভব সাগরে কে মা খেলিতেছ বল না ?
শিবময়ী মূর্ত্তি তোর, শুভঙ্করি এ কি ঘোর,
সুখ দুঃখ ধরি করে কর সবে ছলনা !
এত কি তোমার কায, সদা ব্যস্ত বিশ্বমাঝ,
অশান্ত ধরায় কি গো শান্তি দান বাসনা ?

(২)

সম্পাদয়ন্নবিরতং অবিরামবৃত্তা
যা বৈ স্থিতা কৃতফলং অকৃতস্য নেত্রী।
সা মে ভবত্বনুদিনং বরদা ভবানী
জানাম্যহং ধ্রুবমিদং ধৃতকর্ম্মপাশা ॥

যে ছিঁড়েছে কর্ম্মপাশ, তারে করি চির দাস,
নিত্য শান্তিসুধারাশি পিয়াতেছ জননি,
কার্য্য করি ফল চায়, কৃত ফল দিতে তায়,
সদাই আকুল তুমি ওগো হরঘরণি,
জানি মা তোমায় আমি, কর্ম্মপাশে বাঁধ তুমি,
বেঁধো না বরদে মোরে, নাশ দুঃখরজনী।

(৩)

কো বা ধর্ম্মঃ কিমকৃতং ক কাপাললেখঃ
কিম্বাদৃষ্টং ফলমিহাস্তি হি যদ্বিনা ভোঃ।
ইচ্ছাপাশৈ র্নিয়মিতা নিয়মাঃ স্বতন্ত্রৈঃ
যস্যা নেত্রী ভবতু সা শরণং মমাদ্যা ॥

কি কারণে কার্য্যচয়, জগতে প্রকট হয়,
সুকৃত দুষ্কৃত কিম্বা ললাট লিখিত রে,
কেহ না দেখিয়া কুল, কহয়ে অদৃষ্ট-মূল,
ধর্ম্মাধর্ম্মে সুখদুঃখ এ নহে নিশ্চিত রে,
স্বতন্ত্র বিধানে যাঁর, বদ্ধ আছে এ সংসার,
সে মূল শক্তির আমি সদাই আশ্রিত রে।

(৪)

সন্তানয়ন্তি জলধিং জনিমৃত্যুজালং
সম্ভাবয়ন্ত্যবিকৃতং বিকৃতং বিভগ্নম্।
যস্যা বিভূতয় ইহামিতশক্তিপালাঃ
নাশ্রিত্য তাং বদ কুতঃ শরণং ব্রজামঃ ॥

(৮৭তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, পৃঃ ৭০০)

যাঁহার বিভূতিচয়,　　লোকপাল সমুদয়,
যাঁদের অমিত শক্তি কোন বাধা মানে না,
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি,　　যে সাগরে নিরবধি,
সে অনন্ত জলনিধি যাঁহাদের রচনা,
প্রকৃতি বিকৃতিকারী,　　এই সব কর্ম্মচারী,
যাঁর বলে বলীয়ান্, কর তাঁরি অর্চ্চনা।

(৫)

মিত্রে শত্রৌ অবিষমং তব পদ্মনেত্রম্
স্বস্থে দুঃস্থে স্ববিতথং তব হস্তপাতঃ।
মৃত্যুচ্ছায়া তব দয়া অমৃতঞ্চ মাতঃ
মা মাং মুঞ্চন্ত পরমে শুভদৃষ্টয়স্তেঃ ॥

মা তোমার কৃপাদৃষ্টি,　　সমভাবে সুধাবৃষ্টি,
শত্রু মিত্র সকলের উপরেই করে গো,
সমভাবে ধনী দীনে,　　রক্ষা কর নিশি দিনে,
মৃত্যু বা অমৃত, দুয়ে তব কৃপা ঝরে গো,
যাচি পদে নিরুপমে,　　ভুলো না মা এ অধমে,
শুভ দৃষ্টি তব যেন সর্ব্ব তাপ হরে গো ॥

(৬)

কাম্বা সর্ব্বা ক গৃণনং মম হীনবুদ্ধেঃ
ধর্ত্তুং দোর্ভ্যামিব মতি র্জগদেকধাত্রীম্।
শ্রীসঞ্চিন্ত্যং সুচরণং অভয়প্রতিষ্ঠম্
সেবাসারৈ রভিনুতং শরণং প্রপদ্যে ॥

বিশ্বপ্রসবিণী তুমি,　　ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীব আমি,
করিব তোমার স্তুতি বৃথা এই কল্পনা।
সীমাহীন দেশকালে,　　ধ'রে আছ বিশ্বজালে,
তোমায় ধরিতে হাতে উন্মাদের বাসনা,
অকিঞ্চন ভক্তধন,　　রমাভাব্য যে চরণ,
সে পদে শরণ পাই এই মাত্র কামনা।

(৭)

যা মামাজন্ম বিনয়ত্যতিদুঃখমার্গৈঃ
অসংসিদ্ধেঃ স্বকলিতৈর্ললিতৈর্বিলাসৈঃ
যা মে বুদ্ধিং সুবিদধে সততং ধরণ্যাং
সাম্বা সর্ব্বা মম গতিঃ সফলেঽফলে বা ॥

স্বরচিত লীলাগার,　　মনোহর এ সংসার,
সুখ দুঃখ লয়ে যথা নানা খেলা খেলিছ,

(কার্ত্তিক, ১৩১২ পৃঃ ৭০১)

পূর্ণজ্ঞান দিবে তাই, জন্ম হতে সুখ নাই,
দুঃখ পথ দিয়া মোর করে ধরি চলিছ,
সফল নিষ্ফল হই, কভু বুদ্ধিহারা নই,
তোমারি প্রসাদে তুমি সদা মোরে রাখিছ,
তুমি গতি মোর তাই স্নেহে মাগো পালিছ।
ইতি শ্রীমদ্বিবেকানন্দস্বামিপাদবিরচিতং অম্বাস্তোত্রং সমাপ্তম্।

গীতা-তত্ত্ব।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ সঙ্কলিত।)

আজকাল গীতার চর্চ্চা সর্ব্বত্র। কি পাশ্চাত্যপ্রদেশে, কি এতদ্দেশে গীতার নাম শুনেন নাই, এমন লোক অতি বিরল। এই গীতা কত বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হইল, আর ইহার উপর কত ভাষ্যটীকা টিপ্পনী হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। গীতা হিন্দুর বাইবেল, এ কথা কিছুমাত্র অত্যুক্তি নহে, গীতাব্যাখ্যাত সত্যগুলি এত উদার যে, অনেক অন্যধর্ম্মাবলম্বী গীতাকে খ্রীষ্টধর্ম্ম হইতে গৃহীত বা তদ্ধর্ম্মানুপ্রাণিত বলিয়াও অনুমান করিয়াছেন। যাহা হউক, এই সর্ব্বদেশপূজিত, শত্রুমিত্রসমাদৃতা অমৃতময়ী গীতা সম্বন্ধে কোন আচার্য্য তচ্ছিষ্যগণকে যে সংক্ষিপ্ত উপদেশ প্রদান করেন, আমরা তাহা যথাসাধ্য উদ্ধৃত করিলাম। এ বিষয়ে আমাদের কোন মতামত নাই। কেবল সুধীবর্গের চিন্তার জন্য এই উপদেশ সঙ্কলিত হইল।

"গীতাগ্রন্থখানি মহাভারতের অংশ বিশেষ। ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে কয়েকটী বিষয় জানা আবশ্যক। ১ম,—গীতাটী মহাভারতের ভিতর প্রক্ষিপ্ত, অথবা বেদব্যাসপ্রণীত? ২য়,—কৃষ্ণ নামে কেহ ছিলেন কি না? ৩য়,—যে যুদ্ধের কথা গীতায় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যথার্থ ঘটিয়াছিল কি না? ৪র্থ,—অর্জ্জুনাদি যথার্থ ঐতিহাসিক কি না? প্রথমতঃ, সন্দেহ হইবার কারণগুলি বুঝাইয়া দেওয়া যাউক। ১ম,—বেদব্যাস নামে অনেকে ছিলেন, তন্মধ্যে বাদরায়ণ ব্যাস বা দ্বৈপায়ন ব্যাস কে ইহার প্রণেতা? ব্যাস একটী উপাধিমাত্র। যিনি কোন পুরাণাদি শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তিনিই ব্যাসনামে পরিচিত। যেমন, বিক্রমাদিত্য—এই নামটীও একটী সাধারণ নাম। আরও, শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য করিবার পূর্ব্বে গীতা-গ্রন্থখানি সর্ব্বসাধারণে ততদূর পরিচিত ছিল না। তাঁহার পরেই গীতা সর্ব্বসাধারণে বিশেষরূপে পরিচিত হয়। অনেকে বলেন, গীতার বৌধায়ন ভাষ্য পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। একথা প্রমাণিত হইলে গীতার প্রাচীনত্ব ও ব্যাসকর্ত্তৃত্ব কতকটা সিদ্ধ হয় বটে; কিন্তু বেদান্তদর্শনের যে বৌধায়ন ভাষ্য ছিল, যাহা হইতে রামানুজ শ্রীভাষ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন, শঙ্করের ভাষ্যেও যাঁহার নাম ও যাঁহার ভাষ্যের অংশবিশেষ পাওয়া যায়, যাহার কথা লইয়া দয়ানন্দ স্বামী প্রায়ই নাড়াচড়া করিতেন, তাহা আমি সমুদয় ভারতবর্ষ খুঁজিয়া এপর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, রামানুজও অপর লোকের হস্তে একটী কীটদষ্ট পুঁথি দেখিয়া তাহা হইতে তাঁহার ভাষ্য রচনা করেন। বেদান্তের বৌধায়ন ভাষ্যই যখন এতদূর অনিশ্চিতত্বের অন্ধকারে, তখন গীতা সম্বন্ধে তৎকৃত ভাষ্যের উপর কোন প্রমাণ স্থাপন করিতে চেষ্টা বৃথা প্রয়াসমাত্র। অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে, গীতাখানি শঙ্করাচার্য্য প্রণীত। তিনি উহা প্রণয়ন করিয়া মহাভারতের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন।

(৮৭ তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, পৃঃ ৭৩২)
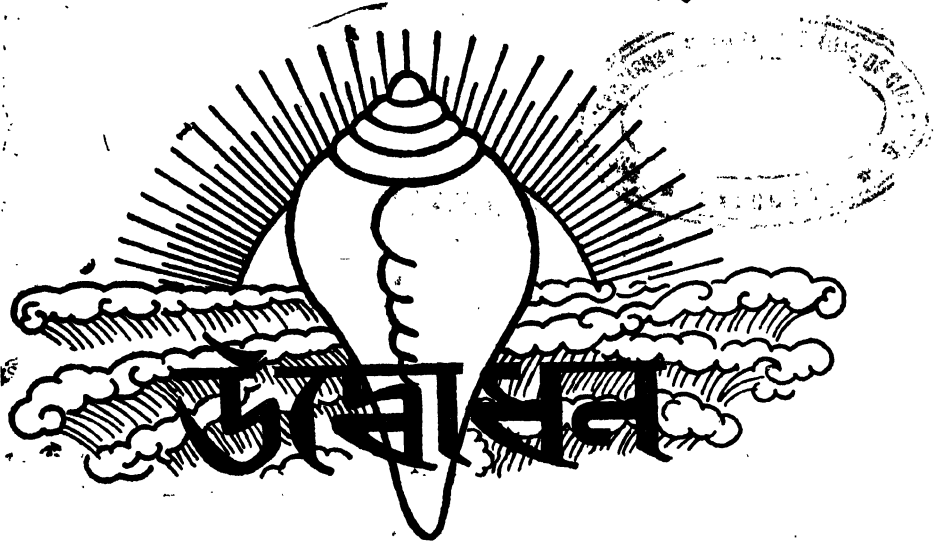
৮৭তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, ১৩৯২

দিব্য বাণী

যদি ঈশ্বর থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই জগতের নিমিত্ত- ও উপাদান-কারণ। তিনি যে কেবল স্রষ্টা—তাহাই নহে, সৃষ্ট কার্যও তিনি। তিনি স্বয়ং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। ইহা কিরূপে সম্ভব? শুদ্ধ আত্মা ঈশ্বরই কি জীবজগতে পরিণত হইয়াছেন? হাঁ, তবে আপাতদৃষ্টিতে। অজ্ঞ ব্যক্তিরা যাহাকে বিশ্ব-সংসাররূপে গ্রহণ করে, তাহার কোন প্রকৃত সত্তা নাই। তাহা হইলে তুমি, আমি এবং অন্যান্য দৃষ্ট বস্তুসমূহ কি? সব কেবল আত্মসম্মোহন—প্রকৃতপক্ষে অনন্ত অসীম নিত্যমঙ্গলময় সত্তাই একমাত্র সত্তা। এই সত্তাতেই আমরা এই-সকল স্বপ্ন দেখি। তিনিই আত্মা—সকল বস্তুর ঊর্ধ্বে, অনন্ত অসীম, সকল জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের ঊর্ধ্বে। তাঁহারই মধ্যে, তাঁহারই মাধ্যমে আমরা বিশ্বকে দেখি। তিনিই একমাত্র সত্তা।… তিনিই সকল বস্তু, কেবল ঐগুলির বিশেষ বিশেষ বিভিন্ন নাম ও রূপ তাঁহাতে নাই।…বৈদান্তিক তাঁহাকে পুরুষও বলেন না, নারীও বলেন না—এই-সকল বর্ণনাই কল্পনা, মনুষ্য-মস্তিষ্কজাত মোহ-ভ্রান্তি মাত্র; প্রকৃতপক্ষে আত্মার মধ্যে নরনারী-ভেদ নাই। যাহারা মোহগ্রস্ত ভ্রান্ত, যাহারা পশুবৎ, তাহারাই কেবল নারীকে নারী, পুরুষকে পুরুষরূপে দর্শন করে। যাঁহারা সব-কিছুর ঊর্ধ্বে, তাঁহারা নরনারীর মধ্যে ভেদ করিবেন কিরূপে? সকল বস্তু, সকল জীবই আত্মা—লিঙ্গবিহীন, শুদ্ধ, চিরমঙ্গলময় আত্মা।

—স্বামী বিবেকানন্দ

['স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা', ২য় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ৩০৩—৩০৪]
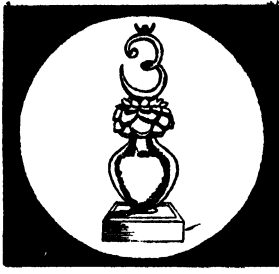
কথাপ্রসঙ্গে

ব্যবহারিক জীবনে বেদান্তের প্রয়োগ

বেদান্তদর্শনের তত্ত্বগুলি খুবই উচ্চ। এই তত্ত্বগুলি দৈনন্দিনজীবনে কিভাবে প্রয়োগ করা যায়, তাহা লইয়াই যত সমস্যা। বেদান্তদর্শনের তত্ত্বগুলি যত সু-উচ্চই হউক না কেন, তাহা যদি বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে তাহার মূল্য আমাদের কাছে কিছুমাত্রই নাই। উচ্চ তত্ত্বগুলির চিন্তন দ্বারা বুদ্ধির কিছু ব্যায়াম হইতে পারে, কিন্তু তাহা আমাদের কি কাজে লাগিবে? ব্যবহারিক ও কাল্পনিক জগতে দুস্তর ভেদ আছে। কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিক ও কাল্পনিক জগতের মধ্যে ভেদ করিলে চলিবে না, ভেদ দূর করিতে হইবে। কারণ বেদান্ত এক অখণ্ড বস্তু সম্বন্ধে উপদেশ দেন। বেদান্ত বলেন, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই সমস্ত জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্মই। এই মহান্ তত্ত্ব দ্বারা আমাদের জীবনকে আচ্ছাদিত করিতে হইবে, আমাদের প্রত্যেক চিন্তার ভিতর যেন ঐ তত্ত্ব প্রবেশ করে এবং কার্যে যেন উহার প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

পর্বতগুহা ও নিবিড় অরণ্য হইতে এই তত্ত্বকে কর্মমুখর নগরীর রাজপথে লইয়া আসিতে হইবে। বর্তমানে ইহাই আমাদের সাধনা। কর্মময় জীবনের মধ্য দিয়া আমাদের মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ—ব্রহ্ম উপলব্ধি করা—তাহাই করিতে হইবে।

একটি কথা এখানে উল্লেখ্য, বেদান্তের উচ্চ-তত্ত্বগুলি পর্বতগহ্বরে বা অরণ্যের মুনিঋষির দ্বারা অধিকাংশ আবিষ্কৃত হয় নাই, পরন্তু কর্মে সদা ব্যস্ত সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজাদের দ্বারাই আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে একটি উদাহরণ দিলে ইহা বোঝা যাইবে। ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে: আরুণি নামে এক ঋষি অরণ্যে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতু একদিন পঞ্চাল-জনপদের রাজা জৈবলির নিকট গমন করেন। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মৃত্যুকালে প্রাণিগণ কিরূপে এই লোক হইতে গমন করে, তাহা কি তুমি জানো?' বালক শ্বেতকেতু উত্তর দিল, 'না'। 'তুমি কি পিতৃযান ও দেবযানের বিষয় অবগত আছ?' রাজা এইরূপে তাহাকে আরও বহু প্রশ্ন করিলেন। শ্বেতকেতু কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। রাজা জৈবলি বলিলেন, 'তুমি কিছুই জানো না।' বালক পিতা আরুণির নিকটে গিয়া সবিস্তারে সব বলিল। আরুণি বলিলেন, 'আমিও ঐসকল প্রশ্নের উত্তর জানি না। যদি জানিতাম, তাহা হইলে তোমাকে তাহা নিশ্চয়ই শিখাইতাম।' আরুণি জৈবলির নিকট গমন করিয়া এই রহস্যবিদ্যা শিখাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তখন রাজা জৈবলি বলিলেন, 'এই বিদ্যা—এই ব্রহ্মবিদ্যা কেবল রাজারাই জানে, যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণেরা কখনই ইহা জানিতেন না।' যাহা হউক, তিনি এ-সম্বন্ধে যাহা জানিতেন, তাহা আরুণিকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এইরূপে আমরা অনেক উপনিষদ্ হইতে জানিতে পারি যে, বেদান্তের উচ্চতত্ত্বগুলি কেবল অরণ্যে ধ্যানলব্ধ নয়, পরন্তু

ইহা সাংসারিক কার্যে বিশেষ ব্যস্ত ব্যক্তিদের দ্বারাই চিন্তিত ও প্রকাশিত।

অতএব বেদান্তের উচ্চতত্ত্বগুলি দৈনন্দিন-জীবনে প্রয়োগ করিতে ভীত হইবার কিছুই নাই। পূর্ব পূর্ব যুগে মহা কর্মব্যস্ত সাংসারিক ব্যক্তিরা যাহা পারিয়াছিলেন, বর্তমানেও তাহা পারা যাইবে। পূর্ব ব্যক্তিরা যেমন বেদান্তের আদর্শে জীবনগঠন করিয়া জীবনযাপন করিয়াছিলেন, বর্তমানেও তাহা করা সম্ভব। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ উচ্চ আদর্শগুলির দ্বারা জীবনগঠন করিয়া জীবনযাপন করিয়াছিলেন। স্বামীজী ইহা বারবার আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়া আমাদের ঐ আদর্শে জীবন-গঠন করিবার জন্য অনুপ্রাণিত করিয়াছেন।

আমাদের জীবন কর্মমুখর। কর্মকে বাদ দিয়া আমরা এক পাও অগ্রসর হইতে পারিব না। অতএব ইহারই মধ্যে থাকিয়া আমাদের বেদান্ত-দর্শনের মূলতত্ত্ব অনুভব করিতে হইবে। তবে ইহা সহজে হইবে না। ইহাতে কৃতকার্য হইতে অসীম ধৈর্যসহকারে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। বেদান্তের সর্বোৎকৃষ্ট ভাষ্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রে এই দর্শনের উপদেশ দিতেছেন, 'তীব্র কর্মশীলতা, কিন্তু তাহার মধ্যে আবার শান্তভাব।' এই তত্ত্বকে 'কর্মরহস্য' বলা হইয়াছে, এই অবস্থালাভই বেদান্তের লক্ষ্য। ইহা দ্বারা যেন আমরা না বুঝিয়া থাকি যে, নিশ্চেষ্টভাবে থাকাই ঐ অবস্থা লাভ করা। তাহা হইলে আমাদের চারিপাশের দেওয়ালগুলি মহা-জ্ঞানী হইত। কিন্তু তাহা তো হয় নাই, উহারা জড়পদার্থ দেওয়ালই আছে। গীতাশাস্ত্র বলেন: তুমি প্রচণ্ড কর্ম কর, কিন্তু কর্মের মধ্যে নিজেকে জড়াইয়া ফেলিও না। কর্মের মধ্যে ধীর শান্ত-ভাবে অবস্থান কর। চিত্তচাঞ্চল্য যেন না ঘটে। চিত্তের সমতা আনয়ন কর। এখানে হয়তো প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কার্যে আকর্ষণ অনুভব না করিলে কিভাবে কাজ করা যাইতে পারে? ইহা ভ্রান্ত প্রশ্ন। কারণ অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন, উত্তেজিত হইয়া কর্ম করিলে তাহা কর্ম না হইয়া অকর্মই হয়। যে ব্যক্তি যত শান্ত ধীর সে ব্যক্তি তত বেশি কাজ করিতে পারেন। হৃদয়াবেগের দ্বারা তাড়িত হইয়া কর্ম করিলে, তাহাতে বৃথা শক্তি ক্ষয় হয়। হৃদয়াবেগ সংযত করিয়া যদি আমরা কাজ করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের দ্বারা বড় কাজ হইবে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বড় বড় মহাপুরুষদের দিকে লক্ষ্য করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, তাঁহারা শান্তপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন বলিয়াই তাঁহারা জগৎকল্যাণের জন্য প্রচুর কাজ করিতে পারিয়াছিলেন।

বেদান্তের সিদ্ধান্ত: তুমি শুদ্ধস্বভাব ও সর্বজ্ঞ। 'তত্ত্বমসি'—তুমিই সেই ব্রহ্ম আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। আত্মাকে কেহ মারিতে পারে না। আত্মার জন্মমৃত্যু ভাবনাটাই কুসংস্কার। এই সব কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইবার জন্য বেদান্ত মানুষকে অভীঃ হইতে বলেন। বেদান্ত বলেন: নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। যে নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না, সেই নাস্তিক। তুমি আত্মা। তুমি সর্বশক্তিমান। তুমি অনন্তশক্তির অধিকারী। তোমার কোন লিঙ্গালিঙ্গ ভেদ নাই। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, জাতিভেদ প্রভৃতি রূপ ভেদ তোমাতে নাই। এই একত্ব বা অখণ্ডভাব অনুভব করিতে হইবে। বেদান্ত আমাদের এই সাহসই দেন।

কোনরকম দুর্বলতার স্থান নাই এখানে। 'আমি দুর্বল', 'আমার দ্বারা ইহা হইবে না', 'আমি অপবিত্র'—এসব বলা নাস্তিকের মতো কথা বলা। এইভাবে কথা বলিতে বেদান্ত আমাদের কখনও শেখান না। বেদান্ত কখনও পাপ স্বীকার

করেন না, ভ্রম স্বীকার করেন। এবং বলেন, ইহাই সর্বাপেক্ষা ভ্রম নিজেকে দুর্বল, পাপী, হতভাগ্য জীব বলা। নিজেকে দুর্বল, পাপী প্রভৃতি ভাবিবার অর্থ হইতেছে, আরও সংসার-বন্ধন-শৃঙ্খলে নিজেকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করা। বেদান্ত পড়িয়া যদি উপরি-উক্ত ভ্রম নাশ করিবার সাহস আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত না হয়, তাহা হইলে বেদান্ত পড়া বৃথা। তাই স্বামীজী তাঁহার বৈদান্তিক শিষ্য শরচ্চন্দ্রকে বলিতেছেন, 'বেদান্ত পড়ে কেবল কি হবে? Practical life-এ (কর্মজীবনে) শুদ্ধ অদ্বৈতবাদের সত্যতা প্রমাণিত করতে হবে।…ঘরে-ঘরে, মাঠে-ঘাটে, পর্বতে-প্রান্তরে এই অদ্বৈতবাদের দুন্দুভি নাদ তুলতে হবে!'

একত্ব বা অখণ্ডভাব—বেদান্তের মূল কথা। ইহা আমাদের সদাসর্বদা মনে রাখিতে হইবে। আত্মা ভিন্ন অন্য কোন দ্বিতীয় বস্তু নাই। নিম্নতম পশু হইতে উচ্চতম মানুষ পর্যন্ত পারমার্থিক দিক হইতে কোন প্রভেদ নাই—সেই একই সত্তা বিরাজিত। নিম্নতম পশু ও উচ্চতম মানুষের মধ্যে প্রভেদ শুধু পরিমাণগত, প্রকারগত নহে। অতএব কাহারও প্রতি হিংসা করার অর্থ হইল নিজেকে নিজে হিংসা করা।

এই অখণ্ডভাব অনুধাবন করিয়া মানুষ যদি দৈনন্দিন কার্যগুলি করে, তাহা হইলে সমাজ হইতে বিভেদ চলিয়া যাইবে। ধর্মের নামে, রাজনীতির নামে, শিক্ষার নামে যে হানাহানি সমাজে সর্বত্র দেখা যাইতেছে তাহার অবসান এবং ভ্রাতৃভাবের অভ্যুদয় হইবে।

বেদান্তের এই আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে গিয়া যদি কেহ অকৃতকার্য হন, তাহাতে দুঃখ পাইবার কিছু নাই। কারণ তিনি এক মহান্ আদর্শের দ্বারা জীবনগঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। চেষ্টা না করার চাহিয়া চেষ্টা করা অনেক গৌরবের। আর যাঁহারা অল্পমাত্রও কৃতকার্য হইয়াছেন, তাঁহারা অকৃতকার্য ব্যক্তিদের কখনও ঘৃণা করিবেন না। কারণ ঘৃণা বা নিন্দার দ্বারা কাহাকেও উন্নত করা যায় না। অতএব সদা-সর্বদা উৎসাহ দিবেন অকৃতকার্য ব্যক্তিদের। কালে তাহারাও পারিবে। তাহাদেরও মধ্যে সেই অনন্তশক্তি রহিয়াছে।

আত্মবিশ্বাস মানুষকে সর্বাধিক কল্যাণসাধন করে। আত্মবিশ্বাসের সহিত এই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার পথ আমাদের করিয়া লইতেই হইবে। দুর্বল হইলে চলিবে না। এ-পথে দুর্বলতার স্থান নাই। হাজার বার পরাজয় হইলেও বিশ্বাস রাখিতে হইবে—বেদান্তের উচ্চতম সত্য—আত্মজ্ঞান লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব। আমাদের দ্বারাই সাংসারিক সকল বন্ধন-শৃঙ্খল ছিন্ন করা সম্ভব।

প্রথমে আমাদের শুনিতে হইবে আত্মার কথা। 'আত্মা বা অরে শ্রোতব্যঃ… ।' দিবা-রাত্র শুনিতে হইবে—আমি সেই আত্মা। বারংবার 'আমি সেই আত্মা' বলিতে হইবে। যতক্ষণ না আমার প্রতি রক্তবিন্দুতে, প্রতি শিরায় ও ধমনীতে স্পন্দিত হইয়া উহা আমার মজ্জাগত হইতেছে, ততক্ষণ উহা বলিতে হইবে। আমার সমুদয় দেহটি ঐ আদর্শে পরিপূর্ণ করিতে হইবে। 'আমি জন্মহীন, অবিনাশী, আনন্দময়, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, নিত্য, জ্যোতির্ময় আত্মা'—দিবারাত্র এই চিন্তা করিতে করিতে আমার হৃদয়ে উহা গাঁথিয়া যাইবে। ঐভাবে ধ্যান করিতে করিতে—উহা হইতে পরে কর্ম আসিবে। ঐভাবে হৃদয় পূর্ণ হইলে হাত আপনা হইতে ঐ আদর্শে কাজ করিবে। তখন এই উচ্চ চিন্তা-শক্তির প্রভাবে আমাদের সমুদয় কার্য দেব-ভাবাপন্ন হইবে। যাঁহারা দৈনন্দিনজীবনে

বেদান্তের আদর্শ প্রয়োগ করিতে চাহেন, তাঁহাদের উহা প্রথম শিক্ষা—সাধন।

দ্বিতীয় সাধন—মনন। বিচার করিতে হইবে—জগতে কোন্‌টি সৎ আর কোন্‌টি অসৎ। যাহাতে একত্ব আনয়ন করে, যাহাতে মিলন ঘটায় তাহাই সত্য। যাহাতে বহুত্বের ভাব আনয়ন করে তাহাই অসত্য। প্রেমের মাধ্যমেই একত্ব, সবার মধ্যে মিলন ঘটায়। প্রেমই একমাত্র সত্য। অতএব আমাদের প্রেমের বাহু সর্বত্র প্রসারিত করিতে হইবে। এই প্রেম আমাদের মধ্যে যত প্রকাশিত হইবে, উত্তরোত্তর ততই আমরা একত্ব অনুভব করিব। জীবন হইতে সমুদয় পাপচিন্তা দূর করিয়া সর্বভূতের প্রতি আমাদের ঐ প্রেম নিবেদন করিতে হইবে। ইহার পরের সাধন, নিদিধ্যাসন—ধ্যান। ধ্যানের দ্বারাই তত্ত্ব বস্তু লাভ হয়।

বাস্তবজীবনে আমরা যদি উপরি-উক্তভাবে সাধনা করি, তাহা হইলে বেদান্তের সু-উচ্চ আদর্শগুলি আমাদের জীবনে অবশ্যই প্রকাশিত হইবে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[প্রাপক : শ্রীপ্রমদাদাস মিত্র]

[১]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জয়তি

31-5-90

পূজনীয় শ্রীমহাশয়ের চরণে সহস্র সহস্র প্রণাম—

কল্য বেলা দ্বিপ্রহরের সময় জ্বর আসিয়াছে—এমন সময়ে আপনার পত্র পাইয়া বিশেষ শান্তি লাভ করিলাম। জ্বরের কিছু লাঘব নাই। অবিরাম ভোগ হইতেছে। প্লীহাও বিলক্ষণ অনুভব হইতেছে, এ Influenza নয়। অদ্য ৫ দিন হইয়াছে, এখনও কোন ঔষধ সেবন হয় নাই। পথ্যের মধ্যে কেবল কিছু দুধ সাগু দিতেছি। দেখি 'পাঁহন' দেবতা কত দিন থাকেন। আমার ধন্য ভাগ্য। ইনি বহুকাল পরে এ দাসের প্রতি দয়া করিয়াছেন। মধ্যে ২ দিন সতীশ বাবুর বাড়ীতে ছিলাম। কল্য সন্ধ্যার সময় গগনবাবুর বাড়ীতে আসিয়াছি।

সতীশ বাবু বৈদ্যক শাস্ত্র জানেন। কিন্তু আমার জন্য এখনও কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন নাই। কয় দিন স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া দেখা গেল। বিনা চিকিৎসায় আরোগ্য হওয়া বড়ই কঠিন বোধ হইতেছে। শ্রীপাওহারী বাবার দর্শনে এক দিন মাত্র গিয়াছিলাম। আমাকে যে 'পাঁহন' দেবতা পাইয়াছেন তাহা তিনি জানেন। তাঁহার আশ্রমের নিকটস্থ যে গ্রামের কথা লিখিয়াছেন এক রাত্রি আমি তথায় ছিলাম। এ অবস্থায় থাকিবার উপযুক্ত স্থান সেথায় নাই।

এখানে গ্রীষ্ম সর্ব্বত্রই বোধ হইতেছে—জ্যৈষ্ঠ মাসের এ দারুণ রৌদ্রে পৃথিবী অগ্নিময় বোধ হইতেছে। অতিশয় শীতল স্থান এখানে দুর্লভ। আমার সর্ব্ব লোমকূপ দিয়া অগ্নি ছুটিতেছে। এ সকলই শরীরের প্রারব্ধ ও পাঁহন দেবতার অনুগ্রহ। দাসকে ৺বদরীনাথ ডাকিতেছেন। তাঁহার চরণতলে দাসের সদা থাকিতে মন।

আপনার সৎসঙ্গ এ দাসের ভাগ্যে কবে হইবে? আপনি সদাই আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার মত সরল ভক্তি আমি পাই। আপনার কথা মনে হইলে আমার মনে এক বিমল সুখের অনুভব হয়, তাহা আর কি বলিব? আপনি যথার্থই ভাগ্যবান কারণ আপনি সদাই প্রাণেশ্বরকে হৃদয়ে রাখিতেছেন। আশীর্ব্বাদ করিতে ভুলিবেন না। যেন মৃত্যুকালে 'স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্' হয়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ স্বামীর ব্যস্ত ও বিকল চিত্ত হইবার কারণ কি? সবিশেষ লিখিবেন। তিনি ব্যস্ত হইলে আমিও যেন ব্যস্ত হই। শুনিয়াছি আমাদের সুরেশবাবু নাকি বড় পীড়িত আছেন। আপনি লিখিয়াছেন স্বামী শ্রীশ্রীগুরুদেবের স্মরণার্থে একটি মঠ স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, উহা আমাদের সকলেরই ইচ্ছা। এই বিষয়ে তিনি লিপ্ত না হইলেও কেবল ইচ্ছাতেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে। হওয়া অতি আবশ্যক। যখন তিনি ইচ্ছা করিয়াছেন, তখন শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইবে। সন্ন্যাসীর কোন বিষয়ে ইচ্ছা নাই। যদ্যপি তাঁহার কোন সৎ সংকল্প উদয় হয়—ত'তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ হইবে। বালকের চপলতা ক্ষমা করিবেন। আর ঐ উদ্দেশ্যে আমাদের সকলের উৎসাহিত হওয়া কর্ত্তব্য। কিমধিকম্ ইতি।

শরীর বড়ই দুর্ব্বল—বেশী লিখিতে পারিলাম না। কোন পত্র আসিলে এখানে রওনা করিবেন [পাঠাইয়া দিবেন]। শীঘ্র পত্র দিবেন। আপনাদের শ্রীচরণে দাসের অসংখ্য প্রণাম জানিবেন।

—দাস গঙ্গাধর

[২]

শ্রীশ্রীগুরুদেব শরণম্

গাজীপুর
2-6-1890

পূজনীয় মহাশয়ের চরণে প্রণাম—

আপনার প্রেরিত পত্র ও ৫৲ টাকার মনি অর্ডার পাইয়াছি। এই টাকার কোন আবশ্যক ছিল না। ৫ দিন হইতে অবিচ্ছেদে জ্বর ভোগ হইতেছে—রেমিটেন্ট-ফিভার হইয়াছে। বড় খারাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ডাক্তারি চিকিৎসা হইতেছে। এক জ্বরি, বড়ই দুর্ব্বল।... পত্র লিখিতে অক্ষম। মঠস্থিত স্বামীগণ আমার এ রোগের কথা কিছু অবগত নহেন।

—দাস গঙ্গাধর

[৩]

শ্রীশ্রীগুরুদেব শরণম্

২১ জ্যৈষ্ঠ। মঙ্গলবার।

পরম পূজনীয় মহাশয়ের চরণে প্রণাম—

রেমিটেন্ট ফিভার হইয়াছে। প্লীহার অনুভব আর নাই। কল্য এখানকার Assistant Surgeon হারাণবাবু দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ঔষধ সেবন করিতেছি। কিঞ্চিৎ Remission হওয়ায় আজ Quinine খাইয়াছি। পথ্য কেবল দুধ সাগু খাইতেছি। হারাণবাবু

Chest পরীক্ষা করিয়া Bronchitis আছে বলিলেন। এখানে বেদানা না পাওয়ায় আপনাকে লিখিতেছি। যদি কাশীতে আপনি ২/১ টি বেদানা পারেন—তাহা হইলে পাঠাইবেন। অধিক আর কি লিখিব। ইতি

—দাস গঙ্গাধর

[৪]

শ্রীরামকৃষ্ণ জয়তি

৩/৫-৬-৯০

পরম পূজনীয় মহাশয়ের চরণে সহস্র প্রণাম—

মহাশয়, আমি এক্ষণে কিঞ্চিৎ ভাল আছি। ২ দিন পূর্ব্বে অবিরাম জ্বর ভোগ হইতেছিল—অবিচ্ছেদে। হারাণবাবুর ২ দাগ ঔষধে, সে ছাড়িয়াছে। ২ দিন কেবল Quinine চলিতেছে। পথ্য দুধ সাগু। আর কোন পথ্য এখনও পাই নাই। আজ অল্প ক্ষুধাও বোধ হইতেছে। আজও Quinine ছাড়িব না। তাহার পর পথ্য পাইলে কিঞ্চিৎ সবল হইয়া শীঘ্র এখান হইতে যাইব।

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম বড় সূক্ষ্ম—"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া"—অর্থাৎ গৃহস্থের বাড়ীতে এ অবস্থায় অধিক থাকিতে ভালবাসি না।

বিশ্বনাথের কাছে দাসের প্রার্থনা যেন সদাই তিনি আপনার ভিতর দিয়া উপদেশ দিবেন। আর আপনার শুভ কাহিনী যেন সদাই শুনান। কিমধিকমিতি। ইতিপূর্ব্বে দুই পোস্ট কার্ড পাইয়াছিলাম।

—দাস গঙ্গাধর

[৫]

শ্রীশ্রীগুরুদেব শরণম্

গাজীপুর
৫।৬।৯০

পূজনীয় শ্রীযুক্ত মহাশয়ের চরণে প্রণাম—

এইমাত্র আপনার একখানি পত্র পাইলাম। আপনাকে আমি অনেক কষ্ট দিয়াছি। তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। পত্রের মধ্যে রসিদ পাইলাম। আনিতে কাল লোক পাঠাইব। গত কল্য বেলা ১০টার সময় এখানে এক 'urgent তার' শ্রীনরেন্দ্র স্বামী পাঠাইয়াছিলেন। 'তার' এখান হইতেও যায়। অসুখ পূর্ব্বে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হইয়াছে। অদ্য পথ্য ভাত খাইয়াছি। Quinine খাওয়াও বন্ধ করিয়াছি। এখনও অত্যন্ত দুর্ব্বল। এক্ষণে একদিন পাওহারী বাবাজীকে সাষ্টাঙ্গ হইয়া শীঘ্রই স্বস্থানে প্রস্থান করিব। এখনও চাঙ্গা আছি।

—দাস গঙ্গাধর

আত্মায় বিশ্বলয়

[অষ্টাবক্র সংহিতার পঞ্চম প্রকরণ হইতে]

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

'উদ্বোধন' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক, বর্তমানে আমেরিকার স্যাক্রামেণ্টো বেদান্তকেন্দ্রের অধ্যক্ষ।

সঙ্গ তব নহে কিছু সহ
চিরশুদ্ধ ত্যাগ কি করিবে?
আত্মসত্যে সংসার তো নাই
এই জ্ঞানে বন্ধন ঘুচিবে। ৫।১

তোমা হতে উঠিছে ভুবন
সিন্ধু বুকে বুদ্বুদ সমান
অন্তরাত্মা জানি সর্ব মূল
লয় হোক্ যত মিথ্যা ভান। ৫।২

ইন্দ্রিয়ের যদিও গোচর
বস্তুহীন এ বিশ্ব নিশ্চয়
সুনির্মল আত্মসত্য মাঝে
রজ্জুভ্রম সম হোক্ লয়। ৫।৩

পূর্ণ তুমি সম সুখ দুঃখে
এক তুমি আশা নিরাশায়
পারো যদি সাধিতে এভাব
জন্ম মৃত্যু দ্বন্দ্ব ঘুচে যায়। ৫।৪

ন তে সঙ্গোঽস্তি কেনাপি কিম্ শুদ্ধস্ত্যক্তুমিচ্ছসি।
সঙ্ঘাতবিলয়ং কুর্বন্নেবমেব লয়ং ব্রজ ॥৫।১
উদেতি ভবতো বিশ্বং বারিধেরিব বুদ্বুদঃ
ইতি জ্ঞাত্বৈকমাত্মানমেবমেব লয়ং ব্রজ ॥৫।২
প্রত্যক্ষমপ্যবস্তুত্বাদ্বিশ্বং নাস্ত্যমলে ত্বয়ি।
রজ্জুসর্প ইব ব্যক্তমেবমেব লয়ং ব্রজ ॥৫।৩
সমদুঃখসুখঃ পূর্ণ আশানৈরাশ্যয়োঃ সমঃ।
সমজীবিতমৃত্যুঃ সন্নেবমেব লয়ং ব্রজ ॥৫।৪

সুভাষচন্দ্রের জীবন ও চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দ

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

[শ্রাবণ, ১৩৯২ সংখ্যার পর]

হুগলী জেলা ছাত্র সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র তাঁর 'জীবনবেদ' খুলে ধরতে চেষ্টা করেছিলেন। এই রচনায় তিনি ব্যক্তির আদর্শ ও জাতির আদর্শ—উভয়কে উপস্থিত করে দেখাতে চান—একে অপরের পরিপূরক। জাতীয় আদর্শে তিনি বিশ্বাসী, আদর্শ না থাকলে জাতির জীবন অর্থহীন, সেই আদর্শের বিকাশের সাধনা জাতি বহু বৎসর ধরে করে যায়। আদর্শকে উপস্থিত করার কালে সুভাষচন্দ্র ভ্রান্ত গুরুদের সম্বন্ধে সাবধান করেছেন। তারপরে তিনি যে আদর্শ গুরুর কথা বলেছেন—তিনি স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর অনুবর্তী চিত্তরঞ্জন প্রমুখ।

ভারতীয় জাতির একালের আদর্শ সাধনার সূত্রপাতে বৃহৎ পুরুষ রামমোহনের কথা তিনি এই রচনাতে তুলেছিলেন। ধর্মের কুসংস্কার-বর্জন, বেদান্ত-সত্যের দ্বারা জাতির মধ্যে ঐক্য-বিধান, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে চিন্তার জাগরণ ইত্যাদি বিষয়ে রামমোহনের মহৎ ভূমিকাকে তিনি স্মরণ করেছেন। সমাজ-সংস্কারে কেশবচন্দ্র সেনের উৎসাহের কথাও বলেছেন। আর এই সকল প্রবাহের সঙ্গম দেখেছেন বিবেকানন্দে।

স্বামীজীর ভূমিকা প্রসঙ্গে প্রথমে এনেছেন ব্যক্তিত্ব বিকাশের কথা :

"১৫ বৎসর পূর্বে যে আদর্শ বাংলার ছাত্র-সমাজকে অনুপ্রাণিত করিত তাহা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ। সে আদর্শের প্রভাবে তরুণ বাঙালী ষড়্‌রিপু জয় করিয়া, স্বার্থপরতা ও সকল প্রকার মলিনতা হইতে মুক্ত হইয়া আধ্যাত্মিক শক্তির বলে শুদ্ধবুদ্ধ জীবন লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইত। সমাজ ও জাতিগঠনের মূল—ব্যক্তিত্ব বিকাশ। তাই স্বামী বিবেকানন্দ সর্বদা বলিতেন—**man making is my mission**—খাঁটি মানুষ তৈরী করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য।"

কথাগুলি লেখার সময়ে অন্যান্যের সঙ্গে বিশেষ-ভাবে নিজের কৈশোর-যৌবনের কথাই সুভাষচন্দ্র বলতে চেয়েছিলেন। তারপরে এখানেও বললেন—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্মীয় সমন্বয়-সাধনাই রাজনৈতিক জাতীয়তা সম্ভব করেছে :

"কিন্তু ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে এত জোর দিলেও স্বামী বিবেকানন্দ জাতির কথা একেবারে ভুলিয়া যান নাই। কর্মবিহীন সন্ন্যাসে অথবা পুরুষকারহীন অদৃষ্টবাদে তিনি বিশ্বাস করিতেন না। [মাত্র ৬ মাস আগে, যুবসম্মেলনে সবরমতী ও পণ্ডিচেরী ভাবধারাকে তাঁর আক্রমণ স্মর্তব্য]। **রামকৃষ্ণ পরমহংস নিজের জীবনের সাধনার ভিতর দিয়া সর্বধর্মের যে সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই স্বামীজীর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল এবং তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয়তার মূল ভিত্তি। এই সর্বধর্মসমন্বয় ও সকল মতসহিষ্ণুতার প্রতিষ্ঠা না হইলে আমাদের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে জাতীয়তার সৌধ নির্মিত হইতে পারিত না।**"

ভারতীয় জাগরণ এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকা সম্বন্ধে যাঁরা সন্ধান করবেন তাঁদের কাছে ভারতের প্রধান বিপ্লবী নেতা ও স্বাধীনতালাভের পক্ষে প্রধান শক্তি বলে কথিত সুভাষচন্দ্রের এই উক্তি অবশ্যই দিগ্‌দর্শকের কাজ করবে।

একই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র আরও বলেছেন :

"স্বামী বিবেকানন্দ মানুষকে যাবতীয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া খাঁটি মানুষ হইতে বলেন, এবং অপরদিকে সর্বধর্মসমন্বয় প্রচার দ্বারা ভারতের জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপন করেন। রামমোহন রায় মনে করিয়াছিলেন যে, সাকারবাদ খণ্ডন করিয়া, বেদান্তের নিরাকারবাদ প্রচার করিয়া তিনি জাতিকে একটি সার্বভৌমিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে পারিবেন। ব্রাহ্মসমাজও সেই পথে চলিয়াছিল কিন্তু ফলে হিন্দুসমাজ যেন আরও দূরে সরিয়া গেল। তারপর বিশিষ্টা-দ্বৈতমূলক বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদমূলক সত্য প্রচারের দ্বারা এবং সকল মতসহিষ্ণুতার শিক্ষা দিয়া রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ জাতিকে একতাসূত্রে গাঁথিবার চেষ্টা করিলেন।"

এই রচনায় বিবেকানন্দের আর একটি দিক—তাঁর প্রবল স্বাধীনতাচেতনার কথাও সুভাষচন্দ্র বিশেষভাবে বলেছেন—যে স্বাধীনতা আংশিক নয়—সর্বাঙ্গীণ :

"রামমোহনের যুগ হইতে বিভিন্ন আন্দোলনের ভিতর দিয়া ভারতের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ প্রকটিত হইয়া আসিতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই আকাঙ্ক্ষা চিন্তারাজ্যে ও সমাজের মধ্যে দেখা দিয়াছিল, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তখনও দেখা দেয় নাই—কারণ তখনও ভারতবাসী পরাধীনতার মোহনিদ্রায় নিমগ্ন থাকিয়া মনে করিতেছিল যে, ইংরাজের ভারতবিজয় একটা দৈব ঘটনা বা divine dispensation. ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বাধীনতার অখণ্ড রূপের আভাস রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে পাওয়া যায়। 'Freedom, freedom is the song of the Soul'—এই বাণী যখন স্বামীজীর অন্তরের রুদ্ধ দুয়ার ভেদ করিয়া নির্গত হয়, তখন সমগ্র দেশবাসীকে মুগ্ধ ও উন্মত্তপ্রায় করিয়া তোলে। তাঁহার সাধনার ভিতর দিয়া, আচরণের ভিতর দিয়া, কথা ও বক্তৃতার ভিতর দিয়া এই সত্যই বাহির হইয়াছিল।" [২।১৬৬-৬৮]

বিবেকানন্দের স্বাধীনতা-ভাবনার উত্তরাধিকারিরূপে সুভাষচন্দ্র এই রচনায় অরবিন্দ, গান্ধী ও চিত্তরঞ্জনকে উপস্থিত করেছেন। অরবিন্দ—পূর্ণ স্বাধীনতার প্রবক্তা ; গান্ধী—জনগণের জন্য স্বরাজের আকাঙ্ক্ষী ; চিত্তরঞ্জন—সেই জনগণের স্বরাজের জন্য প্রবলতম দাবিদার—এই কথাই সুভাষচন্দ্র বলেছেন। অরবিন্দ সম্বন্ধে সুভাষ-চন্দ্রের বক্তব্য পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি প্রসঙ্গেই সমাপ্ত (অর্থাৎ স্বদেশী যুগের পরবর্তী অরবিন্দের কথা উত্থাপন করেননি) ; গান্ধী সম্বন্ধে মন্তব্য দায়সারা ; কিন্তু চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে বক্তব্য অধিক বিস্তারিত ও আবেগপূর্ণ। চিত্তরঞ্জনের মধ্যে যে, "স্বাধীনতার অখণ্ড রূপ" দেখা গিয়েছিল, তার ভাবগত আদর্শ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের "এক" ও "বহু"-র সমন্বয়ের মধ্যেই ছিল, একথা তিনি জানিয়েছেন ; সেইসঙ্গে "পরিপূর্ণ অখণ্ড মুক্তি" বলতে কেবল যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, তা যে একই সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, তাও বিশদ করেছেন। রচনাশেষে সুভাষচন্দ্র বিবেকানন্দের অনুসরণে ছাত্রদের আহ্বান করে বলেছেন : "সাম্যবাদ ও স্বাধীনতামন্ত্র প্রচার করিবার জন্য তোমরা গ্রামে-গ্রামে ছড়াইয়া পড়ো। স্বাধীনতার পূর্ণ স্বাদ নিজের অন্তরে পাইলে সকলেই পাগল হইয়া উঠিবে।...নিজের অন্তরে এই আলোক জ্বালো—সেই দীপ হস্তে লইয়া দেশবাসীর দ্বারবর্তী হও ;...চাষার পর্ণকুটিরে, মজুরদের আবর্জনাপূর্ণ ভগ্নগৃহে।...আর যাও মাতৃজাতির সমীপে। যাঁহারা শক্তিরূপিণী অথচ সমাজের চাপে আজ হইয়াছেন 'অবলা'—তাঁহাদের জাগাও।"

*

ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভূমিকা সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের মূল বক্তব্য-প্রকাশক রংপুর ও হুগলী-ভাষণের মধ্যে উল্লিখিত বিষয়গুলি সুভাষচন্দ্র অন্য নানা-স্থানে নানাভাবে বলেছেন দেখা যায়। সেগুলির উল্লেখ সংক্ষেপে করব।

(ক) "স্বাধীনতা আত্মার সঙ্গীত…"

স্বামীজীর এই কথাটি সুভাষচন্দ্র উদ্ধৃত করেছেন মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে, ৩. ৫. ১৯২৮:

"ফুসফুসের জন্য যেমন অক্সিজেন অপরিহার্য তেমনি অপরিহার্য মানুষের আত্মার স্বাধীনতা। স্বামী বিবেকানন্দ সত্যই বলিয়াছিলেন—'স্বাধীনতা আত্মার সঙ্গীত।' স্বাধীনতাই অমৃত—মৃত্যুর এপারে প্রকৃত অমৃতসুধা।" [১।১৪৪]

যশোহর জেলা রাষ্ট্রনৈতিক সম্মেলনে, ১২. ৭. ১৯৩১:

"[শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায়, উপলব্ধিতে ও] উক্তিতে] ভারতীয় জাতীয়ত্বের নিরাপদ ভিত্ গড়িয়া উঠিলে স্বামী বিবেকানন্দ আবির্ভূত হইয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করিয়া দিলেন। তিনি ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, একমাত্র স্বাধীনতার আলো ভারতীয় জীবনকে উদ্ভাসিত করিতে পারে। তাঁহার বক্তৃতাবলী, কবিতা ও রচনার মধ্য দিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন: 'স্বাধীনতাই আত্মার সঙ্গীত।' নিঃসংশয়ে বলা যায়, বিবেকানন্দ আত্মিক স্বাধীনতার কথাই বলিয়াছিলেন [একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়, তিনি অন্যবিধ স্বাধীনতার কথাও বলেছেন], কিন্তু ইহাও তর্কাতীত যে, আত্মার জাগরণে জীবনের প্রতিটি স্তরে জাগরণের প্রকাশ ব্যক্ত হইয়া ওঠে। একটি স্বাস্থ্যসম্পন্ন মানুষের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রাণের আভা বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে।…স্বাধীনতার জন্য আকাঙ্ক্ষা জাতির জীবনে দৃঢ়মূল হইলে, তাহা জীবনের সকল স্তরে সঞ্চারিত হইয়া যায়।" [৩।১৩১]

[এর পরে সুভাষচন্দ্র পূর্ববৎ বলেছেন, অরবিন্দ বিবেকানন্দের স্বাধীনতার বাণীকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতার ঘোষণারূপে উপস্থিত করেছিলেন]।

মাতৃভূমির প্রতি স্বামীজীর অমেয় ভালবাসার কথা জানাতে সুভাষচন্দ্র বারবার ভগিনী নিবেদিতার রচনাংশ ব্যবহার করতেন।

দিলীপকুমার লিখেছেন:

"সুভাষ [বলল]…আমি যদি তাঁর কাছে শিখে থাকি তবে সে তাঁর এই দেশপ্রেম।… শোনো, নিবেদিতা কী বলেছেন তাঁর মহান্ হৃদয়ের সম্বন্ধে: 'There was one thing, however, deep in the Master's nature, that he himself never knew how to adjust. This was his love of his country and his resentment of her suffering. Throughout these years in which I saw him almost daily, the thought of India was to him like the air he breathed.' এই বলে সুভাষ ধরা গলায় পড়ে চলল প্রায় পনর মিনিট। ওর কাছে বইটি [The Master as I Saw Him] নিয়ে আমি দুদিনে দিনে-রাতে পড়ে শেষ করি। এর সুফল হল এইটুকু যে, স্বামীজীর বাণীর আলোয় যেন সুভাষকে এক নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখলাম।" [স্মৃতিচারণ, পৃঃ ৩২৭]

সিওনি জেল (মধ্যপ্রদেশ) থেকে 'মরাঠা' কাগজের সম্পাদককে লেখা, ৬. ৫. ১৯৩২, রচনায়:

"ভগিনী নিবেদিতা তাঁর 'The Master as

I saw him' পুস্তকে বলেছেন, 'The queen of his adoration was his Motherland'."

[বিশ্ববিবেক, পৃঃ ১৮৫]

'ভারতপথিক' গ্রন্থে :

"[স্বামীজীর] মানবসেবার মধ্যে স্বদেশসেবাও অবশ্য স্বীকৃত হয়েছিল—কেননা তাঁর জীবনচরিত-লেখিকা ও প্রধানা শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন—'তাঁর আরাধ্যা দেবী ছিল তাঁর মাতৃভূমি। মাতৃভূমির এমন কোনো দুঃখ ছিল না যা তাঁর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হত না।' স্বামীজী তাঁর এক আবেগপূর্ণ রচনায় বলেছেন, 'সদর্পে বলো—দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই'।"

(খ) "মানুষ তৈরীই আমার জীবনের উদ্দেশ্য…"

বিবেকানন্দের কথা বলেছেন অথচ তাঁর মানুষ তৈরির ব্রতের কথা বলেননি—সুভাষচন্দ্রের এমন কোনও লেখা প্রায় আছে কিনা সন্দেহ। এ-বিষয়ে উল্লেখ করতে তিনি বাধ্য ছিলেন যেহেতু তাঁর নিজের চরিত্রগঠন বিবেকানন্দের আদর্শেই হয়েছিল—এবং তিনি অবশ্যই বুঝেছিলেন, স্বাধীনতা-সংগ্রামে—যেখানে দুঃখ-দারিদ্র্য-নির্যাতন ও মৃত্যুই উদ্যত—সেখানে চরিত্র ছাড়া অগ্রসর হওয়া যাবে না। সুভাষচন্দ্রের অনুভূতি-রোমাঞ্চিত ভাষা আমাদের স্মরণ হয়ই : "নিজের জীবন পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া ভারতমাতার পদাম্বুজে অঞ্জলিস্বরূপ নিবেদন করিব, এবং এই আত্যন্তিক উৎসর্গের ভিতর দিয়া পূর্ণতর জীবন লাভ করিব —এই আদর্শের দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম।" এই আদর্শ যেহেতু স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন, তাই বারবার স্বামীজী-কথিত চরিত্রগঠন ও মানুষ তৈরির কথা উত্থাপন করেছেন। আর এই চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য দেখলে তাঁর বেদনার শেষ থাকত না। "দলাদলির হোক অবসান" নামক রচনায় তিনি বলেছিলেন : "আজকাল জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষ করিয়া তরুণ সমাজের মধ্যে এক প্রকার লঘুতা ও বিলাসপ্রিয়তা যেন প্রবেশ করিয়াছে।…আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, তখন ছাত্রমহলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের খুব প্রচার ছিল। আজকাল নাকি তরুণসমাজের মধ্যে ঐ সাহিত্যের তেমন প্রচার নাই! তার পরিবর্তে নাকি লঘুত্বপূর্ণ এবং সময়ে সময়ে অশ্লীলতাপূর্ণ সাহিত্যের খুব প্রচার হইয়াছে। একথা কি সত্য? যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কারণ মনুষ্যসমাজ যেরূপ সাহিত্যের দ্বারা পরিপুষ্ট হয় তার মনোবৃত্তি তদ্রূপ গড়িয়া ওঠে। চরিত্রগঠনের জন্য 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য' অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাহিত্য আমি কল্পনা করিতে পারি না।" ['বিশ্ববিবেক', পৃঃ ১৯২]

"মানুষ তৈরী" ব্যাপারটি সুভাষচন্দ্রের চিন্তাকে সর্বদাই অধিকার করে থাকত। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, বিদেশ থেকে 'ইজম্‌' আমদানী করলেই দেশের উন্নতি হবে না; এমনকি স্বদেশীয় ইজম্‌-কে লালন করলেও তা ঘটবে না। আরও বলেছেন, উচ্চাঙ্গের সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কিছুটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করলেও, আদর্শের উদ্দীপনাই মানুষ সৃষ্টি করতে সমর্থ। "আমরা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছি যে, কোনো মতবাদই আমাদের বাঁচাইতে পারে না—যদি-না আমাদের মধ্য হইতে আরও যোগ্য মানুষের উদ্ভব ঘটাইতে পারি।" উচ্চতর মানুষের প্রয়োজনে এদেশ গুরু বা অবতারদের সন্ধান করেছে; এবং ইউরোপের নীট্‌শে অতিমানবের কল্পনাও করেছেন। [৩।১০০] অরবিন্দ নীট্‌শের অনুরূপ কল্পনাকারী। প্লেটোর অতিমানবের কথাও সুভাষচন্দ্রের স্মরণে ছিল।

[১।২৩৫] কিন্তু তিনি বাস্তব জীবনের জন্য বিবেকানন্দের মানুষ তৈরির পরিকল্পনাকেই গ্রহণ করেছেন। এবং নানাদিক থেকে সেই মানুষের আকাঙ্ক্ষিত রূপ লক্ষ্য করতে চেয়েছেন :

"স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, 'মানুষ তৈরী আমার ব্রত।' যখন একদল সত্যিকারের মানুষ তৈরী হইবে তখন স্বামীজীর মিশন এবং লক্ষ্য রূপায়িত হইবে।" [১।২৩৫]

নিছক মতবাদে কিছু হয় না—মনুষ্যচরিত্র গঠিত না হলে—সেই প্রসঙ্গ :

"অনেকের ধারণা যে, জনসাধারণকে বা তরুণসমাজকে জাগাইতে হইলে রাষ্ট্র বা সমাজ সম্পর্কীয় মতবাদ প্রচার করিতেই হইবে। সমাজ বা রাষ্ট্রের আদর্শ কী হওয়া উচিত—এ বিষয়ে আজকাল অনেক প্রকার মতবাদ বা ইজম্ প্রচলিত আছে।...এক-একটি ইজম্-এর গোঁড়া ভক্তরা মনে করেন যে, ঐ মতের প্রতিষ্ঠা হইলে পৃথিবীর সকল দুঃখ দূর হইবে। আজকাল তাই কোনো-কোনো ইজম্-এর লড়াই খুব ঘনাইয়া উঠিয়াছে। আমার নিজের কিন্তু মনে হয় যে, কোনো ইজম্ বা মতবাদের দ্বারা মানবজাতির উদ্ধার হইতে পারে না, যদি সর্বাগ্রে আমরা মনুষ্যোচিত চরিত্রবল লাভ না করিতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলিতেন—man making is my mission—মানুষ তৈরী করা আমার জীবনের উদ্দেশ্য। জাতিগঠনের এবং ইজম্-প্রতিষ্ঠার ভিত্তি খাঁটি মানুষ। খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করা যুব-আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য।" [২।৩১]

সেবার সঙ্গে, আত্মবোধের সঙ্গে, মানুষ তৈরির সাধনা কিভাবে যুক্ত সেই প্রসঙ্গ :

"সেবার উদ্দেশ্য লোককে 'মানুষ' করে তোলা। যতদিন না নিজেরা মানুষ হচ্ছি, ততদিন কি করে লোককে মানুষ করব?...যে দেশে এককালে মানুষ জন্মেছিল সে দেশ আবার বড় হতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, 'জাতির মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনো।'...আজ আমরা আবার মানুষ হবার চেষ্টা করছি। আত্মবিশ্বাস আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে—নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস আনতে হবে। যাঁদের গৌরবে আমরা আজ গর্ব অনুভব করি, তাঁদের জীবনী আলোচনায় দেখতে পাই যে, স্বামী বিবেকানন্দ বা রবীন্দ্রনাথ বা জগদীশচন্দ্র প্রমুখ সকলেই জীবনের গোড়া থেকে এমনি আত্মবিশ্বাস পেয়েছিলেন।...বিবেকানন্দ বলতেন—man making is my mission—খাঁটি মানুষ তৈরী করাই আমার সবচেয়ে বড় কাজ। কেননা ব্যক্তি হচ্ছে জাতির ভিত্তিস্বরূপ।" [২।৬৯-৭০]

বেপরোয়া ত্যাগে ও যন্ত্রণা-সহনের উল্লাসে কিভাবে ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় তার প্রসঙ্গ :

"জীবনে আমরা দিয়া যাইব—চাহিব না। যে নাম চায় না, যশ চায় না, স্বর্গ চায় না—তার দুঃখ কোথায়? আমরা যখন অন্যের নিকট হইতে কিছু চাই কিন্তু তা পাই না—তখনই আমাদের জীবনে দুঃখ আসে। স্বামীজী বলিতেন—'ফিরে যেবা চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যায়।" [৩।৫৮]

'মনুষ্য' প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ ও লেনিনের উক্তির সমরূপতা দেখিয়েছেন :

"রুশ বিপ্লবযজ্ঞের গুরু লেনিন বলে গিয়েছেন : 'It is better to get hold of ten able men than hundred dullards. By able men I mean, men, who will devote to the revolution not only their free evenings but their whole life.'...স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন, 'দশটা মানুষ পেলে আমি ভারতবর্ষ উল্টে দিতে পারি। কিন্তু মানুষ চাই, পশু নয়। Give me ten men, I will revolutionise India. I want men not brutes." [২।২০৩]

স্বামীজী কেবল কয়েকজনকে নয়—সকল মানুষকে তৈরি করার আদর্শ প্রচার করেছেন—বেলুড় মঠে 'মেয়র' সুভাষচন্দ্র বক্তৃতায় সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন :

"স্বামীজী দুইটি জিনিসের উপর জোর দিতেন—ত্যাগ ও চরিত্রগঠন। ত্যাগ ব্যতীত কোনো উপলব্ধিই সম্ভব নয়। ভারতবর্ষে মহাপুরুষের অভাব হয় নাই—ভারতে এমন সব প্রতিভাশালী ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছে, যাঁহারা অন্য দেশের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিগণের সমকক্ষ। যাহা অতি প্রয়োজনীয় তাহা এই—জনসাধারণের চিত্তের উদ্বোধন চাই। এইজন্যই স্বামীজী বলতেন—'মানুষ গড়াই আমার কাজ'।" [বিশ্ববিবেক, পৃঃ ১৮৮]

[ক্রমশঃ]

শিবমহিম্নঃ

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

৩০। বহুলরজসে বিশ্বোৎপত্তৌ ভবায় নমো নমঃ
প্রবলতমসে তৎসংহারে হরায় নমো নমঃ।
জনসুখকৃতে সত্ত্বোদ্রিক্তৌ মৃড়ায় নমো নমঃ
প্রমহসি পদে নিস্ত্রৈগুণ্যে শিবায় নমো নমঃ॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : বিশ্বোৎপত্তৌ (বিশ্বোৎপত্তি-নিমিত্তং) (নিমিত্তার্থে সপ্তমী) বহুলরজসে (বহুলং তমঃ সত্ত্বাভ্যামধিকং রজঃ যস্য তস্মৈ উদ্রিক্তরজসে) ভবায় (ভবতি অস্মাৎ জগৎ ইতি ভবঃ ব্রহ্মমূর্তিঃ তস্মৈ তুভ্যম্) নমো নমঃ। তথা তৎসংহারে (তস্য বিশ্বস্য সংহারনিমিত্তং) প্রবলতমসে (প্রবলং সত্ত্বরজোভ্যাম্ অনভিভূতম্ উদ্রিক্তং তমো যস্য তস্মৈ) হরায় [হরতি ইতি হরঃ (রুদ্রমূর্তিঃ) তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ] জনসুখকৃতে (জনানাং সুখকৃতে অর্থাৎ সুখনিমিত্তম্ অত্র "কৃতে" শব্দঃ অব্যয়ঃ নিমিত্তবাচী) সত্ত্বোদ্রিক্তৌ [সত্ত্বস্য উদ্রিক্তৌ (উদ্রেকে রজস্তমোভ্যাম্ আধিক্যে) স্থিতায়] মৃড়ায় [মৃড়য়তি (সুখয়তি ইতি)] মৃড়ঃ (বিষ্ণুঃ) তস্মৈ নমো নমঃ (গুণত্রয়োপাধিং নত্বা অধুনা নির্গুণং প্রণমতি) প্রমহসি পদে নিস্ত্রৈগুণ্যে শিবায় নমো নমঃ প্রমহসি (প্রকৃষ্টং মায়য়া অনভিভূতং মহো জ্যোতিঃ যস্মিন্ তৎ তথা) (সর্বোত্তম প্রকাশরূপনির্গুণশূন্য মোক্ষ-নিমিত্তম্ ইত্যর্থঃ) শিবায় (মঙ্গলস্বরূপায়) নমো নমঃ।

ভাবানুবাদ : হে ভব! তুমি রজোগুণ-রূপে বিশ্বের উৎপত্তি-বিধানে রত। তোমাকে প্রণাম করি। হে হর! তুমি তমোরূপ ধারণ করিয়া তোমার সৃষ্ট বিশ্বকে তুমি সংহার কর। তোমাকে প্রণাম করি। হে মৃড়! তুমি সত্ত্ব-গুণাশ্রিত হইয়া জনগণকে সুখসাগরে নিমগ্ন কর। তোমাকে প্রণাম করি। হে শিব! গুণযুক্ত তুমি গুণাতীত হইয়া সর্বাবস্থায় বিরাজ কর। সর্বজন-পূজিত ও মায়া-অনভিভূত তোমার মহান্ চরণে আমার প্রণাম জানাই।

৩১। কৃশপরিণতি চেতঃ ক্লেশবশ্যং ক চেদং
ক চ তব গুণসীমোল্লঙ্ঘিনী শশ্বদৃদ্ধিঃ।
ইতি চকিতমমন্দীকৃত্য মাং ভক্তিরাধাদ্
বরদ চরণয়োস্তে বাক্যপুষ্পোপহারম্॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : ক চ ইদং ক্লেশবশ্যম্ (ক্লেশস্য বশীভূতম্) কৃশপরিণতি (অপরিপকবুদ্ধি-সম্পন্নম্) [কৃশা (অল্পা) পরিণতিঃ (পরিপাকো) যস্য তত্তথা অল্পবিষয়মিত্যর্থঃ] চেতঃ। ক চ তব গুণসীমোল্লঙ্ঘিনী গুণসীমান্তেঽবস্থিতা) [গুণানাং সীমা (সংখ্যাপরিমাণয়োরিয়ত্তা) তামুল্লঙ্ঘয়িতুং

শীলং যস্যাঃ সা] (নিত্যবিভূতিঃ) শশ্বৎ ঋদ্ধিঃ (চিরস্থায়িনী সম্পৎ) ইতি চকিতম্ (সভীতম্) মাম্ অমন্দীকৃত্য (উত্তমীকৃত্য) বাক্যপুষ্পোপহারম্ তে চরণয়োঃ ভক্তিঃ আধাৎ (ত্বদ্বিষয়ারতিঃ অর্পিতবতী) যথা পুষ্পানি মধুকরেভ্যঃ স্বমকরন্দং প্রযচ্ছন্তি অন্যানপি দূরাৎ গন্ধমাত্রেণ প্রমোদমাদধতি তথৈতানি স্তুতিরূপাণি বাক্যানি শিবভক্তিরসিকেভ্যো ভগবন্মাহাত্ম্যবর্ণনামৃতরসং প্রযচ্ছন্তি।

ভাবানুবাদ : হে বরদ! পঞ্চক্লেশের বশীভূত আমার অপরিপক্কবুদ্ধিসম্পন্ন অন্তঃকরণই বা কোথায়, আর তোমার অসীমগুণশালিনী নিত্যা বিভূতিই বা কোথায়—এইরূপ চিন্তায় ভীত আমাকে একমাত্র তোমার প্রতি ভক্তিই শঙ্কাহীন করিয়া তোমার শ্রীচরণযুগলে স্তুতিরূপ পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করাইল।

৩২। অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে।
স্বরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : অসিতগিরিসমং (অঞ্জনপর্বততুল্যং) (যদি) কজ্জলং (মসী) স্যাৎ, (যদি) সিন্ধুপাত্রং স্যাৎ (সমুদ্রঃ যদি কজ্জলাধারঃ স্যাৎ), স্বরতরুবরশাখা (কল্পবৃক্ষশাখা) (যদি) লেখনী (স্যাৎ), উর্বী (পৃথিবী) (যদি) পত্রং স্যাৎ, সারদা (সরস্বতী) যদি সর্বকালং তৎ গৃহীত্বা লিখতি তদপি হে ঈশ ! তব গুণানাং পারং ন যাতি (তব গুণানাম্ অন্তং প্রাপ্তুং ন শক্নোতি)

ভাবানুবাদ : অঞ্জন-পর্বতের ন্যায় যদি মসী (কালি) হয় এবং তাহার আধার অর্থাৎ পাত্র যদি সমুদ্র হয় অর্থাৎ মহাসমুদ্রের জল যদি মসী হয় এবং কৃষ্ণপর্বতপ্রমাণ কজ্জল যদি সেই সমুদ্ররূপ পাত্রে গুলিয়া কালি করা হয়, কল্পবৃক্ষের শাখা যদি লেখনী হয়, পৃথিবী যদি পত্র অর্থাৎ কাগজ হয়, সারদা অর্থাৎ সরস্বতী যদি লেখিকা হইয়া অনন্তকাল লেখনী পরিচালনা করিতে থাকেন তাহা হইলেও হে শিব! তিনি তোমার গুণবর্ণনসীমায় উপস্থিত হইয়া তোমার মহিমা কীর্তনে সক্ষম হইবেন না।

৩৩। অসুরসুরমুনীন্দ্রৈরর্চিতস্যেন্দুমৌলে
গ্রথিতগুণমহিম্নো নির্গুণস্যেশ্বরস্য।
সকলগুণবরিষ্ঠঃ পুষ্পদন্তাভিধানো
রুচিরমলঘুবৃত্তৈঃ স্তোত্রমেতচ্চকার॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : অসুরসুরমুনীন্দ্রৈঃ অর্চিতস্য নির্গুণস্য ঈশ্বরস্য ইন্দুমৌলেঃ গুণমহিম্নঃ গ্রথিতঃ (মহিমা একত্রীকৃত গ্রথিতঃ)। সকলগুণবরিষ্ঠঃ পুষ্পদন্তাভিধানঃ অলঘুবৃত্তৈঃ (দীর্ঘছন্দৈঃ) রুচিরং স্তোত্রমেতৎ চকার

ভাবানুবাদ : অসুর, সুরসমূহ ও শ্রেষ্ঠ মুনিগণদ্বারা অর্চিত শশাঙ্কশেখর গুণাতীত মহাশিবের গুণমহিমা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া গুণিগণশ্রেষ্ঠ পুষ্পদন্ত নামক জনৈক ভক্ত গুরুগম্ভীর ছন্দাবলম্বনে এই সুন্দর স্তোত্র রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

৩৪। অহরহরনবদ্যং ধূর্জটেঃ স্তোত্রমেতৎ
পঠতি পরমভক্ত্যা শুদ্ধচিত্তঃ পুমান্ যঃ।
স ভবতি শিবলোকে রুদ্রতুল্যস্তথাঽত্র
প্রচুরতরধনায়ুঃ পুত্রবান্ কীর্তিমাংশ্চ॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : যঃ শুদ্ধচিত্তঃ পুমান্ অহরহঃ ধূর্জটেঃ এতৎ অনবদ্যং (অনিন্দ্যং) স্তোত্রং পরমভক্ত্যা পঠতি রুদ্রতুল্যঃ স শিবলোকে (গচ্ছতি) তথা অত্র (অস্মিন্ জগতি) প্রচুরতরধনায়ুঃ পুত্রবান্ কীর্তিমান্ চ ভবতি।

ভাবানুবাদ : যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই অনিন্দ্য শিবস্তোত্র শুদ্ধচিত্তে পরমভক্তিসহকারে পাঠ করে রুদ্রতুল্য সেই ব্যক্তি শিবলোকে গমন করে এবং ইহলোকে প্রচুর ধনলাভান্তে আয়ু পুত্র ও কীর্তিসম্পন্ন হয়।

৩৫। কুসুমদশননামা সর্বগন্ধর্বরাজঃ
শিশুশশধরমৌলের্দেবদেবস্য দাসঃ।
স খলু নিজমহিম্নো ভ্রষ্ট এবাস্য রোষাৎ
স্তবনমিদমকার্ষীদ্দিব্যদিব্যং মহিম্নঃ॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : শিশুশশধরমৌলেঃ (শিশুশশিশেখরস্য) দেবদেবস্য (মহাদেবস্য) দাসঃ সঃ কুসুমদশননামা (পুষ্পদন্তাখ্যঃ) সর্বগন্ধর্বরাজঃ খলু (ঐতিহ্যে) অস্য (শিবস্য) রোষাৎ (ক্রোধাৎ) নিজমহিম্নঃ ভ্রষ্টঃ (অভবৎ) (চ) শিবমহিম্নঃ ইদং দিব্যদিব্যং (অতীব মনোহরম্) স্তবনম্ অকার্যীৎ।

ভাবানুবাদ : শশিশেখর শিবের দাসানুদাস পুষ্পদন্তনামক সকল গন্ধর্বগণের রাজা কদাচিৎ শিবরোষে শিবমহিমা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শিবমাহাত্ম্যসমন্বিত এই সুন্দর স্তবরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

৩৬। সুরবরমুনিপূজ্যং স্বর্গমোক্ষৈকহেতুং
পঠতি যদি মনুষ্যঃ প্রাঞ্জলির্নান্যচেতাঃ।
ব্রজতি শিবসমীপং কিন্নরৈঃ স্তূয়মানঃ
স্তবনমিদমমোঘং পুষ্পদন্তপ্রণীতম্॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : সুরবরমুনিপূজ্যং (শ্রেষ্ঠদেবৈঃ মুনিভিশ্চ পূজ্যম্) স্বর্গমোক্ষৈকহেতুং (স্বর্গমোক্ষপ্রাপনকারণভূতং) (ইদং স্তোত্রং) যদি প্রাঞ্জলিঃ (অঞ্জলিবদ্ধো ভূত্বা) নান্যচেতাঃ (অনন্যচিত্তঃ সন্) মনুষ্যঃ পঠতি (তর্হি) কিন্নরৈঃ স্তূয়মানঃ (ভূত্বা) সঃ শিবসমীপং ব্রজতি। পুষ্পদন্তপ্রণীতম্ ইদং স্তবনম্ অমোঘম্ (নিষ্পাপম্, সাফল্যগুণসমন্বিতম্ সম্পূর্ণফলদায়কম্ ইত্যর্থঃ)

ভাবানুবাদ : শ্রেষ্ঠ দেবগণ ও মুনিগণদ্বারা সমাদৃত স্বর্গ ও মোক্ষলাভের কারণস্বরূপ এই স্তোত্র, যে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া অনন্যচিত্তে পাঠ করে সে কিন্নরগণ দ্বারা স্তুত হইয়া শিবসমীপে গমন করিতে সমর্থ হয়। সমস্ত কার্যে সাফল্যদায়ক অব্যর্থ এই স্তব পুষ্পদন্ত রচনা করিয়াছিলেন।

৩৭। মহেশান্নাপরো দেবো মহিম্নো নাপরা স্তুতিঃ।
অঘোরান্নাপরো মন্ত্রো নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : মহেশাৎ ন অপরঃ দেবঃ। মহিম্নঃ ন অপরা স্তুতিঃ। অঘোরাৎ ন অপরঃ মন্ত্রঃ। গুরোঃ পরং তত্ত্বং ন অস্তি।

ভাবানুবাদ : শিব হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই। মহিম্নস্তব অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্তুতি নাই। শিবমন্ত্র হইতে অন্য কোন মন্ত্র শ্রেয়তর নয়। গুরুতত্ত্ব হইতে অন্য তত্ত্ব উৎকৃষ্টতর নয়।

৩৮। দীক্ষা দানং তপস্তীর্থং জ্ঞানং যাগাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
মহিম্নঃ স্তবপাঠস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : দীক্ষা দানং তপঃ তীর্থং জ্ঞানং যাগাদিকাঃ ক্রিয়াঃ মহিম্নঃ স্তবপাঠস্য ষোড়শীং কলাং ন অর্হন্তি।

ভাবানুবাদ : দীক্ষা, দান, তপস্যা, তীর্থগমন, জ্ঞানার্জন এবং যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া মহিম্নস্তবের ষোল অংশের এক অংশও পূর্ণ করিতে সক্ষম নয়।

৩৯। শ্রীপুষ্পদন্তমুখপঙ্কজনির্গতেন
স্তোত্রেণ কিল্বিষহরেণ হরপ্রিয়েণ।
কণ্ঠস্থিতেন পঠিতেন সমাহিতেন
সুপ্রীণিতো ভবতি ভূতপতির্মহেশঃ॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : শ্রীপুষ্পদন্তমুখপঙ্কজনির্গতেন কিল্বিষহরেণ হরপ্রিয়েণ কণ্ঠস্থিতেন সমাহিতেন পঠিতেন স্তোত্রেণ ভূতপতিঃ মহেশঃ সুপ্রীণিতঃ ভবতি।

ভাবানুবাদ : শ্রীপুষ্পদন্তমুখপদ্মনিঃসৃত, শিবপ্রিয়, সর্বপাপহর এই স্তব কণ্ঠস্থিত করিয়া সমাহিতচিত্তে পাঠ করিলে সর্বলোকপতি মহেশ্বর পরম পরিতোষ লাভ করেন।

৪০। ইত্যেষা বাঙ্ময়ী পূজা শ্রীমচ্ছঙ্করপাদয়োঃ।
অর্পিতা তেন দেবেশ প্রীয়তাং মে সদাশিবঃ॥

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : ইতি এষা বাঙ্ময়ীপূজা শ্রীমচ্ছঙ্করপাদয়োঃ তেন অর্পিতা। হে দেবেশ! সদাশিবঃ মে প্রীয়তাম্। ইতি মহিম্নস্তোত্রস্য অন্বয়মুখব্যাখ্যা সমাপ্তা।

ভাবানুবাদ : এই বাক্যরূপ পুষ্পোপহার পূজারূপে শ্রীশঙ্করপদে অর্পিত হইল। হে দেবশ্রেষ্ঠ! সদাশিব তুমি পরিতোষ লাভ করিয়া আমায় কৃতার্থ কর।

মহিম্নস্তোত্রের ভাবানুবাদ সমাপ্ত।
ইতি মহিম্নঃ স্তবঃ সমাপ্তঃ
সর্বং শ্রীবিশ্বেশ্বরার্পণমস্তু।

ভারতাত্মার দুটি চিত্র

শ্রীনন্দদুলাল চক্রবর্তী

রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদের একনিষ্ঠ কর্মী',—'সমাজ শিক্ষা' পত্রিকার সংযুক্ত সম্পাদক।

চারদিকে জল! শুধু জল!

১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে প্রবল বর্ষণে পশ্চিমবাংলার প্রায় সব জায়গাতেই বন্যা। ভয়াবহ বন্যা। ক্ষয়-ক্ষতির অন্ত নেই। রামকৃষ্ণ মিশন থেকে নানা জায়গায় চলছে ত্রাণকাজ। মেদিনীপুর জেলার ময়না থানা শোচনীয়ভাবে বিধ্বস্ত। ময়না থানার দক্ষিণ অংশে সেবাকাজ চলছে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের দায়িত্বে। এই অংশে নয়টি শিবিরে প্রায় ৩৯ হাজার লোকের মধ্যে সেবাকাজ চালানো হচ্ছে। রান্না-করা খাবার, শিশুর খাবার, রোগীর ওষুধপথ্য, সবার জন্য পোশাক ইত্যাদি দুর্গতদের মাঝে বিতরণের কাজ চলছে। চারদিকে জল! ঘরবাড়ি ক্ষেতখামার সব জলের তলায়। ধনী-নির্ধন আজ এক ঠাঁই। নদী-বাঁধের ওপর সবার আবাসস্থল। মাথার ওপর ত্রাণশিবিরের দেওয়া পাতলা পলিথিনের শামিয়ানা। তার তলায় হাজার হাজার মানুষের কোনরকমে বেঁচে থাকার জীবন। ভরসা রামকৃষ্ণ মিশনের ত্রাণশিবিরের সাহায্য।

রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মীরা প্রাণপাত পরিশ্রম করে সেবাকাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এই দুর্গম জায়গায় সেবাকাজ চালানো খুবই দুরূহ ব্যাপার। চাল, ডাল, তরকারি, তেল, মসলা, বাসনপত্র, এমনকি রান্নার কাঠ পর্যন্ত কলিকাতা থেকে এনে ত্রাণকাজ চালাতে হচ্ছে। আনাও খুব সহজ ব্যাপার নয়। বোম্বে রোড বিধ্বস্ত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ত্রাণসামগ্রী নিয়ে ট্রাকের পর ট্রাক দাঁড়িয়ে। ছাড়া পেলে সোজা আসবে নরঘাট। রাস্তা কোথাও জলের তলায়। তার ওপর দিয়ে সন্তর্পণে ট্রাক আনতে হবে। নরঘাট এসে মাল নামবে। আবার নৌকায় তুলে মূল কেন্দ্র বাকচা বিবেকানন্দ জনসেবা কেন্দ্রের দিকে যাত্রা। জোয়ারে যেতে হয়। সময় চলে গেলে পরের জোয়ারের জন্য নদীর ঘাটে খোলা আকাশের নিচে অপেক্ষা। পথে আছে লুঠেরা এসব করে ত্রাণসামগ্রী এনে মূল কেন্দ্রে তোলা। এখান থেকে নয়টি কেন্দ্রে মাল পাঠানো হয়। সে আর-এক কঠিন কাজ। খাল দিয়ে তীব্র বেগে জল নামছে। জোয়ারের সাধ্য নেই সেই বেগ ঘুরিয়ে দেয়। এই অবস্থায় বোঝাই নৌকা টেনে টেনে নিয়ে যাওয়া। সারারাত ধরে নৌকা টানা। মাঝিদের সঙ্গে মিশনকর্মীরাও নৌকা টানছে জল জঙ্গল কাদার মধ্য দিয়ে সারারাত ধরে। ভোর হবার আগে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছোতেই হবে। নইলে রান্না হবে না। দুর্গত মানুষ অনাহারে থাকবে। প্রথম দিকে তো নৌকায় করে দূর থেকে জল এনে রান্না চলেছে। তারপরে বাঁধের ওপর নলকূপ বসিয়ে সেই নল-কূপের জল দিয়ে রান্না আর শিবিরের পানীয় জলের ব্যবস্থা। এভাবে চলছিল নয়টি কেন্দ্রের সেবাকাজ। এক কেন্দ্র থেকে অপর কেন্দ্রের খবর সংগ্রহ বা খবর পাঠানোও ছিল এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

সেটা ছিল পূজার মাস। কলিকাতা বা অন্যান্য শহরে দুর্গাপূজা চলছে মহা সমারোহে। মণ্ডপে মণ্ডপে প্রতিমা। হাজার হাজার ভক্ত নরনারী মাকে দেখছেন, আনন্দ করছেন। দোকানে কেনা-বেচারও কমতি নেই। পূজা বোনাস সবই আছে। বন্যার্ত

এলাকায় এবার পূজা হয়নি। কোথাও বর্ষণে প্রতিমা বিনষ্ট, কোথাও মণ্ডপ জলে পরিপূর্ণ, কোথাও গেরস্তের ঠাঁই বাঁধের ওপর, পূজা করবে কে ?

একটি সেবাকেন্দ্রে একদিন দেখা গেল, রান্না-করা খাবার প্রচুর পরিমাণ উদ্বৃত্ত হয়ে গেছে। গ্রহীতার সংখ্যা অনুযায়ী রোজকার মতো রান্না হয়েছে, অথচ বাড়তি হল। কর্মীদের দুশ্চিন্তা। দেখা গেল, অনেকেই সেদিন খাবার নিতে আসেনি।

জায়গার অভাবে বসিয়ে খাওয়াবার ব্যবস্থা এই নয়টি শিবিরের কোথাও করা সম্ভব হয়নি। পাত্র আর কার্ডসহ এসে খাবার নিয়ে যেতে হত। খাবার নেয়নি দেখে কর্মীরা সিদ্ধান্ত করলেন, বিকেল পর্যন্ত দেখা হবে, তারপরে যারা কাছে আছে তাদের ডেকে এনে খাবার দিয়ে দেওয়া হবে। শেষে বিকেলে দেখা গেল, কার্ড নিয়ে সবাই আসছে। বেশির ভাগ মহিলা। সবাই খাবার নিয়ে গেল। আর উদ্বৃত্ত কিছু রইল না। কর্মীদের উদ্বেগ কিন্তু কমল না। তাদের মনে নানা ভাবনা, কোন মহল থেকে উস্‌কে দেয়নি তো! প্ররোচিত করেনি তো কোন স্বার্থসন্ধানী মহল! একটা সঙ্কট সৃষ্টির চেষ্টা চলছে না তো আবার! এরকম নানা জল্পনা চলছে কর্মীদের মাথায়। আশঙ্কা অমূলকও নয়, ত্রাণশিবিরের ক্ষুধার্ত মানুষ নিয়ে স্বার্থসন্ধানী মানুষের তৈরি নানা সঙ্কট কর্মীরা পূর্বে প্রত্যক্ষ করেছেন।

সন্ধ্যায় কর্মীরা নিত্যকার মতো গেলেন শিবিরের মানুষদের কাছে। রোজকার মতোই খোঁজখবর নিচ্ছেন। সুবিধা-অসুবিধার কথা জানছেন। প্রসঙ্গক্রমে উঠল দুপুরে বাড়তি খাবারের কথা। এক বুড়ো বললেন: আজ দুপুরে আমরা মায়ের নামে উপোস দিয়েছি। আজ মহাষ্টমি জানছ না। এদিকে তো মায়ের কোন পুজো হয়নি, তাই ময়নাগড়ে গিয়েছিলাম মায়ের পুজো দিতে।

আড়ংকিয়ারাণা গ্রামে এই শিবির। ময়না-গড় এখান থেকে সাত মাইল হাঁটাপথ। পথের অনেকটা অংশ জলের তলায়। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে মায়েরা গেছে এই সাত মাইল পথ হেঁটে। গেছে বুড়ো-বুড়ী, জোয়ান-মদ্দ অনেকে। সেই রাত থাকতে উঠে যাত্রা করেছে, মায়ের পূজা দিয়ে আবার সাত মাইল জল-কাদার পথ হেঁটে বিকেলের মধ্যে ফিরে এসেছে। অনেকের সন্তানের জন্য মানসিক ছিল। তাই বাচ্চাকে নিতে হয়েছে। মিশনকর্মীটি বললেন: কি কষ্টের মধ্যে আপনারা রয়েছেন—মা তো নিজেই দেখছেন, এত কষ্ট করে অতটা পথ না গিয়ে এবারকার মতো এখান থেকে মাকে প্রণাম করলেই পারতেন।

একজন প্রৌঢ়া, মাথার ঘোমটায় মুখের একদিকটা ঢেকে বললেন: তুমি না মেশনের (রামকৃষ্ণ মিশনের) নোক, তুমি একথা জানাচ্ছ কি করে? তোমাদের মুখে এসব কথা শুনতে ভাল লাগে না।

মিশনকর্মী বললেন: এতটা পথ জল-কাদা হেঁটে গেছেন, আবার ফিরেছেন, বাচ্চা-কাচ্চা সঙ্গে রয়েছে, পথে যদি কোন বিপদ হত! তাই বলা।

মহিলার দ্রুত জবাব: বিপদ হলে তুমি ঠেকাতে পারতে? এই যে ঘরবাড়ি ভেসে গেছে, বাঁধের ওপর রয়েছি, তোমাদের খাবার খাচ্ছি, পেরেছ ঠেকাতে? বিপদ দিলে মাই দিবেন, রক্ষা করলে তিনিই করবেন। মায়ের নাম করে বেরিয়েছি, বিপদ হলে মাই দেখবেন। তুমি ওরকম কথা আমাদের বলতে এসোনি বাপু!

অপর একটি মহিলা ঘোমটায় মুখ ঢেকে

বললেন : বছরে একবার মা এসেছেন, মাকে দেখলাম, পুজো দিলাম, মায়ের পায়ে সিঁদুর ছুঁইয়ে নিয়ে এলাম। এসব কি খারাপ কাজ হয়েছে ?

মিশনকর্মী জবাব দিলেন : খারাপ কাজ কেন হবে—এ তো ভালই কাজ—বলছিলাম, আপনাদের কষ্টের কথা ভেবে—

—কষ্টের কথা আর তুলবেন না, এমনিতেই কি সুখে আছি, এর চেয়ে বেশি কষ্ট আর কি হবে ? মায়ের নামে কষ্ট মনে হয় না।

—বাচ্চাগুলিকে নিয়ে গেলেন কেন ?

জবাব দিলেন আর-একটি মহিলা : ঘরের মানুষ চলে গেলে, বাচ্চা থাকে কার কাছে ? আর বাচ্চা কি থাকতে চায় ? অনেক বাচ্চারই মানসিক পুজো ছিল। আমিও তো আমার ছোট মেয়েটাকে নিয়ে গেছি। মানসিক পুজো দিয়ে এসেছি। এবার আর কিছু যোগাড় করতে পারিনি। চারখানা বাতাসা কিনেই মাকে দিলাম। এবার তো কিছু নেই—

—আমাদের বলে গেলেন না কেন ?

জবাব দিল তার যুবক-স্বামী : বলে গেলে যদি আপনারা যেতে না দেন। তাই বলা হয়নি।

—বলে গেলে খাবারটা রেখে দেওয়া যেত, আমাদের অত ভাবতে হত না। খাবারটা দিয়ে দিলে তো উপোস করেই থাকতে হত সকলকে।

জবাব দিলেন আর-এক মহিলা : ময়নার লোককে আর উপোসের ভয় দেখিও না। উপোস করেই তো আমরা বেঁচে থাকি ! আমরা দুঃখী মানুষ। ছেলেপিলে নিয়ে কদিন আমরা দুবেলা ভাত খাই ? মায়ের নামে দুপুরে তো উপোসই ছিল। না হয় রাতটাও মায়ের নামেই যেত। কত রাতই তো উপোস যায় !

বিস্মিত হয়ে ফিরে এলেন মিশনকর্মীটি। বাঁধের ওপর যাদের বাস, ত্রাণশিবিরের খাবার যাদের একমাত্র অবলম্বন, ভবিষ্যৎ যাদের একান্ত-ভাবেই অনিশ্চিত, সেই মানুষগুলির মনে এই প্রেরণা, এই সাহস, এই শক্তি যোগায় কে ? যেতে-আসতে চোদ্দ মাইল পথ। কোলে-কাঁখে শিশু। পথ জলের তলায়, একটু ফসকালেই বিপদ। জলের টান চলছে উল্টোমুখী। ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। এই চোদ্দ মাইল জলের তলার মাটির পথের ওপর দিয়ে হাঁটা অমরনাথ তীর্থে যাওয়ার চেয়ে কষ্ট কম নয়। সেই কষ্ট ওদের বাধা সৃষ্টি করেনি। সারাদিন উপোস করে ঐ পথের ওপর দিয়েই শিশু কোলে নিয়ে ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে বুড়ো-বুড়ীরা। জোয়ান-মদ্দরা। এসেছে বৌ-ঝিরা। কোন্ জাদুতে এই কষ্ট দেহমনে ক্লান্তি আনে না ! এরা তো বেশির ভাগই নিরক্ষর, দরিদ্র মানুষ। অর্থনীতির অঙ্কে দারিদ্র্যসীমার নিচেই ওদের অবস্থান। এদের কাছে খাওয়ার চেয়ে, পথ-কষ্টের চেয়ে বড় হল জগন্মাতাকে দেখা, মাকে দেওয়া—এই তত্ত্ব কে শেখাল ওদের ?

অনেকের কথায় ওরা নানা সময় নানা হাঙ্গামা বাধায়, ঘেরাও করে, মিছিল করে। কই কেউ তো আটকাতে পারল না ওদের ! কোন তত্ত্বই তো রুখতে পারল না মাতৃদর্শনের দুর্লভ আকাঙ্ক্ষা থেকে ! মিশনের ত্রাণশিবির, যেখান থেকে জুটছে খাওয়া-পরা, ওষুধপথ্য, মাথার ওপর আচ্ছাদন, নিচে বসার আসন, সেই ত্রাণশিবিরকে উপেক্ষা করতেও তো ওদের সাহসের অভাব হয়নি। কিসের টানে, কার আকর্ষণে ওদের এই দুর্জয় অভিযান ? এই কঠোর সাধনা ?

এ-টান ভগবানের। এই আকর্ষণ মায়ের। হাজার হাজার বছরের সংস্কৃতিই ওদের টেনে নিয়ে গেছে এই সাধনার পথে। যে টানে রাজপুত্র ভিখারীর বেশ ধরে। মরণে কৃতার্থ করে জন্মশোধ শেষ পূজা করে। এ সেই টান ! নেশা করিয়ে

আচ্ছন্ন করে ওদের কেউ রাখেনি। এ-ব্যাপারে ওরা সদাজাগ্রত, সদা সচেতন। ওরা জাগ্রত আর সচেতন বলেই খাবার উপেক্ষা করে ছুটে যায়, পথের বিপদ জেনেও সেই পথেই পা বাড়ায়। দেহের কষ্ট থেকে হৃদয়-মনের আনন্দই সেখানে বড় কাম্য। ভগবানের টানের কাছে সবকিছু তুচ্ছ হয়ে গেছে। ধনী-গরীব সেখানে একাকার। ওরা ভগবানকে ধরে, ভগবানকে ঘিরে বাঁচতে চায়। এটাই ওদের ধর্ম। আর এই হল ভারতবর্ষ। স্বামী বিবেকানন্দ ভারত-বর্ষের এই মহিমার কথাই কি উচ্চকণ্ঠে বারবার ঘোষণা করেছেন! ভারতের এই চিত্র দেখেই কি তিনি ভারতের মানুষকে গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন!

আর একটি ঘটনা।

ঘটনার স্থান মেদিনীপুর জেলারই ভগবানপুর থানা। গ্রামের নাম উত্তরবাড়। নরঘাটের পর পশ্চিমদিকে হলদি নদীর নাম হয়ে গেল কেলে-ঘাই। এই কেলেঘাই নদীতে এসে মিশেছে কাঁসাই, আর চণ্ডিয়া নদী। কাঁসাই চণ্ডিয়া ছাড়িয়ে যেতে হবে আরও পশ্চিমে। চাবুকিয়া বাজারের কাছে এসে কেলেঘাই দক্ষিণমুখো মোড় নিয়েছে। তিনটি থানা এসে মিলেছে এক জায়গায়। কেলেঘাই-এর উত্তরে ময়না, দক্ষিণে ভগবানপুর আর পশ্চিমে সবং থানা। চাবুকিয়া বাজার থেকে খেয়া পার হলেই উত্তরবাড় গ্রাম। নিচু এলাকা। অধিবাসীদের বড় অংশ তফসিল শ্রেণীভুক্ত আর দরিদ্র। অবস্থা এখানেও ময়নার মতো। বেশি বৃষ্টি হলে অন্য জায়গায় ভাল চাষ হয়, এখানে ধান ডুবে যায়। এক ফসলী এলাকা। বৃষ্টি হল তো ধান হল, নইলে শূন্য। প্রকৃতির আর-একটি সম্পদ এখানে আছে, সে হল মাদুরকাঠি। জলা জায়গায় প্রচুর মাদুরকাঠি তৈরি হয়। মাদুর-শিল্প এই এলাকার মানুষের জীবিকার একটি উৎস। মহাজন আর নানা পর্যায়ের ফড়েদের হাত গলে ছিটে ফোঁটা এলেও অনেককে এর ওপর নির্ভর করে থাকা ছাড়া উপায় নেই। এটাই এই এলাকার মানুষের নির্মম বিধিলিপি।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ থেকে এই গ্রামে মাদুরশিল্পের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে স্থানীয় পল্লী উন্নয়ন তরুণ সংঘের মাধ্যমে। দুঃস্থ মহিলারা মাদুরের কাজ করে কিছু উপার্জনের সুযোগ পেয়েছে। মহাজনের কাছে না গিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সাহায্যে মূলধন তৈরি করে, তাই দিয়ে মাদুরের কাজ করে খোলা বাজারে বিক্রি করে। পরিবারের আয় বাড়ানো —প্রকল্পের এটাই মুখ্য উদ্দেশ্য। পনেরজন দুঃস্থ মহিলা এই কাজ করছে। মিশনকর্মীদের মাঝে মাঝে তদারকিতে যেতে হয়। যেতে হয় গ্রহীতাদের সঙ্গে বসে অবস্থা পর্যালোচনা করার

সেটা ছিল ১৯৮৩-র অগস্ট মাস। মিশনের কর্মী ঐ গ্রামে মহিলাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাজ দেখছেন। তাদের সুবিধা-অসুবিধার খবর নিচ্ছেন। একজন মহিলা (বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে) মিশনকর্মীর পেছন আর ছাড়ছে না। সব কটি বাড়ি দেখার পর তরুণ সংঘের বারান্দায় বসেছে ঐ পনেরজন মহিলাকে নিয়ে আলোচনা সভা। যে-সব সমস্যা দেখা দিয়েছে, কি করে সেগুলি দূর করা যাবে তাই নিয়ে কথা হচ্ছে। সংঘের কিছু তরুণ কর্মীও বসেছে সভার পেছনে। সেই মহিলাও আছে। আলোচনা শেষ হল। সেই মহিলা এতক্ষণে বলল, আমাকে একটা কল (মাদুরের তাঁত আর টাকা) দাও বাবু। আমি কি খেয়ে বাঁচব? পেছন থেকে তরুণরা বলে উঠল: বুড়ী, তোমার মেয়েকে তো দেওয়া হয়েছে! বুড়ী বিরক্ত হয়ে বলল: চার-পাঁচটা

প্রাণী ঐ একখানা তাঁতে হয়, তুমিই বিচার কর বাপু।

বুড়ীর আর কেউ নেই মেয়ে আছে। মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল। জামাই ভাল কাজ করে কলিকাতায়। মেয়ের তিনটি সন্তান। জামাই আবার বিয়ে করে সেই বউ নিয়ে কলিকাতায় আছে। এই বউ আর সন্তানের খোঁজও নেয় না। টাকাপয়সাও দেয় না। ছেলেমেয়ে নিয়ে বউটি দিনের পর দিন উপোস করে। বুড়ী আর কি করে, মেয়েকে নিজের বাড়ি এনে তুলল। বুড়ীর নিজেরও কিছু নেই। স্বামী নেই। জমিজমা নেই। ছোট্ট একখণ্ড জমির উপর একখানি ভাঙা কুঁড়েঘর। তাও চালে খড় নেই। বুড়ীর এইমাত্র সম্বল। বারান্দায় জল পড়ে, তার মধ্যেই মেয়ের জন্য একখানা তাঁত পেতেছে। ওতে কুলোয় না। তাই তার দাবী আর একখানা তাঁত।

ছেলেরা বুড়ীকে চটাবার জন্য বলল : বুড়ীর অনেক টাকা আছে। এবার আট প্রহর হরিনাম দিয়েছে। অনেক লোক খাইয়েছে। বুড়ী চটে গিয়ে বলল : হরিনাম করেছি, বেশ করেছি, তোদের তাতে কি? গরীব বলে হরিনাম শুনব না? গরীবের আর কি আছে?

চৈত্র-বৈশাখ মাসে এই সব জায়গার অনেকের বাড়িতে হরিনাম হয়। কেউ আট প্রহর, কেউ চব্বিশ প্রহর, যার যেমন ক্ষমতা। বুড়ী শুনতে যায়। তার মনে বড় সাধ, বাড়িতে একটু হরিনাম দেয়। কীর্তনিয়ারা আসবে, হরিনাম হবে। ভক্তেরা আসবে। কত আনন্দ হবে! সাধ থাকলেই তো হয় না, সাধ্যও চাই। জায়গা দরকার, টাকাপয়সা দরকার, লোকজন দরকার। এর কোনটাই নেই। তবু সে হাল ছাড়ে না। গ্রামে গ্রামে ভিক্ষায় বেরোয়। তার আগ্রহ দেখে অনেকেই সাহায্য করেন। এসব জায়গায় এই রকম নিয়ম এখনও চালু আছে কেউ হরিনাম করতে আগ্রহী হলে অনেকেই সাহায্য করেন।

এই ছেলেরাই তখন এগিয়ে এসে সবকিছু করে-কম্মে দেয়। ওরাই লোকজন যোগাড় করে, কীর্তনিয়ার দল ডেকে আনে, বাসনপত্র যোগাড়-যন্ত্র করে আনে, কীর্তনের জায়গায় শামিয়ানা খাটায়—সবকিছু এরাই করে দেয়।

মিশনকর্মীটি বললেন : গ্রামের কত বাড়িতেই তো নামযজ্ঞ হয়েছে, সেখানেই তো শুনেছ আবার এত হাঙ্গামা করে নিজের বাড়িতে না করলেই হত। গরীব মানুষ—

বুড়ী দপ্ করে জ্বলে উঠে বলল : তুমি কেমন মেশনের নোক? তোমার মুখে এই কথা?

—তুমি গরীব মানুষ, লোকজন নেই, ঘর-বাড়ি নেই, টাকাপয়সা নেই; তাই বলছিলাম একথা।

বুড়ী তা মানতে চায় না। বুড়ীর চোখের কোণে জল। বলতে থাকে আপন মনে : কি নিয়ে থাকব বল তো! এই নামটুকু নিয়েই তো আছি। ভগবান ছাড়া কে আছে আমার, আর কাকে নিয়েই বা বেঁচে থাকব! ঐ ভগবানকে ধরেই আছি। কষ্ট দুঃখ যেমন তিনি দেন দেবেন। ঠাকুর ছাড়া বাঁচতে পারব না গো!

চোখ মুছে বুড়ী আবার বলে : নিজে ভাল খাব, ভাল থাকব,—এ সাধ তো করিনি। বাড়িতে নামযজ্ঞ হবে, গাইয়েরা আসবে, ভক্তরা আসবে, হরিনাম হবে, জায়গাটা তীর্থক্ষেত্র হয়ে যাবে। এটা কি খারাপ করেছি? মনে যে কি আনন্দ পেয়েছি, তা তোমাকে বোঝাব কি করে?

ছেলেরা সংবাদ দিল, হরিনামের জন্য ভিখ্-মেগে বুড়ী যা এনেছিল সব হরিনামের জন্য দিয়ে দিয়েছে। একটি দানাও নিজের জন্য রাখেনি। তার নামযজ্ঞে খুব আনন্দ হয়েছিল। সবাই খুব

আনন্দ পেয়েছে।

বুড়ীকে চটাবার জন্য একটি ছেলে বলল: বুড়ী, তোমার ঠাকুরের কাছে মাদুরের তাঁত চাইলেই তো পার।

—মুখপোড়া, ঠাকুরই তো সব দিচ্ছে, তোদের হাত দিয়ে দিচ্ছে, নইলে তোরা পাবি কোথায়? তোদের কি ক্ষমতা?—বুড়ী থামিয়ে দিল ছেলেদের। মিশনকর্মীকে উদ্দেশ করে বলল, মুখ পোড়াদের কথা ছাড়, তুমি আমার একটা ব্যবস্থা করে যাও।

দরিদ্র নিরক্ষর বুড়ী নিজের বাঁচার জন্য একখানা মাদুরের তাঁতের প্রার্থী। অথচ আট প্রহর হরিনামের জন্য তার সাহসের অভাব হয়নি। কোথা থেকে আসে এই প্রেরণা, কে যোগায় সাহস, কে দেয় বল? এত দারিদ্র্য, এত কষ্ট, এর মধ্যেও হরিনাম ভুল হয় না। রাগ হয় না ভগবানের উপর; উল্টে বলে, ভগবান ছাড়া বাঁচতে পারবে না। কে শেখায় এসব কথা? কিসের আশায় বুড়ী এত কষ্টের মধ্যেও ভগবানকে ধরে আছে, ভগবানকে ধরেই বাঁচতে চায়? বুড়ী চায় হৃদয়ে তৃপ্তি, প্রাণে আনন্দ। তার কাছে টাকাপয়সা, ঘরবাড়ি তুচ্ছ। ভিক্ষা করে সেই আনন্দ পাওয়ার বাসনা তার। এতে অসম্মান নেই। আনন্দ আছে। সেই আনন্দটুকুই সে প্রাণভরে পেতে চেয়েছে। ভগবানের নামে ভিক্ষা করে আনা সামগ্রীর শেষ অংশটুকু নিঃশেষে খরচ করে, পরদিন থেকেই উপোস করেও আনন্দ পেয়েছে সে। এই আনন্দের প্রত্যাশাতেই যুগ থেকে যুগান্তর ভারতের মানুষ ঈশ্বরমুখী অভিযান করেছে। এই বুড়ীও সেই ভগবন্মুখী অভিযাত্রী দলের একজন। এই হচ্ছে ভারত। এই ঈশ্বরবিশ্বাসী ভারতেরই কথা স্বামী বিবেকানন্দ তুলে ধরেছেন জগতের সামনে। এই পুণ্য তীর্থভূমির মানুষের অন্তরের ঐশ্বর্যের দিকে টেনে আনতে চেয়েছেন সকলের নজর। আমরা তাদেরই সন্ততি—আন্তর ঐশ্বর্যের আমরাও উত্তরাধিকারী। এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন স্বামীজী।

দেহের সুখ-দুঃখ যাই হোক, ভক্তের জ্ঞান, ভক্তির ঐশ্বর্য থাকে, সে ঐশ্বর্য কখনও যাবার নয়। দেখ না—পাণ্ডবদের অত বিপদ! কিন্তু এ বিপদে তারা চৈতন্য একবারও হারায় নাই। তাদের মত জ্ঞানী, তাদের মত ভক্ত কোথায়?

—শ্রীরামকৃষ্ণ

প্যারিস পেরিয়ে

ডক্টর অমিয়কুমার হাটি

[পূর্বানুবৃত্তি]

পেঁছে গেলাম নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টার—বেলুড় মঠের শাখাকেন্দ্র। এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় স্বামী নিখিলানন্দ বেদান্ত ও ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারে একটি অনবদ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর আচার-আচরণে আপামর জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করেছিলেন। তাঁর দেহাবসানের পরে এই কেন্দ্রটির অধ্যক্ষ এখন স্বামী আদীশ্বরানন্দ।

কলিংবেল টিপতেই একজন তরুণ সাহেব এলেন, পরিচয় দিতে নিয়ে গিয়ে দোতলায় একটা ছোট হলঘরের মতো জায়গায় বসালেন। সোফা সেট পাতা আছে। কয়েকটা আলমারিতে বেশ কিছু বই আছে। মিনিট ৪৫ বসে থাকতে হল। অনিল মহারাজ বা আদীশ্বরানন্দজী নামলেন প্রায় ১০টা নাগাদ।

চিনতে পারলেন। আর উৎকণ্ঠাও প্রকাশ করলেন কেনেডি বিমানবন্দর থেকে ফোন করার পর আর কোন খবর পাননি বলে। অনেক রাত অবধি চিন্তা করেছেন। একটু বিব্রত হলাম। হয়তো ফোনে ভুল শুনেছি বা বুঝেছি। এ জানলে আমিই ফোন করতে পারতাম ওয়াই. এম. সি. এ. থেকে।

খাওয়ালেন অনেক কিছু। ইংলিশ বা আমেরিকান ব্রেকফাস্ট। রাতেও খেতে বললেন।

খেতে খেতে শুধালেন—"এখন কি কর ?"

—"একটি মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষকতা।"

—"প্র্যাকটিশ করলে তো আরও টাকা রোজগার করতে পারতে ?"

—"হ্যাঁ, তবে, শিক্ষকতাই বেছে নিয়েছি।"

—"তা ভাল।"

এমন সময় কয়েকটা মাছি উড়তে দেখলাম। নিউইয়র্কে মাছি! "মহারাজ, মাছি আছে এখানেও ?"—"কখনো-সখনো, দু-চারটা। কোন কোন জায়গায় কোন কোন সময়ে মশার উপদ্রবও বেশ, যেমন থাউজাণ্ড আইল্যাণ্ডে।" বললেন মহারাজ।

—"আবহাওয়াটা এখন বেশ ভাল। শীত কবে পড়বে ?"

—"শীত হয়তো আর কিছুদিন পরেই নামবে। তবে, এবার চার-পাঁচ মাস আগে বেশ গরম পড়েছিল এখানে। পাখা চালাবার মতো অবস্থা।"

—"আপনি কতদিন যাননি ভারতে ?"

—"তা অনেকদিন। যেতে পারি দু-এক বছরের মধ্যেই। তবে গেলে শীতের সময় যেতেই চেষ্টা করব। এপ্রিল মে-র গরম ভয়ানক তা ছাড়া ঐ সময় কাজের চাপও থাকে এখানে।"

—"ঠিকই।"

—"তা তোমার কি পরিকল্পনা ?" শুধালেন মহারাজ।

—"মহারাজ, আমি নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখতে যাব। শুনেছি এখান থেকে গ্রে হাউণ্ড বাস ছাড়ে, তাতে যাওয়া যায়। ওটার একটু খোঁজ আমাকে করে দিতে হবে। আর আজ দেখতে চাই নিউইয়র্ক শহর।"

—"নায়াগ্রাতে হোটেলে থাকবে তো এক-রাত ?" আবার শুধালেন মহারাজ।

—"সে ইচ্ছা আমার নেই, কারণ তাতে অনেক টাকা লাগবে। এমনিতেই এখান থেকে যাতায়াতে হাজার খানেক টাকা শুনেছি।"

—"ঠিকই। কিন্তু আমি বলি কি, ওখানে হোটেলে একদিন থেকো।" মহারাজ বললেন।

—"যেতে কিরকম সময় লাগবে ?" শুধাই স্বামী আদীশ্বরানন্দজীকে।

—"এখানে সকালে বাসে চাপলে ওখানে বিকালে পৌঁছুবে। তোমার জিনিস সব সঙ্গে নিয়েই যাবে, রাতে হোটেলে থাকলে ভাল হবে। দুদিন দেখতে পাবে নায়াগ্রা।" মহারাজ হোটেলে থাকার উপরই জোর দিলেন।

এখন, হোটেলে থাকতে নিশ্চয়ই একরাতের জন্যে পাঁচ-সাতশো টাকা লাগবে। এরপর আছে লণ্ডন। কাজেই, সব খুলেই বললাম ওঁকে, যদি একান্ত অপারগ হই, তাহলেই সেরকম হোটেল বা মোটেল (Motel) সস্তা দেখে বেছে নেব, যদিও ওখানে সস্তা হোটেল মেলা দুরূহ। নইলে রাতের ফিরতি বাসেই ফিরব। আর, আরও একটা নিবেদন জানালাম, আমার নিউইয়র্ক ছেড়ে যাবার দিনটা একটু এগিয়ে আনার জন্যে কিছু করা যায় যদি, তার ব্যবস্থা করতে।

"ওটা সম্ভব।" মহারাজ তরুণ সাহেবটিকে ডাকলেন, এবং নির্দেশ দিলেন। ফোনে এয়ার ইণ্ডিয়াকে জানানো হল, পরশু লণ্ডন পাড়ি দেব। সন্ধ্যায়। অসীম কৃতজ্ঞতা জানালাম মহারাজজী-কে। কিন্তু মনে কেমন একটা অসহায় শূন্যতা-বোধ। নিউইয়র্ক বা তার আশেপাশে অনেক বন্ধুবান্ধব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তাদের কারুর ঠিকানাই সময়াভাবে আনতে পারিনি, সেই জন্যে কি ? তাদের কথা ভেবে ? হবে হয়তো বা। বারবার তো আর এসব জায়গায় আসা হয় না! তাদের দু-একজনের কথা মহারাজকে জিজ্ঞেসও করলাম—যদি পরিচয় থেকে থাকে—কেউ কেউ আবার এদের মধ্যে বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন ছাত্রও। মহারাজ কারুকেই চিনতে পারলেন না, কারুর ঠিকানাই পাওয়া গেল না।

মহারাজ হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন। আঁচ পেয়েছিলেন আমার মনের। শুধালেন, "কি, মন খারাপ করছে, দেশের জন্যে ?"

তাই কি ? দেশের জন্যে এখন থেকেই শুরু হল কি মন খারাপ—যাকে বলে নস্ট্যালজিয়া ? কিন্তু আর কদিন পরেই তো দেশে ফিরব! কী জানি!

দক্ষিণদেশীয় এক ভদ্রলোক এসেছিলেন আজ আশ্রমে দুপুরবেলা। গাড়ি ছিল তাঁর। নিউইয়র্কে আছেন অনেকদিন। কি একটা কোম্পানিতে কাজ করেন। তাঁর গাড়িতে করে তরুণ আমেরিকান ব্রহ্মচারীটিকেও আমার সঙ্গে পাঠালেন মহারাজ। সঙ্গে দিয়ে দিলেন লাঞ্চ প্যাকেটও। বললেন, যেখান থেকে নিউইয়র্ক দেখার বাস ছাড়ে, সেখানে পৌঁছে দিতে। জায়গাটা আমাদের ওয়াই. এম. সি. এ.-র কাছে।

গাড়িতে করে যেতে যেতে পড়লাম ট্র্যাফিক জ্যামের মুখে। কোন গাড়ি নড়ে না চড়ে না। কখন যে এই জ্যাম শেষ হবে, কেউ বলতেও পারে না। কি ব্যাপার ?

—"কোথায় কি একটা ধর্মীয় মিছিল বেরিয়েছে।" এ যে কলকাতাকেও টেক্কা দিল দেখছি, তাই গর্বে (!) বুকটা বেশ ফুলে উঠল, যদিও মনে ভয়, ঠিক সময়ে পৌঁছুতে না যদি পারি, তাহলে নিউইয়র্ক শহর দেখা বোধ হয় আর হবে না। সহজেই পার পেয়ে গেলাম মনে হয়, গাড়ির সারি এগিয়ে চলল, প্রায় ঠিক সময়েই পৌঁছুলাম যেখান থেকে বিশেষ বাসে শহর ঘোরানোর ব্যবস্থা আছে। টিকিট কাটার সময় পকেটের সব ডলারগুলো বের করে তার থেকে দশ ডলার নিয়ে দিলাম। তাই দেখে সেই আমেরিকান ব্রহ্মচারী ব্যারি বারবার আমাকে সাবধান করে দিলেন, এরকমভাবে যেন টাকা বের না করি, তাহলে ছিনতাই হতে পারে। কয়েক ডলারের জন্যে খুন করাও এ শহরে কিছু একটা ব্যাপার নয়। ব্যারিকে ধন্যবাদ জানালাম,

বললাম, আমি অতঃপর সাবধানেই থাকব।

শুনেছি শ্রদ্ধেয় এক মহারাজের কথা। এখানকার হোটেলের বাথরুমে গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীর গলা টিপে ধরে তাঁর সব কিছু কেড়ে নিয়েছিল। দুর্বৃত্ত সেই সন্ন্যাসীর ঝোলা থেকে কটা ডলারই বা পেয়েছিল!

আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে শহর-বন্দর নিউইয়র্ক। সব থেকে কর্মব্যস্ত বন্দর। শহর হিসাবে পৃথিবীতে অনন্ত। বিশালতায়, বৈচিত্র্যে, ঐশ্বর্যে, আড়ম্বরে সকলেরই মন কাড়ে। এবং রয়েছে প্রাণের স্পন্দন ও চাঞ্চল্য। কলকাতার মতো। অনুভবময়। মায়াবী। এরা বলে, নিউইয়র্ক সব শহরের সমাহার, পৃথিবীর সব থেকে উত্তেজনাময় শহর, এরা এর নাম দিয়েছে বড় আপেল—বিগ্ অ্যাপল! সেই শহর দেখায় রোমাঞ্চ তো আছেই! এই শহরের ১০২ তলা এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর নাম জগদ্‌বিখ্যাত, এখন অবশ্য এর থেকেও উঁচু বাড়ি আছে শিকাগো শহরে, এর পুরানো গৌরব এ হারিয়ে ফেলেছে। জাতিপুঞ্জের সদর দপ্তরও এখানে—১৮ একর জায়গা নিয়ে এ জায়গাটাও ওয়াই. এম. সি. এ. হোটেলের কাছাকাছি ৪২ থেকে ৪৮ নং সড়কের মধ্যে। রেলের যে কেন্দ্রীয় স্টেশন—টার্মিনাস—সেটাও বিশাল—৫৫০ ট্রেন রোজ যাতায়াত করে। তবে নিউইয়র্কের পাতাল রেল খুবই পুরানো ও ঝরঝরে। তেমন চটকদার নয়। এবং অনেকে অনেকবার সাবধান করেছেন, একা একা কখনই যেন পাতাল রেলে না চড়ি নিউইয়র্কে। অনেকবার স্টেশনে নেমে এগুতে গিয়েও (টিকিট বেশ সস্তাই) পিছিয়ে এসেছি—দৈত্যপুরীর মতোই মনে হয়েছে। এত জনের নিষেধ এড়িয়ে নিউইয়র্কে পাতালরেলে চাপার সাহস অর্জন করতে পারিনি! ভীরু বাঙালী আর কাকে বলে!

একটা বিরাট বড় গীর্জার সামনে এসে বাস দাঁড়াল। এটা সেণ্ট জন ক্যাথিড্রাল—গোথিক ভাস্কর্যে পৃথিবীর সব থেকে বড় গীর্জা। আবার নতুন করে গীর্জা তৈরি হচ্ছে নানান ধরনের পাথরের বড় বড় চাঁই দিয়ে। অনেক দাতা আছেন, যাঁরা দান করছেন পাথরগুলোতে তাঁদের নাম খোদাই করা থাকবে, এক-একটা পাথরের দাম দেড় হাজার টাকা থেকে পঁচাত্তর হাজার টাকা পর্যন্ত।

নিউইয়র্কের হার্লেম হচ্ছে সাদা কথায় কালো মানুষের বস্তি। হার্লেম-এর পথে ঘাটে আবর্জনার স্তূপ হামেশাই চোখে পড়বে, চোখে পড়বে নোংরা বেশভূষা, দারিদ্র্য, হতাশার ছবি। ব্যারাক-ধরনের বাড়ি। বেশ খানিক জায়গা জুড়ে। ভিতরে কালো সংস্কৃতির একটা গবেষণা কেন্দ্রও আছে। নিউইয়র্কে নিগ্রোর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ। নানা কারণে এ সংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

ভাবতে এখনও অবাক লাগে, যেখানে স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি আলোকবর্তিকা আকাশে উঁচু করে তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সেখানেও সাদাকালোর দ্বন্দ্ব মেটেনি। এই সেদিনও ছিল "জিম ক্রো" বলে জঘন্য এক আইন—বাসে কালো চামড়ার লোকেরা সামনের আসনে বসতে পেত না, সাধারণ প্রেক্ষালয়ে ঢুকতে পারত না, একই সঙ্গে বসে সিনেমা দেখবার অধিকার ছিল না। রোজা পার্ক নামে এক নিগ্রো ভদ্রমহিলা অবসাদে ক্লান্ত হয়ে প্রথম এ নিয়ম ভাঙেন ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে আলাবামার মণ্টগোমরী শহরে, সঙ্গে সঙ্গে কারাদণ্ড। তাঁর মুক্তির আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা নেন মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়ার)। নিগ্রোরা বাস বয়কট শুরু করলেন—শত বাধা-বিপত্তির মধ্যে দিয়ে প্রায় একবছর চলল আন্দোলন—শেষ পর্যন্ত আমেরিকার বিবেক

যেন লজ্জা পেল—১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রদ হল ঐ কালা আইন—কালোদের সে এক বিজয়ের দিন। নিগ্রোদের আরও অনেক নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে আনার জন্যে চলল আন্দোলন, সফলতাও লাভ করলেন মার্টিন লুথার কিং। তাঁর এই মানবিক অধিকার অর্জনেব আন্দোলন বিশ্ববাসীর হৃদয় জয় করল, ১৯৬৪-তে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হলেন। কিন্তু সাদাকালোর দ্বন্দ্ব যে মুছে যায়নি, তার জলন্ত প্রমাণ—মানবমুক্তির অসামান্য এই উদ্গাতা নিহত হলেন এর চার বছর পরেই—আমেরিকার স্বাধীনতা উৎসবের দিনটিতে। কী ট্র্যাজেডি! কী অস্থিরতা ও বৈপরীত্যে ভুগছে আজকের আমেরিকা!

হার্লেমের বিস্তার অনেকটা—একটা দিকে আছে এর হাডসন নদী। এ নদীরও দেখা মিলল। তবে এ নদীর জল তো জল নয়—যেন বিষ! শিল্পনগরী হওয়ার জন্যে এ দুর্দশা। কলকাতার গঙ্গারও সেই দশা হতে চলেছে। তবে এখনও কলকাতার গঙ্গার ইলিশ সব থেকে বেশি দামে বিকোয়। হাডসন নদীর সঙ্গেও সাগরের যোগাযোগ—ইলিশ এখানেও দু-চারটা ধরা পড়ে, তবে কেউ খায় না, খেতে দেওয়া হয় না—ফেলে দিতে হয়, পারা এবং আরও সব বিষাক্ত রাসায়নিক পাওয়া গেছে হাডসনের ইলিশ ও অন্যান্য মাছে। এমনকি আইন করে লোককে জলে নামতেও নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। কিছুদিন আগে একটি লোক সাঁতার কাটতে নেমেছিল হাডসনে রাতের বেলা (কত রকম পাগলই আছে!), ভোরে যখন তীরে উঠল, দেখল পুলিস সামনে দাঁড়িয়ে, আর টিভির লোকজন, ক্যামেরা হাতে! জানা যায়নি, লোকটা স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে সাঁতার কাটতে নেমেছিল, না, টিভি-তে মুখ দেখাবার জন্যে! কত লোক যে ওখানকার এ ধরনের আজব সব প্রচার পছন্দ করে!

নিউইয়র্কের আরেকটি সুবিদিত এলাকা টাইম স্কোয়ার। এটা থিয়েটারের কেন্দ্রভূমি। রয়েছে নামজাদা সব সিনেমা, থিয়েটার হল, নাইট ক্লাব, হোটেল ও দোকানপাট। রাতে এর চেহারাই আলাদা—উচ্ছল, জমজমাট, আলোর রোশনাই-এ দিনকেও জয় করে নেয়—যেন পৃথিবীতে জরা নেই, ব্যাধি নেই, দুঃখ নেই, মৃত্যু নেই। এই জায়গাটার নাম বড় সাদা পথ—দি গ্রেট হোয়াইট ওয়ে! কলকাতা শহরের সঙ্গে একটা সাংঘাতিক তফাত আছে এখানে। কলকাতায় তো বেশির ভাগই—সিনেমার টিকিট হঠাৎ গেলে কিনতে হয় কালোবাজারে চড়া দামে, কিন্তু এখানে অর্ধেক দামে থিয়েটার-সিনেমার টিকিট মেলে! এদিক দিয়েও নিউইয়র্ক আজব!

আমরা এখন শহরের আর-একটা ঘিঞ্জি, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র এলাকা দিয়ে চলেছি। "স্যালভেশন আর্মি"র একটা বোধ হয় সংস্থা রয়েছে পঙ্গুদের জন্য—এরকম বেশ কিছু প্রতিবন্ধী নজরে পড়ল—বাসটা জ্যামজটে কিছুটা আটকে পড়েছে। হঠাৎ—একী দেখছি! নিজের চোখকে যে বিশ্বাস করতে পারছি না—বিকেল ৪টা। তখনও রোদ হাসছে নিউইয়র্কে। হঠাৎ উল্টো দিকের ফুটপাতে হৈ হৈ, চিৎকার! দেখি কি, এক ভদ্রমহিলা চেতনা হারিয়ে পড়ে, যে তাকে মেরেছে বা ফেলে দিয়েছে, সে সামনে দিয়েই পালাল, কোন গলিতে মিলিয়ে গেল! ছোটখাটো জটলা, জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা। আমাদের গাড়ির চালক ভ্রূক্ষেপও করল না—জট খোলা মাত্র হুস করে বেরিয়ে গেল!

আমার জীবন একদিক দিয়ে সার্থক হল বৈকি! নিউইয়র্কে দিনে দুপুরে ছিনতাই বা রাহাজানি দেখা—একি চাট্টিখানি কথা!

শুধু সাদাকালোর বিভেদ নয়, আমেরিকার

আরেক শনি মাফিয়া। একটি সুসংবদ্ধ অপরাধি-চক্র। পঁচিশটি অপরাধী পরিবারের কুড়ি হাজার লোকের দখলে সারা আমেরিকা! যেন এক স্বতন্ত্র সরকার—গভর্নমেণ্ট উইদিন গভর্নমেণ্ট! আমেরিকার কোন সরকার এদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি—এতই শক্তিশালী এরা। পঁচিশ জন দলপতি বা গডফাদারের নাকি সবাই ইতালিয়ান আমেরিকান। নিউইয়র্কের দখল রেখেছে এরকম পাঁচ জন গডফাদার। নিজেদের মধ্যে খুনোখুনিতে, ঝগড়ায় গডফাদার বদলও হয়। ধনতান্ত্রিক অন্যান্য বড় বড় শহরের মতোই নিউইয়র্ক নানা অপরাধের কেন্দ্রভূমি—গড়ে চার-পাঁচটা খুন, পাঁচ-দশটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি, নারী-ঘটিত নানা কদাচার। বছরে ভয়ঙ্কর অপরাধের সমস্যা পঁচাত্তর হাজারের উপর। এই মাফিয়াচক্রের নিম্নতম এক দালালের কাণ্ডকারখানা দেখলাম হয়তো নিজের চোখে।

এর সঙ্গে এও মনে রাখা দরকার, আমেরিকায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার ১৩.৫ শতাংশ, বেকারের সংখ্যা সাদা চামড়ার বেলায় ৭ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশ, ওঠানামা করছে, কালো চামড়ার বেলায় সব সময় এই হার দুশতাংশ বেশি।

নিউইয়র্ক একটি আন্তর্জাতিক শহর। কতক-গুলো বিশেষ এলাকা রয়েছে, সেখানে বিশেষ বিশেষ জাতির বাস—কোথাও ইহুদীরা, কোথাও জার্মানরা, কোথাও বা ইতালিয়ানরা। এখন আমরা যেখানে, সেটা চায়না টাউন। একটা সাজানো-গোছানো বৌদ্ধ মন্দিরও দেখলাম, দোতলার উপর। নানান সব শয়তান মার-এর মূর্তি বা পট বা ছবি বুদ্ধমূর্তির চারপাশে। লাগোয়া দোকান-টোকানও রয়েছে। স্মৃতি ধরে রাখতে কিছু কিনে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন। যা অগ্নিমূল্য! স্মৃতি বরং মাথায় ঢোকানো যাক!

সব শেষে নিউইয়র্ক বন্দরে—মুক্তি দ্বীপের ধারে। স্ট্যাটেন আইল্যাণ্ড যাবার জন্তে যেখানে পারাপার করতে হয়, সে জায়গায়। দূরে দেখা যাচ্ছে মুক্তি দ্বীপ—সেখানে সুনীল জলরাশির পারে বিশাল এক মূর্তি—স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি—ডান হাত উঁচু, সোজা আকাশে ধরে আছে জ্যোতির্ময় মশাল। পৃথিবীবিখ্যাত স্বাধীনতার প্রতীক।

এ-মূর্তি কিন্তু আমেরিকাকে দান করেছে ফ্রান্স—১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, আমেরিকার মুক্তিযুদ্ধের সময় ফ্রান্সের সহমর্মিতার স্মৃতি-স্মারক হিসাবে। যে স্তম্ভের উপর মূর্তিটি দাঁড়িয়ে আছে, সেটি ১৫০ ফুট। এর উপর মূর্তিটি মোট ১৫২ ফুট উঁচু। স্থপতির নাম অগস্টি বারথোইডি (Auguste Barthoidi)। এ জায়গা থেকে ফেরিতে করে যাওয়া যায়, তবে সে সময় এবার আর পাওয়া গেল না!

দূর থেকে অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে চেয়ে দেখলাম মূর্তিটা। ফটো নিলাম। বিশ্বের যারা যেখানে যে-কোন রকম পরাধীনতার নিগড়ে বাঁধা আছে—তাদের মুক্তি ত্বরান্বিত হোক!

এবার ফেরার পালা। হু-হু করে বাস এসে নামিয়ে দিল বোধ হয় ৪৭নং সড়কে। আলো জ্বলে উঠেছে, তখন সন্ধ্যা সবেমাত্র। নিউইয়র্কে রোজই যেন দীপাবলী উৎসব!

হাঁটতে শুরু করলাম ৯৪নং সড়কের দিকে। ফুটপাতে নানা জায়গায় হকারের ভীড়—হঠাৎ গজিয়ে ওঠা খাবারের দোকান, আমাদের কলকাতায় ইদানীং চোখে পড়া 'রোল কর্নার'-গুলোর মতো।

সেণ্ট্রাল পার্ক ধরেই যেতে হয়। অনেকটা এর বিস্তার। যখন চলেছি, তখনও দিন একেবারে মিলায়নি। একটা মাতাল দেখলাম, আবোল-

তাবোল বকতে বকতে চলেছে। জায়গাটা নির্জনই। ভয় ভয় করছিল। এ-পথেই রয়েছে নিউইয়র্ক স্টেট থিয়েটার, নিউইয়র্ক সাধারণ গ্রন্থাগার, নিউইয়র্ক হিসটোরিক্যাল সোসাইটি, নিউইয়র্ক মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিসটোরি, একটা প্ল্যানেটরিয়াম। বেশি সময় লাগল না ৯৪নং সড়কে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে যেতে। সন্ধ্যার সময়।

মহারাজ হয়তো ব্যস্ত ছিলেন। ঠাকুর ঘরে বসতে বললেন। অনেকক্ষণ প্রায় ঘণ্টা দুয়েক একাই বসে রইলাম। আর কারুকে দেখলামও না।

এক সময় খাবার ডাক এল। মহারাজ, চারজন আমেরিকান ব্রহ্মচারী, একজন ভক্ত ভদ্রমহিলা এবং আমি। খাবার টেবিলে বসে আমি তো অবাক! একী কাণ্ড! এ আমি কোথায়? কলকাতায় না নিউইয়র্কে! চোখ কচলালাম। ঘুমিয়ে পড়েছি কি? স্বপ্ন দেখছি কি?

একেবারে পুরোপুরি বাঙালী খাবার। থরে থরে। উপাদেয়। কত পদ! ভাত, ডাল, পুঁইশাক, বেগুন ভাজা, বাঁধাকপি, ডিম আলুর ঝোল, গলদা চিংড়ি, টমাটোর চাটনি! অমৃততুল্য। দেশ থেকে আসার পর ভাল করে, তৃপ্তি করে এই বোধ হয় প্রথম খেলাম। —"নস্ট্যালজিয়াতে ভুগছি বলেই কি এই ওষুধ মহারাজ? এতে যে দেশের জন্যে শোক আরও উথলে উঠবে।" বলি অনিল (স্বামী আদীশ্বরানন্দজী) মহারাজকে।

হাসলেন। বললেন, "এক বাঙালী ভক্ত দিয়ে গেছে। আমিই লাগাতে বলেছিলাম পুঁইশাক। দেশ থেকে এনে লাগিয়েছে।"

কখন এসেছিলেন বাঙালী ভক্ত, কি তাঁর নাম, কোথায় থাকেন, কিছু কিন্তু বললেন না। উনি বললেন না বলেই আমিও আর জানতে চাইলাম না। তবে সুদূর প্রবাসে যে ভাবে বাঙালীয়ানা বজায় রেখেছেন, সেই সঙ্গে বদান্যতা—তাতে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করি। আর দেখলাম সাহেব ব্রহ্মচারী এবং মহিলা ভক্তও চেটেপুটে সব খেয়ে নিচ্ছেন। এও এক ধরনের বাঙালী সংস্কৃতির প্রচার। একি ভোলা যায়?

কিন্তু তবুও কিসের একটা অসম্ভব কষ্ট, একটা অস্বস্তি! কেন? কী কারণে? কিসের জন্যে? বস্তুতঃ আমেরিকা আসার সঙ্গে সঙ্গেই কষ্ট এবং অস্বস্তিটি খোঁচা দিচ্ছিল—কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, প্রবল হয়ে মাথা চাড়া দিচ্ছে। সেই সঙ্গে ভয়ানক একটা অসহায়তা এবং হতাশা গ্রাস করে ফেলতে চাচ্ছে আমাকে।

অরুণ! আমি শুধুই ভাবছি অরুণ ব্যানার্জীর কথা। অত্যন্ত প্রতিভাবান, সপ্রতিভ ছেলে। স্কুল ফাইন্যালে অঙ্কে ১০০-তে ১০০ পেয়েছিল। বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরে একসঙ্গে পড়তাম। গভীর বন্ধুত্ব তারুণ্যে—যা প্রসারিত, প্রগাঢ় হয়েছিল যৌবনে। যাদবপুর থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করল। চাকরি নিল রাউরকেল্লায়। বিয়ে করল। স্ত্রী ওর ডাক্তার অনন্যা। চাকরি করতে করতেই ঘুরে এল কয়েক বছর পশ্চিম জার্মানি থেকে। তারপর রাউরকেল্লার চাকরিও ছাড়ল, স্ত্রীকে নিয়ে পাড়ি দিল আমেরিকা। দশবছর আগে সে কলকাতায় এসেছিল, দেখা করেছিল আমাদের সব বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে, তখন সে প্রতিষ্ঠিত—বড় গাড়ি কিনেছে ওখানে, চাকরিতে সুনাম। স্ত্রীও চাকরি করছেন। কিন্তু হয়তো ছিল কিছু পারিবারিক অশান্তি, যার আভাসই শুধু দিয়েছিল। তারপর আর আমরা তার খোঁজ কিছু জানি না—১৯৭৫-এ এখান থেকে যাবার পর। জানি না ওর

স্ত্রীও ওর সঙ্গে ওদেশে এখনও আছেন কিনা। এদেশ বিদেশ ওর যত বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন —কারুর সঙ্গেই আর ওর যোগাযোগ নেই! হারিয়ে গেছে, বেবাক বেমালুম হারিয়ে গেছে এরকম হীরের টুকরো ছেলেটি!

অরুণের কথা স্বাভাবিক কারণেই জিজ্ঞেস করেছিলাম অনিল মহারাজকে। মহারাজ হেসেছিলেন, বলেছিলেন, "এই বিশাল দেশে ঠিকানা ছাড়া কারুর কি খোঁজ করা যায়!"

কিন্তু সে তো আমাদের ঠিকানা দেয়নি পুরানো যে ঠিকানা, সেখানে চিঠি লিখে কোন উত্তরই পাওয়া যায় না! তাই খড়কুটো পেলেও ডুবন্ত মানুষের মতো তাকে আঁকড়ে ধরতে চাই যে।

কিভাবে তাকে খুঁজে বের করব—এই অসহায়তা জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে মনের গভীরে। কিছুই হয়তো করতে পারা যাবে না, অন্ততঃ আপাততঃ। আমেরিকা এমনভাবে লুকিয়ে রাখতে পারে জলজ্যান্ত মানুষকে!

রাত ৯॥৹টা বাজছে। এবার উঠব। ওয়াই. এম. সি. এ.-তে ফিরে যাব। শুনলাম, অনিল মহারাজ বলছেন, "আসার সময় হাঁটতে হাঁটতে এসেছ, যাবে কিন্তু অবশ্যই বাসে করে, বাসে তোমাকে তুলে দিয়ে আসছে মার্টিন আর জন হেঁটে হেঁটে কটা ডলারই বা বাঁচাবে? উল্টে মাগারের হাতে পড়লে পকেটে যে কটা আছে, সব কেড়ে নেবে।"

না, রাতে মাগারদের হাতে পড়বার কোন-রকম ইচ্ছাই আমার নেই। মাগার মানে লুঠেরা। বাসে তুলতে যাবার সময় মার্টিন আর জন বলছিলেন, এই এলাকাটা সন্ধ্যাবেলাতেও তত সুবিধের নয়।

নিউইয়র্ক শহরে বাসে চেপে যেখানেই যাই না কেন, ভাড়া ৮ টাকার মতো। আবার সড়কগুলো থেকে লম্বভাবে চলে গেছে এক-একটা এভিনিউ। সেই এভিনিউ-এ যেতে গেলে কুপন চাইতে হবে, নির্দিষ্ট সড়কে নেমে নির্দিষ্ট এভিনিউ-এর বাসে উঠলে ঐ কুপন দিলেই চলবে, আর নতুন করে ভাড়া দিতে হবে না। আর-একটা কথা, খুচরো সঠিক ভাড়া নিয়েই উঠতে হবে এবং তাই দিতে হবে, ভাঙানো-টাঙানোর কোন ঝামেলা করা চলবে না বাসে। সবই সরকারী বাস, বড় ধরনের, একতলা।

রাতের বাস। গুটিকয়েক লোক। ঝড়ের বেগে চলছে। পথ ফাঁকা, দুটো ঘটনা নজরে পড়ল। হয়তো অভাবনীয় ভাবেই। একবার উঠল এক সাহেব—যুবক গোছের। কণ্ডাক্টরকে জানাল, পয়সা দিতে পারবে না। তো ঠিক আছে, সে বসল। এর পরে উঠল একজন প্রৌঢ় নিগ্রো। তারও আর্জি বিনা পয়সায় যাবে, তাকে কিন্তু নামিয়ে দিল কণ্ডাক্টর। এখানেও তাহলে বিনে পয়সায় যাবার ঘটনা ঘটে, তবে জানিয়ে, নাহলে ধরা পড়তেই হবে, কেলেঙ্কারির একশেষ! আর সূক্ষ্মভাবে সাদাকালোর প্রভেদটা এখনও থেকে গেছে, সাদাদের পয়সা না দিলে মাপ করা যায়, কালোদের নয়। হয়তো সব সময় নয়, হয়তো কালোও করুণা পায়, হয়তো এ ঘটনা নেহাতই বিচ্ছিন্ন একটা ঘটনা। হতে পারে, হলেই মঙ্গল!

রাত তখন দশটা—ওয়াই. এম. সি. এ.-তে নিজের ঘরে পৌঁছে গেছি। (ক্রমশঃ)

ভাইরাল হেপাটাইটিস

ডক্টর সন্দীপকুমার চক্রবর্তী

ভাইরোলজি বিভাগের অধ্যাপক, কলিকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন।

যকৃৎ বা লিভার মানবদেহের সর্ববৃহৎ গ্রন্থি। শারীরবৃত্তীয় কার্যে যকৃতের ভূমিকা বহুমুখী; কিন্তু সময়ে সময়ে এই যন্ত্রের কার্যকারিতা অনেক কারণেই ব্যাহত হতে দেখা যায়, ফলে যকৃৎ-জনিত অনেক রোগের সৃষ্টি হয়। যকৃতের প্রদাহ বা হেপাটাইটিস (hepatitis) এমনই একটি রোগ যা বহু কারণেই হতে পারে। বিভিন্ন প্রকার জীবাণু থেকে আরম্ভ করে রাসায়নিক পদার্থ ও কয়েক ধরনের ওষুধের মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগেও হেপাটাইটিস রোগ হয়ে থাকে; কিন্তু বর্তমান আলোচ্য বিষয় ভাইরাসজনিত হেপাটাইটিস (Viral hepatitis) রোগ ও তাহার বিস্তার এবং সম্ভাব্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

যদিও ভাইরাসজনিত হেপাটাইটিস বেশ কয়েকটি বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস দ্বারা হয়ে থাকে, যেমন—পীত জ্বর (yellow fever), হারপিস সিমপ্লেক্স (herpes simplex), রুবেলা বা জার্মান মিজিল্‌স্ (German measles), সাইটোমেগালো (cytomegalo), কক্স্যাকি (coxsackie) ইত্যাদি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভাইরাল হেপাটাইটিস বলতে মুখ্যত: তিন ধরনের হেপাটাইটিসের যে-কোন একটিকে বোঝায়, যথা—হেপাটাইটিস 'এ' (hepatitis A), হেপাটাইটিস 'বি' (hapatitis B) ও 'নন্ এ নন্ বি' (non A non B) হেপাটাইটিস। এছাড়া ডেল্টা এন্টিজেন হেপাটাইটিস (delta antigen hepatitis) নামে আর এক ধরনের ভাইরাল হেপাটাইটিসের নাম ইউরোপ ও আমেরিকার কয়েকটি দেশের বৈজ্ঞানিকগণ জানিয়েছেন। এই রোগটি সম্বন্ধে যা জানা গিয়েছে তাতে মনে হয়, হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাস ও ডেল্টা ভাইরাসের মধ্যে কিছু সম্বন্ধ আছে।

হেপাটাইটিস 'এ' বা ইনফেকসাস্ হেপাটাইটিস (infectious hepatitis) রোগটি ছড়ায় মূলত: ঐ ভাইরাস-দূষিত খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে। মুখগহ্বরের মধ্য দিয়ে এই ভাইরাস দেহে প্রবেশ করে যকৃতের প্রদাহ সৃষ্টি করে এবং রোগলক্ষণ প্রকাশ পায় পনর থেকে চল্লিশ দিনের মধ্যে। এই রোগে আক্রান্ত হয় প্রধানত: শিশু ও কম বয়সের ছেলেমেয়েরা, যদিও বয়স্কদের মধ্যেও এই রোগ দেখা যায়। অসুখের লক্ষণ শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগে থাকতেই ক্ষুধামান্দ্য, উপরপেট ভার বা ব্যথা, বমিভাব ও অহেতুক দুর্বলতার কথা রোগীর মুখে শোনা যায়। এই সময়ে রোগীর মলের সঙ্গে প্রচুর 'এ' ভাইরাস নির্গত হয় এবং তখনই রোগ সংক্রমণের হার সবচেয়ে বেশি। কয়েকদিনের মধ্যে জ্বর দেখা যায় ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জনডিস্ (Jaundice) বা ন্যাবার চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠে। চোখের সাদা অংশ (Sclera) ও প্রস্রাব হলুদ বর্ণের হয়। মলের রং সাদাটে মতো দেখায়। রোগীর দুর্বলতা আরও বাড়তে থাকে এবং ক্ষুধা আরও কম বোধ হয়। সাত থেকে পনর দিন বা তিন সপ্তাহ পর্যন্ত এইভাবে চলার পর রোগী ক্রমশ: আরোগ্য লাভ করে। সুখের কথা এই যে, এই রোগে মৃত্যুর হার খুবই কম, প্রতি হাজারে গড়ে একজন মাত্র।

এই রোগের জন্য নির্দিষ্ট (Specific) কোন ওষুধ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। পথ্য ও বিশ্রামই দ্রুত নিরাময়ের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন।

ফলের রস, চিনি, গ্লুকোজ ও উপযুক্ত পরিমাণ পানীয় প্রথম দিকে রোগীর পথ্য হওয়া উচিত; পরে সহজপাচ্য ও উচ্চ ক্যালোরী-সম্পন্ন খাদ্য দেওয়া যেতে পারে। চর্বিজাতীয় খাদ্য পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। যে সকল ব্যক্তির কোন কারণে হেপাটাইটিস 'এ' রোগীর সংস্পর্শে আসার ফলে ঐ রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা আছে তারা **Immune Serum Globulin** ইনজেকসন নিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ রোগের বিরুদ্ধে চার থেকে ছয় মাস পর্যন্ত প্রতিরোধ শক্তি পেতে পারেন।

ইনফেকসাস্ হেপাটাইটিস রোগ নিবারণের উপায়,—যে যে কারণে এই রোগ সংক্রামিত হয়, সেগুলির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা। রোগীর মলের মাধ্যমে এই রোগের ভাইরাস পুষ্করিণী, ইঁদারা, এমনকি নদীর জলকেও দূষিত করে এবং একসঙ্গে বহু ব্যক্তি আক্রান্ত হয়ে মহামারী সৃষ্টি করে। এমন মহামারীর নজীর আমাদের দেশে তথা বিশ্বের বহু দেশেই আছে; তবে উন্নত দেশগুলি জনস্বাস্থ্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার ফলে এই রোগ তাদের দেশ থেকে প্রায় নির্মূল হয়ে গেছে। অপরপক্ষে উন্নয়নশীল দেশগুলি যেখানে দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য এখনও অবহেলিত, সেখানে এই রোগ এখনও সমস্যার সৃষ্টি করে চলেছে।

হেপাটাইটিস 'বি' (hepatitis B) রোগের লক্ষণগুলি মোটামুটিভাবে হেপাটাইটিস 'এ'-র মতো অর্থাৎ রোগের উপসর্গ নিয়ে এই দুই শ্রেণীর হেপাটাইটিসকে তফাত করা সম্ভব নয়। এই রোগ এক ব্যক্তি থেকে অপর ব্যক্তির মধ্যে ছড়ায় মুখ্যত: ঐ ভাইরাস দূষিত রক্ত বা রক্ত-জাত পদার্থ থেকে। সেইজন্য রোগটির অপর নাম সেরাম হেপাটাইটিস (serum hepatitis)। সকল বয়সের ব্যক্তিই এই রোগে আক্রান্ত হতে পারেন, তবে বড়দের মধ্যে এর আধিক্য বেশি।

এই রোগের ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করার ৫০ থেকে ১৮০ দিনের (গড়ে দু-তিন মাস) মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। বিশেষজ্ঞদের মতে এই রোগ হেপাটাইটিস 'এ' অপেক্ষা অধিকতর উদ্বেগজনক, কারণ অনেক ক্ষেত্রে এই রোগের জের বহুদিন ধরে চলতে পারে যার ফলে যকৃৎ-গ্রন্থির মারাত্মক ক্ষতি হয় এবং সিরোসিস-জনিত উদুরী (ascitis) সংজ্ঞাহীনতার (hepatic coma) মধ্য দিয়ে মৃত্যু হতে পারে। যকৃৎ ক্যান্সারের (liver cancer) অন্যতম কারণ হিসাবে হেপাটাইটিস 'বি'-কে দায়ী করাও হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস 'বি' আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে কোন বাহ্যিক রোগলক্ষণ থাকে না, এদের লক্ষণমুক্ত বাহক (Symptomless Carrier) বলা হয়। বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা রক্তের মধ্যে হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসের এন্টি-জেনের উপস্থিতি নির্ণয় করা হয়। এই এন্টি-জেনকে হেপাটাইটিস 'বি' সারফেস্ এন্টিজেন (hepatitis B Surface antigen) বা অস্ট্রে-লিয়া এন্টিজেন (Australia antigen) বলে। সুতরাং রক্ত পরীক্ষায় অস্ট্রেলিয়া এন্টিজেনের উপস্থিতির অর্থ এই যে, ঐ ব্যক্তি হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত হয়েছেন। রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হোক বা নাই হোক, যে কোন অবস্থাতেই 'বি' ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তির দ্বারা অন্যান্য ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হতে পারেন। রক্ত সঞ্চালনের দ্বারা ও একই ইন্জেক্সনের ছুঁচ সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত না করে বহু ব্যক্তির দেহে ব্যবহার করার ফলে হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে সুস্থ ব্যক্তির মধ্যে সংক্রামিত হয়ে থাকে। উল্কির ছুঁচ, নাপিতের ক্ষুর ও নরুন প্রভৃতির মাধ্যমেও এই রোগ ছড়ায়। এমন কি লালা ও যৌন সংসর্গের মাধ্যমেও এই রোগ সংক্রামিত হয়ে থাকে। দেখা গিয়েছে যে,

হাসপাতালের ডাক্তার, সেবিকা, শল্য-চিকিৎসক ও রক্ত পরীক্ষাবিশারদগণ যাঁরা এই রোগী ও তার রক্ত নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকেন, তাঁদের মধ্যে এই রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা অধিক।

এই রোগেরও বিশেষ কোন (Specific) ওষুধ আমাদের হাতে নেই। যে দু-একটি ওষুধ সবেমাত্র ব্যবহৃত হচ্ছে তাও পরীক্ষার পর্যায়ে। উপরি-উক্ত আলোচিত কারণগুলি যেগুলির দ্বারা এই রোগ সংক্রামিত হয়, সেই সম্বন্ধে সচেতনতা ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে এই রোগও বহুলাংশে করায়ত্ত করা যেতে পারে ; বিশেষ করে দাতার রক্তে অস্ট্রেলিয়া এণ্টিজেন আছে কিনা পরীক্ষা করা, একই ছুঁচ বা ছুরি কাঁচি প্রভৃতি জীবাণু-মুক্ত করার পর পুনরায় ব্যবহার, আক্রান্ত রোগীর ব্যবহৃত গামছা, ক্ষুর প্রভৃতি অপরজনের ব্যবহার না করা ইত্যাদি অবশ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে সচেতনতা বিশেষ প্রয়োজন। এ ছাড়া যদি কোন কারণে হেপাটাইটিস 'বি' আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত ছুঁচ বা রক্ত অসাবধানতাবশতঃ অন্য কোন ব্যক্তির (বিশেষতঃ চিকিৎসকদের মধ্যে যা সচরাচর দেখা যায়) দেহ-ত্বকে বিঁধে যায়, সেই ক্ষেত্রে hepatitis B Immunoglobulin (H B I G) ইনজেকসন প্রয়োগে এই রোগ প্রতিরোধ সম্ভব। এ ছাড়া উন্নতদেশগুলির কোন কোন স্থানে হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাস -এর টীকা ব্যবহার হচ্ছে ; কিন্তু এই টীকা আমাদের দেশে এখনও দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্যও বটে।

গত কয়েক বছরের মধ্যে আর-এক ধরনের ভাইরাস হেপাটাইটিসের কথা জানা গিয়েছে, যা 'এ' বা 'বি'-র কোনটাই নয় ; তাই এর বর্তমান নামকরণ 'নন্ এ, নন্ বি' হেপাটাইটিস (non A, non B hepatitis)। এখনও পর্যন্ত যে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, এই রোগ পৃথিবীর বহু দেশেই আছে। প্রধানতঃ রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায় আবার দূষিত খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমেও এই রোগ সংক্রামিত হয় বলে জানা গিয়েছে। পরীক্ষাগারে এই রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। কেবলমাত্র রোগের লক্ষণ ও রক্তপরীক্ষার দ্বারা হেপাটাইটিস 'এ' ও 'বি'-র প্রমাণের অভাবের উপর ভিত্তি করে এই রোগ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এই অসুখেরও কোন নির্দিষ্ট (Specific) ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি। তবে হেপাটাইটিস 'এ' ও 'বি' রোগ প্রতিরোধের কারণগুলি অনুধাবন করলে এই রোগটিও বহুলাংশে দূরীকরণ করা সম্ভব।

ভাইরাল হেপাটাইটিস সম্বন্ধে আলোচনার উদ্দেশ্য এই যে, এই রোগ আমাদের মতো উন্নতিশীল দেশে ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে ; এবং এর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোন ওষুধ এখনও আমাদের হাতে নেই। দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষাগারে এই রোগ নির্ণয়নের সমস্যা। দেশের অধিকাংশ স্থানে ভাইরাস গবেষণাগার নেই। তাই অধিকাংশ রোগীরই ধারণার বশবর্তী হয়ে চিকিৎসা করতে হয়। কিন্তু একটা প্রয়োজনীয় কথা এই যে, ভাইরাল হেপাটাইটিস সংক্রামক রোগ। রোগ সংক্রমণের কারণগুলি সম্বন্ধে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, পৌর সংস্থা তথা জনসাধারণ সকলে যদি সচেতন হন তবে এই রোগ দূরীকরণ মোটেই সমস্যা নয়।

হীরানন্দ

ব্রহ্মচারী অনিরুদ্ধচৈতন্য

কলকাতা অদ্বৈত আশ্রমের প্রকাশন-বিভাগে কর্মরত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে হীরানন্দের উল্লেখ আছে। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাই তাঁর সম্বন্ধে জানার কৌতূহল শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগীদের স্বাভাবিক। কিন্তু বিশেষ কিছু জানা যায় না। এ যাবৎ বাংলায় তাঁর সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। লেখক বম্বে থেকে প্রকাশিত হীরানন্দের দুখানি খুব ছোট জীবনীগ্রন্থ সংগ্রহ করেছেন। সেই ছোট গ্রন্থ দুখানি অবলম্বনে প্রবন্ধটি রচিত। গ্রন্থ দুটি : ১। Sadhu Hiranand—Compiled by Sri C. T. Valecha, 2nd Edition (1975), Published by Sind Brahma Sikhya Sammelan, Kamla High School, Khar, Bombay—400-052. ২। Sadhu Navalrai & Sadhu Hiranand by Sita C. Samtani, Published by Mrs. Sarojini Karhade, Secretary, Bombay Prarthana Samaj, Raja Ram Mohan Roy Road, Bombay—4.

বিরাট কবরখানাটার গা ছম-ছম করা নিস্তব্ধতার মধ্যে দুটি ছোট ছেলে বসে আছে ভূত দেখবে বলে। এদের মধ্যে একজন বিশ্বাস করে ভূত আছে, অন্য জন করে না। যে বিশ্বাস করে না, সে তার কথা প্রমাণ করার জন্য এই পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে। মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতা ভেঙে সে জোরে জোরে বলছে—'যদি ভূত থাক তবে আমাদের শাস্তি দাও।' অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন কিছু ঘটল না, তখন জয়ের আনন্দে ছেলেটি চিৎকার করে উঠল—'দেখলি তো আমার কথা সত্যি কি না!' সাহসী সুদর্শন এই ছেলেটির নাম হীরানন্দ। পুরা নাম হীরানন্দ শৌকিরাম আদওয়ানি।

পরবর্তিকালে এই হীরানন্দকেই আমরা দেখি, কাশীপুরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদমূলে পিতার কাছে পুত্রের ন্যায় শান্ত হয়ে বসে তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আর করুণাময় ঠাকুর তাঁর 'অশ্রুতপূর্ব যন্ত্রণা'র মধ্যেও হীরানন্দকে দেখিয়ে শ্রীমকে ইঙ্গিত করছেন—'যেন বলিতেছেন, ছোকরাটি খুব ভাল।'[১] 'ছোকরাটি'র পরিচয় হিসাবে কথামৃতকার বলছেন, 'হীরানন্দ সিন্ধুদেশবাসী'।

*

বহুদিন আগে পাঞ্জাব থেকে নানকপন্থী একটি পরিবার সিন্ধুদেশের হায়দ্রাবাদ জেলার খুদাবাদ অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করে। পরিবারটি এখানে 'খুদাবদি আমিল' নামে সুপরিচিত। 'খুদাবদি আমিলে'র অর্থ সম্ভ্রান্ত পরিবার। এই পরিবারের দেওয়ান শৌকিরাম নন্দীরাম ছিলেন এক তেজস্বী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি। ধর্মনিষ্ঠা ও উদারতার জন্য তিনি সমাজে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সমাজের তিনি ছিলেন 'মুখি' বা প্রধান। নন্দীরাম তখনকার সিন্ধীসমাজে প্রচলিত নানা কুসংস্কার-মূলক প্রথা, বিশেষ করে যৌতুকপ্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং এই প্রথা বিলোপের কাজে অনেকটা সফলও হন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন মূর্তিমতী সরলতা। গুরু নানকের উপর ছিল তাঁর অবিচল ভক্তি। লেখাপড়া কিছুই জানতেন না, কিন্তু পবিত্র গ্রন্থসাহেব পাঠ শুনে শুনে, বিশেষ দুটি অংশ 'জপুজী' ও 'সুখ্‌মনী' মুখস্থ করেছিলেন।

এই রকম সদ্‌গুণসম্পন্ন দম্পতির ঘরে ২৩ মার্চ, ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে হীরানন্দ শৌকিরাম আদওয়ানি জন্মগ্রহণ করেন। হীরানন্দ ছিলেন তৃতীয় পুত্র। আদর করে বাড়ির সবাই তাঁকে ডাকতেন হীরা।

---

১ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', কথামৃত ভবন, ২।২৭।৩

জ্যেষ্ঠপুত্র নবলরাই। জন্ম ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। নন্দীরামের চারপুত্র—নবলরাই, তারাচাঁদ, হীরানন্দ ও মতিরাম। তেজস্বী পিতা ও স্নেহময়ী জননীর গুণগুলি হীরানন্দকে প্রভাবিত করেছিল। তবে নবীন হীরানন্দের মনে গভীর রেখাপাত করেছিলেন তাঁর বড় ভাই—নবলরাই।

২৭ জানুআরি, ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে হীরা 'নরম্যাল' স্কুলে নিচু ক্লাসে ভর্তি হল। স্কুলে সমবয়সী অনেক বন্ধু পেয়ে হীরা খুব খুশি। শুধু একটি জিনিস তাকে কষ্ট দিত। স্কুলে মুসলমান ও হিন্দু ছাত্রদের জল খাবার জন্য আলাদা আলাদা পাত্র। এই ব্যবস্থা হীরার ভাল লাগত

শৌকিরাম নন্দীরাম (হীরানন্দের পিতা)

নবলরাই ছিলেন অত্যন্ত সাহসী, উদার ও ধার্মিক। চরিত্রের এই বিশেষ গুণগুলির জন্য তিনি অতি অল্প বয়সেই সকলের শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন। ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি কিশোর বয়সেই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন এবং সিন্ধুদেশে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন। বড় ভাই-এর উদার ও সাহসী মনোভাব হীরানন্দের উপর যে কতদূর প্রভাব ফেলেছিল তার প্রমাণ পাই তাঁর কিশোর বয়সের দুটি ঘটনায়।

না। তার মনে হত এই ব্যবস্থা তার মুসলমান বন্ধুদের পক্ষে অপমানজনক। বিভেদ মেটাবার জন্য বালক হীরা একদিন ইচ্ছা করে মুসলমান ছাত্রদের জন্য রাখা বিশেষ পাত্রটিতে জল খেল। কিন্তু ফল হল উল্টো। মুসলমান ছাত্ররা রেগে গিয়ে প্রধান শিক্ষক মশায়ের কাছে নালিশ করল। আবার হিন্দু ছাত্ররাও তার থেকে দূরে সরে গেল যাতে তার ছোঁয়া না লাগে। প্রধান শিক্ষক দেওয়ান কৌরামল চন্দনমল হীরানন্দ

সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতিকথায় এই ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছেন—'যখন আমি হীরানন্দকে ডেকে এ-ব্যাপারে জানতে চাইলাম, তখন সে ধীরভাবে উত্তর দিল, "আমার হিন্দু বন্ধুরা বলছে যে, আমি নিজেকে অপবিত্র করেছি, আর মুসলমান বন্ধুরা বলছে, আমি তাদের পাত্রটিকে অপবিত্র করেছি। কিন্তু আমার মনে হয়, ওরা দুপক্ষই ভুল বলছে।"' দেখা দিল যাতে হীরানন্দের জীবনের গতি সম্পূর্ণভাবে পালটে যায়।

সিন্ধুদেশের স্কুলগুলি তখন বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন ছিল যে, ১৬ বৎসরের নিচে কোন ছাত্র ম্যাট্রিকুলেসন্ পরীক্ষায় বসতে পারবে না। সেই সময় হীরানন্দের বয়স ১৬ পূর্ণ হয়নি, পরীক্ষায় বসার জন্য তাকে

বাঁদিক থেকে নবলরাই, মতিরাম, হীরানন্দ ও তারাচাঁদ

বালক হীরানন্দের কুসংস্কারমুক্ত সাহসী মনের আরও পরিচয় পাই তাঁর ভাইপো ভগবানদাসের স্মৃতি থেকে—যে ঘটনাটি আমরা শুরুতেই উল্লেখ করেছি।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে হীরানন্দ গভর্নমেণ্ট হাইস্কুলে ভর্তি হন এবং ১৮৭৮-এ ম্যাট্রিকুলেসন্ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু এ সময়ে একটা সমস্যা আরও একটি বৎসর অপেক্ষা করতে হবে কিন্তু দাদা নবলরাই চাইলেন না, হীরা একটি বৎসর এভাবে নষ্ট করুক। অনেকে হীরার বয়স সম্বন্ধে মিথ্যা প্রমাণপত্র দিতে পরামর্শ দিলেন, নবলরাই তা গ্রহণ করলেন না। শেষে তিনি ঠিক করলেন, হীরাকে তৎকালীন বিদ্যার পীঠস্থান কলকাতায় পাঠাবেন।

কলকাতার বিদ্বৎসমাজের সান্নিধ্যে তাঁর প্রিয় ভাই সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠুক, এই ইচ্ছার কথা জানিয়ে তিনি কেশবচন্দ্র সেনের কাছে চিঠি লিখলেন ও তাঁর পরামর্শ চাইলেন অবিলম্বে কেশব সেনের সম্মতিসূচক পত্র এসে পৌঁছাল। এক শুভদিনে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তরুণ হীরানন্দ যাত্রা করলেন নতুন জীবনের সন্ধানে। দীর্ঘ পথ পেরিয়ে ১৭ জানুআরি ১৮৭৯-তে হীরানন্দ কলকাতায় এসে পৌঁছলেন।

কেশবচন্দ্র সেনের নির্দেশে কলকাতায় ৬নং কলেজ স্কোয়ারে ব্রাহ্মসমাজের কেন্দ্র 'ভারত আশ্রম'-এ থাকার ব্যবস্থা হল হীরানন্দের। কয়েক মাস পরে তিনি হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন এবং যথাসময়ে দ্বিতীয় বিভাগে এনট্রান্স পাস করে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করেন। ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী। তিনি একজন ভাল খেলোয়াড়। তাঁর প্রিয় খেলা ছিল ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি।

ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজধানী কলকাতার বিলাস-ব্যসন, স্বজন-পরিজন হতে বিচ্ছিন্ন একাকী তরুণ হীরানন্দকে আকর্ষণ করতে পারেনি। বরঞ্চ কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহান্ জীবনের সংস্পর্শে এসে তিনি ত্যাগ-তপস্যাময় উন্নত জীবন-গঠনের জন্য উদ্বুদ্ধ হন। একসময় হীরানন্দ ও তাঁর চারজন বন্ধু ঠিক করেন যে, প্রাচীন ভারতের আদর্শ ছাত্রদের মতো তাঁরা জীবনযাপন করবেন। সেইমতো তাঁরা ১৮৮৩-র জুলাই মাসের কোন একদিন ২৯।২, মদন মিত্র লেনে একটি ঘর ১০ টাকা মাসিক ভাড়ায় সংগ্রহ করেন। এই ঘরটির নাম রাখেন 'ঈগলের বাসা'। এখানে তাঁদের সঙ্গে আরও দুজন যোগদান করেন। তাঁরা মোট সাতজনে এখানে নিয়মিত ধ্যান-ধারণা ও পড়াশুনা করতেন। ঘরের দরজায় তাঁরা তাঁদের প্রতিজ্ঞা একটি কবিতার আকারে লিখে টাঙিয়ে রেখেছিলেন—

'এ মোদের প্রেমের কুটির : ত্যজিয়া দুঃখ
প্রশান্তচিত্তে হেথা প্রবেশ কর, হে ভ্রাতঃ।
এ মোদের কর্মক্ষেত্র, কর্ম ছাড়া নাহি
জানি আর কিছু।
কাজ করব মোরা মানুষের মতো আমৃত্যু
দেখাতে জগতে, মানবজীবন
এক অমূল্য সম্পদ।'

নিঃস্বার্থভাবে সেবা ও 'সত্যিকারের মানুষ' হবার জন্য প্রথম থেকেই নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন হীরানন্দ। সমস্ত ভোগবিলাস ত্যাগ করে কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্যে দিয়ে শুদ্ধ করছিলেন দেহ-মনকে। মেঝেতে শুধু মাদুরের উপর শুতেন, বালিশ ব্যবহার করতেন না। জুতোও ব্যবহার করতেন না। একটিমাত্র কম্বলেই সমস্ত শীত-কালটা কাটাতেন। প্রতিদিন সকাল ৪টায় উঠে ধ্যান ও শাস্ত্রপাঠ করে সারাদিনের কাজের জন্য তৈরি হতেন। দিনের কাজের শেষে আবার সন্ধ্যায় ফিরে এসে নিষ্ঠা সহকারে পূজা-প্রার্থনায় বসতেন। প্রতিদিন নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিজেই লিখে রাখতেন এবং পরে সেগুলি সংশোধন করার চেষ্টা করতেন। এইভাবে তপস্যাময় ছাত্রজীবনের মাধ্যমে এক বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন হীরানন্দ। আর সেই জন্যই বোধ হয় পবিত্রতার স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ এই শুদ্ধ সরল প্রাণবন্ত বিদেশী তরুণটিকে ভালবেসে অতি প্রিয়জনের মতো কাছে টেনে নিয়েছিলেন। স্নেহে আশীর্বাদে ভরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর জীবন।

১৮৮২-র মে মাসে গরমের ছুটিতে বন্ধু নন্দলাল সেনের (কেশব সেনের ভাইপো) সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর গিয়ে হীরানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রথম

দর্শন করেন।[২] এর পরই দেখি, তিনি ঠাকুরের ভালবাসায় বাঁধা পড়ে গেছেন। যদিও 'কথামৃতে' হীরানন্দের প্রথম উল্লেখ পাই ২১ এপ্রিল ১৮৮৬-তে[৩] (ঠাকুর তখন কাশীপুরে), তবে এর পূর্বে অনেকবার তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করেছেন তাও কথাপ্রসঙ্গে মাস্টারমশাই জানিয়েছেন—'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কালীবাড়ীতে মাঝে মাঝে আসিয়া [হীরানন্দ] থাকিতেন।'[৪]

শ্রীরামকৃষ্ণকে গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন হীরানন্দ। ১৮৮৪-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পাস করে তিনি দেশে ফিরে যান এবং সেখানে 'সিন্ধু টাইমস্' ও 'সিন্ধু সুধার' নামে দুটি কাগজের সম্পাদনা করতে থাকেন। এই কাজে তাঁকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হত। তবু তিনি প্রায়ই কলকাতার বন্ধুদের কাছে ঠাকুরের খবর নিতেন। ১৮৮৬-র ফেব্রুআরিতে তিনি জানতে পারেন যে, ঠাকুর গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অত্যন্ত অধীর হয়ে তিনি লিখলেন—

প্রিয় মতি, ১৪ ফেব্রুআরি, ১৮৮৬

পরমহংসদেবের অসুস্থতার খবর পেয়ে অত্যন্ত অধীর হয়েছি। মনে হচ্ছে তিনি আর বেশিদিন এই পৃথিবীতে থাকবেন না। তবু আমি আশায় বুক বেঁধেছি। তাঁর কাছে যাবার জন্য মন ছটফট করছে, কিন্তু কি করব কাজের বন্ধনে আবদ্ধ!

দয়া করে পত্রপাঠ আমাকে তাঁর সম্বন্ধে জানাও। আশা করি তুমি কুশলে আছ। ইতি

হীরানন্দ।

কাজের বন্ধন কিন্তু হীরানন্দকে আটকাতে পারেনি। ঠাকুরের ভালবাসার টানে সব কাজ ফেলে রেখে ছুটে এসেছেন এপ্রিল মাসেই, উপস্থিত হয়েছেন কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে। আর অনেকদিন পরে তাঁর এই যুবক ভক্তটিকে কাছে পেয়ে ঠাকুরও খুব খুশি। প্রবাসী প্রিয়জনকে কাছে ধরে রাখার ব্যাকুলতা নিয়ে বলছেন—'সেখানে নাই বা গেলে?' 'এইখানে থাক না?'[৫] হীরানন্দ যে ঠাকুরের কত প্রিয় ছিলেন তার পরিচয় পাই যখন দেখি অপরিগ্রহের প্রতিমূর্তি ঠাকুর শিশুর মতো আবদার করে হীরানন্দকে বলছেন—'তবে পাজামা পাঠিয়ে দিও।' পাজামা চাইছেন কারণ—'হীরানন্দ বলিয়াছেন, তাদের দেশের পাজামা পরিলে ঠাকুর আরামে থাকিবেন। তাই ঠাকুর স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, যেন তিনি পাজামা পাঠাইয়া দেন।'[৬]

বহুদিন বাংলার বিদ্বৎসমাজের মধ্যে থেকে এবং তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে হীরানন্দ যে-প্রসারিত উদার দৃষ্টি লাভ করেছিলেন সেই দৃষ্টি দিয়ে যখন তিনি তাঁর নিজের সমাজের দিকে তাকালেন তখন দুঃখে ও লজ্জায় তাঁর অন্তর ভরে গেল। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন, যে-কোন উপায়ে কুসংস্কার ও অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে সিন্ধীসমাজকে মুক্ত করবেন। তিনি কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শক্তিশালী লেখনীর সাহায্যে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন তাঁর বুকের আগুন। তিনি বুঝেছিলেন যে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়বার একমাত্র অস্ত্র হল শিক্ষা। তাই

২ 'শ্রীরামকৃষ্ণ এবং হীরানন্দ শৌকিরাম আদওয়ানি'—স্বামী প্রভানন্দ, প্রবুদ্ধ ভারত, ফেব্রুআরি ১৯৭৬, পৃঃ ৬৬

৩ 'কথামৃত'; ৪।৩৩।৩,

৪ 'কথামৃত', ২।২৭।৫,

৫ 'কথামৃত', ২।২৭।৫

৬ 'কথামৃত', ২।২৭।৫

তিনি একদিকে তখনকার এডুকেশন কমিশনের চেয়ারম্যান স্যার ডব্লু হাণ্টারের কাছে আবেদন করলেন সিন্ধুদেশে একটা কলেজ স্থাপন করার জন্য এবং অন্যদিকে জনসাধারণকে শিক্ষিত করার জন্য শিক্ষায়তনের প্রয়োজন—এ নিয়ে তাঁর ছুটি মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ডাক দিলেন। গোঁড়া সমাজপতিদের সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন যে, মেয়েরা শিক্ষিত না হলে কিছুতেই সমাজের মঙ্গল হবে না। হীরানন্দ ও তাঁর কয়েকটি বন্ধুর অক্লান্ত পরিশ্রম, আন্তরিক

হীরানন্দ

কাগজের মাধ্যমে তিনি জনমত তৈরি করতে লাগলেন। অবশেষে সফলতা এল—তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় সিন্ধুদেশে স্থাপিত হল কলেজ। এরপর এক 'অকল্পনীয়' কাণ্ড করলেন হীরানন্দ। তখনকার সিন্ধীসমাজে যা কেউ চিন্তাও করতে পারত না তিনি তাই করলেন—সিন্ধী মেয়েদের প্রচেষ্টায় অসম্ভবও সম্ভব হল—নড়ে উঠল অজ্ঞতার জগদ্দল পাথর। সাড়া পড়ে গেল সমস্ত সিন্ধী-সমাজে। হীরানন্দের ডাকে এগিয়ে এলেন শিক্ষিত যুবকেরা। সুক্কুর, শিকারপুর, লারকানা প্রভৃতি স্থানে মেয়েদের জন্য স্কুল গড়ে উঠল। চতুরা নামে একটি অন্ধ মেয়ে হীরানন্দের কাছে

আবেদন করল, সে লেখাপড়া করতে চায়। শুধু সেই মেয়েটির জন্য তিনি অনেক কষ্টে ইংলণ্ড থেকে ব্রেল-এ (Braille) লেখা বই আনালেন। বুদ্ধিমতী মেয়েটি অল্পদিনের মধ্যেই পড়তে শিখল। শুধু তাই নয়, সে নিজেই সিন্ধী অক্ষরে ব্রেল সৃষ্টি করে সমস্ত 'গীতা' অনুবাদ করে। মেয়েটির সাফল্যে সেদিন সব থেকে বেশি আনন্দ ও গর্ব অনুভব করেছিলেন হীরানন্দ। মেয়েদের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি গুরুমুখী ও সিন্ধীভাষায় যথাক্রমে 'সরস্বতী' ও 'দি সুধার পত্রিকা' নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর লেখনী সমস্ত নারীসমাজকে তাঁদের কর্তব্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে।

প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে লাগলেন হীরানন্দ। ছদ্মবেশে গরীবদের কুটিরে কুটিরে ঘুরে খোঁজ নিতে লাগলেন তাদের ব্যথা-বেদনার, অভাব-অভিযোগের। দিনের পর দিন ওষুধের বাক্স হাতে নিয়ে পথে পথে ঘুরতেন অসহায় দরিদ্র রোগীদের সেবা করার জন্য। উৎসাহী যুবকদের নিয়ে তিনি তৈরি করলেন 'বিশ্বাসীর দল' এবং গ্রামে গঞ্জে গিয়ে মদ খাওয়ার বিরুদ্ধে প্রচার করতে লাগলেন। লক্ষ্ণৌ, বম্বে, কলকাতা প্রভৃতি শহরে গিয়ে নানারকম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। বড় বড় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে লাগলেন। তাঁর দুজন বাঙালী বন্ধুর সহায়তায় গড়ে তুললেন একটা আদর্শ স্কুল—'ইউনিয়ন একাডেমি'। বাঙালী বন্ধুর একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সাহায্যে হীরানন্দ সিন্ধী ছেলেমেয়েদের সংস্কৃত শেখাতে চেষ্টা করেন।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুদেশে কলেরা মহামারী হয়ে দেখা দিল। শত শত লোক কলেরায় আক্রান্ত হলেন। হীরানন্দ দিনরাত নিজহাতে সেবা করতে লাগলেন। সবাইকে ডাক দিয়ে তিনি বললেন—'সময় বহিয়া যায়, সুযোগ পক্ষ লয়, / মৃত্যু নয় দূরে। / কাজ, কাজ, কাজ কর যতক্ষণ আছ ধরণীতে।' তাঁর সাহায্যে ও উৎসাহে গড়ে উঠল হাসপাতাল ও সেবা-সঙ্ঘ।

দেশের উন্নতি, সমাজের মঙ্গলের জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকলেও নিজের পরিবার-পরিজনের প্রতি কর্তব্যেও হীরানন্দের ত্রুটি ছিল না। নিজের দুটি মেয়ে যাতে সুশিক্ষা পায় তার জন্য হীরানন্দ অনেকদিন থেকেই চিন্তা করছিলেন। সেই সময় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মা শ্রীমতী অঘোরকামিনী দেবী বিহারের বাঁকিপুরে মেয়েদের জন্য একটা স্কুল করেছিলেন। হীরানন্দ ঠিক করলেন, মেয়েদের অঘোরকামিনী দেবীর স্কুলেই ভর্তি করে দেবেন এবং সেই উদ্দেশ্যে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে মেয়েদের নিয়ে যাত্রা করেন। সিন্ধু-দেশের হায়দ্রাবাদ থেকে তাঁরা যখন লক্ষ্ণৌ এসে পৌঁছলেন তখন হঠাৎ তাঁর ছোট মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। রাতের পর রাত জেগে হীরানন্দ মেয়ের সেবা করতে লাগলেন। তাঁর অক্লান্ত সেবায় মেয়েটি সুস্থ হয়ে ওঠে, কিন্তু তিনি নিজে অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রচণ্ড জ্বর, তবু তিনি লক্ষ্ণৌতে সময় নষ্ট করতে রাজী হলেন না, কারণ তাঁর কর্তব্যে অবহেলা হবে! বাঁকিপুরে যখন পেঁছিলেন তখন তাঁর জ্বর ১০৪ ডিগ্রী, তবু সেই অবস্থাতেই তিনি অঘোরকামিনী দেবীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর মেয়েদের শিক্ষার ভার নিতে অনুরোধ করলেন।

দিনের পর দিন হীরানন্দের অসুখ বেড়েই চলল। অঘোরকামিনী দেবী ও অন্যান্যরা যথাসাধ্য সেবা করতে লাগলেন, কিন্তু জ্বর কিছুতেই কমল না। ১৪ জুলাই ১৮৯৩-এর সকালে দেখা গেল তাঁর গায়ের জ্বর ১০৫ ডিগ্রী। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে অথচ প্রশান্ত মুখে হীরানন্দ অবিরাম বলে চলেছেন—'জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরি', 'হরি বল হরি', 'তুমি হে ভরসা আমার অকূল পাথারে', বেলা ঠিক ১১টার সময় ধীরে ধীরে প্রশান্তির মধ্যে শেষক্ষণটি ঘনিয়ে এল। সমস্ত মুখে তখন তাঁর মৃত্যুজয়ীর স্নিগ্ধ হাসি।

হীরানন্দ হাসলেও সমস্ত সিন্ধী জাতি সেদিন কেঁদেছিল। প্রিয় নেতা, পথ-প্রদর্শককে হারিয়ে আকুল হয়ে কেঁদেছিল সিন্ধুদেশ। আধুনিক সিন্ধী-সমাজের রূপকার সাধু হীরানন্দকে সিন্ধীরা কখনও ভোলেনান, ভুলতেও পারবেন না। আর ভুলবেন না শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তবৃন্দ। কারণ তাঁরা জানেন সূর্যস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘিরে তাঁর 'সাঙ্গোপাঙ্গাদি ভক্তগণে'র যে মণ্ডল, সেই অপূর্ব সৌরমণ্ডলের একটি উজ্জ্বল তারার নাম—হীরানন্দ।

দারজিলিং-কালিম্পং-এর লামাদের ধর্ম

ডক্টর দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

প্রয়াত লেখক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ছিলেন।

দারজিলিং হল "দোরজিলিং" বা "দোরজিস্থান"। "দোরজি" তিব্বতী কথা, মানে হচ্ছে বজ্র আর "লিং" দ্বীপ বা স্থান—যেমন জম্বুদ্বীপ বা ভারতবর্ষ ওদের ভাষায় "জম্বোলিং"। দারজিলিং-এ মহাকালের মন্দিরের কাছে রয়েছে দোরজি লামার সমাধিস্থান। তাঁরই নামে বুঝি এই দোরজিস্থান বা বজ্রস্থান। লামার নামের সঙ্গে "দোরজি" বা বজ্র যুক্ত কেন সে-বিষয়ে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক এবং সে জিজ্ঞাসা মিটতে পারে দারজিলিং-কালিম্পং-এর লামাধর্ম সম্বন্ধে একটু সন্ধান নিলে।

দারজিলিং-এর যা যা দ্রষ্টব্য তার মধ্যে নাম করা হয় এখানকার বৌদ্ধমন্দিরগুলিরও। কিন্তু নিসর্গসৌন্দর্যরসিকের চোখ দিয়ে এই সব দ্রষ্টব্যের দেখা ব্যর্থ। নৈসর্গিক সৌন্দর্যভোগের সে চোখ, সে চিত্ত না থাকলে যেমন টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয় দর্শন সার্থক হয় না, তেমনই এই সব বৌদ্ধমন্দির দেখতে হলে লামাদের দেবদেবী ও তাদের বিশ্বাস-অর্চনার সম্বন্ধে জ্ঞান ও জিজ্ঞাসা না থাকলে চলে না। মন্দিরের ভিতরের মূর্তি ও দেয়ালে আঁকা ছবির উপর অদ্ভুত নয়নে শুধু দৃষ্টি বুলিয়ে ফেরেন যাঁরা অন্তরে তাঁদের রেখা পড়ে না বিন্দুমাত্রও।

দারজিলিং-এর কাছে "ঘুমে" আছে একটা তিব্বতী গুম্ফা। ভুটিয়াবস্তিতে আছে ভুটিয়াদের একটা। দারজিলিং-এর মাঝখানেই তামং মন্দিরে আছে নেপালী বৌদ্ধদের একটা। আর আলু-বাড়ী বলে একটা জায়গায় আছে, আর একটি গুম্ফা—কালিম্পং-এ একটিই বড় গুম্ফা—সেটি তিব্বতীদের।

গুম্ফার বাইরে খোলা চত্বরে উড়ছে খুব লম্বা ফালির নিশান—তা দূর থেকেই অনেক সময়ে গুম্ফা চিনিয়ে দেয়। একটা ফটক থাকে প্রায়ই। মন্দিরের বাইরে আর ভিতরে নানারকম ছবি আঁকা—সে চিত্রণে আমাদের ভারতীয় কলার সঙ্গে চৈনিক কলার যেন মিশ্রণ দেখা যায়। ভিতরে সারি সারি বসার জায়গা—বৌদ্ধ লামা ও ভক্তদের মর্যাদা অনুসারে তাদের আসনের উচ্চতা ঠিক করা আছে। পাশে খোপে খোপে "তেঞ্জুর" আর "কেঞ্জুর" ধর্মগ্রন্থ—হলদে রেশমী কাপড়ে সযত্নে মোড়া। আর সামনে সারি সারি মূর্তি। সে শুধু বুদ্ধের মূর্তিই নয়। ওদের দেবদেবীর ধারণা অত্যন্ত বিস্তৃত—এমনকি বড় বড় লামারাও ঐ দেবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

এক আদি বুদ্ধকে ওরা মেনে থাকে,—তাঁর দেহ নেই, তিনি সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান্। ওখানকার লামারা তাঁর নাম বলেছে "সমন্তভদ্র"। বলা হয়েছে, এঁর চারদিকে চারলোকে চার দিক্‌পাল আমাদের বায়ু, কুবের, ইন্দ্র, বরুণের মতো। বীণা হাতে শুভ্রকায় "বজ্রসত্ত্ব" (তি—দোরজিসেম্পা) পূর্ব দিক্‌পাল। "অমিতাভ" বা "পদ্মা" নামে,—একটি জন্তু ও একটি ভাণ্ড হাতে,—লাল রং-এর নাগরাজ পশ্চিম দিক্‌পাল। তরোয়াল হাতে সবুজ রং-এর "রত্না" হলেন দক্ষিণদিকের দিক্‌পাল, আর উত্তরদিকের হলেন পীতকায় যক্ষরাজ "কর্মা"। সমন্তভদ্রের সঙ্গে এই চারজন হলেন "গ্যালোয়ারিঙা" বা পঞ্চদেবতা। চার দিক্‌পালের ছবি আঁকা থাকে সাধারণত মন্দিরের বাইরের দেয়ালে।

এদের দেবগোষ্ঠীর মধ্যে ভারতীয় বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব দেবতা গুরু সবাই স্থান পেয়েছে। ভুটিয়ারা বজ্রসত্ত্ব বা "দোরজিসেম্পা"কে ঠিক সমন্তভদ্রের

পরেই স্থান দেয়। তারপর আর্যবজ্র বা "গরব-দোরজি", তারপর পদ্মসম্ভব বা "গুরুরিন্‌পোচে", তারপরে "অবলোকিসার" বা অবলোকিতেশ্বর—যাঁর এগারোটি মাথা, আর এক হাজার হাত এবং প্রত্যেক হাতে একটি করে চোখ। নেপালী বৌদ্ধমন্দিরের দোতলায় দেখা যাবে দীপঙ্কর বুদ্ধ, গৌতম বুদ্ধ আর মৈত্রেয় বুদ্ধ—এই তিন বুদ্ধ-মূর্তি পাশাপাশি। এঁরা হলেন অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যৎ কালের বুদ্ধ। নিচের তলায় পদ্ম-সম্ভবের মূর্তি মাঝখানে, দুই দিকে দুই তারামূর্তি, এক তারামূর্তির পাশে অবলোকিতেশ্বর আর একটির পাশে অমিতাভ বুদ্ধ। অমিতাভকে এরা বোধিসত্ত্ব বলে মানে। আর মঞ্জুশ্রীকে খুব প্রাধান্য দেওয়া হয়। প্রণাম মন্ত্র তাই নমো. বুদ্ধায়, নমো ধম্মায়, নমো সংঘায়, নমো মঞ্জুস্সিরি বোধিসত্বায়। এই লামাধর্মের বিশেষত্বই হল এদের দেবগোষ্ঠীর সর্বগ্রাসিতা—তাই বোধি-সত্ত্বের সঙ্গে শিব, গণেশ, কালীর পূজা করতেও এদের আপত্তি নেই—ভুটিয়াবস্তির পথে পাহাড়ের গায়ে সবরকম মূর্তিই পাশাপাশি আঁকা দেখা গেল। মহাকালের মন্দিরে শিবের পূজা করছেন হিন্দু নেপালী, সঙ্গে সঙ্গে তিব্বতী বৌদ্ধদেরও অর্চনা চলছে। শিবের সঙ্গে গৌরী গণেশের মূর্তি আঁকা, আর-এক জায়গায় কালীমূর্তিও আছে একটি। লামাধর্মে এঁরা সকলেই স্বীকৃত। কালিম্পং-এ এক ভুটিয়া দোকানদারের বাড়িতে আরও দেখা গেল নানক থেকে আরম্ভ করে যত সব শিখগুরুরও মূর্তি ও ছবি।

তিব্বতীদের আগে যে ধর্ম ছিল তার নাম "ব্যোনপা"—তাতে এই রকম বিশ্বাস করা হত যে, সব প্রাণীরই মধ্যে, সব জিনিসেরই মধ্যে এমন আত্মা আছে যার দ্বারা ভাল বা মন্দ হওয়া সম্ভব।

অষ্টম শতকে রাজা "তিস্রোন দেচান" ভারত-বর্ষ থেকে দুইজন বড় ভিক্ষুকে আমন্ত্রণ করে আনেন—একজন শান্তরক্ষিত আর অন্যজন হলেন পদ্মসম্ভব। পদ্মসম্ভব "ব্যোনপা" ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের একটা চমৎকার সমন্বয় করে দিলেন এবং তাঁর যোগাচারের জন্য তিনি খুবই জনপ্রিয় গুরু হয়েছিলেন। তিনি ওখানকার লোকদের দুটি ভাগে বিভক্ত করলেন—যাঁরা বৌদ্ধ তাঁরা "নানপা" বা ভিতরের লোক, যাঁরা বৌদ্ধ নন তাঁরা "চিপা" বা বাইরের লোক! তাঁর প্রবর্তিত এই সমন্বিত মন্ত্রযান বৌদ্ধধর্ম "নিংমাপা" বলে পরিচিত—এরই নানা শাখাধর্ম আজও তিব্বতে, নেপালে, ভুটানে বিস্তৃতভাবে চলছে এবং পদ্মসম্ভব গুরুরিন্‌পোচে আরাধ্যতমদের একজন বলে খুব বড় স্থান পেয়ে আছেন। ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ থেকে অতীশ দীপঙ্কর এসে-ছিলেন তিব্বতে; তিনি এই ধর্মের একটা সংস্কার করেন। তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম ও তার শাখার নাম কদম্‌পা, করম্‌পা, দুগ্‌পা, দিকুংপা—এইসব। দারজিলিং-কালিম্পং-এ এই সব ধর্ম-সম্প্রদায় না থাকলেও গুরু বলে অতীশ দীপঙ্কর আরাধ্যের স্থান পেয়ে আছেন—অনেক মন্দিরে এঁর মূর্তি আছে। সর্বশেষ সংস্কার করেছিলেন—"চোংখাপা"। তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম "গেলুগ্‌পা" বা হলদে টুপি-সম্প্রদায় তিব্বতেই প্রধান, নেপাল ভুটান বা দারজিলিং-এ বেশি নেই। কালিম্পং-এ এই সম্প্রদায়। এরা দালাইলামাকে এত বড় স্থান দেয় যে, তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট যে অতি উচ্চ আসনে রাখা আছে তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ তা বুদ্ধমূর্তিকে পর্যন্ত সম্পূর্ণ আড়াল করে আছে। দালাইলামা, পান্‌চেন লামা প্রভৃতি অনেক লামারও মূর্তি দেখা যায় এই সব বৌদ্ধমন্দিরে।

মহাযান বৌদ্ধধর্মের নানা সম্প্রদায় ভারতেই ছিল—মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি। তিব্বতী লামাধর্মেও তাই বজ্রের স্থান। বজ্রের প্রতীক একটি উপকরণ মন্ত্রতন্ত্র পাঠের সময়ে

অপরিহার্য। এক হাতে এই "দোরজি" অন্য হাতে "ঠিল্‌পো" বা ঘণ্টা নাড়তে নাড়তে লামারা পাঠ করে তাদের পবিত্র গ্রন্থ। "ঙা" বা ঢাকের উপর "নারজাপ" নামে একটা বাঁকানো কাঠি দিয়ে আঘাত করে বাদ্যধ্বনি—পূজা-অর্চনার একটি বিশেষ অঙ্গ। আর একটি উপকরণ লামাদের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। সেটি এক ধর্মচক্র—এর মধ্যে একটি কাগজে লেখা আছে পবিত্র মন্ত্র। ছোট ছোট এই ধর্মচক্র প্রত্যেক লামার সঙ্গে থাকে, বাড়িতে থাকে, ধর্মমন্দিরে বসানো থাকে। সাধারণত তলায় আগুন জ্বালানো থাকে এমনভাবে যাতে করে চক্র আপনা হতে ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে। ভুটিয়াবস্তির গুম্ফায় আছে প্রকাণ্ড পিপের মতো একটি চক্র—একটি ঘণ্টা তার সঙ্গে এমন জায়গায় লাগানো আছে—একবার পূর্ণ আবর্তনে ঘণ্টা বেজে ওঠে। চক্র ঘোরে আর বলতে হয় "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ"। এই মন্ত্রের দার্শনিক অর্থ অনেক লামারই জানা নেই। কিন্তু এর একটা চমৎকার ব্যাখ্যা শোনা যায় অশিক্ষিত লামাদের কাছে।

লামাদের দেবলোক হল "খাম্‌সুম্‌" বা তিনটি লোকের সমষ্টি—"দোখাম্‌", "জুখাম্‌" ও "জুমেখাম্‌' তার নিচে আছে অসুরলোক, নরলোক, পশুলোক, প্রেতলোক, নরক। এই সব লোকেই আছে দুঃখ। যেমন দেবলোকের দুঃখ হল অবতাররূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ। অসুরলোকের দুঃখ যে দেবতাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব তাদের চিরন্তন। আর নরলোকের দুঃখ জন্ম, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু। পশুলোকের দুঃখ তারা কথা বলতে পারে না। প্রেতলোকের দুঃখ তাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা অনির্বাণ। আর নরকের তো দুঃখের অন্ত নেই। ওঁ কথাটি ঐ ত্রিলোক বুঝায়—অ, উ, ম্‌ হল দোখাম্‌, জুখাম্‌ ও জুমেখাম্‌। তারপরে ম, ণি, পদ্‌, মে এবং হুঁ এই পাঁচটি অক্ষর দাঁড়াল যথাক্রমে অসুরলোক, নরলোক, পশুলোক, প্রেতলোক, নরকের পরিবর্তে। ধর্মচক্র ঘুরিয়ে ওঁ মণি পদ্মে হুঁ বলার উদ্দেশ্য হল এই ছয় লোকের দুঃখ দূর হোক্‌। এ যেন অনেকটা আমাদের শান্তিবচনের মতো।

মহাকালের মন্দিরে আছে অসংখ্য ত্রিশূল। শুধু ওখানেই নয় অন্যত্রও এই ত্রিশূল বা "খড়ম" দেখতে পাওয়া যায়, যেমন তামং মন্দিরে একটা ত্রিশূলে গাঁথা তিনটে মাটির মুণ্ড—ব্যাখ্যা তার, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই ত্রিকালের দুষ্কৃতকারীদের এই দিয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে। লম্বা সরু কাপড়ের যে নিশানের কথা আগে বলা হয়েছে, তার উপরে ছাপানো আছে অনেক মন্ত্র আর মাঝে মাঝে এক-একটা ছবির ছাপ। সে ছবিতে একটি ঘোড়া, তার পিঠে রত্ন ও পদ্ম রয়েছে। আর এক-রকম ধ্বজা দেখা গেছে মহাকালের মন্দিরে—গোল গোল কোঁচ দেওয়া কাপড় ঝুলিয়ে যেন অশোকস্তম্ভের অনুকরণ করা হয়েছে। এই সব নিশান বা স্তম্ভধ্বজা লোকে উঠিয়ে দিয়ে যায় কোন রোগ বা বিপদ থেকে রক্ষা পাবার মানসিক করে। আবার অনেক সময়ে এগুলি নিজেদের বাড়িতেও উঠায়।

দারজিলিং-কালিম্পং-এর এই সব গুম্ফায় নানা পার্থক্যের মধ্যেও মোটামুটি যে লামাধর্মের পরিচয় পাওয়া যায় তার বিরাট ঔদার্য আমাদের বিস্মিত করে।

পুস্তক সমালোচনা

দৈনন্দিন জীবনে ধ্যান ও শান্তি: স্বামী সোমেশ্বরানন্দ। প্রকাশক: শ্রদ্ধা প্রকাশন, এ, ই ১০১, বিধান নগর, কলিকাতা-৬৪। ১ম সংস্করণ (১৯৮৫)। পৃষ্ঠা ২০০; মূল্য: ২০.০০ টাকা।

যোগ, বেদান্ত, ধ্যান বা আধ্যাত্মিকতার বাজারে জোয়ার এসে গেছে। নানা কারণে দেশের ও বিদেশের অনেক মানুষ অল্পের মধ্যেই এগুলি সামান্যতঃ কিছু লাভ করার জন্য ব্যস্ত। বনচারী বা আশ্রমবাসী না হয়ে, গেরস্ত থেকেই, কিছু শান্তির জন্য তারা আগ্রহী। স্বামী সোমেশ্বরানন্দের বইটির বক্তব্য তাদের লক্ষ্য করেই।

বইয়ের শেষে ৯নং অধ্যায়ে কিছু interview (নিভৃত একান্ত আলাপ)-এ সমস্যা নিয়ে হাজির হয়েছেন আমাদেরই নিত্যকার পরিচিত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নানা স্তরের মানুষ। শুধু এই আলাপগুলি যদি পড়েন বা চোখ বোলান, অন্য কোন অধ্যয়ে, অনায়াসেই বইটির অভিমুখ ধরতে পারবেন—এক কথায় সেটা মনকে সরাসরি দেখে বিশ্লেষণ করার আহ্বান।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের জমি ভয়াল, পরিভাষায় দুস্তর। সাধারণ মানুষ দরকার মতো যাতে সে জমিতে কিছুটা চলাফেরা করতে পারেন সেজন্য কিছু কিছু জনপ্রিয় প্রবন্ধ, পুস্তিকা ছাপা হয়। সোমেশ্বরানন্দ একটি বিশেষ ক্ষেত্রে অনুরূপ ভূমিকা পালনের চেষ্টা করেছেন। যোগ, বেদান্ত, ধ্যান ইত্যাদির উপরেও নিজে-পড়ুন-পড়ে-শিখুন জাতীয় জিনিস প্রকাশিত হচ্ছে। নবীন পদার্থ-বিজ্ঞানও প্রাচ্যের প্রাচীন বহু মতবাদের দিকে মিলনের হাতটি ক্রমশঃ প্রসারিত করছে। লেখক, অনুমান করতে অসুবিধে হয় না, এগুলির সঙ্গে সাধারণভাবে পরিচিত। কিন্তু তিনি যে উপায় বলছেন তাতে কিছু স্বকীয়তা আছে; অথবা বলা যায় প্রায় ভুলে যাওয়া অতীতের কিছু দুঃসাহসী দার্শনিকের মননের ছায়া এতে পড়েছে।

চমক আছে, উপভোগ্য বস্তু আছে পাতায় পাতায়। তা সত্ত্বেও অনেক উক্তিকে কিছুটা পরিবর্তন (modify) করলে মনে হয় ভাল হত। যেমন 'কামিনী' শব্দের শ্রীরামকৃষ্ণ-অভিপ্রেত অর্থ (২৩ পৃঃ); ভূতের ভয়েতে 'রামনাম' অর্থাৎ অন্ত ধরনের চিন্তাস্রোত (২৮ পৃঃ); রসগোল্লাকে প্রীতিজনক ভাবছি, এটিই ধারণা (vis-a-vis বাস্তব; ৪৪ পৃঃ); ইত্যাদি। পরিবর্তনগুলি এইরকম হলে ভাল হয় কিনা লেখক ভেবে দেখতে পারেন, যথাক্রমে:—কথামৃতের কথা প্রধানতঃ পুরুষ ভক্তদের সামনে বলা এবং স্ত্রীজাতিকে বিদ্যা এবং অবিদ্যা গোষ্ঠীতে বিভাগ; ভূতের ভয় পেলে শিশুকে গুরুজনেরা রামনাম করতে শেখান; প্রীতিজনক ভাবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির নিঃসরণ স্নায়ুগুলোকে উদ্দীপ্ত করে, কাজেই ঐ বোধের মধ্যে বাস্তবতার মাত্রা আছে।

বই-এর ভাষা ও ভঙ্গী সাবলীল। শিক্ষিত বাঙালীরা নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় বহু ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করেন স্বাভাবিকভাবে। সেইরকম বৈঠকী মেজাজ আদ্যোপান্ত। অনেক দৃষ্টান্তই হালফিলের সংবাদপত্রের শিরোনামের ঘটনা নিয়ে। লেখক যেন বলতে চান: 'Esoteric কিছু রাখব না; প্রাণপ্রদ এ জিনিস সকলে পাক, সহজে পাক, সামর্থ্য অনুযায়ী আহরণ করুক।' তৃতীয় অধ্যায়ে বহু টুকিটাকি নির্দেশনা রয়েছে। মনঃসংযমের প্রাচীন উপায়, নবীন সাধকেরা আরও কত কত উপায় অবলম্বন করেন। যেমন, মন্ত্রকে মাত্রায় বিভক্ত করে প্রতি পদক্ষেপে উচ্চারণ, ওঁকারের সাহায্যে

নাদ-সাধন, ঘড়ির টিক্‌টিক্‌-এর সমতালে জপ, মহাপুরুষদের পট ও উক্তিকে লিখে দেয়ালে-টেবিলে রেখে দেওয়া, প্রার্থনা ইত্যাদি ইত্যাদি। সাধারণ ভক্তিবাদকে (গুরু বা ইষ্টের প্রসঙ্গ অল্প আছে) লেখক বই-এতে তেমন প্রশ্রয় দেননি।

কিন্তু একটা কথা বিশেষভাবে ভাবতে হবে। জীবনের সব ক্ষেত্রেই অনুশীলনের, প্রস্তুতির প্রয়োজন। ক্ষেত্রটার নাম যখন ধ্যান বা আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি, তখন একথাটা বেমালুম ভুলে গেলে চলবে না। এ বই-এর মধ্যে এটিরই অভাব চোখে পড়ে। বইটিতে নূতন ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত কিছু কিছু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'ধী-শক্তি' (৮৫ পৃঃ এবং অন্যত্র), 'অশক্তি' (৮৬ পৃঃ), 'চিদাকাশ' (৬০ পৃঃ) প্রভৃতি। চিদাকাশকে চক্র ইত্যাদির সঙ্গে অন্বিত করা হয়েছে, যা বৈদিক বা তান্ত্রিক কোন ধারাতেই সম্ভবতঃ পাওয়া যায় না। চিদাকাশকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় শরীর-মধ্যে চিহ্নিত করাতে কোন কোন পণ্ডিত ভ্রূকুটি করবেন। পঞ্চম অধ্যায়ে বিবৃত কোন কোন ধ্যানভূমিকার সম্পর্কে মন্তব্য আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা। কারণ সে অধিকার বা অভিজ্ঞতা অর্জন করা হয়নি। আমাদের আশা এবং অনুমান যে, ধ্যানপটু মানুষদের সঙ্গে কথা বলে, বিশেষ বিশেষ ডায়েরী বা পুস্তিকার সংকেত তথা লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং বিশ্লেষণের ফলেই এত নিশ্চিত সব উক্তি করা হয়েছে (যেমন ধরুন, ৯৫ পৃঃ-তে কোন কোন মন্তব্য)। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য বা বেদান্তী সাধুদের কিছু সর্বজনগ্রাহ্য অনুভব-কাহিনী বা যোগশাস্ত্রের কিছু কিছু বর্ণনা (যেমন, নীহার-ধূমার্কানিলানলানাং··· অভিব্যক্তি-করাণি যোগে) আমরা জানি বা ১৬৫ পৃষ্ঠাতে বর্ণিত "সময়-চেতনা চলে গেলেও···" ইত্যাদি অনুভব বহুজনমান্য হলেও লেখকের অনেক মন্তব্য বিতর্কের (honest doubts) সৃষ্টি করবে। অবশ্য লেখক বারেবারেই বলছেন, যেন পাঠকেরা নিজেরা হাতে-নাতে ক্রিয়াগুলি করে দেখেন।

বই-এতে আর-একটা ত্রুটি; অনাবশ্যকভাবে অতিমাত্রায় কিছু বাংলা শব্দের ইংরেজীতে অর্থ দেওয়া। বিশ্বাস, অভ্যাস, ফলশ্রুতি, নিরপেক্ষ, অনুভূতি, দৃশ্য, দ্বন্দ্ব, তীব্র, লক্ষ্য, ভাবাবেগ, বৌদ্ধিক, যান্ত্রিক, নীরস, আগ্রহ, সরিয়ে নেওয়া, বোঝা, আশা, তৃপ্তি, সান্ত্বনা—এগুলি এত পরিচিত শব্দ যে এগুলির ইংরেজী দিয়ে অর্থ বোঝানোর প্রয়োজন হয় না। তবে জায়গায় জায়গায় ইংরেজী শব্দ দেওয়া সুপ্রযুক্ত হয়েছে। যেমন, 'রক্ষামূলক ক্রিয়া' যখন 'defence mechanism' হিসেবে অনূদিত হয়েছে, তখনই কথাটার মানে ধরতে পারা যাচ্ছে। বই-এর অন্যতর ত্রুটি—মুদ্রণ প্রমাদ।

বই-এর ভূমিকায় উদ্ধৃত "তুলে নেবে জাহাজ-মাস্তুল···চলে যায় প্রবাসেতে" তুলির টানে জীবন্ত হয়েছে প্রচ্ছদে। প্রচ্ছদটি অনুষঙ্গ-গুণে আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে—পাখি ও মাস্তুল নিয়ে বলা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিকাটি।

বলিষ্ঠ বেপরোয়া অনন্যতা বইটির ছত্রে ছত্রে রয়েছে। চিন্তার পুঁজি সামান্য থাকলেও নূতন খাতে পাঠক চিন্তাকে প্রবাহিত করতে সহজেই প্ররোচিত হবেন বই-এর যে কোন অংশ পড়লে। সাত, আট এবং নয় নম্বর অধ্যায়ে চলিষ্ণু সাক্ষাৎ জীবনের যে ধারাল ও জোরাল বিশ্লেষণ ফুটে উঠেছে, আলোচনা-চক্রের বা নিভৃত-আলোচনার পরিমণ্ডলে তা বইটিকে একটা উপভোগ্য মাত্রা এনে দিয়েছে। জীবনে ঘায়েল মানুষেরা শেষ অধ্যায়টিতে প্রচুর আশার খোরাক পাবেন। বইটিতে স্থলে স্থলে দ্যুতিময় সূত্রোপম কথা আপনার মন কেড়ে নেবে। যেমন, "বর্তমানে স্থিত হওয়াটাই প্রাথমিক কাজ" (১০ পৃঃ), "চিন্তার স্বভাবে···স্থিতিতে ভয়, গতিতে ভয়" (১৪৪ পৃঃ), "আনন্দের অনুভবে চিন্তার খেলা নেই" (১৪১ পৃঃ)। ধ্রুপদী ধারার সঙ্গে তাল সমগ্রতঃ না রেখে লেখা ধ্যান প্রসঙ্গে এরকম বই বাংলায় এর আগে চোখে পড়েনি।

—স্বামী অমরানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেন্টস্‌ হোম, বেলঘরিয়া।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বেলুড় মঠে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা (২০ থেকে ২৩ অক্টোবর) এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে ও মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। আবহাওয়া ভাল থাকায় জনসমাগম যথেষ্ট হয়েছিল। মহাষ্টমীর দিন কুমারীপূজা ও শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমা দর্শনার্থে প্রচুর ভীড় হয়। পূজার তিনদিনই সমাগত সহস্রাধিক ভক্ত নরনারীকে হাতে-হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রগুলিতেও প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে: আগরতলা, আসানসোল, বালিয়াটি, বরিশাল, বোম্বাই, কাঁথি, ঢাকা, গুয়াহাটি, হবিগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, জামসেদপুর, জয়রামবাটী, কামারপুকুর, করিমগঞ্জ, লখনৌ, মালদহ, মরিশাস, মেদিনীপুর, নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, রহড়া, শেলা (চেরাপুঞ্জী), শিলং, শিলচর, শ্রীহট্ট ও বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম।

দ্বারোদ্ঘাটন

গত ৫ অক্টোবর রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ চেরাপুঞ্জী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের পুনর্নির্মিত আবাস-কক্ষের এবং ৬ অক্টোবর শিলং রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের নবনির্মিত দোতলা পাঠাগার ও পাঠ-কক্ষের উদ্বোধন করেন।

গত ১৩ অক্টোবর ১৯৮৫, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী তপস্যানন্দজী মহারাজ সালেম রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের নবনির্মিত 'শ্রীসারদা দেবী হল' (বক্তৃতা-কক্ষ ও শিশুদের পাঠাগার)-এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

ছাত্র-কৃতিত্ব

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের পাঁচজন ছাত্র পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক ১৯৮৫-র পরীক্ষায় ৩য়, ৪র্থ, ৭ম, ৯ম ও ১৩শ স্থান অধিকার করে।

যুব-সম্মেলন

গত ৬ অক্টোবর, **জলপাইগুড়ি** রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের পরিচালনায় ১৪৪জন যুব-প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এক যুব-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১৩ অক্টোবর, **এলাহাবাদ** রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের উদ্যোগে আয়োজিত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ২০০জন যুব-প্রতিনিধি।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

পশ্চিমবঙ্গে ঘূর্ণিবাত্যা ও বন্যাত্রাণ: মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় বিধ্বস্ত ঘোরামারা, সাগর, পাথরপ্রতিমা এবং ২৪-পরগনা জেলার উপকূল অঞ্চলে ২৩২৪ জনের মধ্যে শুকনা ও রান্না-করা খাবার বিতরণ করা হয়। এ ছাড়াও তাদের মধ্যে ১৬১৫টি শাড়ি, ১০৪০টি ধুতি, ৯৩২০টি শিশুদের জামা-প্যান্ট এবং ২০২৫টি উলের সোয়েটার বিতরণ করা হয়। ১২টি পুকুরের বন্যার লবণাক্ত জলও পাম্প দ্বারা নিষ্কাশন করা হয়।

উড়িষ্যায় ঘূর্ণিবাত্যা ও বন্যাত্রাণ: ভদ্রক ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির জলবন্দী অধিবাসীদের

মধ্যে আকাশ থেকে খাবারের প্যাকেট ফেলা হয়। ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন থেকে বালাসোর জেলার ধামনগর ও কোঠার—এই দুই জায়গায় ত্রাণশিবির নির্মাণ করে প্রতিদিন ৫৩০০ জনকে খাওয়ানো হয়।

শ্রীলঙ্কা শরণার্থিত্রাণ: মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, মান্দাপম্ ও তিরুচি শিবিরে আগত শরণার্থী ছেলেমেয়েদের মধ্যে ৫১০০টি বান্ রুটি, ৫০ কে. জি. মুড়ি, ৬০ সেট জামা-প্যান্ট, ১৭৯ সেট পাঠ্যপুস্তক, ৬১টি জ্যামিতি-বাক্স বিতরণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন: ২৪-পরগনার গাইঘাটা থানায় ১৯৮৩-র ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত ঠাকুরনগর বালিকা বিদ্যালয়-ভবনের পুনর্নির্মাণ কার্য অব্যাহত।

উদ্বোধন-সংবাদ

'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে' শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার মহাষ্টমীর দিন বিশেষ পূজা ও হোম প্রভৃতি হয়। পূজার তিনদিনই অগণিত ভক্ত নরনারীর মধ্যে হাতে-হাতে প্রসাদ বিতরণ হয়।

১২ অক্টোবর মধ্যরাত্রে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে শ্রীশ্রীকালীপূজা সুসম্পন্ন হয়। পরদিন সকালে বহু ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ২৪ ও ২৬ নভেম্বর যথাক্রমে স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজ ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'তে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা হয় এবং সন্ধ্যারতির পর স্বামী সত্যব্রতানন্দ তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **রামমুরদ রাম** গত ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, সকাল ৮-৩০ মিনিটে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম করতে করতে ঠাকুর ও মায়ের ছবির সামনে স্বীয় গ্রাম পাণ্ডেকা মাঝিয়াতে (গোরখপুর, উত্তর প্রদেশ) দেহত্যাগ করেন। তাঁর দেহ কাশীধামে এনে পবিত্র মণিকর্ণিকায় সৎকার করা হয়।

রামমুরদ রাম অতি বাল্যকালেই উদ্বোধন 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'র সংস্পর্শে আসেন এবং সেখান থেকে বেলুড় মঠে যান। প্রায় ৪০ বৎসর বেলুড় মঠে থেকে, মঠ ও মায়ের বাড়ীতে অতি নিষ্ঠা সহকারে তিনি ক্ষৌরকারের কাজ করেন। শেষের দিকে স্বাস্থ্য ভেঙে যাওয়াতে প্রায় দুই বৎসর আগে রামমুরদ রাম নিজ গ্রামে ফিরে যান এবং অবসরজীবন যাপন করেন। সরল ও হাস্যকৌতুক ব্যবহারের জন্য তিনি বড় ছোট সকল সাধুর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য **যতীন্দ্রমোহন বসু** গত ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, তাঁর চন্দননগরস্থ বাস ভবনে পরলোক গমন করেন। আনুমানিক ১৪/১৫ বছর বয়সে তিনি শ্রীমা সারদা দেবীর কাছে দীক্ষা প্রাপ্ত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৯৩ বছর।

শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে এঁদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

—বিশেষ দ্রষ্টব্য—

* অতঃপর বর্তমান পৃষ্ঠাসংখ্যা নিচে।

* পুনর্মুদ্রিত অংশের পৃষ্ঠাসংখ্যা উপরে।

পুনর্মুদ্রণ

২য় বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা ● আশ্বিন ১৩০৭ (পৃষ্ঠা ৪৮৬—৪৯৮)

২য়তঃ কৃষ্ণ সম্বন্ধে সন্দেহ এই :—ছান্দোগ্য-উপনিষদে একস্থলে পাওয়া যায়, দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ঘোরনামা কোন যোগীর নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন। মহাভারতে কৃষ্ণ দ্বারকার রাজা, আর বিষ্ণুপুরাণে গোপীদিগের সহিত বিহারকারী কৃষ্ণের কথা বর্ণিত আছে। আবার ভাগবতে কৃষ্ণের রাসলীলা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে। অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশে মদনোৎসব নামে এক উৎসব প্রচলিত ছিল। সেইটীকেই লোকে দোলরূপে পরিণত করিয়া কৃষ্ণের ঘাড়ে চাপাইয়াছে। তাহাতে রাসলীলা আদিই যে ঐরূপে চাপান হয় নাই, কে বলিতে পারে? পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি অতি সামান্যই ছিল। সুতরাং যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। আর, পূর্ব্বকালে লোকের নাম যশের আকাঙ্ক্ষা খুব অল্পই ছিল। এরূপ অনেক হইয়াছে, যেখানে একজন কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গুরু অথবা অপর কাহারও নামে চালাইয়া দিয়া গেলেন। এইরূপ স্থলে সত্যানুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকের বড় বিপদ। পূর্ব্বকালে ভূগোলের জ্ঞানও কিছুমাত্র ছিল না—অনেকে কল্পনাবলে ইক্ষুসমুদ্র, ক্ষীরসমুদ্র, দধিসমুদ্র আদি রচিয়াছেন। পুরাণে দেখা যায়, কেহ অযুত বর্ষ, কেহ লক্ষ বর্ষ জীবন ধারণ করিতেছেন, কিন্তু আবার বেদে পাই, 'শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ'। আমরা এখানে কাহার অনুসরণ করিব? সুতরাং কৃষ্ণ সম্বন্ধে সঠিক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত করা একরূপ অসম্ভব। লোকের একটা স্বভাবই এই যে, কোন মহাপুরুষের প্রকৃত চরিত্রের চতুর্দ্দিকে নানাবিধ অস্বাভাবিক কল্পনা করে। সম্ভবতঃ, কৃষ্ণ সম্বন্ধে এই বোধ হয় যে, তিনি একজন রাজা ছিলেন। এ বিষয় খুব সম্ভব এই জন্য যে, প্রাচীনকালে আমাদের দেশে রাজারাই ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে উদ্যোগী ছিলেন। আরও একটী বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, গীতাকার যিনিই হউন, গীতার মধ্যে যে শিক্ষা, সমুদয় মহাভারতের মধ্যেও সেই শিক্ষা দেখিতে পাই। তাহাতে বোধ হয়, সেই সময় কোন মহাপুরুষ নূতন ভাবে সমাজে এই ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন। আরও দেখা যায়, প্রাচীনকালে এক একটী সম্প্রদায় উঠিয়াছে—তাহার মধ্যে এক একখানি শাস্ত্র প্রচার হইয়াছে। কিছুদিন পরে সম্প্রদায় ও শাস্ত্র উভয়ই লোপ পাইয়াছে, অথবা সম্প্রদায়টী লোপ পাইয়াছে, শাস্ত্রখানি রহিয়া গেল। সেইরূপ গীতা সম্ভবতঃ এমন এক সম্প্রদায়ের শাস্ত্র, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব উচ্চ উচ্চ ভাব সকল নিবিষ্ট ছিল। ৩য়,—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিশেষ কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তবে, কুরুপাঞ্চাল নামে যুদ্ধ যে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর এক কথা,—যুদ্ধের সময় এত জ্ঞান, ভক্তি, যোগের কথা আসিল কোথা হইতে? আর সেই সময় কি কোন সাঙ্কেতিক-লিপি-কুশল (Short hand writer) ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, যিনি সেই সমস্ত টুকিয়া লইয়াছিলেন? কেহ কেহ বলেন, এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ রূপকমাত্র, ইহার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য—সদসৎ প্রবৃত্তির সংগ্রাম; এ অর্থও অসঙ্গত না হইতে পারে। ৪র্থ,—অর্জ্জুন প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ এই,—শতপথব্রাহ্মণ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। উহাতে একস্থলে সকল অশ্বমেধযজ্ঞকারিগণের নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু সে সকল স্থলে অর্জ্জুনাদির নামগন্ধও নাই, অথচ পরীক্ষিত জনমেজয়ের নাম উল্লিখিত আছে। অথচ মহাভারতাদিতে বর্ণনা—যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনাদি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

(অগ্রহায়ণ, ১৩১২, পৃঃ ৭৮১)

এখানে একটী কথা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সকল ঐতিহাসিক তত্ত্বের সহিত আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্থাৎ ধর্ম্মসাধন শিক্ষার কোন সংস্রব নাই। ঐগুলি যদি আজই প্রমাণিত হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাহা হইলেও আমাদের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। তবে এত ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রয়োজন কি ?

প্রয়োজন আছে :—আমাদিগকে সত্য জানিতে হইবে, কুসংস্কারে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। এদেশে এ সম্বন্ধে বড় সামান্ত ধারণা আছে। অনেক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস এই যে, কোন একটী ভাল বিষয় প্রচার করিতে হইলে, একটী মিথ্যা বলিলে যদি সেই প্রচারের সাহায্য হয়, তাহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই, অর্থাৎ The end justifies the means. এই কারণে অনেক তন্ত্রে 'পার্ব্বতীং প্রতি মহাদেব উবাচ' দেখা যায়। কিন্তু আমাদের উচিত, সত্যকে ধারণা করা, সত্যে বিশ্বাস করা। কুসংস্কার মানুষকে এতদূর আবদ্ধ করিয়া রাখে যে, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণও অনেক কুসংস্কারে বিশ্বাস করিতেন। তোমাদিগকে সত্যের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কুসংস্কার সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে।

এক্ষণে কথা হইতেছে,—গীতা-জিনিষটীতে আছে কি ?—উপনিষদ্ আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহার মধ্যে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা চলিতে চলিতে হঠাৎ এক মহাসত্যের অবতারণা। যেমন, জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে অপূর্ব্ব সুন্দর গোলাপ, তাহার শিকড়, কাঁটা, পাতা সব সমেত। আর গীতাটী কি ?—গীতার মধ্যে এই সত্যগুলি লইয়া অতি সুন্দররূপে সাজান—যেন ফুলের মালা বা সুন্দর ফুলের তোড়া। উপনিষদে শ্রদ্ধার কথা অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু ভক্তি সম্বন্ধে কোন কথা নাই বলিলেই হয়। গীতায় কিন্তু এই ভক্তির কথা পুনঃপুনঃ উল্লিখিত আছে ও এই ভক্তির ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। এক্ষণে গীতা যে কয়েকটী প্রধান প্রধান বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, দেখা যাউক। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে গীতার নূতনত্ব কি ? নূতনত্ব এই যে, পূর্ব্বে যোগ, জ্ঞান, ভক্তি আদি প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু সকলের মধ্যেই পরস্পর বিবাদ ছিল, ইহার মধ্যে সামঞ্জস্যের চেষ্টা কেহ করেন নাই। গীতাকার এই সামঞ্জস্যের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি তদানীন্তন সমুদয় সম্প্রদায়ের ভিতর যাহা কিছু ভাল ছিল, সমুদয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও যে সমন্বয়ের ভাব দেখাইতে পারেন নাই, এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ পরমহংসের দ্বারা তাহা সাধিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ নিষ্কাম কর্ম্ম—এই নিষ্কাম কর্ম্ম অর্থে আজকাল অনেকে অনেকরূপ বুঝিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, নিষ্কাম হওয়ার অর্থ—উদ্দেশ্যহীন হওয়া। বাস্তবিক তাহাই যদি ইহার অর্থ হয়, তাহা হইলে ত হৃদয়শূন্য পশুরা ও দেয়ালগুলিও নিষ্কামকর্ম্মী। অনেকে আবার জনকের উদাহরণে নিজেকে নিষ্কামকর্ম্মীরূপে পরিচিত করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু জনক ত পুত্রোৎপাদন করেন নাই, কিন্তু ইঁহারা পুত্রোৎপাদন করিয়াই জনকবৎ পরিচিত হইতে চাহেন। প্রকৃত নিষ্কামকর্ম্মী পশুবৎ জড়প্রকৃতি বা হৃদয়শূন্য নহেন। তাঁহার অন্তর এতদূর ভালবাসায় ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ যে, তিনি সকল জগৎকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিতে পারেন। এরূপ প্রেম ও সহানুভূতি লোকে সচরাচর বুঝিতে পারে না। এই সমন্বয়ভাব ও নিষ্কাম কর্ম্ম—এই দুইটীই গীতার বিশেষত্ব।

এক্ষণে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে একটু পাঠ করা যাক। 'তং তথা কৃপয়াবিষ্টং'

ইত্যাদি শ্লোকে কি সুন্দর কবিত্বের ভাবে অর্জ্জুনের অবস্থাটী বর্ণিত হইয়াছে! তারপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ',—এই স্থানে অর্জ্জুনকে ভগবান যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিতেছেন কেন? অর্জ্জুনের বাস্তবিক সত্ত্বগুণ উদ্রিক্ত হইয়া যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি হয় নাই; তমোগুণ হইতেই যুদ্ধে অনিচ্ছা হইয়াছিল। সত্ত্বগুণী ব্যক্তির স্বভাব এই যে, তাঁহারা অন্য সময়ে যেমন শান্ত, বিপদের সময় তেমনি ধীর। অর্জ্জুনের ভয় আসিয়াছিল। আর তাঁহার ভিতরে যে, যুদ্ধ প্রবৃত্তি ছিল, তাহার প্রমাণ এই,—তিনি যুদ্ধ করিতেই যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। সচরাচর আমাদের জীবনেও এইরূপ ব্যাপার দেখা যায়। অনেকে মনে করেন, আমরা সত্ত্বগুণী, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা তমোগুণী। অনেকে অতি অশুচিভাবে থাকিয়া মনে করেন, আমরা পরমহংস—কারণ শাস্ত্রে আছে, পরমহংসেরা জড়োন্মত্তপিশাচবৎ হইয়া থাকেন। পরমহংসদিগের সহিত বালকের তুলনা করা হয়, কিন্তু এখানে বুঝিতে হইবে, তুলনা একদেশী। পরমহংস ও বালক কখনই অভিন্ন নহে। একজন জ্ঞানের অতীত অবস্থায় পঁহুছিয়াছেন, আর একজনের জ্ঞানোন্মেষ মোটে হয়ই নাই। আলোকে পরমাণুর অতি তীব্র স্পন্দন ও অতি মৃদু স্পন্দন উভয়ই দৃষ্টির বহির্ভূত। কিন্তু একটীতে তীব্র উত্তাপ ও অপরটীতে উত্তাপের অত্যন্তাভাব বলিলেই হয়। সত্ত্ব ও তমোগুণ কিয়দংশে একরূপ দেখাইলেও উভয়ে অনেক প্রভেদ। তমোগুণ—সত্ত্বগুণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আসিতে বড় ভালবাসেন। এখানে দয়ারূপ আবরণে উপস্থিত হইয়াছেন।

অর্জ্জুনের এই মোহ অপনয়ন করিবার জন্য ভগবান্ কি বলিলেন? আমি যেমন প্রায়ই বলিয়া থাকি যে, লোককে পাপী না বলিয়া তাহার ভিতরে যে মহাশক্তি আছে, সেই দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া দাও,—ঠিক সেই ভাবেই ভগবান্ বলিতেছেন, 'নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে'— তোমাতে ইহা সাজে না। তুমি সেই আত্মা, তুমি আপনাকে ভুলিয়া আপনাকে পাপী, রোগী, শোকী করিয়া তুলিয়াছ—এ ত তোমার সাজে না। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'। জগতে পাপ তাপ নাই, রোগ শোক নাই; যদি কিছু পাপ জগতে থাকে, তাহা এই 'ভয়'। যে কোন কার্য্য তোমার ভিতরে শক্তির উদ্রেক করিয়া দেয়, তাহাই পুণ্য, আর যাহা তোমার শরীর মনকে দুর্ব্বল করে, তাহাই পাপ। এই দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ কর। 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ', তুমি বীর, তোমার এ সাজে না। তোমরা যদি জগৎকে এ কথা শুনাইতে পার, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ, নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে', তাহা হইলে তিন দিনের ভিতর এ সকল রোগ শোক পাপ তাপ কোথায় চলিয়া যাইবে। এখানকার বায়ুতে ভয়ের কম্পন বহিতেছে। এ কম্পন উলটাইয়া দাও। তুমি সর্ব্বশক্তিমান্,—যাও তোপের মুখে যাও, ভয় করিও না। মহাপাপীকে ঘৃণা করিও না, তাঁহার বাহির দিকে দেখিও না। ভিতরের দিকে যে পরমাত্মা রহিয়াছেন, সেইদিকে দৃষ্টিপাত কর—সমগ্র জগৎকে বল, তোমাতে পাপ নাই, তাপ নাই, তুমি মহাশক্তির আধার।

এই একটী শ্লোক পড়িলেই সমগ্র গীতাপাঠের ফল পাওয়া যায়, কারণ এই শ্লোকের মধ্যেই গীতার সমগ্র ভাব নিহিত।

(অগ্রহায়ণ, ১৩১২ পৃঃ ৭৮৩)

ভারতের জাতীয় জীবন।

স্বামী সচ্চিদানন্দ লিখিত।]　　　　[২৫৯ পৃষ্ঠার পর।

ধর্ম্ম নিত্য, সৃষ্টির বিবরণ, সেতু। অনন্তসৃষ্টির সঙ্গে, চিরকাল মানুষ নিত্য সত্যের জন্য কাঁদিবে, আর ভারত তাহাকে সান্ত্বনা দিবে,—এই ভারতীয় জীবনোদ্দেশ্য। যতদিন সৃষ্টির বৈষম্য বজায় রাখার জন্য থাকা দরকার, ততদিন অন্য জাতির জীবন নদী থাকিয়া, পরে বালুকাময় নদী-গর্ত্তাবশেষমাত্র হইবে। ভারতের জীবনস্রোত শাশ্বত ব্রহ্মবিদ্যারূপ সাগরের সহিত যুক্ত; তাহার কার্য্যপ্রবাহের বিরাম নাই, কিন্তু জোয়ার ভাটা আছে। নাশ নাই, অবনতি আছে। মুসলমান কর্ত্তৃক ভারতাধিকারের কয়েক শত বর্ষ পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান অবনতির আরম্ভ। পূর্ব্বকালেও বোধ হয়, দু একবার তমঃ আসিয়া ভারতের আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল; শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রভৃতি সে সময়ে পতিত ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপনা করেন। কিন্তু ঈষন্মাত্রযামা গতপ্রায়া বর্ত্তমান গভীর বিষাদ রজনীর ন্যায় কোনও অমানিশা এই পুণ্য ভূমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এ পতনের গভীরতায় প্রাচীন পতন সমস্ত গোষ্পদের তুল্য। দিবার পর রাত্রি, তার পর আবার দিবা, বর্ষার পর শীত, শীতের পর বর্ষা, উত্থানের পর পতন, পতনের পর পুনরুত্থান—এ বৃত্তগতি জগতের নিয়ম; এক-দিকে অনন্ত উন্নতি বা অনন্ত অবনতি নাই। ভারত পড়িয়াছিল, আবার উঠিতেছে। এ প্রবোধনের সমুজ্জ্বলতায় অন্য সমস্ত পূর্ব্বকালীন পুনর্বোধন সূর্য্যালোকে তারকাবলীর ন্যায়। এ পুনরুত্থানের মহাবীর্য্যের সমক্ষে পুনঃপুনর্লব্ধ প্রাচীন বীর্য্য, বাললীলাপ্রায় হইয়া যাইবে।

এ অবনতির কারণ—অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া কেবল একমাত্র অন্তর্জ্জগৎ লইয়া থাকা। নিত্যসত্যানুসন্ধানে সারা জীবন অতিবাহিত কর, আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ, এসব ভাল কথা। কিন্তু পারে ক জনে? যে মন আজ বহির্জ্জগৎ লইয়া ব্যস্ত, তাহাকে শুধু বহির্জ্জগৎ হইতে তুলিয়া লইলেই যে সর্ব্বসাধনার শেষ হইল, এরূপ নহে। যথার্থ বলিলে, এ কেবল সাধনার আরম্ভ। এই ত্যক্তবহির্জ্জগৎবিষয় মনকে অতীন্দ্রিয় সত্যে দৃঢ়লগ্ন করিতে হইবে। মনের স্বভাব, বাধা না পাইলে, এলোমেলো ভাবা, নয়কে হয় করা। যতক্ষণ মন বহির্জ্জগতে থাকে, বহির্জ্জগৎ তাহার ঐ বিশৃঙ্খল গতি নিয়মিত করে; জলে আগুন ভ্রম হইলে, সে ভ্রম শুধ্‌রায়ে দেয়। জাগ্রতাবস্থায় এরূপ হয়ই না; যদি হয়, তা অল্পক্ষণের জন্য, পরক্ষণেই হুঁশ্‌ হয়। স্বপ্নাবস্থায় মন নিরঙ্কুশ, যা ইচ্ছা তাই বানায়, মিথ্যাকে সত্য সাজায়; মানুষ পাখীর মত আকাশে ওড়ে। নিরবচ্ছিন্ন অন্তর্জ্জগতে অবস্থিত মনেরও এই বিপদ। সেথায় বহির্জ্জগতের ভ্রমসংশোধনকারিণী দৃষ্টি একেবারেই নাই। চিত্তচিদাকাশস্থিত মনকে নীচু করিয়া মাঝে মাঝে বহির্জ্জগতের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না করাইলে, সে আত্মপ্রবঞ্চিত হইয়া মিথ্যা সত্য মিশাইয়া ফেলে; ফল, কিন্তুতকিমাকার না সত্য না মিথ্যা। ভারতবর্ষের প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ, যাঁহাদের উপর দেশের উন্নতি নির্ভর করে, যোগী, ঋষি, তপস্বী, সন্ন্যাসী, বহির্জ্জগৎ ছাড়িয়া একমাত্র অন্তর্জ্জগৎ আশ্রয় করিতে যাইয়া, এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাহাতেই ধর্ম্মের অবনতি। শুধু ধর্ম্মে কেন—সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্র, যে দিকে তাকাও, কেবল স্তূপীকৃত আবর্জ্জনারাশি। দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলিতে দেখিবে, কতকগুলো হিজি বিজি মূর্ত্তি এক জায়গায় জড়ো করা, তার না আছে প্রাণ, না আছে অন্যান্য সামঞ্জস্য। ছেলেগুলো ছবি আঁকে, দেখ্‌লে আপাদমস্তক কেঁপে ওঠে; রামরাজার ছবি, রামের মুখ উত্তরদিকে, ত

লক্ষ্মণের মুখ দক্ষিণে, ভরতের পূর্ব্বে, আর সীতার ঊর্দ্ধে। ভাব (Art) বলিয়া কিছুই নাই। সঙ্গীতেও তথৈবচ।

এখন উঠিতে হইবে। হয় উঠিতে হইবে, না হয় ধ্বংস ; জগতে গতিহীন সম্পূর্ণ বিরাম অসম্ভব। চারিদিকে উন্নতি, অগ্রসর হও, এই কোলাহলের মধ্যে ভারতবর্ষের নিদ্রা কি বাঞ্ছনীয়, না সম্ভব ? আর উঠিবে—ধর্ম্মের মধ্য দিয়া। রাজনীতিচর্চ্চা বা অন্য ধর্ম্মেতর আলোচনায় ভারতের প্রাণ স্পন্দিত হইবে না। মুষ্টিমেয় কৃতবিদ্য পাঁচ সাত জনের আস্ফালন সমগ্র জাতীয় জীবনের চিহ্ন নহে। আপামরসাধারণ ধর্ম্ম বোঝে, আপামরসাধারণের উদ্বোধনে জাতীয় উন্নতি ; মুমূর্ষু ভারতের জীবনদায়িনী বিশল্যকরণী আপামরসাধারণসম্পত্তি ধর্ম্ম। যে বৈষম্যে ভারতজীবন গঠিত, তাহার বিপরীত কার্য্য করিতে যাইলে বিষময় ফল উঠিবে। শত সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া ভারতের জীবন-স্রোত ধর্ম্ম পথে প্রবাহিত ; কাহার সাধ্য, সে স্রোতের গতি অন্যদিকে উল্টাইয়া দেয় ? দুই এক জায়গায় চড়া পড়িয়াছে, সত্য ; চড়া কাটিয়া দেও, স্ববেগে নদী বহিতে থাকিবে। অশ্বত্থবৃক্ষ শুষ্কপ্রায় হইয়াছে বলিয়া, তাকে খর্জ্জুরে পরিবর্ত্তিত করিতে যাওয়া বাতুলতা। "এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ" ভারতজীবন কত শত সহস্র বর্ষ ধরিয়া সংসারসূর্য্যের জরাদুঃখতাপে জ্বলিত-মস্তক পথিককে ছায়া দিয়া আসিতেছে ; আজ তাহার দুই একটী শাখা ভগ্নপ্রায়, পতনোন্মুখ, প্রত্যেক হিন্দু ঘাড় পাতিয়া, কঙ্কালাবশেষ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া তাহার অবলম্বন হও ; অনাবৃষ্টি হেতু বৃক্ষ শুষ্কপত্র, হৃদয়রুধিরে তাহার সিঞ্চন কর। নিজে ওঠো, পরকে উঠাও। মা ভৈঃ, জগদ্ধাত্রীর অমৃতপীযূষপানে তুমি অবিনাশী।

কিন্তু সাবধান ! বলবান্ প্রবীণের ভার দুর্ব্বল শিশুর মাথায় অর্পণ করিও না। পুরুষ-সিংহোচিত ত্যাগ সকলের সাধ্য নহে ; ভক্তি, প্রেম, সমাধি অনেক দূরের জিনিস। কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও, বীরতেজে জীবন্ত ভগবৎপ্রতিম মানুষের উপাসনা কর, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, কর্ম্মতপস্যা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ কর, বিরাট মাতৃভূমির পদে আত্মবলিদান কর, পুড়িতে—মরিতে শেখ, জড়তা ছাড়িয়া নড়িতে চড়িতে আরম্ভ কর, তখনই কর্ম্মক্ষয় হইবে, নিষ্কাম ভাবের অধিকারী হইবে। যার কিছু নাই, তার আবার ত্যাগ কি ? কর্ম্ম, কর্ম্ম,—শেষনিশ্বাস পর্য্যন্ত। তারপর, অনেক পর, প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং,—অনেক পর, বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসম্। (সমাপ্ত)

ধর্ম্ম।

(স্বামী বিমলানন্দ লিখিত।)

শ্রীভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন, "কেহ কখনও ক্ষণমাত্র কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না।" ভগবদ্ভক্ত এই বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করা বিশেষ আয়াসসাধ্য নহে। কি অন্তরে, কি বাহিরে, যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, দেখি কেবল কর্ম্ম। বহির্জগতের যে সকল বস্তুকে আমরা চেতন বলিয়া থাকি, তাহাদের ত কথাই নাই, তাহারা ত দিবারাত্র শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের চেষ্টায় ব্যস্ত ; অচেতন বলিয়া যাহাদিগকে আমাদের ধারণা, তাহাদেরও এক অবস্থায় নিত্যস্থিতি অসম্ভব —তাহারাও ক্ষণকালের জন্য কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না। বহির্জ্জগৎ ছাড়িয়া যখন ভিতরের

(অগ্রহায়ণ, ১৩১২, পৃঃ ৭৮৬)

দিকে চক্ষু ফিরাই, দেখি কর্ম্মস্রোতের খরতর বেগ। সে স্রোতের উপর অসংখ্য তরঙ্গ রঙ্গে ভঙ্গে খেলা করিতেছে। বাহ্য ইন্দ্রিয় স্থির, তবু দেখি মন মুহূর্ত্তের জন্য স্থির নয়,—কত কি করিতেছে, কতস্থানে যাইতেছে, সুখের আশায় মত্ত হইয়া কত আকাশ-কুসুম-সুশোভিত কল্পনাকাননে বিচরণ করিতেছে, আবার কখন বা ভবিষ্যৎ দুঃখের আশঙ্কায় জড় সড় হইয়া নিরাশার নিবিড় আঁধারে নিপতিত হইতেছে।

এই অনন্তকালপ্রবাহী কর্ম্মস্রোতের উৎপত্তি কোথায়? কোথায় বা ইহার লয়? কোন্ শক্তির প্রেরণায় আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলে অহর্নিশি ছুটাছুটী করিতেছে, আর কতদিনই বা এই অজ্ঞেয়স্বরূপা শক্তির অধীনে থাকিয়া এই রূপে ঘুরিবে—ইহা নির্ণয় করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত বলিয়া বোধ হয়। 'প্রকৃতিজ গুণসমূহ দ্বারা চালিত হইয়া কার্য্য করিতেছি', এ কথা বলিলে সেই বিচিত্র শক্তির চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পরিচয় পাই না। "কর্ম্মফল" বলিলে কর্ম্মের প্রথম উৎপত্তি বা অন্তিম পরিসমাপ্তি সম্বন্ধে বিশেষ গোলযোগ রহিয়া যায়। "এ সমস্ত কল্পনামাত্র, বস্তুতঃ সেই এক অদ্বিতীয় শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র বিদ্যমান আছেন", অদ্বৈতবাদীর এই উত্তরের উপর স্বতঃই এই প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়,—শুদ্ধ বোধস্বরূপ অদ্বিতীয় সত্তার আবার দ্বৈতাভাস আইল কোথা হইতে? যেখানে দ্বিতীয় বস্তুর উপলব্ধি অসম্ভব, তাহাতে আবার বহু কল্পনা কিরূপে সম্ভবে? "ঈশ্বরের ইচ্ছায় এ সমস্ত হইতেছে, তাঁহার ইচ্ছাতেই আবার সমস্ত মিটিয়া যাইবে", দ্বৈতবাদীর এ উত্তরেও সকল শঙ্কার নিরাকরণ হয় না। ঈশ্বরকে যদি পূর্ণ বল, তবে তাঁহার আবার ইচ্ছা কি? ইচ্ছা ত অপূর্ণ জীবেই সম্ভবে।

যে দিকে যাই না কেন, সেই দিকেই কোন না কোন আপত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। সে আপত্তি খণ্ডন করিয়া স্থির মীমাংসায় উপনীত হওয়া বড়ই কঠিন বলিয়া বোধ হয়। তবে প্রত্যেক মনুষ্যই স্পষ্ট বুঝিতে পারে যে, কোন না কোন অভাব দূর করিবার অভিপ্রায়ে আমরা কার্য্য করিয়া থাকি। এই অভাব-বোধই সকল কার্য্যের সাক্ষাৎ কারণ। বলিতে পার, রাজার আবার অর্থের অভাব কোথায়? তবে কেন তাঁহাকেও অর্থাগমের উপায় উদ্ভাবন করিতে ব্যস্ত দেখা যায়? শরীরে কোন প্রকার পীড়া নাই, তবু কেন ব্যায়ামাদি দ্বারা শরীর লৌহসদৃশ দৃঢ় করিবার ইচ্ছা? রাজার অর্থের বাস্তবিক অভাব নাই বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণে অভাববোধ পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। তাঁহার যাহা আছে, তাহাতে তিনি যারপরনাই সুখে কাল যাপন করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহাতেও তিনি সন্তুষ্ট নন—তাঁহার প্রাণের মধ্যে কেমন একটা ফাঁকা ফাঁকা ভাব সর্ব্বদাই রহিয়াছে—সংস্কারের বশে মনে করেন, আরও অধিক অর্থ হইলেই তাঁহার এই অভাববোধ চলিয়া যাইবে। শরীর বেশ সবল আছে, কোন কার্য্যই বন্ধ নাই, আহারটীও বেশ চলিতেছে—তবু মনে ধারণা করিয়া বসিয়া আছেন, শরীর আরও সবল হইলে ভাল থাকিব। মা ষষ্ঠীর কৃপায় বাটীতে 'ন স্থানং তিলধারণে' তত্রাচ সন্তানের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। জয়নিনাদে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে, কিন্তু কোথায় কে একজন কি বলিয়াছে, সেই ভাবনাতেই বিঘূর্ণিত মস্তকে বসিয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। যাহার কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুতে স্পৃহা নাই, তাহাকেও একেবারে শান্ত দেখি না, সেও একবার এটা, একবার ওটা, এইরূপ করিয়া বেড়াইতেছে। যাঁহার সাংসারিক কোন দ্রব্যে আকাঙ্ক্ষা নাই, তিনিও কোন না কোন স্থানে কোন প্রকারের অভাব-

বোধ করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন। যিনি পরোপকারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনি অপরের কোন অভাববোধ করিয়াছেন বলিয়াই, তাহার মোচনে ব্রতী। নির্ব্বাণলাভেচ্ছু সাধক বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়াই প্রাণপণে নির্ব্বাণ লাভের জন্য যত্ন করিতেছেন। তবেই দেখিতেছি, সকল জীব কোন বস্তু বা অবস্থা বিশেষের অভাববোধ করিয়াই কার্য্যে লিপ্ত হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন বস্তু বা অবস্থার জন্য চেষ্টা হইলেও, সকলের মধ্যে একটী অভাববোধ সাধারণ-ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। সাধারণ হইতে বিশেষের উৎপত্তি, বিশেষ কখনও সাধারণের কারণ হইতে পারে না। অভাববোধটী সাধারণ, ইহা হইতেই বিশেষ বিশেষ কার্য্যের চেষ্টা, অর্থাৎ একমাত্র অভাববোধই ভিন্ন ভিন্ন আধারে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে।

এই অভাববোধ আইসে কোথা হইতে? যদ্যপি আলোর জ্ঞান না থাকিত, তাহা হইলে অন্ধকারের জ্ঞান কখনই সম্ভব হইত না, সুখ না জানিলে দুঃখ বোধ কিরূপে হইতে পারে? পরস্পরসম্বন্ধ (correlative) যাবতীয় পদার্থই অন্যান্যাশ্রয়ী, অর্থাৎ একের জ্ঞান হইতেই তদ্বিপরীতের জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। যখন অভাববোধ হইয়াছে, তখনই বুঝিতে হইবে যে ইহার বিপরীত অবস্থার উপলব্ধিও ভিতরে ভিতরে হইয়াছে—ভাব অর্থাৎ পূর্ণতার জ্ঞানের সহিত তুলনা করিয়াই, অভাববোধ করা সম্ভব। আবার যখন দেখিতেছি যে, এই অভাববোধ সর্ব্বদাই রহিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, ভাবের জ্ঞানও অপ্রতিহতভাবে হৃদয়মধ্যে বিদ্যমান আছে। বিশেষ বিচারের পর দৃষ্ট হয় যে, অভাব বলিয়া বাস্তবিক কোন পদার্থ নাই। যে বস্তুর যে অবস্থায় অবস্থিতি স্বাভাবিক বা আবশ্যক বলিয়া আমাদের ধারণা, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই আমরা অভাববোধ করিয়া থাকি। আমি যদি মনে মনে ধারণা করিয়া রাখি যে অর্থ আমার আবশ্যক, তাহা হইলে অর্থ না পাইলে আমি অভাববোধ করিব। যাহার সে ধারণা নাই, তাহার অভাববোধও হইতে পারে না। বিশেষ অভাবের কথা ছাড়িয়া পুনরায় সাধারণ অভাব-বোধ সম্বন্ধে এইরূপে বিচার করিলে বুঝিতে পারি যে, কেবল যে ভাব অর্থাৎ পূর্ণতার জ্ঞান আমাদের মধ্যে রহিয়াছে এমন নয়, সেই পূর্ণতায় অবস্থিতি আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক, ইহাও আমাদের ভিতরে ভিতরে ধারণা আছে। সে অবস্থায় থাকি না বলিয়াই, অভাববোধ করি; অভাববোধ করি বলিয়াই, কার্য্য করি; কার্য্য হইতেই ফলভোগ, আর ইহারই নাম সংসার। পারি যদি আমি আমার স্বাভাবিক অবস্থায় স্থিত হইতে, তবেই সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারিব। যাহার যে অবস্থায় স্থিতি স্বভাবসিদ্ধ, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। জলের দ্রবত্বে অবস্থিতি স্বাভাবিক, সেই নিমিত্ত দ্রবত্ব জলের একটী ধর্ম্ম। পূর্ণতায় থাকা আমার পক্ষে স্বাভাবিক, তাই ইহাই আমার ধর্ম্ম।

বৈজ্ঞানিক কার্য্য-কারণ-বাদ।

(বাবু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, লিখিত।)

কোন একটা ঘটনা ঘটিতে দেখিলেই, তাহার কোন কারণ আছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়া আমাদের স্বাভাবিক; তবে সেই কারণবোধ ব্যক্তি বিশেষে ও অবস্থা বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হয়। আকাশের কোণে কালো মেঘ দেখা দিল, কিয়ৎক্ষণ পরেই সেই দিক হইতে বায়ু বহিল, মেঘও দ্রুতগতিতে আসিয়া আকাশটাকে যেন ছাইয়া ফেলিল, বিদ্যুৎ চমকিল, বজ্রনির্ঘোষ শ্রুত হইল, মুষলধারে বৃষ্টি হইল। আবার শান্তি আসিল, আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। এত বড় একটা

(অগ্রহায়ণ, ১৩১২, পৃঃ ৭৮৭)

ঘটনা দেখিয়া মানুষকে একটা সিদ্ধান্ত করিতেই হয় যে, কালো মেঘ দেখা দিল কেন ? তবে অসভ্য অবস্থায় হয়ত স্থির করিতে হয়, সয়তানের ক্রোধ মানুষকে ভয়বিহ্বল করিবার জন্য অতবড় একটা আড়ম্বর করিয়া গেল। আবার যদি ঐ ঝড় বৃষ্টির মধ্যে বজ্রপাতে কোন মানুষ মরিয়া গিয়া থাকে, তবে হয়ত স্থির করিয়া লইবে যে, ঐ মানুষটীর পাপেই দৈব বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে, তাহার মৃত্যুতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল, কিন্তু দেশের পুণ্যে বৃষ্টিপাত হইয়া শস্যবৃদ্ধির কারণ হইল।

কবির নিকট ঐ ঘটনারই অন্যতর কারণ উপলব্ধি হইবে ; তিনি হয়ত স্থির করিবেন, ইন্দ্র দেব, তাঁহার সম্বর্ত্ত আবর্ত্তাদি মেঘকে স্মরণ করিয়া শুষ্ক তৃণক্ষেত্রে জল সেচনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আবার হয়ত কোন অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত স্থির করিবেন যে, বায়ুবেগে পূর্ব্বে জলীয় বাষ্প বাহিত হইয়া সঞ্চিত হইয়াছিল, ঐ বাষ্পে স্ফুরিত তড়িৎশক্তি অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে উর্দ্ধতর বায়ুমণ্ডলীতে তাপের অল্পতা হওয়াতে বাষ্প মেঘাকারে পরিণত হইল। এইরূপে মেঘ একখানা স্ফুরিততড়িৎশক্তিমান প্রকাণ্ড দ্রব্যবিশেষ হইয়া দাঁড়াইল। তড়িৎশক্তির প্রসিদ্ধ নিয়মে উহা নিম্নস্থ ভূতলে বিপরীত তড়িৎশক্তি স্ফুরণের কারণীভূত হইল এবং তাহার সহিত প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইল। কিন্তু মধ্যস্থ বায়ুমণ্ডলী তাহাদের মিশ্রণে বাধা দিতে লাগিল ; ফল এই দাড়াইল যে, মেঘ গতিশীল হইয়া উঠিল, বায়ুরাশিও স্তরে স্তরে তড়িৎপূর্ণ হইয়া গতিশীল হইল, —ইহাকেই প্রবল বাত্যা বলিয়া আমরা জানিলাম। ইতিমধ্যে মেঘস্থ জলকণাদ্বারা বায়ুরাশিও কতক পরিমাণে আর্দ্র হইয়া মেঘে ও ভূপৃষ্ঠে সঞ্চিত দুই তড়িৎ সমষ্টির মিলনের যথাকথঞ্চিৎ পথ প্রস্তুত করিয়া দিল। তথাপি মিলিবার সময় যে বাধা অতিক্রম করিতে হইল, তাহাতেই তাপ, আলোক ও শব্দের সৃষ্টি হইল, আমরা ইহাকেই বজ্রপাত বলিয়া বুঝিলাম।

এইরূপে মনুষ্য স্বীয় অবস্থা ও জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন কারণ অনুমান করিয়া থাকে। কিন্তু কারণ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা যে তাহার মনের স্বাভাবিক গুণ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের জ্ঞান, বিজ্ঞান ঐ অনুসন্ধিৎসার উপরই নির্ভর করে। কোন ব্যাপার কেন ঘটিল ? এই প্রশ্ন যাহার মনে উত্থাপিত না হয়, তাহার জ্ঞানলাভের কোন উপায় নাই। সকল কাজই যে মনে করে ভূতে করিয়া থাকে, তাহার নিজের করিবার বা বুঝিবার কিছুই নাই।

পক্ষান্তরে একথাও স্বীকার্য্য যে, সমস্ত প্রত্যক্ষ ঘটনার কারণ নির্ণয় করাও মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। এই জন্যই ভূতের কথা, অদৃষ্টের কথা, দৈবের কথা মনুষ্য সমাজে এত প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কারণ নির্দ্দেশ ও তাহাতে স্থিরবুদ্ধির নামই জ্ঞানলাভ। জ্ঞানলাভের ইচ্ছা স্বাভাবিক এবং মনুষ্য যে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভের অধিকারী, ইহাই তাহার অন্যতম নিদর্শন। সূর্য্য প্রত্যহ প্রাতে পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অস্তমিত হন। কেন এবং কিরূপে ইহা ঘটিয়া থাকে, সকল মানুষের নিকটই প্রশ্ন এই এক। ইহার উত্তর না মিলিলে মানুষের নিশ্চিন্ত হইবার যো নাই। যাঁহার বেশী বিচার আসিল না, তিনি হয়ত দৈব বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন অর্থাৎ স্থির করিলেন যে, ভগবান্ সূর্য্যকে নির্ম্মাণ করিয়া হুকুম দিয়াছেন, প্রত্যহ তুমি পূর্ব্বদিকে উঠিবে ও পশ্চিমদিকে শয়ন করিবে। অথবা হয়ত সূর্য্যের অদৃষ্টের কথাই মীমাংসা করিলেন অর্থাৎ স্থির করিলেন, বিশেষ শুভাদৃষ্টের ফলে জনৈক দিক্-পাল সূর্য্যরূপে পৃথিবীর হিতসাধনার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ভূতের কথার মধ্যেও যে কেহ ফেলিতে পারেন না, এমত নহে। সূর্য্যের অনুপস্থিতিতে ভূতের উৎপাতে হয়ত পৃথিবী উৎসন্ন যাইত, তাহাদিগের দমনার্থ সূর্য্যের ঐ গতি।

(৮৭তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, পৃঃ ৭৮৮)

৮৭তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

পৌষ, ১৩৯২

দিব্য বাণী

মা, মা, মহামায়া, জয় মা, জয় মা। মা, আমাদের ভক্তি, বিশ্বাস, পূর্ণজ্ঞান, বৈরাগ্য, অনুরাগ, ধ্যান-সমাধি দিন। ঠাকুরের এ সংঘের কল্যাণ করুন, সমগ্র জগতের কল্যাণ করুন, জগতে শান্তিবিধান করুন।···আমাদের ভক্তি নেই, তাই এ-সব দিনের মাহাত্ম্য ঠিক ঠিক বুঝতে পারিনে। আজ কি যে-সে দিন? মহামায়ার জন্মদিন। জীবজগতের কল্যাণের জন্য স্বয়ং মহামায়া আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মানুষলীলা বোঝা বড় শক্ত। তিনি কৃপা ক'রে না বোঝালে কে বুঝবে? কি সাধারণভাবে তিনি থাকতেন!···আমরা তাঁকে কতটুকু বুঝেছি? একমাত্র ঠাকুরই মাকে ঠিক ঠিক জেনেছিলেন। ···আমাদের মায়ের নাম সারদা। ঐ মা-ই স্বয়ং সরস্বতী। তিনিই কৃপা ক'রে জ্ঞান দেন। জ্ঞান অর্থাৎ ভগবান্‌কে জানা; এই জ্ঞান হ'লেই ঠিক ঠিক পাকা ভক্তি হওয়া সম্ভব। জ্ঞান না হ'লে ভক্তি হয় না। শুদ্ধ জ্ঞান আর শুদ্ধা ভক্তি এক জিনিস। মায়ের কৃপা হ'লেই তা হওয়া সম্ভব। মা-ই জ্ঞান দেবার মালিক।

—স্বামী শিবানন্দ

['শিবানন্দ-বাণী', ২য় ভাগ, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১০০—১০১]
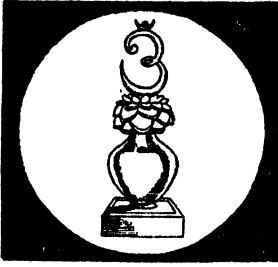
কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীশ্রীমায়ের দুইটি রূপ

শ্রীশ্রীমা সারদা যাঁহার সম্বন্ধে নিবেদিতা বলিয়াছিলেন: "অতি সাধারণ নারীচরিত্র। কিন্তু জ্ঞান আর মাধুর্যের অপূর্ব সমাবেশ। প্রার্থনার নীরবতার মতো পবিত্র শান্ত তাঁর জীবন।" অল্প কয়েকটি কথা, কিন্তু মাতৃ-চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ একখানি চিত্র। শ্রীশ্রীমার ঈশ্বরানুরাগ, পবিত্রতা, ত্যাগ, তপস্যা, ক্ষমা, সর্বজীবে সমদৃষ্টি, দয়া, সহনশীলতা, লোভরাহিত্য প্রভৃতি অসংখ্য স্বাভাবিক সদ্গুণরাজির পুণ্য প্রভাব ইতিমধ্যেই দেশ-দেশান্তরের অগণিত নরনারীর হৃদয় অধিকার করিয়াছে। তাহাদের নিকট তিনি আজ শক্তি-রূপে পূজিতা এবং আদর্শ মাতা রূপে উপাসিতা। আদর্শ গৃহিণী, আদর্শ সন্ন্যাসিনী এবং সর্বোপরি আদর্শ মাতা রূপে যিনি মানবজাতির সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন; প্রতি কর্ম ও চিন্তার মাধ্যমে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগের অপূর্ব সমন্বয় যাঁহার চরিত্রকে মাধুর্যমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, মনুষ্যরূপধারিণী সেই দেবীর পূত-চরিত্রের অনুধ্যান আমাদের পক্ষে অশেষ কল্যাণের নিদান—ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীশ্রীমায়ের পূত-চরিত্রের অনুধ্যান আমাদের চিন্তাকে অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও অজস্র পার্থিব চিন্তা হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবে, কলুষিত চিত্তকে শুদ্ধ ও নির্মল করিবে এবং ক্ষণকালের জন্য হইলেও মন মাতৃ-চিন্তায় নিবিষ্ট হইয়া চির-আকাঙ্ক্ষিত মাতৃ-সান্নিধ্য-লাভে ধন্য হইবে—এই অভিলাষ লইয়াই অনন্তলীলা-রূপিণী শ্রীশ্রীমায়ের দুইটি রূপ এখানে অঙ্কিত করিবার প্রয়াস

সাত্ত্বিক কর্মের কর্তার সংজ্ঞা বর্ণনায় গীতাতে আছে: "মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহ-সমন্বিতঃ / সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥" অর্থাৎ যিনি অনাসক্ত, অহঙ্কারশূন্য, ধৃতি ও উদ্যমযুক্ত হইয়া কর্ম করেন, কিন্তু কর্মের ফলের সিদ্ধিতে হর্ষ বা অসিদ্ধিতে বিষাদশূন্য থাকেন—তিনিই সাত্ত্বিক কর্মের কর্তা।

এই প্রসঙ্গের আলোচনায় অগ্রসর হইবার পূর্বেই একটি কথা এখানে পরিষ্কার করিয়া বলিয়া রাখা প্রয়োজন মনে করি। আলোচনা-প্রসঙ্গে যদিও আমরা গীতোক্ত সাত্ত্বিক কর্মের কর্তার সহিত শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের সাদৃশ্য যথাস্থানে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিব, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, শ্রীশ্রীমা ছিলেন পূর্ণজ্ঞানী ব্রহ্মস্বরূপিণী। শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের কথায়: "ও সারদা, সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে।" অন্য এক সময়ও বলিয়া-ছিলেন: "ও জ্ঞানদায়িনী, ও কি যে সে? ও আমার শক্তি।" কাজেই কোন কর্ম বা কর্মফল তাঁহাকে লিপ্ত বা স্পর্শ করিবার প্রশ্নই আসে না। তাঁহার কর্মে লিপ্ত হওয়া পরার্থে লোক-কল্যাণার্থে। জীবের কল্যাণের জন্য তাঁহার মনুষ্যবৎ লীলা। স্বামী প্রেমানন্দজী বলিয়াছেন: "শ্রীশ্রীমা মানুষদেহধারিণী হলেও তাঁর অপ্রাকৃত ভাগবতী তনু, জীবের কল্যাণের জন্য মনুষ্যবৎ লীলা করছেন।"

আমাদের সাধারণ ধারণা, আধ্যাত্মিকতা এবং জাগতিক ব্যবহারিক কাজকর্মের মধ্যে বোধ হয় কোন সামঞ্জস্য নাই,—দুইটি সম্পূর্ণ পরস্পর-

বিরোধী পৃথক বস্তু। আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি সাংসারিক কাজকর্মের প্রতি উদাসীন ও সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত থাকিবেন—ইহাই যেন স্বাভাবিক। সংসারের কাজকর্ম নিখুঁতভাবে সম্পাদন করিয়া সংসারে থাকিয়াও সংসারাতীত অবস্থা লাভ করা যায় এবং ইহাই যে কর্মযোগের আদর্শ—জনক-রাজাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা উপদেশচ্ছলে শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার এই কথা বলিয়াছেন এবং নিজ জীবনে তাহা দেখাইয়াও গিয়াছেন। তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের ব্যবহারিক জীবনে এই ভাবের প্রতিফলন সাধারণের নিকট ততটা ধরা পড়িত না। অহর্নিশ ভগবদ্ভাবে তন্ময় হইয়া থাকিবার ভাবটি বাহিরে এত বেশি প্রকটিত হইত যে, অন্য ভাবটি তাহার নিকটে কতকটা নিষ্প্রভ হইয়া পড়িত বলিলে চলে। অপরপক্ষে, সংসারের যাবতীয় কাজ নিখুঁতভাবে সম্পাদন করিয়া সর্বাবস্থায়—সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার, আসক্তি ও অহঙ্কার-রহিত হইয়া সংসারে থাকা যায়—শ্রীশ্রীমায়ের জীবন তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের প্রতি কর্মে ও আচরণে এই ভাবের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাইত। আর এই ভাব জগৎ-সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়া আদর্শ স্থাপন করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ রাখিয়া গিয়াছিলেন শ্রীশ্রীমাকে—যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূল-শরীরের অন্তর্ধানের পরেও স্বেচ্ছায় মায়াবন্ধন স্বীকার করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-আরব্ধ লোককল্যাণকার্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য সুদীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর এই ধরাধামে অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমা নিজেই এক সময় বলিয়াছিলেন: "দেখ, সব বলে কিনা আমি 'রাধু' 'রাধু' করেই অস্থির, তার উপর আমার বড় আসক্তি! এই আসক্তিটুকু যদি না থাকত তাহলে ঠাকুরের শরীর যাবার পর এই দেহটা থাকত না। তাঁর কাজের জন্যই 'রাধী' 'রাধী' করিয়ে এই শরীরটা রেখেছেন।" শিব-শক্তির অপূর্ব এই লীলার তুলনা ধর্ম-জগতের ইতিহাসে অতি বিরল।

শ্রীশ্রীমায়ের সমস্ত জীবনটাই ছিল কর্মময়; বাহ্যতঃ অত্যন্ত সাদাসিধা ঘটনাবৈচিত্র্যহীন আরও দশজন কুলনারীর মতোই। শৈশব হইতেই তিনি মাতা শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে থাকিয়া সাংসারিক নানা কাজে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন। পরে দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে নহবতের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে থাকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য রান্না ও তাঁহার সেবা, শ্রীরামকৃষ্ণ-জননী চন্দ্রমণিদেবীর সেবা, ভক্তদের জন্য প্রায়ই রান্না এবং অন্যান্য কাজ; শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরে চিকিৎসার্থ শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থান-কালে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া তাঁহার অনলস নীরব সেবা; শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর কামারপুকুরে কঠোর কায়িক পরিশ্রমে জীবনধারণ—সবই আজ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সর্বজন-বিদিত ঘটনা। আবার পরবর্তিকালে যখন তিনি বহুজন-পূজিতা ভক্তজননী তখনও কিন্তু তাঁহার কর্মের বিরাম নাই। জয়রামবাটীতে অন্য দশজন সাধারণ পল্লীজননীর মতো সন্তানদের জন্য রান্না ও সেবা-যত্ন ইত্যাদি সব কাজই তিনি করিয়াছেন। লোকশিক্ষার্থে তাঁহার এই কর্ম-যজ্ঞের একটি চিত্র ধরা পড়িয়াছে স্বামী প্রেমানন্দজীর একখানি পত্রে। তিনি লিখিয়াছেন: "তোমরা দেখে তো এলে, রাজরাজেশ্বরী সাধ করে কাঙ্গালিনী সেজে ঘর নিকুচ্ছেন, বাসন মাজছেন, চাল ঝাড়ছেন, এমন কি ভক্ত ছেলেদের এঁটো পর্যন্ত পরিষ্কার করছেন। মা জয়রামবাটীতে থেকে এত কষ্ট করছেন গৃহীদের গার্হস্থ্যধর্ম শেখাবার জন্য। অসীম ধৈর্য, অপরিসীম করুণা, সর্বোপরি সম্পূর্ণ অভিমানরাহিত্য!"

সংসারের অন্যান্য দুঃখ-কষ্টও শ্রীশ্রীমাকে কম সহ্য করিতে হয় নাই। নিজ ভ্রাতাদের নিকট হইতে অত্যাচার-আবদার, বিশেষ করিয়া তাঁহার পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধু এবং রাধুর বিকৃতমস্তিষ্ক

মায়ের হস্তে নির্যাতন ভোগ করা ইত্যাদি কত কষ্ট ও সাংসারিক ঝামেলা যে তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এত শত ঝামেলা ও দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও কিন্তু তাঁহার ভিতরকার স্বাভাবিক শান্তভাবের বিন্দুমাত্র হ্রাস হইত না। সর্বাবস্থায় শান্ত ও ধীর স্থির। স্বামী সারদানন্দজী বলিয়াছেন: "আমাদের তো দেখছ, পান থেকে চুন খসলেই আমরা চটে আগুন হই। কিন্তু মাকে দেখ। তাঁর ভায়েরা কি কাণ্ডই করছেন, অথচ তিনি যেমন তেমনটিই আছেন—ধীর স্থির।"

আমরা যখন দেখি শ্রীশ্রীমা পল্লীবাসিনী পুত্রহারা-জননীর পুত্রবিয়োগের কথা শুনিয়া সমবেদনায় শোকাতুরা-জননীর সহিত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছেন, সন্তানদের অমঙ্গল আশঙ্কায় সদা উৎকণ্ঠিত, এবং তাহাদের মঙ্গল কামনায় সদা ব্যস্ত; নিজেও সাংসারিক কাজে নিরত। বাহ্যতঃ সেখানে তাঁহার আচরণের সহিত ঘোর বদ্ধ সংসারী লোকের আচরণের কোন পার্থক্য নাই; পার্থক্য ধরা পড়ে তখন, যখন তাঁহাকে দেখি তিনি ইচ্ছামাত্রই সংসারের সমস্ত কাজ হইতে মনকে গুটাইয়া লইয়া ভগবৎ-চিন্তায় নিমগ্ন হইতেছেন। সেই মুহূর্তে তিনি বাহ্য জগৎ হইতে এক অনাবিল আনন্দলোকে ইচ্ছামতো বিচরণ করিতেছেন। আবার পরমুহূর্তে জগতের কল্যাণের জন্য মনকে নিচে নামাইয়া আনিতেছেন। তিনি বলিতেছেন: "আমার যে মন রাতদিন উঁচুতে উঠে থাকতে চায়, জোর করে তা আমি নীচে নামিয়ে রাখি—দয়ায়…।"

যে রাধুকে না দেখিয়া শ্রীশ্রীমা থাকিতে পারিতেন না, 'রাধু' 'রাধু' করিয়া পাগল, তার জন্য সর্বদা চিন্তিত, শেষকালে সেই রাধু হইতে সমস্ত মন গুটাইয়া লইয়া তিনি আপন সত্তায় লীন হইয়াছিলেন। সাংসারিক কোন আকর্ষণই আর তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। সেই মুহূর্তে সংসার-টংসার তাঁহার মন হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে। তখন তিনি তাঁহার ভিতরকার "আনন্দের পূর্ণঘট"-এর সঙ্গে একাত্ম হইয়া গিয়াছেন। বাহ্য জগতের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধই নাই। এই প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দজীর একটি উক্তির উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি বলিয়াছেন: "এমন আসক্তি দেখিনি, এমন বিরাগও দেখিনি। এদিকে তো 'রাধু' 'রাধু' করে অস্থির। কিন্তু শেষকালে বললেন 'একে পাঠিয়ে দাও।' মাকে বললাম, মা, আপনি এখন রাধুকে পাঠিয়ে দিতে বলছেন, পরে যখন আবার দেখতে চাইবেন তখন কি হবে? মা বললেন, 'না, আর আমার ওর উপর কিছুমাত্র মন নেই'।" ইহাই গীতোক্ত কর্মে মনের সমভাবে সম্পূর্ণ সংযোগ ও বিয়োগ, আসক্তি ও নিরাসক্তির সার্থক রূপ।

এসবেরও ঊর্ধ্বে শ্রীশ্রীমায়ের আর একটি রূপ আছে, তাঁহার শাশ্বতরূপ এবং যে রূপে তিনি স্বমহিমায় বিরাজমানা। সেইরূপ তাঁহার মাতৃরূপ। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে ঈশ্বরের মাতৃভাবের অভাবনীয় বিকাশ তাঁহাকে বিশ্বমাতা রূপে জগৎ-সমীপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। তাঁহার মাতৃস্নেহ যে শুধু মনুষ্য মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে; মনুষ্যেতর প্রাণীদের জন্যও তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। এই প্রসঙ্গে রাধুর একটি পোষা বিড়ালের কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। মা বিড়ালটির জন্য এক পোয়া দুধের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সেবক জ্ঞান মহারাজ ছিলেন বিড়ালটির উপর অত্যন্ত বিরূপ। বিরক্ত জ্ঞান মহারাজ একদিন বিড়ালটিকে তুলিয়া আছাড় দিলে মাতৃ-হৃদয়ে এইরূপ আঘাত লাগিয়াছিল যে, মায়ের মুখখানি বেদনায় কালো হইয়া গিয়াছিল।

জ্ঞান মহারাজের অবজ্ঞা ও অযত্ন সত্ত্বেও রাধু ও মায়ের স্নেহে ইতিমধ্যে বিড়ালের বংশ বৃদ্ধি হইয়াছে। একবার কলিকাতা যাওয়ার পূর্বে মা জ্ঞান মহারাজকে ডাকিয়া বলিলেন: "জ্ঞান, বেরালগুলোর জন্যে চাল নেবে; যেন কারও বাড়ি না যায়—গাল দেবে, বাবা।" আরও বলিলেন: "দেখ, জ্ঞান, বেরালগুলোকে মেরো না। ওদের ভেতরেও আমি আছি।" অন্য এক সময় রাসবিহারী মহারাজের "তুমি কি সকলেরই মা?...এইসব ইতর জীবজন্তুরও?"—প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন: "হ্যাঁ, ওদেরও।"

শ্রীশ্রীমায়ের সহজাত সংবেদনশীল মাতৃ-অন্তঃকরণের স্নেহ-স্পর্শ কাহাকেও বঞ্চিত করিতে জানিত না। ছোট-বড়, কৃতী-অকৃতী, সুকৃতী-দুষ্কৃতী—সকল সন্তানের প্রতিই তাঁহার সমান স্নেহ, সমান করুণা। পানাসক্ত সন্তান পদ্মবিনোদ এবং আরও অগণিত কত সন্তানের বিচিত্র রকমের আবদারপূরণ, সন্তানের মঙ্গল কামনায় মহানিশায় জপ—সবই তাঁহার অন্তঃসলিলা স্নিগ্ধ মাতৃস্নেহের বাহ্য প্রকাশ। নিবেদিতা শ্রীশ্রীমাকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন: "মাগো, ভালবাসায় পরিপূর্ণ তুমি! আর তাতে নেই আমাদের বা জগতের ভালবাসার মতো উত্তেজনা ও উগ্রতা! তোমার ভালবাসা হচ্ছে একটি সুস্নিগ্ধ শান্তি যা প্রত্যেককে এনে দেয় কল্যাণস্পর্শ।"

শ্রীশ্রীমায়ের সকল সন্তানই যে তাঁহার নিকট আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইবার সন্ধান লইতে আসিতেন তাহা নয়। অনেকেই আসিতেন নিজেদের সংসারের দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণার কথা তাঁহাকে বলিয়া নিজেদের মনের ভার লাঘব করিতে। তিনি যে তাঁহাদের সকলেরই মা; তাপিতের তাপে, ব্যথিতের ব্যথায় সমব্যথী। তাঁহাদের ইহকাল পরকালের সর্বস্ব তিনি। মনুষ্যভাব হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বোচ্চ ঈশ্বরভাব পর্যন্ত বিস্তৃত সব ভাবই শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে পাশাপাশি দৃষ্ট হয়। মাতৃত্ব ও দেবীত্বের সংমিশ্রণে এক অপূর্ব মহিমাময় জীবন।

পৌষের কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি। শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের পুণ্য দিন। এই পুণ্য দিনে আমরা স্মরণ করি সন্তানের প্রতি তাঁহার সেই চিরন্তন অভয়বাণী যাহা সন্তানকে দেয় জীবনের পরম আশ্বাস। শ্রীশ্রীমা অভয়বাণী শুনাইয়াছিলেন: "সর্বদা মনে রাখবে তোমাদের একজন মা আছেন", আর "আমার ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে, আমাকেই তো তা ধুয়েমুছে তাকে কোলে নিতে হবে।" মা, তোমার এই পুণ্য আবির্ভাবতিথিতে সন্তানের প্রতি তোমার পরম আশ্বাসের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দিয়া তোমার নিকট সকাতরে প্রার্থনা জানাই—তোমার ধুলোকাদামাখা সন্তান তোমার কৃপায় যেন বুঝিতে পারে যে, তাহার একজন মা আছেন, যিনি তাহার ধুলোকাদা ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইবেন।

যীশুখ্রীষ্ট-অনুধ্যান

গীতাতে আছে:

"যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তৎ তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥"

—অর্থাৎ, যখনই দেখিবে যে, কোন মহাশক্তিসম্পন্ন পবিত্রস্বভাব মহাত্মা মানবজাতির উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, জানিও তিনি আমারই তেজঃসম্ভূত, আমি তাঁহার মধ্য দিয়া কার্য করিতেছি।

আজ হইতে প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে দুঃখ-যাতনাক্লিষ্ট জীবকুলকে উদ্ধারের জন্য মহাশক্তিসম্পন্ন পবিত্রস্বভাব যে মহাত্মা মানবজাতির সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন, সর্বজন-নমস্য

প্রেমাবতার সেই যীশুখ্রীষ্টকে তাঁহার পুণ্য আবির্ভাব উপলক্ষে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার দুই পার্ষদ স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে 'ঋষিকৃষ্ণের দলে' দেখিয়াছিলেন। তাঁহার মহাসমাধির পর মঠ যখন বরাহনগরে তখন বাবুরাম-জননীর সস্নেহ আহ্বানে নরেন্দ্র, বাবুরাম, শরৎ, শশী, তারক, কালী, নিরঞ্জন, গঙ্গাধর ও সারদা তাঁহার আঁটপুরস্থ গ্রামে একবার গমন করিয়াছিলেন। তথায় অবস্থানকালে এক রাত্রিতে তাঁহারা প্রজ্বলিত ধুনির সম্মুখে ধ্যানে বসেন এবং ধ্যানান্তে নরেন্দ্রনাথ যীশুখ্রীষ্ট ও তাঁহার ত্যাগী পার্ষদদের ত্যাগমণ্ডিত প্রেরণাময় জীবন, তাঁহাদের ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রচার ও প্রসারের ইতিহাস প্রাণস্পর্শী ভাষায় সমবেত গুরুভ্রাতাদের নিকট বর্ণনা করেন। তৎশ্রবণে অনুপ্রাণিত শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানরা যীশুখ্রীষ্ট ও তদীয় পার্ষদদের ন্যায় পবিত্র জীবন গঠনপূর্বক জগদ্ধিতায় উৎসর্গীকৃত করিতে কৃতসঙ্কল্প হন এবং ধুনির লেলিহান অগ্নিশিখাকে সাক্ষী রাখিয়া সংসার ত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। পরে সবিস্ময়ে তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, ঐ পুণ্য লগ্নটি ছিল যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের প্রাক্‌ক্ষণ (২৪ ডিসেম্বর রাত্রি)। এই সমস্ত ঘটনাই আজ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে অতি পরিচিত এবং সর্বজনবিদিত। যীশুখ্রীষ্টকে ঈশ্বরের অন্যতম অবতাররূপেই শ্রীরামকৃষ্ণ জানিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে যীশুখ্রীষ্ট সর্বজনবন্দিত এবং ঈশ্বরাবতাররূপে পূজিত।

যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার "জগতের মহত্তম আচার্যগণ" শীর্ষক প্রসিদ্ধ বক্তৃতায় বলিয়াছেন :

"আবার, সেই ঈশদূত ন্যাজারেথবাসী ঈশার দিকে দৃষ্টিপাত কর। তাঁহার উপদেশ : 'প্রস্তুত হও, কারণ স্বর্গরাজ্য অতি নিকটবর্তী।' আমি শ্রীকৃষ্ণের বাণী মনে মনে গভীরভাবে আলোচনা করিয়া অনাসক্ত হইয়া কার্য করিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কখনও কখনও তাঁহার উপদেশ ভুলিয়া গিয়া সংসারে আসক্ত হইয়া পড়ি। আমি হঠাৎ ভগবান বুদ্ধদেবের বাণী হৃদয়ের ভিতর শুনিতে পাই—'সাবধান, জগতের সমুদয় পদার্থই ক্ষণস্থায়ী, এ জীবন সততই দুঃখময়।' ঐ বাণী শুনিবামাত্র মন এই সংশয়দোলায় দুলিতে থাকে—কাহার কথা শুনিব, শ্রীকৃষ্ণের কথা না শ্রীবুদ্ধের কথা? তখনই বজ্রবেগে ভগবান ঈশার বাণী আসিয়া উপস্থিত হয়, 'প্রস্তুত হও, কারণ স্বর্গরাজ্য অতি নিকটে।' এক মুহূর্তও বিলম্ব করিও না, কল্য হইবে বলিয়া কিছু ফেলিয়া রাখিও না। সেই চরম অবস্থার জন্য সদা প্রস্তুত হইয়া থাকো, উহা তোমার নিকট এখনই উপস্থিত হইতে পারে। সুতরাং ভগবান ঈশার উপদেশের জন্যও আমাদের হৃদয়ে স্থান রহিয়াছে, আমরা সাদরে তাঁহার ঐ উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকি, আমরা এই ঈশদূতকে—সেই জীবন্ত ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া থাকি।"

শ্রীরামকৃষ্ণের যীশুখ্রীষ্ট দর্শনের যে বর্ণনা আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে পাই, সংক্ষেপিত আকারে তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া আমাদের "যীশুখ্রীষ্ট-অনুধ্যান" আপাততঃ এখানেই শেষ করিতেছি।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত যদুলাল মল্লিকের উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই বেড়াইতে যাইতেন এবং অনেক সময় যদুলালের বৈঠকখানায় কিছুক্ষণ বসিয়া বিশ্রাম লইয়া দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ফিরিতেন। বৈঠকখানার দেওয়ালে টাঙানো অনেকগুলি উত্তম চিত্রের মধ্যে :

"মাতৃক্রোড়ে অবস্থিত শ্রীশ্রীঈশার বালগোপাল

মূর্তিও একখানি তন্মধ্যে ছিল। ঠাকুর বলিতেন, একদিন উক্ত ঘরে বসিয়া তিনি ঐ ছবিখানি তন্ময় হইয়া দেখিতেছিলেন এবং শ্রীশ্রীঈশার অদ্ভুত জীবনকথা ভাবিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন ছবিখানি যেন জীবন্ত জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিয়াছে এবং ঐ অদ্ভুত দেব-জননী ও দেব-শিশুর অঙ্গ হইতে জ্যোতিরশ্মিসমূহ তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার মানসিক ভাব সকল আমূল পরিবর্তন করিয়া দিতেছে।…শ্রীশ্রীঈশার ও তৎপ্রবর্তিত সম্প্রদায়ের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আসিয়া হৃদয় অধিকারপূর্বক খ্রীষ্টীয় পাদরিসমূহ প্রার্থনা-মন্দিরে শ্রীশ্রীঈশার মূর্তির সম্মুখে ধূপ-দীপ দান করিতেছে, অন্তরের ব্যাকুলতা কাতর প্রার্থনায় নিবেদন করিতেছে—এই সকল বিষয় ঠাকুরকে দেখাইতে লাগিল। …তিন দিন পর্যন্ত ঐ ভাবতরঙ্গ তাঁহার উপর ঐরূপে প্রভুত্ব করিয়া বর্তমান রহিল। পরে তৃতীয় দিবসের অবসানে ঠাকুর পঞ্চবটীতলে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন, এক অদৃষ্টপূর্ব দেব-মানব, সুন্দর গৌরবর্ণ, স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহাকে অবলোকন করিতে করিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। …দেখিতে দেখিতে ঐ মূর্তি নিকটে আগমন করিলেন এবং ঠাকুরের পূত হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ধ্বনিত হইতে লাগিল, 'ঈশামসি—দুঃখ-যাতনা হইতে জীবকুলকে উদ্ধারের জন্য যিনি হৃদয়ের শোণিত দান এবং মানবহস্তে অশেষ নির্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন, সেই ঈশ্বরাভিন্ন পরম যোগী ও প্রেমিক খ্রীষ্ট ঈশামসি!' তখন দেব-মানব ঈশা ঠাকুরকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার শরীরে লীন হইলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ঠাকুরের মন সগুণ বিরাট ব্রহ্মের সহিত কতক্ষণ পর্যন্ত একীভূত হইয়া রহিল! ঐরূপে শ্রীশ্রীঈশার দর্শন লাভ করিয়া ঠাকুর তাঁহার অবতারত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন।"

স্বামী সারদানন্দ মহারাজের অপ্রকাশিত পত্র

[স্বামী মেঘেশ্বরানন্দকে লিখিত পত্র]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Udbodhan Office,
1 Mukherjee Lane
Baghbazar, Calcutta

পরম কল্যাণীয় মেঘেশ্বর ও বুদ্ধচৈতন্য,

তোমাদের উভয়ের বিস্তারিত পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। মঠে পূঃ মহাপুরুষজীকে ঐ বিষয়ে জানাইয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন তোমাদিগকে ঐ সম্বন্ধে চিঠি দিবেন। আশা করি তাঁহার পত্র পাইয়াছ।

তোমরা ভাবিও না। শ্রীশ্রীঠাকুর সকল দেখিতেছেন এবং তোমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন। যাহা আমাদের পক্ষে ভাল হইবে তিনি তাহাই করিবেন।

আমার আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা সতত জানিবে এবং আশ্রমস্থ সকলকে উহা জানাইবে। এখানকার কুশল। মধ্যে ২ তোমাদের কুশল সংবাদ দিয়া সুখী করিও। আমি ভাল আছি। বিদেহানন্দকে আমার আশীর্ব্বাদ দিও। তাহার পত্রও পাইয়াছি। শুভানুধ্যায়ী

শ্রীসারদানন্দ

স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অপ্রকাশিত পত্র

[জনৈক সাধুকে লিখিত]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Ramakrishna Advaita Áshrama
Laksha, Benares City
6/1/28

শ্রীমান্—,

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। শরীর থাকিলে ভোগ ত আছেই, অপরের অপেক্ষা তোমার না হয় বেশী, কিন্তু তজ্জন্য চিন্তিত হইয়া বেশী ভাল ত থাকা যায় না। নিজে যতটা পার সাবধান হইয়া এবং অপরকে না ভোগাইয়া যতদিন পার কাটাইবার চেষ্টা করিবে। তারপর তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি শরীর খারাপ হয় বা অপরকে ভোগাইতে হয় তুমি আর কি করিবে, তাঁহারই ইচ্ছা জেনে সহ্য করিতে হইবে—তবে কখনও যেন তাঁর [উপর] অবিশ্বাস বা অভক্তি না হয়—ইহাই আমার প্রার্থনা।

শরীর দুর্বল থাকিলে অনেক সময় বলে [,] শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার বেশী করিতে গেলে ক্ষতি হয় বটে [,] তবে তাঁর স্মরণ মননে কোনই বাধা নাই। তাহাতে কোন অপরাধ হয় না। মনে বাজে চিন্তা না করে তাঁর স্মরণ মনন সদা সর্বদা সর্ব অবস্থায় করা যে খুবই ভাল তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

অপরের দোষগুণ বিচার করতে যাওয়া সব সময় safe নয় [,] ইহা নিশ্চয়। ওসব উপেক্ষা করে নিজের ভাবে থাকাই ভাল। ঠাকুর তোমার শারীরিক ও মানসিক শান্তি দিন [—] ইহাই প্রার্থনা। আমার শরীর এক প্রকার ভালই আছে তাঁর কৃপায়। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। পুলিন ২।১ দিনের মধ্যেই ভুবনেশ্বর রওনা হইবে। ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

সুভাষচন্দ্রের জীবন ও চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দ

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্বানুবৃত্তি]

(গ) "ভারতে সমাজতন্ত্রের জন্ম ভারতের শিক্ষা দীক্ষা ও অনুভূতিতে···বিবেকানন্দের রচনায়···"

আলোচ্য পর্বে (এবং পরবর্তী পর্বে) সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা ও রচনাবলীতে সমাজতন্ত্রের কথা প্রচুর। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় আদর্শরূপে সমাজতন্ত্রই যে গ্রহণীয়—একথা তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। আবার এমনও দেখা যায়, তিনি সমাজতন্ত্রের কোন বিশেষ আমদানীকৃত আদর্শ সম্বন্ধে পক্ষপাত দেখাননি। সমাজতন্ত্র তাঁর কাছে একটা মূলনীতি, যার কেন্দ্রীয় বক্তব্য হল—"জনগণের হাতেই থাকবে সকল ক্ষমতা"—এবং সমানাধিকার; কিন্তু সেই নীতির প্রবর্তনে কোন একটি দেশ বা ব্যক্তির দ্বারা নির্দেশিত পথ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা নেই। তাছাড়া তাঁর মতো ইতিহাসবোধসম্পন্ন বাস্তববাদী মানুষের পক্ষে একথা মনে করা সম্ভব ছিল না—কোন এক দেশের কলম-চারা অন্যদেশে বনস্পতির আকার ধারণ করতে পারে। যদি তেমন চেষ্টা করা হয় এবং সাফল্য আসে, তাহলে সেটা মতবাদের সাম্রাজ্যবাদ ছাড়া কিছু নয়—তাতে জাতীয় প্রতিভার ধ্বংস হবে—সেক্ষেত্রে বিদেশী উদ্যোগে স্থাপিত কারখানা থেকে স্বদেশী শ্রমিকের পরিশ্রমে বেরিয়ে আসবে নানা রঙের যন্ত্রমানুষ। সুভাষচন্দ্রের সত্তামূলে এই ধারণা প্রবেশ করে গিয়েছিল বিবেকানন্দেরই প্রভাবে।

বিবেকানন্দের রচনায় জনগণের অধিকার সম্পর্কিত বহু উদ্দীপ্ত ও প্রজ্ঞাসিদ্ধ বক্তব্য আছে, যাদের সঙ্গে কৈশোরেই সুভাষচন্দ্রের পরিচয় ঘটেছিল। দেশ-বিদেশের সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বকথা ও আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত বিবেকানন্দের ঐ সকল উক্তির পূর্ণ সামাজিক তাৎপর্য কিশোর সুভাষচন্দ্রের পক্ষে উপলব্ধি করা নিশ্চয় সম্ভব হয়নি—সেগুলিকে তিনি মানবপ্রেমের জলন্ত প্রকাশ বলেই গ্রহণ করেছিলেন। 'ভারতপথিক' গ্রন্থে তিনি সদ্য বিবেকানন্দ-পাঠের প্রসঙ্গে স্বামীজীর ভবিষ্যদ্‌বাণীর উল্লেখ করেছেন: "ভবিষ্যতের কথা বলতে গিয়ে তিনি [স্বামীজী] বলেছেন, ব্রাহ্মণ (পুরোহিত শ্রেণী)—ক্ষত্রিয় (যোদ্ধ শ্রেণী) ও বৈশ্য (বণিক শ্রেণী)—এদের প্রত্যেকেই একসময় সুদিন ভোগ করেছে—এখন এসেছে পদদলিত সাধারণ মানুষ, শূদ্রদের পালা।"

মনে হয়, বিদ্যালয় ও কলেজ জীবনে ধর্ম-ভাবনায় উৎকণ্ঠিত ও সেবামূলক সামাজিক কাজে আগ্রহী সুভাষচন্দ্র স্বামীজীর কথাগুলিকে সাধারণ মানবতাবাদী উক্তি বলেই মনে করেছেন। কিন্তু আই. সি. এস. পড়তে গিয়ে, ইংলণ্ডে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করে, এবং পাঠ্যবস্তু হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান গ্রহণ করেও—তিনি বিবেকানন্দের ঐ সকল উক্তির ব্যাপকতর তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলেন। প্রমাণ হিসাবে চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে কেম্বি জ থেকে ২৩ মার্চ, ১৯২১ তারিখে লেখা পত্রের অংশ উপস্থিত করা যায়, যার মধ্যে বিবেকানন্দের পূর্ব-পরিচিত উক্তিকে নতুনভাবে উপলব্ধি করার ইঙ্গিত আছে। সুভাষচন্দ্র লিখেছেন:

"এখানে এসে এবং এখানকার লোকজন ও কার্যপ্রণালী দেখে আমার মনে হচ্ছে যে, আমাদের দেশে দুইটি জিনিস খুব বেশিরকম-

ভাবে চাই, (১) জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, (২) Labour Movement. স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন যে, ভারতের উন্নতি চাষা, ধোপা, মুচি, মেথরের দ্বারাই হইবে। কথাগুলি বড় ঠিক। পাশ্চাত্য জগৎ দেখাইয়াছে—'Power of the People' কী করিতে পারে। তার উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত হচ্ছে—The first socialist republic in the world অর্থাৎ রাশিয়া। ভারতের উন্নতি যদি কোনোদিন হয়—সেটা আসবে ঐ Power of the People-এর ভিতর দিয়া। আধুনিক জগতে যেসব দেশ উন্নত হইয়াছে, সেসব দেশে ঐ Power of the People-এর জাগরণ হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ 'বর্তমান ভারতে' বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য—এই তিন বর্ণের আধিপত্যের দিন গেছে। পাশ্চাত্য জাতের বৈশ্যবর্ণ হচ্ছে—Capitalists and Industrialists. তাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। লেবার পার্টি হচ্ছে ভারতের শূদ্র বা অস্পৃশ্য জাতি। এরা এতদিন ধরে শুধু কষ্ট করে এসেছে। তাদের শক্তি এবং তাদের ত্যাগের দ্বারা ভারতের উন্নতি হইবে। সেইজন্য আমাদের এখন চাই Mass Education and Labour Organisation."

পরবর্তী কালে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে সুভাষচন্দ্রের অন্যতম প্রধান চেষ্টা ছিল—এই আন্দোলনের ভিত্তি প্রসারিত করে শ্রমিক, কৃষক, এবং অবনমিত মানুষকে তার অন্তর্ভুক্ত করা। জামালপুরে অনুষ্ঠিত ময়মনসিংহ জেলা সম্মিলনে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিরূপে তিনি ২১. ৪. ১৯২৯, যে বাস্তব চিন্তাপূর্ণ ভাষণ দেন, তার মধ্যে একটি বেদনাময় সত্যের স্বীকৃতি ছিল—সামাজিকভাবে উৎপীড়িত গ্রামের মানুষের পক্ষে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ডাকে সাড়া দেওয়া সত্যই সম্ভব নয়, কারণ সে কি করে বিশ্বাস করবে—রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও আসবে? সুভাষচন্দ্র গভীর আবেগময় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন, মানুষকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বন্ধন থেকে মুক্তি দিতেই হবে। অথচ উচ্চবর্গের স্বাধীনতাকামীদের মধ্যে সেই সচেতনতা নেই। "আজ যাহারা সমাজের কাছে অস্পৃশ্য, যাহাদের জলচল নাই, যাহারা মনুষ্যত্বের অধিকার ভোগ করিতে পারে না—যে-পর্যন্ত-না তাহাদিগকে মনুষ্যত্বের আসনে বসাইতেছি, সে-পর্যন্ত তাহারা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবে—আমরা বাস্তবিক মুক্তিকামী। চণ্ডীদাসের বুলি মুখে আওড়াই বটে—'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'—কিন্তু কয়জন তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারে? কিশোরগঞ্জে গিয়াছিলাম, দেখিলাম, কালীমন্দিরে কোনো-কোনো শ্রেণীর প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। প্রস্তাব হইল—সর্বজনীন মন্দির তৈরি করা হউক। কেন, মন্দির তো রহিয়াছে—সেখানে প্রবেশের অধিকার দিবে না কেন? স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—শাস্ত্রের দোহাই দিলে চলিবে না; সমাজে যে যেখানে লাঞ্ছিত হইতেছে তাহাকে লাঞ্ছনার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।...রাষ্ট্রীয় অধিকার দিবার ক্ষমতা হয়ত আমাদের নাই কিন্তু ইচ্ছা করিলে সামাজিক বন্ধন হইতে আমরা তাহাদিগকে মুক্ত করিতে পারি।...আমি শুনিলাম—এখানে ১৫০টি ভাই আসিয়াছে, তাহাদের কিছু দাবি আছে—সে দাবি তাহারা শুনাইতে চায়। তাহারা জলচল নয়, তাহারা জলচল হইতে চায়। আমি মনে করি, ইহা সামান্য দাবি। যে দাবি মানুষের করা উচিত তাহা হইতেছে মনুষ্যত্বের দাবি, মানুষ হিসাবে মানুষের যত রকম অধিকার আছে তাহা দেওয়া চাই।" [২।১১৩-১৪]

উপরের অংশে কেবল স্বামীজীর উদ্ধৃতি নেই, কিন্তু সবটাই তাঁর চিন্তার প্রতিধ্বনি। পতিত মানুষকে তার লুপ্ত ব্যক্তিত্ব ও অধিকার ফিরিয়ে দেবার জন্য স্বামীজীর অবিরাম ব্যাকুল আহ্বানের কথা এখানে স্বতই আমাদের মনে পড়বে।

আগেই দেখেছি, সুভাষচন্দ্র তাঁর রংপুর-ভাষণে (৩০. ৩. ১৯২৯) বলেছেন—সমাজতন্ত্রের জন্ম কার্ল মার্কসের পুঁথিতে নয়, ভারতীয় সংস্কৃতিতে তার উৎস ও আশ্রয়—বিবেকানন্দের বাণীতে এবং চিত্তরঞ্জনের সাধনায় তার বিকাশ। এই উক্তি কিছু মানুষের কাছে আনন্দের, অন্যদের কাছে অস্বস্তির। যাঁরা সুভাষচন্দ্রকে মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক বলে প্রতিপন্ন করতে চান তাঁদের মতে, সুভাষচন্দ্রের এই উক্তি বত্রিশ বৎসরের এক যুবকের জাতীয়তাবাদী ভাবোচ্ছ্বাস—বছর দশেক বয়স বাড়বার পরে ঐ ভাবালুতা কাটিয়ে তিনি মার্কসবাদী হয়ে উঠেছিলেন।

সুভাষচন্দ্র মার্কসবাদী হলে ভাল হত কি মন্দ হত, সে প্রশ্নে যাবার প্রয়োজন নেই। তিনি কী ছিলেন এখানে তাই বিচার্য। তথ্যমুখে আমরা দেখতে পাচ্ছি—সুভাষচন্দ্র তাঁর ৪২-৪৩ বৎসর বয়সে মার্কসবাদী নন—(যেকালে কথিত তাঁর দু-একটি উক্তি থেকে তাঁকে মার্কসবাদী প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়)—৪৭ বৎসর বয়সেও নন। সুভাষচন্দ্রের উক্তিমতোই তা বলতে পারি। আমরা দেখি, তিনি তাঁর ৩২ বৎসর বয়সে রংপুর ভাষণে পূর্বোক্ত প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন, তার থেকে পরবর্তী কালে কিছুমাত্র বিচলিত হননি।

রংপুর ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন:

(১) সমাজতন্ত্র কার্ল মার্কসের পুঁথিতে জন্ম নেয়নি।

বলা বাহুল্য নেয়নি। ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রের যে-কোন ইতিহাসেই দেখা যাবে, মার্কসের পূর্বে নানা ধরনের সমাজতন্ত্র এসে গিয়েছিল।

(২) ভারতের শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতায় সমাজতন্ত্রের জন্ম।

সুভাষচন্দ্র এখানে অবশ্যই মার্কসের জন্মের বহুশত পূর্ববর্তী ভারতীয় বেদান্তের বা বৌদ্ধ ভাবাদর্শের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। বিবেকানন্দীয় সমাজতন্ত্র বৈদান্তিক ভাবাদর্শে গঠিত।

(৩) বর্তমান ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র বিবেকানন্দের বাণীতে উদ্বুদ্ধ ও চিত্তরঞ্জনের সাধনায় বাস্তবায়িত।

আধুনিক ভারতবর্ষের সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা যে বিবেকানন্দের রচনাতেই প্রথম প্রবল ও ব্যাপক আকারে পাওয়া যায়, তা 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে আমরা যথেষ্ট উপস্থিত করেছি। আর রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জনই যে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রচার এবং কার্যক্ষেত্রে তার প্রবর্তনের সক্রিয় চেষ্টা করেছিলেন, তাও ঐতিহাসিক সত্য।

সুভাষচন্দ্র ৬. ৫. ১৯৩২ (যখন তাঁর বয়স ৩৫) 'মরাঠা'-সম্পাদককে লিখেছিলেন:

"পুরোহিত, উচ্চবর্ণ এবং বণিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে স্বামীজী তাঁর লেখায় যে আক্রমণ চালিয়েছিলেন—সেসব একজন সর্বশ্রেষ্ঠ গোঁড়া সমাজতান্ত্রিকের পক্ষেও বিশেষ প্রশংসার বিষয়।"

লক্ষ্য করার বিষয়, যখনই সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের জন্য প্রয়োজনীয় সমাজতন্ত্রের কথা তুলেছেন, তখনই ভারতীয় ভাবভিত্তি চাই—একথা বলেছেন। তাঁর রচনায় ও উক্তিতে তার প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে, উল্লেখযোগ্য একটি-দুটিকে উপস্থিত করব।

উল্লিখিত রংপুর-ভাষণে (৩০. ৩. ১৯২৯; সুভাষচন্দ্রের বয়স ৩২) ভারতীয় সংস্কৃতির সমাজতন্ত্র এবং স্বামী বিবেকানন্দের সাম্যভাবাত্মক ভূমিকার উল্লেখের পরে সুভাষচন্দ্র বলেছেন:

"আজকাল পাশ্চাত্যদেশ হইতে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র বিষয়ক আধুনিক চিন্তার ধারা এদেশে আসিতেছে। ইহার ফলে অনেকের চিন্তাজগতে বিপ্লব উপস্থিত হইতেছে। কিন্তু যাহা নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে তাহা প্রকৃতপক্ষে অতি পুরাতন। গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র এদেশে নূতন তত্ত্ব নয়। আমরা আমাদের ইতিহাসের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি···[তাই] অতি পুরাতনকে নূতন অতিথি জ্ঞান করিয়া আদরের সঙ্গে গ্রহণ করিতেছি।" [২।১৯০]

সুভাষচন্দ্র অতঃপর ব্যাখ্যা করে বললেন, সমাজ বা রাষ্ট্র সম্পর্কে কোন মতবাদকে অভ্রান্ত বা অখণ্ড সত্য মনে করা উচিত নয়। "আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, কার্ল মার্কসের প্রধান শিষ্য যাহারা, সেই রুশ জাতি, কার্ল মার্কসের বাণী অন্ধভাবে অনুসরণ করে নাই। তা যদি করিত তাহা হইলে এত শীঘ্র রাশিয়াতে বলশেভিজম্-এর প্রতিষ্ঠা হইত না।" রাশিয়া কিভাবে দেশ-কালের উপযোগী করে মার্কস-নীতিকে পরিবর্তিত করে গ্রহণ করেছে, তার একাধিক নমুনা দেবার পরে তিনি এই কথা যোগ করেছেন, "আমাদের মনে রাখা উচিত যে, জাতির ইতিহাসের ধারা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আবহাওয়া, এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয়-তার কথা অবহেলা করিয়া কোনো মতবাদ বল-পূর্বক কোনো দেশে প্রয়োগ করা যায় না। এরূপ চেষ্টা করিলে সে দেশে বিপ্লবের সৃষ্টি হইবে, নতুবা ফ্যাসিজমের মতো কোনো বিরুদ্ধ মতবাদের প্রতিষ্ঠা হইবে।" তারপর, সমাজতন্ত্রের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশকে অবহেলা করার যে-চেষ্টা রাশিয়া প্রভৃতিতে প্রথমে করা হয়, তার সংশোধনের চেষ্টা রাশিয়াতেই কিভাবে মনীষীরা করেছেন, তাও প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিযোগে তিনি দেখান। সেকথা বলার সময়ে তিনি বিশেষভাবে বিবেকানন্দের কথা স্মরণ করেই লিখেছেন, "ব্যক্তিত্বের বিকাশ না হইলে, খাঁটি মানুষ তৈরী না হইলে, কোনো ইজম্ বা মতবাদের দ্বারা কোনো জাতির উদ্ধার হইতে পারে না।" প্রসঙ্গ শেষ করেছেন এই বলে, "বলশেভিক রুশজাতির চিন্তাধারা যেরূপ দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হইতেছে তাহাতে আমার মনে হয় যে, জ্ঞানালোকের জন্য রাশিয়ার উপর অতি-নির্ভরশীল হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র আমরা গড়িয়া তুলিব আমাদের আদর্শ ও প্রয়োজন অনুসারে—এবং আবশ্যকমতো বিদেশ হইতে জ্ঞানরত্ন আহরণ করিব।"

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্র যে-ভাষণ দেন (৪. ৭. ১৯৩১ ; বয়স ৩৪)—তার মধ্যে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য অবশ্যই সতর্ক ও সুবিবেচিত হবার কথা। ঐ ভাষণে তিনি গোড়ার দিকেই বলে নেন—ভারতের শ্রমিক আন্দোলন আমস্টার্ডাম বা মস্কো—কারও নির্দেশের কাছেই আত্মসমর্পণ করবে না। ভারতকে তার প্রয়োজন অনুসারে, নিজের পথে চলতে হবে। ভাষণের শেষে পুনশ্চ একই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন—শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত দক্ষিণপন্থী মতবাদীদের সংস্কারমূলক পথ, কিংবা মস্কো-অনুগামী কম্যুনিস্টদের মত-পথ—কোনটাই গ্রাহ্য নয়। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যবর্তী একটি গোষ্ঠী, যা 'পরি-পূর্ণ সমাজতন্ত্রে' বিশ্বাসী—সুভাষচন্দ্র নিজেকে সেই গোষ্ঠীর অন্তর্গত ঘোষণা করার পরে বলে-ছিলেন : "আমার মনে এ-বিষয়ে কোনো সংশয় নাই যে, ভারতের মুক্তি, সেইসঙ্গে পৃথিবীর মুক্তি নির্ভর করে সমাজতন্ত্রের উপর। ভারতকে অন্যান্য জাতির অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষালাভ করিতে হইবে, কিন্তু তাহাকে নিজ প্রয়োজন ও

পারিপার্শ্বিকের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া সমাজতন্ত্র রূপায়ণের নিজস্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে হইবে। কোনো তত্ত্ব বাস্তবে প্রয়োগ করিতে গেলে কারও পক্ষে কখনো ভূগোল বা ইতিহাসকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়।...আমি আরও মনে করি যে, ভারতের উচিত নিজস্ব ধরনে সমাজতন্ত্রের জন্ম দেওয়া। যখন গোটা পৃথিবী সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মাতিয়াছে তখন আমরাই বা তাহা করিব না কেন? এমন হইতে পারে যে, ভারতে যে সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হইবে তাহার মধ্যে এমন নূতন ও অভিনব কিছু থাকিবে যাহা গোটা পৃথিবীর উপকারে আসিবে।" [৩।১২৪-২৫]

[এই ধরনের কথা সুভাষচন্দ্র ২৮ মার্চ, ১৯৩১, করাচীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত নওজোয়ান সভা-র দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে বিস্তৃতভাবে বলেছিলেন। একই আকারে তা বলেছেন, মথুরায় অনুষ্ঠিত উত্তরপ্রদেশ নওজোয়ান ভারত সভা সম্মেলনে ২৩ মে, ১৯৩১। নওজোয়ান সভাগুলি আমদানীকৃত সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আনুগত্যসম্পন্ন ছিল। সুভাষচন্দ্র সেইজন্য এই সভাগুলিতে সমাজতন্ত্রের ভারতীয় ভিত্তির কথা বিশেষভাবে উত্থাপন করেন।]

লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ভারতীয় রাজনৈতিক সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে প্রেরিত সভাপতির ভাষণে (১০. ৬. ১৯৩৩ ; বয়স ৩৬) সুভাষচন্দ্র গান্ধীনীতির ব্যর্থতার রূপবিশ্লেষণের পরে 'সাম্যবাদী সংঘ' নামক একটি নূতন দল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন, যে-দল "জনগণের অর্থাৎ ভারতীয় শ্রমজীবীদের দল"—স্বাধীনতা-উত্তরকালে যে-দল প্রয়োজনে শ্রেণীসংগ্রাম করবে, তার দ্বারা সর্ববিধ বিশেষাধিকার ও কায়েমী স্বার্থকে উচ্ছেদ করে দেশে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠা করবে—সেই দল "পৃথিবীর সংস্কৃতি ও সভ্যতায় অনন্য দান রাখবে।" এখানে পূর্ববর্তী উল্লেখযোগ্য দানের কথা বলতে গিয়ে তিনি সপ্তদশ শতাব্দীতে গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তনে ইংলণ্ড, অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ফ্রান্স, উনিশ শতকে মার্কসীয় দর্শন উপস্থাপনে জার্মানী, বিশ শতকে সর্বহারা বিপ্লব-সম্পাদনে রাশিয়ার ভূমিকার উল্লেখ করেছিলেন। বলাবাহুল্য সুভাষচন্দ্র মার্কসবাদী হলে ভাবী ভারতের নতুনতর দানের কথা তুলতেন না। এই ভাষণের শেষের দিকে সাম্যবাদী সংঘের আদর্শ ও লক্ষ্যের ব্যাখ্যা তিনি করেছিলেন (সংঘের নামটিই তো ভারতীয় সংস্কৃতির ভাষায় চিহ্নিত *)—যার একেবারে শেষে বলেন :

"এই দল ভারতের আদর্শের চরম পূর্ণতার পক্ষে সংগ্রামশীল থাকবে—যাতে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে তার সেই বাণীর ঘোষণা করতে পারে যা যুগের পর যুগ ধরে তার ঐতিহ্যের অন্তর্গত হয়ে আছে।" [দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল, ১৯৩৫—৪২ পৃঃ ৭৫]

[ক্রমশঃ]

* এই নামকরণ প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র ২৩. ২. ৩৪ চেকোশ্লোভাক মহিলা শ্রীমতী কিটি কুর্তীকে লিখেছেন, "The idea of *Samya* is a very old Indian conception—first popularised by the Buddhists 500 years before Christ. I therefore prefer this name to the modern names now popular in Europe." [*Subhas Chandra Bose As I Knew Him*, by Kitty Kur ti, p. 59]

প্যারিস পেরিয়ে

ডক্টর অমিয়কুমার হাটি

[পূর্বানুবৃত্তি]

১১

দেখতে যাব নায়াগ্রা জলপ্রপাত। পৃথিবীতে যত আশ্চর্য জিনিস আছে, তার মধ্যে অন্যতম। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সীমান্ত এলাকায় এই জলপ্রপাত, দেখা যায় আমেরিকার দিক থেকেও, কানাডার দিক থেকেও। কানাডার দিকটি দেখতে অশ্বখুরাকার। আমেরিকার দিকটিও কম চওড়া নয়।

সকাল ৮টায় ওয়াই. এম.সি. এ.-র সঙ্গে পাট চুকালাম। কাজেই ন্যাকড়ার বাক্সটা ও কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা সঙ্গেই চলল। আমি রাখতে চেয়েছিলাম অনিল মহারাজের হেফাজতে। কিন্তু তাঁর মতে এ-সব কাছে রাখাই ভাল। অতএব!

দূরপাল্লার বাস ছাড়ে এখানকার সব বড় বড় শহর থেকে। 'গ্রে হাউণ্ড' নাম বাসগুলোর। লোকে রেলের থেকে বাসে চাপে বেশি। বিরাট বড় কয়েকতলা বাস স্টেশন। সময় ছিল কিছু বাস ছাড়ার। বাস স্টেশনের ভিতরে একটা ছোট বই-এর দোকানে বই-টই উল্টেপাল্টে দেখছিলাম। হঠাৎ হিন্দী সম্ভাষণ দোকান-ওয়ালার কাছ থেকে। কি ব্যাপার? উনি গুজরাটী, নাম মিঃ লুড়। ভারতীয় দেখে আলাপ না করে কি পারেন? ব্যবসায়ী বলেই বুদ্ধি বোধ হয় বেশি—শুধু বই বা খবরের কাগজ নয়, সিগারেটও পাওয়া যায় দোকানে। গুছিয়ে বসেছেন।

বাস ছাড়ল দশটায়। নিউইয়র্ক ছাড়িয়ে গেল। জায়গা পেয়েছি জানালার ধারে। বাস চলবে বিকেল অবধি। সারাদিন ধরে দেখব আমেরিকার খানিকটা ভূ-প্রকৃতি, জনপদ, প্রান্তর, হ্রদ, নদী, পাহাড়, সমতল। মনটা তাই খুশিই।

নিউইয়র্ক শহর ছাড়িয়ে যেতেই দুপাশে গাছ আর গাছ—সবুজের শান্ত নিবিড় সমারোহ—ঘন জঙ্গলই বলা চলে যেন। পেরিয়ে গেল ডেনভাইল—দ্রুত সরে সরে যাচ্ছে ছায়া সুনিবিড় ছোট ছোট ছবির মতো গ্রাম, সমৃদ্ধ—কখন পড়ছে পথে দূরে কাছে অল্প উঁচু পাহাড়—যেমন মাউন্টহোপ ডোভার মাউন্ট আরলিংটন—কোথাও আবার পাথুরে জমি—তবু গাছের কমতি নেই। পড়ছে পথে কোথাও গাছে ঢাকা পাহাড়—সবুজের সমাহার ও সম্ভারে চোখ ও মন জুড়িয়ে যায় একেবারে। এরি মধ্যে এক জায়গায় দেখি কি ভাঙাচোরা মোটর গাড়ির পাহাড়—অনেকখানি এলাকা জুড়ে। আর-এক জায়গায় বেশ কয়েকশো পুরানো মোটরগাড়ি জড়ো করা আছে বিক্রির জন্যে। শহরটার নাম বোধ হয় ইউলিসিস। অন্য দেশের পরিচিত জায়গার নামে এখানকার অখ্যাত গ্রামের নামকরণ খুবই সাধারণ বলে মনে হল, কারণ পথেই পড়ল একটা গ্রাম, যার নাম জেনেভা, আর-একটার নাম রচেস্টার, বিশাল একটা হ্রদের নাম কানাডাগুয়া। এইরকম রয়েছে বাটাভিয়া।

দুপুরে বাস যখন দাঁড়িয়েছিল, তখন খেতে খেতে আলাপ হল এক ভদ্রলোকের সঙ্গে, ভারতীয় বলে মনে হচ্ছিল তাঁকে। সত্যিই তাই, নাম তাঁর রামকিষেণ, দক্ষিণ আমেরিকার গিয়ানার অধিবাসী—কিন্তু জানেন না ভারতীয় কোন ভাষা। এখন কানাডার নাগরিক। কাজ করেন কানাডায় টরণ্টোতে একটা কারখানায়।

—"ভারতের কোথায় বাড়ি আপনার?" শুধাই।

—"তাও জানি না। বাবা-মা মারা যান খুব ছোটতে। গিয়ানায়।"

—"খুব আশ্চর্য তো!" বলি।

ওঁর চোখ দুটো কেমন করুণ, মাটির দিকে নেমে আসে। বলেন রামকিষেণ, "কি জানেন, নিজের জন কেউ ছিল না আমার, মা-বাবা মারা যাবার পর। কার কাছে জানব, কোথায় দেশ? তাই সাতপুরুষের জন্মভূমির নাম আমার হারিয়ে গেছে, কোনদিন কোনভাবেই খুঁজে পাব না তাকে।" তারপর ফুটে উঠল মৃদু হাসি তাঁর ঠোঁটে,—"এক হিসাবে ভালই, কি বলেন? আন্তর্জাতিকতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ, আমি নিজে!"

ঠিক ৭টায় বাস পৌঁছল বাফেলো শহরে। তখনও সন্ধ্যার দেরি—দিনের আলো কিছু রয়েছে। পথে বাস থেমেছে মাত্র তিন জায়গায়। এখান থেকে নায়াগ্রা যাবার বাস ধরতে হবে। দু-চারজনকে শুধাই। একটি তরুণ বলতেই পারল না। ছোট একটি চতুর্দশী মেয়ে কিন্তু বলে দিল, কোন্ স্টপে দাঁড়াতে হবে, বাসের কি নম্বর। বলল, বাস ছাড়বে ঐ স্টপ থেকে ৭।৹ টায়।

ঠিক তাই। গোনাগুনতি লোক বাসটায়। একদম ফাঁকা। হু-হু করে ছুটে চলেছে, আলো ঝলমল যদিও পথ, কিছু বোঝার উপায় নেই। ৮৷৹টা তখন, রাত সবে শুরু। পৌঁছে গেলাম নায়াগ্রা। তো, শহর নায়াগ্রা। তাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে, বিরল বসতি। হোটেলই এক গাদা। কোথায় জলপ্রপাত? কত দূরে? শুধাই দু-চার-জনকে। জানে না অনেকেই। বড়ই অবাক হলাম। প্রদীপের নিচেই বুঝি থাকে অন্ধকার।

লোকজনও কম। দূরে আকাশে যেন কিসের আলোর উৎসব, তাই দেখেই এগুলাম। এবার পথ পেলাম। বড় নির্জন। কাঁধের ক্যামেরা ব্যাগে ঢুকিয়ে নিলাম। গা ছমছমই করছিল।

ঝরঝর কলতান কানে আসছে তখন। আলোর হাজার রোশনাই এগিয়ে আসছে চোখের সামনে। প্রতিরাতেই দীপাবলী উৎসব বুঝি এখানে!

ঐ-তো-ঐ-নায়াগ্রা! আঁধার পেরিয়ে, বেড়া ডিঙিয়ে একছুটে নায়াগ্রার ধারে!

নায়াগ্রা! নয়নাভিরাম নায়াগ্রা! সত্যিই এক অবিস্মরণীয় বিস্ময়! আমেরিকার মিসিগান রাজ্যের সুপিরিয়র, মিসিগান, হিউরন, ইরী ও অণ্টেরিও এই পাঁচটি হ্রদ নিয়ে হ্রদ অঞ্চল। হ্রদ-গুলির উত্তর ও পূর্বের কিছু অংশে কানাডা। ইরী হ্রদ থেকে বেরিয়ে সেণ্ট লরেন্স নদী অণ্টেরিও আসবার পথে বাফেলো শহরের একটু উত্তরে কানাডা ও আমেরিকার মাঝে অপরূপ এই জলপ্রপাতটি সৃষ্টি করেছে, ঝাঁপিয়ে পড়ছে ৫১ মিটার নিচে—প্রচণ্ড শব্দে। বেশ চওড়া, ছন্দোবদ্ধ বিগলিত ধারা—রামধনু রং খেলা করে দিনে রাতে। সেতুটার বেশ কিছু উপরে উঠে সামনের দিকে গিয়ে একা নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকটা সময়। এমন মুহূর্ত খুব কমই আসে, স্বর্গ এবং মর্ত্য যখন একাকার হয়ে যায়, কুলকাল কিছুরই কোন হিসাব থাকে না, আবেগ, অনুভূতি, আনন্দ দিয়েও যার পরিমাপ করা যায় না—অনিন্দ্য নায়াগ্রা তুলনারহিত অনির্বচনীয় সেই মুহূর্তে শুধু দুচোখেই নয়, স্পন্দিত মানসলোকেও দেদীপ্যমান।

কত কাহিনী নায়াগ্রা নিয়ে। সে-সবও কম বিস্ময়কর নয়! এই তো ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের কথা। কারেল সৌচেক নামে ৩৭ বছরের এক দুঃসাহসী কানাডিয়ান যুবক একটা ধাতব পিপের মধ্যে ঢুকে পড়ল, তাকে গড়িয়ে দেওয়া হল—স্রোতে জলের সঙ্গে আছড়ে পড়ল সেই পিপে ৫৩ ফুট নিচে,

কানাডার দিকে, আঘাত পেল পাথরে। ভাবল সবাই মরেই গেছে সৌচেক, কিন্তু সে দিব্যি অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে এল! এরকম আরও এক অসমসাহসী মহিলা এই কাণ্ড করেছিলেন, তখন একটা বড় অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। নিজের বাহাদুরী দেখাবার জন্যে নয়, স্বামীর চিকিৎসার টাকা যোগাড় করতেই মৃত্যুর সঙ্গে এই ভাবে পাঞ্জা লড়তে হয়েছিল তাঁকে, এবং তিনি সে পুরস্কার পেয়েছিলেন!

ভাবতে পারা যায় এ জলপ্রপাত শুকিয়ে খটখটে হয়ে যাবে কখনও? তাও হয়েছিল, একবার প্রাকৃতিক কারণে, ইরী হ্রদের জল নির্গমন পথ বড় বড় বরফের চাঁই পড়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে। ভয়ানক এক তুষার ঝড়ের পর ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ মার্চ দেখা গেল, হঠাৎই শুকিয়ে গেছে জলপ্রপাত, নিচে কাদা, পাথর, এবং পাওয়া গেল তাতে আমেরিকার ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত বন্দুক, নানা ধাতব পদার্থ প্রভৃতি। আগের দিনের তুষার ঝড়, নায়াগ্রা শুকিয়ে যাওয়া প্রভৃতি প্রকৃতির খামখেয়ালী ভাব দেখে সবাই ভাবল, পৃথিবীর অন্তিম লগ্ন ঘনিয়ে এসেছে। যাযকদেরও সেই কথা। ভীত সন্ত্রস্ত সকলে। গীর্জায় ভীড়। কিন্তু একদিনই। পরের দিন ১ এপ্রিল রাত ৩টায় আবার শোনা গেল গুড়গুড় ধ্বনি—পাথর বরফ ভাসিয়ে সগর্জনে আসছে করাল বন্যা, আছড়ে পড়ল আবার হুড়মুড় করে আগের মতো! খুলে গেছিল হ্রদের জল-নির্গমন পথ। ভয়াল ভয়ঙ্কর এ কালস্রোতে, আশ্চর্যের কথা, কেউ মারা যায়নি, পৃথিবী ধ্বংস তো দূরের কথা।

১৯৬৫-র অক্টোবরে আর-একবার শুধু কয়েকদিন জলশূন্য করা হয়েছিল আমেরিকার দিকের নায়াগ্রাকে কৃত্রিমভাবে, নাম দেওয়া হয়েছিল "অপারেশন নায়াগ্রা ড্রাই"—জলের তোড়ে বড় বড় পাথরের যে-সব চাঁই নিচে পড়ে প্রপাতটির ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য কিছুটা কমিয়ে দিয়েছিল, পাথরগুলো তুলে সেটা পুনরুদ্ধার করবার জন্যে এবং জলধারার পাশের লোহার রেলিংগুলোকে নতুন করে, মজবুত করে গড়ে তোলবার জন্যে।

আর বেশিদিন হয়নি। ১৯৭৯-র ২২ জুলাই-এ আমেরিকার তুখোড় এক বুজরুকি গনৎকার প্যাট সেণ্ট জন ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, ঠিক ৪টা ৫৬ মিনিট-এ নায়াগ্রা জলপ্রপাত ধসে পড়বে, উচ্চভূমি ভেঙে পড়বে নিচে—দারুণ হৈ চৈ—সামরিক বাহিনীর প্রযুক্তি বিশারদগণ সন্ত্রস্ত, এমনকি সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে নায়াগ্রা সংযুক্ত কানাডা ও আমেরিকার দুই শহরের মেয়রকেও। প্রচার করা হয়েছে টেলিভিসনে। পাথরে পোঁতা সিসমিক বিপদসঙ্কেতেও নাকি ½ ইঞ্চি নড়াচড়া লক্ষ্য করা গেছে—সন্দেহ হয়েছে ঘনীভূত। এমন সময় দেখা গেল, একটিই নৌকা ভাসছে সেণ্ট লরেন্স নদীতে—তাতে দুজন আরোহী—অকুতোভয় পল কুরৎজ ও তাঁর বালকপুত্র জোনাথন। ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, প্রমোদ তরীটি নদীতে নিয়ে গেলে সেটার ঘটবে নিপট ভরাডুবি। হায় হায় করে উঠল সবাই। হাজার হাজার লোক বলছে ফিরতে, প্রশ্ন করছে তীর থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে এক সাংবাদিক, "আপনার ভয় করছে না?"—"কিস্যুই হবে না।" পল কুরৎজ পাত্তাই দিলেন না—ভেসে চলল তাঁর সাহস-ঘেরা নৌকা। বলা বাহুল্য, শেষ পর্যন্ত কিছুই হয়নি, হলে নায়াগ্রা দেখতে যাওয়া আর হত না!

ফিরতে হবে। রাত সওয়া ৯টা। হিমশীত। এখানকার হোটেলে মাথা গুঁজতে গেলে এক রাতের জন্য ৫০০—১০০০ টাকা। তার থেকে

রাতটা বাসেই কাটাব, ভোরে পৌঁছুব নিউইয়র্ক।

কিন্তু পথ হারিয়ে ফেললাম। লোকজনও খুব কম। একবার এক পুলিস অফিসারকে শুধালাম। পথ বললেন, কিন্তু তার আগে পাসপোর্ট, ভিসা দেখলেন। আসলে এদিক দিয়ে সহজেই কানাডায় ঢুকে পড়া যায়। তাই এই কড়াকড়ি। কিছুদূর গিয়ে আবার গুলিয়ে গেল। ভয়ও হচ্ছে, শেষ বাসের সময় কখন, ছেড়ে গেছে কিনা! এবার এক বুড়ী মেম-সাহেবকে ধরলাম। বললাম আমার অবস্থা। তিনি নিজে খানিক এগিয়ে পথ দেখিয়ে দিলেন। এলাম তো বাস টার্মিনাস-এ। বাস নেই। রাত ১০টা। কি হবে! কোথায় যাব এখন? সামনে এক ট্যাক্সি ড্রাইভারের ট্যাক্সি থামল। ভাবলাম এই অসময়ে আমাকে খদ্দের ভেবে দাঁও মারার মতলব—দেশের মতো। তবু শুধাই, —"শেষ বাস কি পাব আর?"

—"নিশ্চয়ই, বাস আসবে ১০-১৮তে, বাফেলো পৌঁছুবে ১১-১৫তে।"

—"তাহলে তো নিউইয়র্ক যাবার গ্রে হাউণ্ড ধরতে পারব, ছাড়ে রাত ১২টায়।"

—"স্বচ্ছন্দে।" ট্যাক্সি ড্রাইভার চলে গেলেন।

১০ মিনিট কেটেছে। আবার আর-এক ট্যাক্সি ড্রাইভার। নিশ্চিন্ত হতে আবার তাঁকে শুধাই। সময় দেখেন, তারপর 'ওয়াকিটকি' মুখে নিয়ে জেনে নিয়ে একই খবর দিলেন। ভুল ভাঙল। আমাদের দেশের ট্যাক্সি ড্রাইভার নন এঁরা! ইতিমধ্যে দু-চারজন যাত্রীও হাজির। অতএব মাভৈঃ।

পরদিন সকালে নিউইয়র্ক। সময় আছে। হাঁটতে হাঁটতেই চললাম মহারাজের কাছে। শেষ দিন আজ। বিদায় নেব। নিউইয়র্ক ছাড়ব। ভাল লাগছে না এখানে একদম। এখন বাজছে ৯টা। পথে বেশ ভীড়। এর মাঝে দেখি এক অন্ধ নিগ্রো হাঁটছে ধীর গতিতে —দু-পায়ের ফাঁকে একটা কুকুর—পিঠে তাঁর লেখা—ইংরেজীতে—"আমি অন্ধ। দয়া করে একটা পেনসিল কিনুন। ধন্যবাদ।" ইনি কি ভিক্ষুক নন? এবং খোদ নিউইয়র্ক-এ? ট্যাক্সি-গুলোর দরজার সামনে লেখা, "দয়া করে জোরে দরজা বন্ধ করবেন না।" তার মানে নিশ্চয়ই এখানেও লোকে জোরে টেনে দড়াম করে ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করে! সকালবেলা অনেককে কাগজ বিলি করতে দেখেছি, পথে কফিও পাওয়া যায়, এককাপ ৪ টাকার মতো। বেশির ভাগ ঝাড়ুদারই নিগ্রো। বাস স্টেশনের কাছে বুট পালিশওয়ালারাও সব নিগ্রো। একটু আগেই আজও দেখেছি, কয়েকজন নিগ্রো যুবক ও একটি আমেরিকান মেয়ে সাত সকালেই মদ গিলে হৈ-হুল্লোড় করছে। লেখা আছে একটা পুরো বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। শুধু নিউইয়র্ক নয়—ব্যাধিগ্রস্ত এক আমেরিকা আমার চোখের সামনে কেন এত জ্বলজ্বল করছে? অথচ এই মহান্ দেশের সাধারণ মানুষরা কী উদার, কী বলিষ্ঠ—এমনকি এক আমেরিকান অধ্যাপক—যাঁর সঙ্গে অ্যানেসীতে দেখা হয়েছিল—তাঁকে যখন ঠিকানা লিখে দিয়ে বললাম সসঙ্কোচে—"আমার ভিজিটিং কার্ড নেই" তখন তিনিও বলেছিলেন মনে আছে, "আমারও নেই—আসুন আমিও ঠিকানা লিখে দিই আপনার খাতায়"—এই সারল্য এবং সাধারণ জীবনযাপন—ঐ যে চারজন আমেরিকান ব্রহ্মচারী—যাঁরা শেষে বিদায় জানালেন দুপুরে খাবার পর—ভারতকে জানার জন্যে, ভারতের সঙ্গে একাত্ম হবার জন্যে ব্যগ্র—ব্যারি, মার্টিন, জন ও জোসেফ—এঁদের সঙ্গে অন্ধ আমেরিকার, সর্বাঙ্গ আমেরিকার চেহারা

মেলে না। চেহারায় মেলানো যায় না আমেরিকান সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির, অনেকখানি পথ হেঁটে যিনি সঠিক জায়গায় এনে কেনেডি বিমানবন্দরগামী বাসটাতে তুলে দিলেন!

কেনেডি বিমানবন্দরে পৌছে গেলাম বিকাল ৫টা ৩০ মিনিটে। শুনি কি, বারবার ঘোষণা করা হচ্ছে, "খুব চুরি হচ্ছে, সজাগ থাকুন, নিজের জিনিসপত্র সাবধানে রাখুন।" এ ঘোষণা আমেরিকায় বসে শুনব, তাও বিমানে ওঠার আগে, ভাবাই যায় না!

আলাপ হল হঠাৎই এখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে ফিরে যাওয়া জোসেফ নামে দক্ষিণভারতীয় খ্রীষ্টান এক যুবক ও তার বিয়োগান্ত জীবন-নাটকের সঙ্গে। মাদ্রাজের ছেলে। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বড় স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল দু-বছর আগে, কাজ তেমন ভাল মনের মতো, সম্মানজনক, যোগাড় করতে পারেনি, অনেক কিছুই করেছে, এমনকি রেস্ট্রেণ্টের বয়। ছমাস আগে পেয়েছিল একটা ঢালাই কারখানার কাজ, সেটাও হারাল, —ছাটাই—ফিরে চলেছে মাদ্রাজ—স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যাবার পর—অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখ-গহ্বরে। জোসেফ, মনে হল—প্রতীক। [ক্রমশঃ]

শ্রীসারদার আত্মপ্রকাশ

শ্রীমতী অভয়া দাশগুপ্ত

সহ-গ্রন্থাগারিক, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব্‌ কালচার, কলিকাতা।

"অনেক সময় ভাবি যে, আমি তো সেই রাম মুখুজ্জের মেয়ে, আমার সমবয়সী আরও তো অনেক মেয়ে জয়রামবাটীতে আছে, তাদের সঙ্গে আমার তফাত কি? ভক্তেরা সব কোথা থেকে এসে প্রণাম করে। জিজ্ঞাসা করলে শুনি, কেউ হাকিম, কেউ উকিল। এরাই বা এমন, আসে কেন?"—শ্রীসারদার এই উক্তি আমাদের জানিয়ে দেয় যে, তিনি একজন সাধারণ পল্লীবালা মাত্র। কিন্তু মনোনিবেশ সহকারে এই উক্তির গভীরে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, এতে পরিষ্কার ইঙ্গিত রয়েছে—তিনি সাধারণ হয়েও অসাধারণ। সকলের মধ্যে থেকেও তিনি বিশেষ। তাই ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের দরকার হয়ে পড়ে। সারদা নিজের সম্পর্কে মিতবাক্—স্বল্পভাষিণী। তথাপি এই অবগুণ্ঠনবতীর অবগুণ্ঠনের আড়ালে যে মহাশক্তির আবির্ভাব ঘটেছে, তার দ্যুতি মাঝে মাঝে শ্রীসারদার কথার ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে পড়েছে, আর সেখানেই হয়েছে তাঁর আত্মপ্রকাশ। বিদ্যুৎ-চমকের মতো সেই সব ছোট ছোট কথার মধ্য দিয়েই তাঁকে আমাদের ধারণায় আনার চেষ্টা এখানে করা হচ্ছে।

সাধারণ লোকালয়ের মাঝখানে থেকে শ্রীসারদার অলৌকিকত্ব মানুষের মনে প্রতিভাত হওয়ার অবসর মেলেনি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন যথার্থ জহুরি। তাই শ্রীসারদার মাহাত্ম্য বোঝাতে তাঁর মুখে উচ্চারিত হল—"ও সারদা, সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।" সারদার মুখের অবগুণ্ঠনটি যেন এই আবরণেরই প্রতীক। অবগুণ্ঠনে ঢাকা সারদা এক সাধারণ নারী। তাঁর স্বরূপ সহজে প্রকাশিত নয়। এখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাই রত্ন চিনিয়ে দেওয়ার দায়িত্বটুকু স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণকেই নিতে হয়েছিল। সরস্বতী বিদ্যাদায়িনী। সম্পদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ বিদ্যা। সেই বিদ্যাকে করতলে নিয়ে যিনি আসেন, তিনি

সকল ঐশ্বর্যের আকর। অথচ এখানে নেই কোন বহিঃপ্রকাশ। সারদা জ্ঞানদায়িনী। যিনি সংসারে সারবস্তু দিতে পারেন, তিনিই সারদা। অন্তরের সেই স্নিগ্ধ মহিমাকে প্রতিষ্ঠার জন্যেই বাইরে অনাড়ম্বরের আবরণ। এই জীবনে নেই কোন তথাকথিত 'শিক্ষা' কিন্তু আছে বিদ্যা। নেই কোন কামনা, আছে সর্বজীবে ভালবাসা।

এক ভক্তের প্রশ্ন—মা, আপনি দেখছি মায়ায় ঘোর বদ্ধ!—মা মৃদু হেসে উত্তর দিচ্ছেন, "কি করব, মা, নিজেই মায়া।" আবার বলছেন, "মায়া বইকি! মায়া না হলে আমার এ দশা কেন? আমি বৈকুণ্ঠে নারায়ণের পাশে লক্ষ্মী হয়ে থাকতুম।" মায়াকে অবলম্বন করে এসেছেন বলেই বলছেন, "আমার যে মন রাতদিন উঁচুতে উঠে থাকতে চায়, জোর করে তা আমি নীচে নামিয়ে রাখি—দয়ায়…।" এক ভক্তের প্রশ্ন—আচ্ছা, আপনাদের কি সবসময়ে নিজের স্বরূপ মনে থাকে না?—উত্তরে বলছেন, "তা কি সব-সময়ে থাকে? তাহলে কি এইসব কাজকর্ম করা চলে? তবে কাজকর্মের ভেতর যখন ইচ্ছা হয়, সামান্য চিন্তাতে দপ্ করে উদ্দীপনা হয়ে মহা-মায়ার খেলা সব বুঝতে পারা যায়।" শ্রীসারদার মুখ থেকে হঠাৎ হঠাৎ বেরিয়ে আসা এইসব উক্তি থেকেই আভাস মেলে তাঁর অসাধারণ দেবীশক্তির বিশিষ্টতা।

"আমার বাপ মা বড় ভাল ছিলেন। বাবা বড় রামভক্ত ছিলেন। নৈষ্ঠিক, অন্যবর্ণের (দান) গ্রহণ করতেন না। মায়ের কত দয়া ছিল। লোকদের কত খাওয়াতেন, যত্ন করতেন, কত সরল!" আরও বলছেন, "বাবা তামাক খেতে খুব ভালবাসতেন। তা এমন সরল, অমায়িক ছিলেন যে, যে কেউ বাড়ির কাছ দিয়ে যেত, ডেকে বসাতেন, আর বলতেন, 'বস ভাই, তামাক খাও।' এই বলে নিজেই ছিলিম ছিলিম তামাক সেজে খাওয়াতেন। বাপ-মায়ের তপস্যা না থাকলে কি (ভগবান) জন্ম নেয়?" "আমার মা ছিলেন যেন লক্ষ্মী, সমস্ত বছর সব জিনিসটি পত্রটি গুছিয়ে-টুছিয়ে, ঠিক-ঠাক করে রাখতেন। বলতেন, 'আমার ভক্ত-ভগবানের সংসার।'" নিজ জনক-জননীর কথা বলতে গিয়ে কথাপ্রসঙ্গে বলেই ফেললেন—"বাপ-মায়ের তপস্যা না থাকলে কি (ভগবান) জন্ম নেয়?" আরও অনেক কথা বেরিয়ে আসে শৈশবের কথা স্মরণ করতে গিয়ে—"দেখ বাবা, ছেলেবেলা দেখতুম, আমারই মতো মেয়ে সর্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে আমার সকল কাজের সহায়তা করত—আমার সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করত; কিন্তু অন্য লোক এলেই আর তাকে দেখতে পেতুম না। দশ-এগারো বছর পর্যন্ত এরকম হয়েছিল।" একদিকে সাদাসিধে পল্লীবালা সারদা সরলতার প্রতিমূর্তি; ছেলেবেলা থেকেই ক্ষুদ্র বালিকার হৃদয় সকল জীবের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে ওঠে; দরিদ্র পিতার সংসারে গ্রামের পরিবেশে সারদা কখন কাস্তে হাতে পুকুরে নেমে দলঘাস কাটছেন, কখন বা মায়ের কাজে সাহায্য করছেন; আবার স্নেহভরে ছোট ছোট ভাইদের পরিচর্যা করতেও সদা ব্যস্ত। অপরদিকে অসাধারণ বুদ্ধিমতী আবার শান্ত, ধীর-স্থির, সকল কাজে পরম উৎসাহী। নিজ বুদ্ধি খাটিয়ে সকল কাজ সুন্দরভাবে গুছিয়ে করে রাখবার একটা সহজাত প্রচেষ্টা। সাধারণ দরিদ্র পরিবারের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্না একটি পল্লী-বালা মাত্র। তবে সেই ছোট বালিকার ক্ষুদ্র প্রাণে বিরাট হৃদয়ের প্রকাশ দেখা যায়। তাই তিনি আর গোপন থাকতে পারেন না। মাতা শ্যামাসুন্দরীর মনেও মাঝে মাঝে বিস্ময় জাগে—"মাগো, তুই যে আমার কে মা! আমি কি তোকে চিনতে পারছি, মা?" জনসেবার সবে যে শুরু! তাই সাধারণের আবরণে আবৃতা

সারদাও বাহ্যিক বিরক্তির সঙ্গে উত্তর দিতে কিছুমাত্র দেরি করেন না—"কে আবার, কে আবার? আমার কি চারটে হাত হয়েছে? তাহলে তোমার কাছে আসব কেন?" এভাবে লোকব্যবহারে সারদা অতি সাধারণ গ্রাম্য বালিকা।

এরপরে শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে শ্রীসারদার আগমন। বিবাহ বন্ধনের গ্রন্থি। কিন্তু এখানে বিপরীত দৃশ্য।

দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন সারদা। প্রথম পদার্পণেই শ্রীসারদাকে সাদরে গ্রহণ করেন শ্রীরামকৃষ্ণ। 'ঠাকুর দেখে বললেন, তুমি এসেছ? বেশ করেছ।…এখন কি আর আমার সেজবাবু আছে? আমার ডান হাত ভেঙে গেছে।' তখন কয়েকমাস হয় মথুরবাবু মারা গেছেন।… 'মথুরবাবু থাকলে কি আর আমাকে ঐ কুঁড়ে ঘরে (নহবতে) বাস করতে হয়?…তিনি অট্টালিকায় রাখতেন।'" কিছুদিন পরেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশ্ন—"কি গো, তুমি কি আমায় সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ?" সরলা গ্রাম্য কিশোরীর এতবড় আধ্যাত্মিক প্রশ্নের উত্তর দিতে কিছুমাত্র দেরি হয় না—"না, আমি তোমাকে সংসারপথে কেন টানতে যাব? তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।" সাধারণ জগতে এ এক অসাধারণ ঘটনা। এসব ক্ষণিকের কথাগুলিকে অনুধ্যান করলে উপলব্ধি করা যায়—এঁদের দেবমানব-লীলার তাৎপর্য।

"দক্ষিণেশ্বরে মাস দেড়েক থাকবার পরেই ষোড়শীপূজা করলেন।…(সম্ভবতঃ ফলহারিণী কালীপূজার) রাত্রে প্রায় নটায় আমাকে তাঁর ঘরে আনালেন। পূজার সব যোগাড়। ভাগনে সব যোগাড় করে দিয়েছে। আমাকে বসতে বললেন। আমি তাঁর চৌকির উত্তর পাশে (গঙ্গাজলের) জালার পানে মুখ করে (পশ্চিম মুখে) বসলুম। ঠাকুর পূর্বমুখ হয়ে পশ্চিমদিকের দরজার কাছে বসেছেন। দরজা সব বন্ধ। আমার ডান পাশে সব পূজার জিনিস।…আমি একটু পরেই বেহুঁশ হয়ে গেলুম। পূজার মধ্যে কি হয়েছে জানতে পারিনি। (হুঁশ হতে) আমি মনে মনে প্রণাম করলুম। পরে চলে এলুম।"—এভাবে ষোড়শী অর্থাৎ শ্রীবিদ্যা অথবা ত্রিপুরাসুন্দরীর আরাধনা করে শ্রীসারদার দেবী-মানবীত্বের পূর্ণ বিকাশের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন। পূজক ও পূজিতা আত্মস্বরূপে পূর্ণভাবে একীভূত হয়ে আমাদেরও দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করে দিলেন। শ্রীসারদা কত বড় শক্তির আধার হলে পরে এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা আর তাঁর সাধনলব্ধ সমস্ত ফল গ্রহণে সক্ষম হতে পেরেছিলেন! মূর্তিমতী বিদ্যারূপিণী মানবদেহ অবলম্বন করেছেন বলেই এই পূজাগ্রহণ সম্ভব হয়েছে শ্রীসারদার পক্ষে। এই গুপ্ত পূজার পরেও শ্রীসারদার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কোন ব্যতিক্রম আসেনি। দক্ষিণেশ্বরে সারদা নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তদের সেবায় কর্মব্যস্ত। অথচ মন আত্মমগ্ন। "তখন আমার মন এমন ছিল—দক্ষিণেশ্বরে রেতে কে বাঁশী বাজাত, শুনতে শুনতে মন ব্যাকুল হয়ে উঠত, মনে হোত সাক্ষাৎ ভগবান বাঁশী বাজাচ্ছেন—অমনি সমাধি হয়ে যেত।" আবার বলছেন, "লোকে আমাকে ভগবতী বলে, আমিও ভাবি—সত্যিই বা তাই হব। নইলে আমার জীবনে অদ্ভুত অদ্ভুত যা সব হয়েছে! এই গোলাপ, যোগীন এরা তার অনেক কথা জানে।" দেবী-শক্তির সঙ্গে তাঁর দুই সখী জয়া-বিজয়া—গোলাপ-যোগীন নাম নিয়ে ধরাধামে এসেছেন। তাই তো দেবীর দৈনন্দিন সাধারণ জীবনযাপনের আড়ালে যে অলৌকিক জীবনের পরিচয় রয়েছে, সে-খবর এঁদের দৃষ্টি এড়ায় না। "আহা! দক্ষিণেশ্বরে

কি সব দিনই গেছে, মা! ঠাকুর কীর্তন করতেন, আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নহবতের ঝাপড়ির ভিতর দিয়ে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম, হাতজোড় করে পেন্নাম করতুম। কি আনন্দই ছিল! দিনরাত লোক আসছে, আর ভগবানের কথা হচ্ছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা সন্দর্শনে শ্রীসারদা সর্বদা অনুভব করতেন,"হৃদয় মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে।" হৃদয়ের এই আনন্দে ভরপুর থেকে শ্রীসারদা শারীরিক সকল কষ্ট, সকল অসুবিধা অনায়াসে, অক্লেশে বহন করে গেছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে আনন্দের হাট ভেঙে যায়। তখন? তখনকার কথা—"যখন ঠাকুর চলে গেলেন, আমারও ইচ্ছা হল, আমিও চলে যাই। তিনি দেখা দিয়ে বললেন, 'না তুমি থাক। অনেক কাজ বাকী আছে।' শেষে দেখলুম, তাই তো, অনেক কাজ বাকী।" এই যুগে দেশের আদর্শকে সঞ্জীবিত করা, আর ভারতীয় আদর্শের স্থায়ী প্রভাব-বিস্তার করার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। পরাধীন ভারতকে আত্মস্থ করা এবং সমগ্র বিশ্বকে ভারতের পুরাতন সংস্কৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য ঐশী শক্তির প্রয়োজন ছিল। সেই শক্তিকে ভারতের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির হাল ধরতে হবে। তাই সারদাকে শোনাতে হল—"ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল, সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে গেছেন।" তাই শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পরে শ্রীসারদা মাতৃরূপে আপনাকে প্রকাশ করেন। আর সেই প্রকাশের আলোকে—সত্যদীপ্তিতে প্রকাশ হল ভারতবর্ষের। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাকে বহন করে যে তরী এগিয়ে চলল দেশ হতে দেশান্তরে, মাতৃরূপে সেই তরীর হাল ধরলেন সারদা নিজে। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবনার মূলে যে মাতৃভাব—যেভাব প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাকে দিয়ে যান, সেই মাতৃরূপেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের রত্নছেলেদের সঙ্ঘবদ্ধ করেন, আবার ভক্তজননীরূপে সকলের পাশে এসে দাঁড়ান।

"মায়ের কাছে এসেছ, এখন এত ধ্যানজপের কি দরকার? আমিই যে তোমাদের জন্তে সব করছি। এখন খাও-দাও, নিশ্চিন্তমনে আনন্দ কর।" আবার একজন সন্ন্যাসী ছেলেকে বলছেন, "কেন, ঐ যেটুকু পেয়েছ তাই ধরে থাক না কেন? মনে ভাববে, আর কেউ না থাক, আমার একজন 'মা' আছেন।"—এত বড় আশ্বাসবাণী শোনার পরে আর কিসের অভাব! 'বহুজনহিতায়' নিজ জীবনকে উৎসর্গ করা তখন তাঁর পক্ষে সহজ হয়। "নরেন বলছিল, 'মা, আমার আজকাল সব উড়ে যাচ্ছে। সব দেখছি উড়ে যায়।' আমি বললুম, 'দেখো দেখো, আমাকে কিন্তু উড়িয়ে দিও না!' নরেন বললে, 'মা, তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকি কোথায়? যে জ্ঞানে গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দেয় সে তো অজ্ঞান। গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দিলে জ্ঞান দাঁড়ায় কোথায়?'" এ প্রসঙ্গেই আবার বলছেন, "জ্ঞান হলে ঈশ্বর-টীশ্বর সব উড়ে যায়। 'মা, মা' শেষে দেখে, মা আমার জগৎ জুড়ে! সব এক হয়ে দাঁড়ায়। এই তো সোজা কথাটা।"—এই সোজা কথাটুকুকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্তেই মাতারূপে সারদার প্রয়োজন ছিল।

সাধারণের একজন হয়ে উদ্বোধনের বাড়িতে সকল ভক্তমহিলার নানা কথা শুনছেন। এরই ফাঁকে এক সন্তানকে সাধন-ভজন সম্পর্কে বলতে গিয়ে সার কথাটি জানিয়ে দিলেন, "ঠাকুর ও আমাকে অভেদ-ভাবে দেখবে, আর যখন যে ভাবে দর্শন পাবে, সেই ভাবেই ধ্যানস্তুতি করবে, ধ্যান হয়ে গেলেই পূজা শেষ হল।" এইভাবে মাঝে মাঝে ধরা দিয়ে ফেলছেন। "ভগবানকে

কে বাঁধতে পেরেছে বল না! তিনি নিজে ধরা দিয়েছিলেন বলে তো যশোদা তাঁকে বাঁধতে পেরেছিল, গোপগোপীরা তাঁকে পেয়েছিল।" তাই তো নিজমুখে উচ্চারিত হল—"ঠাকুর সাক্ষাৎ ভগবান।...আমি আর কে, আমিও ভগবতী।" আবার একথাও বলেছেন, "বাবা, রাবণ কি জানতো না যে রাম পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, সীতা আভাশক্তি জগন্মাতা—তবুও ঐ করতে এসেছিল! ও (পাগলী) কি আমাকে জানে না! সব জানে, তবু এই করতে এসেছে।" তাই মনে হয়, নিজের স্বরূপকে মানবসাধারণের কাছে উন্মোচন করার জন্য পাগলী মামীকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার উপলক্ষ করে তিনি বলছেন—"তুই আমাকে সামান্ত লোক মনে করিসনি।...তুই যে আমাকে এত বাপান্ত মা-অন্ত করে গাল দিচ্ছিস, আমি তোর অপরাধ নিই না। ভাবি, ছুটো শব্দ বই তো নয়। আমি যদি তোর অপরাধ নিই তা হলে কি তোর রক্ষা আছে?...আমার কি মায়া? এক্ষুনি কেটে দিতে পারি। কর্পূরের মতো কবে একদিন উড়ে যাব, টেরও পাবিনি।" আর একদিন জয়রামবাটীতে খুব বিরক্ত হয়ে বলতে বাধ্য হলেন, "দেখ্, তোরা আমাকে বেশী জ্বালাতন করিসনে। এর ভিতরে যিনি আছেন, যদি একবার ফোঁস করেন তো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কারও সাধ্য নেই যে তোদের রক্ষা করে।" আরও বলতে হচ্ছে—"দেখ মা, এ শরীর (নিজের শরীর দেখাইয়া) দেব-শরীর জেনো। এতে আর কত অত্যাচার সহ্য হবে? ভগবান না হলে কি মানুষে এত সহ্য করতে পারে? ঠাকুর আমাকে কখনও ফুলের ঘাটি পর্যন্ত দেননি।" সংসারে অপর দশজনের মতো নানা জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ—এ শুধু লোকশিক্ষার জন্তে। সংসারে অশান্তি, তুঃখ, অর্থাভাব মানুষকে পাগল করে দিলেও, মানুষ ভগবানকে ভুলে সংসারের মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু সংসারে থেকেও যে একহাতে পূজা, অপর হাতে সেবা করা সম্ভব হয়, সেটি প্রতিষ্ঠিত করবার জন্তেই সারদার গৃহের বন্ধন স্বীকার করে নিয়ে সংসারের মধ্যে আত্মগোপন করবার দরকার হয়ে পড়ে।

রাধুর পাগল-মাকে দেখে সারদার বুকের ভেতরে ব্যথা লাগে। তিনি তুহাত বাড়িয়ে যেই রাধুকে আশ্রয় দিলেন, আর তখনই সামনে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে পেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্বাস দিয়ে বলছেন, "এই সেই মেয়েটি, একে আশ্রয় করে থাক, এটি যোগমায়া।" যোগমায়ার বন্ধন স্বীকার করে নিলেন শুধু জগতের সকল জীবের মঙ্গল-কামনায়। এ তাঁর অনিবার্য বন্ধন নয়; এ তাঁর জীবের প্রতি অসীম প্রেমে স্বেচ্ছারচিত বন্ধন। এ যেন মূর্তিমতী অসীম করুণা। যে করুণায় ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই। পাগলের সন্তান রাধু অর্ধপাগল। সেই রাধু একদিন একটা বেগুন ছুঁড়ে সারদার পিঠে মারলে যন্ত্রণায় তাঁর পিঠ বেঁকে গেলেও তিনি রাধুর মঙ্গল কামনা করছেন। জোড়হাতে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন, "ঠাকুর, ওর অপরাধ নিও না, ও অবোধ।" নিজের পায়ের ধুলো রাধুর মাথায় দিচ্ছেন আর বলছেন, "রাধি, এই শরীরকে ঠাকুর কোন দিন একটি শাসনবাক্য বলেননি, আর তুই এত কষ্ট দিচ্ছিস? তুই কি বুঝবি আমার স্থান কোথায়? তোদের নিয়ে পড়ে আছি বলে তোরা কি মনে করিস বল্ দেখি?" অন্তদের বলছেন, "এই যে রাধী রাধী করি এ তো একটা মোহ নিয়ে আছি।" রাধু একদিকে যেমন শ্রীসারদার দেহধারণের অবলম্বন, অপরদিকে তাঁর জীবনের উদ্দেশ্ত প্রকাশের উপলক্ষ। বিভিন্ন সংঘর্ষের মধ্যে প্রতিকূল পরিবেশে চরিত্র মাধুর্য যথার্থ বিকশিত হয়, আর তখনই আমাদের পক্ষে সেটি বোঝা সহজ হয়।

সংসারের জালে জড়িয়ে থেকেই শ্রীসারদা বলছেন, "দেখ মা, সকলেই বলে 'এ দুঃখ, ও দুঃখ—ভগবানকে এত ডাকলুম, তবু দুঃখ গেল না।' কিন্তু দুঃখই তো ভগবানের দয়ার দান।" আবার বলছেন, "দেখ, লোকে আমার কাছে আসে, বলে—জীবনে বড় অশান্তি, ইষ্টদর্শন পেলুম না। কিসে শান্তি হবে, মা!—কত কি বলে! আমি তখন তাদের দিকে চাই, আর আমার দিকে চাই, ভাবি—এরা এমন সব কথা কেন বলে! আমার কি তাহলে সবই অলৌকিক! আমি অশান্তি বলে তো কখনো কিছু দেখলুম না! আর ইষ্টদর্শন, সে তো হাতের মুঠোর ভিতর—একবার বসলেই দেখতে পাই।" কী অসামান্য শক্তি-সম্পন্ন মানবীদেহ সংসারের শত-সহস্র বন্ধনের মধ্যে থেকেও এমন কথা বলতে পারেন! অশান্তি কি তা তিনি বুঝতে পারলেন না, জানতে পারলেন না ঘোর সংসারে আবদ্ধ থেকেও।

সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পরেও রাতের অন্ধকারে ছেলেদের মঙ্গলকামনায় জপ করছেন। বলছেন, "যার যার নাম মনে আসে, তাদের জন্যে জপ করি। আর যাদের নাম মনে না আসে, তাদের জন্যে ঠাকুরকে এই বলে প্রার্থনা করি—ঠাকুর, আমার অনেক ছেলে অনেক জায়গায় রয়েছে, যাদের নাম আমার মনে হচ্ছে না, তুমি তাদের দেখো, তাদের যাতে কল্যাণ হয় তাই করো।"

শেষদিকে শ্রীসারদার শরীরের কষ্ট দেখে সন্ন্যাসী ছেলেরা যখন দীক্ষা দেওয়া বন্ধ করবার কথা ভাবছেন, তখন সারদা মৃদু হেসে বলছেন, "কেন গো? ঠাকুর কি এবার খালি রসগোল্লা খেতেই এসেছেন?" আরও বলছেন, "না বাবা, আমরা তো ঐজন্যই এসেছি। আমরা যদি পাপ-তাপ না নেব, হজম না করব, তবে কে করবে? পাপী-তাপীদের ভার আর কারা সহ্য করবে?"

এরপরে আরও আছে—"দয়ায় মন্ত্র দিই। ছাড়ে না, কাঁদে, দেখে দয়া হয়। কৃপায় মন্ত্র দিই। নতুবা আমার কি লাভ? মন্ত্র দিলে তার পাপ গ্রহণ করতে হয়। ভাবি শরীরটা তো যাবেই, তবু এদের হোক।" "আপনার জপ কি বলে করব?"—সন্তানের এই প্রশ্নের উত্তরে—"রাধা বলে পার, কি অন্য কিছু বলে পার, যা তোমার সুবিধা হয় তাই করবে। কিছু না পার, শুধু মা বলে করলেই হবে।"—এসব শ্রীসারদার শুধুমাত্র করুণা নয়, সন্তান বাৎসল্য নয়, এ তাঁর সর্বব্যাপী প্রেম। যে প্রেম কিছুই নেওয়ার অপেক্ষা রাখে না, সেখানে কেবল দেওয়া। আপনার প্রভুত প্রাচুর্যে নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে দেওয়া এই হচ্ছে ভারতের সনাতন ঐশ্বর্য। মানুষের মধ্যে যখন আমরা সেরূপ শক্তির প্রাচুর্য দেখতে পাই, তখনই সেখানে ঐশী শক্তির প্রকাশ পরি-লক্ষিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীসারদার মধ্যে সেই প্রকাশ দেখতে চেয়েছিলেন—যা দুঃসাধ্য, যা চিরজাগরূক, যা সংগ্রামজয়ী, যা বন্ধনচ্ছেদী। শ্রীসারদার সেই তপস্যায় নেই কোথাও লেশমাত্র আলস্য, নেই অনবধান। তাই তিনি অমৃতবারি ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন সর্বত্র। শ্রীসারদা স্বপ্ন দেখে-ছিলেন, "একটি মেয়ে একটা কলসী ও ঝাঁটা হাতে করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি কে গো? সে বললে—আমি সব ঝেঁটিয়ে যাব। আমি বললুম—তারপর কি হবে? সে বললে—অমৃতের কলসী ছড়িয়ে যাব।"—এই মেয়ে সারদা নিজে, যিনি ঝাঁটার কাজ করতে গিয়ে পরাধীন ভারতের আবিলতা, সংকীর্ণতাকে দূর করে ভারতের সনাতন শাশ্বত সংস্কৃতিকে ভারতের মাটিতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করে তাঁর অহেতুক প্রেমে অমৃতের কলসী ছড়িয়ে গেলেন। আর জানিয়ে গেলেন—

"যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে, আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও মা,—আমার ভালবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে।"

বিশ্বমাতা সারদামণি

শেখ সদরউদ্দীন

প্রধান শিক্ষক, পানিহাটি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যাপীঠ,—সুপরিচিত কবি ও গীতিকার।

হরের বুকে লীলাময়ী এসেছিলেন পার্বতী-মা,
যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের তেমনি ছিলে তুমি শ্রীমা!
পরমপুরুষ ধন্য হল দয়াময়ি, তোমার প্রেমে—
বিশ্বভরা অন্ধকারে আলোর ধারা এলো নেমে।

তুমি যদি না আসতে মা কৃপাময়ীর রূপে সাজি'
পেতাম কি মা যুগাবতার পরমপুরুষ দেবকে আজি?
মা-করুণাময়ীর স্বামী বিশ্বপিতা করুণাময়—
প্রকৃতিকে সঙ্গে পেয়ে পুরুষ ধন্য, পূর্ণ হয়।

মানব-সেবায় উৎসর্গিতা, তাই তো মানব-বিবন্দিতা,
শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রপূতা বিশ্বমাতায় বিনন্দিতা!
তোমার কাছে সবাই সমান হিন্দু কিংবা মুসলমান,—
তুচ্ছ ছিল জাতের বিচার, গর্ব কিংবা অভিমান।

সকল জনে বাসলে ভালো, সন্তানেরই তুল্য তারা,
নয়ন ভরে দিলে আলো, ছিল যারা দিশাহারা।
অনাথ-আতুর ভ্রষ্টাচারীর তোমার কোলে আসন পাতা,
সবায় নিলে আপন বুকে, তাই তো তুমি বিশ্বমাতা!

জননী তো অনেকে হয়, মাতা হতে কজন পারে?
বিশ্বময়ী, মা-সারদা, এসেছিলে এ সংসারে!
স্বর্গ হতে অপরিসীম করুণারই ঝর্না আনি
স্নেহ-মায়া-মমতাতে ভরালে এই ভুবনখানি!

ধূমকেতু কি এবং আসন্ন হ্যালির ধূমকেতু

ডক্টর অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ডিরেক্টর, পজিসন্যাল অ্যাস্ট্রনমি সেন্টার, কলিকাতা।

মহাকাশে ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটে অকস্মাৎ। রাতের আকাশে যাদের নিয়মিত দেখা যায় তারা হল চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্র। আকাশের এই পটভূমিকায় যখন অকস্মাৎ ঝকঝকে মাথা ও ছড়ানো উজ্জ্বল ঝাঁটার মতো লেজ নিয়ে ধূমকেতু এসে উপস্থিত হয়, সত্যিই সে এক অপরূপ দৃশ্য। আমাদের আকাশে নৈসর্গিক বৈচিত্র্য অনেক আছে, কিন্তু উজ্জ্বল একটি ধূমকেতুর দৃশ্য যেমন মনোহর ও রোমাঞ্চকর তেমনটি আর কিছুই নয়। ধূমকেতুর দর্শন এমন একটা ব্যাপার যেটা যুগ যুগ ধরে মানুষকে আকৃষ্ট করে এসেছে, ধূমকেতুকে দেখে আসছে মানুষ সেই প্রাচীনকাল থেকে। কিন্তু এর আবির্ভাবের আকস্মিকতা মানুষের মনে একটা ভীতির সঞ্চার করত। আগেকার কালে আকাশে ধূমকেতু দেখা দিলেই মনে করা হত যে, বড় রকমের একটা যুদ্ধ বা মড়ক ঘটতে চলেছে। তাই প্রাচীনকালের মানুষ ধূমকেতুকে একটা অমঙ্গল ও দুর্ঘটনার অগ্রদূত বলে মনে করত। ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে একটা অতি উজ্জ্বল ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল, আর সেই বৎসরেই হেস্টিংসের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের রাজা হ্যারল্ডের মৃত্যু হয়। এই ধূমকেতুটির আগমনের জন্যেই হ্যারল্ডকে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করতে হল, এরকম একটা ধারণা ইংলণ্ডের মানুষের মনে হয়েছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৪ অব্দে জুলিয়াস সীজারের হত্যাকাণ্ডের সময় একটি ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়েছিল। শেক্সপীয়ারের নাটক "জুলিয়াস সীজার"-এর একটি জায়গায় এই ঘটনা দুটির কার্যকারণ কল্পনা করে সীজার-পত্নী ক্যালফুর্নিয়ার মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে "ভিখারীরা যখন মরে, তখন আকাশে কোনও ধূমকেতু দেখা যায় না, কিন্তু রাজার মৃত্যুতে স্বর্গ থেকে আলোর জোয়ার আসে।" পৃথিবীর এরকম সব অঘটনের দায়িত্ব, দূরের ক্ষণজীবী জ্যোতিষ্কের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে বোধ হয় মানুষের মন চায়। কিন্তু সমস্ত রকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা বিজ্ঞানীরা এখন স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন যে, ধূমকেতুর দ্বারা পৃথিবীর কোনও রকম ক্ষতির সম্ভাবনা নেই—তাই ধূমকেতুর আগমনের সঙ্গে পৃথিবীর একটা অমঙ্গল হতে চলেছে এমন একটি ধারণা সম্পূর্ণ কুসংস্কার মাত্র।

ধূমকেতুরা সত্যিকারের কি বস্তু? এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই অনেকের মনে জাগে। অ্যারিস্টটলের এমন ধারণা ছিল যে, ধূমকেতু বহির্বিশ্ব থেকে এসে আমাদের সৌরজগতে প্রবেশ করে এবং ছুটতে ছুটতে আবার সৌরজগৎ থেকে বেরিয়ে চলে যায়। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের বেশ কিছু পরেও ধূমকেতু সম্পর্কে এমন একটা ধারণার চল ছিল। নিউটনই প্রথম বিজ্ঞানী যিনি দেখালেন যে, ধূমকেতু সৌর-পরিবারের বাইরে অবস্থিত কোন জ্যোতিষ্ক নয়, বরং গ্রহ, উপগ্রহ ও গ্রহাণুর মতো এরাও সৌরজগতেরই অন্তর্ভুক্ত এবং সূর্যকে পরিক্রমণ করে চলেছে। ধূমকেতুদের মধ্যে অধিকাংশই অনুজ্জ্বল, এদের পৃথিবী থেকে দেখতে হলে বিশেষ শক্তিসম্পন্ন দূরবীনের প্রয়োজন। উজ্জ্বল ধূমকেতুর সংখ্যাও খুব নগণ্য। আর খালি চোখে দেখা যায় এমন অত্যন্ত উজ্জ্বল ধূমকেতু কদাচিৎ আকাশে দেখা যায়। আকাশে যে সব ধূমকেতু দেখতে পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে কিছু কিছু আছে যাদের মাত্র কয়েকদিনের জন্যে দেখা যায়, কিছু আছে যাদের কয়েক সপ্তাহের জন্যে

দেখা সম্ভবপর। আর যাদের আকাশে কয়েক মাসের জন্তে দেখা যায়, তারা অতি দুর্লভ। সাধারণত আকাশে ধূমকেতুর আকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হল, এর ঝাঁটার মতো লেজ। কিন্তু সব ধূমকেতুর লেজের উৎপত্তি হয় না, আর যাদের লেজ গজায়, সেটা হয় সূর্যের কাছে এলে। ধূমকেতু সূর্যের যত কাছে এগিয়ে আসে লেজটাও তত লম্বা হয়ে পড়ে, আবার যখন দূরে চলে যেতে থাকে, লেজটাও তত ছোট হতে হতে অবশেষে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়। সবসময়ই ধূমকেতুর লেজটা সূর্য যেদিকে থাকে তার বিপরীত দিকে প্রলম্বিত হয়। সূর্যের চারদিকে পরিক্রমা করতে করতে ধূমকেতু যখন অনুস্থর (perihelion) অবস্থানে, অর্থাৎ সূর্যের নিকটতম অবস্থানে আসে তখনই তার লেজ সবচেয়ে লম্বা এবং উজ্জ্বল হয়ে থাকে। এর কারণ হল ধূমকেতুর নিজস্ব কোন আলো নেই, ধূমকেতু থেকে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে আসে বলে আমরা তাকে দেখতে পাই। তাই সূর্যের কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত ধূমকেতুকে দেখা যায় না।

ধূমকেতুর চলার পথ কেমন ? ধূমকেতু যদিও সৌর-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু তার চলার পথ গ্রহের মতো আদৌ নয়। আমরা জানি গ্রহদের পরিক্রমণ-পথ এক একটি উপবৃত্ত। উপবৃত্ত হলেও গ্রহদের বেলায় এই পথগুলো প্রায় বৃত্তের মতো—একটা ছোট মুরগীর ডিম যেমন একেবারে গোল নয়, একদিকে সামান্য একটু চাপা, সেই রকম। কিন্তু ধূমকেতুর বেলায় এই পরিক্রমণ-পথ এক একটি সুদীর্ঘ উপবৃত্ত, তার মানে ডিমের আকৃতি না হয়ে একটা লম্বা পটলের আকৃতি। সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরতে কোন কোন ধূমকেতুর সময় লাগে কয়েক হাজার থেকে কয়েক লক্ষ বছর। এমন অনেক ধূমকেতু আছে যাদের এখনও পর্যন্ত মাত্র একবারই দেখা গিয়েছে, তারপরে মহাশূন্যে উধাও হয়ে গিয়েছে। যে সব ধূমকেতুর কক্ষপথ উপবৃত্তাকার, সেগুলিকে নির্দিষ্ট সময় পরে পরে ফিরে আসতে দেখা যাবেই। এদের বলা হয় নিয়মিত (periodic) ধূমকেতু। আবার কোন কোন ধূমকেতুর পরিক্রমণ-পথ অধিবৃত্ত বা পরাবৃত্ত—এক্ষেত্রে এমন ধূমকেতুকে এখনও পর্যন্ত হয়তো বা একবার মাত্র দেখা গিয়েছে, আবার আদৌ আসবে কিনা সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছুই বলা চলে না। এদের বলা হয় অনিয়মিত ধূমকেতু।

ধূমকেতুর দেহ-গঠন প্রধানত দুটি আঙ্গিকে ভাগ করা যায়—প্রথমত এর মুণ্ড বা মাথা, ইংরেজীতে যাকে বলা হয় Head, দ্বিতীয়ত এর পুচ্ছ বা ঝাঁটার মতো লেজ, ইংরেজীতে যাকে বলা হয় Tail, মাথার আবার দুটি অংশ—একটি হল এর কেন্দ্রীয় অংশ (nucleus)। রাসায়নিক বিচারে দেখা গেছে যে, মুখ্যত জল, মিথেন, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি জমাট বেঁধে ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশ গঠিত। আর ঘন জমাট-বাঁধা এই কেন্দ্রীয় অংশকে ঘিরে আছে হালকা গ্যাসের এক আবরণ। ধূমকেতুর মাথার এই বাইরের গ্যাসের আবরণকে ইংরেজীতে বলা হয়ে থাকে Coma, বাংলাতে একে 'ধূম' বলা যেতে পারে। ধূমকেতু যখন সূর্য থেকে অনেক দূরে থাকে, তখন নিজের অভিকর্ষের দরুনই একটি গোল আকারের পিণ্ড হিসেবে থাকে; যতই সূর্যের কাছে এগোতে থাকে ততই সূর্যের প্রবল মহাকর্ষের ফলে এবং প্রচণ্ড তাপে ধূমকেতুর গ্যাসীয় আবরণটি পরিমাণে বাড়তে থাকে, আর তখন সৌর বায়ুর চাপে মস্তকের গ্যাসীয় আবরণ ক্রমশ সূর্যের বিপরীত দিকে বিস্তৃত হতে থাকে এবং এর থেকেই ধূমকেতুর ঝাঁটার আকারে লেজের আকৃতি ধারণ সম্ভবপর হয়। আকাশে বিরাট আকৃতির লেজ-বিশিষ্ট ধূমকেতুর ভর

কিন্তু অতি নগণ্য—পৃথিবীর ভরের এক লক্ষ ভাগের চেয়েও অনেক কম হওয়া সম্ভবপর, এটা ভাবতে কিরকম অবাক লাগে।

নিয়মিত উজ্জ্বল ধূমকেতু যেগুলো পৃথিবী থেকে আমরা খালি চোখে দেখতে পাই, তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল হ্যালির ধূমকেতু। এই ধূমকেতুটির ইতিহাস অতি প্রাচীন। অতীত ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব ২৪০ অব্দে এই ধূমকেতুটিরই আকাশে আবির্ভাবের ঘটনার উল্লেখ প্রাচীন চীন দেশের সাহিত্যে আছে। এই উল্লেখই এই ধূমকেতুটির প্রাচীনতম আবির্ভাবের উল্লেখ বলে গণ্য করা হয়। তারপর প্রতি শতাব্দীতে একবার বা দুবার করে এর আগমন ঘটেছে নিয়মিতভাবে। আর এত উজ্জ্বল ও নয়নাভিরাম এই ধূমকেতুটি যে, প্রতি আবির্ভাবেই সে অগণিত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। খ্রীষ্টপূর্ব ২৪০ অব্দ থেকে ৯১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ধূমকেতুটির ২৯ বার আবির্ভাব পৃথিবীর আকাশে ঘটেছে, আর এর প্রায় প্রতিটি আবির্ভাবের উল্লেখ সারা পৃথিবীর কোন না কোন দেশের তদানীন্তন সাহিত্য বা শিল্পকলায় স্থান পেয়েছে। এই ধূমকেতুটির নাম কিভাবে হ্যালির নাম অনুসারে করা হয়েছিল তা বেশ মজার। এডমণ্ড হ্যালি (Edmond Halley) ছিলেন ইংলণ্ডের দ্বিতীয় রাজকীয় জ্যোতির্বিদ (Astronomer Royal) এবং স্বনামধন্য বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটনের বন্ধু। ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে একটি অতি উজ্জ্বল ও বিশালকায় ধূমকেতুর আবির্ভাব হল। হ্যালি এই ধূমকেতুটি পর্যবেক্ষণ করলেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৬। বন্ধু নিউটনের সাহায্যে হ্যালি এই ধূমকেতুটির পরিক্রমণ-পথ, পরিক্রমণ-কাল ইত্যাদি নির্ণয় করতে সমর্থ হলেন। হ্যালি গণনা করে দেখলেন যে, সূর্যকে একবার পরিক্রমণ করার সময় এই ধূমকেতুটির লাগা উচিত ৭৬ বছর। তখন হ্যালি এই ধারণায় উপনীত হলেন যে ১৬০৭ ও ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে যে দুটি উজ্জ্বল ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল, তারা দুটি স্বতন্ত্র ধূমকেতু নয়, ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দের ধূমকেতুটিরই দুই পূর্বতন আবির্ভাব। গণিত পরিক্রমণ-কাল অনুযায়ী হ্যালি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দের এই ধূমকেতুটিকেই আবার পৃথিবী থেকে দেখা যাবে আগামী ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু বড় দুর্ভাগ্য যে, তাঁর গণনার নির্ভুলতা প্রত্যক্ষ করে যাওয়ার সুযোগ হ্যালি পেলেন না। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে হ্যালির মৃত্যু হয়। কিন্তু সত্যি সত্যিই তাঁর মৃত্যুর ১৬ বছর পরে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের বড়দিনের রাত্রে এই ধূমকেতুটিই আকাশে আবার আত্মপ্রকাশ করল। যিনি প্রথম কোন ধূমকেতু আবিষ্কার করেন, তাঁর নামেই ধূমকেতুর নাম রাখার প্রথা প্রচলিত। ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে হ্যালি এই ধূমকেতুটিকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন মাত্র, কিন্তু তিনি প্রথম এটিকে লক্ষ্য করতে পারেননি, প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন আর কেউ। কিন্তু নির্ভুলভাবে এই ধূমকেতুটির পরিক্রমণ-পথ ও পরিক্রমণ-কাল গণনা করে যাওয়ার জন্যে হ্যালির নামে এই ধূমকেতুটির নামকরণ করা হল হ্যালির ধূমকেতু (Halley's Comet)। প্রচলিত নামকরণ প্রথা থেকে হ্যালির ধূমকেতুর নামকরণ তাই সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই ধূমকেতুটি হ্যালিকে অমর করে রেখেছে।

হ্যালির ধূমকেতুকে শেষবার পৃথিবীর আকাশে দেখা গিয়েছিল ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে। এই অসাধারণ ধূমকেতুটির আবার সূর্যের সবচেয়ে কাছে অর্থাৎ অনুসূর অবস্থানে আসার কথা ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ ফেব্রুআরি। কিন্তু ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে এর পরিক্রমণের সময়, অনুসূর অবস্থায় ধূমকেতু ও পৃথিবী দুটিই সূর্যের একই দিকে ছিল, তার ফলে পৃথিবী থেকে হ্যালির ধূমকেতুকে অপূর্ব উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসাবে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু আগামী ৯

ফেব্রুআরি পৃথিবীর অবস্থান ধূমকেতুটির উল্টো-দিকে থাকবে—তার ফলে এবারে ধূমকেতুটির ঔজ্জ্বল্য ও পুচ্ছটির আপাতদৈর্ঘ্য অনেক কম হবে। হ্যালির ধূমকেতু নিয়ে যে-সব গণনা করা হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে বলা যেতে পারে যে, ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে, জানুআরির শেষে হ্যালির ধূমকেতু ক্রমশ সূর্যের এত কাছে এগিয়ে আসতে থাকবে যে, সেই সময় সূর্যের খুব নিকটে আসার দরুন একে দেখা আর সম্ভবপর হবে না। ফেব্রুআরি মাসের একেবারে শেষের দিকে একে আবার ভোরের আকাশে পূর্বদিকে সূর্য উদয়ের আগে খালি চোখে দেখা

তৎকালীন সারা ভারতের একমাত্র মানমন্দির—দক্ষিণ ভারতের কাদাইকানাল মানমন্দির থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ মে তারিখে নেওয়া হ্যালির ধূমকেতুর আলোকচিত্র।

সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে সন্ধ্যার পশ্চিম আকাশে একে বাইনোকুলার দিয়ে দেখা সম্ভবপর হবে। একেবারে খালি চোখে একে দেখা সম্ভবপর হবে ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসের মাঝামাঝি সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে—তখনও কিন্তু খুব উজ্জ্বল হয়ে দেখা নাও যেতে পারে। এর পরে যাবে—তখন এর উজ্জ্বলতা ও পুচ্ছের দৈর্ঘ্য ক্রমশ বাড়বে। আশা করা যায় যে, মার্চ মাসের মাঝামাঝি হ্যালির ধূমকেতু যথেষ্ট উজ্জ্বল হয়ে ঝাঁটার মতো লেজ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। গণনা অনুযায়ী দেখা যায় যে, ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ এপ্রিল হ্যালির ধূমকেতু পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটে

আসবে, আর সেই সময়ই এটি হয়ে উঠবে পৃথিবীর মানুষের কাছে সবচেয়ে উজ্জ্বল। এপ্রিলের শেষের দিকে একে আবার সূর্যাস্তের পর সন্ধ্যাবেলায় পশ্চিম আকাশে দেখা যাবে—কিন্তু এই সঙ্গে এর ঔজ্জ্বল্য ও পুচ্ছের দৈর্ঘ্য ক্রমশ কমে আসবে। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে খালি চোখে একে আর দেখা সম্ভবপর হবে না—এর পরে হ্যালির ধূমকেতু দেখা সম্ভবপর হবে শুধুমাত্র শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে।

হ্যালির ধূমকেতু আবার আসছে—এই আগমনীবার্তা সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীমহলে একটা সাড়া জাগিয়ে তুলেছে। কিন্তু কেন? তার কারণ হল, ধূমকেতুকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত। তাছাড়া বিজ্ঞানীদের দখলে এখন অতি আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম—শক্তিশালী দূরবীন, শক্তিশালী রেডিও-দূরবীন, মহাকাশযান প্রভৃতি। এইসব যন্ত্রপাতির সদ্ব্যবহার করে এবারের আবির্ভাবে হ্যালির ধূমকেতুর খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করতে না পারলে আবার ৭৬টি বছর অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে। যদি আরও অনেক ধূমকেতু নিয়মিতভাবে পৃথিবীর নিকট দিয়ে চলে যায়, তবুও সমস্ত দিক বিচার করলে হ্যালির ধূমকেতুর সঙ্গে তাদের কোন তুলনাই চলে না—ধূমকেতু রহস্যের কিনারা করতে হলে বিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে বেছে নেবেন হ্যালির ধূমকেতুকে। তাই ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দের আবির্ভাবের সঙ্গে একটা মস্ত বড় সুযোগ বিজ্ঞানীদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। সারা পৃথিবীর যত মানমন্দির রয়েছে, সেগুলিতে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে—প্রস্তুতি চলেছে হ্যালির ধূমকেতু পর্যবেক্ষণের জন্যে। এছাড়া গঠিত হয়েছে "ইণ্টারন্যাশনাল হ্যালি ওয়াচ" (International Halley Watch)—এটি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যত সব জ্যোতির্বিজ্ঞানী হ্যালীর ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ করবেন, সেইসব পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যাদির সমন্বয়ই হবে এই সংস্থার প্রধান কাজ। এই সংস্থার মূল কেন্দ্র হল, মার্কিন দেশের ক্যালিফোর্নিয়ার জেট প্রপালসন্ ল্যাবরেটরি।

তবে সবচেয়ে চমকপ্রদ খবর হল, এবারে হ্যালির ধূমকেতুর আগমনের সময় পৃথিবী থেকে স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান পাঠিয়ে তাকে অভ্যর্থনার অভিনব পরিকল্পনা। ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশ অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তাই অত্যন্ত শক্তিশালী দূরবীন দিয়েও তাকে পর্যবেক্ষণ করে তার গঠন ও উপাদান সংক্রান্ত তথ্য সঠিকভাবে সংগ্রহ করা খুব কঠিন কাজ। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাই এখন মহাকাশযান পাঠিয়ে মহাকাশের বাসিন্দাদের সম্পর্কে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সংগ্রহ করতে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। তাই ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দের হ্যালির ধূমকেতুর পুনরাগমন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে এক অপূর্ব সুযোগ। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার পরিকল্পনাও অনেক আগে থেকে রূপায়িত হয়েছে। এখন পর্যন্ত পাঁচটি মহাকাশযান উৎক্ষিপ্ত করার পরিকল্পনা এ ব্যাপারে আছে। এর মধ্যে দুটি হল জাপান থেকে—প্রথমটির নাম "এম্. এস্. টি৫", এটি মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে এই বছরের ৭ জানুআরি, আর হ্যালির ধূমকেতুর সবচেয়ে কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছবে আগামী ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ মার্চ। জাপানের দ্বিতীয় মহাকাশযানের নাম দেওয়া হয়েছে "প্ল্যানেট এ"—এর উৎক্ষেপণ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে এ বছরের ১৪ অগস্ট, এটি হ্যালির সবচেয়ে কাছে গিয়ে উপস্থিত হবে আসছে ৮ মার্চ। এই দুটি প্রকল্পই হবে গবেষক মহাকাশযান পাঠানোর ব্যাপারে জাপানের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা। এ ছাড়া "ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি" গত ৩ জুলাই একটি মহাকাশ-যান পাঠিয়েছেন, এর নাম দেওয়া হয়েছে "প্রোজেক্ট জিয়োটো" (Project Giotto)। এই পরিকল্পনা এমনভাবে করা হয়েছে যাতে করে স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযানটি একেবারে হ্যালির ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশ থেকে মাত্র ৪৮০ কিলো-মিটার দূরে দাঁড়িয়ে আগামী ১৩ মার্চ চার ঘণ্টা ধরে তার নিরীক্ষণ-কার্য চালাতে সমর্থ হবে—এ এক অভিনব পরিকল্পনা। তবে সবচেয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত মহাকাশযান পাঠাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে "ভেগা" (Vega)। ভেগা প্রকল্পে আছে দুটি পৃথক মহাকাশযান, "ভেগা-১" ও "ভেগা-২"—এদের উৎক্ষেপণ কার্য সমাধা হয়েছে যথাক্রমে ১৯৮৪

খ্রীষ্টাব্দের ১৫ ও ২১ ডিসেম্বর। এই দুটি মহাকাশযানকেই শুক্রগ্রহ ও হ্যালির ধূমকেতু উভয়েরই খুঁটিনাটি বিবরণ সংগ্রহের কাজে লাগানো হয়েছে। ১৭৫ দিন পরে শুক্রগ্রহের অন্ধকার দিক পাশ কাটিয়ে চলে যাবার সময় গত জুন মাসে দুটি মহাকাশযান থেকেই যন্ত্রপাতি সমেত দুটি আধার শুক্রগ্রহের উপরিতলে নিক্ষিপ্ত হয়েছে—এই আধার দুটি শুক্রগ্রহের তলের ওপর ধীরে ধীরে অবতরণ করে শুক্রের তলের নানারকম আলোকচিত্র ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তথ্য পাঠিয়েছে। আর মূল মহাকাশযান দুটি এখন শুক্রগ্রহকে অতিক্রম করে ধীরে ধীরে হ্যালির ধূমকেতুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে—ভেগা-১ মহাকাশযানটি আসছে ৬ মার্চ একেবারে হ্যালির ধূমকেতুর মুখোমুখি এসে উপস্থিত হবে, আর তার ৩ দিন পরেই ভেগা-২ গিয়ে পৌঁছবে। এই দুটি মহাকাশযানে যে সব সর্বাধুনিক সাজসরঞ্জাম আছে সেগুলোর পরিকল্পনা মিলিতভাবে সোভিয়েত, ফরাসী ও হাঙ্গেরিয় বিজ্ঞানীরা করেছেন। দুটি মহাকাশযানই হ্যালির ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশের ৯৬০০ কিলোমিটার দূর থেকে সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করবে। এই সবকটি মহাকাশযানেই যে-সব যন্ত্রপাতি থাকবে, তার দ্বারা ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশের আলোকচিত্র নেওয়া, ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশ যে-সব গ্যাসীয় উপাদানে গঠিত তাদের রাসায়নিক বিচার এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিমাপন সম্ভবপর হবে। এর মানেই হল ধূমকেতু সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যে সব তথ্যের কোনরকম সঠিক ধারণা নেই, সেইসব তথ্য জানা সম্ভবপর হয়ে উঠবে এইসব মহাকাশযান একেবারে হ্যালির ধূমকেতুর খুব কাছাকাছি পাঠিয়ে।

হ্যালির ধূমকেতু নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে ভারতও পিছিয়ে নেই। ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয়েছে "ইণ্ডিয়ান হ্যালি অবজারভেশন প্রোগ্রাম" (**Indian Halley Observation Programme**)—এর মূল কেন্দ্র হয়েছে বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিজিক্স। এই কর্মসূচি রূপায়ণে মাত্র ৬টি প্রতিষ্ঠান মুখ্য অনুসন্ধান পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করছে—এরা হল বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিজিক্স, নৈনীতালের উত্তরপ্রদেশ সরকারের মানমন্দির, রঙ্গাপুরের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মানমন্দির, বোম্বাইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ, আহমেদাবাদের ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি আর কলকাতার পজিসন্যাল অ্যাস্ট্রনমি সেণ্টার। এর মধ্যে প্রথম দুটি প্রতিষ্ঠানের দুটি ৪০ ইঞ্চি প্রতিফলক দূরবীন এবং রঙ্গাপুর মানমন্দিরের ৪৮ ইঞ্চি প্রতিফলক দূরবীন হ্যালির ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ কার্যের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করবে। বোম্বাই ও আহমেদাবাদের দুটি প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা উপরি-উক্ত ৩টি দূরবীনের সাহায্য নেবেন তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা কাজের জন্যে। কলকাতা শহরের আলো, ধোঁয়া ও ধুলো, দূরবীনের সাহায্যে হ্যালির ধূমকেতুর আলোকচিত্রগ্রহণ ও অন্যান্য বিবরণ সংগ্রহের প্রচণ্ড অন্তরায়। সেইজন্যে পজিসন্যাল অ্যাস্ট্রনমি সেণ্টার তাদের দুটি দূরবীন (একটি ১১ ইঞ্চি, অপরটি ১৪ ইঞ্চি) কলকাতার ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি গ্রামে বসাবার ব্যবস্থা করেছেন এবং এখান থেকে এই প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা তাঁদের হ্যালির ধূমকেতু নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ ১৯৮৫-র নভেম্বর মাস থেকে ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল পর্যন্ত চালিয়ে যাবেন। উটি এবং গৌরীবিদান্নুরে অবস্থিত দুটি রেডিও-দূরবীন দিয়েও হ্যালির পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা করা হয়েছে। জাতীয় স্তরে এই সমস্ত কার্যক্রম ইণ্টারন্যাশনাল হ্যালি ওয়াচ আন্তর্জাতিক সংস্থার সমন্বয়ে রূপায়িত হবে।

মহাকাশযান পাঠিয়ে এবং পৃথিবী থেকে শক্তিশালী দূরবীন ও রেডিও-দূরবীনের সাহায্যে আশা করা যায় যে, ধূমকেতুর উৎপত্তি এবং তার জীবনরহস্য সম্পর্কে অনেক নতুন নতুন তথ্য জানা বিজ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ? এই অসাধারণ ধূমকেতুটিকে দেখার সুযোগ পৃথিবীর মানুষের কাছে আসে ৭৬ বছর পর পর। তাই যাঁদের জীবনে একে দেখার সৌভাগ্য হয়, তাঁদের জীবনে সেটি এক পরম স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকে। আশা করা যায় যে, এবারের হ্যালির ধূমকেতুর পুনরাবির্ভাব সাধারণ দর্শককেও একেবারে নিরাশ করবে না।

পথের আলো

ডাক্তার কমলকান্ত ঘোষ
সাহিত্যসেবী।

বসুধার মোহজালে মায়াপাশে বাঁধা
করি যবে বিচরণ আপনারে ঘেরি'
অনিত্য বাসনা লাগি চিত্ত যবে আঁধা
দুঃখের আকর সম ধরণীরে হেরি।
যখন আপনা ভুলি' জগতের নাথে
জীবনের কেন্দ্রে মোর বসাই যতনে,
বাঁধি মোরে সদানন্দ চিন্ময়ের সাথে
রূপান্বিত হয় ধরা শান্তি-নিকেতনে।

অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে যিনি পরম অরূপ
বহুধা বিচিত্ররূপে দিয়াছেন ধরা,
চোখের সীমায় তার বিকৃত স্বরূপ
আমারে দেখায় পথ অলীক অপরা।
সত্যদ্রষ্টা পুরুষের জীবনের বাণী
আমারে দেখায় যেন ধ্রুবপথখানি॥

প্রণাম তোমায় হে সুন্দর

শ্রীশান্তশীল দাশ
সুখ্যাত কবি ও গীতিকার।

প্রণাম তোমায়, প্রণাম তোমায়,
প্রণাম তোমায় হে সুন্দর।
চির নূতনের রূপ ধরে তুমি
এস এ আর্ত ধরণী'পর।
মুছে দাও যত ব্যথা ও বেদনা,
কর প্রদীপ্ত জীবন রচনা;
শিব-সুন্দর-সত্যের পথে
হোক সে নিয়ত অগ্রসর।

জীবনের পথে কত-না আঁধার,
কত সংশয়, দীর্ঘশ্বাস।
আলো তুলে ধরো সে আঁধার পথে
অসুন্দরের হোক বিনাশ।
তোমার উজল প্রদীপটি হাতে,
তোমার নীরব বরাভয় মাথে
চলুক মানুষ অবিচল গতি
পরমের 'পরে সুনির্ভর।

মহাপুরুষ মহারাজের সান্নিধ্যে

শ্রীমতী ভাগীরথী দেবী

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের কৃপাধন্যা।

আজকের জীবনে কোন ঘটনাই তুচ্ছ নয়। ঘটনা আরও বেশি মূল্যবান হয়ে পড়ে, যদি সেটা কোন মহাপুরুষের সান্নিধ্য-বিজড়িত হয়। আমার মহা সৌভাগ্য যে, আমি এইরকম একজন মহাপুরুষের পূতসঙ্গ লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ মঠের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ,—রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে 'মহাপুরুষ মহারাজ' নামে পরিচিত।

পুরীর প্রবাসী বাঙালী ৺হরেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন আমার বাবা। রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের সঙ্গে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমাদের বাড়ি ছিল দোতলা, পুরীর বড় পোস্ট অফিসের পাশে। 'শশিনিকেতন' সেখান থেকে খুব কাছেই। সেইজন্য কোন সন্ন্যাসী সেখানে এলেই বাবা খবর পেতেন এবং গিয়ে সাধুসঙ্গ করতেন।

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের কাছে বাবার দীক্ষা হয় ১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে। আমি তখন শ্বশুরবাড়ি—দ্বারভাঙায়। পুরীতে এসে তাঁর দীক্ষার কথা জানতে পারি। বাবাকে বললাম, 'মহাপুরুষ মহারাজের কাছে আমিও দীক্ষা নেব।'

মহাপুরুষ মহারাজ তখন কলিকাতায়। তাঁকে বাবা আমার দীক্ষার জন্য অনুরোধ করে চিঠি লেখেন। উত্তরে মহাপুরুষ মহারাজ জানালেন, 'বিবাহিতা মেয়ের স্বামীর অমতে দীক্ষা হয় না। তুমি তার স্বামীর অনুমতি আছে জানালে, আমি পুরী গিয়ে তাকে দীক্ষা দিয়ে আসব।'

এ-খবর পেয়ে আমি স্বামীর কাছ থেকে মত নিয়েছিলাম দীক্ষার জন্যে। তাঁর অনুমতি পেয়েই বাবা মহাপুরুষ মহারাজকে চিঠি লিখলেন। তিনি জানালেন, 'আমরা শীঘ্রই ভুবনেশ্বরে যাচ্ছি। সেই সময় তোমার মেয়ের দীক্ষা হবে।'

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ। মহাপুরুষ মহারাজ আরও অনেক মহারাজকে নিয়ে ভুবনেশ্বরে এসেছেন। খবর পেয়েই বাবা, মা ও আমি ভুবনেশ্বর গেলাম। আমাদের গাড়ি লেট থাকায় আমরা পৌছলাম ১১৷৷০টা নাগাদ। মহাপুরুষ মহারাজ বাবাকে বললেন, 'আজ তো দীক্ষা হবে না। আজ তোমরা মঠে প্রসাদ পেয়ে পরের গাড়িতে পুরী ফিরে যাও। কাল আমরা পুরী এক্সপ্রেসে পুরী যাব এবং তোমাদের বাড়িতেই উঠব। আমরা প্রায় কুড়িজন সন্ন্যাসী যাব—তুমি সেইমতো ব্যবস্থা করো। তোমার মেয়ের দীক্ষা বাড়িতেই হবে।'

তার পরদিন সকাল ৭টা নাগাদ পুরী এক্সপ্রেসে ওঁরা সবাই আমাদের বাড়ি এলেন। যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মহাপুরুষ মহারাজ, বিজ্ঞানানন্দ-স্বামী, সুবোধানন্দ-স্বামী, শংকরানন্দ-স্বামী, বিশুদ্ধানন্দ-স্বামী, শর্বানন্দ-স্বামী এবং আরও অনেকে। আমার মনে পড়ছে না সূর্য মহারাজ গিয়েছিলেন কিনা।

সেদিন আমাদের বাড়িতে যে আনন্দের জোয়ার এসেছিল, তা এখনও আমার মানসপটে ভাসে। সকাল ৯৷১০টা নাগাদ আমার দীক্ষা হল। সঙ্গে আমার ছোট কাকা ও কাকিমারও দীক্ষা হয়েছিল। আমার অনেক দিনের আশা পূর্ণ হয়েছিল সেদিন।

আমার বেশ মনে আছে, দীক্ষান্তে আমি মহাপুরুষ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আমি

বড় একান্নবর্তী পরিবারের বউ; আমার অনেক দায়িত্ব; আমি বসে পুজো করবার সময় পাব কি করে?' তিনি বললেন, 'রাত্রে সব কাজ শেষ করে যখন শুতে যাবে, তাঁর নাম দশবার জপ করো। আমি বীজ পুঁতে গেলাম, কালে সময় হলে সব হবে।' তাঁর সে সান্ত্বনা আমাকে যে কি শান্তি দিয়েছিল, তা আর কি বলব! তা আজও আমাকে অনুপ্রাণিত করে।

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে পুনরায় দর্শন হয়েছিল ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বম্বেতে। তখন তিনি খার রোডের মঠে ছিলেন। তিনি আমাকে ও আমার মেজোবোনকে মঠে প্রসাদ পাওয়ার জন্য আসতে বলেছিলেন। আমরা একদিন সকাল ১১টা নাগাদ মঠে পৌছেছিলাম—ফিরেছিলাম সন্ধ্যা ৬টায়। সমস্ত দিনটাই তাঁর পূত সঙ্গে, আলাপ-আলোচনায় কেটেছিল। তাঁর সেদিনের একটি কথা আজও আমার মনে আছে। তিনি বলেছিলেন, 'মা, নিজের ছেলেমেয়েকে তো সবাই ভালবাসে—দেখছ না পশু-পক্ষীদের। সবাইকে নিজের মনে করে ভালবাসবে। তাতেই শান্তি, তাতেই আনন্দ।'

পালা বদল

শ্রীপ্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবীণ কবি।

সর্বভূতে স্থিতি মা তোমার
যে রূপেতে, নাম ভ্রান্তি,*
সবারে তাই তো ভুলিয়ে বেড়াও,
নাহিক সে কাজে ক্ষান্তি।
তুমি মা সাত্ত্বিকী তুমি রাজসী,
ক্ষেত্র বিশেষে তুমিই মা তামসী,
তাই তো দেবেরা প্রণতি জানায়ে
তিনবার,* পায় শান্তি।

বহু প্রণামেও মর্ত্যজনেরে
ভুলাও নিজের কান্তি,
মজা পাও তুমি এরূপ লীলায়
কভু নাই তব শ্রান্তি।

দেখি যবে লোক চায় ভুলিবারে
জীবনে সব ভুল পাপ-তাপেরে
স্মরণ করিয়ে বুঝি মজা পাও,
ঘটাও না সেথা ভ্রান্তি।

তনয় চাহে নিঠুর লীলা তব
কিছুকাল হোক ক্ষান্তি,
ভুলাও তাহারে আর সব কিছু
স্মরাও ওরূপ কান্তি।
পালা বদলের পালা এসে গেলে
বিপরীতে পেয়ো মজা অবহেলে
ভ্রান্ত না ক'রে তনয়ে তখন
মেনে নিও নিজ ভ্রান্তি।

* যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ (শ্রীশ্রীচণ্ডী)

সহস্র-দ্বীপোদ্যানে স্বামী বিবেকানন্দ

মারি লুইস্ বার্ক

Swami Vivekananda in the West : New Discoveries, The World Teacher, (Part one), Vol. III, (3rd Edition, 1985) গ্রন্থের 'Thousand Island Park' পরিচ্ছেদের অংশবিশেষ (পৃঃ ১১৭—১১)। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত।

স্বামীজী যখন শ্বেত পর্বতমালা ছেড়ে সহস্র-দ্বীপোদ্যানে এলেন তখন তাঁর অত্যুচ্চ এক আধ্যাত্মিক অবস্থা। অন্তরে যেমন আনন্দ তেমন শক্তি। যেন গভীরতম সমাধি তাঁর করায়ত্ত ছিল, তবু তার মুক্ত দ্বারপ্রান্ত থেকে স্বেচ্ছায় ফিরে এলেন লোকশিক্ষার জন্যে। এত উন্নত আধ্যাত্মিক অবস্থা, তবু যেন এক ভয়-ভাবনাহীন শিশু। অবশ্য এ দুই অবস্থা তো সমগোত্রীয়। তাঁর স্বাস্থ্য? তাও খুব ভাল। শহরের কাজের যে উত্তেজনা, তা আর নেই। চিত্ত ছুটে চলেছে ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতরে ঈশ্বরের দিকে। তার সঙ্গে সঙ্গে দেহ-মনেও আরাম নেমে এসেছে। এই সহস্র-দ্বীপোদ্যান থেকে জুলাই-এর গোড়ার দিকে এক চিঠিতে বেটি স্টার্জিস্‌কে স্বামীজী লিখছেন—'পৃথিবীর যত ঘুম সব আমাকে পেয়ে বসেছে। দুপুরে কমপক্ষে দু-ঘণ্টা আমি ঘুমুই। আর সমস্ত রাত ঘুমুই মড়ার মতো। এ আর কিছু নয়—নিউইয়র্কে যে এতদিন ঘুমুইনি, এ তারই প্রতিক্রিয়া। আমি একটু-আধটু লেখাপড়া করি, আর রোজ সকালে প্রাতরাশ সেরে একটা করে ক্লাস নিই। এখানে আমাদের খাওয়া-দাওয়া নির্ভেজাল নিরামিষ। আমি আবার প্রায়ই না খেয়ে থাকি। ওজন কমাবার চেষ্টা করছি। এ জায়গা ছেড়ে যাবার আগে যাতে আমার কয়েক পাউণ্ড মেদ ঝরে যায় সেজন্যে আমি কৃতসংকল্প।' বছরের গোড়ার দিকে নিউইয়র্ক থেকে এক চিঠিতে মেরি হেলকে স্বামীজী লিখেছিলেন যে, তাঁর ইচ্ছে ত্রিশ-চল্লিশ পাউণ্ড ওজন গ্রীষ্মের আগেই কমিয়ে ফেলা। পাছে মেরি হেল ভাবেন এতে স্বামীজীকে বিশ্রী দেখাবে, তাই তাঁকে একটু আশ্বাস দিয়ে এও লিখেছিলেন—'আমার যা উচ্চতা এতে বেমানান কিছু হবে না।'

সহস্র-দ্বীপোদ্যানে আসার সপ্তাহখানেকের মধ্যে স্বামীজী মেরি হেলকে দুখানা চিঠি লেখেন। 'বাণী ও রচনায়' এই চিঠি দুখানার তারিখ ২৬ জুন, ১৮৯৫। কিন্তু স্বামীজী নিশ্চয়ই একই দিনে এই চিঠি দুখানা লেখেননি, কয়েক দিনের ব্যবধানে লিখেছিলেন। যেটা তাঁর প্রথম চিঠি বলে অনুমান তার সুর একটু সাধারণ। তাতে লিখছেন—'এ পর্যন্ত সহস্র-দ্বীপোদ্যানে উল্লেখ-যোগ্য কিছু ঘটেনি। প্রাকৃতিক দৃশ্য চমৎকার। যখন ইচ্ছে হয়, বন্ধু-বান্ধব যারা এখানে আছে তাদের সঙ্গে ঈশ্বর ও আত্মা নিয়ে আলোচনা করি। আমি দুধ ফল এই সব খাই, আর মোটা মোটা বেদান্ত সম্বন্ধে সংস্কৃত বই পড়ি। এ সব বই ভারত থেকে পাঠিয়েছে।'

ঐ চিঠিতেই আবার দার্শনিকের সুরে কথাও বলছেন। যেমন কথা আমরা 'দেববাণীর' মধ্যে প্রচুর পাই। যতই অন্ধকার নেমে আসছে, জীবন শেষ হয়ে আসছে, ততই জীবন যে মূল্য-হীন, তা বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছি জীবন স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। কেন লোকে এটা মানতে চায় না তাও বুঝি। তাদের অভ্যাস হচ্ছে, যা অর্থহীন, তার মধ্যে অর্থ খুঁজে বের করা।...বাসনা, অজ্ঞতা আর ভেদবুদ্ধি এই তিনটি নিয়েই মানুষের বন্ধন।

মুক্তি? জীবনকে অস্বীকার, জ্ঞান ও সম-দর্শিতা—এই তিন নিয়ে মুক্তি। আর মুক্তিই হচ্ছে সমস্ত বিশ্বের লক্ষ্য।

২৬ জুনের দ্বিতীয় চিঠিতে দেখি স্বামীজীর আর-এক রূপ। এই চিঠিতে তিনি ব্রহ্মজ্ঞ পরমহংস। আকস্মিকভাবে পত্রের আবরণ ভেদ করে তাঁর এই রূপের আত্মপ্রকাশ। তিনি লিখছেন—'আশ্চর্য এক প্রশান্তি আমার মনের উপর নেমে আসছে। যতই দিন যাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি আমার "কর্তব্য" বলে কিছু নেই। আমি অনন্ত শান্তি ও বিশ্রামের মধ্যে ডুবে আছি। কাজ যা করার তিনি করেন। আমরা নিমিত্ত মাত্র। কাম, কাঞ্চন বা যশের মোহ আপাততঃ আমার ঘুচে গেছে। ভারতে আমার যে মনের অবস্থা ছিল, সেই মনের অবস্থা এখানে ফিরে এসেছে। এই অবস্থায় আমার ভেদবুদ্ধি বলে কিছু নেই, এখন ধর্ম-অধর্ম দুই-ই আমার কাছে সমান; যত ভ্রান্তি, যত অজ্ঞানতা দূর হয়ে গেছে, আমি গুণাতীত অবস্থায় পৌঁছেছি। আমি কোন্ আইন মানব, আর কোন্ আইন মানব না? এই অবস্থায় জগৎ আমার কাছে অসার। জলকাদার ডোবা যেমন। হরি ওঁ তৎ সৎ। শুধু তিনিই নিত্য, আর সব অনিত্য। প্রভু, আমি তোমাতে আছি, তুমিও আমাতে আছ। তুমি আমার চির-আশ্রয়! শান্তি, শান্তি, শান্তি।'

তাঁর মনের এই উচ্চ ভূমি থেকে স্বামীজী নেমে এলেন সহস্র-দ্বীপোদ্যানে তাঁর শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে। সবসমেত বারোজন এসেছেন তাঁর কাছে। স্বামীজীর উদ্দেশ্য, 'এদের অদ্বৈত-অনুভূতির সাথে পরিচয় করে দেওয়া।' এঁরা এই শিক্ষা পেয়ে তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর কাজ চালিয়ে যাবেন, এই ছিল তাঁর আশা। কতটা তাঁরা অদ্বৈত-অনুভূতি নিতে পারবেন, তা তিনি জানতেন না না জানলেও লাভ-ক্ষতি ছিল না কিছু। পরে আমরা দেখি স্বামীজী নিজে বলছেন যে, এই সহস্র-দ্বীপোদ্যানে থাকাকালে ঐশ্বরিকভাবে তিনি ডুবে থাকতেন। এই সময়ে তাঁর মধ্যে এক আধ্যাত্মিক শক্তি সর্বদা জাগ্রত থাকত। এই শক্তি তিনি সকলের মধ্যে চালিত করে গেছেন। তাঁর শিষ্য-শিষ্যা তাঁর বাণীর অনুলিখন রেখে গেছেন। এই সময়কার স্মৃতি-কথাও তাঁরা রেখে গেছেন। এইগুলি সেই শক্তির সাক্ষ্য দেয়। জুলাই মাসে তাঁর মাদ্রাজী শিষ্য আলাসিঙ্গাকে লিখছেন—'প্রতিদিন আমি আমার মধ্যে শক্তির জাগরণ লক্ষ্য করছি।' যে শক্তি স্বামীজীর মতো পুরুষের মধ্যে প্রকাশ পায়, তা বিশেষ কোন স্থান-কালের জন্যে নয়। মিস্ ডাচারের কুটিরে স্বামীজীর অবস্থান একটা উপলক্ষ মাত্র। এই উপলক্ষকে কেন্দ্র করে এক সুদূর-বিস্তারী আধ্যাত্মিক শক্তির তরঙ্গ উত্থিত হল। সেই তরঙ্গ সমস্ত আমেরিকাবাসীর অন্ত-স্তলকে প্লাবিত করে দিয়ে গেল। স্বামীজী যে শিক্ষা দিলেন তা তাঁর সামনে যে কয়জন আমেরিকান উপস্থিত ছিলেন শুধু তাঁদের জন্যে হতে পারে না। তার প্রভাব শুধু তাঁদের মধ্যে বা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। তার প্রভাব বস্তুতঃ অনন্তকালের জন্যে। তার প্রভাব যুগ যুগ ধরে আমেরিকানদের মধ্যে ছড়িয়ে থাকবে। তিনি ঐ কয় সপ্তাহে যে শিক্ষা দিয়ে গেলেন তা সমস্ত আমেরিকাবাসীর সম্পদ। স্বামীজী দিনরাত পরিশ্রম করে ঐ বারোজন শিষ্য-শিষ্যাকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। এ

নয়, শক্তিসঞ্চার। এই শক্তি এসেছে তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতির শীর্ষভূমি থেকে এই শক্তি ঐ বারোজনকে অতিক্রম করে বহু নর-নারীর মধ্যে প্রবেশ করেছে, তাদের জীবনকে পালটিয়ে দিয়ে গেছে। তার ব্যাপ্তি অনন্ত-কালের জন্যে, অগণিত নরনারীর জন্যে। কী ভাগ্যবান ঐ বারোজন শিষ্য-শিষ্যা! নিশ্চয়ই তাঁরা ভেবে উঠতে পারেননি কি করে তাঁরা এই ভাগ্যের অধিকারী হলেন! এই প্রশ্ন শুধু তাঁদের নয়, আমাদেরও। বস্তুতঃ এই প্রশ্নের উত্তর নেই।

জীবন দিয়ে লেখা সাহিত্য

স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ

অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেন্টস্ হোম, বেলঘরিয়া (কলিকাতা)। উদ্বোধন কার্যালয়ে বিগত ২৬ জানুআরি ১৯৮৪, অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণ। ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক টেপরেকর্ড থেকে প্রতিলিখিত।

সাহিত্য তো প্রায় ভুলে গেছি—তবে এক সাহিত্যের কথা বলতে পারি যা জীবন দিয়ে লেখা। স্বামী শিবানন্দ একদিন ললিত মহারাজ (স্বামী কমলেশ্বরানন্দ) প্রভৃতি কয়েকজন সাধুকে বললেন, 'কি পড়ছ?' উত্তর এল, 'উপনিষদ্ পড়ছি।' শিবানন্দজী বললেন, 'আমাদের জীবন পড়তে পার? আমাদের জীবনই উপনিষদ্।' বস্তুতঃ উপনিষদ্ থেকে লোকে যেমন শেখে এই সব জীবন দেখে লোক তেমনিই জীবন গড়তে শেখে।

এ-যুগের 'ব্যাস-ঠাকুর' স্বামী সারদানন্দজী যে ভাগবত, অর্থাৎ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে তাঁর দেখা ঠাকুরের জীবন বিশ্লেষণ করে লিখে গেছেন, তা-ই এ-যুগের সাহিত্য। এরকম জীবনী কোন অবতারের নেই। অতি বড় সন্দিগ্ধ-চিত্ত ব্যক্তিও যদি এই গ্রন্থ পড়ে, সে সংশয় থেকে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। ধরুন—'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং এই শরীরে রামকৃষ্ণ—তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়'—এ-সব কথা এঁরা লিখে না গেলে আমাদের সন্দেহ ঘুচত না।

আবার দেখুন, ঠাকুর বলে গেলেন, 'ভগবান-লাভই মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য',—আর স্বামীজী আমাদের কাজ, স্কুল, হাসপাতাল করার কথা বললেন। আপাতদৃষ্টিতে এ দুই শিক্ষা পরস্পরবিরোধী মনে হলেও, তা নয়। ঠাকুর হলেন বেদ, স্বামীজী তাঁর ভাষ্য। ঠাকুর অর্ধ-বাহ্যদশায় বললেন, 'জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা'; একথা শুনে স্বামীজী বললেন, 'ভগবান যদি কখনও দিন দেন, তবে আজ যাহা শুনিলাম, পণ্ডিত-মূর্খ-ধনী-দরিদ্র-ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলকে তাহা শুনাইব।' পরে রচনা করলেন, 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?' স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখলেন, 'দরিদ্র-দেবো ভব মূর্খদেবো ভব',—আর তারই ফলে পরে অখণ্ডানন্দজী ঘাসপাতা খেয়ে দুর্ভিক্ষে সেবা করে বেড়ালেন—এমনই হৃদয়বত্তা। এই সব জীবন, আর এঁদের লেখাই তো সাহিত্য—যা থেকে জীবন গড়ে নেওয়া যায়।

বড় বড় ঐতিহাসিক—রমেশ মজুমদার, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, কালিকিঙ্কর দত্ত—এঁরা লিখেছেন 'Advanced History of India' গ্রন্থে: শ্রীরামকৃষ্ণের কোন উপদেশই বোরোয়নি তাঁর অনুমোদন ছাড়া; তাঁরা আরও বলেছেন,—কর্মযোগ অধ্যাত্মজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। অখণ্ডানন্দজী প্রমদাদাসবাবুকে লিখছেন, 'জীবনে যখন কাজ ছাড়া থাকা যায় না, তখন লোক-কল্যাণকর কাজই করব।' কর্মযোগে স্বামীজী কর্মেরই স্তুতি করেছেন—অবশ্য যে কর্ম বহুজন-হিতায়। সামনে আদর্শ জীবন দেখলে, তবে তো জীবন গঠন করা যায়।

তা ছাড়া ভগবানের নামই রামকৃষ্ণ-বিবেকা-নন্দ সাহিত্যের চরম কথা। স্বামীজী লিখেছেন ঠাকুরের নামের কথা—যা 'কৃত্যং করোতি কলুষং'—পাপকে পুণ্য করে দেবে। আর শুনেছি শ্রীশ্রীমা তাঁর এক মন্ত্রশিষ্যকে বলেছিলেন, 'দেখ বাবা, ঠাকুর বলেছেন (নিজের শরীর

দেখিয়ে), যে দিনান্তে দশবার এর নাম করবে সেই মুক্ত হয়ে যাবে।' শরৎ মহারাজ (স্বামী-সারদানন্দ) একথা শুনে বললেন, 'ঠাকুরের মুখের কথা—তারপর মায়ের কাছে শুনেছ তা কি মিথ্যে হয়, তবে তুমি দশবার জপ করে থামতে পারবে না,—দশবার করে সুখ হয় না—নেশা আছে তো?' নিজে শুনেছি স্বামী শিবানন্দজী বলছেন, এক শিষ্যকে, 'জপ ১০।১২ বারের কম যেন না হয়।'

খাদ্যের কথায় স্বামী শিবানন্দজী বলেছেন, 'যা পাবে খাবে, তবে শোর-গরুটা খাবে না, কিন্তু প্রসাদ বলে দিলে তাও জিভে ঠেকাবে।' শুনেছি পূজনীয় 'বাবা' (স্বামী অখণ্ডানন্দ)ও তাঁর এক শিষ্যকে বলেছিলেন, 'রবিবারে নিরামিষ খাবে', তবে প্রসাদের কথা জিজ্ঞাসা করায় লিখলেন—'ভগবানের প্রসাদ হলে যে-কোন দিন যে-কোন অবস্থায় যে-কোন বস্তু গ্রহণ করতে পার।' এই সব পড়লেই তো আমরা আচারে-ব্যবহারে ঠিক মতো অনুসরণ করে চলতে পারি।

ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে সাহিত্যের বই-ই জীবনে রূপায়িত হয়েছে, লেখাও রূপায়িত হয়েছে। গিরিশবাবুর রচনাগুলিই দেখুন না —যেন নিজের জীবনের রক্ত দিয়ে লেখা। এ ব্যক্তি কি ছিলেন—কি হলেন! এক সের দুধে তিন সের জল, এই জল মারতে ঠাকুরকে কিই না করতে হয়েছে।

আবার কাশীপুরে ঠাকুর কত লীলা করেছেন! শরীর ছাড়লেও তিনি শ্রীশ্রীমাকে দেখা দিয়ে বললেন, 'আমি আর কোথায় গেছি, এ ঘর আর ও ঘর।'

এই সব রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য পড়লে আনন্দ পাবেন। এর সাহায্যে সত্যকে উপলব্ধি করতে পারবেন।

আপনারা এসেছেন, বেশি করে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের অনুধ্যান হোক। তাঁর কৃপায় সকলের মধ্যে সত্য অগোণে প্রতিভাত হোক। ঠাকুরের কাছে এই আমার প্রার্থনা।

সদ্ এবং কু সকল প্রকার ভাব উপলব্ধি করিলেও, মানুষ তাহার অন্তরের আদর্শবিশেষকে প্রকাশ করিতেই সর্বদা সচেষ্ট রহিয়াছেন। আদর্শবিশেষের উপলব্ধি ও প্রকাশ লইয়াই মানব-দিগের ভিতর যত তারতম্য বর্তমান। দেখা যায়, সাধারণ মানব রূপরসাদি ভোগসকলকে নিত্য ও সত্য ভাবিয়া তল্লাভকেই সর্বদা জীবনোদ্দেশ্য করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে,—They idealise what is apparently real. **পশুদিগের সহিত তাহাদের স্বল্পই প্রভেদ। তাহাদিগের দ্বারা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসৃষ্টি কখনই হইতে পারে না। আর এক শ্রেণীর মানব আছে, যাহারা আপাতনিত্য ভোগসুখাদিলাভে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া উচ্চ উচ্চতর আদর্শসকল অন্তরে অনুভব করিয়া বহিঃস্থ সকল বিষয় সেই ছাঁচে গড়িবার চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে,—**They want to realise the ideal,—**ঐরূপ মানবই যথার্থ সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে। উহাদিগের মধ্যে আবার যাহারা সর্বোচ্চ আদর্শ অবলম্বন করিয়া উহা জীবনে পরিণত করিতে ছুটে, তাহাদিগকে প্রায়ই সংসারের বাহিরে যাইয়া দাঁড়াইতে হয়। ঐরূপ আদর্শ জীবনে পূর্ণভাবে পরিণত করিতে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবকেই কেবলমাত্র দেখিয়াছি—সে-জন্যই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকি।**

—স্বামী বিবেকানন্দ

যে-সব রোগ রোগীর দোষে নয়

ডক্টর জলধিকুমার সরকার

কলিকাতা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ভাইরলজি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থার ভাইরাসজনিত রোগ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সমিতির ভূতপূর্ব সদস্য।

"পরশু ঠাণ্ডা লাগাতে বারণ করেছিলাম, হল তো সর্দি?" "সেদিন নেমন্তন্ন খাওয়ার পরেই পেট খারাপ হল"—এই ধরনের কথার মধ্যে যে খানিকটা সত্য আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সব রোগই কি আমাদের দোষে হয়? অর্থাৎ আমরা দোষ না করলে কি কোন অসুখই হবে না?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের একটু গোড়ার কথায় আসতে হবে। রোগ প্রতিরোধের প্রশ্নে, রোগের মূল কারণগুলি মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত পর্যায়গুলিতে আলোচনা করা যেতে পারে:

(ক) 'ইন্‌ফেক্‌সন (Infection)—যার অর্থ হল যে বাইরে থেকে অতিক্ষুদ্র জীব শরীরে ঢোকার ফলে অসুখের সৃষ্টি। এদের মধ্যে আছে (১) ব্যাক্‌টিরিয়া (Bacteria) বা জীবাণু যাদের খালি চোখে দেখা যায় না। এরা টাইফয়েড, কলেরা প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি করে। প্রধানতঃ খাদ্য, পানীয় বা নিঃশ্বাসের মাধ্যমে এরা শরীরে প্রবেশ করে। (২) ভাইরাস (Virus) বা জীব-পরমাণু, যারা জীবাণুর চেয়ে ছোট। এদের দ্বারা বসন্ত, জণ্ডিস, পলিওমায়েলাইটিস প্রভৃতি অসুখের সৃষ্টি হয়। কয়েকটি ভাইরাস (যেমন জাপানীজ এন্‌কেফালাইটিস ভাইরাস) মশকের কামড়ের মাধ্যমে,কয়েকটি বা (যেমন এড্‌স-AIDS ভাইরাস) পূর্বব্যবহৃত ইন্‌জেক্‌সনের সূচের মাধ্যমে শরীরে ঢোকে। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীর মাধ্যমে খুব খারাপ ধরনের কিছু ব্যাক্‌টিরিয়া বা ভাইরাস সমাজে ছড়িয়ে পড়া (Nosocomial infection) সম্প্রতি উন্নত দেশগুলির একটা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। (৩) কৃমিজাতীয় প্রাণী যেমন হুকওয়ার্ম, অ্যামিবিক আমাশয়, ফাইলেরিয়া প্রভৃতি রোগের কারণ। (৪) ফাঙ্গাস (Fungus)—যাদের দ্বারা চর্মরোগ হয়।

এইসব জীবাণু বা জীবপরমাণুগুলি কিভাবে শরীরে ঢোকে,তা জানা থাকলে এ-বিষয়ে খানিকটা সাবধানতা নেওয়া যায়। প্রতিষেধক টিকা নিলে, অথবা বিশুদ্ধ পানীয় জল খেলে (যেমন জণ্ডিস রোগের ক্ষেত্রে) অনেকটা কাজ হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সব কারণের নিবারণ কি সম্ভব?

(খ) পুষ্টির অভাবজনিত রোগ। উপযুক্ত শ্রেণীর ভাল পুষ্টিকর খাদ্য পরিমাণ মতো খেলে এবং শরীরে ভিটামিন বা প্রয়োজনীয় ধাতব পদার্থ গেলে রিকেট প্রভৃতি রোগ হয় না।

(গ) হজম কার্যের বৈকল্যজনিত এবং চর্বি-জাতীয় খাদ্যের প্রাচুর্যে রক্তনালীর দেওয়ালে পরিবর্তনের ফলে হৃৎপিণ্ডে বা মস্তিষ্কে রক্তচলাচল ব্যাহত হয়ে 'স্ট্রোক্' হতে পারে।

(ঘ) নলপথবিহীন গ্রন্থিগুলির (Endocrine glands) বৈকল্যের ফলে ডায়াবেটিস, গয়টার, রক্তচাপের প্রাবল্য প্রভৃতি অসুখ হতে পারে।

(ঙ) অ্যালার্জি (Allergy) বা শরীরের অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। একই দ্রব্যে আবার সকলের অ্যালার্জি হয় না।

(চ) মাতা ও পিতার পূর্বপুরুষ হতে প্রাপ্ত জন্মগত রোগ—হাঁপানি, কয়েক ধরনের রক্তাল্পতা হৃৎপিণ্ডের বৈকল্য প্রভৃতি।

(ছ) বার্ধক্যজনিত—পূর্বে[১] বলা হয়েছে যে,

---

১ উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

বার্ধক্য কোন রোগ নয়। তবে অনেক সময় বার্ধক্যের সঙ্গী হয়ে আসে চোখে ছানিপড়া প্রভৃতি কয়েকটি রোগ।

(জ) অসাংঘাতিক (Benign) টিউমার ও মারাত্মক (Malignant) ক্যান্সার—এদের কারণ আজ পর্যন্ত সঠিকভাবে না জানার জন্য, 'বেশি ধূমপান খারাপ' প্রভৃতি উপদেশ ছাড়া রোগীর দোষ সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ আলোচনার প্রশ্নই উঠে না।

(ঝ) ওষুধজনিত বা চিকিৎসকজনিত (Iatrogenic) রোগ—বিষয়টির গুরুত্ব দিন দিন নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করছে বলে, এখানে কিছুটা আলোচনা করা দরকার। ওষুধের একমাত্র কাজ হল রোগের বা রোগকষ্টের নিবারণ। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ওষুধমাত্রেরই শরীরে কিছু না কিছু কুফল আছে, তবে মাত্রায় কম বেশি। বিপদ তখনই হয়, যখন এই কুফল মারাত্মক ধরনের হয়। প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক যে, কুফল জেনেও এদের প্রয়োগ করা হয় কেন? হয়, অধিক অপকারী রোগের ধ্বংসের জন্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই কুফল চিকিৎসকের জানা; যেমন ধরা যাক টাইফয়েড রোগে ক্লোরাম্ফেনিকল (যার একটি কোম্পানির ওষুধের নাম 'ক্লোরোমাইসেটিন') ওষুধের প্রয়োগ, যার ফলে কচিৎ সাংঘাতিক ধরনের রক্তাল্পতা হতে পারে; অথবা বসন্ত বা জলাতঙ্ক রোগে টিকার প্রয়োগ যার দ্বারা খুব অল্পসংখ্যক রোগীর মারাত্মক ধরনের মস্তিষ্কের প্রদাহ (encephalitis) হওয়ার সম্ভাবনা। তবুও এইসব ওষুধের ব্যবহার চালু আছে। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে, সকল ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ নতুন আবিষ্কৃত ওষুধের ক্ষেত্রে সব-রকমের কুফল চিকিৎসকের জানা সম্ভব নয়। আবার বিজ্ঞাপনের আতিশয্যে যে চিকিৎসকের মনে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে না, সে কথাও জোর করে বলা যায় না। তবে মনে রাখা দরকার যে, আমরা জীবনে যে-কোন কাজ করতে যাই না কেন, সবকিছুর মধ্যেই বিপদের সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে ("Risks are among the facts of life.")। দীর্ঘমেয়াদী বিপদের আশঙ্কা (যেমন কোন ওষুধের ব্যবহারের ফলে কয়েক বৎসর পরে শরীরে ক্যান্সারের সৃষ্টি হতে পারে কি না) বিবেচনা করতে গিয়ে উন্নত দেশগুলিতে অনেক সময় নব আবিষ্কৃত ওষুধ চালু হতে বহু বৎসর অপেক্ষা করতে হয়। সেরূপ ক্ষেত্রে কোন কোন ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি দ্বারা ভিন্ন নামে অনুন্নত দেশে সেই সব ওষুধ চালু করার চেষ্টার কথাও শুনা যায়। তাছাড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কি সব সময়, সব মীমাংসার নিষ্পত্তি হয়? কারণ ল্যাবরেটরিতে জন্তুদেহে পরীক্ষার ফলাফল মানুষের শরীরে সমভাবে প্রযোজ্য না হতেও পারে! ওষুধজনিত অসুখ সম্বন্ধে আর-একটি বিপদের কথা আনছি না; সেটি হল—কোন কোন ক্ষেত্রে শরীরে আপাত-নিরাপদ ওষুধেও অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হওয়া, যার কথা অন্য সূত্রে আগে বলা হয়েছে। পেনিসিলিন ইন্জেক্সন নিয়ে মৃত্যু হওয়ার কথা অনেকের অজানা নয়।

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের অসুখবিসুখের অধিকাংশ, প্রত্যক্ষভাবে আমাদের দোষ বা অবহেলার জন্য নয়। অবশ্য সহজবোধ্য কারণেই পূর্বজন্মকৃত অপরাধ বা প্রারব্ধের কথা (বিশেষতঃ মাতা ও পিতার পূর্বপুরুষ হতে প্রাপ্ত অসুখের ব্যাপারে) এখানে আনা হচ্ছে না। তবে এটা ঠিক যে, অসুখের সৃষ্টি সম্বন্ধে ব্যক্তিগত জ্ঞানলাভের ফলে এবং সমষ্টিগত, সামাজিক ও সরকারি চেষ্টায় বেশ কয়েকটি অসুখকে বাধা দেওয়া সম্ভব।

পথ ও পথিক

স্বামী চৈতন্যানন্দ

স্বাধীনতা

সবাই ব্যক্তি স্বাধীনতা চায়। বহু বুকের রক্ত ঝরিয়ে, আন্দোলন করেই পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশের স্বাধীনতা এসেছে। ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বর্তমানে আমরা স্বাধীন। কিন্তু আমরা ব্যক্তি স্বাধীনতা কি পেয়েছি? সারা পৃথিবীর কোথাও ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে কি কিছু আছে? জোর দিয়ে কি বলতে পারি আমরা ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীন? পারি না। কারণ সামাজিক নানা প্রথা, মানসিক নানা চিন্তা-ভাবনা আমাদের স্বাধীনতা খর্ব করছে দিবারাত্র। আমরা চাইছি সমস্ত বাধা-নিষেধের গণ্ডী পেরিয়ে যেতে, কিন্তু পারছি না। কোথায় যেন আষ্টেপৃষ্ঠে আমাদের বেঁধে রেখেছে। তবু আমরা সর্বদা স্বাধীনতা চাই। কারণ স্বাধীনতা যে আমাদের স্বভাবজাত।

নারী চাইছে পুরুষের নির্যাতন থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনভাবে সুখময় জীবনযাপন করতে। পুরুষ চাইছে নারীকে নিজের অধীনে রাখতে। নারী চাইছে পুরুষের সমকক্ষ হতে—পোশাকে-পরিচ্ছদে, চলনে-বলনে, শিক্ষায়-দীক্ষায়। উভয়ের মধ্যে চলছে জোর প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়া কি স্বাধীনতা?

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, অফিস-কাছারিতে, হাসপাতালে, ডাক-তার বিভাগে, কলকারখানায় প্রভৃতি সর্বত্র দাবি আদায়ের হুমকি। আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক—অধিকার আছে আমাদের ন্যায্য দাবি আদায় করার! দাবি আদায় করতে গিয়ে যদি জাতীয় সম্পদ নষ্ট হয়, ধ্বংস হয়—তা হবে! জাতীয় সম্পদ নষ্ট করে দাবি আদায়ের অপচেষ্টাকে কি স্বাধীনতা বলে?

আমরা স্বাধীন! রাস্তা জুড়ে পথযাত্রা করব! তাতে অন্য পথযাত্রীদের কারুর অসুবিধা হতে পারে তা আমাদের দেখার দরকার নেই। আমরা যেটা চাইছি তা স্বাধীনভাবে করতে পারছি কিনা সেটাই কেবলমাত্র আমরা দেখব। অপরের যাত্রাকে ব্যাহত করে যাওয়াটাই কি স্বাধীনতা?

পূজার নামে বাহ্যাড়ম্বর করে লোককে দেখাব। এই আড়ম্বরের পূজা করতে আমাদের প্রচুর টাকার প্রয়োজন। খরচ করার এত টাকা আমাদের নেই। এই টাকা চাঁদা হিসাবে জনসাধারণের কাছ থেকে আমরা আদায় করব। যে সহজে না দেবে তাকে ভিটামাটি চাটি করে ছেড়ে দেব। আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে—স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যে একটি কথা বলবে তাকে প্রয়োজনবোধে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতেও আমরা দ্বিধা করব না। অতএব আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করো না! করলে কাউকে ছেড়ে কথা বলব না। এতে তোমাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে কিনা তা তোমরা ভাব গে। তোমাদের স্বাধীনতা আমরা দেখতে যাব না। তোমাদের বাড়ির বারান্দা আছে, আমরা দল বেঁধে তাস-কেরাম খেলব! তোমরা কিছু বলতে পারবে না! বললে ঠেঙাব। তোমরা বাড়ি করেছ, বেশ করেছ—শুধু তোমরা একা একা ভোগ করবে কেন? তোমাদের তো এত স্বার্থপর হওয়া উচিত নয়! অতএব জোর করে তোমাদের বারান্দা আমরা

ব্যবহার করব। আমরা স্বাধীন! আমাদের যা খুশি তাই করতে পারি! অপরের উপর অত্যাচার করার নাম কি স্বাধীনতা?

আমরা হাইড্রোজেন বোমা বানাব। নিউ-ক্লিয়ার বোমা বানাব। আরও কত কি মারাত্মক বোমা বানাব। নক্ষত্রলোকে যুদ্ধ করব। আমরা শক্তিমান! আমাদের প্রাণে যা ইচ্ছা তাই করব! এতে যদি জগৎ ধ্বংস হয় হোক না! তাতে আমাদের কী! আমরা স্বাধীন! আমাদের স্বাধীন ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ করো না। যদি কর—তোমাদের দেশকে এক বোমায় নিমেষের মধ্যে উড়িয়ে দেব। নিজের খেয়ালখুশি মতো মারণাস্ত্র প্রস্তুত করে অপরকে মেরে ফেলার নাম কি স্বাধীনতা?

সর্বত্র স্বাধীন ইচ্ছার জাহির। আমাদের এই স্বাধীনতা অন্যের উপর নির্ভরশীল। একটু তলিয়ে চিন্তাভাবনা করে দেখলে বেশ বোঝা যায়, যে-স্বাধীনতা অন্যের উপর নির্ভরশীল তাকে স্বাধীনতা বলে না। তাকে ক্রীতদাস বলে। সত্যিই আমরা ক্রীতদাস। জন্মলগ্নের সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রকৃতির ক্রীতদাস। প্রকৃতির অঙ্গুলি হেলনে আমরা উঠছি বসছি। প্রকৃতি বলছে—এই সুন্দর পৃথিবী তুমি ভোগ কর। তোমার যতগুলি ইন্দ্রিয় আছে তা দিয়ে খুব করে উপভোগ কর। আমিও সুবোধ বালকের মতো মনের আনন্দে ভোগ করতে লেগে গেলাম। আবার পরক্ষণে বলল—তোমার সামনে ভোগ্যবস্তু সব আছে, তুমি ভোগ করতে পারবে না। ওইসব দেখ আর দুঃখ কর। আমিও প্রকৃতির কথামতো মুখ-গোমড়া করে লোলুপ দৃষ্টিতে মনোরম বস্তুগুলি দেখছি, আর না-পাওয়ার দুঃখে হা-হুতাশ করছি। প্রকৃতি বলল—তোমার অতি প্রিয় সন্তানকে তোমার কোল থেকে ছিনিয়ে নিলাম, তুমি এখন বসে বসে খুব কাঁদ। আমিও পুত্রশোকের দুঃখ-যন্ত্রণায় কাঁদতে লাগলাম। প্রকৃতির ক্রীতদাস আমরা। আমাদের কোন স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই। প্রকৃতি আমাদের পিছনে ইন্দ্রিয়-গুলিকে লেলিয়ে দিয়েছে। ইন্দ্রিয়গুলি সদাসর্বদা আমাদের তাড়িত করছে। বুঝতেই দিচ্ছে না যে, ভালমন্দ যা কিছু করছি সবই ঐ ইন্দ্রিয়ের তাড়নায়। আসলে আমরা ইন্দ্রিয়ের দাস। আর আমরা মনে মনে ভাবছি আমরা স্বাধীন!

কামনা, বাসনা, লোভ, মোহ, ক্রোধ, দম্ভ, দর্প, অসূয়া, ইচ্ছা, মাৎসর্য প্রভৃতি আমাদের মধ্যে গিজগিজ করছে। তাদের দ্বারাই সদাসর্বদা চালিত হচ্ছি। তারা যেদিকে আমাদের চালিত করছে সেদিকে আমরা ধাবিত হচ্ছি। নিজেদের ইচ্ছায় এক পা-ও অগ্রসর হতে পারছি না। তাদের হাতেই আমরা বন্দী। ওইগুলি আমাদের হাতে-পায়ে শৃঙ্খল দিয়ে বন্দী করে রেখেছে।

বিবেকচূড়ামণির একটি শ্লোকে আছে:

শব্দাদিভিঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ
　　পঞ্চত্বমাপুঃ স্বগুণেন বদ্ধাঃ।
কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ-মীন-ভৃঙ্গা
　　নরঃ পঞ্চভিরঞ্চিতঃ কিম্‌॥

—'কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, মীন ও ভৃঙ্গ—এই পাঁচ প্রাণী শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এই পাঁচগুণের মধ্যে নিজ নিজ বিশেষ প্রিয় কোন একগুণে আসক্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পাঁচগুণেরই বশীভূত মানুষের তাহলে কী দুর্দশাই না হতে পারে?'

কুরঙ্গ (হরিণ) ধরার জন্য ব্যাধ বাঁশি বাজায়। বাঁশির মিষ্টি সুরে আকৃষ্ট হয়ে হরিণ ব্যাধের কাছে আসে ও তার পাতা ফাঁদে পড়ে এবং শেষে প্রাণ হারায়। মাতঙ্গ (হাতি) ধরতে লোকে কাঠ দিয়ে ঘিরে মজবুত একটা জায়গা তৈরি করে। তাকে খেদা বলে। ওই খেদার প্রবেশ পথে একটি শিক্ষিত হস্তিনীকে রেখে দেয়। বন্য হাতি ওই জায়গার কাছে এলে হস্তিনী তার

শুঁড়ে শুঁড় জড়িয়ে স্পর্শ সুখ দেয়। ওই সুখের লোভে হস্তিনীর সঙ্গে হাতি ধীরে ধীরে খেদার মধ্যে প্রবেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এইভাবে বন্য হাতি ধরা পড়ে। পতঙ্গ (পোকা) আগুনের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ হারায়। মীন (মাছ) বঁড়শিতে গাঁথা চারের আস্বাদের লোভে বঁড়শি গিলে প্রাণ দেয়। ভৃঙ্গ (ভ্রমর) পদ্মের মধুর গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে তা আর ছাড়তে চায় না। শেষে সন্ধ্যাবেলায় পদ্ম মুদ্রিত হলে তার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে সে প্রাণ হারায়। একটি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হলে যদি প্রাণীর এই অবস্থা হয়, তাহলে পঞ্চেন্দ্রিয়ের বশীভূত মানুষের কি দুরবস্থা! মানুষের দুর্গতির আর শেষ নেই। তবু মানুষ বলতে ছাড়ে না—আমরা স্বাধীন, ইচ্ছামতো সব করছি! এই ইচ্ছা প্রতিহত হলে—আমাদের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেললাম বলে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করি। কামনা-বাসনা-লোভ-মোহ প্রভৃতি আমাদের দিবারাত্র তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের হাতে বন্দী। তাদের ইচ্ছায় সবকিছু করছি। আর বলছি কিনা আমরা স্বাধীন! প্রতারণা আর কাকে বলে!

স্বাধীনতা লাভ করতে হলে আমাদের ইন্দ্রিয়ের পারে যেতে হবে। বশীভূত করতে হবে ইন্দ্রিয়কে—ভৃত্য করে রাখতে হবে। ইন্দ্রিয়কে জয় করতে পারলেই প্রকৃতিকে জয় করা যায়। তখনই প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করা যায়। যতদিন প্রকৃতির রাজ্যে আমরা থাকব ততদিন আমাদের কোন স্বাধীনতা-টাধীনতা নেই।

প্রকৃতির রাজ্যের বাইরে যেতে হলে আমাদের মনকে নাশ করতে হবে। কারণ এই মনটি যত গণ্ডগোল বাধায়। যত সময় মন থাকবে তত সময় কামনা-বাসনা প্রভৃতির হাত থেকে আমাদের নিষ্কৃতি নেই। মনই ওই সবের আশ্রয়-স্থল। মনের সংযোগেই ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। বলবান হয়ে বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়। তাই স্বাধীনতা লাভ করতে হলে মনকে আমাদের বশীভূত করতেই হবে। নচেৎ স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলে চিৎকারই শুধু সার হবে। চিরদিনই ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করে আমাদের কাটাতে হবে। তার ইচ্ছাই বলবতী হবে। আমাদের ইচ্ছার কোন মূল্য থাকবে না।

যোগবাসিষ্টসারে আছে: 'মনই জগৎ সৃষ্টি করে, মনই পুরুষ, মনের ভাব অনুযায়ী যা করা হয়, সেরকমই হয়ে থাকে; (কামাতুর হয়ে) যে-শরীর দ্বারা স্ত্রীকে আলিঙ্গন করে, সেই শরীর দ্বারাই (অপত্যস্নেহবশে) নিজের শিশু কন্যাকেও আলিঙ্গন করে থাকে।' বাহ্যদৃষ্টিতে ক্রিয়া এক-রকম হলেও মানসিকভাবের ভেদবশতঃ তা ভিন্ন হয়ে থাকে। অতএব মনের ভাবই প্রধান। মনই মানুষের বন্ধনের কারণ। মানুষকে সত্যিকারের স্বাধীনতার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে থাকে। অমৃতবিন্দু উপনিষদে আছে:

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তৈ নির্বিষয়ং স্মৃতম্॥

—'মনই মানুষের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ। বিষয়াসক্ত মন বন্ধন ও নির্বিষয় মন মোক্ষের কারণ হয়ে থাকে।'

বাসনামুক্ত হয়ে মন নির্মল হলে তবেই সত্যিকারের স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করা যায়। নির্মল মন করতে হলে ধর্মের অনুশাসনের মধ্য দিয়ে আসতেই হবে। যে-কোন ধর্মাবলম্বী আমরা হই না কেন তাতে কিছু এসে যায় না। প্রত্যেক ধর্মেই মনোনিগ্রহের জন্য বিশেষ প্রণালী আছে, তা অনুসরণ করলে মন শুদ্ধ হয়। এই শুদ্ধ মনের দ্বারাই আমরা প্রকৃতির কামনা-বাসনা-লোভ-মোহ প্রভৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হব। প্রকৃতির উপর স্বাধীনভাবে প্রভুত্ব করতে পারব। পরিশ্রম করে এই স্বাধীনতা অর্জন করতে পারলে জগৎ থেকে সমস্ত হানাহানি চলে যাবে। কেউ কারুর উপর আর অত্যাচার করবে না সাংসারিক সমস্ত দুঃখকষ্ট দূর হয়ে যাবে। হিন্দু-শাস্ত্রে এই স্বাধীনতা লাভকেই মোক্ষলাভ বলে
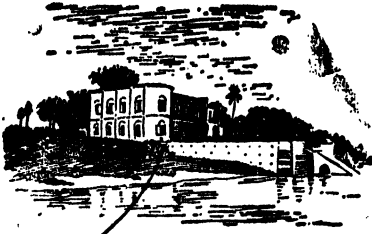
পুস্তক সমালোচনা

শ্রীশ্রীচণ্ডী—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। প্রকাশক: ঋদ্ধি-ইণ্ডিয়া, ২৮ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯। পৃষ্ঠা ৩৯৯ ; মূল্য: ৪০ টাকা।

আমাদের বঙ্গদেশে শ্রীশ্রীচণ্ডীর একটি বিশেষ স্থান আছে। ভারতের অন্যান্য প্রান্তেও এটি দুর্গাসপ্তশতী বা শুধু দুর্গা নামে সমাদৃত। শ্রীশ্রীদুর্গা-পূজার সময়ে বিশেষ করিয়া ইহার পাঠ সর্বত্র প্রচলিত। শান্তিস্বস্ত্যয়নাদিতেও বহু ব্যবহৃত। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে ইহার নামও উচ্চারিত হইয়া থাকে, সেই হিসাবে গীতা-চণ্ডী যেন বাঙালী হিন্দুর প্রাণস্বরূপ।

দুঃখের বিষয়, শ্রীশ্রীচণ্ডী আমাদের দেশে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পাঠের মধ্যেই নিবদ্ধ ও নিঃশেষিত। ইহার অর্থ অনুধাবনের প্রয়াস বিশেষ লক্ষিত হয় না। অথচ প্রাচীন কাল হইতে অনেক সংস্কৃত টীকাকার ইহার উপর টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং ইহার অন্তর্নিহিত অর্থের উপর আলোকপাত করিয়াছেন। এইরূপ একটি প্রসিদ্ধ টীকাকার ছিলেন গোপাল চক্রবর্তী এবং এযুগেও ভট্টপল্লীর বিশিষ্ট পণ্ডিতপ্রবর নানা দর্শনে অভিজ্ঞ আচার্যবর স্বনামধন্য পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন 'দেবীভাষ্য' এই নামে সংস্কৃতে ইহার একটি বিস্তৃত টীকা রচনা করিয়াছিলেন এবং তাহার বিশদ বঙ্গানুবাদও সকলের বোধগম্য করিবার জন্য সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। পূর্বে ইহার দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, শেষটি ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে। দীর্ঘ প্রায় ষাট বৎসর পরে এই তৃতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হইল। ইহার সম্পাদনা করিয়াছেন স্বর্গত তর্করত্ন মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র, পণ্ডিত ডক্টর শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, যিনি নবতিবর্ষ অতিক্রম করিয়াও নিরবচ্ছিন্ন সারস্বত সাধনায় এখনও নিরত। পিতার জীবদ্দশাতেও তিনি তাঁহার অসম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদের অষ্টম অধ্যায় হইতে ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্যন্ত সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। তাই এক হিসাবে ইহা সমান যশস্বী পিতা-পুত্রের যুগ্মসম্পাদনার ফল।

আলোচ্য সংস্করণটিতে ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের একটি মূল্যবান্ ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছে, যাহাতে তিনি শাক্তদর্শন যে অন্যান্য দর্শন-প্রস্থানের মতো একটি বিশিষ্ট প্রাচীন দর্শন, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং সেই দর্শনকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার পিতৃদেব যে শক্তিভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া তাহার মধ্যেই যে সমস্ত দর্শনের সমন্বয় নিহিত রহিয়াছে, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এই শক্তিবাদই উদ্‌ঘাটিত ও প্রতিপাদিত।

গোপাল চক্রবর্তীকৃত 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' এবং পঞ্চানন তর্করত্নকৃত 'দেবীভাষ্য', এই দুইটি টীকা এবং শেষেরটির বঙ্গানুবাদ এই সংস্করণে যুক্ত হওয়ায় শ্রীশ্রীচণ্ডীর একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ আমরা এতদিন পরে পুনরায় লাভ করিলাম। প্রারম্ভে অর্গলাস্তুতি, দেবীকীলক, দেবীকবচ এবং দেবী-সূক্তেরও সংস্কৃত টীকা এবং শেষেরটির সায়ণভাষ্য সংযোজিত হওয়ায় এগুলিরও তাৎপর্য উপলব্ধিতে বিশেষ সহায়ক হইবে। তবে রাত্রিসূক্তটি মনে হয় অনবধানবশতঃ এখানে সংযোজিত হয় নাই। সব শেষে শ্লোকগুলিরও অকারাদিবর্ণক্রমে একটি

সূচী সংযোজিত হইলে সর্বাঙ্গসুন্দর হইত।

চতুর্থ অধ্যায়ে সুপ্রসিদ্ধ শক্রাদিস্তুতির ব্যাখ্যার প্রারম্ভে দ্বিতীয় শ্লোকে বড় সুন্দর বলা হইয়াছে : 'অম্বিকা—অম্বা জননী। মা বলিয়াই দেবতারা তুমি বলিয়াছেন। মহিমার প্রভাবে দু'একবার "আপনি" বলিলেও তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া আবার "তুমি" "তোমাকে" বলিয়াছেন। এই মাতৃভাবে সাধকের হৃদয় উন্মুক্ত, অসঙ্কুচিত।' এই একান্ত আপন মাতৃস্বরূপকেই শ্রীরামকৃষ্ণ এযুগে সকলের জন্য প্রকট করিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীর এই সংস্করণ ধৈর্যের সহিত পাঠ করিয়া মায়ের সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয় সকলে লাভ করিবেন, ইহাই এই গ্রন্থের বিশিষ্ট মহিমা ও সার্থকতা। সকলে ইহার সদুপযোগ করিবেন, ভরসা করি।

—ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক।

সমাজ ও সাহিত্যচিন্তায় বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা—নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক : মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। পৃঃ ২+১৬০ ; মূল্য : ২০·০০ টাকা।

অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম গ্রন্থ 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ'। এই গ্রন্থে তাঁর মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। সেই থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-অনুরাগীদের কাছে তিনি একজন একনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গবেষক হিসাবে পরিচিত। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ আমাদের আলোচ্য বিষয়।

বিগত ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে দুদিন লেখক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবেদিতা স্মারক বক্তৃতা গোল-পার্ক (কলিকাতা) 'রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচারে' দিয়েছিলেন। দুদিনের বিষয়বস্তু ছিল —(১) নিবেদিতার সাহিত্যচেতনা এবং (২) নিবেদিতা ও বাংলা সাহিত্য। ১৯৮৪-তে তিনি মণীন্দ্রমোহন ও বাসন্তী ভৌমিক দুটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয়—(১) স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তা এবং (২) স্বামী বিবেকানন্দের সমাজচিন্তা। এই চারটি বক্তৃতার পরিমার্জিত রূপ হল যথাক্রমে নিবেদিতার সাহিত্য ও শিল্প-চিন্তা, নিবেদিতা ও বাংলা সাহিত্য, বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তা এবং স্বামী বিবেকানন্দের সমাজচিন্তা। এই প্রবন্ধগুলি সঙ্কলিত হয়ে আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশিত। চারটি প্রবন্ধই মননে ও নানা তথ্যে সমৃদ্ধ। এগুলি পাঠ করলে প্রতিছত্রে লেখকের শ্রমপরায়ণতা ও একনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়।

'নিবেদিতার সাহিত্য ও শিল্পচিন্তা' প্রবন্ধে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন : নিবেদিতার ছোটবেলার নাম মার্গারেট,—সে-সময় থেকেই তিনি সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে কিভাবে ধীরে ধীরে সত্যিকারের সাহিত্যপ্রেমিকায় রূপান্তরিত হয়েছিলেন; তাঁর লেখার 'স্টাইল' বা কি; তাঁর রচনার একটি বৈশিষ্ট্য বিষয়বস্তু সংক্ষেপকরণ,—কিভাবে তিনি এটি আয়ত্ত করেন; তিনি কি কি ছদ্মনামে লিখতেন তারও পরিচয় পাওয়া যাবে এখানে।

পরবর্তী কালে নিবেদিতা স্বামীজীর কাছ থেকে ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্য প্রভৃতির জ্ঞানলাভ করেছিলেন। এই জ্ঞানলাভের পর তিনি ভারতীয় নবজাগরণের অগ্রদূতের ভূমিকায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। ভারতীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবনে তাঁর অপরিসীম দানের কথা তৎ-কালীন খ্যাতনামা শিল্পীরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে গেছেন। নিবেদিতা ছিলেন তাঁদের অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁর মৃত্যুতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দ-লাল বসু, অসিতকুমার হালদার, প্রিয়নাথ সিংহ, বরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পীদের রচনায় নিবেদিতার প্রতি কী অপরিসীম শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে! তাঁকে হারিয়ে শিল্পীরা

সত্যিকারের একজন ভারতীয় শিল্পের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীকে হারিয়েছিলেন। নন্দলাল বসুর ভাষায়, "তাঁর (নিবেদিতার) কাছে আমরা এত উৎসাহ পেয়েছি যে, বলবার নয়। তিনি যে আমাদের কি ছিলেন, আমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করতাম কিন্তু প্রকাশ করা কঠিন। তাঁর মৃত্যুর পর আমরা সত্যিই অনুভব করেছিলুম একজন যথার্থ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীকে আমরা হারিয়েছি।"

নিবেদিতা সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করে বিদেশে ভারতের গৌরবের কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। শুধু ঘোষণা করে তিনি ক্ষান্ত হননি, বিদেশে যাতে ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচিতি ও সমৃদ্ধি হয় তার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করেছিলেন। জনজীবনের উপর গ্রন্থ লিখে ভারতীয় সমাজকে বিশ্বের কাছে মর্যাদার সঙ্গে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীচণ্ডী, বৈরাগ্যশতকম্ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে অনেক শ্লোক অনুবাদ করেছিলেন।

'নিবেদিতা ও বাংলা সাহিত্য' প্রবন্ধে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে, একজন বিদেশিনী কি উদ্দেশ্যে বাংলা শিখে বাংলা-সাহিত্যের মাধুর্য রস অনুসন্ধান করে তা বিদেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন। কোন জাতির সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে হলে সে-জাতির ভাষা অবশ্যই শিক্ষণীয়। ভাষা না জানলে কোন জাতির বৈশিষ্ট্য ভাল করে অনুধাবন করা যায় না। তাই নিবেদিতা সংস্কৃত ও বাংলাভাষা মোটামুটি ভাল করে শিখেছিলেন। বাংলা গান ও সংস্কৃত পড়ে বা শুনে তিনি অর্থ বুঝতে পারতেন। স্বামীজী বাংলা সাহিত্য নিয়ে নিবেদিতার সঙ্গে আলোচনা করতেন। স্বামীজী জানতেন, তাঁর মধ্যে সাহিত্যের মাধুর্য উপভোগ করার সেই প্রতিভা আছে।

নিবেদিতা বেশ কিছু বাংলা নাটক ও কাব্যগ্রন্থ ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বিল্বমঙ্গল' প্রভৃতি নাটক তিনি অনুবাদ করেছিলেন। বিশ্বের দরবারে যাতে বাংলাভাষার গৌরববৃদ্ধি পায় তার জন্য তিনি নিঃস্বার্থভাবে প্রচণ্ড খাটতেন। ভারতের প্রতিটি জিনিস ছিল তাঁর কাছে অতি প্রিয়। বিশেষ করে বাংলাভাষা। বাংলার ছড়া এবং পল্লীগাথার গ্রাম্যসুরের মধ্যে তিনি অনুভব করতেন কত না উচ্চভাব। দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতির স্মৃতিচারণায় সে-সব ধরা আছে।

একদা নিবেদিতা মিস্ ম্যাক্‌লাউডকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: "তিনি (স্বামীজী) চেয়েছিলেন আমার সমগ্র অন্তর, মস্তিষ্ক ও সত্তাকে তাঁর কাজে ব্যবহার করতে।" স্বামীজীর এই ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে নিবেদিতা আক্ষরিক অর্থে আমৃত্যু সাধনা করেছিলেন। তাঁর সমস্ত চিন্তা-ভাবনা-কাজকর্ম স্বামীজীর ভারতগঠনের কাজে নিয়োজিত হয়েছিল।

'বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তা' প্রবন্ধটি তথ্যপূর্ণ। এই প্রবন্ধের কিছু কিছু তথ্যে অনবধানতাবশতঃ ত্রুটি থেকে গেছে বলে মনে হয়। যেমন—"স্বামীজীর ধর্মচিন্তার পটভূমিকা রচনা করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।" (পৃঃ ১) সমালোচকের মনে হয়, স্বামীজীর ধর্মচিন্তার পটভূমিকা রচিত হয়েছিল ছোটবেলা থেকেই। বাড়িতে এবং পরে ব্রাহ্ম-সমাজের মাধ্যমে। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে তাঁর সেই ধর্মচিন্তা সুসংস্কৃত হয়ে উদার সর্বজনীনতার মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছিল এবং পরবর্তী কালে তিনি তা জগতের কল্যাণে নিযুক্ত করেছিলেন। 'রাজযোগের মূল লক্ষ্য হল আত্মসংযম···।' (পৃঃ ৮) এখানে আত্মসংযম বলতে মনে হয় মনঃসংযম বোঝাতে চেয়েছেন লেখক। রাজযোগের উদ্দেশ্য জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন ঘটানো,—আত্মজ্ঞান লাভ করা। মনঃসংযম আত্মজ্ঞানলাভের উপায় মাত্র। এই রকম ছোট-

খাট কিছু কিছু ত্রুটি থেকে গেছে এই প্রবন্ধে। আশা করি, পরবর্তী সংস্করণে সংশোধিত হয়ে প্রবন্ধটি সর্বাঙ্গসুন্দর হবে।

'স্বামী বিবেকানন্দের সমাজচিন্তা' প্রবন্ধে স্বামীজী যে সূক্ষ্ম ইতিহাসবোধের ভিত্তিতে সমাজকে বিশ্লেষণ করেছেন তা তথ্য সহায়ে লেখক আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। সমাজের উৎপত্তি থেকে বর্তমান সমাজের রূপরেখার ইতিহাস সবই লেখক বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। রচনাটি খুবই উপভোগ্য হয়েছে।

অল্প কথায় নিবেদিতার সাহিত্য এবং শিল্প প্রতিভা সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছা করলে পাঠক-পাঠিকারা নির্ভরযোগ্য তথ্যনিষ্ঠ উপরি-উক্ত প্রবন্ধ দুটি পড়তে পারেন।

গ্রন্থের ভাষা সাবলীল ও স্বচ্ছ। প্রকাশ-ভঙ্গি স্পষ্ট। প্রচ্ছদ মনোরম। গ্রন্থের সূচীপত্র নেই। লেখক বোধ হয়, ভূমিকায় চারটি প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করায় আর পৃথক্ সূচীপত্র দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। মনে হয়, পৃথক্ সূচীপত্র থাকলে সাধারণ পাঠক ইচ্ছানুযায়ী প্রবন্ধের পৃষ্ঠাসংখ্যা দেখে সহজে পড়তে পারবেন।

—স্বামী চৈতন্যানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার।

নূতন দৃষ্টিভঙ্গী—রমাপতি বিশ্বাস। সাহিত্য কুটীর, ভাগবত নিবাস মসলাপুর, পাটনা-৬। পৃষ্ঠা ১৪+১৮১। মূল্য: তিন টাকা।

'অবতারণা'র এক অংশে লেখক বলেছেন, "পুরাতনের বিরুদ্ধে নির্বিচার বিদ্রোহ বিচার-হীনতা-প্রসূত, নূতনত্বের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা যেন একরূপ অর্বাচীনতারই প্রকাশভঙ্গী। সত্য—চিরপুরাতন এবং চিরনূতন। অতএব পুরাতন এবং নূতনের গুণসমন্বয় ঘটাইয়া সমগ্র মানবজাতির সমবেত, এমন কি একীভূত চেষ্টায় এক উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের সূচনা করিতে হইবে।" —পুরাতন আর নূতনের 'গুণসমন্বয়' লেখকের আদর্শান্বিত 'নূতন দৃষ্টিভঙ্গী' বা 'নব-দর্শনের

লেখক পনেরোটি নিবন্ধে এই 'নূতন' দৃষ্টি-ভঙ্গীতে ধর্ম, সবলতা-দুর্বলতা, সুন্দর-অসুন্দর, পাপ-পুণ্য, স্বাধীনতা-পরাধীনতা, প্রগতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'মনুষ্যত্ব-বাদ বনাম গণতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ' নিবন্ধে তিনি মনুষ্যত্বকেই সকলের উপরে স্থান দিয়েছেন —প্রায় প্রত্যেকটি নিবন্ধে মনুষ্যত্বের পূর্ণ আদর্শ যে দেবত্ব তাকেই সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছেন। লেখক মূলত আদর্শবাদী। যে আদর্শ তাঁর কাছে অনুকূল বলে মনে হয়েছে তার প্রশস্তি গেয়েছেন, পক্ষান্তরে যা তাঁর অনভিপ্রেত তার নিন্দা করেছেন। বিশেষত প্রগতির নামে স্বেচ্ছাচার, একালের রাজনীতির স্বার্থান্ধতার প্রতি বিরূপতা তীব্র ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রাচীন আদর্শের প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা প্রায় সব কটি নিবন্ধেই পাওয়া যায়, তুলনায় অধুনাতনের সমালোচনাই বেশি। তবে কোন কোন একালীন ভাবধারার প্রশংসাও করেছেন—কার্ল মার্কসের মতবাদের সমর্থন বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীতে যথার্থ নূতনত্ব আছে কিনা বিতর্কের বিষয়, তবে আদর্শবাদী ভাবুকের লেখা এই গ্রন্থটি চিন্তাশীল পাঠককে আকৃষ্ট করবে, সন্দেহ নেই।

কাগজের মলাটটি সাদামাটা হলেও মূল গ্রন্থের মুদ্রণ-পারিপাট্য উল্লেখযোগ্য।

—ডক্টর তারকনাথ ঘোষ

সুপরিচিত লেখক ও সমালোচক

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন
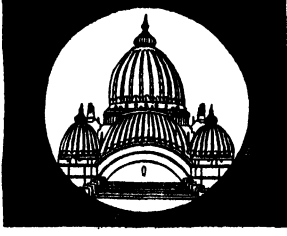
তামিলনাড়ুতে বন্যাত্রাণ: মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের মাধ্যমে উত্তর মাদ্রাজের ব্যাসরপাদি অঞ্চলে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ও গৃহহারা ১৩০০ জনের অস্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয় এবং তাদের মধ্যে খাবারের প্যাকেট বিতরণ করা হয়। এ-ছাড়া আমবেদকর ব্রীজে আশ্রয় নিয়েছে, এরকম ২০০০ জনকে খাবারের প্যাকেট ও ২০০ জন রোগীকে ওষুধ দেওয়া হয়েছে। বন্যায় বিশেষ-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির মধ্যে বাসন-পত্র ও নতুন বস্ত্রাদি বিতরণও করা হয়।

উড়িষ্যায় বন্যা ও ঘূর্ণিবাত্যাত্রাণ: ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পরিচালনায় বালাসোর জেলার ভদ্রক মহকুমায় ১৭টি গ্রামের ২৩০২টি বন্যা-বিধ্বস্ত পরিবারের মধ্যে ৫০০টি ধুতি, ৫০০টি শাড়ি, ২২৮৮টি উলের সোয়েটার এবং ৩৫৪৫টি পুরানো কাপড় বিতরিত হয়। এরপর এখানকার ত্রাণকার্যের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

শ্রীলঙ্কা শরণার্থিত্রাণ: মাদ্রাজ ত্যাগ-রাজনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম কর্তৃক তিরুচি ও মণ্ডপম্ শিবিরে শ্রীলঙ্কা থেকে আগত শরণার্থীদের মধ্যে ৩০০ কেজি গম, ৯০ কেজি মিষ্টি, ৮৫০টি পুরানো জামা এবং ১৩৩টি বই বিতরণ করা হয়। এছাড়া পূর্বোক্ত শিবির দুটি থেকে যথাক্রমে ৭৩৭৫ জন ও ২৪৪৩০ জনের মধ্যে দুধ ও জল-খাবার বিতরিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন: ২৪-পরগনায় গাইঘাটা থানার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ১৯৮৩-র ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত ঠাকুরনগর বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণ-কার্য অব্যাহত।

দ্বারোদ্ঘাটন

গত ২৮ সেপ্টেম্বর নটরামপল্লী রামকৃষ্ণ মঠের নবনির্মিত 'রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়' ভবনের একতলা দ্বারোদ্ঘাটিত হয়েছে।

চণ্ডীগড় আশ্রমের মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

গত ২৪ নভেম্বর চণ্ডীগড় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে প্রস্তাবিত সর্বজনীন শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের শিলান্যাস করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ। এই অনুষ্ঠানে পাঞ্জাবের শিক্ষামন্ত্রী সর্দার সুখজীন্দর সিং এবং চণ্ডীগড়ের প্রশাসকের উপদেষ্টা শ্রী কে. ব্যানার্জী উপস্থিত ছিলেন।

ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র

নাগপুর রামকৃষ্ণ মঠ শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পল্লীবাসীদের সুচিকিৎসার জন্য গত ২৫ অক্টোবর থেকে একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র খোলেন।

উদ্বোধন-সংবাদ

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী বিকাশা-নন্দ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

বিবিধ সংবাদ

রজতজয়ন্তী উৎসব

পশ্চিম রাজাপুর (কলিকাতা) শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের রজতজয়ন্তী উৎসব গত ৩ নভেম্বর বিশেষ পূজা এবং নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। উৎসব শুরু হয় স্বামী লোকেশ্বরানন্দের প্রদীপ জ্বালানোর মধ্যে দিয়ে। এই সময় ভক্তি-গীতি পরিবেশন করেন শ্রীসজল চক্রবর্তী এবং সংঘের বালক-বালিকারা সমবেতকণ্ঠে বেদগান করেন। এরপর স্বামী ভবেশানন্দ ও সংঘ-সভাপতি শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ভাষণ দান করেন।

রাউরকেলা (উড়িষ্যা) শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের রজতজয়ন্তী উৎসব গত ৭ থেকে ৯ নভেম্বর তিন-দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়।

৭ নভেম্বর রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের সূচনা করেন। রাউরকেলা ইস্পাত-প্রকল্পের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী ভি. সুব্রামনির সভাপতিত্বে স্বামী আত্মানন্দ ভাষণ দান করেন।

৮ নভেম্বর স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ সংঘের নবনির্মিত রামকৃষ্ণ-বেদান্ত-সাহিত্য বিক্রয়-কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। এই দিন সন্ধ্যায় স্বামী ভূতেশানন্দজী, স্বামী আত্মানন্দ প্রভৃতির ভাষণ দানের পর শ্রীমা সারদা লীলাগীতি পরিবেশিত হয়।

৯ নভেম্বর স্বামী ভূতেশানন্দজীর মন্দির প্রাঙ্গণে নারিকেল বৃক্ষ-রোপণ এবং স্বামী আত্মানন্দের রামচরিতমানস পাঠের পর ভক্তিমূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

উৎসব

এগরা (মেদিনীপুর) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিলন মন্দিরে গত ২০ নভেম্বর, সাড়ম্বরে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ নভেম্বর আন্তর্জাতিক যুববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ৩১ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

ইলেকট্রন্ রশ্মির সাহায্যে পিনের ডগায় এন্‌সাইক্লোপিডিয়া

আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮ বছর বয়স্ক ছাত্র টম নিউম্যান সম্প্রতি একটি আলপিনের ডগায় অতি সূক্ষ্ম ইলেকট্রন্ রশ্মির সাহায্যে সমগ্র এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা লেখার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এজন্য তাঁকে ১০০০ ডলার পুরস্কার দেওয়া হয়। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বৈজ্ঞানিক রিচার্ড পি. ফেইন-ম্যান ২৫ বছর পূর্বে এই পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছিলেন।

কলকাতায় নতুন সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতায় একটি কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উদ্দেশ্য সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা। কাশীর সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের ধাঁচে এটি তৈরি হবে। এই উদ্দেশ্যে চারজন সদস্যের একটি টাস্ক ফোর্স গড়া হয়েছে।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্র-শিষ্য, শিরপুর-কাঘাজনগর নিবাসী **মাণিকলাল ভট্টাচার্য** গত ২১ অক্টোবর ১৯৮৫, মহাষ্টমীর দিন, পরলোক গমন করেন। গত ১৫ বছর যাবৎ তিনি হৃদরোগজনিত কষ্টে ভুগছিলেন। স্থানীয় 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রে'র তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

*

শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **কৃষ্ণকিঙ্কর রায়**, তাঁর বহরমপুরস্থ নিজ বাস-ভবনে গত ৩০ অক্টোবর ৭৪ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে তিনি সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। দীর্ঘকাল কোষাধ্যক্ষরূপে তিনি আশ্রম পরিচালনা সমিতির সদস্য ছিলেন।

এঁদের দেহনির্মুক্ত আত্মা শান্তিলাভ করুক—শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে এই প্রার্থনা।